"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৩

ষোড়শ বর্ষ : জানুয়ারী—জুন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৩

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জানুয়ারী হইতে জুন—১৯৬৩

চিত্রসূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেস ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র
১৯৬৩

ষোড়শ বর্ষ : জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
(ফেডারেশন হল)
কলিকাতা-৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বর্ণানুক্রমিক ষাণ্মাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৩

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষাণ্মাসিক লেখক সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৬৩

চিত্রসূচী

বিবিধ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু

গত ১লা জানুয়ারী বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সমগ্র দেশবাসীর সহিত আমরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি এবং আমাদের কামনা, সুস্থ শরীরে তিনি আরও দীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাকিয়া বিশ্বের বিজ্ঞান সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়া তুলুন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ   জানুয়ারী, ১৯৬৩   প্রথম সংখ্যা

নববর্ষের নিবেদন

১৯৬২ সালের অবসানে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আজ ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। ১৯৬২ সাল নানাবিধ জটিল সমস্যা এবং বিবিধ স্মরণীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ—একদিকে গুরুতর সংঘর্ষ, অপরদিকে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতি। বিশ্বশান্তি স্থাপনে আগ্রহের অভাব না থাকিলেও পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস জনচিত্তকে উদ্বেগাকুল করিয়া তুলিয়াছে। চীনের ভারতবর্ষ আক্রমণের ঘটনা সারা বিশ্বে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সমগ্র ভারতবাসী আজ শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার মহান ব্রতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়াই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর নববর্ষের যাত্রা সুরু হইল।

বাংলাভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের সুমহান ব্রত গ্রহণ করিয়া আজ হইতে দীর্ঘ পনেরো বৎসর পূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। তদবধি নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়াও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' অভীষ্ট লক্ষ্যাভিমুখে স্বীয় অগ্রগতি অব্যাহত রাখিয়াছে। যাঁহাদের আগ্রহ, ঐকান্তিকতা ও পৃষ্ঠপোষকতা আমাদিগকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করিয়াছে, আজ ষোড়শ বর্ষের সূচনায় তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতেছি।

মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম—সেই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পরাধীন ভারতে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও অনুশীলন চলিত। বিজ্ঞান তখন ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের অধীতব্য বিষয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে—বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্তমানে অপরিহার্য। জনসাধারণ যাহাতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারে—সেই জন্য মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান প্রচারের

প্রয়োজনীয়তা আজ প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেছেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর লক্ষ্যও ইহাই। কিন্তু আজও আমরা এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারি নাই।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিসদের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১লা জানুয়ারী '৬৩ তাঁহার সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত প্রতিভাসণে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবিশেস প্রণিধানযোগ্য। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"আমরা যে যুগে বিজ্ঞান-সাধনা সুরু করিয়াছিলাম, তখন আইন পড়াই ছিল প্রচলিত রীতি। আজ ছাত্র এবং প্র-ছাত্রদের মধ্য দিয়া আমি বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার কামনা করি।····· অনেক সময় মনে হয় এতদিন আমি যাহা করিয়াছি, তাহা নিছক সৌখিন মজদুরী। বিজ্ঞান শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োগ করিবার বস্তু নয়। জীবনের সকল কাজে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করা চাই—আর এইখানেই বিজ্ঞানের সার্থকতা। বিজ্ঞানকে শিল্পের ন্যায় জীবনের সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে।" মাতৃ-ভাসার মাধ্যমে বিজ্ঞানসাধনার উপযোগিতা সম্পর্কে আচার্য বসু আরও বলেন—"ভাবিয়াছিলাম জাতীয়তাবোধ উন্মেসের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুস স্বাভাবিকভাবেই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। এই প্রসঙ্গে আমার অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও আমাকে ভুল বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন, ইহা আমার একটি খেয়াল। কেবলমাত্র দার্শনিক দিয়াই দেশ গড়া যায় না।" মাতৃভাসায় বিজ্ঞান প্রচারের উপর বিশেস গুরুত্ব আরোপ করিয়া তিনি বলেন—"মনে রাখা উচিত, আমাদের মনের গোপন কথা আমরা মাতৃ-ভাসাতেই ব্যক্ত করিয়া থাকি।"

গত বৎসর 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' মোটামুটি ১৬৫টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পদার্থবিদ্যায়—৩৬, রসায়নে—১৮, প্রাণিবিদ্যায়—১৮, উদ্ভিদ-বিদ্যায়—৭, চিকিৎসাবিদ্যায়—২২, ভূবিদ্যায়—১৪ গণিতে—৭, জ্যোতির্বিদ্যায়—৬, নৃতত্ত্বে—৩, শারীর-বিদ্যায়—২, ধাতুবিজ্ঞানে—২, জীবনীতে—১৫ এবং অন্যান্য বিসয়ে—১৫টি প্রবন্ধ এবং বিবিধ আলোচনা আছে।

নিজস্ব অভিজ্ঞতা বা গবেসণালব্ধ বিষয়ের সরল, সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রবন্ধের আকারে লিখিবার জন্য আমরা বহুবার "জ্ঞান ও বিজ্ঞান"-এর লেখক-লেখিকাদের প্রতি আবেদন জানাইয়াছি, কিন্তু আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। সাধারণতঃ যে সকল প্রবন্ধ আসিয়া থাকে, তাহাদের অধিকাংশই ইংরেজী ভাষায় লিখিত বিজ্ঞান পুস্তক বা প্রবন্ধাদির অনুবাদ বা তাহাদের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। অনুবাদ বা ছায়াবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধাদি অবশ্যই উপেক্ষণীয় নহে, তবে বিষয়বস্তু আকর্ষণীয় এবং সহজবোধ্য করিবার জন্য যথোপযুক্ত শব্দবিন্যাস এবং ভাসার সাবলীলতার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

দীর্ঘ পনেরো বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়—অনেকে হয়তো মনে করেন, বিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা রক্ষিত হইলেই যথেষ্ট, ভাসার সাবলীলতা নাই বা থাকিল! কিন্তু গবেসণা-পত্রের ক্ষেত্রে সে কথা কতকটা স্বীকার করিয়া লইলেও—জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের ক্ষেত্রে লোকরঞ্জক প্রবন্ধাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। জনসাধারণের মধ্যে লোকরঞ্জক ভাসায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু পরিবেশন করিতে পারিলে সাধারণ লোক সহজেই বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে। ভাসার আড়ষ্টতা এবং জটিলতা সাধারণ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে যেমন অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে, তেমনই আবার সহজ সরল বিষয়ও দুর্বোধ্য করিয়া তোলে।

আর একটি বিসয়ে লেখক-লেখিকাদের নিকট পূর্বেও আমরা আবেদন করিয়াছি এবং এখনও সেই আবেদন করিতেছি। বিজ্ঞান বলিতে কেবল গবেষণাগারের পরীক্ষা, যন্ত্রপাতি বা কল-কারখানার বিষয়ই নহে, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ,

যেমন—গাছপালা, পশুপক্ষী, কীট-পতঙ্গ, তাহাদের পরিবেশ, স্বভাব-বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় বিজ্ঞানের একটি বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু এইরূপ পর্যবেক্ষণলব্ধ বিবরণের একান্ত অভাব রহিয়াছে। এই সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতালব্ধ বিবরণের দ্বারা কেবলমাত্র ছেলে-মেয়েদেরই নয়, বয়স্কদেরও অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত দেশ-ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, প্রাকৃতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাদি পরিদর্শনের অভিজ্ঞতার বিবরণ পাঠেও জনসাধারণ স্বভাবতঃই বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠে।

পরিশেষে আমাদের পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা এবং অন্যান্য যাঁহারা আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সহায়তা লাভে আমরা কখনও বঞ্চিত হইব না।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

(অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে)

শ্রীমহাদেব দত্ত

১লা জানুয়ারী বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন। গত ১লা জানুয়ারী তাঁর ছাত্র, বন্ধু ও গুণমুগ্ধেরা এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানান। আগামী ১লা জানুয়ারী তাঁর সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার আনন্দের দিনটি সাড়ম্বরে পালনের তোড়জোড় চলছে। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর দান ও বিনিময়ে তাঁর ছাত্র, বন্ধু ও গুণমুগ্ধেরা, তাঁর সমাজ ও দেশ, তাঁর সমকালীন বিজ্ঞানী সমাজ তাঁকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, সম্মান, পরিচিতি কি দিল ও কতটাই বা দেয় তার একটি নীরব খতিয়ান হচ্ছে অলক্ষ্যে। এখানে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান প্রতিভা ও সাধনার সংক্ষিপ্ত অতি সাধারণ পরিচয় দেবার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞানসাধনার দুটি দিক আছে। একটি দিক, যেখানে তিনি তাঁর বিজ্ঞান সাধনা, বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, মত ও বক্তব্য প্রকাশিত প্রবন্ধ, বক্তৃতা প্রভৃতির মারফৎ বিজ্ঞানীদের নিকট সরাসরি ব্যক্ত করছেন। এই সকল প্রবন্ধ, বক্তৃতা, বই দিয়েই সাধারণতঃ বিজ্ঞানীর মূল্যায়ন হয়। এই প্রবন্ধে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের এই দিকের পরিচয় দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাঁর বিজ্ঞানসাধনার অপর দিকটি তাঁর চরিত্রের, তাঁর জীবনের আরও এক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ দিক, যার সর্বজনগ্রাহ্য দলিল প্রমাণ উপস্থিত করা যায় না, যা কেবল তাঁর সংস্পর্শে যে সব বিজ্ঞানকর্মীরা এসেছেন, কেবল তাঁরাই জানেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহু কর্মী যখন নিজ সমস্যা সমাধানে বিব্রত হয়ে পড়েন, যখন ঐ সমস্যার আরও এক নতুন দিক থেকে আলোকপাত নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করবার দরকার দেখা যায়, তখনই তিনি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হন ও সত্যেন্দ্রনাথ পরম আগ্রহে গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য দিয়ে সেই সমস্যা বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ করে নতুন আলোকপাত করেন। এভাবে উদ্ভিদবিদ্যা, রসায়ন,

ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ঐ সকল বিষয়ের গবেষক ও কর্মিদের সঙ্গে তাঁকে প্রায়ই আলোচনায় মগ্ন থাকতে দেখা যায়। তথ্য প্রমাণ দিয়ে কোন অঞ্চল নদীমাতৃক কি দেবমাতৃক ঠিক করা যাবে, কিন্তু শিশিরবিন্দু কত শত ফুল ফোটালো তার হিসাব পাওয়া যাবে কি করে?

সত্যেন্দ্রনাথ হিন্দুস্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের মেধাবী ছাত্র হিসাবে বিজ্ঞানের চর্চা স্নরু করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক কালিস (Cullis) প্রভৃতিকে তিনি শিক্ষক হিসাবে পান। মনে হয়, আচার্য বসু ও আচার্য রায়ের সাহচর্যে পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে সত্যেন্দ্রনাথের যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের দীপশিখাটি জ্বলেছিল, জীবনের সায়াহ্নে তা অম্লান আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর নেবার সময় পর্যন্ত মাঝে মাঝে দিনের পর দিন তাঁকে তাঁর রসায়নের পরীক্ষাগারে গবেষণায় মগ্ন থাকতে দেখা যেত। যদিও মূলতঃ তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যাই তাঁর বিষয়, তবু আজ পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিন্ন হয় নি। আর নতুন কোন যন্ত্র তৈরীর জন্যে কারিগরদের কি ভাবে কি করতে হবে, তা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিতে অনেক সময় দেখা গেছে। ছাত্রাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথ গণিতকেই মুখ্যবিষয় হিসাবে নেন। অধ্যাপক মল্লিক ও প্রধানতঃ অধ্যাপক কালিসের নিকট থেকে যে কোনও গাণিতিক সমস্যা একেবারে মূল নিয়ম থেকে স্নরু করে পুরাপুরি কষে ফেলবার শিক্ষা পান। যে কোনও গাণিতিক সমস্যা ঠিকমত গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা গেলে তার সমাধান করা যাবেই, এই বিশ্বাস নিয়ে সেটিকে পুরাপুরি ভাবে নিজে কষে ফেলা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য। ছাত্রাবস্থায় তাঁর সতীর্থ হিসাবে পান মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি, নিখিল সেন, শৈলেন ঘোষ, পুলিন সরকার, পি. কে. বসু প্রভৃতিকে। প্রেসিডেন্সী কলেজ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এতগুলি মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্রের সমাবেশ আর কখনও হয় নি। তাঁদের সবাইয়ের, বিশেষ করে মেঘনাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও প্রতিযোগিতা থেকে বিজ্ঞানের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার উদ্দীপনা পান ও নিজ মূল্যায়নে সক্ষম হন।

এম. এস্-সি পাশের পরেই ১৯১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগেই পড়াবার ও পদার্থবিদ্যা বিভাগে কোনও অধ্যাপক না থাকায় শৈলেন ঘোষ প্রভৃতির সহযোগে বিভাগটি সংগঠনের ভার সার আশুতোষ সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের উপর দেন। এই কারণে উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠনপাঠন ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। তাঁদের যুগ্ম প্রচেষ্টার প্রথম ফল—বিশিষ্ট ইংরেজী পত্রিকা 'Philosophical Magazine'-এ প্রকাশিত বায়বীয় পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ। এতে প্রমাণিত সম্বন্ধটি 'সাহা-বোস অবস্থা-সমীকরণ' (Saha-Bose Equation of state) নামে পরিচিত। প্রায় এই সময় প্রশান্ত মহলানবীশের সহযোগে মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ আপেক্ষিকতাবাদের আইনষ্টাইন প্রভৃতি কয়েকজন মনীষীর কয়েকটি মূলগত প্রবন্ধের অনুবাদ করেন এবং এগুলি বই হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেন। সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিদ্যার সঙ্গে বিশুদ্ধ গণিতের চর্চা নিয়মিত করে যান। জ্যামিতি বিষয়ক একটি মৌলিক প্রবন্ধ কলিকাতা-গণিত সমিতির (Calcutta Mathematical Society) নিকট পাঠান।

১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের সংগঠনেও তাঁর সক্রিয় অংশ ছিল। ১৯২৩-'২৪ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর পদার্থবিদ্যার একটি প্রবন্ধ বৃটেনে

Philosophical Magazine পত্রিকায় পাঠান, কিন্তু দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ প্রবন্ধটি প্রকাশ না করে ঐ পত্রিকা ফেরৎ দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এই প্রবন্ধটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। সেটি প্রকাশিত না হয়ে ফেরৎ আসায় তিনি বিরক্ত হন। তখন এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ও এই বিষয়ের অন্য বৈজ্ঞানিকদের কাজের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ অধ্যাপক আইনষ্টাইনের (Einstein) নিকট মতামতের জন্যে পাঠান। যোগ্যং যোগ্যেন। আসল হীরা প্রকৃত জহুরীর হাতে পড়লো। আইনষ্টাইনও এর সারবত্তা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে নিজেই অনুবাদ করে জার্মেনির বিশিষ্ট পত্রিকা 'ট্সাইটশ্রিফট' ফ্যুর ফিজিক্স-এ (Zeitschrift fuer Physik) প্রকাশ করলেন একটি পাদটীকার সঙ্গে। এই পাদটীকায় আইনষ্টাইন ঘোষণা করলেন—এই প্রবন্ধটি মৌলিক ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ে তাঁর নিজের গবেষণা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। এই প্রবন্ধে 'বোস-সংখ্যায়ন' (Bose Statistics) দেওয়া হয়, যার উল্লেখ কখনও কখনও 'বোস-আইন-ষ্টাইন' সংখ্যায়ন নামে দেখা যায়। যেহেতু এই প্রবন্ধটি সাধারণ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধরূপে লেখা হয় নি, ব্যক্তিগত চিঠি হিসাবেই লেখা হয়, সে জন্যে প্লাঙ্ক (Planck), আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিজ্ঞানের দিকপালদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কাজ সম্বন্ধে যে তীব্র ও সরাসরি সমালোচনা দেখা যায়, তা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সাধারণ নিয়মমত হয় নি। এই চার পাতার প্রবন্ধটি জার্মেনির বৈজ্ঞানিক মহলে এক বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রায় চার-পাঁচ মাস ধরে বার্লিনের পদার্থবিদ্যার সাপ্তাহিক সেমিনারে এই প্রবন্ধ ও আইনষ্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধগুলি আলোচিত হয়। এই আলোচনার উদ্বোধন করেন আইনষ্টাইন, বোসের প্রবন্ধটির বিবরণ দিয়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই এই বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এসব আলোচনায় যোগদান করেন প্লাঙ্ক, আইনষ্টাইন, শ্রোয়েডিন্-গার (Schroedinger) প্রভৃতি পদার্থবিদ্যার মহারথীরা।

কয়েক বছরের মধ্যেই সত্যেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত পদ্ধতিতে পাউলির (Pauli) প্রকল্পের ভিত্তিতে ফের্মি (Fermi) আর একটি সংখ্যায়ন দেন, যা 'ফের্মি সংখ্যায়ন' বা 'ফের্মি-ডিরাক (Fermi-Dirac) সংখ্যায়ন' নামে পরিচিত। মৌলিক কণার (Fundamental particles) আলোচনায় এই দুটি সংখ্যায়নের বিশেষ মূলগত ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ডিরাক মৌলিক কণা-গুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন। যারা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে, তারা বোসকণা বা বোসোন (Boson), আর যারা ফের্মি-সংখ্যায়ন মেনে চলে, তারা ফের্মিকণা বা ফের্মিয়ন (Fermion)

এই প্রবন্ধটি প্রকাশের দু-বছরের মধ্যে বোস সংখ্যায়ণের আর একটি নতুনভাবে আলোচনা ও প্রমাণ সত্যেন্দ্রনাথ দেন। এই প্রবন্ধটিও আইনষ্টাইন নিজে অনুবাদ করে একই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। গাণিতিক আলোচনা ও প্রমাণের দিক থেকে এই প্রবন্ধ অসামান্য, কিন্তু এই প্রবন্ধের পাদটীকায় আইনষ্টাইন এই প্রবন্ধের সঙ্গে এক জায়গায় একমত হতে পারছেন না লেখায় খুব কম বিজ্ঞানীই এটা যত্ন নিয়ে পড়ে দেখেন। সব রকম কুসংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানীদের ব্যক্তিপূজার কি অপূর্ব পরিচয়! সত্যেন্দ্রনাথের ধারণা বোস-সংখ্যায়ন সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথম প্রবন্ধের চেয়ে সব দিক থেকে অনেক ভাল এবং তাঁর ক্ষোভ এই যে, বিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের প্রভাবে অন্য বিজ্ঞানীরা এর মূল্যায়নে বিরত থাকলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সাহায্য লাভ করে সত্যেন্দ্রনাথ এই সময় দুই বছরের জন্যে ইউরোপে যান। ছয় মাস জার্মেনিতে ও ছয় মাস ফ্রান্সে কাটান। জার্মেনিতে তিনি আইনষ্টাইনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা ও আলোচনা করবার সুযোগ পান। যদিও আইনষ্টাইনের নিকট থেকে

সত্যেন্দ্রনাথ সাধারণ অর্থে উচ্চ পদার্থবিদ্যার শিক্ষায় বা গবেষণার কোন পাঠ গ্রহণ করেন নি, তবু একলব্যের মতই আইনষ্টাইনকে নিজের গুরু হিসাবে তিনি মনে মনে বরণ করেন। সত্যেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও বন্ধুরা জানেন আইনষ্টাইন সম্বন্ধে তাঁর নীরব কিন্তু গভীর শ্রদ্ধার কথা। আইনষ্টাইনের মৃত্যু-সংবাদ যেদিন এলো, সেদিন প্রিয়জন বিরহে ব্যথিত সত্যেন্দ্রনাথকে যিনি দেখেছেন, তাঁর এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। সেদিন দেখা গেল একীকৃত ক্ষেত্রবাদের (Unified Field Theory) আইনষ্টাইনের তৎকালীন মতবাদের মূলগত দোষত্রুটি দেখিয়ে বোসের এই বিষয়ে নিজ মতবাদের সমর্থনের প্রবন্ধটির কাগজপত্রগুলিকে ছিন্ন হয়ে ছিন্ন কাগজপত্রের ঝুঁড়িতে জায়গা নিতে। এই কাজটি বিজ্ঞানীর উপযুক্ত হলো না বোধ হয়, কিন্তু নিঃসন্দেহে মানুষ সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের উপর জয়ী হলো। তবে সত্যেন্দ্রনাথ নিজে আইনষ্টাইনের শিষ্য—এই পরিচয়ে জীবনে কখনও কোনও বস্তুর সুবিধা করে নেন নি বা আইনষ্টাইনকে অনুরূপ কারণে উত্যক্ত করেন নি। এই সম্বন্ধ তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত। সত্যেন্দ্রনাথ যখন জার্মেনিতে, তখন জার্মেনির পদার্থবিদ্যার আবহাওয়া হাইজেনবার্গ (Heisenberg) প্রভৃতির প্রস্তাবিত কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যার নতুন প্রস্তাবে আলোড়িত। সত্যেন্দ্রনাথও অপরাপর জার্মান বিজ্ঞানীদের সঙ্গে এসব আলোচনায় যোগ দেন ও হাইজেনবার্গ প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করবার সুযোগ পান। ফ্রান্সে যাবার সময় তিনি প্রধান লাঁজভ্যাঁ (Langevin), মাদাম কুরী, (Curie) দ্য ব্রোগ্লী (De Broglie) প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ পান। এই সময়ে কিছু দিনের জন্যে তিনি মাদাম কুরীর গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। দ্য ব্রোগ্লীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় পরে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়।

এরপর রেডিও-তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁর ও তাঁর সহযোগীদের একটি গাণিতিক আলোচনা প্রকাশিত হয়। অল্প দিনের মধ্যেই মহলানবীশের D^2-সংখ্যায়নের উপর আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দুটি প্রবন্ধেই গাণিতিক মুন্সিয়ানার যথেষ্ট পরিচয় থাকে। কিছু পরে ডাঃ ক্ষেত্রমোহন বোসের সহযোগে সোনিন বহুপাদ রাশি (Sonine Polynomial) ও তার কোয়াণ্টাম তত্ত্বে প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ডাঃ সিতেশচন্দ্র করের সহযোগিতায় কোয়াণ্টাম তত্ত্বের একটি সমস্যার সহজ গাণিতিক সমাধান তিনি প্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ সমকলনীয় সমীকরণ (Integral Equation) দিয়ে কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যার হাইড্রোজেন-অণুর সমস্যার একটি সুন্দর সমাধান প্রকাশ করেন। প্রকাশের পর দেখা গেল, প্রায় একই সময়ে—বোধ হয় কিছু পূর্বে আর একজন বিজ্ঞানীও মোটামুটি একই ভাবে এই সমস্যার সমাধান করেছেন।

বোধ হয় ১৯৪৪ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি কোয়াণ্টামবাদের হাইজেন্‌বার্গের অনিশ্চয়তা প্রকল্প ও তার জ্ঞানতাত্ত্বিক (Epistemological) ও বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আলোচনা করেন। এতে দেখা যায়, জ্ঞানতাত্ত্বিক মতবাদের দিক থেকে বোসের মত বোর-হাইজেন্‌বার্গের (Bohr-Heisenberg) গোষ্ঠীর চেয়ে আইনষ্টাইন গোষ্ঠীর মতের নিকটতর। ১৯৪৫ সালে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপকের (Khaira Professor) পদ ও কিছুদিন পরে ঐ বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালে প্রায় তিন বছর বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার (National Institure cf Sciences of India) সভাপতি থাকেন।

১৯৫১ সালের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনের সময় আপেক্ষিকতা-বাদের নতুন রূপ—এককারী ক্ষেত্রবাদে আগ্রহী বিজ্ঞানীরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের বোসের ঘরে এক ঘরোয়া আলোচনা সভায় মিলিত হন। এই ঘরোয়া আলোচনায় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের এই বাদ সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্য জাগে। পরদিন এই বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রপ্রতিম ঐ বিষয়ের গবেষক গগন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা সুরু করেন। গগনের নিকট তখন তিনি জানলেন যে, এই বিষয়ের সুরুতেই চৌষট্টি সহসমীকরণ সমাধানের দুর্গম বাধা আছে এবং বিজ্ঞানী শ্রোয়েনডিন্‌গার তাঁর বইতে এই সমীকরণের সঠিক সমাধান অসম্ভব না হলেও অসাধ্য বলেছেন ও আসন্ন (approximate) সমাধানে সন্তুষ্ট থাকবার কথা জানান। শ্রোয়েডিন্‌গার, আইনষ্টাইন প্রভৃতি বিশ্ববিজ্ঞানীদের যেখানে অসুবিধা হয়, সেখানেই বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ সমস্ত শক্তি প্রয়োগের উপযুক্ত মনে করেন ও সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন। যা বিজ্ঞানের মহারথীদের উপযুক্ত নয়, যা বিজ্ঞানের মূলে নতুন আলোকপাত করে না, সেরূপ কোনও বৈজ্ঞানিক সমস্যা বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের কৌতূহল জাগায় না এবং কোন কারণে কৌতূহল জাগলেও তা সমাধান করলে প্রকাশ করবার ইচ্ছার একান্ত অভাব দেখা যায়। এটা তাঁর চিরজীবনের অভ্যাস, এটা তাঁর বিজ্ঞানী-জীবনে এক বিশেষ ত্রুটি বা মহত্ত্ব। তাঁর জীবনের খুব অল্প সময়ই পড়াশুনা বা আঁক কষা না করে নিশ্চেষ্ট থাকতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধের সংখ্যা অনেক কম। তার চরিত্রের এই দিকটা যাঁরা জানেন না, তাঁরা তাঁকে অলস বিজ্ঞানী বলে সমালোচনা করেন, তবে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথকে এ-বিষয়ে কখনও বিচলিত হতে দেখা যায় নি। যাহোক বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের চেষ্টা সফল হয়। তিনি ঐ চৌষট্টি সহসমীকরণের অতি সাধারণ, সম্পূর্ণ সঠিক সমাধান করেন। এই বিষয়ে আলোচনা তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়। পরে আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি একীকৃত ক্ষেত্র-বাদের তাঁর নিজ ধারণার মত রূপ দেন। এই বিষয়ে আইনষ্টাইনের মনোযোগ আকর্ষণ করলে ব্যক্তিগত চিঠিতে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে জানান যে, পদার্থ-বিদ্যায় সত্যেন্দ্রনাথের সঠিক সমাধান কি ভাবে ব্যবহৃত হবে, তিনি এখনও তা সঠিক বুঝতে পারছেন না আইনষ্টাইন নিজের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের মতবাদের আলোচনা করেন। এই প্রবন্ধের উত্তরে লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ কি ভাবে লোকচক্ষুর অগোচরে থেকে গেল, তা আগেই জানানো হয়েছে।

১৯৫২-৫৩ সালে যখন সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে যান, তখন ফ্রান্সের জাতীয় বিজ্ঞান সভার তাঁর সম্মানে আহূত এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁকে ফরাসী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। বিদেশী বিজ্ঞানীদের জন্যে এরূপ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান সেই বিজ্ঞানীর বিশেষ সম্মান ও পরিচিতির নিদর্শন মনে করা হয়। ১৯৫৮ সালে তিনি বৃটেনের রয়েল সোসাইটির (Royal Society) ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে জাতীয় সরকার তাঁকে জাতীয় অধ্যাপকত্বে বরণ করেন।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ কি ভাবে বিজ্ঞানকে তাঁর সাধনার বিষয় হিসাবে নেন, তাঁর কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমরা যখন ছাত্র তখন দেশে স্বাদেশিকতার বান চলছে। আমরা ভাবলাম, দেখি না বিজ্ঞান পড়ে দেশের কতদূর কি করা যায়! বিজ্ঞান নিয়ে লেগে পড়লাম"। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এই কথাটি ভুললে চলবে না। যদিও সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী হিসাবে আজ আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও সম্মানের অধিকারী, তবু তাঁর সমগ্র বিজ্ঞান সাধনা দেশের ঐশ্বর্য-বৃদ্ধিতে, দেশের জনসাধারণেব দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করাতে নিয়োগ করা যায় নি বলে, তিনি সম্পূর্ণ সুখী নন। তাঁর

কোন ছাত্র, কোন ঘনিষ্ঠ বিজ্ঞানী কর্মী দেশের গৌরব, দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্যে কিছু করতে পারলে তিনি খুব সুখী। দেশের শিক্ষার সঙ্গেও যোগ রাখবার তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের স্বপ্ন, কামনা, প্রধান চিন্তা—কি ভাবে দেশের গণমানসে বিজ্ঞান-চেতনার প্রকৃত উন্মেষ হয়। এই জন্যে তিনি চান নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে বিজ্ঞান আলোচনা হোক। তাঁর ধারণা, এ না হলে এই উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হবে না, দেশে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার হবে না ও জনসাধারণ বিজ্ঞান-চিন্তায় অভ্যস্ত না হলে, বিজ্ঞানোন্মুখী না হলে দেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি হবে না, দেশ দারিদ্র্য মুক্ত হবে না। এই উদ্দেশ্যে ঢাকায় থাকা কালে সহকর্মী বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় তিনি বাংলায় একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। দেশের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বহুদিনের কামনার স্বপ্নের রূপ দেবার জন্যে ১৯৪৮ সালে 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই যখন যেখানেই সুযোগ পান, তিনি সর্ব্বস্তরের বিজ্ঞান আলোচনা মাতৃভাষায় করবার জন্যে সাগ্রহ আন্তরিক আবেদন জানান। এদিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুগামী ও উত্তরসাধক। আমাদের সরকার, আমাদের সমাজ সাড়ম্বরে শতবার্ষিকী পালন করে বিশ্বকবিকে সম্মান দেখিয়ে, জাতীয় অধ্যাপকরূপে বরণ করে বিশ্ববিজ্ঞানীকে সম্মানিত করেই কি বিরত থাকবে? তাঁদের স্বপ্ন, তাঁদের অন্তরের কামনা রূপায়ণের দায়িত্ব কি নেবে না? সর্বস্তরের সর্ববিষয়ের শিক্ষা ও গবেষণা মাতৃভাষায় করবার কার্যকরী ব্যবস্থা কবে করা হবে?

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

যে যুগে অল্পখ্যাত ব্যক্তিরাও নিজের গৌরবগাথা প্রচারে তৎপর হন এবং তার জন্যে অপরিসীম আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন, সে যুগে বিশ্বের বিজ্ঞানীসমাজে প্রভূত যশের অধিকারী হয়েও আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ নিজের বিশ্বখ্যাতি সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন এবং কর্মজীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের বিন্দুমাত্র আলোচনায় নীরব।

জন্ম তাঁর উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে—১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী। পৈত্রিক বাসস্থান কাঁচড়াপাড়ার কাছাকাছি গ্রামে হলেও বরাবর কলকাতাবাসী। ১৯০৯ সালে হিন্দুস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে প্রবেশ করেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রতিভা-বিকাশের পথ উন্মুক্ত হলো। ১৯১১ সালে এফ. এ পরীক্ষা থেকে সুরু করে ১৯১৫ সালে মিশ্র-গণিতে এম. এস-সি. পরীক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। কলেজ জীবনের অধ্যায় পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে লেক্‌চারার রূপে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যায় রীডারের পদ গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ১৯৪৫ সালে তিনি কলকাতায় আসেন বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগের খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এই বিভাগে দীর্ঘকাল তিনি

অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীনরূপেও তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে। ১৯৫৬ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। ১৯৫৬-'৫৮ পর্যন্ত তিনি সেখানকার নানা বিভাগের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন। সেই থেকে বিজ্ঞান কলেজে তাঁর গবেষণাগারে তিনি গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

সমষ্টিগণিতে সত্যেন্দ্রনাথের অবদান এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯২৪ সালে জার্মেনীর এক গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম মৌলিক প্রবন্ধ—প্ল্যাঙ্কস্ ল অ্যাণ্ড দি লাইট কোয়ান্টাম হাইপথেসিস। এর পরেই আইনষ্টাইনের আমন্ত্রণ পেয়ে জার্মেনীতে সমষ্টিগণিত নিয়ে তিনি গবেষণা করেন। তাছাড়া অধ্যাপক মার্ক এবং মাদাম কুরীর গবেষণাগারেও তিনি পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকেরা গ্যাসের নানা আচরণ ও বিকিরণক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিম্‌সিম খেয়ে যান। নিউটন, গ্যালিলিও প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত ব্যষ্টিগণিতের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করা গেল না। কাজেই বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন যে, পদার্থ-বিজ্ঞানে চাই সমষ্টিগণিত। অবশেষে অধ্যাপক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক ১৯০০ সালে কোয়ান্টাম থিয়োরী বা শক্তির কণাবাদ উদ্ভাবন করে বললেন যে, বিকিরিত শক্তিপ্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন শক্তি নয়। শক্তিপ্রবাহে আছে অসংখ্য কণিকা এলোমেলোভাবে, অবিন্যস্তভাবে। তিনি এদের নাম দিলেন কোয়ান্টা। ম্যাক্সওয়েল প্রথমে গ্যাসের অণু নিয়ে সমষ্টিগণিত রচনা সুরু করেন। প্ল্যাঙ্ক সমষ্টির অঙ্ক প্রয়োগ করে গ্যাসের আচরণ সম্বন্ধে এক বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। ১৯২৪ সালে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গবেষণা-পত্রে ফোটন বা আলোক-কণার সমষ্টিগত আচরণের তথ্য প্রকাশ করেন। বিজ্ঞানে এই সমষ্টিগণিতকে বলা হয় বোস-সংখ্যায়ন বা Bose-Statistics। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বোস-সংখ্যায়ন পরিকল্পনার কালে আধুনিক মাত্রাগণিত বা কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার অস্তিত্ব ছিল না। আইনষ্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণালব্ধ তথ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, শুধু ফোটনই নয়, বস্তুকণার সমষ্টিতেও বোস-পরিসংখ্যান বিধি কার্যকরী। এই গবেষণাকে তিনি আখ্যা দিলেন **Wichtigen Fortschritt,** অর্থাৎ মূল্যবান যোজনা। বোস-পরিসংখ্যানের সাহায্যে তিনি একক পরমাণু-সম্পন্ন গ্যাসের কোয়ান্টামবাদ উদ্ভাবন করেন।

বোসের আগে গণিতের যে হিসাব চলে আসছিল, বোস-পরিসংখ্যানের বিধি তাথেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগেকার গণিতে প্রতিটি কণিকার একটি নিজস্ব পরিচিতি বা স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা হয়েছিল; কিন্তু বোস-বিধি অনুসারে অবলুপ্ত হলো ব্যষ্টি সত্তা। বোস-সংখ্যায়ন কি, তা জানবার জন্যে সাধারণের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আগেই বলা হয়েছে, এই সংখ্যায়ন একটি সমষ্টিগত বিধান মাত্র। তাহলেও ব্যাপারটি পরিষ্কার হলো না। সমষ্টিগত বিধান মানে হচ্ছে, কোন বিশেষ কাউকে চিহ্নিত না করে সমস্ত শ্রেণীকে চিহ্নিত করা। ব্যষ্টির আচরণ ও সমষ্টির আচরণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যদিও ব্যষ্টি নিয়েই হয় সমষ্টি। একথা সত্য যে, সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির নিজস্ব সত্তা খুঁজে পাওয়া যায় না। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

কোন একজিবিশনে গেলে 'ভীড়' কথাটাকে আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারি। প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে আমরা আমাদের বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই—ছোট ছেলেমেয়েরা হারিয়ে যায়। সে জন্যে আজকাল ঐ সব অনুষ্ঠানে অনুসন্ধান অফিস খোলা হয়ে থাকে, যাতে হারানো লোক

খুঁজে পাওয়া যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভীড়ে আমরা বিচ্ছিন্ন হই—ভীড়ের ধর্ম হচ্ছে বিক্ষেপ। কিন্তু ভীড় না থাকলে বন্ধুরা পরস্পর একত্র হয়ে ঘুরেফিরে দেখি। কাজেই আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, সমগ্রের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্ব থাকে না। যেখানে বহুর সমাবেশ, সেখানেই সমষ্টিগত বিধি। সেখানে ব্যষ্টির আচরণের কোন মূল্য নেই এবং প্রাধান্যও নেই। আমরা সংবাদপত্রে প্রায়ই দেখে থাকি এক ধরণের কথা—'ক্ষুব্ধ জনতা', 'জনতার দাবী', 'জনতার অশোভন আচরণ' ইত্যাদি। জনতা হয়তো একলক্ষ বা দুই লক্ষ লোকের সমাবেশে সৃষ্ট হয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেকটি লোকের বিশেষ সত্তা বর্তমান। কিন্তু শ্যামবাজারের রাখালবাবু যখন জনতার মধ্যে থাকেন, তখন তাঁর কোন নিজস্ব সত্তা পরিস্ফুট হয় না। তিনি ঐ ভীড়ের মধ্যে একজন মাত্র। মনে করা যাক, জনতার মধ্যে ত্রিশ হাজার লোকের আচরণ অশোভন হয়েছিল। দুই লক্ষের মধ্যে ঐ ত্রিশ হাজার লোককে বেছে নেওয়া যায় এবং বলা যেতে পারে যে, এরা অশোভনতার জন্যে দায়ী, কিন্তু তা তো বলা হয় না। ব্যক্তিবিশেষকে না বলে বলা হয় সমষ্টিকে। জনতার অশোভন আচরণ মানে সামগ্রিক হিসাব।

পদার্থ-বিজ্ঞানে সমষ্টিগত বিধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়েছিল। একখণ্ড কাঠ দিয়ে আর একখণ্ড কাচকে স্পর্শ করা হলো। কাঠ এবং কাচ উভয়েই কোটি কোটি অণুর সমষ্টি। আবার অণু এবং তার অন্তর্গত পরমাণুতে আছে সহস্র সহস্র ইলেকট্রন, প্রোটনের গুচ্ছ। দুটি খণ্ড যখন ঠেকানো গেল তখন কাঠের সমস্ত বা কতটা ইলেকট্রন-প্রোটন, কাচের কয়টি ইলেকট্রন বা প্রোটনকে স্পর্শ করেছে, তা বলা যায় না। যদি তা বলা যায়, তবে তা হয় অর্থহীন ব্যাখ্যা। কাজেই এক্ষেত্রে প্রয়োজন সমষ্টিগত বিধির। ঘরে বসে যখন আমরা বলি, ঘরটা বেশ গরম—তার মানে এই নয় যে, ঘরের বাতাসের কিছু সংখ্যক অণুর তাপমাত্রা উচ্চমানের। এক্ষেত্রেও সমষ্টিগত আচরণের প্রাধান্য। এই হচ্ছে সমষ্টিগত বিধির মূল কথা। ম্যাক্সওয়েল এবং ক্লসিয়াস গ্যাসের অণুর সমষ্টিগত বিধি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই অণুর চেয়ে আরো অনেক ক্ষুদ্র কণিকা হচ্ছে আলোক-কণা, বিকিরণ শক্তি-কণা, ইলেকট্রন-কণা, আল্ফা-কণা, মেসন-কণিকা ইত্যাদি। প্রাচীন পদ্ধতিতে এদের আচরণ সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় না। প্রতিটির কিছু না কিছু ভিন্নতর ধর্ম বিদ্যমান। কাজেই ব্যষ্টি-ধর্ম অবলুপ্ত করে গঠিত হলো সমষ্টিগত ধর্ম। সৃষ্টি হলো সমষ্টিগত-গণিত।

ফোটন সম্পর্কে অধ্যাপক বসুর সংখ্যায়ন-বিধি ব্যাপকভাবে বস্তু-সমাবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার জন্যে আইনষ্টাইন এই বিধির সম্প্রসারণ করেন। বোস-গণনাবিধির পরিবর্ধন করা হয়। বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই সম্প্রসারিত বা পরিবর্ধিত সমষ্টি-গণিত প্রয়োগ করা সম্ভব হওয়াতে এর নামকরণ হলো 'বোস-আইনষ্টাইন সংখ্যায়ন' (Bose-Einstein Statistics)।

১৯২৬ সালে অধ্যাপক ফের্মি এবং ডিরাক আর এক ধরণের সংখ্যায়ন উদ্ভাবন করেন। দেখা গেছে—ফোটন, আল্ফা কণা, পাই-অন, কে-মেসন কণিকা, ডয়টেরন, He^4 বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। এই কণাগুলি অধ্যাপক বসুর নামানুসারে 'বোসন' নামে পদার্থ-বিজ্ঞানে খ্যাত। ইলেকট্রন-প্রোটনের আচরণের হিসাব নিতে হলে বলা হয় ফের্মিয়ন। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রতিটি মৌলিক কণিকা—হয় ফের্মিয়ন গোষ্ঠী অথবা বোস গোষ্ঠীভুক্ত।

বিখ্যাত পদার্থবিদ্ পাউলি তাঁর 'স্পিন-সংখ্যায়ন উপপাদ্য' উদ্ভাবন করবার পর বোস-সংখ্যায়ন নতুন ও আরো বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখ্যাত হলো। আমরা জানি, প্রতিটি মৌলিক পদার্থ-কণা নিজস্ব স্পিনের অধিকারী। আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা বলেন যে, এই স্পিনের নিম্নতম

মান শূন্য এবং উর্ধ্বতম মান এক। এর অন্তর্বর্তী স্থানে আর একটি মানের স্পিন থাকা সম্ভব—তা হলো অর্ধ ($\frac{1}{2}$)। পাউলি বললেন, শূন্য বা এক (১) স্পিন-সম্পন্ন কণা বোস-বিধি মেনে চলে। এছাড়া অন্যত্র ফের্মি-সংখ্যায়ন প্রযোজ্য। বোসন কণিকার অখণ্ড বা পূর্ণ মানের স্পিন থাকে, তা বলা হয়েছে। কোন কেন্দ্রক (নিউ-ক্লিয়াস) যদি জোড়-সংখ্যক অর্ধ-স্পিনের কণা দ্বারা গঠিত হয়, তাহলে দুটির মিলিত স্পিনের মান হয় শূন্য অথবা অখণ্ড পূর্ণ-সংখ্যা। কণাসমূহের মধ্যে যেগুলি উপরিবর্ণিত কেন্দ্রক দিয়ে গঠিত হয় তাদের সমষ্টি বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। বিজোড় সংখ্যার ক্ষেত্রে ফের্মি-সংখ্যায়ন প্রযুক্ত। হিলিয়ামের আইসোটোপের মধ্যে He^{4}টি চারটি অর্ধ-স্পিনের কণা থাকায় সেটি মেনে চলে বোস-সংখ্যায়ন।

বোসন কণিকাসমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা এবং তাদের সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা একটি ছকের সাহায্যে দেওয়া হচ্ছে।

কণিকার নাম	সঙ্কেত চিহ্ন	আধান	রেষ্ট মাস্	স্পিন্	ষ্ট্রেঞ্জনেস্
ফোটন	γ	0	0	1	0
পাই-অন	π°	0	264	0	0
(Pion)	$\pi^{-}(\pi^{+})$	$-1(+1)$	273	0	0
কে-মেসন	$(K^{\circ}K^{-\circ})$	$0(-1)$	965	0	$+1(-1)$
কণিকাসমূহ	$K^{+}(K^{-})$	$1(-1)$	967	0	$+1(-1)$

এই প্রসঙ্গে পাই-অন এবং কে-মেসন সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। পাই-অন কণিকাগুলি মহাজাগতিক রশ্মি বা কস্‌মিক-রে'র মধ্যে পাওয়া গেছে। উচ্চ বায়ুমণ্ডলে যখন প্রাথমিক কস্‌মিক রশ্মি পরমাণুর কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে, তখনই এই কণিকাসমূহের উৎপত্তি হয়। বর্তমানে পাই-অন কণিকা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। অ্যাক্‌সিলারেটর থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন প্রোটনকে কোন উপযুক্ত টারগেটের পরে আঘাত হানলে পাই-অন পাওয়া যায়। তিন ধরণের বিক্রিয়া হয়ে থাকে—

(১) $p+p \rightarrow p+p+\pi^{\circ}$

(২) $p+p \rightarrow p+n+\pi^{+}$

(৩) $p+n \rightarrow p+p+\pi^{-}$

কে-মেসন কণিকাটি নতুন এবং অস্বাভাবিক ধরণের বলে' একে বলা হয় strange particle। এর সম্বন্ধে এখনো সুস্পষ্ট ধারণা হয় নি।

গত ১৯৩৫ সালে বিখ্যাত জাপানী পদার্থবিদ্ ডাঃ হিদেকী ইয়োকাওয়া বলেছিলেন যে, বিটা-ধরণের মিথস্ক্রিয়া (Beta-type interaction) অন্তর্বর্তী এক স্পিনশূন্য (spinless) ক্ষেত্র দিয়ে নিষ্পন্ন হয়। এই ক্ষেত্রের নাম দেওয়া হয়েছে অন্তর্বর্তী বোসন ক্ষেত্র। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, অল্পমাত্রার শক্তি থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি প্রস্তুত করতে গেলে অন্তর্বর্তী বোসন সৃষ্ট হয়। একে বলা হয় ইন্‌টারমিডিয়েট বোসন।

বিজ্ঞানী লী এবং ইয়াং সম্প্রতি ভারী মেসন কণিকা এবং হাইপারন প্রভৃতি যে সব কণিকা থেকে নিউট্রিনো উৎপত্তি হয় না, সেই সব কণিকার সঙ্গে নবকল্পিত ইনটারমিডিয়েট বোসন কণিকার আচার-ব্যবহার ও ধর্ম মিলিয়ে দেখে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মোটামুটি কয়েক জাতের বিভিন্ন ধরণের বোসন কণিকার সৃষ্টি হতে পারে। একটি তড়িতাবিষ্ট বা তড়িৎ শক্তিসম্পন্ন কণিকা, একজোড়া বিপরীত ধর্মীয় বোসন কণিকা (Antiparticle) ও একজোড়া তড়িৎ-বিহীন কণিকা।

বোস-সংখ্যায়ন প্রয়োগের ক্ষেত্র এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। পঁচিশ বছরের মধ্যে পদার্থবিদ্যার

এক নতুন অধ্যায়ে বিস্ময়করভাবে প্রযুক্ত হয়েছে এই সংখ্যায়ন। তার ফলে সৃষ্ট হয়েছে এক অভিনব অধ্যায়। অধ্যাপক পাউলির উপপাদ্য এবং আদর্শ বোস-গ্যাস সম্পর্কে আইনষ্টাইনের বিস্তৃত ব্যাখ্যার সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে নিম্ন তাপমানসম্পন্ন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে। এর তরল পদার্থ সম্পর্কিত অধ্যায়ের বিশেষ স্তরে বোস-সংখ্যায়ন সুপ্রযুক্ত হচ্ছে—এটা এক অভিনব সংবাদ; যেহেতু আইনষ্টাইনের গণনা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলেই সকলে জানতেন।

ক্ল্যাসিকাল গতিবিদ্যায় জানা যায় যে, চরমশূন্য তাপমাত্রায় সকল বস্তুনিচয় কঠিনত্ব প্রাপ্ত হবে। কারণ, তাপমাত্রা যত কমবে, পরমাণুর কম্পনও সেই অনুসারে হ্রাস পেতে থাকবে এবং চরম শূন্য তাপমাত্রায় পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে সকল পরমাণু গতিশূন্য অবস্থায় আসবে। এরই ফলে হবে কঠিন বস্তুতে রূপান্তরণ। অথচ আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা গেছে, He^3 এবং He^4—এই দুটি আইসোটোপ চরম শূন্য তাপমাত্রাতেও তাদের তারল্য বজায় রাখতে সক্ষম। বিজ্ঞানীরা এই দুই তরল পদার্থের নাম দিয়েছেন কোয়ান্টাম তরল। রুশ পদার্থবিদ্ কাপিৎজা গবেষণার ফলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, দুটি কোয়ান্টাম তরলের মধ্যে He^4টি এক নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নীচে এক বিশেষ তারল্য লাভ করে। তিনি তাকে বলেছেন অতি-তারল্য। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে He^4কে অতি-তরল পদার্থ বলা হয়েছে। অতি-তরল পদার্থ স্বাভাবিক তরলের বিপরীত গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ এতে সান্দ্রতা (viscosity) এবং এনট্রপির মান শূন্য। এদের আচার-ব্যবহার নির্ধারণের এবং আলোচনার জন্যে বৃটিশ পদার্থবিদ্ লণ্ডন ও টিজা এবং রুশ পদার্থবিদ্ লিও লান্দাউ (১৯৬২ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত) প্রায় সমসাময়িককালে দুটি মত প্রচার করেন।

লান্দাউ পরমাণুদের উত্তেজিত স্তরগুলিকে প্রায় কণা বলে গণ্য করেছেন এবং তারা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। লান্দাউ-এর মতে, He^3 আইসোটোপেরও অতি-তারল্য থাকা সম্ভব; অথচ পরীক্ষা করে একটি মাত্র অতি-তরল পদার্থের হদিস্ পাওয়া গেছে এবং সেটি হলো He^4।

মার্কিন পদার্থবিদ্ ফাইনম্যান বোস-সংখ্যায়ন এবং শ্রডিংগারের সমীকরণের সাহায্যে লান্দাউ-এর প্রস্তাবিত তত্ত্বের সংশোধন করেছেন। লান্দাউ-এর আলোচনায় বোস-সংখ্যায়নের স্থান তেমন নির্দিষ্ট না হলেও ফাইনম্যানের প্রস্তাবিত তথ্যে তার স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

He^4-পরমাণুর কেন্দ্রকের কোন স্পিন নেই এবং এই কারণেই তা বোস-সংখ্যায়ন মেনে চলে। অনুরূপভাবে He^3 ফের্মি-বিধির অনুগামী।

লান্দাউ-এর আগে বিজ্ঞানী লণ্ডন এই বিষয় নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে গবেষণা করেন। তিনি আইনষ্টাইনের এক গণনার সাহায্য গ্রহণ করেন। আইনষ্টাইন সেই প্রবন্ধে এক আদর্শ বোস-গ্যাসের ব্যবহারবিধি আলোচনা করেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, এই ধরণের গ্যাস-সমষ্টির তাপমাত্রা যদি ক্রমশঃ কমানো যায়, তবে ঐ সব গ্যাসের পরমাণুগুলি এক degenerate ground state বা অপজাত সর্বনিম্ন স্তরের দিকে যেতে আরম্ভ করবে এবং চরম শূন্য অবস্থায় সমগ্র পরমাণু সেই স্তরে পৌঁছে যাবে। লণ্ডন এবং টিজা যে He^4-এর যুগ্ম তরল মডেল সৃষ্টি করেছেন, তার কিছু অংশের সঙ্গে আদর্শ বোস-গ্যাসের আচরণের মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

বোস-সংখ্যায়নের এই ব্যাপক প্রয়োগের ফলে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যে এক নতুন প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

অধ্যাপক বসু 'ইউনিফায়েড ফিল্ড-থিয়োরী' নিয়েও অনেক মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশ করে তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজনার সৃষ্টি করেছেন।

আচার্যের অন্যতম সার্থক কীর্তি ১৯৪৮ সালে কলকাতায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠা। ঢাকায় অবস্থানকালেও তিনি 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে

দ্বৈমাসিক পত্রিকা চালিয়েছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে তাঁর বহুমূল্য উপদেশ এবং নির্ধারিত পন্থা যে তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ কেবলমাত্র বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী নন, বিখ্যাত লাতিন মনীষী টেরেন্স-এর বিখ্যাত উক্তির (আমি মানুষ, সে জন্যে মানুষ সম্বন্ধীয় কোন কিছুর প্রতি আমি অনাসক্ত হতে পারি না) পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর জীবনে। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর অসাধারণ মনীষার ছাপ মুদ্রিত হয়েছে। কেবল তাই নয়—"সংস্কৃতজ্ঞদের সঙ্গে সংস্কৃত, ঐতিহাসিকদের সঙ্গে ইতিহাস, প্রত্ন-তাত্ত্বিকদের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে সঙ্গীত, কবিদের সঙ্গে কাব্য কোন আলোচনাতেই পেছপা হত না। আরো আশ্চর্য এই যে, এসব আলোচনাতে শুধু ঔৎসুক্য প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হতো না, এমন সব মন্তব্য করতো যে, বিশেষজ্ঞেরাও খুসী না হয়ে পারতেন না। অন্ততঃ সঙ্গীত ও সাহিত্য নিয়ে আমি এবং ওর আরো নানা বন্ধু ওর সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ লাভবান হয়েছি, একথা হলপ করে বলতে পারি"—বলেছেন শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় (স্মৃতিচারণ)।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সতীশরঞ্জন খাস্তগীর যথার্থই বলেছেন, "আজ আমরা তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, শুধু বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী বলে নয়—সহজ সারল্যে মণ্ডিত ও উদার মানবতায় উদ্দীপ্ত আদর্শ পুরুষ হিসাবে আমরা তাঁকে আজ আমাদের ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করি।"

জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হবার পরে অধ্যাপক বসু বলেছিলেন, "পাঁচ বছরের জন্যে জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে মনে একটা আত্মপ্রসাদ জেগেছে—যাক্, এতদিনে দেশমাতা রেহাই দিয়েছেন। নিজের কাজ নিয়েই এবার মেতে থাকতে পারবো। তবে মুক্তি এল যখন তখন মনীষা অনেকটা ম্লান হয়ে এসেছে। আর চোখের জ্যোতিও ক্ষীণ এখন। তবু তো ডাক শুনতেই হবে!"

থেমে তিনি থাকতে পারেন না, অনলস এবং একাগ্র সাধনায় মগ্ন হয়ে আছেন তিনি। ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের ঊনসত্তর বছর অতিক্রম করে সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্যে আমরা সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই। আমরা প্রার্থনা করি—"শতং জীবতু"।

জারমেনিয়াম ও ট্র্যানজিষ্টর

শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ

বালি হচ্ছে সিলিকনের অক্সাইড রূপ। আর এই সিলিকনের নিকটতম আত্মীয় জারমেনিয়াম। উভয়েই সেলেনিয়াম, টেলুরিয়াম ও বোরন পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। জারমেনিয়াম রূপার মত সাদা ধাতু, পারমাণবিক সংখ্যা ৩২, আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৪ এবং পারমাণবিক ওজন ৭২.৫। বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের রোধশক্তি ৬০ ওমস্; অর্থাৎ এটি একটি স্বল্পপরিবাহী ধাতু। পরিবাহী ধাতুর রোধশক্তি খুবই কম; তামার রোধশক্তি $৬০^{-৫}$ ওমস, আর অপরিবাহী বস্তুর রোধশক্তি খুবই বেশী; যেমন—কাঠের রোধশক্তি $৬০^{১৬}$ ওমস্। জারমেনিয়ামের রোধশক্তি, খাদের পরিমাণ কমবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। সুতরাং রোধশক্তি মেপেই বিশুদ্ধতার পরিমাণ বুঝা যায়। বেশ উঁচু চাপ দিয়ে বিশুদ্ধ

জারমেনিয়ামকে রেক্টিফায়ার বা সংশোধক হিসাবে কাজ করানো যায়। তবে সিলিকন এই বিষয়ে আরো প্রসংশনীয়। যাহোক, রেক্টিফিকেশন বা দিক-পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ-প্রবাহকে একমুখী বিদ্যুৎ-প্রবাহে পরিণত করবার কাজে জারমেনিয়ামের ক্ষমতা বেশ কিছু উচ্চ কম্পনাঙ্কের ভিতর এবং ৮০ ভোল্ট বা অধিক বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা-সম্পন্ন। এটি কেবল রেক্টিফায়ার হিসাবেই কাজ করে না। ত্রিপদী ভাল্‌বের মত এর ভিতর আর একটি বাড়্‌তি দণ্ড প্রোবের আকারে প্রবেশ করালে এটি অ্যাম্‌প্লিফায়ার ও অসিলেটর হিসাবেও কাজ করতে পারে।

জারমেনিয়াম সাধারণতঃ দুঃপ্রাপ্য আকরিক ধাতু আরগীরডাইট অথবা জারমেনাইট থেকে পাওয়া যায়। প্রথমটি সিলভার সালফাইড ও জারমেনিয়াম সালফাইডের সমন্বয়, আর দ্বিতীয়টি লৌহ সালফাইড, তাম্র সালফাইড ও জারমেনিয়াম সালফাইডের সমন্বয়। উভয় ক্ষেত্রেই শতকরা ছয় ভাগ জারমেনিয়াম বর্তমান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এটি জিঙ্ক ধাতুর পরিশোধনের সময় উপজাত দ্রব্য হিসাবে পাওয়া যায়। খনিজ কয়লা থেকেও বেশ পরিমাণে (২০/১০^{৬}) জারমেনিয়াম পাওয়া যায়। আর কয়লায় প্রাপ্ত জারমেনিয়ামের বহুলাংশ জ্বালানীর সময় বাষ্পাকারে উড়ে যায়। সুতরাং জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণায় প্রচুর পরিমাণে লৌহ, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম ও সালফার মিশ্রণ থাকা স্বাভাবিক। আবার জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণায় জারমেনিয়ামের সঙ্গে খুব অল্প পরিমাণে গ্যালিয়াম অক্সাইড থাকে। এখন এই আকরিক অর্থাৎ জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণা থেকে কি করে বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম পাওয়া যায়, তা বলা যাক।

উৎপাদনের বিভিন্ন অবস্থা—জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণা+হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (গাঢ়)—জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড

বিজারকের দ্বারা জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণাকে বিজারিত করলে, আয়রন অক্সাইড ভেঙ্গে আয়রন অর্থাৎ লৌহে পরিণত হয় এবং জারমেনিয়াম সমেত অন্যান্য ধাতুগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে একটি সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত করে। আর গ্যালিয়ামকে পৃথক করতে হলে তাম্র-গ্রাহকের প্রয়োজন, যা আবার লৌহের সঙ্গে মিশে একটি সঙ্কর ধাতু গঠন করে। এরূপে জারমেনিয়াম বাহক ধূলিকণা থেকে জারমেনিয়াম-গ্যালিয়াম বা খাদযুক্ত জারমেনিয়াম পৃথক করা হয়। আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দ্বারা জারমেনিয়াম-গ্যালিয়াম থেকে অবিশুদ্ধ জারমেনিয়াম-টেট্রাক্লোরাইড আংশিক পাতন-ক্রিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়।

এই জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডে শতকরা ২৫ ভাগ আরসেনিক ট্রিক্লোরাইড খাদ হিসাবে বর্তমান। যেহেতু এই দুটি যৌগিক পদার্থের স্ফুটনাঙ্কের পার্থক্য ৫০° সেঃ, সেহেতু আংশিক পাতনের দ্বারা আবার বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড পাওয়া যায়। কিন্তু এটি অপেক্ষাও বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের প্রয়োজন। তাই এই রকম বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডকে ধাতব তাম্রের মধ্যে প্রবেশ করালে আর্কজেনিক ধূসর ফিল্মের আকারে সঞ্চিত হতে থাকে। সবশেষে ট্রেসার উপাদান হিসাবে তেজস্ক্রিয় আর্সেনিক (As_{76}) দ্বারা পুনরাবৃত্তি (recourse) করা হয়ে থাকে। এরূপে যে জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড পাওয়া যায়, তার ভিতর খাদের পরিমাণ ১/১০^{৬} ভাগেরও কম। আর এই প্রকার বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইডকে জলের দ্বারা রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যে জারমেনিয়াম অক্সাইড করা হয়।

$$GeCl_4 + 2H_2O = GeO_2 + 4HCl$$

এখন এই জারমেনিয়াম অক্সাইডকে একটি চুল্লীতে ৬৫০° সেণ্টিগ্রেডে হাইড্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে বিজারিত করলে এবং পরে এই চুল্লীর উষ্ণতা বাড়িয়ে ৯৫০° সেঃ, করলে জারমেনিয়াম তরল অবস্থায় উপনীত হয়। এই তরল জারমেনিয়ামকে

ঠাণ্ডা করলেই ধাতব জারমেনিয়াম ইনগট আকারে পাওয়া যায়।

$$GeO_2+2H_2=Ge+2H_2O$$

এই ধাতব ইনগট্গুলিকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে গলিয়ে আরও বিশুদ্ধ করা যায়। কারণ, খাদ সাধারণতঃ গলিত ধাতুর দিকে থাকে। তাই পেন্সিলাকৃতির ইনগট্কে গলিয়ে, জমিয়ে এবং এক প্রান্ত থেকে কেটে বাদ দিলে প্রয়োজন-মত বিশুদ্ধ জারমেনিয়াম পাওয়া যেতে পারে।

গলিত জারমেনিয়ামের ভিতর একটি ছোট সমজাতীয় জারমেনিয়াম কেলাস ডুবিয়ে দিলে ও আস্তে আস্তে তুলে নিলে জারমেনিয়াম ধাতু ঐ কেলাসের উপরে কেলাসের আকারে জমে যায়। এরূপে একটি বড় জারমেনিয়ামের কেলাস প্রস্তুত করা যায় এবং এই কেলাস থেকে ছোট গোলাকার দণ্ডরূপে ট্র্যানজিষ্টর প্রস্তুতের জন্যে কেটে নেওয়া হয়।

ট্র্যানজিষ্টরের অর্থ হলো রোধ-বদল (**Trangistor=transfer-resistor**), অর্থাৎ জারমেনিয়ামের কেলাসের রোধ-বদল। কেলাসের কতকগুলি বিশেস ভৌত ধর্ম রয়েছে, যা আলোকিত পদার্থে দেখা যায় না। কয়েক প্রকার কেলাস ক্ষীণ সঙ্কেত-ধ্বনি গ্রহণ করতে পারে বলে শব্দ-গ্রাহক যন্ত্রে তাদের ব্যবহার করা হয়; যেমন—গ্যালিনা কেলাসের উপর ঠিক জায়গায় দুটি ধাতব তার ঢুকিয়ে তাদের দু-প্রান্ত হেড-ফোনের সঙ্গে সংযোগ করলে একটি সরল গ্রাহক-যন্ত্র তৈরী হয়। এই প্রকার গ্রাহক-যন্ত্র কিন্তু অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এতে অনেক ত্রুটি আছে। সঙ্কেত-ধ্বনি গ্রহণ ছাড়া এক শ্রেণীর কেলাস আছে, যা থেকে খুব সহজ উপায়ে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। জারমেনিয়াম হলো এই শ্রেণীর কেলাস। আর ট্র্যানজিষ্টর উদ্ভাবনের মূলে রয়েছে এই স্বল্প পরিবাহী কেলাস। স্বল্প পরিবাহক পরিবাহকের মত সহজে তাপ ও বিদ্যুৎ-শক্তিকে সঞ্চালিত করতে পারে না। আবার অন্তরকের মত তাপ ও বিদ্যুৎ-শক্তিকে প্রবল-ভাবে বাধাও দিতে পারে না। তামা, দস্তা, লোহা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ খুব সহজে চলতে পারে বলে এরা পরিবাহক। আর কাচ, কাগজ, রবার, গন্ধক, এবোনাইট, অভ্র প্রভৃতির ভিতর দিয়ে তাপ বা বিদ্যুৎ-স্রোত প্রবাহিত হতে পারে না—তাই এরা অন্তরক বা অপরিবাহী বস্তু। আধুনিক মতে—বৈদ্যুতিক স্রোত হলো পরিবাহী বস্তুর একটি অণুর পারমাণবিক গঠন থেকে ইলেকট্রনের প্রবাহ। আর পরিবাহকের ভিতর যথেষ্ট মুক্ত ইলেকট্রন বর্তমান। দেখা গেছে, প্রায় সমস্ত কেলাসিত বস্তু বা কেলাসের ভিতর খুব অল্প পরিমাণে কোন নির্দিষ্ট খাদ মিশিয়ে মুক্ত ইলেকট্রনের প্রবাহ ঘটিয়ে তাকে পরিবাহকে রূপান্তরিত করা যায়।

বৈদ্যুতিক কাজে পরিবাহক ও অন্তরক—এই দুটি হলো প্রধান উপাদান। আর এই পরিবাহক ও অন্তরকের মাঝামাঝি রয়েছে স্বল্প পরিবাহক বা সেমিকণ্ডাক্টর। যেমন—ধরা যাক, পেন্সিলের শিষ, এটা বিদ্যুৎ-স্রোতকে চালিত করে অথচ এটি একটি অপরিবাহী বস্তু। অধিকাংশ কেলাস, সঙ্কর ধাতু, লবণ ও অক্সাইড এই পেন্সিলের শিষের মত, অর্থাৎ এরা স্বল্প পরিবাহী বস্তু। আর সাধারণ বালি, ভুষা কালি, পাথর, সিরামিক ও বিভিন্ন প্রকার কার্বন প্রভৃতি থেকেই এই স্বল্প পরিবাহীর জন্ম।

এখন স্বল্প পরিবাহীর বৈদ্যুতিক ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে আগেই জানতে হবে, পরি-বাহকের ধর্ম কি? পরিবাহকের তড়িৎ-পরি-বহনের মূলে রয়েছে তার ভিতরে মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতি। পরমাণুর সমাহার হলো অণু। আর পরমাণুর ভিতরে রয়েছে ঋণাত্মক তড়িৎ-কণা বা ইলেকট্রন যা কেন্দ্রকের চারদিকে নিজ কক্ষপথে ঘুরছে। কেন্দ্রক ধনাত্মক তড়িৎকণা বা প্রোটন ও

তড়িৎ-বিহীন নিউট্রন নিয়ে গঠিত। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন পরমাণুর প্রোটন-ইলেকট্রনের সংখ্যা পরস্পর সমান বলে বিপরীত তড়িৎ-কণা থাকতে পারে না, অর্থাৎ পরমাণু তড়িৎ-শূন্য অবস্থায় থাকে। আবার পরমাণুর সব ইলেকট্রনগুলি শুধু একটি কক্ষে থাকে না। কেন্দ্রক থেকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট দূরত্বে রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রনপূর্ণ কক্ষগুলি। এই কক্ষগুলির শক্তির মাত্রা নির্দিষ্ট, অর্থাৎ কোন একটা ইলেকট্রনকে কেন্দ্রকের নিকটতম কক্ষ থেকে পরবর্তী কক্ষে নিয়ে যেতে একটা নির্দিষ্ট শক্তির প্রয়োজন হবে।

পরিবাহকের বিশেষত্ব হলো—তাপ দিলে অনেক মুক্ত ইলেকট্রন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ায়। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগে এই সব ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ, করানো যায়। আর এই ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ অর্থাৎ বৈদ্যুতিক স্রোত উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপের দিকে প্রবাহিত হয়। অন্তরকে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না, তাই এর পরিবাহী শক্তি নেই বললেই চলে। সেমিকণ্ডাক্টর বা স্বল্প পরিবাহকে খুব অল্প সংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন থাকা সম্ভবপর। তাই এর অল্প পরিবহন-ক্ষমতা আছে। তাপের দ্বারা ইলেকট্রন নির্গমনকে থারমিয়নিক এমিশন বলে; যেমন—রেডিও, পরিবর্ধক প্রভৃতি বহু যন্ত্রে ব্যবহৃত ইলেকট্রন টিউব বা ভাল্‌বে হয়ে থাকে। আর তীব্র আলোকরশ্মির দ্বারা ধাতব পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রন নির্গমনকে ফটো-ইলেকট্রিক এমিশন বলা হয়; যেমন—চলচ্চিত্রের যন্ত্রে ব্যবহৃত ফটো-ইলেকট্রিক সেল।

পরিবাহকের মত তাপের বৃদ্ধিতে সেমিকণ্ডাক্টর বা স্বল্পপরিবাহী কেলাসের পরিবহন-ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু ইলেকট্রন নির্গমন যথেষ্ট হয় না। তবে তীব্র আলোকরশ্মির দ্বারা এই রকম কেলাস থেকে পরিবাহকের মত মুক্ত ইলেকট্রন নির্গমন করানো যায়। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র প্রয়োগ করে এই ইলেকট্রনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এভাবে ফটো-ট্র্যানজিস্টর নির্মাণ করা হয়। কিন্তু এছাড়া আর একটি প্রধান উপায়ে সেমিকণ্ডাক্টর কেলাস থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি পাওয়া যায়। অতি বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের ভিতর এক জাতীয় খাদ মিশিয়ে সেটা করা সম্ভব।

বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের ভিতর একটি আর্সেনিক পরমাণু ঢুকিয়ে দিলে সেটা একটা জারমেনিয়াম পরমাণুর স্থলাভিষিক্ত হয়ে রাসায়নিক বন্ধনের দ্বারা একটি মুক্ত ইলেকট্রন দান করে। আর্সেনিক এভাবে ইলেকট্রন দান করে বলে একে বলা হয় দাতা খাদ, আর অতিরিক্ত ইলেকট্রন পায় বলে জারমেনিয়ামকে বলে n-টাইপ। আবার বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামে প্রবিষ্ট একটি বোরন পরমাণু রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টি করবার জন্যে একটি অতিরিক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করে জারমেনিয়াম কেলাসে একটি ইলেকট্রনের ঘাট্‌তি ঘটায়। এক্ষেত্রে বোরন গ্রহীতা খাদ, আর জারমেনিয়ামে অতিরিক্ত ধনাত্মক আধান জন্মায় বলে একে বলে p-টাইপ। বিশুদ্ধ জারমেনিয়ামের ভিতর উপরিউক্ত খাদ খুব অল্প পরিমাণে থাকলেই যথেষ্ট মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়।

জারমেনিয়াম কেলাসের দ্বারা গঠিত ট্র্যানজিস্টর জাংশন এবং বিন্দু-স্পর্শ—এই দুই প্রকারের হতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে একটি p-টাইপ ও n-টাইপ জারমেনিয়াম কেলাসের ব্লক যুক্ত করে একটি দ্বিপদী ট্র্যানজিষ্টর তৈরী হয়। ত্রিপদী জাংশন ট্র্যানজিস্টর p-n-p বা n-p-n-এর ক্ষেত্রে একটি পাত্‌লা n-ব্লকের দুই দিকে থাকে p-ব্লক বা একটি -অঞ্চলের দুই দিকে থাকে n-অঞ্চল। বিন্দু-স্পর্শ ট্র্যানজিষ্টরে একটি p বা n-টাইপের কেলাসের উপর দুটি ধাতব দণ্ডের সূক্ষ্মাগ্র প্রবেশ করানো হয়। এই দুটি ধাতব দণ্ডের মধ্যে ব্যবধান খুবই কম থাকে। এই জাতীয় ট্র্যানজিষ্টরও দ্বিপদী বা ত্রিপদী হতে পারে।

n-টাইপ ও p-টাইপ জারমেনিয়াম কেলাসে

সঙ্গে খাদ কি ভাবে ইলেকট্রনের লেনদেন করে, তা একটু বলা যাক। n-টাইপ কেলাসের মধ্যে ইলেকট্রনের চাহিদা (–) থাকে, আর p-টাইপ কেলাসের মধ্যে ইলেকট্রন বাড়্তি (+) থাকে। আর্সেনিকের যোজ্যতা ৫, অর্থাৎ যার দূরবর্তী কক্ষপথে পাঁচটি ইলেকট্রন বর্তমান। এখন যদি এদের একটি পরমাণুকে জারমেনিয়াম গঠনের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়, তাহলে আর্সেনিকের চারটি ইলেকট্রন, চারটি জারমেনিয়াম ইলেকট্রনের সঙ্গে বণ্ড গঠন করতে চায়। কারণ, জারমেনিয়ামের দূরবর্তী কক্ষপথে চারটি ইলেকট্রন বর্তমান এবং এগুলিই রাসায়নিক ক্রিয়ায় যোগদান করতে ইচ্ছুক। কিন্তু আর্সেনিকের একটি ইলেকট্রন থেকে যায় এবং নিজস্ব কক্ষপথ রচনা করতে উন্মুখ হয়। এতে আর্সেনিক স্থায়িত্ব হারিয়ে ফেলে এবং বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় উপাদানটি অপরিবাহকের ধর্ম হারিয়ে ফেলে এবং স্বল্প পরিবাহক হয়ে দাঁড়ায় এবং বাড়্তি ইলেকট্রনের সাহায্যে বৈদ্যুতিক স্রোতের প্রবাহ চলে। এটা n-টাইপের স্বল্পপরিবাহী কেলাসের কাজ। অন্যথায় যদি প্রবিষ্ট খাদটি একটি কম যোজ্যতাসম্পন্ন উপাদান হয়ে থাকে, যেমন—বোরন, যার যোজ্যতা ৩ এবং দূরবর্তী কক্ষপথে মাত্র তিনটি ইলেকট্রন বর্তমান। সুতরাং জারমেনিয়ামের বাইরের কক্ষের চারটি ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন, বোরনের তিনটির সঙ্গে বণ্ড করতে চায়। কিন্তু জারমেনিয়ামের অবশিষ্ট একটি ইলেকট্রন অযথা পড়ে থাকে। সুতরাং এর সর্বদাই চেষ্টা থাকে অন্যের নিকট থেকে একটি ইলেকট্রন গ্রহণের, অর্থাৎ আধান পূরণের। এই অবস্থায় আংশিক বৈদ্যুতিক পরিবহনের সৃষ্টি হয়, যেহেতু বণ্ড থেকে ইলেকট্রনগুলি আধান পূরণ করবার জন্যে ছুটে চলে অথবা বাহ্যিক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের ক্রিয়ার ফলে আধানগুলি ইলেকট্রন যেদিকে ছুটে চলে, ঠিক তার বিপরীত দিকে চলতে থাকে। আর এরূপ স্বল্প পরিবাহককে p-টাইপের স্বল্প পরিবাহী কেলাস বলা হয়।

দ্বিপদী ট্র্যানজিষ্টর দ্বিপদী ভালবের মত রেক্টিফায়ার হিসাবে, অর্থাৎ এ সি বিদ্যুৎ-স্রোতকে ডি. সি. বিদ্যুৎ-স্রোতে রূপান্তরিত করবার উপায় হিসাবে কাজ করে। ত্রিপদী ট্র্যানজিষ্টরও ত্রিপদী ভাল্বের মত অ্যাম্প্লিফায়ার ও অসিলেটর প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আজকাল ট্র্যানজিস্টর রেডিও, শ্রুতিসহায়ক যন্ত্র, পরিবর্ধক, দূরবর্তী আদান-প্রদান, বক্তৃতা দেবার যন্ত্র, ক্ষেপণাস্ত্র, টেলিভিসন ও রাডার প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ট্র্যানজিষ্টর ইচ্ছামত ক্ষুদ্র আকারবিশিষ্ট করা যায়। কিন্তু ভাল্বের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। ট্র্যানজিষ্টরে ভাল্বের চেয়ে শক্তি খরচ খুবই কম এবং অল্পশক্তিতে বহুদিন ভালভাবে কাজ করে। তাছাড়া ভাল্বের মত বাইরে থেকে উত্তপ্ত করবার প্রয়োজন নেই।

হিমোফিলিয়া

শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত

হিমোফিলিয়া বা রক্ত-অতঞ্চন রোগ একটি বংশগত ব্যাধি। বংশানুক্রমে এই রোগ বিস্তার লাভ করে। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে—রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্ত সহজে জমাট বাঁধতে পারে না বা জমাট বাঁধতে বেশী সময়ের দরকার হয়। আঘাতের ফলে বা অন্য কারণে প্রচুর রক্তপাতের সময় রক্ত জমাট বাঁধে না, শরীরের সমস্ত রক্ত ক্ষরিত হয়ে যায়, ফলে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শরীরের কোথাও কেটে যাওয়া, নাক দিয়ে রক্ত পড়া বা দাঁত তোলবার সময় যে রক্তপাত হয়, তার ফলেও কখনো কখনো এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রক্ত জমাট বাঁধবার প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :—রক্তে প্রোথ্রোম্বিন নামে একটি নিষ্ক্রিয় প্রোটিন থাকে। রক্তপাতের সময় রক্তস্থিত প্ল্যাট্লেট-কণিকাগুলি ভেঙ্গে যায় এবং তাথেকে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন নামক পদার্থ নির্গত হয়। এই থ্রোম্বোপ্লাস্টিন নামক পদার্থ রক্তরসের প্রোথ্রোম্বিনকে থ্রোম্বিনে পরিণত করে। উৎপাদিত থ্রোম্বিন রক্তরসের ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিনে পরিণত করে। এই ফাইব্রিন নামক পদার্থটি সূচের মত সূক্ষ্ম ও আঠালো জালের মত হয়ে রক্তরসে তৈরী হয়। ফলে রক্তের কণিকাগুলি ফাইব্রিনের জালে আট্‌কা পড়ে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালন ও রক্তক্ষরণের সময় যাতে সমস্ত রক্ত জমাট না বাঁধে, তার জন্যে রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় কতকগুলি প্রতিবন্ধক পদার্থ থাকে ; যেমন—অ্যান্টিথ্রোম্বোপ্লাস্টিন, অ্যান্টিথ্রোম্বিন, হিপারিন প্রভৃতি।

অনুসন্ধানের ফলে দেখা গেছে, হিমোফিলিয়া রোগীদের শরীরের রক্তে ক্যালসিয়াম, ফাইব্রিনোজেন, ফস্‌ফোলিপিড, প্রোথ্রোম্বিন ও অ্যাক্সিলারেটর গ্লোবিউলিন প্রায় স্বাভাবিক পরিমাণে থাকে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তির রক্তে প্ল্যাট্লেট-কণিকার সংখ্যাও সমান থাকে। কিন্তু দেখা গেছে—এই কণিকাগুলি অতি সহজে ভেঙ্গে যায় না—ফলে থ্রোম্বোপ্লাস্টিন, যা রক্ত জমাট বাঁধবার কাজে প্রথমেই দরকার, রক্তে তা তৈরী হয় না। আবার এও দেখা গেছে, হিমোফিলিয়া রোগীর রক্ত থেকে সংগৃহীত প্ল্যাট্লেট-কণিকাগুলি সুস্থ ব্যক্তির রক্তের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ভেঙ্গে যায় এবং সুস্থ ব্যক্তির রক্ত জমাট বাঁধায়। এতে মনে হয় সুস্থ ব্যক্তির রক্তরসে এমন একটি পদার্থ আছে, যা প্ল্যাট্লেট-কণিকাকে ভাঙ্গতে সাহায্য করে এবং এই সাহায্যকারী পদার্থটি সম্ভবতঃ হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত ব্যক্তির রক্তে নেই। আরও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, হিমোফিলিয়াগ্রস্ত ব্যক্তির রক্তে স্বাভাবিক পরিমাণের চেয়ে বেশী অ্যান্টিথ্রোম্বোপ্লাস্টিন (যা থ্রোম্বোপ্লাস্টিন উৎপাদন ব্যাহত করে) বেশী থাকে। এরূপ হিমোফিলিয়া রোগীদের প্রচুর রক্তক্ষরণের হাত থেকে রক্ষাকল্পে তাদের রক্তের মধ্যে স্বাভাবিক সুস্থ ব্যক্তির রক্ত বা রক্তরস প্রবেশ করিয়ে দিলে সাময়িকভাবে রক্ত জমাট বাঁধা সম্ভব হতে পারে।

হিমোফিলিয়া রোগ সম্বন্ধে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই রোগ সাধারণতঃ পুরুষেরই হয়, স্ত্রীলোকেরা এই রোগে ভোগে না, কিন্তু স্ত্রীলোকের মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে এই রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত পুরুষের পুত্র ও কন্যাদের এই রোগ হয় না, কিন্তু কন্যারা এই রোগের কারণটি বহন করে। এই কন্যাদের পুত্রেরা এই রোগে ভুগতে পারে; অর্থাৎ হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত পুরুষের পুত্র ও পৌত্রেরা এই রোগ ভোগ করবে না বা রোগের কারণ বহন করবে না, কিন্তু তার দৌহিত্রেরা এই রোগে ভুগতে পারে এবং দৌহিত্রীরা এই রোগের কারণ বহন করতে পারে। বংশানুক্রমে এই রোগ বিস্তৃতির কারণ হলো এই যে, লিঙ্গ-নির্ধারক X-ক্রোমোসোমের মধ্যে

এই হিমোফিলিয়ার কারণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে। পুরুষের দেহকোষের লিঙ্গ-নির্ধারক Y-ক্রোমোসোমে এই হিমোফিলিয়ার কারণ নিহিত নেই। ফলে এই সুপ্ত কারণটি সক্রিয় অ-হিমোফিলিয়া জিনের অনুপস্থিতিতে রক্ত জমাট বাঁধবার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে দেয় না। স্ত্রীদেহের (XX-এর) একটি X-ক্রোমোসোমে হিমোফিলিয়ার জিন সুপ্ত থাকে, অন্য X-ক্রোমোসোমটিতে একটি সক্রিয় অ-হিমোফিলিয়া জিন থাকায় সুপ্ত হিমোফিলিয়া জিনটি রোগ উৎপাদনে কার্যকরী হতে পারে না। যে X-ক্রোমোসোমের মধ্যে হিমোফিলিয়ার জিন থাকে, তাকে x হিসেবে প্রকাশ করলে হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত পুরুষ হবে xY। আর XY-পুরুষ হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত হবে না। স্ত্রীলোক হবে XX বা xX। এদের, মধ্যে XX স্ত্রীলোক হিমোফিলিয়াতে ভুগবে না বা পরবর্তী বংশে রোগের কারণ বহন করবে না। কিন্তু xX-স্ত্রীলোক হিমোফিলিয়ার কারণ পরবর্তী বংশে বহন করবে। নিম্নে দেখানো হয়েছে, কিভাবে হিমোফিলিয়ার কারণ বংশানুক্রমিকভাবে বিস্তার লাভ করে। এই থেকে এও দেখা যায় যে, কোন হিমোফিলিয়া-জিন বহনকারী স্ত্রীলোক যদি কোন হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত পুরুষকে বিবাহ করে, তবে তাদের অর্ধেক কন্যা-সন্তান হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত হতে পারে, আর বাকী অর্ধেক কন্যা-সন্তান হিমোফিলিয়ার কারণ বহন করতে পারে। তাদের পুত্রদের মধ্যে পূর্বানুরূপভাবে অর্ধেক রোগগ্রস্ত ও অর্ধেক সুস্থ হবে।

xY (রোগগ্রস্ত) + XX (সুস্থ)
(পুরুষ) (স্ত্রী)

পুত্রগণ
XX+XY (সুস্থ)
(সুস্থ)
স্ত্রী

পুত্রগণ কন্যাগণ
XY (সুস্থ) XX (সুস্থ)

কন্যাগণ
xX (বাহক) + XY (সুস্থ)
পুরুষ

পুত্রগণ
XY (সুস্থ)
xY (রোগগ্রস্ত)

কন্যাগণ
XX (সুস্থ)
xX (বাহক) +
xY (রোগী) (পুরুষ)

পুত্রগণ
xY (রোগী)
XY (সুস্থ)

কন্যাগণ
xx (রোগী)
Xx (বাহক)
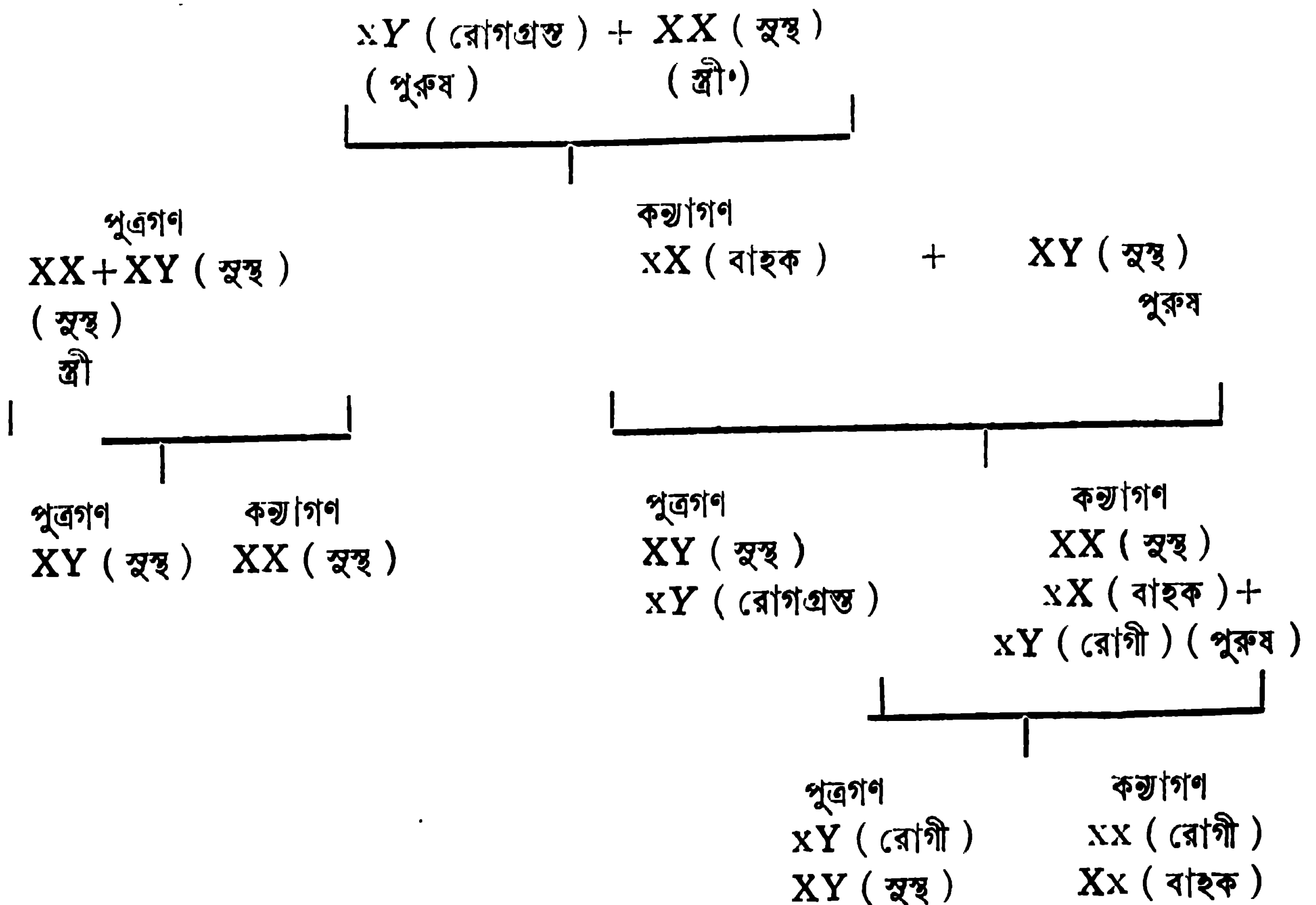
ইংল্যাণ্ডের সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার (১৮১৯-১৯০১) নয়জন পুরুষ বংশধর এই হিমোফিলিয়া রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। সর্বশেষ জ্ঞাত হিমোফিলিয়া-রোগী হচ্ছেন, স্পেনের রাজপুত্র অ্যাল্‌ফোন্সো (১৯০৭-১৯৩৮), আমেরিকার ফ্লোরিডায় সামান্য মোটর দুর্ঘটনায় আহত রাজপুত্রের রক্ত জমাট না বাঁধবার ফলে মৃত্যু হয়। অ্যাল-ফোন্সো ছিলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্রী স্পেনের রাণী ভিক্টোরিয়া ইউজিনের পুত্র। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জে বি. এস. হলডেনের মতে, মহারাণী

ভিক্টোরিয়ার ডিম্বাণুর একটি X-ক্রোমোসোমে হিমোফিলিয়ার জিন ছিল। ফলে, তাঁর দৌহিত্র-কুলে এই রোগ দেখা গেছে। ইউরোপের অনেক রাজপরিবারের এই রোগের কারণের মূলে আছে ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক। ১৯৪৭ সালে বর্তমান ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রিন্সেস এলিজাবেথের সঙ্গে গ্রীসের রাজপুত্র ফিলিপের বিবাহ স্থির হয়। এলিজাবেথ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্রপক্ষের বংশধর, আর ফিলিপ হচ্ছেন ভিক্টোরিয়ার কন্যাপক্ষের বংশধর। এর ফলে কথা উঠেছিল, এলিজাবেথ ও ফিলিপের সন্তানসন্ততির মধ্যে হিমোফিলিয়া রোগ দেখা দেবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। যেহেতু ফিলিপ ভিক্টোরিয়ার কন্যাপক্ষের বংশধর, সেহেতু ফিলিপ হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত হতে পারতেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ফিলিপ হিমোফিলিয়া রোগী নন। তিনি সুস্থ এবং অন্যান্য সুস্থ ব্যক্তির মতই তাঁর রক্ত জমাট বাঁধে। আর এলিজাবেথ হলেন ভিক্টোরিয়ার পুত্রপক্ষের সন্তান এবং এলিজাবেথের পিতা ষষ্ঠ জর্জ (১৮৯৫-১৯৫২) ও পিতামহ পঞ্চম জর্জ (১৮৬৫—১৯৩৬) উভয়েই সুস্থ ছিলেন, হিমোফিলিয়া-গ্রস্ত ছিলন না। সুতরাং এলিজাবেথ হিমোফিলিয়ার জিন বহন করেন না। অতএব এলিজাবেথ ও ফিলিপের পুত্র-কন্যারা হিমোফিলিয়া রোগী বা হিমোফিলিয়ার বাহন হবেন না। পুত্র চার্লস্ (জন্ম ১৯৪৮) ও অ্যান্ড্রু (জন্ম ১৯৬০) বা কন্যা আনে (জন্ম ১৯৫০) কারো হিমোফিলিয়ার লক্ষণ এ-পর্যন্ত দেখা যায় নি; অর্থাৎ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সেই মারাত্মক হিমোফিলিয়ার জিনটি এঁদের দেহে বংশানুক্রমিকভাবে প্রবেশের সুযোগ পায় নি।

রেডার

শ্রীজয়ন্ত বসু

আমার এক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে একদিন রেডারের কথা উঠেছিল। বন্ধুবর কপাল, বুক ও দুই কাঁধে হাত ঠেকিয়ে ক্রশের চিহ্ন আঁকলেন এবং বললেন, রেডার আমাদের ত্রাণকর্তা, 'বৃটিশ হোম চেন অব রেডার ষ্টেশনস্' না থাকলে বৃটেন কবে হিটলারের খপ্পরে চলে যেত! আমার নাস্তিক বন্ধুটির ক্রশ আঁকাটা রসিকতাব্যঞ্জক হলেও বক্তব্যটি কিন্তু সত্য।

রেডার (Radar) হলো 'রেডিও ডিটেক্শন অ্যাণ্ড রেঞ্জিং' (Radio Detection And Ranging) কথাটির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ—ইংরেজি শব্দ কয়টির প্রথম অক্ষরগুলির সমন্বয়। 'রেডিও ডিটেক্শন অ্যাণ্ড রেঞ্জিং'-এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো বেতারের সাহায্যে কোন বস্তুর উপস্থিতি ও তার দূরত্ব নির্ধারণ।

বস্তুবিশেষের অবস্থান সাধারণতঃ আলোর সাহায্যে আমাদের গোচরীভূত হয়। অথচ আমরা জানি, অন্ধকার গুহা-গহ্বরের মধ্যে কোথাও প্রতিহত না হয়ে বাদুড় স্বচ্ছন্দগতিতে উড়ে বেড়াতে পারে। এটা সম্ভব হয় কেমন করে? বাদুড় ওড়বার সময় এমনভাবে শব্দ করে যে, তাতে এক ধরণের সুপারসোনিক শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সুপারসোনিক শব্দ-তরঙ্গ সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের তুলনায় অধিকতর দ্রুত স্পন্দনশীল বলে মানুষের শ্রবণশক্তির একতিয়ারের বাইরে। যাহোক, ঐ তরঙ্গ কঠিন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে বাদুড়ের কর্ণপটহে আঘাত করে এবং তাথেকে তারা কঠিন বস্তুর অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়। রেডারের কর্মক্ষমতার জন্যেও প্রায় একই রকমের কৌশল অবলম্বিত হয়—তবে শব্দ-তরঙ্গের

পরিবর্তে এক্ষেত্রে বেতার-তরঙ্গের প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

রেডার কি ভাবে কাজ করে, একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, দেশের আকাশে শত্রুপক্ষের এক বিমান এসে উপস্থিত হয়েছে। মাটির উপর রয়েছে রেডার যন্ত্র—তাথেকে বেতার-তরঙ্গ প্রেরিত হলো। বিমান থেকে প্রতিফলিত হয়ে সেই তরঙ্গের অংশবিশেষ প্রত্যাবর্তন করলো এবং রেডার যন্ত্রটিতে সেটা ধরা পড়লো। এই প্রক্রিয়ায় প্রতিফলিত তরঙ্গটি লক্ষ্য করে বিমানের উপস্থিতি ও অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। জানা আছে, বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬০০০ মাইল। সুতরাং রেডার থেকে প্রেরিত তরঙ্গ প্রেরণের কত পরে বিমান থেকে প্রতিফলিত হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো, সেই সময়টুকুর পরিমাপ থেকে বিমানের দূরত্ব হিসাব করা যেতে পারে। রেডারের যে বিশেষ অংশ থেকে বেতার-তরঙ্গ আকাশে প্রেরিত হয়, তার নাম এরিয়েল। এরিয়েলেই আবার প্রতিফলিত তরঙ্গ প্রথম গৃহীত হয়। এই এরিয়েলকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে কোন দিকে ঘোরানো যেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নাম স্ক্যানিং। এই প্রক্রিয়ায় আকাশের চতুর্দিকের ছবি রেডারে দেখতে পাওয়া যায়। আবার প্রয়োজনমত আকাশের কোন বিশেষ অংশেও রেডারের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ করা চলে।

রেডারকে মানুষের একটি বিশেষ যান্ত্রিক দৃষ্টি বলা যায়। খালি চোখে যতদূর দেখা সম্ভব, তাথেকে অনেক বেশী দূর পর্যন্ত রেডারের দৃষ্টি চলে। শুধু যে রাত্রির অন্ধকারেই এই দৃষ্টি অব্যাহত থাকে, তা নয়—ধোঁয়া, কুয়াশা—এমন কি, হাল্কা মেঘও এর পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। রেডারের সাহায্যে যতখানি নিখুঁতভাবে কোন একটি বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়, অতীতে বিজ্ঞানী-দের তা কেবল কল্পনার বিষয় ছিল। রেডার চলমান বস্তুর গতি নির্ধারণ করতেও সক্ষম। মানুষের চোখের কাছে এক বিষয়ে অবশ্য রেডারের পরাজয় ঘটেছে। চোখের মত অত বিশদভাবে কোন বস্তুকে রেডারে দেখা যায় না। সমুদ্রে যদি একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকে, রেডারে তাকে দেখা যাবে; কিন্তু তার খুঁটিনাটি, অর্থাৎ তার ডেকের রেলিং বা রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের দল, প্রভৃতি রেডারে বোঝা যাবে না। রেডারের উপযোগিতা সবচেয়ে বেশী যখন অনেকখানি ফাঁকা জায়গায় কোন একটি বস্তু একা উপস্থিত থাকে —যেমন, আকাশে একটি বিমান বা সমুদ্রের মাঝে একটি জাহাজ।

বেতার-তরঙ্গ যে কঠিন বস্তু থেকে প্রতিফলিত হয়, এই তথ্যটি এখন থেকে ৭৭ বছর পূর্বে, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে হাইনরিখ হার্ৎজ সর্বপ্রথম জানতে পেরে-ছিলেন। রেডারের জন্ম কিন্তু এর অনেক পরে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রেডার উদ্ভাবিত হয়। ঐ সময় বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী ও আমেরিকায় রেডারের সম্পর্কে কাজ হচ্ছিল বলে জানা যায়। বৃটেনের তাগিদ ছিল সবচেয়ে বেশী। বৃটিশ বিমানবাহিনীর চেয়ে সে সময় জার্মান বিমানবাহিনী অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। জার্মান বোমারুদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে বৃটেনের চারদিকে রেডার বসানো হলো—গড়ে উঠলো 'বৃটিশ হোম চেন অব রেডার ষ্টেশন্স্'। জার্মান বিমান বৃটেনের উদ্দেশ্যে হানা দিলেই রেডার সতর্কতা ঘোষণা করতো, তার উপস্থিতি ও অবস্থান জানিয়ে দিত।

রেডারের জীবনে এক সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হলো, বৃটিশ বিজ্ঞানীরা যখন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ম্যাগ্নেট্রন টিউব আবিষ্কার করেন। রেডারে সাধারণতঃ যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, ১ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার। ম্যাগ্নেট্রন টিউবের সাহায্যে অতি শক্তিসম্পন্ন ঐ ধরণের বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হলো। এরপর যুদ্ধের কয়েক বছরের মধ্যে আশ্চর্য দ্রুত-গতিতে রেডারের অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়।

রেডারের সাহায্যে কেবল বিমানের অবস্থান জানাই নয়, একবার একটি বিমান দেখতে পেলে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তার অনুসরণ করাও সম্ভব হলো। বিমান ও জাহাজেও রেডার যন্ত্র রাখা হলো—সেগুলির সাহায্যে অন্যান্য বিমান ও জাহাজের খোঁজ রাখা অনেক বেশী সহজ হলো। দিক-নির্ণয়ের ব্যাপারেও রেডারকে কাজে লাগানো হলো।

যুদ্ধ সমাপ্তির পর ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দ থেকে রেডারকে শান্তিকালীন নানাবিধ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। দিক-নির্ণয়ের কাজই তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত বড় বিমান বন্দরেই এখন রেডার যন্ত্র আছে। তাদের সাহায্যে বিমানের গতিবিধি তদারক করা হয়। প্রায় প্রতিটি দূরগামী বিমান ও জাহাজে এখন রেডার থাকে। এই বিশেষ দৃষ্টিশক্তির কল্যাণে দূরপাল্লায় পাড়ি দেওয়া, বিশেষতঃ বিমানে, অনেকখানি সহজ হয়ে গেছে।

এ ছাড়া আবহাওয়ার খোঁজখবর রাখবার ব্যাপারেও রেডারকে কাজে লাগানো হয়। কোথাও যদি মেঘের আবির্ভাব ঘটে, অনেক দূর থেকেই রেডারে তা জানতে পারা যায়। কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার বেশ কিছুক্ষণ আগেই রেডারে তার সঙ্কেত মেলে। আমি এক ভদ্রলোককে জানি, তিনি ইংল্যাণ্ডে রয়্যাল রেডার এস্টাব্লিশমেন্টে কাজ করতেন। বায়ুমণ্ডলে বরফ যেখানে দানা বেঁধে নীচে নামতে থাকে, রেডারের সাহায্যে ওখানকার ঐ বরফের দানাগুলির গতিবিধি সম্বন্ধে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

রেডারের আর একটি অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি অবশ্য ঘটে আকস্মিক যোগাযোগের ফলে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটেনের উপকূলস্থিত রেডার যন্ত্রে একটি নতুন ধরণের সঙ্কেত ধরা পড়ে। প্রথমে মনে হয়েছিল প্রতারণার উদ্দেশ্যে শত্রুপক্ষ ঐ সঙ্কেত সৃষ্টি করছে। বিশ্লেষণ করে পরে বোঝা গেল, ব্যাপারটি তা নয়, সঙ্কেতের মূলে রয়েছে সূর্য থেকে আগত বেতার-তরঙ্গ। বস্তুতঃ ঐ সময় একটি সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ঘটেছিল। যাহোক, জানা গেল সূর্য থেকে আলোক-রশ্মির মত বেতার-তরঙ্গও নিয়মিত পৃথিবীতে এসে উপস্থিত হচ্ছে। ফলে সূর্য সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের একটি নতুন পন্থা উদ্ঘাটিত হলো।

এই ধরণের আরেকটি আকস্মিক যোগাযোগের ফলে পাখীদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে পাখীরা যখন দলে দলে দেশান্তর যাত্রা করে, রেডারের ছবি থেকে তাদের তখনকার গতিবিধি সম্পর্কে নানাপ্রকার তথ্যাদি জানতে পারা গেছে।

সম্প্রতি মানুষ যে কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করেছে, তাদের অবস্থান জানবার জন্যে রেডারকে কাজে লাগানো হয়েছে। চন্দ্রের উদ্দেশ্যেও রেডার থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রেরিত হয়েছে, সেই তরঙ্গ ফিরে আসবার পর তাকে বিশ্লেষণ করে চাঁদের বহিরাবরণ সম্পর্কে কিছু কিছু আভাসও পাওয়া গেছে। গত বছরের ১৯শে ও ২৪শে নভেম্বর সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা রেডারে শুক্রগ্রহের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মঙ্গলগ্রহকে তো এর আগেই রেডারের বেতার-তরঙ্গ ছুঁয়ে এসেছে। বর্তমান বছরের সুরুতে, জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, রেডারে বুধ গ্রহটিকেও প্রতিফলক হিসাবে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

যুদ্ধের প্রস্তুতির মধ্যে যে রেডারের জন্ম, যুদ্ধের সময় সে শৈশব থেকে একবারে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়েছে। শান্তির সময় তার কর্মমুখরতা হ্রাস তো দূরের কথা, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিরই পথে। রেডার আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাশূন্য জয়ের। প্রচেষ্টায় রেডার বিশ্বস্ত বন্ধুর মত মানুষের সহায়তা করছে।

পারমাণবিক বোমা প্রসঙ্গে

শ্রীশঙ্করনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পারমাণবিক বোমার কথায় প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে—পরমাণু কি? পরমাণু হচ্ছে পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ। এই পরমাণুই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে। এই পরমাণুর গঠন খুবই অদ্ভুত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রন ও প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত নিউক্লিয়াস। নিউট্রন তড়িৎ-শূন্য, কিন্তু প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎ-আধানযুক্ত। তাহলে যাবতীয় পদার্থেরই তড়িৎযুক্ত হবার কথা। কিন্তু তা হবার উপায় নেই; কারণ এই নিউক্লিয়াসের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে প্রচণ্ড বেগে ইলেকট্রন ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ইলেকট্রনে থাকে ঋণাত্মক তড়িৎ-আধান। ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান থাকবার ফলে প্রোটনের ধন-তড়িৎ ইলেকট্রনের ঋণ-তড়িৎকে নাকচ করে। ইলেকট্রন-গুলি ঘুরছে কেন? ইলেকট্রনের গতিবেগে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ বল এদের বাইরের দিকে ছিট্‌কে ফেলে দিতে চায়; কিন্তু প্রোটনগুলি এদের আকর্ষণ করে রাখে। এই দুটি বিপরীতমুখী শক্তির সাম্য বিধানে এরা ঘুরতে থাকে।

কোন পরমাণুর প্রোটন ও নিউট্রনের মিলিত ভরকেই পারমাণবিক ভর বলা হয়। কোন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা ঠিক রেখে নিউট্রন যদি ক্রমশঃ বাড়ানো যায়, তবে তার ভর অবশ্যই বাড়বে, কিন্তু প্রোটনের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকায় তার নিজস্ব ধর্মের কোন পরিবর্তন হবে না। এভাবে পাওয়া পরমাণুকে সমস্থানিক বা আইসো-টোপ বলে। কিন্তু সন্দেহ জাগে, কেন্দ্রে সম-তড়িৎযুক্ত প্রোটন এক স্থানে থাকে কেমন করে? কারণ সমতড়িৎ তো পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে! এর উত্তরও বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। নিউট্রন সমান সংখ্যক প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমন্বয়। তাই এথেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে গেলে তা প্রোটনে রূপান্তরিত হয় এবং এই পারস্পরিক রূপান্তরণে যে বিশেষ আকর্ষণী বলের উদ্ভব হয়, সেই বলই ওদের স্ব স্ব স্থানে বেঁধে রাখে। এখন কোন প্রকারে এই পরমাণুর ক্ষয় সাধন করতে পারলেই কিছুটা শক্তি পাওয়া যাবে। এই শক্তির পরিমাপ জানা যায় আইনষ্টাইনের সমীকরণে—$E = mc^2$ (E = শক্তি, m = বস্তুভর, c = আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে)। অতএব যতটা বস্তু ক্ষয় হবে, তার ভরকে আলোর গতির বর্গ দিয়ে গুণ করলে সৃষ্ট শক্তির পরিমাপ পাওয়া যাবে।

পরমাণুর কেন্দ্র থেকে এই শক্তি দুই উপায়ে পাওয়া সম্ভব—(১) পরমাণুর বিভাজন, (২) পরমাণুর একীকরণ। একীকরণ হাল্‌কা পরমাণুর পক্ষেই সম্ভব। যদি দুটি হাল্‌কা পরমাণুকে যুক্ত করে একটা নতুন পরমাণুতে রূপান্তরিত করা যায়, তবে ঐ নতুন পরমাণুর ভর আগেরটার চেয়ে কিছু কম হবে। যে পরিমাণ বস্তু কমবে, তাই পারমাণবিক শক্তিরূপে প্রকাশিত হবে। হিলিয়াম পরমাণুতে দুটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন থাকে। এদের প্রত্যেককে আলাদাভাবে ওজন করে যোগ দিলে হিলিয়াম পরমাণুর ওজন হয় ৪.০০৩০২। কিন্তু এর নিখুঁত ওজন ৪.০০২৮০। এই কম ওজনটুকুই শক্তিরূপে প্রকাশ পাবে।

বিভাজন—৯২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে ভাবী পরমাণু ইউরেনিয়ামের ওজন ২৩৮। কিন্তু এর প্রায় ১২ রকমের আইসোটোপ আছে। তাদের মধ্যে ইউ-২৩৫-কেই বিভাজনে ব্যবহার করা হয়। এই পরমাণু আবার তেজস্ক্রিয়, অর্থাৎ এদের

কেন্দ্রে নিউট্রন ও প্রোটন সংখ্যায় খুব বেশী থাকে (৯২টি প্রোটন ও ১৪৩টি নিউট্রন)। তাই এরা উত্তেজিত অবস্থায় থাকে এবং স্বতঃই ∝-রশ্মি, অর্থাৎ ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত কণা ছুঁড়তে থাকে। এসব মৌলিক পদার্থকেই তেজস্ক্রিয় বলা হয়। ইউ-২৩৫কে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে তা বেরিয়াম ও ক্রিপ্টনে ভেঙে যায় এবং তিনটি নিউট্রন নির্গত হয়। কিংবা ইউ-২৩৫, ষ্ট্রনসিয়াম (প্রোটন সংখ্যা—৩৮), ও জেনন (প্রোটন সংখ্যা—৫৪) অথবা ল্যান্থেনাম (প্রোটন সংখ্যা—৫৭) ও ব্রোমিন (প্রোটন সংখ্যা—৩৫) এবং এরূপ প্রায় ৩০।৪০ রকমে বিভাজিত হতে পারে। একটা ইউরেনিয়াম পরমাণু যখন একটা ল্যান্থেনাম ও একটা ব্রোমিন পরমাণু এবং তিনটি নিউট্রনে ভেঙে যায়, তখন প্রায় ·০০০৮ ভাগ বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

কিন্তু ইউ-২৩৫ ভাঙতে গেলে একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। দেখা গেছে, ইউ-২৩৫কে ভাঙতে দ্রুতগতি নিউট্রনের চেয়ে ধীরগতি (তাপ-তরঙ্গের গতিতে ধাবমান) নিউট্রনে কাজ হয় বেশী। এটা সত্যই এক অদ্ভুত কথা! কিন্তু আসল ব্যাপার এই—ধীরগতি নিউট্রন ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রকের কাছাকাছি আসবামাত্রই কেন্দ্রকের ভিতরে প্রোটনকে বেঁধে রাখে যে শক্তি, তা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং নিউট্রনকে কেন্দ্রকের মধ্যে নিয়ে আসে। তাছাড়া ধীরগতি নিউট্রন ইউরেনিয়াম-কেন্দ্রকের কাছে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে। এভাবে যে তিনটি নিউট্রন বের হয়, তারা অন্য ইউ-পরমাণুর কেন্দ্রে ঢুকে তাথেকে নিউট্রন বের করতে থাকে। নিউট্রন যাতে বাইরে চলে না যায়, তার জন্যে ইউ-২৩৫-এর একটা বড় স্তূপ করা প্রয়োজন। একে বলে ক্রিটি-ক্যাল মাস। এভাবে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে।

বিভাজনের সম্ভাবনা ইউ-২৩৮-এর চেয়ে ইউ-২৩৫-এর বেশী স্থায়ী। ইউরেনিয়াম পরমাণুতে যদি ইউ-২৩৮-এর ভাগ বেশী এবং ইউ-২৩৫-এর ভাগ কম থাকে, তবে তাকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করবার ফলে যে নিউট্রন বেরোয়, গ্র্যাফাইটের সাহায্য তাদের বেগ কমিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এরা ইউ-২৩৫-এর কেন্দ্রে অনায়াসে ঢুকে তাদের ভাঙতে থাকে। কিন্তু এই মন্থরগতি নিউট্রন ইউ-২৩৮-এ প্রবেশ করতে পারে না। তাই কেবল মাত্র ইউ-২৩৫ই ভেঙে যায়। পারমাণবিক বোমায় অবশ্য বিশুদ্ধ ইউ-২৩৫ই ব্যবহার করা হয়। কারণ সেখানে মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

একীকরণ—সূর্যদেহে এই প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু ক্রমাগত হিলিয়াম পরমাণুতে পরিণত হয়। অবশ্য কার্বন এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। পৃথিবীতে এরূপ একীকরণ করবার অনেক অসুবিধা আছে, বরং ডয়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম ব্যবহারে সুবিধা বেশী। এখানে একটা অসুবিধা এই যে, এদের কেন্দ্রের সমতড়িৎ পরস্পরকে বিকর্ষণ করবে, ফলে একীকরণে সুবিধা হবে না। তাছাড়া ট্রিটিয়াম পাওয়াই দুষ্কর। সবচেয়ে সুবিধা হলো লিথিয়ামকে নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা।

লিথিয়াম (৬) + নিউট্রন—→হিলিয়াম (৪) + হাইড্রোজেন (৩)
হাইড্রোজেন (৩) + হাইড্রোজেন (২)---→হিলিয়াম (৬) + নিউট্রন
হাইড্রোজেন (২) + হাইড্রোজেন (২)---→হাইড্রোজেন (১) + হাইড্রোজেন (৩)
বা হিলিয়াম (৩) + নিউট্রন

এই প্রণালীতে অনেক সুবিধা আছে। কারণ ট্রিটিয়াম পৃথকভাবে তৈরী করতে হবে না। আর সর্বপ্রথম যে নিউট্রন লাগবে, তা প্রাথমিক বিভাজন থেকে পাওয়া যাবে। কারণ প্রাথমিক বিভাজন-জাত বিস্ফোরণ ছাড়া একীকরণ অসম্ভব।

এখন দেখা যাক, এই অফুরন্ত শক্তির ভয়াবহতা

কিরূপ ? এই সব বোমা বিস্ফোরণের ফলাফল কি ? বিভাজন বা একীকরণে যে পরিমাণ শক্তির উদ্ভব হয় তার বেশীর ভাগ বিস্ফোরক শক্তি, বাকীটা তেজস্ক্রিয় শক্তি ও নির্গত নিউট্রনের বেগশক্তি। ইউ-২৩৫-এর বিভাজন প্রতিটি প্রাথমিক কণিকা থেকে প্রায় দশ লক্ষ ইলেকট্রন ভোল্ট তেজ পাওয়া যায়।

রেডি অ্যাক্‌সন—বিস্ফোরণের ধাক্কায় সৃষ্ট প্রচণ্ড তাপে ৩ মাইলের মধ্যে সব জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে যাবে এবং তারও ৭ মাইলের মধ্যে সমস্ত প্রাণী বিশেষভাবে আক্রান্ত হবে। এর চেয়েও ভয়াবহ হলো বিলম্বিত বিকিরণ। বিভাজন থেকে উদ্ভূত অংশ সূক্ষ্মরূপে উপরে উঠে অনেক পরে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে। এরই নাম বিলম্বিত বিকিরণ। তেজস্ক্রিয় বিকিরণও এই ফলাফলের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর উপাদান α, β, γ-রশ্মির মধ্যে γ-রশ্মি আমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। কারণ এটা দূরগামী ও অন্তর্ভেদী। আর এই রশ্মিগুলি আপন পথের পরমাণুকে আয়নে পরিণত করবে, অর্থাৎ পরমাণুর উপরের সেল থেকে ইলেকট্রন ছিট্‌কে বাইরে ফেলে দেবে। ফলে পরমাণুগুলির ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের সাম্য ব্যাহত হবে এবং ঋণাত্মক চার্জ চলে যাওয়ায় তারা ধনাত্মক চার্জবাহী আয়নে পরিণত হবে। এই হিসাবে তেজস্ক্রিয় বিকিরণকে আয়ন-সৃষ্টিকারী বিকিরণও বলা যায়। এই বিকিরণের পথে বিভিন্ন পরমাণুর সঙ্গে রশ্মিগুলির সংঘর্ষে তাপেরও সৃষ্টি হবে এবং এই বিস্ফোরণে নির্গত নিউট্রন অন্যান্য পরমাণুর কেন্দ্রে ঢুকে তাদেরও তেজস্ক্রিয় করে তুলবে; যেমন—১টা নিউট্রন নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে প্রবেশ করে কার্বনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (১৪) তৈরী করে। বিভাজন প্রক্রিয়ায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ও বিলম্বিত বিকিরণে ক্ষতি অপেক্ষাকৃত কম। কারণ এই বিস্ফোরণে বাষ্পের গোলা উপরে উঠে তেজস্ক্রিয় মেঘের সৃষ্টি করে এবং তা মিলিয়ে গেলে অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় কণাই দিন কয়েকের মধ্যেই মাটিতে ফিরে আসে। কিন্তু হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণে এই গোলার আকার হয় অনেক বড় এবং কতক তেজস্ক্রিয় কণা এত উপরে উঠে যায় যে, তাদের পৃথিবীপৃষ্ঠে ফিরে আসতে বহু সময় লাগে। ফলে এটা সারা পৃথিবী জুড়ে প্লুটোনিয়াম (২৩৯) বা ইউ-২৩৫-এর অবিভাজিত অংশরূপে আকাশে বিস্তৃত হয়ে তেজস্ক্রিয়
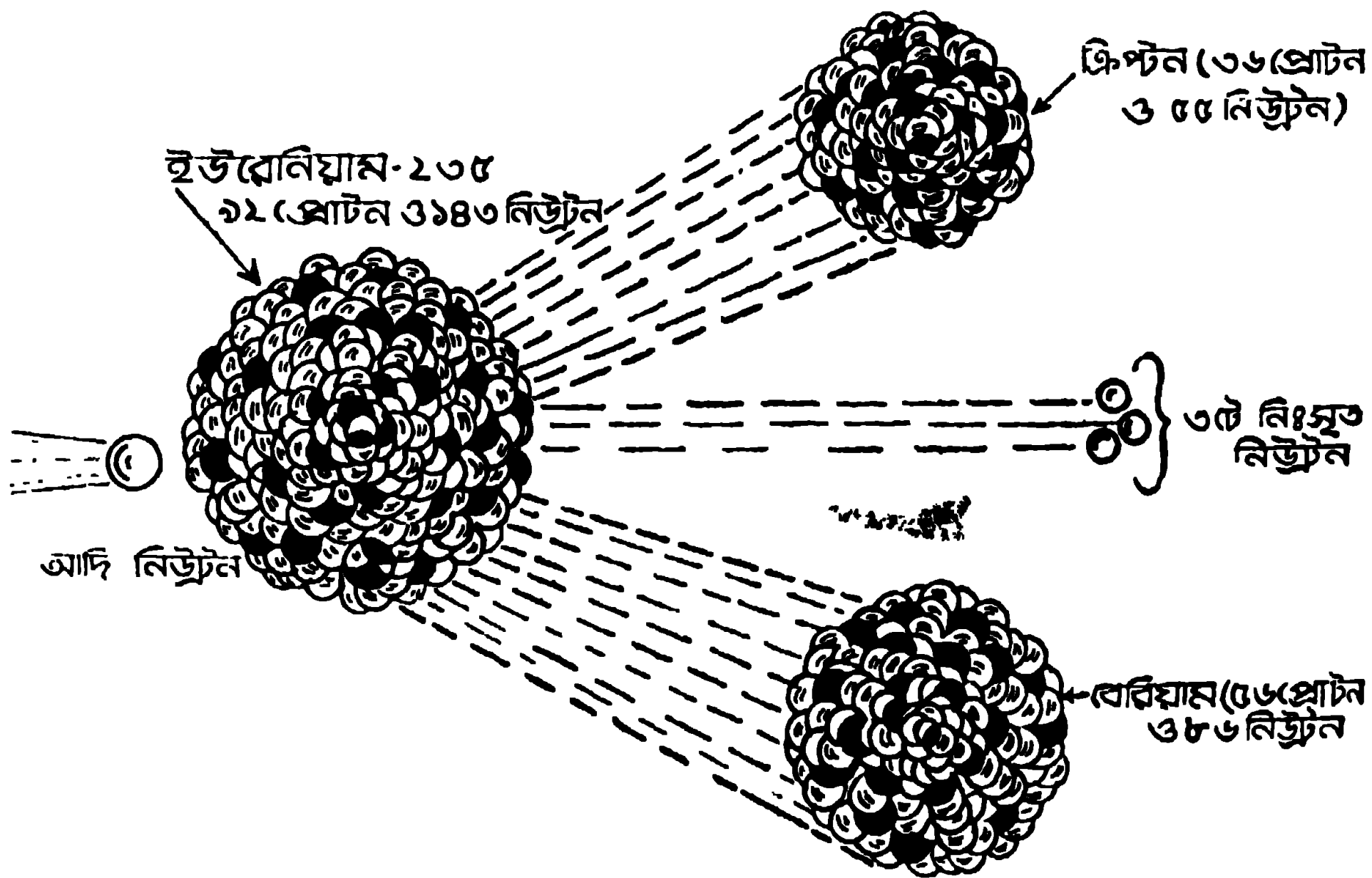
ইউরেনিয়াম বিভাজনের কেন্দ্রক প্রক্রিয়ার ছক।

রশ্মি বিকিরণ করে। এসব তেজস্ক্রিয় কণা খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু দেহের এমন এমন জায়গায় বাসা বাঁধে যে, সেগুলি শীঘ্রই সেখান থেকে বাইরে চলে আসে। একমাত্র ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ বিপজ্জনক, কারণ সেগুলি দেহের মধ্যে প্রবেশে দক্ষ। কিন্তু এথেকে γ-রশ্মি বেরোয় না, তবে এথেকে নিঃসৃত α, β রশ্মি ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে। আয়োডিন-১৩ থেকেও সামান্য ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে কার্বন-১৪-র সৃষ্টি হয়, তা তত বিপজ্জনক নয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বিস্ফোরণজাত তাপেই হোক বা তেজস্ক্রিয় কণার বিলম্বিত ক্রিয়ায়ই হোক, পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এসব ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার সবিশেষ কৌশল বা কোন সাধারণ উপায় আবিষ্কৃত হয় নি।

পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া।
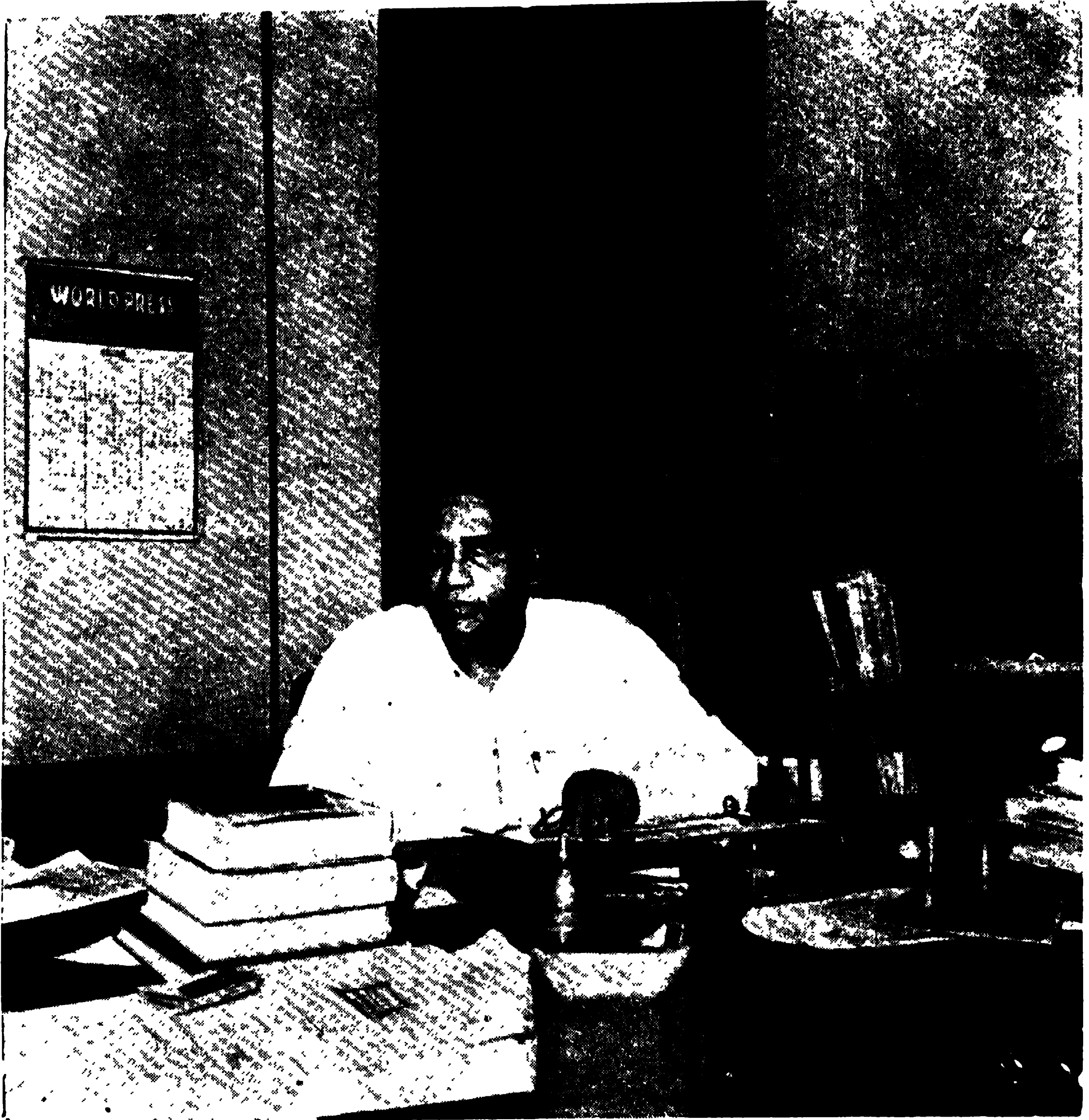
অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন

জন্ম: ২৩শে মে, ১৮৯৪

মৃত্যু: ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬৩

শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায়ের
সৌজন্যে

অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন

শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

ডঃ নিখিলরঞ্জন সেনের জন্ম হয় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে মে, ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার আমদিয়া গ্রামে। সেন পরিবারের অনেকেই বুদ্ধিমত্তা, বিদ্যা ও দেশসেবায় লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। পিতা কালীমোহন সেন ছিলেন ঢাকার একজন বিশিষ্ট উকিল। খুল্লতাত রাজমোহন সেন ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং বহুদিন রাজসাহী কলেজে গণিতের অধ্যাপনা করে পরিণত বয়সে সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। তাঁর পুত্র শ্রীভূপতি মোহন সেন বিখ্যাত গণিতজ্ঞ; তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা এবং শেষ অবধি কিছুকাল অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ্যতার সঙ্গে কার্য পরিচালনা করে অবসর গ্রহণ করেছেন।

ছেলেবেলায় নিখিলরঞ্জন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন—সেখানে তাঁর সহপাঠী ছিলেন শ্রীমেঘনাদ সাহা। স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার অপরাধে (!) এঁদের এই স্কুল ছাড়তে হয়। নবম শ্রেণী থেকে তিনি রাজসাহীতে খুল্লতাত রাজমোহন সেনের কাছে থেকে পড়াশুনা করতেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজসাহী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী কলেজ থেকে আই এস্-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে গণিতে অনার্স নিয়ে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এস সি পড়বার সময় তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীমেঘনাদ সাহা, শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সরকার। ইঁহারা সকলেই পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞানী হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। সেই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপকদের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গণিতে ছিলেন অধ্যাপক সি. ই. কালিস্ (C. E. Cullis), পদার্থ-বিদ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও রসায়নে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। যেমন ছাত্রের দল তেমনই অধ্যাপক-গোষ্ঠী—একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি এস্‌সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ উত্তীর্ণ হয়ে নিখিলরঞ্জন মিশ্রগণিতে (Mixed Mathematics যার বর্তমান নাম ফলিতগণিত বা Applied Mathematics) এম. এস্-সি ক্লাসে প্রবেশ করেন। এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন তাঁর গণিত অনার্স-এর দুইজন বিশিষ্ট সহপাঠী শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং শ্রীমেঘনাদ সাহা। অসুস্থতার জন্য তিনি স্বাভাবিক সময়ে পরীক্ষা দিতে পারেন নি—১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এম এস্-সি পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে।

এই সময়ে স্যার আশুতোষ স্যার তারকনাথ পালিতের ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানের উপর নির্ভর করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে মিশ্র গণিতের ক্লাস শুরু হলো। তখন ঐ বিভাগে স্যার রাস-বিহারী ঘোষ অধ্যাপক ছিলেন ডঃ গণেশপ্রসাদ। নিখিলরঞ্জন সেই বিভাগে শিক্ষকরূপে যোগদান করেন ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি জলবলবিদ্যা (Hydro-mechanics) পড়াতে শুরু করেন। তাঁর প্রথম ছাত্রদলের একজনের কাছে শুনেছি যে, তাঁরা নবীন শিক্ষককে একটু ব্যতিব্যস্ত করবার জন্য নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেন নি; কেননা নিখিলরঞ্জন পড়ানোর বিষয়ে খুব ভাল-ভাবেই প্রস্তুত হয়ে আসতেন। সারা জীবনই তিনি এইরূপ যত্ন সহকারে অধ্যাপনা করেছেন। একবার তাঁর এক ছাত্র এক কলেজে অধ্যাপকের পদ পেয়ে অধ্যাপনা সম্বন্ধে তাঁর পরামর্শ চান। নিখিলরঞ্জন তাঁকে বলেন "দেখ ক্লাসে যা পড়াবে সে সম্বন্ধে আগে নিশ্চিত হয়ে নেবে তা যেন তোমার নিজের কাছে জলের মতন পরিষ্কার হয় এবং যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ ঐ বিষয় পড়াতে যেও না;

যা নিজের কাছেই পরিষ্কার নয় তা অপরকে পরিষ্কার করে বলা যায় না।" এই সময়ে তিনি তাঁর গবেষণার কাজ শুরু করেন—গবেষণার বিষয় ছিল বিভবতত্ত্ব (Potential Theory) এবং জলগতিবিদ্যা (Hydrodynamics)। তিনি গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি ও ডি. এস. সি. উপাধি লাভ করেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি জার্মানি যান এবং বেলিন (Berlin) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি অধ্যাপক ম্যাক্স প্লাংক (Max Planck), অধ্যাপক আলবার্ট আইনষ্টাইন (Albert Einstein) এবং অধ্যাপক ম্যাক্স ফন্ লাউএর (Max von Laue) নিকট অধ্যয়ন করেন তিনি অধ্যাপক ফন্ লাউএর অধীনে আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী (Dr. Phil. Nat.) পান। বেলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকার সময় তিনি মিউনিকে অধ্যাপক আর্নল্ট জমারফেল্টের (Arnold Sommerfeld) কাছেও পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি জমারফেল্টের শিক্ষাদানে বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। কোন বিষয় খুব কঠিন ভাবে লেখা থাকলে তিনি বলতেন—"যদি অধ্যাপক জমারফেল্ট এই বিষয়টি পড়াতেন বা এবিষয়ে লিখতেন তা হলে এটা আর এত কঠিন থাকত না।" তিনি বেলিনে অধ্যাপক কারাথিওডোরির (Caratheodory) কিছু বক্তৃতায়ও যোগ দিয়েছিলেন। ওখানে ডক্টরেট ডিগ্রী পাবার পর তিনি বেলিনের একটি মানমন্দিরে কিছুকাল শিক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক আর. ফন্ মিজেস্ (R. von Mises) এর নিকট গাণিতিক সম্ভাব্যতা (Mathematical Probability), অধ্যাপক ই. শ্মিটের (E. Schmidt—যিনি Hilbert-Schmidt Theory of Integral Equations এর জন্য বিশ্ববিখ্যাত) নিকট 'টপোলজি' (Topology) অধ্যয়ন করেন। তাঁর বিশুদ্ধ গণিত (Pure Mathematics) এর উপর সারাজীবনই বিশেষ আগ্রহ ছিল।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে নিখিলরঞ্জন দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত-গণিতের স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান হন। নিখিলরঞ্জন এই পদে প্রায় ৩৫ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাংলা দেশে তথা ভারতে ফলিতগণিতের চর্চার বিকাশ সাধনে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি গণিতের একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁর অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ফলিত গণিতের বিভিন্ন শাখায় গবেষণা করেছেন। নিখিলরঞ্জন নিজে গবেষণা করেছেন আপেক্ষিকতাবাদে (Theory of Relativity), মহাবিশ্বের আকার (Cosmology) সম্বন্ধে, জ্যোতিঃপদার্থ বিদ্যায় (Astrophysics), দ্রবগতিবিদ্যায় (Fluid Dynamics), কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় (Quantum Mechanics)—বিভবতত্ত্বের (Potential Theory) কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি এই বিষয়গুলিতে ও ব্যালিষ্টিক্স (Ballistics) ম্যাগ্নেটোহাইড্রোডিনামিক্স (Magneto-hydrodynamics), প্ল্যাজমা ফিজিক্স (Plasma Physics) প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদের গবেষণায় পরিচালিত করতেন। তাঁর পরিচালনায় লরেন্টস্ রূপান্তর (Lorentz transformation) মহাকর্ষ (Gravitation), আপেক্ষিকতাবাদীয় তাপগতি বিদ্যা (Relativistic Thermodynamics), বিস্তারশীল বিশ্ব (Expanding Universe), ঊর্মিজ রোধ (Wave Resistance), উদ্দামতা (Turbulence), তারকার গঠন, (Stellar Structure), তারকার বহিরাবরণ (Stellar Envelope), তারকার বিস্ফোরণ (Explosion), আভ্যন্তরীণ ব্যালিষ্টিক্স (কামান বন্দুকের নলের গোলার গতি), চুম্বকধর্মী ও সাধারণ দ্রবের বর্তুলের আবর্তনজ ভারসাম্য প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা হয়েছে।

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত গণিত শিক্ষায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করেন যা এখন সারা ভারতে অনুসৃত হচ্ছে। তিনি যখন ছাত্র ছিলেন তখন মিশ্র গণিত বিভাগে আধুনিক গাণিতিক পদার্থবিদ্যা (Modern Mathematical Physics) শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না—তিনি এই বিষয়ের বিভিন্ন শাখার শিক্ষার ও গবেষণার ব্যবস্থা করেন। সংখ্যাগত গাণিতিক বিশ্লেষণ (Numerical Mathematical Analysis) সম্পর্কিত তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রবর্তন তিনি করেন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কার্যকালের শেষ দিকে তিনি দ্রবগতিবিদ্যা পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষা দিবার ও গবেষণা করবার জন্য একটি পরীক্ষাগার গড়ে তুলতে ব্যাপৃত ছিলেন। বিজ্ঞানে অগ্রসর দেশগুলিতে এই বিষয়ে এইরূপভাবেই উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয়। তাঁর অবসর গ্রহণে এই প্রচেষ্টাটিতে মাঝ পথে ছেদ পড়ে আছে।

শুধু ফলিত গণিতে নয়, তিনি স্কুল কলেজের গণিত শিক্ষায়ও প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কর্মজীবনের শেষ দশকে তিনি গণিতের বোর্ড অব্ স্টাডিজ (Board of Studies in Mathematics) এর সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে তিনি স্কুল কলেজের গণিতের পাঠক্রমের প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেন। বর্তমান পাঠক্রম এই পরিবর্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে রচিত।

নূতন বিষয় শিক্ষার জন্য নিখিলরঞ্জন সর্বদা তরুণ শিক্ষার্থীর মত আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি ছাত্রদের বলতেন "আমাদের বৃদ্ধকালে যদি তোমরা আমাদের না শেখাও তবে কাদের কাছে শিখব" এবং এই সম্পর্কে অধ্যাপক জমারফেল্টের উদাহরণ দিতেন। তিনি যখন অধ্যাপক জমারফেল্টের অধীনে ছাত্র, তখন জমারফেল্ট আলোচনাচক্রে একটি নূতন বিষয় সম্বন্ধে তাঁকে বক্তৃতা করতে বল্লে নিখিলরঞ্জন বলেন "আমি তো জার্মান তত ভাল বলতে পারি না আমাকে বলতে না হলেই ভাল হয়।" এতে অধ্যাপক জমারফেল্ট তাঁর একটি হাংগেরীয় ছাত্রের উল্লেখ করে বলেন —"ঐ হাংগেরীয় ছাত্রটি অপেক্ষা তুমি জার্মান ভাল জান এবং তুমি বিষয়টিও ভাল ভাবে জান, কাজেই তোমাকে বলতেই হবে। বৃদ্ধ বয়সে যদি তোমরা আমাদের না শেখাও তবে কাদের কাছে শিখব।" অধ্যাপক জমারফেল্টের এই কথা তিনি সারাজীবন মনে রেখে কাজে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শিক্ষকের আদর্শ 'শিষ্যাৎ পরাজয়ম্' সর্বদাই সম্মুখে রেখেছিলেন। তাঁর পরিচালনাধীনে Physico-Mathematical Colloquium নামে আলোচনাসভা বসত প্রতি মঙ্গলবার। এটা বোধ হয় তিনি শুরু করেছিলেন ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে বা তার ২।১ বছর আগে এবং চালিয়েছিলেন অবসর গ্রহণ পর্যন্ত। এই সভায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত ফলিত-গণিতের নানা শাখার মৌলিক প্রবন্ধ আলোচিত হতো—এবং উপস্থিত সকলে, কি নবীন কি প্রবীণ, খোলাখুলি ভাবে নিজেদের মতামত আদান-প্রদান করতে পারতেন। নিখিলরঞ্জন বাড়ী গিয়ে অনেক সময় এই সব বক্তৃতার সারাংশ লিখতেন।

গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ফলিত গণিতের প্রণালীগুলির (methods) প্রভূত পরিবর্তন শুরু হয় এবং সেই পরিবর্তনের ধারা এখন সবেগে চলছে। নিখিলরঞ্জন তাঁর ছাত্রদের বল্তেন—"তোমরা এই সব নূতন প্রণালী শেখ, নচেৎ পিছনে পড়ে যাবে এবং কয়েক বছর পর ফলিত গণিতের আধুনিক গবেষণা বুঝতে পারবে না।" ছাত্রদের এই সব প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি একটি আলোচনাচক্রের (Seminar) ব্যবস্থা করেন প্রতি বৃহস্পতিবারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক অব্যবহিত পরেই ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে এবং এই ব্যবস্থা চলে তার অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত।

অধ্যাপক সেন আর একটি গুরুদায়িত্ব স্কন্ধে

নিয়েছিলেন—সেটি হলো কলিকাতা গণিত সমিতির (Calcutta Mathematical Society) পরিচালনা। স্যার আশুতোষ এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা —তাঁর মৃত্যুর পর এর পরিচালনা ক্রমশঃ এমন হতে থাকে যে, এটি প্রায় নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে। এমন সময় নিখিলরঞ্জন এর ভার নেন—তিনি ও তাঁর সহকর্মিদের প্রচেষ্টায় এটি আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সমিতির শুভ-চিন্তা করে গেছেন এবং তাঁর শেষ ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বইগুলি যেন কলিকাতা গণিত সমিতিকে দিয়ে দেওয়া হয়।

তিনি ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মে মাস থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর অবসর গ্রহণের পর ফলিত গণিত বিভাগে উপরে উল্লিখিত আলোচনাসভা ও আলোচনাচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটে—যদিও তাঁর প্রাক্তন ছাত্রেরা ঐ বিভাগের বাইরে বিভিন্ন স্থানে এইরূপ আলোচনা সভা ও চক্রে মিলিত হতেন ও এখনও হন। অবসর গ্রহণের কিছুদিন পূর্বে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন—এই অসুখই তাঁর শেষ অসুখের সূত্রপাত। সুস্থ হয়ে তিনি যাদবপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান অনুশীলন সমিতিতে (Indian Associaticn for Cultivation of Science) এ অবৈতনিক অধ্যাপক হন। তিনি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কর্ম-কল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এখানে তিনি আলোচনার জন্য ছাত্রদের সহিত প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ২।৩ দিন মিলিত হতেন।

ছাত্রেরা তাঁর জীবনের একটা বড় অংশ অধিকার করেছিল তাঁর সারাজীবন ধরে। তিনি আগে ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিতেন তারপরে নিজের দিকে এমন কি নিজের কাজের ক্ষতি পর্যন্ত করে।

গণিতচর্চা ছাড়াও নিখিলরঞ্জন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম হোতা ছিলেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন। বাংলাভাষায় লোকরঞ্জন বিজ্ঞান গ্রন্থও তিনি রচনা করে গেছেন। গত বছর তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি বক্তৃতা' প্রদান করেন। 'তারার কথা' শীর্ষক তাঁর এই বক্তৃতাটি পুস্তকাকারে প্রকাশের চেষ্টা চলছে।

অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের (Indian Science Congress) গণিত শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি কলিকাতা গণিত সমিতির, ভারতীয় সংখ্যায়ন সংস্থা (Indian Statistical Institute) বিশ্বভারতী, এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থা (National Institute of Sciences of India) এইসব প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন। তিনি প্রতিরক্ষাবিজ্ঞান পরীক্ষাগারের (Defence Science Laboratory) সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে ফলিত গণিতে এম এস্-সিতে ব্যালিস্টিক্স শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন ১৯৫১ খৃষ্টাব্দ থেকে। অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সায়েন্স কলেজ কাউন্সিলের সহ-সভাপতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্স ফ্যাকলটির ডীন হয়েছিলেন অবসর গ্রহণের কয়েক বছর আগে থেকে।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে নিখিলরঞ্জন বিখ্যাত কবি নবীনচন্দ্র সেনের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। গত ১৩ই জানুয়ারী তিনি শোকার্ত পত্নী, দুই পুত্র ও এক কন্যা এবং অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব রেখে পরলোক গমন করেছেন। অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন ছিলেন নীরব কর্মী, নিরহংকার মানুষ। তাঁর চরিত্র ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়েরই নিকট আদর্শ-স্থানীয়। তাঁর মত একজন আদর্শ শিক্ষক ও পথপ্রদর্শককে হারিয়ে আমরা নিজেদের অত্যন্ত নিঃস্ব বোধ করছি। বারবার মনে হচ্ছে গণিত বিষয়ের সমস্যা উপস্থিত হলে তার পরামর্শ আর পাব না। তাঁর তিরোধানে ভারতে গণিতচর্চার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো তা সহজে পূর্ণ হবার নয়।

মহাকাশ অভিযান

ডাঃ হোমার ই. নিওয়েল মহাকাশ অভিযান সম্বন্ধে লিখেছেন—পৃথিবী এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে এবং সেই যুগ হচ্ছে মহাকাশ যুগ। প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে যে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে তাতে বিশ্ববাসীর মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে, মহাকাশ যুগ এখন আর মানুষের কল্পনার মধ্যে নেই, তা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে।

মহাকাশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টায় সমগ্র বিশ্ববাসীর মধ্যে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং এর ফলাফল অর্থনীতি, বিজ্ঞান, যন্ত্র-বিজ্ঞান, শিক্ষা এবং মানব-কল্যাণের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে।

পৃথিবীর ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্র এখন আর নেই, তাই বিশ্ববাসী এক নতুন দিগন্তে দাঁড়িয়ে মহাকাশ অভিযানের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে এবং মানুষ তার মন, বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ও ইঞ্জিনীয়ারিং দক্ষতা কাজে লাগাবার চেষ্টা করছে।

মহাকাশে অভিযান পরিচালনায় মানুষের কর্মক্ষেত্র অতি বিস্তৃত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করা এবং যন্ত্র-বিজ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের কাজে লাগাবার জন্যে নব উদ্ভাবিত রকেট ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও কারিগরি বিদ্যার অগ্রগতির পরিণাম স্বরূপ মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা হয়।

বর্তমানে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ প্রভৃতির সহায়তায় চন্দ্র, সূর্য, তারা ও অন্যান্য গ্রহসহ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশে বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনার কাজ প্রসারিত করা সম্ভব হবে।

বর্তমানে পৃথিবীর বাইরে অন্যান্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান চলেছে। মহাকাশ অভিযানের কর্মসূচী প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যেও প্রবল চেষ্টা চলেছে। বর্তমানে জ্বালানী ও রাসায়নিক দ্রব্য, সৌরকিরণ, পরমাণু শক্তি এবং অন্যান্য শক্তির গুণাগুণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, নির্দেশ প্রেরণ, গ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন বাঁচিয়ে রাখবার উপকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে।

মহাকাশ অভিযানের অভিজ্ঞতা ও পদ্ধতি বর্তমানে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ এসেছে। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা কি ভাবে আবহাওয়ার সংবাদ-জ্ঞাপক ও বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় প্রয়োগ করা যেতে পারে, বর্তমানে তারই চেষ্টা চলছে। জাহাজ ও বিমান পরিচালনায় সাহায্যকারী কৃত্রিম উপগ্রহও মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ অভিযান পরিকল্পনায় মহাকাশে মনুষ্য প্রেরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। চন্দ্র এবং বিভিন্ন গ্রহে মানুষ প্রেরণের উদ্দেশ্যে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র মার্কারী পরিকল্পনায় মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করবে পৃথিবীর কাছাকাছি কক্ষপথে পরিভ্রমণের জন্যে। এই কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে জেমিনি পরিকল্পনায় আরও দূরের কক্ষপথে পরিভ্রমণ এবং তৃতীয় পর্যায়ে অ্যাপোলো পরিকল্পনায় চন্দ্রের চতুর্দিক প্রদক্ষিণের জন্যে মানুষ প্রেরণ করা হবে। চন্দ্রে মানুষ নামিয়ে দিয়ে পুনরায় তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা মহাকাশ কর্মসূচীর একটি প্রধান লক্ষ্য।

এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম, পৃথিবী ও তার বায়ুমণ্ডল, সূর্য এবং পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রভাব, জীবজগৎ এবং তার মূল ও প্রাকৃতিক নিয়ম সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাবে।

চীনামাটি, ধাতু, প্লাষ্টিক প্রভৃতি পদার্থ সম্পর্কে গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে এই সব শিল্পের প্রসার ও

ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। নতুন রকমের জ্বালানী, নতুন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন এবং শব্দ অপেক্ষাও দ্রুতগামী বিমানের মূল্য অনায়াসেই উপলব্ধি করা যেতে পারে।

পৃথিবীর প্রথম আন্তর্জাতিক কৃত্রিম উপগ্রহ ‘আরিয়েল’। এর মধ্যে রয়েছে বেতার-গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র। এক বছর ধরে এই উপগ্রহটি পৃথিবীতে তথ্যাদি প্রেরণ করতে পারবে। উপগ্রহটিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসিয়েছেন বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা। যুক্তরাষ্ট্রের ডেল্টা রকেটের সাহায্যে গত ২৬শে এপ্রিল (১৯৬২) ভার্জিনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ওয়ালপস্ দ্বীপ থেকে এটি নিক্ষিপ্ত হয়।

মহাকাশে চন্দ্রলোকের যাত্রীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে যন্ত্র-বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে, তার ফলাফল পৃথিবীবাসীর পক্ষেও কল্যাণকর হবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, মহাকাশ-যাত্রীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে যে বিশেষ ধরণের খাদ্য তৈরি করা হবে, তা খাদ্যসমস্যার সমাধানে সহায়তা করবে।

মহাকাশে বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে যন্ত্র-বিজ্ঞানের যে প্রভূত পরিমাণ উন্নতি হয়েছে, যাবতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে—রাস্তা নির্মাণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রসায়নশিল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদ

উন্নয়নের কাজে তা লাগানো যাবে। এর ফলে শ্রমশিল্পের উন্নতি হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারিত হবে, কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের চাহিদা বাড়বে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র সমৃদ্ধ হবে।

এটা পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে যে, মহাকাশ
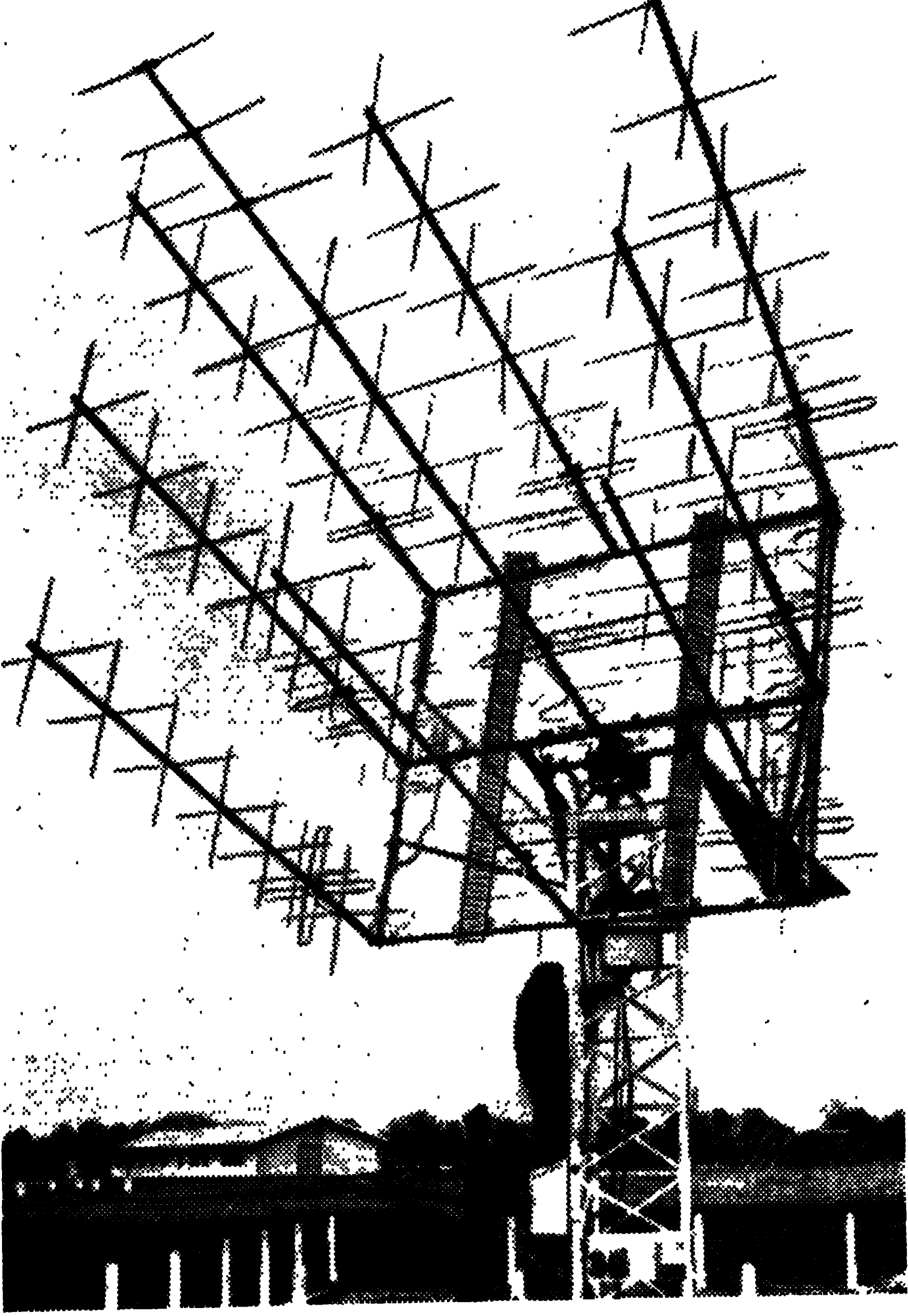
'আরিয়েল' নামক কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত সঙ্কেত ধরবার উদ্দেশ্যে এই বেতার সঙ্কেত-গ্রাহক অ্যান্টিনা যন্ত্রটি লণ্ডনের কাছাকাছি জায়গায় বসানো হচ্ছে।

অভিযানের বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও বাস্তব প্রয়োগ বিশ্ব সংস্থার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। মহাকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতে গিয়ে যে সব সমস্যা দেখা দেবে, সেগুলির সমাধানে যে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এবং অতি মূল্যবান—এই বিষয়টির প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের গুরুত্ব আরোপের মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মহাকাশ অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় এবং অভিযান পরিচালনায় কয়েকটি দেশ যে সহযোগিতা করেছে, তার মধ্যে মহাকাশ কর্মসূচীর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। মহাকাশ অভিযানের ভবিষ্যৎ

কেবল একটি মাত্র দেশের বৈজ্ঞানিকদের পরিবর্তে যদি বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য নেওয়া হয়, তাহলে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যাবে।

পরীক্ষামূলক রকেট মহাকাশে প্রেরণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি বর্তমানে কর্মসূচী প্রণয়ন করছে অথবা ইতিমধ্যেই করেছে।

আর্জেন্টিনা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, ক্যানাডা, ফ্রান্স, ভারতবর্ষ, ইজরাইল, ইটালী, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পাকিস্তান, সুইডেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্র।

ক্যানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ ও উর্ধ্বে প্রেরণের কর্মসূচীও আছে।

আমাদের এই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাকাশ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহযোগিতা পাওয়া গেছে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেরিত মহাকাশে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহের সন্ধান রাখবার কাজে বিভিন্ন দেশ সহযোগিতা করেছে। অনেক দেশ মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে নিজেদের এলাকায় সন্ধানী কেন্দ্র স্থাপন করতেও দিয়েছে এবং ঐ সব কেন্দ্র পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সহযোগিতা করছে।

সঞ্চয়ন

শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ইতিহাস

১লা জানুয়ারী ভারত সরকার শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনটির কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেছেন। এ-পর্যন্ত বাগানটি ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন। বৃহৎ বটবৃক্ষের জন্যে প্রসিদ্ধ এই জনপ্রিয় শিবপুর উদ্যানটিই ফুল ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণার কেন্দ্র। প্রায় দু'শ বছর যাবৎ এখানে বহু উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী উদ্ভিদ-জীবনের রহস্য সম্বন্ধে অক্লান্তভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এসেছেন।

শিবপুরের এই বাগানেই উদ্ভাবিত হয় ভারতের অর্থকরী সব গাছগাছড়া। পাট, চা, কফি প্রভৃতি অর্থকরী গাছগাছড়া এই উদ্যানেই প্রথম প্রবর্তিত হয়।

এই বাগানেই ডাঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ প্রথম পাট উৎপাদন করেন এবং ১০০ টন পাট ইউরোপের বাজারে রপ্তানী করেন। ভারতে কার্পাস, রবার, আলু, ইক্ষু ও অন্যান্য বহু অর্থকরী শস্যের উন্নয়ন সাধিত হয় এই ঐতিহাসিক উদ্যানে।

২৭৩ একর বিস্তৃত এই উদ্যান স্থাপিত হয় ১৭৮৭ সালে। আজ এই বাগানে আছে পৃথিবীর প্রত্যন্ত সব প্রদেশের ১২,০০০ রকমের গাছ-গাছড়া। ভারতের বিভিন্ন বাগানে আজ যে সব মনোহারী গাছগাছড়া আর ফুল দেখা যায়, তাদের সবার আদিভূমি শিবপুরের ঐ উদ্যান। স্বর্গতঃ সার জোসেফ হুকারের মতে—শিবপুরের এই বাগান পৃথিবীর অন্য যে কোন বাগানের তুলনায় উপযোগী আর সুন্দর গাছগাছড়া উদ্ভাবনের ব্যাপারে বেশী কাজ দিয়েছে।

হাজার হাজার মানুষ দেশ-বিদেশ থেকে আসেন ঐ বাগান দেখতে। এই বাগানের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—বিরাট বট গাছটি। বয়স তার দু'শ বছরেরও বেশী। গাছটি আজও সম্পূর্ণ সতেজ আছে। আজও তার শাখায় শাখায় গজায় নতুন পাতা। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো—গাছটির গুঁড়ি আর নেই। ১৯২৫ সালেই তা নষ্ট হয়ে যায়। উপর থেকে যে ঝুরি নেমে এসেছে, তার উপর দিব্যি টিকে আছে সে। গাছটিকে আর গাছ মনে হয় না—মনে হয় এক সম্পূর্ণ অরণ্য। পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম এই

বটের ঝুরির সংখ্যা প্রায় হাজার খানেক—বিস্তৃতি তার ১৩০০ ফুট স্থানে। শিবপুর বাগানের অন্যতম আকর্ষণ হলো তার পাম হাউস, অর্কিড হাউস, ফার্ণারি, ক্যাক্টি, পাইন শ্রেণী, বাঁশের কেল্লা আর ওয়াটার লিলি।

এই বিরাট ওয়াটার লিলি ১৮৮৭ সালে অ্যামাজন থেকে নিয়ে আসা হয়। আজও তার শোভা এতটুকু ক্ষুন্ন হয় নি।

গাছগাছড়া সম্পর্কে জানবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিদিনই বাগান কর্তৃপক্ষের নিকট নানা রকম প্রশ্ন আসে। বাগানের গ্রন্থাগারটিও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বহু প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র, নমুনা, অ্যালবাম ছাড়াও প্রায় ৩০ হাজার বই আছে।

বাগানের মধ্যে দুটি নার্শারী আছে। নার্শারী দুটিতে পাতাবাহার, রঙবেরঙের ফুলগাছ ও মরসুমী ফুল গাছের কাজ হয়। নার্শারীতে অর্কিডের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে দেশে প্রায়ই আবহাওয়ার গোলযোগ দেখা দিত। শস্যের অভাবের ফলে ভারতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। তখন কোম্পানীর সেনা-অফিসার ছিলেন কর্ণেল রবার্ট কীড। তাঁর প্রস্তাবেই খাদ্যশস্য ও কোম্পানী যে সব মসলার ব্যবসা করতো, সেগুলি উৎপাদনের জন্য একটি নার্শারী সংস্থাপিত হয়।

প্রথমে সুরু হয় পারস্যের খেজুর, চেরি, কমলা-লেবু, চন্দনগাছ ও সেগুনের চাষ। সেই থেকেই সুরু হলো প্রাচ্যের বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন।

ভারতের উদ্ভিদবিদেরা যেমন এই উদ্যানের কাছে কৃতজ্ঞ, তেমনই কৃতজ্ঞ শত শত সাধারণ মানুষ। ম্যালেরিয়ার ওষুধ—কুইনাইন উৎপাদনে সিঙ্কোনা অত্যাবশ্যক। এই সিঙ্কোনার চাস সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় শিবপুরের এই বাগানে।

ভারত থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করবার কাজে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের অবদান অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর উৎস সম্পর্কে তথ্য-সন্ধানী মহোল পরিকল্পনা

মহাসমুদ্রের তলায় কয়েক মাইল নীচে যে কি রয়েছে, তা আমরা যতটুকু জানি, তার চেয়ে অনেক বেশী জানি চন্দ্র সম্পর্কে—যদিও সেই চন্দ্র রয়েছে পৃথিবী থেকে ২৪০০০০ মাইল দূরে। এই পৃথিবী সম্পর্কে আমাদের যতটুকু জ্ঞান হয়েছে, তার বেশীর ভাগই আমরা অপ্রত্যক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতেই আহরণ করেছি। ভূকম্পবিদ্যা, ভূবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রত্নজীববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাহায্যে এই জ্ঞান আহরিত হয়েছে। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সূত্রে পাওয়া নানারকম তথ্য মিলিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের আকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া হয়েছে মাত্র। বর্তমানে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে, তাতে জানা যায়—এই অভ্যন্তর ভাগ চারটি সুস্পষ্ট স্তরে বিভক্ত। পৃথিবীর সকলের উপরের স্তরের গড়পড়তা গভীরতা ১০ মাইল। স্থলভাগের তুলনায় জলভাগে সমুদ্রের তলায় এই গভীরতা অপেক্ষাকৃত অল্প। এর নীচের স্তরকে বলা হয় ম্যানটেল। এর গভীরতা ১৮০০ মাইল। এই স্তর কঠিন পাথরে নির্মিত। এর পরের স্তরের গভীরতা ১৩৬০ মাইল। এই স্তরটি গলিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ। একেবারে মধ্যভাগটি কঠিন দ্রব্যে পূর্ণ। এর ব্যাস হচ্ছে ৮১৫ মাইল।

পৃথিবীর একেবারে উপরের স্তর ও তার নীচের স্তর ম্যানটেলের মাঝখানের স্থানটিকে বলা হয় মহোল। যুগোস্লাভিয়ার বিজ্ঞানী অধ্যাপক এ. মোহোরোভিসিরের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। ভূকম্পনের ছেদ রেখা এই খানেই—একথা

তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। তার কারণ, এই দুটি স্তরের গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। সমুদ্রের তলায় প্রাথমিক স্তরের গভীরতা কোন কোন স্থানে মাত্র তিন থেকে চার মাইল পর্যন্ত। সমুদ্রের তলদেশের এই তিন-চার মাইল স্তর ভেদ করে ম্যানটেল স্তর পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খনন করে ঐ স্তরের উপাদান সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ম্যানটেল স্তর থেকে সংগৃহীত উপাদান-সমূহ এই পৃথিবীর সমুদ্র সম্পর্কে বহু তথ্যের সন্ধান দিবে, এই ছিল ধারণা। এটাই মহোল পরিকল্পনা। সমুদ্রগর্ভ থেকে সুড়ঙ্গ খনন সম্ভব কি না, সে সম্পর্কে ১৯৬১ সালে পরীক্ষা করে দেখা হয় এবং এই প্রাথমিক পরীক্ষায় সমুদ্রগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন যে সম্ভব, তা প্রকাশিত হয়। এজন্যে একটি বিশেষ ধরণের জাহাজ নিয়োগ করা হয়। এই জাহাজের সাহায্যে ক্যালিফোর্ণিয়ার লাজোলার কিছু দূরে সমুদ্রতল থেকে ১০৩৫ ফুট নীচ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। সেখানে জলের গভীরতা ছিল ৩০০০ ফুট। এছাড়া মেক্সিকোর গুয়াডেলুপ থেকেও কিছুটা দূরে সমুদ্রগর্ভের ৬০১ ফুট নীচ পর্যন্ত গর্ত খনন করা হয়। এখানে জলের গভীরতা ছিল ১১,৭০০ ফুট।

এই পরীক্ষায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান পাওয়ায় আমেরিকার ন্যাশন্যাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশন টেক্সাসের একটি কোম্পানীর সঙ্গে এই কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্যে একটি নতুন চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

এই ফাউণ্ডেশনই মহোল পরিকল্পনা রূপায়ণে অর্থ-সাহায্য দিচ্ছেন। এতে খরচ হবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার থেকে ৫ কোটি ডলার। ফাউণ্ডেশনের ডিরেক্টর ডাঃ অ্যালান টি. ওয়াটারম্যান এই নতুন পরিকল্পনাটিকে অভিনন্দিত করেছেন। তবে কোথায় যে সুড়ঙ্গ খনন করা হবে, তা এখনও স্থির হয় নি। এই কাজ সম্পন্ন করতে তিন থেকে সাত বছর লাগবে। সমুদ্রের তিন মাইল গভীরে সমুদ্রতল থেকে তিন মাইল নীচ পর্যন্ত এই সুড়ঙ্গ খনন করা হবে।

এই পর্যন্ত যে সব তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, তাতে পৃথিবী ও সৌরমণ্ডলীর উৎস যে কোথায়, সে বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তবে মানুষ চন্দ্র উপগ্রহে গিয়েও এই উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এই সব তথ্য পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ স্তরসমূহ এবং পৃথিবী ও সমুদ্রসমূহের বয়স সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। জীবন এবং বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কেও নতুন তথ্যের সন্ধান দিবে।

নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নিয়েই ম্যানটেল স্তর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ খননের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর কঠিন স্তর এবং ম্যানটেল স্তরের বিভিন্ন কঠিন প্রস্তরের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এই সব পদার্থের ধাতব গঠন-প্রণালী, তেজস্ক্রিয়-তার পরিমাণ, তাপ-বৈদ্যুতিক ও বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা সহ রাসায়নিক ও ভৌত বিশ্লেষণের জন্যেই এই সব নমুনা সংগ্রহ করা হবে। উপরি-ভাগের প্রস্তরের ঘনত্ব সঠিকভাবে জানা গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত পদার্থসমূহের ঘনত্ব জানবার পথ প্রশস্ত হবে।

পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত কোন একটি উপাদানের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ জানা গেলে—পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে আসছে কি না—সে বিষয়ে এবং সমুদ্রের তলদেশের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহ সম্পর্কেও কিছু বলা যেতে পারে।

মহোল পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্যে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে। ন্যাশন্যাল একাডেমি অব সায়েন্স কর্তৃক নিযুক্ত এই বিশেষ কমিটির পক্ষ থেকে উইলার্ড ব্যাসকম এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকেন। মিঃ ব্যাসকম এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ম্যানটেল স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো মহোল পরিকল্পনার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলেও এর ফলে একটি মধ্যবর্তী স্তর সম্পর্কে সমপরিমাণ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। এই স্তর সমুদ্রের তলদেশের পলি নিয়ে গঠিত। এই পলি বা তলানি কি হারে যে সমুদ্রের তলদেশে এসে জমা হয়, বিজ্ঞানীরা তার হদিস আজও করতে পারেন নি। অনেকের ধারণা, সমুদ্রের তলদেশের পলি দিয়ে গঠিত প্রথম কঠিন স্তরটি গড়ে আধ কিলোমিটার পুরু। আবার অনেকের এই রকমও ধারণা যে, প্রতি হাজার বছরে সেখানে গড়ে ১ সেন্টিমিটার তলানি এসে জমে। এই ধারণা ঠিক হলে তাঁদের মতানুসারে এই স্তরটি গঠিত হতে লেগেছে মাত্র কয়েক কোটি বছর। কিন্তু কোন কোন সমুদ্র আছে, যাদের বয়স কয়েক শত কোটিরও বেশী। সুতরাং বিজ্ঞানীরা প্রথম স্তরটি গঠিত হতে কি ৬ থেকে ১০ কোটি বছর লেগেছে—এই প্রশ্ন করে থাকেন।

আর একটি বিষয়ের জন্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সমুদ্রগর্ভের আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি সুড়ঙ্গ খননের মাধ্যমে যে সব উপাদান সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে দশকোটি বছরের বেশী পুরনো কোন প্রস্তরখণ্ড সংগৃহীত হয় নি। সেখানে পলি দিয়ে গঠিত প্রথম স্তরের উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায় নি। আবার অন্যদিকে মহাদেশের কোন কোন অঞ্চল, যা এক সময়ে সমুদ্রতলে ছিল—সেখানে পলি দিয়ে গঠিত আরও প্রাচীন কঠিন প্রস্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

অর্থাৎ কত বছরে কি হারে পলি সমুদ্রের তলায় জমা হয়েছে—সে বিষয়ে যে অনুমান করা হয়েছে, তার মধ্যেই কি ভুল রয়েছে? অথবা ১০ কোটি বছর আগে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প প্রভৃতির ফলে সমুদ্রের তলদেশের কি সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে গেছে? বিজ্ঞানীদের মনে এসব প্রশ্ন উঠেছে। সমুদ্রের তলদেশ যত প্রাচীন বলে অনুমান করা হয়েছে, তত প্রাচীন কিনা সে সম্পর্কে তাঁদের মনে সন্দেহ জেগেছে।

সমুদ্রতল থেকে সংগৃহীত জীবাশ্মসমূহ সমুদ্র ও পৃথিবীর প্রাণিজগতের বিবর্তনের ইতিহাসের ছিন্ন সূত্রের সন্ধান দিয়ে এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ও ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় সাহায্য করবে। এই জীবাশ্মের মাধ্যমে কেবল প্রাণীর আবির্ভাবের সময়ই নয়, এদের সুদূর অতীতের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা যাবে। এছাড়া সমুদ্রতলের জীবাণু, ছত্রাক, অ্যালগি, অ্যামিনো অ্যাসিড এবং অন্যান্য জৈব যৌগিক পদার্থ—অতীতের প্রাণী এবং যে অবস্থায় এই পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব হয়েছিল, এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে সে বিষয়ে বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের অভিনব ব্যবস্থা

বর্তমানে মহাকাশযানে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের এক অভিনব ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় সূর্যের আলোককে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা হয়। আমেরিকার জেনারেল ডিনামিক্স কর্পোরেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান এই অভিনব পরিকল্পনাকে কার্যক্ষেত্রে রূপদান করেছেন এবং তাঁরা এজন্যে নতুন ধরণের এক প্রকার তাপ-বৈদ্যুতিক সেল বা কোষ তৈরী করেছেন।

বর্তমানে এজন্যে সিলিকন সেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নতুন ধরণের সেলের তুলনায় ওগুলি অনেক ভারী এবং ওগুলি নির্মাণে খরচও বেশী পড়ে। তাছাড়া ভ্যান অ্যালেন বলয় থেকে সকল স্থানেরই তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে সিলিকন সেল অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়।

কতকগুলি অর্ধপরিবাহী উপকরণ দিয়ে এসব অতিক্ষুদ্র তাপ-বৈদ্যুতিক বা থার্মো-ইলেকট্রিক সেল গঠিত।

অতি পাতলা দুটি ধাতব পাতের দ্বারা তৈরী

ইহা খুবই কার্যকরী হইবে বলিয়া মার্কিন বন বিভাগের কর্মচারীরা জানাইয়াছেন। বর্তমানে এই ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের ব্যাপারে যে সকল অগ্রগতি হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা ইহার ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা সম্পর্কে খুবই আশা পোষণ করিতেছেন।

বোমা বর্ষণের ফলে যে আগুন লাগিয়া থাকে, তাহা ট্যাঙ্ক বিমানের সাহায্যে নির্বাপন করা হয়। কিন্তু এই জন্য ইহাদের ধোঁয়ার মধ্যে খুব নীচু দিয়া উড়িয়া যাইতে হয়। রাত্রিতে এবং প্রচণ্ড বাতাস থাকিলে তাহারা অগ্রসর হইতে পারে না। ধোঁয়ার মধ্যে ভূপৃষ্ঠের অতি নিকট দিয়া উড়িয়া যাওয়া এই সকল বিমানের পক্ষে বিপজ্জনক।

কিন্তু এই নূতন ধরণের ক্ষেপণাস্ত্র ঘটনাস্থলের তিন হাজার ফুট উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষেপ করা যাইবে বলিয়া এই সকল বিমানে উল্লিখিত বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

অস্থিরোগ চিকিৎসায় অ্যাসপিরিন

“প্যাজেট ডিজিজ” বা প্যাজেট রোগ হচ্ছে মানবদেহের অস্থি-র রোগ। ১৮৭৬ সালে বৃটিশ সার্জেন সার জেমস প্যাজেট এই রোগ আবিষ্কার করেন। এই রোগে কোন কোন সময়ে মানুষের হাত-পা বেঁকে যায় এবং মাথার খুলি, শিরদাঁড়া ও শ্রোণীচক্রে এই রোগ দেখা দেয়। এই রোগ থেকে অস্থি-র ক্যান্সারও হতে পারে। কিছুকাল পূর্ব পর্যন্তও এই রোগের চিকিৎসার উপযোগী ভেষজ আবিষ্কৃত হয় নি। এই রোগের চিকিৎসায় কর্টিসোন নামে ঔষধটি প্রয়োগ করে কিছুটা ফল পাওয়া গেলেও সুস্থ অস্থিকলার পক্ষে এই ঔষধটি ক্ষতিকর। তখন কর্টিসোনের স্থলে অ্যাস্পিরিন প্রয়োগের প্রস্তাব করা হলো। কর্টিসোনের গুণাগুণের দিক থেকে অ্যাস্পিরিনের খুবই সাদৃশ্য আছে। তবে অ্যাস্পিরিন অস্থিকলা বা বোন-টিসুর পক্ষে ক্ষতিকর নয়।

আমেরিকার নিউজার্সি সিটন হলের ডাঃ ফিলিপ হেনিম্যান ও ডাঃ পিটার মরিস এই রোগে বিভিন্ন মাত্রায় অ্যাস্পিরিন প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পান। দেখা গেল, এই ওষুধে রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

সাধারণতঃ জ্বর ও শিরঃপীড়ায় অ্যাস্পিরিনের ব্যবহার বহুকাল থেকেই চলে আসছে। সাধারণ শিরঃপীড়ায় ব্যবহৃত এই ওষুধটি অস্থি-র এই রোগে এক এক মাত্রায় ১২ থেকে ১৬টি বড়ি দেওয়া হয়। এই মাত্রায় এই ওষুধ কেবলমাত্র ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন অনুযায়ীই দেওয়া যেতে পারে বলে ডাঃ হেনিম্যান ও মরিস সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁরা দু-জন রোগীর মাথার খুলি অপারেশন করে দেখেছেন, খুলির যে অংশ প্যাজেট রোগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, সেখানে নূতন অস্থিকলা গজিয়েছে।

প্যাজেট রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় করবার সন্ধান দিয়েছেন বলে ডাঃ হেনিম্যান ও ডাঃ মরিস দাবী করেন না। তবে তাঁরা বলেছেন যে, অ্যাস্পিরিনের দ্বারা এই রোগ নিরাময়ে সাহায্য করা যেতে পারে। তাঁরা এ বিষয়ে আরও গবেষণা চালিয়ে যাবেন।

অ্যাস্পিরিন হচ্ছে অ্যাসিটিল স্যালিসিলিক অ্যাসিডের সংক্ষিপ্ত নাম। এতে আছে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—সাদা, গন্ধহীন কেলাসিত চূর্ণ।

প্রাচীনকালে উইলো গাছের ছালের রস জ্বরের রোগীকে দেওয়া হতো। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে উইলো গাছের নাম হচ্ছে স্যালিক্স। ঐ স্যালিক্স থেকে প্রস্তুত ভেষজসমূহকে বলা হয় সেলিসিলেট ড্রাগ্‌স্—অ্যাস্পিরিন এদেরই অন্যতম। অন্যান্য সেলিসিলেট জাতীয় ভেষজে যে রকম আন্ত্রিক গোলযোগ হয়ে থাকে, অ্যাস্পিরিনে তেমন হয় না। কারণ এটি পাকস্থলীতে অপরিবর্তিতই থাকে, কিন্তু অন্ত্রে সেলিসিলেট অ্যাসিড মুক্ত করে দেয়। অ্যাস্পিরিনের

বড়ি জলে সামান্য দ্রবণীয়। কিন্তু অ্যালকোহল, ইথার অথবা ক্লোরোফর্মে এটা সম্পূর্ণ দ্রবণীয়। ১৯০০ সাল থেকে বহু দেশেই এই ওষুধটি ব্যবহার করা হচ্ছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, বাতজ্বর, গেটেবাত, সর্দি এবং গলার ক্ষতে অ্যাস্‌পিরিন প্রয়োগ করা হয়।

কুমেরু-সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে অনুসন্ধান

দুইজন বৃটিশ ফ্রগম্যান বৃটেনের গবেষণা জাহাজ "শ্যাকলটনে" কুমেরুর তুষার-সমুদ্রের গভীরতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য বাহির হইয়াছেন।

এই দুইজন ফ্রগম্যান হইলেন ২৪ বৎসর বয়স্ক প্রাণিতত্ত্ববিদ পিটার রেডফিয়ার্ন ও চার্লস লে ফুভর। তাঁহারা অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে বৃটিশ অ্যান্টারক্টিক সার্ভের ঘাঁটিগুলি পরিদর্শনের জন্য "শ্যাকল্‌টন"-এ করিয়া ১৩ জন বিজ্ঞানী এবং কারিগর সঙ্গে লইয়া যাত্রা করেন।

মিঃ রেডফিয়ার্ন ও মিঃ লে ফুভর দক্ষিণ অর্কনি দ্বীপপুঞ্জের সিগ্‌নি দ্বীপে অবস্থিত সার্ভের ঘাঁটিটিতে অবস্থান করিবেন। এখানেই গত বৎসর জীব ও উদ্ভিদের জীবন সম্পর্কে বিশেষ অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ হয়। সিগ্‌নি দ্বীপটির গুরুত্ব এই যে, ইহা এমন এক এলাকায় অবস্থিত, যেখানে কুমেরু মহাদেশের তুষার-সমুদ্রের জল এবং দক্ষিণ আটলান্টিকের উষ্ণতর প্রবাহ আসিয়া মিশিয়াছে।

গত বৎসর পর্যন্ত 'বৃটিশ অ্যান্টারক্টিক সার্ভে' দ্বীপের উপর একটি আবহ-কেন্দ্র পরিচালনা করিয়া আসেন। ইহার পর হইতে সার্ভের সদস্যগণ জীবের সহিত তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা (Ecology) পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। ইহার ফলে সিগ্‌নি দ্বীপ ক্রমশঃ কোল্ড-ওয়েদার বায়োলজি সংক্রান্ত গবেষণার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিবে।

কুমেরু অঞ্চলে ব্যবহারোপযোগী সাধারণ পোষাক অপেক্ষা অধিক উষ্ণ "আর্দ্র" পোষাক ব্যবহার করিয়া ফ্রগম্যান দুইজন অগভীর জলের জীব ও উদ্ভিদ সম্প্রদায়ের বিভাগ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্ক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সক্ষম হইবেন। 'শ্যাকলটনে'র যাত্রীদের একটি ছোট দল দক্ষিণ জর্জিয়ার বার্ড দ্বীপে পক্ষিতত্ত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবেন।

বৃটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভে সার ভিভিয়ান ফুক্‌সের পরিচালনাধীনে বৃটিশ অ্যান্টার্কটিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এই সংস্থাটি বহুকাল ধরিয়া এই অঞ্চলে কাজ করিয়া আসিতেছে। ইহা ১৮ বৎসর ধরিয়া গ্র্যাহাম ল্যাণ্ডের মূল ভূখণ্ডে এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলিতে স্থায়ী ঘাঁটি পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। প্রায় চার বৎসর পূর্বে ইহা হালি বে-তে (কোটস্‌ল্যাণ্ড) অবস্থিত রয়েল সোসাইটির ঘাঁটিটির পরিচালন দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই ঘাঁটিগুলি সমগ্র অঞ্চলে যৌথ গবেষণার সুযোগ দিয়াছে এবং এই গবেষণায় আসিয়া যোগ দিয়াছে ১০টি জাতি এবং সকলেই কুমেরু চুক্তির উদ্দেশ্য অনুযায়ী তথ্যাদি বিনিময় করিতেছে।

বৃটিশ সার্ভের ঘাঁটিগুলিতে ৯০ হইতে ১০০ জন বিজ্ঞানী ও কারিগর কম করিয়াও দুই বৎসর ধরিয়া নিয়মিত গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ-কার্য চালাইয়া চলিয়াছেন এবং দক্ষিণ মহাদেশের গঠন-প্রকৃতি ও আবহাওয়া সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রকাশ করিতেছেন। উপরন্তু 'আর্থ ফিজিক্স'-এর ক্ষেত্রে সেখানে বহুবিধ পরীক্ষা চলিয়াছে এবং মেডিক্যাল অফিসারগণ 'হিউম্যান ফিজিও লজি' সম্পর্কে গবেষণা চালাইয়াছেন।

'শ্যাকল্‌টন' জাহাজটি (বিখ্যাত বৃটিশ অভিযাত্রীর নামানুসারে ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে) কুমেরু অঞ্চলের তুষার-সমুদ্রে চলাফেরার উপযোগী করিয়া বিশেষভাবে নির্মিত।

এক্স-রে প্লেট ১০,০০০ বার ব্যবহার করা সম্ভব

লণ্ডন, ২০শে ডিসেম্বর—বৃটিশের একটি উদ্ভাবন ক্যান্সার সার্জারি, রেডিওগ্রাফি, নিউক্লিওনিক্স ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

এই উদ্ভাবনটি 'ইমেজ রিটেনিং প্যানেল' (আই-আর-পি) নামে পরিচিত। ইহার উদ্ভাবক থর্ন ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড-এর মতে, সাম্প্রতিক কালের ইহা এক অতি চমকপ্রদ ইলেকট্রোকেমিক্যাল উদ্ভাবন।

আই-আর-পি হইল একটি ইলেকট্রনিক ফটো-গ্রাফিক প্লেট। ইহা আলো এবং অদৃশ্য বিকিরণ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সংবেদ্য এবং প্রতিটি প্লেট কম করিয়াও ১০,০০০ বার ব্যবহার করা সম্ভব। আশা করা যায়, ইহা এক্স-রে ফটোগ্রাফির ব্যয় লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস করিতে পারিবে এবং ক্যান্সার অপারেশনে বহু মূল্যবান সময় বাঁচাইতে পারিবে।

প্লেটটি মুহূর্তে কোন রকম ডেভেলপিং ছাড়াই দৃশ্যমান চিত্র দিতে পারিবে। ইহা ইস্পাতের আবণের দ্বায়া (coated steel) প্রস্তুত এবং থর্ন ইলেকট্রিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ গ্রুপের তিন জন বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফল। কোম্পানীর বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, মহাকাশ-যুগের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহার এক বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কোম্পানী ইতিমধ্যে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্লেট প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন এবং ১,০০০ প্লেট ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে।

পৃথিবী, শুক্র ও সূর্য থেকে মেরিনারের নিকটতম দূরত্ব

আমেরিকার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা শুক্রগ্রহ, সূর্য এবং পৃথিবী থেকে মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ মেরিনারের নিকটতম দূরত্ব সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য সরবরাহ করেছেন :

১৯৬২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর গ্রীনউইচ সময় রাত্রি ৭টা ৫৯ মিনিটে মেরিনার শুক্রগ্রহের সবচেয়ে কাছে এসেছিল। তখন মেরিনার ও শুক্রগ্রহের মধ্যে দূরত্ব ছিল ২২,১৩৭ মাইল। ২৮শে ডিসেম্বর ঐ উপগ্রহটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে আসে। তখন মেরিনার ও সূর্যের মধ্যে ব্যবধান ছিল ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ মাইল। ১৯৬৩ সালের ১০ই জুন মেরিনার সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে। তখনকার দূরত্ব হবে ১১,৩৮,১৩০০০ মাইল।

১৯৬৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর উপগ্রহটি পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে আসবে। তখন পৃথিবী ও মেরিনারের মধ্যে দূরত্ব হবে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ মাইল।

১৯৬৩ সালের ৩০শে মার্চ মেরিনার থাকবে পৃথিবী থেকে সবচেয়ে দূরে। তাদের মধ্যে ব্যবধান হবে ৯ কোটি ৮০ লক্ষ মাইলের।

মহাজাগতিক কণা সম্পর্কে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ

ষোড়শ এক্সপ্লোরার নামে আর একটি নতুন কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। মহা-জাগতিক কণা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাই এর উদ্দেশ্য। এই উপগ্রহের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এমন একটি মহাকাশযান নির্মাণের চেষ্টা করা হবে, যাতে কোন ফুটা হবে না। মহাজাগতিক কণার দিক থেকে মহাকাশযানের পক্ষে যে সব বিপদ আছে, তা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে পর্যালোচনা করা হবে। এসব কণার সংখ্যা এবং গতি নিরূপণ করা হবে। এই উপগ্রহটি ১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিটে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। পৃথিবী থেকে এর নিকটতম দূরত্ব হচ্ছে ৪৬৬ মাইল এবং সর্বাধিক দূরত্ব ৭৩৩ মাইল।

পুস্তক পরিচয়

আয়নোস্ফিয়ারের কথা ; লেখক—এফ. আই. চেস্তনভ। অনুবাদক—রবীন্দ্র মজুমদার। ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিঃ, ১২নং বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে মানুষের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা বহুদিন থেকেই চলে আসছে। প্রথম দিকে বায়ুমণ্ডলের নীচের দিক নিয়েই কাজ সুরু হয়। কারণ সেটাই অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। ক্রমে উপরের দিক সম্বন্ধেও কৌতূহল বাড়তে থাকে এবং সেখানকার রহস্যও উদ্ঘাটিত হয়। আয়নোস্ফিয়ার হলো উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের একটা অংশ। প্রধানতঃ সূর্য থেকে আগত নানা জাতীয় রশ্মি এই স্থানের বায়ুকণাগুলিকে আয়নায়িত করে, অর্থাৎ বিদ্যুৎকণায় রূপান্তরিত করে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, ভূপৃষ্ঠের উপর ৪০ মাইল থেকে ২৫০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বিদ্যুৎকণা দ্বারা গঠিত এই আয়নোস্ফিয়ার রয়েছে। আধুনিক যুগে আয়নোস্ফিয়ারের অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেতার যোগাযোগের জন্যে এটি একেবারে অপরিহার্য, আর বেতার ছাড়া আজকাল আমাদের একেবারেই চলে না। ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের যে সব বেতার-বার্তা দূর থেকে আমাদের কাছে আসে, সেগুলি সোজা পথে আসে না—আসে আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে। বস্তুতঃ আয়নোস্ফিয়ার না থাকলে দূর পাল্লায় বেতার যোগাযোগ একেবারেই অসম্ভব হতো।

মিঃ এফ. আই. চেস্তনভ রচিত ও শ্রীরবীন্দ্র মজুমদার অনূদিত 'আয়নোস্ফিয়ারের কথা' পুস্তকটিকে আয়নোস্ফিয়ার সংক্রান্ত সকল বিষয় অতি সুন্দর ও সহজভাবে বোঝানো হয়েছে। আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয়, এটা যা দিয়ে গঠিত, সেই আয়ন সম্বন্ধে। আয়ন কি ও কয় প্রকার, কি করে তাদের জন্ম হয় এবং আয়নোস্ফিয়ারে কি ভাবে তারা কয়েকটি স্তরে ভাগ হয়ে রয়েছে—এই নিয়েই বইটির আরম্ভ। এর পর গোধূলি-বেলার আলো, ঊষার আলো, রাত্রির আকাশের আলো, মেরুজ্যোতি, চৌম্বক ঝটিকা—এই সব প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও আয়নোস্ফিয়ারের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। সূর্য আয়নোস্ফিয়ারের অস্তিত্বের জন্যে প্রধানতঃ দায়ী। সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী রশ্মি ও রঞ্জেনরশ্মি উচ্চ বায়ুমণ্ডলকে আয়নায়িত করে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই সূর্যের নানারকম কার্যকলাপের কথা, আয়নোস্ফিয়ার কি ভাবে বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে, বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে প্রতিধ্বনি প্রণালীতে কি উপায়ে আয়নোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরের উচ্চতা ও অন্যান্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায়—ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া উল্কার পথচিহ্ন, সূর্য ও তারকা থেকে আগত বেতার-বার্তা ও মহাশূন্যে গবেষণাগার স্থাপনের সম্ভাবনার কথাও উল্লেখ আছে।

পুস্তকটি পড়লে আয়নোস্ফিয়ার ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বৈজ্ঞানিক সংবাদ পাওয়া যাবে। কোন বিষয় ব্যাখ্যা করতে হলে অনেক সময়েই আনুসঙ্গিক অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ঘটনার অবতারণা করতে হয়। এই পুস্তকটিতে সেই রকম ঘটনাগুলিকে আগে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে; ফলে বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বুঝতেও সাধারণ পাঠকের বিশেষ অসুবিধা হবে না। অনুবাদের ভাষা সুন্দর ও পরিষ্কার। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

আয়নোস্ফিয়ারের কথা ছাপা হয়েছে ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে। ১৯৫৭ সালের জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বৎসর পালন করা হয়। ঐ সময়েই একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাদের সাহায্যে ও আরও অন্যান্য উপায়ে সারা পৃথিবীব্যাপী একযোগে গবেষণাকার্য চালাবার ফলে আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আশা করা যায়, আলোচ্য পুস্তকটির পরবর্তী সংস্করণে সেই সব গুরুত্বপূর্ণ কথা আলোচনা করা হবে।

দীপক বসু

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

রামধনু

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবার পর থেকেই আমাদের অচেনাকে চেনবার ও অজানাকে জানবার কতই না ইচ্ছা হয়। তাই আমরা যখন কথা বলতে শিখি, তখন থেকেই যা দেখি, তা কি ও কেন—এইরকম নানা প্রশ্নে সকলকে বিব্রত করে তুলি।

আকাশের বুকে সূর্য, চন্দ্র, তারা, মেঘ, বিদ্যুৎ ও রামধনু—এমনি আরও কত কি দেখে আমরা বিস্মিত হই। রামধনুর কথাই বলি। বর্ষাকালে অনেক সময় আমরা রামধনু দেখে থাকি—এর রঙের খেলা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারি না। রামধনু তৈরী হয় সাতটি রং নিয়ে। ইংরেজীতে সংক্ষেপে রঙগুলিকে ভিবজিওর (VIBGYOR) বলা হয়। এর একদিকে আছে বেগুনী (Violet) ও অপরদিকে লাল (Red)। বেগুনী ও লালের মধ্যে আছে আর বাকী পাঁচটি রং—ইণ্ডিগো (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow) ও কমলালেবু (Orange) রং। কিন্তু সাধারণতঃ আমরা খালি চোখে এই সাতটি রঙের মধ্যে মাত্র তিন চারটি রং দেখতে পাই।

রামধনু সাধারণতঃ বর্ষাকালে সকালে কিংবা বিকালের দিকে কখনও কখনও আকাশে দেখা যায়। আকাশের যে দিকে সূর্য থাকে, সেদিকে যদি পিছন ফিরে দাঁড়াই, তাহলে আমাদের সামনে রামধনু দেখতে পাই। তাই লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আকাশের যেদিকে সূর্য থাকে, তার অপরদিকে রামধনুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর এই রামধনুর দুই প্রান্ত গিয়ে মেশে উত্তর ও দক্ষিণ দিগন্তে।

রামধনু কেন হয়—এই প্রশ্নই আমাদের মনে জাগে। বর্ষাকালে বাতাসের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ভেসে বেড়ায়। সূর্যের আলো যখন এই জলকণার মধ্যে প্রবেশ করে' বিচ্ছুরিত হয় তখনই সূর্যের আলো—যা এই সাতটি রং দিয়ে তৈরী—ভেঙ্গে গিয়ে রামধনুর সৃষ্টি হয়।

আকাশে আমরা যখন রামধনু দেখি, তখন কিন্তু আমরা সকলেই একটা নির্দিষ্ট

রামধনু দেখি না। প্রত্যেকে আমরা নিজেদের অবস্থিতি অনুসারে পৃথক পৃথক রামধনু দেখতে পাই। অথচ আমরা ভাবি, আমরা যেন একই রামধনু সকলে দেখছি।

রামধনু যে আমরা দেখি, তা কয়েকটা নিয়মের উপর নির্ভর করে। যে রামধনু দেখি, তা আমাদের চোখের সঙ্গে ৪১° ডিগ্রী কোণ করে থাকে এবং এর যে চাপ (arc) তৈরী হয়, তার বাইরের দিকে থাকে বেগুনী, আর চাপের ভিতরের দিকে থাকে লাল।

আকাশের বুকে সময় সময় পরপর দুটি রামধনু বা রেন্‌বো দেখা যায়। প্রথমটিকে প্রাইমারী, আর দ্বিতীয়টিকে আমরা সেকেণ্ডারী রেন্‌-বো বলে থাকি। প্রাইমারী রেন্‌বো সৃষ্টি হয় একবার প্রতিসরণের ফলে, আর সেকেণ্ডারী রেন্‌বো সৃষ্টি হয় দু-বার প্রতিসরণের ফলে। সেকেণ্ডারী রেন্‌বো আমাদের চোখের সঙ্গে ৫৩° ডিগ্রী কোণ করে থাকে। প্রাইমারী রেন্‌বোর চাপের বাইরের দিকে থাকে বেগুনী আর ভিতরের দিকে থাকে লাল। কিন্তু সেকেণ্ডারী রেন্‌বোর বেলায় চাপের বাইরের দিকে থাকে লাল, আর ভিতরের দিকে থাকে বেগুনী। সেকেণ্ডারী রেন্‌বো প্রাইমারী রেন্‌বোর মত অত স্পষ্ট দেখা যায় না।

একটু লক্ষ্য করে দেখলেই এগুলি দেখা যাবে। আরও আশ্চর্য — সূর্যের সাদা আলো থেকেই সৃষ্টি হয় এই বিচিত্র সাতটি রং।

শ্রীমতী শেফালি দত্ত

শ্রীনিবাস রামানুজন

গণিতজ্ঞ হিসাবে একজন দরিদ্র ভারতবাসীর নাম পৃথিবীতে আজ অমর হয়ে আছে, সে খবর সাধারণের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় রাখে না। যে অসামান্য প্রতিভাধর এভাবে ভারতের সুনাম বর্ধিত করেছেন, তাঁর নাম শ্রীনিবাস রামানুজন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ১৯২০ সালের ২৬শে এপ্রিল তাঁর যক্ষ্মারোগে প্রাণ বিয়োগ হয়।

বিশ্বের বিখ্যাত গাণিতিক মহল ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়তো তাঁর নাম অজানা থাকতে পারে—কিন্তু গাণিতিক ক্ষেত্রে রামানুজনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই উচ্চারিত হয়। তিনি অসামান্য প্রতিভাবান হিসাবেই সেখানে স্বীকৃত। গণিতশাস্ত্রে এক নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে রামানুজনের জন্যেই।

শ্রীনিবাস রামানুজন মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা কুম্বকোনামে একটি কাপড়ের দোকানে সামান্য কর্মচারী ছিলেন। রামানুজনের মাতা ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। বিবাহের কয়েক বছরের মধ্যে কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁর পিতা দেবতা নামাগিরির নিকট কন্যার জন্যে প্রার্থনা করেন।

এর পরেই তাঁদের প্রথম সন্তান রামানুজনের জন্ম হয়। তার জন্ম তারিখ ১৮৮৭ সালের ২২শে ডিসেম্বর।

রামানুজন পাঁচ বছর বয়সে প্রথম বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর সাত বছর বয়সে কুম্বকোনাম সহরের উচ্চ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। শৈশব কাল থেকেই রামানুজনের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অতি প্রখর এবং অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে একাকী বসে তিনি নানা চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকতেন। নানারকম অঙ্কের সূত্র তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁর আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে যেত। গণিতের নানা সূত্রের বর্গমূল দশমিক বিন্দু পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।

রামানুজনের পনেরো বছর বয়সের সময়ে তার এক বন্ধু তাঁকে একখানি বই এনে দেয়। বইখানির নাম কারের Synopsis of Pure Mathematics। এই বই-খানিই রামানুজনের জীবনে এক নতুন আলোর সন্ধান দেয়। এর সাহায্যেই যেন তাঁর সমগ্র প্রতিভা বিকশিত হতে আরম্ভ করে। এই বইখানি পাঠ করেই তিনি গণিতের নানাবিধ জটিল সূত্র আবিষ্কার করেন। অন্য কোন বই না থাকায় রামানুজন সমস্ত সূত্রই অদ্ভুত ক্ষমতার বলে মৌলিকতার সঙ্গে লিখতে থাকেন। নানা ধরণের চতুর্ভুজের সূত্র ছিল তাঁর এক নতুন আবিষ্কার। এরপর তিনি জ্যামিতির প্রতি আকৃষ্ট হন। জ্যামিতির পরে তিনি বীজগণিতের প্রতি মনযোগ দেন। নানারকম মৌলিক সূত্রের সাহায্যে এক্ষেত্রেও তিনি প্রশংসা অর্জন করেন।

রামানুজন বলতেন, স্বপ্নে ঈশ্বর তাঁকে বিভিন্ন সূত্রের মূল বলে দেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়, রামানুজন প্রায়ই ঘুমের শেষে স্বপ্নে প্রাপ্ত ঐ সব সূত্রের মূল লিখে রাখতেন। রামানুজনের সারাজীবন ধরেই এই ঘটনা ঘটেছে।

ষোল বছর বয়সে রামানুজন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি বৃত্তিও লাভ করেন। গণিতে পারদর্শী হলেও রামানুজনের ইংরেজীর জ্ঞান ছিল খুবই কম। এজন্যে পরবর্তী পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁর বৃত্তি বাতিল হয়ে যায়। এই সময় তিনি কুম্বকোনাম থেকে প্রথমে ভিজগাপত্তন ও পরে মাদ্রাজে গমন করেন। মাদ্রাজে তিনি কলা বিষয়ে পরীক্ষা দেন ১৯০৬ সালে, কিন্তু অকৃতকার্য হওয়ায় আর কোন চেষ্টা করেন নি। পরবর্তী কয়েক বছর ধরে তিনি গণিতের নানা বিষয়ে স্বাধীনভাবে গবেষণা করেন। ১৯০৯ সালে রামানুজন বিবাহ করেন। এই সময় থেকেই তাঁর প্রবল অর্থাভাব দেখা দেয়। ফলে উপার্জনের চেষ্টা করতে হয় তাঁকে। এই সময় কোন ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি নেলোরের দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাওয়ের একখানি সুপারিশ পত্র যোগাড় করেন।

রামচন্দ্র রাও স্বয়ং গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামানুজনের সঙ্গে আলাপ করবার

পর তাঁর অসামান্য প্রতিভার কথা বুঝতে পারেন। রামচন্দ্র রাও রামানুজনের প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কিছু মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন। এই সময় রামানুজন একটি সামান্য কাজেও যোগদান করেন।

কাজে ব্যস্ত থাকলেও রামানুজন কোন সময়েই গণিতের গবেষণায় অবহেলা করেন নি। তাঁর প্রথম জীবনের গবেষণা 'জার্নাল অব দি ইণ্ডিয়ান ম্যাথেমেটিক্যাল সোসাইটিতে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়। এই সময় তাঁর বয়স ছিল তেইশ বছর। এই সময় রামানুজনের প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেকের অনুরোধে রামানুজন এই সময় কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের জি. এইচ. হার্ডির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন। এই বিষয়ে ১৯১৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তিনি একখানি চিঠি লেখেন। এই চিঠির সঙ্গে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত কতকগুলি সূত্রও পাঠিয়ে দেন। রামানুজমের প্রেরিত চিঠি আর সূত্রগুলি পাঠ করে মিঃ হার্ডি অত্যন্ত বিস্মিত হন। তিনি পত্রোত্তরে রামানুজনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরও লেখেন—রামানুজনের প্রতিভা অসামান্য। কারণ, এই সূত্রগুলি ১৯০৮ সালে ল্যাণ্ডাউ আবিষ্কার করেছিলেন। রামানুজন অবশ্যই এই সূত্রগুলি দেখেন নি। সুতরাং তার আবিষ্কার মৌলিকত্বের পর্যায়েই পড়ে। রামানুজনের ইংরেজী জ্ঞান অতি অল্প। তিনি ফরাসী বা অন্যান্য ভাষাও জানতেন না। সুতরাং অন্য কোন ভাষার গণিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া তাঁর পক্ষে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব ছিল। এই সময় মিঃ হার্ডি রামানুজনকে কেম্ব্রিজে আনয়ন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু রামানুজনের মাতার অনিচ্ছার জন্যে সে চেষ্টা সফল হয় না। পরে মাতার অনুমতি পাওয়া যায় আশ্চর্য-ভাবেই। তাঁর মাতা স্বপ্নাদেশ পান। অবশেষে রামানুজন কেম্ব্রিজে গমন করেন। মাদ্রাজ থেকে তিনি ২৫০ পাউণ্ড ও কেম্ব্রিজ থেকে ৫০ পাউণ্ড বৃত্তি লাভ করেন।

রামানুজনের আবিষ্কৃত সূত্রগুলি যে সবই নির্ভুল ছিল, তা নয়। কিছু কিছু ভ্রম তাঁরও হয়েছিল। আধুনিক গণিতের নানাপ্রকারের সূত্র সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণাই ছিল না। তিনি সেগুলি সম্বন্ধে কোন আগ্রহও প্রকাশ করতেন না বরং বিরক্তিই প্রকাশ করতেন। গণিত ছাড়া অন্য কোন বিষয়েও তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ১৯১৮ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তাঁর কয়েকটি অত্যাশ্চর্য সূত্র আবিষ্কৃত হয়। রামানুজনের প্রতিভা প্রায় সর্বত্রই স্বীকৃত হয়।

বীজগণিতেই রামানুজনের প্রতিভা সঠিক বিকাশ লাভ করে। এই বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ প্রায় কেউই নেই। বিখ্যাত গাণিতিক Euler বা Jacobi-র সঙ্গেই তাঁর তুলনা করা চলে। রামানুজনের স্মৃতিশক্তি, ধৈর্য আর সহজাত প্রতিভার সাহায্যে তিনি নিজ ক্ষেত্রে প্রায় অপরাজেয়।

রামানুজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী ছিলেন। তিনি বিলাতে থাকাকালীনও নিজেই আহার্য প্রস্তুত করে খেতেন। ১৯১৭ সালে রামানুজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। একটি নার্সিং হোমে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১৯ সালের গোড়ার দিকে রামানুজন আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাপের বিষ ও সর্পাঘাত

সাপের বিষ। কথাটা শুনলেই আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ভয় হবারই কথা—রক্তের সঙ্গে এই বিষ নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশলে মৃত্যু যে অনিবার্য।

এ হেন ভয়ের জিনিষটি দেখবার সুযোগ অনেকেরই হয় না। সাপের বিষ দেখতে কেমন? জিনিষটি পরিস্কার চট্‌চটে তরল পদার্থ। রং ঈষৎ হলদে—কতকটা মধু অথবা সরষের তেলের মত দেখতে। কোন গন্ধ নেই সাপের বিষে, কোন স্বাদও নেই।

সাপের দেহের প্রোটিন পরিবর্তিত হয়ে বিষে পরিণত হয়। এই বিষকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করা বিজ্ঞানীদের পক্ষে এখনও সম্ভব হয় নি। তবে যেটুকু হয়েছে, তাথেকে জানা যায় যে, এতে প্রধানতঃ তিন রকমের উপদান আছে। উপাদানগুলি হচ্ছে—গ্লোবিউলিন, পেপ্‌টোন ও ফাইব্রিন। মানবদেহের উপর এই উপাদানগুলির ক্রিয়াও পৃথক। ফাইব্রিনের কাজ হচ্ছে রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দেওয়া। পেপ্‌টোনের ক্রিয়ার ফলে দেহকোষ বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, কোষ-প্রাচীর বিনষ্ট হয় এবং দেহে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। গ্লোবিউলিনের ক্রিয়া হয় স্নায়ুর উপর। ফলে শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।

সব সাপের বিষে এই উপাদানগুলির পরিমাণ এক নয়। কারুর বিষে গ্লোবিউলিনের ভাগটা বেশী, কারুর বা পেপ্‌টোন অথবা ফাইব্রিন বেশী। বোড়া সাপের বিষে গ্লোবিউলিন থাকে খুব সামান্য পরিমাণে, কিন্তু অপর উপাদান দুটি থাকে বেশী পরিমাণে। কাজেই বোড়া সাপের বিষের ক্রিয়া দেখা দেয় প্রধানতঃ রক্তের মধ্যে। সামুদ্রিক সাপের বেলায় ঠিক এর বিপরীত। তাই এর বিষের ক্রিয়া দেখা দেয় প্রধানতঃ স্নায়ুর উপর।

মুখে, গলায় বা পেটের ভিতরে যদি কোন ক্ষত না থাকে, তবে সাপের বিষ চুষে খেলেও ক্ষতি নেই। কারণ, এই বিষ পাকস্থলীতে গিয়ে নানা রকম উপাদানে ভেঙ্গে যায় এবং হজম হয়ে রক্তে মিশবার আগে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কিন্তু রক্তের সঙ্গে কোন রকমে তা মিশলেই প্রাণনাশের কারণ হতে পারে।

এতক্ষণ সাপের বিষের কথা বলা হলো। এবারে আসা যাক সর্পাঘাত প্রসঙ্গে। বিষধর সাপের কামড় বোঝা যায় তার প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখে। এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি কি? প্রথমতঃ, দষ্ট স্থানে দুটি দাঁত ফোটানোর দাগ থাকবে। দাগ দুটির মাঝে থাকবে বেশ কিছুটা ফাঁক। এই দাগ সাপের দুটি সক্রিয় বিষদাঁতের।

এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি সক্রিয় বিষদাঁতের একটু পিছনে থাকে বিষগ্রন্থি। এই জিনিষটি দেখতে অনেকটা পেঁয়াজের খোসার মত। বিষগ্রন্থিতে সাপের বিষ সঞ্চিত থাকে। একটি সরু নলীর দ্বারা বিষগ্রন্থি ও সক্রিয় বিষ দাঁতের গোড়ায়

সংযুক্ত থাকে। ছোবল মারবার সময় বিষের থলিতে চাপ লাগে। সেই চাপে বিষগ্রন্থি থেকে বিষ বেরিয়ে নালীপথ বেয়ে দাঁতের গোড়ায় পৌঁছায়। বিষদাঁতের ভিতরটা ইন্‌জেকশনের সূঁচের মত ফাঁপা। কাজেই তার মধ্য দিয়ে বিষ সহজেই চলে এসে দষ্ট প্রাণীর রক্তে মিশে যায়। সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থান ফুলে ওঠে, ভয়ানক জ্বালা করে এবং সেখান থেকে পাত্‌লা রক্ত ক্রমাগত গড়াতে থাকে। কখনও কখনও দষ্ট স্থানটি অসাড় হয়ে যায়।

সাপের কামড়ের সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থানটির কিছু উপরে একটি শক্ত বাঁধন দিতে হবে। একে বলে তাগা বাঁধা। তাগা বাঁধবার সবচেয়ে উপযুক্ত জিনিষ হচ্ছে নরম রবারের নল। অভাবে রুমাল, দড়ি, ফালি বা রুমালটি পাকিয়ে নিলে বেশ শক্ত বাঁধন হবে।

একটি বাঁধনে চলবে না। প্রথম বাঁধনের একটু উপরে আরও একটি বাঁধন দিতে হবে। হাতে কামড়ালে একটি বাঁধন দিতে হবে কনুইয়ের উপরে বাহুতে, আর পায়ে কামড়ালে একটি বাঁধন দিতে হবে হাঁটুর উপরে উরুতে। বাঁধন দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে—বিষ যাতে রক্তের সঙ্গে মিশে দেহের সর্বত্র, বিশেষ করে হৃৎপিণ্ডে পৌঁছাতে না পারে। একটি বিষয়ে কিন্তু সাবধান হতে হবে—বাঁধন যেন বহুক্ষণ রাখা না হয়। বেশীক্ষণ রাখলে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে সে জায়গায় পচ্‌ ধরতে পারে। তাই বলে ডাক্তারের নির্দেশ ভিন্ন বাঁধন খোলা চলবে না।

বাঁধন দেবার পর আহত ব্যক্তিকে নড়াচড়া করতে দেওয়া উচিত নয়। তাতে বেশী রক্ত চলাচল করে দেহের সর্বত্র বিষ ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা বেশী।

এরপর ক্ষতস্থানটা চিরে দেওয়া দরকার। ধারালো ছুরি অথবা ব্লেডের ডগাটা পুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে এই কাজ করা যেতে পারে। চিরতে হবে সিকি ইঞ্চি লম্বা ও সিকি ইঞ্চি গভীর করে। চেরবার পর রক্তের সঙ্গে বিষটুকু বেরিয়ে যাবে। যতক্ষণ কালো রক্ত বেরুবে—বুঝতে হবে, রক্তে ততক্ষণ বিষ আছে। তারপর যখন লাল রক্ত বেরুবে, তখন বুঝতে হবে—রক্ত বিষমুক্ত হয়েছে।

চিরে রক্ত বের করে দেবার পর ক্ষতস্থানটায় একটা ঔষধ লাগানো দরকার। ঔষধটা আর কিছুই নয়—পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের পাত্‌লা জলীয় দ্রবণ দিয়ে ক্ষতস্থান বার বার ধুয়ে ফেলতে হবে। রক্ত বের করবার পরেও যদি কিছু বিষ থেকে যায়, তবে তা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সংস্পর্শে এসে নষ্ট হয়ে যাবে। এরপর ডাক্তার দেখিয়ে বাঁধন খুলতে হবে।

অ্যান্টিভেনিন সিরাম হচ্ছে সাপের বিষের একমাত্র প্রতিষেধক। এটি প্রস্তুত করবার জন্যে সুস্থ ও সবল ঘোড়ার দেহে সইয়ে সইয়ে অল্প অল্প করে সাপের বিষ ইন্‌জেকশন দেওয়া হয়। ঘোড়া তাতে মরে না, কিন্তু তার দেহে বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। বার বার পরিমিতভাবে সাপের বিষ ইন্‌জেকশন দেবার ফলে ঘোড়াটির

রক্তে সাপের বিষের প্রতিষেধক শক্তি জন্মে। তখন ঘোড়াটির শিরা থেকে উপযুক্ত পরিমাণ রক্ত বের করে নেওয়া হয়। রক্তের যে উপাদান জমাট বাঁধে, তা বের করে নেবার পর পাওয়া যায় অ্যান্টিভেনিন সিরাম। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে যথাসময়ে এই সিরাম ইন্‌জেকশন দিলে বাঁচানো সম্ভব হয়।

অমরনাথ রায়

মোটর গাড়ীর কথা

(কথায় ও চিত্রে)

১। আজকের মোটর গাড়ী—যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হচ্ছে—আধুনিক মোটর গাড়ী। মানুষের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে আজ পর্যন্ত যত রকম যানবাহন উদ্ভাবিত হয়েছে—তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে আজকের মোটর গাড়ী। পৃথিবীতে বর্তমানে ৭০ মিলিয়নেরও (১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ) বেশী মোটর গাড়ী মানুষের নানা কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মোটর গাড়ীতে মানুষ নিজে
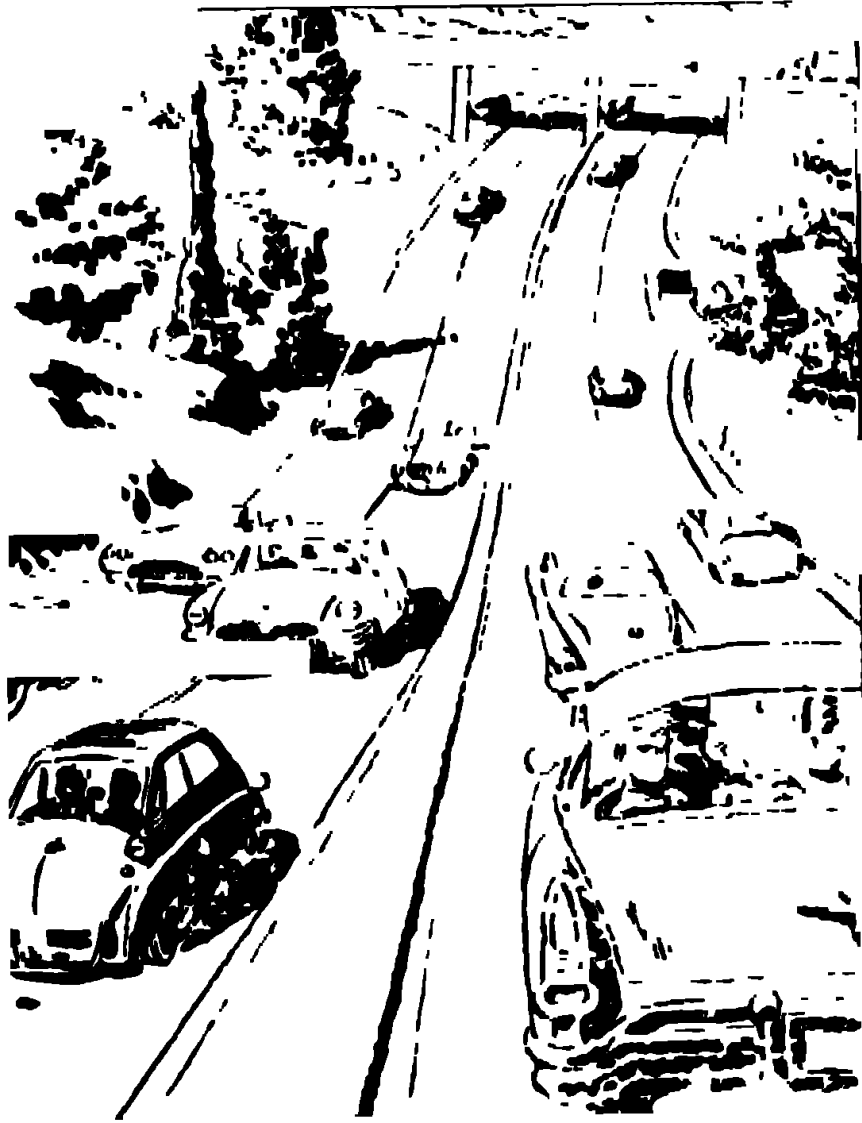
১নং চিত্র।

চড়ছে, বিভিন্ন স্থানে খাদ্য ও মালপত্র পাঠাচ্ছে। রোগী বহনের জন্যে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর কথা কারোই অজানা নয়। আগুন নেবাবার জন্যে দমকলের গাড়ীর প্রয়োজন। এছাড়া আরও নানা কাজে আজ মোটর গাড়ী অপরিহার্য। প্রতিটি কাজই মোটর গাড়ীর সাহায্যে তাড়াতাড়ি, নিরাপদে এবং হিসাব মত করা যায়।

২। মোটর গাড়ীর পূর্বে :—মোটর গাড়ী যখন আবিষ্কৃত হয় নি—তখন মানুষ কেমন করে যাতায়াত করতো বা মালপত্র আদান-প্রদান করতো? তখন মানুষ বিভিন্ন পশুকেই যাতায়াতের বাহন হিসাবে ব্যবহার করতো। আর ছিল রেল। অবশ্য এসবই স্থলপথে চলাচলের জন্যে। এভাবে যাতায়াতের অসুবিধাও ছিল খুব; যেমন বলা যায়—প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ঘোড়ায় চেপেছে, ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার

২নং চিত্র।

করেছে। পোষ মানিয়ে ঘোড়াকে খুব সহজেই এই কাজে লাগানো যায়। আর ঘোড়া খুব জোরে ছুটতেও পারে। যত শক্তিশালী ঘোড়াই হোক না কেন—তার চলবার এবং মাল বহনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ছয় ঘোড়ার গাড়ীর মাল টানবার ক্ষমতা কয়েক টন মাত্র, অর্থাৎ খুব বেশী পরিমাণ মাল ছয়টি ঘোড়া টানতে পারে না। আর এক ঘোড়ার গাড়ী প্রতিদিন প্রায় ২০ মাইলের মত পথ চলতে পারে।

৩। প্রথম মোটর গাড়ী—যতদূর জানা যায়—১৭৬৯ সালে প্রথম মোটর গাড়ী তৈরী হয়। গাড়ীটি তৈরী করেন ক্যুনট (Cugnot) নামে একজন ফরাসী। গাড়ীটির চেহারার সঙ্গে আধুনিক মোটর গাড়ীর খুব কমই সাদৃশ্য আছে। গাড়ীটি ছিল বাষ্প-চালিত। যুদ্ধের গোলা-গুলি বহনের জন্যে এই গাড়ীর ব্যবহার হতো। এর পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে অনেকগুলি বাষ্পচালিত মোটর গাড়ী তৈরী হয়। কিন্তু এই গাড়ীগুলির অনেক দোষত্রুটি ছিল। ১৮৮৫ সালে কার্ল বেঞ্জ নামক

একজন জার্মান প্রথম গ্যাসোলিন-চালিত মোটর গাড়ী তৈরী করতে সক্ষম হন। এই
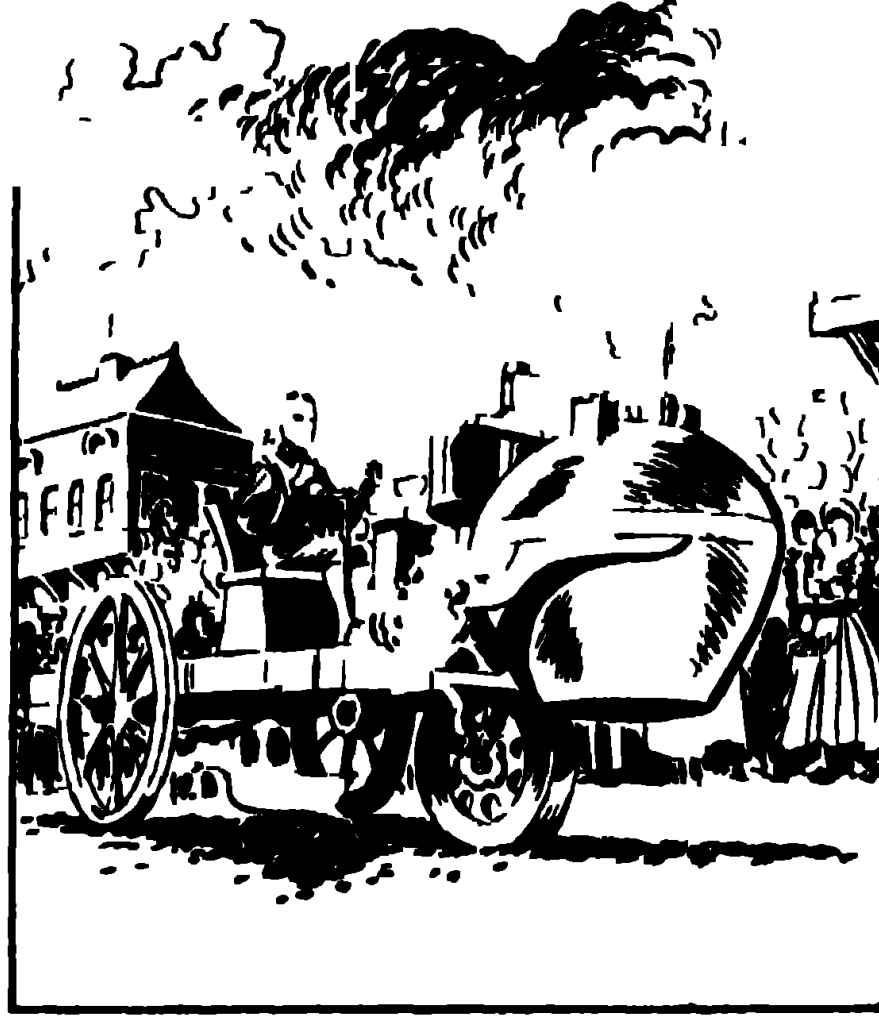
৩নং চিত্র।

গাড়ী আগের মোটর গাড়ীর তুলনায় অনেক উন্নত ছিল।

৪। ডুরিয়া ভ্রাতৃবৃন্দ—তারপর ১৮৯৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ডুরিয়া ভ্রাতৃবৃন্দ আগের মোটর গাড়ীগুলির তুলনায় অনেক উন্নত ধরণের মোটর গাড়ী তৈরী করেন। তাঁদের দেখা-দেখি—অন্যান্যেরাও মোটর গাড়ী তৈরী করা সুরু করেন। কেউ কেউ আবার ডুরিয়া ভ্রাতৃবৃন্দের মোটর গাড়ীর চেয়ে আরও ভাল গাড়ী তৈরীর চেষ্টা করতে থাকেন। তখন
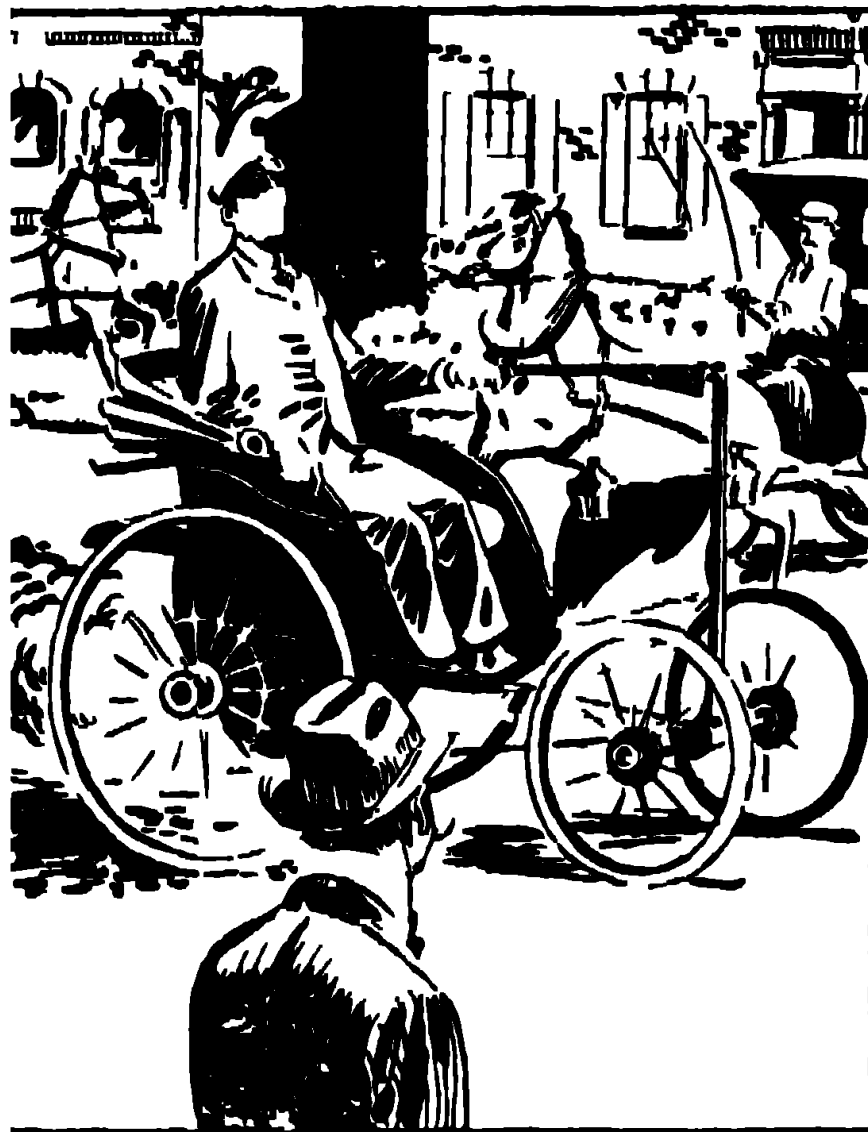
৪নং চিত্র।

রাস্তায় খুব কম মোটর গাড়ীই চলতো। কিন্তু কয়েকটি রাজ্যে রাজপথে মোটর গাড়ীর চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইন তৈরী হয়। কারণ, রাস্তায় মোটর গাড়ী চলাতে ঘোড়া এবং অন্যান্য যানবাহী পশু নাকি ভয় পায়।

৫। মোটর গাড়ী শিল্পের প্রথম যুগ—যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের বহু প্রতিষ্ঠানই মোটর গাড়ী তৈরী করতে সুরু করে। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ীর কোন নির্দিষ্ট মান স্থির হয় নি। যার যে রকম সুবিধা—সে সেভাবেই মোটরগাড়ী তৈরী করতো। বস্তুতঃ
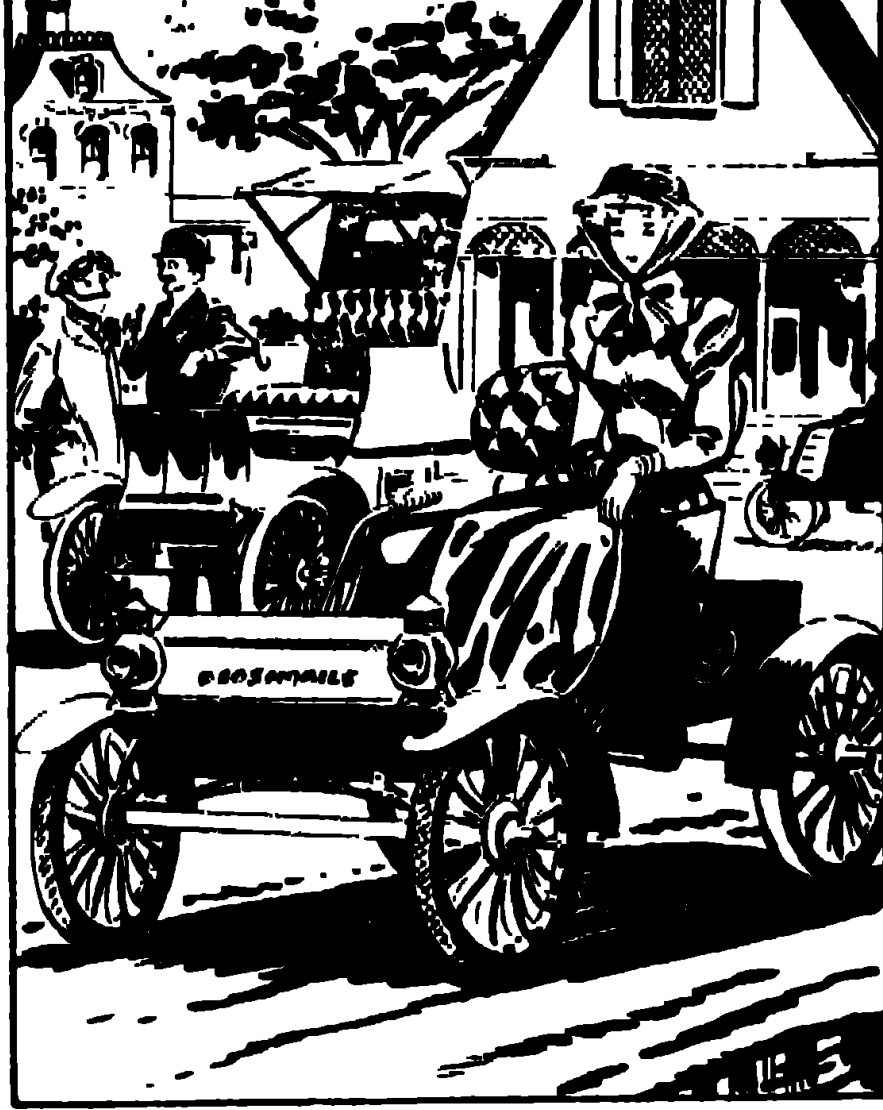
৫নং চিত্র।

প্রতিটি গাড়ীই তখন হাতে তৈরী হতো, আর খরচও ছিল যথেষ্ট। সে জন্যে বিত্তশালী ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষে গাড়ী কেনা ছিল স্বপ্নের ব্যাপার। গাড়ীর কোন অংশ ভেঙ্গে গেলে—সেই অংশটি আবার নতুন তৈরী করে গাড়ীতে লাগানো হতো। ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে মোটর গাড়ীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০০০।

৬। মোটর গাড়ীর ব্যাপক চাহিদা—ক্রমে ক্রমে মোটর গাড়ীর চাহিদা বাড়তে
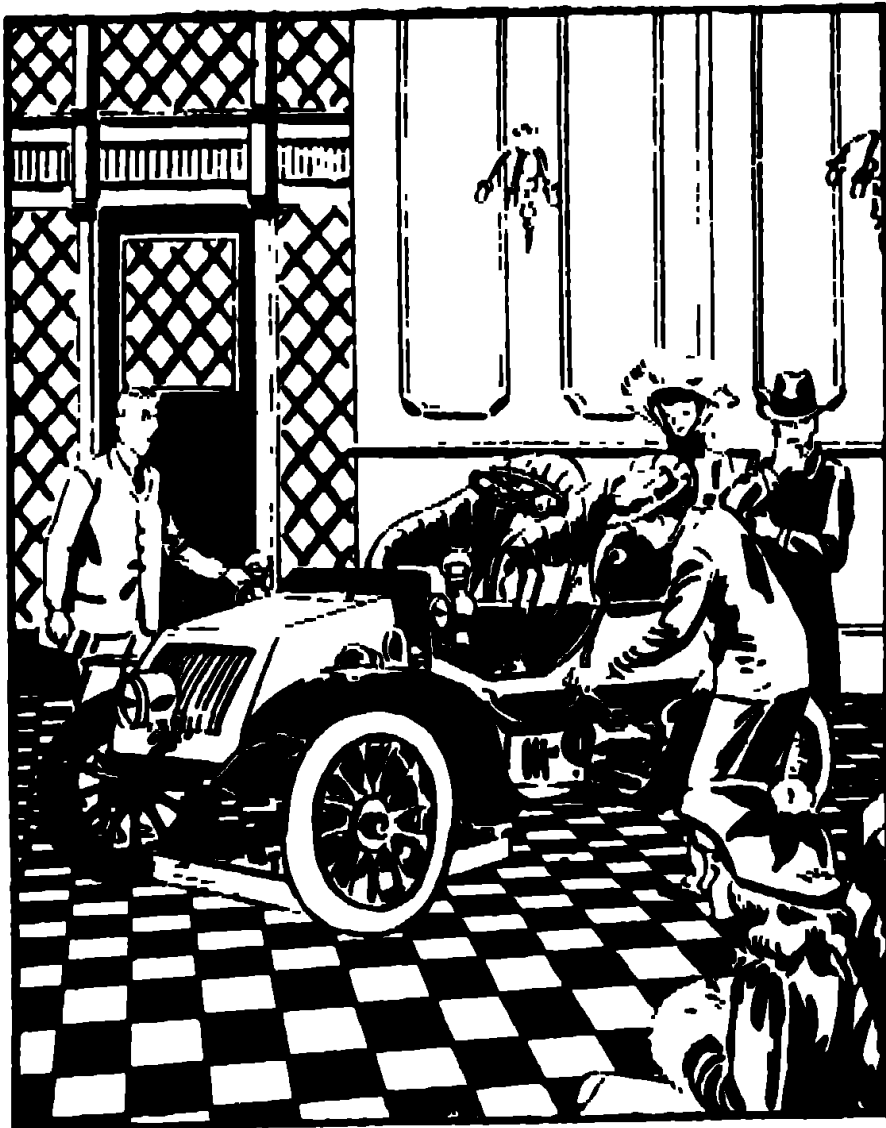
৬নং চিত্র।

থাকে। অনেকেই মোটর গাড়ী কিনতে আগ্রহী হন। মোটর গাড়ী প্রস্তুতকারক

প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখলেন—দাম কমাতে পারলে মোটর গাড়ীর বিক্রী বহুগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু দাম কমানোও খুব মুস্কিল। কারণ, যে পদ্ধতিতে মোটর গাড়ী তৈরী হয়, তাতে দাম কমানো অসম্ভব। সুতরাং চেষ্টা চলতে থাকে অল্প খরচে বেশী মোটর গাড়ী তৈরী করবার জন্যে। এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলেই মোটর গাড়ীর দাম কমানো সম্ভব।

৭। বিশ্ববিখ্যাত হেনরী ফোর্ড—হেনরী ফোর্ডের কথা বোধ হয় কারোর অজানা নেই। মোটর গাড়ীর ইতিহাসে হেনরী ফোর্ডের নাম অমর হয়ে আছে। ১৮৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগানের অন্তর্গত গ্রীনফিল্ডে হেনরী ফোর্ড জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায়
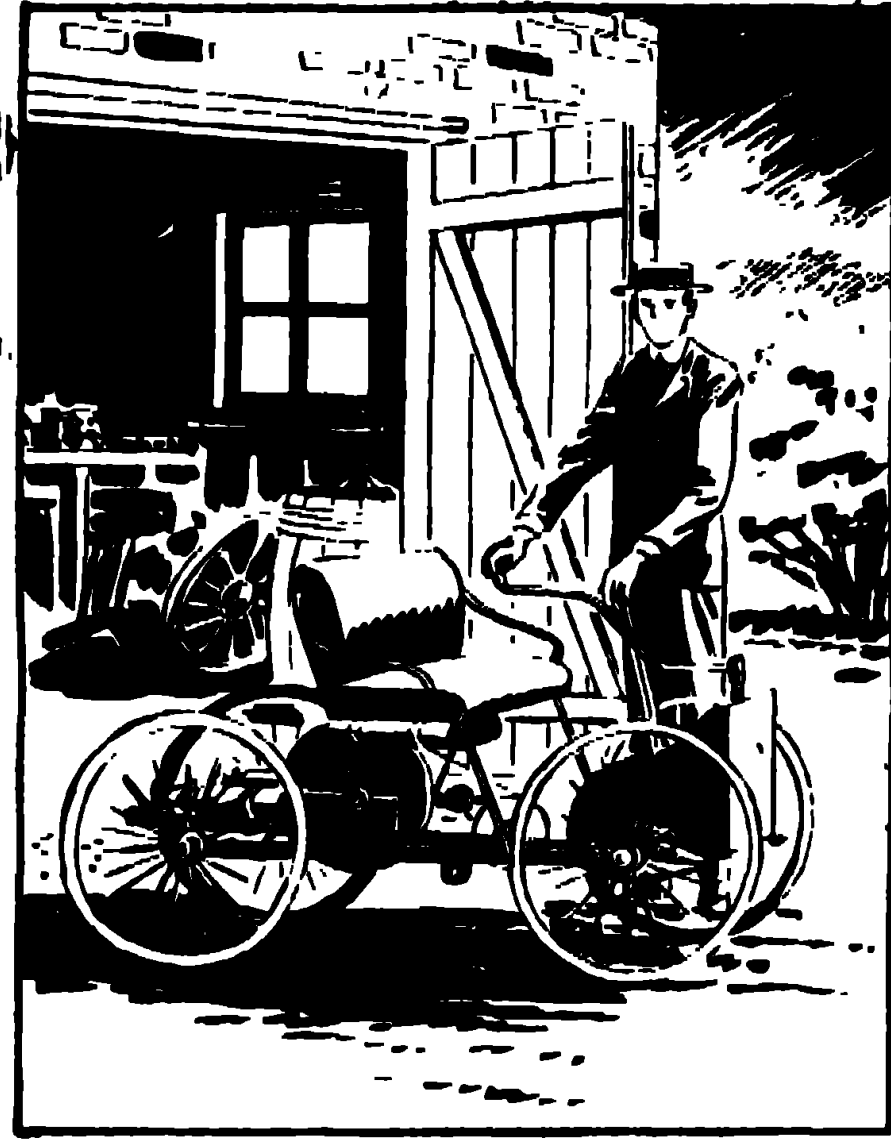
৭নং চিত্র।

হেনরী ফোর্ডকে আর্থিক কষ্টভোগ করতে হয়েছে। ফোর্ড মোটর গাড়ীর শিল্পে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটান। ফোর্ড করতেন যন্ত্রপাতির ব্যবসায়। ১৮৯৬ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব পন্থায় প্রথম মোটর গাড়ী তৈরী করেন। অন্যান্যদের মত ফোর্ডও সস্তায় মোটর-গাড়ী তৈরীর জন্যে চিন্তা করছিলেন। হেনরী ফোর্ডই এই প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেন।

৮। অ্যাসেম্ব্লি লাইন—১৯০৮ সালে হেনরী ফোর্ড অ্যাসেম্ব্লি লাইন পন্থা প্রবর্তন করে মোটর গাড়ীর শিল্পের বিরাট পরিবর্তন সাধন করেন। এই পন্থায় একটা প্ল্যাটফরমের উপর দিয়ে নির্মীয়মান গাড়ীগুলিকে টেনে নেওয়া হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে কারিগরেরা যন্ত্রপাতির অংশ গাড়ীতে জোড়া লাগায়। প্ল্যাটফরমের দু-দিকে বিভিন্ন জায়গায় কারিগরেরা থাকে। একটি গাড়ী যখন তাঁদের সামনে দিয়ে যায়—তখন যে যার কাজটুকু করে দেয়। গাড়ী তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এভাবে কাজ চলতে থাকে। এই পদ্ধতিতে গাড়ী তৈরীতে সময় খুব কম লাগে। আগে একটা গাড়ীর বিভিন্ন অংশ জোড়া

লাগাতে সময় লাগতো দেড় দিন—এখন এই পদ্ধতিতে সময় লাগে ৯৩ মিনিট। এতে
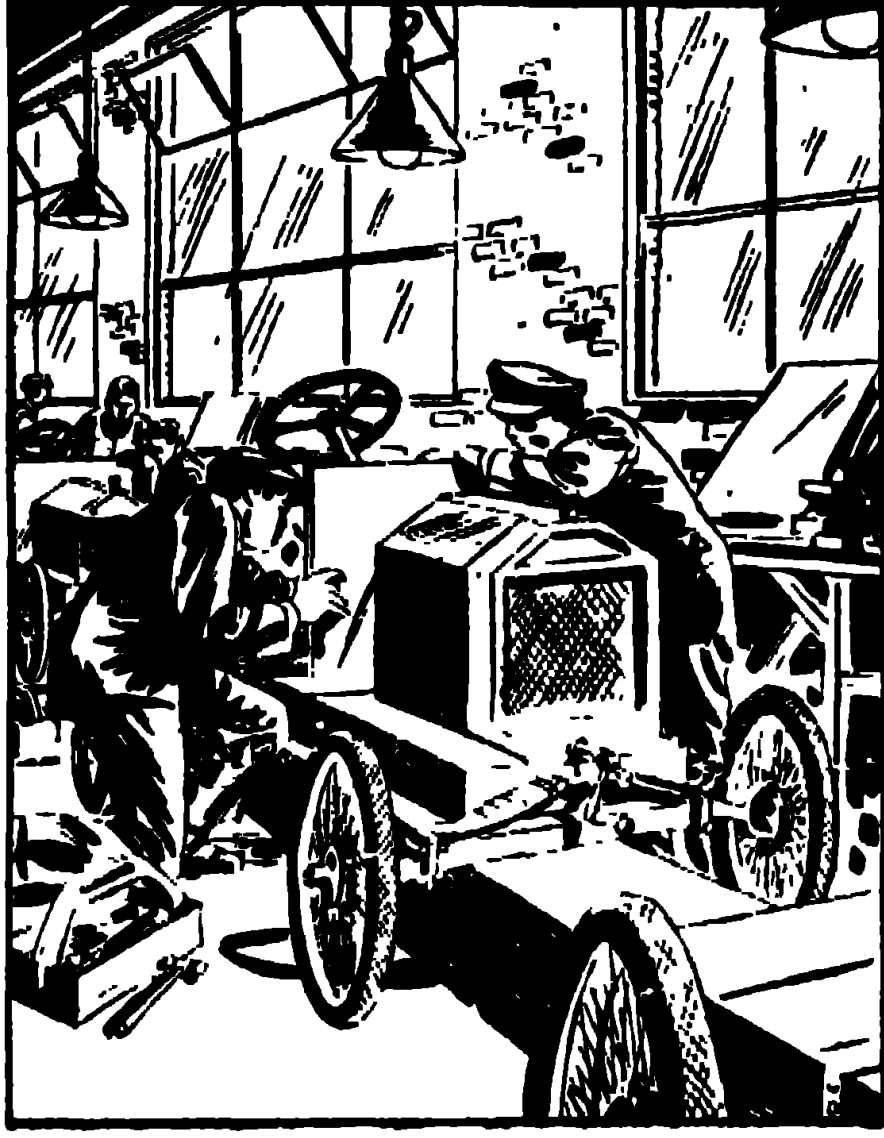
৮নং চিত্র।

খরচও কম হতো। এই পদ্ধতিতে লক্ষ লক্ষ গাড়ী তৈয়ী করে ফোর্ড বাজারে ছাড়েন। ফোর্ডের নির্মিত গাড়ী 'মডেল-টি' নামে পরিচিত।

৯। সেলফ্-ষ্টার্টার—ধীরে ধীরে মোটর গাড়ীর আরও উন্নতি হতে থাকে। ১৯১১ সালে আবিষ্কৃত হয় বৈদ্যুতিক সেলফ্-ষ্টার্টার। এটি আবিষ্কার করেন সি. এফ.

৯নং চিত্র।

কেটারিং। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার। মোটর গাড়ীর ক্রমোন্নতিতে তাঁর দানও কম নয়। সেলফ-ষ্টার্টার আবিষ্কৃত হওয়ায় মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন চালু

করবার হাঙ্গামাও কমে যায়। আগে হাতে করে ক্র্যাঙ্ক স্যাফ্‌ট্‌ ঘুরিয়ে মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন চালু করা হতো। এভাবে ইঞ্জিন চালু করবার অনেক অসুবিধা ছিল। সেলফ্‌-ষ্টার্টার আবিষ্কৃত হওয়ায় সকলেই—এমন কি, মেয়েরা পর্যন্ত নির্ভাবনায় গাড়ী চালাতে সক্ষম হন। আগে রাস্তায় কোন কারণে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে আবার তাকে চালু করা (বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে) খুব দুশ্চিন্তার বিষয় ছিল। এখন আর সে ভয় রইলো না।

১০। নানাভাবে মোটর গাড়ীর উন্নতি—অ্যাসেম্ব্লি লাইন প্রথায় গাড়ী তৈরী হওয়ায় গাড়ীর দাম কমানো সম্ভব হয়। সেলফ্‌-ষ্টার্টার আবিষ্কৃত হওয়ায় গাড়ী চালাবার সুবিধা হয়। এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গাড়ীর বিক্রীও যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং দ্রুতগতিতে নানাভাবে মোটর গাড়ীর আরও উন্নতি সাধিত হতে থাকে। ১৯১২ সালে ইস্পাত দিয়ে

১০ নং চিত্র।

মোটর গাড়ীর কাঠামো তৈরী হতে থাকে। ১৯১৫ সালে চার চাকার ব্রেক মোটর গাড়ীতে বসানো হয়। তারপর ক্রমে ক্রমে মোটর গাড়ীতে সেফ্‌টি গ্লাস, স্বয়ংক্রিয় ট্র্যান্সমিসন গিয়ার এবং পাওয়ার ষ্টিয়ারিং লাগানো হয়। এছাড়া আগের তুলনায় মোটর গাড়ীকে খুব সুদৃশ্য এবং আরামদায়ক করে নির্মাণ করবার পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হয়।

১১। মোটর গাড়ী শিল্প—মোটর গাড়ীর ব্যাপক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শিল্পেরও উন্নতি হতে থাকে। যে সব জিনিষ মোটর গাড়ী তৈরীতে প্রয়োজন, তাদের চাহিদাও বেড়ে যায়। ফলে সে সব শিল্পও প্রসার লাভ করে। এভাবে ইস্পাত, কাচ,

রবার প্রভৃতি শিল্পেরও বিস্তৃতি ঘটে এবং হাজার হাজার লোক এই সব শিল্পে নিযুক্ত থেকে

১১নং চিত্র।

জীবিকা অর্জন করছে। একটা হিসাবে জানা যায়—যুক্তরাষ্ট্রের একটা মোটর গাড়ী তৈরী করতে পৃথিবীর ৫৬টি দেশের ৩০০-এরও বেশী বিভিন্ন রকম জিনিষের প্রয়োজন হয়।

১২। রাস্তা—মোটর গাড়ী চালাবার জন্যে পাকা রাস্তার দরকার। মোটর যখন প্রথম চলতে সুরু করে, তখন অধিকাংশ রাস্তাই ভাল ছিল না। কাঁচা রাস্তায় মোটর গাড়ী চালনায় অনেক অসুবিধা। বিশেষতঃ বৃষ্টি-বাদলার দিনে সময় সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মোটর গাড়ী

১২নং চিত্র।

ব্যাপকভাবে চালু হবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার উন্নতিসাধনও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশে পাকা রাস্তা তৈরী হয়। পৃথিবীর যে সব দেশে রাস্তার অবস্থা খুব উন্নত—তন্মধ্যে

যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। একটা হিসাবে জানা যায়—যুক্তরাষ্ট্রের তিন মিলিয়ন মাইল ব্যাপী রাস্তার মধ্যে প্রায় দুই মিলিয়ন মাইল রাস্তাই পাকা—অর্থাৎ বাঁধানো।

১৩। জ্বালানী তেল—মোটর গাড়ীর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানী তেলের চাহিদাও বেড়ে যায়। এতদিন তৈল-শিল্পের পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ এবং এর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো না। প্রধানতঃ জ্বালাবার জন্যে জ্বালানী তেলের খুব চাহিদা ছিল। অন্য কাজে জ্বালানী তেলের বিশেষ প্রয়োজন হতো না। কিন্তু এবারে গ্যাসোলিনের
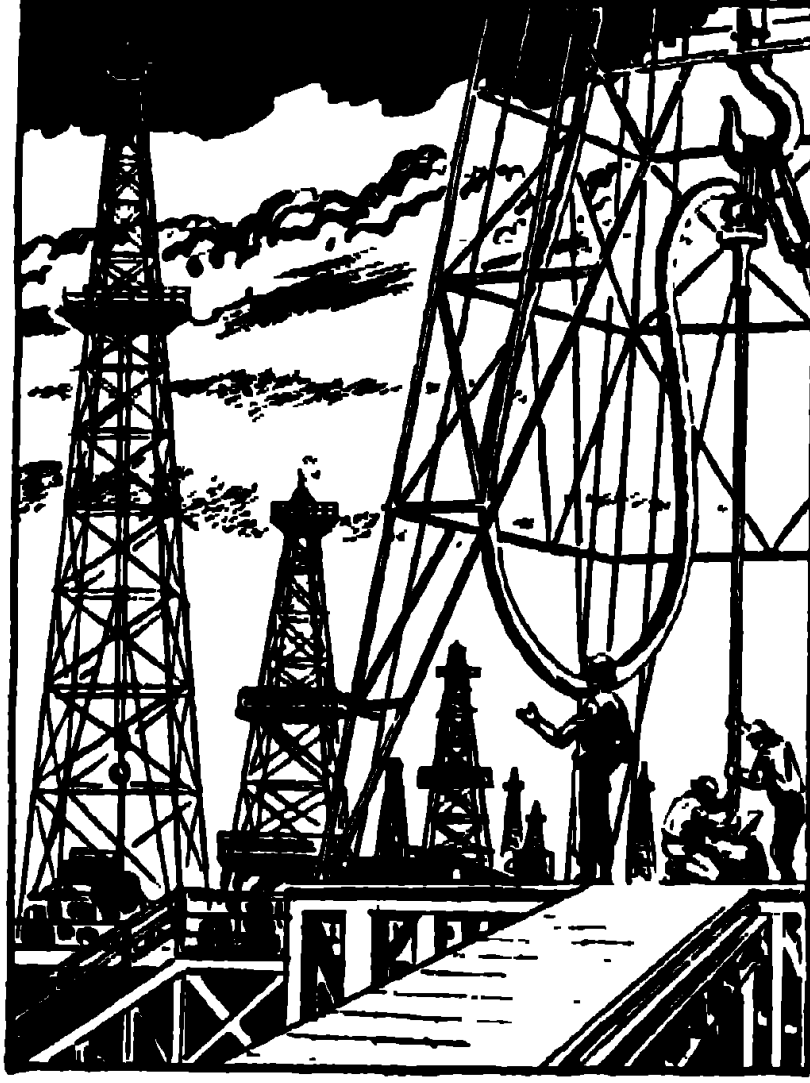
১৩নং চিত্র।

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়—বিভিন্ন দেশে এর উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা চলতে থাকে এবং সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এখন একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই সওয়া দুই বিলিয়ন ব্যারেল তেল প্রতি বছর উৎপন্ন হয়। তেল এখন জাহাজ, লোকোমোটিভ এবং জেনারেটিং প্ল্যাণ্টের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

১৪। মোটর গাড়ী ব্যবহারে সুবিধা—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ যাতায়াতের

১৪নং চিত্র।

ক্ষেত্রে মোটর গাড়ী খুবই প্রয়োজনীয়। মোটর গাড়ীতে চড়ে আরামে এবং অল্প সময়ে

এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়া সম্ভব। যাঁদের মোটর গাড়ী আছে—তাঁদের পক্ষে শহরের ভীড় এড়িয়ে শহরতলীতে বাস করায় কোন ঝামেলা নেই। ইচ্ছামত আরামেও তাঁদের পক্ষে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব। আমেরিকায় প্রতি তিনটি পরিবারের মধ্যে দুটিরই নিজস্ব মোটর গাড়ী আছে। প্রতিটি গাড়ী বছরে গড়ে ১০,০০০ মাইল ভ্রমণ করে।

১৫। মোটর গাড়ীর ভবিষ্যৎ—বর্তমানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বিমানের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও মোটর গাড়ীর প্রয়োজনীয়তা কিছুই কমে নি এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতেও কমবে না। জ্বালানীর উৎকর্ষ সাধন, মোটর গাড়ীর ইঞ্জিনের
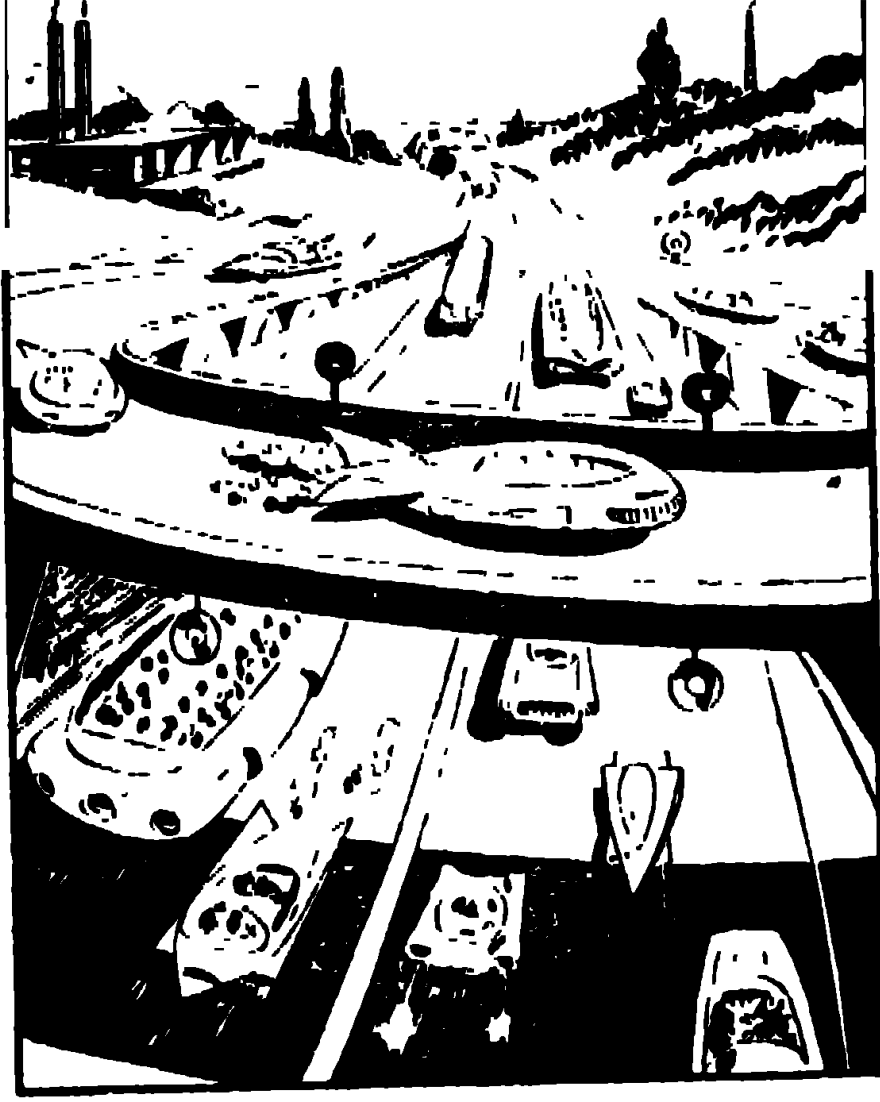
১৫নং চিত্র

ক্রমোন্নতি এবং নতুন নতুন রাস্তা তৈরীর ফলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মোটর গাড়ী পুরোভাগে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা—মানুষ আজ পর্যন্ত পরিবহনের যত রকম উপায় আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে মোটর গাড়ী হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী এবং তা হিসাবানুযায়ী চালানো সম্ভব।

বিবিধ

বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে আনন্দানুষ্ঠান

এই বছর (১৯৬৩) পয়লা জানুয়ারীতে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী, সহকর্মী ও সুহৃদবর্গ একটি আনন্দানুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। এই আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের আবাস কক্ষে।

পুষ্প-ধূপ-সুরভিত সুশোভিত কক্ষে এই সান্ধ্য আসরের প্রারম্ভে একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুমারী স্বপ্না মুখোপাধ্যায়। তারপর শ্রদ্ধাপ্রীতিরঞ্জিত মাল্য ও পুষ্পস্তবক অধ্যাপক বসুকে একে একে অর্পণ করেন জন্মোৎসব কমিটি, হিন্দুস্থান স্মল টুলস্, পায়োনীয়ার নিটিং মিলস্, কিশোর কল্যাণ পরিষদ, ফ্রেণ্ডস্ ইউনাইটেড ক্লাব, কুমার দ্বিজেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের পরিবারবর্গ এবং আরও অনেকে। এরপর জন্মোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে

একটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য। পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিতে অধ্যাপক বসুর অনন্যসাধারণ অবদানের কথা, তাঁর মহিমময় চরিত্রমাধুর্যের কথা, গভীর মানবপ্রীতির কথা অভিনন্দন-পত্রে উল্লিখিত হয়।

অভিনন্দন-পত্র পাঠের পর জন্মোৎসব কমিটির সভাপতি ডাঃ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর অধ্যাপক বসুকে কিছু বলতে অনুরোধ করায় তিনি তাঁর প্রতিভাষণে বলেন—আজকের দিনে অনুষ্ঠান করে তোমরা মনে করিয়ে দিচ্ছ যে, আমার বয়স খুব বেড়ে গেছে। বিজ্ঞানচর্চা করে কি হয়! আজ ডাঃ মেঘনাথ সাহা প্রমুখ পুরনো সহপাঠী ও বন্ধুদের কথা মনে পড়ছে। দীর্ঘদিন বিজ্ঞানচর্চা করেছি, আজ ছাত্র-প্রছাত্রদের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ আমি কামনা করি। শেষের দিকে হিসাব করতে গিয়ে মনে হয়, আমরা যা করেছিলাম, তা ঘরের মধ্যে সাজানো ফুলদানীর ফুলের মত শুকিয়ে না যায়। বিজ্ঞান শুধু ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রয়োগ নয়, বিজ্ঞানকে জীবনের সব ব্যাপারে টেনে নেওয়া দরকার। যেমন গড়তে হবে শিল্প-প্রতিষ্ঠান, তেমনি

জন্মদিনের আসরে অধ্যাপক বসুর সঙ্গে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সহায়রাম বসু, অধ্যাপক নীরেন রায় প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।
(লোকসেবকের সৌজন্যে)

বিজ্ঞানকেও আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত-ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

এটা আনন্দের, না দুঃখের বিষয়—তা বলতে পারি না। তবে আজ তোমাদের প্রীতি ও সাহচর্য পেয়ে আমি ধন্য।

এদেশে বিজ্ঞানচর্চার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন—প্রথম দিকে আমরা যখন বিজ্ঞানচর্চার চেষ্টা করেছিলাম, তখন লোকে আইন ইত্যাদি বেশী পড়তো। তারপর এলো স্বদেশী যুগের আমল, একদল তখন ভাবলাম, দেখাই যাক না

মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অধ্যাপক বসু বলেন—ভেবেছিলাম জাতীয়তা-বাদের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটা সবাই বুঝবে, কিন্তু আমার অনেক নিকট-বন্ধুরাও এই বিষয়ে আমাকে ভাল বোঝেন না, মনে করেন এটা আমার একটা খেয়াল মাত্র। এতদিন যা করেছি,

তা যদি দেশের লোক না নেয়, তখন অবসাদ মুহূর্তে মনে হয়, এর বুঝি দাম নেই! তবে আমি বিশ্বাস করি, মাতৃভাষা ছাড়া দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানকে ছড়িয়ে দেবার অন্য কোন পথ নেই। কারণ আমাদের মনের গোপন কথা সহজ সরল ভাবে আমরা মাতৃভাষাতেই ব্যক্ত করতে পারি।

পরিশেষে তিনি বলেন—তোমাদের এই সাহচর্যে একটা আশা মনে জাগে—এতদিন যা করে এসেছি, তাতে কারো কারো মনে অন্ততঃ সাড়া জেগেছে। তোমরা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছ। এজন্যে তোমাদের আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

অধ্যাপক বসুর প্রতিভাষণের পর অতীতের স্মৃতিকথা শোনান ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন ডাঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী বাণী দাসগুপ্তা, অঞ্জলি ও মঞ্জু ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মুন্সী ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং সবশেষে সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য প্রদর্শন করে কুমারী কেকা গঙ্গোপাধ্যায়। ডাঃ মহাদেব দত্ত, ডাঃ শিবব্রত ভট্টাচার্য ও শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন, আগামী বছর জানুয়ারী মাসে অধ্যাপক বসুর সপ্ততিতম বর্ষ পূর্তি যথাযথ ভাবে উদ্‌যাপনের জন্যে ইতিমধ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং এই উপলক্ষে বিশিষ্ট বিদেশী ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মৌলিক গবেষণা-নিবন্ধ ও আলোচনা সংকলন করে একটি স্মারক-গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, ডাঃ সহায়রাম বসু, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, অধ্যাপক নীরেন রায়, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রচরণ গুহ, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ, শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব, শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, ডাঃ নির্মলকুমার বসু, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী, ডাঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বাসন্তীদুলাল নাগ চৌধুরী, ডাঃ সুবোধকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বিদ্বজ্জন উপস্থিত ছিলেন।

রিহান্দ বাঁধ উদ্বোধন

আজকার এবং আগামীকালের বিস্ময়কর নিদর্শন হলো এই রিহান্দ বাঁধটি। গত ৭ই জানুয়ারী, উত্তর প্রদেশের দক্ষিণপূর্বাঞ্চলে নির্মিত রিহান্দ বাঁধের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু উল্লিখিত মন্তব্য করেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে এই বাঁধটিকে জনগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই বাঁধ নির্মাণে অর্থসাহায্য দিয়েছেন।

এই বাঁধের জন্যে এখানে গোবিন্দবল্লভ পন্থ সাগর নামে যে হ্রদটি তৈরী হয়েছে, ভারতের কৃত্রিম হ্রদের মধ্যে এটিই বৃহত্তম। এই হ্রদের বিস্তৃতি ১৮০ বর্গমাইল এবং এতে জল ধরে মোট ৮৬ লক্ষ একর ফুট। এই বাঁধের জলের সাহায্যে ২৫০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে এবং এই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে ধাতব সম্পদে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের উন্নতি সাধন সম্ভব হবে।

রিহান্দ পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে উত্তর প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলকে ঘিরে। ভারতের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলের অন্যতম হলেও রিহান্দ উপত্যকা উত্তর প্রদেশের সর্বাপেক্ষা অনুন্নত অঞ্চল। রিহান্দ নদী উপত্যকা খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কিন্তু বিদ্যুৎ-শক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে এখানকার খনিজ সম্পদ এতদিন মানুষের আয়ত্তের বাইরে ছিল এবং উপযুক্ত সেচব্যবস্থার অভাবে দারিদ্র্য ছিল এখানকার কৃষকদের চিরসঙ্গী।

রিহান্দ পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ায় এই অঞ্চলে সমৃদ্ধির নবযুগ সূচিত হয়েছে। দশ বছর আগে, যেখানে নগণ্য কয়েকটি কুটির ছিল, এক-শ' জন লোকও বাস করতো কিনা সন্দেহ, আজ সেখানে

বাঁধ এলাকাকে ঘিরে গড়ে-ওঠা নতুন শিল্পগুলি হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান করছে। রিহান্দ বাঁধ থেকে তিন মাইল দূরে স্থাপিত হয়েছে হিন্দুস্থান অ্যালুমিনিয়াম কর্পোরেশন (হিন্দ অ্যালকো)। রিহান্দ বাঁধটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করবার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁর দলবলসহ এই শিল্পসংস্থাটি পরিদর্শন করেন।

ভারতের বর্তমান জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেছে। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত বহু দ্রব্য নির্মাণে অ্যালুমিনিয়াম একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

বর্তমানে রিহান্দ বাঁধের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্প্রসারণ পরিকল্পনা করেছেন এঁরা। প্রধান কারখানার কাছে একটি অ্যালুমিনিয়াম দ্রব্য নির্মাণের কারখানা স্থাপনও এঁদের পরিকল্পনাভুক্ত।

রিহান্দ পরিকল্পনাধীন ছয়টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটি চালু হওয়ায় রাজ্য সরকার এই এলাকার শিল্পসংস্থাগুলিকে পুরাদমে উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যকরী করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

রিহান্দ এলাকায় একটি সিমেন্টের কারখানা, একটি বৃহদাকার রাসায়নিক শিল্পের কারখানা, টায়ার ও টিউব তৈরীর কারখানা, কষ্টিক সোডা উৎপাদনের কারখানা, একটি কাগজের কারখানা, এবং অন্যান্য ছোটখাটো ও আনুসঙ্গিক শিল্পের
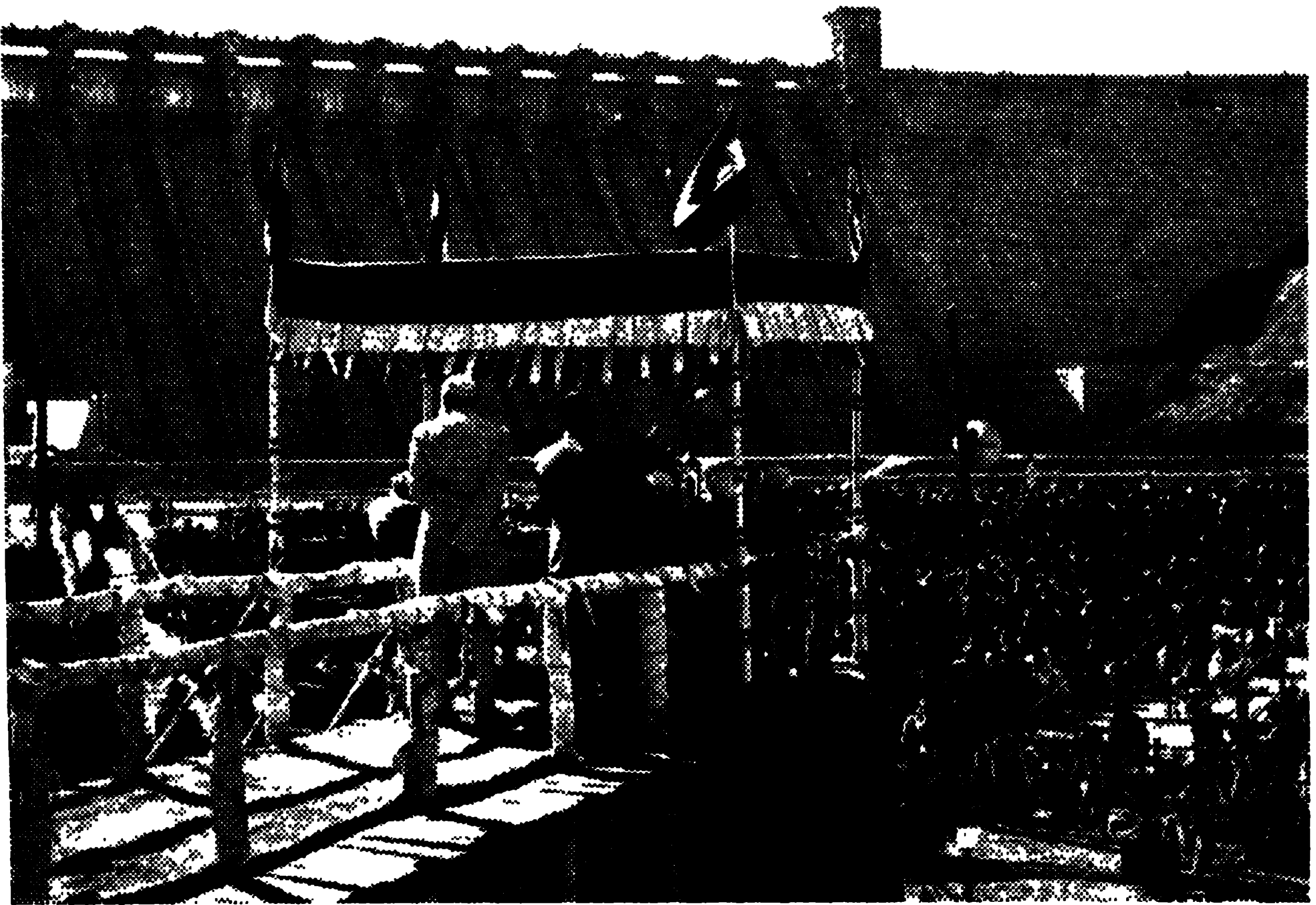
প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু কর্তৃক রিহান্দ বাঁধের উদ্বোধন।

হিন্দ অ্যালকোকে প্রায় ৩০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করে। এই শিল্পসংস্থার বার্ষিক উৎপাদন ২০,০০০ টন; কিন্তু শীঘ্রই বছরে ৫০,০০০ টন অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের জন্যে একটি কারখানা গড়ে উঠছে। রিহান্দ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকে এই সব কারখানায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে রিহান্দের

বিদ্যুৎ-শক্তি প্রভূত সহায়তা করবে। বিহার, উত্তর প্রদেশ ও বাংলার প্রধান প্রধান শিল্পকেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করবে রিহান্দের বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত রেলপথ। রেলপথগুলির বিদ্যুতিকরণের দ্বারা মালপত্র প্রেরণেরও বিশেষ সুবিধা হবে।

রিহান্দ পরিকল্পনা মুখ্যতঃ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে রচিত হলেও রিহান্দ বাঁধের দ্বারা এই এলাকার ১,৪০০,০০০ একর কৃষিজমিতে জলসেচের প্রভূত সুযোগ পাওয়া যাবে। রিহান্দের বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে এখানকার ২,৫০০টি নলকূপ থেকে পাম্পের দ্বারা জল সরবরাহ করা হবে। এর ফলে উত্তর প্রদেশের ষোলোটি জেলার ২৫,০০০ বর্গমাইল এলাকা উপকৃত হবে। রিহান্দ বাঁধের জলপ্রবাহ প্রয়োজনমত উন্মুক্ত করে বিহারের শোন নদের খালগুলিকে বারো মাস জলপূর্ণ রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর দ্বারা এই অঞ্চলের অতিরিক্ত ৫,০০০,০০০ একর জমিতে সেচের সুবিধা পাওয়া যাবে।

বৈষয়িক উন্নয়নের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন অত্যাবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপরে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতের এই মৌলিক শিল্পটির সম্প্রসারণের কাজে যুক্তরাষ্ট্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনা কালে ভারতের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট : দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে এই উৎপাদনের পরিমাণ ৫৭ লক্ষ কিলোওয়াটে পৌঁছায়; তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট। উৎপাদনের লক্ষ্য পূর্ণ হলে ১৫ বছরের মধ্যে ভারত ১ কোটি ৪ লক্ষ কিলোওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে; অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার সূচনায় যা ছিল, তদপেক্ষা ৪৫০ শতাংশ বেশী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। এক সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যায় যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫৬ শতাংশ (৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট) যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তায় সম্পন্ন হবে। অর্থ এবং কারিগরী সহযোগিতার মাধ্যমে ভারতকে এই সাহায্য প্রদত্ত হবে।

পরলোকে অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন ১৩ই জানুয়ারী তাঁহার নিউ আলিপুরের বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

'ডাঃ সেন ১৮৯৪ সালের ২৩শে মে, ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজসাহী গভর্ণমেন্ট কলেজ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশুনা করেন এবং ১৯১৬ সালে গণিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ডাঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ স্নেহময় দত্ত প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জার্মেনীতে বিখ্যাত অধ্যাপক লাউর অধীনে 'থিওরী অব রিলেটিভিটি'র উপর গবেষণা করিয়া ডাঃ সেন পি. এইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

দেশে ফিরিবার পর তিনি সার আশুতোষের অনুরোধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'রাসবিহারী ঘোষ প্রফেসর অব ম্যাথেমেটিক্স্'-এর পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯২৪ হইতে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই দীর্ঘ ৩৫ বৎসরে তিনি ছাত্র ও সহকর্মীদের সঙ্গে যুক্তভাবে অনেক গবেষণার কাজ করিয়াছেন। অ্যাষ্ট্রোফিজিক্স, কোয়ান্টাম থিওরী ও থিওরী অব রিলেটিভিটির উপর তাঁহার অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ আছে। তিনি কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্সের ডীন ছিলেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব বলিয়া যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তিনি সেই গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং 'কিশলয়' পুস্তকের বিজ্ঞানের অংশ তাঁহারই লিখিত। ইহা ছাড়া তিনি বাংলা ভাষায় বহু বিজ্ঞানের প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন এবং বেতার-ভাষণও দিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর অবৈতনিক অধ্যাপক ছিলেন। মৃত্যুর মাস দুয়েক পূর্বেও তিনি সেখানে নিয়মিত ক্লাস লইতেন। মাস দেড়েক ধরিয়া তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন।'

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

৩ঞ্জান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ দ্বিতীয় সংখ্যা

ভিটামিন

শ্রীহৃষীকেশ চৌধুরী

প্রকৃতির শ্যামল বক্ষ হইতে মানুষ আবহমান কাল খাদ্য আহরণ করিতেছে। পুরাকাল হইতেই পুষ্টির জন্য প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট এবং খনিজ পদার্থমিশ্রিত জল খাদ্যের উপকরণরূপে গণ্য হইত। কিন্তু লুনিন ১৮৮১ সালে একটি ইঁদুরকে শুধু প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থমিশ্রিত জল দিয়াও বেশী দিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই সকল পদার্থের অতিরিক্ত এমন একটি অত্যাবশ্যক বস্তু আছে, যাহার অভাবে দেহের বৃদ্ধি তো দূরের কথা, নানা রকম রোগের উপদ্রবে দেহ ক্লান্ত হইয়া অবশেষে চিরশান্তি লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকদের এই অত্যাবশ্যক বস্তুটি আবিষ্কারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। সেই সময় জাহাজের নাবিকেরা কিন্তু জানিত যে, টাট্‌কা ফল বা শাকসব্জী স্কার্ভি রোগের প্রতিষেধক। কিন্তু কিসের অভাবে রোগের উৎপত্তি হয়—তাহা অজ্ঞাত ছিল। প্রায় আশি-পঁচাশি বৎসর আগে জাপানী নাবিকেরা সমুদ্রে থাকিবার-সময় কলে-ছাঁটা চাউল খাইবার দরুণ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিত। জাপানী শব্দ 'বেরিবেরির' মূল অর্থ হইল—'অতি দুর্বল'। তখন জাপানী নৌবহরের প্রধান ডাক্তার ছিলেন টাকাকি। তিনি লক্ষ্য করেন—ইংরেজ বা আমেরিকান নাবিকেরা এই রোগে আক্রান্ত হয় না। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন যে, জাপানী নাবিকদের খাদ্যতালিকা ইংরেজ ও আমেরিকান নাবিকদের খাদ্যতালিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ইহাই রোগের কারণ

নির্ণয় করিয়া জাপানী নাবিকদের আহার্যে কলে-ছাঁটা চাউল কমাইয়া মাংস, বার্লি ও শাকসব্জীর পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। খাদ্য পরিবর্তনের দরুণ জাপানীদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ ক্রমশঃ দূরীভূত হইল, কিন্তু রোগের উৎপত্তির কারণ টাকাকি নিরূপণ করিতে পারিলেন না।

ঠিক একই সময়ে ১৮৯৭ সালে যবদ্বীপে ওলন্দাজ আইকম্যান ছিলেন জেলের চিকিৎসক। জেলে কয়েদীদের তখন কলে-ছাঁটা চাউল খাইতে দেওয়ায় জাপানী নাবিকদের মত তাহারাও বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইত। কলে-ছাঁটা চাউলের ভাত খাইতে দেওয়ায় জেলের মুরগীগুলির মধ্যেও এক ধরণের রোগ দেখা দিয়াছিল। এই রোগের নাম 'পলিনিউরাইটিস'। উপসর্গ হিসাবে দেখা দিত ঘাড় বাঁকা, খোঁড়াইয়া হাঁটা, দুর্বল হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য আইকম্যান চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ একদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন—কয়েকটি রোগগ্রস্ত মুরগী পুনরায় সোজা হইয়া হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া জানিতে পারিলেন যে, ঘটনাচক্রে কলে-ছাঁটা চাউলের ভাতের বদলে মুরগীগুলিকে কয়েক দিন ধরিয়া সস্তা দামের ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত খাইতে দেওয়া হইতেছে। আইকম্যান দুই রকম চাউলই লক্ষ্য করিলেন। কলে-ছাঁটা চাউল পরিষ্কার ও ভাত সাদা হয়, কিন্তু ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলে কুঁড়া থাকে ও ভাত দৃশ্যতঃ কিছুটা অপরিষ্কার হয়। আইকম্যান কয়েকটি রোগগ্রস্ত মুরগীকে শুধু চাউলের কুঁড়া জলে গুলিয়া খাইতে দিলেন। কয়েক দিন পর মুরগীগুলি সুস্থ হইয়া উঠিল। অন্য দিকে কয়েদীদেরও ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত খাইতে দেওয়ায় ক্রমশঃ তাহাদিগকে সুস্থ হইতে দেখা গেল। আইকম্যান পাস্তুরের প্রভাবে বিশ্বাস করিলেন—ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভিতরে এমন একটি 'অত্যাবশক বস্তু' আছে, যাহা মানুষের বেরিবেরি ও পাখীর 'পলিনিউরাইটিস' রোগের প্রতিষেধক। ১৯১১ সালে ফুঙ্ক্ আইকম্যানের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং স্বীকার করিলেন যে, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলে এমন একটি পদার্থ আছে, যাহার অভাবে মানুষের বেরিবেরি রোগ হয়।

১৯১২ সালে হপ্‌কিন্স একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিলেন যে, খাদ্যের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যাহার অভাবে জীবনধারণ অসম্ভব। একটি প্রাণীকে যখন প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থমিশ্রিত জল খাইতে দেওয়ার পরেও অসুস্থ হইতে দেখা যায়, তখন অল্প পরিমাণে দুধ নিয়মিত খাদ্যতালিকায় যোগ করিলে রোগের উপসর্গ কমিতে থাকে। সুতরাং দুধের ভিতরে এমন একটি পদার্থ আছে, যাহাতে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়। এই বিষয়টি তখন বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশেষে ফুঙ্ক্ ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল হইতে এমন একটি পদার্থ পৃথক করিতে সক্ষম হইলেন, যাহা মানুষের বেরিবেরি ও পাখীদের পলিনিউরাইটিস রোগের প্রতিষেধক বলিয়া জানা গেল। ফুঙ্ক্ ছিলেন পোল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক ও লণ্ডনের লিস্টার ইনষ্টিটিউটে পায়রার উপর বিভিন্ন খাদ্যের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণা করিতেন। তিনি গবেষণালব্ধ জিনিষটির নাম দিলেন ভিটামিন। এই নামকরণের একটি কারণ আছে। আমিষ বা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে তাহা শরীরে প্রবেশ করিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড নামে একটি পদার্থে পরিণত হইবার পর রক্তের সঙ্গে মিশে। অ্যামিনো অ্যাসিড শব্দের অ্যামিনো আর ভিটা (vita)—যাহার অর্থ জীবন। ফুঙ্ক্ এই শব্দ দুইটি হইতে 'ভিটামিন' শব্দ সৃষ্টি করিলেন। ফুঙ্কের আবিষ্কৃত চাউলের কুঁড়া হইতে অজানা পদার্থটি পরে ভিটামিন-বি নামে পরিচিত হয়। ফুঙ্কের ধারণা ছিল, শুধু বেরিবেরিই

নয়, রিকেট্‌স্, স্কার্ভি এবং পেলেগ্রা প্রভৃতি রোগও কোন প্রকারের খাদ্যের অন্তঃস্থ বস্তুর অভাবের দরুণই হয়। পরে জানা গেল, শুধু দেহের পুষ্টি বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নহে—বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ও আরোগ্য করিবার শক্তি ইহার মধ্যে নিহিত আছে। এমন অনেক অসুখ আছে, শত চেষ্টায়ও যাহা নিরাময় করা যায় না, সেই সকল ক্ষেত্রে ভিটামিন প্রয়োগে অদ্ভুত ফল পাওয়া যায়। বাংলায় ভিটামিনকে 'খাদ্যপ্রাণ' নামে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান জগতে অনেক প্রকারের ভিটামিনের সঙ্গে আমরা পরিচিত। তবে ইহাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথম—স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিন এবং দ্বিতীয়—জলে দ্রবণীয় ভিটামিন। ইহারা আবার গুণাগুণ অনুযায়ী কয়েক ভাগে বিভক্ত।

(ক) নিম্নলিখিত ভিটামিনগুলি স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় :—

১। ভিটামিন-এ ; সংক্রমণরোধক

২। ভিটামিন-ডি

৩। ভিটামিন-ই ; অনুর্বরতারোধক, আল্‌ফা টকোফেরল

৪। ভিটামিন-কে ; রক্তে প্রোথ্রম্বিন গঠনের অত্যাবশ্যক বস্তু

(খ) নিম্নলিখিত ভিটামিনগুলি জলে দ্রবণীয় :—

১। ভিটামিন-বি ও বি-কমপ্লেক্স

২। ভিটামিন-সি, অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড

৩। ভিটামিন-পি, সাইট্রিন

ভিটামিন-এ

মেক্‌লাম এবং ডেভিস ১৯৩৫ সালে ঘোষণা করেন যে, দুধের মাখন ও ডিমের কুসুমে এমন এক বস্তু আছে, যাহা প্রাণীদেহ বৃদ্ধির জন্য অত্যাবশ্যক। ১৯১৭ সালে মেক্‌লাম ও সাইমণ্ড স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় এ-র অভাবে চোখের অসুখ জেরোপথ্যালমিয়ার কথা উল্লেখ করেন। মেক্‌লাম যাহাকে স্নেহ জাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় 'এ' নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন, বর্তমানে তাহাই ভিটামিন-এ নামে পরিচিত। এই ভিটামিনের অভাবে বহু শিশু অন্ধ হইয়া যায়। জেরোপথ্যালমিয়া রোগের উপসর্গ হিসাবে প্রথমে চোখের পাতা ফোলা এবং চোখের ভিতরের কোণে স্ফীতি, রাত্রে অল্প আলোতে দেখিতে অসুবিধাবোধের (Night-Blindness or Nyctalopia) কথা উল্লেখ করা যায়। এই সকল উপসর্গ দেখা দিলেই সাবধান হওয়া উচিত। শিশুদের অন্ধত্ব ও চোখের নানা প্রকারের অসুখ এই ভিটামিনের অভাবের দরুণ হইয়া থাকে। যাহার মধ্যে ভিটামিন-এ আছে, সেই সকল খাদ্য রোগীকে নিয়মিত খাইতে দিলে রোগের অনেক উপসর্গ কমিয়া যায় এবং রোগী সুস্থ হইয়া উঠে। ইহার অভাবে মূত্রাশয়ের অসুখ ও চামড়া খসখসে বা অমসৃণ হয়। দেহের অস্থি ও দাঁতের বৃদ্ধিও সঠিকভাবে হয় না এবং দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। পুরুষ ইঁদুরের বেলায় ইহার অভাবে প্রজনন-ক্ষমতা পর্যন্ত অনেকাংশে হ্রাস পায়। এই ভিটামিনের অভাবে আমাদের দেহে নানাবিধ রোগ বিশেষতঃ শ্লেষ্মা, সর্দিজ্বর সম্পর্কিত অসুখের আক্রমণ হইয়া থাকে।

সামুদ্রিক মাছ, কড্‌মাছের যকৃৎ, ডিমের কুসুম, দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য, সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্জী, গাজর প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে। বর্ষার গরুর দুধে ভিটামিন-এ শীতকাল অপেক্ষা বেশী থাকে। কারণ বর্ষাকালে গরু প্রচুর পরিমাণে সবুজ ঘাস খাইতে পারে।

ভিটামিন-ডি

এই ভিটামিনের আর একটা নাম হইল 'রিকেট রোগ প্রতিরোধক'। ইহার অভাবে দেহের অস্থি ও দাঁতের সুসম বৃদ্ধি না হইয়া বিকৃত হইয়া যায়। বাল্যকালে যখন দেহ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন এই

ভিটামিনের অভাব যাহাতে না হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। শৈশবাবস্থায় ইহার অভাবে রিকেট রোগের আক্রমণ হয় এবং দাঁতের গঠন ভাল হয় না ও নানা রোগে আক্রান্ত হয়। রিকেট রোগাক্রান্ত শিশুদের হাত-পা অনেকটা ধনুকের মত বাঁকা হইয়া যায়। কারণ ইহার অভাবে দেহ ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসের ব্যবহার ঠিক মত করিতে না পারায় দেহের অস্থিগুলি সুসমভাবে বৃদ্ধি পায় না। ১৯১৯ সালে হাল্‌ড্‌স্কিনস্কী প্রমাণ করেন যে, রিকেট রোগীর দেহে আলট্রাভায়োলেট আলো প্রয়োগে রোগের উপশম হয়। আলট্রাভায়োলেট আলোতে ভিটামিন-ডি আছে। ১৯৩১ সালে আনগাস ও তাঁহার সহকর্মীরা কেলাসিত অবস্থায় ভিটামিন-ডি-কে পৃথক করিতে সক্ষম হন। সকাল বেলার সূর্যালোকে ভিটামিন-ডি প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং ইহা রোগ-প্রতিরোধক। সেই জন্য সকালবেলার সূর্যালোকে তেল মাখাইয়া শিশুকে রাখা উচিত। আমেরিকায় আলট্রাভায়োলেট অভিসিক্ত দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয় ভিটামিন-ডি-এর অভাব পূরণের জন্য।

দুগ্ধ, মাখন, ডিমের কুসুম, কড্‌মাছের যকৃৎ, চর্বিযুক্ত মাছ প্রভৃতিতে ভিটামিন-ডি-এর অবস্থিতি জানা যায়। তবে কড্‌মাছের যকৃৎ ও ডিমের কুসুমে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে।

ভিটামিন-ই

ভিটামিন-ই-কে আবার আল্‌ফা টকোফেরল নামেও অভিহিত করা হয়। ১৯২২ সালে বিশপ এবং ইভান্‌স্‌ লক্ষ্য করেন যে, ইঁদুরের সন্তানধারণের ক্ষমতা বহুলাংশে তাহার খাদ্যের কোন একটি অত্যাবশ্যক বস্তুর উপরই নির্ভরশীল। দেহের বৃদ্ধি বা পুষ্টি থাকা সত্ত্বেও সন্তানধারণের ক্ষমতা হ্রাস পাইতে দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়াছিলেন। বেশ কিছুদিন পরে এই অতি দরকারী বস্তুটি ভিটামিন-ই বা অনুর্বরতারোধক ভিটামিন নামেই পরিচিত হয়। ইভান্‌স্‌ ও ইমারসন গমের অঙ্কুরের তেলে এই ভিটামিনের সন্ধান পান। এই ভিটামিনের অভাবে সন্তানধারণের ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট হইয়া যায় এবং পুরুষের বেলায় শুক্রাশয়ের আকার ছোট হইতে থাকে। হৃদ্‌রোগ ও রক্তশিরা সম্পর্কিত রোগে ইহার প্রয়োগ বিশেষরূপে ফলপ্রদ হয়। ক্রমাগত নিয়মিত ব্যবহারে রক্তের জমাট-বাঁধা নিবারিত হয় ও করোনারি থ্রম্বোসিস হইতেও মনুষ্য সমাজ রক্ষা পাইতে পারে। ১৯২৫ সালের পূর্বে করোনারী থ্রম্বোসিস সম্বন্ধে চিকিৎসকেরা খুব কমই চিন্তা করিতেন। ইংল্যাণ্ডের একটি হিসাব হইতে জানা যায়, করোনারী ধমনী সংক্রান্ত রোগে মৃত্যুসংখ্যা ১৯২৬ সালে ছিল ১৮৮০ এবং ১৯৩৬ সালে ১৪০৯৫। মৃত্যুসংখ্যা ১৯৫৬ সালে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৭৪৭৯০তে। সুতরাং এই রোগের ক্রমবিস্তারের প্রতি লক্ষ্য রাখা বর্তমান সমাজের প্রয়োজন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, ভিটামিন ব্যবহারে রক্তের জমাট-বাঁধা নিবারণ করিয়া জমাট-বাঁধা রক্ত পুনরায় গলাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় এবং রক্তের সঙ্গে পুনর্মিশ্রণের ফলে রক্তে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন সঞ্চারিত হয়। ইহার ফলে দেহের ভিতরের ক্ষরণশীল ক্ষত নিরাময়ে অভূতপূর্ব সহায়তা হয়। পায়ের শিরটানা রোগও ইহার প্রয়োগে আরোগ্য হইতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত অসুখের ইহা একটি মূল্যবান ঔষধ। ক্যানাডার ডাঃ মুঠে হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত রোগে এই ভিটামিন ব্যবহারে প্রভূত ফল পাইয়াছেন। গর্ভকালে ইহা ভাবীমাতাকে নিয়মিত বেশী পরিমাণে খাইতে দিলে মৃতবৎসা দোষ দূরীভূত হয় এবং সুস্থ সবল সন্তানের জন্ম দিতে দেখা যায়। যে সকল পুরুষের শুক্রাশয়ের আয়তন হ্রাসের জন্য প্রজনন-ক্ষমতা হ্রাস পায়, সেই সকল ক্ষেত্রেও এই ভিটামিন ব্যবহারের দরুণ প্রভূত ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। তবে সুস্থ হইবার পরও ইহা নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত, যাহাতে পুনরায় তাহা না হয়।

ছেলে-মেয়েরা আজকাল প্রায়ই চোখে চশমা ব্যবহার করে। চশমা না থাকিলে তাহারা বেঞ্চে বসিয়া দুরের ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা পড়িতে পারে না। ইহাকে সর্ট সাইট বা মাইওপিয়া বলা যায়। ইহার ফলে শুধু কাছের জিনিষ দেখা যায়, কিন্তু দুরের কোন জিনিষ দেখা যায় না। অক্ষিগোলকের তন্তুগুলির পুষ্টির অভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ক্রমাগত বেশী পরিমাণে নিয়মিত ভিটামিন-ই ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় স্বাভাবিক হইতে দেখা যায় এবং শেষপর্যন্ত চশমা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

যে সকল শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি এবং বুদ্ধি ও মনের বিকাশ কম কিংবা দেখিতে বলহীন, কথা বলিতে তোতলামি দেখা যায়, সেই সকল ক্ষেত্রে এই ভিটামিনের নিয়মিত ব্যবহারে আশ্চর্যজনক ফল পাইতে দেখা গিয়াছে। পোলিও রোগে আক্রমণের পরেও যে সকল শিশু বাঁচিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে অনেককেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত অবস্থায় দেখা যায়। ভিটামিন-ই নিয়মিত বেশী পরিমাণে প্রয়োগে সে সকল ক্ষেত্রেও উপসর্গ কমিতে দেখা যায়।

ডায়াবেটিস রোগে একবার আক্রান্ত হইলে সমস্ত জীবনই ইনসুলিন ইনজেক্সন লইয়া অতি সাবধানে কাটাইতে হয়। ভিটামিন নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারের ফলে রক্তে চিনির পরিমাণ কমিতে দেখা যায় এবং পরে ইনসুলিন লইবারও প্রয়োজন থাকে না। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে কয়েক প্রকার চর্মরোগও আরোগ্য হইতে দেখা যায়। অগ্ন্যাশয় ও যকৃতের প্রদাহঘটিত পেটের পীড়ায় এই ভিটামিন ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

ভিটামিন-ই-কে আবার 'যৌবন সঞ্জীবনী' নামেও অভিহিত করা যায়। প্রৌঢ়ত্ব ও অকাল বার্ধক্যে শরীর ও মন যখন নিস্তেজ হইয়া আসে, তখন ইহা নিয়মিত ব্যবহারে শরীর ও মনে অপূর্ব আনন্দ ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে রক্তের চাপ বৃদ্ধি, ইন্দ্রিয়গুলির স্বাভাবিক শক্তি ও যৌনশক্তি হ্রাস ও স্ত্রীলোকের ঋতুবন্ধের পর যখন পূর্ববর্ণিত লক্ষণ দেখা দেয়, তখন এই ভিটামিন ব্যবহারে তাহা দুরীভূত হইতে দেখা যায়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, এইরূপ অবস্থায় ইহার সঙ্গে ভিটামিন-এ যে সকল খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহাও নিয়মিত খাদ্যতালিকাভুক্ত করা উচিত।

সয়াবিন, লেটুস, যবের খৈ, গম, যকৃৎ, ডিমের কুসুম, গমের অঙ্কুর, বাদাম, পেস্তা ও মাখন প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই আছে। তবে হাইকম্যান ও হেরিসের মতানুযায়ী ইহার প্রাত্যহিক প্রয়োজন খুবই কম—দিনে ৩০ মিলিগ্র্যামই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট।

ভিটামিন-কে

ডাম, ১৯২৯ সালে খাদ্যে এমন একটি ভিটামিনের সন্ধান পান, যাহার অভাবে রক্তের মধ্যে প্রোথ্রম্বিন নামক পদার্থের হ্রাস লক্ষ্য করেন। প্রোথ্রম্বিনের দরুণ রক্ত সহজে ঘনীভূত হইতে পারে। কাজেই কোন কারণে দেহে ক্ষত বা ক্ষরণ ঘটিলে রক্তপাত যখন সহজে বন্ধ হইতে চাহে না, তখন ইহাকে অনেকাংশে ভিটামিন-কে-এর অভাবের দরুণ ধরা যায়। এই অবস্থায় ভিটামিন-কে নিয়মিত ব্যবহারে এই দোষ সারিয়া যাইতে দেখা যায়। ডাম এই ভিটামিনের নাম দেন—'Koagulation vitamin', অর্থাৎ যে ভিটামিন রক্ত জমাট বাঁধাইতে পারে। সদ্যোজাত শিশুর অনেক সময় প্রবল রক্তক্ষরণজনিত রোগে মৃত্যু ঘটে। এইরূপ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে শিশুটিকে ভিটামিন-কে ইন্‌জেকশন দেওয়া অথবা পূর্ব হইতেই অবস্থাদৃষ্টে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ভাবীমাতাকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন খাইতে দিলে ভাল হয়। কামলা রোগে ভিটামিন-কে খুবই ফলপ্রদ।

সাধারণতঃ সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্জী, তেজপাতা ও কপিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-কে আছে। ফল, টোম্যাটো ও দুধে কম দেখা যায়।

ভিটামিন-বি ও বি-কমপ্লেক্স

ভিটামিন-বি একটা বিরাট দল ও ইহার মধ্যে বিভিন্ন ভিটামিন দেখা যায়। ইহাদের কার্যকারিতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নামকরণ করা হইয়াছে; তবে বাহ্যিক আকারগত বা দৃশ্যতঃ কোন রাসায়নিক মূল্যানুযায়ী ইহারা প্রত্যেকেই একে অন্য হইতে পৃথক।

১। **ভিটামিন বি$_1$—থিয়ামিন**:—ইহার অভাবে বেরিবেরি রোগের আক্রমণ হয় এবং সেই জন্যই ইহার আর এক নাম হইল—বেরিবেরি প্রতিরোধক ভিটামিন। তবে বেরিবেরি যে শুধু ভিটামিন-বি$_1$-এর অভাবেই নয়, অন্যান্য ভিটামিনের মিলিত অভাবেই হইয়া থাকে, তাহা বর্তমানে জানা গিয়াছে। ইহার অভাবে প্রাণীদেহের স্নায়ুতন্ত্র ও রক্তসংবহন-তন্ত্রে বিরাট আড়োলন দেখা যায়, যাহার ফলে দেহে পঙ্গুতা এবং অবশেষে মৃত্যু ঘটিতে দেখা দেয়। এই ভিটামিনের অভাব হইলে প্রাথমিক উপসর্গ হিসাবে খাওয়ার অনিচ্ছা, অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্তিবোধ ও স্নায়ুতন্ত্রের প্রদাহ প্রভৃতি দেখা দেয়। ইহার অভাবে ইঁদুরের শারীরিক বৃদ্ধি বন্ধ হয় ও শুক্রাশয়ের ক্ষীণতাহেতু প্রজননক্ষমতা পর্যন্ত হ্রাস পায়। ভাবীমাতা গর্ভাবস্থায় অনেক সময় বমনের জন্য কষ্ট ভোগ করে—সেই সময় এই ভিটামিন ব্যবহারে সুফল পাইতে দেখা গিয়াছে। খাইবার অনিচ্ছা হেতু পরিপাক-ক্ষমতা পর্যন্ত হ্রাস পায়। পাকস্থলীর জারক রস ক্ষরণ কম হইবার জন্য এই ভিটামিনের অভাবকে দায়ী করা হয়। বেরিবেরি রোগের উপসর্গগুলি খুব জটিল এবং কিছু সংখ্যক রোগীর হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতাই এই রোগের উপসর্গ হিসাবে দেখা যায়। পরে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হইয়া রোগীর মৃত্যু ঘটে। প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার, বেরিবেরি রোগের উপসর্গ হিসাবে প্রায়ই পা ফুলিতে দেখা যায়, আঙ্গুলের চাপে যে গর্ত হয়, তাহা সহজে পূর্ব অবস্থায় আসে না। এই ভিটামিন ব্যবহারের ফলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হইতে থাকে এবং তাহার অভাবে স্পন্দন কমিয়া আসে। বেরিবেরি রোগের অন্যতম উপসর্গ হিসাবে বহু রোগী হৃৎপিণ্ড সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত না হইয়াও স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ হেতু মৃত্যুবরণ করে। ১৯৩২ সালে উইনডায়াস এবং ওটক ভিটামিন-বি$_1$-কে কেলাসিত অবস্থায় খাদ্য হইতে আলাদা করিতে পারিয়াছেন।

ছোলার ডাল, সয়াবিন, দুধ, আটা, মটর ডাল এবং ঢেঁকিছাঁটা লাল আবরণযুক্ত চাউলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-বি$_1$ আছে। কপি, গাজর, আলু, মিষ্টিআলু, পেঁয়াজ, টোম্যাটো ও বাদামে এই জাতীয় ভিটামিনের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

২। **ভিটামিন বি—$_2$রিবোফ্ল্যাবিন**:—ইহাকে ভিটামিন-বি নামেও অভিহিত করা হয়। ইহার অভাবে জিহ্বার স্ফীতি ও মেজেন্টা রং দেখা যায় এবং ঠোঁটের রং লাল ও খাঁজকাটা দেখায় এবং চামড়া আঁশ আঁশ হইয়া যায়। উপসর্গ হিসাবে দেহে রক্তের অভাব ঘটে এবং শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়া আসে। চোখেমুখে জ্বালা অনুভূত হয় এবং বেশীভাবে চামড়ার কুঞ্চন লক্ষিত হয় এবং ইহার অভাবে সন্তানধারণের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। নিয়মিত ভিটামিন-বি$_2$ ব্যবহারে উল্লিখিত উপসর্গগুলি হ্রাস পাইতে দেখা যায়।

টাট্‌কা সবুজ শাকসব্জী, দুধ, ডিম, যকৃৎ, অঙ্কুরযুক্ত ছোলা, আটা ও সয়াবিনে প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন থাকে। ফলের মধ্যে কলা, কমলা ও আপেলেও ইহার অবস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়াছে।

৩। **নিকোটিনিক অ্যাসিড**:—এলভিজ্যাম এবং তাঁহার সহকর্মীরা ইহার নামকরণ করেন। নিকোটিনের সঙ্গে যাহাতে ভুল না হয়, সেই জন্য ইহাকে নিয়াসিন নামেও অভিহিত করা হয়। ইহাকে পেলেগ্রা প্রতিরোধক ভিটামিনও

বলা হয়। যে সকল লোক ভুট্টার ছাতু, শূকরের চর্বিযুক্ত মাংস ও গুড় প্রধান খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে, তাহারাই সাধারণতঃ পেলেগ্রা রোগে আক্রান্ত হয়। গোল্ডবার্জার টাট্‌কা মাংস, ডিম ও দুধ প্রভৃতি খাইতে দিয়া রোগীকে তাড়াতাড়ি রোগমুক্ত হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বর্তমানে জানা গিয়াছে যে, টাট্‌কা মাংস, দুধ ও ডিমে নিকোটিনিক অ্যাসিড আছে। সাধারণতঃ অনেক ধূমপায়ীদের মনে একটি দৃঢ় ধারণা আছে যে, প্রচুর ধূমপানের ফলে যে নিকোটিন নামক বিষ তাহাদের দেহে সঞ্চিত হয়, এই নিকোটিনিক অ্যাসিডযুক্ত দুধ বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিলেই বুঝি তাহা নষ্ট হইবে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। পেলেগ্রা রোগের উপসর্গ হিসাবে পেটের অসুখ বা উদরাময়, চর্মরোগ ও চামড়ার কুঞ্চন বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। নিকোটিনিক অ্যাসিড নিয়মিত ব্যবহারে মানসিক অবস্থা ও অন্যান্য উপসর্গ দূর হইতে দেখা যায়। কুকুরের দেহে নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাব হইলে জিহ্বা কালো হইতে দেখা যায়।

যকৃৎ, দুধ, মাংস (সাধারণতঃ মুরগী), মাছ, আটা, যবের ছাতু, যবের খৈ, টাট্‌কা সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্জী, টোম্যাটো প্রভৃতিতে নিকোটিনিক অ্যাসিড আছে।

৪। **ভিটামিন-বি৬—পিরিডক্সিন**—ইহার অভাবে ইঁদুর, মুরগী, কুকুর ও শূকরের চামড়ায় নানারকম রোগ দেখা দেয় এবং কান, নাক ও পা ফুলিয়া যায়। ইহার অভাব ঘটিলে পায়ের নীচের চামড়ায় অসহ্য যন্ত্রণা হয়। প্রাথমিক উপসর্গ দেখিয়া পেলেগ্রার ন্যায় মনে হইলেও নিকোটিনিক অ্যাসিড ব্যবহারে এই সকল উপসর্গ দূর হয় না। মানুষের শরীরে ভিটামিনের অভাব হইবার কথা নয়, কারণ পৌষ্টিকনালীর মধ্যে ইহা তৈয়ারী হইতে পারে.

যকৃৎ, টাট্‌কা শাকসব্জী, আটা, দুধ, মাংস এবং ঢেকিছাঁটা লাল আবরণযুক্ত চাউলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-বি৬ আছে।

৫। **প্যানটোথেনিক অ্যাসিড**—মানবদেহে ইহার প্রয়োজন কতটুকু, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তবে ইহার অভাবে ইঁদুরের দেহের বৃদ্ধির অভাব, চর্মরোগ ও পায়ের লোম পাকিতে দেখা যায়। যাহাদের অল্প বয়সে চুল পাকে, তাহাদের এই ভিটামিন ব্যবহারে সুফল পাইতে দেখা যায়। অবশ্য ইহা সর্বজনগ্রাহ্য মত নয়।

যকৃৎ, ডিম, মিষ্টি আলু, দুধ, টোম্যাটো প্রভৃতিতে এই অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে আছে।

৬। **বাইওটিন, ভিটামিন-এইচ**—শুধু ডিমের সাদা অংশ ইঁদুরকে খাইতে দিলে দেহে প্রবল চর্মরোগ দেখা দেয় ও দেহের সমস্ত লোম পড়িয়া যায় ও অবশেষে তাহাদের মৃত্যু ঘটে। এইরূপ অবস্থায় ডিমের কুসুম ইঁদুরকে খাইতে দিলে পুনরায় সুস্থ হইতে দেখা যায়। যাহাদের চুল পড়ে, তাহারাও বাইওটিন যে সকল খাদ্যে আছে, তাহা নিয়মিত আহার করিলে সুফল পাইতে পারে। যকৃৎ ও ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে ইহা আছে।

৭। **ইনোসিটল**—ইনোসিটল ও বাইওটিনের মধ্যে যে একটি নিকট সম্পর্ক আছে, তাহা অনেকেই মনে করেন। ইহার অভাবে ইঁদুরের দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ও চুল পড়িতে দেখা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে ইনোসিটলযুক্ত খাদ্য ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। অল্প বয়সে চুলপাকা ও চুলপড়া ইত্যাদির জন্য প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, বাইওটিন ও ইনোসিটলযুক্ত খাদ্যাভাবকেই অনেকাংশে দায়ী করা হয়। এই জন্য এই সকল ক্ষেত্রে উল্লিখিত ভিটামিনযুক্ত খাদ্য নিয়মিত ব্যবহার করা উচিত।

মাংস, যকৃৎ, টাট্‌কা শাকসব্জী, ফল প্রভৃতিতে প্রচুর পরিমাণে ইহা থাকে

৮। **কোলিন**—ইহার অভাবে লিভারে

চর্বি জমা ও মূত্রযন্ত্রের ক্ষত হইতে দেখা যায়। ইহার ক্রমাগত অভাবে লিভার, সিরোসিস নামক ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। কোলিনযুক্ত খাদ্য নিয়মিত ব্যবহারে লিভারের সিরোসিস রোগে সুফল পাইতে দেখা যায়।

চাউলের অঙ্কুর, ডিমের কুসুম এবং যকৃতে প্রচুর পরিমাণে ইহা আছে।

৯। **ফোলিক অ্যাসিড**—ইহার অভাবে মানসিক অসমতা ও কাজে উৎসাহের অভাব ঘটে এবং দেহের বৃদ্ধিও বাধাপ্রাপ্ত হয়। স্প্রু রোগে ও গর্ভাবস্থায় রক্তশূন্যতায় ফোলিক অ্যাসিড ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল পাইতে দেখা যায়। দেহের বৃদ্ধি ও রক্ত তৈয়ারীর জন্য প্রাণীদেহে ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োজন যথেষ্ট।

য·়তের নিষ্কাশনে, প্রচুর পরিমাণে ফোলিক অ্যাসিড থাকে। তবে সহজলভ্য খাদ্যগুলির মধ্যে কলা, গাজর, কপি, টাট্‌কা মটরশুঁটি, টোম্যাটো, আটা, সবুজ ও পাতাযুক্ত শাকসব্জীতে ইহার অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

১০। **ভিটামিন বি$_{১২}$**—ভিটামিন বি$_{১২}$ও যে দেহের বৃদ্ধির জন্য দরকার, শ্রব তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। ফোলিক অ্যাসিডের মত ইহার অভাবে দেহে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এই সকল উপসর্গ দূর করিতে ফলকার লিভারের নিষ্কাশন ব্যবহারে সুফল পাইয়াছিলেন। ইহা নিয়মিত ব্যবহারে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

মাছ, যকৃৎ, দুধ সবুজ পাতাযুক্ত টাট্‌কা শাকসব্জী ও সয়াবিনে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

ভিটামিন-সি বা অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড

ইহার আর এক নাম হইল 'স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধক'। পূর্বে নাবিকেরা জাহাজে থাকাকালীন টাট্‌কা সবুজ শাকসব্জী ও ফল-মূল না খাইবার দরুণ এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এই রোগের উপসর্গ হিসাবে দেহের যে কোন স্থান হইতে রক্তপাতের ফলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। স্কার্ভি রোগের উপসর্গ হিসাবে দাঁত এবং মাড়িও রোগগ্রস্ত হয়। যে সকল শিশু কোন কারণে মাতৃ-দুগ্ধ হইতে বঞ্চিত হয় ও গোদুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোন উপায় থাকে না, সেই সকল স্থলে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড (কমলা লেবু বা অন্য কোন লেবুজাতীয় ফলের রস) যাহাতে প্রত্যেক দিন খাওয়ান হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ টাট্‌কা গরুর দুধে অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিডের পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ হইতে অনেক কম—চারি ভাগের একভাগ মাত্র। যাহারা নানাপ্রকার দাঁতের অসুখ (পাইওরিয়া প্রভৃতি) ও রক্তশূন্যতায় ভোগে ও শরীরের বৃদ্ধি হয় না, সে সকল স্থলেও অ্যাস্কর্বিক অ্যাসিড ব্যবহারে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়।

লেবুজাতীয় ফলে ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। টাট্‌কা সবুজ পাতাযুক্ত শাকসব্জী, আলু, স্যালাড, কপিতেও ইহা প্রচুর আছে। অল্প তাপেই ইহা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং ইহাকে পাইতে হইলে টাট্‌কা, কাঁচা অকৃত্রিম অবস্থায় গ্রহণ করিলে সুফল পাওয়া যায়। সাধারণ বাতাসের সংস্পর্শে পর্যন্ত ইহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। লেবুজাতীয় ফল ছাড়া অন্য সকল টাট্‌কা ফলেও ইহা প্রচুর পরিমাণে আছে। টাট্‌কা যে কোন ফল প্রত্যহ গ্রহণ করিলে দেহে ইহার অভাব হইবার কথা নহে।

ভিটামিন-পি-সাইট্রিন

ইহাকে ভিটামিন-সি-এর অন্তর্গত ভিটামিন বলা যায়। কারণ যে খাদ্যে ভিটামিন-সি থাকে, সেই সকল খাদ্যে ভিটামিন-পি-এর অবস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং ইহাকে ভিটামিন-সি-এর আনুসঙ্গিক বলা যায়। লেবুজাতীয় ফল, আম, জাম প্রভৃতি টাট্‌কা ফলের শাঁস ও খোসার মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। অজ্ঞতাবশতঃ ফলের রস খাইয়া আমরা প্রায়ই ছিব্‌ড়া ফেলিয়া দেই। এই ছিব্‌ড়ার মধ্যেই থাকে ভিটামিন-পি। কমলা বা অন্য কোন

ফল খাইবার সময় ফলের আবরণী ও বিচি বাদে সবটাই খাওয়া উচিত।

করোনারী থ্রম্বোসিসের কথা আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। তবে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহন করিবার একটি যন্ত্রবিশেষ ও হৃৎপিণ্ড সুস্থ রাখিবার জন্য এক জোড়া ধমনী আছে, যাহার নাম করোনারি আর্টারী। এই ধমনী দুইটির মারফৎ হৃৎপিণ্ডের সবগুলি কোষ বাঁচিবার মত উপযুক্ত খাদ্য ও অক্সিজেন নিয়মিত পায়। সম্ভবতঃ খাদ্যে ভেজালের দরুণ এবং অতিরিক্ত আমিস ও তৈল জাতীয় খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ ও শ্রমবিমুখতাসহ আনুসঙ্গিক আধুনিক যুগের জীবনযাত্রার দরুণ রক্তে কোলেস্টেরল নামক একটি অপকারী পদার্থ বৃদ্ধি পায়। ইহার প্রভাবে ধমনীর গায়ে রক্ত জমাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। রক্ত একটি তরল পদার্থ এবং সেই জন্য জমাটবাঁধা যখন বেশী হয়, তখন ধমনীর রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী কোন খাদ্য পায় না। অবশেষে দুর্বল হইয়া চিরতরে স্তব্ধ হয়। মানসিক পরিশ্রম, অতিরিক্ত আরামপ্রিয়তা, শ্রমবিমুখতা, আধুনিক যুগের কর্মচঞ্চল উত্তেজনা-পূর্ণ জীবনযাত্রা, মানসিক অতৃপ্তি, আমিষ ও তৈলজাতীয় খাদ্য প্রত্যহ গ্রহণ প্রভৃতিও এই রোগের অন্যতম কারণ। বাহুল্যবর্জিত জীবন-যাত্রা, নিরামিষ খাদ্য গ্রহণ এবং স্থিতপ্রাজ্ঞতা, শান্ত সমাহিত তৃপ্ত মনোভাবের অনুশীলন ও শারীরিক শ্রমই এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বলিয়া ধরা যায়। ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, যাহারা শারীরিক শ্রম করে, তাহারা এই রোগে কমই আক্রান্ত হয়।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা গিয়াছে যে, রুটিন নামক একপ্রকার পদার্থ ভয়াবহ করোনারি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ—রক্তের জমাট-বাঁধা দোষটি নিরাময় করিতে পারে। এই রুটিনের আর এক নাম হইল ভিটামিন-পি। ইহাকে পাইতে হইলে প্রত্যহ ফল খাইবার অভ্যাস করিতে হইবে। করোনারি রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ভিটামিন-পি-এর সঙ্গে ভিটামিন-ই যে সকল খাদ্যে আছে, তাহা নিয়মিত প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিলে সুফল পাইবার কথা।

ইহাই হইল মোটামুটি ভিটামিনগুলির পরিচয়। আদিম ও অরণ্যজীবনে মানুষ অনায়াসে নিজের অজ্ঞাতে ভিটামিনপুষ্ট খাদ্য লাভ করিত, কিন্তু সভ্য-জগতের অধিবাসী এই বিংশ শতাব্দীর মানুষের আজ একমাত্র প্রয়াস হইল, খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সংযোগ করা। কিন্তু ক্রমশঃ তাহা সংগ্রহ করা দুরূহ হইয়া উঠিতেছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে বটিকা ও তরলাকারে ভিটামিন প্রস্তুত করিয়া মানুষের প্রয়োজন মিটাইতেছেন। আমরা সদ্য সংগৃহীত শাকসব্জী, মাছ, ডিম, মাংস, দুধ, যকৃৎ ইত্যাদি ব্যবহারে নিজেদের দৈনন্দিন ভিটামিনের প্রয়োজন মিটাইতে পারি। মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে যাহাদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে, তাহারা সামান্য চেষ্টায় টাট্কা শাকসব্জী, ছোলা, আটা, লেবু, সাধারণ ফলমূল সংগ্রহ করিতে পারে। ভিটামিন ব্যতীত প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট অথবা স্নেহ জাতীয় খাদ্য সহজে হজম হয় না। বিশেষতঃ ভিটামিন-বি কমপ্লেক্সের অভাবে অন্ত্রের ক্ষমতা এত কমিয়া যায় যে, হজমের শক্তি প্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার পূর্বে এই বিষয়ে প্রত্যেকেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

সৌরশক্তির উৎস

শ্রীনীরদগোপাল মুখোপাধ্যায়

মানব-সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সূর্যের প্রচণ্ড শক্তিকে—অভিভূত হয়েছে তার অসীমতায়। নানা ভাষায় নানা ছন্দে প্রণতি জানিয়েছে অসীম শক্তিধর আদিদেবকে। মানব-সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জানা গেল, সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত বিকিরিত শক্তির এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র আসে পৃথিবীতে। শক্তির সাধারণ এককে সমগ্র শক্তির পরিমাণ প্রায় এক অবিশ্বাস্য সংখ্যা। অসীম শূন্যের নক্ষত্র-সভায় সূর্য এক অতি সাধারণ জ্যোতিষ্ক মাত্র। সূর্যের চেয়ে বড় কোন নক্ষত্রের বিকিরিত শক্তির পরিমাণ প্রায় আমাদের কল্পনার অতীত। এই প্রচণ্ড শক্তির কথা স্মরণ করলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগে—এই শক্তির উৎস কোথায়? প্রায় প্রতিটি প্রাচীন ধর্মেই সৌর শক্তিকে বর্ণনা করা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তার অমিত শক্তির বহিঃপ্রকাশ রূপে। সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা সুরু হয় মাত্র দেড়-শ' বছর আগে।

প্রথম দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, নক্ষত্রগুলির শক্তির উৎস মাধ্যাকর্ষণজনিত আয়তন সঙ্কোচন। একথা সত্য, নক্ষত্রের মত বড় বড় বস্তুপিণ্ডের আয়তন সঙ্কোচনের ফলে শক্তির বিকাশ সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতিতে বিকিরিত শক্তির পরিমাণের হার প্রত্যক্ষ হারের সঙ্গে মেলে না। আয়তন-সঙ্কোচনের ফলে উৎপন্ন হলে সৌরশক্তি অনেক দিন আগেই নিঃশেষিত হয়ে যেত।

বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হয়। নক্ষত্রের পদার্থের তেজস্ক্রিয়তাকে নক্ষত্র-শক্তির সম্ভাব্য উৎসরূপে ধারণা করতে সুরু করলেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু দেখা গেল, পদার্থের স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না, নক্ষত্র-শক্তির উৎপাদনের হার সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল নক্ষত্রের তাপমাত্রার উপর। সুতরাং এই তত্ত্ব অচল।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সুরু হলো নতুন করে পর্যালোচনা। এডিংটন, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ নক্ষত্র-বিজ্ঞানীরা এগিয়ে এলেন তাঁদের মনীষা নিয়ে। প্রথমেই সুরু হলো জ্যোতিষ্কের ভৌতাবস্থা নির্ধারণ। এথেকেই পাওয়া গেল সম্ভাব্য উত্তর। দেখা গেল, নক্ষত্রনিচয় গঠিত হয়েছে অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে। নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা প্রায় দেড় থেকে তিন কোটি সেন্টিগ্রেড। এই প্রচণ্ড উত্তাপে সমস্ত অণুই ভেঙে যায় পরমাণুতে। পরমাণু থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে কক্ষপথে বিচরণকারী ইলেকট্রন। অখণ্ড থাকে শুধু পরমাণুর কেন্দ্র। এই প্রচণ্ড উত্তাপে পরমাণুর কেন্দ্রগুলি এত বেগে ছুটাছুটি করতে থাকে যে, তাদের পক্ষে পরমাণু-কেন্দ্রের বিকর্ষণ বলকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়। ফলে প্রচণ্ড বেগে পরমাণুর কেন্দ্রে কেন্দ্রে সংঘর্ষ ঘটে। সুরু হয় এক ধরণের পারমাণবিক বিক্রিয়া এবং তারই ফলে মুক্তিলাভ করে অপরিসীম শক্তি। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক পদার্থগুলির একেবারে বহির্ভাগের কক্ষপথের ইলেকট্রনের সামান্য অদল-বদল ঘটে; ভিতরের ইলেকট্রন বা পরমাণু-কেন্দ্র পূর্বাবস্থাতেই থাকে। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়ার উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ অনেক কম।

প্রধানতঃ দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বিক্রিয়ায় পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সম্ভব। পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মাঝারী ওজনের পরমাণু-কেন্দ্রের

বিক্রিয়ায় তেমন শক্তি উৎপন্ন হয় না। অপেক্ষাকৃত ভারী ওজনের পরমাণু-কেন্দ্র, যথা—২৩৫ ভরের ইউরেনিয়াম-কেন্দ্র, বিক্রিয়ার ফলে প্রায় সমান ওজনের দুটি পরমাণু-কেন্দ্রে ভেঙে যায়। আবার কখনও দুই বা ততোধিক হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রে সংযুক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরমাণু সৃষ্টি করে। নক্ষত্রের ক্ষেত্রে বিভাজন-পদ্ধতিতে শক্তি উদ্ভবের প্রশ্নই ওঠে না। কারণ, বিভাজনের জন্যে প্রয়োজনীয় ভারী পরমাণু-কেন্দ্র প্রায় অধিকাংশ নক্ষত্রেই অনুপস্থিত। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, নক্ষত্রে সংযোজন-প্রক্রিয়ায়ই শক্তির বিকাশ ঘটে।

সংযোজন-পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনের জন্যে তাপমাত্রা অনেক হওয়া প্রয়োজন। নতুবা নগ্ন পরমাণু-কেন্দ্রের বিকর্ষণ বলকে অতিক্রম করে সংঘর্ষ সম্ভব হয় না। নক্ষত্রের প্রথমাবস্থায় আয়তন সঙ্কোচন বা স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়া অথবা দুটি পদ্ধতিতেই শক্তির উদ্ভব ঘটে। তখন সুরু হয় পরমাণু-কেন্দ্রের সৃষ্টি এবং তাদের সংঘাত। এই সংঘাতে উদ্ভূত শক্তির অধিক পরিমাণ বিচ্ছুরণকে (Radiation) বাধা দেয় নক্ষত্রের বিরাট বস্তুপিণ্ড। ফলে নক্ষত্রের মধ্যে চলে এক তাপ-কেন্দ্রিক বিক্রিয়ার (Thermonuclear Reaction) অনন্ত পরিক্রমা।

সংযোজন-পদ্ধতিতে শক্তির বিকাশ সম্পর্কিত তত্ত্বটি আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে বেথে এবং ভাইজাকারের গবেষণার ফলে। গ্যামো, অ্যাট্কিনসন প্রমুখ পদার্থবিদেরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, পরমাণু-কেন্দ্রের বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দ্রুত কমতে থাকে। তাই অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎযুক্ত ছোট ছোট পরমাণু-কেন্দ্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা অনেক বেশী। কাজেই হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্র বা প্রোটনের মধ্যে মাত্র এক একক ধন বিদ্যুৎ থাকায় সংযোজন-পদ্ধতিতে শক্তি উৎপাদনে প্রোটনের বিক্রিয়ার সম্ভাবনাই সর্বাধিক। মার্কিন পদার্থবিদ্ বেথে এবং জার্মান বিজ্ঞানী ভাইজাকার স্বতন্ত্রভাবে প্রোটন সংক্রান্ত সব রকম সম্ভাব্য পারমাণবিক বিক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখেন যে, এগুলিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটিতে ঘটে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের বিক্রিয়া, আর একটিতে ঘটে প্রোটনের সঙ্গে অন্য কোন হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রের বিক্রিয়া। বেথে এবং ভাইজাকারের মতে, নবসৃষ্ট নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার সম্ভাবনা থাকলেও পুরাতন নক্ষত্র, যথা—সূর্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে শেষোক্ত পদ্ধতিতে বিক্রিয়া একেবারেই সম্ভব নয়। তার কারণ, একমাত্র প্রোটন ব্যতীত একটি নির্ধারিত সময়ের বেশী শক্তি উৎপন্ন করবার মত যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্র কোন নক্ষত্রেই নেই। হাল্কা পরমাণু হিলিয়াম অবশ্য প্রায় সব নক্ষত্রেই প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু উৎপন্ন পরমাণু-কেন্দ্র অত্যন্ত অস্থায়ী বলে প্রোটনের সঙ্গে হিলিয়াম পরমাণুর কোন বিক্রিয়া হয় না।

প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংযোজন ঘটে প্রধানতঃ দুটি পদ্ধতিতে। একটিতে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে; অপরটিতে কার্বন-চক্রের আবর্তনে প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের সংযোজন ঘটে পরোক্ষভাবে। কার্বন পরমাণু-কেন্দ্র শুধু প্রভাবকের কাজ করে। দুটি পদ্ধতিরই অন্তিম পরিণতি হিলিয়াম পরমাণুতে।

পরোক্ষ পদ্ধতি বা কার্বন-চক্র অনুযায়ী প্রথমে একটি শক্তিপুষ্ট প্রোটন নক্ষত্রের অভ্যন্তরস্থ একটি ১২ ভরের কার্বন পরমাণু-কেন্দ্রকে আঘাত করে। ফলে প্রোটন এবং কার্বন পরমাণুর সংযোজনে সৃষ্টি হয় ১৩ ভরবিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় নাইট্রোজেন সমস্থানিক। তাপমাত্রা, ঘনত্ব এবং কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রের বিকর্ষণ বল প্রভৃতি বিবেচনা করে বেথে গণনা করে দেখিয়েছেন যে, সূর্যের ক্ষেত্রে গড়ে প্রায় দশ লক্ষ বছরে একটি প্রোটনের সঙ্গে একটি কার্বন পরমাণু-কেন্দ্রের সংযোজনমূলক সংঘাত সম্ভব। ১৩ ভরের

নাইট্রোজেন সমস্থানিক সৃষ্টির প্রায় ১০ মিনিট পরেই নাইট্রোজেন থেকে একটি পজিট্রন বের হয়ে যায়। ফলে সৃষ্টি হয় ১৩ ভরের একটি অস্থায়ী কার্বন পরমাণু-কেন্দ্র। প্রায় দু-লক্ষ বছর সূর্যের অভ্যন্তরে উত্তপ্ত গ্যাসের ভিতরে বিচরণ করে এই কার্বন পরমাণু-কেন্দ্র আরও একটি প্রোটন আত্মসাৎ করে সৃষ্টি করে ১৪ ভরের একটি স্থায়ী নাইট্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্র এবং গামা-রশ্মি। প্রায় তিন কোটি বছর পরিক্রমার পর এই নাইট্রোজেন-কেন্দ্র একটি প্রোটন আত্মসাৎ করে' ১৫ ভরের তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-কেন্দ্র এবং গামা-রশ্মির সৃষ্টি করে। প্রায় দু-মিনিটের মধ্যেই তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-কেন্দ্র একটি পজিট্রন ত্যাগ করে পরিণত হয় ১৫ ভরের নাইট্রোজেন-কেন্দ্রে। প্রায় দশ হাজার বছর পরে ঘটে চূড়ান্ত বিক্রিয়া। ১৫ ভরের নাইট্রোজেনের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটে একটি প্রোটনের। এক্ষেত্রে আর সাধারণ সংযোজন ঘটে না। সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট বৃহৎ পরমাণু-কেন্দ্র ভেঙে যায় ১২ ভরের কার্বন এবং ৪ ভরের হিলিয়াম-কেন্দ্রে। এই চক্রের আবর্তনে পুনরায় একটি ১২ ভরের কার্বন-কেন্দ্র সৃষ্টি হওয়ায় কার্বনের কাজকে একটি প্রভাবকের কাজের সঙ্গে তুলনা করা চলে। একটি পজিট্রন ত্যাগ একটি ইলেকট্রন গ্রহণের সমতুল্য। তাই ধরা যায়, কার্বন-চক্রে দুটি ইলেকট্রন এবং চারটি প্রোটন থেকে সৃষ্টি হয় একটি হিলিয়াম পরমাণু-কেন্দ্র। কিন্তু দেখা যায়, হিলিয়াম-কেন্দ্রের ওজন চারটি প্রোটনের ওজনের মাত্র ৯৯% [ইলেকট্রনের ওজন এত সামান্য যে, গণনায় না ধরলেও চলে]। এই ১% ভর পরিণত হয়েছে শক্তিতে। আইনষ্টাইনের সূত্র অনুযায়ী ভরক্ষয়কে আলোর গতিবেগের বর্গ দিয়ে গুণ করলে তুল্য পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়। ভর-ক্ষয় সামান্য হলেও আলোর গতিবেগ এক বিরাট সংখ্যা। এই গতিবেগের বর্গ করায় শক্তির পরিমাণও হয় বিরাট।

শুধুমাত্র প্রোটন-প্রোটন সংযোজনও ঘটে এক জটিল পদ্ধতিতে। তাপমাত্রা প্রভৃতি বিবেচনা করে দেখা গেছে, সাত-শো কোটি বছরে দুটি প্রোটনের সংযোজনে সৃষ্টি হয় একটি ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু-কেন্দ্র বা ডয়টেরন এবং একটি পজিট্রনের। ডয়টেরনটি উৎপন্নের প্রায় দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই আরও একটি প্রোটন অধিকার করে সৃষ্টি করে ৩ ভরের একটি হিলিয়াম পরমাণু-কেন্দ্র এবং গামা-রশ্মি। প্রায় তিন লক্ষ বছর পরে দুটি তিন ভরের পরমাণু যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে একটি ৪ ভরের হিলিয়াম এবং দুটি প্রোটন। কার্বন-চক্রের মতই ভরক্ষয় থেকে উৎপন্ন হয় শক্তি।

বর্ণালী-বিশ্লেষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় কোন্ জ্যোতিষ্কে কোন্ মৌলিক পদার্থ কতখানি আছে, তা জানা সম্ভব। কার্বন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পদার্থের প্রাচুর্য থেকে কোন নক্ষত্রের বিকিরিত শক্তির হার গণনা করা যায়। বিকিরিত শক্তির তাত্ত্বিক হার এবং প্রত্যক্ষ হারের তুলনা করে দেখা গেছে, সূর্যের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্রের কার্বন-চক্র এবং নিষ্প্রভ নক্ষত্রের ক্ষেত্রে প্রোটন-প্রোটন সং-যোজনের সম্ভাবনা বেশী। সূর্যের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতিই সম্ভব হলেও প্রোটন-প্রোটনের বিক্রিয়ার সম্ভাবনা সমধিক।

কার্বনের বদলে অন্য কোন পরমাণু-কেন্দ্রের সংযোজনের বিপক্ষে যুক্তি আছে। প্রায় প্রতিটি নক্ষত্রের তাপমাত্রা দেড় থেকে তিন কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। প্রায় দু-কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় কার্বনের চেয়ে হাল্কা পরমাণু-কেন্দ্রের বিক্রিয়া ঘটলে প্রত্যক্ষ হারের প্রায় দশ হাজার গুণ শক্তি পাওয়া যেত। আবার কার্বনের চেয়ে ভারী অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটলে শক্তির হার হতো মাত্র এক লক্ষাংশ ভাগ মাত্র।

কাজেই নিঃসন্দেহে বলা যায়—সৌরশক্তি, তথা যে কোন জ্যোতিষ্কের শক্তি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ কার্বন-চক্রের আবর্তন বা প্রোটন-প্রোটন বিক্রিয়া।

রাধানাথ শিকদার

(১৮১৩-১৮৭০)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

জন্ম ও শৈশবাবস্থা

সার্ধ শতবর্ষ পূর্বে এমন একজন বঙ্গ-সন্তানের আবির্ভাব হয়েছিল, যিনি গণিতশাস্ত্রে অপরিসীম প্রতিভাধর ছিলেন। জরিপ কার্যে (Survey) তাঁর অবদান সর্বজনস্বীকৃত ও সমাদৃত।

স্বর্গীয় রাধানাথ শিকদার ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে জোড়াসাঁকোর শিকদারপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন[১]। রাধানাথের পিতার নাম তিতুরাম।

তৎকালীন রীতি অনুযায়ী রাধানাথ প্রথমে পাঠশালায় প্রেরিত হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হিন্দু (অপর নাম অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান) কলেজে প্রবেশ করেন। সন্তোষজনকভাবেই লেখাপড়ায় তাঁর অগ্রগতি হতে থাকে এবং ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন। গ্রীসের ইতিহাস, ভূগোল, ইংল্যাণ্ডের ইতিবৃত্ত, ভার্জিলের ঈনিড, শেক্সপীয়র, হোমারের ওডিসি, রাসেলের আধুনিক ইউরোপ, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় তাঁর সময়ে পাঠ্যতালিকার[২] অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হিন্দু কলেজের পরিবেশটি ছিল বড়ই মহনীয়। এখানে রাধানাথ দু'জন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে আসেন ও তত্ত্বাবধানে থাকেন—একজন ডাঃ টাইটলার এবং অপর জন মহামতি হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ডাঃ টাইটলার অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আর উদার মনোভাবাপন্ন ডিরোজিও কলেজের চতুর্থ শিক্ষক হয়েও মূলে ছিলেন ছাত্রবৃন্দের প্রধান উপদেষ্টা এবং পরম সুহৃদ। রাধানাথের সহপাঠীরাও ভবিষ্যৎন সকলেই কৃতী সন্তান হিসেবে পরিগণিত হন[৩]।

ডাঃ টাইটলারের শিক্ষকতায় অঙ্কশাস্ত্রে রাধানাথের পাঠক্রম নিম্নোক্ত রূপ ছিল: ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩২—এই কয়েক বছরের ভিতর ক্রমান্বয়ে Euclid—প্রথম থেকে চতুর্থ পুস্তক, বীজগণিত, ইউক্লিড ষষ্ঠ পুস্তক, Fluxions, Maxima and Minima, স্পর্শক (Tangents), Rectifications, Quadratics, গোলকাকার ত্রিকোণমিতি (Spherical Trigonometry), Taylor এবং Maclaurin-এর উপপাদ্য, Kepler-এর সম্পাদ্য, Windhouse-এর বিশ্লেষণাত্মক ত্রিকোণমিতি Analytical Trigonometry), Johnson's Fluxions, Lagrange-এর উপপাদ্য, Windhouse-এর জ্যোতির্বিদ্যা। গণিতবিদ্যার এই রকম সর্বাত্মক পাঠ্যতালিকা[৪] বিশ্লেষণ করলেই রাধানাথ শিকদারের ন্যায় ভাবী-গণিতবেত্তার কিছু আভাস পাওয়া যায়।

জরিপ সংস্থায়

ডাঃ টাইটলার রাধানাথের সম্বন্ধে অতি উচ্চ মত পোষণ করতেন এবং তাঁরই চরণপ্রান্তে নিউটনের Principia-এর মত কঠিন পুস্তকের বিষয় শিক্ষার সুযোগ রাধানাথের হয়েছিল। এই সময় একটা

---

* পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহোদয় রাধানাথের সহপাঠিগণের প্রসঙ্গে লিখে গিয়েছেন—

"দক্ষিণারঞ্জনো রামো রসিক : কৃষ্ণমোহন : ।
তারাচাঁদো রাধানাথো গোবিন্দশ্চন্দ্রশেখরঃ ॥
হরচন্দ্রো রামতনুঃ শিবশ্চন্দ্র মাধবঃ।
মহেশোঽহমৃতলালশ্চ প্যারীচাঁদো মধুব্রতাঃ॥"

ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাই রাধানাথের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল।

তখনকার দিনে গণিতশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত কর্নেল এভারেস্ট ভারতীয় জরিপ সংস্থার প্রধান কর্ণধার (Surveyor General of India এবং Superintendent of Great Trigonometrical Survey of India) ছিলেন। একদা তিনি বন্ধু ডাঃ টাইটলারের নিকট একজন সুযোগ্য পরীক্ষার্থীর অনুসন্ধান করলে ডাঃ টাইটলার সানন্দে রাধানাথের নাম সুপারিশ করেন। সুতরাং কলেজের শেষ পরীক্ষার পূর্বেই বিকাশোন্মুখ রাধানাথ ভারতীয় মহাত্রিকোণমিতি সংস্থার (G. T. Survey of India) গণনা বিভাগে (Computing Department) মুহুরীর (Computer) কার্যে নিযুক্ত হলেন। বেতন স্থিরীকৃত হয় প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা এবং স্বীয় কর্মদক্ষতায় রাধানাথ পরিশেষে ঐ বিভাগে সর্বপ্রধান কর্মচারীর পদে (Chief Computer) আসীন ছিলেন এবং তৎকালে (যখন মুদ্রাস্ফীতি কল্পনারও অতীত ছিল) তাঁর বেতন ছিল প্রতি মাসে ছয় শত টাকা।[৫] কর্মে ব্যাপৃত থাকাকালে এভারেস্ট সাহেবের অকৃপণ তত্ত্বাবধানে রাধানাথ উচ্চতর গণিতবিদ্যায় স্বীয় নিরলস সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কর্মে নিযুক্ত হবার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা ত্যাগ করে হিমালয়ের শিখরে শিখরে কর্নেল এভারেস্ট-এর সঙ্গে ভ্রমণ করতে থাকেন। 'বহু দুর্গম ও দুর্লভ স্থানে' গমন করবার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।[৬]

জরিপ কর্মে নিযুক্ত অবস্থায়ই ১৮৫২ খৃষ্টশতকে রাধানাথ কলিকাতার সরকারী মানমন্দিরের (Government Observatory) সুপারিটেণ্ডেণ্ট পদে (জনৈক ইউরোপীয় কর্মচারীর অবসর প্রাপ্তিতে) অধিষ্ঠিত হন।[৭] (তখনকার দিনে উক্ত মানমন্দির জরিপ সংস্থারই অধীনে একটি বিভাগ মাত্র ছিল)।

রাধানাথের অবদান

সেকালে ভারত সরকারের জরিপ বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তক ছিল—A Manual of Surveying for India (প্রথম সংস্করণ, ১৮৫১)। এটির সংগ্রাহক ছিলেন—Captaions R. Smyth এবং H L. Thuillier। বইখানি পাঁচভাগে বিভক্ত (পৃষ্ঠা ২৪+৭১৮+পরিশিষ্ট ১৫টি চিত্র সম্বলিত):—

Part I — Geometry, Trigonometry etc. — Chapters I—VII.

Part II — On Surveying Instruments — Chapters I—IX.

Part III — On Surveying Instruments—Chapters I—XXVII.

Part IV — On the Khusrah or Native Field Measurement — Chapters I — VI.

Part V — Practical Astronomy and its application to Surveying — Chapters I — IX.

তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগটি মুখ্যতঃ রাধানাথের অধ্যবসায়ের ফলে রচিত। পূর্বোক্ত সংগ্রাহক-দ্বয় পুস্তকটির ভূমিকায় সশ্রদ্ধ চিত্তে রাধানাথের নামে এই বিষয়ে স্বীকৃতি জানিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গে এটুকুও বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাধানাথের অবদানই বইখানির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, বিজ্ঞানসম্মত ও প্রামাণ্য অংশ। সংক্ষেপে বলতে গেলে বইখানির এক-ষষ্ঠাংশ রাধানাথের পরিশ্রম ও ধীশক্তির ফলস্বরূপ।

উপরন্তু Tables (১৮৫১ খৃষ্টশতকে প্রথম প্রকাশিত) নামে আর এক সঙ্কলন রাধানাথ করেছিলেন। এখানি পরিবর্ধিত আকারে কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই কাজে রাধানাথের উত্তরসাধক হিসেবে C. T. Haig, R. E., J. T. Walker, R. E., F. R. S., এবং J. B. N.

Hennessey, F. R., A. S.,-এর নামোল্লেখ করতে হয়।

এছাড়া কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে চাপমানাঙ্ক সংশোধন বিষয়ক একটি গণনার তালিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। এটাও রাধানাথের গবেষণালব্ধ ফল। *[৮]

রাধানাথের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি—পৃথিবীর উচ্চতম বিন্দু এভারেষ্ট শিখরের আবিষ্কার। তিনি তখন উত্তর-পূর্বাঞ্চলে পর্যবেক্ষণ-কার্যে ব্যাপৃত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে একদিন প্রভাতে রাধানাথ (যিনি সহপাঠিগণের কাছে 'বাবু' রূপে সমধিক প্রসিদ্ধ) সে সময়কার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা Sir Andrew Waugh-এর ঘরে উর্ধ্বশ্বাসে এসে জানালেন যে, পৃথিবীর উচ্চতম গিরিশৃঙ্গের আবিষ্কার তিনি করতে সক্ষম হয়েছেন।[৯]

কেমন করে রাধানাথের নিপুণ গণনায় এভারেস্ট শিখর নাটকীয়ভাবে ধরা পড়লো—তা একদিকে যেমন উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য, অপরদিকে তেমনি তা রাধানাথের অসামান্য ধীশক্তি-ও দক্ষতারই পরিচায়ক। প্রাক-রাধানাথ জরিপ-কর্মচারীরা ছয়টি বিভিন্ন স্থান থেকে ঐ শিখরের জরিপ-ক্রিয়া করেছিলেন—কিন্তু তাঁরা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেন নি যে, দূরবীক্ষণের মাধ্যমে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গিরিশিখর তাঁদের নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হচ্ছে।[১০] সর্বাগ্রে রাধানাথই এই সমাধানটি করে দিয়ে সর্বজনশ্রদ্ধেয় এবং কীর্তির অধিকারী হয়ে রইলেন। আবিষ্কারের পরই হলো শিখরটির নামকরণ। চিহ্নিত-করণের পূর্ব পর্যন্ত শিখরগুলি সচরাচর রোমান সংখ্যায় চিহ্নিত হতো। (এভারেস্ট শিখরের নাম ছিল 'শৃঙ্গ ১৫' [peak XV])।[১১]

চিরনীহারময় এই তুঙ্গ বিন্দুটির নামকরণ করা হয় শিকদার মহাশয়ের উর্ধ্বতন সর্বপ্রধান ও এক সময়ের সহকর্মী George Everest-এর নামানুসারে। এভারেস্ট আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই তাতে আরোহণের প্রয়াস সুরু হলো। আজও তার বিরাম নেই—আরোহণের নব নব উদ্যম ও প্রচেষ্টা। ইদানীং কালের এভারেস্ট শিখরের সমধিক প্রসিদ্ধির মূলে রয়েছে—রাধানাথের নিরলস সাধনা। (অবশ্য রাধানাথকে এই সুমহান কীর্তির অধিকারী হওয়া থেকে বঞ্চিত করতে অপপ্রয়াসও কম হয় নি)।[১২] কিন্তু এ-রকম অপপ্রয়াসকারীদেরও স্বীকার করতে হয়েছে যে, বায়বীয় প্রতিসরণ (Atmospheric refraction) বিষয়ক কারণগুলি রাধানাথ ও তাঁর সর্বপ্রধান Sir Andrew Waugh একাদিক্রমে বহু বৎসর যাবৎ অনুসন্ধানরত ছিলেন। তখনকার সময়ে এই বিষয়টাই সর্বাপেক্ষা গোলোযোগের কারণ ছিল। এই প্রসঙ্গে গণিতশাস্ত্রের এই চিন্তানায়কের কীর্তি প্রামাণ্যভাবে লিখিত রয়েছে।[১৩]

এভারেস্ট সাহেব প্রবর্তিত গণিতশাস্ত্রের অভিন্ন ধারার (যা Ray-Trace system নামে

---

* এই বিষয়ে তাঁর প্রবর্তিত সূত্র হলো—

$$C = B.\ \frac{(t-32^{\circ})\,m - (t-62^{\circ})\,6}{1 + (t-32^{\circ})\,m}.$$

উক্ত পত্রে রাধানাথ বাবু লিখছেন—

'The formula for C given above, is the same as that Col. Boileare makes use of in the computation of his Table XI referring his readers top. 67 of Galbraith's Tables Edit. 1834 where he says the formula will be found (vide p. IX of Introduction to Boileare's Table 1849). Col. Boileare has given no demonstration of the process. Galbraith may have done so, but the works of the latter are not within my reach, I have been necessitated to satisfy myself of the truth of the formula by the following investigation.' লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, একটা পুস্তকের অপ্রাপ্তিতে কাজ ব্যাহত হয় নি। নিজ বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় অঙ্কের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রচলিত) যাবতীয় প্রায়োগিক কৃতিত্ব বাবু রাধানাথের।[১৪]

'কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে যে ঘটিকা গোলক (Hour ball) স্তম্ভ বিদ্যমান আছে, তা শিকদার মহাশয়েরই ধীশক্তির পরিচায়ক।'[১৫]

রাধানাথের বহুমুখী প্রতিভা এবং চারিত্রিক গুণাবলী

বিশ্বকবির 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির' এই উক্তির মূর্ত ও জলন্ত প্রতীক ছিলেন রাধানাথ। এই বিষয়ে 'আর্যদর্শন'[১৬] পত্রে পাওয়া যায়—"তাঁহার গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি, শারীরিক বল, আচার ব্যবহার ও সকল কর্ম স্বাধীনভাবে নির্বাহ করা বিষয়ে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ব্যক্তিগণ নানা প্রকার মত প্রকাশ করেন। হিমালয়স্থিত মশুরী ও ডেরাডুন ও ফরাসী অধিকারস্থ ফরাসডাঙ্গায় তাঁহার সম্বন্ধে অশেষ প্রকার গল্প এক্ষণেও প্রচলিত আছে।...কি ইংরাজ, কি ফরাসী, কি বাঙ্গালী, কোন কার্যগতিকে তাঁহার সহিত আলাপ হইলে কেহ তাঁহাকে ভয় করিত, কেহ ভক্তি করিত, কেহ কেহ বা মনে মনে পূজা।" অনুরূপ বিবরণ আমরা শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা অভিব্যক্ত 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত' পুস্তকে পাই।[১৭]

১৮৪৩ খৃস্টশতকে (যখন তিনি সাধারণ পদ-মর্যাদাসম্পন্ন কর্মচারী) ডেরাডুনে জেলা শাসক একবার রাধানাথের কতিপয় কর্মীকে তাঁর নিজের মালপত্র বহন কর্মে নিযুক্ত করেন। কিন্তু 'পরো-য়ানা'র অভাবে রাধানাথ ঐ কর্মীদের জেলা শাসকদের আদেশ মান্য করতে নিষেধ করেন। উক্ত জেলা শাসক রাধানাথের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। বিচারে রাধানাথের দু-শ' টাকা জরিমানা হয় বটে, কিন্তু শাসকবর্গও সাবধান হয়ে যান। এই ঘটনায় সকলেই রাধানাথের নির্ভীকতার পরিচয় পান।[১৮]

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ নাগাদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন নিয়ে সমগ্র ভারতব্যাপী যে আন্দোলন ও সাড়া পড়ে যায়, তাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে রাধানাথ তদানীন্তন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে একখানি আবেদন পত্রে Radhanath Sickdhar—এই নাম স্বাক্ষর করেন।[১৯]

এ ছাড়া প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের মহাপ্রয়াণে মাধবচন্দ্র মল্লিকের গৃহে (১৮৩০ খৃষ্টাব্দ) আয়োজিত সভায় রাধানাথ ভাষণ দেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ২৯শে অগাষ্ট পাইকপাড়ায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে রাধানাথ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে (ডিসেম্বর ১৫, ১৮৫৪) কিশোরীচাঁদ মিত্রের কাশীপুরের বাসভবনে সামাজিক উন্নতি বিধায়িনীর একটি সমিতি স্থাপনের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যে সভা আহুত হয়, তাতে অন্যান্য জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে রাধানাথ সভ্য হয়েছিলেন।[২০]

ভাষাবিদ্ হিসাবেও রাধানাথ বিশেষরূপে অগ্রণী ছিলেন। তিনি ইংরেজী, সংস্কৃত, ফরাসী, লাতীন ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।[২১]

District Charitable Society নামে তখনকার জনহিতকর প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমসাময়িক প্রখ্যাত বক্তিবর্গের সঙ্গে রাধানাথও যুক্ত ছিলেন।[২২]

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাতৃভূমির ললনাকুলের উন্নতি বিধানার্থে রাধানাথের প্রয়াসের অন্ত ছিল না। হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রস্তাবের সমর্থন জানিয়ে তিনি যে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, তা আমরা আগেই দেখেছি। মাত্র তাতেই তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় তিনি 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করতে থাকেন।[২৩] অতি সরল প্রচলিত ভাষায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ এতে সন্নিবেশিত থাকতো।

বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ মনে হলেও একটু বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশ থেকে রাধানাথের মাতৃভাষা-প্রীতিরও

আভাস পাওয়া যায়। দীর্ঘ প্রবাসের ফলে রাধানাথ মাতৃভাষা ভুলে গেলেও জীবনের অন্তিমে তা পুনরায় শিক্ষা ও তার সাহায্যে শিক্ষাদানের জন্যে সর্বপ্রযত্ন প্রয়োগ করেন। সেই অতীতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন রাধানাথ এবং মাতৃভাষাকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করেন নি।

ধর্মীয় ব্যাপারে রাধানাথ ছিলেন উদারপন্থী। খৃষ্টধর্ম সরাসরি গ্রহণ না করলেও হিন্দুধর্ম তিনি সর্বতোভাবে বর্জন করেন। খাদ্য হিসেবে তিনি হিন্দুর নিষিদ্ধ মাংস গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী ও সমর্থক ছিলেন[২৪]।

বিদেশে খ্যাতি ও মহাপ্রয়াণ

রাধানাথের খ্যাতি বিদেশের সুধীসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাভেরিয়ার Natural History Society-এর সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন।[২৫] ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের কমন্স সভায় একটি বিবরণী প্রেরিত হয়, তাতে গুণমুগ্ধ এভারেষ্ট সাহেব রাধানাথের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন[২৬]।

গণিতের শিক্ষাগুরু, প্রধান কর্ণধার ও সহকর্মী George Everest, শিকদার মহোদয়ের গুণের ভূয়সী প্রশংসা, জ্ঞানের গভীরতা সম্পর্কে বহুবার বহু পত্রে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। এগুলির আলোচনা এক সম্পূর্ণ অধ্যায় সাপেক্ষ। সুখের বিষয়, এভারেষ্ট সাহেবের স্বহস্তলিখিত পত্রগুচ্ছের কয়েকখানি অমূল্য জাতীয় সম্পদরূপে দিল্লীর National Archives-এ রক্ষিত আছে।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই মে, এই কর্মময় জীবনের অবসান হয়। ঐ তারিখে হুগলী জেলার গোণ্ডোল-পাড়ায় রাধানাথ দেহত্যাগ করেন[২৭]।

রাধানাথের সমর্থনে তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহ

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Manual of Surveying পুস্তকের সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত অংশ রাধানাথের সাধনার ফল—একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ঐ বইখানির আরো কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হয়, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে রাধানাথের নামের স্বীকৃতিটি আকস্মিকভাবে তুলে দেওয়া হয়—যদিও রাধানাথের অবদান পুস্তক-খানির ভিতরে অটুট ছিল।

ফলে, স্বর্গতঃ রাধানাথের সমর্থনে তৎকালীন সংবাদপত্রসমূহে বহু প্রতিবাদ পত্র অথবা সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। রাধানাথের ইংরেজ সহকর্মী-রাই এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন! এঁদের মধ্যে Walter Sherwill, John Macdonald প্রমুখ জরিপ সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। ফলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, বিশেষ করে Macdonald সাহেব ভারত সরকারের বিরাগভাজন হন। সরকার Macdonald সাহেবের পদমর্যাদার পথ রুদ্ধ করে অধমর্যাদায় অবনমিত করে এক আদেশ জারী করেন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়[২৮]।

উপসংহার

দেড়-শ' বছর আগে যখন দেশ সম্পূর্ণরূপে অনগ্রসর ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল, সেই অবস্থায় এক-জন কৃতী বরেণ্য বঙ্গসন্তান গণিতশাস্ত্রের মত দুরূহ ও জটিল বিষয়ে এতদূর অগ্রণী হয়েছিলেন দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। তাঁর যথার্থ স্মৃতি-রক্ষার বন্দোবস্ত হলে এবং তাঁর প্রিয় বিষয় গণিতের প্রতি দেশের তীক্ষ্ণধী ছাত্রবৃন্দ আকৃষ্ট হয়ে গণিত-শাস্ত্রকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করলে রাধানাথের যথার্থ স্মৃতিতর্পণ করা হবে। আর যে সত্যের সন্ধানে

রাধানাথ আত্মীয়-পরিজন ত্যাগ করে হিমালয়ের শিখরে শিখরে পরিভ্রমণ করে গেছেন, কত দুরূহ অবস্থার মধ্যে সময় অতিবাহিত করে গেছেন—আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও যেন তা প্রেরণার উৎস হয়ে জাতিকে নবরূপে নব নব প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ করে।

বিবরণপঞ্জী

১। Historical Records of The Survey of India vol IV, 1830 to 1843, Collected and compiled by Col. R. H. Phillimore, C. I. E., D. S. O, 1958.

২। আর্যদর্শন—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাভূষণ, এম. এ সম্পাদিত, কার্তিক, ১২৯১।

৩। সত্যনিষ্ঠ-রসিক কৃষ্ণ মল্লিক ও বলাই চাঁদ মল্লিক তত্ত্ববিশারদ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, শ্রীকানাইলাল পাল কর্তৃক প্রকাশিত ; পৃঃ ২।

৪। আর্যদর্শন—কার্তিক ১২৯১ ; পৃঃ ২৯৪।

৫। The Hindoo Patriot, May 23, 1870.

৬। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (উত্তর ভারত)—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত, (পৃঃ ৫২৪), ১৩২২।

৭। The Friend of India' November 11, 1852.

৮। Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol XXI (No IV, 1852) pp. 329-332.

৯। The Englishman, November 12, 1928 p. 17.

১০। G. S. Burrard, Nature, vol. 71, No. 1828, p. 43, 1904.

১১। ঐ, পৃঃ ৪২

১২। এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য—

A Sketch of the Geography and Geology of the Himalaya Mountains and Tibet by Col. S. G. Burrard, R. E., F. R. S., H. H. Hayden, B. A., F. G. S., revised by Col. Sir Sidney Burrard, K. C. S. I., F. R. S., and A. M. Heron, D. Sc, F. G. S., F. R. G. S., F. R. S. E., 1933, p. 196.

১৩। ঐ, পৃঃ ১৯৫

১৪। An Account of the Measurement of Two Sections of the Meridional Arc of India by Lieut-Col. Everest, F. R S, 1847, p. 19.

১৫। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃঃ ৫২৪।

১৬। আর্যদর্শন—আশ্বিন ১২৯১, পৃঃ ২৮৪।

১৭। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—শ্রীরাজনারায়ণ বসুর দ্বারা অভিব্যক্ত, অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ; এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, পৃঃ ২০-২১

১৮। Sukhendra Lal Mitra, The Bengalee, May 13, 1925.

১৯। বিনয় ঘোষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, পঞ্চদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, পৃঃ ২২৪-এর সম্মুখবর্তী।

২০। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, M. A., F. S. S, F. R. E. S., কর্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২১। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী, পৃঃ ৫২৪।

২২। Nineteenth Report of the District Charitable Society, MDCCCXLIX, Calcutta : 1850., p. 11.

২৩। Peary Chand Mittra, A Biographical Sketch of David Hare, 1877, p. 32.

২৪। Thomas Edwards, Calcutta Review, No CXLIII, 1881, p. 308.

২৫। The Friend of India—March 31, 1864.

২৬। The Bengalee, May 13, 1925,

২৭। The Hindoo Patriot, May 23, 1870.

২৮। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য—

(a) The Pioneer, Nov. 8, 1876.
(b) The Friend of India, Aug. 26, 1876.
(c) The Pioneer, Nov. 27, 1876.
(d) The Friend of India, Aug. 26, 1876.
(e) The Friend of India Sept. 16, 1876.
(f) „ „ „ June, 24. 1876.
(g) „ „ „ Sept. 2, 1876.

বিঃ দ্রঃ—রাধানাথ শিকদার সম্বন্ধে অধিকতর-রূপে আগ্রহী পাঠকবর্গকে লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ Modern Review (February, 1963) পাঠে অনুরোধ জানান যাচ্ছে।

আলকাৎরার কথা

শ্রীঅরুণোদয় চট্টোপাধ্যায়

আলকাৎরা নামটার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থ। একপ্রকার দুর্গন্ধময় কালো আঠালো পদার্থ এই আলকাৎরা। কিন্তু আলকাৎরার প্রয়োজনীয়তার কথা শুনলে বিস্ময়ে অবাক হতে হয়। কৃত্রিম রং থেকে আরম্ভ করে ওষুধ, বিস্ফোরক পদার্থ, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ এই আলকাৎরা থেকে পাওয়া যায়। এ-পর্যন্ত আলকাৎরা থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যের সংখ্যা হলো প্রায় ৩০০টির মত। আলকাৎরা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই দুটি প্রশ্ন আসে। প্রথমতঃ আলকাৎরা জিনিষটি পাওয়া যায় কোথা থেকে? দ্বিতীয়তঃ, এই জিনিষটি থেকে কি কি পদার্থ পাওয়া যায়?

কয়লা হলো আলকাৎরার একমাত্র উৎস। কয়লার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫ ভাগ আলকাৎরা বর্তমান। কয়লা থেকে আলকাৎরা পেতে হলে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাকে বলে অন্তর্ধূম পাতন; অর্থাৎ কয়লাকে একটি বায়ুরুদ্ধ পাত্রে ভর্তি করে উত্তপ্ত করা হয়। এই কাজের জন্যে পাত্রটি অগ্নিসহ মৃত্তিকার দ্বারা তৈরী করা হয়। উত্তপ্ত করবার জন্যে ১০০০ সে. তাপাঙ্কের প্রডিউসার গ্যাস নামক একপ্রকার জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। এর ফলে কয়লা পাতিত হয়ে উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী—এই দুই অংশে ভেঙে যায়। অনুদ্বায়ী অংশে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া, কোল গ্যাস এবং আলকাৎরা। কয়লা পাতিত হবার পর এর উদ্বায়ী অংশটিকে জলের নালাগার, হিমাগার এবং পরে ধৌতাগারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। প্রথমতঃ জলের নালাগারে অল্প কিছু আলকাৎরা ঘনীভূত হয়। তারপর অবশিষ্ট গ্যাসকে হিমাগারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এই হিমাগারের সঙ্গে একটা ট্রাফ যুক্ত করা থাকে। ঠাণ্ডা হবার ফলে সম্পূর্ণ আলকাতরা এই ট্রাফের নীচের ভাগে পাওয়া যায়। এই ভাবে কয়লা থেকে আলকাৎরা উদ্ধার করা হয়।

আলকাৎরা নিয়ে প্রথম গবেষণা সুরু হয় ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে। এর আগে কয়লা পাতিত করে কোল গ্যাস দিয়ে আলো জ্বালানো হতো এবং উৎপন্ন আলকাৎরা স্তূপাকারে পড়ে থাকতো। ঐ সময় আঠারো বছর বয়সের এক বৃটিশ যুবক উইলিয়ম পার্কিন অনেকটা কৌতূহলবশে কৃত্রিম উপায়ে কুইনিন তৈরী করবার প্রচেষ্টায় আলকাৎরা থেকে আকস্মিকভাবে একটি রঞ্জক পদার্থ আবিষ্কার

করেন। এর ফলে আলকাৎরার উপর রাসায়নিকদের দৃষ্টি পড়ে।

এ-পর্যন্ত যতগুলি জৈব পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পদার্থের মধ্যে বিভিন্ন রকমের গন্ধ অর্থাৎ অ্যারোমা বর্তমান। জৈবরসায়নে এই সব পদার্থগুলির নাম দেওয়া হয়েছে অ্যারোমেটিক পদার্থ। এই অ্যারোমেটিক জাতীয় যৌগের প্রত্যেকটির মূল পদার্থ পাওয়া যায় আলকাৎরার মধ্যে। এই সব পদার্থ আলকাৎরা থেকে পেতে হলে আলকাৎরার পাতন প্রয়োজন। এই পাতনের ফলে বিভিন্ন তাপাঙ্কে বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়ে থাকে। কয়লা থেকে প্রাপ্ত আলকাৎরা একসঙ্গে প্রায় ২০ থেকে ৩০ টন পর্যন্ত বড় লোহার পাত্রে পাতিত করা হয়। বিভিন্ন তাপাঙ্কে পাতনের ফলে আলকাৎরা থেকে বিভিন্ন ভাগে যে সব পদার্থ পাওয়া যায়, তাদের নাম হলো :—

১। লঘু তেল বা লাইট অয়েল।

২। মাধ্যমিক তেল বা মিডিল অয়েল।

৩। ভারী তেল বা হেভি অয়েল,
(ক্রিয়োজোট)।

৪। সবুজ তেল বা অ্যান্থ্রাসিন।

৫। পিচ্।

এদের প্রত্যেকটি সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

১। লঘু তেল বা লাইট অয়েল :—

আলকাৎরা পাতনের সময় ১৭০° সে তাপাঙ্কে এই পদার্থটি পাওয়া যায়। এর সাধারণ উপাদান হলো বেঞ্জিন এবং বেঞ্জিনের সমগণীয় কয়েকটি পদার্থ; যথা—টলুইন, জাইলিন ইত্যাদি। আবার বেঞ্জিন থেকে নাইট্রোবেঞ্জিন, অ্যানিলিন, ফিনল প্রভৃতি কতকগুলি মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়। এই সব যৌগগুলি ব্যবহার করে গ্যামাকৃসিন, ডি. ডি. টি. কৃত্রিম রং, প্লাষ্টিক প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

আলকাৎরা পাতিত করে বেঞ্জিনের সঙ্গে পাওয়া যায় টলুইন। এই টলুইন থেকে অনেক রকম রঞ্জক দ্রব্য ও ঔষধ তৈরী করা যায়। টলুইন থেকে স্যাকারিন, টি. এন. টি. (ট্রাইনাইট্রো টলুইন) প্রচুর পরিমাণে তৈরী হয়ে থাকে।

২। মাধ্যমিক তেল বা মিডিল অয়েল :—

আলকাৎরা পাতনের সময় ১৭০ সে. থেকে ২৩০° সে. তাপাঙ্কে এই তেল পাওয়া যায়। এর পরিমাণ শতকরা প্রায় ৮ থেকে ১০ ভাগ। এই পদার্থটির প্রধান উপাদান হলো কার্বলিক অ্যাসিড বা ফিনল এবং ন্যাপথলিন। ফিনলের প্রধান ব্যবহার জীবাণুনাশক পদার্থরূপে ও সাবান শিল্পে (কার্বলিক সাবান)। এছাড়া প্লাষ্টিক শিল্পে এবং বিস্ফোরক পদার্থ নির্মাণে ফিনল ব্যাবহার করা হয়। ন্যাপথলিন আমরা সাধারণভাবে কীটনাশক পদার্থরূপে ব্যাবহার করি। মাধ্যমিক তেল থেকে অল্পপরিমাণে অপর একটি পদার্থ পাওয়া যায় এর নাম ক্রিসল। সাধারণ রঞ্জক ও ঔষধ নির্মাণে এর ব্যবহার হয়। কৃত্রিম রং (নীল) এই তেল থেকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

৩। ভারী তেল বা ক্রিয়োজোট :—

আলকাৎরা পাতনের সময় ২৩০° সে. থেকে ২৭০° সে. তাপাঙ্কে এই তেল পাতিত হয়ে থাকে। এটি প্রধানতঃ কাঠ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এছাড়া আর কোন বিশেষ কাজে এর ব্যবহার নেই বললেই চলে। এই পাতিত পদার্থের প্রধান উপাদান হলো ক্রিসল। ক্রিসলের ব্যাবহার সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে।

৪। সবুজ তেল বা অ্যানথ্রাসিন :—

এই তেল আলকাৎরা পাতনের সময় ২৭০° সে. থেকে ৩৬০° সে. তাপাঙ্কে পাতিত হয়। এই তেল শতকরা প্রায় ১৬ থেকে ২০ ভাগ আলকাৎরার মধ্যে পাওয়া যায়। এর সাধারণ উপাদান হলো অ্যানথ্রাসিন, কার্বজোল ও ফেনোঅ্যানথ্রাসিন। এদের প্রত্যেকটির ব্যবহার হয় নানারকম রঞ্জক কার্যে।

অনেক জৈব রঞ্জকের মূল উপাদান পাওয়া যায় এই সবুজ তেল বা অ্যানথ্রাসিনের মধ্যে।

৫। পিচ্ :—

আলকাৎরার মধ্যে শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ থাকে পিচ্। এটি পাওয়া যায় পাতন পাত্রের অবশিষ্ট পদার্থরূপে। এর মূল উপাদান হলো কার্বন। এতে কার্বন প্রায় ৯৩ ভাগ থাকে। এই পিচ্ সাধারণভাবে কালো রং হিসাবে, জিনিষপত্রের উপর প্রলেপ দেবার জন্যে প্রলেপরূপে, অ্যাসিড ও অন্যান্য ক্ষয়কারী পদার্থ থেকে জিনিষপত্র সংরক্ষণের জন্যে এবং রাস্তা তৈরীর জন্যে ব্যবহার করা হয়।

আলকাৎরার ইতিহাস জৈব রসায়নশাস্ত্রে এক বিরাট অধ্যায় জুড়ে আছে। আরো কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষ যে আজকাল আলকাৎরা থেকে তৈরী হচ্ছে, তার হিসেব দেওয়া কঠিন। গন্ধদ্রব্য, ফুলের নির্যাস, এসেন্স—যা এখন আমাদের মসগুল করে দেয়, তাও পাওয়া যায় ঐ নোংরা পদার্থ থেকে। জ্বরের ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, মাথাধরার ওষুধ প্রভৃতি সবই আলকাৎরা থেকে পাওয়া গেছে। এদের এক-একটি আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে বিরাট ইতিহাস, আর রয়েছে বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম। আলকাৎরা থেকে পাওয়া একটা ওষুধের নাম হলো আর্লিকের ৬০৬; অর্থাৎ ৬০৫ বার বিফল হয়ে বৈজ্ঞানিক আর্লিক ৬০৬ বারের বার ঐ ওষুধটি আবিষ্কার করেন। এই ওষুধের আর এক নাম হচ্ছে স্যালভার্সন।

আগেই বলেছি যে, আলকাৎরা অতি গুরুত্ব-পূর্ণ পদার্থ। আলকাৎরা যেন সেই যাদুকরের যাদু-হাঁড়ি। কত আশ্চর্য জিনিষই না রয়েছে এর মধ্যে!

সঞ্চয়ন

মিটারের কাহিনী

ভারতে মেট্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। আমরা আজকাল যখন কাপড় কিনতে যাই, তখন আমরা গজ হিসেবে কিনি না, মিটার হিসেবে কিনি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কতজন মিটারের কাহিনী জানে?

আমাদের মধ্যে যাঁরা খুব বেশী খবরাখবর রাখেন, তাঁরা হয়তো জানেন যে, প্যারিসে সংরক্ষিত একটি প্ল্যাটিনামের তৈরী রড্‌কে সমগ্র বিশ্বে মিটারের মান বলে ধরা হতো। কিন্তু প্যারিসের এই বিখ্যাত মিটার-রডেরও দিন শেষ হয়েছে। ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কিত একাদশ আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্মেলনের এক প্রস্তাব অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট অপছায়াত্মক (স্পেক্‌ট্র্যাল) বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটা বিশেষ গুণিতককে এখন থেকে মিটারের দৈর্ঘ্য ধরা হবে। এই নতুন সঠিক মাপের মান স্থির করবার জন্যে এখন আর কোন ধাতুর রড্ ঢালাই করতে হবে না। অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থায় প্রয়োজনীয় বিকিরণ নিলেই হবে। একটি আলো এই নিখুঁত পরিমাপ দিতে পারবে। পশ্চিম জার্মেনীর বার্ণসউইকস্থিত ফেডারেল ফিজিক্যাল ও টেকনিক্যাল লেবরেটরীর বিজ্ঞানীরা এই রকম একটি আলো উদ্ভাবন করেছেন এবং তা এখন বিশ্বে দৈর্ঘ্যের নির্দিষ্ট মান হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

ফরাসী বিপ্লবের সময় পরিমাপের একক হিসেবে মিটারের সৃষ্টি হয়। মিটারকে প্যারিসের বিষুব রেখার এক-চতুর্থাংশের দশ লক্ষ ভাগের ১ ভাগের এক দশমাংশ বলে ধরা হতো। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত আস্তে আস্তে মিটারের প্রচলন হয়

এবং অ্যাংলোস্যাক্সন দেশগুলি এখনও ফুট, ইঞ্চিতে দৈর্ঘ্য মাপে, যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁরা মেট্রিক পদ্ধতিই গ্রহণ করেছে। ১৮৬৭ সালে বার্লিনে সার্ভেয়ারদের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন সমগ্র বিশ্বে দৈর্ঘ্যের পরিমাপক হিসেবে মিটার ব্যবহার করা সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের সরকারগুলির কাছে সুপারিশ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ সালে আন্তর্জাতিক মিটার রীতি স্বাক্ষরিত হয় এবং বর্তমানে ৩৮টি জাতি এই চুক্তির সদস্য। ওজন ও পরিমাপ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সাধারণ সম্মেলন ঐ স্বাক্ষরকারীগণের অন্যতম সংস্থা। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ষষ্ঠ বছরে এই সংস্থার অধিবেশন হয় এবং তাঁরা অন্যান্য সদস্যগণের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার অধিকারী। মিটারের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রতিরূপটি প্যারিসে রেখে দেওয়া হয়েছে। প্ল্যাটিনাম ও ইরিডিয়াম ধাতুর মিশ্রণে তৈরী এটি ছিল একটি রড্। কয়েক বছর পর লণ্ডনের একটি ধাতুর কারখানা উন্নত ধরণের একটি মিশ্রিত ধাতু দিয়ে এর ৩০টি নকল তৈরী করে এবং লটারী করে সেগুলিকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে বন্টন করা হয়। প্রতিরূপ রড্‌টিতে হীরা দিয়ে দৈর্ঘ্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। এক মিটারের দৈর্ঘ্য প্রকৃতপক্ষে কতখানি, তা যদি কেউ জানতে চাইতেন, তাহলে তাঁকে তাঁর দেশে সংরক্ষিত মিটারের নকলটির কাছে যেতে হতো। পদার্থবিদ্ ও ইঞ্জিনীয়ারগণ শীঘ্রই দেখতে পেলেন যে, প্রতিরূপ রডেরও কতকগুলি অসুবিধা আছে। মিটারের মধ্যে দৈর্ঘ্যসূচক যে চিহ্নগুলি দেওয়া আছে, খালি চোখে তা অত্যন্ত ছোট দেখায়। আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সেগুলি অত্যন্ত বিরাট, মোটা ও অসমান দেখায় এবং বর্তমানে যে সূক্ষ্ম নির্ভুলতা অত্যন্ত প্রয়োজন, তার পক্ষে এই চিহ্নগুলি কার্যকরী নয়। উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি অথবা অন্য কোন কারণে যাতে দৈর্ঘ্যের তারতম্য না হয়, সে জন্যে এই প্রতিরূপ মিটারগুলি বিশেষ সাবধানে রাখা হয়। তবুও সময় অতিবাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ধাতুরও পরিবর্তন হয় বলে এই পবিত্র রড্‌টির দৈর্ঘ্যেরও পরিবর্তন হয়। এর অণু-পরমাণুগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আভ্যন্তরীণ গঠনেও পরিবর্তন হয়। ফলে একে আর সত্যিকারের প্রতিরূপ বলা যায় না। সাধারণভাবে বলতে গেলে, অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপেও ১০ লক্ষের একভাগ ত্রুটি থাকে। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন সামান্য মনে হলেও বর্তমান যুগে যেখানে উৎপাদকগণ কোন নির্দিষ্ট আকারে ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত ত্রুটিও সহ্য করতে চান না, সেই ক্ষেত্রে এই ত্রুটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই ৮০ বছর আগে এই নির্দিষ্ট মাপের রড্‌টি শিল্পপতিগণের কাছে নিশ্চয়াত্মক হলেও বর্তমান যুগের শিল্পে এই সামান্য অনিশ্চয়তাও বড় আকার নিয়ে দেখা দেয়।

একমাত্র অবস্তুর কোন মিটার দৈর্ঘ্য, বস্তুর সব রকম পরিবর্তন থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আলোর একটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এই রকম একটা অবস্তু মান এবং একটা সন্তোষজনক আলোর উৎস থেকে তা সঠিকভাবে পাওয়া যেতে পারে। এই রকম একটি আলোর উৎস তৈরী করতে পারলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে ফরাসী প্রকৃতিবিদ্ বেবিনেট এবং পদার্থবিদ্ ম্যাক্সওয়েল, মাইকেলসন ও মর্লির মত বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা উনবিংশ শতাব্দীতেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মান গ্রহণ করবার জন্যে সুপারিশ করে দিলেন। ১৯২৭ সালে সপ্তম সাধারণ সম্মেলন, ক্যাডমিয়াম ধাতুর লাল অপচ্ছায়াত্মক রেখাটিকে আন্তর্জাতিক মিটারের দৈর্ঘ্যের মান হিসেবে সাময়িকভাবে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর পূর্বে এঁরা পারদের অপচ্ছায়াত্মক লাইনগুলিকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবার সুপারিশ করেন। কিন্তু এগুলির কোনটিই নির্ভরযোগ্য উপায়ে সঠিকভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

বর্তমানে আমরা জানি যে, প্রকৃতিতে প্রায় সকল বস্তুই বিভিন্ন আণবিক ওজনের আইসোটোপ বা পরমাণুর আকারে রয়েছে। কোন পরমাণুর আণবিক ওজন হলো বস্তু-সংখ্যার সমষ্টি। কাজেই

যুগ্ম বস্তু-সংখ্যার কোন অণুর অপচ্ছায়াত্মক বিকিরণে যুগ্ম সংখ্যক প্রোটন ও নিউট্রন থাকবে। অযুগ্ম সংখ্যার অণুর তুলনায় যুগ্ম সংখ্যার অণু অনেক ভাল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্রিপ্‌টনের ২৬ অণু নির্দিষ্ট মানের মিটারের জন্যে খুব চমৎকার জিনিষ। এই গ্যাস বাতাসে অতি সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।

ব্রান্সউইক আলো থেকে বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ারগণ এক মিলিমিটারের ১০ লক্ষ ভাগের ১ ভাগ পর্যন্ত সঠিক দৈর্ঘ্য স্থির করতে পারেন এবং তা হলো শ্রেষ্ঠতম প্রতিরূপ দৈর্ঘ্যের চেয়েও ১০০০ গুণ বেশী সঠিক। "গ্লোব্যাল"

বিজ্ঞান সাধনায় আকস্মিকতা

শ্রীত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান সাধনায় আকস্মিকতার দাম কম নয়। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধান চালিয়ে যান, কিন্তু সত্য ধরা দিতে চায় না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা একের পর এক চলতে থাকে, হিসাবে যাতে ভুল না হয়, সে জন্যে যুক্তি ও বিবেচনার সঙ্গে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির সম্বন্ধে অবহিত থাকা হয়, তবু সত্যের ক্ষীণ আলোক-রেখাও বৈজ্ঞানিকের চোখে পড়ে না। কিন্তু দেখা যায়, কোন এক বিশেষ মুহূর্তে হঠাৎ আসে এক 'আলোর ঝল্‌কানি', যা তাঁর সমস্ত ব্যর্থতার অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে তাঁর প্রচেষ্টাকে সাফল্যে ভরে দেয়। একটু আগে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ছিল বিভ্রান্ত—কুয়াসার অস্পষ্টতায় আচ্ছন্ন, সেই মুহূর্তে খুলে যায় সত্যের স্বচ্ছ আলোক-দ্বার। এ যেন এক অজানা লোকের অপ্রত্যাশিত দান—তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে আর্কিমিডিস ছিলেন সিসিলির রাজসভার বৈজ্ঞানিক। রাজা একবার তাঁকে এক কঠিন সমস্যা সমাধান করবার ভার দেন। রাজার এক সোনার মুকুট তৈরী হয়ে এল। সেটির ভিতরে রূপার খাদ আছে কিনা বলে দিতে হবে, কিন্তু মুকুটটির কোন ক্ষতি করা চলবে না। বৈজ্ঞানিক এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় লেগে গেলেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করেও কিছু ঠিক করতে পারলেন না। হঠাৎ একদিন এক ঘটনা ঘটে গেল। স্নানের জন্যে সন্ধ্যায় তিনি এক জলপূর্ণ চৌবাচ্চায় নেমেছেন, তাঁর বোধ হলো, দেহটা যেন হাল্‌কা হয়ে গেছে। এতদিন যে সমস্যা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাচ্ছিলেন, তার সমাধান-সূত্র বিদ্যুৎ-ঝলকের মত তাঁর মাথার ভিতর দিয়ে খেলে গেল। তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে তিনি ভিজা গায়ে উলঙ্গ অবস্থায় রাস্তা দিয়ে ছুটছেন, আর চীৎকার করছেন—আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি। তখনকার দিনে তাঁর আচরণে পথিককুল বিদ্রূপ করেছিল বটে, কিন্তু এখন সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের নাম পদার্থবিদ্যা-শিক্ষার্থীরই মুখে মুখে।

স্নানের জন্যে জলে নেমে এই তত্ত্ব সে দিন তাঁর মনে উদিত হয়েছিল যে, জলে নিমজ্জিত অবস্থায় দেহের ওজন কিছু অংশ কমে যায়। একই পদার্থ দিয়ে তৈরী সমান ওজনের দুটি জিনিষের ওজন জলের ভিতরে একই পরিমাণে হ্রাস পাবে। কিন্তু জিনিষ দুটি যদি ভিন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়, তাহলে ওজন সমান হলেও জলে তাদের ওজনের হ্রাসের পরিমাণ তফাৎ হয়ে যাবে, এক হবে না। সুতরাং মুকুটের সমান ওজনের খাঁটি সোনার একটা বল যদি জলের নীচে ওজন করা যায়, তাহলে

মুকুটের বেলায় ওজনের যে হ্রাস পাওয়া যাবে, বলের বেলাতেও তাই হবে। কিন্তু মুকুটে যদি সোনার চেয়ে হাল্‌কা ধাতু রূপা থাকে, তাহলে খাঁটি সোনার বলের চেয়ে তার ওজনের হ্রাস অনেক বেশী হবে। মুকুটের সমান ওজনের একটা সোনার বল তৈরী করিয়ে সেই ধারণানুসারে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন। তাতে তিনি দেখতে পেলেন, সোনার বলের চেয়ে মুকুটটির ওজনের হ্রাস অনেক বেশী। তাতে সাব্যস্ত হলো এই যে, মুকুটটি খাঁটি সোনার নয়, তাতে অন্য ধাতুর খাদ মিশানো আছে। স্বর্ণকারের চাতুরী এই উপায়ে ধরা পড়ে গেল। এর আগে আর্কিমিডিস্‌ কতবার চৌবাচ্চায় নেমে স্নান করেছেন এবং দেহের ওজন হাল্‌কা বলে অনুভূতও হয়তো হয়েছে, কিন্তু তার ভিতরে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলে কোনদিন তাঁর বোধ হয় নি। কিন্তু এই অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে বিদ্যুতের ঝলকের মত সত্য তাঁর কাছে ধরা দিল। অথচ এই সত্য দর্শন কত সহজ, সরল এবং কত আকস্মিক!

আমেরিকার যন্ত্র-শিল্পী ই. হো-র (E. Howe) সেলাইয়ের কল নির্মাণ করবার কল্পনা মনে আসে। যন্ত্রটি তৈরী করে তা চালু করবার সকল বাধা একটির পর একটি দূর করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা দিয়ে সেলাই করা গেল না। তৈরী হলো সেলাইয়ের কল, কিন্তু তার সূচ দিয়ে সেলাই হয় না—সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। হো খুব চিন্তায় পড়লেন। কেমন করে এই সমস্যার সমাধান হয়, তা চিন্তা করতে করতে ক্লান্ত মনে একদিন তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি স্বপ্ন দেখছেন, যন্ত্রটি তৈরী করতে অকৃতকার্য হওয়ায় তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে, রক্ষীদল তাঁকে বধ্য-ভূমিতে নিয়ে চলেছে। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাদের বর্শার তীক্ষ্ণাগ্রে একটা করে ছিদ্র রয়েছে। তখনই তাঁর মাথায় চকিতে খেলে গেল, তাঁর কলে যে সূচ লাগিয়েছেন প্রচলিত রীতি অনুসারে তার ছিদ্র গোড়ার দিকে থাকায় সেলাই হচ্ছে না, ছিদ্রটা থাকা উচিত সূচের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে। এই বোধকে কাজে লাগানো মাত্র তাঁর কলটিতে সুন্দরভাবে সেলাই চলতে লাগলো। আধুনিক কালের সৌষ্ঠবমণ্ডিত যে সেলাইয়ের কল, তার অগ্রদূত হলো হো-নির্মিত সেই আদিম যন্ত্রটি। হো-র স্বপ্ন সত্য-মিথ্যা যাই হোক, সূচের ধারালো প্রান্তে ছিদ্র করবার বোধটি একটি আকস্মিক ব্যাপার এবং তা স্বতঃস্ফূরিত না হলে তিনি কখনই সেলাইয়ের কল আবিষ্কার করতে পারতেন না।

ষ্টীম ইঞ্জিন উদ্ভাবনের সঙ্গে জেম্‌স্‌ ওয়াটের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। বাষ্পশক্তির দ্বারা যে গতিবেগ সঞ্চার করা যায়, তা অনেক দিন থেকেই জানা ছিল। ওয়াট-এর সময়ে যে ষ্টীম ইঞ্জিন ছিল, তা অপরিণত এবং তেমন কার্যকরী ছিল না। ষ্টীম যখন সিলিণ্ডারের ভিতরে জোরে প্রবেশ করে, তখন তা ভিতরকার পিষ্টন বা দণ্ডটিকে ঠেলে দেয়। তখন সিলিণ্ডারের ভিতরে ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করিয়ে বাষ্পকে তখনই ঠাণ্ডা করে দেওয়া হতো এবং সেই সঙ্গে বাষ্পের প্রবেশ রোধ করা হতো। বাষ্প জলে পরিণত হয়ে গেলে ভিতরে আংশিক শূন্যতার সৃষ্টি হতো। সিলিণ্ডারের ভিতরে চাপ অনেকটা হ্রাস পাওয়ায় বাইরের বায়ুর চাপ আবার পিষ্টনটিকে ভিতরের দিকে ঠেলে দিত। বাষ্পকে আবার সিলিণ্ডারের ভিতরে সঞ্চালিত করে এই প্রণালী পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করা হতো। পিষ্টনটির উপর ও নীচের দিকে পুনঃ পুনঃ ওঠা-নামা দ্বারা উপযুক্ত লিভারের সাহায্যে জল পাম্প করা বা দমকল চালানো সম্ভব হতো।

এরূপ প্রণালীতে যে ত্রুটি ছিল ওয়াটের তা নজরে পড়লো। বাষ্পকে ঠাণ্ডা করবার প্রণালীতে যে প্রচুর পরিমাণ উত্তাপের অপচয় ঘটছে, তা তিনি বুঝতে পারলেন। কেন না, সিলিণ্ডারের ভিতর দিয়ে ঠাণ্ডা জল প্রবেশ করাবার ফলে বাষ্পকেই যে শুধু ঠাণ্ডা করা হচ্ছে তা নয়, সিলিণ্ডারের আধারটিও

ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আবার যখন বাষ্প সঞ্চালিত করা হয়, তখন উত্তাপের অনেকখানি খরচ হয়ে যায়, সিলিণ্ডারটিকে পুনরায় গরম করতে। সিলিণ্ডারের ভিতরে সম্পূর্ণ শূন্যতা সৃষ্টি করবার জন্যে যেমন বাষ্পকে তরলীভূত করা প্রয়োজন, তেমনি তার আধারটিকেও সেই সঙ্গে বাষ্পের উত্তাপে রক্ষা করা দরকার। কেমন করে দুটি বিপরীত অবস্থাকে একই সঙ্গে বজায় রাখা যায়, সেটাই হলো ওয়াটের চিন্তার বিষয়।

একদিন বিকালে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তাঁর মাথায় এই সমস্যার সমাধান এসে গেল। স্থায়ীভাবে সিলিণ্ডারটিকে উষ্ণ রাখা হবে অথচ বাষ্পকে শীতল করা যাবে—যদি আলাদাভাবে সংরক্ষিত একটি ঠাণ্ডা পাত্রে বাষ্পকে জমানো যায়।

এই পাত্রটির সঙ্গে সিলিণ্ডারের যদি সংযোগ থাকে, তাহলে সিলিণ্ডার বাষ্পে ভর্তি হলে তা সবেগে ঠাণ্ডা পাত্রটির দিকে ধাবিত হবে এবং তখনই তরল হয়ে যাবে। বাষ্প তরল হয়ে যাওয়া মাত্র সিলিণ্ডারের ভিতরে নিম্নচাপ সৃষ্টি হবে; সুতরাং আবার বাষ্প তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে। জেম্‌স্‌ ওয়াট তখনকার দিনের অপরিণত ষ্টীম ইঞ্জিনের এই ভাবেই উন্নতি সাধন করেছিলেন। এই উন্নতি সাধনের মূলে ছিল তাঁর ভিতরের আকস্মিক প্রেরণা

রাসায়নিক যখন কোন নতুন যৌগিক পদার্থের সন্ধান পান, তখন তার আণবিক গঠন জানবার চেষ্টা হয়। অণুকে দেখা যায় না বলে পরোক্ষ প্রমাণের সাহায্যই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। খনিজ তৈল থেকে কেরোসিন ও পেট্রোল পাওয়া যায় বলে তাদের গঠন সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান চালানো হয়। তাদের ধর্ম ও গুণাগুণ পরীক্ষা করে রাসায়নিকগণ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঐ সকল তৈলের অণুগুলি কার্বন পরমাণুর লম্বা শৃঙ্খল দিয়ে গঠিত এবং প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে দুই বা ততোধিক হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত থাকে। খনিজ তৈলজাত বিভিন্ন পরিবার, যেমন—পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্ভর করে কেবলমাত্র কার্বন পরমাণু-গঠিত শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্যের উপর।

পরে বেঞ্জিন—যার সঙ্গে অনেক বিষয়ে ঐ সকল খনিজ তৈলের সাদৃশ্য আছে—যখন আবিষ্কৃত হলো, তখন তার আণবিক গঠন সম্বন্ধে রাসায়নিকদের মনে কৌতূহল জাগলো। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, তাতে কেবলমাত্র কার্বন ও হাইড্রোজেন আছে, যেমন খনিজ তৈলে থাকে। কিন্তু কতকগুলি ধর্ম সম্বন্ধে খনিজ তৈল থেকে বেঞ্জিনের পার্থক্য দেখা গেল। এই পার্থক্য থাকবার জন্যে রাসায়নিকগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, একই উপাদান উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকলেও উভয়ের আণবিক গঠন বিভিন্ন এবং বেঞ্জিনের অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেনের যে পরমাণবিক সংস্থান, তা খনিজ তৈল থেকে অন্যরূপ। কিন্তু এই পার্থক্যটা কি, তা রাসায়নিকগণ নির্ণয় করতে পারলেন না। বেঞ্জিনের গঠন নিয়ে মহা-সমস্যা উপস্থিত হলো এবং তার সমাধানের জন্যে সকলে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

জার্মান রাসায়নিক কেকুলে (Kekule) বেঞ্জিনের গঠন-সমস্যা নিয়ে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন শীতের সন্ধ্যায় বার্লিনের রাজপথে যখন তিনি একটি গাড়ীর উপর চড়ছেন, তখন তিনি এই সমস্যা নিয়ে এত আত্ম-সমাহিত ছিলেন যে, তাঁর চারদিকে কি ঘটছে তার খেয়াল নেই। যানবাহনের ঘর্ঘর শব্দ, ফিরিওয়ালাদের কর্কশ চীৎকার তাঁর গভীর মনঃসংযোগ ভাঙতে পারলো না। তাঁর মন বেঞ্জিনের গঠন সমস্যায় মগ্ন। তাঁর মানস-নেত্রে ভেসে উঠছে শৃঙ্খল-আকারে কার্বন-পরমাণুর সুদীর্ঘ শ্রেণী, যেমন খনিজ তৈলের বেলায় দেখা যায়। তিনি দেখছেন সেই শৃঙ্খল যেন সাপের মত হেলেদুলে বাঁকা পথে চলেছে। চারদিকের হৈ চৈ ও গোলমালের মধ্যে তাঁর মনে হচ্ছে, সাপের কতকগুলি মুখ পিছনে বেঁকে

নিজেদের লেজ গিলছে এবং সেই বলয়াকৃতির ছবি তাঁর চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই মুহূর্তে কেকুলের কাছে বেঞ্জিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। খনিজ তৈলের অণুতে থাকে যেমন কার্বন-পরমাণুর লম্বা লম্বা শৃঙ্খল, বেঞ্জিন অণুগুলিতে ঠিক তা নয়। বেঞ্জিনের অণু গঠিত হয় শৃঙ্খলের মুক্ত প্রান্তগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে।

রাসায়নিকগণ যখন এ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ, তথ্যাদি আহরণ ও তাদের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ নিয়ে ব্যস্ত, তখন কেকুলে এক অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে চকিতে তাঁর সমস্যার প্রার্থিত সমাধান পেয়ে গেলেন। এই প্রাপ্তির কোন কারণ নির্দেশ করা যায় না। কেকুলের আবিষ্কৃত বেঞ্জিন-অণুর সেই কাঠামো এখন সর্বজনগ্রাহ্য এবং তার উপর ভিত্তি করে নানা প্রকার ওষুধ, গন্ধসার, রং প্রভৃতি এখন রসায়নাগারে প্রস্তুত হচ্ছে।

সত্য কোন্ পথ দিয়ে প্রকাশিত হয়, তা রহস্যময়। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে ধরা যায় না, আবার কখনও তা বিশেষ মুহূর্তে আপনি এসে ধরা দিয়ে যায়। তাই বিফলতা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও সেই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় থাকতে হয়।

চেরেনকভ্ বিকিরণ

শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ

বিজ্ঞান-জগতে মাঝে মাঝে বড় আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। চেরেনকভ্ বিকিরণের আবিষ্কার এই ধরণের এক আশ্চর্য ঘটনা। আশ্চর্য এই জন্যে যে পরীক্ষাগারে আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বেই এই ধরণের বিকিরণের কথা কল্পনা করা বা ভবিষ্যদ্বাণী করা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের পক্ষে উচিত ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের একটি মূলনীতির যথাযথ সূক্ষ্ম প্রয়োগ না হওয়ায় এই আবিষ্কার ও তার ব্যাখ্যা কয়েক দশক পেছিয়ে গেছিল।

বিজ্ঞানের উপরিউক্ত মূলনীতিটি এই: কোন পদার্থ আলো অপেক্ষা অধিকতর গতিবেগসম্পন্ন হতে পারে না শূন্যে আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটার। অতএব পূর্বোক্ত নীতি অনুসারে কোন পদার্থের গতিবেগই সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কিলোমিটারের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। সূক্ষ্ম বিচার করলে দেখা যাবে যে, শূন্যে আলোর যে গতিবেগ, এখানে তার কথাই বলা হয়েছে—কোন বস্তুমাধ্যমে নয় বাস্তবিক, জল বা বাতাসের মত কোন বস্তুর মাধ্যমে আলোর গতিবেগ তার পূর্বোক্ত গতিবেগ অপেক্ষা কম দেখা যায়। আলোর এই গতিবেগ ঠিক কত হবে, তা নির্ভর করে আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও সেই বস্তু-মাধ্যমের প্রকৃতির উপর। এই কারণে বস্তুমাধ্যমের মধ্যে পদার্থের গতিবেগ এমন হতে পারে, যা শূন্যে আলোর গতিবেগ অপেক্ষা কম, কিন্তু সেই মাধ্যমের মধ্যে আলোর গতিবেগ অপেক্ষা বেশী। পদার্থ-বিজ্ঞানের এই মোটামুটি সরল মূলনীতির যথোপযুক্ত উপলব্ধি না হওয়াতেই চেরেনকভ্ বিকিরণের আবিষ্কার এত বিলম্বিত হয়েছে

তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপর গবেষণারত কর্মীরা বহু পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, ঐ ধরণের পদার্থের নিকটে কোন স্বচ্ছ পদার্থ রাখলে তাথেকে অতি ক্ষীণ, নীলাভ একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়। মাদাম কুরীর জীবনীতে ১৯১০ সালেই এই ধরণের ঘটনার কথার উল্লেখ আছে। এর প্রায় সুদীর্ঘ ২৪ বছর পরে রুশ বৈজ্ঞানিক চেরেনকভ্ এই জ্যোতি সম্বন্ধে বিশদ গবেষণা সুরু করেন এবং আরো পরে, ১৯৩৭ সালে, ফ্রাঙ্ক ও টাম্ নামক দু-জন বৈজ্ঞানিক এই

ধরণের বিকিরণের প্রকৃতি ও উৎসের যথার্থ ব্যাখ্যা দেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কয়েক বছর পূর্বে ফ্রাঙ্ক, টাম্ ও চেরেনকভ্‌কে এই বিকিরণ সংক্রান্ত কাজের জন্যে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

চেরেনকভ্ বিকিরণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, চেরেনকভের আগে ফরাসী বৈজ্ঞানিক এল. ম্যালেট ১৯২৬ সালে প্রথম এই সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত হন। বিভিন্ন ধরণের স্বচ্ছ পদার্থ নিয়ে গবেষণার পর ম্যালেট এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পূর্বোক্ত নীলাভ জ্যোতি ফ্লুরেসেন্স বা প্রতিপ্রভা জাতীয় কোন ঘটনা নয়, বরং এর উৎস অন্য কোথাও নিহিত আছে বলেই তাঁর ধারণা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ম্যালেটের কাজ এ-সম্বন্ধে এখানেই শেষ হয় এবং ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত এই ব্যাপারে আর বিশেষ কেউ হস্তক্ষেপ করেন নি।

চেরেনকভ্ যখন ১৯৩৪ সালে এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা সুরু করেন, তখন তিনি ম্যালেটের কাজ সম্পর্কে সম্ভবতঃ অবগত ছিলেন না। যাহোক, সুদীর্ঘ পাঁচ বছর কাল ধরে তিনি যে পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করেন, তার ফলে একদিকে যেমন এই বিকিরণ সম্পর্কিত বহু মূল্যবান তথ্যাদি পাওয়া গেল, অপরদিকে তেমনি ফ্রাঙ্ক ও টাম্ প্রদত্ত মতবাদটিও সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হলো।

চেরেনকভ্ বিকিরণ কি ও কি ভাবে তার উদ্ভব, তা জানতে হলে তরঙ্গ-বিকিরণ সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। বেতার-তরঙ্গের বিকিরণের কথা ধরা যাক। এক্ষেত্রে প্রেরক এরিয়েলে পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রয়োগের ফলে এরিয়েলে যে ইলেকট্রন স্পন্দনের সৃষ্টি হয়, তারই ফলে বেতার-তরঙ্গ আকাশপথে ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরণের স্পন্দনের বেগ আলোর গতিবেগ অপেক্ষা কম হলে তরঙ্গ-বিকিরণের জন্যে পরিবর্তী স্পন্দনের (Oscillatory movement) প্রয়োজন হয়। এরিয়েল মারফৎ বেতার-তরঙ্গ বিকিরণ এরই একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু স্পন্দনবেগ যদি আলোর গতিবেগ অপেক্ষা বেশী হয়, তবে নির্দিষ্ট গতিবেগ-সম্পন্ন বিদ্যুৎ-কণার পক্ষেও তরঙ্গ বিকিরণ করা সম্ভব।

চেরেনকভ্ বিকিরণ শেষোক্ত ধরণের বিকিরণ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মনে করা যাক, কাচ বা ঐ জাতীয় কোন স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়ে একটি ইলেকট্রন মোটামুটি ধীরগতিতে চলেছে। স্বাভাবিক অবস্থায় কাচের পরমাণুগুলির যে ধরণের আকৃতি থাকে, ভ্রাম্যমান ইলেকট্রনটির উপস্থিতিতে সেই অবস্থার রূপান্তর ঘটে। ইলেকট্রনের ঋণাত্মক তড়িতাবেশের জন্যে আশেপাশের পরমাণুর ধনাত্মক তড়িতাবিষ্ট কেন্দ্রগুলি ইলেকট্রনটির দিকে আকৃষ্ট হয় এবং কেন্দ্রকের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন-গুলি তাদের ঋণাত্মক তড়িতাবেশের জন্যে কিছুটা দূরে সরে যায়। ফলে খুব অল্প সময়ের জন্যে পরমাণু-গুলি তাদের গোলকাকার সমতা হারিয়ে এক বিকৃত (polarised) রূপ ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক পরি-ভাষায় এদের বলা হয়, বৈদ্যুতিক ডাইপোল (Electric dipole) বা দ্বিপদী। ইলেকট্রনটি যখন এক বিন্দু থেকে অপর এক বিন্দুতে পৌঁছায়, তখন প্রথমোক্ত বিন্দুর চারদিকের পরমাণুগুলি তাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় এবং শেষোক্ত বিন্দুর চারদিকের পরমাণুগুলি নতুনভাবে দ্বিপদীতে পরিণত হয়। এভাবে পদার্থের বিভিন্ন অংশের পরমাণু-গুলি খুব অল্প সময়ের জন্যে তড়িচ্চুম্বকীয় স্পন্দন (Electromagnetic pulse) পায়। এই ধরণের স্পন্দনের ফলে তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ-বিকিরণ হবার কথা, কিন্তু ইলেকট্রন পথের চারদিকে বৈদ্যুতিক দ্বিপদীগুলির অবস্থান সুসমঞ্জস ও ইলেকট্রনের গতি-বেগ অল্প হবার দরুণ কার্যতঃ কোন বিকিরণ হয় না।

কিন্তু উপরিউক্ত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনটি যদি আলোকের তুল্য গতিতে ভ্রমণ করে, তখন পূর্বোল্লিখিত সামঞ্জস্য আর বজায় থাকে না। ইলেকট্রনের অতি দ্রুত ভ্রমণের ফলে ইলেকট্রন পথের

প্রতি অংশে অনেকগুলি দ্বিপদীয় সমন্বয়ে ঐ পথের অনুগামী একটি দ্বিপদী সৃষ্টি হয় এবং এই দ্বিপদী থেকেই তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বিকিরিত হয়ে থাকে এরই নাম চেরেনকভ্ বিকিরণ। দূরবর্তী কোন বিন্দুতে এই বিকিরণের জন্যে যে তড়িৎ-বিভবের সৃষ্টি হয়, সাধারণতঃ সেগুলি একে অপরকে বিনষ্ট করে। কিন্তু নির্দিষ্ট একটি দিকে এই বিকিরণ-বিভব একে অপরকে পুষ্ট করে এবং কেবল সেই দিকাভিমুখেই চেরেনকভ্ বিকিরণ ভ্রমণ করে।

চেরেনকভ্ বিকিরণের আবিষ্কার বর্তমান যুগের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের হাতে এক প্রভূত শক্তিশালী অস্ত্র তুলে দিয়েছে। মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কিত গবেষণা থেকে সুরু করে অতি হ্রস্ব তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে আজ এর প্রয়োগ চলেছে।

মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এ-পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের গণক যন্ত্রের সাহায্যেই করা হতো, কিন্তু সম্প্রতি চেরেনকভ্ বিকিরণকেও এই কাজে লাগানো হয়েছে। এর দ্বারা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণের অন্তর্ভুক্ত কণিকাগুলির সংখ্যা ও শক্তি নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। দ্রুতগামী ও শক্তিশালী বিদ্যুৎকণার অস্তিত্ব ও গতিবেগ নির্ণয়ও এই বিকিরণ আবিষ্কারের পর সহজসাধ্য হয়েছে। চেরেনকভ্ বিকিরণ-জনিত জ্যোতি একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটে ধরলে একটি বৃত্তের আকারের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। বিদ্যুৎকণার গতিবেগের উপর এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ নির্ভর করে। অতএব ফটোগ্রাফীর সাহায্যে শেষোক্ত তথ্যটি জানতে পারলে অতি সহজ গণনার দ্বারা বিকিরণ সৃষ্টিকারী বিদ্যুৎকণার গতিবেগ নির্ধারণ করা যায়।

অতি হ্রস্ব দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ সৃষ্টি করা বর্তমান যুগের বেতার-বিজ্ঞানের একটি প্রধান লক্ষ্য। চেরেনকভ্ বিকিরণের সাহায্যে ৩ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ তরঙ্গ ইতিমধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সৃষ্টিও অদূর ভবিষ্যতেই আশা করা যায়।

চেরেনকভ্ বিকিরণ প্রসঙ্গে রুশ বিজ্ঞানী ভ্যাভিলভের নাম উল্লেখ না করলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ভ্যাভিলভেরই ছাত্র ছিলেন চেরেনকভ্ এবং তাঁরই নির্দেশে চেরেনকভ্ গামা-রশ্মি প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন পদার্থ থেকে যে জ্যোতি নির্গত হয়, তা নিয়ে গবেষণা সুরু করেন। এই পদার্থগুলি জলের সঙ্গে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকায় তিনি প্রথমে বিশুদ্ধ জল নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বিশুদ্ধ জল থেকে কোন রকম জ্যোতি নির্গত হবার কথা নয়। কিন্তু চেরেনকভ্ আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলেন যে, জল যতই পরিশোধিত হোক না কেন, তা থেকে সব সময়েই অল্প পরিমাণ জ্যোতি নির্গত হচ্ছে। এই পরীক্ষার সময় চেরেনকভ্ কর্তৃক ব্যবহৃত গামা-রশ্মি বিশেষ শক্তিশালী ছিল না। ফলে, জলের এই প্রভা অন্ধকার ঘরে কেবল মাত্র অভ্যস্ত চোখেই দেখা যেত।

চেরেনকভের পরীক্ষা অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে দেখানো হলো। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই এই ক্ষীণ প্রভাকে অলীক ও দৃষ্টি-বিভ্রম-জনিত বলে ব্যাখ্যা করলেন। যে স্বল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী এটিকে বাস্তব বলে বিশ্বাস করলেন, তাঁরাও এই প্রভাকে গামা-রশ্মিজনিত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের যে প্রভা লক্ষ্য করা যায়, তারই অনুরূপ কোন ঘটনা বলে মনে করলেন। একমাত্র ভ্যাভিলভই এই আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন ও চেরেনকভ্‌কে আরো কয়েকটি পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে উপদেশ দেন। বাস্তবিক চেরেনকভ্ বিকিরণের আবিষ্কারে ভ্যাভিলভের অবদান এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, আজও রাশিয়ায় এই বিকিরণকে চেরেনকভ্ বিকিরণ না বলে ভ্যাভিলভ-চেরেনকভ বিকিরণ বলা হয়।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের বৃহত্তম কারখানা

নিউইয়র্কের সহরাঞ্চলের জন্যে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদনের এটিই হবে বৃহত্তম কারখানা। এই কারখানা থেকে দশ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। এই কারখানা নির্মাণে খরচ হবে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার। কন্‌সলিডেটেড এডিসন কোম্পানী এই কারখানা নির্মাণ করবেন।

চর্মরোগ চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি

চর্মরোগ ও ত্বকের প্রদাহের চিকিৎসার একটি অভিনব পদ্ধতি ও ভেষজ সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে বলে ওয়াশিংটনের আন্তর্জাতিক ত্বক বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাম্প্রতিক অধিবেশনে ক্যালিফোর্ণিয়ার পাসাডেনার ডাঃ শোল্‌জ্‌ এবং আরও দু-জন চিকিৎসক জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, সম্প্রতি উদ্ভাবিত 'কর্টিকোস্টেরয়েড্‌স্‌ কম্পাউণ্ড' নামে ভেষজ চর্মরোগ ও ক্ষতে ব্যবহার করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এই ঔষধটি ক্ষতস্থানে নমনীয় প্লাষ্টিক ফিল্ম দিয়ে দু-তিন দিন এঁটে রাখা যায়। নানা রকমের কাউর এবং অন্যান্য চর্মরোগে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। কেবল দেহের বিশেষ স্থানে নয়, সারাদেহ চর্মরোগাক্রান্ত হলেও এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা হতে পারে। এই পদ্ধতিতে কর্টিকোস্টেরয়েড্‌স্‌ সেবন করা বা ইন্‌জেকশন দেবার প্রয়োজন হয় না।

বাল্টিমোরের ডাঃ শোল্‌জ্‌ এবং ডাঃ হ্যারি এম. রবিন্সন এবং সিনসিনাটির ডাঃ লিও গোল্ডম্যান দু-বছর ধরে ১৬০০ রোগীর উপর এই প্রক্রিয়ায় এই ঔষধটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পেয়েছেন। ত্বকের নানা রকম প্রদাহের চিকিৎসায় ও রোগদুষ্ট স্থান নতুন প্রক্রিয়ায় বেঁধে রাখবার ফলে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। পূর্বে এসব রোগের চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। এই চিকিৎসায় শরীরের কোন ক্ষতি হয় না।

মস্তিষ্কে রাসায়নিক দ্রব্যের অসমতাই মানসিক রোগের কারণ

মস্তিষ্কে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ যথাযথ অনুপাতে না থাকলেই মানসিক রোগ দেখা দেয়, এদের অসমতাই মানসিক রোগের কারণ। নিউইয়র্কের রকফেলার ইনষ্টিটিউটের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জৈবরসায়ন-বিজ্ঞানী ডাঃ ডি. ডব্লিউ. উলি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন এবং এর সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন।

এই নতুন জৈবরাসায়নিক মতবাদে এই সম্পর্কে ফ্রয়েডীয় মতের বিরুদ্ধতা করা হচ্ছে। ফ্রয়েডীয় মতে, প্রথম জীবনে অথবা জন্মের পূর্বে কোন রকম মানসিক অভিঘাতই কঠিন মানসিক রোগের কারণ।

ডাঃ উলি এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানসিক রোগের কারণ হচ্ছে জৈবরাসায়নিক। তাঁর মতে, মানসিক স্বাস্থ্যের মূলে আছে সিরোটোনিন নামে হর্মোন। দশ বছর আগেও এই হর্মোনের কথা জানা ছিল না। এই হার্মোনটির আবিষ্কারের পরই জানা গেল যে, এর সঙ্গে মানসিক পীড়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। ডাঃ উলি এই সম্পর্কে "দি বায়োকেমিক্যাল বেসিস অব সাইকোসিস" নামে একটি বই লিখেছেন। তাতে সিরোটোনিন ও অন্যান্য ঔষধের ক্রিয়া লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন যে, অতি অল্প সিরোটোনিন

মানসিক বিষণ্ণতা এবং অতিরিক্ত সিরোটোনিন চিত্তভ্রান্তি ও উত্তেজনার কারণ হয়ে থাকে।

উদ্ভিদ থেকে নতুন ওষুধ

তুর্কমেন বিজ্ঞান পরিষদের উদ্ভিদবিদ্যা ভবনের বিজ্ঞানীরা আড়াই হাজারেরও বেশী বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ সম্পর্কে গবেষণা চালাচ্ছেন, তাদের ভেষজগুণ নির্ধারণের জন্যে। প্রাথমিক বিশ্লেষণ ও অনুশীলনের ফলে ১৯০টি উদ্ভিদের মধ্যে ১৫০টিই ভেষজগুণ-সম্পন্ন বলে প্রমাণিত হয়েছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের গাছগাছড়া ছাড়াও তুর্কমেন বিজ্ঞানীরা ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা ও আরব দেশ থেকে সংগৃহীত নানা রকমের গাছগাছড়া নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। ১৯৫৯ সালে তাঁরা ভারত থেকে এক ধরণের বুনো দারুচিনি (ক্যাসিয়া অ্যাকিউটিফোলিয়া) গাছের চারা আনিয়ে গবেষণা সুরু করেন। গত মাসে তাঁরা এই উদ্ভিদ থেকে কয়েক রকমের চক্ষু-রোগের ওষুধ তৈরীর কাজে সফল হয়েছেন। বর্তমানে দক্ষিণ কাজাকিস্তানের দারমিনা খামারে ব্যাপকভাবে এই ভারতীয় বুনো দারুচিনি গাছের চাষ হচ্ছে। ব্রেজিল থেকে আমদানী করা “বার্ড নাইটশেড” নামে উদ্ভিদ থেকে তাঁরা কর্টিসোন শ্রেণীর একটি রাসায়নিক-হর্মোন তৈরী করেছেন। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে “লাইকোরাইস” নামে যে উদ্ভিদটি প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, তাথেকে তাঁরা তৈরী করেছেন রক্তচাপা-ধিক্যের একটি কার্যকরী ওষুধ।

অগ্নিরোধক যন্ত্র

লেনিনগ্রাডের সুতীবস্ত্র গবেষণা ভবনের কর্মীরা এমন এক সাংশ্লেষিক কাপড় তৈরী করেছেন, যা আগুনের উপর ধরলে শুধু যে পোড়ে না—তাই নয়, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আগুনই নিবিয়ে দেয়।

এই অগ্নিরোধক বস্ত্রের মূল উপাদান হলো ফসফরাসের ধরণের যৌগিক পদার্থ। আগুনের সংস্পর্শে এসে এই সাংশ্লেষিক তন্তুর বস্ত্র গরম হয়ে ওঠবার ফলে ফস্‌ফরাস যৌগিকের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় আগুন নিবিয়ে দেয়। ধোয়া-কাচার পরেও এই কাপড়ের অগ্নিরোধক গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে।

প্রতি সেকেণ্ডে ১০ কোটি ফটোগ্রাফ গ্রহণক্ষম ক্যামেরা

তেজস্ক্রিয় আয়নিত কণার বিচ্ছুরণের গতি-প্রকৃতির অনুশীলন করবার জন্যে লেনিনগ্রাডের সিনে-ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এমন একটি ক্যামেরা তৈরি করেছেন, যার সাহায্যে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ কোটি আলাদা আলাদা ফিল্ম-ফ্রেমে আলোকচিত্র নেওয়া যায়। এই বিশেষ ধরণের লেন্টিকিউলার ক্যামেরার নাম “আর-কে-এস-১”। এর সাহায্যে ফটো তুলে বিশেষ করে ফ্ল্যাশ্‌ ল্যাম্পের নিঃসরণ বা ডিস্‌চার্জ-এর পদ্ধতি ও প্রকৃতি অনুশীলন করা হয়েছে।

এই ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে “আর-কে-এস-২” নামে আর একটি ক্যামেরা তৈরির কাজে নিযুক্ত আছেন, যার সাহায্যে আরও দ্রুততর গতিতে ফটোগ্রাফ তোলা সম্ভব হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ : ২য় সংখ্যা
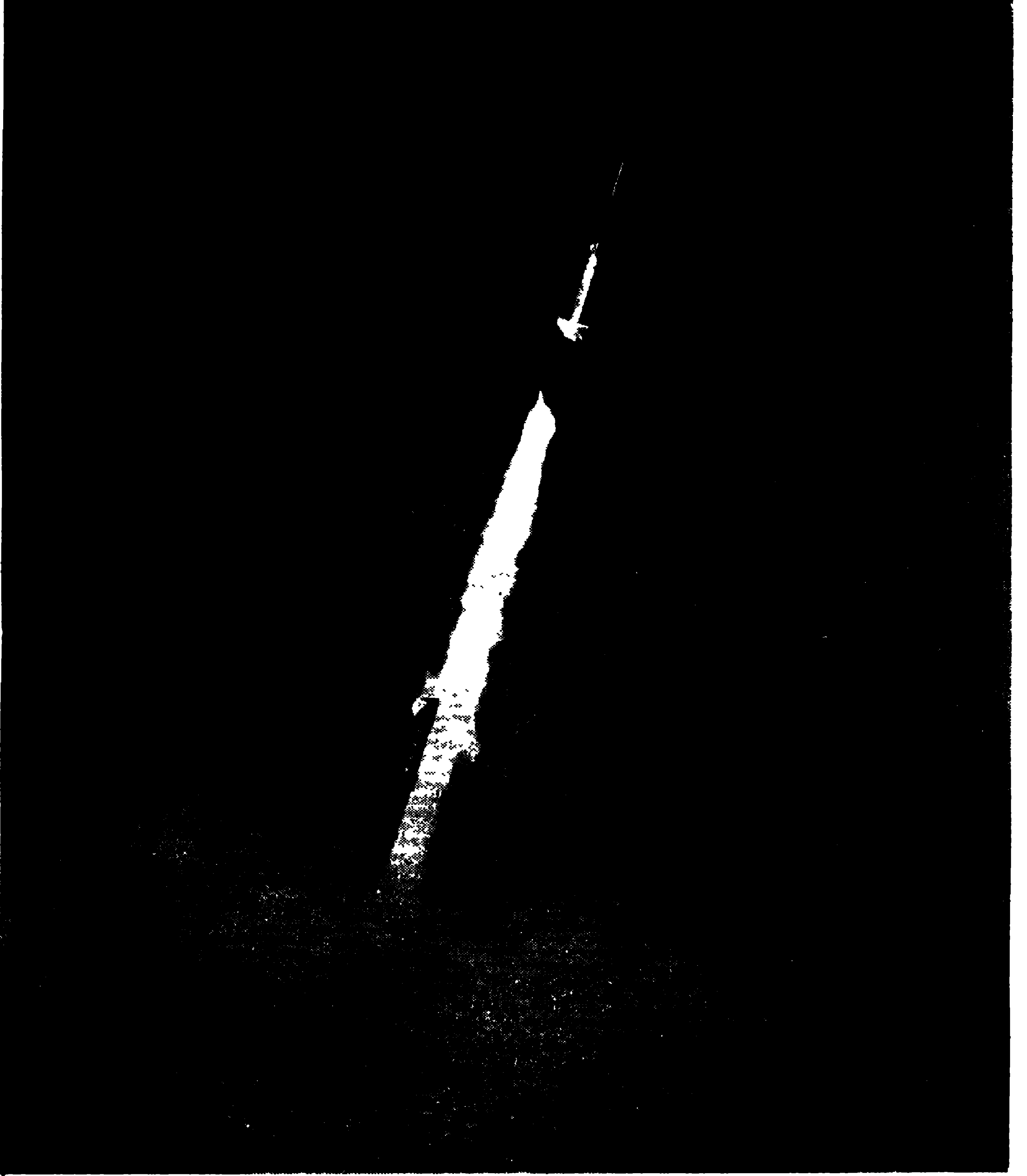
আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে জাপানী রকেট নাইক কেজান (আমেরিকা থেকে প্রাপ্ত) নামক পর্যবেক্ষক রকেট উৎক্ষেপণের দৃশ্য।

ধুলা

আমরা প্রায়ই শুনি যে, রহস্য-সন্ধানী বিজ্ঞানীদের কাছে কিছুই ফেল্‌না নয়। তবে সময় সময় তাঁরা এমন সব ব্যাপার নিয়ে গবেষণা করেন, যার কোন অর্থই আমরা খুঁজে পাই না। এমন একটি জিনিষ হলো ধুলা। এই ধুলা নিয়ে কত যে গবেষণা করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তা জানলে অবাক হতে হয়। আরও অবাক হতে হয়, যখন দেখি যে, ধুলার মধ্য থেকে কত সব আশ্চর্য ঘটনার কারণ বের করা হয়েছে।

আমাদের কাছে ধুলা একটি অতি বিরক্তিকর জিনিষ। কোন জিনিষের উপর জমে তাকে ময়লা করা ছাড়া আমরা তার কোন কাজ দেখি না। এমনও হয়েছে যে, আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত ধুলা দিনের পর দিন মাথার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। বহুদুর পর্যন্ত গিয়ে অবশেষে সেগুলি সমুদ্রের জলে মিশে গেছে। আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে যে কি পরিমাণ ধুলা ওঠে, সেটা কল্পনারও বাইরে। শিল্পপ্রধান শহরেই ধুলার উপদ্রব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের সঙ্গে এত ধুলা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল যে, সারা দেশেই সূর্যের আলো স্তিমিত হয়ে পড়েছিল। মনে হয়েছিল, হঠাৎ বুঝি গভীর রাত নেমে এসেছে। সেই ধুলা ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়গিরি থেকে বৃত্তাকারে এক হাজার মাইল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল দুই ইঞ্চি গভীর হয়ে। প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীটাই হয়ে উঠেছিল ধুলায় আচ্ছন্ন। ক্রাকাতোয়ার কাছাকাছি ধুলা জমেছিল প্রায় চার ফুট গভীর হয়ে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন—যে পরিমাণ ধুলা ক্রাকাতোয়া থেকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা সম্পূর্ণরূপে মাটিতে নেমে আসতে সময় লেগেছিল দুই বছরেরও বেশী।

ধুলা বলতে শুধু পথের ধুলাই বুঝায় না। যে কোন জিনিষ গুঁড়া করলে ধুলায় পরিণত হতে পারে। তাই, যা কিছু রেণুর মত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাকেই ধুলা বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানীরাও ধুলা বলতে তাই বোঝেন। তাই ধুলা অনেক রকমের হতে পারে—কয়লার গুঁড়া, ধোঁয়ার কণা থেকে সুরু করে রাসায়নিক পদার্থের ভাসমান রেণু পর্যন্ত। খনির শ্রমিকদের ফুস্‌ফুস নিয়ে পরীক্ষা করলে তাতে অনেক খনিজ ধুলা পাওয়া যাবে। এভাবে অনবরত খনিজ ধুলা ফুস্‌ফুসের মধ্যে যাওয়ার ফলে শ্রমিকদের অনেকেই শেষ বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। আবার যারা অতিমাত্রায় ধূমপান করে, তাদের ফুস্‌ফুসের মধ্যে এত অঙ্গার-কণা জমে ওঠে যে, ফুস্‌ফুসের গায়ে কালো ছোপের মত দাগ পড়ে যায়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের একুশে আর বাইশে ফেব্রুয়ারী তারিখে দক্ষিণ ইউরোপে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে, সেখানকার অধিবাসীরা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কারণ এই দু-দিন ধরে সেখানে কেবলই ধুলিবৃষ্টি হয়েছিল। সে ধুলার রং আবার লাল। বৈজ্ঞানিকেরা অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন যে, বাতাসের সঙ্গে পরিবাহিত হয়ে এই

ধূলা ইউরোপে এসেছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় মরুভূমি থেকে এই ধূলা আকাশে উঠেছিল, তারপর উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা হয়ে দক্ষিণ ইউরোপে এসেছে। হিসেবে দেখা গেল, যে পরিমাণ ধূলা শুধু দক্ষিণ ইউরোপেই পড়েছে, তার ওজন প্রায় ১০,০০০০০০ টন।

বাতাস ধূলাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। বাতাসের ধাক্কায় মাটির কণা সরতে সরতে সেই জায়গাটি এমন অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, তাকে আর চেনাই যায় না। বিজ্ঞানীদের মতে—গোবী মরুভূমি এককালে খুব উর্বর ছিল। বাতাসের ধাক্কায় উপরের মাটি ক্রমশঃ সরে গিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। গোবী থেকে পরিবাহিত ধূলা সৃষ্টি করছে চীনের লোয়েস-কে। অনেক সময় দেখা যায়, বেলাভূমিতে বাতাসের তারতম্যের জন্যে সঞ্চিত বালুকারাশির পরিমাণেরও তারতম্য হয়েছে। সমুদ্রের তীরে সব সময়েই রাসায়নিক ধূলা ভাসমান। এগুলি সমুদ্রের লবণ-কণা। এখানে আগুন জ্বালালেই সোডিয়াম আলো পাওয়া সম্ভব। লবণ-জলে সিক্ত একটি সূতায় আগুন ধরালে দেখা যাবে, আগুনের শিখার রং হল্‌দে। এই হল্‌দে রঙের আলোকে সোডিয়াম আলো বলে।

ধূলা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। বৈজ্ঞানিক এইট্‌কেন ধূলা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন সেই সময়। তিনি প্রমাণ করেন যে, ধূলাকে কেন্দ্রক হিসেবে ধরেই বৃষ্টির ফোঁটা গড়ে ওঠে। যে ধূলা আমাদের এত বিরক্তির সৃষ্টি করে, সেই ধূলা না থাকলে বৃষ্টিই হতো না। সম্পৃক্ত মেঘ থেকে সব সময় বৃষ্টি হয় না। তার কারণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূলা সেখানে থাকে না। এইট্‌কেন প্রমাণ করেন, এক ঘন সেঃ মিঃ-এ ৫০০-এরও বেশী ধূলিকণা থাকা সত্ত্বেও বৃষ্টি না হতে পারে। ধূলার আরও অনেক প্রয়োজন। পরে অবশ্য বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, বৃষ্টির জন্যে ধূলার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এই ধূলাকে এইট্‌কেন যে রকম ভেবেছিলেন, সেই রকম নয়। বৃষ্টির ফোঁটার জন্যে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থের কণার প্রয়োজন। কৃত্রিম বৃষ্টিপাত কি ভাবে করা যায়, তাও বিজ্ঞানীরা বুঝেছেন। বৃষ্টির কণার জন্যে উপযুক্ত কেন্দ্রক পাঠাতে পারলে বৃষ্টি হতে পারে।

অনেক সময় দেখা গেছে, কালো বা হল্‌দে বৃষ্টি পড়ছে। বায়ুমণ্ডলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কালো বা হল্‌দে ধূলা থাকলেই এমন হতে পারে। পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে কালো ধোঁয়ার সৃষ্টি হওয়াতে জাপানে কয়েক বছর আগে কালো রঙের বৃষ্টি পড়েছিল। এসব ধূলা তেজস্ক্রিয় হওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটাও তেজস্ক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাণীর পক্ষে এই তেজস্ক্রিয় বৃষ্টিপাতের ফল ভয়াবহ। সেকেণ্ডে কি মাত্রায় ধূলা পৃথিবীর উপর জমতে পারে, তাও বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। ধূলা যদি

গোলাকার হয়, তবে ধূলার ঘনত্বকে তার ব্যাসের বর্গফল দিয়ে গুণ করে তাকে আবার ১২০০০০০ দিয়ে গুণ করলে এই মাত্রার একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাবে। কুজ্ঝটিকার কারণও এই ধূলা। সাধারণতঃ কুজ্ঝটিকার কেন্দ্রকের ধূলার ব্যাসার্ধ হয় '০০০৫ মি. মি.।

চাঁদের দেশে পাড়ি দেবার তোড়জোড় আমরা করছি। চাঁদকে পৃথিবী থেকে সুন্দর একটি গোলাকার সোনার থালার মত মনে হয়। চাঁদ কিন্তু আগাগোড়া একটা মরুভূমি। এমন কি, চাঁদের আকাশও পৃথিবীর আকাশের মত নীলাভ নয়। চাঁদের আকাশ কালো। পৃথিবীর আকাশও কালো হতো, যদি না পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধূলা থাকতো। একটা কাচের লম্বা নলের মধ্যে পরিষ্কার কোন তরল পদার্থ ভরে তাকে যদি রোদের সামনে ধরা হয়, তবে তাথেকে একরকম নীল আভা বের হতে দেখা যায়। এর জন্যে দায়ী তরল পদার্থের অণু এবং তরল পদার্থের মধ্যে যে সব ধূলিকণা আছে, সেগুলি। এই একই কারণে আকাশ নীল দেখায়। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড র‍্যালে ধূলাতে আলোর বিক্ষেপণ নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন যে, আপতিত রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চেয়ে ধূলার ব্যাস ছোট না হলে বিক্ষেপণ হবে না।

ক্রাকাতোয়ার আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের সময় যে ধূলা আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা অনেকদিন পর্যন্ত ভাসমান ছিল। তাই বিভিন্ন দেশের আকাশে সময় সময় বিচিত্র রঙের সমারোহ দেখা যেত। গোধূলির সময় আকাশের একটা দিক রক্তাভ হয়ে ওঠে—এর জন্যে ধূলার আলোক বিক্ষেপণ কিছুটা দায়ী। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে এত ধূলা আছে বলেই অমাবস্যার রাত নিকষ কালো অন্ধকার হয় না। নক্ষত্রগুলি থেকে পৃথিবীতে খুব কমই আলো আসে। দিনের বেলায় ধূলা সূর্যের আলোর কিছুটা শোষণ করে নেয় এবং রাত্রিতে তা বিকিরণ করে। ধূলার আরো প্রয়োজনীয়তা আছে। বায়ুমণ্ডলে ধূলা আছে বলেই সূর্যের প্রচণ্ড তেজের কিছুটা হ্রাস পায়। সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনী রশ্মির কিছু অংশও ধূলা শোষণ করে নেয়।

আর এক রকমের ধূলা আছে, যার উৎপত্তি পৃথিবীতে নয়। বিজ্ঞানীরা এগুলিকে বলেন, মহাজাগতিক ধূলা। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ক্ষেত্রেও এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, আকাশে যে এত তারা দেখি, তা হয়তো এই মহাজাগতিক ধূলা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে।

আকাশ থেকেও পৃথিবীতে ধূলা এসে পড়ছে অনবরত। শুনলে আশ্চর্য লাগে, এই আকাশ থেকে পড়া ধূলার জন্যে বছরে ১০০০০০০ টন করে পৃথিবীর ওজন বাড়ছে। চাঁদের ওজন কিন্তু বাড়ছে আরও বেশী মাত্রায়। তার কারণ, চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই বলে অনবরত বিরাট বিরাট উল্কা এসে পড়ছে।

শ্রীঅশেষকুমার দাস

গ্রহণের ইতিকথা

এলাহাবাদ। গঙ্গাতীরে বহুলোক জমায়েৎ হয়েছে লাঠিসোটা নিয়ে। ঢাক-ঢোল, খোল-করতালের প্রচণ্ড কোলাহল। রাহু নাকি চাঁদকে খেতে আসছে। তাই এত সাবধানতা। রাহুকে কিছুতেই চাঁদের কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হবে না। কিন্তু হৈ হৈ করতে করতেই রাহু চাঁদে এক কামড় বসিয়ে দিল। গ্রহণ লাগলো। তারপর অবশ্য মানুষের মন্ত্র, চীৎকার ও বিক্রমে ভয় পেয়ে রাহু চাঁদকে ছেড়ে পালিয়ে গেল। গ্রহণ ছাড়লো।

চাঁদ আর সূর্যের উপর রাহুর বহুদিনের আক্রোশ। সেই সত্যযুগে অমৃতমন্থনে অমৃত উঠলো। দেবতা ও অসুর দু-দলকেই একটু একটু করে ভাগ করে দেবেন বিষ্ণু। মোহিনী মূর্তি ধারণ করে তিনি দেবতাদের আগে পরিবেশন করছেন। রাহু ও কেতু দুই অসুর ভাবলো—কি জানি শেষে যদি ফুরিয়ে যায়! ছদ্মবেশে দেবতাদের দলেই পাত পাতলো তারা। অমৃত তাদের পাতেও দেওয়া হয়েছে। চন্দ্র ও সূর্যের খেয়াল হলো—এরা অসুর। তাঁদের চীৎকারে বিষ্ণু অসুরদের চালাকি বুঝতে পেরে সুদর্শন চক্রকে আদেশ দিলেন ওদের গলা কেটে ফেলতে। অমৃত মুখে দেওয়া হয়ে গেছে, কাজেই শুধু মুণ্ডুটা অমর হয়ে রইলো। যুগ যুগ ধরে রাহু আর কেতু চন্দ্র ও সূর্যকে তাড়া করে ফিরছে। সুযোগ পেলেই তাদের গিলে ফেলে। পেট নেই, হজম হয় না—গলার নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসে চন্দ্র-সূর্য। এই হলো চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণ ও গ্রাসমুক্তির আদি গল্প।

চীনের লোক গ্রহণের সময় ক্যানেস্তারা পিটিয়ে চ্যাঁচামেচি, দৌড়ঝাঁপ করে ড্র্যাগন তাড়ায়। বিরাট ড্র্যাগনটার কাছে চন্দ্র-সূর্য উপাদেয় খাদ্য। কাছে পেলেই টপ্ করে গিলে ফেলে--নিদেন একটা কামড় দেবেই। ফলে পূর্ণ গ্রহণ বা আংশিক গ্রহণ ঘটে। লোকজনের তাড়া খেয়ে ড্র্যাগন পালায়, গ্রহণ ছাড়ে।

চীনের লোকের বিশ্বাস ছিল, গ্রহণ লাগে রাজার দোষে। রাজজ্যোতিষীর কাজ ছিল আগে থেকে হুসিয়ারী দেওয়া, যাতে সবাই মিলে ভয়ডর দেখিয়ে ড্র্যাগনটাকে তাড়িয়ে দিতে পারে। একবার শী এবং হো নামে দু-জন রাজজ্যোতিষী আমোদ-স্ফূর্তিতে বেঁহুস। কখন যে গ্রহণ লেগে গেছে খেয়াল নেই। গ্রহণ ছাড়বারও লক্ষণ নেই। তদন্ত হলো রাজার আদেশে। জানা গেল, জ্যোতিষীদেরই দোষ। রাজার হুকুমে সেনাপতি চললেন অপরাধীদের সাজা দিতে। কি সাজা তা অবশ্য ইতিহাসে পাই নি। পদস্থ ব্যক্তিরও ফাঁসির দণ্ড ছিল।

জ্যোতির্বিদ্যা এখন উন্নত বিজ্ঞান। অঙ্ক কষে ও পরীক্ষা করে দেখা গেছে, গ্রহণ আলোছায়ার খেলা, রাহু আর ড্র্যাগন দুই-ই নিছক গল্প।

অস্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়ে আলো যায় না। আলোর সামনে এলে তার ছায়া পড়ে। সূর্যের সামনের পৃথিবী চাঁদের উপর নিজের ছায়া ফেলে। চাঁদের কিরণ আমরা

পাই না, এই হলো চন্দ্রগ্রহণ। সূর্যের আলোর পথে চাঁদ এসে দাঁড়ালে সূর্য ঢাকা পড়ে চাঁদের আড়ালে—তখন হয় সূর্যগ্রহণ। সূর্য অতি প্রকাণ্ড, চাঁদ ছোট্ট, তবুও এটা সম্ভব দূরত্বের জন্যে। যেমন চোখের সামনে ধরা একটা ছোট মার্বেলের গুলি মস্তবড় ইলেকট্রিক বাল্বকে আড়াল করে দিতে পারে।

পৃথিবী একটা লাট্টুর মত ঘুরতে ঘুরতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। পৃথিবী এই ছোট্ট শিশুটিকে নিয়েই সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঘোরাঘুরির পথ সুনির্দিষ্ট।

পৃথিবীর এই ডিম্বাকৃতির পরিক্রমা-পথকে আমরা বলি কক্ষপথ। চাঁদের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথকে পাঁচ ডিগ্রী কোণে ছেদ করে।

চাঁদ ও পৃথিবী যুগ যুগ ধরে নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘোরবার পথে কখনও কখনও পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য এক সরল রেখায় এসে যায় এবং নিজের ছায়া দিয়ে একে অন্যকে আড়াল করে দেয়। ফলে হয় গ্রহণ। সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী এসে দাঁড়ালে চাঁদের কিরণ বন্ধ হয়ে যায়—ফলে হয় চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্র সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে আড়াল করে দিলে হয় সূর্যগ্রহণ। সম্পূর্ণ আড়াল হলে পূর্ণগ্রহণ, না হলে আংশিক গ্রহণ হয়। মাঝখানটা অন্ধকার, চারদিকে একটুখানি সূর্যের আলো দেখা গেলে বলা হয় বলয়গ্রাস।

চন্দ্র ও পৃথিবীর কক্ষপথ পরস্পরের সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রীতে কাৎ হয়ে আছে, তাই রক্ষা, নচেৎ প্রতি মাসেই গ্রহণ হতো। বছরে সবচেয়ে বেশী সাত ও সবচেয়ে কম দুটি গ্রহণ হতে পারে।

গ্রহণ সম্বন্ধে মানুষের জিজ্ঞাসা অতি প্রাচীন কাল থেকে। প্রায় চার হাজার বছর আগেও মানুষ যে গ্রহণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতো, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ চর্চা ছিল। কতকগুলি বিষয়ে তাঁদের জ্ঞানের গভীরতা বিস্ময়কর।

১৫০৪ খৃষ্টাব্দে এক অভিযানের শেষে কলাম্বাসের জাহাজের সব খাবার ফুরিয়ে যায়। স্থানীয় আদিম অধিবাসীরা কোন জিনিষপত্র দেয় না। আদিম অধিবাসীদের সর্দারকে ডেকে তিনি বললেন, তোমরা আমাকে জিনিষপত্র দিচ্ছ না—খৃষ্টানদের ভগবান তার জন্যে ক্রুদ্ধ হয়েছেন। অমুক দিন তিনি আকাশ থেকে চাঁদকে সরিয়ে নেবেন। কেমন দুর্ভিক্ষ আর মহামারী সুরু হয় দেখবে।

যথাসময়ে চন্দ্রগ্রহণের ফলে সব অন্ধকারে ছেয়ে গেল। আদিম অধিবাসীরা হাঁউ-মাউ করে পড়লো কলাম্বাসের কাছে। কলাম্বাস ওদের হয়ে ভগবানের কাছে আর্জি পেশ করতে রাজী হলেন। জিনিষপত্র পেয়ে তিনিও বেঁচে গেলেন।

এটা অবশ্য কলাম্বাসের একচেটিয়া নয়। ১৮০৬ সালে আমেরিকান রেড

ইণ্ডিয়ানদের সর্দার Techumesh-এর ভাই কি করে কোথা থেকে জানতে পারলো—গ্রহণের খবর। অব্যর্থ টোটকা ওষুধের ডাক্তার সে, কিন্তু পশার হয় না কিছুতেই। অমুক তারিখে এক জোরালো ওষুধ দিয়ে সে সূর্যের মুখ পুড়িয়ে কাল করে দেবে—এই কথা বেশ করে রটিয়ে দিল। যথাসময়ে গ্রহণের ফলে সূর্যের চেহারা কালো হয়ে গেল। এবার তার এমনই পশার হলো যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়ের অভাবে তার না খেয়ে মরবার দশা। তবে মোক্ষম ভূত ও ভবিষ্যদ্বাণী করেন ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়ার জ্যোতির্বিদ Ritter von Oppoler ১২০৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ২১৬২ পর্যন্ত (আজ থেকে আরও দু-শ' বছর পর্যন্ত) যত গ্রহণ হয়ে গেছে ও হবে, তার এক প্রকাণ্ড ফর্দ তৈরী করেন। এতে আছে ৮০০০ সূর্যগ্রহণ ও ৫২০০ চন্দ্রগ্রহণের সন ও তারিখ।

এই হিসাব জানবার ফলে ইতিহাসের সন তারিখের ভুল কিছু কিছু শোধরানো গেছে। যেমন—যীশুখৃষ্টের জন্মের বছর থেকে যে খৃষ্টাব্দ ও খৃষ্টপূর্বাব্দের হিসাব করা হয়, তার গোড়ায় গলদ ধরা পড়েছে। যীশুর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৩ সনের ১৩ই মার্চ।

রবিবার সূর্যগ্রহণ ও সোমবার চন্দ্রগ্রহণ লাগলে বলা হয় চূড়ামণি যোগ। এই গ্রহণে স্বর্ণদান করতে হয়, পাঁজিতে আছে। গ্রহণের পর মুক্তিস্নানে অনন্ত ফল প্রাপ্তির যে ঘোষণা, তার সত্যতা পরখ করবার উপায় আবিষ্কার হতে দেরী আছে। কিন্তু গ্রহণ দেখার আশু ফল প্রাপ্তির কথা আমরা জানি। যেমন—আমেরিগো ভেস্‌পুচি (আমেরিকা খ্যাতির) একবার অকূলপাথারে তাঁর জাহাজের অবস্থান-স্থল নির্ণয় করতে পারছিলেন না। এমন সময় হলো গ্রহণ। সময় মিলিয়ে ও পাঁজির সাহায্যে তিনি তাঁর অবস্থান-স্থল নির্ণয় করে ফেলেন সহজেই।

প্রকৃতির অনেক গোপন তথ্য জানা গেছে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের ফলে। সূর্যের উপাদান সম্বন্ধে অনেকের জিজ্ঞাসা ছিল। পূর্ণগ্রহণের সময় স্পেক্ট্রোস্কোপ যন্ত্র ব্যবহারে সুফল পাওয়া গেছে।

এই বিষয়ে আরও আশা আছে। তাই গ্রহণের আগে বৈজ্ঞানিক-মহলে সাড়া পড়ে যায়। হাজার হাজার টন ওজনের যন্ত্রপাতি টানা-হেঁচড়া করে নিয়ে সুবিধামত জায়গায় অপেক্ষা করে থাকেন তাঁরা। তারপর কয়েক মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম হয়তো পণ্ড হয়ে যায় আকাশে মেঘ থাকবার ফলে। মানুষের জীবনে গ্রহণের অনেক প্রভাবের কথা জানা যায়। গ্রহণ শান্তি স্থাপন ও বিয়ের ঘটকালি করেছে, শোনা যায়। ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খৃষ্টপূর্ব ৫৮৫-এর ২৮শে মে'র এক সূর্যগ্রহণের কথা লিখে গেছেন। পাঁচ বছর ধরে লিডিয়া ও মীড দেশের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছিল। ক্ষণেক বিরামের পর পূর্ণ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো দু-পক্ষ পরস্পরের উপর। এমন সময় আকাশে নেমে এল ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিক নিস্তব্ধ। পাখীরা রাত হয়েছে ভেবে বাসায় ফেরবার পথে ডেকে উঠলো। দিনের বেলা এমন অস্বাভাবিক অন্ধকার ও নিস্তব্ধতায় ভয়ানক ভয়

পেয়ে গেল উভয় পক্ষের সৈন্যদল। দুই দেশের মধ্যে সন্ধি হলো। গ্রহণ ছেড়ে গেলে সূর্য দেখা দিল, কিন্তু শান্তি বজায় রইল। শান্তি স্থায়ী করবার জন্যে এক দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে অন্য দেশের রাজকন্যার বিয়ে দেওয়া হলো। তারপর থেকে এই দুই দেশ আর ঝগড়াঝাঁটি না করে পঞ্চশীল মেনে চললো। আর রাজপুত্র ও রাজকন্যা সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে লাগলো।

শ্রীসুকুমার দাস

বিবিধ

কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সঠিক আকৃতি নিরূপণের উদ্যোগ

গত ৩১শে অক্টোবর পৃথিবীর আকৃতি ও গড়ন যথাযথভাবে নিরূপণের উদ্দেশ্যে মার্কিন বিমান বাহিনী, জাতীয় বিমান বিজ্ঞান, মহাকাশ সংস্থা এবং নৌ ও সৈন্য বাহিনীর উদ্যোগে থর এবল ষ্টার রকেটের সাহায্যে অ্যানা আই. বি. নামে ৩৫০ পাউণ্ড ওজনের একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী থেকে ৭০০ মাইল উর্ধ্বে প্রেরিত হয়েছে। গত অক্টোবর মাসে এই উপগ্রহটিকে নিয়ে পাঁচটি উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়।

বহু যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই উপগ্রহে অতি শক্তিশালী চারটি আলো আছে। এই সকল আলোর সাহায্যে পরিচিত নক্ষত্রের পটভূমিকায় ভূতলের কেন্দ্রসমূহের আলোকচিত্র গৃহীত হবে। তারপর এই সব তথ্য কম্পিউটার যন্ত্রে প্রেরিত হবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে পৃথিবীর যথার্থ কেন্দ্রের সন্ধান করতে পারবেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের যথার্থ অবস্থানের সন্ধানও পাওয়া যাবে। এর ফলে সঠিক মানচিত্র রচনা করা সম্ভব হবে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার কর্মচারীরা জানিয়েছেন যে, ঐ উপগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোকচ্ছটা পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যাবে কি না, তা তারা বলতে পারেন না।

এজন্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা স্থানে যে সব তথ্য-সন্ধানী কেন্দ্র রয়েছে, আগামী কিছু দিনের মধ্যেই এই সব কেন্দ্রের সাহায্যে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রাথমিক পরীক্ষা সম্পন্ন হবার পর পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের কেন্দ্রসমূহের সাহায্যে এই বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হবে।

গত মে মাসে ওয়াশিংটনে ১৮টি রাষ্ট্রের সদস্য-বর্গকে নিয়ে গঠিত কমিটির অধিবেশনের পর থেকে একটি আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক কার্যসূচীকে রূপদান করা হচ্ছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে পৃথিবীর নানা স্থানের বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহের সাহায্যে নিজেদের অঞ্চলের তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এই উপগ্রহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোর প্রত্যেকটি হবে ৮০ লক্ষ দীপ-শক্তির সমান। এছাড়া এই উপগ্রহে যে সব যন্ত্রপাতি আছে, তাদের সাহায্যে প্রায় নির্ভুলভাবেই এর কক্ষপথ নিরূপণ করা সম্ভব হবে। ফলে কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৃথিবী থেকে উপগ্রহটি ঠিক কতখানি উঁচুতে রয়েছে, তা নির্ধারণ করা যাবে। পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে এই উপগ্রহ থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীস্থিত তিনটি কেন্দ্রে তা রেকর্ড করা হবে। এই রেকর্ডের সাহায্যে পৃথিবীস্থিত কেন্দ্রসমূহে প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় করা যাবে।

ম্যালেরিয়া রোগ দূরীকরণের অভিনব ভেষজ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ভেষজ আবিষ্কার করেছেন। ম্যালেরিয়া রোগ উচ্ছেদের ব্যাপারে এই ওষুধটি খুবই সহায়ক হতে পারে।

এই ওষুধটির নাম 'সি ১৫০১'। আমেরিকার ন্যাশন্যাল ইন্‌স্টিটিউট অব হেলথ এর গুণাগুণ পরীক্ষার উদ্দেশ্যে এটিকে রোগচিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখেছেন যে, বর্তমানে প্রচলিত ওষুধসমূহ যতদিন কার্যকরী হয়ে থাকে, তার দশগুণ অধিক সময় কার্যকরী হয়ে থাকে এই নতুন ওষুধটি।

কোন কোন ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত রোগীর উপর এই ওষুধটি প্রয়োগ করে ইতিমধ্যে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। তবে এ-সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধ, উভয় ক্ষেত্রেই যে এটি কার্যকরী হবে, সে সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে এখনও বলবার সময় আসে নি।

যে সব স্বেচ্ছাসেবকের দেহে এক বছর আগে এই ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়েছিল, এক মাস অন্তর এই সংক্রামক রোগবাহী মশা কামড়ালেও তাদের দেহে কোন রোগের লক্ষণ দেখা যায় নি। কিন্তু যাদের দেহে এই ওষুধ প্রয়োগ করা হয় নি, তারা ঐ মশার কামড়েই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, রোগ সংক্রমণ দেহে স্থায়ী হবার পূর্বেই 'সি ১৫০১' ওষুধটি রোগীর দেহে প্রয়োগের ফলে রোগ সংক্রামিত হলেও রোগ-বীজাণুগুলি মরে যায়। একথা সত্য হলে ভারতে প্রচুর পরিমাণে এই ওষুধটি আমদানী করতে হবে। ম্যালেরিয়া রোগ এখনও ভারতের গুরুতর সমস্যা। ভারতের ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ পরিকল্পনায় ১৯৫৩ সাল থেকেই আমেরিকা ভারতকে সাহায্য করছে।

ম্যালেরিয়া রোগ চিকিৎসায় 'সি ১৫০১' ওষুধটি প্রয়োগে অত্যাশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে বলে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। তবে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত অঞ্চলে প্রয়োগ করে তাঁদের সিদ্ধান্তের সত্যতা নির্ধারণের পরেই জনসাধারণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একে বাজারে ছাড়া হবে।

শুক্রগ্রহ অভিমুখে প্রেরিত কৃত্রিম উপগ্রহ দ্বিতীয় মেরিনার

দ্বিতীয় মেরিনারে মহাকাশে তেজস্ক্রিয়তা, উল্কাকণা, ভূচৌম্বক ক্ষেত্র ও মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে যে সব যন্ত্রপাতি চালু রয়েছে, গত ১লা নভেম্বর পৃথিবী থেকে প্রেরিত বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে সেগুলিকে বন্ধ করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। মহাকাশে এক কোটি বিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত এই উপগ্রহে এই সঙ্কেত গৃহীত হয় এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার গোল্ড-স্টোন বেতার-কেন্দ্রে এই নির্দেশ যে কার্যকরী করা হয়েছে, সে কথা জানানো হয়।

গত ১৪ই ডিসেম্বর এই উপগ্রহটি শুক্র গ্রহের খুবই কাছাকাছি এসে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তখন প্রায় ৩০ মিনিট কাল এই কৃত্রিম উপগ্রহটি ঐ গ্রহের খুবই কাছে ছিল।

ঐ উপগ্রহের যন্ত্রপাতিতে ইতিমধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ খুবই হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। সৌর শক্তি চালিত ব্যাটারী থেকেই এতে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছিল। বিজ্ঞানীরা মনে করেন না যে, মহাকাশে তেজস্ক্রিয়তার ফলেই এই সব ব্যাটারী নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁদের ধারণা, ভল্টেজ রেগুলেটার যন্ত্রের গোলমালই এর কারণ। আপনা থেকেই এর সংশোধন হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ে তথ্যসন্ধানী যন্ত্রসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুক্রগ্রহ সম্পর্কে তথ্যসন্ধানী যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে যাতে অকেজো না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে।

ক্যালিফোর্ণিয়ার গোল্ডস্টোন কেন্দ্র, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য কেন্দ্রে এর অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়মিত তথ্য সরবরাহ করছে।

নোটিশ

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) রুলের ৮নং ফরম অনুযায়ী বিবৃতি :—

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশনের কাল—মাসিক

৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৪। প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৫। সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ভারতীয়, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

৬। স্বত্বাধিকারীর নাম ও ঠিকানা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, (বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান) ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

আমি, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরিউক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
প্রকাশক—'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা

তারিখ—২৩-২-৬৩

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ | মার্চ, ১৯৬৩ | তৃতীয় সংখ্যা

কেন্দ্রকের শক্তি এবং মেসন ও আগন্তুক কণা

শ্রীঅজিতকুমার সেনগুপ্ত

কেন্দ্রকের শক্তিকে 'বিনিময় শক্তি' (Exchange force) বলা যেতে পারে, কারণ এর ক্ষমতা বলেই নিউট্রন এবং প্রোটন ক্রমপর্যায়ে একটি থেকে অন্যটিতে রূপান্তরিত হয়। 'নিউট্রিনো হাইপথেসিস' অনুসারে জানা গেছে যে, "পরিবর্তনের" প্রতিটি পর্যায়ে ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনো পরস্পর নিজেদের শক্তি ও স্থান বিনিময় করে। নিউট্রন এবং প্রোটনের মিথস্ক্রিয়াতে নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত হয় এবং ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো উদ্ভূত হয়। এই ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনোকে প্রোটন আত্মসাৎ করে' নি ন পরিণত হয়। ফের্মির বিটা-অবক্ষয় তত্ত্বের সাহায্যে কেন্দ্রকসমূহকে বেঁধে রাখতে যে বলের প্রয়োজন, তার পরিমাপ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। আবার প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যেকার সংঘাতের ফলাফল অনুসরণ করলেও এই 'শক্তি' প্রত্যক্ষভাবে মাপা যায়। আশ্চর্যের কথা—এই দু'টি পদ্ধতিতে যে ফল পাওয়া গেছে, তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফের্মির তত্ত্ব অনুসরণ করে যে মান পাওয়া গেছে, তা দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বনে প্রাপ্ত মানের চেয়ে প্রায় হাজার গুণ ছোট। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে জাপানী পদার্থবিদ্ ইউকাওয়া ১৯৩৫ সালে অগ্রণী হলেন। তিনি বললেন যে, নিউট্রনের প্রোটনে রূপান্তরণ উপরিবর্ণিত পদ্ধতিতে হয় না, অর্থাৎ ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো উদ্ভূত না হয়ে অন্য এক ধরণের কণিকা বিচ্ছুরিত হয়। এর ভর ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় কয়েক শত গুণ বেশী। এই নবোদ্ভূত কণিকার নাম 'মেসন' রাখা হয়েছে, যেহেতু এর ভর প্রোটন ও ইলেকট্রনের মাঝামাঝি। মেসন কণিকার প্রধান ধর্ম হচ্ছে, এরা ইলেকট্রন অপেক্ষা অনেক ভালভাবে নিউক্লিওনগুলিকে এক সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারে। একথা আমরা জানি যে, কেন্দ্রক

থেকে বিটা রশ্মি প্রধানতঃ দুটি পর্যায়ে বিচ্ছুরিত হয়।

প্রথম পর্যায়ে—নিউট্রন, প্রোটন ও ঋণাত্মক মেসন কণিকায় পরিণত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে—মেসন কণিকা আপনা আপনি ভেঙে গিয়ে সৃষ্টি করে ইলেকট্রন এবং একটি নিউট্রিনো।

অনুরূপভাবে কেন্দ্রক থেকে পজিট্রন দুটি স্তরে উদ্ভূত হয়ে থাকে।

প্রথম স্তরে—প্রোটন, নিউট্রন ও ধনাত্মক মেসন কণিকায় পরিণত হয়। পরবর্তী স্তরে এই মেসন কণিকা ভেঙে পজিট্রন এবং নিউট্রিনোর জন্ম দেয়।

ইউকাওয়ার এই প্রকল্প (Hypothesis) প্রথমে সবাই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করলেন না। কিন্তু কয়েক বছর পরে পরীক্ষামূলকভাবে মেসন কণিকার অস্তিত্ব সত্য সত্যই প্রমাণিত হলো। মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণের মধ্যে মেসন কণিকার অস্তিত্ব আবিষ্কার করলেন একদল মার্কিন বিজ্ঞানী। তাঁরা মেঘ-প্রকোষ্ঠের (Cloud chamber) অভ্যন্তরে প্রবহমান মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক মেসন কণিকা দেখতে পেলেন। তবে মেসন কণিকাসমূহ এক সেকেণ্ডের দশলক্ষ ভাগের কয়েক ভাগ সময়ের মধ্যে নিজ থেকেই ইলেকট্রন এবং নিউট্রিনোতে পরিণত হয়।

এই আবিষ্কারের ফলে সহজেই অনুমান করা গেল যে, মহাজাগতিক রশ্মির বিকিরণ পথে যে সব মেসন কণিকার ছুটাছুটি দেখতে পাওয়া যায়, কেন্দ্রকের শক্তি সৃষ্টি তাদেরই কীর্তি। শীঘ্রই একথা স্পষ্ট জানা গেল যে ব্যাপারটা তা নয়। মহাজাগতিক রশ্মির মেসন কণিকা কদাচিৎ কেন্দ্রকের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তারা বেশ পুরু বস্তুর মধ্য দিয়ে শোষিত না হয়ে অতি সহজে চলে যেতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে কেন্দ্রকগুলিকে বেঁধে রাখবার কাজে তারা কতটা কার্যকরী, তা নিয়ে সন্দেহের সূত্রপাত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই সমস্যা রয়ে গেল ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এই বছরে বৃটেনে বিজ্ঞানী পাওয়েল এবং তাঁর সহকর্মীরা অপেক্ষাকৃত ভারী ধরণের মেসন কণিকার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। এই নবাবিষ্কৃত মেসন কণিকা অতি শীঘ্রই হাল্‌কা মেসন কণিকায় (যার কথা ইউকাওয়া বলেছিলেন) পরিণত হয়। বিভিন্ন ধরণের মেসন কণিকাকে চিহ্নিত করবার জন্যে হাল্‌কা ধরণের কণার নাম দেওয়া হয়েছে মিউ-মেসন (μ-মেসন) এবং নতুন আবিষ্কৃত ভারী মেসনের নামকরণ হলো পাই-মেসন (π-মেসন)।

পাই-মেসন প্রথমে মিউ-মেসনে এবং সর্বশেষে ইলেকট্রনে পরিণত হয়। এ-সম্বন্ধে আরো গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পাই-মেসন কেন্দ্রকের সঙ্গে অতি সুচারুরূপে মিথস্ক্রিয়া সম্পন্ন করে, ঠিক যেমনটি বলেছিলেন ইউকাওয়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রনকে বেঁধে রাখে পাই-মেসন। এর নাম বলা যেতে পারে পাই-অন (Pion)।

মেসন প্রস্তুতিকরণের কোন পদ্ধতি না জানার জন্যে আদিতে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে অবস্থিত মেসন কণিকা নিয়েই প্রাথমিক পর্যায়ের গবেষণা চালাতে হয়েছে। পরে অ্যাকসিলারেটর যন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে মেসন কণিকা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। যদি অতি উচ্চ শক্তির প্রোটন কণিকা-প্রবাহ একটি হাল্কা মৌলে আঘাত হানে, তবে অফুরন্ত ধারায় মেসন নির্গত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান কালে যে "কলোসাল অ্যাকসিলারেটর" তৈরী করা হয়েছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য মেসন এবং অন্যান্য কণিকা উৎপাদন করা। আজকাল π এবং μ-মেসন কণিকার তরঙ্গ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে তাদের নানা ধর্ম সম্বন্ধে অনেক নতুন তত্ত্ব জানা যাচ্ছে।

এ-পর্যন্ত আমরা জানি যে, তিন ধরণের পাই-

অন কণিকা আছে—ধনাত্মক বা পজিটিভ, ঋণাত্মক বা নেগেটিভ এবং নিউট্র্যাল বা নিস্তড়িৎ।

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক পাই-অনের ভর ২৭৩.৩ ইলেকট্রন মাস, নিস্তড়িৎ পাই-অনের ভর ২৬৪'৩ ইলেকট্রন মাস্। অপরাপর মৌল কণিকার মত পাই-অন কণিকার কোন সহজাত (intrinsic) কৌণিক ভরবেগ নেই। সমস্ত পাই-মেসন কণা স্বল্পস্থায়ী।

তড়িতসম্পন্ন পাই-অন কণিকার গড়-আয়ু ২.৫৬ × ১০$^{-৮}$ সেকেণ্ড, তড়িৎশূন্য পাই-অনের জীবনকাল আরো হ্রস্ব ৩ × ১০$^{-১৬}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত। এদের জীবনকাল যখন শেষ হয়, তখন তড়িতাবিষ্ট পাই-মেসন অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে মিউ-মেসন ও নিউট্রিনোতে পরিণত হয়। তড়িৎশূন্য পাই-মেসন সহজেই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং এ থেকে গামা রশ্মির দুটি তরঙ্গ উদ্ভূত হয়।

মিউ-মেসন বা মিউ-অন কণিকাকে আবার পজিটিভ এবং নেগেটিভ—এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এদের উভয়ের ভর সমান—তা হলো ২০৬.৮ ইলেকট্রন মাস্। তাদের গড়-আয়ু (mean life) ২.২২ × ১০$^{-৬}$ সেকেণ্ড। নেগেটিভ মিউ-মেসন ভেঙে একটি ইলেকট্রন ও দুটি নিউট্রিনো তৈরী করে, আবার পজিটিভ মিউ-মেসন থেকে একটি পজিট্রন ও দুটি নিউট্রিনোর সৃষ্টি হয়।

কৌণিক ভরবেগের সমতা রক্ষার জন্যে প্রতিটি মিউ-মেসনের অবক্ষয়ের শেষে দুটি নিউট্রিনো বিনির্গত হওয়া প্রয়োজন বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

আগন্তুক বস্তুকণা

পাই বা মিউ-মেসন ছাড়া আরো কয়েক জাতের মেসন কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। মেসন ছাড়াও আর এক ধরণের কণিকা পাওয়া গেছে, যাদের বলা হয় হাইপারন। এদের সকলের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায় নি বলেই অনেকে এদের বলেন আগন্তুক কণা, আবার কেউ বলেন অস্বাভাবিক কণা।

পাই-মেসন কণিকা বের হবার পর অনেকে ধারণা করেছিলেন যে, মৌল কণিকার তালিকা বোধ হয় সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু এটি বের হবার কিছুদিনের মধ্যেই আরো ভারী ধরণের মেসন কণিকার অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল। আরো পরে নিউক্লিয়নের (প্রোটন, নিউট্রন) চেয়েও ভারী কণিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের বলা হয় হাইপারন।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে একদল নতুন আগন্তুক কণার কথা জানতে পারা গেল। প্রতিটি জাতের কণিকা পাওয়া গেছে মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে। আগে বেলুনের সাহায্যে, বর্তমানে রকেট ও মহাজাগতিক যানের মধ্যে ছবি তোলবার 'ইমালসন' প্লেটে লেপে পাঠানো হয়ে থাকে উচু বায়ুস্তরে। আগন্তুক মৌল কণাগুলির ভর, আধান, গড়-আয়ু, অবক্ষয়ের পদ্ধতি ইত্যাদি জানবার জন্যে অনেক প্লেট নষ্ট করতে হয়; কারণ এসব কণিকা মোটেই সহজলভ্য নয়। এই পদ্ধতিতে সব সময় যে তাদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানা যায়, তাও নয়। পরে অ্যাকসিলারেটর যন্ত্রের সাহায্যে এদের প্রস্তুত করে অনেকটা নির্ভুল তথ্য বের করা সম্ভব হয়েছে।

বুদ্বুদ-প্রকোষ্ঠ (Bubble chamber) তৈরী হবার পরে এসব নতুন নতুন মৌল কণা সম্বন্ধে গবেষণা করবার পথ অনেক সহজ হয়ে গেছে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে, মিউ-অন এবং পাই-অন ছাড়া আরও এক গোষ্ঠীর মেসন কণিকা আছে। পাই-অন ও প্রোটন অথবা নিউক্লিয়নদের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত হয় এই তৃতীয় গোষ্ঠীর মেসন কণিকা, যার নাম দেওয়া হয়েছে কে-মেসন বা কে-অন (Kayon)।

কে-মেসন তিন শ্রেণীর—ধনাত্মক, ঋণাত্মক তড়িৎ-বিশিষ্ট এবং নিস্তড়িৎ। তড়িৎযুক্ত কে-অনের

ভর ৯৬৬·৮ ইলেকট্রন মাস্ এবং তাদের গড় আয়ু ১·২২ × $১০^{-৮}$ সেকেণ্ড। এরা অবক্ষয়ের পর মিউ-অন ও নিউট্রিনোতে অথবা তড়িৎ-যুক্ত বা তড়িৎ-শূন্য পাই-অন কণিকাতে পরিণত হয়।

নিস্তড়িৎ কে-মেসনের ভর ৯৭৪ ইলেকট্রন মাস্ এবং এদের গড়-আয়ু ০·৯৫ × $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড। অবক্ষয়ের ফলে এরা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক অথবা দুটি নিস্তড়িৎ পাই-অন সৃষ্টি করে। সম্প্রতি আর এক ধরণের নিস্তড়িৎ মেসন আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে "ওমেগা কণিকা"। এর ভর ১৫৪০ ইলেকট্রন মাস্। তাছাড়া এদের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত স্বল্প। অবক্ষয়ের ফলে এরা তিনটি পাই-অন সৃষ্টি করে।

হাইপারনকে সাধারণতঃ গ্রীক বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তিন ধরণের হাইপারন এ-পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

(১) $\overset{\circ}{\Lambda}$ (ল্যাম্‌ডা)-হাইপারন। এটি নিস্তড়িৎ। এর ভর ২১৮২ ইলেকট্রন মাস্। গড়-আয়ু ২·৭৭ × $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড। ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নিউ-ক্লিয়ন এবং পাই-অনের জন্ম দেয়।

স্পিন—½, ষ্ট্রেঞ্জনেস → ± ১

(২) Σ (সিগ্‌মা)-হাইপারন। তিন শ্রেণীর—পজিটিভ (Σ^{+}), নেগেটিভ (Σ^{-}), নিউট্র্যাল (Σ°)। ভর যথাক্রমে ২৩২৭·৯, ২৩৪১·৬, ২৩২৯·৫ ইলেকট্রন মাস্। প্রত্যেকটির স্পিন ½, ষ্ট্রেঞ্জনেস → ± ১।

গড়-আয়ু—পজিটিভ : ·৭৮ × $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড
নেগেটিভ : ১·৫৪ × $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড
নিউট্র্যাল : $১০^{-১১}$ সেকেণ্ডের কম।

তড়িতাবিষ্ট হাইপারন থেকে সৃষ্টি হয় নিউ-ক্লিয়ন এবং পাই-অন; নিস্তড়িৎ হাইপারন অবক্ষয়ের ফলে Λ-হাইপারন ও গামা-রশ্মি সৃষ্টি করে।

(৩) Ξ (জাই, Xı)-হাইপারন। দুই শ্রেণীর—নেগেটিভ ও নিউট্র্যাল।

নিগেটিভ Ξ^{-} হাইপারনের ভর ২৫৮৫ ইলেকট্রন মাস্, আয়ুষ্কাল $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড।

নিউট্র্যাল Ξ° হাইপারনের ভর ২৫৬৬ ইলেকট্রন মাস্, আয়ুষ্কাল ১·৬ × $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড।

এরা উভয়েই শেষ পর্যন্ত Λ-হাইপারন এবং পাই-অন সৃষ্টি করে।

ডিরাক ধনতড়িৎ-বিশিষ্ট ইলেকট্রনের অস্তিত্বের কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব কেবলমাত্র ইলেকট্রনের বেলাতেই খাটে না, যে কোন মৌল কণিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। ডিরাকের তত্ত্বের সাহায্যে বিপরীত-ধর্মী বস্তুকণার অবস্থিতি তো জানা গেছেই, তাছাড়া তাদের ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক বিবরণ পাওয়া গেছে।

ডিরাক কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এবং আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাহায্যে কোন মুক্ত কণিকার গতির সমীকরণের সমাধান করতে গিয়ে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেন যে, একই জিনিষের দুটি অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। মোট কথা হচ্ছে, প্রতিটি কণিকার একটি বিপরীত অবস্থা বর্তমান, যাকে বলা হয় বিপরীত বস্তুকণা। দুটি কণার ভর এবং অন্যান্য ধর্ম সমান, কিন্তু উভয়ের আধান বিপরীত ধর্মীয়; অর্থাৎ পজিটিভ কণিকার নেগেটিভ বিপরীত বস্তুকণা থাকে। কেন্দ্রকসমূহের সংঘর্ষের সময়ে কণিকার সঙ্গেই তার বিপরীত-ধর্মী কণা সৃষ্ট হয়। ডিরাকের তত্ত্ব অনুসারে প্রোটনের একটা পাল্টা কণিকা থাকা উচিত। তাকে বের করবার জন্যে জোর চেষ্টা চলছিল। বিগত ১৯৫৫ সালে শক্তিশালী অ্যাকসিলারেটর যন্ত্রের সহায়তায় ঋণতড়িৎ-বিশিষ্ট প্রোটন কণিকা সৃষ্টি করা হয়েছে। একে বলা হয় অ্যান্টি-প্রোটন। এর আবিষ্কারের ফলে বিপরীত বস্তুকণা সম্বন্ধে পূর্বের ধারণা দৃঢ় হয় এবং অনুমান করা যাচ্ছে যে, পরমাণুর মধ্যে যেহেতু অ্যান্টি-প্রোটন আছে, সেহেতু পরমাণুকে ঘিরে অবশ্যই ধনাত্মক ইলেকট্রনও থাকবে।

একদা মনে করা হতো যে, বিশ্বের সমগ্র বস্তুর

সৃষ্টি হয়েছে মাত্র তিনটি মৌল কণিকা থেকে। সে ধারণা আজ অবসিত। বর্তমান কাল পর্যন্ত পঁচিশের বেশী মৌল কণিকার সন্ধান পাওয়া গেছে এবং বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আরো অনেক কণিকার কথা পরে জানা যেতে পারে।

যে কয়টি মৌলিক কণিকার বিষয় নিয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হলো, তাদের মধ্যে সিগ্‌মা এবং জাই-হাইপারনসমূহের বিপরীত কণাগুলিকে এখনো আবিষ্কার করা যায় নি, তবে তারা যে আছে, একথা বিজ্ঞানীরা বলেন।

আলোচিত কণিকাগুলির প্রত্যেকটির এত বিভিন্ন শ্রেণী থাকে যে, অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগে—তাহলে মৌলিক কণিকা বলতে আমরা কি বুঝি? আদিতে 'মৌলিক পদার্থ' বলতে বুঝাতো আগুন, মাটি, বাতাস এবং জল। পরবর্তীকালে এই ধারণা হয় যে, প্রতিটি রাসায়নিক মৌলের পরমাণু একটি মৌলিক কণিকা। আরো পরে 'মৌলিক কণা' শব্দটি প্রযোজ্য হতো কেবলমাত্র প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে। বর্তমানে মৌলিক কণিকার সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ত্রিশে পৌঁচেছে এবং আরো বাড়বে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন জাগা অস্বাভাবিক নয় যে, সত্যই কি পদার্থের এত বেশী এককের কোন প্রয়োজন আছে, না ক্রমান্বয়ে মৌলিক কণার সংখ্যা বৃদ্ধি পদার্থের চরম কণা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতারই পরিচয় দিচ্ছে?

লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মাত্র চার ধরণের কণিকা স্থায়ী—ফোটন, নিউট্রিনো, ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়ন। তাহলে কি এ-কথাই বুঝতে হবে যে, অন্যান্য মৌলিক কণিকাগুলি এদের পারম্পরিক সংযোজনেই সৃষ্টি হয়েছে? আবার লক্ষ্য করা গেছে যে, অস্থায়ী কণাগুলির মধ্যেও কিছু সংখ্যক অন্যের চেয়ে বেশী স্থায়ী। এসব দেখে শুনে এই কথাই মনে হয় যে, সব কণিকাই মৌলিক, কিন্তু এদের মধ্যে কতকগুলি আবার বেশীমাত্রায় মৌলিক। ব্যাপারটি হাস্যকর সন্দেহ নেই। তাই বিজ্ঞানীদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এক নতুন সমস্যা। সমগ্র বিষয়টিকেই আবার নতুন করে ভাবতে হবে।

আজ পর্যন্ত পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার গবেষণায় যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে, তা মেনে নিলেও মৌলিক কণা নিয়ে যে ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে, তার এখনও সমাধান হয় নি।

রঞ্জক দ্রব্য

মোহঃ আবু বাক্‌কার

রঞ্জক দ্রব্য বলতে এমন সব জিনিস বুঝায়, যেগুলিকে তেল বা অন্য কোন পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে বিভিন্ন বস্তুর উপর আস্তরণের মত রং লাগানো যায়। রঞ্জক দ্রব্যসমূহকে বস্তুর বহিরাবরক বলা যেতে পারে। এগুলি খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণিকার সমন্বয়ে গঠিত এবং জলে অদ্রবণীয়। এরা জ্যোতিষ্মান বস্তু নয়। আপতিত সাদা আলো থেকে বিশেষ বর্ণের আলো শোষণ করে এরা নিজের বর্ণ পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন রঞ্জক দ্রব্যে রঞ্জিত বস্তুকে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হতে দেখা গেলেও বর্ণ তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়। যখনই সাদা আলোক-রশ্মি কোন বস্তুর উপর পতিত হয়, পদার্থ তখনই নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী সাদা আলোর কোন কোন বর্ণ শোষণ করে এবং শোসণের পর যে বর্ণের আলো অবশিষ্ট থাকে, তা বস্তুর উপরিতল থেকে চতুর্দিকে বিকিরিত বা ইতস্ততঃ প্রতিফলিত হয়। এই প্রকার প্রতিফলিত বা বিকিরিত আলোক-

রশ্মির দ্বারাই বস্তুটি দেখা যায়। বস্তুর বর্ণবৈচিত্র্য ঘটে থাকে আপতিত আলোর বর্ণ এবং তার বিশিষ্ট শোষণ অথবা বিশিষ্ট প্রতিফলনের দ্বারা।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যে বর্ণের আলো প্রতিফলিত বা বিকিরিত হয়, বস্তুর বর্ণও সেই রকম দেখায়। যে বস্তু সব রকম বর্ণের রশ্মি সমপরিমাণে বিকিরণ করে, তা সাদা আলোতে সাদা দেখায়। আর যে বস্তু সব রকম বর্ণের আলোই শোষণ করে, তার বর্ণ হয় কালো। একটা বস্তুকে লাল দেখাবার মানেই হলো, বস্তুটি লাল বর্ণের রশ্মি ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের রশ্মি শোষণ করে নিয়েছে এবং লাল রশ্মিটাই প্রতিফলিত করছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাদা আলো বা আলোক-রশ্মি হচ্ছে সাতটি রঙের সংমিশ্রণ। এই সাতটি রঙ হচ্ছে—(১) বেগুনী, (২) নীল, (৩) আসমানী বা ঘন নীল, (৪) সবুজ, (৫) হল্‌দে, (৬) কমলা ও (৭) লাল। আকাশে রামধনুতে এই সাতটি রং দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ সাদা আলোক-রশ্মি বা সূর্যালোককে কোন প্রিজ্‌ম্‌ বা ডিফ্র্যাক্‌শন গ্রেটিং-এর ভিতর দিয়ে যেতে দিলে এই সাতটি রঙের বর্ণচ্ছটা পাওয়া যায়। এরূপ আলোর বর্ণবিন্যাসকে বর্ণালী বলা হয়।

আগে বলা হয়েছে যে, আপতিত আলোক-রশ্মির বিশেষ বিশেষ বর্ণের শোষণের ফলেই বর্ণের বৈচিত্র্য দেখা যায়। নীচের তালিকা থেকে দেখা যাবে—একটা বস্তু কোন্‌ রং শুষে নিলে কোন্‌ রঙের দেখাবে। সাদা থেকে যে বর্ণের আলো শোষিত হলো এবং তার ফলে যে বর্ণের আলো দৃষ্ট হলো, তারা পরস্পরের পরিপূরক। এরূপ দুই বর্ণের আলোর একত্রীকরণে আবার সাদা আলো পাওয়া যাবে। যে দুই বর্ণ একত্রে মিলে সাদা আলোর অনুভূতি সৃষ্টি করে, তাদের পরিপূরক বর্ণ বলে।

পরিপূরক বর্ণের তালিকা

		কোন্‌ রং শুষে নিলে —	কোন্‌ রঙের দেখাবে ;
অর্থাৎ একটা বস্তু	(১)	বেগুনী রং শুষে নিলে	সবুজাভ হল্‌দে রঙের দেখাবে
	(২)	নীল ,,	হল্‌দে ,,
	(৩)	আসমানী বা ঘন নীল	কমলা ,,
	(৪)	সবুজ রং শুষে নিলে	নীলাভ লোহিত বা রক্তনীল ,,
	(৫)	হল্‌দে ,,	নীল রঙের দেখাবে
	(৬)	কমলা ,,	সবুজাভ নীল বা আসমানী ,,
	(৭)	লাল ,,	লোহিত সবুজ রং দেখাবে

উপরিউক্ত তালিকায় ক্রমিকভাবে অন্তর্ভুক্ত বর্ণ দুটি পরস্পরের পরিপূরক।

এবারে বিভিন্ন রঞ্জক দ্রব্যের কথায় আসা যাক।

সাদা রঞ্জক দ্রব্য—এই রঞ্জক দ্রব্যগুলি সাধারণ সূর্যালোকে অস্বচ্ছ, কিন্তু দ্রব্যগুলির অভ্যন্তরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকার আলোক প্রতিসরণ করবার ক্ষমতা থাকায় উপরিতল থেকে অধিকাংশ আলো প্রতিসরিত হয় এবং কিছুটা অংশ বর্ণালীর তেমন কোন পরিবর্তন না করে উদ্ভাসিত অংশের দিকে ফিরিয়ে দেয়। সচরাচর সাদা রঙের রঞ্জক দ্রব্যের মধ্যে টাইটেনিয়াম ধাতুসমন্বিত আকরিক থেকে উদ্ভূত টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (TiO_2), বাতাসে সীসক ধাতুর ক্ষয়প্রাপ্তির ফলে উৎপন্ন লেড মনোক্সাইড (PbO) বা শ্বেতসীসক (সফেদা), দস্তাধাতুর দহনজাত জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO_2) উল্লেখযোগ্য। এগুলি ছাড়া লিথোকোন (জিঙ্ক

সালফাইড ও বেরিয়াম সালফেটের সংমিশ্রণে তৈরী) কদাচিৎ বিশুদ্ধ জিঙ্ক সালফাইড এবং অ্যান্টিমনি ডাইঅক্সাইডও (SbO_2) ব্যবহৃত হয়

স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্য—স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্যগুলির স্থায়িত্ব, কাঠিন্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য এবং এরা ধারালো বস্তুর রোধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলির বেশীর ভাগই অন্যান্য রঞ্জকদ্রব্যের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সে জন্যে এগুলিকে রঞ্জক-বর্ধক বলা হয়। অধিকাংশ স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্যই প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ। সচরাচর ব্যবহৃত স্বচ্ছ রঞ্জক দ্রব্যের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$), ম্যাগ্‌নেসিয়াম সিলিকেট ($MgSiO_3$), ক্লে, ব্যারাইটস্‌ ($BaSO_4$) উল্লেখযোগ্য।

রঙীন রঞ্জক দ্রব্য—প্রাথমিক রং হচ্ছে তিনটি, যথা—(১) লাল, (২) আসমানী ও (৩) নীল। এই তিনটি রং উপযুক্ত অনুপাতে মিশিয়ে অন্যান্য রং পাওয়া যায়।

লাল রঞ্জক দ্রব্য—লাল রঞ্জক দ্রব্যের মধ্যে মিনিয়াম বা রেড লেড ও ফেরিক অক্সাইডের নাম করা যেতে পারে। মিনিয়াম বা রেড লেড আলো সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করতে পারে এবং নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত ইস্পাতের প্রাথমিক প্রলেপ হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ এই দ্রব্যটির লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষয় প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। মিনিয়াম বা রেড লেড কখনো কখনো রাবার প্রস্তুতিতেও ব্যবহৃত হয়। ধাতব সীসককে বাতাসের সান্নিধ্যে জারিত করে প্রথমে লিথার্জে পরিণত করা হয়। পরে এই লিথার্জকে পুনরায় প্রায় ৩১১° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জারিত করে রেড লেডে পরিণত করা হয়। আর ফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) আয়রন সালফেটকে উত্তপ্ত করে তৈরি করা হয়। আবার লাল রঞ্জক দ্রব্যেরও নানারকম ভাগ আছে যথা—; ভেনিশিয়ান রেড, ইণ্ডিয়ান রেড, ক্যাড্‌মিয়াম রেড ইত্যাদি। ভেনিশিয়ান রেড রঞ্জকটি, ফেরিক-অক্সাইডের সঙ্গে সমপরিমাণে রঞ্জক-বর্ধক ক্যালসিয়াম সালফেট মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এই রঞ্জকটি অত্যন্ত স্থায়ী এবং নিষ্ক্রিয় (বিশেসতঃ কাঠের উপর প্রলেপ দেবার ক্ষেত্রে)। ইণ্ডিয়ান রেড নামে পরিচিত রঞ্জকটি প্রাকৃতিক খনিজ পদার্থ, যার ভিতরে থাকে শতকরা ৮০-৯৫ ভাগ ফেরিক অক্সাইড এবং অবশিষ্ট ক্লে ও সিলিকা। ক্যাড্‌মিয়াম রেড রঞ্জকটি ক্যাডমিয়াম সালফেট, সোডিয়াম সালফেট এবং সোডিয়াম সেলেনাইড একত্রে দহন করে পাওয়া যায়।

হলুদ রঞ্জক দ্রব্য—ক্রোমিয়াম যৌগের একটা বৃহৎ অংশ খনিজ পিগ্‌মেন্ট (রঞ্জক দ্রব্য) হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলির একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে, কেন না এগুলির যথেষ্ট হরিদ্রাভ সৌন্দর্য, আলোর প্রতি তীব্রতা, বাতাসে স্থায়িত্ব শক্তি এবং প্রলেপ নেবার শক্তি আছে। ক্রোমিয়াম ধাতু থেকে উদ্ভূত হলুদ রঞ্জক দ্রব্যকে সাধারণতঃ ক্রোমইয়োলো বলা হয়। ক্রোমইয়োলো বা ক্রোম রং ঘরবাড়ী রং করা, শিল্প, রঙীন ছাপার কাজ, অয়েল ক্লথ ও লিনোলিয়াম প্রস্তুতিতে এবং পোর্সেলিনের উপর গ্লেজ দিবার জন্যে ব্যবহৃত হয়। এগুলি সোডিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণের সঙ্গে লেড নাইট্রেট কিংবা অ্যাসিটেট দ্রবণ মিশ্রিত করে প্রস্তুত হয়। বর্ধক হিসাবে সমওজনে জিপসাম, ক্লে অথবা ব্যারাইট্‌সও থাকে। ক্রোম ইয়োলোর পর জিঙ্ক ইয়োলো অথবা জিঙ্ক ক্রোমেট ও লিথার্জের নাম উল্লিখিত হতে পারে।

নীল রঞ্জক দ্রব্য—আজকাল ব্লু পিগ্‌মেন্ট হিসাবে আলট্রামেরিন ব্লু-ই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। পূর্বকালে শিল্পীরাই এটাকে বিচূর্ণ ল্যাপিসল্যাজুলি হিসাবে ব্যবহার করতো—কেন না, তখন এটি ছিল অত্যন্ত দামী খনিজ পদার্থ। আলট্রামেরিন হচ্ছে সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট ও সালফাইডের এক জটিল যৌগ। এটা তৈরী হয় সোডিয়াম কার্বনেট, কেওলিন, চারকোল, কোয়ার্জ, গন্ধক,

সোডিয়াম সালফেট ও রেজিন একত্রে উত্তপ্ত করে। এই গলিত বস্তুকে ঠাণ্ডা করে বিচূর্ণিত করা হয় এবং বিচূর্ণিত বস্তুকে জলে ধুইয়ে নিয়ে আরো কিছুটা গন্ধক মিশিয়ে প্রায় ৫০০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়, যতক্ষণ না ব্লু রং পাওয়া যায়। দামী আলট্রামেরিন ব্লু তৈরি করতে হলে প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত কাঁচামালে বিন্দুমাত্রও লৌহ না থাকা বাঞ্ছনীয়; কেন না—লৌহ, প্রাপ্ত নীল রংকে মন্দীভূত করে দেয়। এভাবে সোডিয়াম কার্বনেটের বদলে সোডিয়াম সালফেটকে অবশিষ্ট বস্তুগুলির সঙ্গে উত্তপ্ত করে ঘন নীল রং তৈরি করা হয়। সাধারণ জলে ধৌত লিনেন ও কার্পাসের তৈরী জামা-কাপড়ের লাল্চে রং দূর করবার জন্যেই আলট্রামেরিন ব্লু বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ জলে ফেরাস কার্বনেট থাকে, যার জন্যে ধৌত কাপড়গুলির উপর একটা লাল্চে রং থেকে যায়। এ ছাড়া কাগজ ও অন্যান্য বস্ত্র সাদা করতেও এটা ব্যবহৃত হয়। আলট্রামেরিন ব্লু-র পর কোবাণ্ট ব্লু উল্লেখযোগ্য। তবে সাধারণ উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহৃত হয় না। ছাপার কালিতে যে ব্লু রং ব্যবহৃত হয়, তা হচ্ছে কপার থ্যালোসাইনামিন। এ ছাড়া আছে প্রুসিয়ান ব্লু, টার্ণবুলস্ ব্লু, চাইনীজ ব্লু, মিলোরি ব্লু, ব্রোঞ্জ ব্লু প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের নীল রং। এগুলি সাধারণতঃ সোডিয়াম ফেরোসায়ানাইডের সঙ্গে সোডিয়াম সালফেট দ্রবণের বিক্রিয়াজাত পদার্থের বিভিন্ন রকম Reagent, যথা—পটাসিয়াম ক্লোরেট, ব্লিচিং পাউডার, পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ইত্যাদির সাহায্যে জারণের ফলে তৈরী হয়। অদ্রবণীয় প্রুসিয়ান ব্লু, পটাসিয়াম ফেরোসায়ানাইডের দ্রবণের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে ফেরিক লবণ মিশ্রিত করে পাওয়া যায়। এই ঘন নীল রঞ্জকটির তামার ন্যায় ঔজ্জ্বল্য আছে।

সবুজ রঞ্জক দ্রব্য—সবচেয়ে পুরাতন সবুজ রঞ্জক দ্রব্য বলতে ক্রোমিয়াম অক্সাইড (Cr_2O_3)-কে বুঝায়। এই রঞ্জকটি পরাবর্ত চুল্লীতে গন্ধকের সঙ্গে ক্রোমেট কিংবা ডাইক্রোমেট উত্তপ্ত করে তৈরি করা হয়।

$$Na_2Cr_2O_7 + S \longrightarrow Cr_2O_3 + Na_2SO_4$$

(সোডিয়াম ডাইক্রোমেট) + সালফার বা গন্ধক → সবুজ রঞ্জক + সোডিয়াম সালফেট, যা পরিত্যক্ত হয়
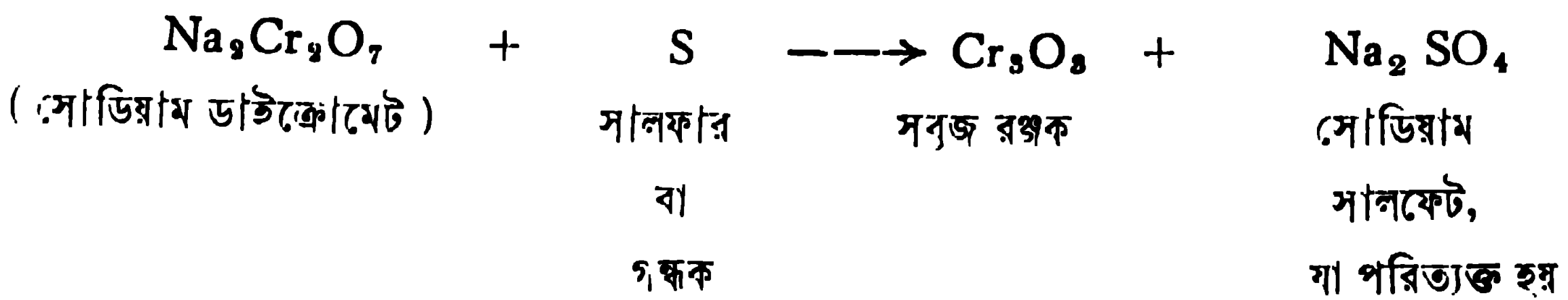
ক্রোমিয়াম অক্সাইডের পর সিক্ত ক্রোমিয়াম অক্সাইডের নাম করা যেতে পারে। এই রঞ্জক দ্রব্যটিকে Guignet's green বা Emerald green ও বলা হয়। এটা পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট ও বোরিক অ্যাসিড একত্রে কয়েক ঘণ্টা ধরে লোহিত-তপ্ত করলে পাওয়া যায়। ক্রোমগ্রীন নামের রঞ্জকটি বিভিন্ন নামে বিক্রীত হয় এবং এটা দুটি রঞ্জকের সংমিশ্রণে তৈরী—একটি হচ্ছে ক্রোমইয়েলো এবং অন্যটি হচ্ছে প্রুসিয়ান ব্লু।

বাদামী রঞ্জক দ্রব্য—প্রাকৃতিক কাদাকে (বিশেষতঃ লৌহসংযুক্ত) সাবধানে নিয়মিত উত্তপ্ত করলে বাদামী রঞ্জক দ্রব্য পাওয়া যায়। এটা Burnt Sienna, Burnt umber এবং Burnt ocher নামে পরিচিত। আম্বার পিগ্মেণ্টগুলিতে বাদামী ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড তথা আয়রন অক্সাইড থাকে। বাদামী রঞ্জক দ্রব্যগুলি বেশী স্থায়ী এবং কাঠ ও লোহার উপর প্রলেপ দেবার কাজে বেশী ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ভ্যানডাইক বাদামী রঞ্জক হচ্ছে অনির্দিষ্ট উপাদানের Native earth, যাতে লৌহের অক্সাইড ও জৈব পদার্থ থাকে।

কালো রঞ্জক দ্রব্য—কালো রঞ্জক হিসাবে কার্বন ব্ল্যাক, গ্র্যাফাইট, ল্যাম্প ব্ল্যাক, থার্ম্যাল ব্ল্যাক

প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। তবে কার্বন ব্ল্যাক ও গ্র্যাফাইট রঞ্জকদ্বয় লৌহ ও ইস্পাতের প্রাথমিক প্রলেপ হিসাবে ব্যবহৃত হয় না—কেন না, এগুলির দ্বারা বস্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের তাপীয় বিয়োজনের ফলে উৎপন্ন থার্ম্যাল ব্ল্যাক রাবার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

এখন রঞ্জক দ্রব্য দিয়ে কোন বস্তুকে (ধরা যাক, একখানা ফ্যাব্রিককে) কি ভাবে রঙীন করা হয়, তাই আলোচনা করছি।

একখানা ফ্যাব্রিককে একটা বিশেষ রঙে রঙীন করবার জন্যে প্রথমেই দেখে নেওয়া হয়, রংটা অ্যাসিড-ধর্মী, না ক্ষার-ধর্মী। যদি অ্যাসিড-ধর্মী হয়, তাহলে ফ্যাব্রিককে একটা মৃদু ক্ষারবিশিষ্ট লবণের দ্রবণে (যেমন—অ্যালুমিনিয়াম অ্যাসিটেট, ফেরিক অ্যালাম) ডুবিয়ে নেওয়া হয়। এর পর সিক্ত কাপড়খানাকে জলীয় বাষ্পে রাখা হয়। আবার কখনো কখনো কোন মৃদু ক্ষারীয় দ্রবণের সঙ্গে (যেমন—অ্যামোনিয়া, সোডিয়াম কার্বনেট) বিক্রিয়া করানো হয়। এভাবে ধাতব হাইড্রক্সাইড ফ্যাব্রিকের তন্তুতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থায় জমা হয়। এরূপে ফ্যাব্রিকখানা রাগবন্ধিত (Mordanted) হয়ে যাবার পর ফ্যাব্রিকখানাকে রঞ্জক পদার্থের দ্রবণে ডুবানো হয়। এর ফলে রঞ্জকটি রাগবন্ধকের (Mordant) সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে রং সৃষ্টি করে।

রঞ্জকটি ক্ষার-ধর্মী হলে অ্যাসিড-ধর্মী রাগবন্ধক, যথা—ট্যানিন, ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ পদ্ধতি টার্টার এমেটিক দ্রবণ নিয়ে অনুসৃত হয়। কখনো কখনো পিঙ্ক সল্টও (অ্যামোনিয়াম ক্লোরোস্ট্যানেট) রাগবন্ধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই লবণের দ্রবণে ফ্যাব্রিকখানাকে সিক্ত করে জলীয় বাষ্পে রাখা হয়, যার ফলে স্ট্যানিক অ্যাসিড ফ্যাব্রিকের তন্তুতে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত স্ট্যানিক অ্যাসিডই ক্ষার-ধর্মী রঞ্জকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রং সৃষ্টি করে

আমাদের পরিচিত খাকী রং তৈরী হয়, যখন কোন টেক্সটাইলকে ফেরিক ও ক্রোমিক লবণের দ্রবণে সিক্ত করে কোন মৃদু ক্ষারে ধৌত করা হয়।

আবার ক্যালিকো প্রিন্টিং-এ রঞ্জক দ্রব্যের দ্রবণটি একটা সুবিধাজনক রাগবন্ধক ও Thickening বস্তুর (স্টার্চ অথবা গাম) সঙ্গে মেশানো হয় এবং প্রয়োজনীয় ডিজাইন ফ্যাব্রিকে ছাপানো যায়। Thickening বস্তুগুলি রাগবন্ধককে ফ্যাব্রিকের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেয় না। এবার ফ্যাব্রিক-খানাকে সুবিধাজনক উষ্ণতায় জলীয় বাষ্পের সান্নিধ্যে রাখা হয়। এর ফলে ধাতব হাইড্রক্সাইড উদ্ভূত হয় এবং তন্তুর অভ্যন্তরে রংগুলিকে সুদৃঢ় করে দেয়।

জননেন্দ্রিয়ে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দিনগুলিতে পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। মানুষের হিংস্রতা ভীষণ রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তারই অন্যতম প্রকাশ হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণ। যে সকল জাপরমণী সন্তানসম্ভবা ছিলেন, তাঁরা কি ভাবতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হবার পরে নিদারুণ রোগ সঙ্গে নিয়ে আসবে? নবজাত সন্তানদের কেউ হলো ওজনে অত্যন্ত হাল্‌কা, কেউ বা বেঁটে, কারো মাথা খুব ছোট, অর্থাৎ তার মস্তিষ্ক পুরাপুরিভাবে বিকশিত হয় নি। কারো সন্তানের চোখ থাকতেও দৃষ্টি অস্বচ্ছ, কেউ বা পাঁচ বছর বয়সেও কথা বলতে পারে না, আবার কেউ বা বোবা, হাবা। পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরে এমনি ভাবে প্রথম

সূর্যের মুখ দেখেছিল হিরোসিমা-নাগাসাকির ভবিষ্যৎ জাপ নাগরিকের অধিকাংশ।

এর পর থেকেই চলছে নানা গবেষণা। মানুষের জননেন্দ্রিয়, গর্ভবতী মহিলা এবং নবজাত শিশুর উপর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে সর্বত্র। বিজ্ঞানীরা বলেন—এমন কি, স্বল্পমাত্রার তেজস্ক্রিয় রশ্মিও যদি বেশ কিছুক্ষণ ধরে মানুষের দেহে প্রবেশ করে, তাহলে তাদের সন্তানও স্বাভাবিক হয় না। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কয়েকজন বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাত্র ৫০ রোয়েন্টগেন মাত্রার তেজস্ক্রিয় রশ্মি যদি স্ত্রী-ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করানো যায়, তাহলে তার ঋতুচক্রে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাই নয়, ১৫ থেকে ২৫ রোয়েন্টগেন মাত্রার রশ্মি যদি দেহের মধ্যে যায়, তাহলে তাদের প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায়। এমন কি, তেজস্ক্রিয় রশ্মির দ্বারা আবিষ্ট জীবজন্তুর নবজাত বাচ্চাদেরও প্রজনন-ক্ষমতা একেবারে কমে গিয়ে বন্ধ্যা করে তোলে। এর ফলে সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, জননেন্দ্রিয়ের উপর যে আঘাত আসে, তা চিরস্থায়ী এবং বংশানুক্রমিক ধারায় চলতে থাকে।

ভ্রূণের গায়ে যদি ১০০-২০০ রোয়েন্টগেন তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবেশ করে, তাহলে তার দেহে নানা ধরণের বিকৃতি ঘটে। ভ্রূণের বয়স একমাস হলে ঐ পরিমাণ রশ্মির স্পর্শে মুহূর্তেই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। গর্ভস্থ ভ্রূণের হাত-পা, মাংসপেশী সৃষ্ট হবার পরে যদি গর্ভবতী রমণী তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা আবিষ্ট হন, তাহলে সেই শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে। ভ্রূণের কেন্দ্রীয় স্নায়ু-সংস্থা সৃষ্ট হবার সময়ে তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রবিষ্ট হলে সমগ্র স্নায়ু-সংস্থা বিকৃত হয়ে যায়। হিরোসিমাতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরে নবজাত শিশুদের অবস্থা যে ভয়াবহ হয়েছিল, তার উল্লেখ প্রথমেই করা হয়েছে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে জননেন্দ্রিয় কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা জানবার আগে আমাদের জীবতত্ত্ব এবং বংশানুক্রম সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করা প্রয়োজন।

সবাই বোধ হয় জানেন যে, মানুষ জন্মগ্রহণ করে একটি নিষিক্ত বীজ বা ডিম্বাণু থেকে। স্ত্রী-বীজ এবং শুক্রকীটের কেন্দ্রকের চেহারা অন্যান্য কোষ থেকে পৃথক। মানবদেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে ৪৮টি ক্রোমোসোম থাকে। ক্রোমোসমগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে। তাহলে সর্বসমেত ২৪টি জোড়া হলো। প্রত্যেক জোড়া পরস্পরের তুলনায় সামান্য পৃথক পর্যায়ের। ক্রোমোসোম তৈরী হয় ডেসক্সিরিবোনিউক্লিও প্রোটিন বা ডি. এন. পি. দিয়ে। মানুষের দেহে কোষের যে জটিল খেলা চলছে, তার পাণ্ডাগিরি করে এই প্রোটিন। কোষ-বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোসোম দু-ভাগে লম্বালম্বিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে সৃষ্টি হয় সম-আকৃতির দুটি ক্রোমোসোমের। এবার কোষের দুই মেরুতে এ দুটি স্থান নেয়। এমনি ভাবে চলতে থাকে বিভাজন-প্রক্রিয়া, ৪৮টি ক্রোমোসোম না হওয়া পর্যন্ত। কোষ বিভাজিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যেকার সাইটোপ্লাজম, মাইটোকণ্ড্রিয়া, মাইক্রোসোম, প্রোটোপ্লাষ্ট ইত্যাদিও দুটি বিভিন্ন কোষের মধ্যে ভাগাভাগি করে চলে যায়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই যে চুলচেরা ভাগ হবে, তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অনেক সময় দেখা যায়, একটি কোষ অপরটির তুলনায় আকারে ছোট হয়েছে। এ নিয়ে অনেক কথা বলা চলে, কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে তাহা বাহুল্য হবে মাত্র।

একথা নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে যে, প্রতিটি জীবজন্তু ডিম্বাণু থেকে জন্ম গ্রহণ করে। একটা বিষয় লক্ষ্য করবার মত—কোন সন্তান তার চেহারা বা স্বভাব পায় তার বাবার মত, কেউ বা তার মায়ের মত। আবার কেউ বা তাদের ঠাকুরদা-ঠাকুরমা বা তাদের বাবা-মার আকৃতি ও স্বভাবের খানিকটা পায়। কিন্তু কেন? ছেলে আর বাবা যেন

মটরশুঁটির দুটি অংশ। একটি অপরটির প্রতিচ্ছবি। তাই বা কেন? এই প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে গিয়ে জানা যায় যে, এর জন্যে দায়ী পিতার শুক্রকীট। শুক্রকীটের মধ্যেকার প্লাজ্‌মা পিতার আকৃতি ও স্বভাব সন্তানে এনে দেয় সত্য, কিন্তু মূল চাবিকাঠি থাকে শুক্রকীটের কেন্দ্রকের অন্যতম উপাদান ডি. এন. পি.-এর মধ্যে। এই অমিত শক্তিসম্পন্ন বস্তুটির অংশ—একটি ডেসক্সিরিবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (Desoxyribonucleic acid), অপরটি প্রোটিন। এই দুয়ে মিলে তৈরী হয়েছে ডি. এন. পি। এক কথায় বলতে গেলে আমাদের দেহের যাবতীয় পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্যে দেহের অভ্যন্তরে যে সব পন্থা নিজ থেকেই তৈরী হয় বলে আমরা মনে করি, তার মূলে আছে ঐ জটিল নামের বস্তুটি।

এই অসীম ক্ষমতাশালী বস্তুটির আকৃতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হলে ক্রোমোসোমের মধ্যেও পরিবর্তন আসে। তারই ফলে বিভাজিত কোষের মধ্যে দেখা দেয় নানা অসঙ্গতি। এই অসঙ্গতির মাত্রা যত চড়ে, নবজাত প্রাণীর সুস্থ হয়ে জন্মাবার আশা সেই অনুপাতে কমে; অর্থাৎ নবজাত প্রাণী ভালভাবে জন্মাবেই না। যদি অসঙ্গতির মাত্রা একটু জোরদার হয়, তাহলে নবজাতকের কোন অংশ হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা হয়ে যাবে। তার জন্যে নবজাতক বিকলাঙ্গ হতে পারে—এমন কি, তার মধ্যে তার নিজস্ব বংশের কোন বৈশিষ্ট্য নাও বর্তাতে পারে।

স্বাভাবিক ধারা থেকে এই বিচ্যুতিকে বলা হয় মিউটেসন বা পরিব্যক্তি। কেন্দ্রকের অসঙ্গতি থেকে সুরু হয় মিউটেসন, আর এই নতুন ধারা চলতে থাকে বংশানুক্রমে। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে অথবা যে যে কারণে মিউটেসন হয়, সেই সমস্ত কারণে ডি. এন. পি-এর চেহারায় পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় কারণগুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায় না, কিন্তু এই অজ্ঞাত কারণগুলি শেষ পর্যন্ত মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হবার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ডি. এন পি-এর গঠনগত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে নবজাতকেরা কতকগুলি মারাত্মক রোগ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। রোগের নামগুলি হলো এই—(১) মাইক্রোঅপথ্যালমাস (এতে চোখ খুব ছোট হয়), (২) হিমোফিলিয়া (এক ধরণের রক্তরোগ, কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হলে ঘা সহজে শুকায় না, রক্ত জমাট বাঁধে অনেক দেরীতে), (৩) সিজোফ্রেনিয়া ও মাইক্রোসেফ্যালিস্ (মস্তিষ্কের রোগ), (৪) অ্যালবিনিজম (রঞ্জক শূন্য অবস্থা)। এ ছাড়া আরো অনেক কঠিন রোগ বাসা বাঁধে শিশুর দেহের মধ্যে।

ডি এন পি-এর স্বাভাবিক গঠন যে সব কারণে বিকৃত হয়, তার অনেকগুলির হদিস পাওয়া গেছে। ক্ষতিকারক বস্তু শুক্রকীট বা স্ত্রী-বীজের কেন্দ্রকস্থিত ডি. এন পি-এর স্বাভাবিক গঠন নষ্ট করে এবং তারই জন্যে মিউটেসনের হার দ্রুত হয়। এর ফলে শিশু মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হতে পারে অথবা নানা বিকৃতি নিয়েও বেচে থাকতে পারে।

কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যারা ডি. এন. পি-এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে উপরিউক্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবেও একই অবস্থা ঘটে থাকে। ১৯২৫ সালে রুশ বিজ্ঞানী জি. এ. ন্যাডসন এবং জি. এস. ফিলিপভ্ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, রেডিয়াম থেকে নির্গত রশ্মি মিউটেসন-ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

১৯২৭ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এইচ. জে মুলারও বলেন যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে মিউটেসন দ্রুতবেগে সম্পন্ন হয়। তিনি আরো বলেন, অপরাপর কারণের জন্যে মিউটেসন হওয়াতে নবজাতকের উপর যে ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের বেলায়ও তেমনি হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে পরিবর্তনের হার অনেকটা দ্রুত হয়।

গাছপালা, কীট-পতঙ্গ বা ছোট ছোট জীবজন্তু নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা এবং মিউটেসনের হার পরস্পর সমানুপাতিক ; অর্থাৎ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাত্রা বেড়ে গেলে মিউটেসনের হার দ্রুত হয়। তার ফলে মৃত সন্তান, বিকলাঙ্গ ও রোগগ্রস্ত সন্তান জন্ম নেয়। জন্মগত রোগগুলি বংশপরম্পরায় চলতে থাকে। বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় জীবতত্ত্ববিদ ডাঃ জে বি. এস হলডেন বলেন যে, কেবলমাত্র প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে মানুষের এবং অন্যান্য দীর্ঘজীবী প্রাণীর মিউটেসন-ক্রিয়া হতে পারে। আবার মুলার অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিকিরণের প্রভাবে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ মিউটেসন হয়ে থাকে, অর্থাৎ মিউটেসনের মাত্র পাঁচ শতাংশ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জন্যে হয়ে থাকে।

স্বাভাবিক অবস্থায় কি পরিমাণ তেজস্ক্রিয় রশ্মি প্রতি বছরে মানুষের জননেন্দ্রিয়ের উপর কার্যকরী হয়, তার একটা ছক দেওয়া গেল।

তেজস্ক্রিয় রশ্মির উৎস	রশ্মির পরিমাণ
মহাজাগতিক রশ্মি (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে)	০.০২৮ র‍্যাড্
প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ	
বিচ্ছুরিত গামারশ্মি	০.০৪৩ র‍্যাড্
বাতাসের র‍্যাডন	০.০০১ র‍্যাড্
পটাসিয়াম-৪০	০.০২০ র‍্যাড্
কার্বন-১৪	০.০০১ র‍্যাড্
অন্যান্য বস্তু	০.০০২ র‍্যাড্
প্রতি বছরে	০.০৯৫ র‍্যাড্
ত্রিশ বছরে	২.৮৫ র‍্যাড্

সুইডেনের বিজ্ঞানীরাও নানা ধরণের হিসাব দিয়েছেন। সব মিলিয়ে মোটামুটি জানা যায় যে, ৩০ বছরে মানুষের জননেন্দ্রিয়ে স্বাভাবিকভাবে উদ্গত তেজস্ক্রিয় রশ্মি ৩ থেকে ৪ রেম্ মাত্রায় প্রবেশ করে।

মুলার বলেন যে, মিউটেসনের হার যদি দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়ে, তবে সমগ্র পৃথিবীতে এক দুঃসহ অবস্থার সৃষ্টি হবে। মিউটেসনের হার দ্বিগুণ হতে পারে, যখন তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের হার দ্বিগুণ হয়। হলডেন বলেন যে, এই "দ্বিগুণ মাত্রা" হচ্ছে ৩ থেকে ৪ রেম্।

মুলারের অভিমতে এই মাত্রা হচ্ছে—
$\frac{(৩-৪)\times ১০০}{৫}$ = ৬০-৮০ রেম্ (rems) পর্যন্ত। রুশ বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে স্থির করেছেন যে, "দ্বিগুণ মাত্রা" (Doubling dose) ১০ রেম্। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থাও ঐ একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। এবারে আমরা মূল বক্তব্যে ফিরে আসছি।

পরিসংখ্যান থেকে জানা গেছে যে, তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ফলে শতকরা ৩-৪ ভাগ শিশুর সকলেই জন্মগত রোগ নিয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। ক্রমাগত পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের হার এক সময় "দ্বিগুণ মাত্রার" অঙ্কে পৌছে যাবে এবং মিউটেসনের হারও দ্বিগুণ হবে; অর্থাৎ আরো প্রায় ৪ ভাগ শিশু জন্মগত রোগ নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখবে।

মানুষের গড় আয়ু যদি ষাট বছর ধরা যায় এবং তার প্রজনন-ক্ষমতা যদি ত্রিশ বছর কাল ধরে সক্রিয় থাকে, তাহলে ঐ ত্রিশ বছরে $\frac{P\times ৩০}{৬০} = \frac{P}{২}$ সংখ্যক শিশু জন্ম নেবে।

P = পৃথিবীর জনসংখ্যা।

আর জন্মগত রোগ নিয়ে প্রায় $\frac{৪\times P}{১০০\times ২}$ সংখ্যক শিশু ভূমিষ্ঠ হবে।

যদি ১০ রেম মাত্রাকে "দ্বিগুণ মাত্রা" ধরা হয়, তাহলে প্রতি রেম্ বিকিরণে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে : $\frac{৪\times P}{১০০\times ১০\times ২}$

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় রশ্মি ও পদার্থের প্রভাবে ৩০ বছরে

$\frac{D_{৩০} \times ৪ \times P}{১০ \times ১০ \times ২}$ জন মানুষ আক্রান্ত হবে

$D_{৩০}$ = ৩০ বছরে জননেন্দ্রিয়ে বিকিরিত তেজস্ক্রিয় বস্তুর পরিমাণ।

সাধারণতঃ তেজস্ক্রিয় সিজিয়াম-১৩৭ থেকে নির্গত গামারশ্মি জননেন্দ্রিয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গাণিতিক হিসাবে দেখা গেছে যে, এই তেজস্ক্রিয় বিকিরণের পরিমাণ ০'২৯ রেম্‌।

পৃথিবীর জনসংখ্যা যদি ৫×১০^{৯} ধরা যায়, তাহলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে আগত তেজস্ক্রিয় সিজিয়ামের জন্যে প্রতি বছর

$\frac{৪ \times ০'২৯ \times ৫ \times ১০^{৯}}{১০০ \times ১০ \times ২ \times ৩০}$ = ৯৬,০০০ জন লোক দুরারোগ্য বংশগত রোগে ভুগবে।

পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা চিরতরে বন্ধ না হলে আগামী শতাব্দীর গোড়ার দিকেই প্রতি বছরে ৯৬,০০০ জন শিশু বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক, হিমোফিলিয়া, মাইক্রোসেফালিস প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ নিয়ে জন্মাবে।

যে সংখ্যা এখানে দেওয়া হলো, তা নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চ সংখ্যা নয়। প্রকৃত সংখ্যা যে কত বেশী, তা এখনো সঠিকভাবে জানা যায় নি।

সিজিয়ামের পরে ষ্ট্রনসিয়ামের কথা বলা যাক। বিজ্ঞানীরা বলেন, তেজস্ক্রিয় ষ্ট্রনসিয়াম আরো মারাত্মক। এর প্রভাবে ক্রোমোসোমের পরিবর্তন কেমন করে হয়, তার নির্দিষ্ট তালিকা পাওয়া যায় নি। বায়ুস্তরের ট্রপোস্ফিয়ার থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কতটা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখনো ধোঁয়াটে।

তাছাড়া এই গণনায় "দ্বিগুণ মাত্রা" ধরেছি ১০ রেম। হলডেনের মতানুসারে ৩ রেম ধরা হয় নি। যদি দেখা যায় হলডেনের কথাই ঠিক, তাহলে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা যা দেওয়া হয়েছে, তার তিন গুণ হবে।

এছাড়া তেজস্ক্রিয় বিকিরণ দেহে প্রবেশ করবার ফলে লিউকেমিয়া, হাড়ের ক্যান্সার, অ্যাপ্লাষ্টিক অ্যানিমিয়া প্রভৃতি যে সব রোগ হয়, তার একমাত্র পরিণতি শোচনীয় অকাল মৃত্যু। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা বলেন, এই রোগগুলি নাকি অনেক ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক।

নাগাসাকি ও হিরোসিমায় পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির যে হিসাব পাওয়া গেছে, তাতে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, আগামী শতকের প্রথমেই প্রতি বছর ২১৮,০০০ জন (লিউকেমিয়া ও অন্যান্য রক্তরোগে) + ৪০,০০০ জন (হাড়ের ক্যান্সারে) + ৯৬,০০০ জন (অন্যান্য বংশগত রোগে—এই রোগগুলির নাম পূর্বেই বলা হয়েছে) = ৩৫৪,০০০ জন দুরারোগ্য রোগের কবলগ্রস্ত হবে।

তাহলে এক পুরুষে, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছরে ১০,০০০,০০০ জন নবজাতক ও যুবক কালান্তক রোগের কবলগ্রস্ত হয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করবে।

আইনষ্টাইন, রাসেল, বার্ণাল, হ্যাডো, পাওয়েল, রটব্লাণ্ট, ম্যাক্সবর্ন্‌, অটোহ্যান, হাইসেনবার্গ, ভন্‌ লাউয়ে, ষ্ট্র্যাসম্যান, জোলিওকুরী প্রমুখ বিশ্বের শান্তিকামী মনীষীরা বারে বারে আবেদন জানিয়েছেন, পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্যে। আমরা আশা করি, মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হয়ে পৃথিবীকে এই বিভীষিকা থেকে মুক্ত করবে।

বৃত্তাকার সিনেমা

কিছুদিন আগে ভারতের কয়েকটি সহরে সার্কারামা নামক নতুন ধরণের চলচ্চিত্র দেখানো হয়।

সুবিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক ওয়াল্ট ডিজনী এই নতুন ধরণের চলচ্চিত্রের উদ্ভাবক। চলচ্চিত্রের এই যুগান্তকারী কৌশলটিকে বিশ্বের সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন।

সাধারণ চলচ্চিত্রে দর্শকগণের সঙ্গে ছবির কোন সম্পর্ক থাকে না, তাঁরা একটা গৌণ মনোভাব নিয়ে থাকেন। কিন্তু সার্কারামায় তাঁরা নিজেদের ছবির অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন এবং সত্যিকারের জীবনের মত বিভিন্ন দৃশ্য অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া অনুভব করেন।

সার্কারামায় সাধারণ চতুষ্কোণ সমতল পর্দার পরিবর্তে বৃত্তাকার একটি পর্দা থাকে। চতুর্দিকের এই বৃত্তাকার পর্দার মধ্যবর্তী স্থানটিতে প্রত্যেক বারে প্রায় ৬০০ দর্শক বসতে পারেন। তাঁরা যখন চতুর্দিকে ফিল্মটিকে দেখেন, তখন তাঁরা নিজেদের সেই দৃশ্যটির সঙ্গে মিলিয়ে ফেলেন এবং এটাই হলো দৃষ্টিবিভ্রম।

একটি জায়গায় ১১টি মুভি ক্যামেরা বসিয়ে একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে সেগুলির মুখ বাইরের দিকে রেখে একটি ইউনিট হিসেবে সার্কারামা ফিল্ম তোলা হয়। এতে ক্যামেরাগুলি চতুর্দিকে 'দেখে'। ছবি তোলবার সময় বহু ক্যামেরার এই ইউনিটটিকে একটি উঁচু জায়গায়—একটি গাড়ীর উপর অথবা একটি এরোপ্লেনের নীচে রেখে চতুর্দিকের ছবি নেওয়া হয়।

ছবিটি ডেভেলপ করবার পর পরস্পর সংযুক্ত বিদ্যুৎ-শক্তি দিয়ে সঠিকভাবে সংযুক্ত ১১টি প্রোজেক্টর থেকে ১১টি পর্দার উপর একসঙ্গে ছবি ফেলা হয়। প্রত্যেকটি পর্দা ১০ ফুট উঁচু এবং ১৩ ফুট লম্বা। সার্কারামা থিয়েটারটি হলো ৪৮ ফুট ব্যাসের একটা গোলাকার পিপার মত। এর উপরের দিকে পর্দাগুলি লাগানো হয়। প্রোজেক্টরগুলি এই সিলিণ্ডারের বাইরের দিকে দেয়ালে বসানো হয় এবং প্রত্যেকটি ভিতরের দিকে একটি পর্দায় ফোকাস ফেলে।

কিন্তু এটা কি সম্পূর্ণ একটা নতুন জিনিষ? না—এটাও 'ভিষ্টাভিনের' মতই পুরনো।

সিনেমার শিশুকাল অর্থাৎ নির্বাক ছবির যুগ থেকেই ছবিকে বড় করে দেখাবার জন্যে এবং দর্শকদের কম্পমান ছবির সঙ্গে আরও বেশী যুক্ত করবার জন্যে চেষ্টা করা হয়। গত কয়েক বছরে বড় পর্দার যে পদ্ধতি বিশ্বের সিনেমাগুলিকে জয় করেছে, তাকে ৫০ বছর পূর্বে আবিষ্কৃত একটি পদ্ধতিরই হেরফের বলা যায়। কারণ, যে সময়ে অস্কার জেষ্টার বার্লিনে প্রথম সিনেমা খোলেন, ঠিক সেই সময়েই জেনাস্থিত জার্মেনীর চশমা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কার্ল জাইসের পদার্থবিদ্ আর্নেষ্ট এবি এবং ডাঃ রুডলফ্ তথাকথিত হাইপারগোনার লেন্স তৈরী করেন। অন্য কথায় বলতে গেলে বড় পর্দার লেন্স সেই যুগেই তৈরী হয়ে গিয়েছিল, তবে সেটা দিয়ে ছবি দেখিয়ে জনসাধারণকে তখন পর্যন্ত অবাক করে দেওয়া হয় নি। ফরাসী পরিদর্শক হেনরী ক্রিটিয়েঁ ১৯৩৭ সালে প্যারিসের বিশ্বমেলায় ৩২ ফুট উঁচু এবং ৯৯৬ ফুট লম্বা একটি পর্দায় দুটি বিপুল আকারের প্রোজেকটর ব্যবহার করে দুটি ফিল্ম দেখিয়ে দর্শকগণকে অবাক করে দেন। দুটি প্রতিবিম্বকে অত্যন্ত সঠিকভাবে একত্রিত করে বিরাট আকারের একটি ছবি ফেলা হয়।

এরপর ষোল বছর পার হয়ে গেল, কিন্তু

আর কেউ এই কৌশলটিকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন নি। তখন আমেরিকার সিনেমা শিল্পের মহারথীরা এই কৌশলটি কাজে লাগাবার সিদ্ধান্ত করেন। ফলে সমগ্র বিশ্বে বড় পর্দার ফিল্ম দেখানো সুরু হয়ে যায়। বর্তমানে আমেরিকায় প্রতি তিনটি ফিল্ম এই পদ্ধতিতে তৈরী হচ্ছে। তেমনি 'উইণ্ডজ্যামারের' মত যে ফিল্মগুলি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছে, তা ১৯২৬ সালে ফ্রান্সের এবেল গান্সের আবিষ্কৃত পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী করা হয়। তিনি তিনটি ক্যামেরা ব্যবহার করে তিনগুণ আকারের অবিচ্ছিন্ন চিত্র দেখাতে সক্ষম হন। তার প্রথম ছবি "নেপোলিয়ন" ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম প্যারিসে দেখানো হয়। ঐ বছরেই বার্লিনের অধিবাসীগণ বিরাট আকারের পর্দার ছবি দেখবার সুযোগ পান। এগুলি থেকেই প্রমাণ হয় যে, বিশ্বে নতুন কিছু নেই।

এমন কি, যে বৃত্তাকার সিনেমা হামবুর্গ থেকে তার বিশ্ববিজয় পরিক্রমা সুরু করে, তাও সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। কারণ মঁসিয়ে রাউল গ্রিময় নামক একজন যন্ত্রকুশলী প্যারিসে ১৯০০তম বিশ্বমেলায় সিনেকোয়ামারামা প্রদর্শন করেন। একটি বৃত্তাকার পর্দায় ছবি দেখানোর জন্যে তিনি ১২টি ক্যামেরা ব্যবহার করেন। এই প্রদর্শনী এত সাফল্য অর্জন করে যে, হাজার হাজার দর্শক সমাগম হতে থাকে। এই রকম সিনেমায় আগুন লাগবার ভয় থাকে—এই অজুহাত দেখিয়ে পুলিশ সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ করে দেয়। ফলে আবিষ্কারক সর্বস্বান্ত হয়ে যান এবং এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করা ছেড়ে দেন।

১৯৫৮ সালের ব্রুসেল্‌সে অনুষ্ঠিত বিশ্বমেলায় ওয়াল্ট ডিজনী ১১টি প্রজেকটার ব্যবহার করে বৃত্তাকার পর্দার ফিল্ম দেখান। তিনি যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তা সম্পূর্ণ ঠিক না হলেও এই নতুন ফিল্মগুলি বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রেও ওয়াল্ট ডিজনীকে পথিকৃৎ বলা যায় না, কারণ এর দুই বছর পূর্বে জার্মেনীর সিনেমার গল্প লেখক এডালবার্ট বেলটিস, ক্রীষ্টমাস ট্রিতে প্রতিবিম্বিত একটা কাঁচের গোলক দেখে নতুন এক কল্পনা নিয়ে ভাবতে সুরু করেন। প্রতিবিম্বিত একটি কাচ-গোলকে স্বাভাবিক রং ও আলোসহ একটু আবছা আকারে হলেও সম্পূর্ণ ৩৬০ ডিগ্রী বৃত্তে পুরা ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে বেলটিস ভাবতে থাকেন যে, এই গোলকটির ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে একটি ক্যামেরা দিয়ে যদি ছবি তোলা যায়, তাহলে অনেকগুলি বৃত্তাকার ছবি পাওয়া যাবে। তারপর সেই ফিল্মটি যদি গোলাকার কোন বাড়ীর কেন্দ্র থেকে প্রলম্বিত প্রতিবিম্বমান একটি গোলকের উপর সোজাসুজি নীচে থেকে দেখানো যায়, তাহলে চতুর্দিকের গোলাকার দেয়ালে মূল দৃশ্যটি সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হবে। বিশেষ করে ফিল্ম তোলবার সময় চারদিকে কয়েকটি মাইক্রোফোন বসিয়ে যদি—যে দিক থেকেই শব্দ আসুক—তা রেকর্ড করা হয় এবং ছবি দেখাবার সময় সেই দিক থেকেই শব্দগুলি দেওয়া যায়, তাহলে তার ফল হবে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। ছবির দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করবার কাজ তাহলে সম্পূর্ণ হবে এবং দৃষ্টিবিভ্রমও সম্পূর্ণ হবে। কারণ সেগুলি তখন জীবনের মতই অবিচ্ছিন্ন ধারায় চলবে। দর্শক যে দিকেই তাকাবেন, সেদিকেই তিনি ছবির সঙ্গে একাত্ম হবেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, ছবিটি যদি কোন চলমান গাড়ী থেকে তোলা হয়, তাহলে দর্শকের মনে হবে যে, তিনিও সেই গাড়ীতেই বসে আছেন। কারণ দৃশ্যটি দর্শকের কাছে এগিয়ে আসে, তাকে এক পার্শ্বে ছাড়িয়ে যায় এবং তিনি যদি পিছন ফিরে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, দৃশ্যটি পেছন দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। যদি একটা সিংহ তাড়া করে, তাহলে দর্শকেরাও মাথা নীচু করে পালাতে চেষ্টা করবেন—কারণ ছবিটি নেবার সময় ক্যামেরাম্যানও ঠিক তেমনি ভাবে মাথা নীচু করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে

পিছনে ঘুরে দেখতে পাবেন যে, সিংহটি লাফ দিয়ে পিছনে গিয়ে পড়লো।

সিনেমার যান্ত্রিক উন্নতির শেস সীমা হলো এই সিনেটারিয়াম। কারণ ৩৬০ ডিগ্রীর বেশী কোন প্রতিচ্ছবি তোলা অসম্ভব। মানুষ যুগ যুগ ধরে যা কল্পনা করে এসেছে এবং যন্ত্রবিদ্‌গণ বহুদিন থেকে যে সাফল্য অর্জন করবার চেষ্টা করেছেন, 'তা এখন বাস্তবে পরিণত হয়েছে—তা হলো অসীম প্রতিবিম্ব, একটা সম্পূর্ণ দৃষ্টিবিভ্রম। 'গ্লোব্যাল'

এন্‌জাইমের কার্য

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমরা শারীরক্রিয়ার যে সব ব্যাপার দেখে চমকে যাই, তার বেশীর ভাগ ব্যাপারের মূলেই আছে এন্‌জাইম।

এন্‌জাইমের কথা আলোচনা করতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে আসে মদ্যপানের কথা। এই দেশে কিছুকাল থেকে মদ্যপান একটা খারাপ অভ্যাস ও তাকে বর্জন করা দরকার বলে আন্দোলন চলছে। অথচ এই কলকাতা শহরে রাত্রি ২টা পর্যন্ত মদের দোকান খোলা। কেন এমন হয়? আমার কাছে এই প্রশ্ন ৪০ বছর ধরে আর একটি যে প্রশ্ন নিয়ে আমি মাথা ঘামাই—মানুস হঠাৎ কেন মরে—তার সমপর্যায়ভুক্ত।

মানুষ মদ খায় কেন? করোনারী রোগীর খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে কলম থেমে গেল। প্রথমে লিখেছিলাম, শোবার আগে অর্ধ আউন্স মদ্যপান (অরিষ্টাদি) সমীচীন। মহাত্মাবাদীর দল ক্ষেপে ওঠেন আর কি! কিন্তু এদিকে তাঁদের অনেকেই ট্রাঙ্কুলাইজার বা ঘুমপাড়ানী ওষুধের রেওয়াজ দেখান। আমি বলি, এই দুয়ের মূলে একই কথা। শরীরে এন্‌জাইম অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে। এন্‌জাইম কাজ করে, চিনি গ্যাঁজায় এবং শেষ অবধি মদেই তার পরিণতি। আমার বিজ্ঞানী পাঠককে ধৈর্য ধরতে বলছি, মদ খেতে নয়। মদ খুব খারাপ, কেউ যেন না খায়। তবে শুধু এই হুজুগ চালালে সাধু হতে পারি, কিন্তু গ্যাঁজানো কমবে না। কিংবা জীবনের উপর তার প্রভাবও লোপ পাবে না। বস্তুতঃ এই গ্যাঁজানো থেকে দেশ তার সারা শুল্কের এক তৃতীয়াংশ আদায় করে।

রাষ্ট্রীয় আয় বাড়ানোর সঙ্গে গ্যাঁজানো জড়িয়ে ফেলা বৈজ্ঞানিক প্রথা কিনা জানি না। তবে সে দিন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ওচোয়া (Ochea)। তিনি জীবনের উৎসের সন্ধান করছেন নিউক্লিক অ্যাসিডই নিউক্লিয়াসের গোড়ার দ্রব্য। এই নিউক্লিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয় কোষের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসে এবং এখানেই তার উৎপত্তি। জীবিত কোষই হচ্ছে জীবন। অবশ্য ওচোয়া প্রাণ সৃষ্টি করতে পারবেন না তাঁর পরীক্ষাগারে। জীবনই জীবনের উৎস। কোন প্রকার বৃক্ষই হোক আর জন্তুই হোক, জীবনের উৎসই জীবন—অর্থাৎ পরীক্ষাগারে অজৈব বস্তু থেকে মানুষ তৈরী হবে না। মানুষ থেকে মানুষ, গরু থেকে গরু, ঢ্যাঁড়সের বীচি থেকে ঢ্যাঁড়স হতে থাকবে এবং ঢ্যাঁড়স, ধান, গম সবই চাষে উৎপন্ন হবে। হাঁস, মুরগী, মাছ, মাংস সবই কৃষির উপর নির্ভর করবে।

তাহলে এন্‌জাইম-বিদ্যার দরকার কি? এর

কি কোন ভবিষ্যৎ নেই? আছে বৈ কি! চিনি বা শ্বেতসার গাঁজালে মদ হবেই, মদের চাহিদা থাকবেই। ৬০ লক্ষ টাকার বিলাতী মদ এদেশে আমদানী করে ডলার, স্টারলিং ফুরাবার ভয় থাকলেও। অধ্যাপক ওচোয়া বলেন, D. N. A ও R. N. A থেকেই প্রোটিন, অর্থাৎ কোষের প্রধান উপকরণ তৈরী হয় এবং আগেই বলেছি, জীব-কোষই জীবনের মূল। প্রাণপ্রতিষ্ঠায় কোষেরই অর্থাৎ জীবিত কোষেরই একচেটিয়া অধিকার।

বাতাস মৌলিক পদার্থ নয়—এটা ল্যাভয়েসিয়ার প্রমাণ করেছেন। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন বায়ুর দুটি প্রধান উপাদান। এর পরে এলো হাইড্রোজেন। এই তিনটি মৌলিক পরমাণু নিয়েই গবেষণা আরম্ভ হয়। দেখা গেল, কতকগুলি বিশেষ ধর্মী ঘটক উপস্থিত থাকলে অনুকূল পরিবেশে মৌলিক পরমাণুর বেশ তাড়াতাড়ি রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং নতুন নতুন দ্রব্য অল্প আয়াসে উদ্ভূত হয়। এই ঘটকের নাম আমরা রেখেছি অনুঘটক বা Catalyst। ঘটক যেমন বিবাহের ঘটকালি করে, অনুঘটকের কাজও তেমনি, মৌলিক পরমাণুর সংশ্রব ঘটিয়ে নতুন দ্রব্যের সৃষ্টি করা। তাই জৈব-রাসায়নিক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী এবং শারীরবৃত্তবিদ্ মিলে আমরা বলবো—এই সব ঘটনই এনজাইমের কাজ। ঐ যে Pentose Nucleic Acid, যাকে আমরা DNA বলছি এবং DNA থেকে যে RNA (Ribo Nucleic Acid) হবে, সে-ও বিশেষ এনজাইমের কাজ। তাকে D N A-ase ও R N Aase বলা হয়েছে। এই ase-এর সৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে অবাঞ্ছিতভাবে বস্তুর যাতে পরিণতি না হয় কিংবা অণু-পরমাণু বিভাজন ঘটে, তার জন্যেই প্রয়োজন এনজাইমের!

তাছাড়া এনজাইমের অভাবে যদি নতুনের সৃষ্টি না হয়, জীবসৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ না থাকে, তাহলে ঐ D N Aase ও R N Aase ছাড়া কার্যকরী মৌলিক পরমাণুর পরিবর্তন ঘটে যাবেই; কিন্তু এ হবে জীবসৃষ্টির অন্তরায়, প্রকৃতির অবাঞ্ছিত পরিণতি। তাই অবাঞ্ছিত পরিণতির প্রতিরোধ সব সময়েই দরকার। যেমন জীবকোষের মধ্যে ase-গুলি আণবিক স্বেচ্ছাচার নিয়ন্ত্রণ করে, তেমনি সামাজিক ক্ষেত্রেও স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধ করা দরকার। সেজন্যে আমি পরিবার-নিয়ন্ত্রণ সমস্যায় Vasectomy করে পুরুষের দ্বারাই ত্বরিৎ লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপদেশ-পত্র প্রচার করেছি।

১৯৬২ সালে নভেম্বর মাসে বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে জগদীশচন্দ্র বসু স্মারক বক্তৃতায় আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক আক্রিদি বহু বিষয়ের অবতারণা করেন। প্রকৃতির রাজ্যে যে পরীক্ষাগার আছে; সেখানে এনজাইমসমূহ কি ভাবে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং শুঁটিধারী (Pod বা Legume) উদ্ভিদেরা কি ভাবে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং তাথেকে কি ভাবে প্রোটিন সৃষ্টি হয়—সে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার।

খাদ্যবীজের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রোটিন আছে সয়াবীনে, অর্থাৎ চীনের শাদু-বীজে। প্রকৃতির পরীক্ষাগারে এই প্রোটিন সৃষ্টি হয়েছে বলে চীনদেশে প্রোটিন-ক্ষুধা এই বীজের দ্বারাই অনেকাংশে মেটানো যাচ্ছে।

পোলোক সাহেব ও তাঁর সহকর্মীরা এই অনুঘটকের নাম দিয়েছেন Nitrate Reductase বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের রসায়ন বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ডাঃ চৌধুরী ১৯২৯ সালে লাহোর বিজ্ঞান কংগ্রেসে তাঁর অভিভাষণে Nitrate ও Nitrite থেকে Nitrate Reductase-এর সাহায্যে কি করে প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়, তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তার ফলে লেখক তাঁর বাড়ীতে যাবতীয় পরিত্যক্ত ময়লা সংগ্রহ করে বায়ুহীন পরিবেশে তরলিত (Anaerobic liquefaction) করেছিলেন এবং সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক (Septic tunk) বায়ুহীন পরিবেশে ক্রিয়াশীল করবার জন্যে শিবপুর

ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে এন্‌জাইম এনেছিলেন। এই প্রক্রিয়া বহুলাংশে কার্যকরী হয়েছিল এবং আজ ৩০ বছর বাদে বাংলা দেশের প্রতি পল্লীগ্রামে সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক আর অজানা জিনিষ নয়।

ভাল দই পাবার জন্যে কলকাতার লোক মোল্লার চকে যায়। মোল্লার চকের দই ভাল। দই কলকাতার সব মিষ্টির দোকানেই পাওয়া যায়, তবে মোল্লার চকে লোকে যায় কেন? ওখানকার ঘটক ভাল ভাল এন্‌জাইমের মালিক। সেই এন্‌জাইম দুধের মধ্যেকার চিনি গ্যাঁজাতে সাহায্য করে এবং দুধে যে সব প্রোটিন আছে, সেগুলিকে D N Aase ও R N Aase-এর সাহায্যে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের দ্বারা হজমের উপযোগী করে পাকস্থলীতে পাঠায়। সেখানে অম্লরস (HCl) প্রস্তুত হয়ে আছে পুরাপুরি হজমের জন্যে—তার সাহায্যে অনতিবিলম্বে হজম হয়ে যাবে। তাই আমরা চিকিৎসকেরা বলি—দুধ না সইলে দই খাও।

দই-এ যে বুলগেরিয়া ব্যাসিলাস আছে তাতেও রুশ, তথা ফরাসী বিজ্ঞানী এন্‌জাইমের কাজ দেখিয়েছেন।

আমরা যে খাদ্য খাই ও পরিপাক করি, তার সবই এন্‌জাইমের কাজ। যত খাদ্য আমরা খাই, তার হজম এন্‌জাইমের দ্বারা হয়। আমরা যে সব খাদ্য খাই, তার মধ্যে ক্লোরিন পরমাণু মুক্তভাবে থাকে না। ক্লোরিন কেবল সাধারণ লবণের (Sodium chloride) মধ্যেই থাকে না। খাদ্যের মধ্যে নানাভাবে ক্লোরিন ও আয়োডিন থাকে। এন্‌জাইমের মাধ্যম (Enzyme action) ছাড়া কোনটিই সংহতির কাজে লাগতে পারে না। পরীক্ষাগারে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পেতে যে পরিশ্রম ও সময় লাগবে, সেই তুলনায় অনুকূল অবস্থায় অনায়াসে ও অল্প সময়ের মধ্যেই এন্‌জাইম ঐ অ্যাসিড প্রস্তুত করবে। পাকস্থলীর অক্‌সেন্টিক কোষে যে HCglase আছে, খাদ্যের গন্ধ, অনুভূতি —এমন কি, খাদ্যের নাম মনে হলেই তার নিঃসরণ সুরু হয়।

হঠাৎ প্রাণান্তকর হৃদ্‌রোগের আক্রমণের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে যে নতুন কোষের উদ্ভব হয়ে অবাঞ্ছিতভাবে হৃৎপিণ্ডের স্ফীতি ঘটতে থাকে, তা প্রতিরোধের জন্যে আমি অতি বিষাক্ত HCN ব্যবহারে অব্যর্থ ফল পেয়েছি।

হৃদ্‌রোগ একটি প্রচ্ছন্ন ব্যাধি। এটা হঠাৎ ঘটে না—বহুদিন চাপা থাকে। হঠাৎ কিছুই হয় না। একাধিকবার প্রদাহের কথা শুনলেই আমি প্রুসিক অ্যাসিড (অন্য নাম হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড) দিয়েছি এবং হৃদ্-আক্রমণ বা করোনারী স্প্যাজম (Transient Coronary Spasm or Coronary Kicks) দেখলেই এই হার্ট টনিকে অব্যর্থ ফল পেয়েছি। এর বিশেষ কাজ হলো, অবাঞ্ছিত কোষ বৃদ্ধির মূলে যে aseগুলি কাজ করছে, তাদের প্রতিরোধ করা।

পরলোকগত ডাঃ অনুকূল সরকার, ডাঃ কুদরত্-ই-খুদা প্রমুখ রসায়নবিদ্ বন্ধুরা আমাকে ২% (শতকরা ২ ভাগ) হিসাবে এই বিষ জলে মিশিয়ে দিয়েছেন এবং তার ২-৫ ফোঁটাই হৃৎপিণ্ডকে বড় হতে বাধা দেয় এবং R N Aase ও D N Aase-এর প্রোটিন প্রস্তুতির কাজে অন্তরায় হয়।

Tissue culture বা কোষতন্তু বীক্ষণাগারে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পটাশিয়াম সায়ানাইড অতি কম মাত্রায়—এমন কি, হোমিওপ্যাথিক ডাইলিউসনেও সমস্ত এন্‌জাইমের কাজ রোধ করে।

আমার মৌলিক গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয় করোনারী অকুঞ্চন জীবেতর দেহে প্রমাণ করেছি এবং মৃতের ময়না তদন্তেও আমার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত হয়েছে। মৃতের ময়না তদন্তে কি কি সংঘটন জীবনে হতে পারে, তার প্রমাণ 'ভবিষ্যৎ-বাণী'র মত মৃতের আত্মীয়স্বজনকে জানিয়েছি। স্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যখন বেঁচে ছিলেন, তখন তাঁকে একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। মৃত্যুর

সাতদিন আগে অধুনা মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লবাবুকেও একথা জানিয়েছিলাম, আমার এই আশঙ্কার কথা। ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন ভোর ৫টায় চিঠি লিখে প্রফুল্ল সেন মশাইকে জানাই এবং অনুরোধ করে-ছিলাম ডাঃ রায় যেন সকল অবসাদকারী কার্য থেকে অব্যাহতি পান। ফল কিন্তু আশানুরূপ হয় নি।

শারীরবিদ্যার একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে আমি বহুকাল যাবৎ এই এন্‌জাইম তত্ত্বের কাজে, অর্থাৎ এন্‌জাইমের কাজে ase-গুলিকে কাজ করতে দিলে কি হয় এবং এদের বাধা দিলে কি হয়—তার গবেষণায় ব্যাপৃত আছি।

শরীরে এন্‌জাইমকে বেপরোয়াভাবে কাজ করতে দিলে মৃত্যু (যা চিরন্তন সত্য) ঘনিয়ে আসে, আর হিসাবমত এন্‌জাইমের ব্যবহার করলে কিম্বা সময়মত তার প্রতিরোধ করলে মৃত্যু যে মানুষের ইচ্ছাধীন হতে পারে—এই বিষয়টি বোঝাতে আমার এই প্রবন্ধের অবতারণা।

মহাকর্ষ

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকণা অবিরাম পরস্পরকে আকর্ষণ করে চলেছে। বিশাল নক্ষত্র, নীহারিকা থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণু পর্যন্ত কেউই এই আকর্ষণ শক্তি থেকে বঞ্চিত নয়। তবে নক্ষত্র নীহারিকার তুলনায় অণু-পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু তবুও অণু-পরমাণুর আকর্ষণ শক্তিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। কারণ গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ শক্তির মূলে আছে অসংখ্য অণু-পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি। পাঠক হয়তো জানেন যে, এই শক্তির নাম মহাকর্ষ-শক্তি (Gravitation)

মাধ্যাকর্ষণ বা মহাকর্ষ আবিষ্কারের বহুল প্রচলিত কাহিনীটি সবাই জানেন। নিউটন বাগানে বসেছিলেন। এমন সময় গাছ থেকে একটা আপেল মাটিতে পড়লো। একটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রতিটি আপেল বাগানে ঘটে থাকে। কিন্তু এই অতি সাধারণ ঘটনাটি তাঁর সামনে একটা উদ্ভট প্রশ্ন উপস্থাপিত করলো। আপেলটাকে মাটিতে পড়তে দেখে তাঁর হঠাৎ মনে হলো, ওটা উপরের দিকে বা অন্য কোনও দিকে না গিয়ে মাটিতেই পড়লো কেন? আপেলটা আমার মাথায় পড়লেও বোধ হয় এ-রকম একটা প্রশ্ন কোনদিন আমার মাথায় উঠতো না। প্রশ্নটির মত উত্তরটিও আমাদের কাছে হয়তো উদ্ভট বলেই মনে হবে। তিনি বললেন যে, পৃথিবী আপেলটাকে আকর্ষণ করে মাটির দিকে টেনে আনলো বলেই আপেলটা উপরে বা পাশে চলে যেতে পারলো না। আমার মনে হয়, 'পৃথিবী আপেলটাকে আকর্ষণ করলো' একথা বলতে নিউটনের মত বড় বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োজন ছিল, তার চেয়ে অনেক বড় প্রতিভার প্রয়োজন ছিল ঐ উদ্ভট প্রশ্নটি মাথায় আনতে।

নিউটন মহাকর্ষ বিষয়ক নীতিগুলিকে সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন। এই সূত্র দিয়ে বিশ্বের যে কোন দুটি বস্তুর আকর্ষণ-শক্তি পরিমাপ করা যায়। সূত্রটি হয়তো পাঠকদের কাছে একটু নীরস লাগতে পারে। তবুও প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতা রক্ষা করবার জন্যে এ-সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করে নেব। সূত্রটি হচ্ছে এই যে, যে-কোনও দুটি বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে

এই আকর্ষণ-বলের পরিমাণ—(১) বস্তু দুটির ভরের গুণফলের সঙ্গে সমানুপাতিক (Directly proportional to the product of their masses), (২) বস্তু দুটির মধ্যেকার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তঅনুপাতিক (Inversely proportional to the square of their distance from each other).

প্রথমে আমরা সূত্রের ১নং অংশ নিয়ে আলোচনা করবো। মনে করুন, দুটি বস্তুর ভর যথাক্রমে M ও m_2 এবং মহাকর্ষ-বল (যা বস্তু দুটির মধ্যে ক্রিয়া করছে) F। তাহলে সূত্রের প্রথম অংশ অনুযায়ী, (উভয়ের মধ্যেকার দূরত্ব অপরিবর্তিত থাকলে)

$$F \propto M \times m \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (i)$$

অর্থাৎ দূরত্ব অপরিবর্তিত রেখে দুটি বস্তুরই অথবা যে কোন একটি বস্তুর ভর বাড়ালে বা কমালে বস্তু দুটির মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ-শক্তিও বাড়বে বা কমবে। M বা m-এর যে কোন একটিকে ২ গুণ বৃদ্ধি করলে F-ও ২ গুণ বৃদ্ধি পাবে। আবার M ও m উভয়েই যদি ৩ গুণ বৃদ্ধি পায়, তবে F, (৩ × ৩) = ৯ গুণ বৃদ্ধি পাবে। এদের হ্রাস করলে F-ও অনুরূপভাবে হ্রাস পাবে।

এবার আলোচনা করা যাক সূত্রের দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে। বস্তুটির মধ্যে দূরত্ব d হলে এবং ভর M ও m অপরিবর্তিত থাকলে এই সূত্রানুযায়ী—

$$F \propto \frac{1}{d^2} \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots (ii)$$

অর্থাৎ দূরত্ব (d) দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলে মহাকর্ষ-বল (F) চারগুণ হ্রাস পাবে। দূরত্ব ৩ গুণ বৃদ্ধি করলে মহাকর্ষ ৯ গুণ হ্রাস পাবে। আবার দূরত্ব ৩ গুণ হ্রাস করলে মহাকর্ষ ৯ গুণ বৃদ্ধি পাবে।

এখন (i) ও (ii) সমীকরণকে সংযোজিত করে পাই,

$$F \propto \frac{M \times m}{d^2}$$

$$\text{or } F = \frac{M \times m \times G}{d^2}$$

G একটি ধ্রুবক। একে বলা হয় মহাকর্ষের বিশ্ব ধ্রুবক (Universal Gravitational Constant)। এর মান ৬.৬৬৪ × ১০^-৮ ডাইন; অর্থাৎ যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ-শক্তির পরিমাপ করতে হলে বস্তু দুটির ভরের গুণফলকে দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করে তাকে ৬.৬৪ × ১০^-৮ দিয়ে গুণ করতে হবে।

তবে সত্য কথা বলতে কি, আমাদের ব্যবহারিক জগতে এই সূত্রের কোনই প্রয়োজন নেই। কারণ আমরা সাধারণতঃ যে জগতের সঙ্গে পরিচিত, তার বস্তুসমূহের মধ্যে মহাকর্ষ-বল এতই সামান্য ক্রিয়া করে যে, তার পরিমাপ করা খুবই নিষ্প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। একটা উদাহরণ দিই। মনে করুন ১ পাউণ্ড ভরের দুটি বস্তু পরস্পর থেকে ১ ফুট দূরে রাখা হয়েছে। এখন এদের মধ্যে যে মহাকর্ষ-বল ক্রিয়া করছে, তার পরিমাণ ৩ × ১০^-৬ পাউণ্ড। নিতান্তই সামান্য বল, একটি সাধারণ লিখবার কাগজের যতটা বেধ হয়, ততটা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট একটি লোহার ঘনক কল্পনা করলে তার ভরও প্রায় ঐ রকমই হবে।

গ্রহ-নক্ষত্রের আকর্ষণ এত প্রবল কেন, একথা নিশ্চয়ই এখন আর বলে দিতে হবে না। এদের ভর অতি বিপুল, সে জন্যে এদের আকর্ষণও প্রচণ্ড; একথা নিশ্চয়ই পাঠক এখন বুঝতে পারছেন।

মহাকর্ষ সম্বন্ধে নিউটনের ধারণা পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ-সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা করেন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক হেনরী ক্যাভেণ্ডিস। অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল পরীক্ষাটি; অথচ এ-রকম গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষার জন্যে, বলতে গেলে প্রায় কোন যন্ত্রপাতির প্রয়োজনই হয় নি। একটি দণ্ডের দু-দিকে দুটি সমান ভরের সীসার বল x_1 ও x_2

সংযুক্ত আছে। দণ্ডটির ঠিক মাঝখানে একটি সুতা বেঁধে সেটিকে কোন একটি অবলম্বন থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। এই অবস্থায় ঐ দুটি বল সমেত দণ্ডটি অনুভূমিকভাবে ঝুলতে থাকবে এবং একটি অনুভূমিক তলে চক্রাকারে ঘুরতে পারবে (চিত্র-১)। এখন একই রকমের আর একটি বল y-কে x_1-এর খুব কাছে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দেখা গেল যে, x_1 সামান্য সরে এসে y-কে স্পর্শ করলো; অর্থাৎ বোঝা গেল যে, প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে আকর্ষণ করে। x_1 অথবা y-এর ভর বৃদ্ধি করলে আকর্ষণও প্রবল হয়। x_1 ও y-এর মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং দূরত্ব বৃদ্ধি করলে আকর্ষণ কম হয়।

একটা প্রশ্ন হয়তো পাঠকের মনে জেগেছে যে, দুটি বস্তুর দূরত্ব বললে কি বোঝা যাবে? দুটি বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বিন্দু থাকতে পারে। তাদের মধ্যে কোন্ দুটি বিশেষ বিন্দুর মধ্যেকার দূরত্বের কথা ধরা হবে? এবার সেই প্রসঙ্গেই আসছি।

দুটি বস্তু যখন মহাকর্ষ-বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে, তখন ঐ বল বস্তু দুটিতে অবস্থিত দুটি বিন্দু সংযোজক সরলরেখা বরাবর কাজ করে; অর্থাৎ মহাকর্ষ-বল সমগ্রভাবে বস্তুর একটি বিশেষ বিন্দুতেই ক্রিয়া করে। ঐ বিন্দুকে বস্তুর অভিকর্ষ-কেন্দ্র (Centre of Gravity) বলে। তবে অভিকর্ষ-কেন্দ্র বা ভার-কেন্দ্র বস্তুটির মধ্যে সব সময়েই অবস্থিত নাও হতে পারে। যেমন, কোন বলয়ের ভার-কেন্দ্র তার কেন্দ্রে, অর্থাৎ শূন্যের মধ্যে অবস্থিত।
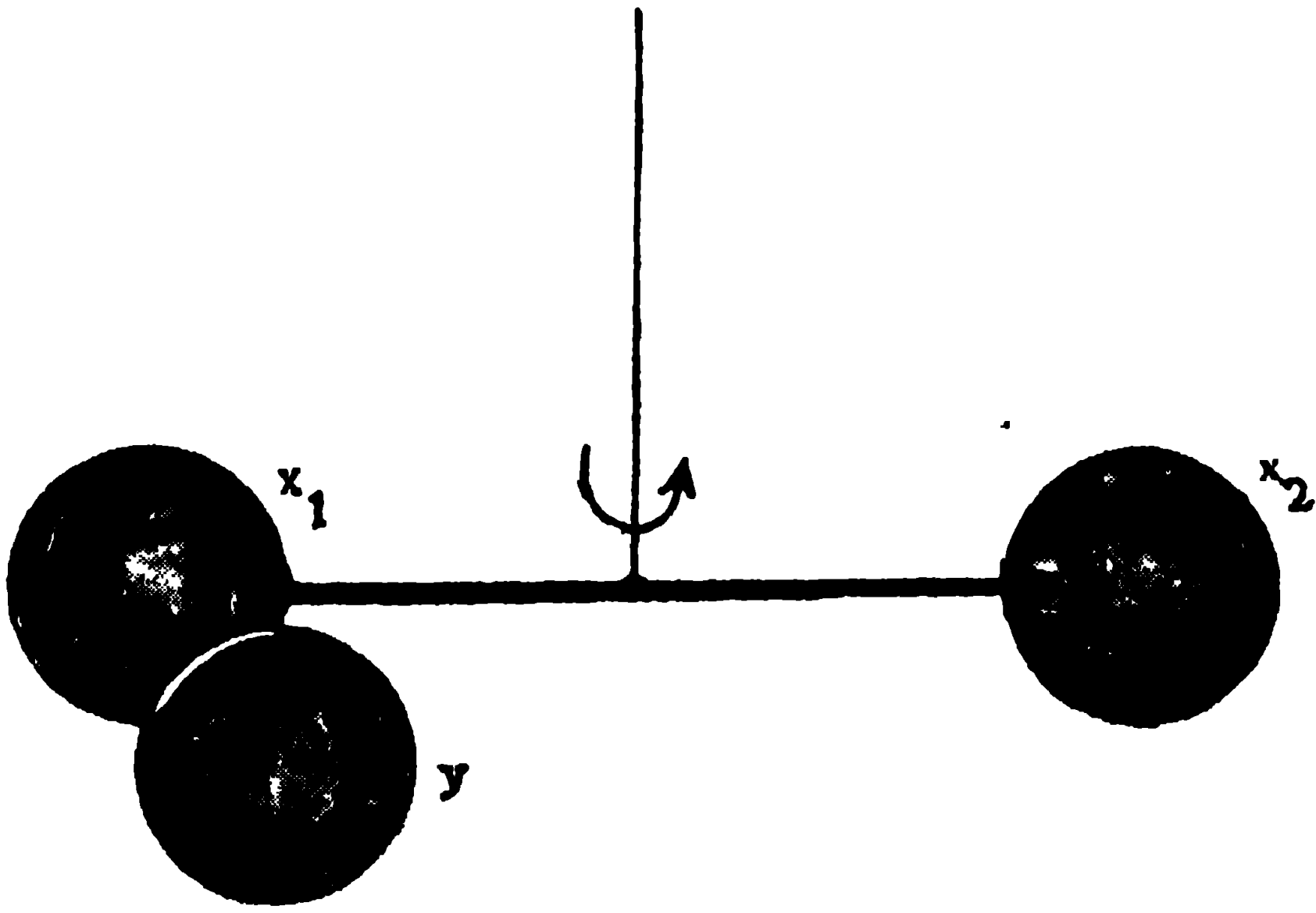
১ নং চিত্র
মহাকর্ষ-শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে হেনরী ক্যাভেণ্ডিসের পরীক্ষা।

নিয়মিত জ্যামিতিক আকারসম্পন্ন বস্তুর অভিকর্ষ-কেন্দ্র সব সময় তার জ্যামিতিক কেন্দ্রে অবস্থিত হবে। যেমন, বৃত্তের অভিকর্ষ-কেন্দ্র তার কেন্দ্রে, ত্রিভুজের অভিকর্ষ-কেন্দ্র তার মধ্যমাগুলির ছেদবিন্দুতে, চতুর্ভুজের অভিকর্ষ-কেন্দ্র তার কর্ণ-দ্বয়ের ছেদবিন্দুতে। কিন্তু অনিয়মিত আকারের বস্তুকে যেহেতু জ্যামিতিক মাত্রা (Geometric Dimension) দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, সেহেতু তার অভিকর্ষ-কেন্দ্রও জ্যামিতিক ছকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে কি ভাবে একটি অনিয়মিত আকারের বস্তুর অভিকর্ষ-কেন্দ্রের অবস্থান বর্ণনা করা যায়? অনিয়মিত আকারের বস্তুর অভিকর্ষ-কেন্দ্র এমন একটি বিন্দুতেই হবে, যার মধ্য দিয়ে যে

কোন একটি সমতল কল্পনা করলে সেই সমতলটি বস্তুটিকে দুটি সমান ভরের বস্তুখণ্ডে বিভক্ত করে দেবে। অর্থাৎ একটি বস্তুর অভিকর্ষ-কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যদি যে কোন দিক থেকে বস্তুটিকে ছুরি দিয়ে কেটে ফেলা যায়, তবে দুটি সমান ওজনের টুক্‌রা পাওয়া যাবে। এই তথ্য শুধু অনিয়মিত আকারের বস্তুর ক্ষেত্রেই নয়, নিয়মিত জ্যামিতিক আকারের বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আমরা ভার বলতে পদার্থের যে ধর্মকে বুঝি, তা আসলে পদার্থ এবং পৃথিবীর মধ্যে ক্রিয়াশীল মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি। পৃথিবী প্রত্যেক পদার্থকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং এই জন্যে আমরা পদার্থের ভার অনুভব করি। একই জিনিষের ভার এই কারণে বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন হতে পারে, যেহেতু সব গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি সমান নয়। কারো ওজন যদি পৃথিবীতে ১২০ পাউণ্ড হয়, তবে চাঁদে তার ওজন হবে ২০ পাউণ্ড। চাঁদে গেলে যে কেউ একটি ২৫ ফুট উঁচু দেয়াল অনায়াসে লাফিয়ে পার হতে পারবেন। কারণ চাঁদের ভর পৃথিবীর চেয়ে কম—প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। এজন্যে চাঁদের আকর্ষণ, একই জিনিষের উপর পৃথিবীর আকর্ষণের এক-ষষ্ঠাংশ। কেন না, আমরা নিউটনের সূত্র থেকে একটু আগেই জানতে পেরেছি যে, যে কোন দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষ তাদের ভরের সমানুপাতিক। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি আছে বলেই লাফ দিলে আবার আমরা পৃথিবীতেই ফিরে আসি। মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি না থাকলে মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে তীব্র গতিতে (সেকেণ্ডে প্রায় ১৮ মাইল) ধাবমান এই পৃথিবী থেকে আমরা কে কোথায় ছিট্‌কে পড়তাম তার ঠিক নেই।

একটা কথা হয়তো আপনাদের মনে হতে পারে যে, মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ একই কথার দুটি ভিন্ন প্রতিশব্দ কি না? না—মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বের যে কোন দুই বা ততোধিক বস্তুর পারস্পরিক আকর্ষণকে মহাকর্ষ বলা হয়ে থাকে। কিন্তু অভিকর্ষ বলতে পৃথিবীর সঙ্গে পৃথিবী-পৃষ্ঠে কোন বস্তুর আকর্ষণকেই বুঝতে হবে। মহাকর্ষ আর অভিকর্ষের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য নেই। মহাকর্ষ কেবল অভিকর্ষ কথাটির চেয়ে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়, এইমাত্র।

মহাকর্ষ হচ্ছে শক্তির একটি বিশেষ রূপ। চৌম্বক শক্তি, আলোক-শক্তি, তাপ-শক্তির মত মহাকর্ষ-শক্তিও বলা যেতে পারে। তাই যে কোনও শক্তির মত মহাকর্ষ-শক্তিও বস্তুর বেগের পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম; অর্থাৎ মহাকর্ষ-শক্তির অধীনে স্বাধীন গতিসম্পন্ন কোন বস্তুর বেগ ত্বরান্বিত বা মন্দীভূত হবে। বস্তুর গতি যদি মহাকর্ষের অনুকূলে হয়, তবে তার গতিবেগ একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর বস্তুর গতি মহাকর্ষের প্রতিকূলে হলে, তা ঐ একই হারে (মহাকর্ষের অনুকূলে গতিবেগ হলে যে হারে বেগ বৃদ্ধি পায়) মন্দীভূত হবে। বেগ পরিবর্তনের এই হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে। পৃথিবীর উপর যখন কোন বস্তু পড়তে থাকে, তখন তা এই ত্বরণের সম্মুখীন হয়। অবশ্যই এই সময়ে পৃথিবীরও বস্তুটির দিকে ত্বরণ হয়, কিন্তু পৃথিবীর ভর সাধারণ বস্তুগুলির ভরের তুলনায় এতই বেশী যে, এই সামান্য আকর্ষণে পৃথিবী প্রায় নড়ে না বললেই চলে। এজন্যে অভিকর্ষজ বলের দ্বারা শুধুমাত্র পৃথিবীর দিকে পড়ন্ত বস্তুটিই ত্বরান্বিত হয়েছে বলে আমরা ধরে নেব।

নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে আমরা পাই, m ভরের একটি বস্তুর উপর p বল ক্রিয়া করলে, উৎপন্ন ত্বরণ যদি f হয়, তবে $p = m.f$ অথবা, $f = \frac{p}{m}$ হবে।

অতএব, অভিকর্ষজ ত্বরণ,

$$g = \frac{F}{M} = \frac{G.M.m}{m.d^2} = \frac{G.M}{d^2}$$

(M = পৃথিবীর ভর, m = পড়ন্ত বস্তুর ভর, f =

ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ-বল এবং d—বস্তুটির ভারকেন্দ্র থেকে পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের দুরত্ব। উপরিউক্ত সূত্র থেকে আমরা একটা খুব প্রয়োজনীয় কথা জানতে পারলাম যে, গ্রহ-নক্ষত্রের উপর পড়ন্ত বা উর্ধ্বগামী বস্তুর ভরের উপর অভিকর্ষের ত্বরণের মান নির্ভর করে না; অর্থাৎ একটি ১০ পাউণ্ড ভরের বস্তু যে ত্বরণে পৃথিবীর উপর পড়বে, একটি ২০ পাউণ্ড ভরের বস্তুও সেই একই ত্বরণে পড়বে। একই উচ্চতা থেকে দুটি বিভিন্ন ভরের বস্তু পড়তে থাকলে উভয়ে একই সঙ্গে ভূমি স্পর্শ করবে। পাঠক হয়তো একথার প্রতিবাদ করে বলবেন যে, তাহলে একটা কাগজ আর একটা ঢিল ছাদ থেকে ফেললে ঢিলটা কেন আগে পড়ে? এর কারণ বায়ু কাগজের গতিরোধ করছে; ঢিলেরও যে গতিরোধ করে নি, তা নয়। তবে ঢিলের ঘনত্ব কাগজের ঘনত্বের চেয়ে বেশী, তাই বাধা অতিক্রম করবার ক্ষমতাও তার বেশী। এই তথ্য প্রমাণিত করবার জন্যেই নিউটন গিনি ও পালকের বিখ্যাত পরীক্ষাটি করেন। একটা লম্বা কাচের নলের মধ্যে একটি গিনি ও একটি পালক ভরে নলটি তিনি যথাসম্ভব বায়ুশূন্য করেছিলেন। এবার পালক ও গিনি সমেত বায়ুশূন্য নলটি তাড়াতাড়ি উল্টে দিলেন এবং দেখতে পেলেন যে, পালক আর গিনি একই সঙ্গে নলটির অপর প্রান্তে পৌঁছলো। এথেকে প্রমাণিত হল যে, অভিকর্ষজ ত্বরণ সব বস্তুর উপরেই সমান। পৃথিবীতে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান 'প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে ৩২ ফুট' (32 ft/Sec²); অর্থাৎ কোন বস্তু স্থির অবস্থা থেকে পৃথিবীতে পড়তে থাকলে পতনের মুহূর্ত থেকে এক সেকেণ্ড পরে বস্তুটির বেগ হবে ৩২ ফুট; দুই সেকেণ্ড পরে বেগ হবে ৬৪ ফুট, তিন সেকেণ্ড পরে বেগ হবে ৯৬ ফুট। এভাবে বেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না বস্তুটি ভূমি স্পর্শ করে। এতক্ষণ আমরা মহাকর্ষের ধর্ম বা আচরণ সম্বন্ধেই আলোচনা করেছি। এর স্বরূপ কি, কি থেকে মহাকর্ষ-শক্তির উদ্ভব হয়, সে কথা বলা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে, এ-সম্বন্ধে বলবার খুব কমই আছে। কেন না, মহাকর্ষ কি, সে তথ্য এখনও মানুষের অজানা। এই সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, ভর বা আয়তনের মত মহাকর্ষও পদার্থের একটি ধর্ম। পদার্থের ভর কেন থাকে, এই প্রশ্নের যেমন কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না, তেমনি পদার্থের কেন মহাকর্ষ থাকে, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও অন্ততঃ এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। তবে দুটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ-শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে।

নিউটন মহাকর্ষের সূত্র আবিষ্কার করলেও মহাকর্ষ কি ভাবে হয়, সে সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, তার অধিকাংশই কল্পনাপ্রসূত। বিশ্বের প্রতিটি স্থানে বিরাজমান মহাকর্ষ-শক্তির একটি মাধ্যমকে তিনি কল্পনা করেন। তিনি বলেন যে, দুটি বস্তুর মধ্যে যখন মহাকর্ষ-শক্তি ক্রিয়া করে, তখন বস্তু দুটির মধ্যবর্তী স্থানে ঐ মাধ্যমটিতে এক নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় এবং বস্তু দুটি তখন পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলে।

১৭৪৭ সালে লী-সেজ নামে একজন বৈজ্ঞানিক এ-সম্বন্ধে আর একটি মতবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতবাদে বলা হয়েছে যে, মহাশূন্যের প্রতি স্থানে সর্বদিক থেকে অসংখ্য কণিকা অক্লান্ত গতিতে ছুটে চলেছে। তিনি পরমাণুর চেয়েও অতি ক্ষুদ্র এই কণিকাগুলির নাম দেন "আলট্রা-মানডেন-কণিকা" (Ultramundane Corpuscles)। এই কণিকাগুলি সবদিক থেকে সমানভাবে আঘাত করে বলেই কোন বস্তু স্থির থাকতে পারে। কিন্তু যখন দুটি বস্তু কাছাকাছি আসে, তখন বস্তু দুটি পরস্পরকে কিছু সংখ্যক কণিকার আঘাত থেকে বাঁচায়। ফলে বস্তু দুটির চতুর্দিকে সমান বল প্রযুক্ত হয় না এবং তারা তখন এগিয়ে চলে পরস্পরের দিকে।

কিন্তু এই সূত্র মেনে নেওয়ার কতকগুলি অসুবিধা

আছে। কণাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই তারা কোন বস্তুকে আঘাত করলে বস্তুটির আন্তরাণবিক ফাঁকের (Intermolecular Space) মধ্যে ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। দ্বিতীয়তঃ এত প্রচণ্ড বেগে কোন পদার্থকে কণিকাগুলি আঘাত করলে পদার্থটির অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠবার কথা। এসব অসুবিধার ফলে এই মতবাদ অচিরেই বাতিল হয়ে যায়।

ম্যাক্সওয়েল অঙ্কের সাহায্যে দেখাতে সক্ষম হন যে, যদি ইথারের মত কোনও একটি মাধ্যমে কোন বলরেখার বরাবর চাপ (Pressure) প্রয়োগ করা হয় এবং ঐ রেখার লম্বভাবে টানের (Tension) প্রয়োগ করা হয়, তবে মহাকর্ষ-শক্তির মত এক রকম বলের উদ্ভব হয়। কিন্তু এসব তথ্যের কোনটা থেকেই মহাকর্ষ-শক্তির কারণ স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা যায় না। মহাকর্ষ-শক্তির আচরণ খুবই জটিল এবং এ-সম্বন্ধে মানুষ জেনেছেও অতি সামান্য। যে দিন মানুষ মহাকর্ষ-শক্তির স্বরূপ জানতে পারবে, সে দিন হয়তো বিশ্বজগৎ তার সামনে এমন এক নতুন রূপে দেখা দেবে, যার সঙ্গে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে মানুষের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর কোনই মিল নেই।

A x y B
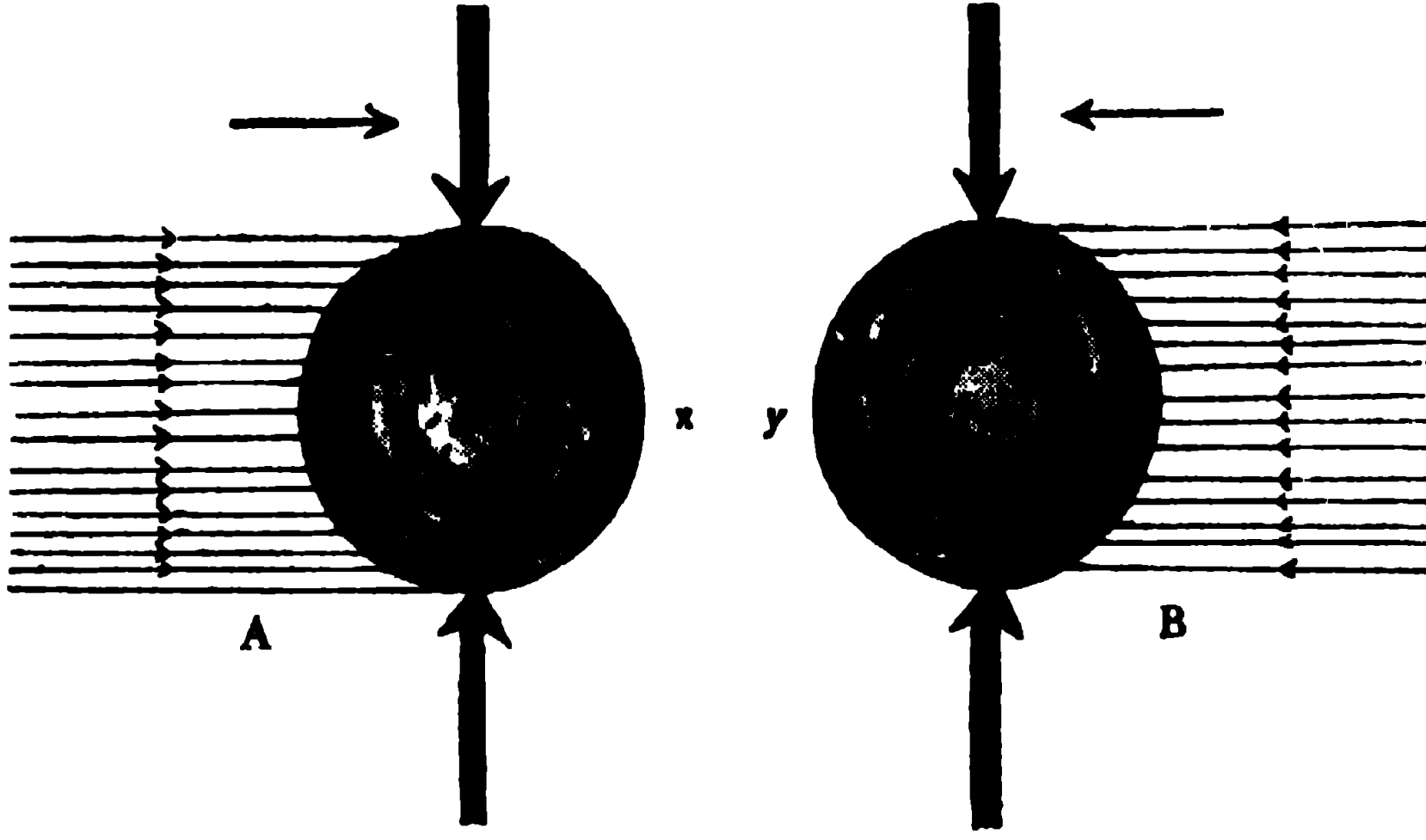
মহাকর্ষ সম্বন্ধে লী-সেজের আলট্রা-মানডেন কণিকাতত্ত্ব। x ও y দুটি বস্তু। এরা যখন মহাশূন্যে মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় তখন চারদিক থেকে সমানভাবে এদের উপর কণিকাগুলি এসে আঘাত করতে থাকে। কিন্তু বস্তুগুলি যখন কাছাকাছি আসে, তখন x-এর গায়ে A-র বিপরীত-মুখী কণিকাগুলিকে আঘাত করতে y বাধা দেয় এবং y-এর ক্ষেত্রেও ঘটে তাই। ফলে বস্তু দুটি পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

প্লাষ্টিক উদ্ভাবনের শতবার্ষিকী

ক ১০০ বৎসর পূর্বে লণ্ডনের একটি আন্ত-র্জাতিক প্রদর্শনীতে আলেকজেণ্ডার পার্কস্ একটি নূতন পদার্থের কথা প্রকাশ করেন। এই পদার্থটির নাম 'পার্কসাইন', যাহা প্লাষ্টিক নামে সম্পূর্ণ এক নূতন শিল্পের জন্মদান করে।

এই শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বার্মিংহাম ১৪ দিনের জন্য একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করিতেছে। আধুনিক প্লাষ্টিক কি ভাবে উৎপন্ন হইতেছে এবং কি ভাবে তাহা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইতেছে, প্রদর্শনীতে তাহা দেখানো হইবে।

বৃটেনের প্রাত্যহিক জীবনে প্লাষ্টিকের ব্যবহার কি পর্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে, তাহা একটি মাত্র দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে—বৃটেনে প্রত্যহ ২০,০০০,০০০ পলিথিন ব্যাগ প্রস্তুত করা হইতেছে।

প্রদর্শনীতে প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠান তাহাদের বিভিন্ন রকমের প্লাষ্টিকের দ্রব্য প্রদর্শন করিবে। বৃটেন জনপ্রতি ২১০১ পাউণ্ডেরও অধিক প্লাষ্টিক উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং তাহার মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ রপ্তানী হইয়া থাকে।

আফ্রিকার ঘোড়ার মারাত্মক রোগের টিকা

উত্তরপ্রদেশের ইজ্জৎনগরে ভারতীয় পশু-চিকিৎসা গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি ঘোড়াকে 'আফ্রি-কান্ হর্স সিক্‌নেস' নামক রোগের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য অত্যন্ত ফলপ্রদ একপ্রকার টিকা আবিষ্কার করিয়াছেন।

মাত্র বৎসর দুই পূর্বে অকস্মাৎ আমাদের দেশে ঘোড়ার মধ্যে এই রোগ হইতে দেখা যায় ও অল্প-দিনের মধ্যে বহুসংখ্যক ঘোড়া এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগ অশ্বেতর প্রাণী—গাধা ও খচ্চরদেরও সহজে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ এই রোগ একপ্রকার রক্তচোষা পোকার দ্বারাই ঘোড়ার দেহে সংক্রামিত হয় এবং একজাতের মশাও রোগবাহীর কাজ করে। একবার আক্রান্ত হইলে পশুর প্রাণহানি অবশ্যম্ভাবী। পশু-চিকিৎসাশাস্ত্রে আজ পর্যন্ত এই রোগের কোনও চিকিৎসার কথা লেখা হয় নাই—কেবলমাত্র টিকাই এর একমাত্র প্রতিষেধক। টিকাই পশুকে এই রোগ হইতে বাঁচাইতে পারে। যদিও টিকা দেওয়ার উপযুক্ত সময় চৈত্র-বৈশাখ মাস—তবু বৎসরের যে কোনও সময়ে প্রয়োজনবোধে টিকা দেওয়া যাইতে পারে। টিকা লইবার তিন মাস পরে পশুর দেহে এই শক্তিশালী প্রতিষেধকের কাজ আরম্ভ হয়। প্রত্যেক রাজ্যের পশুচিকিৎসা বিভাগ বিনামূল্যে এই টিকা দিয়া থাকেন।

ঘোড়ার মালিকদের অবগতির জন্য জানানো হয় যে, এই রোগ হইতে রেহাই পাইতে হইলে আস্তাবল আর তার আশেপাশের অঞ্চল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। যে সকল স্থানে এই রোগ আগে হইতে দেখা গিয়াছিল, সেখানকার পশুদের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিশেষতঃ সন্ধ্যার দিকে পশুর গায়ের উত্তাপ লইয়া দেখা উচিত, জ্বর বাড়ে কি না—কারণ রোগের ইহাই প্রধান লক্ষণ। এইরূপ হইলে রুগ্ন পশুদের যত শীঘ্র সম্ভব আলাদা করিয়া ফেলা উচিত এবং নিকটস্থ পশু-চিকিৎসককে খবর দেওয়া উচিত।

ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট

ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটি নূতন শক্তিশালী সার। ভারতের কৃষকেরা এই নাইট্রোজেনঘটিত সারের গুণাগুণ সম্পর্কে সচেতন হইলেও কৃষকদের মধ্যে এই সারের আরও বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশের চাষীরা নাইট্রোজেনঘটিত সার হিসাবে শুধু অ্যামোনিয়াম সালফেট সারই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে উৎপাদিত ক্যালসিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সার সকল রাজ্যের কৃষকেরা যাহাতে প্রচুর পরিমাণে পান, তার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে।

এই নূতন সার 'সি. এ. এন' নামে অধিক পরিচিত। ইহাতে অ্যামোনিয়াম সালফেট সারের মত শতকরা ২০ ভাগ নাইট্রোজেন আছে। সি. এ. এন. যে কোনও নাইট্রোজেনঘটিত সারের অনুরূপ বা তাহা অপেক্ষাও ভাল। প্রায় সকল রকম শস্যের জন্যই এই সার ব্যবহার করা চলে এবং প্রায় সমস্ত রকম জমিতে দেওয়া চলে। এই সার দুই রকমভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে—চাষের জমি তৈয়ারীর সময় অথবা চারা বড় হওয়ার সময়।

কোন কোন দিক দিয়া এই সার অ্যামোনিয়াম সালফেট সার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রধানতঃ নাইট্রোজেনঘটিত সার হইলেও ইহাতে নাইট্রোজেন ছাড়াও ক্যালসিয়াম বা চুন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই কারণে টকো জমিতে (যাহাতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী) এই সার অত্যন্ত উপযোগী। এই সারে চুন থাকায় জমির অম্লত্ব নষ্ট করে। তাহা ছাড়া যে সকল জমিতে সালফাইড থাকিবার ফলে ধানের চারাগাছ কালো হইয়া যায়, সেখানে অ্যামোনিয়াম সালফেট দেওয়া চলে না। কিন্তু সি. এ. এন. দেওয়া যাইতে পারে। সময়মত এবং ঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করা উচিত।

জমির স্বাভাবিক উর্বরতা এবং কোন্ ফসল কখন তোলা হইবে, তাহার উপরই কতটা সার দেওয়া উচিত, তাহা নির্ভর করে। কৃষকেরা এই বিষয়ে আনুসঙ্গিক তথ্যাদি তাঁহাদের নিজ নিজ অঞ্চলের কৃষি-কর্মচারী বা গ্রাম-সেবকদের নিকট হইতে পাইতে পারেন।

গোয়ার খইল

গোয়ার (Guar) বীজ এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশে গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং এই বীজ হইতে গঁদ বাহির করিয়া লইবার এক নূতন শিল্প ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। বিদেশে এই গঁদ রপ্তানী করিয়া আমাদের দেশ এখন বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিতে সক্ষম হইতেছে। গোয়ার বীজ হইতে গঁদ বাহির করিয়া লইবার পর যে খইল অবশিষ্ট থাকে, তাহাও পশুখাদ্য হিসাবে খুবই ভাল এবং দামেও কম।

গোয়ার খইলে প্রোটিনের পরিমাণ খুব বেশী। সেই জন্য শর্করা জাতীয় খাদ্যের সহিত মিশাইয়া এই খইল ব্যবহার করা উচিত। বর্তমানে আমাদের দেশে বৎসরে ১১,৫০০০ টন গোয়ার খইল উৎপন্ন হয়। খাদ্য হিসাবে গোয়ার খইল যদিও গোয়ার বীজের ন্যায় অত সহজে হজম হয় না, তথাপি গবাদিপশুর খাদ্য হিসাবে সহজেই এই খইল ব্যবহার করা যাইতে পারে।

গোয়ার গঁদ প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানীর জন্য প্রস্তুত করা হয়। জাতির এই সঙ্কটে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী। কৃষকেরা যদি এখন গবাদিপশুর খাদ্যে গোয়ার বীজের পরিবর্তে গোয়ার খইল ব্যবহার করেন, তবে দেশের এই বিপদকালে তাঁহারা যথার্থই মাতৃভূমির ডাকে সহায়তা করিবেন।

আখের 'কাটিং' হইতে ভাল চারা উৎপাদন

আখের 'কাটিং' কাটিবার পর খুব শীঘ্র জমিতে লাগাইয়া দেওয়া উচিত ; কিন্তু কোন কারণে দেরী হইলে চারা জন্মাইতে দেরী হয় এবং ঐ 'কাটিং' শুকাইয়া যায়। তবে ঐ শুষ্ক 'কাটিং' যদি জলে ভিজাইয়া লইয়া জমিতে রোপন করা হয়, তবে তাহা হইতে সদ্য-কাটা 'কাটিং'-এর অপেক্ষাও ভাল চারা হয়। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ-এর "ভারতীয় আখ গবেষণা-কেন্দ্রের" বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, শুষ্ক কাটিং

দুই চার ঘন্টা জলে ভিজাইয়া রাখিলে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যায়।

আখগাছ হইতে 'কাটিং' কাটিয়া নেওয়া আর জমিতে ঐ 'কাটিং' রোপন করিবার মধ্যে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়া গেলে শুধু যে চারাগাছ জন্মাইতে দেরী হয় তাহাই নহে, উৎপাদনের হারও কমিয়া যায়। কিন্তু ঐ 'কাটিং' জলে ভিজাইয়া নিলে অতিদ্রুত চারা জন্মায় আর ফলনের প্রাচুর্যও কিছুমাত্র কমে না।

বারাউনী তৈল শোধনাগার

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও বিহারের বারাউনীতে স্থাপিত তৈল শোধনাগারের প্রথম ১০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষম ইউনিটটিকে আগামী সেপ্টেম্বরে চালু করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

দ্বিতীয় দশ লক্ষ টনের ইউনিটটি এই বৎসরের শেষে কিম্বা ১৯৬৪ সালের প্রারম্ভে চালু করা যাইবে। ভারতীয় তৈল শোধনাগার লিমিটেডের চতুর্থ বার্ষিক (১৯৬১-৬২) রিপোর্টে উপরিউক্ত মর্মে বলা হইয়াছে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য অনুযায়ী তৃতীয় পর্যায়ের নির্মাণ-কার্য, অর্থাৎ টিউব উৎপাদনের ব্যবস্থা ১৯৬৪ সালে সম্পূর্ণ হইবে।

নুনমাটি পর্যন্ত অপরিশোধিত তৈলবাহী পাইপ লাইন স্থাপনে বিলম্ব হইবার ফলে রেলযোগে নুনমাটি পর্যন্ত তৈল সরবরাহের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পাইপযোগে অপরিশোধিত তৈল সরবরাহ আরম্ভ হইয়াছে। পরে কেরোসিন তৈল শোধন আরম্ভ হইয়াছে।

ভারতীয় তৈল কোম্পানী বিভিন্ন শোধনাগারের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন উপজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন।

২৭০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে উদ্ভিদ-জীবনের আবির্ভাব

পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের যে ধারণা, তাথেকে এক-শ' কোটি বছর পূর্বে অর্থাৎ ২৭০ কোটি বছর আগে প্রথম উদ্ভিদ-জীবনের আবির্ভাব হয়েছিল—ওয়াশিংটনের কার্ণেগী ইনস্টিটিউশনের ডাঃ টি. সি. হোরিং-এর রিপোর্ট থেকে তা জানা গেছে। জলাশয়ে আজ শ্যাওলার আকারে এককোষী 'অ্যালগী' নামে যে উদ্ভিদ দেখা যায়, সেইগুলিই হচ্ছে ঐ আদিম কালের উদ্ভিদের নিদর্শন। আদিমযুগের ঐ উদ্ভিদে যে রাসায়নিক গুণাগুণ ছিল, তারই অবশিষ্ট অ্যালগীর মধ্যে রয়েছে।

কার্ণেগী ইনস্টিটিউশনের ষষ্ঠীতম বার্ষিক বিবরণীতে এসব তথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪৫০ কোটি বছরের কাছাকাছি।

আলোর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। এক বছরে এই গতিতে আলো যে পথ অতিক্রম করে—তাকেই বলা হয় আলোকবর্ষ বা লাইট ইয়ার। এই ব্রহ্মাণ্ডে সর্বাধিক দূরে যে সব নক্ষত্র চোখে পড়ে, তারা রয়েছে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ছায়াপথে রয়েছে সূর্য ও দশ হাজার কোটি অন্যান্য নক্ষত্র। এদের জন্ম হয়েছিল প্রায় এক হাজার কোটি বছর আগে।

ধাতু এবং অন্যান্য ভারী উপকরণ এই পৃথিবীতে সূর্য থেকে এসেছে।

এছাড়া পৃথিবীস্থিত রেডার এবং রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে শুক্রগ্রহে আবহাওয়ার তাপমাত্রার পরিবর্তনে যে পরিবর্তন ঘটে, নতুন করে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে বলে জানা যায়।

পুস্তক পরিচয়

অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন

ক্যাথেরীন ওয়েনস্ ফেয়ার রচিত। অনুবাদ—রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী; ৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯; মূল্য ২৲ টাকা।

মূল ইংরেজী ভাষার বইখানি একজন আমেরিকান কর্তৃক রচিত। গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু মৌলিক ও যুগান্তকারী আবিষ্কারের জনয়িতা আইনষ্টাইনের জীবনযাত্রা কোন দেশ বা কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। তাই জুরিখ থেকে প্রিন্সটন পর্যন্ত আইনষ্টাইনের কর্মধারায় যে যুগপুরুষের জীবনবেদের পরিচয় পাওয়া যায়—বইখানিতে তার অনবদ্য বর্ণনা পাওয়া যাবে। মনে হয় বইখানি পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বছর ধরে পাঠকও আইনষ্টাইনের সঙ্গী হয়ে আছেন। আইনষ্টাইনের উপর হিটলারী দৌরাত্ম্য আমেরিকান দৃষ্টিভঙ্গীতে একটু বেশী প্রকট হয়েছে, কিন্তু সেই সত্যটুকু আইনষ্টাইনের মহিমাকে যে উজ্জ্বলতর করে তুলেছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শান্তিবাদী আইনষ্টাইন তাঁর চিরসঙ্গী গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও বেহালা দিয়ে যুদ্ধোন্মত্ততার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম নীরবে করে গেছেন, তাতে শান্তিরই জয় সূচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে আইনষ্টাইনের এই জীবনকথা বিশ্বের ইতিহাসের অংশ বলে মনে হয়। বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক আচরণ প্রসঙ্গক্রমে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনষ্টাইনের সাক্ষাৎ ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ভূমিকা থেকে আইনষ্টাইনের ভারতপ্রীতি আমাদের মুগ্ধ করে।

কিশোরদের জন্যে লেখা হলেও বড়রা এই বই পড়ে মুগ্ধ হবেন। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বইখানি পড়ে মনে হবে, একটি জীবনী যেন নাটকের মত উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকের নায়ক আইনষ্টাইন ও আর একটি অনবদ্য চরিত্র এ্যাল্সা, তাঁর সহধর্মিণী—যিনি প্রতি পদক্ষেপে এই আত্মভোলা বিজ্ঞানীকে সাংসারিক ও সামাজিক সমস্ত দুশ্চিন্তার হাত থেকে সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন।

ইংরেজী থেকে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ মূলতঃ এই বইখানির উপযোগিতা বাঙালী পাঠকের কাছে বাড়িয়ে দিয়েছে, যদিও মাঝে মাঝে আক্ষরিক অনুবাদে সাবলীলতা একটু ব্যাহত হয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য বাংলায় এখনও প্রচুর নয়—বিশেষতঃ জীবনী বা প্রবন্ধ। অনুবাদক সেই সাহিত্যের সঙ্গে এই নতুন সংযোজন ঘটিয়ে পাঠকের ধন্যবাদার্হ হবেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সুন্দর ভূমিকা বইখানির মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি করেছে।

ছাপার ভুল স্থানে স্থানে চোখে পড়ে। প্রকাশকের এদিকে সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর। দামের অনুপাতে এই পরিচ্ছন্ন ও প্রয়োজনীয় বইটি শুধু কিশোরদের কাছেই নয়, বড়দের কাছেও প্রিয় হবে সন্দেহ নেই।

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মার্চ—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা

'জিরো-গ্র্যাভিটি' জুতা—ভবিষ্যৎ মহাকাশযানে যাঁরা ভ্রমণ করবেন, তাঁদের জন্যে ডেনভারের (কলোরেডো) মার্টিন কোম্পানীর সেক্রেটারী ন্যান্সি ওয়েগুলার একরকম অদ্ভুত জুতা উদ্ভাবন করেছেন। ভারশূন্যতার জন্যে মহাকাশযানের মধ্যে কোন একস্থানে স্থিরভাবে থাকবার উপায় থাকে না। এই জুতা পরিধান করে যাত্রীরা মহাকাশযানের মধ্যে যে কোন স্থানে স্থিরভাবে থাকতে পারবে। ছবিতে ওয়েগুলারকে 'জিরো-গ্র্যাভিটি' জুতা পরিধান করে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে সিলিং-এর উপর হাঁটতে দেখা যাচ্ছে।

আলেকজান্দ্রিয়া ও ইউক্লিড

খৃষ্টের জন্মের দু'শো বছর আগে পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সুকুমার সাহিত্য, শিল্পচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহর। খৃষ্টপূর্ব ৩৩২ শতকে দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার এই শহরের পত্তন করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এর পরিধি বিস্তৃত হলো। বিভিন্ন জাতির বাসভূমি হয়ে উঠলো এই শহর। মিশরীয়, গ্রীক ও ইহুদীগণের আধিপত্য ছিল যথেষ্ট। এর বন্দর ছিল বিরাট এবং স্থানীয় সওদাগরেরা বহু দূরবর্তী দেশের সঙ্গে, যেমন—সুদূর নরওয়ে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া তখন জ্ঞানচর্চার নালন্দা। আকর্ষণীয় ছিল এর যাদুঘর এবং গ্রন্থাগার। খৃষ্টপূর্ব ৩২৩ সালে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর সেনাপতিরা তাঁর সাম্রাজ্যকে নানা ভাগে বিভক্ত করেন।

সেনাপতিদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন টলেমি। তিনি প্রথম টমেমি বা টলেমি সটার নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ৩৬৭ থেকে খৃঃ পূঃ ২৮৩ সাল পর্যন্ত তিনি বেঁচেছিলেন এবং তিনি মিশরের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সত্রাপ বা শাসনকর্তা (গভর্ণর) নিযুক্ত হয়েছিলেন। খৃঃ পূঃ ৩০৫ সালে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণ করেন এবং টলেমি সাম্রাজ্য প্রায় তিন-শ' বছর ধরে চলে।

আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে বিখ্যাত করে তোলবার জন্যে যদি একটি লোকের নাম করতে হয়—তবে তিনি হলেন টলেমি। তাঁরই প্রচেষ্টায় যাদুঘর ও গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এই যাদুঘর কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। সভ্য পৃথিবীর সমস্ত অংশ থেকে দলে দলে ছাত্র এখানে জ্ঞানলাভের আশায় আসতেন।

বড় বড় বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞানের ছাত্রেরা গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও কলাশাস্ত্রের শিক্ষকেরা আকৃষ্ট হয়ে সম্মিলিত হয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিজ্ঞানী এবং শিক্ষকেরা টলেমির রাজকোষ থেকে নিয়মিতভাবে অর্থ সাহায্য পেতেন এবং তার ফলে তাঁরা অনন্যমনা হয়ে জ্ঞানদান ও জ্ঞান আহরণের কাজে নিমগ্ন থাকতে পারতেন। তাঁরা নানাপ্রকার পুঁথি সংগ্রহ করতেন, লিপিবদ্ধ করতেন নানা-বিধ তথ্য আর তাঁদের গবেষণালব্ধ তত্ত্ব গ্রন্থাকারে প্রকাশ করতেন। গ্রন্থাগারটি ছিল একটি প্রকৃত জ্ঞানের ভাণ্ডার। এখানে প্রায় ৭৫০,০০০টি প্যাপিরাসের মোড়ক (Scroll) ছিল। বেশীর ভাগই ছিল গ্রীক ভাষায় লেখা; কারণ সে সময়ে বলতে গেলে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের আন্তর্জাতিক ভাষা ছিল 'গ্রীক'।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বে খ্যাতিমান চিন্তাশীল ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন—তাঁদের অন্যতম ছিলেন ইউক্লিড। এই বিখ্যাত

গণিতজ্ঞের গবেষণা প্রায় দু-হাজার বছর ধরে পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে এসেছে।

ইউক্লিডের জীবনকাহিনী আজ অতি অল্পই জানা যায়। তিনি ছিলেন গ্রীক—তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ইউক্লিডিস (Eukleides)। কিন্তু তাঁর জন্মতারিখ ও স্থান এবং তাঁর বাল্যজীবনের কাহিনী চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। জানা যায় যে, তিনি এথেন্স শহরে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। আলেকজান্দ্রিয়া শহরে যখন তিনি উপস্থিত হন, তখন তাঁর বয়স চল্লিশের বেশী। প্রথম টলেমির রাজত্বকালেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করেন এবং সম্ভবতঃ তিনিই এখানে 'ম্যাথেমেটিক্যাল স্কুল' স্থাপন করেন। বলা বাহুল্য বিজ্ঞানের জগতে তাঁর স্থান সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।

অসীম ধৈর্য ও সতর্কতার সঙ্গে তাঁকে প্রস্তুত করতে হয়েছে গণিতের পাঠ্য-পুস্তক, যা প্রায় দু-হাজার বছর ধরে জ্যামিতি অধ্যয়নের প্রথম সোপান রূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে। এমন কি, ইউক্লিডের সময়েও জ্যামিতি-শাস্ত্রে বড় বড় গবেষণা হয়েছে। ব্যাবিলন এবং মিশরীয় সাম্রাজ্যের পত্তনের প্রারম্ভ থেকেই জ্যামিতি চর্চার সূত্রপাত হয়।

জিওমেট্রি শব্দ দুটি গ্রীক শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে—জিও—পৃথিবী, মেট্রন—পরিমাপ। প্রথম অবস্থায় ভূপৃষ্ঠের জমির মাপজোক করবার কাজে এই বিদ্যার উদ্ভব ঘটে। প্রাচীন মিশরে কৃষিক্ষেত্রের এলাকা নির্দিষ্টকরণের জন্যে জ্যামিতির প্রয়োগ হতো। প্রতি বছর নীল নদের অববাহিকাস্থিত কৃষিক্ষেত্রগুলি বন্যায় ডুবে যেত। তার ফলে সমস্ত এলাকা জুড়ে জমা হতো হাজার হাজার টন কাদা ও সিল্ট—তার জন্যে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট সীমানা-চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে যেত। এই প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্নতত্ত্ব, জ্যামিতি, বিশেষভাবে কোণ, ক্ষেত্রফল ইত্যাদির পরিমাপন বিদ্যার অনুশীলন হতে লাগলো। কয়েক শতাব্দী ধরে জ্যামিতি শাস্ত্রে গবেষণালব্ধ ফল প্রচুর পরিমাণে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু ইউক্লিডের পূর্বে জ্যামিতি ছিল যেন কতকগুলি এলোমেলো সিদ্ধান্তের সঙ্কলন এবং জটিল গাণিতিক ধাঁধায় পূর্ণ। ইউক্লিড অশেষ পরিশ্রম করে এলোমেলো সিদ্ধান্তগুলিকে সুসংবদ্ধ করেন এবং ধাঁধার রহস্য সমাধান করেন। তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত ও উপপাদ্য সঙ্কলন করে তাদের যথাযথভাবে সাজান এবং যুক্তি-তর্কগুলিকে প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত করেন। এর সঙ্গে নিজের আবিষ্কৃত নানা উপপাদ্যও সংযোজিত হয়।

অপ্রয়োজনীয় এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল নয়, এমন তথ্য তিনি বিনাদ্বিধায় বর্জন করে অনেক পরিশ্রমের পর তৈরী করেছেন প্রাথমিক জ্যামিতির গ্রন্থ। এ-থেকেই বিজ্ঞানের একটি পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

ইউক্লিডের গ্রন্থের নানারূপ তথ্যের কতটা মৌলিক, তা আজ বলা শক্ত। আমরা

জানি যে, তিনি হিপোক্রেটিস, পিথাগোরাস, ইউডোক্সাস, Theaetetus প্রমুখ পূর্বসূরীদের নাম উল্লেখ করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

একথা সত্য, তিনিই প্রথম জ্যামিতিকে বিজ্ঞানসম্মত পন্থায় উপস্থিত করেন। তাঁর বড় কাজ—তেরোটি গ্রন্থ রচনা। আধুনিক গণিকতজ্ঞেরাও এগুলিকে 'মাষ্টারপিস্' বলে মনে করেন। এদের নাম Stoicheia। ইংরেজীতে বলা হয় 'এলিমেণ্টস অব জিওমেট্রি' বা শুধু 'এলিমেণ্টস্'। প্রতিটি গ্রন্থ পার্চমেণ্ট বা প্যাপিরাসের পৃথক বাণ্ডিল দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। প্রতিটিতে জ্যামিতির একাধিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম থেকে ষষ্ঠ খণ্ড পর্যন্ত প্লেন জিওমেট্রি নিয়ে লেখা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে আছে সমানুপাত। সপ্তম থেকে নবম খণ্ডে আছে অমূলদ রাশি, দশম থেকে ত্রয়োদশ খণ্ডে আছে কঠিন বস্তুর জ্যামিতি বা সলিড জিওমেট্রি।

ইউক্লিডের জ্যামিতি ইউরোপে পৌঁচেছিল অনেক পথ ঘুরে। দীর্ঘদিন ধরে আলেক-জান্দ্রিয়া পাশ্চাত্যে অত্যন্ত শক্তিশালী দেশ বলে গণ্য হতো, একথা আগেই বলা হয়েছে। বহুকাল ধরে এই শহর জ্ঞানচর্চার মধ্যমণিরূপে সম্মানিত হয়ে আসছিল। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা এই শহর দখল করে নেবার পর এর সৌভাগ্যসূর্য ক্রমে ক্রমে অস্তমিত হয়। আরবীয়েরা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল ইউক্লিডের 'এলিমেণ্টস্' পাশ্চাত্য জগতের দ্বারদেশে। তখন মধ্যযুগ চলছে পাশ্চাত্যে। আরবীয়েরা এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, কারণ তারাও ছিল গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দে 'এলিমেণ্টস্' গ্রন্থের বেশ কয়েকখানা আরবী অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়। ১১২০ সালে অ্যাথেলহার্ড নামে একজন ইংরেজ আরবী থেকে এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। পরে আরো কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৪৮২ সালে ভেনিসে এটি প্রকাশিত হয়। ১৫৭০ সালে সার হেন্‌রি বিলিংগ্লে ইংরেজী ভাষায় এক হাজার পৃষ্ঠায় 'এলিমেণ্টস্' গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, সম্ভবতঃ বাইবেল ছাড়া এই গ্রন্থটির মত এত জনপ্রিয় গ্রন্থ আর নেই। একমাত্র বাইবেল ছাড়া আর কোন পাঠ্যপুস্তক এত বেশী কপি বিক্রীত হয় নি। তাছাড়া প্রায় দু-হাজার বছর ধরে অপরিবর্তিত অবস্থায় আর কোন গ্রন্থও চালু থাকে নি। ইউরোপের মধ্যে গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য অগ্রসর দেশে এই গ্রন্থটির প্রথম দুটি খণ্ড খুবই চালু।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার পত্তন করেন—ইউক্লিড, নিউটন ও গ্যালিলিও। যেমনি ভাবে ধ্রুবীয় পদার্থবিদ্যা (Classical Physics) প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম থিয়োরী উদ্ভাবনের ফলে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়েছে, তেমনি ইউক্লিডের জ্যামিতিও আধুনিক চিন্তাবিদ্‌দের কাছে চ্যালেঞ্জ প্রাপ্ত হয়েছে।

ভূ-সংক্রান্ত গণনার কাজে (Terrestrial Calculation) ইউক্লিড কতকগুলি

কল্পনাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। তিনি তাদের বলেছেন 'স্বীকার্য'। ইউক্লিডের এই সব স্বীকার্য যে সব ক্ষেত্রে সত্য বা নিভুর্ল, সে সব ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি বা 'স্বীকার্য' সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যেখানে তা নিভুর্ল নয়, সেখানে কি হবে?

প্রাচীন এবং আধুনিক কালের একাধিক গণিতবিদ্ স্বীকার্যগুলিকে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে কার্ল ফিডারিশ গস্ বলেন যে, তা অসম্ভব। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ইউক্লিডের একটি উপপাদ্যে আছে—দুটি সমান্তরাল সরল রেখা কখনই একসঙ্গে মিলবে না। কিন্তু দেখা গেছে যে, ভূপৃষ্ঠে মধ্যরেখা (Meridian) নিরক্ষরেখার সঙ্গে ৯০° ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে, আবার উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুতে মিলে যায়। ইউক্লিডের জ্যামিতি সমতলে অবস্থিত ক্ষেত্র সম্বন্ধীয়। যেখানে একাধিক সমতল ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, সেখানে তাঁর জ্যামিতির গণনা মেলে নি।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে Saceheri, Bolyai Lobaschevsky, Riemann প্রমুখ গণিতজ্ঞেরা ইউক্লিড থেকে স্বতন্ত্র পর্যায়ের জ্যামিতির উদ্ভাবন করেন। তাঁদের পদ্ধতি অনুসারে স্বভাবতঃই ইউক্লিড থেকে পৃথক সিদ্ধান্তের হদিস মেলে। এই কারণেই উচ্চতর গণিতে ইউক্লিড ছাড়া আরো নানা ধরণের জ্যামিতির কথা জানতে পারা যায়। আধুনিক গবেষকেরা বলেন, Riemann, Lobachevsky এবং ইউক্লিডের জ্যামিতি বিভিন্ন হলেও এগুলি সবই এক বিস্তৃততর বা ব্যাপকতর (General) জ্যামিতির নানা ব্যাখ্যা মাত্র।

ইউক্লিডের গবেষণা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এই কারণেই যে, তাঁকে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। তখনকার দিনে লেখবার কাগজও ভাল ছিল না। আজকাল নিজেদের চাহিদা অনুযায়ী নানা ধরণের কাগজ প্রচুর পাওয়া যায়, কিন্তু আর্কিমিডিস, ইউক্লিডের সময়ে প্যাপিরাস আর পার্চমেণ্ট কাগজ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না। অঙ্কনের যন্ত্রপাতির লেশমাত্র ছিল না। ইউক্লিড এবং অন্যান্য প্রাচীন গণিতবিদেরা থালা-ভর্তি বালি বা মুখ-খোলা বাক্সে মিহি বালি ভর্তি করে তার উপরে সূচালো কাঠি দিয়ে জ্যামিতির 'অঙ্কন' করতেন। একবার আঁকা হয়ে গেলে হাত দিয়ে তা সমান করে ফের আবার অঙ্কনের কাজ চলতো। এমনি অসুবিধার মধ্যে তাঁদের চলতে হয়েছে আজীবন।

তাঁর নিজের সময়ে ইউক্লিড বিখ্যাত ছিলেন প্রধানতঃ শিক্ষক হিসাবে। বোধহয় তিনিই আলেকজান্দ্রিয়াতে 'ম্যাথেমেটিক্যাল স্কুল' স্থাপন করেন। তাঁর ছাত্রদের অন্যতম ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস। এমন কি, টলেমিও অনেক সময় ইউক্লিডের ছাত্র হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তবে তিনিও যে জ্যামিতি নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। প্রোক্লাস বলেন যে, টলেমি নাকি একদিন

ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তাঁর 'এলিমেণ্টস্' ছাড়া অন্য কোন সহজ উপায়ে জ্যামিতি শেখা যায় কি না। ইউক্লিড স্পষ্টভাবে এবং রসিকতা করে প্রত্যুত্তর দেন, "There is no royal road to geometry."

একথা সত্য যে, ইউক্লিডের খ্যাতি তাঁর 'Stoicheia' গ্রন্থের জন্মেই। তাহলেও আরো কতকগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'গোলকের জ্যামিতি' বা 'জিওমেট্রি অব স্ফিয়ার'। এটি প্রধানতঃ জ্যোতির্বিদদের জন্মেই লেখা।

সত্যরঞ্জন ভৌমিক

বজ্র ও বিদ্যুৎ

প্রকৃতির দুই বিশেষ রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। একটি তার শান্ত রূপ, অপরটি রুদ্র রূপ। বজ্র ও বিদ্যুৎ প্রকৃতির রুদ্র রূপেরই এক নিদর্শন।

প্রাচীনকালে অনেকে মনে করতেন, বজ্র ও বিদ্যুৎ বুঝি এক অতিপ্রাকৃত ব্যাপার। আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম যে, দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু নিধনের জন্মে অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করেছিলেন 'বজ্র'। প্রাচীনকালে রোমক এবং গ্রীকদের মধ্যেও অনেকটা এই ধারণা ছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, শত্রু নিধনের জন্মে দেবতারা বজ্র ও বিদ্যুৎকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেন। আজকের বিজ্ঞানের যুগে আমরা বজ্র ও বিদ্যুৎকে আর অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলে মনে করি না। কারণ বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা এদের প্রকৃত স্বরূপ জানতে পেরেছি।

বজ্র ও বিদ্যুৎকে যদি জানতে হয়, বুঝতে হয়, তাহলে পরমাণু সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানতে হবে। কারণ প্রকৃতির সব কিছুই ঐ অতি ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টির দ্বারা গঠিত। এখন দেখা যাক, পরমাণু জিনিষটা কেমন। এর চেহারা অনেকটা ছোটখাটো সৌরজগতের মত। প্রতিটি পরমাণুরই একটি কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস আছে। এই কেন্দ্রের চারদিকে ঘোরে কতকগুলি নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা বা ইলেকট্রন।

কেন্দ্রের চারদিকে নির্দিষ্ট গতিপথে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে। এই গতিপথকে বলে 'অরবিট' বা কক্ষপথ। সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে যেমন পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহগুলি ঘোরে, তেমনি পরমাণুজগতেও নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলি ঘোরে। পরমাণুবিশেষে কক্ষপথ বা অরবিটের সংখ্যাও কম-বেশী হয়। রূপা, তামা প্রভৃতি ধাতুর পরমাণুর মধ্যেকার শেষের কক্ষপথের কয়েকটি ইলেকট্রন পরমাণুর সঙ্গে খুব

আলগাভাবে সংলগ্ন থাকে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই ইলেকট্রনগুলি এক পরমাণু ছেড়ে অপর পরমাণুতে সহজেই চলে যেতে পারে।

সাধারণতঃ প্রতিটি পরমাণুতে যে পরিমাণ নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণা থাকে, ঠিক ততগুলিই পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণা থাকে। পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণা থাকে পরমাণুর কেন্দ্রস্থল —নিউক্লিয়াসে। যদি কোন পদার্থের পরমাণুগুলির ইলেকট্রনের সংখ্যা কম বা বেশী হয়, তবে আমরা বলি পদার্থটি বিদ্যুতাবিষ্ট। ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশী হলে নেগেটিভ, আর কম হলে পদার্থটি পজিটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট হয়ে পড়ে। যদি কোন নেগেটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট বস্তু পজিটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট বস্তুকে স্পর্শ করে, তাহলে প্রথম বস্তু থেকে অতিরিক্ত ইলেকট্রনগুলি দ্বিতীয় বস্তুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে উভয় বস্তুর মধ্যেকার ইলেকট্রনের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। এই ইলেকট্রন-প্রবাহকেই আমরা বলি বিদ্যুৎ প্রবাহ। ইলেকট্রনগুলিকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু এই বিদ্যুতাবিষ্ট কণিকাগুলি যখন বাতাসের মধ্য দিয়ে এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে প্রবাহিত হয়, তখন তাদের গতিপথের বায়ু উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে জ্বলতে থাকে। ইলেকট্রন-প্রবাহের পথে ঐ উজ্জ্বল বায়ু-রেখাকেই আমরা বলি বিদ্যুৎ-চমক।

যে মেঘ থেকে সাধারণতঃ বজ্রপাত হয়, তার নাম 'থাণ্ডার ক্লাউড'। থাণ্ডার ক্লাউডে থাকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা। প্রত্যেকটি জলকণাই—হয় পজিটিভ, নয়তো নেগেটিভ বিদ্যুতাবিষ্ট। নেগেটিভ তড়িতাবিষ্ট জলকণাগুলি মেঘের উপরে সঞ্চিত হয়। বৈদ্যুতিক আকর্ষণের নিয়ম অনুসারে দুটি বিপরীতধর্মী তড়িৎ-কণা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। মেঘের মধ্যেকার বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ-কণাগুলিও পরস্পরকে আকর্ষণ করে। দুটি মেঘ যদি কিছু দূরে অবস্থিত থাকে এবং যদি তাদের মধ্যেকার এই বৈদ্যুতিক আকর্ষণ খুব বেশী হয়, তবে এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে ইলেকট্রন-কণিকাগুলি ছুটে যায়। বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষে ইলেকট্রন কণিকাগুলি উত্তপ্ত হবার দরুণ যে উজ্জ্বল আলোক-রেখার সৃষ্টি করে—তাই হলো বিদ্যুতের ঝিলিক।

একাধিক মেঘের মধ্যে যেমন বিদ্যুৎ-ক্ষরণ হয়, তেমনি একই মেঘের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও বিদ্যুৎ ক্ষরিত হয়ে থাকে। অনেক সময় মেঘের তলায় সঞ্চিত নেগেটিভ বিদ্যুৎ-কণার আধিক্য ঘটায় মেঘের নেগেটিভ আর ভূপৃষ্ঠের উপর সঞ্চিত পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণার মধ্যে আকর্ষণ ঘটে। যখন এই আকর্ষণী শক্তি বাতাসের বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়, তখন মেঘ থেকে ক্ষরিত বিদ্যুৎ ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে ভূপৃষ্ঠে নেমে-আসা এই বিদ্যুৎকেই আমরা বলি বজ্রপাত। মেঘ থেকে ভূপৃষ্ঠের যে দূরত্ব, তার চেয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর অবস্থিত বড় বড় গাছপালা, অট্টালিকা, জাহাজের মাস্তুল প্রভৃতির দূরত্ব আরও কম। উপরন্তু এসব বস্তুর চূড়ায় প্রায় সব সময়েই পজিটিভ বিদ্যুৎ-কণা সঞ্চিত থাকে। তাই বাজ সাধারণতঃ এই সব বস্তুর উপরেই পড়ে।

বাজ পড়ে প্রতি বছর যে কত প্রাণী প্রাণ হারায়, তার ইয়ত্তা নেই। বাজ যেখানে পড়ে, সেখানকার দাহ্য পদার্থগুলি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়—ধাতু-নির্মিত দ্রব্যগুলি গলে যায়। লৌহ দণ্ডের কাছে বাজ পড়লে লৌহ দণ্ডটি চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। নিকটে যদি কোন দিক্‌দর্শন যন্ত্র থাকে, তবে সেই যন্ত্রের মধ্যেকার চুম্বক-শলাকার মেরুদ্বয় বিপরীত-ধর্মী হয়ে পড়ে; অর্থাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে এবং দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুতে পরিণত হয়। যে জায়গায় বাজ পড়ে, সেখানে অল্প সময়ের জন্যে আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায়। এই গন্ধ হলো ওজোনের। ওজোন হলো আঁশটে গন্ধযুক্ত এক রকম গ্যাস। প্রচণ্ড বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ, অর্থাৎ বাজ বায়ুর মধ্যেকার অক্সিজেনকে ওজোন গ্যাসে রূপান্তরিত করে।

বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গেই যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তা বায়ুকে উত্তপ্ত করে এবং তার ফলে বায়ু হঠাৎ প্রসারিত হয়। তখন ঐ প্রসারিত বায়ুর চাপ-তরঙ্গগুলি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বায়ুর মধ্যে এই আলোড়নের ফলেই শব্দের সৃষ্টি হয়। মেঘ-ডাকা বলতে আমরা এই শব্দকেই বুঝি। একটানা মেঘের ডাক শোনা যায় অনেক কারণে। প্রথমতঃ শব্দ-তরঙ্গ বাতাসের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ১১০০ ফুট বেগে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ ৫ সেকেণ্ডে শব্দ প্রায় ১ মাইল যায়। শ্রোতা থেকে ঐ শব্দের উৎস, অর্থাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের বিভিন্ন অংশের দূরত্ব বিভিন্ন রকম হওয়ায় শব্দও বিভিন্ন সময়ে শ্রোতার কানে এসে পৌঁছায়। তাই একটানা মেঘের গর্জন শোনা যায়। আবার অনেক সময় নিকটবর্তী অট্টালিকা এবং পাহাড়ে ঐ শব্দের প্রতিফলন এবং প্রতিধ্বনির জন্যেও একটানা গর্জন শোনা যায়।

শব্দের গতিবেগ আমাদের জানা আছে। এথেকেই বিদ্যুৎ-আলোকের মোটা-মুটি দূরত্ব নির্ণয় করবার একটি সহজ উপায় আছে। যখনই বিদ্যুতের আলো চোখে দেখা যাবে, ঠিক তখনই সেকেণ্ড হিসাবে সময় গোনা আরম্ভ করতে হবে। গর্জন শোনা মাত্রই সময় গোনা বন্ধ করে গনণায় যত সেকেণ্ড হয়েছে, তাকে ৫ দিয়ে ভাগ দিতে হবে। তাহলেই শ্রোতা থেকে ঐ বিদ্যুৎ-আলোকের মোটামুটি দূরত্ব জানা যাবে।

বিদ্যুৎ উদ্ভিদ-রাজ্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করে। উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্যে দরকার নাইট্রোজেন। নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ 'নাইট্রেট' থেকে উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। বাতাস থেকে সোজাসুজি নাইট্রোজেন গ্রহণ করা উদ্ভিদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। তাই বাতাসের নাট্রোজেনকে অন্য পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে নাইট্রেটে পরিণত করা দরকার। এ কাজ করে বিদ্যুৎ।

যখনই আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কায় তখনই বাতাসের কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র মিলিত হয়ে নাইট্রেট প্রস্তুত করে। বৃষ্টির জলে সেই নাইট্রেট ধৌত হয়ে মাটিতে এসে পড়ে। তখন উদ্ভিদ তার মূলের সাহায্যে ঐ দ্রবীভূত

নাইট্রেটকে শোষণ করে পুষ্টিলাভ করে। তবে বিদ্যুতের সাহায্যে যে পরিমাণ নাইট্রেট তৈরী হয়, তা সমগ্র উদ্ভিদ-জগতের তুলনায় অতি নগণ্য।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আকাশের এই বিদ্যুৎ মানুষের মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই করে বেশী। এ যে অতি সহজেই কিভাবে মানুষের অনিষ্ট করতে পারে, তার একটা দৃষ্টান্ত দিই।

একবার এক বাড়ীর সামনের একটি নারকেল গাছে বাজ পড়ে। সেখান থেকে বিদ্যুৎ লাফিয়ে গিয়ে বাড়ীতে আঘাত করে এবং দেয়ালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেঝের উপর অবস্থিত লোহার খাটটিতে প্রবেশ করে। ঐ খাটে একটি লোক শুয়ে ছিল। সে তড়িতাহত হয়ে মারা যায়। এতেও নিস্তার নেই। খাট থেকে বিদ্যুৎ মেঝের মধ্য দিয়ে রান্নাঘরে অবস্থিত ষ্টোভে আঘাত করে এবং ষ্টোভ থেকে বেরিয়ে টেলিফোন যন্ত্র সংলগ্ন তার স্পর্শ করে ভূগর্ভে চলে যায়। বজ্রাঘাতে মানুষের মৃত্যুর এমনি আরও অনেক নজির আছে।

ধীর স্রোতে প্রবাহিত বিদ্যুৎ যদি কিছুক্ষণ যাবৎ বালুকা মিশ্রিত ভূমি স্পর্শ করে, তবে ঐ বিদ্যুতের তাপে বালি গলে যায় এবং ঐ গলিত বালি ও মাটি একত্রিত হয়ে 'ফালগুরাইট' নামে একপ্রকার পাথর জাতীয় জিনিষ সৃষ্টি করে।

পথের ধার দিয়ে যে সব বিদ্যুৎ-পরিবাহী তার চলে গেছে, সেগুলিকে বজ্রপাত-জনিত ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে আজকাল এক অভিনব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ-পরিবাহী তামার তারের উপর আর একটি ধাতুর আবরণ দেওয়া হয়। এই বহিরাবণটির সঙ্গে কিছুদূর অন্তর ভূগর্ভের যোগ সাধন করা হয়। বাজ পড়লে বিদ্যুৎ ওই বাইরের আবরণটিতে প্রথমে আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভূগর্ভে চলে যায়। এর ফলে মূল তারটি রক্ষা পায়।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা সকলেরই জেনে রাখা ভাল। যে ব্যক্তি মেঘের গর্জন শুনতে পাবে—গর্জন শোনবার পর তার আর তড়িতাহত হবার সম্ভবনা থাকবে না। আর বজ্র যাকে আঘাত করবে সে কিছুই বুঝতে পারবে না।

ঝড়ঝঞ্ঝার সময় অর্থাৎ যখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকায় ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকে, তখন গাছের তলায় দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ আগেই বলেছি যে, গাছ-পালার উপরেই বাজ পড়বার সম্ভাবনা বেশী। ঐ সময় নদী বা সমুদ্রে স্নান করা ও সাঁতার কাটাও বিপজ্জনক। কারণ নদী বা সমুদ্রে বাজ পড়লে বিদ্যুৎ জলের মধ্যে বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হতে পারে এবং তার ফলে স্নানরত বা সন্তরণরত ব্যক্তির তড়িতাহত হয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। ঝড়ঝঞ্ঝার সময় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করাও খুব বিপজ্জনক। কারণ কাছাকাছি কোথাও বিদ্যুৎ-ক্ষরণ হলে, তা ঐ বৈদ্যুতিক যন্ত্রের তার বেয়ে এসে কর্মীকে আহত করতে পারে।

ঘর-বাড়ীকে বজ্রের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়,

তার নাম হলো লাইটনিং কণ্ডাক্টর। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন ফ্রাঙ্কলিন নামে এক বিজ্ঞানী ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে। এই যন্ত্রের ছুটি প্রধান অংশ হচ্ছে—একটি দণ্ড এবং একটি পরিবাহক-তার বা কণ্ডাক্টর। দণ্ডটির তলাকার অংশের ব্যাস হলো ২ থেকে ৩ ইঞ্চির মধ্যে। দৈর্ঘ্যে দণ্ডটি ৬ থেকে ১০ ফুট। অগ্রভাগটি সূচালো এবং এটিকে স্থাপন করা হয় সেই বস্তুর উপর, যাকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করা দরকার। এই দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে একটি বিদ্যুৎ-পরিবাহক তার—সাধারণতঃ তামার তার। যে বস্তুকে বজ্রের কবল থেকে রক্ষা করতে হবে, সেই বস্তুর সঙ্গেই এই তারটি সংযুক্ত করে তার শেষ অংশটি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয়। অবশ্য সে জন্যে মাটিতে ৬।৭ গজ গভীর গর্ত করা দরকার। তার পোঁতবার পর গর্তটিকে কোক কয়লার গুঁড়া দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হয়। কারণ আর কিছুই নয়—কোক্ কয়লা বিদ্যুতের ভাল পরিবাহক। মোটামুটিভাবে এই হলো বজ্র-নিবারক যন্ত্রের কথা।

মেঘে যে জাতীয় বিদ্যুৎ থাকে, আবেশ প্রক্রিয়ায় ঠিক তার বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে থাকে, ভূপৃষ্ঠের বস্তুর উপরে। বস্তুটি ভূপৃষ্ঠের যত উর্ধ্বে অবস্থিত থাকে, তার উপর তত বেশী পরিমাণে বিপরীতধর্মী বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে থাকে। কিন্তু এই সব বস্তুর উপর যদি কোন সূচালো অগ্রভাগযুক্ত ধাতব দণ্ড থাকে, তবে সেই দণ্ডের অগ্রভাগ দিয়ে ভূপৃষ্ঠস্থ বিদ্যুৎ-কণা বেরিয়ে গিয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এর ফলে বিদ্যুৎও অনেক পরিমাণ প্রশমিত হয়। বজ্র-নিবারক যন্ত্রের জন্যেই ভূপৃষ্ঠের ঘর-বাড়ীর উপর বিদ্যুৎ সঞ্চিত হতে পারে না। ফলে মেঘ ও ভূপৃষ্ঠস্থ বস্তুর ছুটি বিপরীতধর্মী বিদ্যুতের মধ্যে পরস্পর মিলিত হবার চেষ্টা কমে যায়। সেই কারণে মেঘ থেকে তখন আর বিদ্যুতের ক্ষরণ হয় না, অর্থাৎ বাজ পড়ে না। যদি বা কখনও তা হয়, তবে এই যন্ত্র সেই বিদ্যুৎকে সরাসরিভাবে ভূগর্ভে পাঠিয়ে দেয়—তাতে ঘর-বাড়ীর কোন ক্ষতি হয় না।

ভাল লাইটনিং কণ্ডাক্টারের নিম্নোক্ত গুণগুলি অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

(১) বিদ্যুৎ ক্ষরিত হলে যন্ত্রের দণ্ডটি গলে যাবে না।

(২) দণ্ডটির অগ্রভাগ খুব সুচালো হবে।

(৩) দণ্ড ও বিদ্যুৎ-পরিবাহক তারের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে না এবং দণ্ড ও ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে তার মারফৎ বেশ ভাল সংযোগ থাকবে।

(৪) যে বাড়ীর উপর এই যন্ত্র বসানো থাকবে, তার উপর যদি লোহা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুনির্মিত কোন বস্তু থাকে, তবে তাদেরও এই যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

শেষোক্ত নিয়ম ছুটি যদি ঠিকমত পালন করা না হয়, তবে পরিবাহক তার ও ঘর-বাড়ীর মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষরণ হবে। ফলে বিপদের আশঙ্কা বেড়ে যাবে।

শ্রীঅমরনাথ রায়

বিবিধ

১৯৬৪-৬৫ সালে সূর্য সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা

১৯৬৪-৬৫ সালে সূর্যের অভ্যন্তর অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকবে। ঐ সময়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা মিলিতভাবে পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রতিক্রিয়া এবং এর অন্যান্য রহস্যভেদের চেষ্টা করবেন। এই আন্তর্জাতিক তথ্য-সন্ধানী পরিকল্পনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবেন।

প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা ও প্রজ্বলনের ফলে সূর্যের মধ্যে যে কলঙ্ক দেখা যায়, সেই সৌরকলঙ্কের সংখ্যা তখন হ্রাস পাবে। সূর্য সম্পর্কে তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের এই হবে উপযুক্ত সময়। ঐ ঝঞ্ঝার জন্যে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় কণা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। এর কিছুটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ঊর্ধ্ব-ভাগে প্রবেশ করে বেতার-তরঙ্গ চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে।

১৯৫৭-৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে সূর্য সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল, তা নতুন পর্যালোচনার সহায়ক হবে।

মার্কিন বিজ্ঞানীরা ঐ সময় আবহবিজ্ঞান, ভূ-চৌম্বকত্ব, মেরুপ্রভা, সূর্যের অভ্যন্তর, আয়নমণ্ডল এবং মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবেন।

এই সময়ে সূর্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্র ভূপদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের তুলনায় সীমিত হলেও ঐ সময়ে তথ্য-সন্ধানী যন্ত্রপাতির সাজ-সরঞ্জামের সুযোগ-সুবিধা মিলবে অনেক বেশী। এই সময়ে রকেট, কৃত্রিম উপগ্রহ, উন্নত ধরণের ক্যামেরা এবং রেডারের সাহায্য লওয়া হবে।

মোটর গাড়ীর পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট রং নীল ও হলুদ

আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সাময়িক পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, মোটর গাড়ী চালনার নিরাপত্তার দিক থেকে নীল ও হলুদ রংই সর্বোৎকৃষ্ট।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, মোটর গাড়ীর চালকেরা রাস্তায় চলবার সময় তাঁদের গাড়ীর বিপরীতমুখী অন্য গাড়ী যে কতদূরে রয়েছে, তা নিরূপণ করবার ব্যাপারে ঐ গাড়ীর রং তাদের অনেকখানি প্রভাবিত করে থাকে। বিপরীতমুখী অন্য রঙের কোন গাড়ী ২০০ ফুট দূরে থাকলে মনে হবে যেন ৬ ফুট আরও বেশী এগিয়ে রয়েছে। এতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা খুবই বেশী থাকে।

নানা রকম রং নিয়েই তাঁরা পরীক্ষা করে দেখে-ছেন। রাত্রি ও দিনের বেলায় কেবলমাত্র নীল ও হলুদ রং-এর গাড়ীর দূরত্বই প্রায় ঠিকমত বুঝা যায়। ধূসর রঙের গাড়ীগুলিকে মনে হয় যেন ঠিক জায়গা থেকে আরও দূরে রয়েছে।

দিনের বেলায় ও কুয়াসার সময়ে সবচেয়ে নিরাপদ হচ্ছে নীল রং এবং রাত্রিবেলায় হলুদ রং।

ক্ষুধার শান্তি

লণ্ডন হইতে ৬ই জানুয়ারী তারিখে প্রচারিত বৈজ্ঞানিক রয়টারের এক খবরে জানা যায়—একদল ফরাসী বলেন যে, একটি তৈলজাত দ্রব্য বিশ্বে ক্ষুধার অবসান ঘটাইতে পারে। বৃটিশ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "নেচার"-এ ঐ বিষয়ে পাঁচ বৎসরের গবেষণার ফল প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অপরিশোধিত পেট্রোল

শোধনকালে যে কোন জাতীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে বিশ্বের ক্ষুধার্ত জনগণের ক্ষুধা-শান্তির জন্য পর্যাপ্ত প্রোটিন পাওয়া যাইতে পারে। পেট্রোল শোধনকালে মোমজাতীয় দ্রব্যকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া তৈল হইতে উৎপন্ন মোম-জাতীয় দ্রব্যকে প্রোটিন-ভিটামিনে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

রেডিওগ্রাফি-ক্যামেরা

বোম্বাই হইতে ৯ই জানুয়ারী তারিখে প্রচারিত পি. টি. আই-এর এক খবরে জানা যায়—ট্রম্বের পার-মাণবিক শক্তি-সংস্থা রেডিওগ্রাফি-ক্যামেরা নির্মাণ করিয়াছেন, যদ্বারা ঝালাই ও ছাঁচে-ঢালা ধাতব পদার্থের অভ্যন্তরে ফাটল বা ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করা যাইতে পারে। তেজস্ক্রিয় ইরিডিয়ামের দ্বারা এই ক্যামেরা নির্মিত হইয়াছে। ইহার ওজন মাত্র ২২ কিলোগ্র্যাম।

পারমাণবিক শক্তিসংস্থা এই প্রথমবার ফস্ফরাস-৩২ বা তেজস্ক্রিয় কৃত্রিম ফস্ফরাসের সাহায্যে সুপারফস্ফেট প্রস্তুত করিয়াছেন।

মঙ্গলগ্রহে হিমপ্রবাহ

টোকিও হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত রয়টারের খবরে জানা যায়—৩রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গল-গ্রহ পৃথিবীর ১০ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে আসিবার পর কিওটো জ্যোতির্বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ শোতারো মিয়োসি সেখানে হিম-প্রবাহ সৃষ্টিকারী বিশাল মেঘপুঞ্জ লক্ষ্য করিয়াছেন।

মঙ্গলগ্রহে ইতিপূর্বে কোন দিনই এমন ঝড়ো আবহাওয়া দেখা যায় নাই। ডাঃ মিয়োসি আরও বলেন, গত ১০ই ডিসেম্বর পৃথিবীর টাইফুনের অনুরূপ টাইফুন মঙ্গলগ্রহে দেখা যায়। তাহার পর হইতেই বিশাল এক মেঘপুঞ্জ উহার সমগ্র আকাশ ছাইয়া রহিয়াছে।

ঝড়ের মূলে

নয়াদিল্লী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইউ. এন. আই. প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—খ্যাতনামা সুইডিস বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিজেকুস্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, গত গ্রীষ্মকালে পৃথিবীতে যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইয়াছে, মুখ্যতঃ তাহার ফলেই গত কয়েক মাসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অস্বাভাবিক ও বিপর্যয়কারী ঝড়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

তিনি বলেন—আরও পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হইলে পৃথিবী ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ব্যাহত হইবে এবং উহার পরিণতি যে কি হইতে পারে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। যুগোশ্লাভ সংবাদ সংস্থা 'তানযুগ' এই সংবাদ প্রচার করিয়াছেন।

চন্দ্রে হাইড্রোজেন গ্যাস

মস্কো হইতে ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত রয়টারের এক খবরে জানা যায়—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' জানাইতেছেন, সোভিয়েট জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোজিরেভ রিফ্লেক্টর-টেলিস্কোপের সহায়তায় চন্দ্রে হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করিয়াছেন।

'টাস' বলেন, এতদ্দ্বারা চন্দ্রদেহে অত্যধিক তাপমাত্রার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

ময়ূর—ভারতের জাতীয় পাখী

নয়াদিল্লী হইতে ৩১শে জানুয়ারী তারিখে প্রচারিত পি টি. আই-এর এক খবরে জানা যায়—ভারত সরকার ময়ূরকে ভারতের জাতীয় পাখীরূপে অভিহিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও সংবাদপত্রসমূহের অভিমত বিচার করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ এপ্রিল, ১৯৬৩ চতুর্থ সংখ্যা

তেজস্ক্রিয়তার দু-চার কথা

শ্রীপ্রদীপকুমার চক্রবর্তী

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে রয়েছে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তি। বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতিটি ধাপে আমরা এর পরিচয় পাই—প্রতিটি আবিষ্কারের মধ্যে এরই সত্যতা নিহিত আছে।

এক্স-রে আবিষ্কারের ঘটনা আকস্মিক ও চমকপ্রদ নয় কি ? কিন্তু সেই আকস্মিক আবিষ্কারকে ভিত্তি করে বিভিন্ন বিজ্ঞান-সাধকের নিরলস কর্ম-সাধনার ফলেই এক্স-রে যে আজ মানুষের কতখানি কাজে লেগেছে, সে খবর আজ কারো অজানা নেই। মৃত ব্যাঙের দেহ-সঙ্কোচন বৈজ্ঞানিকের সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি বলেই সেই সামান্য ঘটনা থেকে যে মহানাটকের জন্ম হলো, আজ আলোতে উদ্ভাসিত যাদু-নগরীর অনেকেই তা জানেন। এই প্রবন্ধে এই রকমেরই এক আকস্মিক কিন্তু সুদূরপ্রসারী আবিষ্কার সম্পর্কে দু-চার কথা বলবো। এটি হলো তেজস্ক্রিয়তা।

ভারী জিনিস, যার পারমাণবিক গুরুত্ব ২০৬-এর বেশী, তাদের মধ্য থেকে এক ধরণের বিমিশ্র স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণ হয়। এই স্বতঃউৎসারিত বিকিরণই তেজস্ক্রিয়তা নামে পরিচিত। এই বিকিরণের রশ্মির মধ্যে তিন ধরণের রশ্মি আছে—এদের নাম হলো α (alpha), β (beta), γ (gamma)। এদের বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে।

এই বিকিরণকে স্বতঃস্ফূর্ত বলবার কারণ হলো—ঠাণ্ডা কিংবা গরম, বৈদ্যুতিক কিংবা চৌম্বক প্রভাবেও এর কিছু পরিবর্তন হয় না।

শুধু প্রাকৃতিক জগতে প্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থই একমাত্র নয়, কৃত্রিম উপায়েও বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে তেজস্ক্রিয়তার আবেশ ঘটানো সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক জগতে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় প্রকৃতিজ তেজস্ক্রিয় পদার্থ, আর কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত পদার্থকে

বলা হয় আবিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Induced radio-active element)। এই তেজস্ক্রিয়তা মুহূর্ত-কালীন নয়, বহুকালব্যাপী—দীর্ঘকাল ধরে এই ক্রিয়া চলে।

এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রগতির সূচনা করেছে এবং পারমাণবিক পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর বিস্তৃত পর্যালোচনার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

এই বিষয়ে গবেষণার ফলে বহুকাল পূর্বেই অনেক মূল্যবান খবর জানা গেছে এবং সাম্প্রতিক কালেও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

আগেকার খবরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

(ক) α, β, γ নামে তিন ধরণের রশ্মির আবিষ্কার।

(খ) তেজস্ক্রিয়তার বিভিন্ন প্রয়োগ।

(গ) তেজস্ক্রিয়তার প্রাথমিক সূত্রাবলী।

বর্তমানে যে সব জিনিষের উপর এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত হয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(ক) তিন শ্রেণীর তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস, প্রকৃতি ইত্যাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে পরমাণুর অন্তর্দেশের গঠন-প্রণালীর বিশেষ খবর জানা গেছে।

(খ) কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে নিউট্রন, পজিট্রন নামে বিভিন্ন কণিকা, যা পরমাণুর গঠন-উপাদান।

আগেই বলেছি, তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হয়েছিল ঘটনাচক্রে। যে জিনিসটি নিয়ে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল, তা ইউরেনিয়াম ও পটাসিয়ামের সংযোগ-জাত লবণ (Double Salt of Uranium and Potassium)। যিনি নাটকের সূত্রপাত করেন তিনি হলেন ফরাসী পদার্থবিদ্—হেন্‌রী বেকারেল। বেকারেল এক্স-রে টিউব নিয়ে এক বিশেষ কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক্স-রশ্মি যখন উৎপন্ন হয়, তখন এক্স-রে টিউবের কাঁচের দেয়াল থেকে এক ধরণের নীল বা সবুজ আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। আবার কতকগুলি ফ্লুরেসেন্ট লবণের উপর সূর্যরশ্মি পতনেও এক ধরণের আলো বিচ্ছুরিত হয়। এই বিচ্ছুরিত আলো ফস্‌ফরেসেন্স (Phosphorescence) নামে পরিচিত। এই ধরণের আলোর মধ্যে কি সম্পর্ক বিদ্যমান, তা-ই বেকারেল বের করবার চেষ্টা করছিলেন।

সৌভাগ্যের কথাই বলতে হবে, সে দিন সূর্যের মুখ দেখা যায় নি বলে বেকারেল ইউরেনিয়াম ও পটাসিয়ামের লবণটি কাগজে মুড়ে ড্রয়ারে রেখে দেন। সেই ড্রয়ারে কালো কাগজে মোড়া আলোক-চিত্রের প্লেট ছিল। কয়েক দিন পরে ড্রয়ার খুলেই বেকারেল আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, প্লেটগুলির মধ্যে দাগ পড়েছে। কি আশ্চর্য! প্লেট-গুলি কালো কাগজে মোড়া, আর ড্রয়ারের মধ্যেও সূর্যকিরণ প্রবেশ করতে পারে নি! তবে?···

কাজেই তাঁর মনে হলো ঐ লবণটিই অন্ধকারে এক ধরণের আলো বিকিরণ করেছে এবং তা কাগজ ভেদ করে প্লেটগুলির উপর তাদের পরিচয় রেখে গেছে। তখন বেকারেল আরম্ভ করলেন পরীক্ষার পর পরীক্ষা। একটা বাক্সের মধ্যে ইউরেনিয়াম লবণ ও ফটোগ্রাফির প্লেট পাশাপাশি রেখে কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের পাত দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে উভয় ক্ষেত্রেই দেখলেন, একই ফল ফলেছে—প্লেটে আলোর পরিচয় ধরা পড়েছে। ইউরেনিয়ামের বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ (কঠিন বা তরল) নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, কোন পার্থক্য নেই। এই বিকিরণের সঙ্গে ফস্‌ফরেসেন্সের কোন সম্বন্ধ নেই। এই বিকিরিত রশ্মির নাম দেওয়া হলো আবিষ্কারকের নামানু-সারেই—বেকারেল রশ্মি। পরে একে বলা হলো তেজস্ক্রিয়তা।

তখন থেকে সুরু হলো এই নতুন পথে অভিযান। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-জগতে এলো নব উন্মাদনা—বৈজ্ঞানিক ব্যস্ততা।

রসায়নবিদেরা তেজস্ক্রিয় পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন, আর পদার্থবিদেরা আরম্ভ করলেন তার আকৃতিগত ধর্ম নির্ধারণ।

এই নব-আবিষ্কৃত জগতে দুটি নতুন বিস্ময়কর প্রতিভার উদয় হলো। তাঁরা হলেন, মাদাম কুরী ও পিয়ারী কুরী—স্বামী ও স্ত্রী।

পিচ্‌ব্লেণ্ড নামে একজাতীয় খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করলেন তাঁরা। দেখলেন যে, পিচ্‌ব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম লবণের তেজস্ক্রিয়তা থেকে বহুগুণ জোরালো। আংশিক কেলাসন (Fractional crystallisation) পদ্ধতিতে পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকে দুটো নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করলেন। তাদের নাম হলো রেডিয়াম ও পলোনিয়াম।

একই বছরে আবিষ্কৃত হলো ইউরেনিয়ামের সমশক্তিসম্পন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থোরিয়াম। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে পিচ্‌ব্লেণ্ড থেকেই আবিষ্কৃত হলো আরও একটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ অ্যাক্টিনিয়াম (Actinium)। এছাড়া আরো অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে; যথা—রেডিওথোরিয়াম, মেসো-থোরিয়াম ইত্যাদি।

বেকারেলের আবিষ্কারের পর রাদারফোর্ড ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তার ভেদ করবার ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা আরম্ভ করেন। তিনি লক্ষ্য হিসেবে টিনের পাত ব্যবহার করে দেখলেন যে, ইউরেনিয়ামের গা থেকে বিকিরিত রশ্মির মধ্যে দুই রকমের রশ্মি আছে। এদের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত মৃদু, তাকে রাদারফোর্ড α-রশ্মির বলে অভিহিত করেন। এই শ্রেণীর রশ্মির আয়নী-করণের ক্ষমতা খুবই বেশী। অপর রশ্মিটির কিন্তু এই ধরণের ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত কম। তিনি এর নাম দিলেন β-রশ্মি। β-রশ্মি α-রশ্মি থেকে তীব্রতর। আরো তীব্রতর যে রশ্মিটি ভিলার্ড আবিষ্কার করেন, তার নাম হলো γ-রশ্মি।

রেডিয়ামের গা থেকে বিকিরিত রশ্মির মধ্যে এই তিন ধরণের রশ্মির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার সহজ পদ্ধতিটি হলো মাদার কুরীর প্রস্তাবিত পদ্ধতি। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ :

একটা Pb-block-এর গায়ে একটা গর্ত করে কিছু রেডিয়াম রাখা হলো। গর্তটি এমন ভাবে তৈরী করা হলো, যাতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সমান্তরাল-ভাবে এসে একটু দূরে রাখা ফটোগ্রাফির প্লেটে পড়তে পারে। সমগ্র সরঞ্জামটি একটা বায়ুহীন কক্ষে রাখা হলো। এরপর এতে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হলো। বহুক্ষণ এভাবে রাখবার পর যখন আলোকচিত্রটি পরিস্ফুট (develop) করা হলো, তখন তিন ধরণের সুস্পষ্ট দাগ দেখা গেল। এই তিনটি দাগ তিন ধরণের রশ্মির (α, β ও γ) দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে।

এই স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের ব্যাখ্যা দিলেন সডি ও রাদারফোর্ড। তাঁরা বললেন যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের অণুগুলির α, β রশ্মি বিকিরণের ফলে বিপর্যয় (disintegration) ঘটে। এর ফলে নতুন পদার্থের উদ্ভব হয়। যেমন, ইউরেনিয়াম তেজস্ক্রিয়তার ফলে শেষে সীসকে পরিণত হয়। অবশ্য এই ধরণের রূপান্তর একদিনে বা এক বছরে সম্ভব নয়। এই রূপান্তর ঘটে বহুকাল ধরে।

তেজস্ক্রিয়তার প্রথম প্রয়োগ হলো—পর্বতগাত্রে সীসা ও ইউরেনিয়ামের আনুপাতিক হার থেকে পর্বতগুলির বয়স নির্ণয়ে। তাথেকে আবার পৃথিবীর বয়সেরও মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে। এই ধরণের অনুসন্ধিৎসার ফলেই পৃথিবীর সঠিক বয়স নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে।

রেডিও-আইসোটোপের কথা অনেকেই জানেন। এর প্রয়োগ সুদূর বিস্তৃত। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এর দান অনস্বীকার্য। ক্যান্সার রোগে আজকাল এর প্রয়োগ বিশেষ উপকার সাধন করছে।

আরো একটি জিনিষের কথা বলে এই প্রবন্ধের যবনিকা টানবো। এটি হলো রেডিয়াম-থিরাপী। রেডিয়াম থেকে বিকিরিত রশ্মি ত্বকের পক্ষে ক্ষতিকর হলেও এর প্রয়োগে ত্বকের বহুবিধ রোগ নিরাময়ে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে। আভ্যন্তরীণ নানাবিধ রোগের ক্ষেত্রেও এর বিশেষ প্রয়োগ আছে।

হস্তলিপি-বিজ্ঞান

শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ রায়

যে শাস্ত্রের সাহায্যে হস্তাক্ষর হইতে লেখকের চরিত্র বিচার করা হয়, তাহার নাম হস্তলিপি-বিজ্ঞান।* কিন্তু ইহাকে বৈজ্ঞানিকগণ অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, এই শাস্ত্র ফলিত মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা রাখে। হস্তাঙ্গুলির টিপ দেখিয়া অপরাধী সনাক্ত করিতে পারা যায়—এই সম্বন্ধে কোন বৈজ্ঞানিকই আজ আর দ্বিমত নহেন; কিন্তু বৈজ্ঞানিক মহলের স্বীকৃতি আদায় করিতে আবিষ্কারককে (তিনি বাঙ্গালী) কম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। গলার স্বর ও মাথার চুল প্রভৃতিও অপরাধী নির্ণয়ে সাহায্য করে—একথা ইতিপূর্বে কেহ বলিলে নিশ্চয়ই উপহাসাস্পদ হইতেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ আজ উহা মানিয়া লইয়াছেন। পরমতসহিষ্ণুতা বিজ্ঞানীদের পরম ধর্ম। সেই ধর্মের কথা স্মরণ করাইয়া বর্তমান প্রবন্ধে হস্তলিপি-বিজ্ঞানের স্বপক্ষে কিছু কিছু যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিব।

কে লেখে? হাত লেখে, না মন লেখে? মনের বিনা আদেশে হাতের কিছুই করিবার ক্ষমতা নাই—তাহা লেখাই হউক, ছবি আঁকাই হউক বা মুষ্ট্যাঘাত করাই হউক। মনের আদেশ হাত নিমেষের মধ্যে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ সঙ্গে মনের ছাপও হাত প্রকাশ করিয়া দেয়। নিম্নের দুইটি তথ্য হইতে ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

(১) ক্রুদ্ধ হইয়া কথা বলিবার সময় নানা ভঙ্গীতে হস্তসঞ্চালন করা হয়। ক্রুদ্ধ হইয়া লিখিবার সময় হস্তাক্ষরও নানা ভঙ্গীর হইয়া থাকে। অক্ষরগুলি অসমান হয়, শব্দের নীচে নিম্নরেখা দেখা যায়, রেফ দীর্ঘ হয়, আদ্য অক্ষর বিসদৃশ হয় এবং লাইনের শেষ অক্ষরটির টান দীর্ঘ বা প্রলম্বিত হয়—ইত্যাদি। লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি হস্তাক্ষরে কম-বেশী দেখা যাইবে। এই সব লক্ষণ স্বাভাবিক হস্তাক্ষর হইতে ভিন্ন ধরণের হয়।

(২) আবেগজনিত বাষ্পের জন্য স্বাভাবিক বাক্যালাপের যেমন ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, উহার দরুণ স্বাভাবিক হস্তাক্ষরেরও তদ্রূপ ব্যতিক্রম হইয়া থাকে। অক্ষরের টান বা মাত্রার উপর লেখক একাধিকবার কলম ঘুরাইবেন, 'র' প্রভৃতি অক্ষরের ফোঁটার আধিক্য দেখা যাইবে, দাঁড়ি একাধিক বা দাঁড়ির শেষে ড্যাস চিহ্ন দেখা যাইবে। এরূপ আরও বহু অসঙ্গতি দেখা যাইবে, যাহা লেখকের স্বাভাবিক হস্তাক্ষরে দেখা যায় না।

এই নিয়মগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য আমরা কাহাকেও রাগাইয়া বা তাহার অনুভূতিতে আঘাত করিয়া ঐ অবস্থায় তাহার হস্তাক্ষর গ্রহণ করিয়া তাহার স্বাভাবিক হস্তাক্ষরের সঙ্গে মিলাইলে উপরিউক্ত উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণিত হইবে।

সত্য হইলে এই শাস্ত্রকে ফলিত মনস্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিতে কি বাধা থাকিতে পারে?

কিন্তু হস্তাক্ষর কি মনের কথা প্রকাশ করে? সহজ কথায়, হস্তাক্ষরে কি চরিত্রের প্রতিফলন হয়? শৈশবে আমরা পিতার হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিয়া থাকি। পরে শিক্ষক, অধ্যাপক, দেশের আদর্শস্থানীয় পুরুষের হস্তাক্ষরেরও অনুকরণ করিয়া থাকি। ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই সকল পারিপার্শ্বিক প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া হস্তাক্ষর সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের হয়, কিন্তু ব্যক্তির অবচেতন মনে এই

* রাজশেখর বসু মহাশয় নাম দিয়াছেন 'হস্তলিপি তত্ত্ব'।

সকল প্রভাব এককালীন লোপ পায় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও নানা অবস্থায় যখন উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তখন বুঝিতে পারি—যাহা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, তাহা সত্য সত্যই ভুলি নাই, সঙ্গোপনে মনের কোণে লুকাইয়া আছে, সময়মত তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শুধু যে অবচেতন মন এইভাবে হস্তাক্ষরে ধরা পড়ে তাহা নহে, সেই পরমাশ্চর্য, দুর্জ্ঞেয় মন, যাহা যুগে যুগে শিক্ষাবিদ্গণকে বিস্মিত করিয়াছে—তাহাকেও হস্তাক্ষরে ধরা যায়।

টান বা Stroke দ্বারা অক্ষর গঠিত হইয়াছে। টান ঊর্ধ্ব-অধঃ, দক্ষিণে-বামে গিয়াছে। আমাদের দৃষ্টি বা জ্ঞানও ঊর্ধ-অধঃ, দক্ষিণ-বামের পরিসীমা ছাড়িয়া যায় না। ঊর্ধ্বে, মহাশূন্যের (সেই হিসাবে অজ্ঞাত বিষয়ের) রহস্য ভেদ করিতে কৌতূহলী যিনি, তাঁহার হস্তাক্ষরে ঊর্ধ্বমুখী টান থাকে। যে সমাজে আমরা বাস করি, তাহা আমাদের আশেপাশে অর্থাৎ দক্ষিণে-বামে আছে। সামাজিকতা বিচার করিবার সময় তাই হস্তাক্ষরের দক্ষিণ ও বামের টান বিচার করা হয়। পশ্চাতের দিকে যখন তাকাই তখন আমরা অতীতের দিকে ফিরিয়া দেখি, আর সম্মুখের দিকে আছে আমাদের ভবিষ্যৎ। "We look before and after"—কবির এই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন। এই জন্য আমরা বামে-হেলা ও দক্ষিণে-হেলা লেখা হইতে Extroversion ও Introversion বিচার করি। এই মতবাদের Corollary হিসাবে Forward stroke হইতে সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও Backward stroke হইতে ভীরুতা ও দ্বিধা ধরা হয়। ঊর্ধ্বমুখী টান যে অর্থে ধরা হয়, নিম্নমুখী টান স্বভাবতঃই তাহার বিপরীত হইবে। এই জন্য Moral turpitude নিম্নমুখী টান হইতে ধরা হইয়া থাকে।

এইরূপ কয়েকটি a-priory theory-র উপর এই শাস্ত্রের সমগ্র ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েড, ইয়ং প্রভৃতি চিন্তাবীরের মতবাদও অনুরূপ theory-র উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রয়েডীয় দর্শন যদি মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা রাখে, হস্তলিপি-বিজ্ঞানের অপরাধটা কোথায় ? স্মরণ রাখা দরকার, ফ্রয়েডীয় দর্শনের সত্যতাও এখন অনেকে অস্বীকার করিতেছেন।

এই নিয়মগুলির সত্যতা প্রমাণের জন্য আমরা কাহারও মনে বৈজ্ঞানিকজনোচিত কৌতূহল অথবা ধর্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেখিতে পারি, তাহার হস্তাক্ষরের টান ঊর্ধ্বমুখী হয় কি না ? অথবা তাহার মনে প্রচলিত দেব-দেবীর কোপের কাহিনী-মূলক কুসংস্কারের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া দেখিতে পারি, তাহার হস্তাক্ষরের মাত্রা ও দক্ষিণাভিমুখী টান ক্ষুদ্র হইতেছে কি না এবং তাহার লেখার ভিতর কিছু কিছু অক্ষর বামে হেলিয়াছে কি না, অথবা অক্ষরে অক্ষরে স্বাভাবিক ব্যবধানও সঙ্কীর্ণ হইয়াছে কি না ? এই সকল লক্ষণ তাহার স্বাভাবিক হস্তাক্ষরে অনুপস্থিত থাকিলে এই শাস্ত্রকে ফলিত মনস্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করিতে বাধা কি ?

কিন্তু একটি বিষয় সপ্রমাণ করিতে পারা যায় নাই। এইবার তাহা আলোচনা করিতেছি। পূর্বে যেখানে বলা হইয়াছে—অবচেতন মনে সবই সঙ্গোপনে লুকাইয়া আছে, কিছুই আমরা ভুলি নাই—ইহা সেই প্রসঙ্গে। এমনও দেখা যায়, লেখকের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জীবনসায়াহ্নে তাহার হস্তাক্ষর তাহার পিতার হস্তাক্ষরের অনুরূপ হইয়াছে। আবার এমনও দেখা যায়, জীবনভোর নিজ হস্তাক্ষরে মাতা বা পিতার হস্তাক্ষরের ধারা প্রতিফলিত হইতেছে। ইহাও তাহার অনিচ্ছাকৃত। ইহার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হস্তলিপি বিজ্ঞানীগণ অপারগ হইয়াছেন। ইহা Law of Heredity-র অন্তর্ভুক্ত, যাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্ণয় করিতে সকল বিজ্ঞানীই অপারগ হইয়াছেন।

বিজ্ঞান যে যে ক্ষেত্রে বিফল হইয়াছে, সেই

সেই ক্ষেত্রে উহা পরমেশ্বর, ধর্ম, পুনর্জন্মবাদ প্রভৃতির উপর চাপাইয়া দিয়া দায়িত্ব এড়ান হইয়াছে।

বংশের ধারা অব্যাহত থাকিবার বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাকে কয়েকটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

১। কোন জীবদেহে যে বিশিষ্ট কোষগুলি বর্তমান তাহাই বিভক্ত হইয়া অপত্যের দেহ গড়িয়া তোলে এবং সেই কোষের মধ্যে জনকের সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অতি সূক্ষ্ম রেখায় থাকিয়া যায়। ফলে নবগঠিত কোষগুলি জনকের কোষের অবিকল প্রতিকৃতি রূপে গড়িয়া উঠে।

২। সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করুন—ইহাতে জনকের চিত্তবৃত্তি ও হস্তাক্ষরের ধারা স্মরণ করুন :—আত্মা প্রজায়তে পুত্রঃ।

৩। আরও স্মরণ করুন পুত্র মনুষ্যের আত্মা।"

(মহাভারত ॥ বন পর্ব ॥ ৩১৯ অঃ)

ক্যান্সার

শ্রীপ্রণব রায়

লোকের ধারণা, ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। যে সব রোগে মানুষের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশী, ক্যান্সার তাদের অন্যতম। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকেও এই রোগের কাছে হার মানতে হয়েছে। তার কারণ, এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে আজও আমরা অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছি। পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞানীরা নিয়ত এই রোগ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আজ অবধি তাঁরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি।

এখন দেখা যাক, ক্যান্সার রোগটা কি। এটা আলোচনা করবার আগে জীবকোষ নিয়ে দু' চার কথা বলা দরকার। আমাদের শরীর হচ্ছে কতকগুলি জীবকোষের সমষ্টি। জীবকোষে জেলির মত অর্ধতরল প্রোটোপ্লাজম বর্তমান। এই প্রোটপ্লাজম হচ্ছে জীবনের আধার। এর কেন্দ্রে ঘনতর গোলাকার অংশকে নিউক্লিয়াস বলা হয় এবং এই নিউক্লিয়াসে থাকে সূক্ষ্ম সরু সূতার মত ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমে লম্বালম্বিভাবে সাজানো থাকে 'জিন'—যারা আমাদের দেহের গঠনাকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং বংশ-বৈশিষ্ট্য বহন করে। হাতের বহু আঙ্গুল (Polydactyle), সোনালী চুল, কটাচোখ, মাথার টাক হবার পিছনে রয়েছে জিনের কারসাজি। এদের রাসায়নিক প্রকৃতি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড এবং সেটাকে বলা হয় ডি. এন এ.। জীবকোষ বিভাজনের ফলে আমাদের শরীরের কোষের বৃদ্ধি হয়। একটি কোষ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দু'টিতে এবং দু'টি চারটিতে—এভাবে ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। কোষ-বৃদ্ধি যেন তেন ভাবে হয় না—এতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বর্তমান। জীবকোষের অরাজকতা আমাদের শরীরে সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলা এবং কোষগুলি যে কোন ভাবে বাড়তে থাকে। তার ফলে দূষিত অর্বুদের (Malignant tumour) সৃষ্টি হয়। টিউমার দুই রকমের—তাদের মধ্যে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার হচ্ছে ক্ষতিকারক এবং একেই ক্যান্সার বলা হয়।

কোন কোন বিজ্ঞানী এই মত পোষণ করেন যে, মানুষের ক্যান্সার হবার পিছনে রয়েছে অতি ক্ষুদ্র

'ভাইরাস' নামক জীবাণুর প্রভাব। এই অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসকে কেবলমাত্র ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যায়। অন্যান্য প্রাণীর বেলায় দূষিত অর্বুদ সৃষ্টিকারী ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। রকফেলার গবেষণাগারের ডাঃ পিটন রাউস প্রমাণ করেন যে, মুরগীর 'সারকোমা' (Sarcoma—Cancer of Connective tissue) হবার কারণ ভাইরাস। আমেরিকার কয়েকজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করেন যে, স্তন্যপায়ীদের কয়েক প্রকারের ক্যান্সারের কারণও ভাইরাস। ভাইরাস ইনজেকসন করে তাঁরা ইঁদুর ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের শরীরে ২০ প্রকারের দূষিত অর্বুদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের গবেষণায় জানা যায় যে, মুরগীর ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাস হাঁস, ইঁদুর ইত্যাদি প্রাণীর শরীরেও ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।

ভাইরাসের কার্যপ্রণালী নিয়ে দু'চার কথা বলা দরকার। রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, ভাইরাস কেবলমাত্র নিউক্লিক অ্যাসিডের অণুর দ্বারা গঠিত। ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করে জিনের কাজ নিজের হাতে নিয়ে নেয়। ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিডের নিয়ন্ত্রণে কোষে অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে হয় দূষিত অর্বুদ—এ হচ্ছে তাঁদের মতবাদ, যাঁরা ভাইরাস প্রকল্পে বিশ্বাস করেন। এতে অনেকে আপত্তি তুলেছেন এবং অখণ্ড যুক্তিও দেখিয়েছেন। এই প্রকল্পের প্রধান আপত্তির কারণ হলো—ক্যান্সার কেবলমাত্র একটি কারণে হয় না। পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়া, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রসায়ন, Chronic irritation, হর্মোনের অসাম্যতা, ধূমপান ইত্যাদি নানা কারণে ক্যান্সার সৃষ্ট হতে পারে। ক্যান্সার রোগ সৃষ্টিতে (বিশেষতঃ ফুসফুসের ক্যান্সার) ধূমপানের যে বিশেষ ভূমিকা আছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ডাঃ শ্রীমতী কমল রণদীভের মতে, ভারতে শতকরা পঞ্চাশ জন ক্যান্সার রোগী মুখের ক্যান্সারে ভোগেন। তার কারণ, তামাক বা জর্দা মিশ্রিত পান খাবার অভ্যাস। তামাক বা জর্দার রস প্রাণী-দেহে প্রয়োগ করবার ফলে মানুষের শরীরে দূষিত অর্বুদ সৃষ্টি হতে দেখা গেছে। কাশ্মীর ও কাংড়া উপত্যকা অঞ্চলের লোকের উদরের ক্যান্সারের কারণ হচ্ছে, তারা শীতকালে আলোয়ানের নীচে জ্বলন্ত কাঠকয়লা ভর্তি হাঁড়ি বা গরমজলের বোতল নিয়ে চলাফেরা করে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণায় এক চমকপ্রদ তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। ব্যাক্টিরিয়ার উপর ভাইরাসের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করবার সময় তাঁরা দেখেছেন যে, ভাইরাস নির্দোষ অবস্থায় থাকতে পারে। তেজস্ক্রিয় রশ্মি, ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রসায়ন নির্দোষ ভাইরাস অণুকে অনিষ্টকারী অবস্থায় পরিণত করে।

শরীরের যে কোন জায়গায় ক্যান্সার হতে পারে। তবে সাধারণতঃ কোমল জায়গায় ক্যান্সার হয়। দূষিত অর্বুদ দুটি স্তর থেকে উৎপন্ন হয়—এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্ম।

চিকিৎসা :—ক্যান্সার রোগে তিন ধরণের চিকিৎসা হতে পারে—

(১) শল্য-চিকিৎসা

(২) তেজস্ক্রিয়ার চিকিৎসা

(৩) ওষুধ (Chemotherapeutic)

ক্যান্সার রোগ দুরারোগ্য ব্যাধি নয়, তবে প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না হলে এই রোগ থেকে আরোগ লাভ করা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়। শল্য ও তেজস্ক্রিয় চিকিৎসাই হচ্ছে বর্তমানে এই রোগের চিকিৎসার প্রধান উপায়। এই রোগের ওষুধ বের করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। হফমেন-লা-রচির (Hoffman-La-Roche) '5-FU' নামক ওষুধ প্রয়োগে শতকরা পাঁচ ভাগ লোকের ক্যান্সার রোধ করতে সক্ষম হয়েছে। শল্য-চিকিৎসা কেবলমাত্র প্রথম অবস্থায় ফলপ্রদ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ক্যান্সার চিকিৎসার ভেলা

(বৈজ্ঞানিক নাম Semecarpus anacardium এবং সংস্কৃত নাম 'ভল্লাতক') ব্যবহার করা হয়।

তেজস্ক্রিয় রশ্মি দিয়ে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। শক্তিশালী রঞ্জেন রশ্মি, রেডিয়াম, রেডন ও রেডিও-আইসোটোপের সাহায্যে এই রোগের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়। জরায়ুর ক্যান্সারে রেডিও-কোবাল্টের (C^{60}) চিকিৎসায় সুফল পাওয়া গেছে। রক্তের ক্যান্সার (Blood Leukaemia) রেডিও-ফস্ফরাস (P^{32}) দিয়ে চিকিৎসিত হচ্ছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, প্রথম অবস্থায় ধরা না পড়লে ক্যান্সার রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করা যায় না। সাধারণ লোকের জানবার জন্যে ক্যান্সার রোগের নিম্নলিখিত কতকগুলি লক্ষণ উল্লেখ করা হলো। এদের একটিরও আবির্ভাব হলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

(১) কোন ঘা—যা বহুদিন শুকায় না।

(২) শরীরের কোন জায়গা যদি ফুলে ওঠে।

(৩) অহেতুক রক্তপাত।

(৪) ক্রমাগত হজমের গণ্ডগোল ও খাবার খেতে কষ্ট।

(৫) ক্রমাগত কাশি।

(৬) কোষ্ঠ পরিষ্কারের সাধারণ অভ্যাসের পরিবর্তন।

ক্যান্সার সম্বন্ধে লোকের অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, এই রোগ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয়। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এটা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই রোগ বংশানুক্রমে সংক্রামিত হয় না। যদিও কোন কোন বংশে বংশানুক্রমে ক্যান্সার হতে দেখা গেছে। ক্যান্সার সম্বন্ধে আরো ব্যাপক গবেষণার দরকার।

কোষের জৈব রসায়ন নিয়ে আরো গভীর গবেষণার ফলে আশা করা যায়, এই বিষয়ে আরও অনেক কিছু জানা যাবে।

আয়নোস্ফিয়ার এবং ভ্যান অ্যালেন রি

শ্রীভাস্কর ঘোষ

ভূপৃষ্ঠের উপরে যে সুদূরবিস্তৃত বায়ুমণ্ডল রয়েছে, তার সীমা কতখানি, কত দূর গেলে আর বায়ুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না—তার চেয়েও উপরে উঠলে সেই অসীম শূন্যের রূপ কেমন দেখা যায়? এসব প্রশ্ন প্রায়ই মানুষের মনে জাগে। স্পেশ বা শূন্য-জয়ের কল্পনা মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন। আজ-কের বিজ্ঞান তার অভাবনীয় অগ্রগতির কতকগুলি স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছে গ্রহলোকের সঙ্গে বেতার-সংযোগ স্থাপন করে, পৃথিবীর চারদিকে রকেটে করে মানুষকে পরিক্রমা করিয়ে, কৃত্রিম উপগ্রহের জন্ম দিয়ে।

আয়নোস্ফিয়ারের কথা বিজ্ঞানীরা জেনেছিলেন আজ থেকে অর্ধ শতাধিক বছর আগে, যখন মার্কনি বেতার-তরঙ্গকে ভূপৃষ্ঠের এক কেন্দ্র থেকে বহু দূরবর্তী অপর এক কেন্দ্রে প্রেরণ করতে সফল হন। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ মাইল উপর থেকে আরম্ভ হয়ে যে শূন্য-স্তরটি (Space layer) কয়েক সহস্র মাইল দূর অবধি বিস্তৃত, তার গঠন সম্পর্কে পুঙ্খানু-পুঙ্খ গবেষণা এবং পরীক্ষাকার্য চালানো হয় মাত্র কয়েক বছর আগে। পৃথিবীর ৬৭টি দেশের পাঁচ হাজারেরও বেশী বিজ্ঞানী একত্রে এই গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, ১৯৫৭-৫৮ সালে, অর্থাৎ IGY তথা আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানবর্ষে। তার অনুবৃত্তি করে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তাঁরা যে

আবিষ্কারগুলি করতে সক্ষম হন, তার মধ্যে আয়নোস্ফিয়ারের থেকে সুরু করে ভ্যান অ্যালেন রিং (বা ভ্যান অ্যালেন বেল্ট) অন্যতম।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করে একের পর এক স্তরগুলি, যথা—ট্রপোস্ফিয়ার, ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং আয়নোস্ফিয়ার পার হয়ে নক্ষত্রলোকে যাত্রা করতে হলে মহাকাশগামী রকেটের গতি এবং দিক স্থির রাখতে হয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় অমিত শক্তির। কিন্তু রকেটের শীর্ষ থেকে যে উপগ্রহটি বেরিয়ে যায়, তাকে যদি আবার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হয়, তাহলে বিজ্ঞানীরা মূলতঃ ছুটি অসুবিধার সম্মুখীন হন। প্রথমতঃ, একটি নির্দিষ্ট কোণে তাকে অনুপ্রবেশ করতে হবে, যাতে ঘর্ষণজনিত তাপ এবং স্পিনিং বা নিজের অক্ষের লাট্টুর মত ঘোরা কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, আয়নোস্ফিয়ার এবং ভ্যান অ্যালেন রিং-এর প্রভাব, যা মানবদেহকে ক্ষত-বিক্ষত ও জীর্ণ করে ফেলে। প্রথম বাধাটি অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ তা সম্পূর্ণ গাণিতিক নির্ভুলতার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বিপত্তি এবং সংঘাতের ভয় আছে। মাত্র কয়েক বছর আগে, অর্থাৎ ভ্যান অ্যালেন রিং আবিষ্কৃত হবার কিছু পরে এই বিকিরণজনিত বিপত্তির হাত থেকে রেহাই পাবার পথ দেখেছে বিজ্ঞান—হয় একে এড়িয়ে যেতে হবে, নয়তো উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা করতে হবে।

ভ্যান অ্যালেন বেল্ট বায়ুমণ্ডলের তড়িতাবিষ্ট তেজস্ক্রিয় কণিকার পরিবেষ্টনী—যার নিম্নতম স্তরের সামান্যতম প্রভাব থেকে নিরাপদ হতে হলে অন্ততঃ ভূপৃষ্ঠ থেকে ১২০ মাইলের মধ্যে থাকতে হবে। মূলতঃ এক্স-রশ্মি, আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, বেতার-তরঙ্গ প্রভৃতি এর মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে। তবে সময় বিশেষে, অর্থাৎ পৃথিবীর উপর চৌম্বক ঝটিকা-প্রবাহ এবং সৌরকলঙ্কের পরিমাণ অনুসারে এই পরিবেষ্টনী পৃথিবীর কাছাকাছিও আসতে পারে, আবার দূরেও সরে যেতে পারে। তবে এই পরিবর্তনের মান সীমিত। ভ্যান অ্যালেন রিং-এর আবিষ্কর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জেম্‌স্ ভ্যান অ্যালেন এবং এতে সোভিয়েট বিজ্ঞানী সুডাকভ এবং ভ্যান অ্যালেনের স্বদেশীয় বিজ্ঞানী ডাঃ বেনেটের সহযোগিতা অনস্বীকার্য। ভ্যান অ্যালেন রিং আয়নোস্ফিয়ারের বহিরাংশ থেকে সুরু, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬২৫—৩৫,০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিশাল পরিধির বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রার আধান-ঘনত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে, অর্থাৎ তড়িতাবিষ্ট বস্তুকণাগুলির পরিমাণ বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন।

সর্বাধুনিক পরীক্ষায় জানা গেছে যে, ভ্যান অ্যালেন বেল্ট দুটি প্রধান স্তরে বিভক্ত এবং এই দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্থানকে বৈদ্যুতিক শূন্যের (Electrical Vacuum) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

ভ্যান অ্যালেন বেল্টের উৎপত্তি কি ভাবে হয়, এ নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং দুটি বলয়ের অন্তর্বর্তী অংশে তড়িতাবিষ্ট বস্তুকণার অনুপস্থিতি অথবা অনুল্লেখযোগ্য অবস্থিতি কি কারণে ঘটে, তা এখনও সঠিক জানা যায় নি। তবে এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়া গেছে যে, দুটি পৃথক ঘটনায় দুই দূরবর্তী বলয়ের উৎপত্তি হয় এবং অন্তর্বলয়ের এক স্থানে—পৃথিবী থেকে প্রায় ২৫০০ মাইল তফাতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে শক্তি সঞ্চিত হয়, যেখানকার বিকিরণ চার ঘণ্টার মধ্যে একটি মানুষের জীবন নাশে সক্ষম।

বহির্বলয়ের সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয় যে, সূর্য থেকে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণ পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে তারা ঠিক আলোক-তরঙ্গের মত, কোন বাধা পেলে তিনটি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক অংশ সেই বাধা অতিক্রম করে পৃথিবীর দিকে চলে আসে, তার মধ্যে এক্স-রশ্মির অস্তিত্ব থাকে না। দ্বিতীয় অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে

মিলিয়ে যায়। অবশিষ্ট বিকিরণ সঞ্চিত শক্তিরূপে ভ্যান অ্যালেন বেল্টের উৎপত্তি করে। আয়নোস্ফিয়ার একটা তার বহিরাকাশের মাধ্যাকর্ষণজনিত

ভ্যান অ্যালেন রিং-এর A B অংশটি [যা পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে ৬২৫ মাইল উপরে সুরু হয়ে ৬২৫০ মাইল পর্যন্ত প্রসারিত] প্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং এই অংশটি নিয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথমে গবেষণা সুরু করেন। কারণ মহাকাশযানে মানুষ যখন পৃথিবী পরিক্রমা করবে, তখন তার এই অংশের সংস্পর্শে আসবার ভয় থাকে। C D অংশটি ঠিক কতদূর বিস্তৃত, তা এখন পর্যন্ত সঠিক জানা না গেলেও প্রায় ৩৫,০০০ মাইল পর্যন্ত এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এই অংশটি নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে অপেক্ষাকৃত কম আলোড়ন দেখা যায়। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—উত্তর মেরু থেকে এই পরিবেষ্টনীর আপেক্ষিক দূরত্ব দক্ষিণ মেরুর দূরত্বের চেয়ে বেশী।

চৌম্বক রেখাগুলি এই শক্তিকে যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখে।

অন্তর্বলয়ের উৎপত্তি হয়েছে বায়ুমণ্ডলের কস্‌মিক রশ্মির ভয়াবহ বিস্ফোরণজনিত বিদ্যুতাবিষ্ট কণা থেকে। এই স্তরের মধ্যে প্রোটন এবং ইলেকট্রন-গুলি অশেষ শক্তিসম্পন্ন: প্রায় কয়েক কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের সমান।

যে আবিষ্ট কণাসমূহ বলয় ছুটির মধ্যে ধরা পড়ে আছে, তাদের ব্যবহার কিছুটা বিশিষ্ট ধরণের। এই কণাগুলি ভূচৌম্বক রেখা বরাবর প্রচণ্ড বেগে স্ক্রুর পাকের মত প্যাঁচানো গতিতে এগিয়ে যায় এবং এই শ্রেণীর অসংখ্য “ফাঁদ” একত্রিত হয়ে একটি বলয়ের আকার ধারণ করে।

এক্সপ্লোরার-এক ও এক্সপ্লোরার-তিন নামে ছুটি মার্কিন উপগ্রহ থেকে যে তথ্যাবলী জানা গেছে, তাতে কেবলমাত্র অন্তর্বলয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভ্যান অ্যালেন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু বহির্বলয়ের পরিচয় তখনও অজানা ছিল। কারণ পূর্বোক্ত ছুটি উপগ্রহের কোনটিই বহির্বলয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে নি।

কস্‌মিক রশ্মির বিস্ফোরণ হয় এবং তার ফলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড বাত্যা প্রবাহিত হয়, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কস্‌মিক রশ্মির পরিমাণ অনেকাংশে সৌরকলঙ্কের উপর নির্ভর করে। ভূপৃষ্ঠের উপর কস্‌মিক রশ্মির প্রতিফলনের হার যখন কম হয় তখন দেখা যায়, সৌরকলঙ্ক অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চৌম্বক ঝটিকা ঘটতে বিলম্ব হয় না। এর পর সূর্য আবার স্বাভাবিক আলোড়নহীন শান্ত অবস্থায় ফিরে এলেও তার বেশ কয়েক সপ্তাহ পরে বায়ুমণ্ডলে কস্‌মিক রশ্মির পরিমাণ আবার সাধারণ অবস্থা ফিরে পায়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে সম্যক উপলব্ধি করা যায় যে, কস্‌মিক রশ্মির বিস্ফোরণের

বর্ধিতাকার চৌম্বকরেখা তড়িতাহিত কণিকার-কর্কস্ক্রু-সদৃশ গতি
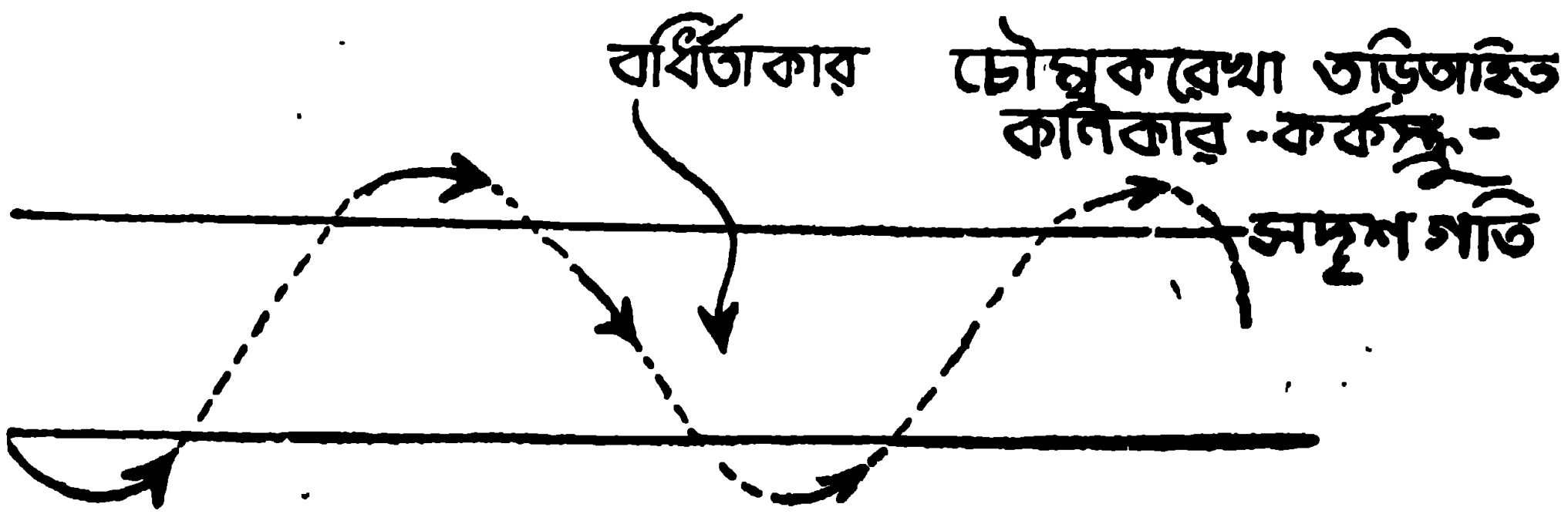
তড়িতাহিত কণিকার স্ক্রুর মত প্যাঁচানো গতি।

তারপর সোভিয়েট উপগ্রহ স্পুটনিক-তিন উত্তর মেরুর উত্তরাংশে, অর্থাৎ সমগ্র মেরুজ্যোতির এলাকায় বিকিরণ বলয়ের অস্তিত্ব পেল। কিন্তু ভ্যান অ্যালেন অন্তর্বলয়ের সেখানে কোনই অস্তিত্ব নেই। তখন সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এই অংশে বিকিরণ ধরা পড়ে আছে। কিন্তু মার্কিন উপগ্রহ পাইওনিয়ার-তিন যখন প্রায় ৬৩,০০০ মাইল উপরে উঠলো, তখনই প্রমাণ হয়ে গেল যে, এতটা উঁচুতে উঠতে তাকে ছুটি বলয়ের বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাও তাঁদের পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত ব্যাখ্যা পেয়ে গেলেন।

সূর্য থেকে বিকিরণ অনিয়মিত এবং বেশী হলে ফলে যে তড়িতাহিত কণিকার উদ্ভব হয়েছিল, তাদের অধিকাংশকে ভ্যান অ্যালেন রিং গ্রাস করেছে।

এই মহাজাগতিক বিকিরণ পরিবেষ্টনীর কেবল যে কোন মানুষ মারবার ক্ষমতা আছে, তাই নয়, এর অন্তঃস্থিত এক্স-রশ্মি থেকে মানবদেহে বিভিন্ন রোগও হয়। ত্বক এবং স্নায়ুতন্ত্রের বিকৃতি, চোখের ছানি এবং গ্লোকোমা—এমন কি, প্রজননতন্ত্রের অকর্মণ্যতাও এই বিকিরণজনিত অন্যতম ব্যাধি।

মহাকাশচারী মানুষকে এই ভয়াবহ বিকিরণ কুণ্ডলী থেকে রক্ষা করবার জন্যে ছুই রকমের বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। একটি হলো, সীসার আধার দিয়ে সমগ্র মহাকাশযানটিকে ঢেকে দেওয়া। এক ইঞ্চি পুরু সীসা শতকরা ৯০ ভাগ বিকিরণ

রোধ করতে পারে এবং ছয় ইঞ্চি পুরু সীসা শতকরা ৯৯ ভাগ বিকিরণ রোধে সক্ষম। তবে সীসার অসুবিধা হচ্ছে এই যে মহাকাশযানের ওজন অনাবশ্যকরূপে বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয় বিকল্প হচ্ছে—মেরু এলাকা থেকে রকেট উৎক্ষেপ করা। তাহলে অনেকাংশে বিকিরণকে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

ভ্যান অ্যালেন বেল্টের আবিষ্কর্তা ডাঃ জেম্স্ ভ্যান অ্যালেন একবার একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন—মানুষের দ্বারা আলোকের গতিবেগের সমান গতিবেগ অর্জন করবার সম্ভাবনা কম। কারণ, তড়িতাহিত হাইড্রোজেন অ্যাটম, তথা প্রোটন কণিকা শূন্যে যে ভ্যাকুয়াম তৈরী করে রেখেছে, তা কোন মানুষ আজ পর্যন্ত গবেষণাগারে করতে পারে নি। এক ঘনসেন্টিমিটার আন্তর্নাক্ষত্রিক স্থানের মধ্যে একটি মাত্র হাইড্রোজেন পরমাণু অধিষ্ঠান করে। ডাঃ ভ্যান অ্যালেন গণনা করে দেখেছেন যে, আলোকের তিন-দশমাংশ গতিতে ধাবমান [৫৬,০০০ মা/সে] রকেটের গায়ে হাইড্রোজেন কণিকার সংঘাতের ফলে যে ক্ষয় হবে, সেই ক্ষয় রোধ করবার মত পদার্থ রকেটে ব্যবহারোপযোগী নয়। যদি কোনও দিন বিজ্ঞানীরা তেমন কোন সঙ্কর ধাতু উৎপন্ন করতে সক্ষম হন, তবে মহাজাগতিক বিকিরণকে অগ্রাহ্য করে মানুষ মহাকাশের যে কোন স্থানে বিচরণ করতে পারবে।

সবচেয়ে ছোট পাখী

শ্রীপতাকীরাম চন্দ্র

প্রকৃতির রাজ্যে সমস্ত প্রাণীর মধ্যে পাখীর সম্বন্ধেই মানুষ বোধহয় সবচেয়ে বেশী কৌতূহলী। এদের অপরূপ দৈহিক সৌন্দর্য, ওড়বার দক্ষতা ও ভঙ্গী এবং মিষ্টি কাকলি শুধু কবি নয়, সাধারণ মানুষকেও চিরদিন আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু পাখীদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট যারা, তাদের সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কিছু জানে না—তারা ছোট বলেই হয়তো সকলের নজর এড়িয়ে যায়। শুধু সৌন্দর্য নয়, অন্যান্য অনেক দিক থেকেই কিন্তু এই ছোট পাখীরা অতুলনীয়।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ার কিছু অংশে 'সান বার্ড' নামে এক জাতের ছোট পাখী এবং উত্তর আমেরিকার 'হামিং বার্ড' নামে আর এক জাতের ছোট পাখী পাওয়া যায়। পাখীদের মধ্যে হামিং বার্ড অনেক দিক থেকেই অদ্বিতীয়। বেশীর ভাগ হামিং বার্ড বড় জাতের গুব্‌রে পোকার চেয়েও ছোট। কিন্তু এত ছোট হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন হামিং বার্ড বার্ষিক পরিক্রমাকালে হাজার হাজার মাইল যাতায়াত করে। পাখীদের মধ্যে একমাত্র হামিং বার্ডই পিছন দিকে উড়তে পারে। কোন কোন হামিং বার্ড সেকেণ্ডে পঞ্চাশবার পর্যন্ত ডানা নাড়াতে পারে। অন্যান্য পাখীর চেয়ে এদের দৈহিক গঠনেও অনেক বিশেষত্ব আছে। প্রজাতির বিপুল সংখ্যা, ভৌগোলিক বিস্তৃতির সীমাবদ্ধতা প্রভৃতি বিশেষত্বের জন্যে হামিং বার্ডের গোত্র "ট্রোকিলাইডি" বহু আগেই অন্যান্য পাখী থেকে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে আলাদা পথে বিবর্তিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

হামিং বার্ড ও সান বার্ড প্রায় এক রকম দেখতে ও মোটামুটি এক ধরণের স্বভাববিশিষ্ট হলেও এদের মধ্যে বহু তফাৎ আছে। হামিং বার্ডের সঙ্গে কাঠঠোক্‌রা জাতীয় পাখীর কিছু দূর সম্পর্ক আছে, কিন্তু সান বার্ড চড়ুই জাতীয় পাখীর জ্ঞাতি

সান বার্ড আমাদের দেশের পাখী বলে এখানে এদের কথা আলোচনা করা যাক।

বাংলা দেশে যে সব সান বার্ড দেখা যায়, তাদের মধ্যে প্রধান হলো নেক্টারিনিয়া এশিয়াটিকা নামের প্রজাতিটি। বাংলায় এদের দুর্গাটুনটুনি বলা হয়। সমস্ত সান বার্ডের গোত্রটিকে "নেক্টারিনাইডি" বলা হয়। এখানে দুর্গাটুনটুনি বলতে সাধারণভাবে নেক্টারিনাইডি গোত্রের সমস্ত পাখীকেই বোঝানো হয়।

দুর্গাটুনটুনি সাধারণতঃ চড়ুই পাখীর চেয়েও ছোট, কিন্তু তাদের শরীর তুলনায় আরো সরু। এদের শরীরের বেশীর ভাগ কালো হলেও শরীরের বিভিন্ন অংশে উজ্জ্বল রং দেখা যায়। এদের গলা, মাথা ও বুকে প্রায়ই ঘন নীল, সবুজ বা বেগুনী রং দেখা যায়। এই রংগুলি ময়ূরের গলার রঙের মত বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন রকমের দেখায়। পালকের সূক্ষ্ম অংশগুলি বিশেষ কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোক-রশ্মির সঙ্গে তুলনীয় হলে এবং একই দিকে পরিপাটি করে সাজানো থাকলে এই রকম ময়ূরকণ্ঠী রং দেখা যায়। এই রঙের একটা ধাতব জেল্লা থাকে। তাছাড়া সাধারণ পাখীর মত দুর্গাটুনটুনির পিঠ, পেট ও লেজের বেশ কিছু পালক হল্‌দে, লাল বা অন্য রঙের হয়ে থাকে। একই পাখীর গায়ে চার-পাঁচটা রং থাকায় এদের খুবই সুন্দর দেখায়। হামিং বার্ডের শরীরে অবশ্য এই লাল ও হল্‌দে রংগুলি দেখা যায় না।

দুর্গাটুনটুনির পুরুষদের পালকের রং সাধারণতঃ উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সাদাসিধা স্ত্রীপাখীদের তুলনায় এদের শরীরে রঙের বিন্যাসও বেশী সুন্দর। বর্ষায় এই তফাৎ খুব বেশী থাকে। শীতকালে কোন কোন জাতের পুরুষদের এই ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃই কমে আসে। এই "বার্ষিক যৌন ঔজ্জ্বল্য হ্রাস" মরুভূমির বাসিন্দাদের মধ্যে বেশী দেখা যায়। হামিং বার্ডে অবশ্য এই যৌন পার্থক্য ও ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস বিশেষ দেখা যায় না।

এদের শরীরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ হলো ঠোঁট। শরীরের তুলনায় এদের ঠোঁট আনুপাতিকভাবে অন্যান্য পাখীদের ঠোঁটের চেয়ে বড়। এদের ঠোঁটগুলি সরু ও লম্বা, কখনো সামান্য বাঁকানো, অনেকটা ইন্‌জেক্‌শনের সূচের মত। এদের জিভ সরু ও লম্বা এবং শেষের দিকে চেরা। জিভটা বন্ধ ঠোঁটের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। ফুলের মধ্যে ঠোঁট ঢুকিয়ে জিভ্‌টাকে পিছনে টেনে নিয়ে এরা ফুলের মধু টেনে নেয়।

এদের প্রধান খাদ্য হলো ফুলের মধু। অবশ্য সবাই সব ফুলের মধু খেতে পারে না। ঠোঁটের গঠন অনুযায়ী এক এক জাতের দুর্গাটুনটুনি এক এক ধরণের ফুলের মধু খায়। তাছাড়া এরা কখনো কখনো শুধু আস্বাদের জন্যে বিশেষ কোন ফুলের মধু খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কোন কোন অঞ্চলে বিশেষ জাতের দুর্গাটুনটুনিকে চাষ-করা ফসলের ফুলের মধু খেতে এমন অভ্যস্ত হতে দেখা গেছে যে, পরে ঐ ফসলের চাষের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছে।

মধু ছাড়া এরা ছোট ছোট পোকামাকড়ও খায়। এদিক থেকে এদের "মাকড়সা-শিকারী" ও "মাছিধরা" পাখীদের সঙ্গে বেশ মিল আছে।

মধু খাবার সময় এরা ফুলের গায়ে বা নিকটস্থ ছোট ডালে বসে ফুলের উপর দিয়ে গর্ভমূলে ঠোঁট ঢুকিয়ে দেয়। সর্বজয়ার মত বড় ফুলের বেলায় এরা ফুলের স্তবকের পাশে ঠোঁট দিয়ে ফুটো করে মধু খায়। কখন কখন এরা ফুলে না বসে উড়ন্ত অবস্থায়ই মধু পান করে। হামিং বার্ড অবশ্য সব সময় উড়ন্ত অবস্থাতেই মধু পান করে।

ডিম পাড়বার মরসুমে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী দুর্গাটুনটুনি একসঙ্গে থাকে। গাছের ছোট ডাল, ঝোপ বা ঐ ধরণের কোন জায়গায় এরা ন্যাসপাতির আকারের ছোট্ট সুন্দর একটি ঝুলন্ত বাসা তৈরী করে। এরা মানুষকে বিশেষ ভয় করে

না—লোকালয়ে বা বাড়ীর মধ্যেও এরা কখনো কখনো বাসা তৈরী করে। শুকনো ঘাস, শ্যাওলা বা খুব সরু খড়কুটা দিয়ে বাসা তৈরী করবার সময় এরা মাকড়সার জাল দিয়ে সেটিকে শক্ত করে। বাসায় ঢোকবার জন্যে পাশের দিকে একটা ছিদ্র থাকে। হামিং বার্ডের বাসা হয় ছোট্ট ঝুড়ির মত।

এরা সাধারণতঃ একসঙ্গে দুটি ছোট্ট ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে খুব সুন্দর। সাদা, গোলাপী বা নীলাভ চকচকে ডিমগুলির উপর প্রায়ই গাঢ় রঙের ফুট্‌কি বা ডোরাকাটা থাকে।

বাসা তৈরী করা ও ডিমে তা' দেওয়া স্ত্রী-পাখীর কাজ। পুরুষেরা খাবার জোগাড় করে, বাসা পাহারা দেয় এবং স্ত্রী-পাখীর কাজে সাহায্য করে।

দুর্গাটুনটুনির মধ্যে সবচেয়ে ছোট হলো "সিন্নিরিস মিনিমাস" প্রজাতি—এদের দেখতে এক একটা বড় মাছির মত। মালাবার উপকূল ও দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য জায়গায় এদের দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে অন্ততপক্ষে দশটি প্রজাতি ও পঁচিশটি রকমারি দুর্গাটুনটুনি পাওয়া যায়। এদের কয়েকটি দক্ষিণ ভারত এবং রাজপুতনায় থাকে। কিন্তু এদের বেশীর ভাগ হিমালয়ের পাদদেশ, উত্তর বাংলা এবং আসামের অধিবাসী। বসন্ত কালে এদের অনেকে বাংলা দেশে আসে। নেক্‌টারিনিয়া এশিয়াটিকা বা লোহিতপিঙ্গল সান বার্ড (দুর্গাটুনটুনি), নেঃ জেলোনিকা বা লোহিত-পিঙ্গলপশ্চাৎ সান বার্ড, এথোপাইজা স্যাচুরাটা বা কালোবুক সান বার্ড, এঃ সিপরাজা বা হিমালয়ের হল্‌দেপিঠ সান বার্ড, এঃ ইগ্‌নিকডা বা অগ্নিপুচ্ছ হল্‌দেপিঠ সান বার্ড এবং নেপালেন্‌সিস বা নেপালের হল্‌দেপিঠ সানবার্ড প্রধান। কলকাতার কাছেপিঠে সাধারণতঃ প্রথম দুই ধরণের দুর্গা-টুনটুনি দেখা যায়। এরা পেয়ারা, সর্বজয়া ইত্যাদি ফুলের মধু খায়।

উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণ চীন, পশ্চিমে সিরিয়া, পূর্ব আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণপূর্বে নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যস্থিত বিরাট ভূভাগে এদের দেখতে পাওয়া যায়। সাহারা ও থর মরুভূমি এবং তুষারসীমার উপরের হিমালয়েও কোন কোন দুর্গাটুনটুনিকে দেখতে পাওয়া যায়।

আকারে অত্যন্ত ছোট হলেও এই বিপুল ভৌগলিক বিস্তার, জীবনযুদ্ধে দুর্গাটুনটনির সাফল্যের প্রমাণ।

উল্কাপাতের কথা

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

উল্কাপাত চিরদিনই সাধারণ মানুষ ও বৈজ্ঞানিকদের মনে বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে বহু গবেষণা করেছেন। উল্কাপিণ্ড নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভবতঃ সুরু হয় ১৮০৩ সালে। তখনই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন যে, উল্কাপিণ্ড মহাশূন্য থেকেই পৃথিবীতে পতিত হয়। উনিশ শতকের আগে ধারণা ছিল—উল্কাপিণ্ড মহাশূন্য থেকে পতিত হয় না। এর উৎপত্তি হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরে। তখন এই বিশ্বাস ছিল যে, উল্কাপিণ্ড আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় ছড়িয়ে পড়ে। আবার অনেকের বিশ্বাস ছিল—ঝড়-বৃষ্টির সময় জলীয় বাষ্প কঠিনত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় ঐ ধরণের বস্তুর রূপ পরিগ্রহ করে

১৮০৩ সালে ফ্রান্সের লেল নামক জায়গায় প্রকাণ্ড উল্কাপাত হয়। তার ফলে বিজ্ঞানীরা তাঁদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তাঁরা স্বীকার করেন যে, এত প্রকাণ্ড উল্কা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হতে পারে না। বর্তমানে নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, উল্কাপাত তিনটি উপায়ে হতে পারে। সূর্য থেকে অনবরত নানা ধরণের ধূলা বা কঠিন বস্তু নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ, ধূমকেতুর অংশবিশেষ, যা পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। তৃতীয়তঃ অন্যান্য গ্রহনক্ষত্র থেকে নিক্ষিপ্ত নানা ধরণের কঠিন অংশ।

অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ডের গতি এবং তাদের গঠন চিরকাল সকলের মনে ঔৎসুক্য জাগিয়েছে। অবশ্য বর্তমানের জেট-প্লেনের যুগে উল্কাপাত সকলের কাছে কোন নতুনত্বের পরিচয় দেয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পতিত উল্কাপিণ্ড বহু যাদুঘর বা সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে। ১৯০৭ সালে রাশিয়ার টাঙ্গাস্‌টা নামক স্থানে প্রকাণ্ড উল্কাপাত হয়। এই পতন এত সাংঘাতিক ধরণের হয় যে, প্রায় ত্রিশ বর্গমাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত গাছ সঙ্গে সঙ্গে ভূপাতিত হয়। ১৯৪৭ সালেও রাশিয়ায় আর একটি সাংঘাতিক রকমের উল্কাপাত হয়।

১৮০৩ সালে ছাব্বিশে এপ্রিল ফ্রান্সের লেল নগরে হঠাৎ আকাশে তীব্র আলোকস্ফুরণ দেখা যায়। বহু লোক সে আলোক প্রত্যক্ষ করে। এর কিছু পরেই শত শত কামান-গর্জনের মত প্রচণ্ড শব্দে চতুর্দিক কেঁপে ওঠে। প্রায় পাঁচ-ছয় মিনিট যাবৎ যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প চলতে থাকে। চারদিক ধূলায় অন্ধকার হয়ে যায়। পরে জানা যায়, প্রকাণ্ড এক উল্কাপিণ্ডই এই সাংঘাতিক ঘটনার জন্যে দায়ী।

উল্কাপিণ্ডের গতি সাধারণতঃ প্রচণ্ড হয়ে থাকে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবার সময় এর গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল থেকে ৪৪ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। মাধ্যাকর্ষণের ফলে পৃথিবীর নিজস্ব গতিবেগের দরুণ পৃথিবীর কাছাকাছি আসবার সময়েই উল্কাপিণ্ডের গতি কমে যায়। উচ্চতর গতির কারণ—যখন পৃথিবী থেকে কোন বস্তু দূরে থাকে, তখন তার গতি সাধারণতঃ ২৬ মাইল (প্রতি সেকেণ্ডে) বা তারও বেশী হয়ে থাকে। সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর গতি সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮ মাইল। সুতরাং কোন উল্কাপিণ্ড ও পৃথিবী যদি সামনাসামনি ধাক্কা খায়, তবে তাদের গতিবেগের গড় হবে ১৮ মাইল ও ২৬ মাইলের যোগফল, অর্থাৎ ৪৪ মাইল।

উল্কাপিণ্ড পতনের ফলে পৃথিবীর নানা জায়গায় প্রকাণ্ড গহ্বর সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমে-

রিকার যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনা নামক স্থানে এই ধরণের প্রকাণ্ড একটা গহ্বর দেখা যায়। এর বেড় ৪১০০ ফুট এবং গভীরতা ৬০০ ফুট। সম্ভবতঃ ঐ উল্কাপিণ্ডের ব্যাস ছিল পঞ্চাশ ফুট।

প্রতি বছরে কত উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পতিত হয়? এই ধরণের প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। একজন বৈজ্ঞানিকের মতে—প্রত্যহ প্রায় পাঁচ-ছয়টি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বক্ষে পতিত হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যভাগে পতিত উল্কাপিণ্ডের সংগ্রহ এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এই ধরণের এক একটি উল্কাপিণ্ডের আয়তন হয় কমপক্ষে ২০ কিলোগ্র্যাম। এই হিসাব অনুযায়ী বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২০০ টন। যদিও পৃথিবীর চতুর্দিকের বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসবার সময় উল্কাপিণ্ডের আয়তন নানা কারণেই কমে যায়।

পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ড সযত্নে রক্ষিত হয়। আমেরিকায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, চিকাগোর যাদুঘর, লণ্ডনের প্রাকৃতিক বস্তুর যাদুঘর, প্যারী ও ভিয়েনার যাদুঘর প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত উল্কাপিণ্ড সকলেরই বিস্ময় উদ্রেক করে। ভূপৃষ্ঠে পতিত উল্কাপিণ্ডের বিভিন্ন ওজন ও আকৃতি হয়ে থাকে। আফ্রিকায় পতিত একটি উল্কাপিণ্ডের ওজন ৭০ টন। এই পিণ্ডটিকে সরানো সম্ভব হয় নি। ১৯০৫ সালে অ্যাডমিরাল পেরী বহু কষ্টে একখণ্ড উল্কা সংগ্রহ করে আনেন। তার ওজন ছিল ৩৪ টন। এটি পাওয়া যায় গ্রীনল্যাণ্ডে। ছোট ছোট টুক্‌রা পাথরের আকারে অজস্র উল্কাপিণ্ডও দেখা যায়। প্রায় প্রতিটি পিণ্ডের গায়েই প্রায় ১/১৬ ইঞ্চি পুরু আলকাৎরা জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। এগুলি সম্ভবতঃ পতনের সময় জ্বলে যাওয়ায় ঐ ভাবে পিণ্ডের গায়ে মাখানো অবস্থায় থাকে। উল্কাপিণ্ডগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। এক ধরণের উল্কার প্রধান উপাদান লোহা ও নিকেল। পাথরের আকারের আর এক ধরণের পিণ্ডের উপাদান নানা রকমের ধাতব পদার্থ। তৃতীয় ধরণের পিণ্ডের উপাদান পাথর ও লোহা।

উল্কাপিণ্ডের সাহায্যেই বিজ্ঞানীরা নভোমণ্ডল সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। সৌরমণ্ডলে বিভিন্ন ধাতুর অস্তিত্ব উল্কাপিণ্ড পরীক্ষা করেই জানা গেছে। কোন কোন উল্কাপিণ্ডে ৫% থেকে ২০% পর্যন্ত নিকেল পাওয়া গেছে। বাকী অংশ প্রধানতঃ লোহা। অংশের মধ্যে সিলিকা (SiO_2) ৩৭% থেকে ৫৫%, তাছাড়া অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগ্‌নেসিয়াম ইত্যাদি ধাতুও কম-বেশী পরিমাণে থাকে। কোন কোন উল্কাপিণ্ডের গঠন-উপাদান অতি জটিল। তার মধ্যে নরম কাঁচের মত পদার্থও দেখা গেছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরণের উল্কাপিণ্ড ছোট ছোট কতকগুলি স্ফটিক বা ক্রিষ্ট্যালের সমষ্টি। এর মধ্যে লোহার সালফাইডই (FeS) বেশী পরিমাণে থাকে। কোন কোন পিণ্ডে Pyroxene-ও থাকে। আবার কোন কোন পিণ্ডের মধ্যে হীরকের সন্ধানও পাওয়া গেছে।

নানাবিধ পরীক্ষার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে যে, উল্কাপিণ্ড প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গ্রহ বা নক্ষত্রের ছিন্ন বা টুক্‌রা অংশ-বিশেষ। নভোমণ্ডলে নিরন্তর এই ধরণের পিণ্ড প্রচণ্ড বেগে ছুটে বেড়াচ্ছে। সেগুলিই কোন কোন সময়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে এসে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

সম্ভবতঃ উল্কাপিণ্ড সম্বন্ধে মানুষের গবেষণা কোন দিন শেষ হবে না। উল্কাপিণ্ডের ধাতব এবং আকৃতিগত রহস্য চিরদিন মানুষকে চিন্তা বা গবেষণার খোরাক জোগাবে। জাগতিক নানা রহস্যের দ্বার হয়তো এভাবেই মানুষের কাছে উন্মুক্ত হবে।

ভূকম্পন-সৃষ্ট দোলনের দ্বারা পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ গঠন নিরূপণ

শ্রীসুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত

পৃথিবীর গভীরে ভূ-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা হইয়াছে। তাহার মধ্যে ভূ-কম্পনের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া অনেকাংশে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। এই বিষয়ে গবেষণার গতি ঘুরিয়া গিয়াছে একটি বিশেষ শক্তিশালী ভূকম্পনকে কেন্দ্র করিয়া। ১৯৫২ সালে কামস্কাট্‌কা উপদ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প হয়। তাহা আমাদের পৃথিবীকে এত জোরে নাড়া দেয় যে, পৃথিবীর সমস্ত অংশই অল্পবিস্তর একত্রে ঘড়ির দোলকের ন্যায় দুলিয়া উঠে। অনুরূপ ঘটনা গত ১৯৬০ সালে চিলির ভূমিকম্পেও ঘটিয়াছে। মোটা-মুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, চিলির ভূ-কম্পনের ফলে পৃথিবীবক্ষে যে সকল তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যেকটির এক পূর্ণদোলনের সময় কয়েক সেকেণ্ড হইতে এক ঘণ্টা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। প্রতি পূর্ণদোলনের অধিক সময়ব্যাপী তরঙ্গগুলিই আমাদের পৃথিবীর গভীরের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করিতে সাহায্য করিয়াছে।

ভূকম্পনের বিষয়ে মূল কথা হইতেছে যে, একটি সীমাবদ্ধ স্থানে অকস্মাৎ প্রভূত গতিসম্পন্ন শক্তি মুক্তি পাইয়া থাকে। সাধারণতঃ এই শক্তি তুলনা-মূলকভাবে পরিমাণে অল্প হইলে দুই প্রকার তরঙ্গরূপে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়া দীর্ঘ সময়ে বিলীন হইয়া থাকে। এই তরঙ্গগুলি যখন কোন স্থান অতিক্রম করিতে থাকে, তখন সেই স্থান নাতিদীর্ঘ সময় তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। এই সাধারণ তরঙ্গগুলির দোলনকাল কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। যদি ভূকম্পনশক্তির শৃঙ্খলমুক্তির ক্ষেত্র ভূত্বকের নিকটে হয়, তাহা হইলে কিছু তরঙ্গ ত্বকের উপর দিয়া প্রবাহিত হয়। এই ত্বকসন্নিহিত তরঙ্গগুলির দোলন-কাল কিছু বেশী—২০ সেকেণ্ড হইতে এক মিনিট পর্যন্ত।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, কোন বড় জিনিষে দোলন সৃষ্টি করিতে অধিক শক্তিব্যয়ের প্রয়োজন হয়। আমরা যদি ঘরের দেওয়ালে হাত দিয়া আঘাত করি, তাহা হইলে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হইবে। এই তরঙ্গগুলির প্রকৃষ্ট যন্ত্রাদি ব্যতীত ধরা পড়িবার সম্ভাবনা নাই। সেই কারণে এইরূপ সামান্য আলোড়নকে দেওয়ালের সামান্য অংশের আলোড়নরূপে চিন্তা করিতেই আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ইহাকে বৃহৎ দেওয়ালের সামান্যতম আলোড়নও মনে করা যাইতে পারে। এখন দেওয়ালটির দোলন-কাল দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব হইতে পারে। দীর্ঘ দোলন-কাল সৃষ্টি করিতে অধিক শক্তির প্রয়োজন হইবে। পৃথিবীর ক্ষেত্রেও এই কথাই প্রযোজ্য। প্রত্যেক বস্তুতেই এইরূপ অসংখ্য দোলন-কালযুক্ত আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া থাকে। সময়-গুলি অসংখ্য হইলেও দীর্ঘতম দোলন-কাল কিন্তু সাধারণতঃ কয়েক সেকেণ্ড বা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই দীর্ঘতম দোলন-কাল ৫৭ মিনিট মাত্র। এখন যদি ভূমিকম্পের প্রারম্ভিক আলোড়ন বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে ৫৭ মিনিট দোলন-কাল ও অন্যান্য অনতিদীর্ঘ দোলন-কালযুক্ত আলোড়ন সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে। ১৯৬০ সালের চিলির ভূমিকম্প সত্যই এই সকল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

এখন বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধানের বিষয় হইল, পৃথিবীর গঠন কিরূপ হইলে এইরূপ দোলন-কালযুক্ত আলোড়নের সৃষ্টি হইতে পারে। স্বভাবতঃই

প্রথমে মনে করা হইল—সম্পূর্ণ পৃথিবী একই বস্তুর দ্বারা গঠিত এবং ভূমিকম্পে পৃথিবী-গোলকের দোলন হয় কেন্দ্রমুখী। ইহাতে পৃথিবীর ঘনত্ব একটি বিশেষ সংখ্যা ধরিলে দীর্ঘতম দোলন-কাল পাওয়া যায় প্রায় ৪৫ মিনিট। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ইহা অত্যন্তরূপে ঘনত্ব সংখ্যা ধরিবার অপেক্ষা রাখে। সেই জন্য নানা কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন গঠন-প্রকৃতি ধরা হইয়াছে। বিভিন্ন মতে, গঠন-প্রকৃতির মধ্যে প্রধান বলা যাইতে পারে—(১) বুলেন$_{খ}$ (২) বুলেন$_{ক১}$ (৩) বুলেন$_{ক২}$ (৪) বুলার্ড$_{১}$ (৫) বুলার্ড$_{২}$ পৃথিবীর প্রতিকৃতিগুলিকে।

বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতি পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ চাপ ও চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে এই প্রতিকৃতিতে পৃথিবীকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। সর্বাপেক্ষা উপরের অংশ ২৯০০ কিলোমিটার পুরু এবং ইহাতে ঘনত্ব প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ৩ গ্রাম হইতে বর্ধিত হইয়া ৫½ গ্রাম পর্যন্ত হইয়াছে। ইহার নিম্নের অংশ ২২০০ কিলোমিটার পুরু ও তরল অবস্থায় আছে। ইহার ঘনত্ব ৯½ হইতে বর্ধিত হইয়া সর্বনিম্নে ১২ হইয়াছে। ইহার পরে পৃথিবীর অবশিষ্ট ১২০০ কিলোমিটার কঠিন পদার্থ ও ইহার ঘনত্ব প্রায় প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১৮ গ্রাম।

বুলেন$_{ক১}$ প্রতিকৃতিতে বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতি হইতে সামান্য পার্থক্য আছে। ইহাতে ভিতরের দুইটি অংশকে একত্র করিয়া তরল পদার্থের দ্বারা গঠিত চিন্তা করা হইয়াছে। ঘনত্ব ভেদ বুলেন$_{খ}$ -এর ন্যায় মনে করা হইয়াছে।

বুলেন$_{ক২}$ প্রতিকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথিবী কঠিন পদার্থের দ্বারা নির্মিত, কিন্তু ঘনত্ব পরিবর্তনের হার বুলেন$_{খ}$ -এর ন্যায়।

বুলার্ড$_{১}$ প্রতিকৃতিতে বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতি হইতে কেবলমাত্র সর্বোপরিস্থ ৪০০ কিলোমিটারে সামান্য প্রভেদ আছে। প্রায় ১০০০ কিলোমিটার নিম্নে হঠাৎ প্রতি ঘনসেন্টিমিটারে ১ গ্রাম ঘনত্ব বৃদ্ধিই হইতেছে বুলার্ড$_{২}$ প্রতিকৃতির বৈশিষ্ট্য। তাহা ব্যতীত অন্য সকল বিষয়েই বুলার্ড$_{১}$ ও বুলার্ড$_{২}$ সহগামী। আরও অন্যান্য প্রতিকৃতি আছে। কিন্তু বর্তমানে এইগুলিই যথেষ্ট হইবে।

পিকারিস গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দুইটি দীর্ঘতম কেন্দ্রমুখী আলোড়নের দোলন-কাল ২৬.৭ ও ১০.৬ মিনিট হয় বুলেন$_{ক২}$ প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে। বুলেন$_{খ}$ -এর ক্ষেত্রে হয় ইহা যথাক্রমে ২০.৭ ও ১০.২ মিনিট। ইহাতে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপরিউক্ত দুইটি প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘতম দোলন-কালের পার্থক্য যথেষ্ট বেশী।

কিন্তু পৃথিবীর স্বাভাবিক আলোড়ন কেন্দ্রাভিমুখী না হইয়া একটি অক্ষের চতুর্দিকে দোলনরূপে হইতে পারে সাধারণ ঘড়ির দোলকের ন্যায়। ইহাকে অক্ষীয় দোলন বলা যাইতে পারে। এই প্রকার দোলনে পৃথিবী ঘড়ির চাকার ন্যায় না হইয়া গোলাকার হওয়াতে দোলনের অক্ষ অপেক্ষা বিভিন্ন অক্ষাংশে ও দ্রাঘিমাংশে দোলন-পরিমাণ কম-বেশী হইতে পারে। এই কম-বেশীর পরিমাপ অসংখ্যরূপে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, প্রধান তিন প্রকার দোলনবিস্তৃতি অনুসারে তিনটি দীর্ঘতম দোলন-কাল যথাক্রমে ৪৪.১, ১২.৭ ও ৭.৩ মিনিট অথবা ২৮.৬, ১১.৬ ও ৭.১ মিনিট বা ২১.৯, ১০.৫ ও ৬.৯ মিনিট। এই সমস্ত গণনা বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতি অনুসারে। কিন্তু বুলেন$_{ক২}$ প্রতিকৃতি অনুসারেও সময়গুলি প্রায় একই মানবিশিষ্ট। বুলেন$_{ক২}$ প্রতিকৃতি প্রকৃত অবস্থা হইতে বহুদূরে, কারণ তাহাতে সমস্ত পৃথিবীকে একপ্রকার পদার্থ দ্বারা গঠিত মনে করা হইয়াছে। এই সকল কারণে অক্ষাবলম্বী দোলন হইতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গঠন নির্ণয়ে সাহায্য পাইবার আশা নাই।

পিকারিস তখন হস্‌কিন্স (১৯২০) প্রবর্তিত অক্ষাবলম্বী বা কেন্দ্রাভিমুখী দোলন নিরপেক্ষ অন্যপ্রকার দোলনের কথা চিন্তা করিলেন। এই দোলনের বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহাতে পৃথিবীগোলক দোলনের সময় ডিম্বাকৃতি হইয়া সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। ইহাতে পৃথিবী-গোলকের কোন ব্যাসের চতুর্দিকে কোন ঘূর্ণ. নাই। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, কেন্দ্রাভিমুখী দোলন ইহারই বিশেষ উদাহরণ মাত্র। কেন্দ্রাভিমুখী দোলন সৃষ্ট হইতে পারে না, যেখানে পৃথিবীর কেন্দ্র তরল মনে করা হইয়াছে। সেই জন্য বুলেন$_{খ}$ বা বুলেন$_{ক২}$ মাত্র বিবেচনাযোগ্য থাকে। নিম্ন তালিকায় গণনার ফল বিভিন্ন প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে দীর্ঘতম দোলন-কালগুলি মিনিট মানে দেওয়া হইল।

বুলেন ক$_{২}$	বুলেন ক$_{১}$	বুলেন খ	বুলার্ড$_{১}$	বুলার্ড$_{২}$
২৬.৭	৫৬.০	২০.৬৫	৫৩.৪	৫৩.২
১০.৬	২৫.২	১০.২	২৫.৮	২৪.০
৪৪.৩	১৬.৩	৫৩.৭	১৫.৫	১৫.০
	১০.৪	২৪.৭	৯.৮	৩৫.৫
	৭.৯	১৫.৫	৮.০	১৭.৪
		৯.৮		১৩.১
		৮.০		২৫.৩
		৩৫.৫		১৪.০
		১৭.৯		১১.৮
		১৩.৬		
		২৫.৭		
		১৪.৪		

ইহাতে অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের দোলনবিস্তৃতি ধরা হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে. এই সকল সময়গুলি যন্ত্রে ধরা পড়িয়াছে কি না। ১৯৫২ সাল হইতে এই বিষয়ে পরীক্ষা চালনা করা হইতেছে। ১৯৫২ সালে বেনিয়ফ এইরূপ দীর্ঘ দোলন-কাল পরিমাপক ভূকম্পমান যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাহার কিছুকাল পরেই কামস্কাট্‌কা উপদ্বীপে প্রবল ভূমিকম্প হয়। বেনিয়ফের যন্ত্রে দুইটি দোলন-কাল ধরা পড়ে; যথা, ৫৭ মিনিট ও ১০০ মিনিট। এই ১০০ মিনিট দোলন-কালকে পিকারিস মনে করিয়াছেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল অংশের দোলন। কিন্তু ইহা উপরে ধরা না পড়িবার সম্ভাবনা। সেই জন্য ইহা সত্যই ধরা পড়িয়াছে, না যান্ত্রিক গোলযোগের দরুণ মনে হইতেছে, তাহার বিচার আবশ্যক।

ইহার পর ১৯৬০ সালের ২২শে মে, চিলির প্রবল ভূকম্পন হয়। এবারও বেনিয়ফের যন্ত্রে কামস্কাট্‌কার ভূমিকম্পের অনুরূপ দোলন-কালগুলি ধরা পড়ে। এবারে অনেক অধিক সংখ্যায় দীর্ঘ দোলন-কালগুলি যন্ত্রের পরিলিখন হইতে আবিষ্কৃত হয়। বৈজ্ঞানিক প্রেস্‌ও নিরপেক্ষভাবে নিজের যন্ত্রে পরিলিখিত দীর্ঘ সময়গুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই সময়গুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ইহারা গাণিতিক হিসাবে বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতির বিভিন্ন ধারায় আলোড়নের সময় অনুসারী। আরও দুইটি স্থানের পরিলিখন লইয়া পরীক্ষাগুলিকে প্রামাণ্য করিবার চেষ্টা করা হইল। ১৩ মিনিট হইতে ৬০ মিনিট পর্যন্ত সমস্ত সময়গুলির তালিকাটি চারিটি ভূকম্প-মানমন্দির হইতে প্রকাশিত হইল। তাহা হইতে নিম্নলিখিতরূপ বৈজ্ঞানিক অনুমান করিতে পারা যায়।

(১) অক্ষাবলম্বী দোলন-কালগুলি সকল পৃথিবী-প্রতিকৃতিতেই যান্ত্রিক পরিলিখন অনুসারী একই ফল দেয়।

(২) বুলার্ড$_{১}$, বুলার্ড$_{২}$ ও বুলেন$_{খ}$, তিনটি প্রতিকৃতিই বুলেন$_{ক১}$ ও বুলেন$_{ক২}$ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত যান্ত্রিক লিখন পরীক্ষোত্তীর্ণ।

(৩) বুলার্ড$_{১}$ ও বুলেন$_{খ}$-এর বুলার্ড$_{১}$ প্রতিকৃতি

অপেক্ষা ভূকম্পনযন্ত্র পরিলিখনের সহিত অধিকতর মিল আছে।

(৪) বুলার্ড$_1$ ও বুলেন$_{খ}$ প্রায় সমধর্মী হওয়াতে উভয়েই প্রায় একরূপ ফল গাণিতিক হিসাবে দিয়াছে।

(৫) কিন্তু বুলার্ড$_1$ প্রতিকৃতিতে কেন্দ্রাভিমুখী দোলনের পরীক্ষার ফলের সহিত গরমিল হইতে দেখা যাইতেছে। কিন্তু বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতি দুইটি বিভিন্ন কেন্দ্রে দৃষ্ট ফলের সহিত বেশ সামঞ্জস্য রাখিয়াছে। এই সামঞ্জস্যের ফলে পৃথিবীর শেস অন্তর্ভাগ তরল না হইয়া কঠিন হইবে।

উপরের সমস্ত মন্তব্য হইতে আমরা মোটামুটি ধরিয়া লইতে পারি যে, পৃথিবীর গঠন-প্রকৃতি বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতি যথাযথরূপে বর্ণনা করিতেছে। কিন্তু পরীক্ষার ফলের সহিত অধিক পরিমাণে সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে, যদি বুলেন$_{খ}$ প্রতিকৃতিকে উপরের দিকে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া লওয়া যায়, অর্থাৎ বুলেন$_{খ}$কে যদি উপরের দিকে কিছু পরিমাণ বুলেন$_{ক}$ প্রতিকৃতিধর্মী করিয়া লওয়া যায়। বুলার্ড$_1$ ও বুলেন$_{ক}$কে প্রায় সমান্তরাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণে পরীক্ষার ফল সংগ্রহ করিতে পারিলে পৃথিবীর গঠন হয়তো সুনিশ্চিতরূপে বলা সম্ভব হইবে।

ডাঃ স্যাবিন কর্তৃক শিশু-পক্ষাঘাতের ওষুধ আবিষ্কার

শিশু-পক্ষাঘাত বা পোলিওমাইলাইটিস একটি মারাত্মক ব্যাধি। এই রোগ মানুষকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়—এই ব্যাধির দুঃখভার সারাজীবন বহন করতে হয়। এই অভিশাপ থেকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন ডাঃ সল্ক। কয়েক বছর হলো ডাঃ আলবার্ট ব্রাইস স্যাবিন নামে আর একজন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীও এই রোগের আর একটি ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। তিনি এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে পক্ষাঘাত রোগের জীবন্ত ভাইরাসকে টিকা হিসাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করেছেন। সল্ক টিকা নেওয়ার যে খরচ হয়, তার দশ ভাগের এক ভাগ খরচেই এই স্যাবিন টিকা নেওয়া যায়। অনেকের ধারণা, এই টিকা সল্ক টিকার তুলনায় অনেক বেশী কার্যকরী।

পঁচিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার ফলেই এই জীবন্ত পোলিও-ভাইরাস টিকা আবিষ্কৃত হয়। পৃথিবীর নানাদেশেই এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। স্বল্প খরচে এর প্রয়োগ সম্ভব বলে পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে এই টিকা খুবই কাজে লাগতে পারে—লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হতে পারে।

ডাঃ স্যাবিন ১৯০৬ সালে বিয়ালিস্টকে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মকালে ঐ স্থানটি ছিল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে বিয়ালিস্টক রয়েছে পোল্যাণ্ডে। তাঁর যখন পনেরো বছর বয়স, তখন তাঁদের পরিবারের সকলকে নিয়ে তাঁর অভিভাবকবৃন্দ স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন। স্যাবিন পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, কষ্টেই সংসারযাত্রা নির্বাহিত হতো। এই কষ্টের ভার কিছুটা লাঘব করবার উদ্দেশ্যে অ্যালবার্ট যদি দন্ত-চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষাগ্রহণ করে, তবে তার ব্যয়ভার বহন করতে রাজী আছেন—এই কথা তাঁর পিতৃব্য তাঁকে জানান। তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে তরুণ স্যাবিন দু-বছর অতি

মনোযোগের সঙ্গে দন্ত-চিকিৎসা সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন। ঐ সময়েই পল ডি. ক্রুইফের লেখা মাইক্রোব হান্টার্স নামে বইখানি তার হাতে আসে! এই পুস্তিকাখানিই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

ডাঃ স্যাবিন

"বিজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ যে কি, তা আমি এই পুস্তকে যে সকল জীবনী রয়েছে, তা পড়েই প্রথম জানতে পেরেছি। আমার চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা শুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে এর খুবই প্রভাব রয়েছে"—এই কথা তিনি পরে বলেছিলেন।

এর পরেই তরুণ স্যাবিন মনস্থির করে ফেললেন, ছেড়ে দিলেন দন্ত-চিকিৎসার বিদ্যালয় এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন প্রখ্যাত মাইক্রোবায়োলজিস্ট বা জীবাণু-সংক্রান্ত জীব-বিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়াম এইচ. পার্ক।

তাঁর কাছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করবার জন্যে একটু স্থান চাইলেন। এই ধরণের অনুরোধ সচরাচর আসে না—তাঁর এই প্রার্থনা ডাঃ ক্লার্ক মঞ্জুর করলেন।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ স্যাবিন বলেছিলেন, "এর পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে ডাঃ পার্ক নানা ধরণের বিষয় নিয়েই গবেষণা করবার জন্যে আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পোলিও বা শিশু-পক্ষাঘাত রোগ সম্পর্কে গবেষণা এরই মধ্যে একটি। পূর্বে এই রোগের নিদান বা রোগের লক্ষণ নিরূপণের জন্যে রোগীর গায়ের ত্বক পরীক্ষা করে দেখা হতো। এই কাজ নিয়ে আমি ছ-মাস ছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে, এই পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য নয়।"

চার বছর পরে ১৯৩৫ সালে নিউইয়র্ক সহরের রকফেলার ইনষ্টিটিউটে মিঃ স্যাবিন চাকরী পেলেন। পোলিও রোগ বা শিশু-পক্ষাঘাত রোগের ভাইরাস বা জীবাণুকে যে স্নায়ুর তন্তুর মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা, জন্মানো ও বাড়ানো যায়—এইখানেই এই কথা তিনি প্রমাণ করেন।

১৯৩৯ সালে সিনসিনাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিনে-এ অধ্যাপক ও গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। পোলিও রোগের ভাইরাস যে মানবদেহের অন্ত্রেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এ-কথা তিনি এখানে আসবার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রমাণ করেন। তারপর তিনি এই ভাইরাসের টিকা নিয়ে গবেষণা করতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দরুণ এই কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁকে মার্কিন সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসকের দলে যোগদান করতে হয়। যুদ্ধাবসানে তিনি পুনরায় সিনসিনাটিতেই ফিরে আসেন এবং গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৪৯ সাল এই রোগ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ঐ বছরেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী প্রখ্যাত নোবেল লরিয়েট ডাঃ জন এফ. এনডার্সের পরিচালনাধীনে মানবদেহের বিশেষ ধরণের পোলিও রোগের ভাইরাস কিভাবে জন্মানো যেতে পারে, তার উপায় আবিষ্কার করেন। তাঁদের এই আবিষ্কারের ফলে এই ভাইরাসকে টিকা হিসাবে প্রয়োগ করবার পথে যে সব বাধা ছিল, তার একটি অপসারিত হলো। এই আবিষ্কারের ফলে ভাইরাস আরও সহজে জন্মানো যাবে। কি ধরণের ভাইরাস টিকার পক্ষে উপযোগী, বিজ্ঞানীরা তারপর সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।

টিকা হচ্ছে একপ্রকার প্রক্রিয়া যাতে মানবদেহে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে। এতে দুর্বল —এমন কি, রোগের মৃত ভাইরাস মানবদেহে প্রয়োগ করা হয়। ফলে ঐ রোগের জীবন্ত বীজাণু ঐ দেহকে আক্রমণ করতে পারে না। এই টিকা নেবার ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু প্রতিরোধ-প্রণালী এখনও বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্যাবৃত। তবে এটুকু জানা গেছে যে, এই টিকা নেবার ফলে বাইরে থেকে রোগের জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করবার মত উপাদান মানবদেহে জন্মায়। ঐ সব উপাদানের পরিমাণ আক্রমণকারী জীবাণুর তুলনায় বেশী হলে মানুষ আর ঐ রোগে পীড়িত হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ভাইরাসের সঙ্গে রোগের কি সম্পর্ক? ১৯৩৫ সালে প্রথম ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া যায়। এর পরে প্রায় ৩০০ রকমের ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। ভাইরাস অতি ক্ষুদ্র জীবাণু—এককভাবে এদের জীবন্ত বলে প্রতীয়মান হয় না। প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিডের সমবায়ে এদের দেহ গঠিত। বাইরের আবরণের মধ্যে প্রোটিনের ভিতর থাকে নিউক্লিক অ্যাসিড। বিশুদ্ধ আকারে পাওয়া গেলে দেখা যায়, এরা নড়াচড়া করতে পারে না এবং এদের কোন বৃদ্ধিও হয় না।

কিন্তু জীবন্ত কোষের মধ্যে ভাইরাস বেঁচে থাকতে পারে, তাদের বংশবৃদ্ধি হতে পারে, তাদের গঠন-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে পারে। খাদ্যের সঙ্গে বা শরীরের কোন অংশ কেটে গেলে সেই ক্ষত স্থান দিয়ে মানবদেহের কোন কোষের মধ্যে ভাইরাস প্রবেশ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণের উপযোগী কোষের সন্ধান না পায়, ততক্ষণ এরা রক্তে প্রবাহিত হতে থাকে।

প্রথমে ঐ ভাইরাসের প্রোটিনের বহিরাবরণের সংঘাতে কোষের বহিরারণটির ছেদ ঘটে। ফলে ভাইরাসের মূল কেন্দ্রবস্তুর নিউক্লিক অ্যাসিডের (DNA) অণুটি ঐ কোষের মধ্যে প্রবেশ করে। প্রোটিনের বহিরাবরণ কোষের বাইরে পড়ে থাকে। এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে ভাইরাস স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে।

সব রকম ভাইরাসের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ভাইরাসের অন্যতম হলো পোলিও বা শিশু-পক্ষাঘাতের ভাইরাস। এরা এত ক্ষুদ্র যে, দশ লক্ষ পোলিও ভাইরাসকে পাশাপাশি রাখলে মাত্র এক ইঞ্চি জায়গা নেবে। এদের আকার গোল।

পোলিও ভাইরাসের প্রোটিনের আবরণ স্নায়ু-কোষের আবরণ ছেদ করবার পর এর নিউক্লিক অ্যাসিড স্নায়ুকোষের মধ্যে প্রবেশ করে। এর পর এদের বৃদ্ধি হয় এবং ঐ কোষকে ধ্বংস করতে থাকে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই লক্ষাধিক নতুন ভাইরাস তৈরী হয়ে যায়।

জীবাণুর আক্রমণ ও ভাইরাসের মানবদেহে প্রবেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। জীবাণু যে ভাবে বিভক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, ভাইরাসের বৃদ্ধি সেভাবে হয় না। বর্তমান মতবাদ এই যে, ভাইরাস দেহের কোন কোষ আক্রমণ করবার পর সেই কোষের উপর সম্পূর্ণ অধিকার স্থাপন করে এবং ঐ কোষের উপাদান কাজে লাগিয়ে ওর মধ্যে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলে। তবে ঐ সব নতুন ভাইরাসের বহিরাবরণ কোষের বাইরে ফেলে-আসা বহিরাবরণের মতই কি না, তা এখনও জানা যায় নি। নিউক্লিক অ্যাসিডের কার্যকলাপের মধ্যেই এর উত্তর রয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

এরা বৃদ্ধি পেয়ে পাশের স্নায়ুকোষে বিস্তৃত হয়। এভাবে শরীরের কোন অঙ্গের স্নায়ুকোষগুলি নষ্ট হয়ে গেলে, সেই অংশ অসাড় ও অবশ হয়ে পড়ে। এই টিকার সন্ধানে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে টিকার উপযোগী ভাইরাসের সন্ধান সমস্যা হয়ে দেখা দিল। তারপর বহু চেষ্টার পর তাঁরা এমন একপ্রকার ভাইরাসের সন্ধান পেলেন, যেগুলি স্নায়ুকোষ নষ্ট করে না, কিন্তু বাইরে থেকে আগত পোলিও রোগের আক্রমণ প্রতিহত করে। এজন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরীতে সাহায্য করে থাকে।

মৃত ভাইরাস নিয়ে ডাঃ জোনাল সল্ক টিকা তৈরী করলেন। এরা মৃত বলে দেহে প্রয়োগ করলেও এদের বংশবৃদ্ধি বা কোন স্নায়ুকোষ নষ্ট হয় না, কিন্তু এই রোগাক্রমণ প্রতিরোধে অ্যান্টিবডি তৈরীতে সাহায্য করে।

ডাঃ স্যাবিন টিকা হিসাবে ব্যবহারের জন্যে নির্দোষ ভাইরাসের সন্ধান করলেন অন্যভাবে। তাঁর মনে হলো, বংশপরম্পরায় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাদির যে পুনরাবৃত্তি ঘটে, তার মূলে আছে একপ্রকার ভাইরাস। এরাই বংশগতির বাহক। এরা মানদেহে থাকলেও স্নায়ুকোষের কোন ক্ষতি করে না। ন্যাশন্যাল ফাউণ্ডেশনের আনুকূল্যে তিনি গবেষণাগারে পোলিও ভাইরাসের কয়েক পুরুষ উৎপাদন করে পরীক্ষা করে দেখলেন। ন্যাশন্যাল ফাউণ্ডেশন ফর ইন্ফ্যানটাইল প্যারা-লাইসিস নামে প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে প্রেসিডেন্ট ডি. ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট নিউইয়র্ক সহরে স্থাপন করেন। শিশু-পক্ষাঘাত রোগ সম্পর্কে গবেষণাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ১৯৫৮ সালে এর নাম পরিবর্তন করে কেবলমাত্র ন্যাশন্যাল ফাউণ্ডেশন রাখা হয় এবং তখন থেকে সব রকম ভাইরাসবাহিত রোগ

সম্পর্কেও গবেষণার ব্যবস্থা হয়। অবশেষে তিনি নির্দোস ও দুর্বল ধরণের একপ্রকার ভাইরাসের সন্ধান পান। মানুষের অন্ত্রে এই সব নির্দোস ও দুর্বল ভাইরাস বৃদ্ধি পায়, জন্মে এবং রক্তধারায় প্রবাহিত হয়ে থাকে। এরা বাইরে থেকে এই রোগের মারাত্মক ভাইরাসের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। উল্লিখিত দুর্বল ভাইরাস দেহে থাকলে, রক্তধারায় বাহিত হলেও তাতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় না।

এসব জীবন্ত ভাইরাসের টিকা মুখে গ্রহণ করা যায়। এরা মানুষের অন্ত্রে অনির্দিষ্টকাল থাকতে পারে। সেখানে এদের বংশবৃদ্ধি হয় এবং জীবনভর মানুষকে মারাত্মক ধরণের ভাইরাসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

এসব নির্দোষ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে। কোন কোন বিজ্ঞানীর অভিমত এই যে, এই সব নির্দোষ ভাইরাস সংক্রমণের পর মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ডাঃ স্যাবিন এই ধরণের সম্ভবনাকে আমল দেন নি। তিনি এই বিষয়ে উদ্বিগ্নও নন। আজ পর্যন্ত এই বিষয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, তাতে দেখা গেছে, এরূপ হবার কোন আশঙ্কা নেই!

ডাঃ স্যাবিন এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন—"পোলিও রোগের টিকা নিয়ে আমার গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। আমি ইতিমধ্যেই ক্যান্সার রোগ নিয়ে গবেষণা সুরু করেছি।"

নাইলন তন্তু

আবদুস সালাম মণ্ডল

আজ পর্যন্ত যত প্রকারের নিত্যব্যবহার্য কৃত্রিম পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে সিন্থেটিক রাবার এবং নাইলন অন্যতম। আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক রাবারের উৎসস্থলগুলি যখন বৃটিশ শাসনাধীনে ছিল, তখন জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের নিরলস সাধনায় দেশের রাবারের ব্যাপক চাহিদা মিটিয়েছেন সিন্থেটিক রাবার দিয়ে। আর আজ যদিও প্রাকৃতিক তন্তুর অভাবে বস্ত্রসমস্যা প্রকট হয় নি, তবু তারও প্রতিবিধান হিসাবে আবিষ্কৃত হয়েছে কৃত্রিম তন্তু নাইলন—দীর্ঘ স্থায়িত্ব ও ব্যবহার-বৈচিত্র্যে যা প্রাকৃতিক তন্তুকে বহু দুর ছাড়িয়ে গেছে।

খ্যাতনামা রসায়নবিদ্ ওয়ালেস এইচ. ক্যারোসার তাঁর অপরিসীম অধ্যবসায়ের মূল্য স্বরূপ এই 'নাইলন' আবিষ্কারে সক্ষম হন। তিনি হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন (Hexamethylene diamine) ও এডাইপিক অ্যাসিড (Adipic acid), এই দুই রাসায়নিক পদার্থের বিক্রিয়া ঘটিয়ে 'নাইলন লবণ' তৈরী করেছিলেন। ঐ 'নাইলন লবণ' থেকে জলকণা বিদূরিত করে পলিমারিজেসন পদ্ধতিতে কৃত্রিম নাইলন প্রস্তুত করেন। পলিমারিজেসন পদ্ধতিকে দুই বা দুইয়ের অধিক জৈব অণুর সম্মিলনে অধিকতর জটিল আণবিক সংযুক্তিকরণ আখ্যা দেওয়া যায়।

এখন উপরিউক্ত প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে যে 'নাইলন লবণের' কথা বলা হয়েছে, আজকাল তা (১) বেঞ্জিন ও পেট্রোলিয়ামের যৌগ (Cyclohexane of Benzene or Petroleum), (২) ভুট্টার আবরণ ও (৩) জইয়ের খোসা প্রভৃতি কাঁচা সামগ্রী থেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। অবশ্য প্রথম দিকে ব্যাপকভাবে নাইলন উৎপাদন করা

হতো ফেনল নামক একটা জৈব পদার্থ থেকে। এই পদ্ধতি আজকাল আর অনুসরণ করা হয় না।

বর্তমানে সাইক্লোহেক্সেন থেকে জারণ পদ্ধতির সাহায্যে প্রথমে 'এডাইপিক-অ্যাসিড' ও পরে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিনের অপরিহার্য উপাদান বুটাডিন তৈরী করা হয়। জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ—

$$C_6H_{12} \xrightarrow[Mn]{air} C_6H_{11}OH + C_6H_{10}O \xrightarrow[Aqueous\ HNO_3]{80^\circ C} HOOC\,(CH_2)_4COOH + xN_2O + yNO$$

Cyclohexane CO of Benzene or Acetates Petroleum. — Cyclohexanol (55%) — Cyclohexanone 45% — Adipic acid
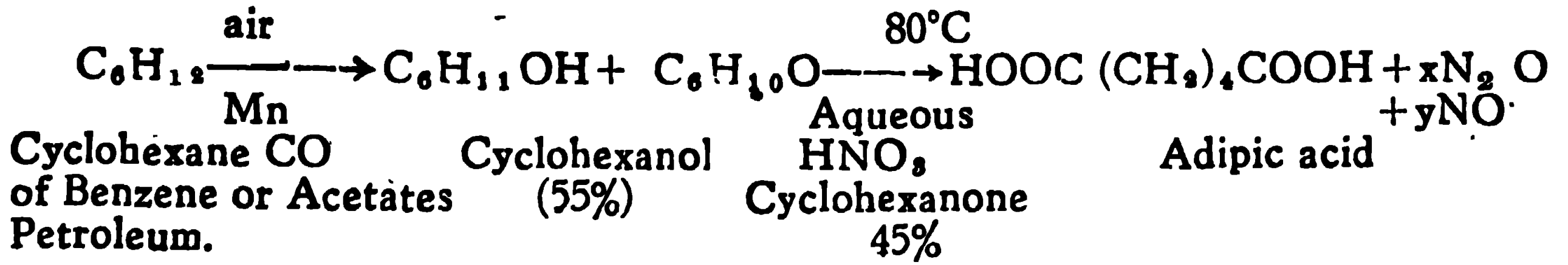
এই এডাইপিক অ্যাসিডের সঙ্গে হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন-এর বিক্রিয়ার (Reaction) সাহায্যে বর্তমানে নাইলন প্রস্তুত হচ্ছে—

$$x\,HOOC\,(CH_2)_4\,COOH + xH_2N\,(CH_2)_6NH_2 \rightarrow x(-H_3N(CH_2)_6NH_3OOC\,(CH_2)_4\,COO-)$$
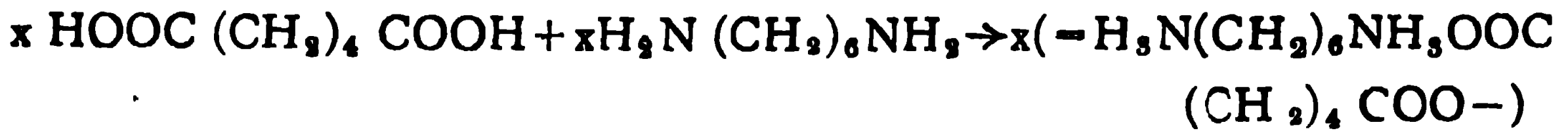
Adipicacid — Hexamethylene diamine — Nylon salt

$$\xrightarrow{-2xH_2O} (-HN(CH_2)_6NHOC\,(CH_2)_4CO-)x$$
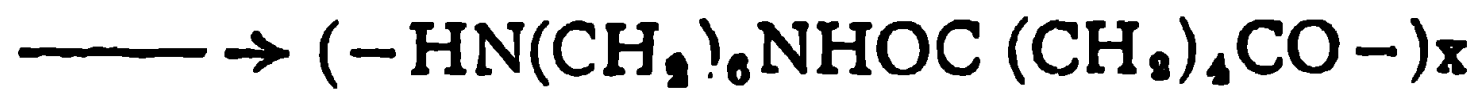
Nylon

প্রস্তুত প্রক্রিয়া—প্রথমতঃ নাইলন লবণ-যুক্ত দ্রবণে কিছু পরিমাণ এডাইপিক অ্যাসিড ও অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে নেওয়া হয়। পরে ঐ দ্রবণকে পাম্প করে বিশেষ জ্যাকেটের মধ্যে রক্ষিত কয়েকটি স্বয়ংক্রিয় চুল্লীর (Autoclave) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ঐ প্রকার চুল্লীতে সাধারণতঃ ডাইফিনাইল অক্সাইড বাষ্পের সাহায্যে যথোপযুক্ত উষ্ণতা বজায় রাখবার ব্যবস্থা থাকে।

এখান থেকে জলীয় বাষ্পযুক্ত নাইলন দ্রবণের সঙ্গে কিছু টাইটেনিয়াম অক্সাইড (TiO_2) (Pigment dispersion agent) মিশিয়ে নেওয়া হয় এবং ঐ মিশ্রণকে Autoclave chamber-এর মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় মিশ্রণের মধ্যে একটা জটিল আণবিক সংযুক্তিকরণ, অর্থাৎ পলিমেরিজেসন সংঘটিত হয় এবং একটা তরল আঠালো পদার্থ পাত্রের তলদেশে জমা হয়।

এরপর এই তরল পদার্থের উপর প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৪০ থেকে ৫০ পাউণ্ড পর্যন্ত চাপ প্রয়োগ করে তরলবস্তুকে ঢালাই-চক্রের (Casting wheel) মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এই ঢালাই-চক্র থেকে প্রায় ১২ ইঞ্চি চওড়া ৩½ ইঞ্চি পুরু পলিমারের একটা ফিতা বেরিয়ে আসে। ঐ ফিতাটির তলদেশ শক্ত রাখবার জন্যে নীচে জলের স্প্রে এবং উপরের দিকে বায়ুপ্রবাহ চালানো হয়।

এরপর ঐ ফিতাগুলিকে টুকরা টুকরা করে কেটে ব্লেণ্ড করবার জন্যে পেসাই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তন্তু-উৎপাদক যন্ত্রের প্রকোষ্ঠে (৫নং) পাঠানো হয়। এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে বিশেষ চাপ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে এবং একে বেষ্টন করে যে জ্যাকেট থাকে, তাকে Dowsterm Vapour বা Diphenyloxide Vapour দিয়ে উত্তপ্ত রাখা হয়। এর ফলে এই প্রকোষ্ঠের তাপমাত্রা সব সময় নাইলনের গলনাঙ্ক ২৬৩° সেন্টিগ্রেডের উপর থাকে। তাই নাইলন টুক্‌রাগুলি উত্তপ্ত তারের জালির উপর এসে তরলীভূত হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা করে তন্তু-উৎপাদক স্পিনারেটের মধ্যে পড়ে এবং অবশেষে তন্তুর আকারে বেরিয়ে আসে। পাখার সাহায্যে বায়ু-প্রবাহ চালিয়ে এরূপে উৎপাদিত তন্তুকে কঠিন

আকার দান করা হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একটি কাঁচনির্মিত রোলারের সহায়তায় বিশেষ বিশেষ টান দিয়ে ইচ্ছামত প্রস্থচ্ছেদের নাইলন সূত্রে রূপান্তরিত করা হয়। মোটামুটি এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই আজকাল ইউরোপের অধিকাংশ কারখানায় নাইলন তৈরী হচ্ছে।

নাইলনের ব্যবহার :—সাধারণ সূতার তুলনায় নাইলন অধিকতর নমনীয় এবং প্রসরণশীল হওয়ায় সৌখীন শাড়ী, ব্লাউজ ও মোজা হিসাবে এর ব্যবহার আজ ব্যাপক এবং সর্বজনবিদিত। এছাড়া বিশেষ স্থিতিস্থাপক গুণের জন্যে তন্তু হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাইলন ব্যবহৃত হচ্ছে। আজকাল প্লাষ্টিক-শিল্পে ছাঁচে ব্যবহারের উপযোগী পাউডার হিসাবেও নাইলনের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

পরিধেয় বস্ত্রাদিতে ব্যবহৃত নাইলন তন্তুকে সাধারণতঃ বিভিন্ন অ্যাসিড, অ্যাসিটেট, পিগ্‌মেন্ট প্রভৃতির সাহায্যে রঙীন করা হয় এবং এরূপে নাইলনকে বিভিন্ন রঙে রঙীন করবার কাজে বিশেষ সতর্কতার অভাবে অনেক সময় নাইলনের রাসায়নিক পদার্থগুলি শরীরের ঘর্মের সংস্পর্শে আসে এবং চর্মের উপর মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি করে। সুতরাং নাইলনের পোষাক ব্যবহারের সময় কিছু সতর্কতা গ্রহণ করা দরকার।
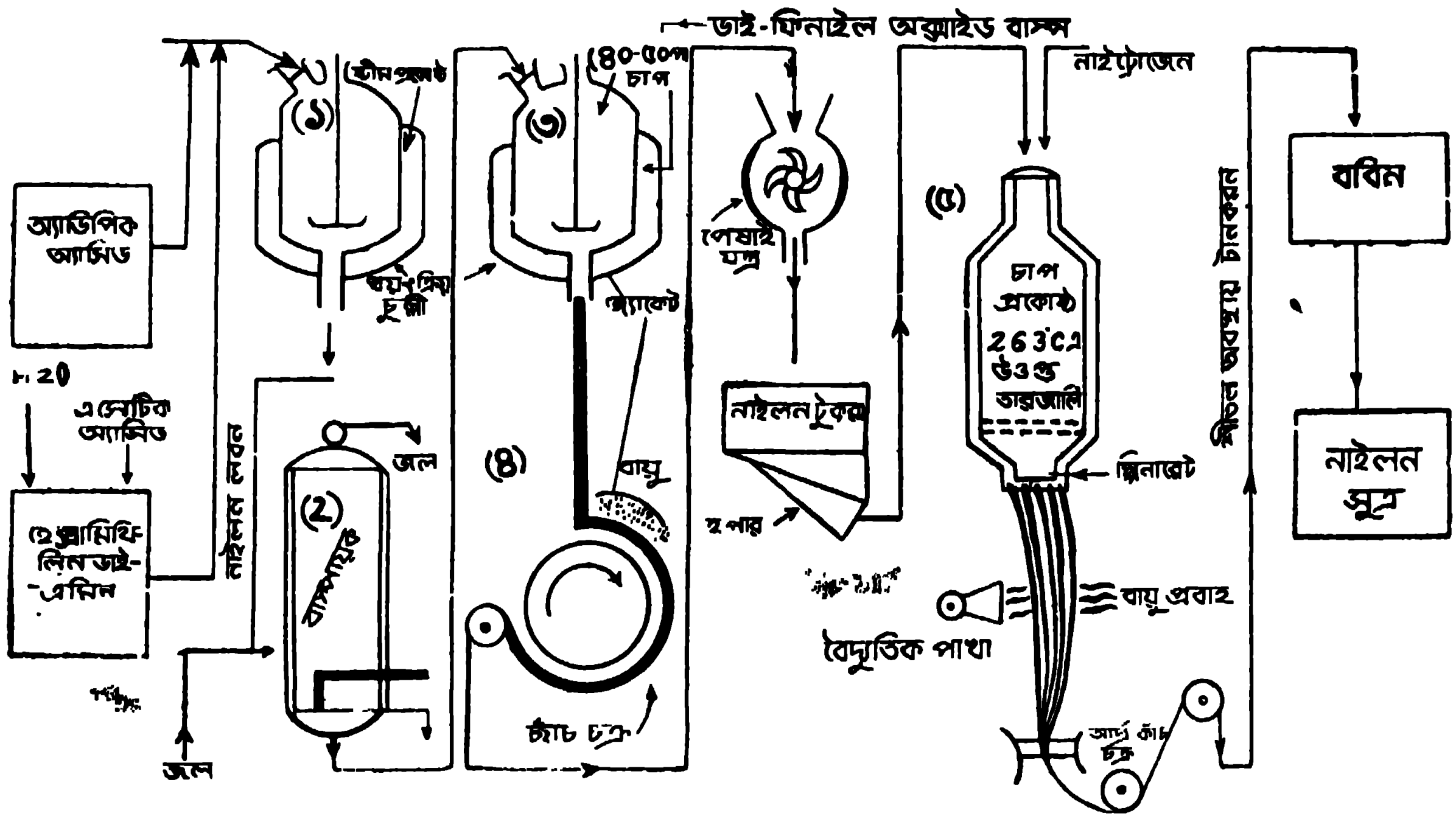
নাইলন তন্তু প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক ব্যবস্থা।

তবে রাসায়নিকদের সতর্ক দৃষ্টির উপর বিশ্বাস রেখে আমরা আশা করতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে নাইলনের ব্যবহার সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হবে—আর ঠিক তখনই জনসেবায় বিজ্ঞানীদের এক অভিনব প্রচেষ্টা সফল ও সর্বাঙ্গসুন্দর হবে।

সঞ্চয়ন

চাঁদ ও পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি

সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের একটি অভিযাত্রীদল দীর্ঘকাল কামচাট্‌কার আগ্নেয়গিরিমালা সম্পর্কে অনুশীলন ও পর্যবেক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ করেছেন। এঁরা অনেকগুলি আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নেমে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। এগুলির মধ্যে একটি হলো ইউরোপ-এশিয়ার মধ্যে উচ্চতম ক্লিউচেভ্‌স্কাইয়া আগ্নেয়গিরি, যার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৫০০০ মিটার। এই বিজ্ঞানীদল অগ্ন্যুদ্‌গারী গিরিগহ্বরের ভিতবে নেমে ফোটোমেট্রিক মাপজোক ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়েছেন।

এই বিজ্ঞানীদলের অন্যতম, লেলিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডি. ভি. শারোনফ তাঁদের এই বৈজ্ঞানিক অভিযান সম্পর্কে লিখেছেন: জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন—চাঁদের পৃষ্ঠদেশ জুড়ে যে অসংখ্য পাহাড়, সমতল ভূমি আর জ্বালামুখ দেখা যায়, সেগুলির উৎপত্তি আগ্নেয়গিরি থেকেই এবং লাভা, ভস্ম এবং অন্যান্য উদ্‌গীরিত জিনিষ হলো এর উপাদান। এই মতটাকে যাচাই করবার জন্যে পার্থিব আগ্নেয়গিরিগুলির সঙ্গে চাঁদের পিঠের উপর যা দেখা যায়, তার তুলনামূলক অনুশীলন করা দরকার। সেই সঙ্গে সৌররশ্মির প্রতিসরণ ক্ষমতা সম্পর্কেও অনুসন্ধান চালানো প্রয়োজন। পৃথিবী ও চাঁদের উপরকার বিভিন্ন গঠন ও ভূ-সন্নিবেশ থেকে কতটা পরিমাণে ও কোন্ কোন্ দিকে এই সৌররশ্মিগুলি প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হচ্ছে, সেটা জানা প্রয়োজন। আমাদের অভিযাত্রীদলের অন্যতম কাজ ছিল এই সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালানো।

কাম্‌চাট্‌কার যে অঞ্চলে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি সক্রিয় রয়েছে, সেই অঞ্চলে গিয়ে সবচেয়ে বড় দুটি অগ্ন্যুদ্‌গারী গিরি ক্লিউচেভ্‌স্কাইয়া ও আভাচা-র গহ্বরে কয়েক বার নেমে আমরা মোট প্রায় ৪০ ঘণ্টা ধরে তথ্য সংগ্রহের কার্যসূচী সম্পন্ন করি। তা-ছাড়া অন্যান্য আগ্নেয়গিরির গহ্বরেও আমরা নেমেছি এবং পর্যবেক্ষণ চালিয়েছি। এই সব গিরিগহ্বরের লাভা, ভস্ম, নানারকমের প্রস্তরখণ্ড, রাসায়নিক মল (স্লাগ) ইত্যাদির যে সব নমুনা আমরা সংগ্রহ করে এনেছি, সেগুলি লেলিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক রসায়নবিদ্যার গবেষণাগারে এখন বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে। এই অনুশীলনের পূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হতে আরও বছরখানেক সময় লাগবে এবং এগুলি যে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার উপরে অনেক নতুন আলোকপাত করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এখানে উপস্থিত করছি।

মার্কিন বিজ্ঞানী গোল্ড এই থিওরি উপস্থিত করেছেন যে, চাঁদের পৃষ্ঠদেশ আগাগোড়াই খুব নরম ধূলিকণায় আচ্ছাদিত। আমাদের পর্যবেক্ষণের ফল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। চন্দ্রপৃষ্ঠের বিভিন্ন গঠন থেকে প্রতিসরিত সৌররশ্মির অনুশীলনের ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, চাঁদের উপরিতল অত্যন্ত অমসৃণ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন খুব ছোট ছোট গর্তে ভরা এবং এক ধরণের সছিদ্র স্পঞ্জের মত উপাদানে আচ্ছাদিত। এই স্পঞ্জসদৃশ উপাদানের গঠন আবার নির্দিষ্ট আকারবিহীন তীক্ষ্ণ কোণসমন্বিত। চূর্ণাকার কোন উপাদান হলে চন্দ্রপৃষ্ঠ এই রকম হতো না। তাছাড়া চাঁদের গতি ও ঘূর্ণনবেগ হিসেব করলে দেখা যাবে যে, তার পৃষ্ঠদেশ যদি এই ধূলিচূর্ণে আচ্ছাদিত হতো, তাহলে তার

পাহাড়গুলির ঢালু হয়ে আসবার নতি হতো অন্ততঃ ৪৫ ডিগ্রি। কিন্তু চাঁদের অধিকাংশ পাহড়েরই ঢালু হয়ে আসবার নতি হলো তার চেয়ে অনেক কম।

ক্লিউচেভ্‌স্কাইয়া আগ্নেয়গিরির ঢালুতে আমরা যে জমাট-বাঁধা বিরাট লাভা-প্রস্তর পেয়েছি, তার গায়ে এক ধরণের স্পঞ্জসদৃশ ধাতুমিশ্রিত রাসায়নিক মল রয়েছে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে "স্কোরিয়া"। এই লাভা-প্রস্তরের গায়ে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মির বর্ণালী ও প্রতিসরণ বিশ্লেষণ করেও সাধারণভাবে একই ফল পাওয়া গেছে। এসব থেকে সাধারণভাবে আমরা এই মতেরই সমর্থন করি যে, চাঁদ ও পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলির প্রকৃতি ও গঠন মোটামুটি একই রকম। তবে চাঁদের আগ্নেয়গিরিগুলি বহু কাল আগেই নির্বাপিত হয়ে যাওয়ায় সেগুলির বহিঃস্তরের গঠন একটু অন্য রকম হয়ে থাকতে পারে।

নতুন ভারতের কয়না পরিকল্পনা

মানুষের কল্পনাশক্তিই সকল মহাকীর্তির উৎস। আজকের বিমান আবিষ্কারের অনেক আগেই মানুষ পুষ্পক রথের কল্পনা করেছিল। আজকের এই মহাশূন্য আবিষ্কারের অনেক আগেই হনুমানের সূর্যলোক সফর সম্পর্কে চিন্তা করা হয়েছিল। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এক কালের কল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হতে চলেছে।

কথিত আছে, ভগীরথ গঙ্গার ধারা পরিবর্তন করেছিলেন। এক সময় একথা নিছক কল্পনাবিলাস বলেই মনে হতো। কিন্তু আজ ইঞ্জিনিয়ারেরা তা সম্ভব বলেই মনে করেন।

মহারাষ্ট্রের কয়না পরিকল্পনা প্রমাণ করে দিয়েছে—এক যুগের মানুষ যা ভাবতে পারে, পরবর্তী যুগের মানুষ তা করতেও পারে। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উপর প্রবাহিত কয়না নদী নিজের ইচ্ছায় পূর্বদিকে ডেকানে নেমে যায়। এখানেও কয়নার পথে কিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। কিন্তু সামান্য ধারা পরিবর্তন করে কয়নাকে যদি পশ্চিমে চালিত করা যায়, তাহলে অনায়াসে বিপুল পরিমাণ জলবিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যায়। প্রকৃতি যা করে নাই, মানুষ তাই করেছে। কয়নাকে পশ্চিমে চালিত করে যে কয়না বঙ্গোপসাগরের পানে ছুটে যেত, তাকে আরব সাগরে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই অল্প পরিবর্তনটুকুর ফলে মহারাষ্ট্রের লাভ হয়েছে ৪৩০,০০০ কিলোওয়াট দুর্মূল্য বিদ্যুৎ-শক্তি। ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ইতিহাসে কয়নার এই গতিমুখ পরিবর্তন একটি বিশেষ ঘটনা স্বরূপ।

সুউচ্চ পাহাড়ের উপর প্রবাহিত কৃষ্ণা ও কয়না বর্ষার জলকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করে। কয়নার উপরিভাগে বছরে গড়ে ২৫০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। করদের কাছে কয়না নিজেকে কৃষ্ণার মধ্যে বিলিয়ে দিত। পাহাড় থেকে নেমে কৃষ্ণা খুব বেশী জল পায় না।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৯০০ ফুট উচ্চে সমুদ্রের ঠিক ধারে অবস্থিত কয়না বেসিন থেকে বিন্দু বিন্দু জল ফেললেও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা সম্ভব। সাযোদ্রি পর্বতগাত্রের পশ্চিম দিকটি সোজা ১৪০০ ফুট উঠে গেছে। নীচ থেকে আরব সাগর মাত্র ৩৫ মাইলের পথ। এই পথে মাত্র ১৫ মাইল এগুলেই কয়নায় জোয়ার-ভাটার টান পড়বে। ফলে কয়নার বৈদ্যুতিক সম্ভাবনা আরও বেড়ে গেছে।

১৯৫৪ সালে কয়না পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। এই পরিকল্পনার অন্যতম অঙ্গ হলো, দেশমুখওয়াড়ীর বাঁধটি। সেচ ও বিদ্যুতের ভাণ্ডার বলা যায় এই বাঁধটিকে। বাঁধের নীচে জল অন্য পথে চালিত করে ভূগর্ভের দুটি বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। তিন পর্যায়ে এই পরিকল্পনাটি সম্পন্ন করা হবে।

প্রথম পর্যায়ে ৩৮'২৮ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই সময় ২০৭'৫ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ তৈরী হবে এবং পোফালীর ভূগর্ভস্থিত বিদ্যুৎ-কেন্দ্রটিতে ২৪০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে। এই বিদ্যুতের জন্যে বোম্বাইয়ে একটি রিসিভিং ষ্টেশন স্থাপন করা হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে হবে ৯৪৫০ কোটি ঘনফুটের একটি বাঁধ। এই জলের একাংশ কৃষ্ণা বেসিনে সেচের জন্যে সরবরাহ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাঁধ ও পাওয়ার হাউসসহ ১৪ ১৬ কোটি টাকা খরচ হবে।

শেষ পর্যায়ে কয়নার জল থেকে সব বিদ্যুৎটুকু ছিনিয়ে নেওয়া হবে। এই সময় অতিরিক্ত ১৫০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

সাতারা জেলার হেলওয়ার্ক গ্রামের তিন মাইলের উপর কয়না যেখানে পুব দিকে বাক নিয়েছে, সেখানেই অবস্থিত হবে কয়না বাঁধ। দেশমুখওয়াড়ীর ছোট্ট সমতলভূমিটুকু আজ আর নেই। কয়না বাঁধ আজ সগর্বে তার উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে এখানেই সর্বপ্রথম বাঁধ তৈরীর জন্যে পাথরকুচির কংক্রিটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যে কয়না বাঁধে ২৯১ ফুটের সেন্ট্রাল স্পিলওয়েের ব্যবস্থা আছে। তাতে ছয়টি (৪১' × ২৫' ফুট) ক্রেস্টগেট আছে। ঐগুলি প্রতি সেকেণ্ডে ৯৮,৫০ কোটি ঘনফুট জল গ্রহণ করতে সক্ষম।

কয়নার বিদ্যুৎ-কেন্দ্রগুলি ভূগর্ভে অবস্থিত। প্রাচ্যদেশে এমন বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের সংখ্যা নিতান্তই কম। ভারতে শুধু মাইথনের পাওয়ার হাউসটি ভূগর্ভে স্থাপিত। আর্থিক ও কারিগরি দিক বিবেচনা করেই পাওয়ার হাউসটি ভূগর্ভে স্থাপন করবার সিদ্ধান্ত করা হয়। খনন কার্যের প্রথম পর্যায় প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

কয়না বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে উৎপাদিত শক্তি ২২০ কিলোভোল্টের ১৫০ মাইল দীর্ঘ ডবল সার্কিট লাইনযোগে ট্রম্বেতে সরবরাহ করা হয়। গত বছর ১৬ই মে থেকে ঐ লাইনে বিদ্যুৎ সঞ্চালন সুরু হয়।

কয়না পরিকল্পনা থেকে সমগ্র মহারাষ্ট্রে লাভবান হবে। শিল্প ও অন্যান্য কাজে কয়নার বিদ্যুৎ যোগাবে উৎসাহ, কৃষিক্ষেত্রে প্রবাহিত হবে কয়নার জল। শস্যশ্যামলা হয়ে উঠবে প্রকৃতি। মানুষের কল্পনা পরিণত হবে বাস্তব সত্যে।

জনকল্যাণে পরমাণু-শক্তি

"ইটালীর নাবিকটি নতুন পৃথিবীতে এসে পৌঁচেছেন"—আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডাঃ আর্থার এইচ. কম্পটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন অফিসের ডাঃ জেম্‌স্ বি. কোনাণ্টকে নতুন পারমাণবিক যুগের অভ্যুদয়ের বার্তা—এই রহস্যময় কয়টি কথায় টেলিফোনে জানিয়েছিলেন

এই নাবিকটি হচ্ছেন এন্‌রিকো ফের্মি, ইতালী-জাত মার্কিন বিজ্ঞানী। তারিখটি ছিল ১৯৪২ সালের ২রা ডিসেম্বর। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ষ্ট্যাডিয়ামের নীচে স্কোয়াশ খেলার প্রাঙ্গনে এই নতুন যুগের বার্তা-বহনকারী গবেষণাটি চালানো হচ্ছিল। ফলাফল যে কি হবে, কেউ জানতেন না। অধীর আগ্রহে সকলেই প্রতীক্ষমান। অ্যাটমিক পাইল—কার্বন আর ইউরেনিয়াম দিয়ে গঠিত, একটি স্তূপ—দেখতে একটা বিরাট মৌচাকের মত। ক্যাড্‌মিয়াম ধাতুতে তৈরী দীর্ঘ একটি দণ্ডকে ধীরে ধীরে ঐ স্তূপের মধ্য থেকে বের করে আনা হচ্ছে।

বেলা ৩টা ২০ মিনিটে ফের্মি নির্দেশ দিলেন—"ক্যাড্‌মিয়ামের দণ্ডটি আর এক ফুট পরিমাণ টেনে বের করে আনুন; তাতেই হয়ে যাবে।" সত্যই

তা হলো। তেজস্ক্রিয়তা নিরূপণের ফলকের কাঁটাটি ঘুরতে লাগলো। বোঝা গেল, পৌনঃপুনিক পারমাণবিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও তা নিয়ন্ত্রণ করবার পথ প্রস্তুত হয়েছে। ফের্মি তাঁর সেই গবেষণা সম্পূর্ণ করলেন। পৃথিবীর প্রথম পারমাণবিক চুল্লী বা অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর চালু হলো।

যাঁরা এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মনে আর সন্দেহ রইলো না যে, পরমাণু-শক্তি ভবিষ্যতে পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের নিত্য কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। রিয়্যাক্টরে তৈরী তেজস্ক্রিয় উপকরণ আইসোটোপ-সমূহ বিজ্ঞান, ভেষজ-বিজ্ঞান, কৃষি-বিজ্ঞান এবং শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে যে বিশেষ কাজে লাগবে, তা তাঁদের কাছে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হলো। তাছাড়া পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে, তা যত দূরবর্তীই হোক না কেন, এই নতুন উৎস থেকে অফুরন্ত বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে—এই কথাও তাঁরা সে দিন উপলব্ধি করেছিলেন। যুদ্ধকালীন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও বিস্তৃত ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তির শান্তিকালীন প্রয়োগের পরিকল্পনা রচনার সময়ও তাঁরা করে নিয়েছিলেন।

তবে ১৯৪৫ সালে এই নতুন যুগের অভ্যুদয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে অতি অল্প লোকই সচেতন ছিলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে পরমাণু-শক্তির কল্যাণকর প্রয়োগ সম্পর্কে পরমাণু-বিজ্ঞানীরা অবহিত ছিলেন। তাহলেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের আবিষ্কার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বলে অভিনন্দিত হয়েছিল। এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ রোগের চিকিৎসা, রোগ-নির্ণয়, পৃথিবীর খাদ্যসরবরাহ বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতিসাধন এবং শ্রমশিল্পের নানাবিধ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই আবিষ্কারের দশ বছরের মধ্যেই পরমাণু-শক্তি থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে কারখানা চালানো হলো, সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে আলো জ্বললো, রেডিও চললো এবং আরও নানারকম কাজ সম্পন্ন হলো।

এর পর থেকে ভেষজ-বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প, কৃষি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং অন্যান্য যে সব ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তি মানুষের বিশেষ কাজে লাগতে পারে, সে সব ক্ষেত্রে এই শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে খুবই অগ্রগতি ঘটেছে। তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে সঙ্কর ফসল উৎপাদনে, কীটাণু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে এটি দিয়েছে অফুরন্ত ইন্ধনের সন্ধান। ভবিষ্যতে বিমান ও মহাশূন্যযানেও এথেকে হবে জ্বালানীর সৃষ্টি। পরমাণুর সাহায্যে মানুষের কল্যাণসাধনের যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে এবং ইতিমধ্যেই এই পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করে মানুষের যে উপকার হয়েছে বা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তার সামান্য কয়েকটিই এখানে উল্লেখ করা হলো। বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে পরমাণুর সাহায্যে জনকল্যাণের ক্ষেত্রে এমন সব কর্ম সাধিত হবে. যা এখনও মানুষের কল্পনার বহির্ভূত।

লাক্ষার ব্যবহার

ছোট্ট একটি কীটের দেহনিঃসৃত আঠালো রস থেকে তৈরী হয় লাক্ষা। এই লাক্ষা ভারতকে এনে দিচ্ছে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা। লাক্ষা রপ্তানী হয় আমেরিকায়। আমেরিকায় প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয়—এমন অনেক দ্রব্য নির্মাণের কাজে লাগে লাক্ষা। পিয়ানো, ছাপার কাগজ, দ্রব্য-সংরক্ষণী রং প্রভৃতি কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া গেল।

ভারত এই কীটের চাষ হয় বট, বাবলা, কুল, পলাশ, কুসুম, অড়হড়, খয়ের প্রভৃতি গাছে। এই

কীট গাছের বল্কলের মধ্যে তার লম্বা শুঁড় প্রবেশ করিয়ে দিয়ে রসটুকু চুষে নেয় খাদ্যরূপে। খাদ্যা-বশেষটুকু রাসায়নিক পরিবর্তনের পর নির্গত হয় এবং ঐ কীট স্বীয় দেহের চারধারে তা আবরণের মত ব্যবহার করে। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যেই তাকে এরূপ করতে হয়। এই আঠালো রসই লাক্ষায় পরিণত হয়।

লাক্ষার বৃহত্তম উৎপাদক হিসেবে ভারতের স্থান সর্বোচ্চ, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সবচেয়ে বড় ক্রেতা। ভারতের মোট উৎপন্ন লাক্ষার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ রপ্তানী হয় যুক্তরাষ্ট্রে। ১৯৬১ সালে মার্কিন ক্রেতারা প্রায় ১০ হাজার টন লাক্ষা আমদানী করে ছিল ভারত থেকে। এতে ভারতীয় উৎপাদকদের আয় হয়েছিল প্রায় ৫০০,০০০ ডলার

লাক্ষার বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র অ্যালকোহল ছাড়া আয় কোন দ্রাবকের মধ্যে এগুলি দ্রবীভূত হয় না। বৈদ্যুতিক শক্তির পক্ষে লাক্ষা ইনসুলেটররূপে ব্যবহৃত হয়।

আঠালো ইনসুলেটর হিসাবে লাক্ষা বৈদ্যুতিক আবরণরূপে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক মোটরের রক্ষার ব্যাপারেও এর প্রয়োজন অনস্বীকার্য। আমেরিকার প্রত্যেকটি কারখানা, অফিস-ভবন এবং প্রায় প্রত্যেকটি গৃহে লাক্ষা অত্যাবশ্যক। কাচের সঙ্গে কাচ, কাচের সঙ্গে ধাতু জোড়া দিতে লাক্ষার জুড়ি মেলা ভার। এই কারণে আলোর বাল্‌ব, বেতার ও টেলিভিশন টিউব নির্মাণে লাক্ষা বা গালা ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকায় পুরুষ ও কোন কোন মহিলা যে ফেল্ট টুপী পরিধান করেন, তার আকৃতি যাতে বিকৃত না হয়, সে জন্যে লাক্ষা ব্যবহার করা হয়। তৈলশিল্পেও লাক্ষার প্রয়োজন আছে। পেট্রো-লিয়াম ও তদ্‌জাত দ্রব্যগুলিতে লাক্ষা দ্রবীভূত হয় না। আয়রন অক্সাইডের সঙ্গে লাক্ষা মেশালে মোটা লাল রং তৈরী হয়। তৈলবাহী জাহাজের ভিতরের দিকে এই রং মাখালে তা গ্যাসোলিনের কুপ্রভাব থেকে ঐ জাহাজকে রক্ষা করে।

মুদ্রণ ও প্রকাশনের ক্ষেত্রে লাক্ষার ব্যবহার খুবই প্রচলিত। ফটো-এনগ্রেভারগণ কালার প্লেটের উৎপাদনে এর ব্যবহার করেন। অনেক পত্রিকা এবং কোন কোন গ্রন্থে ব্যবহৃত এক ধরণের মুদ্রণের কাগজে প্রলেপ হিসাবে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়।

লাক্ষা খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়, তাই ছাপার কালিতে এর ব্যবহার আছে। বস্তুতঃ এর দ্রুত শুষ্ক হবার গুণটির জন্যেই দ্রুতগতিসম্পন্ন মুদ্রণ-যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। মার্কিন রাসায়নিকেরা বর্তমানে যে সব নতুন নতুন কালি প্রস্তুত করছেন, তাতে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে।

খেলনা প্রস্তুতকারকেরা প্রলেপ হিসাবে এবং জোড়বার কাজে লাক্ষা ব্যবহার করেন। জুতা ও চামড়ার নানা কাজেও এর প্রয়োজন আছে। চকোলেট প্রভৃতি মিষ্টিদ্রব্য তৈরীতে লাক্ষা খুব কাজে লাগে। এই ধরণের মিষ্টিদ্রব্যের উপর লাক্ষার পাত্‌লা প্রলেপ মাখালে সেগুলি সহজে গলে যায় না।

কাঠের ভাল আসবাব তৈরীর কাজে লাক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। আমেরিকার বাসগৃহে ওক কাঠের মেঝের খুব প্রচলন আছে। এই জাতীয় মেঝের সুষ্ঠু রুচিসম্মত রূপ দিতে লাক্ষা অপরিহার্য।

ভেষজ-শিল্পেও লাক্ষার ব্যবহার আছে। ক্যাপ-সুল তৈরীতে প্রলেপরূপে লাক্ষা ব্যবহৃত হয়।

বহুপূর্বে লাক্ষার ব্যবহার প্রচলিত ছিল রং ও ফোনোগ্রাফ রেকর্ড তৈরীর কাজে।

লাক্ষার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। রাঁচীর ভারতীয় লাক্ষা গবেষণা-কেন্দ্র বা আমেরিকায় লাক্ষা নিয়ে কাজ করছেন যে সব রাসায়নিক, তাঁরা কেউ চুপ করে বসে নেই। মার্কিন আমদানীকারকগণ এই ভারতীয় পণ্যটি সম্পর্কে বহু আশা পোষণ করেন। কারণ লাক্ষার যে সব গুণ আছে, তা কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা যায় মা।

বধিরতা

আধুনিক সভ্যতা মানবসমাজে অনেক নতুন রোগ নিয়ে এসেছে—এমন কি, অনেক দৈহিক বৈকল্যের জন্যেও এই সভ্যতা অনেকটা দায়ী। বর্তমান সভ্যতার যুগে একটা বিশেষ রোগ হলো উচ্চ রক্তচাপ এবং এই রোগের মূলে রয়েছে সহর-জীবনের অতিব্যস্ততা। এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বধিরতাও সভ্যতারই অন্যতম অবদান।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বধির হয়ে যাওয়া এবং সাধারণভাবে শ্রবণশক্তি কমে যাওয়া বা বধিরতার কোন প্রকৃত কারণ না থাকলেও সম্পূর্ণ বধির হয়ে যাওয়াটা প্রকৃতিদত্ত বিধান নয়। যে সব আদিম অধিবাসী প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করে, বার্ধক্যেও তাদের শ্রবণশক্তি খুব ভাল থাকে।

সভ্য জাতিগুলির মধ্যে শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে—জীবনযাপন পদ্ধতি, পরিবেশ এবং বিশেষ করে আধুনিক সভ্যতার নানারকম শব্দের চাপের উপর শ্রবণশক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে। শিল্পনগরীগুলির জনগণের বার্ধক্যের শ্রবণশক্তি, অল্প শব্দসম্পন্ন অথবা একেবারে কোন শব্দ নেই, এই রকম পরিবেশের জনগণের তুলনায় অনেক কম। শব্দবহুল পরিবেশে বেশী দিন থাকলে শ্রবণশক্তি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরে কোন শান্ত পরিবেশে বাস করলেও সেই শক্তি আর ফিরে পাওয়া যায় না।

আদিম অধিবাসীদের শ্রবণশক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে ডুসেলডর্ফের মেডিক্যাল অ্যাকাডেমীর ডাঃ প্লেষ্টার একটি চিকিৎসকদলের সঙ্গে সুদানের গভীর বনে ভ্রমণ করেন। সেখানে মাবান নামক একটি উপজাতি বাস করে। মাবান উপজাতির সভ্যতাকে প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের সভ্যতা বলা যায়। কানের পক্ষে প্রস্তর যুগকে সত্যিকারের বর বলা যেতে পারে। নিউইয়র্কের নাগরিকগণের ১১ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত যতখানি শ্রবণশক্তি থাকে, মাবান উপজাতির লোকদের ৭০ বছরের বৃদ্ধেরও শ্রবণশক্তি ততখানি। তার অর্থ হলো, একজন ৭৫ বছর বয়স্ক বৃদ্ধ মানব ১৫ বছর বয়স্ক একজন আমেরিকান ছেলের মতই পরিষ্কার শুনতে পায়।

বিভিন্ন ধরণের জনগণের মধ্যে অবশ্য কৈশোর বয়সের শ্রবণশক্তিতে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না। সুদান, নিউইয়র্ক অথবা রুর জেলার শব্দবহুল রাজধানী ডুসেলডর্ফের কিশোরেরা একই রকম শুনতে পায়। কিন্তু বয়স ৩০।৪০-এর কোঠার পৌঁছে গেলে—এমন কি, তার আগেই সভ্য মানুষের শ্রবণশক্তি দুর্বল হতে থাকে।

সুতরাং আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ৩০ বছরের পর থেকেই যে শ্রবণশক্তি ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে অথবা বার্ধক্যে যে বধিরতা আসে, সেই অবস্থাকে সভ্য দেশগুলিতে প্রায় স্বাভাবিক বলেই মনে করা হয়। এই অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়, মানুষের তৈরী।

জোনাকীর আলোর উৎস কোথায়?

লীন পুল এই সম্বন্ধে লিখেছেন—গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় পল্লীঅঞ্চলে জোনাকীর ঝাঁক বেরিয়ে আসে। তাদের দেহে যে আলো জ্বলে, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুকাল ধরে ভেবেছেন। এই আলো কোথা থেকে আসে, কেন আসে, এতে তাদের কি কাজ হয়—ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা এক-শ' বছরেরও বেশী হলো গবেষণা করে আসছেন।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে এই বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং এর ফলে এই আলোর উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। কয়েক

দশক পূর্বে এই বিষয়ে যাঁরা অগ্রগামী হয়েছিলেন, তাঁদের গবেষণাকে ভিত্তি করেই সাম্প্রতিক কালে পথসন্ধানের চেষ্টা হয়েছে।

এই জৈব আলো বা "বায়োলুমিনেসেন্স" সম্পর্কে পর্যালোচনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ হলেন উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী শারীরবৃত্তবিদ্ রাফায়েল ডুবোয়া। এক ধরণের দীপ্তিমান শুক্তি নিয়ে তিনি গবেষণা করে দেখলেন যে, এই জৈব আলোর পিছনে দুটি জিনিষ রয়েছে। এই দুটি জিনিষের মধ্যে তিনি একটির নাম দিলেন 'লুসিফেরিন' এবং অপরটির নাম দিলেন 'লুসিফারেজ'। এই শব্দ দুটি এসেছে লুসিফার শব্দ থেকে। লুসিফার শব্দের অর্থ আলোর বাহক।

আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ই-নিউটন হার্ভি ডুবোয়ার গবেষণাকে ভিত্তি করে এই বিষয়ে আরও তথ্য সন্ধানের চেষ্টা করেন। তাঁর এই চেষ্টার ফলে জানা যায় যে, এই আলো বিকিরণের পিছনে আছে এন্‌জাইম গোষ্ঠীর কোন বস্তু, যেমন পেপ্‌সিন ইত্যাদির মত ক্রিয়া। এই পেপ্‌সিন জাতীয় বস্তুটি জোনাকীর আলো বিকিরণের ক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করে। আলো বিকিরণকারী নানা ধরণের জীব নিয়েই তিনি লুসিফারেজের প্রতিক্রিয়ার বিষয়ে পরীক্ষা করেন এবং এই প্রতিক্রিয়া যে নানা রকমের হয়ে থাকে, তা প্রমাণ করেন।

জন্‌স্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানী সম্প্রতি "সায়েন্টিফিক আমেরিকানে" এ-পর্যন্ত জৈব আলো সম্পর্কে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ও তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এতে তাঁরা জীবের বিবর্তনের পথে এই জৈব আলোর ব্যাপারটি কি ভাবে উদ্ভব হলো, তারও বর্ণনা দিয়েছেন

এই দু'জন বিজ্ঞানীর একজন হলেন ডাঃ উইলিয়াম ডি. ম্যাকেলরয়। ইনি জন্‌স্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান। আর একজন হচ্ছেন ডাঃ হাওয়ার্ড এইচ. সেলিগার। তিনিও ঐ বিভাগেরই অধ্যাপক এবং এই বিষয়ে গবেষণায় সাহায্য করছেন। তাঁদের এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, জৈব আলো বিকিরণের পিছনে কি আছে অর্থাৎ মূল বস্তুটি কি, তা জানা গেছে।

জন্‌স্ হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়েব গবেষণাগারে ডাঃ ম্যাকেলরয় এবং তাঁর সহকারীগণ জোনাকীর দেহ থেকে লুসিফেরিন নামে পদার্থ সংগ্রহ করতে পেরেছেন। কি কি পদার্থের সমবায়ে এই বস্তুটি গঠিত, অর্থাৎ এর রাসায়নিক গঠন প্রণালী ডাঃ ম্যাকেলরয় ডাঃ এমিল হোয়াইটের সহযোগিতায় গবেষণার ফলে জানতে পেরেছেন এবং এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত নির্ভুল কি না, প্রমাণ করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা বিশ্লেষিত পদার্থসমূহকে পুনরায় সংশ্লেষিত করেন। ঐ মৌলিক পদার্থটি উপযুক্ত পরিবেশে পুনরায় আলো বিকিরণ করায় এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এই আলোর অন্যতম প্রধান উপকরণ লুসিফারেজকেও তাঁরা পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন। দেহ থেকে এই আলো বিকিরণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জোনাকীরই নয়, নানা রকমের জীবাণু কীটপতঙ্গ, ছত্রাক, নানা রকমের মাছ, শামুক, শুক্তি প্রভৃতিরও আছে।

ডাঃ ম্যাকেলরয় এবং ডাঃ সেলিগার এই সব জীবের দেহ থেকে আলো বিকিরণের ব্যবহারিক বা কার্যকরী দিকটিরও উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন জীবের ক্ষেত্রে এই আলো বিভিন্ন কাজ করে থাকে। জোনাকীর ক্ষেত্রে এই দেহনিঃসৃত আলো হলো যৌন-মিলনের সঙ্কেত। গভীর সমুদ্রের অ্যাংলার মাছের দেহনিঃসৃত আলোর কাজ হচ্ছে অন্য প্রাণীকে প্রলুব্ধ করা এবং কোনও কোনও আলো-বিকিরণকারী সামুদ্রিক জীবের কাছে এটি হলো আত্মরক্ষার উপায়।

তবে অতি ক্ষুদ্র জীবদেহের আলোর দ্বারা কি

উদ্দেশ্য সাধিত হয়ে থাকে, তা এত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় নি। আলো-বিকিরণকারী জীবাণু ও ছত্রাক কৃত্রিম উপায়ে জন্মানো যেতে পারে।

পৃথিবীর আদিমতম জীবের বিকাশ ঘটেছিল অক্সিজেন শূন্য আবহাওয়ায়। তাদের কাছে অক্সিজেন ছিল বিষতুল্য—এই ধারণার ভিত্তিতেই হপ্‌কিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত এসে পৌঁচেছেন যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া হেতু যে সব জীব অক্সিজেন গ্রহণ করতো না, তাদের সঙ্গে এই জৈব আলোর সম্পর্ক রয়েছে।

তার পরের যুগে যখন ঐ সব জীব অক্সিজেন গ্রহণ করতে লাগলো, তখনও অক্সিজেন অপসারণ-কারী আলোর প্রতিক্রিয়ার অবসান ঘটলো না, যদিও ঐ আলো ছিল তখন অপ্রয়োজনীয়। এজন্যেই কোন কোন জীবদেহ থেকে যে আলো নিঃসৃত হয়ে থাকে, বর্তমান পরিবেশে তার ব্যবহারিক প্রয়োজন আর নেই।

তবে এটা যুক্তিসঙ্গত অনুমান মাত্র। এই বিষয়ে ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে আরও বহু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।

বিদ্যুৎ-সংহতি

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

বিদ্যুতের সংহতি বা সমন্বয় বলতে কি বোঝাতে চাই, এই প্রশ্ন প্রথমেই উঠতে পারে। এক কথায় উত্তর দেওয়া মুশকিল, তবে ভরসা এই যে, প্রবন্ধের আলোচনার মধ্যেই ক্রমে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে দেশের বিদ্যুৎ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক। বর্তমানে ভারতের বিদ্যুৎ-উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ষাট লক্ষ কিলোওয়াট, স্বাধীনতার পরবর্তী চৌদ্দ বছরে পরিমাণ চার গুণেরও কিছু বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় পরি-কল্পনার অঙ্গীভূত হয়ে উৎপাদনের হার গড়পড়তা প্রতি আট বছরেই দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস উত্তাপ বা জলপ্রবাহ। কয়লা ইত্যাদি খনিজ জ্বালানীর উত্তাপে অধিক চাপ ও তাপমাত্রায় যে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাথেকেই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে থাকে। বাষ্পের পরিবর্তে জলস্রোতের সাহায্যেও বিদ্যুৎ উৎপাদিত হতে পারে। যাহোক আমাদের দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন প্রধানতঃ কয়লার উপরই নির্ভর করে।

কয়লা—বর্তমানে উৎপাদিত বিদ্যুতের শতকরা প্রায় ষাট ভাগই কয়লার জ্বালানী উত্তাপ থেকে সংগৃহীত হয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় জানা গেছে, দেশে নানা জাতের কয়লার মোট খনিজ সঞ্চয় ৬০০০ কোটি টন। নতুন খনি আবিষ্কারের ফলে পরিমাণ আরো বাড়তে পারে। বস্তুতঃ সে সম্ভাবনাই অধিক। খনি থেকে কয়লা আহরণের ব্যাপারটা একটা সংঘবদ্ধ প্রক্রিয়া। বর্তমানে ছয় কোটি টন করে কয়লা প্রতি বছর তোলা হচ্ছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই পরিমাণ কম করেও অন্ততঃ দশ কোটিতে এসে দাঁড়াবে। মোট আহরিত কয়লার শতকরা দশ ভাগেরও কিছু বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট উৎপাদনের লক্ষ্য ১২০ লক্ষ কিলোওয়াট। তার অন্ততঃ ৬৫ লক্ষ কিলোওয়াট কয়লাকেই জোগাতে হচ্ছে।

তেল ও গ্যাস—ভারতে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ খুব সন্তোষজনক নয়। তেলের জ্বালানী উত্তাপ থেকে বর্তমানে মাত্র আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়ে থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনার পরিসরে এই পরিমাণ আর বাড়াবার চেষ্টা হচ্ছে না। দেশে সম্প্রতি অবশ্য

কয়েকটি বড়দরের তৈল-অঞ্চল আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে পশ্চিম উপকূলের কাম্বে উপত্যকা ও আসামের নাহারকাটিয়া অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খনিজ তেলের রাসায়নিক ক্রিয়ার সময় প্রাকৃতিক গ্যাসও বেশ সহজলভ্য হয়। এই গ্যাস কাজে লাগিয়ে সম্প্রতি নাহারকাটিয়ায় পঞ্চাশ হাজার কিলোওয়াটের একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র বসানো হচ্ছে।

জল-বিদ্যুৎ—এই জাতীয় বিদ্যুতের সবচেয়ে বড় সুবিধা এই যে, উৎপাদনের কাজে জ্বালানীর মোটেই প্রয়োজন হয় না, টারবাইনের চাকা ঘোরাবার জন্যে জলস্রোত পর্যাপ্ত থাকলেই যথেষ্ট। বর্তমানে ২১ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি জলপ্রবাহের সাহায্যে উৎপাদিত হয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় জল ও শক্তি কমিশনের মতে, ভারতে জল-বিদ্যুতের মোট সম্ভাবনা ৪০০ লক্ষ কিলোওয়াট—তার মানে বছরে প্রায় ২৯,০০০ কোটি ইউনিট বা কিলোওয়াট আওয়ার (at load factor 60%)। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে ১৫ কোটি টন কয়লার প্রয়োজন। কিন্তু এ-পর্যন্ত আমরা মোট সম্ভাবনার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র আহরণ করতে পেরেছি। বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক কারণ বশতঃ আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে তার অর্ধেকের বেশী কাজে লাগানো সম্ভব হবে না।

পরমাণু-শক্তি—পরমাণুর ফিসন-এর ফলে যে অপরিমেয় তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তা থেকেও বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি দেশ পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যক্রমে আমাদের দেশেও এই বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাধীনতার পর ভারতে দুটি পরমাণু 'রিয়্যাক্টর' বসানো হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সে অভিজ্ঞতা বেশ কাজে লাগবে। ১৯৬৫ সালের মধ্যেই বোম্বের নিকটবর্তী তারাপুরে একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসানো হচ্ছে—মোট ক্ষমতা দেড় লক্ষ কিলোওয়াট। পারমাণবিক শক্তির মূল উপাদান ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম—ভারতের বিভিন্ন স্থানে তা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। সহজে পরিশোধনীয় অবস্থায় মোট ইউরেনিয়াম ১৫,০০০ টন, থোরিয়ামও ১৫০,০০০ টনের কম হবে না। পরমাণু "জ্বালানী"র এই সঞ্চয় এককভাবে ভারতের মোট শক্তির চাহিদা কয়েক-শ' বছর চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

১৯৬১ সালের মার্চ মাসে মোট ১৫৭·৭৫ কোটি ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়েছিল। দেশের শিল্পোন্নয়ন এবং সাধারণভাবে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। ১৯৬১ সালে জনপ্রতি বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ছিল বছরে ৪৫ ইউনিট। পশ্চিমের অগ্রগামী দেশগুলির তুলনায় এই পরিমাণ যৎকিঞ্চিৎ মাত্র। আমেরিকা ও বৃটেনে জনপ্রতি বার্ষিক ব্যবহার যথাক্রমে ৪১১১ ও ২০০৫ ইউনিট (১৯৬০ সালে)। আমাদের দেশের অবস্থা যে কত বছরে ওদের সমান হবে, বর্তমানে সে চিন্তা থাক। আপাততঃ দেশে শক্তির চাহিদা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতেই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি জটিল হয়ে উঠেছে। বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের জন্যে ভবিষ্যতে আরো অনেক দিন আমাদের কয়লার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করতে হবে। ফলে এই জ্বালানী সম্পদের উপর যে চাপ পড়ছে, তা সহজেই অনুমেয়। তবে পরমাণুর শক্তি কয়লার ভার ক্রমশঃই লাঘব করতে পারে। জাতীয় অর্থনীতি সবল না হলে অবশ্য এই চেষ্টা সার্থক হবে না। বিদেশী সহযোগিতায় প্রাথমিক উদ্যোগ সম্পূর্ণ হয় মাত্র; কিন্তু ব্যাপক পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যে দেশের লোকদেরই প্রধানতঃ যান্ত্রিক কৌশলগুলি আয়ত্তে আনা দরকার।

১৮৯৯ সালে সর্বপ্রথম দেশে কয়লার সাহায্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে যে সব উৎপাদক যন্ত্র বসানো

হয়েছিল, স্বভাবতঃই তাদের কার্যক্ষমতা অনেক কম ছিল। বর্তমানের আধুনিকতম উৎপাদক যন্ত্রগুলিতে এক ইউনিট বিদ্যুতের জন্যে মাত্র ০'৭৫ পাউণ্ড কয়লাই যথেষ্ট (তাতেও আবার জ্বালানীর ভাগ অনধিক ৭০ শতাংশ)। পুরনো যন্ত্রে কিন্তু প্রতি ইউনিটে দুই থেকে ছয় পাউণ্ড পর্যন্ত কয়লার যোগান দরকার। জ্বালানীর এই বৃথা অপচয় বন্ধ করবার জন্যে এসব যন্ত্র অবশ্যই বন্ধ রাখা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই কয়েকটি বাতিলও হয়েছে, কিন্তু বিকল্প বিদ্যুৎ-ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত পুরনো যন্ত্র দিয়েই আপাততঃ কাজ চালিয়ে নিতে হচ্ছে। বড় আয়তনের যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে। আধুনিক কারিগরি কৌশল গ্রহণ করে ভারতের শক্তি পরিকল্পনায় প্রতি ইউনিটে কয়লার ব্যয় ক্রমেই সঙ্কুচিত করে আনা হচ্ছে। ১৯৪৯ সালে প্রতি ইউনিটে গড়পড়তা ২'১৯১ পাউণ্ড কয়লা লাগতো, দশ বছর পরে ১৯৫৮-'৫৯ সালে সেখানে ১'৬৪৬ পাউণ্ডেই যথেষ্ট। কয়েক বছরের মধ্যেই আমাদের দেশীয় ব্যবস্থায় এক পাউণ্ডে এক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। বলা বাহুল্য, কয়লার সঞ্চয় এভাবে কিছু সংরক্ষিত হচ্ছে।

আমাদের দেশের কয়েকটি পুরনো উৎপাদক যন্ত্রে এখনো ধাতু নিষ্কাশনের জন্যে উচ্চ শ্রেণীর কয়লা প্রয়োজন। উচ্চ শ্রেণীর কয়লা বলতে আমরা রাসায়নিক ময়লা বর্জিত অধিক উত্তাপ সৃষ্টিকারী জ্বালানীই বোঝাতে চাই। বলা বাহুল্য, ভারতের মাত্র ৫১৩ কোটি টন এই শ্রেণীর কয়লা উপযুক্ত কারণেই রক্ষা করা প্রয়োজন। বর্তমানে সামান্য তাপ সৃষ্টিকারী লিগ্‌নাইট বা ব্রাউন কোল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করবার কার্যকরী উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে লিগ্‌-লাইটের সঞ্চয় আছে।

এই জাতীয় কয়লায় ছাই বা অন্যান্য অদাহ্য পদার্থই থাকে শতকরা ৪০ থেকে ৭০ ভাগ। স্পষ্টতঃই এই অবিশুদ্ধ কয়লা দূরবর্তী বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে বহন করে নেওয়া এক গুরুতর সমস্যা। কাজেই উৎপাদন ব্যয় বেড়ে ওঠে। খনি-অঞ্চলেই উৎপাদন করে উপযুক্ত তারের ব্যবস্থায় শহর বা শিল্পাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট সমাধান। দেশের পরিমিত পরিবহন ব্যবস্থা ও এভাবে কিছু স্বস্তি পায়। এই সব বিবেচনা থেকেই সম্প্রতি নেয়ভ্যালী বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে (১৯৬২ সাল)।

জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষত্ব এই যে, এর প্রাথমিক ব্যয় ও চলতি ব্যয় সামান্য—কয়লার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীতেই জলের প্রবাহ সারা বছরে সমান থাকে না। গ্রীষ্মে থাকে শুষ্ক কিংবা ক্ষীণস্রোতা, বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে ওঠে, মাঝে মাঝে বন্যার তোড়ে এক সময়কার অভাব সুদে-আসলে পূরণ করে দেয়। তাই জল-বিদ্যুৎ যোজনায় বহু ব্যয়সাধ্য বাঁধ আগেই তৈরী রাখা দরকার। কৃষিপ্রধান দেশে সেচের ব্যবস্থার দিকেও উপযুক্ত নজর দিতে হবে। এত দিক দেখবার পর তবে বিদ্যুতের কথা। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপদন সব সময় সমান রাখা সম্ভব হয় না। বৈদ্যুতিক পরিচলন ব্যবস্থা তাই অটুট রাখা প্রয়োজন, যাতে অন্য স্থানের উদ্বৃত্ত ভাগ দিয়ে সাময়িক অভাব পূরণ করা যায়।

ভারতে বিদ্যুৎ-শক্তির বিভিন্ন উৎসগুলির সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি পর্যালোচনা করেছি। প্রত্যেক ব্যবস্থারই নিজস্ব সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে। কয়লার সঞ্চয় ক্রমক্ষীয়মান, তাছাড়া তার পরিবহন নিয়ে আরেক সমস্যা। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুতে এই সমস্যা অনেক সহজ হয়ে আসে। কারণ এক টন ইউরেনিয়াম বর্তমান অবস্থাতেও দশ হাজার টন কয়লার কাজ করতে পারে। আশা করা যায়, ক্রমে এই পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশে পারমাণবিক উৎপাদক যন্ত্র প্রতিষ্ঠার

সমস্যার কথা আগেই বলেছি। দেশের অর্থনীতি ও কারিগরি কলাকৌশল আয়ত্ত করবার উপর তার প্রসার নির্ভর করছে। জল-বিদ্যুতের সম্ভাব্য স্থলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্পাঞ্চল থেকে অনেক দূরে, দীর্ঘপথ ধরে তার টেনে নিয়ে বিদ্যুৎ পরিচলনের সমস্যাও এখানে রয়েছে। তাছাড়া কয়লা, পরমাণু বা জল-শক্তি চালিত উৎপাদক যন্ত্রগুলি বৃহৎ আয়তনের হলেই একমাত্র পুরাপুরি ব্যয় লাঘব হতে পারে, কিন্তু স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্যে এক জায়গায় এতটা বিদ্যুৎ সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না। বিদ্যুৎ পরিচলনের ব্যবস্থা যদি সঠিক থাকে, তাহলে আমরা অনায়াসেই এক স্থানের উদ্বৃত্ত দিয়ে অন্য জায়গার প্রয়োজন মেটাতে পারবো। শরীরের স্নায়ুজালের মত এভাবে সারা দেশব্যাপী বৈদ্যুতিক পরিচলন-ব্যবস্থা চালু থাকা চাই। সব রকম ভাবে উৎপন্ন বিদ্যুৎই এই ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করবে। এক একটি উৎপাদন ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি এই সমন্বয় পদ্ধতির মধ্যে বিলীন হয়ে থাকবে, অথচ তার সুযোগগুলি থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না। দেশের সীমানার মধ্যে এভাবে বিদ্যুতের পরিচলন-ব্যবস্থা কার্যকরী করা বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের একটি আধুনিক চিন্তা। মূল সূত্রটি হলো—স্বল্পতম ব্যয়ে শক্তি উৎপাদন এবং যেখানে যে আয়তনে যে ব্যবস্থায় যন্ত্র বসালে এই উদ্দেশ্য পূরণ হয়, তা অবশ্যই করা প্রয়োজন।

পরিকল্পনা অবশ্যই অভিনব সন্দেহ নেই। সমস্ত ব্যবস্থাটি কার্যকরী করবার জন্যে যে পরিমাণ কারিগরি বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয়, তা ধারণাতীত। এমনিতেই বিদ্যুতের পরিচলন একটি জটিল ব্যাপার। সারা দেশব্যাপী সমন্বয় ব্যবস্থা কার্যকরী করতে যে বিরাট সংগঠন শক্তির প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য মাত্র। তাই মূল পরিকল্পনাকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। আপাততঃ আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা দরকার। ভারতের কয়েকটি রাজ্যে তা ইতিমধ্যে করাও হয়েছে; যেমন—ডি-ভি-সি'র পরিচালনায় বিহার ও পশ্চিম বাংলা—সম্প্রতি উড়িষ্যাও এখানে এসে যোগ দিয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলে রয়েছে মহারাষ্ট্র, গুজরাট যুক্ত অঞ্চল। ছোটখাট বিভিন্ন চাহিদা পূরণের জন্যে আমরা জ্বালানী তেল ব্যবহার করতে পারি। তেলের সাহায্যে চালিত উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির সুবিধা এই যে, ছোট ছোট আয়তনেও সেগুলি অনায়াসে বসানো চলে। তাছাড়া প্রতি ইউনিটে তাদের প্রাথমিক ব্যয়ভার কয়লার তুলনায় বেশী হয় না। অবশ্য আমাদের দেশে তেলের সঞ্চয় খুবই সীমাবদ্ধ, তবে হিসাব করে কাজ চালালে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তেলের জ্বালানীর তাপে এভাবে বিদ্যুৎ-শক্তির সাময়িক প্রয়োজন মেটানো হবে, পরে পরিবহন ব্যবস্থার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তেলনির্ভর ব্যবস্থাগুলি বন্ধ করে দিলেই হবে। এভাবে সঠিক পরিকল্পনা ও বিবেচনার সঙ্গে অগ্রসর হলে আমরা দেশের সমস্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিচলন ব্যবস্থা-গুলিকে একটি বৃহৎ সমন্বয় পদ্ধতির মধ্যে সংহত করতে পারবো।

বিজ্ঞান-সংবাদ

কুষ্ঠরোগের টিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ পাবলিক হেলথ সার্ভিস-এর একটি রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, কুষ্ঠরোগের গবেষণার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে আমেরিকায় উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। এই গবেষণার ফলে গবেষণাগারে রক্ষিত পশুর দেহে কুষ্ঠরোগের জীবাণু জন্মানো সম্ভব হয়েছে। এর আগে আর এভাবে এই বীজাণু জন্মানো সম্ভব হয় নি। এর ফলে ভবিষ্যতে টিকার সাহায্যে এই রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে বলে তাঁরা বলেছেন।

যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হয়ে থাকে। যক্ষ্মারোগের জীবাণুর সঙ্গে কুষ্ঠরোগের জীবাণুর খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। বর্তমানে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় যে সব ওষুধ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, সেগুলির তুলনায় যক্ষ্মারোগের মৃত জীবাণু ও বি. সি. জি-র সংমিশ্রণে তৈরী টিকা এই রোগ প্রতিরোধে অনেক বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। পশুদেহে এই ওষুধটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রায় দেড় কোটি কুষ্ঠরোগী রয়েছে এবং এর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই রয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে। এটি প্রধানতঃ গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের রোগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আছে প্রায় দু-হাজার রোগী। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ঐ সব অঞ্চলে এই ওষুধটি খুবই কাজে লাগবে।

জর্জিয়া রাজ্যের আটলান্টায় সরকারী জনস্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সংক্রামক রোগের গবেষণা-কেন্দ্রে ডাঃ চার্লস সি. শেপার্ড এ-বিষয়ে গবেষণা করছেন এবং তাঁকে সাহায্য করছেন ডাঃ ওয়াই. টি. চ্যাং। তিনি ১৯৪৭ সাল থেকে এ-বিষয়ে আমেরিকায় গবেষণা করছেন। ডাঃ চ্যাং ওয়াশিংটনস্থিত আমেরিকান লেপ্রোসী ফাউণ্ডেশন বা আমেরিকার কুষ্ঠরোগ সংস্থার একজন বিশেষজ্ঞ।

ডাঃ শেপার্ডই প্রথম শ্বেত ইঁদুরের পায়ের পাতাকে এই রোগে সংক্রামিত করে কুষ্ঠরোগের জীবাণু গবেষণাগারে জন্মাবার পন্থা আবিষ্কার করেন।

পশুদেহের সবচেয়ে ঠাণ্ডা অংশ হচ্ছে পায়ের পাতা। কুষ্ঠরোগের জীবাণু ৬৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। ডাঃ শেপার্ড ফিলিপাইন ও লুইজিয়ানার কারভিলস্থিত কুষ্ঠরোগীদের কাছ থেকে জীবাণু সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি উচ্চ তাপের সাহায্যে মৃত যক্ষ্মারোগের জীবাণু ও বি. সি জি মিশিয়ে এই টিকা তৈরী করেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ইঁদুরের দেহে এই টিকা প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, এই রোগের বৃদ্ধি শতকরা ৩০ থেকে ৬০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে। স্ট্রেপ্টোমাইসিন সহ আরও বারোটি ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গেছে, ঐ টিকার তুলনায় এই সকল ভেষজ অনেক কম কার্যকরী হয়ে থাকে। এই রোগের স্বাভাবিক সংক্রমণ এই টিকা প্রয়োগের দ্বারা রোধ করা যেতে পারে কি না, তা কার্যক্ষেত্রে উপযুক্তভাবে প্রয়োগের দ্বারা ভবিষ্যতে নিরূপিত হতে পারে।

আগামী মে মাসে মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনা

আগামী মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকার পরবর্তী মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহটিকে মহাকাশে প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। মহাকাশযাত্রী লিরয় গর্ডন কুপার ২২ অথবা আরও বেশী বার ঐ মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা করবেন। এতে সময় লাগবে প্রায় ৩৪ ঘণ্টা।

এর আগে যে সকল মহাকাশযানে করে জন গ্লেন, স্কট কার্পেন্ট্যর এবং ওয়াল্টার শিরা পৃথিবী পরিক্রমা করে এসেছেন, সেগুলির তুলনায় এই মহাকাশযানটি হবে উন্নত ধরণের। এতে অতিরিক্ত অক্সিজেন ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে। অ্যাটলাস বুস্টার রকেটের সাহায্যেই এটি মহাকাশে প্রেরিত হবে। ঘণ্টায় ১৭৫০০ মাইল গতিতে এটি পৃথিবী পরিক্রমা করবে এবং পূর্ব নির্ধারিত মিডওয়ে দ্বীপের নিকটবর্তী প্রশান্ত মহাসাগরীয় কোন এলাকায় অবতরণ করবে।

মহাকাশযাত্রীর পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে মহাকাশের কোন বস্তু নিরীক্ষণ করবার ক্ষমতা থাকে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হবে এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হবে, যা এযাবৎ হয় নি।

অপুষ্টি দূরীকরণের অভিনব ব্যবস্থা

সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিজ্ঞান বিষয়ক সম্মেলনে অপুষ্টিজনিত রোগ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

তুলার বীজের গুঁড়া, ভিটামিন, ধাতব দ্রব্যাদি, ভুট্টাচূর্ণ ও সরগম—এই কয়টির সংমিশ্রণে ইনক্যাপারিনা নামে একটি অভিনব খাদ্যবস্তু আমেরিকায় তৈরী হয়েছে। মূল্যের দিক থেকে এই জিনিষটি খুবই সস্তা এবং পুষ্টিকর। মধ্যআমেরিকা এবং পানামার অপুষ্টিজনিত রোগ দূরীকরণ এবং শিশুদের পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে এই বস্তুটি তৈরী হয়েছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশান্যাল ইনস্টিটিউট অব হেলথের বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন টি. বার্টন এবং জেড. ই. শেফার এবং ভেনভারবিলট বিশ্ববিদ্যালয়ের উইলিয়াম জে, ডার্বি বলেছেন যে, অন্যান্য দেশেও এই ধরণের পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু ঐ সব দেশে লভ্য প্রোটিন সমৃদ্ধ বস্তুর সংমিশ্রণে তৈরী হতে পারে।

তাঁরা বলেছেন এই বিষয়ে আরও অগ্রসর হতে হলে খাদ্যগ্রহণ সম্পর্কে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ-বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছেন এবং অন্যান্য সরকারকে এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করছেন।

শুক্রগ্রহে কি প্রাণের অস্তিত্ব আছে?

সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মেনীর জনপ্রিয় জ্যোতির্বিদ এবং ব্যাভেরীয় আল্‌প্‌সের গিরিশৃঙ্গস্থিত ওয়েণ্ডেলষ্টেইনের জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগারের প্রধান ডাঃ রুডল্‌ফ কুয়েন বলেছেন যে, আমাদের প্রতিবেশী শুক্রগ্রহে হয়তো জীবনের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কিনা, সে সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান, পৃথিবীর কোন বিশেষ স্থানে বসে, জানতে পারে। বর্তমানে এত সূক্ষ্ম যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হয়েছে যে, সেগুলির সাহায্যে দূরবর্তী গ্রহগুলির অবস্থাও জানতে পারা যায়। প্রতিবিম্ব নিক্ষেপক সর্ববৃহৎ টেলিস্কোপের সাহায্যেও কেবলমাত্র দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে শুক্রগ্রহ সম্পর্কিত গবেষণায় এ-পর্যন্ত বিশেষ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় নি। শুক্রগ্রহ পৃথিবীর প্রতিবেশী হলেও সেটি পৃথিবী থেকে প্রায় ৪ কোটি ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুকতারা নামে পরিচিত এই গ্রহটি সব সময়ে এত বেশী মেঘ ও কুয়াসা দিয়ে আবৃত থাকে যে, আধুনিক যন্ত্রাদি দিয়েও তা ভালভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না।

যাহোক রশ্মির বর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় প্রধানতঃ কার্বন মিশ্রিত গ্যাস রয়েছে। এর মধ্যে আছে পৃথিবীর তুলনায় কিছু কম মাত্রায় কার্বন ডাই-অক্সাইড। ফলে শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় রয়েছে যৌগিক কার্বন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ। সেখানে হাইড্রোজেন ও মুক্ত অক্সিজেন আছে কিনা, তা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও অজ্ঞাত রয়েছে। বিশেষ আলো বিদ্যুৎ দিয়ে মাপবার ফলে আমাদের প্রতিবেশী গ্রহের উত্তাপের অবস্থাও জানা গেছে।

এই সব পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গেছে যে, শুক্রগ্রহের বাইরের দিকের বাতাসের উত্তাপ হিমাঙ্কের খানিকটা নীচে এবং গ্রহের পৃষ্ঠে কমপক্ষে ৩১০° সেণ্টিগ্রেড (৫৯০ ফা.) উত্তাপ রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছেন।

শুক্রগ্রহে জীবন পৃথিবীর মতই বিকাশ লাভ করেছে, এ-কথা ধরে নিলে আমাদের প্রতিবেশী এই গ্রহটিতে যথেষ্ট গাছপালা থাকা উচিত। বিজ্ঞানীদের মতে এই বৃক্ষলতাদিও পৃথিবীর আদিমতম বৃক্ষাদির মতই। তবে পৃথিবীর উন্নয়নের তুলনায় শুক্রগ্রহ এখনও ২৫ থেকে ৩৫ কোটি বছর পশ্চাতে রয়েছে। শুক্রগ্রহের উত্তাপ অনুযায়ী জীবজন্তুর উদ্ভব সেখানে হয়েছে কিনা, তা এখনও বিপুল বিতর্কের বিষয় থেকে গেছে। জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য মনে করেন যে, শুক্রগ্রহে হয়তো এককোষী প্রাণী রয়েছে। তবে মাছ বা ডায়নোসোরের মত উচ্চতর প্রাণী হয়তো এই গ্রহে নেই।

পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি

সম্প্রতি ভিয়েনায় ক্যানাডার ডাঃ জি. সি. লোরেন, ফ্রান্সের ফ্যাঙ্কোয়েস পেরিন, সোভিয়েটের ভ্যাসিলী এস. স্বেলিয়ানফ যুক্তরাজ্যের সার রোজার মেকিংস, যুক্তরাষ্ট্রের ডাঃ গ্লেন টি. সীবর্গ এবং পাকিস্তানের ডাঃ আই. এইচ. উসমানীর মধ্যে অল্প খরচে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ডাঃ সীবর্গ পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ ও রকেট প্রেরণ সম্পর্কেও আলোচনা করেন এবং এই বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব গবেষণা হয়েছে, তা বিবৃত করেন। ডাঃ সীবর্গ বলেন যে, বর্তমান রকেটে যে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তার জায়গায় পারমাণবিক ইন্ধন ব্যবহৃত হলে এদের ধাক্কার শক্তি হবে দ্বিগুণ। এই ইন্ধনের সাহায্যে প্রেরিত মহাকাশযান দু-জন লোককে মঙ্গলগ্রহে নিয়ে এক বছরের মধ্যেই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারবে।

তিনি আরও বলেন—এই ইন্ধনের সাহায্যে পৃথিবী থেকে অতি ঊর্ধ্বে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনও সম্ভব হবে এবং এই সব উপগ্রহের সাহায্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেলিভিশনে সরাসরি বার্তার আদান-প্রদান করা যাবে।

শক্ হইতে রক্ষা করিবার অভিনব ভেষজ

আঘাত, অসুস্থতা এবং অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে মানবদেহে যে শক্ বা অভিঘাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে, তাহা হইতে রোগীকে রক্ষা করিবার একটি অভিনব ভেষজ ওয়াশিংটনের জনৈক চিকিৎসক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ঔষধের নাম অ্যানজিওটেন্‌শন টু (Angiotension Two)। মানবদেহের রক্তের চাপ বজায় রাখিবার জন্য অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি হইতে স্বাভাবিক-ভাবে যে বস্তুটি নির্গত হইয়া থাকে, সেই বস্তুটিরই রাসায়নিক উপাদানসমূহ মনুষ্য-উদ্ভাবিত এই নূতন ভেষজটির মধ্যে রহিয়াছে।

এই ধরণের রোগীর দেহে রক্ত চলাচল ফিরাইয়া আনিবার জন্য বর্তমানে ইনোর অ্যাড্রি-ন্যালিন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই নূতন ভেষজের আবিষ্কর্তা জর্জ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ ফ্রাঙ্ক এ ফিনার্টি (জুনিয়ার) জানাইয়াছেন যে, এই ঔষধটি ইনোর অ্যাড্রিনেলি-নের তুলনায় দুই বা তিন গুণ অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে। ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থের ৫৬ জন হৃদ্‌রোগীর উপর ইহা প্রয়োগ করিয়া তিনি বিশেষ ফল পাইয়াছেন। এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া খুবই তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায় এবং কোন প্রতিক্রিয়াও হয় না।

রক্ত চলাচল হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে এবং তাহা দ্রুত ফিরাইয়া না আনিতে পারিলে রোগীর মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে। মানবদেহের যে বস্তুর জন্য রক্তের চাপ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেই বস্তুটির কথা বিজ্ঞানীদের বহুকাল হইতেই জানা আছে—কিন্তু ঔষধ হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ইহা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। নানা কারণেই মানুষ শক্ বা অভিঘাত পাইয়া থাকে। এই সকল ক্ষেত্রে যে সকল ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গে এই নূতন ভেষজটির কার্যকারিতা আরও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

অপরাধী সনাক্তকরণে পরমাণু-বিজ্ঞানের প্রয়োগ

অপরাধীকে ধরবার কাজে নানারকম বৈজ্ঞানিক উপায় এবং উপকরণের প্রয়োগ আজকাল পৃথিবীর নানা দেশেই প্রচলিত হয়েছে। সম্প্রতি পরমাণু-বিজ্ঞানকেও এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করা অচিরেই আরম্ভ হবে বলে মনে হচ্ছে।

পরমাণু-বিজ্ঞানের সাহায্যে অপরাধীকে ধরবার, অর্থাৎ তার অপরাধ প্রমাণিত করবার এমন সব সুক্ষ্ম প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারা যাবে, যা অন্য কোনও উপায়ে সম্ভব নয়।

জেনারেল ডিনামিক্স করপোরেশনের বিজ্ঞানী ডাঃ ভিন্‌সেন্ট পি গিন যুক্তরাষ্ট্রের 'পরমাণু-শক্তি কমিশনের' তরফে এই বিষয়টি নিয়ে যে সব গবেষণা করেছেন, তার ফলাফল ওয়াশিংটনের আমেরিকান নিউক্লিয়ার সোসাইটির এক অধিবেশনে সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন।

অপরাধ নির্ণয়ের সহায়ক এই পারমাণবিক পদ্ধতিকে বলা হয়েছে "নিউট্রন অ্যাকটিভেশন" বিশ্লেষণ।

ডাঃ গিন ঐ বৈঠকে বক্তৃতায় বলেছেন—কোনও লোক কিছুক্ষণ আগে বন্দুক বা পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছে কিনা, তাঁর আবিষ্কৃত পন্থায় সেটা ধরতে পারা যাবে। এই প্রমাণ এত সুক্ষ্ম যে, অন্য কোনও উপায়ে তার কণামাত্রও ধরা-ছোঁয়া যায় না।

বন্দুক বা পিস্তলের গুলিতে যে বারুদ থাকে, তার কোনও রকম অস্তিত্ব অপরাধীর শরীরে সাধারণতঃ খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু এক গ্র্যাম পরিমাণ বারুদের এক হাজার কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত অতি সুক্ষ্ম কণাও এই পারমাণবিক পদ্ধতিতে ধরে ফেলা যায়।

প্রায় সব রকম পিস্তলে ব্যবহার্য গুলিতে যে বারুদ থাকে, তার মধ্যে অ্যান্টিমনি মিশ্রণ এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তার সঙ্গে বেরিয়াম মিশ্রণও থাকে। যে লোকটি বন্দুক বা পিস্তল ছুঁড়েছে, তার হাতে ঐ মিশ্রধাতুর অতি সুক্ষ্ম অংশ লেগে থাকে। ডাঃ গিনের আবিষ্কৃত নিউট্রন অ্যাকটিভেশন পদ্ধতির সাহায্যে ধরতে পারা যাবে, সন্দেহভাজন কোনও লোক কিছুক্ষণ আগে বন্দুক বা পিস্তলের গুলি ছুঁড়েছিল কি না।

প্রচলিত "প্যারাফিন টেষ্ট" এখন আর ততটা নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগ এবং বিভিন্ন পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁদের গবেষণা-কেন্দ্রে ডাঃ গিনের এই নতুন পদ্ধতিটি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন।

বধিরতা সম্পর্কে গবেষণা

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং ১৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের "ইয়ার ব্যাঙ্কে" বধির ব্যক্তিদের টেম্পোর‍্যাল বোন বা কপালের পাশের অস্থি সংরক্ষণ করা হয়। বধিরতা সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয় এই সব অস্থি। এই সব "ইয়ার ব্যাঙ্কের" কার্যাবলীর সমন্বয় সাধনের জন্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টেম্পোর‍্যাল বোন ব্যাঙ্কস্ সেন্টার ফর ইয়ার রিসার্চ' স্থাপিত হয়েছে।

বধিরতার মূল কারণ নির্ণয় এবং বধিরতা থেকে

আরোগ্যলাভের পন্থা নির্ধারণের জন্যে সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রে বর্তমানে এক কর্মসূচী রূপদান করা হচ্ছে। দেশব্যাপী এই কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়স্থিত কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে।

এই ব্যাঙ্কগুলি গবেষণাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অস্থিগুলি প্রথমে গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যোপযোগী করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়। এই অস্থির সঙ্গে যুক্ত থাকে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিভিন্ন অস্থি ও শ্রবণ-প্রণালীটি। এর সবই পরীক্ষা করা হয় গবেষণাগারে। একই সময়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বধিরতা ও চিকিৎসার ইতি-বৃত্তও পর্যালোচনা করা হয়। এই ভাবেই বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করতে সক্ষম হন, কি কি কারণে কোন্ ধরণের বধিরতার সৃষ্টি হয় এবং সংশ্লিষ্ট রোগীর উপর কোন্ ধরণের চিকিৎসার কি প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

বধির ব্যক্তিরাই ব্যাঙ্কে তাদের অস্থি এবং রোগের ইতিবৃত্ত জমা দিচ্ছেন। আশা করা যায় বিজ্ঞানীদের এই সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলে উত্তরপুরুষ বধিরতার হাত থেকে মুক্তি পাবে।

সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র

আরিজোনায় টাসকনের কিট পীক ন্যাশন্যাল অবজারভেটরীতে সূর্য পর্যবেক্ষণের যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপিত হইয়াছে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। ইহার মাধ্যমে সূর্যকে আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হইবে।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটির ফোক্যাল লেংথ ৩০০ ফুট এবং ইহার মাধ্যমে বৃহদাকারে সূর্যকে দেখা যাইবে। ইতিপূর্বে আর কখনও বৃহৎ আকারে ও সুস্পষ্টভাবে সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় নাই।

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ রবার্ট বি, ম্যাকমাথের নামানুসারে এই দূরবীক্ষণটির নাম দেওয়া হইয়াছে। ডাঃ ম্যাকমাথ অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটিজ ফর রিসার্চ ইন অ্যাস্ট্রনোমি, ইনকর্পোরেটেড নামক প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তন চেয়ারম্যান।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদযাপন

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী—রামমোহন লাইব্রেরী হলে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উদযাপিত হয়।

অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সভাপতি মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেনের অনুপস্থিতিতে শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। প্রধান অতি-থির আসন গ্রহণ করেন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রেরিত এক বাণীতে পরিষদের কার্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই কর্ম প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন এবং বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

অতঃপর পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ তাঁহার বার্ষিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন। এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের পনেরো বছরের কর্ম-প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, দেশবাসীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও তাহাদের বিজ্ঞানানুরাগী করিয়া তুলিবার জন্য যে ব্যাপক আয়োজন ও বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, তাহা আর্থিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার দরুণ পরিষদের পক্ষে পরিকল্পনা অনুযায়ী করা সম্ভব হয় নাই। সরকারের নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাহায্য না পাইলে এই সব পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব

নহে। এই জন্য প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্যের জন্য পরিষদ সরকারের শিক্ষা বিভাগের নিকট কয়েক বৎসর যাবৎ আবেদন করিয়া আসিতেছে।

প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার ভাষণে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ পূর্বসূরীদের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, তাঁহারা দেশ ও জাতির কথা ভাবিয়া গভীর নিষ্ঠার সহিত এই কাজে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টার সহিত বর্তমান প্রচেষ্টার তুলনা করিয়া তিনি বলেন—বর্তমানে বিজ্ঞানচর্চার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও আধুনিক লেখকদের মধ্যে সে নিষ্ঠা যেন দেখা যায় না। এখন আমরা পরশাসন-মুক্ত হইয়া সাহেবীয়ানার দিকে যেন আরও বেশী ঝুঁকিয়া পড়িতেছি। বর্তমান মাথাভারী শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, এই শিক্ষাব্যবস্থা তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি না করিয়া বরং মুখস্থের প্রবৃত্তি জাগাইয়া তোলে। এই জন্য সর্বস্তরে বিজ্ঞানের প্রসারের উদ্দেশ্যে শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজনীয়।

পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার প্রারম্ভিক ভাষণে বলেন—যখন এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় হয় নাই তখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষার আগ্রহ আমাদের ছিল। তারপর ইংরেজীর মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রচলন হয়। দেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন আমরা মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্রতী হই। আশা করিয়াছিলাম, স্বাধীন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নতির জন্য সর্বস্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রবর্তন করিবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনে এখনও যেন এই বিষয়ে সংশয় রহিয়া গিয়াছে। আমি মনে করি, দেশ যদি একবার জোর করিয়া বিশ্বাস লইয়া এই কাজে নামিয়া পড়ে, তাহা হইলে আর কোন কিছুই আমাদের কাজকে ব্যাহত করিতে পারিবে না। এই রকম প্রস্তুতি দেশের আজ আছে।

পরিষদের উদ্দেশ্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া অধ্যাপক বসু বলেন যে, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া এবং বর্তমান যুগের সহিত তাল রাখিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমাদের চলিতে ও দেশবাসীকে চালাইতে হইবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভাষণে জীবনের সাধারণ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বিজ্ঞানের দিকে আমাদের অমনোযোগিতার কথা উল্লেখ করিয়া জনসাধারণের জীবনে বিজ্ঞান-চেতনার প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনুষ্ঠানে ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী পরিসদের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কুমারী স্বপ্না মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক-ছাত্র ও বিজ্ঞানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে কর্মসচিবের নিবেদন

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পঞ্চদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসের এই শুভ অনুষ্ঠানে পরিষদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের স্বাগত অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। পরিষদের এই প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী সম্মেলনে যোগদান করে আপনারা এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার প্রতি যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা প্রদর্শন করেছেন, তার জন্যে আমরা আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে গত ১৯৪৮ সালে বাংলার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সুধি-বৃন্দের সহযোগিতায় এই বিজ্ঞান পরিষদ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ একটি জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তার কর্মপ্রচেষ্টার পঞ্চদশ বর্ষ অতিক্রম করে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করেছে, এটা দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দের কথা, সন্দেহ নেই। পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মধারা সার্থক ও ব্যাপক করে তোলবার জন্যে দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেরই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমাদের উৎসাহ জোগায়।

এই অনুষ্ঠানে এই বছরে আমরা অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে প্রধান অতিথিরূপে পেয়ে বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করছি। তিনি বাংলার অন্যতম খ্যাতিমান সুধী ব্যক্তি। গভীর পাণ্ডিত্য ও দেশহিতৈষণার জন্যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। আপন মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাদি ও ভাবধারার সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ সাধনের যে কর্মপ্রচেষ্টা পরিষদ গ্রহণ করেছে, তার সার্থকতা ও উপযোগিতা সম্পর্কে অধ্যক্ষ ঘোষ তাঁর সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করবেন ও পথনির্দেশ করে আমাদের উৎসাহিত করবেন বলে আমরা আশা করছি।

পরিষদের কথা বলতে গিয়ে সর্বাগ্রে আমরা দুঃখভারাক্রান্ত চিত্তে পরিষদের পরম শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক সদস্য অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন মহাশয়ের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। গত ১৩ই জানুয়ারী তিনি পরলোক গমন করেছেন। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ও সহযোগিতা ছিল সুনিবিড়। তিনি পরিষদের অন্যতম সহঃসভাপতি ছিলেন। ফলিত গণিতবিদ্যায় অধ্যাপক সেনের অবদান ছিল অসামান্য। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও মহান চরিত্রের জন্যে তিনি সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আজ তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে আমাদের এই বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টা জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে বিশেষ সহায়ক, একথা আজ দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করেন। দেশের জনগণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও আধুনিক বিজ্ঞান-চেতনার বিকাশ সাধন করাই পরিষদের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে নিজেদের মাতৃভাষায় সহজ কথায় বিজ্ঞানের তথ্যাদি জনগণের নিকট পরিবেশন করাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে পরিষদ সেই আদর্শই গ্রহণ করেছে। যাহোক, পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে নতুন করে আজ আর কিছু বলবার আবশ্যকতা আছে

বলে মনে হয় না—বিগত দীর্ঘ পনেরো বছর যাবৎ পরিষদ বাংলা ভাষায় নানাভাবে বিজ্ঞানের বিবিধ তথ্যাদি ও ভাবধারা জনগণের নিকট পরিবেশন করে আসছে। দেশবাসীর মনে বিজ্ঞানের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ সৃষ্টি করতে, প্রত্যেকটি মানুষকে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন করে তুলতে না পারলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি এই যুগে কখনও সম্ভব হতে পারে না।

একথা আজ সর্ববাদিসম্মত যে, বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত অনুশীলন ও তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে না পারলে কোন দেশেরই বৈষয়িক উন্নতি ও জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জয়যাত্রায় পাশ্চাত্য দেশগুলি আজ অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে। কেবলমাত্র শিক্ষায়তন ও গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডিতে মুষ্টিমেয় বিজ্ঞানী ও গবেষকের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও ভাবধারা সীমাবদ্ধ থাকলে কোন দেশের সামগ্রিক কল্যাণ কখনও সাধিত হয় না। দেশের প্রত্যেকটি মানুষকে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলা একান্ত প্রয়োজন—দেশব্যাপী একটা বৈজ্ঞানিক আবহাওয়া গড়ে তোলা দরকার। এজন্যে পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে বহুদিন আগে থেকেই বিজ্ঞান বিষয়ক অসংখ্য সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা, আলোচনা প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলা হয়েছে। সে সব দেশে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ মানুষেরও একটা মোটামুটি ধারণা আছে, বিজ্ঞান চর্চায় তারা আনন্দ পায়। তাই উচ্চ বিজ্ঞানশিক্ষা ব্যতিরেকেও সে সব দেশে এডিসন, রাইট, মেণ্ডেল প্রভৃতি বিজ্ঞান-প্রতিভার উদ্ভব সম্ভবপর হয়েছে। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের জনসাধারণ বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যাদি ও ভাবধারার সঙ্গেও পরিচিত নন। অনেকের মধ্যেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল ভিত্তিটুকু পর্যন্ত গড়ে ওঠে নি। বর্তমান যুগে আধুনিক বিজ্ঞানের অজস্র অবদান আমরা নিয়ত প্রত্যক্ষ করছি, দৈনন্দিন জীবনে নানা সুখ-সুবিধা ভোগ করছি; কিন্তু কোন্ জিনিষটা কি, কিভাবে কি হলো—কোন তথ্যই আমরা অনেকেই জানি না, এমন কি, জানবার বা বোঝবার আগ্রহ বা উৎসাহও আমাদের নেই। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এরূপ উদাসীন মনোভাব, এরূপ বিজ্ঞান-বিমুখতা জাতীয় অগ্রগতির পরিপন্থী।

দেশের জনগণের মন থেকে এই বিজ্ঞান-বিমুখতা, তথা বিজ্ঞান-ভীতি দূর করা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের সব কিছুই জটিল বা দুরূহ নয়; আর কেবল গবেষণাগারের উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানই বিজ্ঞান নয়, মানব-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের নানা জ্ঞাতব্য বিষয় ছড়িয়ে আছে। এসব জানলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যেও একটা বৈজ্ঞানিক মনোভাব গড়ে ওঠে। আবার সাধারণ মানুষের মধ্যেও অনেক সময় স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক প্রতিভা লুকানো থাকে; উপযুক্ত পরিবেশে অনুকূল আবহাওয়ায় সে-প্রতিভা বিকশিত হয়ে ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা আবিষ্কার-উদ্ভাবনে দেশ ও জাতি উন্নত হয়ে উঠতে পারে।

প্রতি বছর আমরা পরিষদের শুভ প্রতিষ্ঠা-দিবস এভাবে পালন করে আসছি; আর এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীর নিকট পরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথা নতুন করে তুলে ধরি। আমাদের এই পরিষদ বাংলার জনগণের একটি জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান বিজ্ঞান-প্রগতির যুগে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্য ও ব্যাপকতার উপর দেশের ভবিষ্যৎ অগ্রগতি অনেকাংশে নির্ভর করে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমাদের মত অনগ্রসর দেশে মাতৃভাষায় সহজ ও সরল কথায় জনসাধারণকে বিজ্ঞানের মূল তথ্যাদির সঙ্গে পরিচিত করে তোলা শিক্ষিত সমাজের একটি জাতীয় কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

এই আদর্শ সামনে রেখে পরিষদ গত দীর্ঘ

১৫ বছর যাবৎ যথাসাধ্য কাজ করে যাচ্ছে। অবশ্য একথা আমরা স্বীকার করি যে, দেশবাসীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গঠন ও তাদের বিজ্ঞানানুরাগী করে তোলবার জন্যে যে ব্যাপক আয়োজন ও বিরাট কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন, আমরা তা করতে পারি নি। তার জন্যে যেরূপ বিপুল অর্থব্যয় ও দেশব্যাপী সংগঠনের প্রয়োজন, এই পরিষদের ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আর্থিক অসঙ্গতি ও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পরিষদ তার আদর্শানুযায়ী জনশিক্ষামূলক কতকগুলি পরিকল্পনার কাজে হস্তক্ষেপই করতে পারে নি; কেবল প্রারব্ধ কাজগুলি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছে মাত্র। এর মধ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা প্রকাশ, বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তকাদি প্রণয়ন, অবৈতনিক বিজ্ঞান-পাঠাগার পরিচালনা প্রভৃতি কয়েকটি কাজ নিয়মিত চলছে। জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের প্রতি একটা সহজ আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি করতে হলে পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়াও অধিকতর লোকরঞ্জক ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এজন্যে সহজ পরীক্ষাদির সাহায্যে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিতভাবে জনপ্রিয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্ন যন্ত্রাদির মডেল, চার্ট প্রভৃতি সমন্বিত একটি স্থায়ী বিজ্ঞান সংগ্রহশালা ও যন্ত্রপ্রদর্শনী স্থাপন করবার পরিকল্পনাও পরিষদের রয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ ও স্থানের অভাবে এসব কাজে এযাবৎ হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় নি।

প্রধানতঃ স্থানাভাবের জন্যেই পরিষদের কাজকর্মের প্রসার সাধন সম্ভব হচ্ছে না। ভাড়া করা দুটি মাত্র কক্ষে পরিষদের প্রারব্ধ কাজগুলির জন্যেও স্থান সংকুলান হয় না। এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রসার ও স্থায়িত্ব বিধানের জন্যে এর একটি নিজস্ব গৃহ নির্মিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, যাতে পরিষদে বক্তৃতাকক্ষ, গ্রন্থাগার, পাঠাগার, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করা যায় এবং ব্যাপকভাবে কাজকর্ম পরিচালনা করা সম্ভব হয়। পরিষদের গৃহনির্মাণের চেষ্টা বহুদিন ধরেই চলেছে; কিন্তু এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করা এখনও সম্ভব হয় নি। আপনারা জানেন, কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট থেকে মধ্য কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে একখণ্ড জমি আমরা সংগ্রহ করেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পরীক্ষান্তে দেখা গেল, সেই ভূমিখণ্ডের তলদেশ বিশেষ দুর্বল; কাজেই উপযুক্ত অট্টালিকা এখানে নির্মাণ করা সম্ভব নয় বলে বাস্তুকারগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এখন উক্ত জমির পরিবর্তে অপর কোন স্থানে উপযুক্ত একখণ্ড জমি দেবার জন্যে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের নিকট আবেদন জানানো হয়েছে। এ-বিষয়ে পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক বসু মহাশয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়কেও লিখেছিলেন। একবার ক্রীত জমি প্রত্যর্পণ ও নতুন জমি প্রদানের ব্যাপারে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের প্রচলিত ব্যবস্থায় পরিষদের আর্থিক অসুবিধার সম্ভাবনা দেখা যায়। এরূপ একটি জনপ্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত অর্থের অপচয়ের সম্ভাবনায় আমরা বিশেষ বিব্রত বোধ করছি। আমরা আশা করছি, পরিষদের ন্যায় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্যে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট সহজ ব্যবস্থায় উক্ত জমিখণ্ডের পরিবর্তে অপর কোন উপযুক্ত জমির ব্যবস্থা করে দেবেন। এখন জমির ব্যবস্থা হলেই আমরা গৃহনির্মাণের কাজে অগ্রসর হতে পারি। কার্যারম্ভ করবার মত অর্থ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর থেকে গৃহনির্মাণের জন্যে আমরা গত আর্থিক বছরে এককালীন পঞ্চাশ হাজার টাকার অর্থ সাহায্য পেয়েছি—জনসাধারণের নিকট থেকেও মোটামুটি পঁচিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। পরিষদের

শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট থেকে আরও অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি। এখন উপযুক্ত একখণ্ড জমির সংস্থান হলেই পরিষদের গৃহনির্মাণের কাজ আরম্ভ হতে পারে। এই বিষয়ে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সাহায্য ও সহযোগিতা বিশেষভাবে কামনা করছি।

এখন পরিষদের প্রারব্ধ কাজকর্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করছি। পরিষদের প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা বর্তমান ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী সংখ্যায় ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করলো। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী থেকে এই মাসিক পত্রিকা পরিষদ কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এটিই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকা। এতে যথাসম্ভব সহজ বাংলায় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ, বিজ্ঞানীদের জীবনী, দেশবিদেশের বিজ্ঞান সংবাদ, নতুন আবিষ্কার প্রভৃতি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর' অংশে প্রতি সংখ্যায়ই ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী অপেক্ষাকৃত সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি আলোচিত হয়। মাতৃভাষায় সহজ কথায়ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ের আলোচনা চলে এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্যের তাৎপর্য বুঝা যায়—একথা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার জনপ্রিয়তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, গ্রন্থাগার প্রভৃতিতে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলেও এই পত্রিকার প্রচার বেড়েছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার মাধ্যমে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে—এতে আমরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করি। অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিরাও আজকাল বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যেরূপ আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করছেন, তাতে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টার সাফল্য লক্ষিত হয়।

পরিষদের জনশিক্ষামূলক বিজ্ঞান গ্রন্থমালায় আলোচ্য বছরে শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত 'আচার্য প্রমথনাথ বসু' শীর্ষক একখানা জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ব-বিদ্ প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের এই জীবনালেখ্য-খানা ছাত্রসমাজে বিশেষ সমাদৃত হবে, আশা করি। এছাড়া স্বর্গীয় চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের লিখিত 'পরমাণুর নিউক্লিয়স' এবং শ্রীদেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত 'ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ' নামক পুস্তক দুখানাও পরিষদের জনপ্রিয় পুস্তক-মালার সাম্প্রতিক সংযোজন। এগুলি নিয়ে পরিষদ কর্তৃক এযাবৎ মোট ২২ খানা পুস্তক প্রকাশিত হলো। বর্তমানে 'সৌর পদার্থবিদ্যা' নামক একখানা অনুবাদ পুস্তক প্রকাশের কাজ চলেছে। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বাংলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থমালা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে পরিবেশন করা পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টার বিশেষ সহায়ক, তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিন্তু এটি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কাজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আমরা এরূপ পুস্তক প্রকাশের জন্যে মাঝে মাঝে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকি; সরকার থেকে নিয়মিতভাবে বার্ষিক অর্থসাহায্য পেলে একাজে অধিকতর সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতো।

বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে জনসাধারণকে উৎসাহী করবার উদ্দেশ্যে পরিষদের একটি অবৈতনিক বিজ্ঞান পাঠাগার পরিচালিত হচ্ছে। আধুনিক পাঠাগারের পক্ষে যথোচিত বিধি-ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা এখনও আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। স্থানাভাবই এর প্রধান কারণ। বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান বিস্তারের জন্যে জনসাধারণ ও ছাত্রসমাজকে গল্প ও উপন্যাসাদির পরিবর্তে বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকাদি পাঠে

আকৃষ্ট করতে পারলে যথেষ্ট সুফল লাভের সম্ভাবনা। পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হলে একটি সুপরিচালিত বিজ্ঞান গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের লক্ষ্য। এছাড়া বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পাঠ্যপুস্তকের একটি অবৈতনিক পাঠাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও পরিষদের আছে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ এতে সুগম হবে। পরিষদের বিভিন্ন জনশিক্ষামূলক কর্মপ্রচেষ্টা, বিশেষতঃ তার অবৈতনিক পাঠাগার পরিচালনার প্রচেষ্টায় কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা বিভাগ পরিষদকে বার্ষিক দেড় হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করে থাকেন। এজন্যে আমরা পৌর প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ।

পরলোকগত প্রখ্যাত সাহিত্যিক রাজশেখর বসু মহাশয়ের প্রদত্ত দানে পরিষদ কর্তৃক প্রতি-বছর 'রাজশেখর বসু স্মৃতি-বক্তৃতা' নামে একটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়ে থাকে। নানা প্রতিবন্ধকতার জন্যে আলোচ্য বছরের বক্তৃতাটির ব্যবস্থা করা এযাবৎ সম্ভব হয় নি। এই বছরের এই বক্তৃতাটি অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয় দিবেন বলে স্থির হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী এপ্রিল মাসে এই বক্তৃতাটির ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে।

পরিষদের কাজকর্ম ও আশা-আকাঙ্খা সম্পর্কে একটি মোটামুটি বিবরণ আপনাদের নিকট বিবৃত করলাম। আমরা আশা করি, পরিষদের এই জনশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার প্রতি আমরা দেশের সুধীবৃন্দ ও জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা ক্রমে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পাবো এবং পরিষদ অদূর ভবিষ্যতে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় কল্যাণকর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। তবে এজন্যে যে ব্যাপক ও সুসম্বদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার প্রয়োজন তা কেবলমাত্র জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায়ই সম্ভব নয়। এর জন্যে যথোচিত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা একান্তভাবে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আমরা বার্ষিক নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য হিসাবে মাত্র ৩,৬০০৲ টাকা পেয়ে আসছি এবং এই সাহায্য পরিষদ প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রকাশন বাবদই প্রদত্ত হয়ে থাকে। পরিষদের অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্তব্যাদির কথা ছেড়ে দিলেও কেবলমাত্র পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ের তুলনায়ও এই সরকারী সাহায্য একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে হয়। কেবল 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা প্রকাশের জন্যেই বর্তমানে মোটামুটি ব্যয় বার্ষিক প্রায় ২০,০০০৲ টাকা। প্রয়োজনানুরূপ সরকারী সাহায্য বৃদ্ধির জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগের নিকট আমরা গত কয়েক বছর যাবৎ আবেদন করে আসছি। আমরা আশা করছি, আমাদের বর্তমান জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের পরিচালনায় জাতীয় সরকার পরিষদের এই সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার প্রতি অধিকতর সহানুভূতিশীল হবেন।

এই সম্মেলনের আমাদের প্রধান অতিথি অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদিগকে যথোচিত পরামর্শ ও উৎসাহ দান করবেন। আমরা তাঁর শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিশেষে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলাগণকে পরিষদের প্রতি তাঁদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইতি—

কলকাতা
২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩ সন।

নিবেদক—
শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ
কর্মসচিব, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

এপ্রিল—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

কয়না বাঁধ
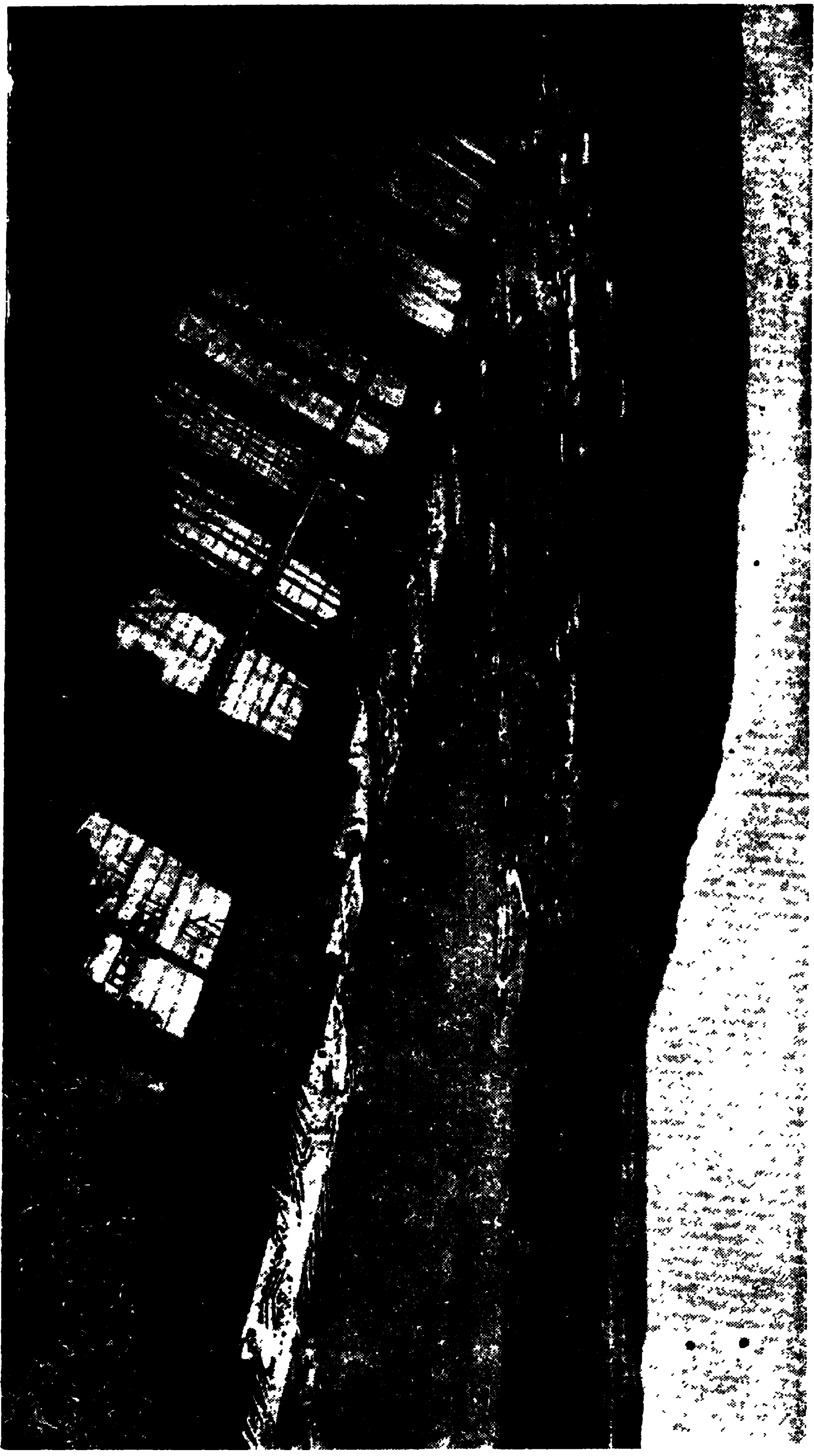
মহারাষ্ট্রের কয়না পরিকল্পনা ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং-এর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১৯৫৪ সালে কয়না পরিকল্পনার কাজ সুরু হয়। পশ্চিমঘাট পাহাড়ের উপর প্রবাহিত কয়না নদীর জলাশয়টিকে পশ্চিমঘাটের নীচে অন্যপথে চালিত করে ভূগর্ভে দুটি বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হবে।

রসায়ন ও আমরা

জীবনধারণের জন্যে মানুষকে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়, লজ্জা নিবারণের জন্যে বস্ত্র পরিধান করতে হয়, সুরুচির পরিচয় দিতে হলে সেই বস্ত্রকে রঞ্জিত করতে হয়, দৈহিক পুষ্টির জন্যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করতে হয় ও ব্যাধির কবল থেকে মুক্তিলাভের জন্যে ওষুধ গ্রহণ করতে হয়। এ-সবের জন্যে আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা রসায়নবিদ্যার সাহায্য নিতে হয়।

জয়রথে চড়ে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে রসায়ন। মানব-কল্যাণে তার অবদানের যেন আর শেষ নেই! আজ যে দিকে চাই, সে দিকেই দেখি রসায়ন শাস্ত্রের জ্ঞানলব্ধ তথ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ।

মানব-কল্যাণে রসায়নের অবদান পঞ্চমুখী। জনস্বাস্থ্য, কৃষির উন্নতি ও খাদ্য সরবরাহ, চিকিৎসা শাস্ত্র, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শিল্প-বাণিজ্য। প্রথমে দেখা যাক জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে রসায়নের অবদান কতখানি।

জনস্বাস্থ্য: মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটবার ও রোগগ্রস্ত হবার মূলে আছে রোগ-জীবাণু। এই রোগ-জীবাণু নানাভাবে নানা পথে মানুষের দেহে প্রবেশ করে রোগ সংক্রামিত করে। মশা-মাছি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গেরাও রোগ-জীবাণুর বাহক। কাজেই জনস্বাস্থ্যের জন্যে যেমন রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা দরকার, তেমনি ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গদেরও দমন করা দরকার। রোগ-জীবাণু ধ্বংসকল্পে ডি. ডি. টি, ব্লিচিং পাউডার, গ্যামাক্সিন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রভৃতি মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ব্যবহৃত হয়। ফ্লিট, ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন প্রভৃতি কীটপতঙ্গ-নাশক। বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপর জনস্বাস্থ্য অনেকটা নির্ভরশীল। দূষিত জলে ক্লোরিন গ্যাস, ওজোন গ্যাস, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি মিশিয়ে শোধন করা হয়। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে—Prevention is better than cure—অর্থাৎ রোগ হলে চিকিৎসা করবার চাইতে রোগ যাতে না হয়, সে বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা ভাল। রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে দেহের রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়। এই উদ্দেশ্যে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের টিকা দেওয়া হয়। টিকা রসায়নেরই অবদান।

কৃষির উন্নতি ও খাদ্য সরবরাহ: উনবিংশ শতাব্দীতে বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ্ লিবিগ উপলব্ধি করেছিলেন যে, রসায়নের সঙ্গে কৃষির এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। জমির প্রকৃতি ও উদ্ভিদের পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণাকালে লিবিগ দেখেছিলেন—জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়াও উদ্ভিদদেহের পুষ্টির জন্যে নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি মৌলিক পদার্থ অত্যাবশ্যক। জমিতে গাছপালা জন্মালে তারা ধীরে

ধীরে জমির নাইট্রোজেনটুকু নিঃশেষ করে দেয়। পুরনো প্রথায় আবর্জনা প্রয়োগ করে জমিতে নাইট্রোজেনের ভাগ বাড়ানো হতো। এখন রসায়নের দৌলতে পাওয়া সোডিয়াম নাইট্রেট নামক রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু খনিজ সোডিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

তখন চেষ্টা চলতে লাগলো—অল্প খরচে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করা যায় কিনা। দেখা গেল—বাতাসে রয়েছে প্রচুর নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পয়সা লাগে না। এগিয়ে এলেন নরওয়ের দু'জন বিজ্ঞানী—বার্কল্যাণ্ড ও আইড। এঁরা বৈদ্যুতিক উপায়ে বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগ করে তৈরী করলেন নাইট্রাস অক্সাইড। এই নাইট্রাস অক্সাইডকে রাসায়নিক উপায়ে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করা হলো। তারপর নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে চুনাপাথর মিশিয়ে তৈরী করা হলো ক্যালসিয়াম নাইট্রেট। প্রকৃতপক্ষে এই ক্যালসিয়াম নাইট্রেটই প্রথম রাসায়নিক বা কৃত্রিম সার।

কিছুকাল পরে এগিয়ে এলেন আর দু'জন বিজ্ঞানী—ফ্র্যাঙ্ক ও ক্যারো। এঁরা তৈরী করলেন ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ৩০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও বায়ু থেকে সংগৃহীত নাইট্রোজেন সহযোগে এই ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড প্রস্তুত হলো। আর্দ্র অবস্থায় সায়েনামাইড অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। অ্যামোনিয়া জমির পক্ষে ভাল সার।

সারের উপর ফসলের গুণ ও পরিমাণ নির্ভর করে—একথা সত্য। কিন্তু সারই একমাত্র কৃষির উন্নতির সহায়ক নয়। অনেক কীট-পতঙ্গ শস্যকে আক্রমণ করে এবং তাতে ফসলের ক্ষতি। কৃষির উন্নতিবিধানের জন্যে এদের মারতে হবে। এই কাজে ডি. ডি. টি, বেঞ্জিন হেক্সাক্লোরাইড, এনড্রিন, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট প্রভৃতি রাসায়নিক কীটঘ্ন ব্যবহৃত হয়।

উদ্ভিদের আবার নানারকম মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে। কৃষির উন্নতিকল্পে এই সব রোগ দমন ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার। তামা, দস্তা ও পারাঘটিত যৌগিক পদার্থ এবং ক্লোরোকুইনোন খুব ভাল জীবাণুনাশক। বীজ বপন করবার আগেই জমির মধ্যেকার ক্ষতিকর জীবাণু ধ্বংস করবার জন্যে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি হলো মিথাইল ব্রোমাইড, ক্লোরোপিকরিন ও এথিলিন ডাইব্রোমাইড। ফসলের আর এক শত্রু—আগাছা। বিভিন্ন ধরণের আগাছা দমনের জন্যে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে টি. সি. এ., ২-৪ ডি অন্যতম।

রাসায়নবিদেরা আবার উদ্ভিদ-হর্মোনের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, উদ্ভিদ-হর্মোন—ইণ্ডোল ব্যুটাইরিক অ্যাসিড টমেটো গাছের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে যে ফল পাওয়া যায়, সেগুলি বীজশূন্য এবং আকার ও স্বাদে অনেক উন্নত হয়। আবার ইণ্ডোল

অ্যাসেটিক অ্যাসিড নামক হর্মোনটি পাইন, আপেল প্রভৃতি গাছের কাটা ডালে প্রয়োগ করলে তাড়াতাড়ি শিকড় গজায়।

কৃষির ক্ষেত্রে রসায়নের আর দুটি উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে—উদ্ভিদকে পত্রবিহীন করা ও জমিকে শস্যবৃদ্ধির উপযোগী করা। ক্যালসিয়াম সায়েনামাইড প্রয়োগ করলে কার্পাস গাছের সবগুলি পাতা খসে যায়। তাতে উদ্ভিদ ও ফসলের কোন ক্ষতি হয় না। পরন্তু যান্ত্রিক উপায়ে তখন ফসল আহরণ করা সহজসাধ্য হয়।

যে জমি শিথিল ও সরন্ধ্র, সেই জমিই শস্যবৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী। জমির এমন উন্নতিসাধন করতে হলে জমিতে ক্রিলিয়াম, ফ্লাফিয়াম, মার্লোম, এক্রিলন প্রভৃতি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে হয়।

খাদ্য সরবরাহের ব্যাপারেও রসায়নের দান প্রচুর। দেহরক্ষা ও দেহের পুষ্টির জন্যে আমাদের নানা উপাদানযুক্ত খাদ্য প্রয়োজন। রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে কোন্ কোন্ খাদ্যবস্তুতে কোন্ কোন্ উপাদান কি পরিমাণে বর্তমান, তা নির্ণয় করা যায়। আবার এই রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যেই নানাপ্রকার কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। সেই সব কৃত্রিম খাদ্যের মধ্যে দালদা, বনস্পতি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য ও মল্টেড দুধ, ল্যাক্টোজেন প্রভৃতি শিশুখাদ্য অন্যতম।

চিকিৎসা শাস্ত্র ঃ রসায়নের দানে সমৃদ্ধ হয়েই চিকিৎসা-শাস্ত্র আজ উন্নতির চরম সোপানে আরোহণ করেছে। রসায়নবিদ্‌গণের গবেষণার ফলেই আজ আবিষ্কৃত হয়েছে ক্লোরোমাইসেটিন শ্রেণীর অ্যান্টিবায়োটিক, পেনিসিলিন ও সালফা-গোষ্ঠীর ওষুধ। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এই সব ওষুধ যুগান্তর এনেছে। এদের প্রয়োগে কত যে মুমূর্ষু রোগী প্রাণ ফিরে পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। যে সব রোগ ছিল দুরারোগ্য—রসায়নবিদ্‌গণের গবেষণালব্ধ ওষুধ প্রয়োগে তাদের আজ সহজেই উপশম ঘটছে। চেতনা-বিলোপকারী নানারকম ওষুধ আবিষ্কারের ফলে কঠিন কঠিন অস্ত্রোপচারের কাজ আজ সহজভাবে সমাধা হচ্ছে। এভাবে রসায়ন-বিজ্ঞানের দানে সমৃদ্ধ হয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান আজ মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধন করছে।

মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ঃ মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানেও রসায়ন-বিজ্ঞানের অবদান কম নয়। রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলেই আজ মানুষের জীবনে এসেছে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এসেছে প্রাচুর্য। কয়লা থেকে পাওয়া যাচ্ছে হীরা ও আলকাৎরা। আবার আলকাৎরা থেকে উদ্ধার করা হচ্ছে প্রাণমাতানো কত সুগন্ধি, মনোমুগ্ধকর রং এবং চিনির চেয়ে বহুগুণ মিষ্টি স্যাকারিন। মাটি থেকে তৈরী হচ্ছে সিমেন্ট। আবার কৃত্রিম রেশম, কৃত্রিম পশম, কৃত্রিম রবার, নাইলন—এমনকি, প্লাষ্টিকের যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার—সবই রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ মাত্র।

শিল্প-বাণিজ্য ঃ শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির ফলেই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যায়।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির পশ্চাতেও আছে রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলেই বিষয়টি আরও সহজবোধ্য হবে। লৌহ আকরিক আছে আকরে। রসায়ন-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলেই তাথেকে কারখানায় লোহা নিষ্কাশন করা সম্ভব হচ্ছে। আবার রসায়নের জ্ঞান প্রয়োগ করেই লোহাকে নানান ধরণের ইস্পাতে পরিণত করা হচ্ছে। তুলা থেকে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তৈরী হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরক পদার্থ ডিনামাইট। সেই ডিনামাইট যুদ্ধবিগ্রহে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার শান্তির সময়ে পাহাড় ভাঙ্গা, সুড়ঙ্গ তৈরী করা প্রভৃতি মানবকল্যাণমূলক কাজে ডিনামাইটকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রসায়নের জ্ঞান প্রয়োগের দ্বারাই আজ আখ থেকে চিনি প্রস্তুত, চামড়া স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত করা (ট্যান করা), পরিধেয় বস্ত্রাদি বিরঞ্জিত করা, রবার ক্লথ প্রভৃতি প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে।

এমনিভাবে রসায়ন-শাস্ত্রের জ্ঞানের প্রয়োগে মানবসমাজ নানাদিক থেকে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে।

অমরনাথ রায়

গাছের বয়স

বাগানের কোন বড় গাছ কাটলে তার গুঁড়ির ভিতরে অনেকগুলি গোল দাগ দেখতে পাওয়া যায়—ঠিক যেন কতকগুলি বৃত্ত কেউ একটার পর একটা সাজিয়ে রেখেছে। আসলে কিন্তু সেগুলি কিছুই নয়—সেগুলি হচ্ছে গাছের বয়সের চিহ্ন। কথাটা খুবই অদ্ভুত, তাই না? কিন্তু অদ্ভুত হলেও ধ্রুব সত্য। ঐগুলিই গাছের বয়সের

বাইরের ছাল
বার্ষিক বৃত্তাংশ
মজ্জা
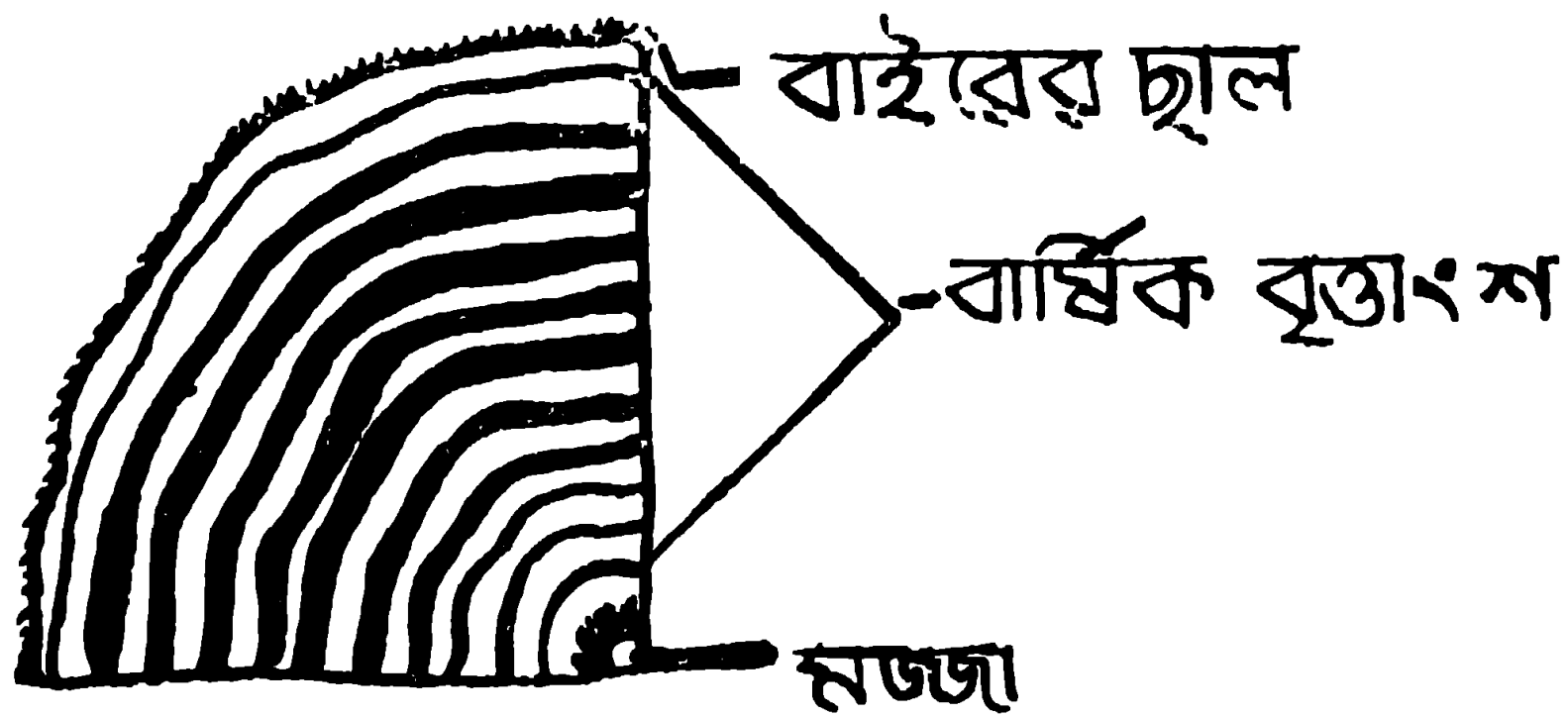
গাছের কর্তিত অংশের দৃশ্য।

চিহ্ন কেন? কারণ প্রত্যেক বছর গাছের কাণ্ডে একটি মাত্র কালো দাগ পড়ে। পাকা বাড়ী যেমন একটার পর একটা ইঁট গেঁথে তৈরী হয়—তেমনি গাছের দেহও অনেকগুলি ছোট ছোট কোষ দিয়ে তৈরী। উদ্ভিদদেহের কোষের সংখ্যা অগণিত।

গাছের কাণ্ডের একটা প্রস্থচ্ছেদ কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রেখে পরীক্ষা করলে তাতে ছোট বড় নানা আকারের কোষ দেখা যায়।

গাছের বাৎসরিক জীবনে মাত্র ছুটি কাল বর্তমান। একটা হচ্ছে বসন্ত থেকে বর্ষা, একত্রে সবটাই স্প্রিং সিজন, আর অন্যটা হেমন্ত থেকে শীত পর্যন্ত, একত্রে সবটাই অটাম সিজন। স্প্রিং সিজনে গাছের যতটুকু অংশ বা কাঠ তৈরী হয়, তাকে বলে স্প্রিং-উড (Spring wood) এবং অটাম সিজনে (Autumn season) যতটুকু অংশ বা কাঠ তৈরী হয়, তাকে অটাম-উড (Autumn wood) বলে।

বার্ষিক বৃত্ত

কোষ

অটাম উড স্প্রিং উড
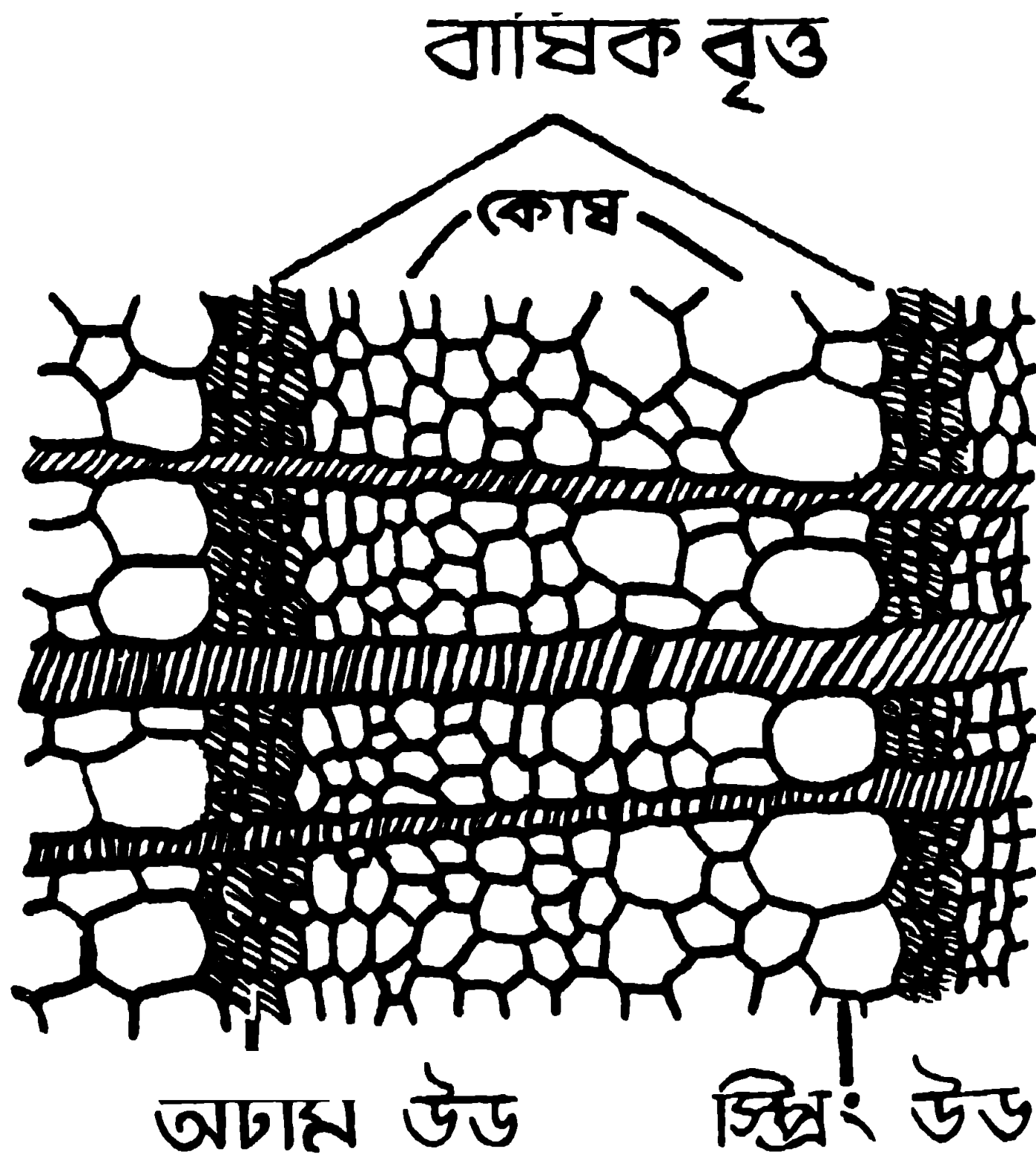
কাটা গাছের ১/৪ অংশ।

গাছের কোষগুলি আর কিছুই নয়, গোল গোল ছিদ্র মাত্র। এই ছিদ্র দিয়ে গাছের প্রয়োজনীয় রস বা জল মূল থেকে পাতা, ফুল ও ফল ইত্যাদিতে যায়। আমরা একথা সবাই জানি যে, বসন্ত থেকে বর্ষা পর্যন্ত গাছ—পাতা, ফুল ও ফলের জন্যে প্রচুর পরিমাণে জল গ্রহণ করে। কারণ এই সময়েই গাছের সজীবতা সুপষ্টভাবে দেখা যায়। এই সময় পর্যাপ্ত জল বা রস যাবার জন্যে গাছের মধ্যস্থিত কোষের ছিদ্রগুলি যতটা সম্ভব বড় হয়। তারপর অটাম সিজনে গাছ, ফুল, ফল ইত্যাদি উৎপন্ন করে না, উপরন্তু তার দেহের সমস্ত পাতা ঝরিয়ে ফেলে। এই সময় মাটিতে জলও বেশী পায় না, তার খাদ্যও এই সময় কম লাগে; সুতরাং কোষের ছিদ্র ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। অবশেষে শরৎ, হেমন্ত পেরিয়ে শীতকালে ঐ ছিদ্রগুলি যতটা সম্ভব ছোট হয়। শেষকালে এক সময় ঐ কোষের ছিদ্রগুলি একেবারে বুজে যায়। বুজে যাওয়ায় দু-তিনটি কোষস্তরের

সৃষ্টি হয়। এই কোষস্তরের নাম ক্যাম্বিয়াম। কোষগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায় মোট একটা মোটা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। কালো দাগের ঠিক পরেই বসন্ত কাল সুরু হবার ফলে কোষ খুব বড় হতে থাকে। বসন্ত থেকে বর্ষা পর্যন্ত কোষ বড় হয় বলে ঐ জায়গার কাঠ সাদাই থাকে। সুতরাং প্রতি বছরে গাছের দেহে খানিকটা সাদা বা স্বাভাবিক ও খানিকটা কালো কাঠের সৃষ্টি হয়। ঐ কালো গোল দাগগুলিই বাৎসরিক বৃত্ত। তাহলে কালো কাঠ হচ্ছে অটাম-উড আর সাদা কাঠ হচ্ছে স্প্রিং-উড।

দাগ দেখে বয়স ঠিক করতে হলে যত দাগ, তার এক বাড়িয়ে বয়স বলতে হবে। কারণ প্রথম বছর গাছ কেবল লম্বায় বাড়ে, তাই প্রস্থে কোন কালো বৃত্তের দাগ সৃষ্টি হয় না, তাই দ্বিতীয় বছরে একটি দাগ পড়ে এবং তৃতীয় বছরে আর একটি দাগ পড়ে। মোট দু-বছরের দুটা দাগ আর প্রথম বছর, মোট তিন বছর বয়সের সময় দাগ হবে দুটা। সুতরাং যে গাছের কাণ্ডে পাঁচটা দাগ আছে, তার বয়স হবে ছয় বছর।

সব গাছের কিন্তু এই দাগ দেখা যায় না। একবীজপত্রী গাছের ক্যাম্বিয়াম গঠিত হয় না বলে তার কোন বাৎসরিক বৃত্ত দেখা যায় না। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কেত হলো—সম্ভাব্য গাছের বয়স = ঐ গাছের বাৎসরিক বৃত্তের সংখ্যা + প্রথম বছর।

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

কাচ

কাচ তোমরা সবাই দেখেছ। কিন্তু কাচ আসলে যে কি জিনিষ, তা হয়তো তোমরা অনেকেই জান না। তোমরা শুনে খুবই অবাক হবে যে, আমাদের সবচেয়ে পুরনো শিল্প হচ্ছে কাচ শিল্প। অনেক দিন আগে থেকেই মানুষ কাচ তৈরী ও তার ব্যবহার করে আসছে। একটা গল্প বলি শোন। অনেক দিন আগেকার কথা— একদল ফিনিসীয় জাহাজে যেতে যেতে একদিন সমুদ্রের তীরে নেমে পড়ে। সেখানে তারা রান্না করবার জন্যে আগুন জ্বালায়। কিছুক্ষণ পরে তারা দেখতে পায় যে, বালির উপরে স্বচ্ছ একটা কিসের আস্তরণ পড়ে আছে। সেই জিনিষটাই হলো কাচ।

এই ব্যাপারটা যে কি করে ঘটলো সেটাই এবার আলোচনা করছি। তোমরা হয়তো জান যে, তিনটি বিভিন্ন রকমের যৌগ মিলে কাচ তৈরী হয়। সে জন্যে রসায়ন শাস্ত্রে কাচের কোন সাধারণ রাসায়নিক সঙ্কেত পাওয়া যায় না। তবে কাচে যে সব বিভিন্ন যৌগ থাকে, তাদের নাম জানা গেছে। কাচে থাকে সাধারণতঃ সোডিয়াম বা পটাসিয়াম অক্সাইড (Na_2O, K_2O), ক্যালসিয়াম বা লেড (সীসা) অক্সাইড (CaO, PbO or

Pb_3O_4) আর বালি। বালিকে আমরা রসায়নের ভাষায় সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) বলবো।

তোমরা জান যে, সমুদ্রের জলে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) থাকে। আর সমুদ্রের ধারে সমস্তই বালি। গরমে এই বালি আর NaCl বিক্রিয়া করে। তার ফলে তৈরী হয় কাচ। এখন তোমরা বুঝতে পার যে, কি করে সেই অতি প্রাচীন কালে সমুদ্রের ধারে কাচ তৈরী হয়েছিল।

কাচের আবার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে—

(১) বিভিন্ন রঙের দিক থেকে, যেমন—নীল কাচ, সবুজ কাচ, হল্‌দে কাচ, লাল কাচ ইত্যাদি।

(২) যৌগের বিভিন্নতার দিক থেকে, যেমন—

(ক) ফ্লিণ্ট কাচ—এতে থাকে লেড অক্সাইড, পটাসিয়াম কার্বনেট আর বালি।

(খ) সোডা লাইম কাচ বা নরম কাচ—এই রকম কাচ তৈরী হয় খড়িমাটি ($CaCO_3$) সোডিয়াম কার্বনেট আর বালি দিয়ে।

(গ) বোহেমিয়ান কাচ বা শক্ত কাচ—এতে থাকে খড়িমাটি, পটাসিয়াম কার্বনেট আর বালি।

আমাদের দেশে বড় বড় ফ্যাক্টরীতে প্রচুর পরিমাণে কাচ তৈরী হয়। ভারতবর্ষে এরূপ প্রচুর ফ্যাক্টরী আছে। যে রকম কাচ তৈরী করতে হবে, ঠিক সেই রকম যৌগ মেসিনে ভাল করে গুঁড়িয়ে নেওয়া হয়। তারপর নির্দিষ্ট অনুপাতে সেই সব যৌগ নিয়ে আর একটা মেসিনে ফেলা হয়। এই মেসিনে সমস্ত জিনিষটা ভাল করে মিশে যায়। তারপর সেই মিশ্রণটাকে বড় বড় ট্যাঙ্কে রেখে প্রোডিউসার গ্যাস দিয়ে গলানো হয়। যখন মিশ্রণটা একটা তরল পদার্থে পরিণত হয় আর কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস বেরিয়ে যায়, তখন সেটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা করা হয়। তারপর সেটা দিয়ে নানারকম জিনিষ তৈরী করা হয়। রঙীন কাচ তৈরী করতে হলে গলিত কাচের ভিতরে অন্য রঙীন রাসায়নিক যৌগ দিতে হয়। পরে আবার তাকে গলিয়ে সমসত্ব (Homogeneous) করে নেওয়া হয়।

ঘরের আসবাবপত্র, লেবোরেটরীর শিশি, বোতল, টেষ্ট টিউব সব কিছুই কাচ দিয়ে তৈরী করা হয়। এসব কাজে কাচ কেন ব্যবহার করা হয়—জান। এর কারণ হচ্ছে, কাচ স্বচ্ছ আর সহজে কোন পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।

তোমরা হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে যে—ছুরি, করাত, হাতুড়ী দিয়ে কাচ সমান করে কাটা যায় না। কাচ-কাটা কলমে হীরা লাগানো থাকে। একমাত্র হীরা দিয়ে কাচ সমান করে কাটা যায়।

অনুপকুমার ভট্টাচার্য

ঘড়ির কথা

সময়কে যে কবে থেকে ঘড়ির সাহায্যে নির্ধারণ করা হচ্ছে, তা বলা মুশকিল। তবে সূর্যঘড়ি যে সবচেয়ে প্রাচীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। মিশরের মাটি খুঁড়ে, পিরামিড ভেঙে, আর চিত্রলিপি ঘেঁটে প্রাচীনকালের সময় মাপবার সামান্য কিছু হদিস মিলেছে। নেপোলিয়ন যখন মিশর যাত্রা করেন, তখন রাজনীতিতে অকৃতকার্য হলেও তাঁর দলের লোকেরা একটা আজব পাথর পায়। পাথরটা রসেটা গ্রামে পাওয়া গিয়েছিল বলে তার নাম দেওয়া হয়েছে রসেটা পাথর। এই পাথরটাতে মিশরীয় চিত্র-লিপি ও গ্রীক ভাষায় একই বিষয় খোদিত আছে। এই পাথর থেকে জঁা ফ্রাসোয়া শাম্পেলিয় মিশরের তদানীন্তন ভাষার পাঠোদ্ধারে সক্ষম হন এবং তাথেকেই মিশরীয়দের সময়জ্ঞানের কথা জানা যায়। সেকালের মিশরবাসীদের সূর্যদেবতা ছিলেন 'রা'। 'রা'-এর প্রতীক ছিল লম্বা আকারের পাথর। বিভিন্ন স্থানে সেরকম পাথর পুঁতে রাখা হতো এবং তাদের ছায়ায় হতো সময় নির্ণয়। এই ধরণের বৃহৎ আকারের যে পাথরটি সর্বপ্রাচীন, তার বয়স সম্ভবতঃ চারহাজার বছরেরও বেশী। একে বলা হয় ক্লিওপেট্রার সূচ। সেই আকাশ-ফোঁড়া সূচের ছায়া দেখেই মিশর জেনেছিল, বছর কত বড় হয় আর সময় কত ছোট হয়। পাথরের ছায়াটা যেদিন সবচেয়ে ছোট হতো, বছরের সে দিনটাই ছিল সবচেয়ে বড়। বছরের যে দিন ছায়াটা হতো সর্ববৃহৎ, সেটাই হ্রস্বতম দিন—বঙ্গাব্দের হিসাবে ছয়ই পৌষ। ইউরোপীয়েরা যাকে ক্লিওপেট্রার সূচ বলতো, তদানীন্তন মিশরের পুরোহিতেরা সেই পাথরটাকে বলতো 'ঈশ্বরের অঙ্গুলী'। এই ধরণের সময় নির্দেশক স্তম্ভকে গ্রীকরা বলতো 'নোমন'।

সবচেয়ে প্রাচীনতম সূর্যঘড়ি বলতে যেটিকে বোঝায়, সেটি একটি মিশরীয় 'ঈশ্বরের অঙ্গুলী'র কাছে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে। সূর্যঘড়িটি পাথর কেটে তৈরী এবং তাতে অক্ষর চিহ্নিত। সেই সূর্যঘড়িটির বিভিন্ন ঘরের ছায়ানুযায়ী সময় বোঝা যেত।

ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারের কার্কডেল চার্চে একটি পাথর আছে। সেটি জোয়ার-ভাটার সময় দেয়, ঘণ্টা-মিনিটের নয়। ষোড়শ শতকের লোকেরা হাতীর দাঁতের সূর্যঘড়ি নিয়ে বেড়াতে বের হতেন। সময় জানতে হলেই পকেটস্থ ঘড়িটাকে সূর্যের সামনে মেলে ধরতেন। কিন্তু সূর্যঘড়ি সময় নির্দেশে বড় বেশী অলস, কেন না ছায়ার নড়া-চড়া খুব ধীর।

জলঘড়ি তৈরী হলো, মিনিট-সেকেণ্ড জানবার জন্যে। কোথাও আবার বিরাটাকার বালিঘড়ির ব্যবহার হতো। খৃষ্টপূর্ব দেড়-শ' সালের কাছাকাছি রোমান আইনে যখন সূর্যঘড়ি অলস প্রতিপন্ন হলো, তখন এল জলঘড়ি। গ্রীকরা এটির নাম দিয়েছিল 'ক্লেপসিড্রা'। উন্নত ধরণের জলঘড়ি তৈরী হতো একটা দাগকাটা কাচের জার দিয়ে।

জারটিতে জল ভরে দেওয়া হতো এবং তাথেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল বেরিয়ে গিয়ে সময় নির্দেশে সাহায্য করতো। এই জলঘড়ি দিয়েই তখনকার দিনে রোমের-সেনেটে বক্তাদের বক্তৃতার সময় সংক্ষেপ করা হতো।

জলঘড়িতে একটি অসুবিধা ছিল এই যে, জারটি যখন ভর্তি থাকতো, তখন জল তাড়াতাড়ি পড়তো আর খানিকটা খালি হলে পড়তে দেরী হতো। আর্কিমিডিস তাই বের করলেন গিয়ার লাগানো জলঘড়ি। জলের উপর একটি ভাসমান বস্তুর সঙ্গে একটি চাকা সংলগ্ন থাকতো। জল নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চাকাটিও আস্তে আস্তে ঘুরতো, আর চাকাটি ঘোরাতো একটি কাঁটাকে। সেটিই তখন ঘড়ির একমাত্র কাঁটা। পরে একটি ঘণ্টা জুড়ে দেওয়াতে জলঘড়ি ঠিক একালের ঘড়ির মতই সময় বলে দিত।

বাগদাদ আর দামাস্কাসে অষ্টম শতকের পর হারুন অল রসিদের পরিচালনায় সময় পরিমাপের বিষয়ে আরবেরা অনেক উন্নতি করেছিল এবং ভারত থেকে সে জন্যে হিসাবের সুবিধার্থে সংখ্যার শূন্যটিকে তারা নিজেদের গণিতে জুড়ে নিয়েছিল।

ইউরোপীয়েরা ভারতীয় নক্ষত্রবিদ্‌দের স্বদেশে নিয়ে গিয়ে নক্ষত্রের কথা জেনে নিল। তাদেরই সহায়তায় ফ্লোরেন্সের তোসকানেল্লী, সান্তামারিয়া চার্চে একখানি কাচের ঘর গড়লেন এবং তার ছাদের ক্ষুদ্রতম এক ফুটো দিয়ে নক্ষত্র দেখে সময় ঘোষণা আরম্ভ করলেন। দিনের বেলায় সেই ফুটোটির সাহায্যে সূর্যরেখায় তিনি সময় জানতে পারতেন। সেই সময়েই তৈরী হলো এক আজব ধরণের ঘড়ি। দুদিকে ভার দিয়ে একটি রড্‌কে রাখা হতো। সেভাবে একটি কাঁটা তুল্যভার থাকতো। কাঁটাটি ঘোরানো হতো একটি চক্র দিয়ে। জেরবার্ট নামে একজন এতে একটি ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিলেন। ল্যাটিন ভাষায় ঘণ্টাকে বলা হয় 'ক্লকা'। তাথেকে ঘড়ির নাম হলো ক্লক। দোদুল্যমান বস্তু যেহেতু 'পেণ্ডুলে' তাই তার নাম হলো পেণ্ডুলাম। প্রথম যান্ত্রিক ঘণ্টাঘড়ি তৈরী হয় বারো-শ' ছিয়াশি সালে, লণ্ডনের সেন্ট পল ক্যাথিড্রালের জন্যে। সূর্যঘড়ির মত যান্ত্রিক ঘড়িতে ডায়াল লাগানো হলো। পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি পিটার হেনলীন নামে একজন ন্যুরেম-বার্গবাসী ঘড়ির স্প্রিং আবিষ্কার করেন। এই রকমে প্রথমে আধুনিক ঘড়ি তৈরী হলো।

প্রথম টাইমপিস তৈরী করতে হ্যারিসনের ছয় বছর লেগেছিল। সে ঘড়ির গিয়ার আবার কাঠের তৈরী ছিল। হ্যারিসন যেটুকু বাকী রাখলেন, তা পূরণ করে দিলেন সুইস ফার্দিনাদ বের্থোদ।

১৮৮৪ সালের পর থেকে লঙ্গিচুড ঠিক করবার জন্যে গ্রীনউইচকে জিরো ডিগ্রি লঙ্গিচুডে রাখা হলো এবং সব ঘড়ি মেলানো হতে লাগলো গ্রীনউইচ-এর সময়ানুসারে।

নেপোলিয়নের স্ত্রী সম্রাজ্ঞী জোসেফিন প্রচলন করেছিলেন ঘড়িকে বাহুতে পরবার পদ্ধতি। পুত্রবধূ অগাস্তে আমেলিকে নতুন রকমের কিছু উপহার দেবার ইচ্ছা হয়েছিল

তাঁর। দুখানি ব্রেসলেটের অর্ডার আগেই দিয়েছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হওয়ায় হুকুম দিলেন, ব্রেসলেট দুটিতে ছোট ছোট ঘড়ি লাগানো হোক। চমৎকার পদ্ধতি। ব্রেসলেট ক্রমে নামতে নামতে এসে ঠেকলো কব্জিতে। তাথেকেই হাতঘড়ির প্রচলন হয়েছে।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

চিকিৎসা ও কৃষিবিজ্ঞানে আইসোটোপের ব্যবহার

যাবতীয় পদার্থই পরমাণুর দ্বারা গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রীয় বস্তু নিউট্রন ও প্রোটনের দ্বারা গঠিত। প্রোটনের মধ্যে এক একক ধনাত্মক বিদ্যুৎ থাকে। আর নিউট্রন হলো-বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ কণা। যে সকল পরমাণুর কেন্দ্রে একই সংখ্যক প্রোটন ও বিভিন্ন সংখ্যক নিউট্রন থাকে, সেই পরমাণুগুলিকেই আইসোটোপ বলা হয়। এদের রাসায়নিক ব্যবহার একই রকম।

আজ পর্যন্ত যতগুলি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গেছে, তাদের প্রত্যেকেরই প্রায় একটার বেশী আইসোটোপ আছে। ইউরেনিয়ামের কথাই ধরা যাক। এই মৌলিক পদার্থটির একটি আইসোটোপের মধ্যে আছে ১৪৩টি নিউট্রন। এই আইসোটোপে যেহেতু ৯২টি প্রোটন আছে, তাই তার ওজন ১৪৩+৯২=২৩৫। এর রাসায়নিক চিহ্ন হলো U^{235}। ২৩৫ ওজনের আইসোটোপটি পারমাণবিক চুল্লী ও পরমাণু-বোমা নির্মাণকল্পে অপরিহার্য। সবচেয়ে হাল্কা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেনেও দুটি আইসোটোপ বর্তমান। হাল্কা হাইড্রোজেনের (যার ওজন ১) পরমাণু-কেন্দ্রে একটি মাত্র প্রোটন আছে, কোন নিউট্রন নেই। এর চিহ্ন হলো H^1। ভারী হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াসে আছে একটা প্রোটন ও একটা নিউট্রন। একে বলা হয় ডয়টেরিয়াম। হাইড্রোজেনের আর একটা আইসো-টোপের নাম ট্রাইটিয়াম। এর পরমাণু-কেন্দ্রে আছে দুটি নিউট্রন ও একটি প্রোটন।

এবার তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের কথায় আসা যাক। পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্যস্থিত ধনাত্মক বিদ্যুৎ পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। অত্যন্ত বেশী বিদ্যুৎ সমন্বিত পরমাণু-কেন্দ্রের মধ্যে এই বিকর্ষণ শক্তির পরিমাণ খুবই বেশী হয়। তার ফলে পরমাণু-কেন্দ্রকটি দু-ভাগে ভেঙ্গে গেলে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি মুক্ত করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরমাণু-কেন্দ্র বিভাজনের ক্ষেত্রে ঐ দুটি অংশ প্রায় সমান আকারেরই হয়। এই বিভাজিত পরমাণুকে বলা হয়, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। দেখা গেছে, ইউরেনিয়াম, অ্যাকটিনিয়াম ও থোরিয়াম শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে পরিণত হয় স্থায়ী সীসায়। এদের ওজন যথাক্রমে ২০৬, ২০৭ ও ২০৮।

ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের ৬ শতাধিক তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকা উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার ফলে পরমাণু-শক্তির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়েছে। যে সব শারীরিক বৈকল্য এতকাল চিকিৎসাশাস্ত্রের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে এসেছে, সে সবের চিকিৎসা ও গবেষণার ক্ষেত্রে চিকিৎসকেরা এখন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে থাকেন। তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তেজ বিকিরণ করে। তাঁরা এই চিহ্নিত কণিকাগুলিকে শরীরে প্রবেশ করিয়ে গাইগার-মুলার কাউন্টারে শরীরের মধ্যে তাদের গতিপথ লক্ষ্য করেন। কোথাও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে তার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। ধরা যাক, কোনও লোককে সামান্য পরিমাণে লবণ খাওয়ান হলো। এখন ঐ লবণের অন্যতম উপাদান সোডিয়ামকে যদি তেজস্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, তবে গাইগার কাউন্টারের সাহায্যে সেই লবণের গতিপথ ধরা যাবে এবং সহজেই বলা যাবে, লোকটির শরীরে রক্তচলাচল ঠিক আছে কিনা।

ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় রেডিয়ামের তীব্র রশ্মির সাহায্যে রোগাক্রান্ত তন্তুগুলিকে ধ্বংস করে ফেলবার তথ্যটি এখন চিকিৎসা-জগতে স্বীকৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে রেডিয়ামের পরিবর্তে তেজস্ক্রিয় কোবাল্ট অনায়াসেই ব্যবহার করা চলে। তাতে সুবিধাও হয় বেশী। কারণ এতে খরচ কম পড়ে এবং কোবাল্টের তেজ বিকিরণ করবার ক্ষমতাও বেশী।

থাইরয়েড গ্রন্থির বিকার ও গলগণ্ডের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করা হচ্ছে। পূর্বে এসব রোগে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সাহায্য গ্রহণ করতেন। থাইরয়েড গ্রন্থির মধ্যে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন প্রবেশ করে তেজ বিকিরণ করে। তার ফলে থাইরয়েডের অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশগুলি নষ্ট হয়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় পরমাণু-কণিকার সাহায্যে কৃষি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। উদ্ভিদের খাদ্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হলো ফস্‌ফেট। ফস্‌ফেট প্রায় সব রকম সারের মধ্যেই থাকে। ফস্‌ফরাসের একটা দুর্বল তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করে রাসায়নিক সারের স্বাভাবিক ফস্‌ফেটের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উদ্ভিদ-চাষে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফস্‌ফরাস থেকে যে ক্ষীণ তেজ বিকিরিত হবে, তাতে উদ্ভিদের কোনও ক্ষতি হবে না। উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে অতি সহজেই ধরতে পারা যাবে—যে জমিতে যে গাছের জন্যে ঐ তেজস্ক্রিয় সার প্রয়োগ করা হলো, সেই জমি ও সেই চারা গাছের মধ্যে ফস্‌ফরাসের কি অবস্থা ঘটলো। এর ফলে জানা যায়—কোন্ ফসলের পক্ষে কি রকম সার সবচেয়ে ভাল, কতখানি সারের প্রয়োজন এবং চারা গাছ থেকে কতটা দূরে কোথায় সার দিতে হবে।

অষ্ট্রেলিয়ায় মিজ্‌ল্‌টো নামে এক রকমের পরগাছা খুবই দেখতে পাওয়া যায়। সেখানকার ইউক্যালিপ্টাস গাছগুলি এই পরগাছার প্রভাবে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ ইউক্যালিপ্টাস গাছের কাঠ থেকে এদেশের আয় কম হয় না। তাই সেখানকার বিজ্ঞানীরা কয়েক রকম সন্ধানী পরমাণু-কণিকার সাহায্যে ইউক্যালিপ্টাস গাছের অনিষ্ট না করেও পরগাছা ধ্বংসের উপায় বের করেছেন।

কৃষি-বিজ্ঞানী ডঃ ডবলিউ ব্যালফ সিংগলটন উদ্ভিদের সুপ্রজননের ক্ষেত্রে পরমাণুর তেজ বিকিরণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, এর সাহায্যে নতুন নতুন পর্যায়ের উদ্ভিদ সৃষ্টি যে কৃষি-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উষা ভট্টাচার্য

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের পরলোক গমন

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ২৮শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে তাঁর সদাকৎ আশ্রমের বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন।

১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বিহার রাজ্যের বর্তমান সারন জেলার অন্তর্গত জেরাদেই নামক গ্রামে রাজেন্দ্র প্রসাদের জন্ম হয়। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর পিতার নাম মহাদেব সহায়।

পাটনা থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে তিনি ইউনিভারসিটির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন এবং এর জন্যে ২০৲ টাকা এবং ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্যে ১০৲ টাকা বৃত্তি পান। একজন বিহারী ছাত্রের এরূপ কৃতিত্ব এই প্রথম। এর পরে তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

এখানে আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে ফিজিক্স ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কেমিষ্ট্রি অধ্যয়ন করেন। তিনি ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকতেন।

ইংরেজি, পারশিয়ান ও লজিকে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়ে তিনি এফ. এ. পাশ করেন। গণিত ও বিজ্ঞানে নম্বর পান কিছু কম। তা সত্ত্বেও কিন্তু ইউনিভারসিটির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এবং দু-বছরের জন্যে ২৫৲ টাকা এবং ইংরেজিতে প্রথম হবার জন্যে আরও ১০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন ভাষার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্যে ১৫৲ টাকা ডফ ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর তেমন আকর্ষণ ছিল না বলে তিনি বি এ. পড়তে আরম্ভ করেন।

রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছেন, সেই সময় তাঁর মনে এক নতুন চেতনার উদয় হয়। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছেন, ছাত্রেরা এখানে মেম্বার হতে পারে। এই সোসাইটির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের চরিত্র গঠন। রাজেন্দ্র প্রসাদ এতে যোগদান করেন। এখানে অন্যান্যদের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতাও বক্তৃতা দিতেন।

এর কিছুদিন পরেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এর জন্যে সভা ডাকা হতো। সভায় সুরেন্দ্র-নাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ

প্রমুখ নেতারা বক্তৃতা দিতেন। এই সব সভায় যোগদান করে রাজেন্দ্র প্রসাদের মনে উদিত হয় স্বাদেশিকতা বোধ।

বি. এ. পাশ করে তিনি এম. এ. ও বি. এল ক্লাসে যোগদান করেন। সব পরীক্ষায় তিনি বরাবর প্রথম স্থান অধিকার করে এসেছেন, কিন্তু এম. এ. ও বি. এল পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেলেন না। এই ক্ষতিপূরণের জন্যে তিনি এম. এল পরীক্ষার জন্যে থিসিস দেওয়া স্থির করলেন এবং পাশ করে হলেন ডক্টর—ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ।

১৯০৬ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ ভলাণ্টিয়ার-রূপে যোগদান করেন। এখানেই তিনি প্রথম সরোজিনী নাইডু, মদনমোহন মালব্য ও জিন্নার বক্তৃতা শোনেন।

১৯১৬ সাল রাজেন্দ্র প্রসাদের জীবনের এক স্মরণীয় বছর। এই বছরে তিনি গান্ধীজীকে প্রথম দেখেন। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে বিহারের প্রতিনিধি দলের একজন হয়ে উক্ত অধিবেশনে রাজেন্দ্র প্রসাদ যোগ দিয়েছিলেন। এক বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী এসেছেন।

তিনি জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কর্মে আত্মনিয়োগ করেন এবং ক্রমশঃ গান্ধীজীর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরূপে পরিগণিত হন।

স্বাধীনতা লাভের জন্যেই আন্দোলন করা কংগ্রেসের অন্যতম কাজ—সেই কাজে রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু সেই সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—যেমন, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, পণপ্রথা, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির প্রতিকারের প্রতিও তাঁর মনোযোগ ছিল।

১৯১১ সালে রাজেন্দ্র প্রসাদ সর্বপ্রথম নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় তিনি কলকাতায় ছিলেন। তারপর তিনি গেলেন পাটনায়। বিহারের অধিবাসীরা তাঁর নেতৃত্ব কামনা করেছিলেন। অচিরেই তিনি বিহার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৩০ সালে তিনি প্রথম কারারুদ্ধ হয়ে তাঁর ছাত্রজীবনের পরিচিত স্থান ছাপরার জেলে নীত হন। সেই সময়ে গান্ধীজী ও আরউইনের গোল টেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা চলছিল।

১৯৩২ সালে ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করে ১৯৪২ সালে। এই আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্যে অন্যান্য দেশনায়কের সঙ্গে রাজেন্দ্র প্রসাদ কারারুদ্ধ হন। এইবার তিনি জেলে বসে হিন্দীতে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেন। ১৯৪৫ সালে অন্যান্য নেতার সঙ্গে তিনিও মুক্তি পান।

১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। রাজেন্দ্র প্রসাদ এই মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হন—তাঁকে ভার দেওয়া হয় খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের।

তারপর ভারতের সংবিধান রচনার জন্যে কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লি প্রতিষ্ঠিত হলে রাজেন্দ্র প্রসাদ তার চেয়ারম্যান পদে বৃত হন। ভারতের সংবিধান রচিত হবার পর ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হয়। তিনি সেই নব-ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৫৭ সালে তিনি ঐ পদে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিবিধ

ভারতের ঊর্ধ্বাকাশ গবেষণা

বোম্বাই হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—ভারতের পারমাণবিক শক্তি গবেষণা বিভাগকে ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে গবেষণায় সাহায্যের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান-বিদ্যা ও মহাকাশ গবেষণা পরিচালনা সংস্থা (নাসা) উহাকে চারটি নাইক-গাজুন রকেট ও নয়টি নাইক-আপাসে রকেট দিবে। গবেষণা এই বছরের শেষের দিকে আরম্ভ হইবে।

এই সম্পর্কে নাসার সহিত ভারতীয় পারমাণবিক গবেষণা বিভাগের যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার বিবরণ এই বিভাগের মুখপত্র 'নিউক্লিয়ার ইণ্ডিয়ার' ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

কেরলে চৌম্বক বিষুবরেখার নিকট থাম্বা ও ত্রিবান্দ্রমের মাঝামাঝি আত্তিপুরার নিকট একটি রকেট ঘাঁটি তৈয়ার করা হইতেছে। এই ঘাঁটি হইতে সাউণ্ডিং রকেট উৎক্ষিপ্ত হইবে।

দুর্গাপুর-কলিকাতা গ্যাস পাইপ লাইন

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কলিকাতায় এপ্রিল মাস হইতে দুর্গাপুর হইতে গ্যাস সরবরাহ আসিবে। দুর্গাপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত ১০৬ মাইল দীর্ঘ এই গ্যাস পাইপ লাইন বসাইবার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। শুধু পাইপের মুখগুলি ওয়েলডিং করিবার কাজ বাকী আছে। প্রকাশ যে, এই পাইপ লাইনের জন্য ১১ হাজার টন লোহার পাইপ বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। এই পাইপ লাইন দিয়া কমপক্ষে প্রতিদিন ৩ কোটি কিউবিক ফুট গ্যাস প্রবাহিত হইবে। ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী এই গ্যাস খরিদ্দারদের সরবরাহ করিবে। একটি যুগোশ্লাভ সংস্থা এই পাইপ লাইন বসাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। গত অক্টোবর মাসে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইবার কথা ছিল।

ডিহরী-অন-শোনে এশিয়ার দীর্ঘতম সেতুর ভিত্তি স্থাপিত

ডিহরী-অন-শোন হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রেরিত এক খবরে প্রকাশ—১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের পরিবহন ও যোগাযোগ রক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম শোন নদীর উপর যে দুই মাইল দীর্ঘ সেতু নির্মিত হইবে, সেই সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এইটি হইবে এশিয়ার দীর্ঘতম সেতু।

সেতুর ভিত্তি স্থাপনের জন্য নির্মিত কূপের ভিতরে একখণ্ড প্রস্তর নামাইয়া দিয়া শ্রীজগজীবন রাম সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেন।

এই সেতু নির্মাণ করিতে ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। আড়াই বৎসরের মধ্যেই ইহার নির্মাণ-কার্য সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। এই সেতু নির্মিত হইলে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের সাহায্যে কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কয়লা চালান দিবার ব্যাপারে যে অসুবিধা আছে, এই সেতু নির্মিত হইলে তাহাও দুরীভূত হইবে।

দুর্গাপুর প্রোজেক্ট

১৪ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের পক্ষ হইতে 'দুর্গাপুর প্রোজেক্টস

লিমিটেড'-এর বার্ষিক (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ হইতে ৩১শে মার্চ, ১৯৬২ সাল পর্যন্ত) রিপোর্ট পেশ করা হয়।

রিপোর্ট হইতে প্রোজেক্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কে জানা যায় যে, তৃতীয় যোজনার শেষে দুর্গাপুরে মোট ৫টি ইউনিটে ২৮৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করিবার লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২টি ৩০ মেগাওয়াট করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্র বর্তমানে চালু রহিয়াছে। ২টি ৭৫ মেগাওয়াট করিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলিতেছে। ইহা ছাড়া ৫ম একটি উৎপাদন ইউনিট তৃতীয় যোজনায় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কয়লা পোড়াইবার চুল্লীর কাজ ও পরিকল্পনা সম্পর্কে রিপোর্টে জানানো হয় যে, কয়লা পোড়াই-বার চুল্লীটি দ্বিগুণ করিবার পর উহাতে ৪টি ব্যাটারীর ব্যবস্থা করা হইবে। প্রতিটি ব্যাটারীর সঙ্গে ২৯টি চুল্লী থাকিবে। তৃতীয় যোজনায় ৫ম একটি ২৯ চুল্লীবিশিষ্ট ব্যাটারী স্থাপনের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার প্রস্তাব বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

রিপোর্টে আরও জানানো হয় যে, যথাক্রমে ২২ কোটি এবং ৬ কোটি টাকার সার প্রস্তুতের প্রকল্প এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত প্রকল্প দুইটির প্রাথমিক পর্যায়ে দেখাশুনা করিবার ভারও দুর্গাপুর প্রোজেক্ট কোম্পানী গ্রহণ করিয়াছে।

সহস্র বছরের "নিদ্রাভ ঙ্গ"

ফিলাডেলফিয়া হইতে ২৮শে জানুয়ারী তারিখে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—গুয়াতেমালায় মায়া রেড ইণ্ডিয়ানদের কবরে সহস্রাধিক যাবৎ "নিদ্রিত" ছিল, এমন জীবাণুকে পুনরায় বাঁচাইয়া তোলা হইয়াছে।

এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের জনক মার্কিন মাইক্রো-বায়োলজিস্ট ডাঃ জোশেফ ভালেন্টা সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, অ্যান্টিবায়োটিক্স উৎপাদনের কার্যে এই সকল জীবাণু ব্যবহার করা হয়তো সম্ভব হইতে পারে। কোন কোন জীবাণু হয়তো রোগবাহী—এমনও হইতে পারে যে, এই সকল জীবাণুই একদা মায়া সভ্যতার অবলুপ্তির জন্য দায়ী ছিল।

আরও অনেক পৃথিবী, অনেক মানুষ

নিউ ইয়র্ক হইতে ২৩শে জানুয়ারী তারিখে এ. পি. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—আমেরিকান আকাশ-মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ও আমেরিকান আবহ সমিতির যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতাকালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লয়েড মক্ত বলেন, ছায়াপথের বিভিন্ন স্থানে এমন ৬০ কোটি উপগ্রহ রহিয়াছে, যেগুলিতে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীবনের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

আমাদের সূর্যের ন্যায় ২০ কোটি নক্ষত্র ছায়াপথে রহিয়াছে। প্রতিটি তারার অন্ততঃ এমন তিনটি করিয়া উপগ্রহ থাকা সম্ভব, যেগুলি বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীবন রক্ষণে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন, ঠিক এই মুহূর্তেই আমরা কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারিতেছি না—কিন্তু সৌরমণ্ডলের বাহিরেও যে জীবনের অস্তিত্ব রহিয়াছে, অধিকাংশ বিজ্ঞানীই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ　　মে, ১৯৬৩　　পঞ্চম সংখ্যা

মৌলিক কণা

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পদার্থ-বিজ্ঞান এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। বলবিদ্যার (Classical mechanics) নবতর প্রয়োগ, ফ্যারাডে-ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-চুম্বকীয় মতবাদ পদার্থ-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে যখন বহু সমস্যার সমাধানে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, তখন আরও নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে—যার সমাধানের জন্যে পদার্থ-বিজ্ঞানকে অনেক জটিলতার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। ক্যাথোড-রশ্মি, আলোক-তড়িৎ (Photo-electricity), তেজস্ক্রিয়া (Radio-activity) জিম্যান-ক্রিয়া (Zeeman effect), এক্স-রশ্মি, বর্ণালীরেখা সংক্রান্ত রিড্‌ব্যার্গের নিয়ম প্রভৃতি নব নব আবিষ্কার পদার্থ-বিজ্ঞানে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সূচনা করেছে। বিদ্যুতের কোন পারমাণবিক গঠন আছে কিনা—এই প্রশ্নও দৃঢ়ভাবে দেখা দিয়েছে। যদিও বস্তুর পরমাণু সম্পর্কে সে দিন একটা মোটামুটি ধারণা ছিল—বিজ্ঞানের পুস্তকে তার স্থান ছিল না। গ্রীক বা হিন্দু দর্শনের পরমাণুকে বিজ্ঞানীরা আমল দেন নি। এমন কি, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেলভিন বিদ্যুৎকে অবিরল সুসম তরল পদার্থ আখ্যা দিয়েছেন, আর পদার্থ বিজ্ঞানে সেই তত্ত্ব সুবিবেচিত হয়েছে।

সেই বছরেই বিজ্ঞানী টমসন পরীক্ষার দ্বারা ক্যাথোড-রশ্মি কণার ভরণ ও ভরের অনুপাত নির্ধারণ করায় কেলভিনের তত্ত্ব বিবেচনা করবার প্রয়োজন রইলো না। ১নং চিত্রে টমসনের পরীক্ষার কাঠামোটি দেখানো হয়েছে। ক ক্যাথোড থেকে রশ্মি খ ও গ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে চ ও ছ-এর মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রমণকালে চ ও ছ-তে তড়িৎ-আধান

প্রয়োগের দ্বারা ক্যাথোড-রশ্মির উর্ধ্ব বা নিম্নমুখী বক্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এই বক্রগতি থেকে জানা যায় যে, ক্যাথোড-রশ্মি ঋণ তড়িৎযুক্ত। এখন দুটি তারের কুণ্ডলী চ ও ছ-এর কাছে রেখে যদি তড়িৎ-ক্ষেত্রের লম্বভাবে একটি চৌম্বক ক্ষেত্র বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, তবে চ ও ছ তড়িৎ-ফলকজনিত বক্রতা লোপ পায়। এখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের মান থেকে ক্যাথোড-রশ্মির গতিবেগ গণনা করা যায় এবং যে কোন একটি ক্ষেত্র থেকে যে বক্রতা সৃষ্টি হয়—তা ক্যাথোড-রশ্মির ভরণ ও ভরের অনুপাত নির্ণয় করে।

আয়ন থেকে অনেক গুণ কম। তিনি এর নামকরণ করেন কণিকা বা Corpuscle ও তার ভরণের পরিমাণ হলো ইলেকট্রন। পরে অবশ্য এই কণিকাই ইলেকট্রন নামে আখ্যাত হয়েছে। বস্তুতঃ ইলেকট্রনই পদার্থ-বিজ্ঞানে স্বীকৃত প্রথম মৌলিক কণা।

সমসাময়িক আরও কয়েকটি পরীক্ষায় টমসন ও তাঁর ছাত্রেরা ইলেকট্রনের ভরণের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। পরে এই সব পরীক্ষার ভিত্তিতে পরমাণুর গঠন সম্পর্কে এক মতবাদ খাড়া করেন। তাঁর মতে, একটি পরমাণু হলো Z সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রতি ইলেকট্রন $-e$ ভরণ সমন্বিত এবং $+Ze$ ধন বিদ্যুৎ সমন্বিত। ফলে পরমাণু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ।
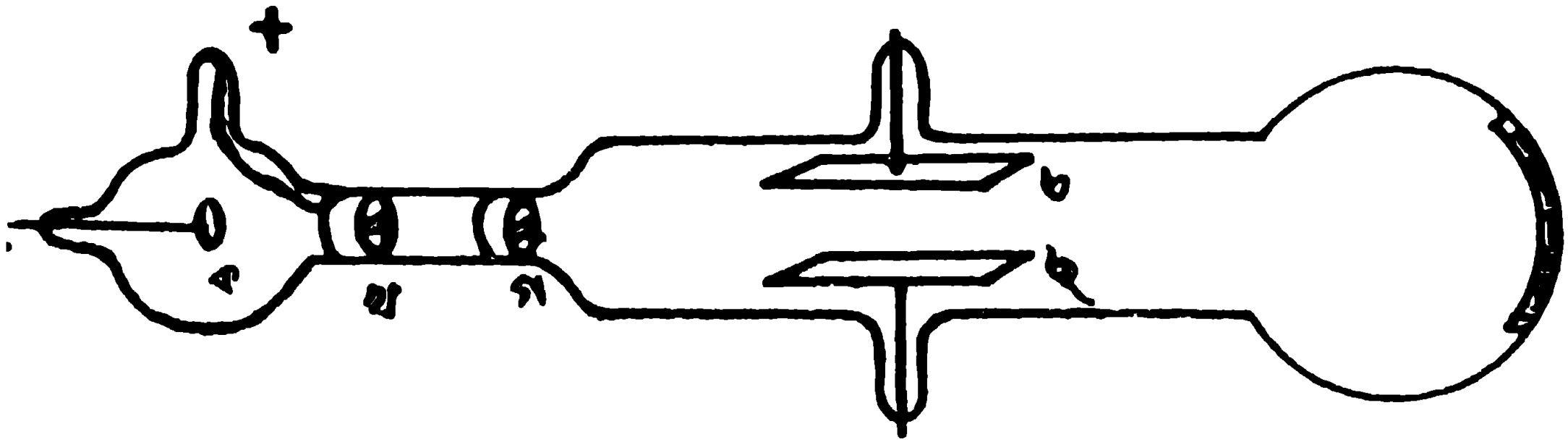
১নং চিত্র। ক ক্যাথোড, খ ও গ রশ্মি বহির্গমনের ছিদ্র, চ ছ—তড়িৎ-ক্ষেত্র। ডান দিকে—বক্রতা মাপবার স্কেল।

এত সহজ একটি পরীক্ষাও কিন্তু সে যুগে খুব সহজ ছিল না। কারণ টিউবের ভিতর বায়ুর চাপ কমাতে না পারলে ক্যাথোড-রশ্মির বক্রতা ধরা পড়ে না। উচ্চ ভাকুয়াম সৃষ্টি তখন খুবই কঠিন ছিল। কার্যতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের আবিষ্কর্তা হার্জের মত বিজ্ঞানীও এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হন নি। তার কারণ ছিল উচ্চ ভ্যাকুয়াম সৃষ্টির বাধা। যান্ত্রিক কৌশল ও বিজ্ঞানের পরীক্ষার যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রয়েছে, এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্টই প্রমাণ হয়। ভ্যাকুয়ামের যান্ত্রিক কৌশল আয়ত্ত না হলে টমসনের পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হতো না। ইলেকট্রোলিসিস পরীক্ষায় আয়নের ভরণ ও ভরের অনুপাত ক্যাথোড রশ্মির ভরণ ও ভরের অনুপাত থেকে কয়েক হাজার গুণ কম। তখন টমসন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ক্যাথোড-রশ্মির কণার ভর

পরমাণুর ভর ধন বিদ্যুতেই সীমাবদ্ধ ও সুসমভাবে বিস্তৃত। বাইরের কোন তেজের দ্বারা ঋণ বিদ্যুৎ তার সাম্যাবস্থা থেকে বিচ্যুত হয় ও তার স্পন্দন ঘটে, ফলে তেজের বিকিরণ হয়। ২নং চিত্রে তিনটি ইলেকট্রনযুক্ত পরমাণুর টমসন-কল্পিত ছবি দেখানো হয়েছে। ধন বিদ্যুতের সুসম বর্তুলাকার বিস্তৃতি কল্পনা করে টমসন ইলেকট্রন-স্পন্দনের সংখ্যা নির্ণয় করে আলোক বর্ণালী রেখার স্পন্দন-সংখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে সাফল্যলাভ করেন—এমন কি, পরমাণুর ব্যাসার্ধ $১০^{-৮}$ সেণ্টিমিটার নির্ধারণ করেন। এই নির্ভুল সংখ্যাটি টমসনের কল্পনার একটি সার্থক ফল সন্দেহ নেই।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রাদারফোর্ড আল্‌ফা-কণার পাত্‌লা বস্তুর পাতের ভিতর নিক্রমণের যে পরীক্ষা করেন, তাতে এক নতুন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া

যায়। আল্ফা-কণার ভরণ +2e এবং ভর হাইড্রোজেনের চার গুণ। টমসন-কল্পিত পরমাণুতে আল্ফা-কণা পাতের ভিতর দিয়ে সরলরেখায় নির্গত হবার কথা; কারণ আল্ফা-কণা ইলেক্ট্রন থেকে অনেক বেশী ভারী হওয়ায় ইলেক্ট্রন কর্তৃক বক্রগতি হবার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়তঃ ধন বিদ্যুৎ সমগ্র পরমাণুতে ছড়ানো রয়েছে বলে এত ক্ষীণ যে, তা দিয়েও আল্ফা-কণা বক্রগতি হবে না। যদি বৃহৎ কোণ

মার্সডেন পরীক্ষার দ্বারা পরমাণুর এই রূপের সত্যতা প্রমাণ করেন।

এই সব আবিষ্কারের ভিত্তিতে নীল্স্ বোর হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত মতবাদ প্রচার করেন। বোর ও রাদারফোর্ড মৌলিক কণা সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে এলেন, ৩নং ছবিতে তা দেখানো হয়েছে। মৌলিক কণার ভর ও ভরণ সম্পর্কে এই চিত্রে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার আবিষ্কার
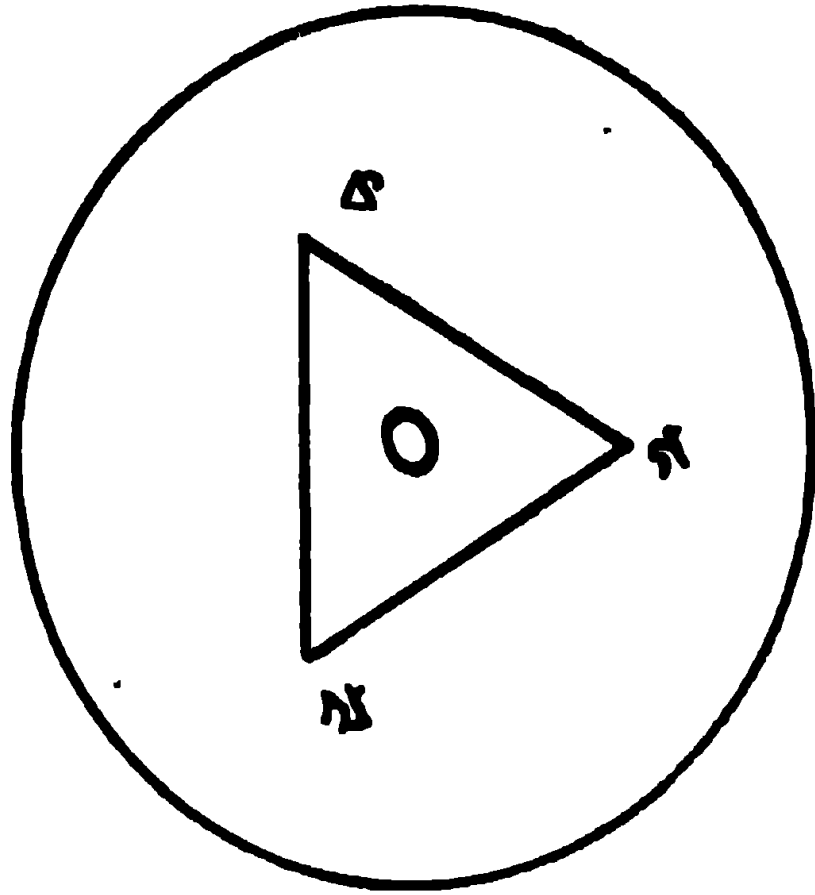
২নং চিত্র। তিনটি ইলেকট্রন-সংযুক্ত পরমাণুর টমসন অঙ্কিত চিত্র। ১৯০৩ সালে তাঁর সিলিম্যান বক্তৃতা (ইয়েল) থেকে গৃহীত।

সহ আল্ফা-কণার বক্রতা এই পরীক্ষায় দেখা যায়, তবে তা সংখ্যাগত হ্রাস-বৃদ্ধির (Statistical fluctuation) জন্যে। রাদারফোর্ডের এই তত্ত্ব মেনে নিলে প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কোণের বক্রতা বহু সংঘাতের ফলে যুক্ত হয়ে বৃহৎ কোন বক্রতা প্রাপ্ত হতে পারে। ফলে এই বক্রতা গসিয়ান (Gaussian) রেখা মেনে চলবে ও বক্রতার কোণের গড় বর্গমূল (Root mean square) সংঘাত সংখ্যার অথবা পাতের বেধের বর্গমূলের সমানুপাতিক হবে। রাদারফোর্ড পরীক্ষার ফল থেকে প্রমাণ করেন যে, এর কোনটাই সত্য নয়। ফলে রাদারফোর্ড-কল্পিত পরমাণু বর্তমানে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। তাঁর মতে $১০^{-১২}$ সেন্টিমিটার ব্যাসের আয়তনে +Ze বিদ্যুৎ পরমাণুতে কেন্দ্রীভূত আছে এবং Z সংখ্যক ইলেক্ট্রন সারা পরমাণুতে ছড়িয়ে আছে। এক বছর পরে তাঁর ছাত্র গাইগার ও

প্রতিফলিত হয়েছে। প্রোটন p হলো হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীন। γ গামা ভরহীন তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ কণা (Quanta)। ম্যাক্স-প্ল্যাঙ্ক কৃষ্ণদেহ বিকিরণের পরীক্ষা থেকে একটি সূত্র আবিষ্কার করেন—১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি এই পরীক্ষার ফল থেকে প্রচার করেন যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ কণিকার আকারে বিকিরিত বা শোষিত হয়। এই কণার তেজ $h\nu$। ν হলো বিকিরণের স্পন্দন-সংখ্যা, আর h প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা। বস্তু ও বিকিরণ ক্ষেত্রের তেজ বিনিময়ের এই কণিকাস্বরূপ পদার্থ-বিজ্ঞানে এক বিপ্লব নিয়ে এল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আইনষ্টাইন এই মতবাদের বিশেষ আলোচনা ও উন্নয়ন করেন। ফলে বোরের পরমাণুবাদ বিশেষ প্রভাবিত হয়।

১৯২৪-১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান প্রবর্তনে পদার্থ-বিজ্ঞান এক নতুন রূপ পরিগ্রহ

করলো। প্ল্যাঙ্ক, আইনষ্টাইন ও বোর তরঙ্গধর্মী বিকিরণে কণাধর্মের আরোপ করে এই যুগের উদ্বোধন করেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিলিকান আলোক-তড়িতের পরীক্ষা এবং ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কম্পটন ইলেকট্রন ও এক্স-রশ্মির সংঘাতের পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে, তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বস্তুর সঙ্গে তেজ ও ভরবেগ বিনিময়ে কণিকার মত ব্যবহার করে।

কণিকারও তরঙ্গধর্ম থাকা উচিত। ফোটনের মত বস্তু-কণারও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ, নিত্যসংখ্যা h-কে তার ভরবেগ p দিয়ে ভাগ দিলে পাওয়া যাবে। ৪নং চিত্রে ডুব্রগলি-কল্পিত পরমাণুর কক্ষে ইলেকট্রনের তরঙ্গধর্ম দেখান হয়েছে। ৪(ক) চিত্রে তরঙ্গসংখ্যা পূর্ণসংখ্যা নয়, তাই সমতানতা (Resonance) সম্ভব নয়। ৪ (খ) চিত্রে অবশ্য পূর্ণসংখ্যক তরঙ্গের জন্যে সমতানতা সম্ভব এবং ইলেকট্রনের এই রূপ
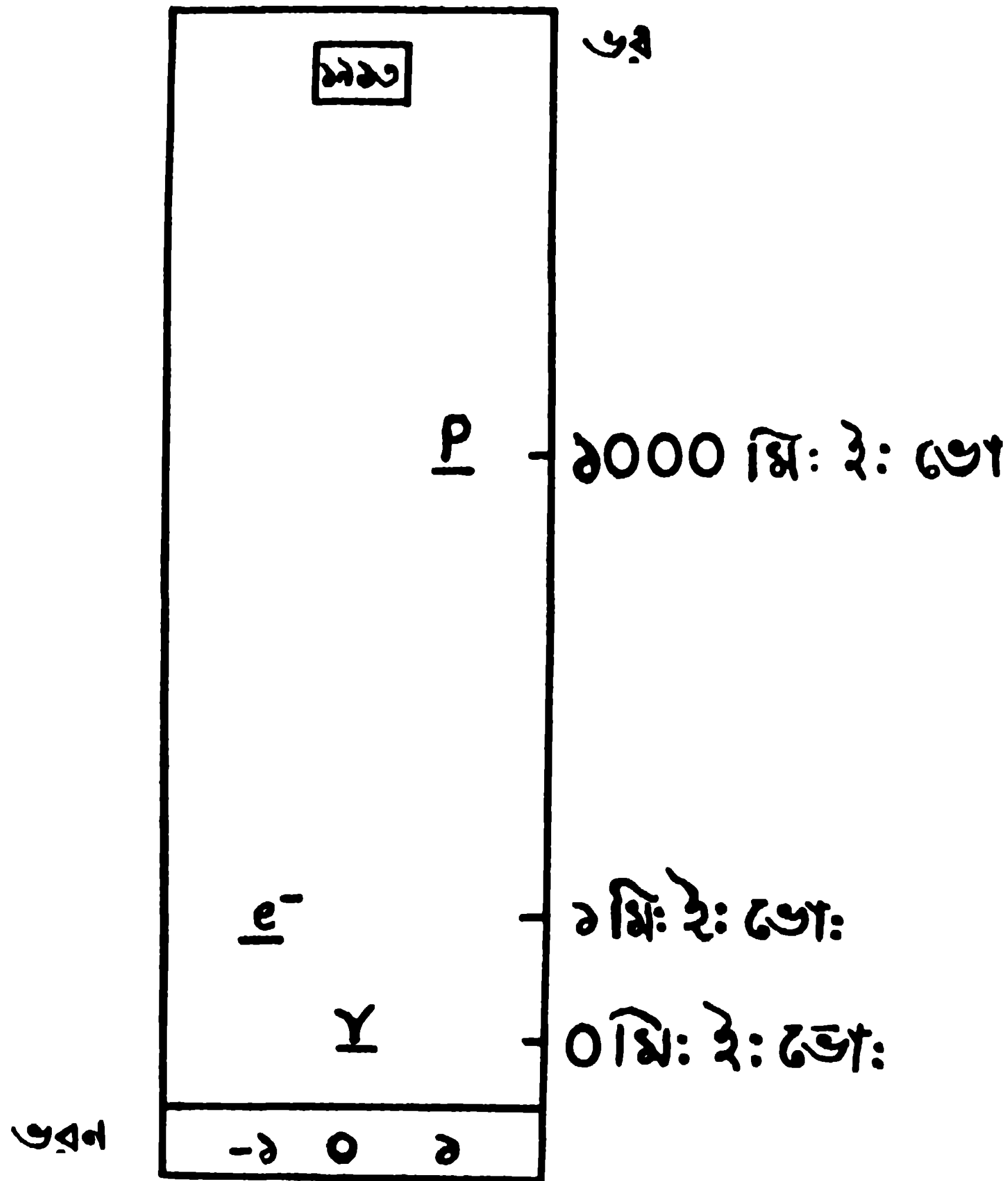
৩নং চিত্র। ১৯১৩ সালে আবিষ্কৃত মৌলিক কণা, ভর ও ভরণ, মিঃ ইঃ ভোঃ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট (Mev) একটি ইলেকট্রনকে এক মিলিয়ন ভোল্ট বিভবে তুললে তার যে তেজ (Energy) হয়, তাকে মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট বলে।

এক্স-রশ্মির এই কণিকার নাম ফোটন ও γ অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা হয়। একটি ফোটনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য λ ও ভরবেগ P-এর গুণফল প্ল্যাঙ্কের নিত্যসংখ্যা h এর সমান হয়। তখন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ডুব্রগলি প্রশ্ন তোলেন যে, তাহলে বস্তু-

কক্ষই নিয়মসঙ্গত। এভাবে ডুব্রগলি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত বোরের কোয়ান্টাম মতবাদের সুদৃঢ় ভিত্তি দেন এবং পরে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রোডিঙ্গার এই সব তত্ত্বের উপর তাঁর বিখ্যাত সমীকরণের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমীকরণ কোয়ান্টাম

বলবিদ্যার এক মৌলিক পদক্ষেপ সন্দেহ নেই।

বস্তু-কণার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য তার ভরবেগের বিপরীত অনুপাতী। তাই ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের জন্যে অত্যন্ত গতিশীল কণার প্রয়োজন এবং ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ ক্ষুদ্র স্থানে প্রবেশ করানো সম্ভব। তাই অধুনা অতি বেগবান বস্তু-কণা সৃষ্টির জন্যে নবতম যন্ত্র তৈরী হচ্ছে। নিম্নের তালিকায় কণার গতিবেগ ও তজ্জনিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটি সাধারণ হিসাব দেওয়া হলো।

ক　　খ
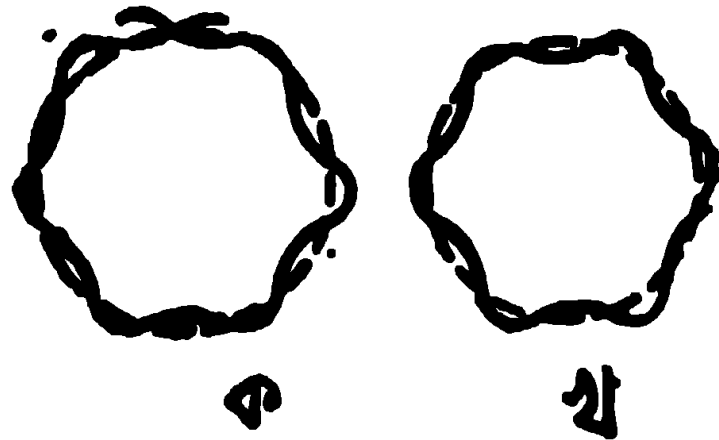
৪নং চিত্র। (ক) পূর্ণ সংখ্যক তরঙ্গ-সংখ্যা না থাকলে কক্ষে সমতানতা থাকে না। (খ) পূর্ণ সংখ্যক তরঙ্গ-সংখ্যার সমতানতা দেখানো হয়েছে।

দৈর্ঘ্য	ভরবেগ × আলোকের গতিবেগ	
$১০^{-৮}$ সেন্টিমিটার	·০০২ মিলিয়ন ভোল্ট	(~পরমাণুর ইলেক্ট্রন সীমাবদ্ধ)
$১০^{-১২}$,,	২০ মিলিয়ন ভোল্ট	(~পরমাণুর কেন্দ্রীন জনিত)
$১০^{-১৪}$,,	২০০০ ,,	(~বর্তমানে প্রাপ্ত)
$১০^{-১৬}$,,	২০০০০০ ,,	(ভবিষ্যৎ ?)

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আবিষ্কার হওয়ায় পরমাণু ও অণুবিজ্ঞানের বহু সমস্যারই সহজে সমাধান হলো, কিন্তু পরমাণু-কেন্দ্রের তত্ত্ব তবু অনেকটা অজানা থেকে গেল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে যেমন পরমাণু-বিজ্ঞানের (Atomic Physics) গোড়াপত্তন হলো, তেমনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পরমাণু-কেন্দ্রীন বিজ্ঞানের (Nuclear Physics) যাত্রা সুরু হয়। এই যুগে যে নতুন মৌলিক কণার আবিষ্কার হলো তার নাম নিউট্রন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে কুরী-জোলিও এবং জোলিওআবিষ্কার করেন যে, পোলোনিয়াম থেকে নিঃসৃত আল্‌ফা-কণা বেরিলিয়ামের সঙ্গে সংঘাতে এক রকম বিদ্যুৎহীন অতি ভেদকারী শক্তিসম্পন্ন কণিকার জন্ম দেয়। এই কণিকা হাইড্রোজেন সমন্বিত বস্তু থেকে সংঘাতের দ্বারা প্রোটন সৃষ্টি করে। তখন এই কণিকাকে ফোটন মনে করা স্বাভাবিক ছিল। ফোটন ভরহীন বলে প্রোটন সৃষ্টিতে এর তেজ অন্ততঃ ৫০ মিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্ট হওয়া উচিত। এই সময় কেম্ব্রিজে স্যাড্‌উইক প্রমাণ করেন যে, এই কণা ফোটন নয়—প্রোটনের প্রায় সমান ভর-বিশিষ্ট এক নতুন বস্তু-কণা। পূর্বেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড এই রকম একটি কণা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন এবং তার নাম দিয়েছিলেন নিউট্রন। তার পর এতদিন এই কণার অস্তিত্বের ব্যর্থ অনুসন্ধান হয়েছিল। স্যাড্‌উইক পরীক্ষার দ্বারা এই কণার আবিষ্কার করে পদার্থ-বিজ্ঞানে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করলেন।

পরমাণু কেন্দ্রীনের উপাদান সম্পর্কে পুরাতন মতবাদের বদলে নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো। প্রোটনের সঙ্গে নিউট্রনও যে কেন্দ্রীনের অন্যতম

উপাদান, সে সম্পর্কে সন্দেহ রইলো না। আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষায় জানা গেল যে, নিউট্রনের ভর প্রোটন থেকে কিছু বেশী। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিটা বিকিরণের কথা জানা গিয়েছিল। কোনও পরমাণু-কেন্দ্রীন থেকে তেজস্ক্রিয়ার ফলে যখন ইলেকট্রন বা বীটা-কণা নির্গত হয়, তখন তেজ ও ঘূর্ণন-সংখ্যার নিত্যতা বজায় রাখতে তার সঙ্গে নিউট্রিনো (ν) নামে প্রায় ভরহীন ও বিদ্যুৎহীন

১৯৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে অ্যাণ্ডারসন পজিট্রন নামক একটি কণিকার আবিষ্কার করেন। উইলসন আবিষ্কৃত মেঘকক্ষ নামক যন্ত্রে এই কণিকাটি ধরা পড়ে। চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে দেখা গেল যে, এর ভর ইলেকট্রনের সমান ও ভরণ ইলেকট্রনের বিপরীত। ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে ডিরাকের মতবাদে এরূপ একটি কণিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল।

ভর

১৯৩৩

n p — ১000 মিঃ ইঃ ভোঃ

e^- e^+ — ১ মিঃ ইঃ ভোঃ

ν $\bar{\nu}$ γ — 0 মিঃ ইঃ ভোঃ

ভরণ	0	১	-১	0	১	0
ঘূর্ণন সংখ্যা	½		½			১

৫নং চিত্র। ১৯৩৩ সালে আবিষ্কৃত মৌলিক কণা; ভর, ভরণ ও ঘূর্ণন-সংখ্যার পরিচয়। n-এর কুঞ্চিত রেখা কণিকাটিকে অস্থায়ী (unstable) সূচনা করে।

এক রকম বস্তু-কণার নির্গমন হয়। এখন দেখা গেল যে, নিউট্রন প্রোটনের মত স্থায়ী কণা নয়। একটি নিউট্রন বীটা তেজস্ক্রিয়ার মত প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রিনোতে ভেঙে পড়ে।

এই মতবাদে প্রত্যেক কণিকার একটি বিপরীত কণিকার অস্তিত্ব আছে। পজিট্রন হলো ইলেকট্রনের বিপরীত কণা। নিউট্রিনো ও (ν) অ্যান্টি-নিউট্রিনো ($\bar{\nu}$) পরস্পর বিপরীত কণা। নিউট্রনের

বিভাজনে আমরা বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী অ্যান্টিনিউট্রিনো পাই

$$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}$$

ফোটনের (γ) বিপরীত কণা ফোটন। ৫নং চিত্রে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের মৌলিক কণা সম্পর্কে আমাদের ধারণা পাওয়া যাবে। চিত্রের নিম্নে ভরণ ও কণার ঘূর্ণন-সংখ্যা $h/2\pi$ এককে দেখানো হয়েছে। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মতে, ঘূর্ণন-সংখ্যা $\frac{1}{2}$ বা তার গুণিতক হবে—পরীক্ষায় সে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সব মৌলিক কণার আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক অধ্যায় মাত্র। বিভিন্ন প্রকারের মেসন, বিপরীত কণা ইত্যাদির আবিষ্কার পরবর্তী কালে এক নবতর যুগের সৃষ্টি করেছে। বারান্তরে সে প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

ডি. এন. এ.

শ্রীপিনাকী ভট্টাচার্য

বংশধারা বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করবার জন্যেই ‘জীন’-এর কল্পনা করা হয়। বলা হতো যে, জীনই বংশগত বৈশিষ্ট্য এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত করে। কিন্তু এই জীন যে ঠিক কি—সে সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না, জীন যে রাসায়নিক পদার্থ, সে সম্বন্ধে প্রথম সন্দেহ জাগে ভাইরাসের জীবন আলোচনা করে। ভাইরাসগুলি এক একটি শুধুমাত্র একটি নিউক্লিওপ্রোটিন অণু, অথচ এদের মধ্যে জীবনের সমস্ত লক্ষণই বর্তমান। এদের মধ্যেও বংশগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। সুতরাং ধরেই নিতে হয় যে, জীন নিশ্চয়ই রাসায়নিক পদার্থ, হয় নিউক্লিওপ্রোটিন নিজেই অথবা এর কোন উপাদান—নিউক্লিক অ্যাসিড বা প্রোটিন।

ইসারিচিয়া কোলাই নামক ব্যাক্টিরিয়া বা জীবাণুর দেহস্থিত ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তারা প্রধানতঃ নিউক্লিওপ্রোটিন দিয়েই তৈরী। এই নিউক্লিওপ্রোটিনের প্রায় ৪০ শতাংশ ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি এন. এ (DNA)। পরীক্ষার ফলে হার্সে ও চেজ দেখেছেন যে, সংক্রমণের সময় ভাইরাসগুলির শুধুমাত্র ডি. এন. এ-ই ব্যাক্টিরিয়ার দেহে প্রবেশ করে এবং সেখানে নতুন ভাইরাস সৃষ্টি করে। সুতরাং এদের ক্ষেত্রে বংশগত ধারার বাহক বা জীন যে ডি. এন. এ,, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রেও যে এই সিদ্ধান্ত সত্য, তা নানাভাবে দেখানো যেতে পারে। অবশ্য ডি. এন. এ-ই যে বংশগত বৈশিষ্ট্যের একমাত্র বাহক বা অন্যতম বাহক, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

বিভিন্ন জীবের কোসগুলির রাসায়নিক গঠন তুলনা করলে দেখা যাবে যে, এদের উপাদানগুলির মধ্যে একমাত্র ডি. এন. এ-র পরিমাণই যে কোন জীবের দৈহিক সব কোসেই এক, শুধু যৌনকোষে ডি. এন. এ-র পরিমাণ এই পরিমাণের অর্ধেক। অন্য কোন উপাদান, যথা—রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন, প্রোটামিন, হিস্টোন, লিপিড ইত্যাদি কারোর ক্ষেত্রেই একথা সত্য নয়। অথচ জীন সম্বন্ধে আমাদের যা ধারণা, তাতে এটাই আমরা আশা করি।

দ্বিতীয়তঃ প্রমাণ হিসেবে হাওয়ার্ড ও পেকের পরীক্ষাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁরা তেজস্ক্রিয় অর্থো-ফস্ফেটের সংস্পর্শে রেখে বিলাতী মোটা যব ভিসিয়া ফেবার মূল রোপণ করেন। তারপর ক্রমবর্ধমান মূলটির বিভিন্ন অবস্থায় একে ফালি ফালি করে কেটে

কোষগুলির অবস্থা দেখতে লাগলেন এবং তার সঙ্গে কোষগুলির বিভিন্ন অবস্থায় তাদের কেন্দ্রের তেজস্ক্রিয়তা মেপে দেখলেন। দেখা গেল যে, কোষের স্থিতিশীল অবস্থাতেই, অর্থাৎ কোষটি যখন বিভাজিত হচ্ছে না, তখনই ডি. এন. এ. সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু বিভাজনের সময় তা হচ্ছে না। আবার মূলাগ্রের স্বতঃতেজস্ক্রিয় চিত্র (Autoradiograph) নিয়ে দেখা গেল যে, কোষের তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা চিহ্নিত ডি এন. এ-গুলি বিভাজনের ফলে সৃষ্ট কোষগুলিতে কোন রকমের বিকৃতি বা পুনঃ সংযোজন ব্যতিরেকেই পাচার হয়ে যাচ্ছে। এখন জীন সম্বন্ধে আমাদের ধারণানুযায়ী জানা আছে যে, এগুলি কোষ-বিভাজনের সময় অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ এদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থেকে যায়। আবার একটি কোষ বিভাজিত হয়ে যখন দুটি কোষে পরিণত হয়, তখন দুটিতেই একটি করে জীন থাকবার কথা। এই বাড়তি জীনটি নিশ্চয়ই বিভাজনের আগে সৃষ্ট। সুতরাং হাওয়ার্ড ও পেকের পরীক্ষার দ্বারা জীন ও ডি. এন. এ-র সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হলো বলা যায়।

যেহেতু জীনের প্রকৃতির উপরেই জীবের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে, সেহেতু জীনের কোন রকম পরিবর্তন ঘটলেই জীবের বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন ঘটবে। অপর পক্ষে, জীবের বৈশিষ্ট্যের কোন রকম পরিবর্তন ঘটলেই বুঝতে হবে, জীনের নিশ্চয়ই কোন পরিবর্তন হয়েছে। জীবের এই বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনকে বলে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি। সুতরাং মিউটেশনের ফলে কোন পরিবর্তন হলো, বা কোন পদার্থের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তনের ফলে মিউটেশন হলো, সেটা নির্ধারণ করতে পারলেই জীনের রাসায়নিক প্রকৃতি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। জীব-কোষকে কিছুক্ষণ অতিবেগুনী রশ্মির সংস্পর্শে রাখলে তার মিউটেশন হতে দেখা গেছে। আবার এও দেখা গেছে যে, অন্যান্য প্রোটিন অপেক্ষা ডি. এন. এ-ই প্রথমে এই আলো শোষণ করে, আর তার ফলে নিশ্চয়ই তার গঠনের পরিবর্তন হয়। আবার দেখা গেছে যে, কোষের অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা ডি এন. এ-রই মাষ্টার্ড গ্যাসের প্রতি আকর্ষণ বেশী। সুতরাং জীব-কোষকে মাষ্টার্ড গ্যাসের সংস্পর্শে রাখলে ডি. এন. এ-ই প্রথমে বিক্রিয়া করে পরিবর্তিত হবে। কাজেই বলা যায়, মাষ্টার্ডগ্যাসের সংস্পর্শে রাখলে জীবের যে মিউটেশন হয়, তাও ডি এন. এ-র গঠনের পরিবর্তনের ফলে। অনুরূপ ভাবে ৫-ব্রোমো ইউরাসিল যদি কোষের মারফৎ ডি. এন. এ-র গঠনের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলেও মিউটেশন হয়। অবশ্য এই প্রমাণগুলি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয়।

নিউমোনিয়ার জীবাণুর মধ্যে দুটি শ্রেণী আছে। এক শ্রেণীর চতুর্দিকে স্টার্চ জাতীয় পদার্থের একটা আবরণ থাকে। আর অপরটির কোন আবরণ নেই। গ্রিফিথ দেখলেন যে, যদি ইঁদুরকে এই জীবাণুর মধ্যে কিছু জীবিত আবরণহীন জীবাণু ও তার সঙ্গে অল্প কয়েকটি আবরণযুক্ত মৃত জীবাণু খাওয়ানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, ইঁদুরের পাকস্থলী থেকে কয়েকটি জীবিত ও আবরণযুক্ত জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি তারপর পরবর্তী সব পুরুষেই আবরণযুক্ত জীবাণুর জন্ম দেয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, আবরণহীন জীবাণুগুলির এই ভাবে আবরণযুক্ত হবার পিছনে ইঁদুরের কোন হাত আছে কি না। যদি ধরা যায় যে, মৃত জীবাণুগুলি থেকে তাদের আবরণের জন্যে দায়ী জীনটিই আবরণহীন জীবাণুতে সঞ্চারিত হয়ে তাদের আবরণ তৈরীর ক্ষমতা যোগাচ্ছে, আর তাই একবার এই ক্ষমতা পাওয়ায় পরবর্তী সমস্ত পুরুষেই এই ক্ষমতা সঞ্চারিত হচ্ছে, তাহলে স্বভাবতঃই এতে ইঁদুরের কোন হাত থাকবার কথা নয়। বাস্তবিকই তাই দেখা গেল। ডসন ও সায়া দেখালেন যে, ইঁদুর বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পরীক্ষা নলেও এই জীবাণুগুলিকে নিয়ে একই পরীক্ষা করা যায় এবং তাতে একই ফল পাওয়া যায়। পরে আরও ভাল করে

করে দেখা গেল যে, মৃত জীবাণুগুলি না হলেও চলে, যদি তাদের বদলে সেগুলিকে চাপ দিয়ে একটু রস বের করে নেওয়া হয়। আবার এই রস থেকে এর সংগঠনকারী বিভিন্ন পদার্থগুলিকে পৃথক করে দেখা গেল যে, যে পদার্থটি আসলে এই আবরণহীন জীবাণুগুলিকে আবরণ তৈরীর ক্ষমতা যোগায় সেটি প্রকৃতপক্ষে ডি. এন. এ-ই। এ-রকম আরও অনেক জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করে এই একই ফল পাওয়া গেল।

সাধারণতঃ পেনিসিলিনের সংস্পর্শে রাখলে রোগ-জীবাণুগুলি মারা যায়। কিন্তু অনেক রোগ-জীবাণুকে পেনিসিলিনের সংস্পর্শে রাখলে দেখা যাবে যে, এদের মধ্যে অধিকাংশই মারা পড়েছে বটে, কিন্তু অল্প কয়েকটি টিকে গেছে। তারপর এই টিকে-থাকা জীবাণুগুলি বা এদের উত্তর পুরুষের কোন জীবাণুর উপর পেনিসিলিনের কোন প্রভাব থাকে না। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, এদের কোষের মধ্যে পেনিসিলিনের বিষক্রিয়া নষ্ট করবার জন্যে একটি বিশেষ জীনের সৃষ্টি হয়েছে। এটি অবশ্য পূর্বের কোন জীনের হঠাৎ পরিবর্তনের জন্যে সৃষ্ট হয়েছে। যাহোক, এই যদি সত্য হয়, তবে এই জীবাণু থেকে বিশুদ্ধ ডি. এন. এ তৈরী করে অপর জীবাণুর কোষে সঞ্চারিত করলে তারাও এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে। ১৯৫১ সালে হচ্‌কিস পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

এই পরীক্ষাগুলি থেকে ডি. এন. এ-ই যে জীন, সেটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। অবশ্য এর সত্যতা আরও উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখানো খুবই মুস্কিল। সম্প্রতি জে. বেনয়েট, পি. লিরয় এবং সি ও. আর ভেণ্ডারলি দেখিয়েছেন যে, এক শ্রেণীর খাকী হাঁস থেকে ডি. এন. এ. তৈরী করে যদি আর এক শ্রেণীর পিকিন জাতীয় হাঁসের দেহে সঞ্চারিত করা যায়, তবে আট দিনের পর থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর হাঁসের দেহে একটা বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ খাকী হাঁস খুব বড় আকারের হয় এবং তাদের ঠোঁট হয় হলদে রঙের। অপর দিকে, পিকিন হাঁসগুলি আকারে ছোট আর তাদের ঠোঁটগুলি সবুজ ও কালো রঙে মিশ্রিত। উপরিউক্ত ভাবে পরিবর্তিত হবার পর দেখা গেল যে, তাদের ঠোঁটে হলদে বা গোলাপী রঙের উপর ঘন কালো কালো দাগ সৃষ্টি হয়েছে।

মোটামুটিভাবে ডি. এন. এ-ই যে জীন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকবার কথা নয়। সুতরাং ডি. এন. এ-র রাসায়নিক গঠনের কথা স্বভাবতঃই মনে হবে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ডি. এন. এ প্রোটিন নয়—ডিঅক্সি-রাইবোজ—এই চিনি জাতীয় পদার্থের ফস্‌ফেট লবণ। তবে একটি অণুতে এ-রকম অনেকগুলি ডিঅক্সিরাইবোজ ও ফস্‌ফেট একটি দীর্ঘ শিকলের আকারে পর পর সাজানো আছে। তাছাড়া প্রত্যেক ডিঅক্সিরাইবোজের সঙ্গে একটি করে জৈব ক্ষার যুক্ত আছে। এই ক্ষারগুলির মধ্যে সাধারণতঃ এই চারটিই প্রধান—দুটি পিউরিন জাতীয় অ্যাডেনিন ও গুয়ানিন এবং অপর দুটি পাইরিমিডিন জাতীয় থাইমিন ও সাইটোসিন। এদের মধ্যে দেখা গেছে, অ্যাডেনিন ঠিক যে পরিমাণে থাকে, থাইমিনও ঠিক সেই পরিমাণে থাকে। গুয়ানিন ও সাইটোসিনের পরিমাণও সব সময় এক থাকে।

ওয়াট্‌সন ও ক্রিকের পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, ডি. এন. এ. অণু একটি মাত্র সুতা দিয়ে তৈরী নয়, যাতে সুগার ও ফস্‌ফেটগুলি পরস্পর বাঁধা রয়েছে। পরন্তু এ-রকম দুটি সুতা দিয়ে তৈরী। এই সুতা দুটি পরস্পর জড়িয়ে আছে দুটি ক্ষারের মধ্যে হাইড্রোজেন বণ্ডের সাহায্যে। একটি সুতার থাইমিনের সঙ্গে অপর সুতাটির অ্যাডেনিন সর্বদাই হাইড্রোজেন বণ্ড দ্বারা যুক্ত।

তাই তাদের পরিমাণ সব সময় এক, অনুরূপভাবে গুয়ানিন ও সাইটোসিনও হাইড্রোজেন বণ্ডের দ্বারা যুক্ত।

প্রশ্ন উঠতে পারে—ডি. এন. এ-র গঠন যদি সব সময় একই রকম হয়, তবে বিভিন্ন ডি. এন. এ-র গুণাবলী বিভিন্ন হয় কিরূপে সেটা স্বভাবতঃই নির্ভর করবে চারটি ক্ষারের সজ্জাক্রম অনুসারে। একটিতে যে ক্রমে ক্ষারগুলি সজ্জিত আছে এবং সেই ক্রম অনুসারে তার গুণাবলী যা হবে, অপরটিতে ক্ষারগুলির সজ্জাক্রম তাথেকে ভিন্ন হবে এবং এর ফলে তার গুণাবলীও ভিন্ন হবে। ডি. এন. এ. জীবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে দায়ী। কিন্তু জীবের যে কোন বৈশিষ্ট্য কোন না কোন রাসায়নিক পদার্থ অথবা কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, যার জন্যে আসলে দায়ী কোন একটি জৈব অনুঘটক বা এনজাইম। একটি বিশেষ এনজাইম খাদ্যকণা থেকে একটি বিশেষ পদার্থ বা অনুরূপ একাধিক পদার্থের সৃষ্টি করে। এনজাইমগুলি সবাই প্রোটিন। সুতরাং এটা বোঝা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন ডি. এন. এ. অণু তাদের গঠন অনুসারে বিভিন্ন প্রোটিন অণু সৃষ্টি করে; কিন্তু ডি. এন. এ-র গঠন বলতে বোঝায় শুধুমাত্র চারটি ক্ষারের বিভিন্ন সজ্জাক্রম। তেমনি প্রোটিনগুলি সবাই শুধুমাত্র কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী এবং এই অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির ক্রম অনুসারে প্রোটিন অণুর গুণাবলী বিভিন্ন হয়। কাজেই প্রশ্ন জাগে, কি করে শুধুমাত্র ৪টি ক্ষারের ক্রমিক সজ্জা থেকে কুড়িটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হতে পারে? প্রশ্নটা আপাত-বিভ্রান্তিকর মনে হলেও এর একটা সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া যেতে পারে।

ক্ষার চারটির সজ্জাক্রমের উপরেই যে অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি নির্ভর করবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই যদি ধরা যায় যে, চারটির মধ্যে যে কোন দুটির একটি বিশেষ ক্রমের উপর নির্ভর করবে একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি, অর্থাৎ একটি বিশেষ ক্ষারের পর আরেকটি বিশেষ ক্ষার থাকলে সব সময়েই তার ফলে একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হবে, তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৬টি; কারণ, ৪টি জিনিসের মধ্য থেকে দুটি করে নিয়ে সাজাতে গেলে তা মাত্র ১৬ ভাবেই করা যায়। এথেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, যে কোন তিনটি ক্ষারের একটি বিশেষ ক্রমের ফলে সৃষ্টি হয় একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড। কিন্তু ৪টি জিনিস থেকে যে কোন তিনটি নিয়ে মোট ৪ × ৪ × ৪ = ৬৪ ভাবে সাজানো যেতে পারে। সুতরাং এই ৬৪ রকম সজ্জা থেকে ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টির ব্যাখ্যা পেতে হলে স্বভাবতঃই আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কিছু কিছু সজ্জা থেকে কোন অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হবে না। ধরা যাক, ক্ষার চারটি যথাক্রমে A, B, C ও D এবং একটি বিশেষ ডি. এন. এ-অণুতে এদের ক্রম নিম্নরূপ:

···BCA, CDD, ABA, BDC···

এবং BCA, CDD, ABA ও BDC এই বিভিন্ন ক্রমের জন্যে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হবে। কিন্তু ডি. এন এ একটি বিরাট অণু। কাজেই খাদ্য কণাগুলি যখন প্রোটিন সৃষ্টির সময় এই ক্ষারগুলির ক্রম দেখে নিজেদের সাজিয়ে প্রোটিন অণুর সৃষ্টি করে, তখন তাদের পক্ষে এই বিরাট অণুর আদি ও অন্ত নির্ণয় করা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং এই একই ক্রম তাদের কাছে—

···B, CAC, DDA, BAB. DC···

অথবা

···BC, ACD, DAB, ABD, C···

এরূপে প্রতিভাত হতে পারে। যেহেতু একটি মাত্র বিশেষ ডি এন. এ. অণু থেকে তিনটি বিভিন্ন প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হতে পারে না, সেহেতু এই তিনটি সজ্জা থেকে নিশ্চয়ই একটি মাত্র প্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ যে কোন দুটি সজ্জা থেকে

কোন প্রোটিন অণু সৃষ্টি হয় না। এখন এই তিনটি ক্রমিক সজ্জার মধ্যে পার্থক্য এই যে, কমাগুলি তুলে দিয়ে একটিকে অপরটির উপর চাপিয়ে দিলে তারা পরস্পর মিলে যাবে। সুতরাং তিনটি ক্ষারের ক্রমগুলির মধ্যে যেগুলিকে পাশাপাশি লিখলে তারা অপরগুলির সঙ্গে মিলে যাবে, তাদের মধ্যে যে কোন একটি থেকে কোন একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড হতে পারে, অন্যগুলি থেকে নয়। যেমন— A,B ও C এই তিনটি ক্ষারের তিনটি ক্রম A B C, BCA ও CAB-এর মধ্যে যে কোন একটি (ABC) থেকে একটি বিশেষ অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হবে। অপর দুটি BCA ও CAB থেকে কোন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হবে না। কারণ ABC-এর ক্রম BCA বা CAB-এর ক্রম বলে প্রতিভাত হতে পারে।

…ABC, ABC, ABC,…

বা…A, BCA, BCA. BC…

বা…AB, CAB, CAB, C…

এখন সহজেই ৪টি ক্ষারের ক্রমের সাহায্যে ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের সজ্জা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কারণ, এই ৬৪টি উপায়ের সজ্জার মধ্যে ৪টিতে শুধু একটি মাত্র ক্ষার থাকবে। সুতরাং এদের ক্রম হবে…AAAAAA…এর মত। এই ভাবের ক্রম থেকে স্বভাবতঃই আমরা কোন অ্যাসিড আশা করি না। কারণ, যদি ধরা যায় ১, ২ ও ৩ নং A দিয়ে, অর্থাৎ AAA এই ক্রম থেকে একটি অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হবে, তাহলে ২, ৩ ও ৪ নং A দিয়ে অর্থাৎ AAA এই ক্রম থেকে কোন অ্যাসিড পাওয়ার কথা নয়। কাজেই এই সজ্জা থেকে কোন অ্যাসিড পাওয়া যাবে না। সুতরাং বাকী থাকে ৬০টি সজ্জা। এগুলিকে আবার ২০টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগে থাকবে তিনটি ক্রম, যা থেকে একটি মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড হতে পারে। যেমন ABC, BCA ও CAB—এই তিনটি ক্রম থেকে একটি মাত্র অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে। অতএব ২০টি ভাগের জন্যে প্রতি ভাগ থেকে ১টি করে মোট ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টি হবে।

এভাবেই ডি. এন.এ-র গঠনের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রোটিনের সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে ডি. এন. এ জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ঘরোয়া জীবনে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

'ঘরে বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর' গ্রন্থে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের ঘরোয়া জীবন সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলেছি। এই সব খুঁটিনাটি ঘটনার মধ্য দিয়েও সেই জ্ঞানতপস্বী মহাজীবনের একটা বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। আমার বাল্যকালে প্রায় দশ বছর আমি তাঁর তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করেছি। তিনি সম্পর্কে আমার দাদা মশায়—আমি তাঁকে নানা বলে ডাকতাম।

মুর্শিদাবাদ জেলার ফতেসিং পরগণার অন্তর্গত জেমো গ্রামে ১২৭১ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির শুভলগ্নে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের জন্ম। পিতা গোবিন্দসুন্দর, মাতা চন্দ্রকামিনী দেবী। পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ত্রিবেদী পূর্বেই দেহরক্ষা করেছিলেন। তাঁর অগ্রজ ব্রজসুন্দর নবজাত পৌত্রের নামাকরণ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর। সুতিকাগৃহে নবজাতকের মুখদর্শন করে ব্রজসুন্দর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—এই শিশু উত্তর কালে প্রতিভাবলে, বিদ্যাবত্তায় ও চরিত্রগুণে প্রচুর খ্যাতি লাভ করবে। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল।

যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ হলো। প্রতিভাধর শিশু বিদ্যালয়ে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে সবাইকে চমৎকৃত করে তুললেন। পারিবারিক প্রথানুযায়ী অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই তাঁর বিয়ে হয়। তের-চৌদ্দ বছর বয়সে জেমো রাজবাড়ীর মেয়ে ইন্দুপ্রভা দেবীকে তিনি জীবনসঙ্গিনী করে ঘরে নিয়ে এলেন।

অনেকের ধারণা, অল্পবয়সে বিয়ে করলে লেখাপড়া হয় না। এটা যে কতখানি ভুল—রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনই তার প্রমাণ। বস্তুতঃ বিয়ের পরেই তিনি শিক্ষার বিস্তৃত পরিধির মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক—রিপন কলেজের অধ্যক্ষরূপে তিনি চিরস্মরণীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিসৎকে তিনিই গড়ে তুলেছেন। একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই বিরাট পুরুষ। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অপরিমেয় দান। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রামেন্দ্রসুন্দর সম্বন্ধে বলেছিলেন, "দর্শনের গঙ্গা, বিজ্ঞানের সরস্বতী ও সাহিত্যের যমুনা—মানবচিন্তার এই ত্রি-ধারা রামেন্দ্র-সঙ্গমে যুক্ত বেণীতে পরিণত হইয়াছিল।"

রামেন্দ্রসুন্দরের এই কর্মময় জীবনে তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী ছিলেন ইন্দুপ্রভা দেবী। বাগ্দেবীর চরণে স্বামীর আত্মসমাহিত ভাবের প্রেরণা তিনি যুগিয়ে গিয়েছেন—কোনও দিন কোনও কারণে কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন নি। তিনি শুধু সহধর্মিণী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সহমর্মিণী। তাই তাঁর উপর সাংসারিক সমস্ত কর্তব্যের ভার দিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর নিশ্চিন্তচিত্তে নিজের সাধনায় ডুবে থাকতেন মাঝে মাঝে যদি কখনও কোন সাময়িক বিরূপ ঘটনার সৃষ্টি হতো, ইন্দুপ্রভা দেবী স্বয়ং এগিয়ে এসে সমস্যা পূরণের চেষ্টা করতেন।

একদিন। রামেন্দ্রসুন্দরের গালে একটা ব্রণ হওয়ায় আট দশ দিন দাড়ি কামানো হয় নি। এদিকে এক ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ ভারতবর্ষে এসেছেন—তিনি খবর পাঠিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে সেদিনই দেখা করতে আসবেন।

অসময়ে নাপিত পাওয়া গেল না। তখন এগিয়ে এলেন ইন্দুপ্রভা দেবী। তিনিই নানার

দাড়ি কামিয়ে দেবেন। দস্তুরমত সাবান মাখিয়ে ক্ষুর হাতে নিয়ে ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীর একদিকের দাড়ি নির্মূল করে দিলেন বটে, কিন্তু আর একদিকের গালে ক্ষুর চালাতে গিয়েই সেটা একটুখানি বসে গেল—ফলে প্রচুর রক্তপাত। নানী তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে টিংচার আইডিন, তুলা ইত্যাদি এনে নানার সেই জগৎসিংহ-ওসমান্-মার্কা মুখে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন, আর গালপাট্টা বেঁধেই নানা সেই সাহেবের সঙ্গে গভীর তত্ত্বকথায় প্রবিষ্ট হলেন।

ইং ১৯১১ সাল—যেবার সম্রাট পঞ্চম জর্জ কলকাতায় আসেন—রামেন্দ্রসুন্দর সেই বছর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। টাকীর যতীন মুন্সী সাহিত্য পরিষদের কাজে প্রায়ই তাঁর কাছে আসা-যাওয়া

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

করতেন। তাঁর বিশেষ অনুরোধ—যদি রামেন্দ্রসুন্দর গঙ্গাবক্ষে কিছুদিন ভ্রমণ করেন, তাহলে তাঁর শরীরের যথেষ্ট উন্নতি হবে। তাঁকে রাজী করিয়ে তিনি নিজস্ব বজরাখানি কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর, ইন্দুপ্রভা দেবী, জ্যেষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা দেবী ও আমরা দু-তিনটি শান্তশিষ্ট ছেলেমেয়ে বজরায় চেপে বসলাম। ইন্দুপ্রভা দেবী অসুস্থ স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় প্রাণমন ঢেলে দিলেন। নবদ্বীপ পর্যন্ত যাওয়া হবে, আবার সেখান থেকেই সোজা কলকাতায়।

ইন্দুপ্রভা দেবীর বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, তিনি স্বামীর সঙ্গে জোড়ে গঙ্গাস্নান করবেন—আজ সেই সুযোগ উপস্থিত—তিনি মহাখুসী। গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণকালে একদিন ইন্দুপ্রভা দেবী রামেন্দ্রসুন্দরের সামনেই তাঁর বিবাহিত জীবনের কথা বলতে সুরু করে দিলেন।

"বুঝলি খোকা, তোর নানার যখন তেরো—আমার তখন আট বছর বয়েস। আমার বাবা এই ভোলা মহেশ্বরকে গৌরীদান করেছিলেন। বরকে দেখে ঘোমটা দিতাম না—তোর নানার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে আমার খুব মজা লাগত। খেলার ফাঁকেই তোর নানা পালিয়ে গিয়ে বই নিয়ে বসত। তখন থেকেই রাতদিন কেবল বই আর বই।" তারপর একটু মুচ্‌কি হেসে বললেন, "ওই সরস্বতীই আমার সতীন।"

নবদ্বীপের ঘাটে বজরা নোঙ্গর করতেই ইন্দুপ্রভা দেবী রামেন্দ্রসুন্দরকে সঙ্গে নিয়ে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে যাওয়ার বায়না ধরলেন। অসুস্থ শরীরে তাঁর যাওয়া হলো না, কিন্তু তিনি কথা দিলেন কলকাতায় পৌঁছে তিনি একদিন ইন্দুপ্রভা দেবীকে দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে যাবেন।

সোনার গৌরাঙ্গ দর্শন করে আমরা ফিরে এসে দেখি নানা আপন মনে একটানা লিখে যাচ্ছেন—নিজের মনেই হাসছেন—আপন মনেই কথা বলছেন—বাইরের সব কিছু থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন—সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ।

মাথায় নির্মাল্য ছুঁইয়ে ইন্দুপ্রভা দেবী নানাকে বললেন

—দু'হাত তুলে মাথায় ঠেকাও।

রামেন্দ্রসুন্দর ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। কথাটি নানার কর্ণগত হয়েছে কি না, মুখ দেখে বোঝা গেল না।

ইন্দুপ্রভা দেবী আবার তাড়া দিলেন—

—কৈ, প্রণাম কর।

আমি কাছেই ছিলাম—চট্‌ করে একটা মন্তব্য করে বসি—

—কাকে প্রণাম? তোমাকে?

হঠাৎ আমার কথাটা কানে ঢুকতেই রামেন্দ্রসুন্দর শিশুর মত খল্‌খল্‌ করে হেসে উঠলেন।

নানী বললেন—নাও, এবার হাঁ কর—

এক টুক্‌রা প্রসাদী সন্দেশ নানার মুখে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু তিনি যে ভাবে ইন্দুপ্রভা দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন—মনে হলো তার মধ্যে কোন অর্থ ছিল না। উদাসী রামেন্দ্রসুন্দরের মন হয়তো এরই মধ্যে অন্য কোনও ভাবরাজ্যে উড়ে গিয়েছে।

গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করবার সময় একদিন কৌশলে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে পড়ার ছুটি করে নিয়েছি। ইন্দুপ্রভা দেবী সেটা জানতে পেরেই ফরমাস করলেন—আমার ডাল ক'টা বেছে দে।

আবার নানার কাছে গিয়ে ছুটি বাতিল করবার দরখাস্ত পেশ করি। সব শুনে তিনি বললেন—ওই তো মুস্কিল, তোর নানী আমাকেও রান্না ঘরে ঢোকাতে চায়।

রামেন্দ্রসুন্দরের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে এক সান্ধ্য অনুষ্ঠানে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। চাঁদির ফলকে খোদাই করা সোনার গোলাপ পাতায় সাজানো মকমলের বাক্সে মোড়া অভিনন্দন পত্র দেওয়া

হলো। রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত স্বহস্ত লিখিত অভিনন্দন পাঠ করলেন। একটা সোনার কলম, পেন্সিল একটার একদিকে সোনার ছুরি, অপরদিকে কাগজ কাটা চেয়াড়ি, আর একটা সোনার দোয়াত রামেন্দ্রসুন্দরকে উপহার দেওয়া হলো।

ইন্দুপ্রভা দেবীর কাছে সেই দোয়াত কলম চাইলাম। একটা কিছু লিখে রামেন্দ্রসুন্দরকে দিতে হবে।

স্বামীগর্বে গর্বিতা ইন্দুপ্রভা দেবী সেই দোয়াতে কালি ঢেলে দিয়ে বললেন—সোনার দোয়াত কলমে লেখার উপযুক্ত হও—তাহলেই তোমার নানার আনন্দ—নইলে যা তা আঁচড় কাটলে কি হবে?

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রাণাধিক প্রিয় সাহিত্য পরিষৎ আর যাঁরা পরিষদের অকৃত্রিম বন্ধু ও অক্লান্তকর্মা সেবক, তাঁদেরও তিনি পরমাত্মীয় জ্ঞান করতেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ব্যোমকেশ মুস্তফী যখন মারা যান, তখন তাঁর শোক সভায় রামেন্দ্রসুন্দর এত বিচলিত হয়ে পড়েন যে, সংজ্ঞাহীন হবার উপক্রম। তাঁর মুখের একটি কথাই শুধু বারে বারে প্রতিধ্বনিত হয়—ব্যোমকেশ সাহিত্য পরিষৎ—সাহিত্য পরিষৎ ব্যোমকেশ। তাঁর মনের ক্ষত অনেক দিন শুকোয় নি—কেবল দীর্ঘশ্বাস আর হা-হুতাশ!

ইন্দুপ্রভা দেবী স্বামীর এই অবস্থা দেখে তাঁকে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে একটু অভিমান দেখিয়ে বললেন, আমি মরে গেলেও তোমার এতটা দুঃখ হবে না, জানি।

সাহিত্য পরিষদের বিভিন্ন কাজে রামেন্দ্রসুন্দর সর্বদাই ডুবে থাকতেন। কাজেই সাংসারিক কোনও বিষয়ে মন দেবার সময়ই ছিল না তাঁর। একদিন তাঁর আদরের মেয়ে গিরিজা ধরে বসলেন রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা দেবীর ফটো তোলা হবে। নানা আপত্তি জানিয়েও রেহাই পেলেন না। ইন্দুপ্রভা দেবীও সাজসজ্জা করেছেন—নানাকেও ধপ্‌ধপে কাপড় জামা পরিয়ে দেওয়া হলো। নানা চেয়ারে বসলেন, সে যুগের রীতি অনুযায়ী ইন্দুপ্রভা দেবী নানার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে। ফটোগ্রাফার নানাকে একটু হাসি-হাসি-মুখ করতে বললেন—কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে হাসি আর ফুটতে চায় না। অগত্যা ইন্দুপ্রভা দেবী বললেন—'একবার মনেই কর না—তোমার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ আঁটছ—পরিষদের মাথায় আর একতলা কেমন করে চাপানো যায়।'

সঙ্গে সঙ্গেই অভীষ্টসিদ্ধি—নানার মুখে হাসি উথলে উঠতেই লেন্সের ঢাকনা খুলে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দর প্রায়ই জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। আমিও তাঁর নিয়মিত সহযাত্রী। রবীন্দ্রনাথও রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আসতেন। একদিন তিনি হঠাৎ এসে পড়েছেন। খবর পেয়েই রামেন্দ্রসুন্দর তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন—খালি গা। সেদিকে আকর্ষণ করতেই তিনি কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, আমরা পোসাকী রামেন্দ্রসুন্দরকে দেখতে চাই না—আটপৌরে ত্রিবেদী মশাইকেই আমাদের ভাল লাগে।

আর একদিন রবীন্দ্রনাথ এসেছেন। খবর পেয়ে অন্দরমহল থেকে কিঞ্চিৎ জলযোগের অনুরোধ আসতেই কবিগুরু সহাস্যে উত্তর দিলেন—'রামেন্দ্রশক্তির অনুরোধে আমি তো অসম্মত হতে পারি না।' ইন্দুপ্রভা দেবী স্বহস্তে সরবৎ ও জলখাবারের রেকাব সাজিয়ে মেয়েদের হাতে পাঠিয়ে দিলেন। জলযোগান্তে আর একটি অনুরোধ ইন্দুপ্রভা দেবী রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে বলে পাঠালেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ সবিনয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই আবেদন পেশ করে দিলেন—ওঁরা আপনার একটি গান শুনতে চান, তা কি হয় না?

—কেন হবে না? কি গাইব, আপনি ফরমাস করুন।

এবার রামেন্দ্রসুন্দর বিপাকে পড়ে গেলেন। যিনি সঙ্গীতের কিছুই খবর রাখেন না, তাঁর উপরেই কি না এই ভার! তাঁর মুখে আশঙ্কা ও আত্মপ্রসাদ যুগপৎ খেলা করে যায়।

নানার হয়ে আমিই বলে বসলাম—সেই গানটা—ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ—

রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে প্রশ্ন করেন—

—প্রথম লাইনটা বুঝি ভুলে গিয়েছ?

—উঁহু, ভুলব কেন? ওতে যে নানার নাম আছে—সুন্দর, হৃদিরঞ্জন তুমি—আবার নানীর নামও আছে ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ!

রবীন্দ্রনাথ পুলকিত হাস্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন—আপনার নাতিটির মনে রাখবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব।

সময়মাফিক কাজকর্ম করবার জন্যেই ঘড়ির ব্যবহার। রামেন্দ্রসুন্দরের ঘড়ি কিন্তু দু' ঘণ্টা ফাষ্ট চলতো। একদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এসেছেন তাঁর কাছে। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনার পর মালব্যজীর দৃষ্টি পড়লো দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ির দিকে—তখন সেখানে বারোটা বেজে গিয়েছে। চমকে নিজের পকেট ঘড়িটা বের করে তিনি দেখেন—তখন সবে দশটা। দু' ঘণ্টা এগিয়ে রাখার কারণ জিজ্ঞেস করতেই নানা হেসে বললেন—

লিখতে লিখতে সময়ের খেয়াল থাকে না—তাই ঘড়িটা এগিয়ে না রাখলে আমার কলেজের দেরী হয়ে যায়।

এই নিয়ে একদিন রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তর পেলাম, আমার ঘড়িটা এগিয়ে থাকে—পেছিয়ে থাকে না।

জাতির পুরোভাগে আজীবন যিনি এগিয়ে চলেছেন—আগামী দিনের সুস্পষ্ট সঙ্কেত যাঁর কর্মধারায়, যার লেখনীতে ভবিষ্যতের দ্রুত চলার ছন্দ, সেই রামেন্দ্রসুন্দরের এই জন্ম-শতবার্ষিকীর পুণ্য লগ্নে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের প্রণতি জানাই। তিনি ছিলেন স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি, আজ বাঙালী ও বাংলাকে চিনতে গেলে জানতে হবে, রামেন্দ্রসুন্দরের সাধনালব্ধ সুন্দর জীবনটিকে।

জল ও জীবন

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়

আলো, বাতাস, জল প্রভৃতি যে সকল জিনিষ ভগবানের অযাচিত দান রূপে আমরা প্রচুর পরিমাণে পাইয়া থাকি, তাহাদের মর্যাদা আমরা বুঝিতে পারি না। সেই কারণে জলাভাবক্লিষ্ট মরু অঞ্চল ব্যতীত অন্যত্র জল একটা তুচ্ছ নগণ্য পদার্থ বলিয়াই গণ্য। অন্য পদার্থের তুলনায় তাহার সামাজিক মর্যাদা ও মূল্যমান খুবই কম। কোন দ্রব্যে জল মিশাইলে আমরা চটিয়া যাই, কোন জিনিষ খুব সস্তা হইলে তাহা জলের দামে বিক্রয় হইতেছে বলি, আর সরল ও সহজবোধ্য বিষয়কে একেবারে জলের মত পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়া থাকি। কবিও সেই কারণে সাদা জলের উপর বিদ্রূপ হানিয়াছেন:

"দেবতা কেন হারালো দৈত্যে বল দেখি দাদা?
(কারণ' দেবতা খেতো ঐ লাল পানি আর দৈত্য
খেতো সাদা।"

"কেন নদীর জল ঘোলা আর সাগরের
জলে নুন?
(কারণ) পাছে বেশী জল খেয়ে মানুষগুলো
হয় খুন।"

সাধারণভাবে জলের মর্যাদা যাহাই হউক না কেন, জীবনের সহিত জলের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য। পণ্ডিতগণের মতে, জলেই জীবনের প্রথম উদ্ভব ঘটিয়াছিল এবং জলশূন্য অবস্থায় জীবনের প্রকাশ ও প্রসার ঘটিতেই পারে না। জীবন বলিলেই যেমন জল বুঝায়, জল বলিলেও তেমনিই জীবন বুঝায়। কারণ পৃথিবীর প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই জল দ্বারা আবৃত এবং সেই জলের প্রতিটি বিন্দু জীবন-চঞ্চল। সংখ্যা হিসাবে তুলনা করিলে জলচর প্রাণীর সংখ্যা স্থলচর প্রাণীর বহুগুণ এবং বৈচিত্র্যেও স্থলচর হইতে জলচর প্রাণী বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এইখানেই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক জীব হইতে পৃথিবীর বৃহত্তম জীব শত ফুট লম্বা ও ওজনে ২০০ শত টন তিমি মাছ পাশাপাশি রহিয়াছে। এইখানেই ডায়েটম, রেডিওল্যারিয়া, ফোরামিনিফেরা জাতীয় আণুবীক্ষণিক প্রাণীদের কঠিন আবরণ (Silica বা Carbonate of lime) যুগ যুগ ধরিয়া জমা হইয়া পর্বতশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাই আদি জীব প্রোটোজোয়ার বিহার স্থান। ইহারা এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে। এইরূপে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি প্রোটোজোওন হইতে দশ লক্ষ প্রোটোজোয়া সৃষ্টি হইতে পারে।

জলেই জীবের উদ্ভব এবং সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে জলচর প্রাণীরা স্থলচর প্রাণী অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও জলচর অবস্থায় জীব সকল ক্রমবিকাশের ধাপে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ বা যে সমস্ত গুণ স্থলচর স্তন্যপায়ী জীবের প্রাধান্যের কারণ, সেইগুলি জলচর অবস্থায় বিকশিত হয় না। জীব জল হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া আসিবার পর হইতেই তাহাদের দ্রুত অগ্রগতি হইয়াছে সত্য, কিন্তু জলের প্রয়োজনীয়তা তাহার পক্ষে এখনও অপরিহার্য। জলহীন জীবন কল্পনা করাই যায় না।

আমরা না জানিয়া আমাদের দেহে শতকরা ৭৫ ভাগই জল বহন করিয়া বেড়াইতেছি—এমন কি, আমাদের দেহের কঠিন অস্থিগুলির মধ্যেও শতকরা ২২ ভাগ জল রহিয়াছে। সকলের দেহেরই বারো আনা জল।

জল দেহের শুধু যে বৃহত্তম অংশ দখল করিয়া আছে তাহাই নয়, প্রাণীমাত্রেই জীবিত কালে প্রচুর পরিমাণ জলের নিয়ত আদান-প্রদান করিয়া থাকে। উদ্ভিদেরা পাতার মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণ জল ত্যাগ করে ও শিকড়ের সাহায্যে মাটি হইতে জল গ্রহণ করে। এক একর জমির গম উহাদের জীবনে নাকি প্রায় ১০০০ টন জল ত্যাগ করে। বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর গাছপালার প্রভাব কিরূপ, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়। গাছপালা না থাকিলে বাতাস ক্রমশঃ শুষ্ক অর্থাৎ জলীয় বাষ্পশূন্য হয় এবং সে কারণে উপযুক্ত পরিমাণ শিশির বা বৃষ্টিপাত হয় না। বৃষ্টিপাত না হইলে সে স্থান ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হয়। আমরাও ত্বক, ফুস্‌ফুস ও মলমূত্রের মাধ্যমে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন সের জল ত্যাগ করিয়া থাকি এবং ঐ পরিমাণ জলও পানীয় এবং খাদ্যের মধ্য দিয়া গ্রহণ করা উচিত। খাদ্য না হইলে মানুষ ৭/৮ সপ্তাহ কাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু জল না হইলে এক সপ্তাহের অধিক জীবন রক্ষা করা কঠিন।

জলের সহিত জীবনের এই যে নিগূঢ় সম্পর্ক, তাহার কারণ জলে জীবনধারণোপযোগী এমন কতকগুলি অসাধারণ গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, যাহা অপর কোন পদার্থে নাই। সাধারণ নিয়মে কোনও তরল পদার্থকে যতই ঠাণ্ডা করা যায়, তাহা ততই সঙ্কুচিত হয়, যে পর্যন্ত না তাহা কঠিন রূপ ধারণ করে। কিন্তু জলের বেলায় ইহার আশ্চর্য ব্যতিক্রম দেখা যায়। জল ঠাণ্ডা করিলে তাপমাত্রা

৪° সেঃ পৌঁছান পর্যন্ত ইহা ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইতে থাকে, কিন্তু শৈত্য ৪° সেঃ পৌঁছিলে ইহা আর সঙ্কুচিত না হইয়া কঠিন অবস্থায় না পৌঁছান পর্যন্ত আয়তনে বাড়িতে থাকে। এই কারণে ইহার ঘনত্ব কমিয়া যায় এবং হাল্কা হইয়া জলের উপরের স্তরে আসিয়া যায়। বরফ জলে ভাসে এই কারণে। জলের ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী হয় ৪° সেন্টিগ্রেডে।

জলের এই গুণ প্রকৃতির জীব সংরক্ষণে অতিশয় সহায়ক ও কার্যকরী হইয়া থাকে। কারণ শীতকালে নদী, হ্রদ বা অন্যান্য জলাশয়ের উপরের স্তর ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে যেমন ক্রমশঃ শীতল হইতে থাকে, তেমনই উহা ঘন হইয়া তলদেশে নামিয়া যায় এবং নীচের জল উপরে উঠে। এই ভাবে চলিতে চলিতে সমস্ত জলের তাপমাত্রা যখন ৪° সেঃ হয়, তখন জলের উপরিভাগ অধিকতর ঠাণ্ডা হইলে উহা আর নীচে না নামিয়া উপরেই ভাসিতে থাকে এবং ক্রমশঃ বরফে পরিণত হয়। উপরের এই বরফের স্তর একটা আচ্ছাদনস্বরূপ হইয়া নীচের স্তরের তাপমাত্রা ৪° সেঃ-এর নীচে নামিতে দেয় না এবং উহা সেই কারণে তরল অবস্থায় থাকে বলিয়া মৎস্য বা অন্যান্য জলচর জীব প্রচণ্ড শীতেও নষ্ট হয় না।

অন্যান্য যে সমস্ত গুণের জন্য জল জীব-জগতে অসাধারণ বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি হইল ইহার উচ্চ বৈশিষ্টিক তাপ (Specific heat)। পরিজ্ঞাত প্রায় সকল পদার্থের মধ্যে (হাইড্রোজেন গ্যাস ব্যতীত) ইহার বৈশিষ্টিক তাপ সর্বাপেক্ষা বেশী, অর্থাৎ ইহার তাপমাত্রা ১° সেঃ বৃদ্ধি করিবার জন্য যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হয়, সমপরিমাণ অন্যান্য পদার্থের তুলনায় তাহা অনেক বেশী। অধিকন্তু জল উত্তপ্ত হইলে হাল্কা হইয়া যায় এবং উত্তপ্ত জলরাশি, জল কুপরিবাহী বলিয়া উপরেই ভাসিতে থাকে। জল স্থলভাগ বা ধাতব পদার্থের মত সহজে উত্তপ্ত হইলে প্রচণ্ড গ্রীষ্মে জলচর প্রাণীদের অস্তিত্ব লোপ পাইত। জল যেমন সহজে উত্তপ্ত হয় না, তেমনই আবার উত্তপ্ত হইলে সেই উত্তাপও সহজে ত্যাগ করে না। জলের এই গুণ গরম জলের বোতল প্রভৃতিতে কাজে লাগানো হয় এবং এই গুণের জন্যই শীতপ্রধান অঞ্চলের দ্বীপগুলির তাপমাত্রা শীতকালে কতকটা সহনীয় অবস্থায় থাকে। কারণ গ্রীষ্মকালে যে প্রচণ্ড তাপ চারিদিকের জলরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখে, তাহা শীতকালে ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দেয়।

জলের তলটান সর্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া ইহা কৈশিক নলের ছিদ্রপথে অপর সকল তরল পদার্থ অপেক্ষা বেশী দূর উপরে উঠিতে পারে এবং এই কারণেই উদ্ভিদের মধ্যে রস চলাচল সম্ভব হয়। উপরন্তু ইহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কৈশিক নলের ছিদ্রের মধ্যে জলের তাপমাত্রা-২০° সেঃ নামাইলেও উহা জমিয়া যায় না, তরল অবস্থায় থাকে। সেই কারণে উদ্ভিদের দেহের রস কৈশিক নলের মধ্যে থাকায় প্রচণ্ড শীতেও উহা জমিয়া যায় না। উপরন্তু যে আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা উদ্ভিদসমূহ নিজেরা পুষ্ট হয় এবং অন্য প্রাণীগণের খাদ্য প্রস্তুত করে, তাহা জল ব্যতীত কখনই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। উদ্ভিদের দেহে এক পাউণ্ড কঠিন পদার্থ প্রস্তুত করিতে দুই শত পাউণ্ড হইতে চারি শত পাউণ্ড পর্যন্ত জলের প্রয়োজন হইতে পারে। জীব সংরক্ষণ ও পোষণের উপযোগী এই সকল ও অন্যান্য গুণ ব্যতীত জলের এমন কতকগুলি অনন্যসাধারণ বিশেষ গুণ আছে, যাহা ইহাকে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য করিয়া তুলিয়াছে।

পণ্ডিতগণের মতে, জীবন বলিতে আমরা যাহা বুঝি—তাহা, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব-কোষের সমন্বয়ে জীবদেহ গঠিত, তাহাদের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া সঞ্জাত বৈদ্যুতিক শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। এই শক্তিই জীব-কোষের আয়তন ও গঠন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইহাই তাহার

বৃদ্ধি, প্রজনন, নিঃস্রবণ, পেশী সঙ্কোচন ও স্নায়বিক যাবতীয় জীবধর্মের নিয়ামক। এই শক্তি সুষ্ঠুভাবে কার্য করিলে আমরা সুস্থ থাকি, আংশিকভাবে ব্যাহত হইলে অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং গুরুতর বিপর্যয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হই। জীবনীশক্তির মূল উৎস জীব-কোষের ভিতর এই সকল সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি জলের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। একেবারে শুষ্ক অবস্থায় সচরাচর কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়াই ঘটিতে পারে না। একটি বীজ শতবর্ষ শুষ্ক রাখিলেও তাহাতে অঙ্কুরোদ্গম হইবে না, অঙ্কুরোদ্গমের পূর্বে জলসিক্ত হওয়া প্রয়োজন।

জলের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এত অধিক সংখ্যক বিভিন্ন প্রকারের পদার্থকে দ্রবীভূত করিবার মত ক্ষমতা অন্য কোনও তরল পদার্থের নাই এবং ইহাতে দ্রবণক্ষম বহু সংখ্যক পদার্থের মাত্র অল্প কয়েকটির সহিত ইহার রাসায়নিক সংযুক্তি ঘটিয়া থাকে। প্রাণীদেহে যে সমস্ত নানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া জলের মাধ্যমে সংঘটিত হয় এবং যেগুলি জীবনীশক্তির প্রধান উৎস, তাহাতে ইহা নিজে অবিকৃত থাকে। সেই কারণে প্রাণ সম্পর্কিত ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী পদার্থসমূহের একটি নির্ভরযোগ্য ধারক ও বাহক হিসাবে ইহার সমতুল্য কিছুই নাই।

জল বিশুদ্ধ অবস্থায় নিজে অতি সামান্য পরিমাণে H⁻3OH' রূপে আয়নিত হইলেও এবং এই কারণে বিদ্যুৎ অপরিবাহী হইলেও দ্রবীভূত পদার্থের অণুগুলিকে আয়নিত করিয়া (অর্থাৎ বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অংশে সংবিচ্ছিন্ন করিয়া) পরিবাহী করিতে ইহার সমকক্ষ কোনও দ্রব্য নাই। নিজে আয়নিত না হইয়া ইহাতে দ্রবীভূত পদার্থকে আয়নিত করিবার এই যে শক্তি, ইহাকে আন্তর্বৈদ্যুতিক শক্তি (Dielectric property) বলে। জলের আন্তর্বৈদ্যুতিক ধ্রুব সংখ্যা (Dielectric constant) পরিজ্ঞাত সকল পদার্থ অপেক্ষা বেশী। অবশ্য জলে দ্রবীভূত সকল পদার্থই যে সমভাবে আয়নিত হয়, এমন নহে। সাধারণতঃ অজৈব অম্ল, ক্ষার ও লবণ জাতীয় পদার্থগুলি সমজাতীয় জৈব পদার্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আয়নিত হইয়া থাকে। আবার শর্করা প্রভৃতি এমন কতকগুলি জিনিস আছে, যেগুলি একেবারেই আয়নিত হয় না। আয়নিত অবস্থায় অণুগুলি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়। সাধারণ ও আয়নিত অবস্থায় একই অণুর প্রাণীদেহে গুণের কি অসীম পার্থক্য, তাহা একটি দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। সাধারণ অবস্থায় হাইড্রোজেন গ্যাসের অণুগুলি আয়নিত অবস্থায় থাকে না এবং প্রাণীদেহে ইহার প্রভাবও অতি সামান্য। আয়নিত অবস্থায় কিন্তু জীবদেহে ইহাদের কার্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। এক লিটার রক্তে সাধারণ অবস্থায় $\frac{১}{২০,০০০,০০০}$ গ্র্যাম হাইড্রোজেন আয়নিত অবস্থায় থাকে। কোনও কারণে এই সামান্য হাইড্রোজেনের পরিমাণ যদি দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ লিটার প্রতি $\frac{১}{১০,}$ গ্র্যামে পৌছায়, তাহা হইলে জীবন রক্ষা সম্ভব নহে। রক্তে হাইড্রোজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থায় সামান্যতম হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেও তাহাতে শারীরিক প্রক্রিয়ার নানারূপ বিপর্যয় দেখা দেয়। দ্রবীভূত পদার্থকে আয়নিত করিবার ফলে এই যে শক্তি, ইহাই প্রাণী-জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণে জলের মাধ্যমে জীবনীশক্তির মূল উৎস সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে।

আমাদের দেহের বারো আনা জল হইলেও এবং জল জীবনের পক্ষে অপরিহার্য হইলেও দেহস্থ জলের পরিমাণ অতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলেও আমাদের দেহে জলাধিক্য হইবার আশঙ্কা কম, কারণ, বৃক্ক অর্থাৎ কিড্‌নী তৎক্ষণাৎ ইহা মূত্ররূপে বাহির করিয়া দিয়া দেহের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। কোন কারণে এই যন্ত্রটি

অসুস্থ হইলে আমাদের দেহে প্রয়োজনাধিক জল জমিবার আশঙ্কা দেখা দেয়। দেহস্থ জীব-কোষগুলিতেও জল যথেচ্ছভাবে প্রবেশ করিতে পারে না এবং ইহার পরিমাণ অতি সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহস্থ জলের ঘাটতি দেখা দিলে নানা উপসর্গের সৃষ্টি হয়। খনির ভিতরের তাপমাত্রা ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা বেশী বলিয়া খনির শ্রমিকদের দেহ হইতে প্রচুর জল ঘর্মাকারে বাহির হইয়া যায়। তজ্জন্য তাহাদের পেশীসমূহের আক্ষেপ (Miner's cramp) দেখা দেয়। অবশ্য এই উপসর্গের প্রাথমিক কারণ শরীর হইতে অধিক পরিমাণে জল নির্গমন হইলেও প্রকৃত কারণ ঘামের সঙ্গে দেহের লবণ সকল বাহির হইয়া যায় তাহার অভাব। কারণ, এই উপসর্গ বিশুদ্ধ জল পান করিলে সারে না, লবণ-মিশ্রিত জলেই উপশম হয়। সম্পূর্ণ অনাহারে থাকাকালে আমাদের দেহের প্রায় সমস্ত স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং প্রোটিনের অর্ধাংশ দগ্ধ করিয়া জীবন রক্ষা করা হয়, কিন্তু জলের বেলায় $\frac{1}{10}$-এর অধিক ব্যয় করা যায় না, এমনই অপরিহার্য দ্রব্য এই জল।

দেহের এই জলসাম্য সামান্যভাবে ব্যাহত হইলে আমরা অসুস্থ হইয়া পড়ি এবং গুরুতরভাবে ব্যাহত হইলে মৃত্যুর সম্মুখীন হই। শোথ (Oedema) এবং বহুমূত্র (Diabetes), সন্ন্যাস রোগ বা মৃগী (Epilepsy) প্রভৃতি রোগে এই জলসাম্য অল্পবিস্তর ব্যাহত হয়।

প্রোটোপ্লাজ়ম* নামক যে মূল উপাদানে আমাদের দেহ গঠিত, বার্ধক্যে তাহা নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং পূর্বের ন্যায় জল শোষণ ও ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। সেই কারণে আমাদের শরীরের জলীয় অংশ ক্রমশঃ কমিয়া যায় এবং দেহ শুষ্ক হইয়া পড়ে। জীব-কোষের অভ্যন্তরে যে সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি জীবনীশক্তির মূল উৎস, সেগুলিও সেই কারণে পূর্বের ন্যায় সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে না এবং ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে ও অবশেষে মৃত্যুতে একেবারে বন্ধ হয়।

জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে বস্তুটি আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, জীবের যাহাতেই জন্ম, যাহাতেই স্থিতি, যাহার সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং যাহার অধিক তারতম্যে বা অভাবে মৃত্যু হইতে পারে, তাহাকে তুচ্ছ করা অকৃতজ্ঞতা নহে কি?

* যেখানে ইংরেজী Z-এর ন্যায় উচ্চারণ হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্য 'জ়' এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইল অর্থাৎ জ় = Z।

কীট-পতঙ্গের যন্ত্রসঙ্গীত

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী

যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীতে মানুষের অপূর্ব দক্ষতার কথা বাদ দিলে প্রাণীদের মধ্যে কোন কোন জাতের পাখী সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী। এই সুমধুর কণ্ঠস্বরই সাধারণতঃ পাখীদের গান নামে পরিচিত। অনেকে এই সুমধুর কণ্ঠস্বরের জন্যে পাখী পোষে। পাখী ছাড়াও কোন কোন প্রাণী কণ্ঠসঙ্গীতের জন্যে প্রসিদ্ধ— অবশ্য তাদের গান আমাদের কাছে মোটেই শ্রুতিমধুর বলে মনে হয় না বরং কর্কশ শোনায়। বর্ষাকালে ব্যাঙের গান অনেকেরই শোনা আছে। আমাদের কাছে ব্যাঙের এই ঐক্যতান যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, ব্যাং সমাজে কিন্তু এর যথেষ্ট মর্যাদা আছে। গলা ফুলিয়ে এদের গান গাইবার ভঙ্গীটিও বেশ চমৎকার। এক স্থান

থেকে শব্দ শোনা মাত্র ক্রমশঃ চারদিক থেকে 'কোরাসে' ব্যাঙের গান সুরু হয়ে যায়। পুরুষ ব্যাং এই গানের দ্বারা সঙ্গিনীকে আকৃষ্ট করে। স্ত্রী-ব্যাংও শ্রেষ্ঠ গাইয়ের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। এ-রকমও শোনা যায় যে, সীল জাতীয় কোন কোন প্রাণী এমন করুণ সুরে একটানা শব্দ করে, যাকে গান বলেই মনে হয়।

আবার কোন কোন জাতের মাছ, গুব্‌রে পোকা, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী বিচিত্র কৌশলে শব্দ করে থাকে। কিন্তু তাদের শব্দে কোন সুরমাধুর্য নেই। সে জন্যে তাদের শব্দকে ঠিক সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যায় না।

আড় ট্যাংরা, চেকভাগা প্রভৃতি মাছ কান্‌কোর দু-দিকের দুটি কাঁটাকে সামনে এবং পিছনে নাড়িয়ে কট্‌কট শব্দ করে থাকে। জল থেকে তুললেই এদের এই শব্দ পরিষ্কার শোনা যায়। কট্‌কটে মাছও দাঁতের সাহায্যে কট্‌কট্‌ শব্দ করে পেটটাকে ফুলিয়ে বলের আকার ধারণ করে পাতি-চাঁদা মাছকে জলের উপরে তুললে বুক ও পিঠের কাঁটাগুলি কাঁপিয়ে গুঞ্জন করতে থাকে। অবশ্য এই শব্দ এত আস্তে হয় যে, মনযোগ না দিলে শোনা যায় না। সিঙ্গি, মাগুর প্রভৃতি মাছকে কখনও কখনও জলের উপর মাথা তুলে কুপ্‌ কুপ্‌ আওয়াজ করতে শোনা যায়।

উড়ন্ত অবস্থায় কোন কোন পাখীর ডানা ও পালকের সংস্পর্শে বাতাসের মধ্যে শ্রুতিমধুর শব্দ উৎপন্ন হয়। উড়ন্ত মশা-মাছির ডানা থেকেও একটানা শব্দ উৎপন্ন হয়। এই সব শব্দের মধ্যে কিছুটা সুর-সঙ্গতি থাকলেও সেটা যন্ত্রসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, এরা নিজেদের খুশীমত শব্দ সৃষ্টি করতে পারে না। কোন কোন জাতের টিকটিকি লেজ কাঁপিয়ে শব্দ উৎপাদন করে। র‍্যাটেল সাপও তার লেজের সাহায্যে খট্‌খট্‌ শব্দ করে। বোল্‌তা, ভীমরুল, মৌমাছিরা বাসার কাছে কোন আগন্তুককে দেখলেই ডানা কাঁপিয়ে বিচিত্র শব্দ উৎপন্ন করে। তাদের এই শব্দ উৎপাদন আত্মরক্ষার কৌশল মাত্র।

এই সব প্রাণীদের মধ্যে কয়েকটি বাদে অধিকাংশই শোনবার ক্ষমতার অধিকারী কিনা—সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তবে ঝিঁঝিঁপোকা, উইচিংড়ি, মাকড়সা প্রভৃতি কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সুরবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মাকড়সা নিম্নস্তরের প্রাণী। যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতি তার অনুরাগের কিছু কিছু কাহিনীও প্রচলিত আছে; যেমন—এক ব্যক্তি তার ঘরে বসে বেহালা বাজাতেন। বেহালার শব্দ শুনে একটা মাকড়সা উপরের ছাদ থেকে সূতা ছেড়ে ঝুলন্ত অবস্থায় গান শুনতো এবং বাজনা বন্ধ হলেই স্বস্থানে চলে যেত। এই কাহিনী কতদূর সত্য তা বলা যায় না, তবে কোন কোন বিজ্ঞানী পরীক্ষার ফলে মাকড়সার শব্দবোধের পরিচয় পেয়েছেন। তারের ঝঙ্কারের তালে তালে কোন কোন মাকড়সার বিচিত্র নাচও বিশেষ উপভোগ্য। নিম্নস্তরের আরও অনেক কীট-পতঙ্গেরই সঙ্গীতে রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

পাখী, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা যেমন কণ্ঠসঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন করেছে, কোন কোন জাতের কীট-পতঙ্গও তেমনি বাজনায় নৈপুণ্য লাভের অধিকারী হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা জাতের বাজিয়ে কীট-পতঙ্গের সংখ্যা বড় কম নয়! আমাদের দেশেও নানা জাতের বাজিয়ে কীট-পতঙ্গের সঙ্গে অনেকের পরিচয় আছে। কীট-পতঙ্গেরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাহায্যে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে। বিভিন্ন শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ সর্বদাই আমাদের চারদিকে এই সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। কিন্তু আমরা সেই বাজনা শুনতে পাই না। খুব সাবধানে কান পাতলে সেই শব্দ শোনা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গিনীর মনোরঞ্জন করাই এদের বাজনার লক্ষ্য। ঝিঁঝিঁপোকা, ব্যাং প্রভৃতি প্রাণীরা আবার

দলবদ্ধ ভাবে মনের আনন্দে একটানা ঐক্যতান পরিবেশন করে।

কীট-পতঙ্গের মধ্যে বাজিয়ে যথেষ্ট থাকলেও গাইয়ে কিন্তু মোটেই নেই। কারণ এদের কণ্ঠস্বর নেই। এদের সমবেত ঐক্যতানে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। আর একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়—এদের মধ্যে পুরুষেরাই কেবল ওস্তাদ বাজিয়ে। স্ত্রী-পতঙ্গেরা একেবারেই বাজাতে পারে না, তবে তারা রসজ্ঞ শ্রোতা। স্ত্রী-পতঙ্গের মনোরঞ্জনের জন্যে পুরুষ পতঙ্গ যখন বাজনা বাজাতে থাকে, তখন তার সুরমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে স্ত্রী-পতঙ্গ পুরুষের কাছে উপস্থিত হয়। সব সময়ে পুরুষের এই প্রচেষ্টা সফল হয় না। যন্ত্রসঙ্গীতের তাল কেটে গেলে তা আর স্ত্রী-পতঙ্গকে আনন্দ দেয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষরা কেবল নিজেদের তৃপ্তি বিধানের জন্যেই একটানা বাজিয়ে যায়। স্ত্রী-পতঙ্গ তার বাজনায় আনন্দ পেল কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে।

কোন কোন জাতীয় কীট-পতঙ্গ স্বজাতীয়দের যন্ত্রসঙ্গীতে সাড়া তো দেয়ই—উপরন্তু মানুষের গান বা কোন রকম একটানা শব্দে আকৃষ্ট হয়ে উড়ে এসে গায়ে বসে। এদের এই আচরণ রীতিমত বিস্ময়কর। সন্ধ্যাবেলায় মানুষের গানে আকৃষ্ট হয়ে ঝিঁঝিঁপোকার এরূপ উপস্থিতি পাড়াগাঁয়ে অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন। একটা, দুটা করে ক্রমশঃ অনেক ঝিঁঝিঁপোকা উড়ে এসে গায়কের দেহে বা আশেপাশে বসে থাকে। গান বন্ধ করলেই আবার চলে যায়। সময় সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, এদের উৎপাতে আর বসা যায় না। এদের এই বিচিত্র স্বভাব সঙ্গীত-প্রিয়তার নিদর্শন বলা যেতে পারে।

সবুজ রঙের ঝিঁঝিঁপোকারা এক জায়গায় ক্রমাগত একটানা খট্‌খট্‌ শব্দ শুনলেই সেখানে ছুটে আসে। এই অদ্ভুত স্বভাবের সুযোগ নিয়ে কোন কোন অঞ্চলে ছেলেমেয়েরা অনায়াসে এদের বন্দী করে ফেলে। ঝিঁঝিঁপোকা বন্দী করা অবশ্য তাদের কাছে খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। ডানায় ধরলে অথবা বুকে মৃদু চাপ দিলেই ঝিঁঝিঁপোকা কট্‌ কট্‌ কড়-ড়-ড়-ড় করে কর্কশ আওয়াজ করে ওঠে। ছেলেমেয়েরা এই বিকট শব্দ উপভোগ করে। গরমের সময় সন্ধ্যাবেলায় সাধারণতঃ ঝিঁঝিঁপোকা দেখা যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা তখন ঝিঁঝিঁ-পোকার ছড়া সুর করে আবৃত্তি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে দুটা নারকেলের মালা ঠুকে তাল দিতে থাকে। ঐ শব্দ শুনে ঝিঁঝিঁপোকা ছুটে আসে। তখনই তারা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে অনায়াসে বন্দী হয়।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই জাতের ঝিঁঝিঁ-পোকা দেখা যায়। এক জাতের ঝিঁঝিঁপোকার রং সবুজ, আর এক জাতের রং ধূসর। ধূসর ঝিঁঝিঁপোকার গায়ে ছিট্‌ ছিট্‌ কতকগুলি চিহ্ন থাকে। সাধারণতঃ সবুজ ঝিঁঝিঁপোকাই সংখ্যায় বেশী দেখা যায়। পুত্তলী অবস্থায় এরা গাছের গুঁড়ি বা অন্য কোন জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে। তখন এদের দেহে ডানা থাকে না। সময়মত পুত্তলীর পিঠের অংশটা লম্বালম্বি চিরে যায় এবং তার মধ্য থেকে পূর্ণাকৃতির ঝিঁঝিঁ-পোকা বেরিয়ে আসে।

শীতকাল শেষ হলে সব জায়গায় ঝিঁঝিঁ-পোকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আবার বর্ষা সুরু হবার আগেই এরা আত্মগোপন করে। এদের যন্ত্রসঙ্গীত খুব জোরালো হয়। পুরুষ ঝিঁঝিঁপোকা খুব জোরে ‘ঝিন্‌ ঝিন্‌’ শব্দে সঙ্গীত পরিবেশন করে। সাধারণতঃ দিনের বেলায় এরা বাজনা বাজিয়ে থাকে। সারাদিনই কোন না কোন দলের বাজনা শোনা যায়। রাত্রিতে এদের বাজনায় বিরতি ঘটে।

চারদিক একেবারে চুপচাপ, কোথাও কোন শব্দ শোনা যায় না—সেই অবস্থায় হঠাৎ কোন

লতাপাতার আড়াল থেকে একটা জোরালো শব্দ শোনা যায় 'কিট-কিট-কিট কিরির-র-র-র।" এই শব্দ খুবই তীক্ষ্ণ এবং তার মধ্যে একটা সুর-সঙ্গতির পরিচয় পাওয়া যায়। এক স্থান থেকে শব্দ শোনা যাবার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্যান্য স্থান থেকেও ঠিক অনুরূপ শব্দ সুরু হয়ে যায়।

ঝিঁঝিঁপোকার ঐক্যতান কানের পর্দায় যেন সুচের মত বিদ্ধ হয়। সঙ্গীতের সুর আস্তে আস্তে উঁচু পর্দায় উঠে আবার ধীরে ধীরে নীচের পর্দায় নেমে আসে। এভাবে ঐক্যতান বেশ কিছুক্ষণ একটানা চলবার পর ক্রমশঃ থেমে যায়।

ধূসর বর্ণের ঝিঁঝিঁপোকা সবুজ ঝিঁঝিঁ-

ঝিঁঝিঁপোকা

কেউ যদি এই ঐক্যতানে সুর মেলাতে না পারে, তবে দু-একবার শব্দ করেই চুপ করে থাকে। সুর না মিলিয়ে এরা ঐক্যতানে অংশ গ্রহণ করে না।

পোকার চেয়ে কিছুটা ছোট। এরা থাকে গাছের উঁচু ডালে। সে জন্যে এরা কাঠ-ঝিঁঝিঁ নামে পরিচিত। গাছের উঁচু ডালে থাকে বলে এরা সহজে নজরে পড়ে না। এরা 'ঝির ঝির' শব্দ

করে। এরাও সমবেতভাবে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে। কিন্তু এদের সঙ্গীত খুব ক্ষীণ এবং বৈচিত্র্যহীন। সে জন্যে এদের ঐক্যতান সহজে আমাদের কর্ণগোচর হয় না। খুব মনযোগ দিলে এদের ঐক্যতান শোনা যায়।

ঝিঁঝিঁপোকার দেহের দু-দিকে দুটি গভীর গর্ত আছে। গর্তের উপরে থাকে ছোট ছোট ডানার মত দুটি পর্দা। এই পর্দা দুটিকে অতি দ্রুতগতিতে কাঁপিয়ে এরা শব্দ উৎপন্ন করে। গর্তের আবরণ ড্রামের পর্দার মত কম্পিত হয়ে ডানার মৃদু শব্দ-কম্পন বহুগুণ বর্ধিত হয়ে জোরালো শব্দের সৃষ্টি হয়।

কারো কারো মতে দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলে পাহাড়ী ঝিঁঝিঁ নামে পরিচিত এক জাতের ঝিঁঝিঁপোকা দেখা যায়। এদের কট্ কট্ ধ্বনি খুবই বিকট শোনায়। এক স্থানে ঝিঁঝিঁর শব্দ বন্ধ হওয়া মাত্র অন্য স্থান থেকে অনুরূপ শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ শুনে মনে হয় যেন দু-জনের মধ্যে বাজনার প্রতিযোগিতা চলছে।

উইচিংড়ি আমাদের দেশে অপরিচিত নয়। সর্বত্রই এদের দেখা যায়। এরা লাফাতে ওস্তাদ। এদেশে সাধারণতঃ ৪।৫ শ্রেণীর উইচিংড়ি দেখা যায়। কেউ মাটিতে গর্ত করে বাস করে, কেউ কেউ লতাপাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। কেউ আবার ঘরের আনাচে-কানাচে, দেয়ালের ফাটলে বাস করে। উইচিংড়ি ডানা কাঁপিয়ে একটানা যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে। এক জাতের উইচিংড়ি মাটির মধ্যে দু-মুখো গর্ত খুঁড়ে বাস করে। এরা সহজে গর্ত থেকে বেরুতে চায় না। মাঝে মাঝে গর্ত থেকে লম্বা শুঁড় বের করে চার দিকের অবস্থা অনুভব করে। গর্ত থেকে বেরোতে বাধ্য হলে এরা লাফিয়ে লাফিয়ে পালায়। এদের যন্ত্রসঙ্গীত খুবই কর্কশ। গেছো উইচিংড়ি একটানা যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে না। এরা থেমে থেমে চিচিড়িং, চিচিড়িং শব্দে বাজনা বাজায়। দেয়ালের ফাটলে বসবাসকারী উইচিংড়ি একটানা 'ঝির ঝির' শব্দে বাজনা বাজায়।

পুরুষ উইচিংড়ির বাজনার শব্দ শুনে স্ত্রী-পতঙ্গ কাছে আসে। বাজনার শব্দ বন্ধ হবার পর পুরুষ উইচিংড়িদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই বেঁধে যায়। যে জয়ী হয় সে-ই স্ত্রী-পতঙ্গটিকে লাভ করে। স্ত্রী-পতঙ্গকে আকৃষ্ট করবার জন্যেই এরা যন্ত্রসঙ্গীতের মাধ্যমে সুরের জাল বিস্তার করে।

পুরুষ কয়ারফড়িংও ওস্তাদ বাজিয়ে। এদের যন্ত্রসঙ্গীতে প্রত্যেক দফায় 'কিট কিট কিটির-র-র' শব্দ তিনবার শোনা যায়। হয়তো এভাবেই এরা প্রণয়িণীকে আহ্বান করে। কিছুক্ষণ একভাবে চলবার পর 'কিট কিট কিট' শব্দের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

কয়ারফড়িং-এর পিছনের পায়ে কতকগুলি নিম্নাভিমুখী কাঁটা থাকে। পাত্‌লা পর্দার মত দুটি সূক্ষ্ম উপাঙ্গের সঙ্গে এই কাঁটাগুলিকে এরা উখার মত ঘসে শব্দ সৃষ্টি করে। 'অর্কেলিমাস,' 'কনোসেফালাস,' 'নিওকনোসেফালাস,' 'আট-লান্টিকাস' প্রভৃতি গণভুক্ত কয়ারফড়িং যন্ত্রসঙ্গীতে বিস্ময়কর দক্ষতা লাভ করেছে।

সবুজ রঙের ক্যাটিডিড বা পঙ্গপাল জাতীয় এক রকম ফড়িংও ভাল বাজিয়ে। ডানা দুটিকে সামান্য ছড়িয়ে সড়্ সড়্ শব্দ করতে থাকে, তবে শব্দটা পরিষ্কার বোঝা যায় না। সড়্ সড়্ শব্দের মাঝে মাঝে ক্রিং ক্রিং শব্দও শোনা যায়। সবুজবর্ণের ডানার নীচে—ছোট ছোট আরও দুটি ডানা আছে। এই ডানা দুটির আকৃতি ত্রিভুজের মত। এই ডানা দুটিকে অতিদ্রুত কাঁপিয়ে এরা সড়্ সড়্ শব্দ সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে ডানার কম্পন বন্ধ করে ক্রিং-ক্রিং শব্দ উৎপাদন করে। এদের বাজনার শব্দ শুনে স্ত্রী-পতঙ্গ এসে হাজির হয়। স্ত্রী-পতঙ্গকে দেখলেই বাজিয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বেড়ে যায়। খোসমেজাজে সে তখন একটানা বাজিয়ে চলে। প্রথমে সড়্ সড়্ শব্দ, পরে ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং-ক্রি-

রি-রি-রি শব্দ শোনা যায়। তখন এদের সঙ্গীত শুনে মনে হয় যেন সুরের মূর্ছনা চলছে। ছোট ডানা দুটির মূলদেশে অবস্থিত অপর দুটি উপাঙ্গের সঙ্গে ডানার পরস্পর ঘর্ষণের ফলে এই বিচিত্র সুর শোনা যায়। স্ত্রী-পতঙ্গ মনের আনন্দে এক জায়গায় বসে শুঁড় দুটি সঞ্চালন করে এই সঙ্গীত উপভোগ করতে থাকে। অবশ্য বাজনা ভাল না লাগলে এরা বসে থাকে না। এরা দিনের বেলায় সন্ধ্যার ঠিক আগে সাধাণতঃ যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। অনেকে আবার মেঘলা দিনে, কেউ কেউ কেবল রাত্রিবেলায় শব্দ করে।

পঙ্গপাল জাতীয় আরও নানারকমের পতঙ্গ বাজনায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেছে। 'মাইক্রো-সেণ্ট্রাম', 'অ্যামব্লিকরিফা,' 'ফ্যানারোপটেরা' প্রভৃতি গণভুক্ত পঙ্গপাল জাতীয় পতঙ্গেরা বাজিয়ে কীট-পতঙ্গদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে।

এখানে মাত্র কয়েকটি বাজিয়ে কীট-পতঙ্গের কথা আলোচনা করা হলো। এছাড়াও পৃথিবীতে নানাজাতের প্রচুর বাজিয়ে কীট-পতঙ্গ দেখা যায়। তাদের যন্ত্রসঙ্গীতও এদের তুলনায় কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

সঞ্চয়ন

কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

কুষ্ঠ মানবদেহের সর্বপুরাতন এবং সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ রোগ হলেও উত্তর ইউরোপে এই রোগের সঙ্গে এখন কারও কোন পরিচয় নেই বললেই চলে। কিন্তু বৃটিশ চিকিৎসকগণ এখনও এই মারাত্মক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছেন। বিশ্বে এখন যত কুষ্ঠরোগী আছে (আনুমানিক ১০,০০০,০০০ থেকে ১৫,০০০,০০০) তার এক-তৃতীয়াংশ আছে কমনওয়েলথের দেশগুলিতে।

১৯৪১ সালের পর কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় কতকগুলি ভেষজ, বিশেষ ভাবে সালফোন্‌স্‌ ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া যায়। বৃটেনের দু'জন চিকিৎসক ডাঃ কক্রেন ও ডাঃ লো যথাক্রমে ভারত এবং নাইজেরিয়ায় কুষ্ঠরোগী-দের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে এই সালফোন্‌স্‌ ব্যবহার করেন। কিন্তু কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থায় গত ৩০ বছরে যে উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, তা অন্যান্য সংক্রামক রোগের চিকিৎসায় উন্নতির তুলনায় অনেক কম লক্ষণীয় হয় এবং তার গতিও অনেক বেশী শ্লথ হয়।

কুষ্ঠরোগ হয় চামড়ায়, নাসিকা পথে এবং কোন কোন স্নায়ুতে এক রকমের কুষ্ঠ-বীজাণুর আক্রমণ থেকে।

বৃটিশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের একদল বিজ্ঞানী ন্যাশন্যাল ইনসটিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চে কাজ করবার সময় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, লেবরেটরিতে মানব-দেহের বীজাণুর অভাবে বন্য ইঁদুরের দেহের কুষ্ঠ-বীজাণু ব্যবহার করে তুলনামূলক পরীক্ষা সম্ভব। এই সিদ্ধান্ত বীজাণুর ধীরগতি বৃদ্ধি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের দিক দিয়ে এবং জীবন্ত কুষ্ঠ-বীজাণু এবং মৃত বীজাণুর মধ্যে পৃথকীকরণের দিক দিয়ে অতি মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়।

মালয়ে কাউন্সিল এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটনে

সক্ষম হন। কাউন্সিল এখানে আবিষ্কার করেন, কুষ্ঠ-রোগীর চামড়ায় যে বীজাণু থাকে, তা যথেষ্ট পরিমাণে ধ্বংস করা সম্ভব হয় সালফোন্‌স্-এর সাহায্যে চিকিৎসায় তিন বা ছয় মাসের মধ্যে এবং রোগীর অন্যকে রোগ সংক্রামিত করবার ক্ষমতাও এই সঙ্গে লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস করা যায়। যাহোক মৃত বীজাণুর অধিকাংশই কয়েক বছর ধরে তন্তুর মধ্যে থেকে যায় বলেই রোগ সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায় না।

মৃত বীজাণু যে তন্তুগুলির মধ্যে রোগ জীইয়ে রাখতে পারে, এই আবিষ্কারের ফলে নতুন ধরণের ভেসজের সন্ধান করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়। সকলে মনে করেন, এমন ভেসজের প্রয়োজন আছে, যা মানুষের শরীর থেকে মৃত কুষ্ঠ-বীজাণু সরিয়ে ফেলতে পারে বা ধ্বংস করতে পারে—কেবল জীবন্ত বীজাণু ধ্বংস করলে কিছুই হবে না।

ডাঃ কক্রেনের সঙ্গে ডাঃ পল ডবলিউ. ব্র্যাণ্ডও কুষ্ঠরোগজনিত অঙ্গবিকৃতির চিকিৎসার জন্যে ভারত এবং বিশ্বের সর্বত্র খ্যাতির অধিকারী হন।

ভেলোরের (মাদ্রাজ রাজ্য) ক্রিশ্চিয়ান মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হস্পিটালের কুষ্ঠ-বিভাগের অর্থোপেডিক রিসার্চ ইউনিটের প্রধান ডাঃ ব্র্যাণ্ড সার্জিক্যাল অর্থোপেডিক অপারেশনের জন্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। এই অপারেশনের ফলে বহু পঙ্গু রোগী তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করতে পারছে এবং স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মত জীবিকার্জনের সুযোগ খুঁজে পাচ্ছে। তিনি এদের ব্যবহারের উপযোগী কতকগুলি সাজসরঞ্জামের ডিজাইনও প্রস্তুত করেছেন। ডাঃ ব্র্যাণ্ড রয়েল কলেজ অব সার্জন্‌স্-এর একজন ফেলো।

ক্লোজ্‌ড্-সার্কিট টেলিভিশনের নতুন ব্যবহার

ডেভিড স্টিভেন্স এই সম্বন্ধে লিখেছেন—আপনি যখন সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী পথে ডারহাম ক্যাথিড্রাল থেকে শহরে প্রবেশ করবেন, তখন নিশ্চয়ই কর্তব্যরত একজন পুলিশম্যানকে টেলিভিশন স্ক্রিনের উপর চোখ রেখে কাজ করতে দেখে বিস্ময়বোধ করবেন। পুলিশটি এই ভাবে শহর এবং আশেপাশের রাস্তায় ট্রাফিক-লাইটের সাহায্যে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করছে। এই ক্লোজ্‌ড্-সার্কিট টেলিভিশন সম্পর্কে যে সব ক্যামেরা ব্যবহৃত হয়, সেগুলি সাধারণ টেলিভিশন ক্যামেরার মত জটিল নয়, তাছাড়া অনেক পোর্টেবল ক্যামেরার তুলনায় সেগুলি অনেক ছোট।

ক্লোজ্‌ড্-সার্কিট টেলিভিশনের সবচেয়ে নাটকীয় ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় নাইট্রোগ্লিসারিন প্রস্তুতের সময়। এই নাইট্রোগ্লিসারিন নানা ধরণের বিস্ফোরক পদার্থের মূল কথা এবং সেই জন্যে প্রয়োজন হয় নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থার। কয়েক বছর পূর্বে ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্মীদের রক্ষা-ব্যবস্থা হিসাবে ক্লোজ্‌ড্-সার্কিট টেলিভিশন স্থাপন করেছে। এই সব কর্মীদের যে কেবল ফ্লো-মিটার এবং টেম্পারেচার গেজের উপর চোখ রাখতে হয়, তা নয়, দু'টি তরল পদার্থের গতির উপরেও তাদের চোখ রাখতে হয়। টেলিভিশন সংযোগ ৮০ ফুট দূরে একটি কংক্রিট ব্লক হাউস থেকে এই প্রক্রিয়া লক্ষ্য বা করবার সুযোগ দিয়েছে।

বিশেষ ডিজাইনে নির্মিত টেলিভিশন ক্যামেরা বিশেষ পারমাণবিক শক্তির কেন্দ্রগুলিতেও রিয়্যাক্টরের ফুয়েল চ্যানেল পরিদর্শনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হলো, লণ্ডনের হ্যামারস্মিথ হাসপাতালে মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের রেডিও-থেরাপিউটিক ইউনিটের সাইক্লোট্রন। বিকিরণের প্রবলতা এ-ক্ষেত্রে লক্ষণীয়। কিছুদিন পূর্বে ডয়টেরনকে ১৫,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট পর্যন্ত এবং আল্ফা-কণাকে ৩০,০০০,০০০ ইলেকট্রন

ভোলট পর্যন্ত বৃদ্ধি করবার জন্মে এই যন্ত্রে যে সব কাজ হতো, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হতো একটি টেলিস্কোপ ও একটি দর্পণের ব্যবস্থার মাধ্যমে।

রিয়্যাক্টর, ফ্রগ্‌ম্যান অথবা যে সব ডাইভার সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করছে অথবা উদ্ধার-কার্যে নিযুক্ত আছে, তাদের কারও কাজের সঙ্গে কারও কোন সম্পর্ক নেই বটে, কিন্তু টেলিভিশন তাদের সকলের কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছে।

বৃটেনের একটি মোটর গাড়ী নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এমন এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে, যে ব্যবস্থার সহায্যে তাদের ইঞ্জিনীয়ারেরা, টেষ্ট-ট্র্যাকে গাড়ী যখন চলবে, তখন তার অংশ-বিশেষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে পারবেন। তারা একটি মাইক্রো-ওয়েভ ব্রডকাষ্ট সংযোগ এবং বিমানের ককৃপিটে একটি মনিটর স্ক্রীনের মধ্য দিয়ে ইঞ্জিনের আচরণের প্রতি সরাসরি দৃষ্টি রাখবার জন্মে ক্লোজ্‌ড্‌-সার্কিট টেলিভিশনের ব্যবস্থা করেছেন।

উত্তর ইংল্যাণ্ডের একটি বিরাট গ্যাস কারখানায় টেলিভিশন ব্যবহৃত হচ্ছে দূর থেকে মিটার, ষ্টীম প্রেশার গেজ, থার্মোমিটার ইত্যাদির কাজ দেখবার জন্মে। এতে পায়ে হেঁটে ইঞ্জিনীয়ারদের আর সময় নষ্ট করবার প্রয়োজন হয় না। তাঁরাও কন্ট্রোল রুমে বসে সব কিছুর উপর নজর রাখতে পারেন। স্কটল্যাণ্ডের একটি রেলওয়ে মার্শালিং ইয়ার্ডেও এই টেলিভিশন ব্যবহৃত হচ্ছে। রোলিং ষ্টকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্মে দায়ী ইয়ার্ড মাষ্টার এক মিনিটেরও কম সময়ে স্ক্রীনের উপর নজর রেখে ইয়ার্ডের সমস্ত অবস্থা বুঝে নিতে পারেন

ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্লোজ্‌ড্‌-সার্কিট টেলিভিশন ব্যবহার করছে। উদাহরণস্বরূপ-বলা যায়, ষ্টক ব্রোকারেরা এই টেলিভিশন ব্যবহার করছে লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে তাদের দপ্তরগুলিতে অথবা শহরে তাদের মক্কেলদের কাছে মূল্য 'রিলে' করবার কাজে।

কতকগুলি শিক্ষণ হাসপাতালে এই টেলিভিশন ছাত্রদের আরও ভাল করে সার্জিক্যাল অপারেশন লক্ষ্য করবার সুযোগ দিচ্ছে, যে সুযোগ তারা অপারেশন থিয়েটারে বসে পেতে পারে না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের কয়েক শত ছাত্র লেকচার রুম এবং সংলগ্ন কক্ষগুলিতে স্থাপিত মনিটর স্ক্রীন মারফৎ এক সঙ্গে লেকচার শুনতে পারে।

সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য হলো আলট্রাভায়োলেট টেলিভিশন ক্যামেরা টিউবের ব্যবহার। জীব-কোষগুলির মৌলিক প্রক্রিয়া সরাসরি লক্ষ্য করাই ছিল জীববিদ্যাবিদ্‌দের বহু কালের বাসনা। এই আলট্রাভায়োলেট টেলিভিশন ক্যামেরা টিউব উদ্ভাবিত হওয়ায় তাঁদের এই বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান অ্যানাটমি বিভাগে একটি ক্লোজ্‌ড্‌-সার্কিট টেলি-ভিশন ক্যামেরার সঙ্গে এই নতুন টিউব যুক্ত করে এই সম্পর্কে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা সুরু হয়ে গেছে। টিউবটি এতদুর সংবেদ্য যে, তার ফলে রঙোত্তর বিকিরণকে একটা বিশেষ স্তরে নামিয়ে আনা যায় এবং এই বিকিরণ কোষগুলিকে সহসা আর নষ্ট করতে পারে না।

শিশুর আমাশয় রোগ

ডাঃ এন. পদভোরচান্নায়া এই সম্বন্ধে লিখেছেন—আমাশয় এক সাধারণ আন্ত্রিক সংক্রমণ। এই সংক্রমণ ঘটায় ব্যাসিলাস্‌ ডিসেন্টারিয়ে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতেই সাধারণতঃ অ্যামিবিক আমাশয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাশয় মুখ্যতঃ গ্রীষ্ম-কালের ব্যাধি হলেও বছরের যে কোন সময় তা হতে পারে। প্রবল আক্রমণ থেকে অল্পস্বল্প আন্ত্রিক গোলযোগ পর্যন্ত নানা রকমের আমাশয়

আছে। আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শিশুদের ক্ষেত্রেই বেশী। কারণ শিশুদের আন্ত্রিক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী বড় কোমল, তাই তারা সহজে আক্রান্ত হয়। এই রোগের লক্ষণ : জ্বর, খিটখিটে ভাব, ক্লান্তি বা অবসাদ, বমি, ঘন ঘন পাত্‌লা মলত্যাগ। শ্লেষ্মা ও রক্তমিশ্রিত মলত্যাগ করবার সময় শিশু কষ্ট পায়, মুখ লাল হয়ে ওঠে। প্রবল ধরণের আক্রমণ সাধারণতঃ আকস্মিক হতে দেখা যায় এবং রোগীর অবস্থাও কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়ায়। মৃদু আক্রমণের ক্ষেত্রে রোগ ঐ রকম আকস্মিক হয় না, কেবল ঘন ঘন পাত্‌লা মলত্যাগ করতে দেখা যায়। মৃদু লক্ষণের জন্যেই বেশীর ভাগ পিতামাতা প্রথম দিকে সন্তানের ঐ ব্যাধির উপর গুরুত্ব দেন না। ফলে শিশুর চিকিৎসা যথাসময়ে সুরু হতে পারে না। চিকিৎসা ও প্রতিষেধক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে দেরী হয়ে গেলে রোগ জটিল হয়ে দাঁড়ায়, সারতে অনেক বেশী সময় নেয় এবং সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যায়।

এই জন্যেই পিতামাতাকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। সামান্য আন্ত্রিক গোলযোগ হলেও সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখিয়ে শিশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। অল্পস্বল্প আমাশয়ের ক্ষেত্রে যথাসময়ে যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগী ভবিষ্যতে ঘন ঘন উদরাময় রোগে ভুগতে পারে। আমাশয়ের জীবাণু মানুষের দেহ আক্রমণ করে তার মুখের মধ্য দিয়ে—দূষিত খাদ্য, জল ও নোংরা হাত মারফৎ অন্ত্রে প্রবেশ করবার পর জীবাণুর বংশবৃদ্ধি হয় দ্রুতবেগে। কতকগুলি জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। মৃত জীবাণু থেকে টক্সিন নিঃসৃত হয়। রক্ত এই টক্সিন গ্রহণ করে শরীরে ছড়িয়ে দেয়। বৃহৎ অন্ত্রের নিম্নাংশে প্রদাহ ঘটবার ফলে ক্ষতের সৃষ্টিও হতে পারে।

একজন সুস্থ লোকের অন্ত্রেও আমাশয়ের জীবাণু নানাভাবে প্রবেশ করতে পারে। আক্রান্ত লোকের কাছ থেকেও ঐ রোগ পেতে পারে। আমাশয়ের রোগী তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতিসম্মত নিয়মকানুন সম্পর্কে খুব হুঁশিয়ার থাকে না বা থাকতে পারে না। ভাল করে না-ধোওয়া হাত দিয়ে খাবার, খাবারের থালা বা দরজায় হাতল প্রভৃতি ধরলে রোগী নিজের অজ্ঞাতসারে জীবাণু ছড়ায়। তার সংস্পর্শে যে সব লোক আসে, তারা যদি পরিচ্ছন্নতার নিয়মকানুন পালন না করে ও ভাল করে হাত না ধোয়, তাহলে তারা সহজেই আমাশয়ের কবলে পড়তে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ সেরে যাবার বহুদিন পরেও রোগীর অন্ত্র থেকে জীবাণু নির্গত হতে দেখা যায়। এই সব ব্যক্তি সত্যই বিপজ্জনক এবং খাদ্যদ্রব্যের দোকান, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা, শিশুদের প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি স্থানে এদের কর্মে নিযুক্ত রাখা উচিত নয়। সংক্রমণের আর একটি উৎস মাছি। মাছি বহু দূর পর্যন্ত জীবাণু বয়ে নিয়ে যেতে পারে। আমাশয়ের বাড়ী থেকে মাছি একেবারে তাড়িয়ে দিতে হবে। মাছির সংখ্যা যত কমবে, আমাশয় রোগের সম্ভাবনাও ততই হ্রাস পাবে।

রোগীর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিষপত্র ঔষধ দিয়ে ভাল করে জীবাণুমুক্ত করা দরকার। ঘর-দরজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, জঞ্জাল সাফ করে ফেলতে হবে, রোগীর মলমূত্র এমনভাবে ফেলতে হবে, যাতে মাটি ও জল দূষিত না হয়। রান্না করবার আগে ও খাওয়ার আগে এবং মলত্যাগের পরে সাবান দিয়ে হাত ভাল করে ধুয়ে ফেলা দরকার। স্তন্য দেবার সময় বা শিশুর খাবার তৈরি করবার সময় ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে নিতে হবে। শিশুর খাদ্য রাখতে হবে ঠাণ্ডা জায়গায় এবং এই খাদ্য যেন কখনো বাসি না হয়। ফল ও সব্‌জি সাবান দিয়ে ধুয়ে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জলে ভিজিয়ে তারপর খোসা ছাড়ানো প্রয়োজন। গরমে শিশুদের পেট খারাপ হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়! সুতরাং গ্রীষ্মকালে তাদের রাখতে হবে ঠাণ্ডা ঘরে, গরম কমে গেলে বাইরে ছায়ায় রাখা চলে। শিশুকে

যাতে মশা-মাছি বিরক্ত না করে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

মায়ের দুধই শিশুর প্রকৃষ্ট খাদ্য। মাতৃস্তন্য কেবল পুষ্টিকরই নয়, তা শিশুর রোগ-প্রতিরোধের শক্তিও বৃদ্ধি করে।

ঔষধপত্র ও পথ্য ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ না করে কখনো দেওয়া উচিত নয়। এই সব নিয়ম মেনে চললে আমাশয় রোগের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব।

মেদবাহুল্য

একটা সুপ্রাচীন প্রবাদ আছে—হাস্থন এবং দীর্ঘজীবী হোন। দীর্ঘজীবী হতে হলে কি শুধু হাসলেই চলে—খাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই? আধুনিকতম চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুযায়ী দীর্ঘজীবন লাভ করবার জন্যে খাওয়ার প্রয়োজন খুব বেশী নয়।

বর্তমানে চিকিৎসকেরা বিশ্বাস করেন যে, মানসিক কারণেই সাধারণতঃ মেদবাহুল্য ঘটে। অত্যধিক আহারের সঙ্গে মেদবাহুল্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একজন স্থূলকায় লোক যত চেষ্টাই করুন না কেন, খাওয়ার ইচ্ছা তিনি কিছুতেই প্রতিরোধ করতে পারেন না। কোন কারণে মনে কোন দুঃখ থাকলে কিছু লোক হয়তো খাওয়া প্রায় ছেড়েই দেন এবং তাঁদের শরীরের ওজন দ্রুত-গতিতে হ্রাস পেতে থাকে, আবার কিছু লোক আছেন খাবার দেখলে তাঁদের মনের সব দুঃখ-কষ্ট চলে যায়। ভাল ভাল আহার্য মনকে যে অনেকখানি হাল্কা করে দেয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং রাজনৈতিক বা ব্যবস্থামূলক আলোচনার সময় যে কোন রকম উপাদেয় খাদ্যের ঢালাও ব্যবস্থা করা হয়, তা একেবারে নিরর্থক নয়। তথাপি ভাল জিনিষেরও একটা সীমা থাকা উচিত।

মানসিক কারণে যে মেদবাহুল্য ঘটে, তা মস্তিষ্কের কাজ। পশ্চিম জার্মেনীর উপ্পারটালস্থিত স্নায়ু-চিকিৎসার হাসপাতালের অধ্যাপক আলেক-জাণ্ডার ষ্টার্ম বলেন যে, অত্যধিক খাওয়ার ইচ্ছাই যে মেদবাহুল্যের কারণ, এই তথ্যটি ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তবে নৈতিক শক্তির অভাব হলেই যে মানুষ মোটা হয়, তা নয়। যিনি মোটা হতে থাকেন, সকলেই তাঁকে খাওয়ার পরিমাণ অর্ধেক কমিয়ে দিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু এই সস্তা পরামর্শ কোন কাজের কথা নয়। কারণ মোটা লোকের মস্তিষ্কের কতকগুলি নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র বেঠিক হয়ে যায়। মানসিক কারণগুলি যদি নির্ণয়যোগ্য ও চিকিৎসা-যোগ্য হয়, তাহলে বল্গাবিহীন ক্ষুধাকে আবার নিয়ন্ত্রণে আনবার সম্ভাবনা থাকে।

অধ্যাপক ষ্টার্ম বলেন যে, পরীক্ষামূলকভাবে জন্তুদের মস্তিষ্কে কতকগুলি বিষয়ের সৃষ্টি করে তাদের মেদ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। মানসিক কোন অবসাদ দেখা দিলে জন্তুরা কোন কোন লোকের মত খাদ্য গ্রহণের মাত্রা না বাড়িয়ে বরং একেবারেই খেতে চায় না। অস্ত্র করে বা বৈদ্যুতিক সূচ ফুটিয়ে জন্তুর মস্তিষ্কের কয়েকটি অণুবৎ পদার্থ নষ্ট করে দিয়ে সেগুলির মধ্যে খুব বেশী আহার্য গ্রহণের ইচ্ছা জাগিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে জন্তুগুলি খেয়ে সন্তুষ্ট হওয়ার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে। ফলে এগুলির ক্ষুধা কিছুতেই কমে না এবং অনবরত খেয়ে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই দ্বিগুণ মোটা হয়ে যায়। এই অণুগুলিকে নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র বলা যায়।

তবে প্রতিনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও রয়েছে। এটা হলো খাওয়ার ইচ্ছা বা খাদ্য কেন্দ্র। এই কেন্দ্রটিকে পরীক্ষামূলকভাবে নষ্ট করে দিলে খাবার ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং ওজনও খুব তাড়া-তাড়ি কমতে থাকে।

জন্তুদের উপর যে সব পরীক্ষা চালানো হয়েছে, সেগুলি সবই মানুষের উপর পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়, তবে মানুষের মেদবাহুল্যও যে মস্তিষ্কের কোন

গোলমালের ফলেই হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মাথায় ও মস্তিষ্কে খুব বেশী কোন আঘাত লাগলে মেদবাহুল্য ঘটবার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। অধ্যাপক ষ্টার্ম বলেন যে, অন্য ধরণের মেদবাহুল্যও ঘটে থাকে; যেমন—বংশানুক্রমিক মেদবাহুল্য। তবে এই ক্ষেত্রেও বাইরের পরিবেশ তাদের উপর অনেকখানি কাজ করে এবং তারও উৎপত্তি মস্তিষ্ক থেকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, সন্তান জন্মের পর অল্পবয়স্কা নারীরা মোটা হতে থাকেন। সন্তান ধারণ ও জন্মের ফলে শরীরে যে একটা বিপুল ওলট-পালট হয়, তারই ফলে মেদবাহুল্য ঘটে এবং এর সঙ্গে মস্তিষ্কের কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি খুব বড় রকমের অস্ত্রোপচারের পরেও মেদবাহুল্য ঘটে। খুব সাঙ্ঘাতিক মানসিক চাপ, যেমন—আঘাত, মানসিক চাঞ্চল্য অথবা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সম্পর্কের উন্নতি বা অবনতিও অনেক সময় মেদবাহুল্য ঘটিয়ে থাকে। মোটা ছেলেমেয়ে অনেক সময় সম্পূর্ণভাবে "মানসিক রোগী"। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের বাইরের ছোঁয়াচ থেকে রক্ষা করবার আগ্রহাতিশয্যে অতিভোজী করে তোলেন। এর চিকিৎসাও খুব সহজ। এই রকম শিশুদের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিতে হবে এবং যথেষ্ট ব্যায়ামের ব্যবস্থা করতে হবে।

জীববিদ্যায় নতুন তথ্যের উদ্ভাবক ডাঃ ক্রিক

ভেসজবিদ্যায় সবশেষ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কেম্ব্রিজের (ইংল্যাণ্ড) ডাঃ ফ্রান্সিস ক্রিক। লণ্ডনের ডাঃ উইলকিন্স ও হার্ভার্ডের ডাঃ জেম্‌স্ ওয়াট্‌সনের সঙ্গে একত্রে যে অ্যাসিড ডি. এন এ. মৌলিক জীববিদ্যার ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে, তার ধর্ম বিষয়ক গবেষণার জন্যে তিনি এই পুরস্কার লাভ করেন।

তাঁর বয়স এখন ৪৬ বছর মাত্র এবং এই বয়সেই কেশের পকতা দেখা দিলেও তিনি সদা-প্রফুল্ল এবং প্রাণপূর্ণ। তাঁর আগ্রহ কেবল বিজ্ঞান-চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তিনি গম্ভীর সাহিত্য যেমন ভালবাসেন, তেমনই ভালবাসেন স্কোয়াশ খেলতে। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং সিগারেট ইত্যাদি সম্পর্কেও তাঁর রুচি লক্ষণীয়। তিনি অনেক সময়ে অবকাশ যাপন করেন 'শী' নিয়ে মেতে থেকে। এই সময় তার সঙ্গে থাকেন তার স্ত্রী এবং দুই কন্যা (একজনের বয়স এগারো এবং অন্য জনের আট)।

কথাবার্তার মধ্যেও তার প্রাণোচ্ছলতার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোন বিষয়ে তিনি সকলের সঙ্গে মতবিনিময় করে থাকেন এবং তাতে যথেষ্ট আনন্দ পান। তার রসবোধ প্রচুর এবং সেই জন্যে তিনি সর্বাবস্থায় হাসতে জানেন।

ক্রিক্ লণ্ডনে গিয়ে পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৯৩৭ সালে গণিত সহ পদার্থবিদ্যায় ব্যাচেলর অব সায়ান্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৩ সালে কেম্ব্রিজে "এক্স-রে ডিফ্র্যাকশন, পলিপেপটাইডস্ ও প্রোটিন্‌স্" সংক্রান্ত কাজের জন্যে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বৃটেনের নৌ-দপ্তরের চৌম্বক ও অন্যান্য মাইন সম্পর্কে একজন বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করেন। তার পর নৌ-দপ্তর ত্যাগ করে তিনি দু'বছরের জন্যে জীববিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকেন এবং ১৯৪৯ সালে কেম্ব্রিজের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিলের লেবরেটরি অব মলিকিউলার বায়োলজিতে যোগদান করেন। এখন এখানে তিনি মলিকিউলার জেনেটিক্স বিভাগের প্রধান হয়ে আছেন।

ক্রিক্ যে সব কাজের জন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অর্জন করেন, তা শেষ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার জয়ে তাঁকে সাহায্য করে। এটি সম্পন্ন হয় কেম্ব্রি-

জের একটি ক্ষুদ্র প্রি-ফ্যাব লেবরেটরিতে, যা সাধারণ্যে 'হাট' নামে পরিচিত।

ওয়াটসন আমেরিকা থেকে ১৯৫২ সালে ইংল্যাণ্ডে আসেন তাঁর সঙ্গে কাজ করবার জন্যে। এর পর ক্রিক্ যান নিউইয়র্কে এক্স-রে ক্রিস্ট্যালোগ্রাফি সম্পর্কে কাজের জন্যে। সেখানে তিনি দু'বছর কাটিয়ে আসেন ওয়াটসনের সঙ্গে নিউক্লিক অ্যাসিডের গঠন-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। এই সময় উইলকিন্স লণ্ডনে ডি. এন এ-র চাক্ষুস ও এক্স-রে বিশ্লেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, এর মলিকিউলের রূপ হেলিক্যাল-এর (স্ক্রু আকারের) মত।

এই তিনটি বিজ্ঞানীর গবেষণা সুপ্রজনবিদ্যার মৌলিক তত্ত্বের নির্দেশ দিতে পারে। এর ফলে বিজ্ঞানীদের বংশানুক্রমের ক্ষেত্রে জিন-এর রাসায়নিক ব্যাখ্যা দেবার পথ সুগম হয়েছে।

ক্রিক্ কয়েকবার আমেরিকার যান ভিজিটিং প্রোফেসর (হার্ভার্ডে দু'বার) এবং লেকচারার হিসাবে। বৃটেনের রয়েল সোসাইটি তাঁকে ১৯৫৯ সালে ফেলো নির্বাচিত করে। তিনি কেম্ব্রিজের চার্চিস কলেজ এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত সান-ডিয়েগোর ইন্সটিটিউট অব বায়োলজিরও একজন ফেলো। ফ্রান্স তাঁকে বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির প্রিক্স চার্লস মেয়ার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। এই বছর তিনি পেয়রডনার ফাউণ্ডেশন প্রাইজ লাভ করেছেন এবং আমেরিকার কলা ও বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

রক্তচাপাধিক্যের সঙ্গে কি লবণ খাওয়ার সম্পর্ক আছে?

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের লীনপুল এই সম্বন্ধে লিখেছেন—খাদ্যের সঙ্গে আমরা যে লবণ গ্রহণ করি, তার সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপের সম্পর্কটা কি রকম? অধিকাংশ বিজ্ঞানীরই ধারণা যে, রক্তচাপের আধিক্যের সঙ্গে লবণ খাওয়ার একটা সম্বন্ধ আছে। তাঁরা বহু ক্ষেত্রে দেখেছেন যে, লবণ খাওয়া কমিয়ে দিলেই রক্তের চাপও নেমে যায়। এর অর্থ কি এই যে, অতিরিক্ত লবণ খেলে রক্তের চাপ বেড়ে যায়? জন হপকিন্স হাসপাতালের তিন জন চিকিৎসক এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, লবণ খাওয়ার সঙ্গে রক্তচাপের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এই তিন জন চিকিৎসক হচ্ছেন, ডাঃ লুইস সি. লাসাগ্না, নর্মা ফেলিস এবং লিণ্ড টে ট্রেন্ট।

রক্তচাপাধিক্য রোগে যাঁরা ভুগছেন এবং যাঁদের রক্তচাপ স্বাভাবিক—এই দুই শ্রেণীর লোক নিয়ে তাঁরা এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁরা প্রথমে টেবিলের উপরে কয়েক সারি পেয়ালা সাজিয়ে রেখেছিলেন। প্রত্যেক সারিতে ছিল চারটি করে পেয়ালা। তিনটিতে ছিল পরিস্রুত জল, আর একটিতে লবণ জল বা চিনির সরবৎ।

ঐ সব রোগীকে এক একটি কাঁপের জল চেখে নিয়ে কুলকুচা করে পরেরটি চেখে দেখতে বলা হলো। প্রত্যেকটি সারির পেয়ালা শেস করবার পর রোগীকে বলা হলো, কোন্ পেয়ালাটিতে লবণজল এবং কোন্ পেয়ালাটিতে সরবৎ ছিল, তা দেখিয়ে দিতে।

মিষ্টি জল যে পেয়ালাতে ছিল, তা তারা ঠিকই দেখালো। কিন্তু গোলমাল বাঁধলো লবণ-জলের বেলায়। যারা অতিরিক্ত রক্তচাপে ভোগে, তাদের লবণাক্ত জলের স্বাদ পেতে হলে স্বাভাবিক রক্তচাপ যাদের, তাদের তুলনায় দ্বিগুণ এবং কোন কোন সময়ে ৩০ গুণ পর্যন্ত লবণ না দিলে সেই জল তাঁদের কাছে লবণাক্ত বলেই মনে হয় না।

জন হপকিন্স মেডিক্যাল স্কুলের চিকিৎসকেরা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, রক্তচাপাধিক্য রোগীর

(হাইপারটেনশন) মূত্রের সঙ্গে অধিক পরিমাণে লবণ নির্গত হয়ে থাকে বলেই তারা অধিকতর পরিমাণে লবণ গ্রহণ করে কি না, অথবা অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের ফলেই রক্তচাপ বেড়ে যায় কিনা, সে সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। অনেকের অনুমান, যে বংশে রক্ত-চাপাধিক্য (হাইপারটেনশন) রোগ রয়েছে, সেই বংশের কোন লোক অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ করলে তার হাইপারটেনশন রোগ দেখা দিতে পারে। যারা সাধারণতঃ অধিকতর পরিমাণে লবণ গ্রহণ করে, আর যারা কম পরিমাণে লবণ গ্রহণ করে—এই দুই শ্রেণীর লোকেদের তুলনা করে দেখা গেছে যে, প্রথম শ্রেণীর লোকেদের মধ্যেই হাইপারটেন-শনের রোগী অধিকতর পরিমাণে দেখা যায়।

ঐ সকল চিকিৎসক এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, যাদের এই রোগ সম্পর্কে প্রবণতা রয়েছে, তারা অল্প পরিমাণ লবণের স্বাদ পান না বলেই অধিকতর পরিমাণে লবণ গ্রহণ করে থাকেন।

এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী পর্যায় সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন যে, যে সকল পরিবারে অতিরিক্ত লবণ খেতে দেখা যায়, যাদের এই স্বাদ গ্রহণের ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না, তাদের এবং তাদের পরিবারের অন্যান্য লোকজন—বাপ-মা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা ও অন্যান্যদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং হাইপারটেনশন রোগে যারা ভোগে, যাদের স্বাদ গ্রহণের সঙ্গে অন্যান্যদের মিল রয়েছে, তাদেরও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

দ্বিতীয় শব্দ

শ্রীঅশোককুমার দত্ত

শব্দের পরিধি আমাদের শ্রবণশক্তিকে অতিক্রম করে দু'দিকে ছড়িয়ে আছে। আলোর বেলায় যেমন রামধনুর সাতটা রং-কে ছাপিয়ে অতিবেগুনী, অবলোহিত, এক্স-রে, গামা-রে প্রভৃতি বিচিত্র রশ্মির অস্তিত্ব আছে, শব্দের বেলায়ও সেরূপ—যেখানে কোন শব্দ নেই, সেই শব্দহীন স্থানেও অতিশব্দ বা আলট্রা-সাউণ্ড রয়েছে। আলট্রা-সাউণ্ড বা অতিশব্দ আমরা শুনতে পাই না, আমাদের কানে সাড়া জাগায় না। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান এই শব্দহীন শব্দকেও মানুষের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়েছে।

'দ্বিতীয় শব্দ' কিন্তু আমাদের শ্রবণাতীত এই আলট্রা-সাউণ্ড নয়। 'দ্বিতীয় শব্দ' একটি তাত্ত্বিক ধারণা। বিজ্ঞানের রাজ্যে এটি আজ বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে এসেছে। তাপের মাত্রা যখন খুব কমে যায়—এত কম যে, আমরা ঠিক কল্পনা করতে পারি না—তেমন জায়গায় এসে জিনিষের রীতি-নীতি, বিধি-ব্যবহার কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যায়। আমাদের এই পরিচিত সাধারণ জগতের সঙ্গে তার কোন মিল নেই। নতুন নিয়মে নতুন ভাবনায় এখানকার সব কিছু বুঝে নিতে হয়। এখানে এসেই একটি অভিনব 'দ্বিতীয় শব্দ'-এর প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আমরা যতটা নীচু তাপমাত্রার কথা বলছি, সে সম্বন্ধে প্রথমে একটা ধারণা করে নেওয়া যাক। তাপ হলো পরিমাণগতভাবে জিনিষের আভ্যন্তরীণ অস্থিরতার লক্ষণ। যে জিনিষের পরমাণু যত চঞ্চল, তাপের মাত্রাও সে অনুপাতে বেশী। এই হিসাবে এমন এক অবস্থা নিশ্চয় থাকতে পারে, যেখানে এসে পরমাণুগুলি পুরাপুরি স্থির হয়ে যাবে। যে তাপমাত্রায় এভাবে ঠাণ্ডায় জমে যায় তা হলো

কেলভিনের হিসাবে তাপমাত্রার শূন্য ডিগ্রী (চরম বা অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার)।

কেলভিনের শূন্য ডিগ্রী নীচু তাপমাত্রায় প্রকৃতির শেষ সীমা, কোন জিনিসের তাপমাত্রাই এর নীচে নামানো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি এই কথাতেই সায় দেয়। নীচু তাপমাত্রার প্রভাবে আমাদের পরিচিত সাধারণ গ্যাসগুলি ঘন হয়ে তরল জিনিসে পরিণত হয়। এভাবে ১৯১১ সালে তাপমাত্রা যখন প্রায় ৪ ডিগ্রী চরমে নামিয়ে হিলিয়ামকে তরল করা হলো, তখন দেখা গেল—সেখানে যেন আলাদা এক জগতের নিয়ম উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। নীচু তাপমাত্রার প্রভাবে পড়ে জিনিসের গুণাগুণ অন্যভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রথমে তার খোঁজ পাওয়া গেল হিলিয়ামকে ফোটাতে গিয়ে। তরল জিনিস যে ফোটে, তা নির্ভর করে তাপমাত্রা ছাড়াও তার উপরকার চাপের উপর। ঠাণ্ডা করেও তাই জলকে ফোটানো সম্ভব, যদি চাপও সে অনুপাতে কমিয়ে আনা যায়। এভাবে চাপ ও তাপমাত্রা একসঙ্গে কমিয়ে হিলিয়ামকে ফুটিয়ে দেখা হচ্ছিল। ২.১৯ ডিগ্রী কেলভিনে এসে হিলিয়াম সহসা একেবারে স্থির হয়ে গেল। স্ফুটন মানে তরল জিনিসের সমস্ত স্তর থেকে বুদ্‌বুদের আকারে বাষ্প বেরিয়ে আসে। ২.১৯ ডিগ্রীতে বুদ্‌-বুদের এই বিক্ষোভ বন্ধ হয়ে যায়। বুদ্‌বুদ উৎপত্তির জন্যে তরল জিনিসটির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তাপমাত্রার একটা পার্থক্য থাকা দরকার। এই পার্থক্য যতই কম হোক না কেন, ২.১৯ ডিগ্রীর এই বিশেষ তাপমাত্রায় এই পার্থক্য আর বজায় থাকছে না—তরল হিলিয়ামের তাপ পরিবহন ক্ষমতা তখন লক্ষ লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। আর এক বিচিত্র ব্যাপার 'রোলিন ফিল্ম'। ১৯৩৬ সালে বিজ্ঞানী রোলিন তরল হিলিয়ামের এক সূক্ষ্ম স্তর বা ফিল্মের খোঁজ পেলেন। একটি পাত্রে হিলিয়াম রাখা হয়েছিল। খানিক পরে দেখা গেল পাত্রের তলদেশেও তা ছড়িয়ে পড়েছে, ভাঙা বা টুটাফাটা নেই, আসলে হিলিয়ামের একটি সূক্ষ্ম অংশ জীবন্ত জিনিসের মতই যেন পাত্রের গা বেয়ে নেমে আসে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম নলের মধ্য দিয়েও তা বয়ে চলে। তারপর সেই দর্শনীয় ক্ষমতা—সামান্য আলোর স্পর্শে হিলিয়াম কি ভাবে ফোয়ারার আকারে উৎ-ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। পাত্রে খানিকটা তরল হিলিয়াম আছে, তাতে একটা সূক্ষ্ম নল ডোবানো। পাত্রটির গায়ে এবার আলো ফেলা হলো। আলোর এই সামান্য উত্তাপে তরল হিলিয়াম এখন অত্যন্ত চঞ্চল, সরু নলটির পথে পিচ্‌কিরির ধারায় বইতে সুরু করলো। অনেক সময় তাকে ত্রিশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত উঠতে দেখা যায়। নীচু তাপমাত্রায় এসে হিলিয়ামের এই যে ব্যবহার, সাধারণ পরিচিত নিয়মে তা সম্ভব হয় না। জিনিসের এক ভিন্ন প্রকৃতি এখানে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

এসব ঘটনার আলোকে লণ্ডন এবং টিজা ১৯৩৪ সালে তরল হিলিয়ামের এক অভিনব তত্ত্ব প্রকাশ করেন। হিলিয়ামের মধ্যে সাধারণ পদার্থের অতীত এক বিশেষ বা অতিপদার্থ মেশানো রয়েছে। মেশানো বললে অবশ্য ভুল হয়, হিলিয়ামের কিছু কিছু পরমাণু যেন অত্যন্ত নীচু তাপমাত্রায় এসে ভিন্ন রকম আচরণ করে। এই ভিন্নধর্মী পরমাণুগুলির সাহায্যে তরল হিলিয়ামের অভিনব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা সহজ হয়। কিন্তু জিনিসের মধ্যে একটা অতিপদার্থ এসে হাজির হবে, এ যেন কেমন কথা! তবে মৌলিক তত্ত্বের ধারণায় তার সমর্থনও মেলে। বোস পরিসংখ্যান থেকেই তা বেরিয়ে আসছে। প্রথমে সেই মূল বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আদর্শ গ্যাসের যে নিয়ম ব্যক্ত করেছেন, আইনষ্টাইন তাথেকে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এতে বলা হয়েছে, কোন জিনিসের ঘনত্বই একটি বিশেষ মানকে অতিক্রম করতে পারে না। অবস্থাগুণে নির্দিষ্ট

আয়তনের ভিতরে যদি অধিক পরিমাণ জিনিস এসে পড়ে, তবে ঐ বাড়্তি জিনিসটুকুর জন্যে ঘনত্বের কোন অদল-বদল হয় না, বাড়্তি কোন চাপ বা আয়তন ছাড়াই তা বিচিত্র এক অবস্থায় বিচরণ করবে (বোস-আইনষ্টাইন কনডেনশেসন)। হিলিয়ামের ক্ষেত্রে তার অতিপদার্থটিই হচ্ছে এই বিশেষ অবস্থা। কিন্তু সে সত্ত্বেও লণ্ডনের এই তত্ত্ব সব ক্ষেত্রে সমান কার্যকরী নয়, মাঝে মাঝে যেন কয়েকটি গিট্ বাঁধা আছে। বোস-আইনষ্টাইনের সূত্রে নতুন কোন তাৎপর্যের খোঁজ পাওয়া যায় কি না, পৃথিবীর বিজ্ঞানী সমাজ তা চিন্তা করে দেখেছেন।

অবস্থা যখন এভাবে একটা অমীমাংসিত পর্যায়ে রয়েছে, তখন এক বিচিত্র শব্দ-প্রকৃতির আভাসে তরল হিলিয়াম "ঘোলা" হয়ে উঠলো। টিজা বিষয়টি প্রথমে উত্থাপন করলেন। হিলিয়ামের ছুটি উপাদান আমরা বিশেষভাবে স্পন্দিত করতে চাই। ছুটি শব্দযন্ত্র তরল হিলিয়ামে বসিয়ে

অধ্যাপক ল্যাণ্ডাউ।

রাখা হলো। আমরা জানি, শব্দ এক ধরণের স্পন্দন—স্প্রীংয়ের দোলার মত তা জল, বাতাস বা যে কোন কিছুকে আশ্রয় করে আলোড়িত হয়। এর নাম শব্দ-তরঙ্গ। কল্পনা করা যাক, তরল হিলিয়ামের মধ্যে শব্দের এই তরঙ্গ যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দুটি শব্দযন্ত্র যদি পরস্পর বিপরীতভাবে বেজে ওঠে, তবেই এটা সম্ভব। স্প্রীংকে দু-দিক থেকে টানলে এই অবস্থা। শব্দের তখন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব, সমুদ্রের ঢেউ যেন জমাট বেঁধে পাহাড় হয়ে রয়েছে। হিলিয়ামের দুই ধরণের পরমাণু তখন আলাদা-আলাদাভাবে অবস্থান করে। কোথাও অতি-পদার্থের বিশেষ পরমাণুগুলির ঘন সন্নিবেশ, কোথাও বা সাধারণ পরমাণুর সমাহার। পরমাণুর এই বিশেষ সজ্জা হিলিয়ামের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে তাপ-মাত্রার একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে। যেখানে সাধারণ পরমাণু, তাপমাত্রা সেখানে অধিক; আর পরমাণুর বিশেষ উপাদানগুলিতে তাপমাত্রা কিছু কম। শব্দের প্রভাবে পরিবাহী পদার্থে ঘনত্বের পরিবর্তন দেখা দেয়। এখানে তার বদলে আসছে তাপ-মাত্রার পার্থক্য। শব্দের সঙ্গে মিল থাকলেও তা এভাবে শব্দ নয়, সাধারণ শব্দের তুলনায় কিছু তফাৎ। এটি হলো দ্বিতীয় শব্দ। তাছাড়াও রয়েছে তৃতীয়—এমন কি, চতুর্থ পর্যায়ের শব্দ। মূল ধারণাটি এনেছিলেন টিজা, তবে ল্যাণ্ডাউ তার পরিপূরণ করেন। এই দ্বিতীয় শব্দের গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে তরল হিলিয়ামের রহস্য উদ্ভেদে যেন বাধা পড়লো। ল্যাণ্ডাউয়ের তত্ত্ব তাই নতুন গুরুত্ব নিয়ে উপস্থিত হলো। দ্বিতীয় শব্দের এই আকর্ষণীয় দিকটি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলবার চেষ্টা করবো।

ল্যাণ্ডাউ তাঁর তত্ত্ব বিচারে এই কথা প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে, হিলিয়ামের পরমাণু বোসের নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হবে না। তাঁর মতে, খুব নীচু তাপমাত্রায় পরমাণুগুলি দু-ভাবে বিচরণ করে। তাপমাত্রা যখন এক ডিগ্রী কি তারও কম হয়, তখন বিশেষ যে পরমাণুগুলি ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হয়, সেগুলিকে তিনি বললেন ফোনন তরল হিলিয়ামের পটভূমিকায় ফোননগুলি যেন গ্যাসের কণার মতই বিচরণ করে। তাপমাত্রা আর একটু বাড়লে রোনন এসে দেখা দেয়। এই রোনন আর এক জাতের পরমাণু। ক্রমে সমস্ত ফোননই এভাবে রোনন-এ পরিণত হবে। অত্যন্ত জটিল নিয়মে ফোনন আর রোনন কাজ করে। হিলিয়ামের দ্বিতীয় শব্দ-তরঙ্গের গতি ব্যাখ্যায় ল্যাণ্ডাউয়ের এই অভিনব তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য ফল দেখিয়েছে। তাপমাত্রায় প্রভাবে দ্বিতীয় শব্দের গতি পরিবর্তিত হয়। টিজা এবং ল্যাণ্ডাউ দু-জনেই তার সূত্র নির্দেশ করেছেন। দেখা গেল—এক ডিগ্রী কেলভিন পর্যন্ত উভয় মতেই মোটামুটি মিল আছে। কিন্তু তার নীচু তাপমাত্রায় এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। টিজা যেখানে বলছেন শূন্য ডিগ্রী তাপমাত্রায় শব্দের গতি স্তব্ধ হয়ে পড়বে, ল্যাণ্ডাউয়ের মতে সেখানে গতি সাধারণ শব্দের গতির উপর নির্ভর করে পুনরায় বেড়ে যাবার কথা। ৩টি পৃথক তত্ত্ব একে অপরকে অস্বীকার করে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছে। এদের মধ্যে কোন্‌টি যে ঠিক, সে প্রশ্নটি ক্রমে বেশ জোরালো হয়ে উঠলো। অবশেষে ওসবর্ণ ০·১ ডিগ্রী কেলভিনে পরীক্ষা করে দেখলেন শব্দের গতি ল্যাণ্ডাউয়ের ধারণার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এর ফলেই যে টিজার মতটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে, তা নয়। টিজার ভিত্তি বোস-আইনষ্টাইন সমীকরণ। এই সমীকরণ অবশ্য গ্যাসের পক্ষেই খাটে। তবে হিলিয়াম তরল অবস্থাতেও কিছুটা গ্যাসের ধর্ম বজায় রাখে—তা যেন মূলতঃ ঐ নিয়মই মেনে চলতে চায়।

সম্প্রতি এই ধারণায় যেন কিছুটা চির খেয়েছে। পরমাণুর কণা নিউট্রন ছুঁড়ে দেখা গেছে—সাধারণ অবস্থায় যা হয় না, পরমাণুর এই ছোট ছোট 'ঢিল'-গুলি তরল হিলিয়ামের মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে। তবে কি ল্যাণ্ডাউয়ের ধারণাই ঠিক?

ফোনন-রোনন-এর গায়ে ধাক্কা লেগে নিউট্রন বিক্ষিপ্ত হচ্ছে—এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানী ল্যাণ্ডাউকে এই বছর নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করা হয়েছে।

নীচু তাপমাত্রায় প্রকৃতির এক আশ্চর্য প্রকাশ ঘটে। বহুরূপী যেমন রূপ বদ্‌লায়—গ্যাসও তেমনি রূপ বদ্‌লে ক্রমে তরল বা কঠিন হবে, এতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু হিলিয়াম তরল হচ্ছে তাপমাত্রা শূন্যের কাছাকাছি নেমে গেলে। তাই এরূপ আশ্চর্য ব্যবহার বিজ্ঞানের রাজ্যে বিচিত্র আবর্তন তুলছে। হিলিয়ামের দ্বিতীয় শব্দটি, যার রহস্যময় তার জন্যে এতদিন বিজ্ঞানী সমাজ দিশেহারা হয়েছিলেন, নতুন এক আলোকে তাঁরা আজ দিক খুঁজে পেয়েছেন। তরল চঞ্চল এই হিলিয়াম আমাদের পরিচিত নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আপনার ক্ষেত্র প্রসারিত করে নিয়েছে।

জীবজগতে সহাবস্থান

রমেন দেবনাথ

প্রয়োজনের খাতিরে মানুষ বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরণের সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে থাকে এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে সেই নীতিও পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু জীবজগতে কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে এমন কিছু কিছু সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেগুলি তাদের বংশগত বৈশিষ্ট্য। এরূপ সহাবস্থান (Symbiosis) এবং সহ-ভোজনের (Commenselism) কথাই বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয়।

মিথোজীবিতা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে দুটি জীব পরস্পরের উপকারার্থে একত্রে বাস করে (Association of organisms for mutual benefit)। জীব দুটিকে মিথোজীবী (Symbiont) বলা হয়। এই প্রক্রিয়া সহাবস্থানের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে দুটি জীব একত্রে বাস করে এবং একটির কাছ থেকে উপকার পেয়ে অপরটিও প্রত্যুপকার করতে ভোলে না। একটি জীব খাদ্য দিয়ে উপকার করলে আর একটি জীব তাকে আশ্রয় দিয়ে উপকার করে; আবার অনেক সময় দুটি জীবই পরস্পরকে খাদ্য দিয়ে সাহায্য করে। পরজীবীদের (Parasites) মত মিথোজীবীরা মোটেই স্বার্থপর নয়। পরজীবীরাও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে একত্র বাস করে এবং তাদের কাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে; কিন্তু প্রতিদানে এরা শুধু অনিষ্ট সাধনই করে থাকে।

মিথোজীবিতাকে দু-ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) উদ্ভিদ-জগতে মিথোজীবিতা।

(২) প্রাণী-জগতে মিথোজীবিতা।

কতকগুলি উদাহরণ দিলে মিথোজীবিতা প্রক্রিয়ায় সহাবস্থানের বিষয়টি ভাল করে বোঝা যাবে।

উদ্ভিদ-জগতে মিথোজীবিতা—

(ক) লাইকেন উদ্ভিদ-জগতের এক বিস্ময়। দুইটি ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের সংমিশ্রণে তার সৃষ্টি। ছত্রাক এবং শ্যাওলা এই দুটি ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ একত্রে মিলিত হয়ে (১ম চিত্র, ক, খ) তাদের স্বকীয় সত্তা হারিয়ে ফেলে জন্ম দেয় এই নতুন উদ্ভিদ লাইকেনের। পুরনো দালানের ছাদে, দেয়ালে এবং বড় বড় গাছে লাইকেন প্রায়ই দেখা যায়। এরা অর্ধেক শ্যাওলা এবং অর্ধেক ছত্রাক। মিথোজীবিতা এখানে পরিপূর্ণভাবে

প্রকাশিত। ছত্রাক এবং শ্যাওলা, এই দুটি মিথোজীবী উদ্ভিদ একত্রে বাস করে এবং ছত্রাকের সূত্রাণু শ্যাওলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। এই দুটি উদ্ভিদ এমনভাবে মিশে যায় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে এদের অস্তিত্ব বুঝা যায় না। এই সহাবস্থানের ফলে দুটি উদ্ভিদই উপকৃত হয়। ছত্রাক নিজের খাদ্য নিজে তৈরী করতে পারে না; কারণ গাছের সবুজ পদার্থ—পত্রহরিৎ (Chlorophyll) তার নেই এবং সে জন্যে অঙ্গার-আত্তীকরণ (Carbon-assimilation; Photosynthesis) প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে না। সুতরাং খাদ্যের জন্যে এরা শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে এবং প্রতিদানে শ্যাওলা ছত্রাক থেকে জল গ্রহণ
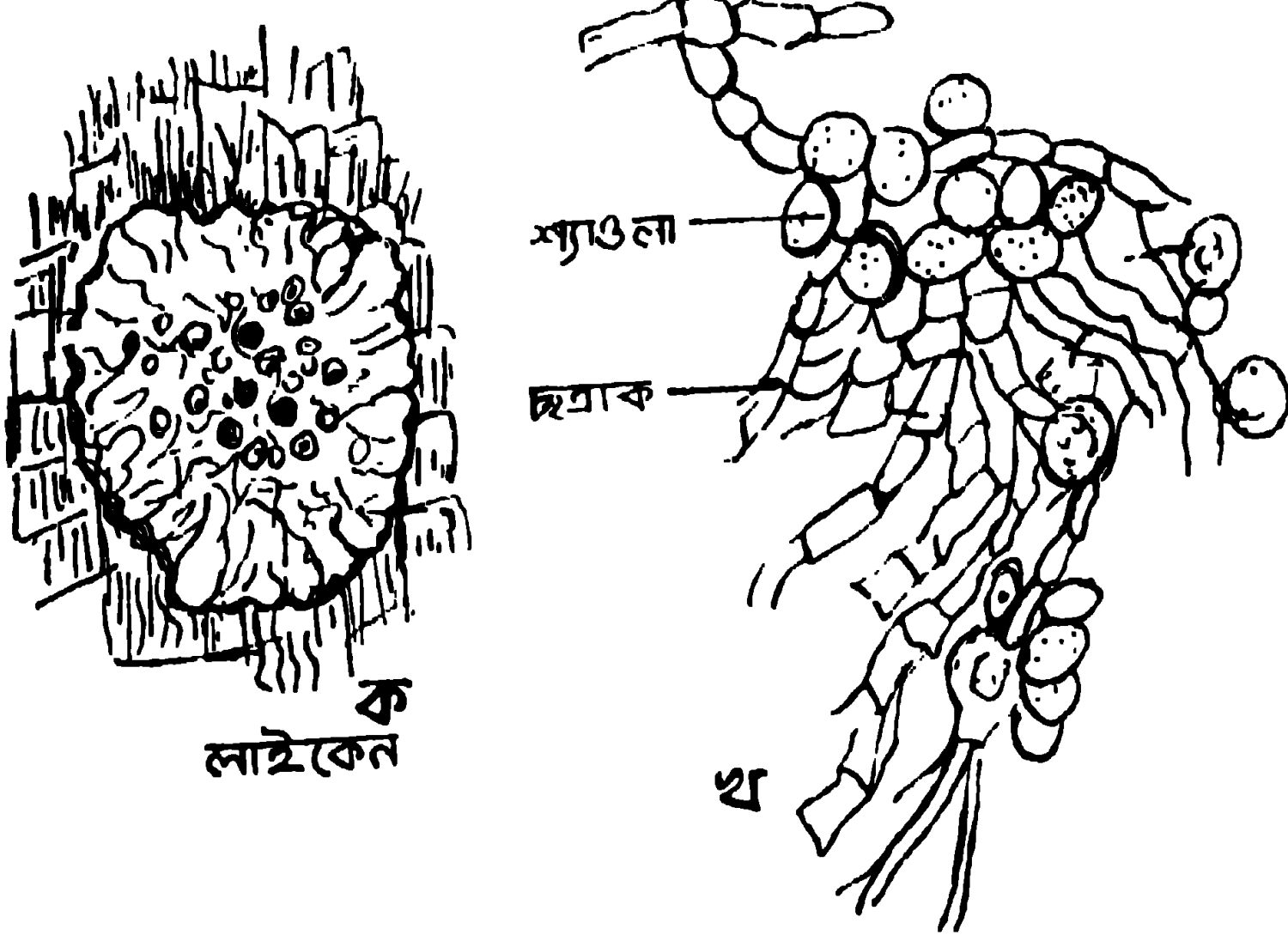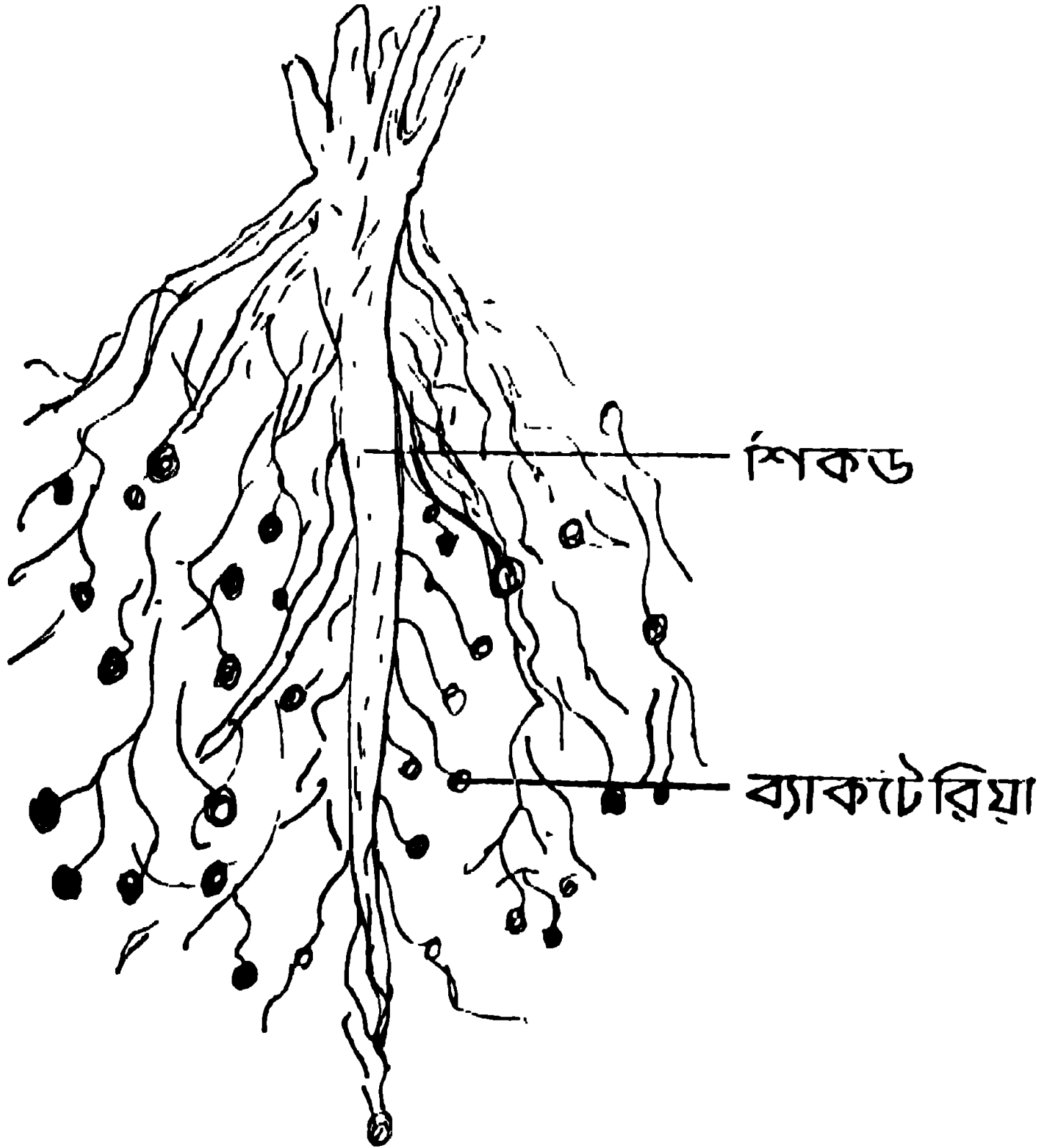
১নং চিত্র। শ্যাওলা ও ছত্রাকের সহাবস্থান।

২নং চিত্র। গাছের শিকড়ে ব্যাক্টিরিয়ার বাস।

করে আর ছত্রাকের শিকড়ের সাহায্যে সুরক্ষিত থাকে।

(খ) ছোলা, মটর জাতীয় কতকগুলি গাছের (Leguminous plant) শিকড়ে একপ্রকার ব্যাক্টিরিয়া বাস করে। এটিও একটি মিথোজীবিতার উদাহরণ। এই সহাবস্থানের ফলে ব্যাক্টিরিয়া এবং ছোলা, মটর গাছ সকলেই উপকৃত হয়। এই গাছগুলি মাটি থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে পারে না। তাদের শিকড়ে যে অসংখ্য ব্যাক্টিরিয়া থাকে (২য় চিত্র), তারাই মাটি থেকে গাছকে নাইট্রোজেন এনে দেয় এবং প্রতিদানে গাছগুলি ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে খাদ্য দান করে—কারণ তারা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরী করতে পারে না।

হাইড্রার কোষ

জুক্লোরেলা

৩নং চিত্র। হাইড্রা ও জুক্লোরেলার সহাবস্থান।

প্রাণিজগতে মিথোজীবিতা—প্রাণী-রাজ্যে বিচরণ করলে এই সহাবস্থানের উদাহরণ আরো বেশী পাওয়া যাবে। নিম্নে কতকগুলির বিবরণ দেওয়া হলো।

(ক) হাইড্রা ও শ্যাওলা—হাইড্রা একনালীদেহীর (Coelenterata) অন্তর্গত এক রকম প্রাণী। এই প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে জুক্লোরেলা নামক শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ (৩য় চিত্র) বাস করে। এই সহাবস্থানের ফলে দুটি জীবই উপকৃত হয়। উদ্ভিদদের আলোক-সংশ্লেষণের ফলে যে অক্সিজেনের উদ্ভব হয়, হাইড্রা তা গ্রহণ করে, আবার হাইড্রার শ্বসন-প্রক্রিয়ার ফলে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত হয়, উদ্ভিদ তা গ্রহণ করে।

আলোক-সংশ্লেষণ

$$6CO_2 + 6H_2O = 6C_6H_{12}O_6 + 6O_2$$

শ্বসন প্রক্রিয়া

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 = 6H_2O + Energy + 6CO_2$$
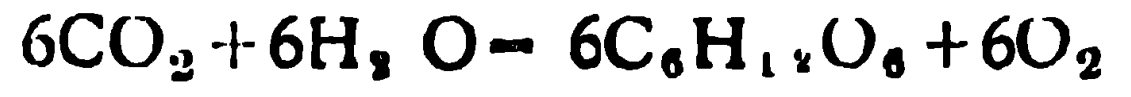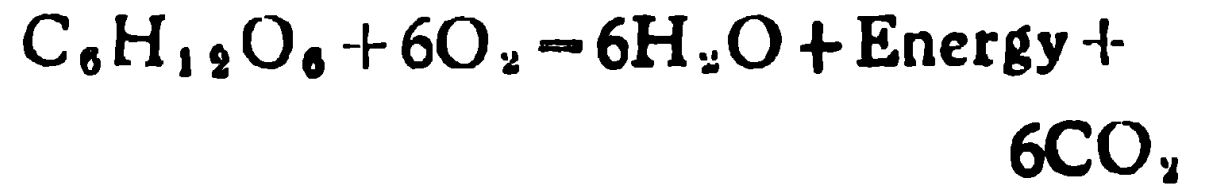
(খ) উইপোকা ও এককোষী প্রাণী—উইপোকার শরীরে একপ্রকার এককোষী মিথোজীবী প্রাণী (Flagellata) বাস করে। বই, কাপড়চোপড় এবং কাঠের আসবাবপত্র সব কিছু উইপোকা খেয়ে ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু ঐসব জিনিষে সেলুলোজ জাতীয় যে রাসায়নিক পদার্থ থাকে, তা উইপোকা হজম করতে পারে না এবং সে জন্যে সে নির্ভর করে তার দেহস্থিত এককোষী প্রাণীর উপর। এককোষী প্রাণীরা সেলুলোজ জাতীয় পদার্থকে হজম করে বাকী খাদ্যকে উইপোকার হজমোপযোগী করে দেয়। মিথোজীবিতার ফলে এই ভাবে দুটি প্রাণী পরস্পর উপকৃত হয়।

(গ) পিপীলিকা ও অ্যাফিড জাতীয় পোকা—পিপীলিকা সামাজিক প্রাণী; সামাজিকতার উদাহরণ তাদের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে পরিস্ফুট। পিপীলিকাদের কলোনীতে অ্যাফিড নামক একজাতীয় মিথোজীবী

পোকা বাস করে। অ্যাফিডের শরীর থেকে এক প্রকার রস নির্গত হয়। পিপীলিকার কাছে এই রস অতি প্রিয়। তাই এই রস খাওয়ার জন্যে পিপীলিকা খুঁজেপেতে অ্যাফিড ধরে আনে (৪র্থ চিত্র) এবং দুগ্ধবতী গাভীর মত এই অ্যাফিডকে অতি যত্নে তাদের কলোনীর আশেপাশে পালন করে। পিপীলিকা অ্যাফিডকে তৈরী খাবার দান করে আর অ্যাফিড প্রতিদানে পিপীলিকাকে রস দান করে। সে জন্যে অ্যাফিডকে পিপীলিকার গাভী বলা হয়।

একে অন্যের কোন ক্ষতি করে না। উইপোকা ও পিপীলিকার কলোনীতেও তাদের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণী বাস করে। একে শান্তিপূর্ব সহাবস্থান বলা যেতে পারে।

কমেনসেলিজমের সাধারণ উদাহরণ হলো—সাগর-কুসুম (Sea Anemone); হাইড্রা জাতীয় প্রাণী) এবং সন্ন্যাসী কাকড়া (Hermit Crab)। এই কাকড়া মরা শামুকের খোলের ভিতর বাস করে এবং সাগর-কুসুম শামুকের খোলের উপরে আশ্রয় নেয় (৫ম চিত্র)।

৪নং চিত্র। পিঁপড়ে ও অ্যাফিডের সহাবস্থান।

মিথোজীবিতার বিবরণ এই পর্যন্ত রেখে কমেনসেলিজম বা সহভোজনের কথা কিছু আলোচনা করা যাক। কমেনসেলিজমের অর্থ হলো এক টেবিলে বসে খাওয়া। এখানে দুই বা ততোধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী একত্রে বাস করে এবং পারস্পরিকভাবে উপকৃত হয়। অনেক সময় শুধু একটি প্রাণীই উপকৃত হয়, কিন্তু তাই বলে অন্যের কোন ক্ষতি হয় না।

স্পঞ্জের সঙ্গে এক সঙ্গে অসংখ্য প্রাণী বাস করে। ১২টি স্পঞ্জের পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে, তাদের সঙ্গে ৬৮৩টি বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী আছে। তারা একই সঙ্গে বাস করে অথচ

এই সহাবস্থানের ফলে সাগর-কুসুম কাকড়ার খোলের উপর চড়ে চলাফেরার কাজ করে এবং কাঁকড়ার বর্জিত খাদ্য খেয়ে জীবনধারণ করে। প্রতিদানে সাগর-কুসুম তার বিষাক্ত হুল-ফুটানো (Stinging cell) কোষের সাহায্যে এবং ফুলের মত প্রস্ফুটিত দেহ দিয়ে কাঁকড়াকে আড়াল করে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। কমেনসেলিজমের এই উদাহরণকে মিশর দেশে সহাবস্থান এবং সহযোগিতার প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হতো।

কমেনসেলিজমের আরো একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। রোমোরা নামক একজাতীয় মাছ আছে। এরা হাঙর বা অন্যান্য বড় মাছের কান্‌কো

বা অন্যান্য জায়গায় লেগে থাকে এবং এই অবস্থাতেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নীত হয়। অন্যান্য মাছের গায়ে লেগে থাকবার জন্যে রেমোরার শোষক যন্ত্র (Sucker) আছে। এই অবস্থার ফলে যদিও রেমোরাই শুধু উপকৃত হয় (চলাফেরা এবং খাদ্য সংগ্রহে), তাই বলে যে মাছের গায়ে লেগে থাকে, সে তাকে (রেমোরাকে) তার শরীর থেকে ছাড়িয়ে দেয় না।

৫নং চিত্র। কাঁকড়া ও সাগর কুসুমের (সী-অ্যানিমন) সহাবস্থান।

সহযোগিতা এবং সহাবস্থানের আরো প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায় কীটপতঙ্গ এবং ফুলের মধ্যে। মৌমাছি, প্রজাপতি, পিঁপড়ে ইত্যাদি পতঙ্গ ফুলের মধু আহরণের জন্যে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায় আর প্রতিদানে ফুলের পরাগসংযোগের সহায়তা করে। এই সহযোগিতার জন্যেই উদ্ভিদ-জগৎ বেঁচে আছে।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি, সহযোগিতা এবং
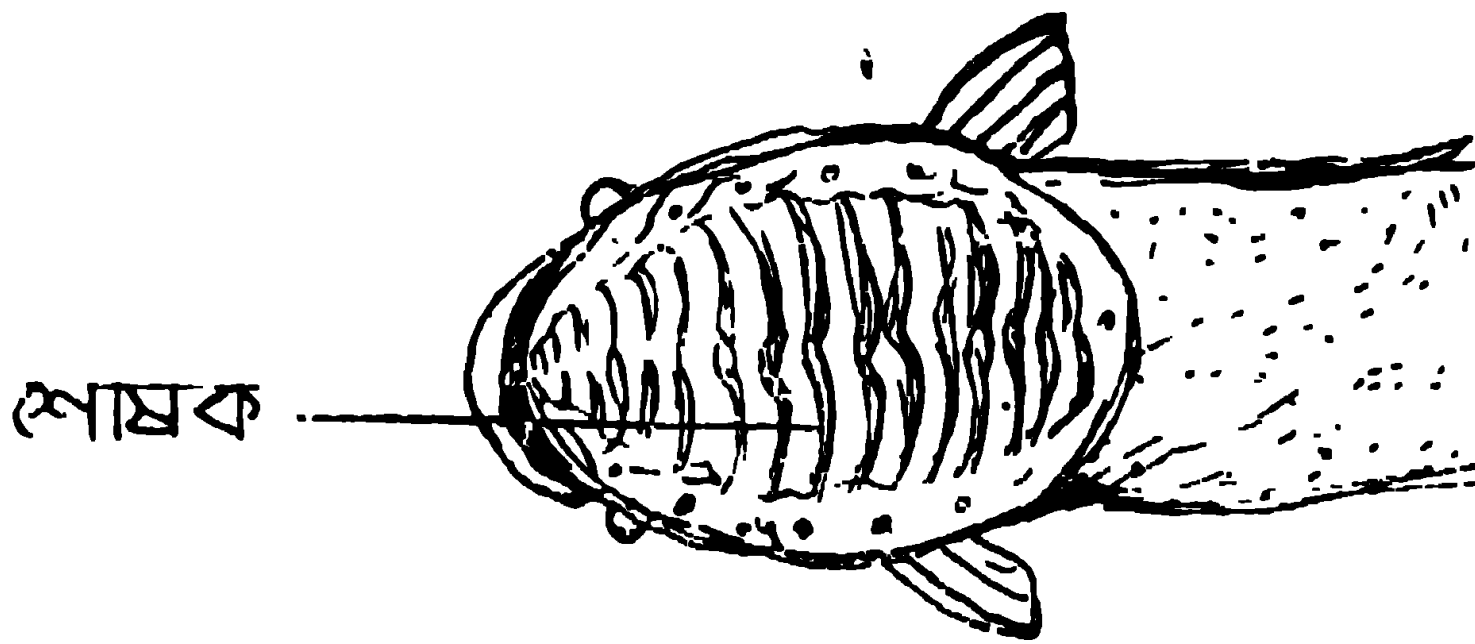
৬নং চিত্র। রেমোরা।

উপরে বর্ণিত মিথোজীবিতা এবং কমেন-সেলিজম প্রক্রিয়ার উদাহরণ ছাড়াও জীবজগতে সহাবস্থান মনুষ্যেতর জীবজগতেই প্রকৃষ্ট রূপে পরিস্ফুট।

ভাষার কথা

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

সভ্যজগতের পক্ষে ভাষার প্রয়োজন কতখানি, সে কথা বলাই বাহুল্য। মানুষের পক্ষে ভাষার গুরুত্ব অন্নবস্ত্রের ঠিক পরেই। ভাষাসৃষ্টি সম্ভব না হলে মানুষের পক্ষে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে জীবনযাপন করাই দুরূহ হতো। সেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য, কান্ট-হেগেলের দর্শন, টলষ্টয়ের উপন্যাস কিছুই সম্ভব হতো না। ভাষার অভাবে বিজ্ঞান, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতির অভাবনীয় উন্নতি এবং বিস্তারও সাধিত হতো না।

মানুষের সঙ্গে পশুপক্ষীর প্রধান পার্থক্য এই যে, পশুপক্ষীর ভাষা নেই। অনেকে পশুপক্ষীর শব্দকে ভাষা মনে করেন, এ-সম্বন্ধে এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। তবে একথা নিশ্চিত যে, মানুষের ভাষার অনুরূপ কোন ভাষা পশুপক্ষীদের মধ্যে নেই।

বর্তমান যুগে ভাষা ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম হলেও আমরা অনেক সময় ভাষার সাহায্য ছাড়াও ভাব প্রকাশ করে থাকি। যেমন—মোটর গাড়ীর গতি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্যে অনেক সময় বিভিন্ন আকারের সাইনবোর্ড ব্যবহৃত হয়; রাস্তায় পুলিস লাল ও সবুজ আলোর সাহায্যে অথবা হাত দেখিয়ে যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। হেলিওগ্রাফ নামক যন্ত্রের সাহায্যে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় খবর পাঠানো যায়। এগুলি ভাষা না হলেও ভাষার কাজ অর্থাৎ অর্থবহন করে। পৃথিবীর অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে এখনও আভাস-ইঙ্গিতের দ্বারা ভাবপ্রকাশের রীতি প্রচলিত আছে। ক্যানারি দ্বীপের একজাতীয় আদিবাসী শিস দেওয়ার মত শব্দ করে কথাবার্তার কাজ চালায়। একই উদ্দেশ্যে প্রাচীন চীন ও পেরুর ইঙ্কা জাতীয় লোকদের মধ্যে গিঁট দেওয়া দড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন ভাষাভাষী অনেক উপজাতি হাতের ইশারায় মনের ভাব ব্যক্ত করে।

ভাষার উৎপত্তি হলো কি করে, সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। প্রাচীন হিন্দুদের ধারণা ছিল যে, সংস্কৃত ভাষা ঈশ্বরের সৃষ্টি। এমন কি, সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন সুইডিস ভাষাবিদ্ মত প্রকাশ করেন যে, ইডেন উদ্যানে ঈশ্বর সুইডিস ভাষায়, আদম ড্যানিশ ভাষায় এবং সাপ ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতো। কিছুকাল পূর্বে তুর্কী ভাষাবিদ্‌রা মনে করতেন যে, তুর্কী ভাষা থেকেই সমস্ত ভাষার উদ্ভব। ভাষা-বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এসব ভ্রান্ত ধারণা লোপ পেয়েছে। এখন এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কি বলেন, দেখা যাক।

ডারউইনের মতে, ভাষা সৃষ্টির আগে মানুষ ইশারায় মনের ভাব প্রকাশ করতো। শব্দের সাহায্যে এই ইশারাগুলিকে অনুকরণ করবার চেষ্টাতেই ভাষার উদ্ভব হয়। অনেক ভাষাবিদ্ ডারউইনের মত সমর্থন করেন। আবার অনেকের মতে, প্রাকৃতিক শব্দের অনুকরণ থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়। কুকুর, বিড়াল ও অন্যান্য পশুপক্ষীদের ডাক, সমুদ্রের গর্জন, ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দ ও আরও যে সব বিচিত্র শব্দ প্রতিদিন শুনতে পাওয়া যায়, তাথেকে মানুষ ঐ সব জিনিষের নামকরণ করতো। ক্রমশঃ এথেকেই ভাষার উৎপত্তি হয়। এই মত অনেকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, মানুষ প্রথমে নানারকম শব্দ করে আনন্দ, দুঃখ, ভয়

ইত্যাদি প্রকাশ করতো। এথেকে পরে ভাষার উৎপত্তি হয়।

ভাষার দুটি রূপ—কথ্য আর লেখ্য। কথ্য-ভাষার আবির্ভাবের কয়েক লক্ষ বছর পরে লিখিত ভাষার প্রচলন হয়। সর্বপ্রথম যে লিখিত ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়, সে হচ্ছে সুমেরীয় ভাষায় লেখা। সুমেরীয় ভাষা খৃঃপূঃ ৪০০০—৩০০ বছর পর্যন্ত মেসোপটেমিয়ায় প্রচলিত ছিল। লিখনরীতি আবিষ্কারের পূর্বে ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করা হতো। ক্রমশঃ দুই বা ততোধিক চিত্র সংযোগে একটি ভাব প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন—সূর্য ও গাছ মিলিয়ে হলো পূর্বদিক; সূর্য আর চাঁদ এক সঙ্গে এঁকে বোঝানো হলো আলো—ইত্যাদি। প্রাচীন মিশর ও আসিরিয়ায় চিত্রলিপি প্রচলিত ছিল। চীনাদের লিখনপদ্ধতি একপ্রকার চিত্রলিপি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু কালক্রমে চিত্রলিপিতে নানাপ্রকার অসুবিধা দেখা দিতে লাগলো। তখন বিভিন্ন শব্দের পরিবর্তে নানারকম চিহ্নের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই ভাবে বর্ণমালার উদ্ভব হয়। ফিনিশীয় ও হিব্রুরাই বর্ণমালার আবিষ্কর্তা। চিত্রলিপি থেকেই যে অক্ষরের জন্ম হয়, তার প্রমাণ বর্ণমালা কথাটির ইংরেজী শব্দ Alphabet। Alphabet এসেছে সেমিটিক ভাষার দুটি কথা Aleph ও Beth থেকে। Aleph কথাটির অর্থ ষাঁড়, আর beth মানে ঘর। যে অক্ষর দুটি থেকে A ও B-এর উদ্ভব হয়, সে দুটি দেখতে ছিল ষাঁড় ও ঘরের মত। ফিনিশীয়দের মধ্য থেকে লিখনরীতি গ্রীকদের মধ্যে প্রচলিত হয় এবং তাদের মধ্য থেকে পৃথিবীর অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন সেমিটিক বর্ণমালা থেকেই সংস্কৃত দেবনাগরী লিপির জন্ম হয় এবং তাথেকেই উত্তর ভারতের অন্যান্য বর্ণমালার উদ্ভব হয়।

পৃথিবীতে ভাষার বৈচিত্র্য যেমন, তাদের গঠন-রীতির বৈচিত্র্যও তেমনি কম নয়। আমরা পড়বার সময় বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে পড়ি, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষাতেও পড়বার নিয়ম এই। আরবী ও হিব্রু ভাষা কিন্তু ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে পড়া হয়। চীনা ও জাপানীরা আবার উপর থেকে নীচের দিকে পড়ে। হোমারের সময়ে গ্রীসদেশে নাকি প্রথম লাইন বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে, দ্বিতীয় লাইন ডানদিক থেকে বাঁ-দিকে, পরের লাইন আবার বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে—এইভাবে পড়বার রীতি প্রচলিত ছিল।

জগতের সব কিছুর মত ভাষাও পরিবর্তনশীল। মানবসমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন ঘটে। একটি ভাষা লুপ্ত হয়ে তার জায়গায় অন্য ভাষা দেখা দেয়। কখনও একটি ভাষা ভেঙ্গে অনেক উপভাষার সৃষ্টি হয়। কখনও বা ভাষার আকৃতি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় যে, তাকে আর চেনাই যায় না। রাজা অ্যালবার্ট-এর সময়ের ইংরেজীকে এখনকার ইংরেজীর সমগোত্রীয় বলে চেনা শক্ত। একথা কল্পনা করাও কঠিন যে, চর্যাপদের সময়কার বাংলার সঙ্গে আধুনিক বাংলার কোন সম্বন্ধ আছে! কোন কোন শব্দের অর্থ কিরূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়, তার কয়েকটি মজার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন, বহু প্রচলিত কয়েকটি নাম, যথা—Calvin—টাকমাথা, Barbara—বিদেশী, Ursula—স্ত্রী-ভালুক, Lana—পশম, Gretta—নীচ, বিখ্যাত Mona Lisa-র Mona কথাটির মানে হলো স্ত্রী-বাঁদর। ইংরেজীতে নামের পরে অনেক সময় Esquire ব্যবহৃত হয়। Esquire শব্দের অর্থ হলো ঢাল-বহনকারী।

বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জাতির মধ্যে দূরত্ব অনেক কমে এসেছে। এই পারমাণবিক বোমার যুগে মানুষকে টিকে থাকতে হলে বিভেদ ভুলে গিয়ে মিলিত হতে হবে। তাই আজ নানাদিক থেকে আন্তর্জাতিক ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। এই মিলনের পথে বাধা কম নয় এবং একটি প্রধান প্রতিবন্ধক হলো ভাষা-বিভেদ।

ভাষার ব্যবধান যে ঐক্যের কত বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে, তা জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি। পৃথিবীর অগণিত ভাষার মধ্যে কারুর পক্ষেই অল্প কয়েকটির বেশী শেখা সম্ভব নয়। এর ফলে বিদেশে অনেক সময় অনুবাদকের (Interpreter) সাহায্য নিতে হয়। এতে অহেতুক ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিতে পারে। ভাষার ঐক্য ছাড়া মানব জাতির সর্বাঙ্গীণ মিলন কখনই সম্ভব নয়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস, বিদ্বেষ প্রভৃতি থাকবেই। এই জন্যে আমাদের ভাষাগত অনৈক্য দূর করবার জন্যে সচেষ্ট হওয়া দরকার।

এ-সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রস্তাব হয়েছে। একদল ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি বহুপ্রচলিত ভাষার একটিকে গ্রহণ করতে চান। আবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যে কয়েকটি কৃত্রিম ভাষারও সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যে এস্পারেন্টো, ইডিয়ম নিউট্রাল, মনলিং প্রধান। এই ভাষাগুলির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি হলো এই—(ক) এগুলি কৃত্রিম, (খ) এগুলির প্রচলন হলেও উচ্চারণ-রীতির পার্থক্যের জন্যে ভেঙ্গে গিয়ে পুনরায় বিভিন্ন ভাষা দেখা দেবে, (গ) আন্তর্জাতিক ভাষা প্রচলিত হলে জাতীয় ভাষাগুলি লুপ্ত হবে। প্রচলিত ভাষার একটিকে আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত করাও সহজ নয়। জাতীয়তাবোধ ও গতানুগতিকতা এর প্রধান প্রতিবন্ধক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জাতীয়তা বোধের উর্ধ্বে উঠতে পারলে তবেই আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারবো।

বিজ্ঞান-সংবাদ

কুষ্ঠরোগের নবতম চিকিৎসা-ব্যবস্থা

ইউক্রাইনের দোনেৎস্ক সহরে কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিকোলাই তোর্সুয়েফ দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার পর কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের এক নতুন ও সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং এই পদ্ধতি প্রয়োগে তিনি ১১২ জন রোগীকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। কুষ্ঠ-নিরাময়ের এই নতুন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে ডাঃ তোর্সুয়েফের অন্যতম সহকারী-গবেষক ডাঃ নিকোলাই ওভ্‌চিনিকফ-এর সঙ্গে যুক্তভাবে যে গ্রন্থটি লিখেছেন, সেটি কিছুদিন আগে প্রকাশিত হবার পর কুষ্ঠরোগ-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করছেন, শুধু কুষ্ঠ নিরাময়ের নতুন ও সহজতর পদ্ধতির জন্যে নয়, কুষ্ঠরোগের কারণ, লক্ষণ, রোগনিরূপণ, বিভিন্ন রকমের নিদান, প্রতিষেধক ও রোগোত্তর নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি সম্পর্কেও বিশদ আলোচনার জন্যে ডাঃ তোর্সুয়েফ ও ডাঃ ওভ্‌চিনিকফের এই গ্রন্থটি একটি অতি মূল্যবান আকর-গ্রন্থ। তোর্সুয়েফের কুষ্ঠ-চিকিৎসার এই নতুন পদ্ধতির ভিত্তি হলো, রোগীর রক্তরসের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বিক্রিয়ামূলক বিশ্লেষণ।

ষাট বছর বয়সের প্রবীণ চিকিৎসক নিকোলাই তোর্সুয়েফ এ-পর্যন্ত মোট ৩৫২টি গবেষণা-নিবন্ধ লিখেছেন।

ইস্পাতের দ্বিগুণ শক্তিবৃদ্ধি

মস্কোর ধাতু-বিজ্ঞানী মিখাইল বের্নষ্টেইন ইস্পাতের শক্তি দেড়গুণ থেকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে তোলবার এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী সস্তা ও সাধারণ কার্বন-ইস্পাত সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কর-ইস্পাতের সঙ্গে শক্তির দিক থেকে পাল্লা দিতে পারে।

পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রে রক্ষিত লোহা প্রত্যেকটি পরিবর্তনের সঙ্গে তার মাত্রা (ডাইমেনশন) সামান্য পরিমাপে বদ্‌লায়—এই তথ্যটির ভিত্তিতে এই নতুন পদ্ধতিকে কার্যকরী করে তোলা হয়েছে। বহু সহস্র ওয়েষ্টেডের খুব শক্তিশালী এক চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ইস্পাতকে রেখে বের্ন্‌ষ্টেইন লক্ষ্য করেন যে, ইস্পাতের কেলাসগুলি গতিশীল হয়ে ওঠে এবং পরস্পরকে গুঁড়িয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত চূর্ণে পরিণত হয়। কঠিনীকৃত এই ইস্পাতচূর্ণ দেড় গুণ থেকে দ্বিগুণ বেশী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার নমনীয়তা ও স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

বের্ন্‌ষ্টেইনের পদ্ধতিতে তৈরী ইস্পাত থেকে নির্মিত যন্ত্রপাতি আরও হাল্কা ও বেশী মজবুত হবে এবং এর সাহায্যে টেলিভিশনের গম্বুজগুলিকে উচ্চতর ও সেতুগুলিকে দীর্ঘতর করা যাবে; তাছাড়া ট্রাক্টর ও কম্বাইন যন্ত্রগুলিকে ঢের বেশী নির্ভরযোগ্য করে তোলা যাবে।

তেজস্ক্রিয়তার দ্বারা খাদ্য-সংরক্ষণ

তেজস্ক্রিয় কোবাল্টের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণ করবার একটি তেজস্ক্রিয় ইউনিট সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তৈরী করেছেন। আয়ননকারী তেজস্ক্রিয়ার দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণের পরীক্ষার কাজে তাঁরা সুফল পেয়েছেন। দেখা গেছে, তেজস্ক্রিয়াধীনে খুব সামান্য সময় রাখবার ফলে খাদ্যের সব বীজাণু ধ্বংস হয়ে যায় এবং খাদ্যগুণের কোন লক্ষ্যনীয় পরিবর্তন ব্যাতিরেকেই ৪-৫ গুণ বেশী সময় খাদ্য-দ্রব্যকে সংরক্ষণ করা যায়। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, তেজস্ক্রিয়ার দ্বারা এই বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্যের মধ্যে কোন রকম তেজস্ক্রিয় গুণ সঞ্চারিত হয় না এবং ঐ খাদ্যদ্রব্য মানুষ বা অন্য প্রাণীর পক্ষে সম্পূর্ণ নির্দোষ।

তেজস্ক্রিয়ার বিভিন্ন মাত্রা প্রয়োগে খাদ্যগুণের কোন পরিবর্তন ঘটে কি না এবং সংরক্ষণের সময়ের তারতম্য ঘটে কিনা, সে সম্বন্ধে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা বর্তমানে গবেষণা চালাচ্ছেন। জাতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের কার্যসূচীর অঙ্গ হিসেবে এই গবেষণা চালানো হচ্ছে।

ভাইরাস-সন্ধানী ইলেকট্রন

খ্যাতনামা রুশ জীবাণু-বিজ্ঞানী এন. এফ. গামালেয়া-র নামে অভিহিত জীবাণুর গঠন-বিদ্যা ও ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ-বিদ্যা সংক্রান্ত গবেষণা-ভবনে নতুন যে ইলেকট্রন-অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি স্থাপন করা হয়েছে, তার সাহায্যে যে কোন জীবাণুকে ২ লক্ষ গুণ বর্ধিত আকারে দেখা যায়। প্রধানতঃ ভাইরাস সংক্রান্ত গবেষণা চালাবার জন্যে এই ইলেকট্রন-মাইক্রস্কোপকে কাজে লাগানো হচ্ছে। "ইউ-এম ভি. ১০০" নামে পরিচিত এই যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছে প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এন. এ. পেরেভের্জেফ-এর নির্দেশে। এই যন্ত্রটির উচ্চতা দুই মিটার এবং এর "ইলেকট্রন কামানে" ১ লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। এই বিদ্যুতে এর টাংষ্টেন তন্তুগুলি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ২.৫ হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। এর ফলে ইলেকট্রনগুলি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ কিলো-মিটার পর্যন্ত গতিবেগ অর্জন করে এবং সেই অতি শক্তিশালী "ইলেকট্রন-রশ্মি" ভাইরাসের মত অতি ক্ষুদ্র জিনিষকে পরিস্ফুট করে তোলে। এই ভাইরাস আকারে এত ক্ষুদ্র যে, সাধারণ আলোক-তরঙ্গ এদের পাশ কাটিয়ে যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে এখানকার বিজ্ঞানীরা ফ্লু, পোলিও, বসন্ত ইত্যাদি ভাইরাসের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন।

প্লাষ্টিকের হৃৎপিণ্ড

একটি প্রাণীর দেহ থেকে হৃৎপিণ্ড তুলে নিয়ে সেটা যে অন্য প্রাণীর দেহে যুক্ত করা যায়, সোভিয়েট শল্য-চিকিৎসকেরা অনেক দিন আগেই তা প্রমাণ করেছেন। মস্কোর ডাক্তার ভ্লাদিমির দেমিখফ এবং গোর্কি শহরের ডাঃ নিকোলাই

সিনিৎসিনের যুগান্তকারী অস্ত্রোপচারগুলির কথা আজ বিশ্ববিদিত। ডাঃ দেমিখফ ১৯৫৮-৫৯ সালে একটি কুকুরের দেহে একটি অতিরিক্ত মুণ্ড ও একটি অতিরিক্ত হৃৎপিণ্ড যোগ করেছিলেন এবং কুকুরটি দীর্ঘকাল স্বাভাবিক অবস্থায় জীবিত থাকে এবং দুটি মুখ দিয়েই খাদ্য গ্রহণ ও শব্দ করে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহের বিভিন্ন রুগ্ন অঙ্গ বাদ দিয়ে সে জায়গায় কৃত্রিম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জুড়ে দেবার কাজে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়েছেন। কৃত্রিম চোখ, কৃত্রিম মূত্রাশয়, যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড ও ফুস্‌ফুস ইত্যাদির খুব সাফল্যজনক উন্নতি ঘটেছে।

নিখিল সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির সদস্য ও বিশিষ্ট শারীরবিজ্ঞানী ডাঃ ই. বাব্‌স্কির নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি যে প্লাষ্টিকের হৃদ্‌যন্ত্র তৈরী করেছেন, তা পরীক্ষামূলকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাঁরা পরীক্ষাধীন প্রাণীদের ২৬ ঘণ্টা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখেন। তাঁরা মনে করেন, আর কয়েক বছরের মধ্যেই সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা জীবজন্তুর হৃৎপিণ্ডের মতই নিখুঁতভাবে কার্যকরী যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ড তৈরী করতে পারবেন এবং তখন গুরুতর রকম হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহে এই প্লাষ্টিক হৃদ্‌যন্ত্র বসিয়ে দিয়ে তাদের নিরাময় করে তুলতে সক্ষম হবেন।

চাঁদের অভ্যন্তরের তাপাঙ্ক

সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, চন্দ্রের অভ্যন্তরে ৫০ হইতে ৬০ কিলোমিটার গভীরে তাপাঙ্ক হইল প্রায় ১ হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড।

গোর্কির রেডিওফিজিক্যাল ইনষ্টিটিউট হইতে পরিচালিত এই হিসাবের ভিত্তি হইল, চন্দ্রের বেতার-বিকিরণের নিখুঁত পরিমাপ। ১৫ হইতে ৫০ সেণ্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই বিকিরণের তীব্রতা পরিমাপ করিয়া বিজ্ঞানীরা হিসাব করিয়াছেন যে, চন্দ্রগোলকের ১৫ হইতে ২০ মিটার গভীরের তাপাঙ্ক উপরিতলের তাপাঙ্ক অপেক্ষা ২৫ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড বেশী। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, চন্দ্রের অভ্যন্তরে আছে এক উত্তপ্ত কেন্দ্রীয় বস্তু।

গোর্কির বিজ্ঞানীরা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, চন্দ্রের উপরিতল হইতে ১৫-২০ মিটার পর্যন্ত গভীরের উপাদান হইল এক ধরণের সচ্ছিদ্র ঝামা-পাথরের মত বস্তু।

বিদ্যুৎ-সরবরাহের ভাসমান কারখানা

সমুদ্রের উপকূলবর্তী বন্দর অথবা তারই নিকটবর্তী কোন স্থানে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের উদ্দেশ্যে মার্কিন স্থল-বাহিনী পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের একটি ভাসমান কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের লিবার্টি নামক জাহাজে এই কারখানাটি নির্মিত হবে। এথেকে ১০০০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হবে। পারমাণবিক রিয়াক্টরের সাহায্যেই এই কারখানায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে। কেবল স্বদেশেই নয়, বিদেশের বন্দরেও এটিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। ২০০০০ অধিবাসী অধ্যুষিত কোন সহরের পক্ষে এই কারখানায় উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তি যথেষ্ট হবে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের একটি ঘোষণায় এই প্রসঙ্গে আরও জানানো হয়েছে যে, বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় একবারের ইন্ধনে কারখানাটি দু-বছরেরও বেশী সময় চালু থাকবে।

মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

মঙ্গলগ্রহে জীবনের অস্তিত্ব আছে কি না—সে বিষয়ে সন্ধান করবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৪ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সহ একটি উপগ্রহ ঐ গ্রহে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেছেন। জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ

সংস্থা এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যন্ত্রপাতিসহ এই উপগ্রহের ওজন হবে ৫০০ পাউণ্ড। ঐ সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই গ্রহটির আলোকচিত্র গৃহীত হবে এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

ঐ বছরের বসন্তকালে শুক্রগ্রহেও আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মেরিনারের সাহায্যে পরিকল্পিত তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় উল্লিখিত পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ বর্তমানে স্থগিত রাখা হয়েছে।

মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার জনৈক মুখপাত্র বলেছেন, ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসের পূর্বে অন্য কোন তথ্য-সন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহ শুক্রগ্রহাভিমুখে প্রেরণ করা হবে না। তিনি আরও বলেছেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত আরও শক্তিশালী রকেট উদ্ভাবিত হতে পারে এবং ঐ সব রকেটের সাহায্যে পরে ১২০০ পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহ প্রেরণ করা সম্ভব হবে। এতে দ্বিতীয় মেরিনারের তুলনায় যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম থাকবে বেশী—হয়তো একটি টেলিভিশন ক্যামেরাও থাকবে। তাছাড়া শুক্রগ্রহ অভিমুখে প্রেরিত ঐ কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিসহ একটি আধারও শুক্রগ্রহে প্রেরণের ব্যবস্থা হবে।

দ্বিতীয় মেরিনারের সাহায্যে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ ও পাঠোদ্ধার করতে কয়েক বছর লেগে যেতে পারে বলে ঐ মুখপাত্রটি জানিয়েছেন।

একই ইন্ধনে দশ বছর বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা

আমেরিকার মার্টিন মারিয়েটা কর্পোরেশন নামে একটি বেসরকারী ব্যবসায়প্রতিষ্ঠান তাদের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ উৎপাদনের কারখানায় ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছেন। পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের এই যন্ত্র বা অ্যাটমিক জেনারেটরে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ বা ষ্ট্রনসিয়াম টাইটেনেট ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই তেজস্ক্রিয় বস্তুটি যাতে কোন প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর না হতে পারে, তারও ব্যবস্থা তাঁরা করেছেন। এই জেনারেটরে ৬০ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে এবং উপকূলবর্তী কোন বাতিঘর বা লাইট হাউসে ১০ বছর একবারের ইন্ধনে, এই জেনারেটরের সাহায্যে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে আলো সরবরাহ করা যাবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের তত্ত্বাবধানে মেরিল্যাণ্ডস্থিত বালটিমোরে মার্টিন মারিয়েটা কোম্পানীর পারমাণবিক বিভাগ এই জেনারেটরটি নির্মাণ করেন। এই কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত পাঁচটি জেনারেটরে ষ্ট্রনসিয়াম-৯০ ব্যবহৃত হচ্ছে। এদেরই একটি আছে সুমেরু অঞ্চলে এবং আর একটি কুমেরু অঞ্চলে। ঐ দুটি অঞ্চলেরই আবহাওয়া-কেন্দ্রে ঐ দুটির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এই কেন্দ্র দুটির কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। বাকী তিনটির মধ্যে প্রথমটি থেকে উপকূলরক্ষী একটি বয়াতে, দ্বিতীয়টি সমুদ্রতলে পথ-সন্ধানী দীপে এবং তৃতীয়টি থেকে মেক্সিকো উপসাগরস্থিত ভাসমান আবহাওয়া-কেন্দ্রে বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঠকে নানাভাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা

কাঠ গৃহনির্মাণের প্রাচীনতম উপকরণ। দু-হাজার বছরেরও বেশী মানুষ এই প্রাকৃতিক উপাদানকে নানাদেশে নানাভাবে ব্যবহার করে আসছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে কাঠের ব্যবহারের ক্ষেত্র বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাষ্ঠজাত দ্রব্যকে নানাভাবে ব্যবহার করবার পন্থা

আবিষ্কৃত হয়েছে। এক ধরণের আঠা আবিষ্কৃত হয়েছে, যার সাহায্যে কাঠের তক্তা জোড়া দেওয়া যায়। সেই জোড়া দেওয়া তক্তা খুবই মজবুত হয়ে থাকে। এইগুলি কড়িকাঠ হিসাবে ঘর-বাড়ী নির্মাণে ব্যবহৃত হয় এবং এই কড়িকাঠগুলি সাতফুট পর্যন্ত পুরু হয়ে থাকে।

তারপর এর আর একটা সুবিধা এই যে, জোড়া দিয়ে এই কাঠগুলিকে ইচ্ছামত আকার দেওয়া যেতে পারে, কাঠগুলি বেঁকেচুরেও যায় না। নীচু ধরণের বড়-বাড়ী নির্মাণে এই ভাবে কাঠের ব্যবহার আমেরিকায় খুবই বেড়ে চলেছে।

প্লাইউডের ব্যবহার কেবল বাড়ীর সিলিং বা দেয়াল হিসাবেই নয়, কড়ি-বর্গা হিসাবেও ব্যবহারের ব্যবস্থা হয়েছে। এতে অর্থ ও সময় দুয়েরই সাশ্রয় হয়ে থাকে।

তাছাড়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাঠকে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী অগ্নিনিরোধকও করা হয়েছে। জল এবং উইপোকা যাতে নষ্ট না করতে পারে, তারও ব্যবস্থা হয়েছে। তার জন্যে কাঠের উপরে নানারকমের আস্তরণ দিতে হয়।

তবে বহু তলার বাড়ী কাঠে তৈরী হয় না। অল্প মূল্যে নীচু ধরণের বাড়ী নির্মাণের ব্যাপারে কাঠই প্রধান উপকরণ। বর্তমান আমেরিকায় ১০টি বাড়ীর মধ্যে ৯টিই কাঠের তৈরী। প্রত্যেকটিতে গড়পড়তা এক হাজার থেকে দু-হাজার খণ্ড কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেক দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে প্রচুর কাঠ পাওয়া যায়। বর্তমানে গাছ যত কাটা হয়, তার তুলনায় বৃক্ষ রোপণ করা হয় অনেক বেশী আমেরিকায় ৪৮ কোটি ৯০ লক্ষ একর জমিতে রয়েছে অরণ্য।

কাঠকে নানাভাবে ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঘর-বাড়ী সাজাবার জন্যে নানা রকমের নানা আকারের তৈজসপত্র তৈরীও সম্ভব হয়েছে। দশ বছর আগেও এটা সম্ভব ছিল না।

সৌরকিরণ বিদ্যুতে পরিণত করবার নতুন পদ্ধতি

মহাকাশযানে ব্যবহারের জন্যে সৌরকিরণকে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে অতিশয় পাতলা থার্মোইলেকট্রিক যন্ত্র (প্যানেল) তৈরী করা হয়েছে। মহাকাশযানে এরূপ যন্ত্র শীঘ্রই ব্যবহার করা হবে।

জেনারেল ডায়নামিক্স্ কর্পোরেশন নামক আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান এই যন্ত্র তৈরী করেছে। বর্তমানে ব্যবহৃত সিলিকন সৌর-সেলের তুলনায় এগুলির কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা আছে। প্রথমতঃ এগুলি ওজনে অনেক হাল্কা এবং তৈরী করতেও খরচ কম পড়ে। তাছাড়া তেজস্ক্রিয়তার মধ্যেও এগুলি টিকে থাকতে পারে।

ফটো-ইলেকট্রিক সোলার সেলের সাহায্যে যেমন সৌরকিরণকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব হয়, এই প্যানেলের সাহায্যে কিন্তু তা হয় না। থার্মোইলেকট্রিক প্যানেলের সাহায্যে সৌরকিরণকে প্রথমে তাপ ও পরে বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করা হয়। মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি পরিচালনা, যোগাযোগ রক্ষা করা প্রভৃতি কাজের জন্যে ঐ বিদ্যুৎ-শক্তি ব্যবহার করা ভবিষ্যতে সম্ভব হবে।

প্রতি প্যানেলে অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি বস্তু থাকে, যেগুলিকে বলা হয় থার্মোইলেকট্রিক এলিমেন্ট। এগুলি আয়তনে দেশলাই কাঠির মাথার চেয়ে বড় নয়। প্রতি প্যানেলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তা এক ওয়াটের চার ভাগের এক ভাগ। প্রথম অবস্থায় এইরূপ তিনটি প্যানেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হবে।

থার্মোইলেকট্রিক প্যানেল নির্মাণে বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মহাকাশযানে এই প্যানেল এমনভাবে সন্নিবেশিত হবে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করবার পর ঐ

প্যানেল মহাকাশযানের বাইরে প্রসারিত হয়ে সৌরকিরণ গ্রহণ করবে।

হায়দরাবাদের জাতীয় গবেষণাগার

ভারতের গবেষণাগারসমূহে এমন কোন গবেষণা চালানো যেতে পারে কি না, যার ফলে উভয় দেশই উপকৃত হবে—এই বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখবার উদ্দেশ্যে কয়েক বছর আগে মার্কিন কৃষি দপ্তরের দু-জন বিজ্ঞানী ভারত পরিদর্শনে এসেছিলেন। তাঁরা হায়দরাবাদে এসে সেখানকার আঞ্চলিক গবেষণাগারে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সব্জী তৈল থেকে কতকগুলি উপকরণ তৈরীর প্রক্রিয়া দেখে অবাক হয়ে যান। এই প্রক্রিয়ায় তাঁরা হাইড্রোক্সিল বা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্রুপকে কাজে লাগিয়ে থাকেন। এতে ঐ তৈল শক্ত বস্তুতে পরিণত হয়।

তাঁরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের বলেছেন, ঐ হাইড্রোক্সিল গ্রুপের উপকরণ কম পরিমাণে প্রয়োগ করলে ঐ তৈল শক্ত না হয়ে ক্যাস্টর অয়েলের মত ঘন বস্তুতে পরিণত হতে পারে এবং তা নানা কাজেই লাগানো যেতে পারে। জেট ইঞ্জিনে ক্যাস্টর অয়েল লুব্রিক্যান্ট হিসাবে, সুগন্ধ দ্রব্য ও নাইলন তৈরীতে এবং পরিস্কারক দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তিসির তৈলে বার্নিস, রং প্রভৃতি তৈরী হয় আর লোধ্রতেল ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বহুকাল থেকেই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এই দু-জন মার্কিন বিজ্ঞানীর পর্যালোচনার পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তরের সঙ্গে হায়দ্রাবাদের আঞ্চলিক গবেষণাগারে এই বিষয়ে গবেষণার জন্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যে মার্কিন কৃষি দপ্তর থেকে ঐ গবেষণাগারকে পাঁচ বছরের জন্যে ১১৪৯৪০ টাকা দান করা হয়। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়েল রিসার্চ ভারতে কয়েকটি গবেষণাগার পরিচালনা করে থাকেন। হায়দরাবাদের এই গবেষণাগারটি এদেরই অন্যতম।

এই গবেষণার ফলে তিসি ও লোধ্রতৈলের সমন্বয়ে নানা কৃত্রিম বস্তু তৈরীর ব্যবস্থা হয়েছে। লোধ্রতৈলের সাহায্যে এক রকম পালিশ তৈরী হয়ে থাকে, যা কয়েক বছরেও হল্‌দে হয় না। হায়দরাবাদে ডাঃ কে. টি. আচায়া এই গবেষণা সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিচালনা করছেন।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বলয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঊর্ধ্বাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে যে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে, রেডিও-টেলিস্কোপের সাহায্যে তারকা ও নীহারিকাপুঞ্জের অবস্থান নির্ণয়ে তা কোন বাধা সৃষ্টি করবে না বলে মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন, প্রতিরক্ষা দপ্তর এবং জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা একটি রিপোর্টে জানিয়েছেন। তাঁরা আরও জানিয়েছেন যে, এই বলয় দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এর ফলে চৌম্বক নিরক্ষবৃত্ত এলাকায় যে সব তেজস্ক্রিয় কণা পুঞ্জীভূত হয়েছে, সেগুলি ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। টেলস্টার এবং ইনজুন কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে আভাস পাওয়া গেছে যে, এই বলয় এক বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মে—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা
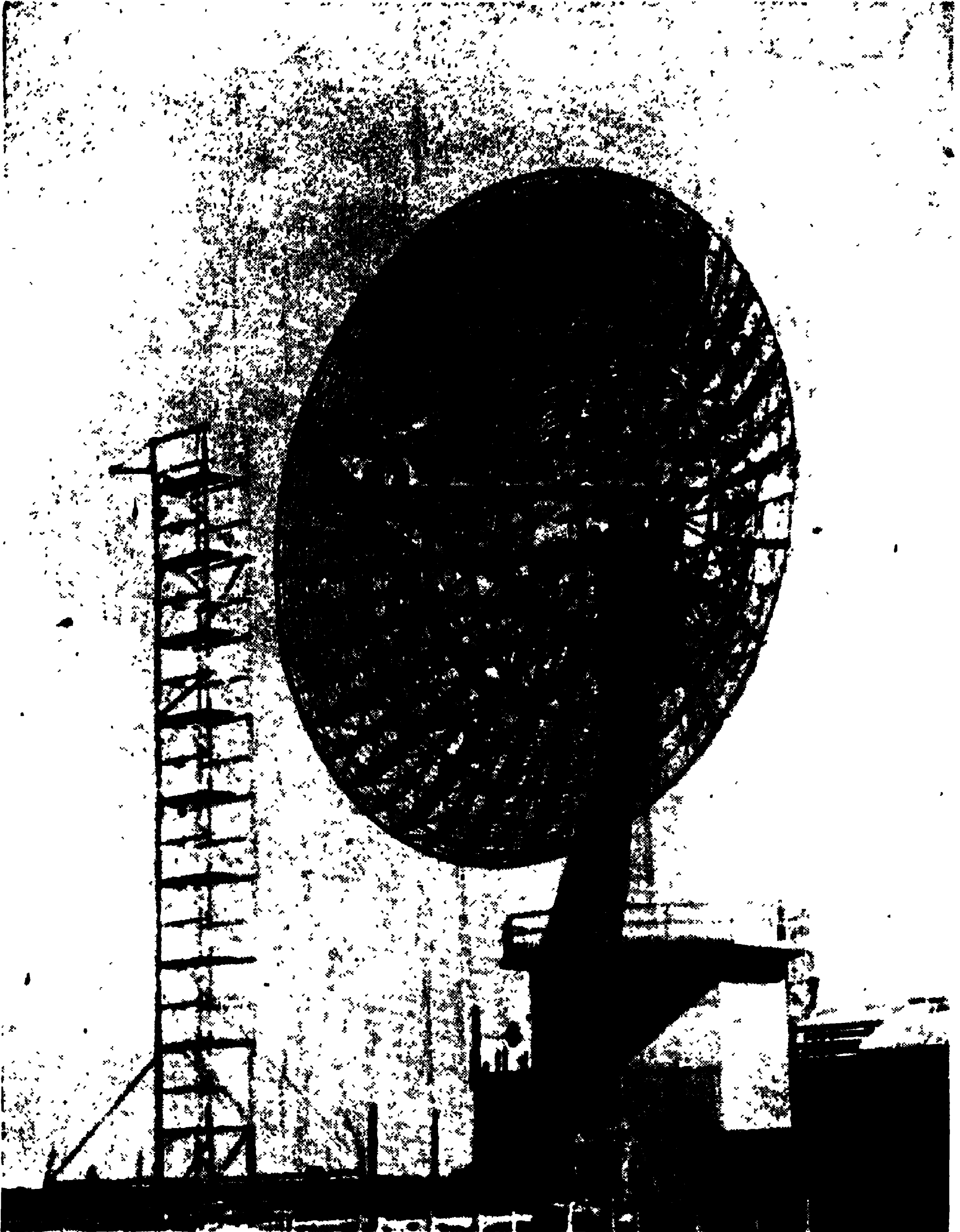
যুক্তরাষ্ট্রের 'স্যাটান' মহাকাশযানের উড্ডয়ন পরিকল্পনায় ব্যবহৃত রেডার যন্ত্র।

ধূমকেতু

নভোমণ্ডলের অনেক কিছুই এখনও মানুষের অজানা রয়ে গেছে। মানুষ চেষ্টা করছে মঙ্গল, চাঁদ প্রভৃতি গ্রহ-উপগ্রহে পাড়ি দেবার জন্যে। অনেকটা সাফল্য লাভও করেছে মানুষ এই কাজে। কিন্তু তবুও অসীম এই নভোমণ্ডলের বিচিত্র রহস্যের সামান্য অংশও মানুষের বোধগম্য হয় নি। ধূমকেতুর ব্যাপারটাও এই রকমের একটা রহস্য। আজও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে বলতে পারেন না, কি করে ধূমকেতুর উৎপত্তি হয়েছে।

ধূমকেতু সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে আগে জানা দরকার, কি বস্তু দিয়ে ধূমকেতু তৈরী। বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল বলেন, ধূমকেতুর মধ্যে কিছুই নেই—নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে—যখন ১৮৬১ সালে লিরিডের ধূমকেতুর সঙ্গে এবং ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ হয়।

হ্যালির ধূমকেতুর সঙ্গে যখন পৃথিবীর সংঘর্ষ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, তখন পৃথিবীর বহু অংশে দারুণ আতঙ্কের সঞ্চার হয়। ভয়ে অনেকে চার্চে জমায়েত হয়ে প্রার্থনা করতে থাকে। কারণ তাদের ধারণা ছিল, এই সংঘর্ষে পৃথিবী নিশ্চয়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল ব্যাপারটা কিছুই নয়।

ধূমকেতুর একবার দেখা পাওয়ার পর বহু বছরের মধ্যে আর তার দেখা পাওয়া যায় না। এক একটা ধূমকেতু যে কোন একটা প্রকাণ্ড গ্রহের সমান। এরূপ বিশাল আকৃতি সত্ত্বেও ধূমকেতুর মধ্যভাগ সম্পূর্ণ ফাঁকা—এক বিরাট শূন্য। ধূমকেতুর লেজ নানা রকমের হয়ে থাকে। আবার কোন কোন ধূমকেতুর লেজ থাকেই না। ধূমকেতুর অগ্রভাগই অনেকটা ঘন অবস্থায় থাকে। অবশ্য এখন পর্যন্ত কোন ধূমকেতুকেই খুব ভাল করে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় নি।

সাধারণতঃ ধূমকেতুর দেহে থাকে ছোট ছোট পাথরের টুক্‌রা, যা অগ্রভাগেই বেশী পরিমাণে থাকে, আর লেজের দিকে ক্রমশঃই পাত্‌লা হয়ে আসে। এই সব পাথরের টুক্‌রার চতুর্দিকে একটা গ্যাসীয় পদার্থের আবরণ থাকে। এই গ্যাসকে বলা হয় 'কমা'।

এই সব পাথর আর গ্যাসের ঘনত্ব অতি সামান্য। তাই কোন ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘর্ষ হলে এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার ঘটবার সম্ভাবনা নেই।

ধূমকেতু সাধারণতঃ খুব উজ্জ্বল হয়ে থাকে। ধূমকেতুর নিজের কোন আলো না থাকলেও সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে খুবই উজ্জ্বল দেখায়। সূর্যের আলো ধূমকেতুর অভ্যন্তরস্থ পাথর আর গ্যাসের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে এই ঔজ্জ্বল্যের সৃষ্টি করে।

কোন কোন সময় প্রায় ২০০ লক্ষ মাইল লম্বা অত্যুজ্জ্বল লেজওয়ালা ধূমকেতু পৃথিবী থেকে দেখা যায়। ১৮৪৩ সালে এরূপ একটি ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। একবার পরিক্রমায় এর প্রায় ২০০০ বছর সময় লাগে। ধূমকেতুর লেজ সব সময়েই সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে। তাই যদি কোন ধূমকেতু তার গতিপথের মাঝখানে থাকে, তবে লেজটি সামনে আছে বলে মনে হবে। বর্তমান শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি। অবশেষে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, আলোক যে কোন বস্তুর উপর চাপ দিতে পারে, যার ফলে হাল্কা পদার্থসমূহ অনেক দূরে সরে যেতে পারে।

প্রায় ৮০০ ধূমকেতুর কথা জানা গেছে, যাদের একবার সূর্যপরিক্রমায় প্রায় ১২ বছরের মত সময় লাগে। বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতু প্রায় ৭৭ বছরে একবার সূর্যপরিক্রমা করে। তাই ১৯১০ সালের পর আবার ১৯৮৭ সালে এই ধূমকেতুর দেখা পাওয়া সম্ভব। এই পরিক্রমা কালে ধূমকেতু যে কেবল ঔজ্জ্বল্য হারায়—তা নয়, অনেক সময় তারা অনেকগুলি অংশে বিভক্ত হয়েও পড়ে। এই ভাঙ্গা অংশগুলিকেই আমরা উল্কাপাত রূপে দেখে থাকি।

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সঠিক কোন কথা বলতে পারেন না। ধূমকেতুর গতিপথ আর গতিবেগ দেখে একথা জানা গেছে যে, এরা সূর্যের আকর্ষণের বাইরে যেতে পারে না।

অনেকে বলেন—সৌরজগৎ সৃষ্টিকালে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছিল। এ-সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে, ধূমকেতু বৃহস্পতি বা শনিগ্রহের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎপন্ন হয়েছে।

সঠিকভাবে কিছু জানা না গেলেও একথা সত্য যে, বর্তমান যুগে মানুষ যখন নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে অনেক অভিনব তথ্য সংগ্রহ করছে, তখন কোন দিন হয়তো নভোমণ্ডলের বিচিত্র রহস্যের কিনারা করা সম্ভব হবে।

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ইউরেনাসের আবিষ্কার

আকাশ ভর্তি তারা ফুটেছে। আর সেই দিকেই একটা দূরবীণে চোখ লাগিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন হার্শেল।

এমনি একদিন নয়—দিনের পর দিন তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন আকাশের জ্যোতিষ্কটিকে। মন তখন আশায় দুলছে। হ্যাঁ, নড়ছে তো! নড়ছে জ্যোতিষ্কটা। তাহলে তো ওটা নক্ষত্র নয়! নিশ্চয়ই ওটা একটা ধূমকেতু! হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, ওটা একটা ধূমকেতু—উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন তিনি। তাহলে তিনি একটা ধূমকেতুর আবিষ্কারক বলে খ্যাত হতে পারবেন!

কি কৌতুককর ঘটনা—যাঁর ভাগ্যে একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কারের কৃতিত্ব রয়েছে, তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে ধূমকেতু আবিষ্কারের চেষ্টা করে চললেন। আমি ইউরেনাসের আবিষ্কারক ফ্রেডরিক উইলিয়াম হার্শেলের কথাই বলছি।

আসলে হার্শেলের ইউরেনাস আবিষ্কারের ব্যাপারটা আগাগোড়াই বিস্ময়কর। অল্প বয়সেই তিনি বেশ নাম করেছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে। বাবার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন রয়াল ব্যাণ্ড পার্টিতে। তারপর কিভাবে সঙ্গীতজ্ঞ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী হলেন, সে আর এক গল্প। দিনের পর দিন তিনি দুরবীণে চোখ দিয়ে থাকেন, তাও ইউরেনাস আবিষ্কারের জন্যে নয়—আকাশের তারকার একটা তালিকা তৈরী করবার জন্যে।

তারকার তালিকা তৈরী করতে করতেই তিনি যে একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করেছিলেন, একথা তাঁর ১৭৮১ সালের রোজনামচা এবং রয়্যাল সোসাইটিতে উপস্থাপিত 'একটি ধূমকেতুর বিবরণ' নামক নিবন্ধ থেকেই জানা যায়।

হার্শেলের সহোদরা অনেকগুলি আবিষ্কারের মধ্যে একটি ধূমকেতু আবিষ্কারের কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর নাম বিজ্ঞানের পাতাতেই কেবলমাত্র লেখা আছে। আর হার্শেলের নাম গাঁথা আছে সকলের মনের মধ্যে। যাহোক, হার্শেলের ভুল ধরা পড়তে দেরী হলো না। গ্রীনউইচ, অক্সফোর্ড এবং অন্যান্য স্থানের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আপ্রাণ চেষ্টা করে জ্যোতিষ্কটির কক্ষপথ নির্ণয় করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর সেইখানেই অসুবিধা দেখা দিল। ধূমকেতুর যে অধিবৃত্তাকার পথে জ্যোতিষ্কটির চলবার কথা, জ্যোতিষ্কটি তো সেই পথে চলছে না! তাহলে?

হার্শেলও পড়লেন দ্বিধায়। এতদিন ধরে যাকে তিনি ধূমকেতু বলে ধরে নিয়েছিলেন, সেটা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ধূমকেতু নয়। তবে জিনিষটি কি?

সমস্যার সমাধান মিললো কয়েক মাসের মধ্যেই। ইংল্যাণ্ডের সেন্ট পিটার্সবার্গের

গণিতজ্ঞ আনডার্স যোহান লেক্সেল জানালেন, খুব সম্ভব জ্যোতিষ্কটি পৃথিবীর কক্ষপথের বাইরের কোন গ্রহ।

এভাবেই হার্শেল আবিষ্কার করলেন ইউরেনাস গ্রহটিকে। অথচ এই গ্রহটিকেই ফ্লেমস্টীড, ব্রাডলে প্রমুখ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ১৬৯০ থেকে ১৭৮১ সালের মধ্যে অন্ততঃ সতেরো বার লক্ষ্য করেছেন, আর সতেরো বারই সকলে এটিকে নক্ষত্র ভেবে অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেন নি। স্বীকার করতেই হবে, হার্শেলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করবার কোন চেষ্টা করেন নি।

এটি হার্শেলের এক যুগান্তকারী আবিষ্কার বলেই স্বীকৃত হয়। এর আগে যে গ্রহগুলির বিষয় বিজ্ঞানীদের জানা ছিল, সেগুলি জানা ছিল অতি প্রাচীনকাল থেকেই। বিজ্ঞানের যুগে গ্রহ আবিষ্কার এই প্রথম।

এরপর প্রশ্ন এলো নতুন গ্রহটির নামকরণের। তৃতীয় জর্জের সম্মানে হার্শেল গ্রহটির নাম দিলেন—জর্জিয়ান সাইডাস। কিন্তু এই নাম বেশী দিন কেউ গ্রহণ করলো না। ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লালাণ্ডে গ্রহটির নাম দিলেন 'হার্শেল'। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বোড-এর দেওয়া ইউরেনাস নামটিই স্বীকৃতি পেল।

ইউরেনাস নিঃসঙ্গ নয়। পাঁচটি সঙ্গী তার চারদিকে অবিরাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। ১৭৮৭ সালে হার্শেল নিজেই দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। ১৭৯৭ সালে তিনি আরও চারটি উপগ্রহ আবিষ্কারের দাবী জানিয়েছিলেন। কিন্তু এবার দেখা গেল, ঐগুলির সত্যই কোনও আপেক্ষিক গতি নেই, সেগুলি অনেক দূরের ক্ষীণ নক্ষত্র মাত্র। ১৮৫১ সালে ইংরেজ জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাসেল নতুন দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। সবশেষের উপগ্রহটির আবিষ্কৃত হলো তারও প্রায় এক-শ' বছর পরে, ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। টেক্সাসের ম্যাকডোনাল্ড মানমন্দির থেকে কুইপার ফটোগ্রাফীর সাহায্যে আবিষ্কার করেন পঞ্চম উপগ্রহ—মিরাণ্ডা। পাঁচটি উপগ্রহের নাম—এরিয়েল, আমব্রিয়েল, টাইটানিয়া, অবেরন এবং মিরাণ্ডা।

এভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে আবিষ্কারের সুরু হলো, তার প্রাথমিক পর্যায় শেষ হলো বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। ইউরেনাসের আবিষ্কার সুগম করে দিল নতুন গ্রহ নেপচুন এবং প্লুটোর আবিষ্কারের পথ। বিজ্ঞান জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো একটা মহান আবিষ্কার, যার সুরু একটা ভুলের মধ্য দিয়ে।

শ্রীসুদামচন্দ্র রায়

সংখ্যার কথা

তোমরা ছেলেবেলা থেকেই ১ ২ ৩···ইত্যাদি সংখ্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এই সংখ্যাগুলি কি এবং এদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ কি ?

১,-১, ২,-২, ···এদের বলা হয় "স্বাভাবিক সংখ্যা" (Natural Number)., অর্থাৎ এদের মধ্যে কোন জটিলতা বা অস্বাভাবিকতা নেই। আবার ১, ২, ৩······ ইত্যাদিকে ধনাত্মক সংখ্যা (Positive Number) ও -১, -২, -৩··· ইত্যাদিকে ঋণাত্মক সংখ্যা (Negative Number) বলা হয়। মনে হতে পারে, এদের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? দেখ, শেষোক্ত দলের প্রত্যেকের আগের দিকে একটি করে ছোট্ট সরল রেখা (—) আছে, যা প্রথমোক্ত দলের কারুর নেই। শূন্য (০) যতক্ষণ সংখ্যার ডান-পাশে না বসে, ততক্ষণ যেমন তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় না, তেমনি এই সরল রেখাটি (—) সংখ্যার বামপাশে না বসলে এর মূল্য বুঝা যায় না। ডান দিকের শূন্য যেমন সংখ্যাটিকে দশগুণ বাড়িয়ে তোলে, তেমনি বাঁ-দিকের সরল রেখা সংখ্যাটিকে একেবারে উল্টো বানিয়ে দেয়। এটির নাম হচ্ছে—ঋণাত্মক বা বিয়োগ চিহ্ন। ধর, তুমি আর সমীর ক্লাশে ঠিকমত উত্তর দিতে পারছো না। শিক্ষক মহাশয় বেত হাতে নিয়ে বলেন—তোমরা আমার দিকে এগিয়ে এস। সমীর শিক্ষক মহাশয়ের দিকে ২ গজ এগিয়ে গেল। কিন্তু তুমি ভয় পেয়ে পিছনের দরজার দিকে দুই গজ পিছিয়ে গেলে। তাহলে তুমি শিক্ষক মহাশয়ের দিকে কতটা এগিয়ে গেলে ? উত্তর হবে, —২ গজ। এবার বুঝলে তো কি করে ঋণাত্মক সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যার উল্টো হয়।

আবার ২, ৪, ৬······এদের নাম হলো 'জোড় সংখ্যা' (Even Number) ; ৩, ৫, ৭,······ইত্যাদি হলো 'বিজোড় সংখ্যা' (Odd Number)। এদের মধ্যে প্রভেদ কি ? ধর, তোমরা ৭ জন আছ। বললাম—তোমরা সমান দুটি দলে ভাগ হয়ে যাও। কিন্তু তোমরা তা করতে পারবে না—কারণ ছয়জন ছেলে তিনজন তিনজন করে দুটি দল তৈরী করবে, কিন্তু একজন কোন দলে যেতে পারবে না। যে দলে যাও—সে দলের সংখ্যা অপর দলের চেয়ে এক বেশী হয়ে যাবে। তাই এই ৭ সংখ্যাটিকে বিজোড় সংখ্যা বলা হয়। কারণ তোমরা একে ২ দিয়ে ভাগ করতে পারবে না। অপরপক্ষে, যেহেতু ৬ সংখ্যাটি ২ দ্বারা বিভাজ্য, সেহেতু এটি একটি জোড় সংখ্যা।

১, ৪, ৯, ১৬, ২৫······এদের বলা হয় 'বর্গ সংখ্যা' ((Square Number)। তোমরা বর্গক্ষেত্র দেখেছ। বর্গক্ষেত্র একটা আয়ত ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দুই-ই সমান। ১, ৪, ১৬···ইত্যাদি সংখ্যক যে কোন একক বিশিষ্ট আয়ত

ক্ষেত্রকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করা যায়, অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলিকে বর্গাকারে সাজানো যেতে পারে। তাই এদের বলা হয় 'বর্গ সংখ্যা'। ধর, তোমরা ১৬ জন ছেলে আছ। বললাম, তোমরা বর্গাকারে দাঁড়াও—অর্থাৎ তোমাদের এমন ভাবে দাঁড়াতে হবে, আমি যেন যে কোন দিক থেকে তোমাদের সমান সংখ্যক ছেলেকে দেখতে পাই। তোমরা চারজন, চারজন করে চারটি সারি তৈরী করে পর পর দাঁড়িয়ে গেলে, অর্থাৎ ১৬ সংখ্যাটিকে বর্গাকারে সাজানো হলো। বর্গ সংখ্যার এই হলো বৈশিষ্ট্য। অঙ্কের ভাষায় বলতে গেলে—যে সংখ্যা দুটি একই সংখ্যার গুণফল, তা একটা বর্গ সংখ্যা ; যেমন—

$$৪ = ২ \times ২ = ২$$

$$৯ = ৩ \times ৩ = ৩^{২}$$

$$১৬ = ৪ \times ৪ = ৪^{২}$$

আবার ১, ৩, ৫, ৭, ১১...... ইত্যদি সংখ্যাগুলিকে একটা পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। সেই নামটি হলো—মৌলিক সংখ্যা (Prime Number)। এই সংখ্যাগুলিও ঠিক তেমনি—এরা হয় 'একে'র দ্বারা, না হয় নিজের দ্বারা বিভাজ্য হবে, কিন্তু অন্য কোন সংখ্যার দ্বারা বিভাজ্য হবে না।

১, ৩, ৫......এদের বলা হয় বিজোড় সংখ্যা। কতকগুলি ঢাক্‌না দেওয়া গ্লাস দর্শকদের সামনে রাখ। তারপর গ্লাসগুলির মধ্যে প্রথম বিজোড় সংখ্যাটি, প্রথম দুটি বিজোড় সংখ্যা, প্রথম তিনটি বিজোড় সংখ্যা ঢুকিয়ে দাও। অর্থাৎ প্রথম গ্লাসে ১ কে, দ্বিতীয় গ্লাসে ১ ও ৩ কে, তৃতীয় গ্লাসে ১, ৩ ও ৫ কে—এই ভাবে ঢুকিয়ে রাখলে। তারপর এক একটি গ্লাস থেকে সংখ্যাগুলিকে একসঙ্গে বের করে আন—দেখতে পাবে, এক একটি বর্গসংখ্যা হয়ে গেছে। কারণটা তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল কথা বিজোড় সংখ্যাগুলিকে ক্রমান্বয়ে যোগ করলে—যোগফল একটি বর্গ-সংখ্যা হয়। যেমন—

১ + ৩ = ৪ একটি বর্গসংখ্যা

১ + ৩ + ৫ = ৯ „ „

১ + ৩ + ৫ + ৭ = ১৬ „ „

১ + ৩ + ৫ + ৭ + ৯ = ২৫ „ „

ইত্যাদি

শ্রীমনোরঞ্জন মাইতি

আগ্নেয়গিরি

তোমরা বোধ হয় অনেকেই জান যে—সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার বলিদ্বীপে আগুং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রচুর ধন-সম্পত্তি ও জীবননাশ হয়েছে। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি পূর্ব জাভার রাজধানী সুরাবায়াকে মধ্যাহ্নে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলে। হঠাৎ অন্ধকার হওয়ায় স্কুল-কলেজ ছুটি হয়ে যায়—যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে জ্বলন্ত লাভাস্রোতে আশেপাশের গ্রামগুলি বিপন্ন হয়ে পড়ে। আগুং পর্বতের জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত গরম ছাই ও পাথর ৪৫ মাইল দূরে গিয়েও পড়েছে। জ্বলন্ত লাভাস্রোতে শত শত লোকের প্রাণহানি ঘটে। স্থানীয় অনেক গ্রামের অধিবাসীরা ভগবানের তুষ্টিবিধানের জন্যে মন্দিরে গিয়ে ধর্ণা দেয়। তাদের ধারণা—ভগবান খুসী হলেই আগুং আগ্নেয়গিরি ঠাণ্ডা হবে। শতাধিক বছর যাবৎ আগুং আগ্নেয়গিরি সুপ্ত ছিল। হঠাৎ একদিন সে আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

আগুং পাহাড়ের ধারেকাছে অবস্থিত কয়েকটি গ্রামের সর্দারেরা হুকুম দিলেন—মন্দিরে গিয়ে সব গ্রামবাসী প্রার্থনা কর—কেউই পালাতে পারবে না। দেবতাই এই বিপদ থেকে আমাদের বাঁচাবে। ওদিকে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করলেন—গ্রাম ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাও, নচেৎ কেউই রক্ষা পাবে না। কিন্তু কেউই সামরিক কর্তৃপক্ষের ঘোষণা অনুযায়ী গ্রাম ছেড়ে পালালো না—দিনরাত্রি দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করতে লাগলো।

ওদিকে আগুং পর্বত থেকে উৎক্ষিপ্ত কালো ধোঁয়া ও ধূলায় সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে; উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোত ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, আর অগ্নি উদ্গীরণও চলেছে সঙ্গে সঙ্গে। ক্রমে ক্রমে সেই গলিত লাভাস্রোত সব গ্রামগুলিকেই ঢেকে ফেলে।

ইন্দোনেশিয়ার রেডক্রশের অধ্যক্ষের মতে, আগুং পর্বতের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রায় লক্ষাধিক লোক গৃহহারা হয়েছে। মারা গেছে প্রায় এগারো হাজার লোক। আগ্নেয়গিরি থেকে নিঃসৃত লাভা, ভস্মরাশি ও প্রস্তর বর্ষণের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে, সেখানে আগামী দশ বছরে কোন শস্যাদি জন্মাবে না বলেই মনে হয়। বেসাকী, গোঙ্গা, আমেদ প্রভৃতি কাছাকাছি গ্রামগুলি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১০০,০০০ একর জমির শস্য বিনষ্ট হয়েছে এবং ৩৫,০০০ গবাদি পশু মারা গেছে। যারা আগে সাবধান হয়ে নিরাপদ স্থানে চলে গিয়েছিল, একমাত্র তারাই এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত যে কিরূপ ভয়াবহ, তা উপরের ঘটনার বিবরণ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়। আগ্নেয়গিরির এই রকম অগ্ন্যুৎপাতের সংবাদ মাঝে মাঝেই শোনা যায়।

পৃথিবীতে প্রায় ৩০০-এর বেশী সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আছে। এক সারি আগ্নেয়গিরি বেষ্টন করে আছে প্রশান্ত মহাসাগরকে। আর একসারি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ ও ভূমধ্যসাগর সহ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। কিন্তু জাভা ও সন্নিহিত ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জগুলিতেই আগ্নেয়গিরির সক্রিয়তা সর্বাধিক। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; যথা—সক্রিয়, সুপ্ত ও নিষ্ক্রিয়। সক্রিয় আগ্নেয়গিরি থেকে সর্বদাই অগ্ন্যুৎপাত হয়। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত হয়। আর নিষ্ক্রিয় আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

নানাবিধ প্রাকৃতিক কারণে ভূত্বক বিদীর্ণ হয়ে ভূগর্ভের উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত হয়ে স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে ক্রমশঃ উঁচু হয়ে আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়। এর শীর্ষদেশ হয় মোচার মত। শীর্ষদেশে কড়াইয়ের মত আকৃতিবিশিষ্ট মুখগহ্বর থাকে। এই মুখগহ্বরকে বলা হয় জ্বালামুখ। জ্বালামুখ দিয়েই ভূগর্ভের উত্তপ্ত লাভাস্রোত, আগুন, ধোঁয়া, ধুলা প্রভৃতি নির্গত হয়।

অগ্ন্যুৎপাতের কারণ সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, তেজস্ক্রিয় পদার্থের দরুণ ভূত্বকের স্থান বিশেষ অত্যধিক উত্তপ্ত হবার ফলে অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। আবার কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ বিশ্বাস করেন—ভূত্বকের আন্দোলনের ফলেও অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে। ভূমিকম্পের দরুণ ভূত্বকে যে প্রচণ্ড আলোড়ন হয়—তার ফলে ভূপৃষ্ঠের নিম্নস্থিত গলিত পদার্থসমূহ ভূপৃষ্ঠে নির্গত হয়। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গ্যাস গলিত লাভাপ্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর উপরে বেরিয়ে আসে। এই গ্যাস হচ্ছে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সালফার ডাইঅক্সাইড প্রভৃতির সংমিশ্রণ।

ভূমিকম্পের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন কোন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে বা পরে। আবার কোন কোন আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেও ভূমিকম্প হতে দেখা গেছে। অবশ্য অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্যে ভূতত্ত্ববিদেরা গবেষণা চালাচ্ছেন।

এখন কয়েকটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলছি। এযাবৎ বিজ্ঞানীরা চার শতেরও বেশী অগ্ন্যুৎপাতের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। অগ্ন্যুৎপাতেয় ফলে ভূমির উর্বরা শক্তি বাড়ে। কোন কোন আগ্নেয়গিরির শুষ্ক জ্বালামুখে বৃষ্টির জল জমে হ্রদের সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি একদিন দেখা গেল—সিসিলির ১০,৭৭১ ফুট উঁচু আগ্নেয়গিরি এট্‌নার জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়া, আগুন ও ধূলা উৎক্ষিপ্ত হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ। এট্‌নার আবদ্ধ জ্বালামুখ দিয়ে ভিতরের গ্যাস সজোরে নির্গত হবার ফলেই প্রচণ্ড শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। এট্‌নার

জ্বালামুখ থেকে উদ্গত অগ্নিশিখায় আকাশ লাল হয়ে যায়। জ্বালামুখ থেকে উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোত এট্‌নার গা বেয়ে ধীরে ধীরে ঢালু অংশে অগ্রসর হতে থাকে। গলিত লাভাপ্রবাহে মিলো এবং রেনোজোনাম নামক ছটি গ্রাম একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। বাড়ীঘর, ক্ষেত-খামার সবকিছু লাভাপ্রবাহে ঢাকা পড়ে। চল্লিশ হাজার একর ফল ও চাষের জমি একেবারে বিনষ্ট হয়। গ্রামবাসীরা বাড়ীঘর ছেড়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়।

এট্‌না যখন সুপ্ত থাকে তখন তাকে অতি সুন্দর দেখায়। তার শীর্ষদেশ সাদা তুষারে আবৃত। এট্‌নার পাদদেশের চারদিকের পরিমাপ ১০০ মাইলেরও বেশী। এর প্রধান জ্বালামুখ তিন মাইল চওড়া এবং ১০০০ ফুট গভীর। মোচাকৃতির শীর্ষদেশের চারদিক ঘিরে আছে ছ-শ' ছোট ছোট জ্বালামুখ।

মাঝে মাঝে প্রায়ই এট্‌নার অগ্ন্যুৎপাতে প্রচুর ক্ষতি এবং জীবনহানি হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে ১১৬০ সালে। এর ফলে সিসিলির ক্যাটানিয়া দ্বীপের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং ১৫,০০০ লোক মারা যায়। ক্যাটানিয়ায় ১৬৬৯ সালে ১২ মাইল লম্বা একটি ফাটল সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্য থেকে গলিত লাভাস্রোত চল্লিশ দিন ধরে নির্গত হয়েছিল। ক্যাটানিয়ার সমগ্র উত্তর-পূর্ব অংশটাই একেবারে জনহীন হয়ে পড়ে। বিধ্বস্ত অঞ্চলকে আবার মানুষের বাসোপযোগী করে গড়ে তুলতে বহু বছর সময় লেগেছিল। ১৬৯৩ সালে এট্‌না আগ্নেয়গিরির ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ষাট হাজার লোক মারা যায়। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচণ্ড ভূমিকম্পও হয়েছিল। এর পরেও অনেকবার অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে। ১৯২৩ সালে এট্‌নায় অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি এবং জীবননাশ হয়। ইউরোপের আগ্নেয়গিরির মধ্যে মারাত্মক অগ্ন্যুৎপাতের দিক থেকে এট্‌নাই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এটি হাওয়াইয়ের মৌনা লোয়া, ইকোয়াডোরের কটোপাক্সি, আইসল্যাণ্ডের হেক্‌লা, দক্ষিণ-মেরুর ইরুবাস এবং মার্টিনিকের পিলী আগ্নেয়গিরির সমশ্রেণীভুক্ত।

৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পিয়াই এবং হার-কিউলেনিয়াম নগরী ছটি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। ভিসুভিয়াসের এই ধ্বংসলীলার কাহিনী বিশ্ববিখ্যাত। তার পরেও বহুবার ভিসুভিয়াসে বিস্ফোরণ হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক বিস্ফোরণ হয় ১৬৩১ সালে এবং এর ফলে ১৮০০০ লোক মারা যায়। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসের অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও বেশ কিছু লোক প্রাণ হারায়। প্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত আগ্নেয় গিরির মধ্যে মৌনা লোয়া আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখই হচ্ছে সবচেয়ে বড়—১৩,০০০ ফুট চওড়া এবং ৮০০ ফুট গভীর।

যবদ্বীপের নিকটবর্তী ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয় ১৮৮৩ সালের ২৬শে ও ২৭শে অগাষ্ট। এর পূর্বে ছ-শ' বছর ক্রাকাতোয়া সুপ্তাবস্থায় ছিল।

ক্রাকাতোয়ার জ্বালামুখ থেকে উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়া ও ভস্মরাশি ১৫০ মাইল ব্যাপী আকাশকে একেবারে ঢেকে ফেলে। ক্রাকাতোয়ার উৎক্ষিপ্ত ভস্মরাশি ১০০০ মাইল দূরবর্তী স্থানেও গিয়ে পড়েছিল। এই বিস্ফোরণের গর্জন বহু দূরবর্তী স্থানেও শোনা গিয়েছিল। এই অগ্ন্যুৎপাতে হাজার হাজার লোক মারা যায় এবং প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতি হয়।

কটোপাক্সি আগ্নেয়গিরির উচ্চতা ১৯,৫৫০ ফুট। এর শীর্ষদেশ তুষারাবৃত। সর্বদাই কটোপাক্সির জ্বালামুখ থেকে বাষ্প নির্গত হয়ে থাকে। ইকোয়াডরের কুইটো থেকে ৩২ মাইল দূরে অ্যাণ্ডিজে কটোপাক্সি অবস্থিত। ১৬৯৮ সালে কটোপাক্সিতে সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণ হয়। এর ফলে টাকুনগা শহর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। শহরের অধিকাংশ অধিবাসীই মারা যায়। এর পরেও বহুবার প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১৮৮৫ সালের অগ্ন্যুৎপাত। এই অগ্ন্যুৎপাতে প্রচুর ধোঁয়া, ভস্মরাশি এবং অগ্নিশিখা উত্থিত হয়। ১৭৪৪ সালের কটোপক্সির বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ ৬০০ মাইল দূর থেকেও শোনা গিয়েছিল এবং উত্থিত ভস্মরাশি ১২৫ মাইল দূরবর্তী স্থানে গিয়ে পড়েছিল। পিলী আগ্নেয়গিরির বিস্ফারণও ছিল প্রচণ্ড। সেণ্ট পিয়েরী নগরী থেকে ছয় মাইল দূরে মার্টিনিক দ্বীপে পিলী অবস্থিত। ১৯০২ সালের ২রা মে ধূলা মিশ্রিত খুব উত্তপ্ত কালো ধোঁয়া পিলী আগ্নেয়গিরি থেকে উত্থিত হয়ে সেণ্ট পিয়েরি নগরীর চারদিক ঢেকে ফেলে। অগ্নি উদ্গারণ এবং উত্তপ্ত গলিত লাভাস্রোতে সমস্ত নগরী ধ্বংস হয়ে যায়। ৩০০০০ লোক মারা যায়। নগরীর মাত্র দুজন লোক কোন রকমে রক্ষা পায়। তার মধ্যে একজন ছিল ভূগর্ভস্থ কারাগারের একজন কয়েদী।

১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেক্সিকো শহরের ১০০ মাইল পশ্চিমে প্যারিকুটিন গ্রামের একটি শস্যক্ষেত্রে হঠাৎ একটি ফাটল দেখা দেয়। ফাটল থেকে প্রথমে ধোঁয়া, ধূলা এবং পরে গলিত লাভা ও আগুন নির্গত হতে থাকে। তিন-চার ঘণ্টার মধ্যে ১০০০ ফুট উঁচু এবং ৩০০০ ফুট চওড়া একটি আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হয়। প্রায় এক বছর বাদে দেখা যায়—আগ্নেয়গিরিটির উচ্চতা হয়েছে ১৫০০ ফুট। এই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্যারিকুটিন গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়।

এখানে মাত্র কয়েকটি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কথা বলা হলো। এছাড়াও অনেক আগ্নেয়গিরি আছে—যাদের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে মানুষের জীবনহানি ও আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।

শ্রীদেবব্রত মণ্ডল

বিবিধ

সোভিয়েটের 'লুনিক-৪'-এর চন্দ্রের আকাশ অতিক্রম

সোভিয়েটের চন্দ্রলোকযাত্রী রকেটটি চন্দ্রের আকাশপথ অতিক্রম করে চলে গেছে। অবশ্য তার সমস্ত কাজ সে সম্পূর্ণ করেই মহাকাশে বিলীন হয়ে গেছে। সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' জানিয়েছেন—৬ই এপ্রিল ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম সন্ধ্যা ৬-৫৪ মিঃ-এ 'লুনিক-৪' চন্দ্রের ৫,৩০০ মাইল ঊর্ধ্বপথে আকাশ অতিক্রম করেছে।

'টাস' আরও জানিয়েছে—মানুষের চন্দ্রলোক জয়ের পথে 'লুনিক' আরও কিছুটা সাহায্য করবে। যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য পাওয়া গেছে, সেগুলির বিচার-বিশ্লেষণ চলছে। রকেটটির সঙ্গে বেতার-যোগাযোগ আরও কিছুদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, কিন্তু আর সে কোনদিনই পৃথিবীর দিকে ফিরে আসবে না বা চন্দ্রের উপগ্রহরূপে চন্দ্রকে প্রদক্ষিণও করবে না—সে চিরকালের মত চলে গেছে। পৃথিবী থেকে চন্দ্র পর্যন্ত দীর্ঘপথ পরিক্রমায় তার সময় লেগেছে ৯০ ঘণ্টার মত।

পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীরা তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেছেন, যন্ত্রপাতি চালু রাখবার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। বিশ্বস্ততার সঙ্গে সে প্রত্যেকটি নির্দেশ পালন করেছে। মানুষের চন্দ্রলোক অভিযানের প্রস্তুতি-পর্বে 'লুনিকে'র দান অসামান্য বলেই স্বীকৃত হবে।

ভারতে মহাশূন্য গবেষণার যুগ

কেরলে ইকোয়েটেরিয়াল সাউথ রকেট-ক্ষেপণ ঘাঁটি স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারত মহাশূন্য-গবেষণার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিল। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের ১৯৬২-'৬৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টে ঐ কথা জানা যায়।

রিপোর্টে বলা হয় যে, রাণা প্রতাপ সাগর পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রটি ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারগণ কর্তৃক স্থাপিত হইবে। শুধু উহার নক্সাটি ক্যানাডা সরবরাহ করিবে।

তারাপুরে পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থার সহিত চুক্তি হইয়া গিয়াছে। বিস্তৃত কার্যসূচী রচিত হইতেছে।

তারাপুরের পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রে ব্যয় হইবে ৪৮ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা এবং উৎপাদন-ক্ষমতা হইবে ৩৮০ মেগাওয়াট। এখানে কাজ দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে।

রাণা প্রতাপ সাগরের পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রটিতে ২০০ মেগাওয়াট শক্তি উৎপাদিত হইবে। পরে উৎপাদন-ক্ষমতা দ্বিগুণ করা যাইবে।

ভারতের তৃতীয় পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রটি মাদ্রাজ রাজ্যের মহাবলীপুরমের কাছে স্থাপিত হইবে। ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন্য কেরলে সাউণ্ডিং রকেট ক্ষেপণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় আরও কয়েকটি দেশ অংশ গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পারমাণবিক দপ্তর রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক মহাশূন্য-গবেষণার জন্য কেরালার ঐ রকেট-ক্ষেপণ কেন্দ্রের ব্যবহার তাঁহারা করিতে পারিবেন।

ভারতীয় রকেট

নয়াদিল্লী হইতে ২৩শে মার্চ তারিখে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, আবহাওয়া অফিসসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল পি. আর. কৃষ্ণ রাও ২৩শে মার্চ বলেন যে, আগামী বৎসর মহাকাশ-গবেষণা সংক্রান্ত ভারতীয় জাতীয় কমিটি কয়েকটি আবহ-রকেট উৎক্ষেপের ব্যবস্থা করিতে পারে এবং কেরলে যে রকেট-ঘাঁটি স্থাপন করা হইতেছে, সেখান হইতে এই সকল রকেট উৎক্ষেপ করা হইবে।

শ্রী রাও বিশ্ব আবহ-বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে ভারতীয় আবহ-বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন। তিনি আরও বলেন যে, ঐ বিভাগের একজন অফিসার বর্তমানে আবহ-রকেট সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

যুগল-হিমল শৃঙ্গ জয়

পর্বতারোহণের ইতিহাসে যুগল-হিমল শৃঙ্গ জয়ের অভিযানে সাফল্য লাভ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অথচ অভিযানে সাফল্য লাভের কয়েক দিন আগেই অত্যন্ত উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যায়। খারাপ আবহাওয়ায় হিমালয়ের দশটি অভিযানেরই যাত্রা বিপজ্জনকরূপে ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু তারপরেই দুর্ঘটনার পরিবর্তে একের পর এক সাফল্যের সংবাদ আসতে থাকে। প্রথমেই খবর এলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর দলটি কোক্‌টাং শৃঙ্গে আরোহণ করেছে। সে আরোহণের বিশদ বিবরণ আসবার আগেই আবার এক নতুন সুসংবাদ পাওয়া গেল, ফরাসী অভিযাত্রীরা দল বেঁধে সবাই জনু পর্বতের শিখর ছুঁয়ে এসেছে। বিস্ময় কাটবার আগেই অধিকতর চমকপ্রদ সংবাদ পাওয়া যায়। একটি ক্ষুদ্র জাপানী পর্বতারোহীর দল উত্তর-পশ্চিম নেপালের সুবিখ্যাত মুকুট-হিমল পর্বতশ্রেণীর ২২২১২ ফুট উঁচু হোংদে শীর্ষ জয় করেছে। একটা দিন কাটবার আগেই আবার ততোধিক বিস্ময়কর এক সংবাদ আসে—দ্বিতীয় একটি জাপানী অভিযাত্রী দল উত্তর-মধ্য নেপালের সর্বাধিক ভীতিপ্রদ পর্বতশীর্ষ যুগল-হিমল আরোহণ করেছে। ১৯৬২ সালের মে মাস পর্যন্ত যে চারটি পর্বতশীর্ষ থেকে সাফল্যের সংবাদ এসেছিল, সেই চারটিই এতদিন অজেয় ছিল।

মুকুট-হিমলের অবস্থান উত্তর-পশ্চিম নেপালে। ১৯৪৯ সালের আগে পর্যন্ত এই অঞ্চলটি ভৌগোলিক-দের এক রকম অজানাই ছিল। সেই বছর বৃটিশ পর্বতারোহী হেনরি টিলম্যান সর্বপ্রথম এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করে আসেন। তারপর ১৯৫০ সালে এই পথে এসে পর্বতারোহণের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম অধ্যায় সংযোজন করেছেন ফরাসী পর্বতারোহী মরিস হেরজগ। এর আগে দশ বছরে এই অঞ্চলে একাধিক পর্বতাভিযান হয়েছে, কিন্তু মুকুট-হিমল তাদের লক্ষ্য ছিল না। ইসিজাকার নেতৃত্বে জাপানী দলটিই এই পথে প্রথম হোংদে-শীর্ষে আরোহণ করেছে।

ইসিজাকা ব্যতিরেকে দলের সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। হিরায়ামা, কুমাগায়া এবং মিয়াহারা। তাছাড়া শেরপা চারজন, আর চল্লিশ জন ছিল মালবাহক। মার্চ (১৯৬২) মাসের তিন তারিখে অভিযাত্রী দল জাপান থেকে রওনা হন। সমুদ্রপথে কলকাতায় এসে আকাশপথে কাঠমাণ্ডু হয়ে পশ্চিম-নেপালের পোখারায় উপস্থিত হন। পোখারা থেকে হাঁটাপথে টুকুচে যান। টুকুচের উত্তর-পশ্চিমেই মুকুট-হিমল। তাঁরা ৩রা মার্চ (১৯৬২) জাপান ছেড়েছিলেন, ৮ই মে (১৯৬২) হোংদেশীর্ষে আরোহণ করেন!

কিন্তু আকিরা টাকাহাসির পর্বতারোহণের অভিজ্ঞতা অনেক বেশী চমকপ্রদ। ইনি যুগল-হিমল অভিযাত্রী দলের নেতা ছিলেন। যুগল-হিমল অভিযানের সংগঠক হলেন অল জাপান অ্যালপাইন অ্যাসোসিয়েশন—আর পৃষ্ঠপোষক-

দের মধ্যে আছেন—জাপান সরকার, নিপ্পন টেলিভিসন ইত্যাদি।

যুগল-হিমল আসলে একটি পর্বতগোষ্ঠীর নাম। এর মধ্যে যে পর্বতশীর্ষটি উচ্চতম, তার ইংরেজি নাম—বিগ হোয়াইট পিক। তার উচ্চতা ২২৮৭০ ফুট। একে বেষ্টন করে আছে দোর্জে লাকপা, গিয়াণ্টসেন, পূর্বী ইত্যাদি পর্বতশীর্ষ। এই পর্বতাকীর্ণ অঞ্চলটি লাংটাং হিমলের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং গণেশ ও গৌরীশঙ্কর হিমলের মাঝখানে।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও মধ্যনেপালের এই সুবিস্তৃত এলাকায় বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯৪৯ সালে টিলম্যান সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে পদার্পণ করেন। তারপর ১৯৫৫ সালে শ্রীমতী মোনিকা জ্যাকসনের নেতৃত্বে একটি বৃটিশ মহিলা অভিযাত্রী-দল এই পার্বত্যাঞ্চলে পর্বতারোহণের উদ্দেশ্যে আসেন। হিমালয়ে মহিলা পর্বতারোহীদের প্রথম সাফল্যের কৃতিত্ব এঁদেরই। এঁরা আরোহণ করেন গিয়াণ্টসেন শীর্ষ—যার উচ্চতা ২০৩০১ ফুট।

১৯৫৭ সালে অপর একটি বৃটিশ অভিযাত্রী-দল এই পর্বতগুলির উচ্চতম শীর্ষ যুগল-হিমলে আরোহণের উদ্দেশ্যে আসেন। তিনজন অভিযাত্রীকে পর্বতে রেখে এই দলকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়। নিহতদের মধ্যে দুইজন সদস্য ছিলেন, অপরজন স্বয়ং দলের নেতা।

এরপরেই জাপানী অভিযাত্রীরা যুগল-হিমল শীর্ষকে নিজেদের করে নেয়। পর্বতারোহণের ইতিহাসে এটি অভিনব কিছু নয়। এভারেষ্ট যে অর্থে বৃটিশ-শীর্ষ ছিল, নাঙ্গাপর্বত যে-অর্থে জার্মান-শীর্ষ এবং কে-টু আমেরিকান শীর্ষ—যুগল-হিমলও ঠিক সেই অর্থে জাপানী-শীর্ষ।

১৯৫৮ সালে জাপানের ফুকাদা প্রথম এসে পর্বতটির বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণ করে যান। তারপরেই ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে পর পর দুটি অভিযাত্রী-দল গঠিত হয় ইতো ও কাজিমাতোর নেতৃত্বে। কিন্তু দুটি অভিযানই ব্যর্থ হয়। এই ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দুটি। একটি হলো মন্দ আবহাওয়া, আরেকটি হলো পর্যাপ্ত আহার্যের অভাব।

কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যর্থ অভিযান দুটির অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই তৃতীয় অভিযানটি পরিকল্পিত হয় এই অভিযানের নেতা নিখিল জাপান পর্বতারোহী সঙ্ঘের কর্মাধ্যক্ষ টাকাহাসি। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন—নাকানো, ইশিদা, কাতো, আকিয়ামা, তাকাসিমা, মোরিতা এবং ইয়াসুহিসা। শেরপার সংখ্যা ছিল ১৩, মালবাহক ১৫০। অভিযানের সবপ্রকার রসদ এবং সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তাঁরা সমুদ্রপথে জাপান থেকে রওনা হয়েছিলেন তাঁরা ফেব্রুয়ারী (১৯৬২)।

দক্ষিণ থেকে যুগল-হিমল পর্বতের পাদদেশে পৌঁছুতে হলে পূর্বী-চাচুম্বু হিমবাহ অতিক্রম করতেই হবে। পৃথিবীর স্বল্প কয়েকটি দীর্ঘতম হিমবাহের মধ্যে এ হলো একটি—প্রায় বিশ কিলোমিটার। এই হিমবাহেরই প্রান্তদেশে প্রায় ১২৫০০ ফুট উঁচুতে বোম্পাসেল বা পেমসাল। যুগল-হিমল অভিযানের মূল শিবির এই পেমসালেই স্থাপিত হয়।

লবণ হ্রদ

লবণ হ্রদের বুকে জনপদ পত্তনের কাজ এগিয়ে চলেছে বেশ দ্রুতগতিতে। নির্দিষ্ট সময়ের এক মাস আগে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ৩১২ একর জমি ভরাট শেষ হয়েছে।

যে যুগশ্লাভ সংস্থা হ্রদ ভরাট করবার ভার নিয়েছেন, তাঁরাই সমস্ত এলাকায় (৩·৭৫ বর্গ মাইল) জন্যে 'লবণ হ্রদ নগর' পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে দেবেন।

শীঘ্রই লবণ হ্রদের লাগোয়া নিউকাট খালটি ভরাট করবার কাজও সুরু হচ্ছে।

শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে কম খরচে গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনায় তৈরী একটি সুদৃশ্য দোতলা

বাড়ীতে সরকারী কাজকর্ম হচ্ছে—লবণ হ্রদের বুকে। এটি করতে খরচ হয়েছে সাড়ে আঠার হাজার টাকার মত। পাশে আরও দুটি ঐ ধরণের বাড়ী উঠছে। একটি ঘরে সাজানো আছে পিতলের ঘটি, মানুষের হাড়, বড় বড় কয়লার টুক্‌রা মায় একটি গ্যাস সিলিণ্ডার পর্যন্ত। এগুলি পাইপ-বাহিত বালির সঙ্গে গঙ্গা থেকে এসেছে।

দক্ষিণদারি, মাণিকতলা, বেলেঘাটা থেকে কেষ্টপুর খাল ও ধাপা পর্যন্ত বিস্তৃত এই লবণ হ্রদের ৩.৭৫ বর্গমাইল জমি ভরাট করে পরিকল্পনাটি রূপায়ণে খরচ হবে প্রায় সাত কোটি টাকা। দেড় লক্ষের মত লোক এখানে থাকতে পারবেন। অবশ্য পরিকল্পনা শেষ হবে ১৯৬৬-'৬৭ সাল নাগাদ।

নূতন কায়কল্প

টোকিও হইতে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রয়টার কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে জানা যায়—যিনি জরাগ্রস্ত হইতে চলিয়াছেন, তাঁহার বয়স হইতে অন্ততঃ পাঁচ বছর কমাইয়া ফেলা যায়—এমন একটি নূতন ঔষধ আবিষ্কার করা সম্ভব হইয়াছে বলিয়া জাপানী গবেষকেরা দাবী করিয়াছেন।

ঔষধটি তৈয়ারী হইয়াছে তুষ হইতে। ১৯৫৩ সাল হইতে জাপানী বিজ্ঞানীরা এই জিনিসটির লুক্কায়িত ক্ষমতা লইয়া গবেষণা করিতেছেন। তাঁহারা মনে করেন, এই ঔষধ ব্যবহারে লোকের সহজেই যৌবন ফিরিয়া পাওয়া উচিত।

কৃত্রিম রক্ত

ওসাকা হইতে ১লা এপ্রিল তারিখে ইউ. এন. আই. ডি. পি. এ. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—সমগ্র চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের অস্ত্রোপচার বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ সেইজি কিমোতো ১লা এপ্রিল ঘোষণা করেন যে, তিনি "কৃত্রিম রক্ত" উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, রক্তের লোহিত-কণার রঞ্জক পদার্থ হিমোগ্লোবিনের বিকল্প খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে।

ভারতে কথিত ভাষার সংখ্যা ১৫০০

দাক্ষিণাত্য ভাষাতত্ত্ব কলেজ ইনষ্টিটিউটের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, সারা ভারতে প্রায় পনেরো শত ভাসা কথিত হইয়া থাকে। উপরিউক্ত পনেরো শত ভাষার মধ্যে ছয় শত ভাষার লিখিত কোন রূপ নাই এবং চারি শত ভাসা হইতেছে উপজাতীয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সারা পৃথিবীতে সর্বমোট চার হাজার ভাসা প্রচলিত আছে।

১৯৬৩-'৬৪ সালে ভারতের অর্থনীতিক ভবিষ্যৎ

বাজেটের সঙ্গে সরকারী অর্থনীতিক পর্যা-লোচনার রিপোর্ট ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংসদে পেশ করা হয়।

এই পর্যালোচনায় বলা হইয়াছে যে, বর্তমান আর্থিক বৎসরে খরিফ শস্যের সময়ে জুন মাসে দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় নাই এবং ইহার পরে অতিরিক্ত বারিপাত এবং বন্যা হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে পঙ্গপালের আক্রমণও হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও ১৯৬২-৬৩ সালে কৃসিজাত উৎপাদনের সম্ভাবনা সামগ্রিকভাবে সন্তোষজনক। চাউল ব্যতীত অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৬১-৬২ সালের তুলনায় বেশী হইবে। ইক্ষু এবং পাট উৎপাদন কিছুটা কম হইলেও তুলা উৎপাদন সুনিশ্চিতভাবেই বেশী হইবে।

পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং কয়লা সরবরাহের আরও উন্নতি হইবে এবং ইহার ফলে শিল্পোৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। সার, সিমেণ্ট, অ্যালুমিনিয়াম, খনিজ তৈল এবং পেট্রোলজাত দ্রব্য উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

আগামী বৎসরে ইস্পাত উৎপাদনে বর্তমান

বৎসরের মত উন্নতি হইবে না। বর্তমানে যে ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে, উহা কাজে লাগানো হইতেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ কর্মসূচী কিছু দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবে না। কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পের অবস্থা কি হইবে, তাহা এখনও বলা শক্ত। কারণ, কি পরিমাণ দ্রব্য বা উপকরণ আমদানী হইবে, তাহা এখনই বলা যাইতেছে না। চিনি উৎপাদন কিছুটা কম হইতে পারে, কিন্তু পাট ও সুতীবস্ত্র সম্পর্কে বাহিরের চাহিদা মিটান সম্ভব হইবে।

মস্তিষ্কে রক্তচাপ নিরোধে ঘোড়ার চুল

ওয়াশিংটন হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নাফেন কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—ঘোড়ার চুল মস্তিষ্কের শিরায় প্রবেশ করাইয়া মস্তিষ্কে রক্তচাপ নিরশনের এক অভিনব চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভাবন করিয়াছেন আমেরিকান চিকিৎসক ডাঃ জন পি. গাল্লাঘার।

প্রকাশ, ডাঃ জন পি. গাল্লাঘার এক ক্ষুদ্রাকৃতি বন্দুকের মত যন্ত্রের সাহায্যে রোগীদের মস্তিষ্কের শিরায় ঘোড়ার চুল প্রবেশ করাইয়া দিতেছেন। ফলে মস্তিষ্কে রক্তচাপগ্রস্ত রোগী আরোগ্য লাভ করিতেছে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে মৃত্তিকা অপসারণ

মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের একটি খবরে প্রকাশ, পারমাণবিক বিস্ফোরণকে মৃত্তিকা অপসারণের কাজে—যেমন, পোতাশ্রয় নির্মাণ বা খাল খননের কাজে লাগানো যেতে পারে।

গত ৬ই জুলাই '৬২ নেভাদার ভূগর্ভে শান্তিপূর্ণ "সেডান" নামে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরণ সম্পর্কে বিবৃতি দান প্রসঙ্গে কমিশন জানিয়েছেন যে, অতি ক্ষুদ্র আকারের পারমাণবিক বিস্ফোরণের সাহায্যে ৭৫ লক্ষ ঘনগজ পরিমাণ জমি ও পাথর অপসারিত হয়েছে এবং এর ফলে ১২০০ ফুট ব্যাসের একটি গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। এই গহ্বরের গভীরতা ৩২০ ফুট।

এই বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে এই বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, তেজস্ক্রিয়তার শতকরা ৯৫ ভাগই থাকে মাটির বহু নীচে এবং আবহমণ্ডলে যে সামান্য তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে, তাতে কারো কোন অনিষ্ট হয় না। অকুস্থলে কোন টেক্‌নিশিয়ান উপস্থিত থাকলে তার মাত্র তিন রণ্টগেন তেজস্ক্রিয়তার সম্মুখীন হতে হয়। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে আদৌ বিপজ্জনক নয়।

পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'প্লাউ-শেয়ার' নামে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। পরীক্ষিত বিস্ফোরণ এই পরিকল্পনারই অন্তর্ভুক্ত। মৃত্তিকা অপসারণের কাজে এ যে খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে, তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এর বিস্ফোরণ ক্ষমতা ১০০০০০ টন টি এন. টি-র সমান। নেভাদার উত্তরাঞ্চলে ৬৩৫ ফুট মৃত্তিকাতলে এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।

ভ্রম সংশোধন

মার্চ মাসে (১৯৬৩) প্রকাশিত 'মহাকর্ষ' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক জানাইয়াছেন—১২৫ ও ১২৬ পৃষ্ঠায় 'তবে কি ভাবে একটি অনিয়মিত আকারের বস্তুর অভিকর্ষ কেন্দ্রের...... বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য'—এই অংশটুকু বাদ দিয়া পড়িতে হইবে এবং ১২৬ পৃষ্ঠায় শেষাংশ এইরূপ হইবে— $G = \frac{F}{m} = \frac{G. M. m.}{m. d^2} = \frac{G. M.}{d^2}$

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ | জুন, ১৯৬৩ | ষষ্ঠ সংখ্যা

মৌলিক কণার আধুনিক রূপ

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ কর

ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন, নিউট্রন. ফোটন ইত্যাদি মৌলিক কণার আবিষ্কারের পর ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ইউকাওয়া প্রচার করেন যে, পরমাণু-কেন্দ্রীন ও ইলেকট্রন যে ভাবে তড়িৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের দ্বারা পরমাণুতে আবদ্ধ থাকে, পরমাণু-কেন্দ্রীনে সে রকম প্রোটন ও নিউট্রন এক বিশেষ শক্তিতে আবদ্ধ। এই শক্তির ক্ষেত্র কেন্দ্রীনের ক্ষুদ্র পরিসরের ফলে খুবই হ্রস্ব—ফলে তজ্জনিত ভরবেগ অধিক হওয়া উচিত। বিশেষ আপেক্ষিকতা-বাদের মতে, এই ক্ষেত্রজনিত ভরবেগ আলোর গতিবেগ ও ক্ষেত্রের কোয়ান্টামের ভরের সমান হবে। ইউকাওয়া গণনায় দেখান যে, এই কোয়ান্টামের ভর হওয়া উচিত ইলেকট্রনের ভরের ২০০ গুণ বেশী। কিন্তু তখনও এই রকম কোন বস্তুকণার সন্ধান পাওয়া যায় নি—ফলে ইউকাওয়া তাঁর এই গণনার ফল অভ্রান্ত বলে প্রচার করতে পারেন নি।

১৯৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দে অ্যাণ্ডারসন ও নেডারমায়ার মেঘকক্ষে নভোরশ্মিজাত এমন কয়েকটি ধন ও ঋণ ভরণ সমন্বিত কণিকার সন্ধান পেলেন, যাদের ভর ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাঝামাঝি। এই কণিকাগুলির নাম দেওয়া হলো মেসোট্রন বা মেসন। বিভিন্ন পরীক্ষায় এই কণিকাগুলির ভর মাপতে গিয়ে দেখা গেল যে, এদের ভর এক রকম নয়। ১নং চিত্রে বিভিন্ন পরীক্ষায় নানা রকমের মেসনের ভর দেখানো হয়েছে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরীক্ষালব্ধ এই ফল থেকে মেসনের গড় ভর স্থির হলো ইলেকট্রনের ভরের ১৭২ গুণ। কিন্তু এই গড় ভর থেকে বিভিন্ন কণিকার ভর যথেষ্ট কম-বেশী হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে কনভার্সি, প্যান্সিনি ও পিকিওনি নভোরশ্মির এই মেসন কণার সঙ্গে পরমাণু কেন্দ্রীনের সংঘাতে দেখান যে, এই ক্রিয়া খুবই

ফের্মি, টেলার ও ওয়াইস্কফ্ এই সিদ্ধান্তে

আসেন যে, পরমাণু-কেন্দ্রীনে নিবদ্ধ শক্তি খুবই তীব্র। মেসন যদি কেন্দ্রীনের শক্তির ক্ষেত্র হয়, তবে কেন্দ্রীনের সঙ্গে তার সংঘাত ক্ষীণ হওয়া উচিত নয়। তাঁরা দেখান যে, নভোরশ্মির এই মেসন কেন্দ্রীনের শক্তি থেকে অন্ততঃ ১০^{১৩} গুণ কম শক্তির ক্ষেত্র হতে পারে। সাকাতা, ইনোইউ, বেথে ও মারসাক্ বলেন যে, নভোরশ্মির এই মেসন কণাগুলি বলে প্লেটে ধরা পড়ে না। নিম্নে প্রক্রিয়াটি দেখানো হলো—

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu$$
$$\mu^+ \rightarrow e^+ + \nu + \bar{\nu}$$

তেজ, ভরবেগ ও ঘূর্ণন সংখ্যার বিশ্লেষণে নিউট্রিনোর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। π^- ও μ^- মেসনও উপরোক্তভাবে ধরা পড়ে। পরীক্ষায়
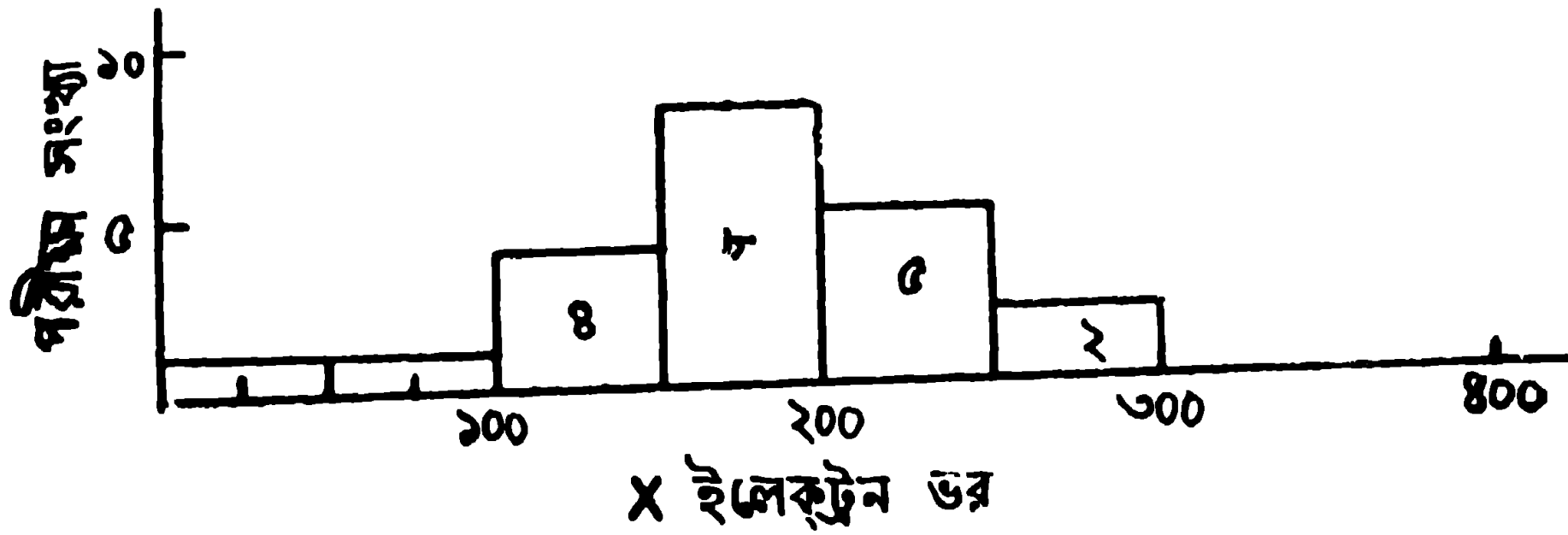
১নং চিত্র।

ইউকাওয়া-মেসন হতে পারে না। ইউকাওয়া-মেসন নভোরশ্মিতে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের আয়ুষ্কাল এত কম যে, বর্তমান যন্ত্রে ধরা পড়ে না।

প্রায় একই সময়ে ব্রিষ্টলে পাওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা ভরণ সমন্বিত কণিকার গতিপথ দেখবার জন্যে ফটোগ্রাফিক এমালসন আবিষ্কার করেন। এসব কণিকা ইমালসনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় যে আয়নের সৃষ্টি করে—তারা প্লেটটি ডেভেলপ করবার পর কৃষ্ণ কণিকার সৃষ্টি করে। এই কণিকা-গুলিই মৌলিক কণার পথের পরিচয় দেয়। এই রকম কয়েকটি প্লেট নভোরশ্মির সংঘাতে মৌলিক কণার বিশেষ পরিচয় বহন করে আনে। কৃষ্ণ কণিকার ঘনত্বের পরিবর্তনের হার ও সংঘাতজনিত পথের বক্রগতি থেকে মৌলিক কণার অনেক খবর জানা যায়। এই রকম কয়েকটি প্লেট থেকে দেখা গেল যে, এক রকম ভারী মেসন (π) ক্ষুদ্রতর মেসনে (μ) রূপান্তরিত হয় ও এই ক্ষুদ্রতর মেসন ইলেকট্রনে পরিণত হয়। অবশ্য বীটা তেজস্ক্রিয়ার মত এসব ক্ষেত্রেও নিউট্রিনো থাকে, কিন্তু তা বিদ্যুৎহীন

দেখা গেল, π মেসনের ভর ইলেকট্রনের চেয়ে ২৭৩ গুণ ও μ মেসনের ভর ইলেকট্রনের চেয়ে ২০৭ গুণ বেশী।

এখন দেখা গেল যে, π মেসনই ইউকাওয়া-মেসন, যা কেন্দ্রীনের শক্তির ক্ষেত্র এবং μ মেসন নভোরশ্মিতে কনভার্সিদের পাওয়া মেসন।

২নং চিত্রে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে মৌলিক কণার রূপ দেখানো হয়েছে। π^+, π^-, μ^+, μ^- এক্ষেত্রে নবীন আগন্তুক। এরা সবাই অস্থায়ী। এই সময়ে অ্যান্টিপ্রোটন, অ্যান্টিনিউট্রন প্রভৃতি বিপরীত কণা ও ভরণহীন π^0 কণিকাগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী হলেও আবিষ্কৃত হয় নি। চিত্রে এগুলি বৃত্তের মধ্যে দেখানো হয়েছে। ভরণ সংযোজন সমতার (Charge conjugation symmetry) ধারণা তখন জন্ম নিয়েছে। বিন্দু-রেখার দ্বারা এই চিত্রে সেই সমতা দেখানো হলো। চিত্রের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে বিন্দু-রেখানুযায়ী কণিকা ও বিপরীত কণিকার দর্পণ-ছায়া প্রকাশ করে। π^0 এবং γ নিজেরাই তাদের বিপরীত কণা। চিত্রের নিম্নদেশে

ভরণ ও ঘূর্ণন-সংখ্যা ছাড়া কেন্দ্রীন-কণিকার (Nuclecn) ভরণ-সংখ্যা দেওয়া হলো। এই সংখ্যাটির অর্থ তাৎপর্যপূর্ণ। Λ, μ, n প্রভৃতি মৌলিক কণা অস্থায়ী, আবার e^-, e^+, ν প্রভৃতি স্থায়ী। একটি কণিকা অস্থায়ী হলে ক্ষুদ্রতর স্থায়ী কণিকায় পরিণত হয়। ν, $\bar{\nu}$, γ—এরা ভরহীন, তাই এদের ক্ষুদ্রতর হবার উপায় নেই। $e^{\pm}$ হলো ক্ষুদ্রতম ভরণ সমন্বিত কণা। কোন বিক্রিয়ায় ভরণ বাড়তে কমতে পারে না—তাই এই কণিকাগুলিরও ভাঙবার সম্ভাবনা নেই। এখন প্রোটন স্থায়ী কণা কেন? কেন প্রোটন একটি ইলেকট্রন ও একটি ফোটনে ভেঙে পড়ে না? এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবু প্রোটনের এই স্থায়িত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে কেন্দ্রীন-কণিকার ভরণ-সংখ্যা (N) এসে পড়ে। কোন কণিকাগুচ্ছের সামগ্রিক N, সমস্ত নিউট্রন ও প্রোটন বিযুক্ত সমস্ত অ্যান্টিনিউট্রন ও অ্যান্টি-প্রোটনের সমান। ফলে p, $\bar{P}$ দাঁড়ালো $e^{\pm}$ এর মত স্থায়ী; কারণ কেন্দ্রীন-কণিকা ভরণ-সংখ্যাযুক্ত—এরা ক্ষুদ্রতম কণিকা। তাই এদের ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা নেই।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মৌলিক কণার এই সব আবিষ্কারে তেমন কোন জটিল প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু এই সময় ম্যাঞ্চেষ্টারে রচেষ্টার ও বাটলার মেঘকক্ষে দুটি ছবি পান, যাতে মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এক নতুন চিন্তাধারা দেখা যায়। ৩(ক) চিত্র ১ ও ২ চিহ্নিত দুটি মৌলিক কণার গতিপথ থেকে জানা গেল যে, এরা ইলেকট্রনের ১০০০ গুণ ভারী কোন বিদ্যুৎহীন মৌলিক কণার উপজাত। ৩(খ) চিত্রে এই রকম একটি বক্রগতিপথবিশিষ্ট মৌলিক কণা বিদ্যুৎযুক্ত দেখা গেল। তার উপজাত একটি

ভর | ১৯৪৭

$\bar{p}$ $\bar{n}$ | n p | μ^- μ^+ e^- e^+ ν $\bar{\nu}$ | π^- π^0 π^+ γ

১০০০ মি: ই: ভো:
১০০ মি: ই: ভো:
১ মি: ই: ভো:
০ মি: ই: ভো:

ভরণ	-১ ০	০ +১	-১ ০ +১	-১ ০ +১
ঘূর্ণন সংখ্যা	½	½	½ ½	০ এবং ১
N	-১	১	০ ০	০

২নং চিত্র।

বিদ্যুৎহীন কণা, যা ছবিতে ধরা পড়ে নি ও আর একটি বিদ্যুৎযুক্ত কণা বক্রবিন্দু থেকে বেরিয়েছে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে পাওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা ইমালসনের ছবিতে τ টাউ নামক একটি ভারী মৌলিক কণার সন্ধান পেলেন, যা তিনটি π মেসনে ভেঙে পড়ে। এই সব নতুন কণিকার শ্রেণী অপরিচিত কণা বলে আখ্যাত হলো। বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট তেজের নীচে সংঘাত হলে এসব কণিকার জন্ম হয় না; কারণ এরা যথেষ্ট ভারী। নভোরশ্মিতে এই রকম তেজ রয়েছে বলেই এই রকম কণিকার সন্ধান পাওয়া গেল। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ব্রুকহাভেন জাতীয় গবেষণাগারে কস্‌মোট্রন নামক উচ্চ তেজসম্পন্ন কণা সৃষ্টির যন্ত্র তৈরী হওয়ায় নভোরশ্মি ছাড়াও গবেষণাগারে এসব মৌলিক কণার সাক্ষাৎ পাওয়া
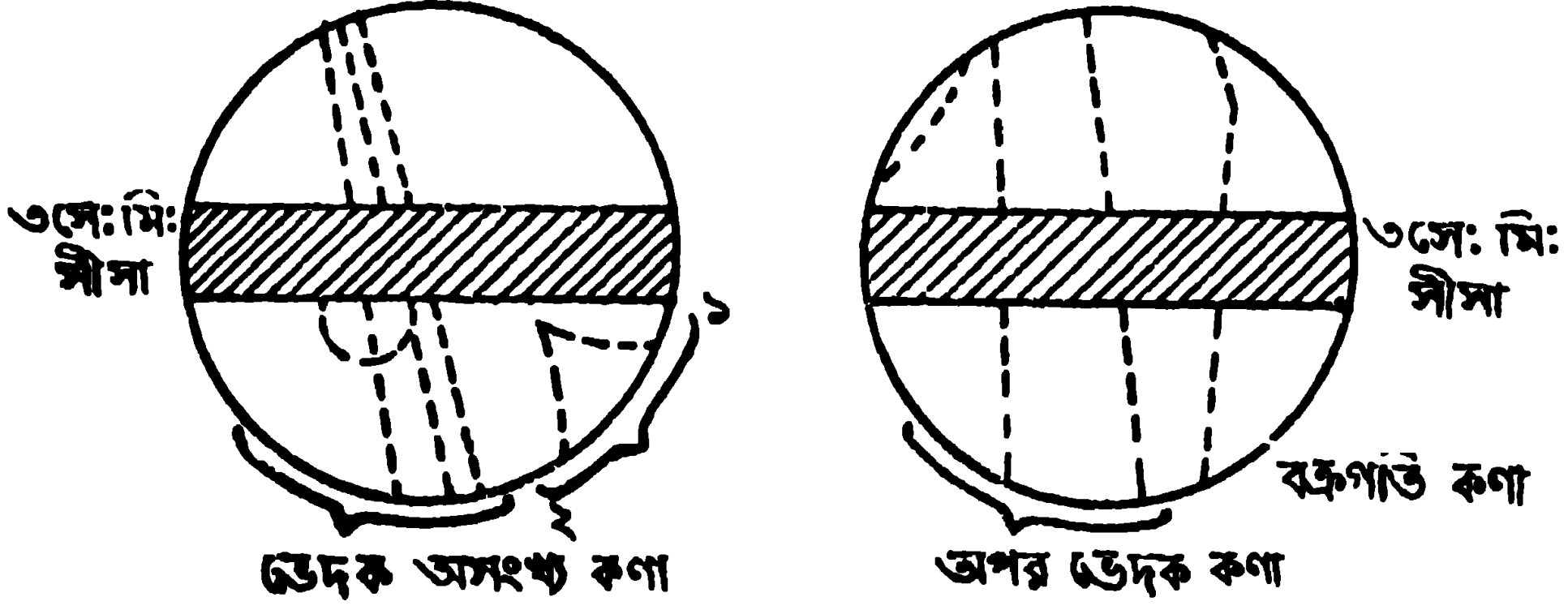
৩নং চিত্র। ক খ

	এ্যান্টি বেরিয়ন	বেরিয়ন	লেপটন	এ্যান্টি লেপটন	বোসন
ভরণ	-১ ০ +১	-১ ০ +১	-১ ০	-০ +১	-১ ০ +১
ঘূর্ণন সংখ্যা	১/২	১/২	১/২	১/২	০ এবং ১
N	-১	১	০	০	০
L	০	০	১	-১	০

৪নং চিত্র।

গেল। ৪নং চিত্রে ১৯৬১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মোট ৩০টি মৌলিক কণা দেখানো হয়েছে।

সাধারণতঃ এদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে মৌলিক কণাগুলি বেরিয়ন ও অ্যান্টিবেরিয়ন; দ্বিতীয় শ্রেণীতে লেপ্‌টন ও অ্যান্টিলেপ্‌টন, তৃতীয় শ্রেণীতে হলো বোসন। প্রত্যেক শ্রেণীতে বিন্দু-রেখাটির দু-দিকে কণা ও বিপরীত কণা দেখানো হয়েছে। বৃত্তাঙ্কিত কণাগুলি এখনও অনাবিষ্কৃত, কিন্তু তাদের অস্তিত্বের সম্ভাবনা দেখা গেছে। এই চিত্রে লেপ্‌টন-সংখ্যা দেখানো হয়েছে। কোন বিক্রিয়ায় যেমন ভরণ, ঘূর্ণন-সংখ্যা বুদ্বুদকক্ষ (Bubble chamber) নামক এক জটিল যন্ত্রের আবিষ্কার করেন গ্লেসার। বীয়ারের বোতলে অসম কয়েকটি বিন্দুতে বীয়ারের বুদ্বুদ জমতে দেখে তাঁর ধারণা হয় যে, বিদ্যুৎযুক্ত আয়নেও বুদ্বুদ জমা হবে। আসল যন্ত্রে স্ফুটনাঙ্কের কাছাকাছি অতি উত্তপ্ত কোন তরল পদার্থ রাখা হয়। তার ভিতর দিয়ে কোন উচ্চ তেজসম্পন্ন কণা প্রবেশ করলে যে আয়নের সৃষ্টি হয়—সেই আয়নে তরল পদার্থটির বুদ্বুদ জমায় ও ফটোগ্রাফে কণিকার গতিপথ ধরা পড়ে। তরল হাইড্রোজেন ভর্তি এই রকম বুদ্বুদকক্ষের একটি ছবি ৫নং চিত্রে
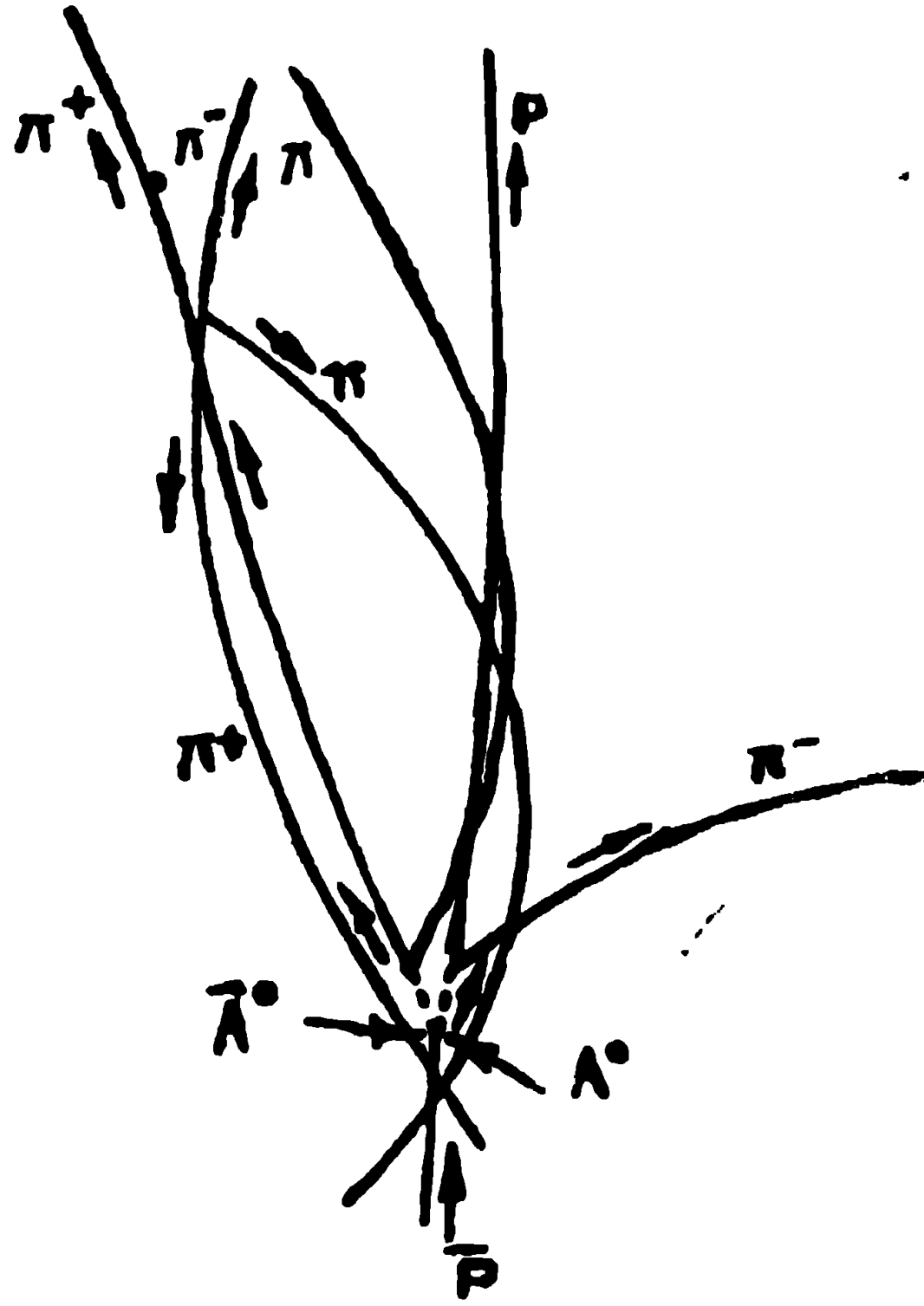
৫নং চিত্র।

কেন্দ্রীন ভরণ-সংখ্যা (N)-এর নিত্যতা রক্ষা হয়, সেরূপ লেপ্‌টন-সংখ্যাও নিত্য থাকে। উদাহরণ-স্বরূপ—

$$n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}$$
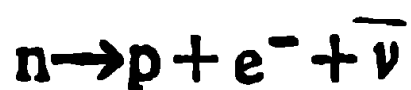
এখানে লেপ্‌টন-সংখ্যা বিক্রিয়ার আগে ও পরে ০ আছে।

মেঘকক্ষে সাধারণতঃ নিম্নতর তেজের কণা ধরা পড়ে—কিন্তু উচ্চতর তেজের মৌলিক কণার জন্যে দেখানো হলো। এতে একটি অ্যান্টিপ্রোটন বুদ্বুদ-কক্ষের হাইড্রোজেনের সংঘাতে বিভিন্ন কণিকার জন্ম দিয়েছে।

$$\bar{p} + p \rightarrow \Lambda^{\circ} + \Lambda^{\circ}$$

$$\Lambda^{\circ} \rightarrow \pi^{-} + p$$

$$\bar{\Lambda}^{\circ} \rightarrow \pi^{+} + \bar{p}$$

$$\bar{p} + p \rightarrow \pi^{+} + \pi^{+} + \pi^{-} + \pi^{-}$$
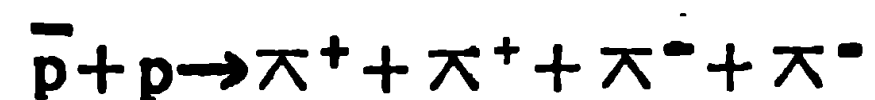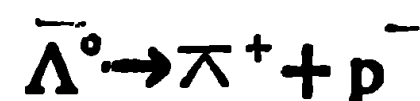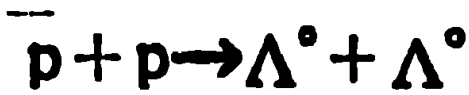
এইসব প্রক্রিয়ায় ভরণ-সংখ্যা, লেপ্‌টন-সংখ্যা,

কেন্দ্রীন ভরণ-সংখ্যা প্রভৃতির নিত্যতা রক্ষিত হয়েছে। পাওয়েল আবিষ্কৃত τ (টাউ) মেসন এখন K মেসন নামে খ্যাত। পাই মেসনদের পায়ন, মিউ মেসনদের মিউওন, K মেসনদের কেওন ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়।

গবেষণাগারে এসব মৌলিক কণা সৃষ্টি করা হয় বিভিন্ন কণা-ত্বরণযন্ত্রের সাহায্যে। ভ্যান্‌ডিগ্রাফ ও কক্‌রফ্‌ট্‌-ওয়াল্টনের যন্ত্র ছাড়া সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন, বিভাট্রন ও কস্‌মোট্রন জাতীয় যন্ত্র দিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ১০ বিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টযুক্ত কণিকার সৃষ্টি করা যায়। ৬নং লেখচিত্রে বিংশ-শতাব্দীর কয়েক বছরে গবেষণাগারে কণা-ত্বরণ যন্ত্রে প্রাপ্ত মৌলিক কণার তেজের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

এসব তেজসম্পন্ন মৌলিক কণা যে সব বিভিন্ন যন্ত্রে ধরা পড়ে এবং তাদের তেজ ও অন্যান্য ধর্ম মাপা যায়—সে সব কণাবীক্ষণ যন্ত্রের তালিকা দেওয়া হলো।

(১) আয়নকক্ষ
(২) গাইগার কাউন্টার
(৩) প্রতিপ্রভ কাউন্টার
(৪) শেরেনখভ্‌ কাউন্টার
(৫) মেঘকক্ষ
(৬) বুদ্‌বুদকক্ষ
(৭) ফটোগ্রাফিক ইমালসন্‌
(৮) সেমিকণ্ডাক্টর

কণা-ত্বরণযন্ত্র ও উল্লিখিত কণাবীক্ষণ যন্ত্রগুলি

১০০বি:ই:ভো
১০বি:ই:ভো:
১বি:ই:ভো:
১০০মি.ই:ভো:
১০মি:ই:ভো:
১মি.ই:ভো:
১৯৩০ ১৯৪০ ১৯৫০ ১৯৬০

৬নং চিত্র।

জটিলতা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বহু বৈজ্ঞানিক ও একত্র সমন্বয় ছাড়া এসব গবেষণা সম্ভব নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে বহু বৈজ্ঞানিক এসব মৌলিক কণার ধর্ম ও স্বরূপ সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছেন—আজ পর্যন্ত অনেক কিছুই জানা গেছে, তবু মৌলিক কণার রহস্যের অন্ত নেই। হয়তো ভবিষ্যৎ তার সমাধান করবে।

টেলিভিসন

জয়ন্ত বসু

উত্তর ইংল্যাণ্ডের এক বড় সহর ম্যাঞ্চেষ্টার। তার দক্ষিণ প্রান্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাস। ভিতরের লাউঞ্জ। এখানে ওখানে ছড়ানো কয়েকটি সোফা। এক কোণে টেবিলের উপর বড় একটি টেলিভিসন সেট।

লণ্ডনে টেম্‌সের ধারে সেই যে প্রকাণ্ড ঘড়িটা, বিগ্‌বেন যার নাম, ঘং ঘং করে সে রাত বারোটা ঘোষণা করলো। টেলিভিসনের পর্দায় সেটা ফুটে ওঠে এবং তখনকার মত টেলিভিসনের কার্যসূচীর সমাপ্তি। ব্রায়ান ওয়াকার ও বারীন রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই স্নাতকোত্তর ছাত্র, এতক্ষণ টেলিভিসন ওরফে টেলি (টেলিভিসনের ওটা আদরের ডাক নাম) উপভোগ করছিল। ব্রায়ান উঠে গিয়ে সুইচটি বন্ধ করে দেয়। ফিরে এসে সোফায় বসতে বসতে বলে:

আচ্ছা বারীন, তুমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র, টেলির কার্যকারিতার পেছনের কৌশলটা কি, একটু বুঝিয়ে বল দেখি।

বারীন বোঝে, শনিবার রাতে এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া ব্রায়ানের স্বভাববিরুদ্ধ, বেশ আরো কিছুক্ষণ সময় সে এখন কাটাতে চায়। বারীন তাই কিঞ্চিৎ বিশদভাবেই ব্যাখ্যা সুরু করে:

রেডিও ও সিনেমার কৌশল যদি তোমার জানা থাকে, টেলির কার্যকারিতা বুঝতে তোমার অসুবিধা হবে না। রেডিওর ক্ষেত্রে কি হয় জান তো? প্রেরক-যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সম্মুখে কোন শব্দের সৃষ্টি হলে বায়ুর চাপের যে তারতম্য ঘটে, সেই অনুযায়ী মাইক্রোফোনের ভিতরের বৈদ্যুতিক সার্কিটের অংশবিশেষ নড়তে থাকে। ফলে ঐ অংশের বৈদ্যুতিক গুণও অনুরূপভাবে পরিবর্তিত হয় এবং সার্কিটে শব্দ-তরঙ্গের প্রতিকৃতিস্বরূপ একটি বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অতঃপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গটিকে পরিবর্ধিত করে একটি বাহক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। বাহক তরঙ্গটি শব্দ-তরঙ্গের তুলনায় অনেক দ্রুত স্পন্দনশীল। যাহোক, সমগ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গটি এরিয়েলের সাহায্যে বেতার-তরঙ্গরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে ঐ বেতার-তরঙ্গ গৃহীত হয় এবং তখন বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। সেই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে বাহক তরঙ্গটিকে এরপর বাদ দেওয়া হয় ও মূল বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় গ্রাহক-যন্ত্রের লাউড-স্পীকারে পাঠানো হয়ে থাকে। লাউড-স্পীকারে একটি চুম্বকের নিকটস্থ তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঐ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ফলে কুণ্ডলীটি আন্দোলিত হতে থাকে ও কুণ্ডলী-সংলগ্ন একটি বিশেষ কাগজের চোঙা নড়তে থাকে। লাউড-স্পীকারের সম্মুখস্থ বায়ুতে এর ফলে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ শব্দ প্রেরক-যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সম্মুখস্থ শব্দের অনুরূপ। এভাবে রেডিওতে দূর-দূরান্তের শব্দ শুনতে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। টেলিভিসনের ক্ষেত্রেও একই ধরণের কৌশলে শুধু শব্দই নয়, ছবিও পাঠানো হয়ে থাকে। তবে ছবির বেলায় অবশ্য শব্দ-তরঙ্গের পরিবর্তে আলোক-তরঙ্গের প্রয়োগ করা হয়।

যে কোন দৃশ্যকে আমরা দেখতে পাই, তাথেকে প্রতিফলিত আলোক-তরঙ্গ আমাদের চোখে এসে পৌঁছয় বলে। কোন দৃশ্যের ছবি টেলিভিসনে পাঠাতে হলে টেলিভিসনের প্রেরক-যন্ত্রের ক্যামেরা দৃশ্যটির সম্মুখে রাখা হয়। দৃশ্যটি

থেকে আগত আলোক-তরঙ্গ ক্যামেরার ভিতর একটি লেন্সের সাহায্যে বিশেষ বস্তুর এক পর্দার উপর পড়ে' সেখানে একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি করে। পর্দার ঐ বস্তুর বৈশিষ্ট্য এই যে, ওর যে অংশে যে পরিমাণ আলো পড়ে, সেই অংশ থেকে সেই অনুপাতে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং যেহেতু ইলেকট্রন কণিকা নেগেটিভ বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন, সেহেতু পর্দার ঐ অংশ ইলেকট্রন হারাবার ফলে একই অনুপাতে পজিটিভ-বিদ্যুৎ-শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এভাবে ক্যামেরার সম্মুখস্থ দৃশ্যটির একটি বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি পর্দার উপর গড়ে ওঠে। পর্দাটির গঠন-বৈশিষ্ট্যের ফলে ঐ প্রতিকৃতি অনেকগুলি অংশ বা উপাদানে বিভক্ত হয়। ক্যামেরার অন্যদিক থেকে একটি ইলেকট্রন-গুচ্ছকে পর্দার উপর ফেলা হয় এবং যখন যে উপাদানের উপর ইলেকট্রনগুচ্ছ এসে পড়ে, তখন সেই উপাদানের বিদ্যুৎ-শক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একের পর এক পর্দার সমস্ত উপাদানগুলির উপর ইলেকট্রনগুচ্ছকে ফেললে সমগ্র প্রতিকৃতির বিভিন্ন অংশের বিদ্যুৎ-শক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি সম্ভব হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করা হয় আই-কোনোস্কোপ ক্যামেরায়। টেলিভিসনের যত প্রকার ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হয়, ঐতিহাসিক ভাবে এটি তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম। সর্বাপেক্ষা অধিক যে ক্যামেরা এখন ব্যবহৃত হয়, তার নাম ইমেজ অর্থিকোন। এই ক্যামেরায় দৃশ্যের আলো অনুযায়ী ক্যামেরার বিশেষ পর্দা থেকে ইলেকট্রন নির্গত হলে আর একটি টার্গেট প্লেটের উপর তাদের সংহত করা হয় এবং টার্গেট প্লেটে দৃশ্যের যে বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতি গড়ে ওঠে, ইলেকট্রন-গুচ্ছের সাহায্যে তদনুযায়ী বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

যাহোক, অতঃপর রেডিওর প্রক্রিয়ার মতই ক্যামেরা থেকে বহির্গত বিদ্যুৎ-তরঙ্গকে পরিবর্ধিত করে একটি বাহক বিদ্যুৎ-তরঙ্গের উপর চালানো হয় এবং এরিয়েলের সাহায্যে সমগ্র বিদ্যুৎ-তরঙ্গটি বেতার-তরঙ্গরূপে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে বেতার-তরঙ্গটি গৃহীত হলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে তার রূপান্তর ঘটে। ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ থেকে বাহক তরঙ্গটি এরপর বর্জিত হয় ও মূল তরঙ্গকে পরিবর্ধিত অবস্থায় পিক্‌চার টিউবে প্রেরণ করা হয়।

ঐ পিক্‌চার টিউবের একধারে একটি পর্দা আছে, যার উপর টেলিভিসনের ছবি ফুটে ওঠে। পিক্‌চার টিউবের অন্য ধার থেকে একটি ইলেকট্রন-গুচ্ছ এসে পর্দাটির উপর পড়ে। পর্দাটির ভিতরের দিকে লাগানো থাকে ফস্‌ফর নামে একটি প্রতিপ্রভ পদার্থ। ঐ পদার্থের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওর উপর ইলেকট্রন এসে পড়লে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও গতির অনুপাতে তাথেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। পিক্‌চার টিউবে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রেরিত হয়, সেটি ইলেকট্রন-গুচ্ছের তীব্রতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ অনুযায়ী আলো পিক্‌চার টিউবের পর্দা থেকে নির্গত হয়। প্রেরক-যন্ত্রের ক্যামেরায় দৃশ্যের বৈদ্যুতিক প্রতিকৃতির উপাদানগুলিকে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে রূপান্তরের জন্যে যে ভাবে নির্বাচন করা হয়, সেই একই ক্রমানুযায়ী পিক্‌চার টিউবের ইলেকট্রনগুচ্ছকে পর্দার বিভিন্ন অংশে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। ফলে পিক্‌চার টিউবের পর্দায় দূরস্থিত ক্যামেরার সম্মুখের ছবি দেখতে পাওয়া যায়।

অবশ্য দৃশ্যের ছবিটিকে নিখুঁতভাবে দেখবার জন্যে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, ছবিকে যে উপাদানগুলিতে ভাগ করা হয়, সেগুলি যত ক্ষুদ্রায়তনের হবে, ছবিটি ততই নিখুঁতভাবে দেখা যাবে। কেন না, একটি উপাদানের মধ্যে যদি আলো-ছায়ার তারতম্য থাকে, ছবিতে সেটি ধরা দেবে না। কাজেই উপাদান এত ক্ষুদ্র হওয়া উচিত, যাতে তার মধ্যে আলো-ছায়ার তারতম্য না থাকে বা থাকলেও যৎসামান্য। একই কারণে, জান বোধ হয়, ফটোগ্রাফীর প্লেট বা

ফিল্মের উপাদানও ক্ষুদ্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। টেলিভিসনের এক একটি ছবির উপাদানের সংখ্যা সাধারণতঃ লক্ষাধিক হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ, উপাদানগুলিকে অত্যন্ত দ্রুত একের পর এক উপস্থাপিত করতে হয়। কোন একটি উপাদানকে আমাদের চোখের সামনে রেখে যদি সেটিকে সরিয়ে নেওয়া হয়, আরো সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আমাদের মনে হবে, সেটি বুঝি উপস্থিত রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিশক্তির এই বৈশিষ্ট্যের ফলে একটি ছবির উপাদানগুলিকে যদি দ্রুত একের পর এক উপস্থাপিত করা হয়, তবে আমাদের মনে হবে, আমরা বুঝি সম্পূর্ণ ছবিটিকেই একসঙ্গে দেখছি।

টেলিভিসনের ছবির উপাদানগুলিকে যে ভাবে নির্বাচন করা হয়, তার নাম স্ক্যানিং। কোন একটি পৃষ্ঠা পড়বার সময় পাঠকের চোখ যে ভাবে শব্দ চয়ন করে, সেই একই পদ্ধতি। ছবির উপরের বাঁ দিক থেকে সুরু করা ও এক লাইন বরাবর ডান দিকে এগিয়ে যাওয়া। লাইনটি শেষ হলে দ্রুত দ্বিতীয় লাইনের বাঁ দিক থেকে ফের সুরু করা ও লাইনটি ধরে ডান দিকে এগুনো। এভাবে লাইনের পর লাইন অতিক্রম করে একেবারে তলা পর্যন্ত নেমে যাওয়া।

বৃটেনে টেলিভিসনের এক একটি ছবিতে লাইনের সংখ্যা ৪০৫, আমেরিকায় ৫২৫, ফ্রান্সে ৪৪১ ও ৮১৯, রাশিয়া ও অন্যান্য বেশীর ভাগ দেশে ৬২৫, আমাদের ভারতবর্ষেও ঐ ৬২৫। লাইনের সংখ্যাকে আন্তর্জাতিকভাবে ৬২৫ হিসাবেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

স্ক্যানিং-এর অবশ্য প্রয়োজনীয়তা ছিল না, যদি ছবির প্রতিটি উপাদানের জন্য পৃথক বৈদ্যুতিক সার্কিটের ব্যবস্থা থাকতো। উপাদানগুলিকে তখন এক সঙ্গে পাঠানো সম্ভব হতো এবং পিক্চার টিউবের পর্দায় সেগুলিকে একসঙ্গে উপস্থাপিত করলে সম্পূর্ণ ছবিটিকে দেখা যেত। কিন্তু এক একটি ছবির লক্ষাধিক উপাদানের জন্যে লক্ষাধিক সার্কিটের প্রয়োজন। প্রতিটি প্রেরক-যন্ত্রে, বিশেষ করে প্রতিটি গ্রাহক-যন্ত্রে, লক্ষাধিক সার্কিটের ব্যবস্থা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। স্ক্যানিং-এর ব্যবস্থায় একটি সার্কিটের সাহায্যেই সমস্ত উপাদানগুলিকে পাঠানো হয়ে থাকে।

স্ক্যানিং সম্পর্কে আরো দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে রাখি। স্ক্যানিং-এর সময় প্রেরক-যন্ত্রের ক্যামেরায় ঠিক যতক্ষণ অন্তর অন্তর লাইনগুলি উপস্থাপিত হয়, গ্রাহক-যন্ত্রের পিক্চার টিউবে ঠিক ততক্ষণ অন্তরই আবার লাইনগুলিকে উপস্থিত করা প্রয়োজন। এর জন্যে প্রতি লাইনের সুরুতে একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক সঙ্কেত (Synchronising pulse) টেলিভিসনের বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে প্রেরিত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে ঐ সঙ্কেতটিকে বেছে নিয়ে ওর সাহায্যে সিন্‌ক্রোনাইজেসনের কাজ সমাধা করা হয়।

আবার প্রতিটি লাইনের শেষ থেকে পরের লাইনের সুরু পর্যন্ত যে সমান সময় ক্যামেরা ও পিক্চার টিউবের পর্দায় ইলেকট্রনগুচ্ছের আঘাত লাগে, সে সময়টুকুর জন্যে বন্ধ রাখা হয়। এর জন্যে Synchronising pulse-এর মত আর একটি বৈদ্যুতিক সঙ্কেত (Blanking pulse) টেলিভিসনের বেতার-তরঙ্গের সঙ্গে পাঠানো হয়ে থাকে।

ব্রায়ান এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে বারীনের কথা শুনছিল। এবার বললো, ব্যাপারটা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, তবে কিঞ্চিৎ ঘোরালো। মগজের গোড়ায় একটু ধোঁয়া দেওয়া আবশ্যক—বলে' পকেট থেকে পাইপ বের করে তামাক ভরতে লাগলো। তারপর বললে—আচ্ছা বন্ধু, টেলিভিসনে একটি ছবিকে কি ভাবে পাঠায়, তাতো খানিক বুঝলাম। কিন্তু গতিশীল দৃশ্যকে কেমন করে দেখানো হয়?

যেমন করে সিনেমায় দেখানো হয়ে থাকে, বারীন বলে। একটি ঘটনা যখন ঘটছে, পরপর তার

অনেকগুলি ছবি তুলে সেই ছবিগুলিকে যদি দ্রুত ক্রমানুযায়ী চোখের সামনে উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে মনে হবে ঘটনাটিই বুঝি আমরা দেখছি। এর মূলেও অবশ্য আমাদের দৃষ্টির স্থায়িত্ব, দৃষ্টির যে বৈশিষ্ট্যের কথা একটু আগে তোমাকে বলেছি। কত দ্রুত ছবিগুলি দেখানো হয়—শোন। সিনেমায় প্রতি সেকেণ্ডে ২৪টি, টেলিতে আরো বেশী, সেকেণ্ডে ২৫ বা ৩০টি। আর একটি বক্তব্য আছে। ছবিগুলির উপস্থাপনের দ্রুততা বাড়াবার জন্যে সিনেমায় প্রতিটি ছবিকে পরপর দু-বার দেখানো হয়, আর টেলিতে প্রতিটি ছবিকে দুটি অংশে ভাগ করে পরপর সে দুটি দেখানো হয়। টেলিভিসনের এই প্রক্রিয়ার নাম ইণ্টারলেস্‌ড্‌ স্ক্যানিং, অর্থাৎ যে স্ক্যানিং-এ অন্তর্বুর্ণনির ব্যবস্থা রয়েছে। তোমাকে তো বলেছি স্ক্যানিং-এর সময় প্রতিটি ছবিকে অনেক-গুলি লাইনে ভাগ করে ফেলা হয়। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ইত্যাদি অর্থাৎ বেজোড় লাইনগুলি থাকে ছবির প্রথম অংশে। আর দ্বিতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি জোড় লাইনগুলি থাকে ছবির দ্বিতীয় অংশে। প্রতি লাইনের শেষে যেমন, ছবির দুটি অংশের প্রতিটির শেষেও তেমনি Synchronising pulse ও Blanking pulse পাঠাবার ব্যবস্থা আছে।

বব অ্যাড্‌লার ঘরে ঢোকে। বব মার্কিনদেশীয় ছাত্র। ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি পড়ছে। বলে :

টেলি বন্ধ কেন ?—বারোটা বেজে গেছে বুঝি ?

ব্রায়ান ঘাড় নেড়ে জানায়, ববের আন্দাজই ঠিক। তারপর বলে :

টেলি বন্ধ বটে, তবে বারীন টেলিভিসন সম্বন্ধে আমাকে বেশ খানিকটা জ্ঞান দিয়ে দিয়েছে।

টেলির কত বয়স হবে বল তো বারীন, বব জিগ্যেস করে। মানে টেলি তো অত্যন্ত জনপ্রিয়, ইউরোপ কি আমেরিকায় এত জনপ্রিয় বোধকরি আর কেউ নেই! আমিও—বুঝলে, আমিও চাই ঠিক ঐ রকম জনপ্রিয় হতে। তাই জানতে চাই, টেলির কতদিন লেগেছে এই রকম জনপ্রিয়তা অর্জন করতে ?

বারীন : টেলিভিসনের সূত্রপাত, বলতে গেলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, পাওল নিপকাও নামে একজন জার্মান বৈজ্ঞানিক যখন স্ক্যানিং-এর একটি যন্ত্র তৈরী করেন। টেলিভিসনের অন্যান্য কৌশল সম্পর্কেও পাওলের মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা ছিল, কিন্তু বাস্তব অবস্থা তখন টেলি তৈরির অনুকূল ছিল না, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির তখনো উদ্ভব হয় নি। প্রকৃত টেলিভিসনের জন্মদাতা বলা চলে জন লগি বেয়ার্ডকে। এই স্কটল্যাণ্ডীয় ভদ্রলোকটি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ১৯২৩ সালে স্বাস্থ্যহানির দরুণ তাঁকে ব্যবসায় ছেড়ে দিতে হয়। তিনি কিন্তু অবদমিত না হয়ে টেলিভিসন প্রস্তুতিতে মনোনিবেশ করেন। ১৯২৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী সরকারী-ভাবে টেলি প্রথম প্রদর্শিত হলো ; রয়্যাল ইন্‌ষ্টিটি-উটের সভ্যদের বেয়ার্ড তাঁর যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখালেন। লণ্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটনের বিজ্ঞান যাদুঘরে যদি যাও, বেয়ার্ড-নির্মিত প্রথম টেলিভিসন যন্ত্রটি সেখানে দেখতে পাবে। দেখে অবাক হবে যে, নেহাৎ সাধারণ যন্ত্রপাতি, যেমন ধর পুরনো সাইকেলের কলকব্জা—এই সব দিয়ে এই যন্ত্রটি নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমানে যে টেলি দেখছ, এটা কিন্তু ঠিকভাবে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপিত হয় ১৯৩৬ সালে —বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন, সংক্ষেপে যাকে বি বি সি বলা হয়, লণ্ডনের আলেকজাণ্ড্রা প্যালেস থেকে যখন টেলিভিসনের প্রচার সুরু করলো। টেলিভিসনের ব্যাপারে ঐ সময় বৃটেন ও আমে-রিকার মধ্যে বেশ কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল। বৃটেনেরই অবশ্য জয় হয়। আমেরিকায় জনসাধা-রণের জন্যে টেলিভিসনের প্রচার সুরু হয় ১৯৪১ সালে অর্থাৎ বৃটেনের ৫ বছর পরে।

ব্রায়ান বলে ওঠে: থ্রী চীয়ার্স ফর বৃটানিয়া, হিপ্ হিপ্ হুররে!

বারীন: তোমার অত উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণ নেই, ব্রায়ান। বর্তমানে আমেরিকা ও রাশিয়া বৃটেনের চেয়ে এগিয়ে গেছে। আমেরিকা এবং রাশিয়ার মস্কো ও লেনিনগ্র্যাডে এখন রঙীন টেলিভিসন প্রায় নিয়মিত চালু হয়ে গেছে, যা নিয়ে বৃটেনে এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

বব খুশী হয়ে নড়েচড়ে বসে। বলে—আচ্ছা, টেলিতে রঙীন ছবি দেখাবার কৌশলটা কি

বারীন: মূল কথাটি কি, বলছি। লাল, নীল ও সবুজ, এই তিন বর্ণের যথাযথ সংমিশ্রণের ফলে যে কোন বর্ণের সৃষ্টি করা যেতে পারে। অপর পক্ষে যে কোন বর্ণকে বিশ্লেষণ করে ঐ তিনটি বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়। ঐ তিনটিকে তাই প্রাথমিক বর্ণ বলা হয়ে থাকে। টেলিভিসনের ক্যামেরার সামনে যে দৃশ্য থাকে, তাথেকে বিচ্ছুরিত আলোককে ফিল্টারের সাহায্যে প্রাথমিক বর্ণ তিনটির আলোক-তরঙ্গে বিভক্ত করা হয়। তারপর ঐ তিনটি আলোক-তরঙ্গ যথারীতি বেতার-তরঙ্গে রূপান্তরিত অবস্থায় প্রেরিত হয়। গ্রাহক-যন্ত্রে এর ফলে তিনটি বিভিন্ন বিদ্যুৎ-তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ঐ তরঙ্গ তিনটি ও গ্রাহক-যন্ত্রের পিক্‌চার টিউবের পর্দায় তিন ধরণের ফস্‌ফরের সাহায্যে প্রেরক-যন্ত্রের ক্যামেরার সম্মুখস্থ দৃশ্যটির রঙীন প্রতিকৃতি সঠিক দেখতে পাওয়া যায়। ঐ তিন ধরণের ফস্‌ফরের বৈশিষ্ট্য এই যে, ওদের এক একটি থেকে এক এক বর্ণের আলোকই কেবল বিচ্ছুরিত হয়, একটি থেকে লাল, আর একটি থেকে নীল ও অপরটি থেকে সবুজ

বব: আচ্ছা—বারীন, রেডিওর তো আমাদের দেশের কথাবার্তা এখানে বসে শুনতে পাই। টেলিভিসনের ছবি দেখতে পাই না কেন?

বারীন: দূরপাল্লার বেতার-তরঙ্গ প্রেরক-যন্ত্রের এরিয়েল থেকে গ্রাহক-যন্ত্রের এরিয়েলে কি ভাবে সাধারণতঃ এসে উপস্থিত হয়, জান তো? ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ থেকে ৫০০ কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত যে আয়নমণ্ডল আছে, তাথেকে প্রতিফলিত হয়ে। টেলিভিসনের জন্যে যে বেতার-তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য রেডিওর জন্যে ব্যবহৃত বেতার-তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা অনেকখানি ছোট। ঐ বেতার-তরঙ্গ আয়নমণ্ডল থেকে প্রতিফলিত হয় না, আয়নমণ্ডল ভেদ করে চলে যায়। সে জন্যে তোমার দেশ থেকে টেলিভিসনের ছবি এদেশে সাধারণতঃ আসে না। তবে কোন কিছু থেকে টেলিভিসনের বেতার-তরঙ্গকে যদি কার্যতঃ প্রতিফলিত করা যায়, তবে রেডিওর মত টেলিও সহজে দূরপাল্লায় পাড়ি দেবে। সম্প্রতি নতুন এক ব্যবস্থায় এটি সম্ভবও হয়েছে।

ব্রায়ান: নতুন ব্যবস্থাটি কি—আমি জানি, বারীন। তুমি টেল্‌স্টারের কথা বলছো তো?

ঠিকই বলেছ ব্রায়ান, বারীন বলে। গত জুলাই মাসে আমেরিকা থেকে পাঠানো টেলিভিসনের ছবি ফ্রান্স ও বৃটেনের গ্রাহক-যন্ত্রের পর্দায় দেখতে পাওয়া যায়। ঐ টেলিভিসনের বেতার-তরঙ্গ আমেরিকা কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত টেল্‌স্টার নামক উপগ্রহ থেকে কার্যতঃ প্রতিফলিত হয়ে আসে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এমন কয়েকটি উপগ্রহের সৃষ্টি করা হবে, যাদের সাহায্যে টেলিভিসন রেডিওর মতই নিয়মিত দূর-দূরান্তে প্রচার করা চলবে।

একটু বিশদভাবে বলতে গেলে অবশ্য টেল্‌স্টার উপগ্রহ বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিতই করে নি, তার পরিবর্ধনও করেছে। বস্তুতঃ টেল্‌স্টার একটি রীলে (Relay) হিসাবে কাজ করেছে। রীলের কাজ হলো প্রেরক-যন্ত্রের দিক থেকে আগত বেতার-তরঙ্গকে গ্রহণ করে তার শক্তি বৃদ্ধি করা ও তারপর তাকে গ্রাহক-যন্ত্রের দিকে পাঠিয়ে দেওয়া। প্রসঙ্গক্রমে আমার বোধহয় বলে রাখা উচিত যে, টেলিভিসনের বেতার-তরঙ্গ রীলের

সাহায্যে স্থলপথে এখন দূরের পথে নিয়মিত পাঠানো হয়ে থাকে। তবে সে ক্ষেত্রে টেল্‌স্টারের মত একটি নয়, অনেকগুলি রীলেকে পরপর ব্যবহার করতে হয়। তোমার দেশে—স্যান্‌ফ্র্যান্সিস্কোয় বসে যে নিউইয়র্কের ছবি দেখতে পাওয়া যায়, সেটি সম্ভব হয় এরূপ পরপর অনেকগুলি রীলের সাহায্যে। তোমাদের মনে আছে বোধহয়, কিছুকাল আগে মস্কোর ঘটনা বৃটেনে টেলিতে দেখানো হয়েছিল, আর লণ্ডনের ঘটনা রাশিয়াতে। এই ঘটনার পিছনেও ছিল ঐ রীলের কার্যকারিতা। ইউরোপের অনেকখানি জুড়ে টেলিভিসনের যে সংযোগ পথ রয়েছে, তার নাম ইউরোভিসন। ফিনল্যাণ্ডের হেলসিংকির মাধ্যমে মস্কো এই ইউরোভিসনের সঙ্গে সংযুক্ত। আবার সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মস্কো, লেনিনগ্রাড, কীয়েভ—এই সব সহরের মধ্যে নিজস্ব সংযোগের ব্যবস্থা আছে। বর্তমান সপ্তবর্ষ পরিকল্পনায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সুদূরতম অঞ্চলগুলিতেও এই ব্যবস্থা বিস্তৃত করবার কথা রয়েছে।

বব: টেলির জয়যাত্রা অনেক দূর এগিয়েছে বুঝলাম। কিন্তু বারীন, এখনো তো এমন দেশ রয়েছে, যেখানে টেলিভিসন অনুপস্থিত বললেই চলে। তোমার দেশেই ধর না, অবস্থাটা কি?

আমাদের দেশ যে একেবারে পিছিয়ে আছে, তাও নয়, বারীন জানায়। দিল্লীতে তো নিয়মিত ভাবে টেলিভিসন চালু হয়ে গেছে। বর্তমানে অবশ্য সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে প্রচারিত হয়। সামাজিক অনুষ্ঠান থাকে সপ্তাহে দু-দিন, বুধবার ও রবিবার সন্ধ্যার দিকে ঘণ্টাখানেক করে। টেলি দেখবার জন্যে দিল্লী ও দিল্লীর আশেপাশে এখন ১৮০টি টেলি ক্লাবও গড়ে উঠেছে। এছাড়া স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে সপ্তাহের প্রথম পাঁচ দিন কিছুক্ষণের জন্যে টেলিভিসনে শিক্ষার ব্যবস্থাও রয়েছে। ১৯২টি স্কুলে টেলিভিসন সেট আছে। আশা করা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে দিল্লীর সমস্ত স্কুলেই টেলির ব্যবস্থা করা যাবে। বর্তমানে দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আকাশবাণী ভবন থেকে ২০ মাইল দূর পর্যন্ত টেলিভিসন দেখতে পাওয়া সম্ভব। বম্বেতেও টেলিভিসনের জন্যে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সুরু হয়েছে।

আর টেলির জয়যাত্রার কথা যখন তুললে, তখন বলতে হয় যে, টেলির জয়যাত্রাকে সঠিকভাবে বুঝতে হলে কত রকম কাজে যে তাকে নিয়োজিত করা হচ্ছে, সেটা জানা দরকার। কল-কারখানায় তো টেলির হামেশাই প্রয়োগ হয়। উদাহরণস্বরূপ, দূর থেকে কোন বস্তুকে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, টেলিভিসনের সাহায্যে তখন ঐ দূরের বস্তুটির ছবি চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার মনে কর, হাসপাতালের অস্ত্র-চিকিৎসার কক্ষে কোন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক একটি শক্ত অস্ত্রচিকিৎসা করছেন। টেলিভিসনের সাহায্যে ঐ অস্ত্রচিকিৎসার খুঁটিনাটি অনেকগুলি ক্লাসরুমে বহু ছাত্রকে এক সঙ্গে দেখানো হয়ে থাকে

টেলিভিসনের আর এক ধরণের প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য। ওয়াইট দ্বীপের কাছে সমুদ্রের ২৮০ ফুট নীচে অকর্মণ্য একটি ডুবোজাহাজকে খুঁজে বের করা ও তাথেকে লোকজনকে উদ্ধার করবার ব্যাপারে বৃটিশ নৌবাহিনী জলের তলায় টেলিভিসনকে কাজে লাগিয়েছে। ফরাসী নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন কুস্তো টেলিভিসনের সাহায্যে ভূমধ্যসাগরে নিমজ্জিত একটি প্রাচীন গ্রীসদেশীয় বাণিজ্যপোতকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন। সম্প্রতি অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগরে যে মার্কিন পারমাণবিক ডুবোজাহাজ থ্রেসার জলের নীচে নিখোঁজ হয়েছে, সেটির অনুসন্ধানের জন্যে টেলিভিসনকে কাজে লাগানো হবে বলে শোনা যাচ্ছে।

টেলিভিসনের সবচেয়ে চমকপ্রদ অবদানের কথা তোমরা নিশ্চয় জান। চন্দ্রের এক পৃষ্ঠ সব সময় পৃথিবীর দিকে ঘোরানো, অন্য পৃষ্ঠ পৃথিবী থেকে কোন সময়ই দেখা যায় না। রাশিয়ার

প্রেরিত লুনিক-৩ নামক আন্তর্গ্রহ ষ্টেশন থেকে ঐ অদৃশ্য পৃষ্ঠটির ছবি তুলে টেলিভিসনের সাহায্যে তা পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে, যা কেবল কল্পনার বিষয় ছিল, তা এখন প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে।

ব্রায়ান: জয়, টেলিভিসনের জয়! আমি বলি কি—বারীন, তোমাকে তো আমরা অনেকক্ষণ বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিলাম, এবার চল তোমার ঘরে গিয়ে টেলির একটু স্বাস্থ্যপান করা যাক।

তিন বন্ধু এবার উঠে পড়ে।

মহাকর্ষের স্বরূপ

কমলেশ মৈত্র

নিউটনের মহাকর্ষ তত্ত্ব (Theory of Gravitation) আবিষ্কারের আগে তা নিয়ে কেউ বড় একটা মাথা ঘামাতেন না। শোনা যায়, তিনি একদিন অবকাশ যাপন কালে বাগানের মধ্যে পাকা আপেল পড়তে দেখে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। অবশ্য এটা একটা নিছক কাহিনীও হতে পারে। কিন্তু লোকে বলে, সাধারণ লোকের কাছে মহাকর্ষের নিয়ম বোঝাতে গিয়ে তিনি গাছ থেকে আপেল ফল পতনের উদাহরণটা মাঝে মাঝে দিতেন।

নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্র হলো:

(ক) বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুই প্রত্যেককে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এবং

(খ) যদি M ও m ভরের (Mass) বস্তুকে পরস্পরের ভরকেন্দ্র থেকে r দূরত্বের দ্বারা পৃথক করে রাখা যায়, তবে তারা পরস্পরকে $G\frac{Mm}{r^2}$ বলে আকর্ষণ করবে। এই স্থলে G হলো মহাকর্ষীয় নিত্য সংখ্যা (Gravitational Constant)। এর মান ৬.৬৬৪ × ১০$^{-৮}$ সি. জি এস একক (ডাঃ পল হাইল; ইউ এস. ব্যুরো অফ ষ্ট্যাণ্ডার্ডস্)।

প্রকৃতপক্ষে এই মহাকর্ষ কি? কেন একটি বস্তু অপর একটি বস্তুকে আকর্ষণ করে? এই সব প্রশ্ন এই তত্ত্ব আবিষ্কারের পরেই উঠেছিল। কিন্তু তৎকালে মহাকর্ষের বিচিত্র ধর্মাবলী পর্যবেক্ষণ করা খুবই শক্ত ব্যাপার ছিল। কারণ বিজ্ঞান তখন আজকের মত এতটা উন্নত অবস্থায় ছিল না। এই কারণে সে সময়ে অনেক বিজ্ঞানী নিউটনের তত্ত্ব ভুল বলে সন্দেহ করেছিলেন। কেউ বা আবার মহাকর্ষের অস্তিত্বই সরাসরি অস্বীকার করেছিলেন। ধীরে ধীরে মহাকর্ষ তত্ত্ব অবশ্য স্বীকৃতি লাভ করে তার নির্ভুলতার জন্যেই, কিন্তু মহাকর্ষের প্রকৃতি বা স্বরূপ রহস্যেই ঢাকা রয়ে যায়। মহাকর্ষ সম্বন্ধে এই জটিলতার কারণ হলো:

(ক) মহাকর্ষ সুবিশাল দূরত্বেও তার জোর খাটায়।

(খ) বস্তুপিণ্ডসমূহের পারস্পরিক অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তদনুযায়ী মহাকর্ষীয় বলের চকিত পরিবর্তন সাধিত হয়।

(গ) মহাকর্ষীয় বলকে কোন বস্তুর দ্বারাই আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা যায় না।

নিউটন যদিও মহাকর্ষীয় সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তবুও তিনি মহাকর্ষের স্বরূপ সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করে যেতে পারেন নি। তিনি অবশ্য এই

তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সূক্ষ্ম স্থিতিস্থাপক মাধ্যম, ইথারের সাহায্য নিয়েছিলেন—যা মহাশূন্যে এবং পদার্থের আন্তরাণবিক স্থানের **(Inter-molecular space)** মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে (সে কালে এই স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের অস্তিত্বের কথা যথেষ্ট সন্দেহের চোখেই দেখা হতো; পরে মাইকেলসন ও মর্লির এক ঐতিহাসিক পরীক্ষায় এই ইথার মাধ্যমের অস্তিত্বই নাকচ হয়ে যায়)। নিউটন বলেছিলেন, মহাকর্ষীয় বল ইথারের মধ্য দিয়েই একটি বস্তু থেকে অপর একটি বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়। নিউটনের পরে কোন কোন বিজ্ঞানী এই ধারণার আরো বিশদ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। কেউ কেউ বলেছিলেন, মহাকাশ থেকে আগত একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কণিকা মহাশূন্যে ভাসমান বস্তুপিণ্ডগুলির উপর নিরন্তর আছড়ে পড়ছে। বস্তুপিণ্ড যখন মহাশূন্যে একাকী থাকে, তখন কণিকাগুলি চারদিক থেকেই সমানভাবে তার উপর আসতে পারে। ফলে বস্তুটির সাম্যাবস্থার **(State of Equilibrium)** কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু যখন দুটি বস্তু সামনাসামনি আসে, তখন একে অপরের কিছুটা অংশ আবৃত করে রাখে। ফলে মহাকাশ থেকে আগত সেই অতি ক্ষুদ্র কণিকাপুঞ্জ সেই আবৃত অংশে আর পড়তে পারে না, কিন্তু আবৃত অংশের বিপরীত দিকে তা একভাবেই এসে পড়তে থাকে—যার জন্যে উভয়ের সাম্য নষ্ট হয় এবং একে অপরের দিকে আবৃত অংশের সোজাসুজি অগ্রসর হতে থাকে। আমরা এই ক্রিয়াকেই বলি, বস্তু দুটি পরস্পরকে আকর্ষণ করছে।

উপরিউক্ত প্রকল্প দুটিকে যদি স্বীকার করতে হয়, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, মহাকর্ষের একটা নির্দিষ্ট বেগ আছে। কণিকাবাদের ক্ষেত্রেও কণিকাগুলির নিজস্ব বেগের কথা ধরতে হবে। কারণ বস্তু দুটির মধ্যবর্তী স্থানে আবদ্ধ ধাবমান কণিকাপুঞ্জ উভয়ের উপর আছড়ে পড়ে নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত মহাকর্ষীয় বল কার্যকরী হবে না; অর্থাৎ মহাশূন্যে দুটি বস্তু পরস্পরের সামনে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই মহাকর্ষ কার্যকরী হবে না—কিছুক্ষণ পরে হবে। বস্তু দুটি যদি সচল অবস্থায় থাকে, তবে তাদের উপর ক্রিয়াশীল মহাকর্ষীয় বলের পরিমাণ তাদের পারস্পরিক অবস্থান ছাড়াও তাদের গতিবেগ এবং মহাকর্ষের বেগের উপর নির্ভর করবে। এগুলির জন্যে যদি কোন সংশোধন আরোপিত না করা হয়, তবে মহাকর্ষীয় সূত্র ঠিক ভাবে প্রতিপালিত হবে না, অর্থাৎ মহাকর্ষীয় বল $1/r^2$ এর সমানুপাতিক হবে না। কিন্তু এইরূপ কোন ঘটনা পরিলক্ষিত হয় নি। সম্ভবতঃ বস্তুসমূহের গতিবেগের তুলনায় মহাকর্ষের বেগ খুব বেশী হবার জন্যে উল্লিখিত বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না—এরূপ মনে করে ল্যাপ্লাস গাণিতিক বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন। তার ফলে মহাকর্ষের বেগ যা নির্ধারিত হয়, তা আলোকের বেগের তুলনায় অবিশ্বাস্য রকম দ্রুতগামী। সুতরাং স্বভাবতঃই ব্যাপারটা সন্দেহজনক হয়ে পড়ে এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ আমরা জানতে পেরেছি যে, কোন বস্তু-কণিকা বা শক্তি-কণিকা মাধ্যমের ভিতর দিয়ে এত প্রবল বেগে অগ্রসর হতে পারে না। অতএব ইথার বা ঐ জাতীয় অন্য কোন প্রকল্পের সাহায্যে মহাকর্ষের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

মহাকর্ষীয় বলের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, কোন বস্তুর দ্বারা একে আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা যায় না—যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। যদি সম্ভব হতো, তবে তা সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণের সময় নিশ্চয়ই ধরা পড়তো। সূর্যগ্রহণের কথাই ধরা যাক। সূর্যগ্রহণের সময় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে থাকে চন্দ্র এবং সূর্যকে আড়াল করে দাঁড়ায়। এতে যদি মহাকর্ষ আংশিকভাবে

অবরুদ্ধ হতো, তবে পৃথিবীর উপর সূর্যের টান কমতো। তখন অন্যান্য গ্রহের আকর্ষণের ফলে পৃথিবী ধীরে ধীরে দূরে সরে গিয়ে অন্য কক্ষপথ ধরতো এবং গ্রহণের শেষে পুনরায় পূর্ব কক্ষপথে ফিরে আসতো। কিন্তু এরূপ ঘটতে দেখা যায় না। কাজেই বিজ্ঞানীরা মহা সমস্যায় পড়লেন—কি ভাবে মহাকর্ষের এসব বিস্ময়কর ধর্মাবলীর সুষ্ঠু ব্যাখ্যা সম্ভব ?

এর জন্যে দরকার হলো আর একজন মহা-বিজ্ঞানীর। তাঁর নাম অ্যালবার্ট আইনষ্টাইন। আইনষ্টাইন যথাকালে প্রকাশ করলেন তাঁর স্পেশাল ও জেনারেল থিওরী অব রিলেটিভিটি। স্থান ও কাল, পদার্থ ও শক্তি, মহাকর্ষ, গতিবেগ এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ—এই হলো তাঁর মোটামুটি প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই তত্ত্ব গণিতের ভাষা ভিন্ন সাধারণ ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ এর তাত্ত্বিক দুরূহতা। এর সিদ্ধান্তগুলি এতই চমকপ্রদ যে, সাধারণ লোকের কাছে তা বিভ্রান্তিকর। কিন্তু কতটা বিভ্রান্তিকর ? যেমন—

আমাদের ধারণা, স্থান (দৈর্ঘ্য × বিস্তার × উচ্চতা), কাল ও গতিবেগ—এরা প্রত্যেকই পৃথক সত্ত্বা—একের সঙ্গে অন্যের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু আইনষ্টাইন বললেন—না, তা নয়। স্থান, কাল ও গতিবেগ—এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কোন বস্তুর গতিবেগ বাড়ালেই গতিবেগের মুখোমুখি তার দৈর্ঘ্য কমবে এবং তার উপরে রাখা ঘড়িতে সময়ের গতি মন্দীভূত হতে দেখা যাবে। তবে এটা ঐ বস্তুর উপর বসে বসেই ধরা পড়বে না, কোন পৃথক স্থান থেকেই এই পরিবর্তন বোঝা যাবে। এভাবে বস্তুটিকে আলোর গতিতে চালিত করলে তার দৈর্ঘ্য হবে শূন্য, সময়ের গতি বলে কিছু থাকবে না এবং তার ভর হবে অনন্ত। সাধারণ গতিবেগের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ আলোর তুলনায় যে সব গতিবেগ একেবারেই নগণ্য) অবশ্য এই পরিবর্তন হবে যৎসামান্য—মোটেই ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু স্থান, কাল ও গতিবেগ পরস্পর নির্ভরশীল হলে কি হবে ? বিশ্বজগতের কোন বস্তুরই গতিবেগ নিরপেক্ষ নয়—সবই আপেক্ষিক (relative)। এর মধ্যে একমাত্র অপরিবর্তনীয় গতি হলো আলোকের। অতএব স্থান ও কাল যেহেতু গতিবেগের উপরে নির্ভর করে, সেহেতু তারাও আপেক্ষিক, অর্থাৎ সকল 'স্থান' ও সকল 'স্থানের সময়' একরূপ নয়।

এ তো গেল স্থান-কাল তত্ত্বের কথা। এখন মহাকর্ষ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি, দেখা যাক।

কোন বস্তুকে যদি 'শূন্য' স্থানে একটা নির্দিষ্ট গতিবেগ দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সেটা সমবেগে সরল রেখা ধরে চলবে। কিন্তু তার চলবার পথে যদি হঠাৎ আর একটা বস্তুপিণ্ড উপস্থিত করা যায়, তখন কি হবে ? তখন সে তার সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে বাঁকা পথ ধরবে। কারণ, সে ক্ষেত্রে সেটিই হবে তার পক্ষে নতুন 'সোজা পথ'। এর কারণ—মহাকর্ষের প্রভাব। কিন্তু মহাকর্ষটা কি ? আইনষ্টাইন বললেন—মহাকর্ষ হলো বিশ্বজগতের স্থান-কাল ধর্মের সম্মিলিত আত্মপ্রকাশ। মহাকর্ষ-শূন্য স্থানে, অর্থাৎ বস্তুপিণ্ডহীন মহাকাশের জ্যামিতিক গুণাগুণ থাকে এক রকম, সেখানে ইউক্লিডের জ্যামিতি খাটে। দুটি বিন্দুর মধ্যে ন্যূনতম দূরত্ব হয় সেখানে সরল রেখা। কিন্তু যেই মাত্র সেখানে একটি বস্তুপিণ্ড হাজির করা যায়, মহাকাশের জ্যামিতিক গুণও পরিবর্তিত হয় চকিতে—মহাকাশ যেন বেঁকে যায়। তখন দুটি বিন্দুর মধ্যের ন্যূনতম দূরত্ব হয়, একটি বক্র রেখা—ঠিক যেমনটি হয় একটি গোলকের উপরিতলে অঙ্কিত বিন্দুর মধ্যে যোগাযোগকারী একটি টান-করা সূতার ক্ষেত্রে। স্থানের এই বক্রতাকেই আমরা মহাকর্ষরূপে অনুভব করি।

এভাবে অগ্রসর হয়ে আইনষ্টাইন বহু বিচিত্র

ফলাফল ও মীমাংসায় উপনীত হন এবং মহাকর্ষের বিস্ময়কর ভেদ্যতা ও মুহূর্ত মধ্যে কার্যকারিতার ধর্মের সুন্দর ব্যাখ্যা করেন। এই তত্ত্বের সাহায্যেই আইনষ্টাইন বলেন, মহাকর্ষের প্রভাবে সকলেই পড়তে বাধ্য—এমন কি, আলোকেরও বিস্তার নেই। মহাকর্ষ-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে আলোককেও তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত হতে হবে (পরে একথার সত্যতা পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে)। এভাবেই আইনষ্টাইন বুধগ্রহের কক্ষপথের বিস্ময়কর দ্রুত-গতির কারণ নির্দেশ করেন, যা এযাবৎ নিউটনের তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা এসে পড়ছে। সেটা হলো বস্তুপিণ্ডসমূহের উপস্থিতিতে মহাকাশের গুণাগুণ বদ্‌লে যায় কেন? এই প্রশ্ন অবশ্য পদার্থ-বিজ্ঞানীদের। এর মীমাংসাকল্পে এখন তাঁরা নানা পথে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন। কোন কোন বিজ্ঞানী কোয়ান্টাম থিওরীর দ্বারা এই রহস্যকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করছেন। তবে এ-সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত কোন সুনিশ্চিত মীমাংসায় এসে পৌঁছানো যায় নি। বস্তুতঃ বিশ্বে ক্রিয়াশীল অন্যান্য বলগুলির (Force) মধ্যে মহাকর্ষীয় বলই সবচেয়ে বিস্ময়কর। ঠিক কি ভাবে যে মহাকর্ষীয় বল নিঃসরিত হয়, তা আজও সম্পূর্ণরূপে জানা যায় নি। মনে হয়, পদার্থের যে সব ধর্ম এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে, সেগুলি জানতে পারলেই মহাকর্ষ সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করা যাবে। বর্তমানে অবশ্য এ-বিষয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং তার উপর ভিত্তি করে এখন এটুকুই বলা যেতে পারে যে, এক বিশেষ ধরণের নিউক্লিয়ার দোলনের জন্যে, অর্থাৎ যে সব প্রাথমিক কণিকা দিয়ে পার-মাণবিক নিউক্লিয়াস গঠিত, তাদের দোলনের জন্যেই মহাকর্ষীয় বল উৎসারিত হয়। •

সুগন্ধ—স্বাভাবিক ও কৃত্রিম

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

প্রকৃতির রাজ্যে সুগন্ধের পরিব্যাপ্তি—

রূপ, রস, শব্দ ও স্পর্শের মত ঘ্রাণেরও প্রবল সহজাত অনুভূতি মানুষের রয়েছে। সুগন্ধের মহিমা আমাদের শাস্ত্রসমূহে পাওয়া যায়। দেব-দেবীদের যদি সুগন্ধ আদরের জিনির হয়, তবে তা মানুষের সমাদর লাভ করবে তাতে আর আশ্চর্য কি আছে? পৃথিবীর সর্বত্রই সুবাসের সমাদর দেখতে পাওয়া যায়।

আর একদিক থেকে বিচার করলে সুগন্ধের সঙ্গে আমাদের নিত্য ও সর্বক্ষণের পরিচিতি রয়েছে। দেব-দেবীর অর্চনা, সভা-সমিতি, আহার-বিহার—এক কথায় সকল ব্যাপারে সুগন্ধেব স্থান অতি উচ্চে। হিসেব করলে দেখা যাবে, আমাদের জীবনযাত্রার বহুলাংশে সুগন্ধ এক স্বাস্থ্যকর ও মনোরম আকর্ষণীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে। সুগন্ধ ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে অনেক জায়গায়। সুগন্ধ ও সুগন্ধময় জিনিষের প্রাচীন প্রয়োগের নিখুঁত ছবি বিশ্বকবি এঁকেছেন—

"কুরবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে,
লীলাকমল রৈত হাতে কী জানি কোন কাজে।
অলক সাজতো কুন্দফুলে
শিরীষ পরতো কর্ণমূলে
মেখলাতে দুলিয়ে দিত নব-নীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে
ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে,
লোধ্র ফুলের শুভ্র রেণু মাখতো মুখে বালা

কালাগুরুর গুরু গন্ধ লেগে থাকতো সাজে,
কুরবকের পরত মালা কালো কেশের মাঝে।”

সচরাচর আমরা যে সব সুগন্ধের সঙ্গে পরিচিত তা তিন ভাগে ভাগ করা যায়—নৈসর্গিক বা উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত, প্রাণীজ বা জন্তুজাত এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরী। প্রকৃতির রাজ্যে শত সহস্র সৌরভময় ফুল রয়েছে। আবার রয়েছে চন্দনের মত সুগন্ধময় কাষ্ঠ ও অগণিত সরস সুমধুর ফল।

পশুদেহ থেকে গন্ধদ্রব্য আহরণ করা সম্ভব হয়েছে, সে কথা অনেকেরই কাছে নতুন ঠেকবে। মৃগনাভি বা কস্তুরী এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়াও রয়েছে—অ্যাম্বারগ্রীজ, সিভেট ইত্যাদি। সামুদ্রিক অতিকায় মৎস্য তিমি থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে অ্যাম্বারগ্রীজ, আর গন্ধগোকুল শ্রেণীর প্রাণীজাত সিভেট। বীবর জাতীয় প্রাণী থেকে আমরা পাই ক্যাষ্টরিসম্। প্রাণী থেকে যে সব সুগন্ধদ্রব্য পাওয়া যায়, সেগুলির দাম অত্যন্ত বেশী। তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। এই সব জিনিস সংগ্রহ করতে হলে অনেক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করতে হয়—ছুটতে হয় বন্ধুর পাহাড়ে, তা নেপালেই হোক বা তিব্বতেই হোক; কারণ সেখানে কস্তুরীমৃগের বাসস্থান। পাড়ি দিতে হয় মহাসাগরের বিপদসঙ্কুল বুকে—যেখানে চলাফেরা করে বিশালাকার তিমি। শুধু তিমি বা কস্তুরীমৃগ জোগাড় হলেই কাজ শেষ হয় না—তাদের দেহ থেকে নির্দিষ্ট সুগন্ধদ্রব্যগুলি সংগ্রহ করা আর এক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এগুলি সংগ্রহ, শোধন ও সংরক্ষণ করতে বিজ্ঞানের (বিশেষ করে রসায়নের) আশ্রয় নিতে হয়।

সুগন্ধ-বিজ্ঞানের আলোচনা করতে গিয়ে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। ‘পদ্ম’ বা কমলকে সকলেই জানেন। কিন্তু সেই ‘পদ্ম’ যখন ইংরেজিতে Padma এই বানান নিয়ে দাঁড়ায়, তখন গন্ধ-বিজ্ঞানী তার অর্থ করেন Phenyl Acetaldehyde Dimethyl Acetal (আদ্য অক্ষরগুলির সংযোগে হয়—Padma) [পদ্মের ইংরেজী প্রতিশব্দ Lotus তা আশা করি বলা নিষ্প্রয়োজন]।

সুরভিদ্রব্যের ব্যবহার কি শুধু আদবকায়দা বা ফ্যাশানেরই পরিচায়ক? না, তা নয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, যার সাবলীল অনুবাদ হবে—পরিচ্ছন্নতা দেবভাবের অনুবর্তী। সে কারণে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সুগন্ধ একই পথের পথিক। তারপর ধরুন ধূপ, ধূনার ধোঁয়া। মশামাছি বিতাড়নে এদের অবদান কম নয়! আর সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হচ্ছে এক স্বর্গীয় পরিবেশ। চন্দন তেলের জীবাণুনাশক ক্ষমতা রয়েছে। আর একটি গন্ধতেলের নাম করতে হয়—শিট্রনেলা। ভারতের প্রতিবেশী সিংহল এবং জাভায় এটি সচরাচর পাওয়া যায়। কীটপতঙ্গ দূর করতে এটি বিশেষ-রূপে কার্যকর। এই রকমের গুণের সুগন্ধ তেল আরো রয়েছে।

প্রকৃতি তার রাজ্যে যে সুস্নিগ্ধ কুসুমরাজির ডালি সাজিয়ে রেখেছেন, তাথেকে কবিরা পেয়েছেন প্রেরণা। চম্পার সৌরভ, জ্যোৎস্না রাত্রে হাঁসনা-হানার আমেজ সাধারণ লোককেই উদ্বুদ্ধ করে, সেক্ষেত্রে কবিদের তো কথাই নেই। কবির ভাবরাজ্যে—

“পুকুরের তটে তটে
মধুচ্ছন্দা রজনীগন্ধা সুগন্ধ তার রটে।
ম্যাগ্‌নোলিয়ার শিথিল পাপড়ি
খসে খসে পড়ে ঘাসে,
ঘরের পিছন হতে বাতাবির ফুলের খবর আসে।”

কবির বর্ণনায় আর এক নিখুঁত ছবি-

“কমল ফোটে; কুন্দ ফোটে;
কনকচাঁপার চারিধারে
মধুর স্বরে গুঞ্জরিছে অলি;—
দূরক্ষেত্রে একাকিনী বিনম্রা অপরাজিতা
সমীরণে পড়ে ঢলি ঢলি;—
ভেসে আসে পুষ্পগন্ধ চারিদিকে; ঘাসের উপরে
পাতায় পাতায় শিশিরবিন্দু খেলে;”

এ তো গেল কবি কল্পনার কথা। ফিরে আসা যাক বাস্তব রাজ্যে। যখন স্বভাবতঃই 'কুসুমের গন্ধ ভাসে গগনে', সে রকম ক্ষেত্রে গন্ধ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতের তাৎপর্য কি? প্রধান কারণ হলো—স্বল্প আয়াসে কম খরচে নৈসর্গিক কুসুম সৌরভের সহজে প্রাপ্তির উপায়। জুঁই বা গোলাপের নির্যাস আহরণ করতে অনেক যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যের দরকার—সুতরাং দাম পড়ে বেশ চড়া। আর বিজ্ঞানীর তৈরী কৃত্রিম জুঁই বা নকল গোলাপের সুগন্ধের দাম অনেক কম।

কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধ-প্রস্তুতি

ফুলের মত ফলের গন্ধও অনুকরণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। আজকাল সরবতে এবং দইয়ের ঘোলে আম, কাঁঠাল, আনারসের যে গন্ধ—রাসায়নিক উপায়ে সেগুলি প্রস্তুত। আর কোন্ জিনিষেরই বা তৈরী বাকী রইলো? নিত্য ব্যবহারের সরষের তেল, ঘি—সবেরই গন্ধ এখন বিজ্ঞানীর হাতে তৈরী সম্ভব হচ্ছে। যাক, সে সব অবান্তর কথা।

শুধু ফুল ও ফল নয়, বহু বিচিত্র গন্ধ আজ রসায়নের দৌলতে তৈরী করা সহজসাধ্য হয়েছে। সে সব গন্ধ প্রকৃতির রাজ্যে পাওয়া যায় না। কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের বিশেষ বিশেষ প্রকার গন্ধ থাকবার দরুণই তাদের সাহায্যে এই কাজে ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়েছে এবং হচ্ছে।

এখন সংক্ষেপে আধুনিক রসায়নী সুগন্ধ প্রস্তুতির কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। মনে করা যাক, জুঁই ফুলের গন্ধ অনুকরণ করে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে হবে।

বিজ্ঞানী দেখলেন জুঁই ফুলের নির্যাসে নিম্নোক্ত উপাদানগুলি রয়েছে—

বেন্‌জাইল অ্যাসিটেট	৬৫%
লিনালিল "	৭.৫%
লিনালল	১৫.৫%
বেন্‌জাইল অ্যালকোহল	৬.০%
অন্যান্য	৫.৫%

জুঁই ফুলের গন্ধ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুতিতে সুগন্ধ-বিজ্ঞানী তাই এমন এক ফিরিস্তি তৈরী করলেন, যার ভিতর রইলো—শতকরা ৪০ ভাগ বেন্‌জাইল অ্যাসিটেট, ১৫ ভাগ লিনালল, ৫ ভাগ অ্যামাইল সিনামিক অ্যালডিহাইড, ১৫ ভাগ হাই-ড্রক্সিসিট্রনেলল ইত্যাদি। পরে সামান্য মাত্রায় জুঁই ফুলের নিছক নির্যাস (absolute) এতে দেওয়া হয় কৃত্রিম গন্ধটিকে নৈসর্গিক জুঁইয়ের গন্ধের ন্যায় প্রাণবন্ত করবার জন্যে।

একথা বলে রাখা দরকার যে, এই ধরণের শত সহস্র ফিরিস্তি বর্তমানে সুগন্ধ-বিজ্ঞানীর মুষ্টিবদ্ধ। ইদানীং প্রায় সমস্ত ফুলের গন্ধকেই কৃত্রিম উপায়ে অনুকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

ফলের গন্ধের ব্যাপারেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করা গেছে। উদাহরণস্বরূপ কৃত্রিম কলার গন্ধে দেওয়া হচ্ছে—অ্যামাইল অ্যাসিটেট, বেন্‌জাইল প্রোপিওনেট, বেন্‌জালডিহাইড, ভ্যানিলিন ইত্যাদি।

সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুতের পৃথিবী-বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান-গুলি তাদের নিজ নিজ মাত্রায় উপাদান মিশিয়ে গন্ধদ্রব্য তৈরী করে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও মূল্যমান বজায় রেখে চলে।

বিজ্ঞান-কুশলী, বিশেষ করে গন্ধ বিজ্ঞানী, অতি ধীরে-সুস্থে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুত করেন। নকল গন্ধ তৈরীর কাজেও কম সাধনার প্রয়োজন নয়। তবেই তো পাওয়া যায়—মানুষের হাতে তৈরী গোলাপ, জুঁইয়ের সুগন্ধ। এক্ষেত্রে প্রতিটি রাসায়নিক উপাদান অতি সন্তর্পণে মিলিয়ে-মিশিয়ে ধাপে ধাপে কাজটি সেরে নিতে হয়। গায়কের সঙ্গে যিনি সঙ্গত করেন তাঁকে যেমন গানের তালে চলতে হয়, তেমনি গন্ধ-বিজ্ঞানীকে এক একটি উপাদানের গন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তবে এগিয়ে যেতে হয়। (সামান্য মাত্রা-বিভ্রম বা অসাবধানতার ফলে কাজ

সমূহরূপে ব্যাহত হয়)। তবেই সার্থক হয় গন্ধ-বিজ্ঞানীর নিরলস প্রয়াস।

সুগন্ধ-বিজ্ঞানীর নিরলস ও নিখুঁত প্রয়াস

মিশ্রণ-প্রক্রিয়াকে নানাভাবে উপমা দিয়ে বোঝানো যায়। একটা ঘড়ির যন্ত্রগুলি যেমন নির্দিষ্ট মাপজোখ সহকারে তৈরী হয়, সেই রকম রাসায়নিক উপাদানগুলি নির্দিষ্ট মাত্রায় এবং যথাযথভাবে মিশাতে হয়। এই ব্যাপারে উপাদানগুলি ক্রমান্বয়ে মিলাতে হয়—আগে বা পরে হয়ে গেলে মাত্রা-বিভ্রমের ন্যায় অভীপ্সিত গন্ধ আশানুরূপ তো হবেই না, বহু ক্ষেত্রে সব বিফল হয়ে যায় বা যাবার উপক্রম হয়।

আবার চিত্রকরের নিপুণ কলাকুশলীর সঙ্গে মিশ্রণ ব্যাপারটির তুলনা করা চলে। কলাবিদ্‌কে যেমন চিত্রের ভাব অনুযায়ী রঙের তুলি ধরতে হয়, বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য বা সরসতা বা লঘুভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়, সেইভাবে গন্ধ-বিজ্ঞানীকে এগিয়ে যেতে হয়। কোন গন্ধ হয় হাল্কা, আবার কোন গন্ধ হয় সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। অনুরূপভাবে নিপুণ ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সহকারে কর্মরত ভাস্করের ভাস্কর্যের সঙ্গেও এই ব্যাপারটি তুলনীয়।

এই সুগন্ধ-শিল্পে ভারত এককালে পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী ছিল। ভারতের আতর-শিল্প বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও উন্নত পর্যায়ের ছিল। সেকালে ভারত গন্ধদ্রব্য রীতিমত রপ্তানী করে এসেছে, তাও আমরা জানি। বিদেশী পর্যটকগণ এদেশে এসে গন্ধ-শিল্পের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। ভারত গন্ধ-পুষ্প, গন্ধ-কাষ্ঠ, গন্ধমূল ও গন্ধময় তৃণের দেশ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়েছে প্রাচীন যুগেই। তাথেকেই বোঝা যাবে, এদেশ এই বিষয়ে কতদূর উন্নত এক সময়ে হয়ে উঠেছিল। আয়ুর্বেদাচার্য সুশ্রুত সেই সুপ্রাচীন যুগেই গোলাপ জাতীয় নির্যাসের উল্লেখ করে গেছেন। বিষয়টির প্রাচীনত্ব তাথেকেই সপ্রমাণ হয়। বিশ্বকবির কথায় বলতে হয়—

'শুনি যেন কানন-শাখায়
বেলা শেষের বাজায় বেণু
মাখিয়ে নে আজ পাখায় পাখায়
স্মরণ-ভরা গন্ধ-রেণু।'

মনস্তত্ত্বের উপর সুগন্ধের বিচিত্র প্রভাব আজও পুরামাত্রায় বিজ্ঞানীর হাতে ধরা পড়ে নি। সব গন্ধ সকলের সমভাবে আদর পায় না। আবার একই গন্ধ সকল সময় একজনের ভাল নাও লাগতে পারে—নির্ভর করে মনের বিচিত্র অবস্থার উপর। ব্যক্তিত্ব অনুযায়ী সুগন্ধের প্রকারভেদ হতে দেখা যায়—সচরাচর লঘুচিত্ত, অমার্জিত ও সরল গ্রাম্য লোকেরা খুব চড়া ও তীব্র গন্ধ পছন্দ করে, আর পক্ষান্তরে গম্ভীর, সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রিয় গন্ধ মৃদু, স্নিগ্ধ। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাপ্রবাহে গন্ধ মনের উপর এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তারে সক্ষম। এই রহস্যের কারণ উদ্ঘাটনে বিজ্ঞানের সাধকবর্গ আজো ব্যাপৃত। সুখের বিষয় গন্ধের বহু রহস্য অল্পে অল্পে বিজ্ঞানীর হাতে ধরা পড়েছে। ইন্দ্রিয় চেতনায় গন্ধের প্রভাব (তা সু অথবা কু পর্যায়ের হতে পারে), মনস্তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সুগন্ধের স্থান, পশু—সবিশেষ কুকুরের ঘ্রাণশক্তির প্রাখর্য ও তার কারণ এবং মানবের ঘ্রাণশক্তির সঙ্গে তার পার্থক্য—প্রভৃতি অনেক অজ্ঞাত ও জটিল তথ্য ও তার সঠিক কারণ এখন বিজ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে ও করছে।

সুগন্ধ-বিজ্ঞানের বীজ, যা সুদূর না হলেও স্মরণাতীত অতীতে নিহিত ছিল, তা আজ বিরাট মহীরুহে শাখা-প্রশাখান্বিত। সুগন্ধের বহুমুখী দিক নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান নানা প্রকার আলোক সম্পাত করতে সমর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। বহু গবেষণা পুস্তক এ-বিষয়ে রচিত হয়েছে; সেই সঙ্গে এ-বিষয়ক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে যাচ্ছে। সৌগন্ধ বিজ্ঞানের বহু পত্র-পত্রিকা পৃথিবীর বিবিধ ভাষা-

সমূহে প্রকাশিত হয় নিয়মিতভাবে। ভারতেরও এরূপ একটি পত্রিকা রয়েছে।

আধুনিক সুগন্ধ-বিজ্ঞানে ভারত সুসভ্য দেশ-সমূহের ন্যায় অগ্রণী। তবে পরিতাপের বিষয়, সুগন্ধময় কৃত্রিম রাসায়নিক দ্রব্যরাজির উৎপাদন ভারতে নিতান্তই অল্প। ভারতের স্বীয় বৈশিষ্ট্যময় চন্দন তেল, কাহি, লেমন-গ্রাস ও আতরশ্রেণীর গন্ধ পৃথিবীতে সমাদরের সামগ্রী।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুগন্ধদ্রব্য প্রস্তুতকারীরা এমন সব রাসায়নিক দ্রব্য সংশ্লেষণে সমর্থ হচ্ছেন, যেগুলি (অন্ততঃ সুগন্ধের দিক দিয়ে বিচার করলে) নৈসর্গিক গন্ধের সমীপবর্তী বা হুবহু নকল বলাও চলে। তাই আজ কৃত্রিম Amber-শ্রেণীর গন্ধদ্রব্য পরীক্ষাগারে প্রস্তুত হয়ে ছাপিয়ে গিয়েছে দেশ-বিদেশের বাজারে—আর তিমি মৎস্যজাত অকৃত্রিম অ্যাম্বার-গ্রীজের উপর পূর্ণমাত্রায় বর্তমানে নির্ভরশীল হতে হয় না। অনুরূপভাবে কস্তুরী ও অন্যান্য প্রাণীজ গন্ধদ্রব্য কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হচ্ছে। একি বিজ্ঞানের সাধনার প্রকৃষ্ট ফল নয় এবং শ্লাঘার পরিচায়ক নয় ?

আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান ভারতীয় বিজ্ঞানী বিশেষরূপে সুগন্ধ ও আনুসঙ্গিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ডাঃ সদ্‌গোপাল ডি এস সি, এফ. আর. আই সি, এফ আর. এইচ. এস, এফ. আই. সি. মহোদয়ের মতে—

"With the development of modern coke oven distillation and synthesis of organic compounds from the several organic fractions and intermediates obtained therefrom, the chemist has been able to manufacture an impressive array of perfumery synthetics. The perfumer has now at his command such a large number of aromatics that he can pride himself at least to a large extent, to be in a position to imitate nature. It is no exaggeration to confess that the privileged composer's role reverts today to the maker of synthetics. At his disposal are an infinite number of products of which no perfumer even dreamt in the past. As a consequence of all these newer developments, a close link has been established today between nature and laboratory and a realistic approach for the modern perfumer is to exploit both the gifts of nature and modern science in the maximum service of Man." (Dr. Sadgopal, Chemical Industry News, Vol. VI, No.4, p.165, August 1961).

[শ্রদ্ধেয় ডাঃ সদ্‌গোপাল মহোদয় কর্তৃক লেখককে প্রেরিত একখানি পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে উপরের উদ্ধৃতিটি দেওয়া গেল। এজন্যে লেখক তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।]

নিউট্রিনো প্রসঙ্গে

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

আধুনিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে নিউট্রিনোর কাহিনী সবচেয়ে বেশী বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বিটা-অবক্ষয় তত্ত্ব অনুসরণ করতে গিয়ে গবেষকেরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন—কেন্দ্রক থেকে যে বিটা-কণিকা উদ্গত হচ্ছে, তাদের সকলের জোর সমমানের নয়। যে পরিমাণ শক্তি তাদের মধ্যে থাকা উচিত, তা পাওয়া গেল না এদের মধ্যে। এই বৈষম্য দেখে অনেকের মনে হয়েছিল, ডালটনের সুপ্রাচীন "শক্তি অবিনশ্বর" তত্ত্বটির আসন বুঝি টলে উঠলো।

১৯৩০ সালে সুইজারল্যাণ্ডের বিজ্ঞানী ডাব্লিউ. পাউলি বললেন, যে শক্তির হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না তা নিয়ে নিয়েছে এক নিস্তড়িৎ কণা। তাই যদি না হবে তাহলে তাকে অনায়াসে ধরা যেত। তিনি আরও বললেন, নানা কারণে এই কণিকা হবে খুব হাল্কা। আইনষ্টাইনের $E=mc^2$ তত্ত্ব অনুসারে আমরা জানি যে, স্থির অবস্থায় কোন বস্তু যে শক্তি ধরে, তা তার ওজনের সঙ্গে সমানুপাতিক। নিউট্রন ভাঙ্গবার পরে যতটা শক্তির হদিস পাওয়া যায় না, তার পরিমাণ অতি সামান্য। এই কারণে বস্তুর ওজনও প্রায় নেই বললেই চলে। পাউলি এই কণিকার নাম দিলেন "দি নিউট্রন"। কিন্তু প্রায় সমসাময়িককালে বিজ্ঞানী স্যাড্উইক যে নিস্তড়িৎ কণা আবিষ্কার করেছিলেন, তা নিউট্রন বলে খ্যাত হওয়াতে ইটালীয় পদার্থবিদ্ এন্‌রিকো ফের্মি পাউলি কথিত এই নয়া কণিকার নাম দিলেন "Il neutrino" অর্থাৎ ছোট নিউট্রন। সেই থেকে এই কণিকার নাম নিউট্রিনো চলে আসছে।

এই কণিকা ইলেকট্রনের সঙ্গে একই সঙ্গে বিনির্গত হয় এবং যতটা সম্ভব 'শক্তি' টেনে নেয় নিজের দেহে যেহেতু এই কণা কখনো দৃষ্টিগোচর হয় নি, সেহেতু একদল ভাবলেন, জটিলতা এড়িয়ে যাবার জন্যে নিস্তড়িৎ কণার দোহাই দেওয়া হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এর কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগলো ততই এমন অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল, যার ফলে পদার্থবিদেরা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে পারলেন যে, পাউলির কথা ঠিক। নিউট্রন আবিষ্কারের সময় থেকেই বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, নিউট্রন থেকে প্রোটন তৈরী হবার সময়ে সৃষ্টি হয় বিটা-কণিকার (তেজস্ক্রিয়)। বোধ হয় প্রোটনের পজিটিভ আধানের সঙ্গে সমতা বজায় রাখবার জন্যে সমপরিমাণ নেগেটিভ কণা (ইলেকট্রন) নির্গত হয়ে থাকে। তা যেন বুঝা গেল, কিন্তু নিউট্রিনো বেরুলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে। ১৯২০ সালের প্রথম দিকে অসংখ্য বর্ণালী নিয়ে গবেষণা করবার পর পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে যখন একটা জোরালো তথ্য জানা গেল, তখনই বর্ণালীর কতকগুলি রেখার জটিল প্রকৃতি এবং উৎস সম্বন্ধে সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। এই সমস্যা যতটা জটিল ভাবা গিয়েছিল, তার চেয়েও অনেক জটপাকানো। এই জট উন্মুক্ত হয় ১৯২৪ সালে। এই সময় প্রথম জানা যায় যে, ইলেকট্রনের সহজাত 'স্পিন্' আছে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন যে, ইলেকট্রন সর্বদাই তার কক্ষের চারপাশে এক নির্দিষ্ট বেগে ঘুরছে। পরে দেখা গেল, প্রোটন ও নিউট্রনেরও স্পিন্ আছে এবং তারা সমমানের। নিউট্রন থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন সৃষ্টি হবার সময়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে এই দুটি নবজাতকের স্পিন্ একই রেখায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তারা একই

দিকে থাকতে পারে অথবা বিপরীতমুখীও হতে পারে। যখন একদিকে থাকে তখন তাদের স্পিন্ সংখ্যা হয় ২ একক, বিপরীত দিকে থাকলে তার মান শূন্য। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য—নিউট্রন, প্রোটন, ইলেকট্রনের স্পিন্ কোয়াণ্টাম সংখ্যা হচ্ছে $+\frac{1}{2}$ এবং $-\frac{1}{2}$। প্রতি ক্ষেত্রেই মূল নিউট্রনের স্পিন্ নবজাতকের স্পিন্ অপেক্ষা ভিন্ন। শক্তি বা তড়িতের মত স্পিনেরও কোন ক্ষয় নেই। এই কারণে বিজ্ঞানীদের অনেকে অনুমান করলেন যে, নিউট্রন থেকে প্রোটন ও ইলেকট্রন তৈরী হবার সময়ে আর একটি তৃতীয় কণিকার উৎপত্তি হয়। এই তৃতীয় কণিকা নিউট্রনের হারানো স্পিন্ আত্মসাৎ করে নিয়েছে। সত্য সত্যই যদি তিনটি কণার সৃষ্টি হয়, তাহলে একটির স্পিন্ বিপরীত হলেও অপর দুটির সম্মিলিত স্পিন নিয়ে মোট স্পিনের সংখ্যা মূল নিউট্রনের মত হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, স্পিন্ সংখ্যার সমতা বজায় রাখে নিউট্রিনো। প্রকৃতপক্ষে এটি স্পিন্ ছাড়া আর কিছুই নয়। এর কোন বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, রেষ্টমাস্ শূন্য। স্পিন্ সংখ্যা হচ্ছে $\frac{1}{2}$ ($h/2\pi$), h—প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। আগেই বলা হয়েছে, বিটা-অবক্ষয়ের সময় এটি বেরয়। নিউট্রিনোকে গ্রীক বর্ণমালার ν অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এটি এক ধরণের লেপ্টন এবং এরা ফের্মি-ডিরাক সংখ্যায়ন মেনে চলে।

কুড়ি বছর ধরে পদার্থবিদ্‌দের কোন কৌশলেই নিউট্রিনো ধরা পড়ে নি। একে ধরবার জন্যে নানা ভাবে চেষ্টা চলতে থাকে। একদল চেষ্টা করেছিলেন নিউট্রিনো জন্ম নিয়ে বেরিয়ে আসবার পর তাকে ধরতে, আর একদল সতর্ক দৃষ্টি আবদ্ধ করে রেখেছিলেন উৎসস্থলের প্রতি। ইলেকট্রন নির্গত হবার পদ্ধতিটি খুব ভালভাবে অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা। ভেবেছিলেন হয়তো এথেকে নতুন পথ পাওয়া যেতে পারে। অবশেষে একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র তাঁরা পেলেন। ইলেকট্রন ছিট্‌কে আসবার পরে সমগ্র কেন্দ্রকটি ঘুরে যায়, অর্থাৎ 'রিকয়েল' করে। যদি কেবলমাত্র ইলেকট্রন নির্গত হতো, তাহলে কেন্দ্রকের 'রিকয়েল' হতো বিপরীত দিকে। অথচ তা হলো না। বোধহয় নিউট্রিনোর জন্যে 'রিকয়েল' হলো ভিন্ন রকম। দীর্ঘদিন ধরে সমীক্ষার ফলাফল কোন নির্দিষ্ট আকার ধারণ করতে পারে নি। এর মধ্যে সুরু হলো মহাযুদ্ধ। গবেষণায় বাধা আসতে লাগলো। তা সত্ত্বেও যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করবার কাজ চলতে লাগলো অব্যাহত গতিতে। যুদ্ধের অবসানে আবার এই গবেষণা আরম্ভ হলো নতুন যন্ত্রপাতি ও উন্নততর পন্থার আশ্রয় নিয়ে। ক্রমে বাঞ্ছিত সাফল্য লাভ করা গেলেও নিউট্রিনোর অবস্থিতির উপযুক্ত প্রমাণ মিললো না।

সৃষ্টির পরমুহূর্তেই নিউট্রিনোকে পাকড়াবার ব্যবস্থা চলতে থাকলো। বিজ্ঞানীদের সমস্ত সূক্ষ্ম কৌশল ব্যর্থ হলো। যে কণা পৃথিবীর মধ্য দিয়ে হাজার হাজার মাইল ভেদ করে অবলীলাক্রমে চলে যেতে পারে কোন বাধা না পেয়ে, তাকে ধরা বেশ শক্ত, একথা নিশ্চয় সকলে বুঝতে পারেন। কোন বস্তুর সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি না করলে একে ধরা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এবারে প্রশ্ন উঠলো—যদি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক থেকে নিউট্রিনো নির্গত হয়, তাহলে নিউট্রিনোর পক্ষে কেন্দ্রকের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু বহু পরীক্ষার পরেও আশাব্যঞ্জক কোন কিছু জানা যায় নি। যুদ্ধের পরে তৈরী হলো ইউরেনিয়ামের পাইল। লক্ষ লক্ষ গুণ জোরালো তেজস্ক্রিয় রশ্মি উৎপত্তি হলো। সিণ্টিলেসন কাউণ্টার যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পরে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় কণিকা ধরবার কাজ অনেকটা সহজ হলো। স্বচ্ছ রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে তৈরী এক ইঞ্চি পুরু একটা ব্লক নেওয়া হলো এর মধ্যে। দ্রুত বেগসম্পন্ন কণিকার দল মৃদু আলোর ঝলক তুলতে পারে। এর ঠিক পরেই থাকে একটা ফটোমাল্‌টিপ্লায়ার টিউব। এতে আলোর ফ্ল্যাশ মুহূর্তের মধ্যে ছোট্ট তড়িৎ-

তরঙ্গে পরিণত হয়ে ছাপ রেখে দেয়। যুদ্ধের পরে এক মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রেডারিক রেনিস তাঁর সর্বশক্তি এবং সমস্ত সম্পত্তি নিয়োগ করলেন নিউট্রিনো নিয়ে গবেষণার কাজে। দশ বছর কঠোর পরিশ্রমের পর এবং কয়েক হাজার ডলার ব্যয় করে রেনিস ও তাঁর সহকর্মীরা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, নিউট্রিনো আছে এবং তার ব্যবহার যেমনটি আশা করা গিয়েছিল, ঠিক তেমনই। কাজটি খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। কারণ নিউট্রিনোর সঙ্গে কেন্দ্রকের সংঘর্ষ দিনে কয়েক ডজনের বেশী হয় না। সেই অনুপাতে অন্যান্য কণিকার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের 'কলিসনের' হার অনেক বেশী। কাজেই সত্যিকার নিউট্রিনো-কেন্দ্রক সংঘর্ষের ফলাফল দেখতে পাওয়া বেশ শক্ত। রেনিস একই সঙ্গে নিউট্রন ও পজিট্রন সৃষ্টির দিকে নজর দিয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন হাইড্রোজেনের কেন্দ্রকের সঙ্গে নিউট্রিনোর সংঘর্ষের ফলে এরা জন্ম নেয়। এছাড়া মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে নিউট্রিনো ও পজিট্রনের সাক্ষাৎ হামেশাই মেলে।

নিউট্রিনো দিয়ে আঘাত হানবার জন্যে বহু সংখ্যক হাইড্রোজেন কেন্দ্রকের (প্রোটন) প্রয়োজন। রেনিস দুটি প্রকাণ্ড আকারের সিণ্টিলেসন কাউন্টারের মাঝখানে কয়েক শত গ্যালন জল ভর্তি একটা ট্যাঙ্ক বসালেন। 'কাউন্টার' যন্ত্র দুটির মধ্যে পোরা হলো বিশেষভাবে তৈরী "সিণ্টিলেসন ফ্লুইড"। প্রতিটি কাউন্টারের মুখোমুখি বসানো হলো কয়েক ডজন ফটোমালটিপ্লায়ার, যাতে আলোর ক্ষুদ্রতম রেখাও হাতছাড়া হয়ে না যেতে পারে।

১৯৫৩ সালে রেনিস, সি. এল. কাওয়ান এবং অন্যান্য সহকর্মীরা ওয়াশিংটনের হানফোর্ডস্থিত রিয়্যাক্টরের কাছে এক পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তাতে আলোকের সন্ধান পাওয়া গেলেও পুরাপুরি সাফল্য লাভ হলো না। ১৯৫৬ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি সংস্থার "সাভানা রিভার" প্ল্যান্টে বড় করে পরীক্ষাগার ফেঁদে বসলেন তাঁরা। আগের মত এবারেও ট্যাঙ্ক নেওয়া হলো মোট পাঁচটি। প্রত্যেকটি ৬½ ফুট × ৪½ ফুট মাপের। এর দুটিকে টার্গেট ট্যাঙ্ক করা হলো। এই দুটির গভীরতা ৩ ফুট। এগুলিকে বাকী তিনটি ট্যাঙ্কের মধ্যে (এদের বলা হয় "ডিটেক্টর"; গভীরতা ২ ফুট) বসিয়ে স্যাণ্ডউইচের মত করা হলো। টার্গেট ট্যাঙ্কের মধ্যে জল থাকে, এছাড়া সামান্য পরিমাণ ক্যাডমিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দেওয়া হয়। ডিটেক্টর ট্যাঙ্কের মধ্যে ভর্তি থাকে Organic scintillator-এর দ্রবণ। নানা ধরণের Organic scintillator আছে। তবে সাধারণতঃ টলুইন বা জাইলিন এবং অল্প শক্তির টারফিনাইল বা Diphenyloxazole ব্যবহার করা হয়। রিয়্যাক্টর থেকে নির্গত শক্তি টলুইন (বা জাইলিন) শুষে নেয়। পরক্ষণেই তারা এই শক্তি টারফিনাইলে সঞ্চারিত করে। এখান থেকেই আলো বেরয়। প্রায় এক-শ'-এর বেশী ফটোমালটিপ্লায়ার নল ট্যাঙ্কগুলির চারপাশে এমন ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়, যাতে গামা-রশ্মি ফোটন (Gamma-ray photons) থেকে নির্গত আলো সহজেই ধরা যেতে পারে। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল যে, নিউট্রিনো জলের মধ্যে প্রবেশ করে প্রোটনের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করবে এবং একটি পজিট্রন ও একটি নিউট্রনের জন্ম দেবে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যে পজিট্রন ইলেকট্রনের মুখোমুখি হবে এবং প্রোটন-ইলেকট্রন অ্যানিহিলেশন হবে। একই সঙ্গে গামা-বিকিরণের অ্যানিহিলেশন হবে—এতে থাকবে দুটি ফোটন আর প্রত্যেকটি হবে 0·51 Mev শক্তিসম্পন্ন। ফোটনসমূহ এবার ডিটেক্টর ট্যাঙ্কে প্রবেশ করে সিণ্টিলেসন সৃষ্টি করবে এবং তা সহজেই রেকর্ড করা যাবে। ইতিমধ্যে নিউট্রন জন্মেই জলের মধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে এক সেকেণ্ডের কয়েক মিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যেই ক্যাডমিয়াম কেন্দ্রকের মুখোমুখি হয়ে সেখানেই আবদ্ধ হয়ে থাকে। এর ফলে

4 Mev শক্তি তিন-চারটি গামা-রশ্মি ফোটনের মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়। এরাও ডিটেক্টর ট্যাঙ্কে গিয়ে আলোর ঝলকানি তোলে। কিন্তু এরা পজিট্রন-ইলেকট্রন অ্যানিহিলেশনের পরে সিণ্টিলেসন সৃষ্টি করে। কারণ ক্যাডমিয়াম কেন্দ্রকের মধ্যে নিউট্রন আবদ্ধ হতে খানিকটা সময় লাগে। কাউণ্টার এবং ফটোমালটিপ্লায়ার নল এমনভাবে বসানো থাকে, যাতে এক সঙ্গে জোড়া সিণ্টিলেসন রেকর্ড করা যেতে পারে। প্রতিটি জোড়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধানও বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

শেষ পর্যন্ত নিউট্রিনোকে ধরা গেল। কিন্তু তারপরও অনেক প্রশ্ন রয়ে গেল। নিউট্রিনো কত রকমের? এক না দুই? অর্থাৎ নিউট্রিনো এবং অ্যাণ্টিনিউট্রিনো কি ফোটনের মত একই বস্তুকণা, না নিউট্রনের মত তারা পৃথক? যে সব নিউট্রিনো পজিট্রনের সঙ্গে নির্গত হয়, তারা ইলেকট্রনের সঙ্গে আগত নিউট্রিনোর বিপরীত। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সত্যিই কি কোন পার্থক্য আছে? মহাজাগতিক রশ্মিতে অবস্থিত ক্ষণস্থায়ী মিউ-মেসন বা মিউ-অন কণিকার বিষয় আলোচনা করে এই প্রশ্নের মীমাংসা করা যেতে পারে। যখন মিউ-মেশন বা মিউ-অন অবক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন তাথেকে একটি ইলেকট্রন এবং দুটি নিউট্রিনো বের হয়। কিন্তু ইলেকট্রনের শক্তির তারতম্য হয়। কেন তা হয়? যদি আমরা একথা মেনে নিই যে, দুটি নিউট্রিনো পরস্পর পৃথক-ধর্মী, তাহলে ইলেকট্রনের শক্তির বিভিন্নতা নিয়ে জটিলতার অবসান হয়। এথেকে সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, নিউট্রিনো এবং অ্যাণ্টিনিউট্রিনো দুটি বিভিন্ন কণা। এ যেন মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু দুটির পার্থক্য কোন্ জায়গায়? এর উত্তর একটু আশ্চর্য মনে হতে পারে। নিউট্রিনো এবং তার বিপরীত কণার স্পিন্ পরস্পরের উল্টো। প্রথমটি Clockwise এবং দ্বিতীয়টি Anticlockwise। এই সিদ্ধান্ত শুনে অনেকেই হয়তো খুসী হতে পারবেন না। তাঁরা ভাবতে পারেন—কোন দর্শক যদি নিউট্রিনোর পিছন থেকে লক্ষ্য করেন, তাহলে তাঁর কাছে নিউট্রিনোর স্পিন্ Anticlockwise বলে মনে হবে। যদি তিনি নিউট্রিনোকে ধরে ফেলে এগিয়ে যান, তাহলে নিউট্রিনো দর্শকের দিকে এগুতে থাকবে এবং স্পিন্ দেখে তিনি মনে করবেন যে, এটি অ্যাণ্টিনিউট্রিনো। কিন্তু এই যুক্তি বানচাল হয়ে যায় যদি নিউট্রিনোর গতিবেগ এবং আলোর গতি একই রকম ভাবা যায়, কারণ সে ক্ষেত্রে দর্শকের পক্ষে কখনই নিউট্রিনোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাকে পিছনে ফেলা সম্ভব হবে না। যেহেতু আইনষ্টাইন বলেছেন, আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে কোন কিছু চলতে পারে না। নিউট্রিনো যে আলোর গতিবেগে চলে, একথা অবিশ্বাস করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এর ভর মাপবার জন্যে বহু কৌশল করা হয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তা ইলেকট্রনের ভরের চেয়ে অনেক কম এবং তা শূন্য বলা যেতে পারে। এর ফলে সহজেই অনুমেয় যে, ফোটনের মত নিউট্রিনো আলোর গতিবেগে চলে।

রেনিস ও তাঁর সহকর্মীদের পরীক্ষার ফলে নিউট্রিনোর চেয়ে অ্যাণ্টিনিউট্রিনোর অস্তিত্ব বেশী করে টের পাওয়া গিয়েছিল। আধুনিক মতবাদ অনুসারে নিউট্রন থেকে প্রোটন জন্ম নেবার সময়ে একটি ইলেকট্রন এবং একটি অ্যাণ্টিনিউট্রিনো বের হয়, আবার প্রোটন থেকে নিউট্রন সৃষ্টির মুহূর্তে একটি পজিট্রন ও একটি নিউট্রিনো উদ্গত হয়। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে নিউট্রিনো সৃষ্টির সম্ভাবনা কম, কিন্তু সূর্যের মধ্যে প্রোটনের নিউট্রনে রূপান্তর অধিক সংখ্যায় হয়ে থাকে। নিউট্রিনো ও নিউট্রনের সংঘর্ষে নিউট্রন প্রোটনে পরিণত হয়। সমুদ্রের অনেক গভীর স্থান থেকে (যেখানে মহাজাগতিক রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না) জল সংগ্রহ করে নিউট্রিনোর আচরণ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। একথা স্থিরভাবে জানা গেছে যে, অ্যাণ্টিনিউট্রিনো ($\bar{\nu}$) নিউট্রিনো (ν) থেকে সম্পূর্ণ

পৃথক। অ্যান্টি-নিউট্রিনো একটি অ্যান্টি-লেপ্টন। "পজিট্রন বিটা-অবক্ষয়ের" সময় নিউট্রিনো এবং "ইলেকট্রন-বিটা অবক্ষয়ের" ফলে অ্যান্টি-নিউট্রিনো নির্গত হয়।

যেমন—(১) $A^{37} \rightarrow Cl^{37} + e^{+} + \nu$

(২) $n \rightarrow p + e^{-} + \bar{\nu}$

প্রোটন থেকে হিলিয়াম-কেন্দ্রক হবার ফলে সূর্যের মধ্যে যে প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়, তার এক সপ্তমাংশ চলে যায় নিউট্রিনোর মধ্যে। নিউট্রিনো না থাকলে আমরা সূর্যের কাছ থেকে আরো শতকরা পনেরো ভাগ বেশী উত্তাপ পেতাম। একথা শুধু সূর্যের বেলাতেই নয়, সমগ্র নক্ষত্রমণ্ডলের ক্ষেত্রেই খাটে। নিউট্রিনো যদি কিছু তাপ চুরি করে সোজা মহাশূন্যে চলে না যেত, তাহলে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অধিকতর উত্তপ্ত হয়ে উঠতো। নিউট্রিনোর কাজ অনেকটা রেফ্রিজারেটারের মত। নিজের দেহে তাপের উগ্রতা কিছু পরিমাণে গ্রহণ করে পৃথিবীকে অপেক্ষাকৃত শীতল করে রেখেছে।

বিশ্রামে বিভ্রান্তি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র

'বিরাম কাজের অঙ্গ একসাথে গাঁথা
নয়নের অংশ যেন নয়নের পাতা।'
রবীন্দ্রনাথ

আমার প্রতিপাদ্য বিষয় করোনারী ধমনীঘটিত দুরন্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কতটুকু বিশ্রাম দরকার, সেই প্রশ্নের অবতারণা ও আলোচনা।

বিশ্রামের কথা পাড়লেই পরিশ্রমের কথা আসে, যেমন আলোর কথা বলতেই আসে তার অভাব হলে কি হয়।

জার্মেনীর পুনর্গঠনের সময় দেখা গেল, নব্য জার্মেনীর বহু প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার একের পর এক করে মরতে আরম্ভ করেছেন। এই সব ম্যানেজারের মৃত্যুর ময়না তদন্তে দেখা গেল যে, সকলেই করোনারী অক্লুশনে মারা গিয়েছেন।

এর আগে আমার বহু প্রবন্ধে ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত) আমি এই ব্যাধির প্রকোপ ও তার সংঘটন প্রসঙ্গে অনেক তথ্য প্রকাশ করেছি। এখন কি ভাবে এই হঠাৎ মৃত্যু প্রতিরোধ করা যায় (অবশ্য একশ' বছর পর্যন্ত পরমায়ু বাড়াবার জন্যে), সেটাই আমার করণীয় বলে স্থির করেছি।

শতবর্ষ পূর্বে যখন পশু-পক্ষীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয় নি—এখন থেকে বহু শত বর্ষ পূর্বেও যখন পশু-পক্ষীর জীবন থেকে মানুষ শিক্ষা লাভ করতো বা যখন মহামনীষী চাণক্য, ঈশপের, পঞ্চতন্ত্রের কথা ও হিতোপদেশ থেকে আমরা জ্ঞান লাভ করতাম, তখন আমরা বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে পশু-পক্ষীর আচরণই স্থির নির্দেশ বলে মেনে নিতাম। আহত পশু বিশ্রাম লাভের আশায় নিরাপদ স্থানে বিশ্রাম নিত কিংবা কোনও ব্যাধির প্রকোপ বোধ করলে পশু-পক্ষীরা খাদ্যের সন্ধানে বের হতো না। তাই দেখে সেকালের পণ্ডিতেরা যা কিছু হোক না কেন, "বিশ্রাম লও, পাকযন্ত্রের বিশ্রাম দাও" এরূপ উপদেশ দিতেন। এমন কি, "ব্যাধি পাপের ফল" বলে কত যে ব্যাধিগ্রস্ত লোকের উপর অত্যাচার চলতো, তার ফিরিস্তি দিলে এক মহাভারত রচনা হয়। 'কর্ম থেকে অবসর লও। প্রায়শ্চিত্ত কর। পূজা দাও। কৃচ্ছতা অবলম্বন কর।' মনুসংহিতার বিধানে কুষ্ঠব্যাধি হলে সমাজচ্যুতও হতে হতো।

আজ বিজ্ঞানের যুগে সব ব্যাধিই স্বল্পায়াসে নিরাময় হতে পারে। বিশ্রাম যে শরীরের ক্ষয়

নিবারণে সহায়ক, তা আর কারো জানতে বাকী নেই। মাসে চারদিন উপবাস ও কর্মবিরতি সত্য সত্যই একটি স্বাস্থ্যকর রীতি—তবে বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

ফরাসী দেশে স্বেচ্ছাসেবকেরা একবার বিশ্রাম নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অকেজো রেখে মহানগরী প্যারিসে ছয় সপ্তাহ প্লাষ্টার অব প্যারিস-এ আবদ্ধ হয়েছিলেন। ছয় সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহী নালীসমূহ কার্যকারিতা হারাচ্ছে। রক্তে চুনের আধিক্য ঘটেছে, আর রক্তের চাপ বিশেষভাবে প্রতিহত হয়েছে। এই অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে আর সংশোধন করতে প্রায় সমান সময়ের প্রয়োজন হয়েছে, অর্থাৎ ছয় সপ্তাহ লেগেছে।

আমাদের দেশের কথা ছেড়ে দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের কথা ধরা যাক। পশ্চিমদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা প্রসবের পর প্রসূতিকে আঠারো দিন বিছানায় আটকে রাখতেন। ফলে এই শয্যাশায়ী অবস্থায় দেহে নানারকম বিশৃঙ্খলা ঘটতে লাগলো। ১৯৩৮ সাল থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রসবান্তে তিন দিন মাত্র শয্যাশায়ী রাখবার ব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থায় আর্থিক দিক দিয়েও পনেরো দিনের খরচা বেঁচে যায়। আর্থিক চাপে পড়ে বিজ্ঞানানুযায়ী সংস্কার সর্বত্রই হতে বাধ্য। তবে দেখা গেছে যে, হাসপাতালে বড় বড় অপারেশন বা শল্য-চিকিৎসার পর পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে রোগীদের ছেড়ে দেওয়ার রেওয়াজ হওয়ায় Post-operative morbidity অর্থাৎ শল্যচিকিৎসার পরবর্তী অকর্মণ্যতা ও মৃত্যুসংখ্যা কমে গেছে।

হৃদ্‌রোগাক্রান্ত রোগীকে কাজ করতে দিতে অতি-সাবধানতা এবং তার কর্মবিরতি কত যে অনর্থের সৃষ্টি করেছে, তা বলে শেষ করা যায় না। একটি কি দুটি হৃদ্‌রোগের আক্রমণ (Heart attack, Coronary spasm, Coronary kick বা পাকস্থলীঘটিত ব্যথা) চিকিৎসককে এত ভীত করে তোলে যে, তাঁরা প্রায়ই একটি বা দুটি আক্রমণের পরই রোগীকে তিন মাস শয্যায় রেখে থাকেন। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এবং 'ভারতবর্ষে' লিখিত প্রবন্ধে আমি বহুবার বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি যে, রোগ নির্ণয়ের ভুলই এই চিকিৎসার মূলে আছে এবং প্রায়শঃই এই ভুলের মাশুল হচ্ছে আর্থিক ক্ষতি আর মানসিক উদ্বেগ। এই বিষয়ে ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লস্‌ এঞ্জেলস্‌ শহরের হৃদ্‌রোগ সংস্থার ক্রেজার, স্টাইভেলম্যান ও ফোরেস্তিজ প্রমুখ হৃদ্‌রোগ-বিশেষজ্ঞেরা ভূতপূর্ব মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেন-হাওয়ারের চিকিৎসায় যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্য সত্যই শিক্ষাপ্রদ। তাঁর তিনটি হৃদ্‌রোগের আক্রমণ ও একটি মস্তিষ্কের শিরায় রক্ত তঞ্চন (Coagulation or Clotting) বিষয়ে আমি সংবাদপত্রে মতামত প্রকাশ করেছিলাম। মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি সেই হৃদ্‌রোগ এবং মস্তিষ্কের শিরায় রক্ততঞ্চন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করছেন।

সাধারণ্যে এখন আর অজানা নেই যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট কখনো চিকিৎসকদের বিশ্রামের উপদেশ মানতে গিয়ে বুদ্ধিভ্রষ্ট হন নি—এমন কি, তিনি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত গলফ্‌ খেলাও ছাড়েন নি। এই সব ঘটনা যে বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকদের চোখ খুলে দেবে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।

১৯২০ সাল থেকে মার্কিন দেশে পোলিও রোগীদের ছয় মাস পর্যন্ত প্লাস্টার করে রাখা হতো। অনড় কাঁধ (Frozen shoulder), বাতব্যাধির পঙ্গুতা, সক্রিয় যক্ষ্মা প্রভৃতি ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত লোকদের আধুনিক প্রথায় যে চিকিৎসা চলছে, তাতে বিশ্রামেরই প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ভগিনী কেনী ও তাঁর অনুবর্তীরা দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, এসব রোগীদের বিবেচনামূলক পরিশ্রমঘটিত চিকিৎসার অধীনে রাখলে এদের অনেকেরই আশু

উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আর তাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থার পরিবর্তে বিবেচনামূলক সক্রিয় অবস্থায় রাখলে আর্থিক দুরবস্থারও কিছু পরিমাণ নিরসন হতে পারে।

সাধারণ মানুষের মনে বিশ্রাম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তি রয়ে গেছে এবং চিকিৎসক যদি হাসপাতাল থেকে কোনও লোককে বের হয়ে পরিশ্রম করতে বলেন, তাহলে অনেক সময় ডাক্তারবাবুকে 'নির্দয়' অভিধায় অলঙ্কৃত করা হয়ে থাকে। অপর পক্ষে চিকিৎসকেরাও নিজেদের চিকিৎসাব্যবসায় চালু রাখবার জন্যে রোগীর মনোভাব অনুসারে হাসপাতালের বিছানায় আটকে রাখতে বাধ্য হন। এখন এমন একটা বিষচক্র সৃষ্টি হয়েছে যে, হাসপাতালের স্থান সংকুলান, চিকিৎসকদের আর্থিক সঙ্গতি ও সাধারণের প্রতি সরকারের সেবার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে।

বৃদ্ধদের পঙ্গুতা, অশক্ত ও অসমর্থের আশ্রয় আর ব্যাধির নিরাময় পৃথক পৃথকভাবে সর্বাঙ্গীন সমাজকল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ হলে প্রত্যেক লোকের পক্ষে শতায়ু হওয়াটা খুব একটা আশ্চর্য ব্যাপার নয়।

পশ্চিম জার্মেনীতে ম্যানেজারদের ব্যাধি সত্য সত্যই লেখকের আবিষ্কৃত করোনারী অক্লুশন। আর বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চললে এর কোনটাতেই লোকের অকালমৃত্যু ঘটতে পারে না। ইতিপূর্বে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত লেখকের একটি নিবন্ধে ('বোম্বাই সহরে আন্তর্জাতিক ধমনী-সঙ্কোচন সম্মেলন', মে, ১৯৬২) কাজ ও বিশ্রামের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাত্রে ৮ ঘণ্টা বিশ্রাম ও ঘুম (রাত ৯টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত) আর দুপুরের খাওয়ার পর ২ ঘণ্টা বিশ্রাম সত্যই পেশী ও স্নায়ুর পক্ষে উপকারী। অবশ্য খাদ্য-তালিকা আর বয়স হিসাবে সুসমঞ্জস তাপ (ক্যালোরি) সরবরাহকারী খাদ্য দিতে হবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, যদি কোন লোক একটানা ৪ ঘণ্টা বা তার বেশী পরিশ্রম করে, তবে তার পেশীগুলিতে ল্যাক্টিক অ্যাসিড জমা হয় ও তার শরীরস্থ স্নায়ুকোষের নিস্‌ল্ দানা (Nissle granule) অন্তর্হিত হয় ও তার পরবর্তী কাজ সুসম্পন্ন হতে পারে না। বায়োপ্‌সি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, উপযুক্ত বিশ্রামের পর তার মাংসপেশীতে সঞ্চিত ল্যাক্টিক অ্যাসিড অন্তর্হিত হয় ও নিসল্ দানা আবার আবির্ভূত হয়। তখন সে আবার সুস্থ সতেজ দেহে কাজ করতে পারে। এজন্যেই আন্তর্জাতিক শ্রম-সংস্থা (I. L. O) বলেছেন যে, দিনে চার ঘণ্টা করে দুই ক্ষেপে (Shift) আট ঘণ্টা কাজ ও তার মাঝে দুই ঘণ্টা বিশ্রাম বিজ্ঞানসম্মত। তবে যে কাজে একটু বেশী শারীরিক ও মানসিক দক্ষতা প্রয়োজন, সে সব কাজ একনাগাড়ে তিন ঘণ্টা ও দিনে মোট ছয় ঘণ্টার বেশী করা উচিত নয়। তাঁরা বলেন যে, সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টা করে কাজ করা উচিত এই হিসাবে বছরে প্রায় ৯১ দিনকে কাজের দিন বলে ধরতে হয়।

একথা মানতেই হয় যে, কাজ করলেই বিশ্রাম দরকার। তবে বিশ্রাম ও কাজ কোনটাই যাতে অস্বাভাবিক পরিমাণে না হয়, সে দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। শ্রম ও বিশ্রাম যদি সুসমঞ্জসভাবে স্থির করা না হয়, তবে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। তাই কাজ আর অবসরকে পরস্পরের সঙ্গতিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে। তবেই বিশ্রামে বিভ্রান্তি আর ঘটবে না, আর মানুষ তার ঈপ্সিত শত বর্ষ পরমায়ু লাভ করতে পারবে।

আয়নোস্ফীয়ার

শ্রীসুভাষকুমার সিকদার

আয়নোস্ফীয়ারের আবিষ্কার বিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৫ মাইল পর্যন্ত ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডল শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ বায়ুর দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে তিনটি স্তর—ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অনুসারে ট্রপোস্ফীয়ার, ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার ও ওজোনের স্তর। এর ঊর্ধ্বে শত শত, সম্ভবতঃ হাজার হাজার মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত আয়নোস্ফীয়ার—বায়ুর গ্যাসীয় আয়নের সমষ্টি

বায়ুমণ্ডলের সকল স্তরগুলির চেয়ে আয়নোস্ফীয়ারের গুরুত্বই সর্বাধিক। এটাই অনেক অত্যাশ্চর্য ঘটনার মূল কারণ। ১৮৮২ সালে ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্যালফোর ষ্টুয়ার্ট পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাত্যহিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথম আয়নোস্ফীয়ারের তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা দেন। পরে দেখা যায়, আয়নোস্ফীয়ারের অস্তিত্ব স্বীকার করলে রেডিও-তরঙ্গের ব্যাখ্যাও সহজ হয়ে পড়ে। ১৯২৫ সালে আয়নোস্ফীয়ার হাতেনাতে ধরা পড়ে। রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণের পরীক্ষার দ্বারা আয়নোস্ফীয়ারের উচ্চতা মোটামুটি ৬২ মাইল বলে ধরা হয়।

পৃথিবীব্যাপী বহু পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, সূর্যই আয়নোস্ফীয়ারের সৃজনকর্তা। সূর্য থেকে প্রতিনিয়ত আলো ও নিউক্লীয় কণিকা পৃথিবীতে এসে পড়ছে। সূর্যের আলোর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপরের ভাগকে বিদ্যুৎযুক্ত করে এবং সূর্যরশ্মির এক ক্ষুদ্র অংশ দৃশ্যমান আলোক হিসাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। দ্রুতগতিসম্পন্ন কণিকাগুলি অরোরার সৃষ্টি করে এবং বায়ুমণ্ডলের স্তর ভেদ করে মহাজাগতিক রশ্মিরূপে পৃথিবীতে এসে পড়ে। সূর্য থেকে সব রকম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের রশ্মিই পৃথিবীতে আসে, কিন্তু কোন্ দৈর্ঘ্যযুক্ত রশ্মি আয়নোস্ফীয়ারে শোষিত হয়, তা সঠিক জানা সম্ভব হয় নি।

রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণের ক্ষেত্রে আয়নোস্ফীয়ার অত্যাবশ্যক। বায়ুর বৈদ্যুতিকীকরণই এই তরঙ্গ প্রতিফলনের কারণ। এজন্যে সূর্য ও আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির পরিমাণের উপর রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ নির্ভর করে। যত বেশী পরিমাণে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে, তত বেশী পরিমাণে বায়ুস্তর আয়নিত হয়। সূর্যপৃষ্ঠে যখন কলঙ্ক দেখা যায়, প্রচুর পরিমাণে রশ্মি ও কণিকা তখন চারদিকে ধাবিত হয় এবং পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অধিক পরিমাণে আয়নিত হয়। আবার যখন সৌরকলঙ্ক মিলিয়ে যায়, তখন বিদ্যুৎযুক্ত কণিকার পরিমাণও কমে যায়। এভাবে আয়নোস্ফীয়ারের প্রসারণ ও সঙ্কোচনের জন্যে মাঝে মাঝে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। বেতার যোগাযোগের ক্ষেত্রে আয়নোস্ফীয়ার সম্পর্কিত জ্ঞান তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করে আয়নোস্ফীয়ার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব হয়েছে। এই পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, আয়নোস্ফীয়ারে চারটি স্তর আছে। এগুলির নাম ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা অনুসারে যথাক্রমে D, E, F_1 ও F_2 স্তর। নির্দিষ্ট কম্পন ও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ একটা নির্দিষ্ট স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত কম হবে, রেডিও-তরঙ্গ তত উপর থেকে প্রতিফলিত হবে। পরিশেষে

সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যযুক্ত রেডিও-তরঙ্গ আয়নোস্ফীয়ার ভেদ করে মহাশূন্যে হারিয়ে যাবে।

রেডিও-তরঙ্গের দ্বারা পরীক্ষা করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব পাওয়া সম্ভব নয়। কি প্রকার অণু-পরামাণু কত শক্তির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য গ্রহণ করে এবং কি প্রকৃতির কণিকা বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বে আঘাত করে—এসব প্রশ্নের খুঁটিনাটি উত্তর জানতে হলে আয়নোস্ফীয়ারে রকেট পাঠিয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরীক্ষাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। গত দশকের এই সব পরীক্ষায় U. S. A ও সোভিয়েট রাশিয়া অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

প্রথম প্রথম সূর্যপৃষ্ঠে কোন বিস্ফোরণ (Flare) লক্ষ্য করবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশালকায় রকেট পাঠিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। এর অসুবিধা হচ্ছে এই যে, আয়নোস্ফীয়ারে পৌঁছুতে বিলম্ব হলে সূর্য থেকে আগত প্রাথমিক কণিকাগুলি ধরা নাও পড়তে পারে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক কণিকার আঘাতে সৃষ্ট গৌণ (Secondary) রশ্মিগুলিই ধরা পড়বে।

এই অসুবিধা দূর করবার জন্যে রকুন (রকেট+বেলুন) ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০,০০০ ফুট থেকে ১৫ মাইল পর্যন্ত উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলে রকেটবাহী-বেলুন ভাসিয়ে রাখা হয়। সূর্যপৃষ্ঠে বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা মাত্রই বেলুনটিতে রেডিও-সঙ্কেত পাঠানো হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেলুন থেকে রকেটটি গর্জন করে আয়নোস্ফীয়ারে ঢুকে পড়ে। এই কাজটুকু ১½ মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হয়ে যায়। অপর পক্ষে, ভূপৃষ্ঠ থেকে রকেট পাঠিয়ে এই কাজ করতে প্রায় তিন মিনিট লেগে যায়। বেলুনে রেডিও-সঙ্কেত পাঠাবার দু-রকম পদ্ধতি আছে। প্রথম পদ্ধতিতে, বারংবার আয়নোস্ফীয়ারে রেডিও-তরঙ্গ প্রেরণ করা হয়। যখন সহসা এই তরঙ্গের প্রতিফলন বন্ধ হয়ে যায়, বুঝতে হবে সূর্যপৃষ্ঠে তখন বিস্ফোরণ হয়েছে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রস্তুত একটি টেলিস্কোপ সূর্য লক্ষ্য করে থাকে। সূর্য থেকে রেডিও-সঙ্কেত পেলে বুঝতে হবে, সূর্যপৃষ্ঠে বিস্ফোরণ হয়েছে।

গত দশকের "আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে" এসব পরীক্ষার সূত্রপাত করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার ফলাফল কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ও অত্যাশ্চর্য। দেখা গেছে যে, আয়নোস্ফীয়ারে আগত রশ্মি আলট্রাভায়োলেট রশ্মি নয়, এক্স-রশ্মির সমষ্টি মাত্র। এখন এটা সত্য সত্যই সূর্য থেকে আগত ও রেডিও গোলযোগের কারণ, না গৌণ রশ্মি—এই নিয়ে বিশ্বের বিজ্ঞানীরা গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। যে এক্স-রশ্মি ধরা পড়েছে, তা এত শক্তিশালী যে, এথেকে অনুমিত হয়—সূর্যপৃষ্ঠের বিস্ফোরণস্থলের উষ্ণতা ১ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত। এই তাপমাত্রা সূর্যপৃষ্ঠের সাধারণ তাপমাত্রার চেয়ে অনেক বেশী। এথেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন বিশেষ প্রক্রিয়া সূর্যপৃষ্ঠে ক্রিয়াশীল।

আয়নোস্ফীয়ার পরীক্ষার আর একটি পদ্ধতিও কাজে লাগানো হচ্ছে। সূর্য-তারকা থেকে আগত রেডিও-তরঙ্গ আয়নোস্ফীয়ারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। এই তরঙ্গের কম্পনাঙ্কের পরিবর্তনের হিসাব থেকে আয়নোস্ফীয়ারের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব।

আয়নোস্ফীয়ারের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও ভূ-পদার্থবিদ্‌দের ধারণা হচ্ছে এই যে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বের স্তরগুলি প্রথমে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি শোষণ করে। এই রশ্মিই বায়ুকে বিদ্যুৎযুক্ত করে আয়নোস্ফীয়ারের সৃষ্টি করে। অবশ্য এক্স-রশ্মিও গ্যাসকে আয়নিত করে। এসব সত্ত্বেও আয়নোস্ফীয়ারে ক্রিয়াশীল পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে জানা এখনো সম্ভব হয় নি। আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষের পরীক্ষাসমূহের ফলে অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান হবে।

এবারে আয়নোস্ফীয়ার সম্পর্কিত কতকগুলি

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আলোচনা করা যাক। আয়নোস্ফীয়ারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের জন্যেই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের শতকরা দুই ভাগ এখানে সৃষ্ট হয়েছে। আবার সূর্যপৃষ্ঠে বিস্ফোরণ ঘটলে বা সৌরকলঙ্ক দেখা দিলে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তন হয়। মহাশূন্য থেকে প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর যে উল্কাপাত হচ্ছে, তার দ্বারাও ক্ষণিকের জন্যে বায়ুমণ্ডল আয়নিত হয় এবং তা রেডিও-তরঙ্গ প্রতিফলিত করে। সুতরাং রেডিও-তরঙ্গের দ্বারা উল্কাপাত সম্বন্ধেও গবেষণা করা যাবে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়ার উপর উল্কাপাতের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা বর্তমানে করা হচ্ছে। ফটো-ইলেকট্রিক সেল ও স্পেকট্রোস্কোপের পরীক্ষার দ্বারা যে রাত্রিকালীন ভাস্বরতা আবিষ্কৃত হয়েছে, তা সোডিয়াম মেঘ ও উত্তেজিত অক্সিজেন অণু থেকে উৎপন্ন হয়। অনুমান করা হয় যে, সূর্যের তাপে বিচ্ছিন্ন পরমাণু একত্রিত হবার ফলে এইরূপ হয়।

আর একটি অদ্ভুত ঘটনা হলো—হুইস্লার (Whistler)। এটা হচ্ছে বিপরীত গোলার্ধে প্রতিফলিত বিদ্যুতের প্রতিধ্বনি। আকাশের বিদ্যুৎস্ফুরণ (Lightning) থেকে এর সৃষ্টি। বিদ্যুৎ চমকালে প্রকাণ্ড তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ (Electromagnetic waves) সৃষ্টি হয়ে আয়নোস্ফীয়ারে প্রবেশ করে এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের পথ ধরে চৌম্বক বিষুবরেখার ১০০০ মাইল উপরে এসে পৌঁছয় এবং বক্রাকারে বিপরীত গোলার্ধে প্রবেশ করে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়। যখন চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখনই এথেকে বাঁশীর মত শব্দ হয়। হুইস্লারের আবিষ্কার গবেষণার এক নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যেহেতু ১০০০ মাইল উপরেও হুইস্লার-তরঙ্গ বর্তমান, সেহেতু সেই তরঙ্গ বহন করবার জন্যে কোন গ্যাস অবশ্যই সেখানে থাকবে। কারও মতে—পৃথিবী সূর্যের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত এবং এই বায়ুমণ্ডল (করোনা) আয়নিত হাইড্রোজেন গ্যাসের দ্বারা সৃষ্ট। আবার কেউ কেউ মনে করেন—এই গ্যাস সূর্য থেকে এসেছে। যাহোক্, এই দুই-এর কোন তত্ত্বেরই কোন অব্যর্থ প্রমাণ নেই।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞান বর্ষে পৃথিবী ব্যাপী গবেষণার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল আয়নোস্ফীয়ার। আয়নোস্ফীয়ার সম্পর্কিত আশ্চর্য ঘটনাগুলি এসব পরীক্ষার ফলে অতি শীঘ্রই ব্যাখ্যাত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

সঞ্চয়ন

নুতন হামনিবারক টিকা

এক নতুন পদ্ধতিতে টিকা দেওয়ার ফলে হাম প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে, এটি তার অন্যতম। হামনিবারক এই টিকাটি আবিষ্কার করেছিলেন ম্যাসাচুসেটসের বোস্টনে অবস্থিত শিশু হাসপাতালের ডাঃ জন এফ. এনডার্স।

পোলিও নিবারক যে টিকা বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে ত্রুটিমুক্ত করে নিখুঁত করে তুলেছেন ডাঃ এনডার্স।

হামনিবারক এই টিকাটির কথা প্রথম ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। হামের দুর্বল অথচ জীবন্ত ভাইরাস থেকে এই টিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে এই টিকা ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। যে সমস্ত

ছেলেমেয়েদের এই টিকা দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে শতকরা ৯৬ থেকে ১০০ জন এই ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

তবে এই টিকার একটা গুরুতর ত্রুটি দেখা গেল। জীবন্ত ভাইরাস থেকে তৈরী টিকা দেওয়ার ফলে শিশুদের দেহে উদ্ভেদ দেখা দিতে লাগলো। অনেক সময় এগুলি এত বেদনাদায়ক ও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে যে, তা প্রায় প্রকৃত হামরোগেরই সমতুল্য হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে কোন কোন শিশু জ্বরাক্রান্তও হয়ে পড়ে। কিন্তু এখন এনডার্স টিকা প্রদানের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলে এই টিকা দিলে জ্বরও হয় না অথবা উদ্ভেদও দেখা দেয় না।

এই জ্বর ও উদ্ভেদ নিবারণের উদ্দেশ্যে এর একটা প্রতিকার উদ্ভাবিত হয়। ফিলাডেলফিয়ার শিশু হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ জোসেফ স্টোক্‌স্‌, জুনিয়র এবং বাল্টিমোরের মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল স্কুলের ডাঃ ফ্রেড আর. ম্যাকক্রাম্ব এই নতুন প্রক্রিয়ায় এনডার্স টিকা প্রদানের উদ্ভাবক। জ্বর ও উদ্ভেদ নিবারণ করতে হলে টিকা দেবার অব্যবহিত পরেই অপর বাহুতে রক্তের একটি উপাদান গামা গ্লোবিউলিন সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে টিকার কার্যকারিতা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে, অথচ অবাঞ্ছিত কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যত প্রকার পদ্ধতি জানা আছে, তার সবগুলি দিয়ে এর নিরাপদ প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

ডাঃ স্টোক্‌স্‌ সম্প্রতি এই নতুন টিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন। সেটা হচ্ছে এই যে, হামরোগে আক্রান্ত হলে অনেক সময় শিশুদের মস্তিষ্কের যে ক্ষতি হতো, এই নতুন টিকা তা নিবারণ করতে পারে।

ডাঃ স্টোক্‌স্‌ বলেছেন—টিকা নিয়েছে এ-রকম ৫০টি শিশুকে আমরা পরীক্ষা করেছি। এদের মধ্যে অন্ততঃ ২৫ জনের মস্তিষ্কে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা সম্ভব ছিল, কিন্তু আমরা একজনের মধ্যেও তা দেখি নি।

অনেক উন্নতিশীল দেশের পক্ষেই এই টিকা প্রকৃত আশীর্বাদস্বরূপ হবে। এই সব দেশের কোন কোনটিতে হামরোগে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে শতকরা ১০ জনেরই মৃত্যু হয়। এছাড়া এর চেয়ে বেশী সংখ্যায় মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আরও বেশী হয় "কালো হাম", যাতে উদ্ভেদ থেকে স্থানীয় রক্তপাত ঘটে থাকে।

কেন এই গামা গ্লোবিউলিন উদ্ভেদ ও জ্বর নিবারণ করতে পারে? এর কারণ—রক্তের ঐ উপাদানটি নেওয়া হয় এমন সব লোকের শরীর থেকে, যারা ইতিপূর্বেই হামরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। সে জন্যে গামা গ্লোবিউলিনের মধ্যে থাকে ভাইরাস প্রতিরোধক পদার্থ বা অ্যান্টিবডি, যা ভাইরাসকে ধ্বংস করে। যে কখনও হামে আক্রান্ত হয় নি, তার রক্তে অ্যান্টিবডি জন্মায় না।

জীবন্ত ভাইরাসের টিকা নেওয়ার অব্যবহিত পরে গামা গ্লোবিউলিন ইঞ্জেকসন দিলে ঐ ভাইরাস শরীরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না। পরন্তু গামা গ্লোবিউলিনের দ্বারা স্থানীয়ভাবে মৃদু রোগ সংক্রমণ ঘটে এবং এর ফলে দেহের প্রতিরোধ-শক্তি থেকে হাম নিবারক অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়।

যে সব ভেসজ প্রস্তুতকারী কোম্পানী এই হাম নিবারক টিকা প্রস্তুত করবে, মার্ক অ্যাণ্ড কোম্পানী তাদের অন্যতম। এই কোম্পানীর জীবতত্ত্ব ও ভাইরাস গবেষণা বিভাগের প্রধান ডাঃ এম. আর. হিলম্যান বলেন যে, এই টিকা যতদূর সম্ভব নিরাপদ। মুরগীর ডিমের মধ্যে এর উৎপাদন করা হয়। তিনি বলেন যে, এই ধরণের টিকা প্রদান করা হয়েছে এ-পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি লোককে। কিন্তু কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি।

হাম সাধারণতঃ গুরুতর ব্যাধি বলে বিবেচিত

হয় না, কিন্তু এই রোগ থেকে নানা বিপজ্জনক ও জটিল প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি দেখা দিতে পারে। যেমন এর ফলে মস্তিষ্ক-প্রদাহ, নিউমোনিয়া, স্নায়ুর গোলযোগ দেখা দিতে পারে।

পাখীর ভাষা

প্রত্যেক ভারতবাসী কোকিলের সুমধুর কণ্ঠস্বর শুনেছেন। যাঁরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পড়েছেন, তাঁরা চক্রবাক পাখীর গল্প জানেন। একটি পাতার আড়াল পড়লেও এই পাখীগুলি একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকে। এই সব গান ও ডাকের কোন অর্থ আছে কি? এগুলি কি পাখীদের ভাসার একটা অংশ?

বিজ্ঞানে যে ৮০০০ বিভিন্ন রকমের পাখীর কথা বলা হয়, সেগুলির মধ্যে মাত্র অর্ধেক পাখী গান গাইতে পারে। চৌম্বক টেপ এবং শব্দের স্পেক্টোগ্রাফের মত যন্ত্রগুলি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, প্রায় সব রকম পাখীরই দুই ধরণের শব্দ আছে—একটা হলো গান, অন্যটা হলো শব্দ। ক্রেইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পশু-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ গারহার্ড থিলক বলেন যে, এই দুটি শব্দের মধ্যে যে তফাৎ রয়েছে, তা শব্দের দৈর্ঘ্য বা হ্রস্বতা নিয়ে বিচার করা উচিত নয়। শব্দগুলির আসল কাজ কি, তা বিবেচনা করতে হবে। তবে এদের সঙ্গীতের মূল্য মানুষের মান অনুসারেও অত্যন্ত সুন্দর।

গান শুনেই বলে দেওয়া যায় পাখীটি কোন্ জাতের। সঙ্গীত পাখীর জাতি নির্দেশ করে। পাখীর সঙ্ঘবদ্ধতাই যে এদের জাতি রক্ষার সহায়ক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাখীর গানের তাৎপর্য সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার কাজটি খুবই চিত্তাকর্ষক। গানের প্রথম উদ্দেশ্য হলো, সঙ্গী বা সঙ্গিনীকে আকর্ষণ করা। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ পুরুষ পাখীরাই গান গায়। যারা সঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছে, তাদের তুলনায় যে পাখী সঙ্গিনী পায় নি, সেই বেশী গান গায়। সন্তান উৎপাদনের জন্যে পুরুষ পাখী কোন বিশেষ একটা এলাকা বেছে নেয় এবং অন্য পুরুষ পাখীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার ঝুঁকি নিয়েও স্ত্রী পাখীর জন্যে গান গাইতে থাকে। এই গানগুলি যেন কয়েকটা কবিতার সমষ্টি। শব্দতত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে এই শব্দগুলির চমৎকার একটা ছবি পাওয়া যায়। এগুলির স্পেক্টোগ্রাফ মানুষের শর্টহ্যাণ্ডের মত।

যে জাতের পাখীদের বংশবিস্তারের প্রবণতা প্রবল, তারা গান গেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের তাড়িয়ে দিতে চায়। যে পাখীগুলি নতুন অঞ্চল গড়ে তোলবার জন্যে যায়, তারাও এই ডাকে বুঝতে পারে যে, অঞ্চলটি আগে থেকেই দখল করা হয়ে গেছে। এর ফলে পাখীদের মধ্যে একটা মারামারির সম্ভাবনা হ্রাস পায়। দুটি পুরুষ পাখীর গলা ছেড়ে পরস্পরের প্রতি গান গাইবার অর্থ হলো, কতকগুলি বিশেষ নিয়ম মেনে পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। পশুদের মধ্যেও রক্তাক্ত সংগ্রাম এড়াবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই এই রকম একটা ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়। জোড় এবং বেজোড়ের পুরুষ পাখী একই রকমের গান করে বলে মনে হয়। যে সব পাখীর সঙ্গিনী আছে, তাদের চেয়ে সঙ্গিনী-বিহীন পাখী অনেক বেশী গান করে। কেবল মাত্র আমেরিকার ক্ষুদ্র পাখী সাভানা ফিঞ্চ সঙ্গিনীকে আহ্বান করবার সময় এক রকম এবং প্রতিদ্বন্দ্বী পুরুষকে বিতাড়িত করবার জন্য অন্য রকম শব্দ করে।

অধিকৃত অঞ্চলের সীমান্তে যখন পরস্পরের দেখা হয়, তখনই সাধারণতঃ পুরুষ পাখীগুলি পরস্পরকে গান শোনায়। টেপ রেকর্ডারে গৃহীত কোন পুরুষ পাখীর রাগের গান যখন বাজানো হয়, তখন ঐ জাতের পাখীরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এমন কি, যে পাখীটির গান রেকর্ড করা হয়েছে, সেই রেকর্ড শুনে সেও রেগে যায়। গান আরম্ভ হলেই পাখীটি রেগে গিয়ে লাফালাফি সুরু করে দেয়, তারপর নিজেই গান গাইতে সুরু করে। ডাঃ থিলক একবার

দেখেন যে, একটা পুরুষ পাখী রেকর্ডে নিজের গান শুনে পাগলের মত লাউড স্পীকারেই ঠোকর মারতে সুরু করেছে। ভিন্ন জাতের পাখী কিন্তু সেই গানে কর্ণপাতও করে না।

পাখীর গানের আর একটি কাজ হলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে পড়া এবং উভয়ের কাজে মিল রাখা। আহারান্বেষণে যদি একে অপরকে হারিয়ে ফেলে, তাহলে গান গেয়ে একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়। দ্বৈত গানে একজন প্রথমে গান গাইলে অপরে তার উত্তর দেয়। কিন্তু দুয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া এত তাড়াতাড়ি হয় যে, দুজনেই এক সঙ্গে গান সুরু করে দেয়। রাত্রিবেলায় পাখীগুলি একে অপরকে দেখতে পায় না বলে গান গেয়ে পরস্পরের সম্পর্ক রাখবার এক চমৎকার পদ্ধতি এরা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। পাখীর গানের আরও প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, তবে এখন পর্যন্ত সেগুলির তাৎপর্য জানা যায় নি।

প্রত্যেক জাতের পাখীর সাধারণ শব্দ সেই জাতের পাখীর কাছে ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলি সতর্কতাজ্ঞাপক, খাদ্য-সন্ধান, যাচ্ঞাজ্ঞাপক অথবা দুরত্বজ্ঞাপক হতে পারে। যে কোন জাতিরই ১৫টার বেশী এই রকম শব্দ নেই। সন্তান প্রতিপালন করবার জন্যে একজাতের পাখীর বিশেষ এক ধরণের শব্দের প্রয়োজন হয়। এই জাতের পাখী যদি বধির হয়, তাহলে উপযুক্তভাবে সন্তান প্রতিপালন করতে পারে না। আর এক জাতের পাখী দৃষ্টিশক্তির সাহায্যেই অভিপ্রায় বুঝতে পারে। যেমন—শাবক হাঁ করলেই বুঝতে পারে, খেতে চাইছে কি না। এই জাতের বধির পাখীরও শাবক প্রতিপালনে কোন অসুবিধা হয় না।

জার্মান বিশেষজ্ঞ ডাঃ থিলক্ বলেন যে, নিকট সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতের পাখীর গানের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। এর ফলে এক জাতের পাখী অন্য জাতের সঙ্গে মিশে যেতে পারে না।

বিবর্তন অনুযায়ী সাধারণ শব্দ এবং গানেও কার্যকরী কতকগুলি শব্দ সকলেই গ্রহণ করেছে। যেমন—বড় কোন শিকারী পাখী দেখলে বিভিন্ন জাতের পাখী একই রকম শব্দ করে সকলকে সতর্ক করে দেয়। এই সতর্কবাণী অত্যন্ত উচ্চ পর্দায় বহুক্ষণ স্থায়ী শব্দে উচ্চারিত হলেও প্রথমে সুরু হয় প্রায় অশ্রুত শব্দ দিয়ে। ফলে শিকারী পাখীও বুঝতে পারে না যে, কোন্ পাখীটা প্রথম শব্দ করলো। এই সতর্কবাণী শুনে একই জাতের সমস্ত পাখী তৎক্ষণাৎ আশ্রয় খোঁজে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, প্রায় সব জাতের পাখীই এই রকম ডাকে সাড়া দেয়। এই ক্ষেত্রে জাতের বাধা অপসারিত হয়। এই ব্যবহারে পাখীগুলির নিশ্চিহ্ন হবার ভয় কম থাকে। দিনের বেলায় প্যাঁচা দেখলে অবশ্য পাখীগুলির ব্যবহার এক রকমের হয় না। দিনের বেলা প্যাঁচা অন্য পাখীর কোন ক্ষতি করতে পারে না, কাজেই তারা এমন একটা শব্দ করে, যাতে প্যাঁচার অবস্থিতি বুঝতে পারা যায়। এই সতর্ক-বাণীর জন্যে পাখীদের নানা রকম শব্দ আছে, তবে সেগুলি খুব মৃদু শব্দ এবং বারে বারে উচ্চারিত হয়। ওকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে সমবেত কণ্ঠে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়, প্যাঁচা তা বুঝতে পারে বলে মনে হয়। কাজেই প্যাঁচার ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে দিনের বেলায় এরা সকলে মিলে ডাকতে থাকে। ওরা সকলে ভাল করেই জানে যে, দিনের বেলায় এদের এই শত্রুটি কিছুই করতে পারবে না।

মৎস্যের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা

বাতাসের সাহায্যে গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু জলের নীচে, যেখানে কোন রকম গন্ধ বহন করে নিয়ে যাবার মত বাতাস নেই, সেখানে কি হয়? জলের নীচে বাতাস না থাকলেও মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা কিন্তু মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

গন্ধ গ্রহণের জন্যে মাছের মস্তিষ্কে বড় বড়

গন্ধবহা নাড়ী রয়েছে। কিন্তু জলের নীচে যেখানে বাতাস নেই, সেখানকার প্রাণীদের এত বেশী গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকাটা একটু অদ্ভুত শোনায় না কি? জার্মান প্রাণী-বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফন ফ্রিস্ ১৯৪১ সালে মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে তিনি দেখতে পান যে, নদীর ছোট ছোট মাছ গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতাকে দূরের বিপদ-আপদ জানবার জন্যে ব্যবহার করে এবং বিশেষ অনুভূতির কোসগুলিতে অবস্থিত স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতাকে সামনের জিনিস, বিশেষ করে খাদ্য পরীক্ষার জন্যে ব্যবহার করে। গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে যেমন দূরের খাদ্য সম্পর্কে জানতে পারে, তেমনি নিজের দলের অন্যান্যেরা কোথায় আছে অথবা কাছাকাছি কোথাও শত্রু আছে কিনা, তা জানতে পারে। যদি কোন মাছ আহত হয়, তাহলে সে তার চামড়া থেকে এমন একটা পদার্থ পরিত্যাগ করে, যা থেকে অন্যান্য মাছ সাবধান হয়ে যায়। এই গন্ধ অনুভব করা মাত্র অন্যান্য মাছ পালিয়ে যায়। অধ্যাপক ফন ফ্রিস দেখতে পেয়েছিলেন যে, মাছ নাক দিয়ে ঘ্রাণ গ্রহণ করে এবং মুখের ভিতরের স্বাদগ্রহণকারী ঝিল্লী দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করে।

ফন ফ্রিসের গবেষণা অনুসরণ করে ডাঃ হেরাল্ড টেইখম্যান মাছের গন্ধগ্রহণের ক্ষমতা সম্পর্কে নতুন কতকগুলি তথ্য জানতে পারেন। মাছের বিভিন্ন জাতির মধ্যে গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতাও বিভিন্ন। এগুলির মধ্যে কিছু মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা বেশী আবার কতকগুলির খুব কম। শেষোক্তগুলির তুলনায়ও মানুষের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা কম।

মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা পরীক্ষা করবার জন্যে গীসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ টেইখম্যান একটি সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করেন। মৎস্যরক্ষিত একটি চৌবাচ্চায় তিনি একই সঙ্গে একদিক থেকে সুগন্ধি জল দিতে থাকেন এবং অন্য দিকে একটি পোকা দিয়ে দেন। মাছগুলির মধ্যে খুব তাড়াতাড়ি এমন একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো যে, সুগন্ধি জল ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পোকাটি জলে ছাড়তে না ছাড়তেই মাছগুলি পোকার জন্যে ছুটে এলো। পক্সিনাস নামক এক জাতের মাছ ১ : ৬৭,০০০,০০০ মিশ্রণেও সাড়া দেয়। রামধনু ট্রাউট মাছ ১ : ৯,৯০০,০০০,০০০ মিশ্রণেও সাড়া দেয়। প্রতি এক কিউবিক সেণ্টিমিটার বাতাসে ৪ লক্ষ মিলিয়ন হিসেবে যদি কৃত্রিম লেবুর গন্ধ মেশানো যায়, তাহলে মানুষ সেই গন্ধ টের পায়। ঈল মাছের গন্ধ গ্রহণের ক্ষমতা খুব বেশী। ইউ-রোপের অন্যতম বৃহত্তম হ্রদ কনষ্ট্যান্সের চেয়ে ৫৮ গুণ বড় কোন হ্রদে যদি মাত্র এক কিউবিক সেণ্টিমিটার সুগন্ধি দ্রব্য ঢেলে দেওয়া হয় এবং সমগ্র হ্রদে তা বেশ ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও এই অবিশ্বাস্য মিশ্রণে ঈল মাছ সেই গন্ধ টের পায়। ১ : ১৭৮৯,০০০,০০০,০০০,০০০ অনুপাতের মিশ্রণেও ঈল মাছ তার প্রিয় খাদ্যের গন্ধ পায়।

ডাঃ টেইখম্যান মনে করেন যে, ঈল মাছ তাদের এই অদ্ভুত ঘ্রাণশক্তির সাহায্যেই বিপুল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। ডাঃ টেইখম্যান ১৯৫৯ সালে লক্ষ্য করেন যে, নদী দিয়ে যে মিঠাজলের স্রোত সমুদ্রে এসে পড়ে, ঈলের পোনাগুলি সেই গন্ধ টের পেয়ে নদীতে ঢুকে পড়ে এবং সেখানেই বাস করতে থাকে। ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক ডাঃ ক্রুয়েট্জ্‌বার্গও ১৯৬১ সালে এই তথ্য সমর্থন করেন। একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক ডাঃ হ্যাস্‌লার প্রমাণ করেন যে, স্যামন মাছ গন্ধের সাহায্যেই তার বাসোপ-যোগী নদী চিনে নেয়।

স্মৃতির রহস্য

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা সব সময়েই বলি যে "আমার পরিষ্কার মনে আছে" অথবা "আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম" ইত্যাদি। আমাদের মনে আছে বা আমরা ভুলে গেছি—

অথবা আমাদের মনে থাকা বা না থাকার প্রকৃত অর্থ কি ?

মস্তিষ্ক যখন কোন সংবাদ পায়, তখন তাতে কি কোন পরিবর্তন ঘটে ? সেই পরিবর্তনটাই বা কি রকম ? বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন থেকে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার জন্যে চেষ্টা করছেন। এই সমস্যার সমাধান করা সম্পর্কে অধ্যাপক পল গ্রীস এবং তাঁর ছাত্র জে. এস. চেনার, গটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে কতকগুলি চমৎকার পরীক্ষা করেছেন এবং তার ফলে এই পুরনো প্রশ্নগুলির এক নতুন উপায়ে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয়। আমরা যা কিছু দেখি, শুনি বা করি, সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ু-কোষগুলিতে পর পর সাজানো থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষমতা বিপুল কিন্তু অসীম নয়। আমরা সত্য সত্যই কিছু ভুলতে পারি না, কারণ স্নায়ুকোষে যে সংবাদ একবার রাখা হয়ে গেছে, তা আর মুছে ফেলা যায় না। তবে এমনও ঘটতে পারে যে, স্নায়ুকোষের সংগ্রহশালায় যাওয়ার কোন রাস্তা হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে এবং এই পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়াটাকেই আমরা স্মৃতিবিভ্রম বলি। সেই পথটা খুলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আবার "স্মরণ" করতে পারি।

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডাঃ একৃক্লেস স্মৃতি সম্পর্কে যে আধুনিক সূত্রের সৃষ্টি করেন, অধ্যাপক গ্রীস তা নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। বর্তমানকালে ডাঃ একৃক্লেসের সূত্র ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ইলেকট্রনিক হিসাবকারী যন্ত্রের সূত্র অনুযায়ী ডাঃ একৃক্লেস বিশ্বাস করেন যে, ইন্দ্রিয়গুলি মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলিতে যে খবর পাঠায়, তা অবিরামভাবে একটা দোলায়মান চক্রপথে ঘুরতে থাকে। এই চক্রপথ যতদিন সক্রিয় থাকে, ততদিন পর্যন্ত স্মৃতিতে সংবাদগুলিও জীবন্ত থাকে। হিসাবকারী যন্ত্র বা সাধারণতঃ যাকে "ইলেকট্রনিক ব্রেন" বলা হয়, তাতেও ঠিক একই পদ্ধতিতে কাজ হয়। বেতারের মূলনীতি অনুযায়ী একটা দোলায়মান চক্রপথে ইলেকট্রনিক ব্রেনে তথ্যগুলি জমা হতে থাকে একৃক্লেসের সূত্র যদি ঠিক হয়, তাহলে জৈব বৈদ্যুতিক একটা উত্তেজনার উপর স্মৃতিশক্তি নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিকেরা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ বিদ্যুৎ-স্রোতকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

একৃক্লেসের সূত্র পরীক্ষা করবার জন্যে অধ্যাপক গ্রীস বানর ব্যবহার করেছেন। বানরগুলিকে কতকগুলি কৌশল এমনভাবে শেখানো হয়, যাতে ওরা সেগুলি কিছুতেই ভুলে না যায়। তার অর্থ হলো, এই কৌশলগুলি ওদের মস্তিষ্কের কোথাও সংগৃহীত হয়ে থাকে। জাগ্রত এবং মনোযোগী বানরের মধ্যে ছোট ছোট অনেক দোলা দেখতে পাওয়া যায়। বানরকে অজ্ঞান করবার পর ই.ই.জি-তে অনেকখানি পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অনেকগুলি ছোট কম্পনের পরিবর্তে কতকগুলি বড় কম্পন হতে থাকে। অধ্যাপক গ্রীস শেষে বানরগুলিকে ১৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত ঠাণ্ডা করেন। এই উত্তাপ হলো রক্তের স্বাভাবিক উত্তাপের অর্ধেক। মধ্যে মধ্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বানরগুলিকে সজীব রাখা হয়। ই.ই.জি. একেবারে শূন্য পর্যন্ত চলে যায়।

এগুলিকে আবার তাপমাত্রা বাড়িয়ে জাগিয়ে দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ বানরগুলি আবার আগের শেখানো খেলাগুলি দেখাতে সক্ষম হয়। আমাদের সূত্র অনুযায়ী ই.ই.জি. ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত হয়। কারণ রক্ত অর্ধজমাট হয়ে যাওয়ায় দোলায়মান চক্রপথ ভেঙ্গে যায়। এই পরীক্ষা থেকে একটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, দোলায়মান চক্রপথের উপর স্মৃতিশক্তি স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল নয়। কারণ এই চক্রপথ নষ্ট হয়ে গেলেও স্মৃতি বেঁচে যায়। অধ্যাপক গ্রীস স্মৃতি সম্পর্কে অন্য রকম একটি সূত্র দিয়েছেন।

স্মৃতির বিষয়গুলি নিশ্চয়ই কোথাও বিশেষভাবে জমা হয়ে থাকে। গটিংগেনের গবেষকগণের গবেষণার ভিত্তি হলো এই সূত্রটি। যে জিনিষ এত সংবাদ সংগ্রহ করে রাখে, তা কেবল মাত্র

স্নায়ুকোষের পক্ষেই সম্ভব। তাতে যে উপাদান রয়েছে, তার কাজ বহুদিন থেকেই বৈজ্ঞানিকদের কাছে রহস্যজনক হয়ে আছে। এগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র দানার মত। বর্তমানেই বায়োকেমিষ্টগণ জানেন যে এটা হলো নিউক্লিওপ্রোটিন অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের সমষ্টি। আধুনিক বায়োকেমিষ্ট্রিতে নিউক্লিক অ্যাসিড একটা গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা অভিনয় করে। দানাগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র দানাগুলিকেও রিবোসোমে বিভক্ত করা যায়। এগুলিতে আবার রয়েছে রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড। বর্তমানে জানা গেছে যে, রিবোসোমেই প্রোটিন বিশ্লিষ্ট হয়। রিবোসোম্, প্রোটিনের গঠন স্থির করে। কাজেই প্রোটিনের গঠন অনুযায়ী রিবোসোমগুলি সংবাদ জমা করে রাখতে পারে।

অধ্যাপক গ্রীসের সূত্র অনুযায়ী, যে কোন অভিজ্ঞতা স্নায়ুর উত্তেজনার অংশ হিসেবে কতক-গুলি ইলেকট্রন স্নায়ুকোষে চলে যায়। এর ফলে কোষের পরিবেশে একটা পরিবর্তন হয়। কোষের রাসায়নিক গঠনেও পরিবর্তন হয়। রিবোসোমের কিছু উপাদান বেরিয়ে চলে যায়। এর ফলে স্নায়ুতে যে উত্তেজনা আসে, ঠিক সেই অনুপাতে স্নায়ুকোষে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনটাই হলো সংবাদ। এখন এই রিবোসোম থেকে যে প্রোটিন হবে, তা আগেকার প্রোটিনের গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রিবোসোম এই প্রোটিনকে যে সংবাদ দেয় তার প্রতিচ্ছবি হলো স্মৃতি। প্রোটিনের গঠন অনুযায়ী যেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, তার জায়গায় অবিরাম নতুন প্রোটিন গঠিত হয়। এই অদ্ভুত সংগ্রহ-শালায় প্রত্যেকটি জিনিষ নতুন করে নকল করা হয়। এই ব্যবস্থাটা খুব লাভজনক না হলেও প্রোটিন উপাদানগুলি অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী বলে এটাই সব চেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা।

যে পরিমাণ ও যে গুণসম্পন্ন উত্তেজনা রিবো-সোমকে উত্তেজিত করে এবং সেগুলি পাগলের মত নতুন তথ্য নকল করে যায়, ঠিক সেই পরিমাণ ও ঠিক সেই রকম গুণসম্পন্ন আর একটা উত্তেজনা না পাওয়া পাওয়া পর্যন্ত প্রোটিনগুলি শান্ত থাকে। প্রোটিনে যে সব সংবাদ জমা থাকে, তা প্রয়োজন অনুযায়ী স্মৃতিপথে আসে। এগুলি আবার ভেঙ্গে গিয়ে যৌগিক উপাদান এসিটাইল কোলিনের সৃষ্টি করে। এগুলি আবার স্নায়ু-কোষগুলিকে উত্তেজিত করে এবং স্মৃতির কাজ করতে সুরু করে। কোষগুলিতে যে সংবাদ একবার স্থান পায়, তা আর কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না। সেগুলির উপর অন্য আর কিছু লেখা যায় না অথবা সেগুলিও অন্য কিছু লিখে নিতে পারে না। স্নায়ুর মধ্যে অবস্থিত সবগুলি কোষ যদি সংবাদে পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মস্তিষ্ক আর কোন সংবাদ গ্রহণ করতে পারে না—অর্থাৎ স্মৃতির সীমা তখন পূর্ণ হয়ে যায়।

ভিটামিন বায়োটিন

রণজিৎকুমার দত্ত

১৯১৬ সালে প্রথম লক্ষ্য করা হলো যে, খাদ্যে বেশী পরিমাণে ডিমের সাদা অংশ থাকলে ইঁদুরের পক্ষে অপকার হয়—ইঁদুরের চামড়া ফুলে যায়, লোম পড়ে যায়, মাংসপেশীর কার্যকারিতার অভাব ও স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা যায়। এও লক্ষ্য করা গেল যে, ডিমের সাদা অংশ সিদ্ধ করে ইঁদুরকে খাওয়ালে তেমন অপকার হয় না। বিজ্ঞানীরা আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রাণীর যকৃৎ, ঈষ্ট ও অন্য কতকগুলি খাদ্যে এমন একটি পদার্থ আছে, যা ডিমের সাদা অংশ ভক্ষণের অনিষ্টকারিতা দূর করতে পারে। বিজ্ঞানী জোর্জি ও তাঁর সহকর্মীদের মতে—ভিটামিন-এইচ নামক একটি পদার্থ ডিমের সাদা অংশ ভক্ষণের অপকারিতা দূর করতে পারে। ১৯৩৫ সালে বিজ্ঞানী কগ্ যখন ঈষ্টের খাদ্যের অত্যাবশ্যক একটি উপাদান সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন, তখন তিনি ডিমের হল্‌দে কুসুম থেকে একটি ভিটামিন পৃথক করেন এবং তার নাম দেন বায়োটিন। পরে দেখা গেল, জোর্জি ও তাঁর সহকর্মীদের জ্ঞাত ভিটামিন-এইচ ও বায়োটিন রাসায়নিকভাবে একই পদার্থ।

ডিমের সাদা অংশ ভক্ষণের অপকারিতা সম্বন্ধে গবেষণায় পরে জানা যায় যে, কাঁচা ডিমের সাদা অংশে এভিডিন নামে একটি প্রোটিন থাকে। অতিরিক্ত পরিমাণে ডিমের সাদা অংশ গ্রহণ করলে এই এভিডিন দেহের বায়োটিন নামক ভিটামিনের সঙ্গে একটি যৌগিক পদার্থ তৈরী করে, যা পরিপাক-ক্রিয়ার এন্‌জাইমের দ্বারা বিভক্ত হয় না বা দেহে শোষিত হয় না। ফলে দেহে বায়োটিনের অভাব-জনিত লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

প্রাণী ও উদ্ভিদ-দেহে বায়োটিন থাকে এবং প্রায়শঃই অন্য পদার্থের সঙ্গে যুক্তভাবে থাকে। যেমন ঈষ্টের দেহে বায়োটিন থাকে লাইসিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে। শূকরের যকৃতে বায়োটিন থাকে অন্য একটি যৌগ হিসেবে। যখন প্রোটিনের সঙ্গে (এভিডিন ছাড়া) যৌগ হিসেবে বায়োটিন দেহে থাকে বা খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়, তখন পরিপাক ক্রিয়াতে এই বায়োটিন যৌগ ভেঙ্গে যায় ও দেহের পুষ্টিসাধনের কাজে লাগে।

বায়োটিন দেখতে দানাদার এবং জলে খুব অল্প পরিমাণে দ্রবণীয়। অল্প উত্তাপ বা আলোতে এর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। তবে অম্ল ও ক্ষারের কঠিন প্রক্রিয়ায় বায়োটিনের ভিটামিন গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায়। বায়োটিন বেশী আছে—এমন খাদ্য হচ্ছে প্রাণীর যকৃৎ, কিড্‌নী, গুড়, ঈষ্ট, দুধ ও ডিমের হল্‌দে কুসুম শাকসব্জী ও শস্যকণাতেও বায়োটিন থাকে।

মানবদেহে বায়োটিনের অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ডিমের সাদা অংশ অধিক পরিমাণে আছে, এমন খাদ্য খাওয়াবার পর দেখা গেছে যে, পূর্ণবয়স্ক মানুষের ত্বক ফুলে যায়, মাংসপেশীতে বেদনা অনুভূত হয়। তারপর আলস্য এবং মানসিক উপসর্গও দেখা যায়। এই সকল রোগীকে দৈনিক ১৫০—৩০০ মাইক্রোগ্র্যাম বায়োটিন বা অক্সিবায়োটিন খাওয়ালে ঐ লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়। বানর, কুকুর, ইঁদুর, খরগোস, হাঁস, মোরগ ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রেও বায়োটিনের অভাবজনিত লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। হাঁস ও মোরগের বায়োটিনের অভাবে পেরোসিস বা হাড় গঠনে গোলমাল হয়। কুকুরের দেহ বায়োটিনের

অভাবে অবশ হয়ে আসে। পাখীদের প্রজনন-ক্ষমতা ও স্ত্রী-ইঁদুরের দুগ্ধদান-ক্ষমতা হ্রাস পায়।

বায়োটিন-শূন্য খাদ্য গ্রহণের ফলে মানুষের দেহে বা অন্য প্রাণীতে অনেক সময় অভাবজনিত লক্ষণ নাও প্রকাশ পেতে পারে। তার কারণ, মানুষ বা প্রাণীদেহের পরিপাকনালীর জীবাণুসমূহ এই ভিটামিনটি তৈরী করতে পারে, যা শরীরে শোষিত হয় ও কাজে লাগে। ফলে পরীক্ষাগারে প্রাণীদেহে বায়োটিনের অভাব জনিত লক্ষণ পেতে হলে প্রাণীদের এভিডিন খাওয়াতে হয় বা অ্যান্টিবায়োটিক্ বা অন্য ওষুধের সাহায্যে পরিপাকনালীর জীবাণুসমূহ ধ্বংস করতে হয়। এই কারণে মানুষের দেহের জন্যে কতটা বায়োটিন দরকার, তা নির্ভুলভাবে পরিমাপ করা দুরূহ। তবে দৈনিক ২০০ মাইক্রোগ্র্যাম বায়োটিন মানুষের দেহের পক্ষে যথেষ্ট বলে ধরা হয়েছে। রোমন্থনকারী প্রাণীর পাকস্থলীর প্রথম অংশে এই ভিটামিনটি জীবাণুর দ্বারা সৃষ্ট হয়

প্রাণীদেহে বায়োটিন প্রত্যক্ষভাবে কি কাজে লাগে, তা ভালভাবে আজও জানা যায় নি।

বিজ্ঞান-সংবাদ

চাঁদের অভ্যন্তরের তাপাঙ্ক

গোর্কি মানমন্দিরের ডাঃ ডি. এস ত্রোইৎস্কি-র তত্ত্বাবধানে একদল সোভিয়েট বেতার-জ্যোতি-বিজ্ঞানী চাঁদের বেতার-বিকিরণ বিশ্লেষণ করে চন্দ্রপৃষ্ঠের নীচেকার বিভিন্ন স্তরের তাপাঙ্ক ও চাঁদের পাহাড়ের সংযুতি নির্ণয় করেছেন। ইতিপূর্বে দূরবীক্ষণে পর্যবেক্ষণের ফলে চন্দ্রের বস্তুর ঘনত্ব যা হিসেব করা হয়েছিল, এই বেতার-পর্যবেক্ষণের ফলে সেই ঘনত্ব ১০ গুণেরও বেশী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এই বেতার-বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেই মস্কোর বিজ্ঞানীরা প্রথম সূর্যের অতি-ছটামণ্ডল (সুপার-করোনা) সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হন। বর্তমানে গোর্কি মানমন্দিরে বেতার-জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাঁদের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে সৌর-আবহমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরের চৌম্বক ক্ষেত্র পরিমাপের কাজে ব্যাপৃত আছেন। ভবিষ্যৎ গ্রহান্তর যাত্রার পক্ষে এই তথ্যটি হবে খুবই ́।

নিয়েভেলীর দ্বিতীয় টার্বো-জেনারেটর

গত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের অব্যবহিত পূর্বে মাদ্রাজের নিয়েভেলী বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের কর্মীরা তাঁহাদের জাতিকে একটি সুন্দর উপহার প্রদান করেন। ওই দিনে এখানকার দ্বিতীয় টার্বো-জেনারেটরটিকে চালু করা হয়। ইহার ফলে এই কেন্দ্রের উৎপাদনের পরিমাপ দাঁড়ায় ১ লক্ষ কিলোওয়াট। ইহার নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হইলে এখানে ৪ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে এবং নিয়েভেলী হইয়া দাঁড়াইবে ভারতের বৃহত্তম বিজলী উৎপাদনের ষ্টেশন।

১৯৫৯ সালের অগাষ্ট মাসে সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিজাইনারদের সহযোগিতায় এই বিদ্যুৎ-স্টেশন নির্মাণের কাজ সুরু হয় এবং প্রথম ব্লকটির উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে ইহার উদ্বোধন করেন। জ্বালানী হিসেবে ভারতে এখানেই প্রথম লিগ্‌নাইট ব্যবহার করা হইতেছে। এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে লিগ্‌নাইট পাওয়া যায় এবং ইহার খরচও খুব কম। একটি লিগ্‌নাইট খনি স্থাপন ও কাঁচা লিগ্‌নাইট-পিণ্ডকে পরিশোধনের জন্যে একটি শোধনাগার স্থাপনেও সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা সহায়তা করিয়াছেন ও সোভিয়েট

যুক্তরাষ্ট্র যাবতীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছে। নিয়েভেলীর সহিত যুক্ত একটি রাসায়নিক সারের কারখানা, একটি ব্রিকেটিং কারখানা ও একটি কেওলিন কারখানাকেও এখান হইতে বিজলী সরবরাহ করা হইবে।

সোভিয়েট বিশেষজ্ঞেরা এই বিজলী ষ্টেশনকে আধুনিকতম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করিয়াছেন। এখানকার কতকগুলি ইউনিট স্বয়ংক্রিয় ও দূর-নিয়ন্ত্রিত—যাহার ফলে খুব কম সংখ্যক কর্মী গোটা ষ্টেশনটিকে অত্যন্ত সহজে সুপরিচালিত করিতে পারিবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে, সোভিয়েট কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তায় ভারতে মধ্য প্রদেশের কোর্বা শহরে একটি তাপ-বিদ্যুৎ (২,৯০,০০০ কিলোওয়াট) ষ্টেশন, উত্তর প্রদেশের ওব্রা শহরে একটি তাপ-বিদ্যুৎ (২,৫০,০০০ কিলোওয়াট) ষ্টেশন এবং বিহারের পাত্রাতু শহরে একটি তাপ-বিদ্যুৎ (৪ লক্ষ কিলোওয়াট) ষ্টেশন নির্মিত হইতেছে।

প্রাণঘাতী স্নায়বিক ব্যাধির ভাইরাস

লেনিনগ্রাডে নিখিল-সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদের যে সপ্তদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, সেই অধিবেশনে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রখ্যাত চিকিৎসক ও স্নায়বিক রোগ-বিশেষজ্ঞ ডাঃ লিও জিল্‌বের তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, শরীরের কতকগুলি স্থানের—বিশেষতঃ মস্তিষ্কের শিরার জড়তা থেকে যে "স্ক্লেরোসিস" রোগে বহু ক্ষেত্রেই রোগী মারা যায়, বিজ্ঞানীরা সেই রোগের ভাইরাসের সন্ধান পেয়েছেন। এই স্ক্লেরোসিস ব্যাধির উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ে পৃথিবীর নানা দেশের বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল ধরে গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই ব্যাধির ভাইরাস আবিষ্কার করবার ফলে এক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করা হলো বলে ডাঃ জিল্‌বের ঘোষণা করেন।

ডাঃ জিল্‌বেরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ক্যান্সার রোগের উৎপত্তির মূলে আছে ভাইরাস। এই ক্যান্সার-ভাইরাসের সন্ধানে দীর্ঘকাল ধরে তিনি গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

ডাঃ জিল্‌বের তাঁর ওই রিপোর্টে আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন—জৈব কোষের বাইরে অন্যান্য মাধ্যমেও (নন-সেলুলার মিডিয়াম) ভাইরাসগুলি তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে তিনি কয়েকটি বিশেষ ধরণের অজৈব রাসায়নিক মাধ্যমে কয়েক শ্রেণীর ভাইরাসের বংশবৃদ্ধি ঘটাতে পেরেছেন। এই ব্যাপারটি রোগ নিদানের ক্ষেত্রে বিশেষ 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে সোভিয়েট চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা মত প্রকাশ করেন।

আরো কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে জীবন বিকশিত হবে

তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ায় বা অন্য একটি তারকার সঙ্গে সংঘর্ষের দরুণ পৃথিবী বা তার অধিবাসীদের ধ্বংসলীলার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা নেই বলে কাজাক বিজ্ঞানী তোচেনাগো অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আরো কোটি কোটি বছর ধরেই আমাদের পৃথিবীতে জীবন বিকাশলাভ করবে। পাভলোদার (ৎসেলিনি অঞ্চল) সম্পর্কে গবেষণারত এই বিজ্ঞানীর মতে, মাত্র কয়েক শত কোটি বছর পরই সূর্যের শক্তি ক্ষয় এবং তার জন্যে পৃথিবীতে সামান্য কয়েক ডিগ্রি তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। দুই ছায়াপথের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বিশ্বের ধ্বংসসাধনের সম্ভাবনাও অবিশ্বাস্য। "সোয়ান" নক্ষত্রমণ্ডলীতে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে দুই ছায়াপথের যে সম্মিলন অবলোকন করছেন, সেই ছায়াপথ দুটির গ্রহ ও তারকাদের উপর তার কোন প্রতিক্রিয়া হবে না। ছায়াপথ দুটির একটি অপরটির মধ্য দিয়ে সহজেই চলে যাবে। সম্ভাবনা-তত্ত্ব অনুযায়ী ৫০০০০০০০০০০কোটি বছরের মধ্যে একবার

পৃথিবীর সঙ্গে অন্য তারকার সংঘর্ষ ঘটতে পারে। সুতরাং আমাদের গ্রহের প্রকৃতপক্ষে অনন্ত জীবন রয়েছে। আর পৃথিবীর লোকেরা যদি নিজেদের অপূরণীয় ক্ষতি নিজেরাই না করে, তবে মানবসমাজ ক্রমাগত বিকাশ লাভ করবে এবং সভ্যতা ও সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নব নব শিখরে উন্নীত হবে।

পৃথিবীর দিকে একটা ধূমকেতু আসছে

জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূ-পদার্থবিদ্যার সোভিয়েট সমিতির এক বিশেষ অধিবেশনে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক দিমিত্রি মার্তিনফ নতুন একটি ধূমকেতুর সাম্প্রতিক আবিষ্কারের কথা উল্লেখ করে জানান যে, এখন ধূমকেতুটিকে একটি তারার মত দেখায় এবং সেটা পৃথিবীর কক্ষপথের সঙ্গে প্রায় মিলে যাওয়া একটা কক্ষপথেই চলেছে। ধূমকেতুটি ৬ই মে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে, ১৬ লক্ষ থেকে ১৮ লক্ষ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে এসেছে।

হাঁপানি রোগের নূতন ঔষধ

মস্কো, ৯ই এপ্রিল—মস্কোর ইউ-এস-এস-আর ফার্মাসিউটিক্যাল-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনটিটিউট হাঁপানি রোগের একটি নূতন সিন্থেটিক ঔষধ উদ্ভাবন করিয়াছে। এই ভেষজটির নাম 'ডিপ্রোফিলিন'।

এই নূতন ঔষধ গুঁড়া ও বটিকা, এই উভয় আকারেই পাওয়া যায়। রোগীর দেহে ইন্‌জেকশন করিয়াও ডিপ্রোফিলিন প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নিয়মিত ব্যবহার করিলে এই ঔষধের দ্বারা হাঁপানির প্রকোপ বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং নূতন করিয়া আক্রমণের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়।

কৃত্রিম 'ভেড়া'

জীবজন্তুর উপর আবহাওয়ার প্রভাব পরিমাপের জন্য এয়ারশায়ারের (স্কটল্যাণ্ড) হানা ডেয়ারি রিসার্চ ইনটিটিউটের বৈজ্ঞানিকেরা কৃত্রিম 'ভেড়া' ব্যবহার করিতেছেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আমরা যতটা মনে করি ঠাণ্ডায় ভেড়ারা তার চেয়ে অনেক বেশী কাবু হয়।

কৃত্রিম 'ভেড়ার' সাহায্যে, জীবন্ত পশুর তাপক্ষয়ের উপর বায়ুর তাপমাত্রা, বাতাসের বেগ, সৌরবিকিরণ ও অতিলোহিত রশ্মি বিকিরণ প্রভৃতির প্রভাব পরিমাপ করা হইতেছে।

ভেড়াটি হইল একটি ধাতু নির্মিত চোঙা, যাহার উপর লোমযুক্ত ভেড়ার চামড়া জড়ানো আছে। ভিতরে আর একটি চোঙার মধ্যে আছে একটি বৈদ্যুতিক পাখা, ১২টি ৩০ ওয়াটের বাল্ব হিটার এবং ভিতরের তাপমাত্রা ৩১° সেন্টিগ্রেডে বজায় রাখিবার জন্য একটি থার্মোস্টাট যন্ত্র।

বাক্‌শক্তিহীনদের কথা বলবার অভিনব যন্ত্র

বাক্‌শক্তিহীনদের কথা বলবার একটি অভিনব যন্ত্র সম্প্রতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং পৃথিবীর সব স্থানেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাধ্যমে এই কৃত্রিম ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রটি সরবরাহ করবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বেল টেলিফোন লেবরেটরিজ কর্তৃক এই যন্ত্রটি প্রথম উদ্ভাবিত হয়। এর পরে যাদের বাগযন্ত্র বা কণ্ঠনালীর উর্ধ্বভাগ অস্ত্রোপচার করে সরানো হয়েছে অথবা বাগযন্ত্র অসাড় হয়ে পড়েছে, তাদের জন্য ওয়েস্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানী এটি নির্মাণ করেন। ঐ কারখানায় তৈরী এই যন্ত্রটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় পাওয়া যেত। ঐ কোম্পানী লাভের উদ্দেশ্যে এটি তৈরী করেন নি।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ১১২টি সদস্য রাষ্ট্রের যে কোন অধিবাসীর নিকট থেকে অর্ডার পেলে তাকে এই যন্ত্রটি সরবরাহ করা হবে। বিদেশে সংস্থার যে ছয়টি আঞ্চলিক দপ্তর আছে, তাদেরই মাধ্যমে ওয়াশিংটন ডিসির প্যান আমেরিকান সেনিটারী ব্যুরোর নিকট এই অর্ডার দিতে হবে। প্রত্যেকটি কৃত্রিম বাগযন্ত্রের সঙ্গে

পাঁচটি ভাষায় লিখিত নির্দেশপত্রও প্রেরণ করা হবে। প্রতিটি যন্ত্রের মূল্য ৪৫ ডলার।

পেনিসিলিন অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরী ভেষজ আবিষ্কার

সাধারণ পেনিসিলিন যে সকল রোগীর দেহে কার্যকরী হয় না, তাদের চিকিৎসায় অক্সেসিলিন নামে একটি নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিক ভেষজ প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত ছয়টি রোগী, মস্তিষ্ক ও ঘাড়ে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত পাঁচটি রোগী এবং আগুনে পোড়া তিনটি রোগী এই নতুন ওষুধ গ্রহণ করে আরোগ্যলাভ করেছে। মেথিসিলিনের তুলনায় এই কৃত্রিম পেনিসিলিন বা অক্সেসিলিন পাঁচ থেকে আটগুণ অধিক শক্তিশালী। এই ওষুধ সেবন করতে হয় এবং এতে সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে।

সিয়াটেলের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব মেডিসিনের চিকিৎসকবর্গ এই সংবাদ দিয়েছেন। অক্সেসিলিনের আবিষ্কার চিকিৎসা-ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সূচনা করছে বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বলয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ

মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয় বলয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মার্কিন বিমান বাহিনী অতি ক্ষুদ্র একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে প্রেরণ করেছেন। এর ওজন দেড় পাউণ্ডেরও কম। বিগত ৯ই জুলাই মহাকাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে যে কৃত্রিম বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে এবং পৃথিবীকে ঘিরে যে ভ্যান অ্যালেন বলয় রয়েছে, তাদের তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য।

এর আগে ২৭শে অক্টোবর এই উদ্দেশ্যেই জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা পঞ্চদশ এক্সপ্লোরার নামে আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করেছেন।

নূতন ঔষধ তৈরী

বৃটেনে সম্প্রতি যক্ষ্মা, ক্যান্সার এবং হৃদ্‌রোগের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রামের জন্য চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ হইয়াছে

সলসবারী গ্রেনের অন্তর্গত পোর্টন-এ সমর দপ্তরের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল রিসার্চ এস্টাব্লিশ-মেন্টের লেবরেটরিসমূহে যে কাজ চলিয়াছে, তাহা শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা রোগের বিরুদ্ধে এক অতি শক্তিশালী টিকা আবিষ্কার সম্ভব করিবে।

জীবন্ত প্রাণীতে রোগ সৃষ্টির সময় ব্যাক্টিরিয়া এবং ভাইরাসের কাজ কি ভাবে হয়, এই সকল গবেষণার ফলে তাহা হয়তো জানা যাইবে। কাচের পাত্রে এবং টেস্ট টিউবে এই ধরণের পরীক্ষা না করিবার কারণ হইল—ইহাতে ফল ভিন্ন রকমের হইতে পারে।

ক্যান্সার টিউমারের বিরুদ্ধে আক্রমণ

ক্যান্সার তন্তু উর্বর ডিমের কোন কোন কোষের দ্বারা ধ্বংস করা সম্ভব। বৃটিশ সায়ান্স জার্নাল "নেচারে" প্রকাশিত এক প্রবন্ধে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডি. আর. কার্বি যে পরীক্ষাকার্য চালান, তাহার ফলাফল বর্ণিত হইয়াছে। এই পরীক্ষা হয় কতকগুলি জীবন্ত ইঁদুরের ক্যান্সার-টিউমারে ইঁদুরের ট্রোফোব্লাস্ট (Trophoblast) সংযোগ করিয়া। পাঁচ দিন পরে ইঁদুরগুলির মৃত্যু ঘটিলে ক্যান্সার পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। ছয়টির মধ্যে চারটিতে ট্রোফোব্লাস্ট ক্যান্সার-তন্তুর মধ্যে অনেকখানি ঢুকিয়া যায় এবং টিউমারের মধ্যভাগ 'খাইয়া' ফেলে।

ডাঃ কার্বি এই সম্পর্কে আরও কিছু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই পরীক্ষার ফলাফল তিনি

শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন। তাঁহাকে এখনও দেখিতে হইবে যে, এই ট্রোফোব্লাস্ট কোষগুলি কারসিনোমা (Carcinoma) ছাড়াও ক্যান্সারের বিরুদ্ধে ফলপ্রদ উপায়ে প্রয়োগ করা সম্ভব কি না।

হৃদ্‌রোগের জন্য নতুন ভেষজ

ইম্পিরীয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ হৃদ্‌রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য একটি নূতন ভেষজ "অ্যাষ্ট্রোমিড"-এর ('Astromid') কথা ঘোষণা করিয়াছে। এই সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে ব্যাপক পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়ায় ইহা এখনও বাজারে ছাড়া হয় নাই।

"অ্যাষ্ট্রোমিড" ধমনীর রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতে পারিবে—ধমনীর এই রোগই করোনারি থ্‌রম্বোসিসের কারণ হইয়া থাকে। ভেষজটি এই হৃদ্‌রোগ নিয়ন্ত্রণে নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বলয়ের অবস্থান

মার্কিন বিমান-বাহিনী জানিয়েছেন যে, কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় বলয়ের এক প্রান্ত রয়েছে আটলাণ্টিক মহাসাগরে নিরক্ষবৃত্তের ২০০ মাইল উর্ধ্বে এবং এর অন্যান্য অংশ রয়েছে পৃথিবী থেকে তারও অনেক উর্ধ্বে।

গত ৯ই জুলাই '৬২ মহাকাশে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাবার ফলে যে বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে, তার অবস্থিতি ও মাত্রা সম্পর্কে মার্কিন বিমান বাহিনী বিশেষ যন্ত্রপাতি সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখেছেন। টেলস্টার এবং ইনজুন নামে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এবং অ্যারিয়েল নামে বৃটিশ বিমানের সাহায্যে এই বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। মার্কিন বিমান-বাহিনী জানিয়েছেন যে, এই বলয় অতি শক্তিশালী ইলেকট্রনের সমবায়ে গঠিত। ভূ-চৌম্বক নিরক্ষবৃত্ত এলাকার ৪০০ মাইল উর্ধ্বে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ খুবই বেশী এবং ১০০০ মাইল উর্ধ্বে স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে ১০০-১০০০ গুণ বেশী হয়ে থাকে। মার্কিন বিমান-বাহিনীর কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণের ফলে মহাকাশযাত্রী শিরাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবার ব্যাপারে খুবই সহায়ক হয়েছিল। কম্যাণ্ডার শিরা ষষ্ঠ পরিক্রমাকালে পৃথিবী থেকে ১১৬ মাইল উর্ধ্বে ছিলেন।

ক্যান্সার চিকিৎসার অভিনব পদ্ধতি

জনৈক মার্কিন চিকিৎসক ক্যান্সারের ক্ষত চিকিৎসার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন।

এতে মেথোট্রেক্সেট নামে একটি ভেসজ ব্যবহৃত হয়। বোস্টনের লেহে ক্লিনিকের চিকিৎসক ডাঃ রবার্ট ডি. সুলিভ্যান ক্ষতস্থানে রক্তবাহী শিরার মধ্যে এক থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত এই ঔষধটি প্রয়োগ করে খুবই ভাল ফল পেয়েছেন। জীবদেহের স্বাভাবিক কোষের ক্ষেত্রে এই ভেসজটি বিষের মত কাজ করে। এজন্যে রোগীর দেহে মাঝে মাঝে লিউকোভোরিন নামে একটি বিষঘ্ন দ্রব্যের ইনজেকশন দেওয়া হয়; অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে একটি ওষুধ ক্যান্সার নিরাময়ের জন্যে এবং আর একটি তার বিষক্রিয়া নষ্ট করবার জন্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

এই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা লক্ষ্য করে পৃথিবীর বারোটি রাষ্ট্রের চিকিৎসকবৃন্দ এই ওষুধটি চেয়ে পাঠিয়েছেন এবং এর প্রয়োগ-কৌশল জানতে চেয়েছেন।

সুষম খাদ্যই শিশুরোগের প্রধান ভেষজ

প্রতি বছর পেটের অসুখে পঞ্চাশ লক্ষ শিশু ও বালক-বালিকার মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুর বেশী ভাগই দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে ঘটে থাকে।

আমেরিকার বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং শিশু-

পক্ষাঘাত রোগের টীকা আবিষ্কারক ডাঃ আলবার্ট স্যাবিন এই সমস্যা পর্যালোচনা করে সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রসমূহে এই সমস্যা প্রায় সমাধান হয়ে গেছে। এজন্যে প্রয়োজন ভাল খাবার, ভাল থাকবার ব্যবস্থা, প্রচুর নির্মল বায়ু ও জল, স্বাস্থ্য রক্ষার সম্পর্কে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা, জীবাণুমুক্ত দুধ, শিশুপালন সম্পর্কে মায়েদের শিক্ষা প্রভৃতি। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহে এক সঙ্গে সবগুলি ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার পূর্বে শিশুর জন্মের প্রথম দু-বছরের মধ্যে যথোপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করে এই সমস্যার কতকটা সমাধান করা যেতে পারে।

ডাঃ স্যাবিন বলেছেন—জীবাণু ও ভাইরাস রয়েছে এই রোগের মূলে। ময়লা হাতের মাধ্যমে এই রোগ বাহিত হয়। যে সব শিশু সুষম খাদ্য পায় না, তারা অপুষ্টির ফলে এই সব জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে না।

ডাঃ স্যাবিন স্বল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহের শিশুদের জন্যে একপ্রকার খাদ্যের সুপারিশ করেছেন। এই সব খাদ্য দুধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হবে। এদের মধ্যে এমন অ্যান্টিবায়োটিক অথবা অন্য উপকরণ থাকবে, যা জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিহত করবে, অতি নোংরার মধ্যেও জীবাণু সৃষ্টি হবে না। তবে দুধের পরিবর্তে শিশুর খাদ্য হিসাবে যে জিনিষটি ব্যবহৃত হবে, তার দাম কম হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া খেতে সুস্বাদু এবং প্রোটিন ও ভিটামিন-সমৃদ্ধ হওয়া দরকার। ডাঃ স্যাবিনের ধারণা, পশু-খাদ্যের সঙ্গেও অ্যান্টি-বায়োটিক দ্রব্য মেশালে উপকার পাওয়া যেতে পারে। শিশুর জীবনে প্রথম দু-বছরের মধ্যে খাদ্যজনিত অপুষ্টি দূর করতে পারলে মায়ের বুকের দুধ না খাইয়ে তার পরিপূরক অন্য কোন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করা অসম্ভব হবে না। মায়ের দেহের সংস্পর্শে না আসবার দরুণ পেটের অসুখ যে সকল জীবাণুর জন্যে হয়ে থাকে, শিশু সেই সব জীবাণুর দ্বারা সংক্রামিত হবে না।

ফুস্‌ফুস সংযোজনের ব্যবস্থা

ফুস্‌ফুস অকেজো হয়ে গেলে তার বদলে অন্য দেহের ফুস্‌ফুস লাগিয়ে রোগীকে রক্ষা করবার ব্যবস্থা ভবিষ্যতে করা যেতে পারে—মার্কিন বিজ্ঞানীরা এ-রকম আশা পোষণ করেন।

এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা কয়েকটি কুকুরের দেহ থেকে ফুস্‌ফুস অপসারিত করে জলে ঠাণ্ডা করা প্লাষ্টিকের ব্যাগে রাখেন। তারপর তাঁরা অন্য কুকুরের দেহের ফুস্‌ফুস সরিয়ে নিয়ে আগের ফুস্‌ফুসের স্থলে সংযোজিত করেন। ঐ সব ফুস্‌ফুসের ক্রিয়া দু-মাস পর্যন্ত চালু ছিল।

পূর্বে সংরক্ষিত কোন পশুর ফুস্‌ফুস এই প্রথম সাফল্যের সঙ্গে অন্য দেহে সংযোজিত হলো। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত ইমোজিন ব্যাসেট হাসপাতালের ডাঃ ডেভিড এ. ব্লুমেনস্টক, হার্বার্ট বি. হেক্টম্যান এবং জন এ. কলিন্‌স্ এই বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁরা আশা করছেন, এমন দিন আসবে যখন মনুষ্যদেহের সুস্থ ফুস্‌-ফুসকে হিমায়িত করে বহুকাল রাখা যাবে এবং প্রয়োজন অনুসারে সেগুলিকে অন্যদেহে সংযোজিত করা যাবে। আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির একটি রিপোর্টে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেন। ফুস্‌-ফুসটিকে দেহ থেকে অপসারণের পর জীবন্ত রাখা এবং অন্য দেহের রক্তপ্রবাহের সঙ্গে সংযোজন করা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণতঃ যমজের মধ্যে কোন একজনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্য জনের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে জোড়া যায়। যমজ ব্যতীত অন্য দেহ সংযোজিত অংশকে গ্রহণ করে না, তাতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ক্যান্সার রোগের ভেষজ

মেথোট্রেক্সেট প্রয়োগ করে এই প্রতিক্রিয়া নষ্ট করা হয়।

এই শল্যচিকিৎসা এই ভাবে সম্পাদিত হয়েছিল—প্রথমতঃ কুকুরের বাঁ-দিকের ফুস্‌ফুসটি অপসারিত হয়। রক্তবহা নালীসমূহ যাতে দীর্ঘাকারে থাকে এবং সেই সব নালী যাতে নতুন দেহের রক্তবহা নালীর সঙ্গে জোড়া যায়, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এটি অপসারিত হয়।

তারপর ফুস্‌ফুসটি সিরাম দিয়ে ভর্তি করে একটি প্লাষ্টিকের থলিতে বরফের জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়। যান্ত্রিক উপায়ে তিন বা চারবার শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ব্যবস্থা হয়।

এর প্রায় আঠারো অথবা কুড়ি ঘণ্টা পরে আর একটি কুকুরের বাঁ-দিকের ফুস্‌ফুসটি বের করে তার স্থলে ঐ ফুস্‌ফুসটি লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং মেথোট্রেক্সেট ইনজেক্‌শন দেওয়া হয়। এর পর সপ্তাহে তিন দিন এই ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা হয়। ১৪টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৪টিতে চিকিৎসকেরা সাফল্য অর্জন করেন। ৫৬ দিন পরে অপারেশন করে দেখা যায়, ঐ সব ফুস্‌ফুস ভালভাবেই কাজ করছে।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা হিমায়িত করে বহুকাল এই সব ফুস্‌ফুস রাখা যেতে পারে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখছেন। মনুষ্যদেহে এই ধরণের অস্ত্রোপচারের পুর্বে আরও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

পুস্তক পরিচয়

বিচিত্র প্রসঙ্গ—শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস; ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মিত্র ও ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ—২৩৫; মূল্য—চার টাকা।

গ্রন্থকার বহুদিন হইতেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লিখিয়া আসিতেছেন। বিজ্ঞান বিষয়ক মনোজ্ঞ প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া তিনি আলোচ্য পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহাতে সূর্য, পৃথিবী, আবহতত্ত্ব, ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত ২৮টি প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি যেমন তথ্যবহুল তেমনই চিত্তাকর্ষক। অধিকাংশ প্রবন্ধেরই বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, লেখকের বিজ্ঞানানুরাগী মন বিচিত্র বিষয়ে আকৃষ্ট হইলেও ক্ষণিক উৎসাহ-বশেই তিনি এই প্রসঙ্গগুলি লিপিবদ্ধ করেন নাই, বিভিন্ন সূত্র হইতে তথ্যাদি আহরণ করিয়া আলোচ্য বিষয়বস্তু যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রেই পুস্তকখানি পড়িয়া যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। পুস্তকখানির মলাট, বাঁধাই ও ছাপা সুন্দর।

স্বাস্থ্যদীপিকা—(মাসিক পত্র) পরিচালনা সম্পাদক-শ্রীনিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ১৩১, বহুবাজার ষ্ট্রীট (ত্রিতল, রুম নং ২২), কলিকাতা-১২, মূল্য—প্রতিসংখ্যা—চল্লিশ নয়া পয়সা।

আমরা স্বাস্থ্য বিষয়ক এই নূতন পত্রিকাখানির জানুয়ারী সংখ্যা পাইয়াছি। এই সংখ্যায় লিখিয়াছেন—শিবতোষ মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ মল্লিক, অসীমকুমার চক্রবর্তী, সীমানন্দ অধিকারী, দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকবৃন্দ। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত। প্রচ্ছদপটটি সুদৃশ্য। আমরা এই নবীন সহযোগীর সাফল্য কামনা করি।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুন—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রাগৈতিহাসিক নাম্বার—অ মার পুনর্গঠিত

ব্যাঙের ছাতা

সাধারণতঃ বর্ষাকালে বাড়ীর পিছনের ছাইগাদায় বা আস্তাকুঁড়ের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে সাদা বা একটু হলদে রঙের ছোট-বড় নানা আকারের ছাতার মত একরকম অদ্ভুত জিনিষ জন্মাতে দেখা যায়। এগুলি একরকমের উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছু নয়। কথাটা শুনতে অদ্ভুত হলেও মিথ্যা নয়। কারণ ওগুলি সত্যই উদ্ভিদ। আমরা সাধারণভাবে ওগুলিকে "ব্যাঙের ছাতা" বলি। কিন্তু তাই বলে এরা সত্যই ব্যাঙের কোন জিনিষ নয় অর্থাৎ ব্যাং এগুলি তৈরী করে না। তবে বর্ষাকালে স্যাঁতসেঁতে জায়গায় সময় সময় ঐসব উদ্ভিদের কাছে ব্যাংদের বসে থাকতে দেখা যায়। সেই জন্যেই বোধ হয় এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে—ব্যাঙের ছাতা।
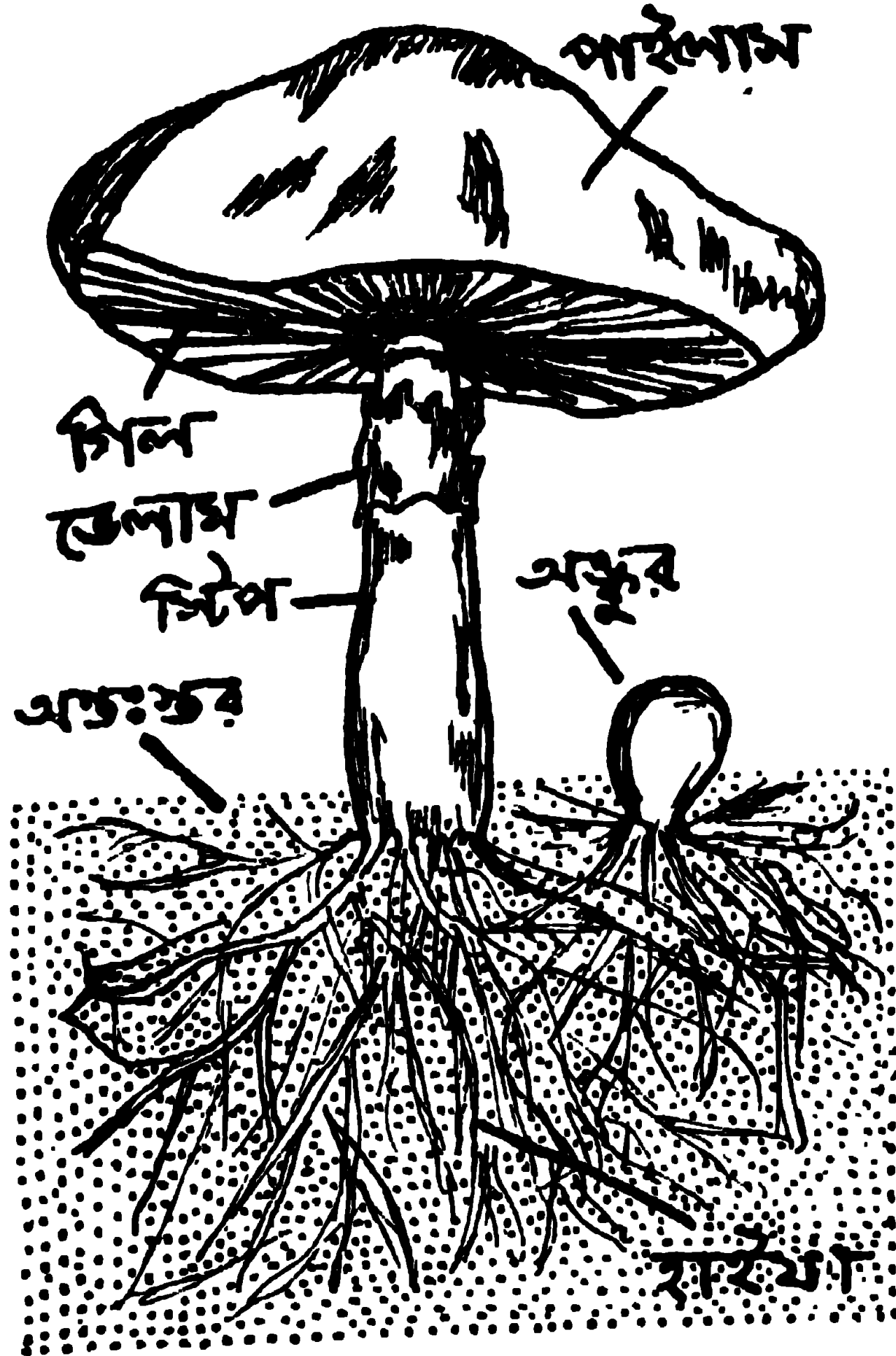
১নং চিত্র। ব্যাঙের ছাতা : পরিণত অবস্থা ও অঙ্কুর

ব্যাঙের ছাতা সাধারণ গাছের মতই মাটি বা পচা গাছপালার মধ্যে জন্মায়, তবে বীজ থেকে নয়। এটা কিন্তু আরও আশ্চর্যের কথা। বীজ থেকে গাছ হয় না তো কোত্থেকে হয়? সব কিছু জানতে গেলে উদ্ভিদের সেই প্রথম শ্রেণীবিভাগ থেকে আরম্ভ করতে হবে।

পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে বিরাট উদ্ভিদজগৎ। এই বিরাট উদ্ভিদজগৎকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়—অপুষ্পক উদ্ভিদ এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ। যে সব উদ্ভিদের ফুল বা বীজ হয় না তাদেরই অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। অপুষ্পক উদ্ভিদ সাধারণতঃ তিন প্রকারের হয়।—(১) থ্যালোফাইটা, (২) ব্রাওফাইটা, (৩) টেরিডোফাইটা। থ্যালোফাইটা আবার নিম্নলিখিত দুটা বিভাগ নিয়ে তৈরী—শৈবাল বা অ্যাল্‌গি আর ছত্রাক বা ফাঙ্গাস। ব্যাঙের ছাতা এই ছত্রাক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একজাতের উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ।

ব্যাঙের ছাতা সাধারণতঃ পচা জিনিষ বা যেখানে পচা জিনিষ জমা করা হয়, সে সব জায়গায় জন্মায়। ব্যাঙের ছাতা দেখতে সাদা, তার কারণ এদের দেহে ক্লোরোফিল বা সবুজকণিকা নেই। তাই এরা সূর্যের আলো থেকে কোন খাদ্য তৈরী
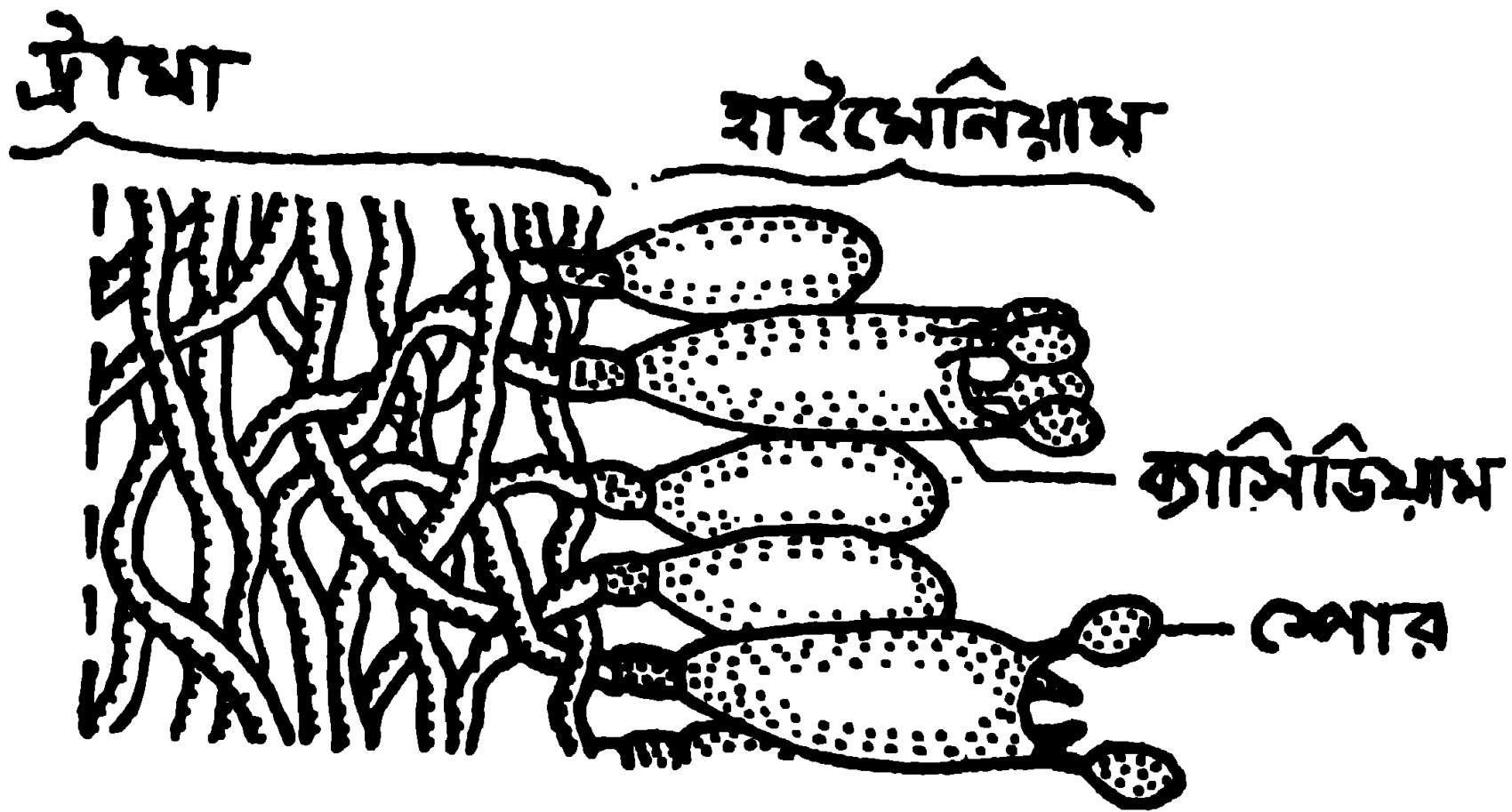
২নং চিত্র। গিলের প্রস্থচ্ছেদের অর্ধাংশ।

করতে পারে না। এদের যা খাদ্য, তা ঐ পচা পদার্থের রস থেকে তৈরী। তাই এরা পরজীবী। অন্যান্য উদ্ভিদ থেকে এদের আকৃতিগত তফাৎ হলো এই যে, এদের দেহে পাতা ও শাখা-প্রশাখার কোন চিহ্নই নেই।

সর্বপ্রথমে স্পোর থেকে একটা ছোট্ট অঙ্কুর জন্মায়। এই অঙ্কুরের তলার দিকে কতকগুলি সরু সরু সুতার মত পদার্থ থাকে। এগুলি ক্রমশঃ বিভক্ত হয়ে জালক অর্থাৎ জালের মত হয়ে অনেকটা অন্তঃস্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এরা সাধারণতঃ অন্তঃস্তরের ভিতরের রস শোষণ করে। এই অঙ্কুরকে বলে মাইসেলিয়াম আর জালকাকার মূলের প্রত্যেকটি সুতার মত অংশকে বলে হাইফা।

মাইসেলিয়াম প্রথমে একটা পাত্‌লা সাদা আবরণ দিয়ে মোড়া থাকে। এই আবরণের নাম ভেলাম। ভেলাম অঙ্কুরের বাড়্‌তি অবস্থায় তাকে মাটির ঘর্ষণ থেকে রক্ষা করে। এই মাইসেলিয়ামের উপরের দিকের গোলাকার মাথাটাকে বলা হয় পাইলাস এবং সমস্ত কাণ্ডটাকে বলা হয় ষ্টিপ। ভেলাম দেহটাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখে।

ক্রমে মাইসেলিয়াম যখন পূর্ণবয়স্ক হয়, তখন উপরের আবরণ অর্থাৎ ভেলাম ফেটে গিয়ে কাণ্ডের মাঝখানে রিং-এর মত ঝুলতে থাকে। এবার পাইলাস আকারে বড় হয় এবং ক্রমে গোলাকার ছাতার আকার ধারণ করে। ছাতার উপরের দিকটা মসৃণ ও গোলাকার। কিন্তু নীচের দিকে ষ্টিপের গা থেকে ছাতার গা পর্যন্ত প্রচুর পাত্‌লা ও সরু পাতার মত জিনিষ আট্‌কানো থাকে, এদের ল্যামেলা বা গিল বলে। এরা সংখ্যায় প্রায় ৩০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত হয়।

সাধারণ উদ্ভিদের মত ব্যাঙের ছাতা জাতীয় উদ্ভিদ কিন্তু বীজের দ্বারা নতুন উদ্ভিদ তৈরী করে না। নতুন গাছ জন্মাবার জন্যে একপ্রকার সূক্ষ্ম, গোলাকার আণুবীক্ষণিক পদার্থের দরকার হয়। এই গোলাকার পদার্থগুলিকে স্পোর বা বীজরেণু বলা হয়। এরা ল্যামেলা বা গিলের দু-পাশেই জন্মায়। সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে কোন গিলের

৩নং চিত্র।

প্রস্থচ্ছেদ কেটে অণুবীক্ষণের তলায় নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, গিলের কেন্দ্রস্থল ঠিক জালের মত দেখতে। এই জাল খুব সরু সরু সূতার মত জিনিষ দিয়ে তৈরী। এই জালকাকার স্থানকে বলা হয় ট্রামা।

এই ট্রামার দু-পাশে স্থূল চোঙের মত পদার্থ সজ্জিত থাকে, এগুলিকে বলা হয়—হাইমেনিয়াম। প্রত্যেকটি হাইমেনিয়াম চারটি করে স্পোর ধারণ করে। স্পোর বাদ দিয়ে হাইমেনিয়ামকে বলা হয় ব্যাসিডিয়াম। প্রত্যেক স্পোরের কেন্দ্রে একটা করে কালো রঙের গোলাকার পদার্থ থাকে। এই কালো রঙের গোলাকার পদার্থগুলিকে

বলে নিউক্লিয়াস। ক্রমে এই সব স্পোরগুলি ব্যাসিডিয়ামের দেহচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ে, তারপর সুবিধামত অনুকূল জল-হাওয়ায় এরা প্রত্যেকে অঙ্কুরিত হয়ে চারটি আলাদা ব্যাঙের ছাতা উৎপাদন করে।

আমরা যাকে ব্যাঙের ছাতা বলি, উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে সেই জাতীয় গাছের নাম হলো অ্যাগারিকাস।

প্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শুক্রগ্রহ

বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো—এই নয়টি গ্রহ নিজেদের অক্ষের উপর ঘুরতে ঘুরতে ক্রমাগত সূর্যের চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। এদের মধ্যে শুক্রই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয়। কারণ কক্ষপথে ঘুরতে ঘুরতে শুক্রই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি, অর্থাৎ প্রায় দু'শো ষাট লক্ষ মাইলের মধ্যে এসে পড়ে। কিন্তু এত কাছে আসা সত্ত্বেও শুক্র মানুষের কাছে আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। তার কারণ—শুক্র সব সময়েই একটা ঘন মেঘের স্তরের আড়ালে এমনভাবে ঢাকা থাকে, যাতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শুক্রের পুরাপুরি সঠিক অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করা সম্ভব নয়।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে আসছেন। তখনকার বিজ্ঞানীরা ধারণা করতেন যে, শুক্রে প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। এমন কি, অনেকে ধারণা করতেন—শুক্রগ্রহেও হয়তো পৃথিবীর মত এক উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠেছে। শুক্রের অন্ধকার দিকটা মাঝে মাঝে খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখে তাঁরা ভাবতেন যে, শুক্রের নতুন কোন রাজার অভিষেক উৎসবে হয়তো এই আলোক-সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকের বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই আলোর রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁরা বলেন—পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে যে মেরুজ্যোতি দেখা যায়, এই আলোও ঠিক সেই জাতীয়।

তথ্য যখন অজানা, তখন কল্পনার রঙে পাখা মেলে পৃথিবীর সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে শুক্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের অনেক কাছে। তাই শুক্রে আলো এবং উত্তাপের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে বেশী হবে। আবার পৃথিবী এবং শুক্রের আয়তন এবং ভর প্রায় সমান। কাজেই মাধ্যাকর্ষণ এবং বায়ুমণ্ডলকে ধরে রাখবার ক্ষমতাও দু-জনেরই প্রায় সমান হবে। যেহেতু উত্তাপ বেশী, সেহেতু শুক্রের সমুদ্র, নদী, নালা প্রভৃতি থেকে বাষ্পীভবন হবে প্রচণ্ড রকম বেশী।

কাজেই সব সময়ে শুক্র থাকবে একটা মেঘের আবরণে ঢাকা এবং বৃষ্টি হবে প্রচুর পরিমাণে।

উত্তাপ এবং বৃষ্টি দুই-ই যদি বেশী হয়, তাহলে শুক্রে বন-জঙ্গল হবে এত ঘন যে, আমাদের সুন্দরবনকে মনে হবে একটা সাজানো বাগানের মত। গাছপালা, বন-জঙ্গল যদি থাকলোই তবে বন্য প্রাণীই বা থাকবে না কেন? সাপ, বাঘ, পশু-পাখীর সঙ্গে শুক্রের মেঘে-ঢাকা আবরণের মধ্যে, কে জানে, সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়তো সুন্দর এক সভ্যতাও গড়ে উঠেছে!

কিন্তু বিজ্ঞান আজ যে পর্যায়ে উঠেছে, সেখানে এই গল্প দাঁড় করানো শক্ত হয়ে পড়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা শুক্রের মেঘে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, শুক্রের মেঘে জলের তো নামগন্ধ নেই-ই, অক্সিজেন গ্যাসও নেই বললেই চলে। তবে শুক্রের বায়ুমণ্ডলে আছে প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, যার পরিমাণ পৃথিবীর তুলনায় কয়েক শত গুণ বেশী। কাজেই শুক্রে বৃষ্টি বা গাছপালা আশা করা যায় না। গাছপালা থাকলে অক্সিজেন নিশ্চয়ই থাকতো। কারণ উদ্ভিদ নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছাড়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে— শুক্র একটা বৃষ্টিহীন শুষ্ক মরুভূমির মত। পৃথিবীর মত শুক্রও আপন অক্ষের উপর ঘোরে, তবে পৃথিবীর তুলনায় এই গতিবেগ অনেক কম। আস্তে ঘোরবার ফলে শুক্রের এক অর্ধাংশের তুলনায় অপর অর্ধাংশে তাপের পরিমাণ হবে অনেক কম। আর উত্তাপের অতিরিক্ত তারতম্যের জন্যে ধূলা-বালি উড়িয়ে সৃষ্টি হবে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার। শুক্রের আহ্নিক গতিবেগের পরিবর্তন না হলে উত্তাপের এই তারতম্য থাকবে চিরকাল। কাজেই এই ঝড়েরও শেষ হবে না কোন দিন। শুক্রের বহিরাবরণ তাহলে মেঘের জন্যে মোটেই নয়, অসংখ্য ধূলিকণা-মিশ্রিত বায়ুমণ্ডলই এই আবরণ সৃষ্টির একমাত্র কারণ।

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে, শুক্রের উপরিভাগের উত্তাপ প্রায় ৬০০° ফারেনহাইটের কাছাকাছি। যে উত্তাপে সীসা পর্যন্ত গলে যায় সেখানে প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা বাতুলতা মাত্র।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, শুক্রের অন্ততঃ একটা চাঁদ আছে। তবে শুক্রের অত্যধিক ঔজ্জ্বল্যের পাশে সেই ছোট্ট উপগ্রহটাকে পৃথিবী থেকে না দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক।

শুক্র সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্যই আজও অজানা রয়ে গেছে। তবে বিজ্ঞান যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, তাতে শুক্রগ্রহ সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অদূর ভবিষ্যতেই পাওয়া যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

শ্রীসুনিচাপ্রসন্ন কর

মেরুজ্যোতি

তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছ যে, পৃথিবীর উত্তর আর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের আকাশে প্রায়ই নানাবর্ণের উজ্জ্বল আলো দেখতে পাওয়া যায়। এই আলোর নাম মেরুজ্যোতি। এই মেরুজ্যোতি কি, আর কেনই বা এদের দেখা যায়—সে কথা সংক্ষেপে

তোমরা সবাই ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প দেখেছ। তোমাদের অনেকের বাড়ীতেই হয়তো ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প আছে। কিন্তু একটা কথা জান কি যে, এই আলো তার ছাড়াই জ্বলে। সাধারণ বাল্বের মধ্যে একটা সরু তার উজ্জ্বল হয়ে সাদা আলো দেয়, কিন্তু ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্পের নলের মধ্যে যে বাতাস থাকে তাই জ্বলতে থাকে। এটা কি করে সম্ভব?

বাতাস কোনও অবস্থাতেই স্থির থাকে না; অণুগুলি সব সময়েই ছুটাছুটি করে। স্বাভাবিক অবস্থায় বাতাস এত ঘন থাকে যে, বাতাসের অণুগুলি জোরে ছুটাছুটি করতে পারে না, সামান্য একটু নড়লেই আর একটা অণুর সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ফলে এই ধাক্কা কখনই জোরালো হতে পারে না। কিন্তু বাতাস যেখানে খুবই হাল্কা সেখানে একটা বাতাসের কণা অনেক দূর পর্যন্ত ছুটতে পারে। কোন কারণে গতিবেগ বৃদ্ধি পেলে এভাবে ছুটতে ছুটতে যখন তারা আর একটা কণার সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন সে ধাক্কা এত জোরালো হয় যে, সময়ে সময়ে পরমাণু থেকে ইলেকট্রন ছিট্‌কে বেরিয়ে যায়। কখনও বা একটা পরমাণুর সঙ্গে ইলেকট্রন যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে যদি একটা পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বেরিয়ে যায় তাহলে সেই পরমাণুতে একটা প্রোটন বেশী হয়ে যায়। এর ফলে পরমাণুটি হয়ে যায় পজিটিভ-ধর্মী। এদের বলা হয় আয়ন। এভাবেই যদি একটা ইলেকট্রন বেশী এসে যায়, তখন তাকে বলা হয় নেগেটিভ আয়ন। এছাড়া মুক্ত অবস্থাতে যে সব বিদ্যুৎ-কণা ভেসে বেড়ায়, তাদেরও বলা হয় আয়ন।

সাধারণ বাতাসে এই আয়ন সামান্য পরিমাণে থাকলেও তারা বাতাসের ঘনত্বের জন্যে অপরের সঙ্গে বেশী জোরে ধাক্কা খেতে পারে না। কিন্তু ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্পের নলের ভিতরের বাতাস প্রায় সবটাই বের করে নেওয়া হয়। নলের মধ্যে বাতাস খুব অল্প পরিমাণে থাকায় পরমাণু-কণা আর আয়ন-কণা বেশ কিছুটা জায়গায় বিনা বাধায় ছুটতে পারে। এর ফলে তারা যথেষ্ট গতিবেগসম্পন্ন হয়। ঐ অবস্থায় নলের দুই প্রান্তে পজিটিভ আর নেগেটিভ বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালালে নলের ভিতরের নেগেটিভ আয়ন প্রচণ্ড বেগে পজিটিভ প্রান্তের দিকে ছুটতে থাকে। ছোট্‌বার সময় তারা বাতাসের যে সব অণুর সঙ্গে ধাক্কা খায়, তাদেরও আয়নে রূপান্তরিত করতে থাকে। এভাবেই নলের এক

প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলতে থাকে। চলবার পথে আয়ন আর ইলেকট্রন-কণা যখন বাতাসের অণুর সঙ্গে ধাক্কা খায়, তখন গ্যাসের অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর উজ্জ্বল আলো ছড়াতে থাকে। এভাবেই ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প বিনা তারেই আলোকিত হয়ে ওঠে।

আকাশের মেরুজ্যোতি আর ঘরের ফ্লোরেসেণ্ট ল্যাম্প একই জিনিষ। মেরুজ্যোতি সাধারণতঃ দেখা যায় ৬০/৭০ মাইল থেকে ৬০০/৭০০ মাইল উপর পর্যন্ত বাতাসের আয়ন স্তরে। সেখানে বাতাস খুবই হাল্কা আর সেখানকার বাতাসে থাকে প্রচুর আয়ন। তাছাড়া সূর্য তার ভাণ্ডার থেকে প্রতি মুহূর্তেই অসংখ্য ইলেকট্রন চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই সমস্ত ইলেকট্রন-কণা মহাকাশ অতিক্রম করে যখন বায়ুমণ্ডলের আয়নস্তরে প্রবেশ করে, তখন প্রচণ্ড বেগে তারা বাতাসের কণার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কণাগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। ফলে কণাগুলি ছড়াতে থাকে রং-বেরঙের আলো। এই ভাবেই উৎপত্তি হয় মেরুজ্যোতির।

এর পর তোমরা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পার—আমরা মেরুজ্যোতি দেখতে পাই না কেন? তোমরা জান যে, পৃথিবীকে একটা মস্ত চুম্বক বলে ধরা হয়। আর এই চুম্বকের দুই মেরু আছে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে। চুম্বক সব সময়েই বিদ্যুৎ-কণাকে তার মেরুর দিকে আকর্ষণ করে। ইলেকট্রন-কণাগুলি পৃথিবীর কাছে এসে মেরুর দিকে বেঁকে যায় বলেই কেবলমাত্র মেরু অঞ্চলেই এই আলোর সৃষ্টি হয়।

তোমরা যদি কেউ কখনও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড কি আলাস্কা কিংবা সোভিয়েটে যাও, তাহলে মেরুজ্যোতি দেখে আসতে ভুলো না যেন!

শ্রীচিত্তব্রত মজুমদার

দেশলাইয়ের কথা

একটা দেশলাইয়ের কাঠি নিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে সামান্য একটু ঘষলেই দপ্ করে জ্বলে ওঠে। কিন্তু সামান্য ঘর্ষণের ফলে কেমন করে আগুন জ্বলে ওঠে, সে কথা কি তোমরা ভেবে দেখেছ? এত সহজে আগুন জ্বলে ওঠে যে, তাতে আর ভাববার অবকাশই থাকে না। কিন্তু এই সহজলভ্য আগুন পাবার জন্যে একদিন মানুষকে কত মেহনত, কত চিন্তাই না করতে হয়েছিল। কারণ আগুন ছাড়া আমরা এক পা-ও অগ্রসর হতে পারি না।

আদিম যুগে এই আগুন পাবার জন্যে কত যে অদ্ভুত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছিল, সে এক বিচিত্র কাহিনী। যখন মানুষ পাহাড়-পর্বতের গুহায় বাস করতো, তখন এক

খণ্ড শক্ত কাঠের সঙ্গে আর এক খণ্ড নরম কাঠ ঘর্ষণ করে আগুন জ্বালাতো। এরপর আয়রন পাইরাইটের ব্যবহার সুরু হলো। খনিজ লোহাকে আয়রন পাইরাইট বলা হয়। এই আয়রন পাইরাইটের সঙ্গে লোহার ঘর্ষণে আগুনের ফুল্‌কি নির্গত হয়। এই ফুল্‌কি সহজেই তুলা কিংবা হাল্কা সোলা প্রভৃতি পদার্থকে জ্বালিয়ে দিতে পারে। তারপর এল চক্‌মকি পাথর। চক্‌মকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালবার ব্যাপার তোমরা অনেকেই হয়তো দেখে থাকবে। অনেক দিন পর্যন্ত এই চক্‌মকির ব্যবহার চলে আসছিল। এর অনেক দিন পরে দেশলাইএর ব্যবহার সুরু হয়। এথেকেই বুঝতে পার, নিত্যপ্রয়োজনীয় আগুনকে সহজলভ্য করবার জন্যে কত পরিশ্রম করতে হয়েছে। এখন আমরা কত সহজে আগুন জ্বালাবার ছোট্ট বাক্সটিকে নিরাপদে পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই! কেমন করে এই দেশলাই তৈরী করা হয়, সে কথা সংক্ষেপে বলছি।

দেশলাই প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে। সহজেই জ্বলতে পারে, এ-রকম কাঠির এক প্রান্তে পটাসিয়াম ক্লোরেট নামক একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ এবং চিনির সংমিশ্রণের প্রলেপ থাকতো। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডে ডোবালেই এই কাঠি জ্বলে উঠতো। কিন্তু এক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধা হলো এই যে, সালফিউরিক অ্যাসিড সব সময়ে কাছে রাখতে হতো। অথচ এই পদার্থটাকে কাছে রাখা ভীষণ বিপজ্জনক। গায়ে লাগলেই সেখানটা পুড়ে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি হবে। আর জামা কাপড়ে পড়লে তো কথাই নেই। সে জায়গার আর কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার শেষ নেই—কি ভাবে আরও সহজ উপায়ে রাসায়নিক পদ্ধতিতে আগুন জ্বালানো যায়। বর্তমানে আমরা যে দেশলাই ঘষে আগুন জ্বালাই, সেই দেশলাইয়ের আবিষ্কার হয় ১৮৮৭ সালে।

ছোট সরু কাঠির এক প্রান্তে বারুদের মুণ্ডি থাকে। সহজেই জ্বলতে পারে, এমন কাঠ দিয়ে দেশলাই কাঠি তৈরী করা হয়। অ্যান্টিমনি সালফাইড, পটাসিয়াম ক্লোরেট, পটাসিয়াম ক্রোমেট, রেড লেড এবং শিরিসের আঠা প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে ময়দার কাইয়ের মত জিনিষ প্রস্তুত করা হয়। কাঠির এক প্রান্তে ঐ কাই মুণ্ডির আকারে লাগানো থাকে। বারুদ লাগানো কাঠি ভাল করে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই কাঠি দেশলাই বাক্সের গায়ে ঘর্ষণ করা মাত্রই আগুন জ্বলে ওঠে। দেশলাইয়ের বাক্সের দুই দিকেই বারুদ দেওয়া থাকে। লাল ফস্‌ফরাস, অ্যান্টিমনি সালফাইড, কাচ কিংবা বালির গুঁড়া এবং গঁদের আঠা—এই কয়টি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে পূর্বের মত কাই প্রস্তুত করে কাগজের এক পিঠে মাখানো হয়। শুকিয়ে গেলে এই বারুদ মাখানো কাগজ দেশলাই বাক্সের গায়ে এঁটে দেওয়া হয়।

দেশলাইয়ের বাক্সের গায়ে কাঠির ঘর্ষণের সময় বারুদের সঙ্গে যে লাল ফস্‌ফরাস মিশ্রিত থাকে, তা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সাদা ফস্‌ফরাসে রূপান্তরিত হয় এবং সাদা ফস্‌ফরাস বাতাসের সংস্পর্শে এলেই জ্বলে ওঠে। অবশ্য দেশলাইয়ের কাঠি যে কোন অমসৃণ শক্ত জায়গায় ঘর্ষণ করলেই জ্বলে উঠতে পারে। ঘরের মেঝেতে ঘর্ষণ করেও অনেক সময় দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালানো যায়।

শ্রীশেখরকান্তি ঘোষ

বিবিধ

মহাশূন্যে মার্কিন মহাকাশযাত্রী

১৫ই মে, কেপ কেনাভেরাল হইতে ছত্রিশ বছরের তরুণ মার্কিন মহাকাশযাত্রী গর্ডন কুপার গ্রীনউইচ সময় বেলা ১টা ৪ মিনিটে (ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিঃ) 'ফেইথ-৭' নামক মহাকাশযানে মহাশূন্যে যাত্রা করেন। ইহাই আমেরিকার দীর্ঘতম মহাকাশ-যাত্রা।

এই মার্কারী মহাকাশযানটি বুষ্টার রকেটের সাহায্যে মহাকাশে প্রেরিত হয়। যাত্রার সময় এই রকেটের ওজন ছিল ১৩০টন এবং মহাকাশযানটির ওজন দেড়-টন। ১৩০ডি অ্যাটলাস ক্ষেপণাস্ত্রেরই পরিবর্তিত সংস্করণ হচ্ছে বুষ্টার রকেট। এই রকেটের ধাক্কার পরিমাণ ৩৬০,০০০ পাউণ্ড।

মহাকাশচারী কুপার ৩৫ ঘণ্টা ১৩ মিনিট মহাকাশে থাকিয়া ২২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া ১৭ই মে নিরাপদে পৃথিবীর বুকে প্রত্যাবর্তন করিয়াছন।

মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। রেট্রো-রকেট যন্ত্র ব্যবহারের এক মিনিট বিলম্ব ঘটিলে কুপার লক্ষ্যস্থল হইতে ৫০০ মাইল দূরে ছিটকাইয়া পড়িতেন এবং ইহার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটিলে পৃথিবীর বায়ুস্তরে আসিয়া আরোহীসহ মহাকাশযানটি পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত। এই বিপদের সম্মুখে অবিচলিতভাবে তিনি স্বহস্তে মহাকাশযান চালাইয়া নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করেন।

শব্দের সাহায্যে মৎস্য-শিকার

কোন জায়গায় যথেষ্ট পরিমাণ মাছ আছে কিনা, আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান সে সম্পর্কে সঠিক খবর দিতে পারে। হামবুর্গের মীনপোষ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডাঃ গুস্তাভ ক্রিষ্টাগ জলের নীচের শব্দ সম্পর্কে গবেষণা করেন।

মৎস্যজীবীরা বহু প্রাচীন যুগ থেকেই জানেন যে, নানা রকমের মাছ ও সামুদ্রিক জীব শব্দ করে এবং সেগুলির মধ্যে শব্দের প্রতিক্রিয়াও হয় এবং অনেক মৎস্যজীবী এই তথ্যটি কাজে লাগিয়ে মৎস্য-শিকারে সাফল্য লাভ করেন। বহু যুগ থেকে অনেকে হাততালির শব্দ করে পার্চ মাছ শিকার করে থাকে। কাঠের টুক্‌রা দিয়ে গোঙানির মত শব্দ করে অনেকে ক্যাটমাছ শিকার করে। আবার প্রাচীন কালের মত আধুনিক যুগেও প্রত্যেক মৎস্য-শিকারী, মৎস্য-শিকারের সময় নিঃশব্দতার প্রয়োজন জানেন।

আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকেরা জলের নীচে ব্যবহারযোগ্য মাইক্রোফোন, অ্যাম্‌প্লিফায়ার, টেপ রেকর্ডার এবং এই ধরণের অন্যান্য যন্ত্রপাতিসহ জাহাজে করে সমুদ্রে চলে যান। সমুদ্রে গিয়ে ধাতব টোপ হিসেবে তাঁরা মাইক্রোফোনটিকে সমুদ্রের জলে নামিয়ে দেন। ডাঃ ক্রিষ্টাগ বলেছেন যে, এই অদ্ভুত জিনিসটি, বিশেষ করে তিমি মাছ ও ডলফিনগুলিকে আকৃষ্ট করে। এই সামুদ্রিক জীবগুলি সাধারণতঃ জাহাজগুলিকে অনুসরণ করে। তার ফলে তিমি মাছের গোঙানির মত শব্দ রেকর্ড করা অনেকখানি সহজ হয়ে যায়।

অন্য কয়েক রকমের মাছ আবার জাহাজের ছায়া দেখেই ভয়ে পালিয়ে যায়। যে সব মাছ অত্যন্ত বেশী শব্দ করে, সেগুলি পর্যন্ত জাহাজের ছায়া দেখলেই চুপ করে যায়। মাছের এই স্বভাবের জন্যে শব্দ গ্রহণের বিশেষ যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করতে হয়েছে এবং অধ্যবসায়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়েছে। রবারের ডিঙ্গি নিঃশব্দে এগিয়ে যেতে পারে বলে বৈজ্ঞানিকেরা এই ডিঙ্গিতে যন্ত্রপাতি নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়েন। এই ডিঙ্গিতে

চড়ে মাছের শব্দের যে রেকর্ড নেওয়া হয়, তা পরে টেলিফাঙ্কেন ইঞ্জিনীয়ারদের উদ্ভাবিত একটি ম্যাগ্‌নেটিক টেপ ইউনিটে বিশ্লেষণ করা হয়। ডাঃ ফ্রিষ্টাগ বলেন যে, বর্তমানে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করা যায় যে, অনেক রকমের মাছ ও সামুদ্রিক জীবের শব্দ করাটাই হলো বিশেষত্ব। দিক নির্ণয়ের জন্যেই হোক বা যোগাযোগ রাখবার জন্যেই হোক ৪২ রকমের মাছ শব্দ করতে পারে।

ইলেকট্রিক রিষ্টওয়াচ

ভবিষ্যতে আমাদের সময়, মানুষের চুলের ব্যাসের অর্ধেকের মত মোটা মিনিটের তারের উপর নির্ভর করবে। এই রকম অদ্ভুত সূক্ষ্ম তারের রিষ্টওয়াচ, সাধারণতন্ত্রী ফেডারেল জার্মেনীর ঘড়ির বাজারে ইতিমধ্যেই বেরিয়ে গেছে। এক মিলিমিটারের ২০০ ভাগের এক ভাগ ব্যাসের সূক্ষ্ম তারই হলো এই ঘড়ির প্রাণকেন্দ্র। বিখ্যাত ঘড়ি-নির্মাতাদের বিক্রয়-পরিচালক ডাঃ মিলার সম্প্রতি এসেনে সমাগত বিশেষজ্ঞদের কাছে এই যাদু-ঘড়ির কার্যকারিতা প্রদর্শন করেন। এই রিষ্টওয়াচের ব্যবহারিক গুণের নিদর্শন হিসেবে ডাঃ মিলার বলেন যে, এই অতি সূক্ষ্ম তারের এক কিলোগ্র্যামের দৈর্ঘ্য হবে ২০০ মাইল।

এই বৈদ্যুতিক রিষ্টওয়াচের জন্যে অতি সামান্য বিদ্যুতের প্রয়োজন হয়। একটি ১০০ ওয়াট বাল্ব জ্বালাতে যে বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োজন হয়, তা দিয়ে ৪,৮৫১,০০০টি বৈদ্যুতিক রিষ্টওয়াচ চালানো যাবে।

একটি ৬ পেনি মুদ্রার চাইতেও ছোট একটি ব্যাটারী দিয়ে ঘড়িটি চালানো হয়। একটি এই রকম ব্যাটারী এই রকম ঘড়িকে এক বছর চালাতে পারবে। সাধারণ ঘড়ির স্প্রিং খারাপ হয়েই নানা রকম অসুবিধা ঘটায়; সে জন্যেই এই ঘড়িতে কোন স্প্রিং নেই।

সাধারণ ঘড়ি ও বৈদ্যুতিক ঘড়ির মধ্যে তফাৎ হলো এই যে, এই ঘড়িতে চাবি দেওয়া বা সময় মেলাবার ক্রাউনটি নেই। এসেনের অলঙ্কার নির্মাতাদের দোকানে ১১০৲ টাকা থেকে ২০০৲ টাকা মূল্যে এই ঘড়ি পাওয়া যায়।

ভারতের প্রথম আবহ-রকেট

নয়াদিল্লী হইতে ২২শে এপ্রিল তারিখে ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক খবরে প্রকাশ—থুম্বার (কেরল) প্রস্তাবিত রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র হইতে সম্ভবতঃ ১৯৬৪ সালের গোড়ার দিকে প্রথম আবহ-রকেট উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করা হইবে। ২২শে এপ্রিল লোকসভায় শ্রীওঙ্কারলালের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই তথ্য প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন যে, ১৯৬৪-'৬৫ সালে উপযুক্ত বিরতির পর আনুমানিক ডজনখানেক রকেট উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে। তবে এই ব্যাপারে পরিমাণ এখনই জানান সম্ভব নয়।

উড়িষ্যার ভূগর্ভে প্রচুর ক্রোমাইট আবিষ্কার

নয়াদিল্লী হইতে প্রচারিত ৩রা মে তারিখের এক খবরে প্রকাশ—ভারতের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা বিভাগ উড়িষ্যায় সমীক্ষা চালাইয়া যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এই রাজ্যের ঢেনকানল ও কটক জেলায় আনুমানিক ৮ কোটি টন আকরিক ক্রোমাইট ভূগর্ভে সঞ্চিত আছে।

কালাহাণ্ডি জেলায় প্রচুর পরিমাণ বক্সাইটও আছে বলিয়া সমীক্ষা বিভাগ আভাস দিয়াছেন।

মার্কিন এভারেস্ট-অভিযান সফল

২রা মে কাঠমাণ্ডুতে প্রাপ্ত এক বেতার-বার্তায় জানা যায়—মার্কিন এভারেস্ট-অভিযাত্রীদলের দুই জন সদস্য ১লা মে বেলা একটায় এভারেস্ট-শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

এভারেস্ট বিজয়ের মার্কিন প্রচেষ্টা এই প্রথম এবং প্রথমবারেই সফল হইয়াছে। প্রথমে স্থির করা হইয়াছিল, ৩০শে এপ্রিল শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু পরে তারিখ বদ্‌লাইয়া ১লা মে করা হয়।

বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের উচ্চতা ২৯,০২৮ ফুট। এই তৃতীয়বার এভারেস্টে মানুষের পদচিহ্ন পড়িল।

অভিযাত্রীদলের মুখপাত্র হিসাবে জেমস্ উলমাস সাংবাদিকদের এই সাফল্যের সংবাদ দেন। তিনি বলেন যে, অভিযাত্রীদল যে সঙ্কেত পাঠান, তাহা প্রথম ধরা পড়ে সিংহলে। সেখান হইতে উহা কাঠমাণ্ডুতে প্রেরণ করা হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে নর্মান জি. ডাইরেনফোর্থের নেতৃত্বে ২০ জন সদস্যবিশিষ্ট মার্কিন এভারেস্ট-অভিযাত্রীদল কলিকাতা হইয়া নেপাল যাত্রা করে। আমেরিকার ন্যাশন্যাল জিও-গ্রাফিক সোসাইটির উদ্যোগে এই অভিযানের আয়োজন করা হয়।

এইটিই হইল মার্কিন দেশের প্রথম এভারেস্ট-শৃঙ্গে আরোহণের প্রয়াস। এই অভিযানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, অভিযাত্রীদের সঙ্গে ডাঃ হর্ণডেন নামক যে চিকিৎসক আছেন, তিনি পর্বতারোহীদের ব্যবহারের জন্য এক বিশেষ ধরণের অক্সিজেনের মুখোস প্রস্তুত করিয়াছেন। নেপাল হইতে প্রায় ৩৭ জন শেরপা সঙ্গে লওয়া হয়।

গত ১৯৬১ সালের মে মাসে নেপাল সরকার এই অভিযানের অনুমতি দেন।

এভারেস্ট-অভিযানে ১৯৫২ সালে সুইস পর্বতারোহিগণ এবং ১৯৫৩ সালে হান্ট যে পথ ধরিয়া অগ্রসর হন, এই অভিযাত্রীদলও মোটামুটি সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হন।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মৎস্য-চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিকল্পনা

পৃথিবীর প্রতি একর জমির যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদন করবার শক্তি আছে, সেই পরিমাণ শক্তি সমুদ্রের এক একর পরিমিত স্থানেরও আছে। বর্তমানে এই শক্তির মাত্র ১৬ ভাগ কাজে লাগানো হচ্ছে এবং সমুদ্র থেকে যে পরিমাণ মৎস্য সংগ্রহ করা যেতে পারে, তার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ দিয়ে বিশ্বের যে যে অঞ্চলে প্রোটিনের খুবই অভাব রয়েছে, সেই সব অঞ্চলের অভাব মেটানো হচ্ছে।

সম্প্রতি জেনিভায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে মৎস্যচাষ, সংগ্রহ ও মৎস্য থেকে তৈরী খাদ্যবস্তুর দ্বারা বিশ্বের ক্রমবর্ধমান জন-সংখ্যার খাদ্য ও প্রোটিনের অভাব মেটাবার বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে দেখা হয়েছে। এজন্যে পরিকল্পনাও রচিত হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্র মৎস্য-চাষের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়েছে। গত পনেরো বছরের মধ্যে পেরু বাড়িয়েছে ৬০০ গুণ। কিন্তু পশ্চিম আফ্রিকার কোন কোন স্থানের অধিবাসীরা প্রোটিনযুক্ত খাদ্যাভাবে খুবই কষ্ট পাচ্ছে। কিন্তু তাদের বাসভূমির সামান্য দূরেই রয়েছে প্রচুর মৎস্য। সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলের সেই মৎস্য সংগ্রহ করে তাদের এই অভাব মেটানো যেতে পারে। আবার ভারতে রয়েছে পোতাশ্রয়ের অভাব। এই পোতাশ্রয়ের অভাবেই সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ ব্যাহত হচ্ছে। আবার পৃথিবীর বহু অঞ্চলে পরিবহনের সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং উষ্ণ আবহাওয়া মৎস্য-বন্টনে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।

তাপমাত্রা ও পরিবহনের সমস্যার দরুণ মৎস্যের অপচয় ঘটবার যে সম্ভাবনা, তা যান্ত্রিক উপায়ে মৎস্যের সার তৈরীর পর কৌটাবদ্ধ করে সংরক্ষণ করা যেতে পারে এবং অপচয়ের সম্ভাবনা দূর করা যেতে পারে।

বিশ্বের ২০টি রাষ্ট্র এ-বিষয়ে উৎসাহ দেখিয়েছে। আমেরিকার কয়েকটি শিল্প-প্রতিষ্ঠানও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি তৈরী করেছে। বর্তমানে এসব বস্ত পরীক্ষাধীন আছে এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকার মৎস্যজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের পথে যে সব সমস্যা আছে, তা পরীক্ষা করে দেখছেন।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জন-সাধারণের আগ্রহ ক্রমশ: বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ | জুলাই, ১৯৬৩ | সপ্তম সংখ্যা

কোয়াণ্টাম তত্ত্ব ও তার পটভূমিকা

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

সম্ভবতঃ জ্ঞানোন্মেষের প্রথম দিন থেকেই আলো মানুষের কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা রূপে দেখা দেয়। তাই দীর্ঘকাল ধরে বৈজ্ঞানিকেরা চেষ্টা করেছেন, আলোর বিভিন্ন আচরণের মধ্যে একটা একতার সন্ধান করতে। আলো সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রথম কে কবে সুরু করেন, আমার জানা নেই, তবে এটুকু জানা আছে যে, হায়গেন্‌স্‌, ম্যাক্সওয়েল, ম্যাক্স প্লাঙ্ক—এমন কি, নিউটন ও আইনষ্টাইন পর্যন্ত আলো সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়েছেন এবং তাঁদের মূল্যবান চিন্তাধারার সাহায্যে আলোক-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের সকলের গবেষণা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করবো না এবং এই সংক্ষিপ্ত স্থানে তা করা সম্ভবও নয়। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, কোয়াণ্টাম তত্ত্বের বিকাশ ও তার পটভূমিকা।

এ-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বহুবার আলোচনা হয়েছে যে, আলো কণিকার প্রবাহ ও তরঙ্গের প্রবাহ। উভয় মতবাদই বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিকের সমর্থন পেয়েছে; কাজেই এদের মধ্যে কোন্‌টা প্রকৃতপক্ষে সত্য, তা রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে। ব্যাপারটা আরো ঘোরালো মনে হলো, যখন দেখা গেল যে, আলোর যে সব আচরণের ব্যাখ্যা তরঙ্গবাদের সাহায্যে হয়, সে সব আচরণের ব্যাখ্যা কণিকাবাদের সাহায্যে হয় না। আবার যে সব আচরণের ব্যাখ্যা কণিকাবাদের সাহায্যে হয়, তাদের ব্যাখ্যা তরঙ্গবাদের সাহায্যে ভালভাবে হয় না; অর্থাৎ আলোর মধ্যে দুটি পরস্পর বিরোধী ধর্মের বিকাশ পরিলক্ষিত হলো। বৈজ্ঞানিকেরা একথা বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী এবং সম্পর্কবিহীন মনে হলেও একটা যোগসূত্র কোথাও নিশ্চয়ই আছে। বৈজ্ঞানিকেরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা

করতে লাগলেন এই যোগসূত্রটি খুঁজে বের করবার জন্যে। সাফল্য অর্জন করলেন ম্যাক্স প্লাঙ্ক।

ম্যাক্স প্লাঙ্ক তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে আলোর কণিকাবাদ ও আলোর তরঙ্গবাদকে সংযোজিত করলেন। তাই কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবার আগে আমরা আলোর তরঙ্গবাদ ও কণিকাবাদকে বোঝবার চেষ্টা করবো।

তরঙ্গ বললে প্রথমেই মনে পড়ে জলের তরঙ্গের কথা। স্থির জলপৃষ্ঠে কোন বস্তুর সাহায্যে আঘাত করলে জলের উপর বয়ে চলে উঁচু-নীচু ঢেউ বা তরঙ্গ। এই ঢেউ বা তরঙ্গ কিন্তু এলোমেলোভাবে হয় না। এর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে। যেমন—প্রত্যেক তরঙ্গই একটি মাধ্যমের সাহায্যে চলাচল করে। জল একটি মাধ্যম, শব্দতরঙ্গের মাধ্যম বায়ু; অর্থাৎ মাধ্যম সেই জিনিষটিকেই বলা হবে, যে জিনিষটি তরঙ্গ প্রবাহের সময় আন্দোলিত হবে। বিভিন্ন মাধ্যমে তরঙ্গের গতিবেগ বিভিন্ন, কিন্তু একই মাধ্যমে এবং অপরিবর্তিত উষ্ণতা এবং আর্দ্রতায় তরঙ্গের গতিবেগ নির্দিষ্ট। যেমন অনার্দ্র বায়ুতে 0 সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় শব্দের গতিবেগ ১১২০ ফুট/সেকেণ্ড। ঐ বিশেষ অবস্থায় সর্বকালে সর্বক্ষেত্রেই শব্দ-তরঙ্গের গতিবেগ একই হবে। অথচ অনুরূপ অবস্থায় জলের তরঙ্গের গতিবেগ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তরঙ্গের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য. হলো তার উচ্চতা। জলের তরঙ্গ কি রকম হয় একবার মনে করুন। যেখানে জলপৃষ্ঠকে আঘাত করা হলো, সেখানটা জলের সমতল থেকে একটু নেমে গেল এবং ঐ স্থানকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্তের আকারে জলপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে উঠলো। আবার ঐ বৃত্তের চতুস্পার্শ্ব ক্রমশঃ ঢালু হয়ে এক নিম্নতম উচ্চতায় এসে আবার ক্রমশঃ উঁচু হয়ে উঠলো বৃত্তের আকারে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে একটি উচ্চবৃত্ত ও একটি নিম্নবৃত্ত সৃষ্টি হতে থাকলো। বৃত্তের ব্যাসার্ধ যত বৃদ্ধি পাবে, স্বাভাবিক জলপৃষ্ঠ থেকে তার গভীরতা বা উচ্চতাও ততই হ্রাস পাবে। একটি উচ্চ বৃত্তের উচ্চতা যত হবে, পরবর্তী নিম্নবৃত্তের গভীরতা তার চেয়ে একটু কম হবে। আবার পরবর্তী উচ্চ বৃত্তের উচ্চতা আরো একটু (নিম্ন বৃত্তের গভীরতার চেয়ে) কম হবে। এভাবে বৃত্তগুলির উচ্চতা ও গভীরতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে এক সময় তা জল-সমতলের সঙ্গে মিশে যাবে।

এরপর উল্লেখ করা যাক তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের কথা। এটিও তরঙ্গের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবারও জলের তরঙ্গের কথাই মনে করুন। এককেন্দ্রিক কতকগুলি বৃত্ত হয়েছে। বৃত্ত না বলে রিং বলাই ভাল। রিংগুলির উচ্চতম একটি শীর্ষবিন্দুও কল্পনা করা কঠিন নয়। পর পর দুটি উচ্চ বৃত্তের শীর্ষবিন্দুর মধ্যে দূরত্বই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। বিন্দুদ্বয়ের অবশ্য একই ব্যাসার্ধের উপর অবস্থিত হওয়া চাই; অর্থাৎ উভয় বৃত্তের ব্যাসার্ধের অন্তরই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।

ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে একক সময়ে মাধ্যম কতবার কম্পিত হচ্ছে, তারই সংখ্যা। যদি কোনও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য λ, ফ্রিকোয়েন্সি v এবং গতিবেগ c হয়, তবে এই তিন রাশির সম্বন্ধ সূচিত করবে নিম্নলিখিত সমীকরণ—

$$c = \lambda \times v \qquad \text{(i)}$$

গ্রাফ কাগজে যদি x অক্ষ ধরে তরঙ্গ কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব বা সময়কে সূচিত করা যায় এবং ৬ অক্ষ ধরে যদি মাধ্যমের চাঞ্চল্য সূচিত করা যায়, তবে ১নং চিত্রের অনুরূপ একটি রেখা পাওয়া যাবে।

এতক্ষণ আমরা জলের তরঙ্গের সাহায্যে তরঙ্গের বিভিন্ন ধর্ম বোঝবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তরঙ্গের মাধ্যম বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং মাধ্যমের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের ধরণও বদ্‌লে যায়। যেমন—জলের তরঙ্গের ক্ষেত্রে মাধ্যম কম্পিত হয় তরঙ্গের গতিপথের উপর লম্বভাবে, কিন্তু শব্দ-তরঙ্গের ক্ষেত্রে বায়ুর কম্পন হয় তরঙ্গের গতিপথের দিকেই বা গতিপথের রেখা বরাবর। তাহলেও সব তরঙ্গেই পূর্ববর্ণিত প্রতিটি ধর্মের বিকাশ অবশ্যই হবে; অর্থাৎ তরঙ্গ-গতির একটি মাধ্যম

থাকবে, একটি বিশেষ অবস্থায় নির্দিষ্ট গতিবেগ থাকবে, তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থাকবে এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও মাধ্যমের অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে ফ্রিকোয়েন্সিও অপরিবর্তিত থাকবে।

বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে হায়গেন্‌স্‌ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, আলোও তরঙ্গের প্রবাহ। কিন্তু তরঙ্গের মাধ্যমের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। কল্পনা করে নিতে হলো যে, এই তরঙ্গের মাধ্যম ইথার নামে এমন একটা কিছু, যার ভর নেই, যাকে স্পর্শ করা যায় না বা দেখাও যায় না, কিন্তু ত্রৈমাত্রিক মহাশূন্যের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে এর অস্তিত্ব আছে। পাঠক হয়তো ভাবছেন যে, আমি কোন অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা সুরু করেছি, কিন্তু এতে অতিপ্রাকৃতিকতার লেশ মাত্র নেই, তবে এটাকে বৈজ্ঞানিকদের একটা উদ্ভট কল্পনা বলে মনে করতে পারেন। কারণ, যে বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন পরীক্ষামূলক প্রমাণই নেই, সেই বস্তুর কল্পনাকে অন্ততঃ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উদ্ভট কল্পনা ছাড়া আর কি বলা যায়?

বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে এ-রকম একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে বিজ্ঞানানুরাগী পাঠক হয়তো খুবই হতাশ হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আলোকের তরঙ্গবাদকে মেনে নিতে গেলে এ-রকম একটা দুঃসাহসিক কল্পনাকে প্রশ্রয় না দিয়েও বৈজ্ঞানিকদের উপায় ছিল না। আর আলোকের তরঙ্গবাদকে না মেনেই বা উপায় কি ছিল? কারণ অন্য কোনও তত্ত্বের সাহায্যে তরঙ্গবাদের মত সুষ্ঠুভাবে আলোর বিভিন্ন আচরণের ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। তাই তখনও পর্যন্ত আলো সম্বন্ধে যতগুলি তত্ত্ব বা মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তরঙ্গবাদকে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আলোর তরঙ্গবাদের যেমন সুবিধা আছে, অসুবিধাও তেমনি আছে। এখন আমরা এই সুবিধা-অসুবিধাগুলি বোঝবার চেষ্টা করবো।

১নং চিত্র।

তরঙ্গের গ্রাফ। λ-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। A = তরঙ্গের উচ্চতা।

আলোর ক্ষেত্রে মাধ্যমের (ইথারের) কম্পন তার গতিপথের উপর লম্বভাবে হয়। ম্যাক্স্‌ওয়েল তাঁর বিদ্যুচ্চুম্বকীয় তত্ত্বের সাহায্যে দেখালেন যে, আলোর তরঙ্গ হচ্ছে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও চৌম্বক তরঙ্গের সমষ্টি বা মিশ্রণ। আলোর গতিপথের উপর লম্বভাবে এই তরঙ্গগুলি থাকে এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও চৌম্বক তরঙ্গ

পরস্পরের সমতলের উপর লম্বভাবে সঞ্চালিত হয়। কিন্তু ত্রৈমাত্রিক মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে একটি সরল রেখা কল্পনা করলে তার উপর যে কোনও একটি বিন্দুতেই অসংখ্য লম্ব থাকতে পারে। তাই আলোক-তরঙ্গ একই সরলরেখায় অসংখ্যভাবে বিন্যস্ত থাকতে পারে। কিন্তু এমন আলোক রশ্মি কি থাকতে পারে না, যার প্রত্যেকটি চৌম্বক তরঙ্গ এবং প্রত্যেকটি বৈদ্যুতিক তরঙ্গ একই সমতলে থাকবে? হ্যাঁ, এ-রকম তরঙ্গ থাকা সম্ভব এবং এই ধরণের তরঙ্গবিশিষ্ট আলোর নাম পোলারাইজ্‌ড্‌ আলো। পরীক্ষাগারে এই রকম আলো নিয়ে পরীক্ষা করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা ক্যালসাইট নামক ক্রিষ্ট্যাল থেকে তৈরী নিকোল প্রিজ্‌ম্‌-এর সাহায্য নেন। সাধারণ আলো-কে এই প্রিজ্‌ম্‌-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালে পোলারাইজ্‌ড্‌ আলো পাওয়া যায়। পোলারাইজ্‌ড্‌ আলো নিয়ে নানারকম পরীক্ষা করে আলোর তরঙ্গবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের আস্থা অনেকটা বেড়ে গেল।

আরো দেখা গেল, বিশেষ অবস্থায় একই দিকে ধাবমান দুটি রশ্মি থেকে একটি উজ্জ্বলতর রশ্মির উৎপত্তি হয়। আবার বিপরীত দিকে ধাবমান দুটি আলোক-রশ্মি উপযুক্ত অবস্থায় পরস্পরের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করছে—এই রকম ঘটনাও একাধিকবার ঘটতে দেখা গেল। এই সব ঘটনাও আলোর তরঙ্গবাদকে সমর্থনই করে।

এবার আমরা আসবো আলোর কণিকা-বাদের আলোচনায়। নিউটনের আলোর কণিকাবাদে ইথার বা ঐ জাতীয় কোনও মাধ্যমের কল্পনা করবার দরকার হয় নি। তাঁর তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, আলো হচ্ছে অতি দ্রুত-বেগে ধাবমান একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র কণিকার স্রোত। কণিকাগুলি যখন আমাদের চোখের রেটিনায় এসে আঘাত করে, তখন আমরা দেখতে পাই। এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই নিউটন আলোর সরলরেখায় গমনের কারণ এবং প্রতিফলন ও প্রতিসরণের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হন। কিন্তু প্রতিসরণের নিয়ম-গুলি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ধরে নেন যে, আলোর বেগ ঘন মাধ্যমে বেশী এবং লঘু মাধ্যমে কম হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ফোকোর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত তথ্য এই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। কাজেই নিউটনের কণিকা-বাদের ক্ষেত্র অনেক সঙ্কীর্ণ হয়ে এলো।

তবুও কিন্তু এই দুই মতবাদের দ্বারা আলোক সংক্রান্ত প্রায় সব সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যত দিন যেতে লাগলো, ততই রাশি রাশি এমন সব সমস্যা বৈজ্ঞানিক-দের সম্মুখে এসে জড়ো হতে লাগলো, যাদের ব্যাখ্যা প্রচলিত মতবাদগুলির কোনটির সাহায্যেই করা সম্ভব হয় না। এই রকম একটি সমস্যা হলো কম্পটনের পরীক্ষা (Compton's Effect)। কম্পটন লক্ষ্য করেন— পর্যায় সারণীতে যে সব মৌলের স্থান গোড়ার দিকে, সেই সব মৌলের উপর রঞ্জেন রশ্মি ফেললে তাথেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং পরবর্তীকালে যে রশ্মি বেরিয়ে আসে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আগের চেয়ে বড়। আলোর কণিকাবাদ মেনে নিতে গেলে ইলেকট্রন বেরিয়ে আসবার একটা ব্যাখ্যা হয়তো করাও যেতে পারে, কিন্তু আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কোনও প্রশ্নই তো তাহলে ওঠে না, আর আলোর তরঙ্গবাদকে স্বীকার করে নিতে গেলেও এর কোন ব্যাখ্যাই হয় না। বৈজ্ঞানিকেরা খুবই বিব্রত হয়ে পড়লেন।

এই ধরণের দ্বিতীয় একটি সমস্যা হচ্ছে, "কৃষ্ণ বস্তুর বিকিরণ"। আলো আর উত্তাপ যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, সে কথা সবাই জানেন। কেন না, একটি ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌ যখন আলো দেয়, তখন তা রীতিমত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আবার উনুন জ্বালালে তাথেকে তাপের সঙ্গে

সঙ্গে আলোও পাওয়া যায়। কিন্তু ইলেট্রিক বাল্‌বের ফিলামেণ্টের উত্তাপ (প্রায় ৫০০০° ফারেনহাইট) যদি ক্রমশঃ কমানো যায়, তবে আলোর রং বদ্‌লাতে থাকবে। ফিলামেণ্টের উত্তাপ যখন প্রায় ২৫০০° ফারেনহাইট হবে, তখনও আলো পাওয়া যাবে, তবে তা আগের চেয়ে অনুজ্জ্বল এবং কম সাদা। তাপমাত্রা আরো কমিয়ে যদি ১০০০° ফারেনহাইটে আনা যায়, তাহলে আলোর রং খুবই অনুজ্জ্বল এবং বেশ লাল্‌চে হবে। রং ক্রমশঃ এই ভাবে বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে এক সময় তাপমাত্রা এমন অবস্থায় আসবে, যখন আর আলো পাওয়া যাবে না। এতে সন্দেহের কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু যত সমস্যা এর মধ্য থেকেই দেখা দিল। সেই কথাতেই এবার আসছি।

প্লাঙ্ক ছিলেন তাপ-গতিবিদ্যার একজন বিশেষজ্ঞ। তাপ-গতিবিদ্যা বা থার্মোডাইনামিক্স হচ্ছে এমন এক বিজ্ঞান, যার সাহায্যে তাপ-শক্তিকে গতিবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা যায়। প্লাঙ্ক এই বিজ্ঞানের সাহায্যে হিসাব করে দেখলেন যে, সাধারণ উষ্ণতাতেও যে কোনও বস্তুর—এমন কি, কৃষ্ণবর্ণের বস্তুরও আলোক বিকিরণ করা উচিত; অর্থাৎ আমার, আপনার এবং বিশ্বজগতের প্রত্যেক বস্তুরই দীপ্তিমান হয়ে ওঠবার কথা। তাহলে হিসাবে কি গোলমাল হলো? না, কোন গোলমালই হয় নি, প্লাঙ্ক দেখলেন সবই ঠিক আছে। কাজেই তাঁর ধারণা হলো যে, প্রচলিত তাপ-গতিবিদ্যার তত্ত্বে কোনও গলদ আছে। তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

১৯০০ সালে প্লাঙ্ক দেখালেন যে, এই সব ব্যাপারের ব্যাখ্যা সুন্দরভাবে করা যায়, এক যুগান্তকারী কল্পনা বা মতবাদের দ্বারা। তিনি তাঁর এই তত্ত্বের নাম দিলেন "কোয়াণ্টাম তত্ত্ব"। তিনি বললেন যে, কোনও বস্তু যখন তাপ শোষণ বা বিকিরণ করে, তখন বিকিরণ বা শোষণ-প্রক্রিয়া একটানা চলে না। এই প্রক্রিয়া হয় থেমে থেমে এবং প্রত্যেকবার থামবার মধ্যবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ বা আলোক শোষিত বা বিকিরিত হয়। এই পরিমাণ শক্তির চেয়ে কম শক্তি থাকা সম্ভব নয়; অর্থাৎ মোট বিকিরিত বা শোষিত আলোক-শক্তির পরিমাণ এই পরিমাণ শক্তির দ্বারা বিভাজ্য হবে।

সমস্ত বিদ্যুচ্চুম্বকীয় বিকিরণই আলোকের মত তরঙ্গধর্মী। প্লাঙ্ক সিদ্ধান্ত করলেন যে, এই তরঙ্গ জলের তরঙ্গের মত একটানা প্রবাহিত হয় না, প্রবাহিত হয় কাটা কাটা ভাবে। তিনি প্রত্যেকটি কাটা কাটা তরঙ্গকে তরঙ্গের প্যাকেট বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্যাকেটগুলির নাম তিনি দিলেন কোয়াণ্টা (Quanta)। একটি বিশেষ কম্পন-সংখ্যার আলোর ক্ষেত্রে সব কোয়াণ্টামগুলি একই শক্তিবিশিষ্ট। শক্তির পরিমাণ (কোয়াণ্টামে) নির্ভর করে আলোর কম্পন-সংখ্যার উপর।

প্লাঙ্ক একটি সমীকরণের সাহায্যে কোয়াণ্টামে শক্তির পরিমাণ ও তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি বা কম্পন-সংখ্যার মধ্যে আঙ্কিক সম্পর্ক নির্দেশ করেন। ΔE কোয়াণ্টায় শক্তির পরিমাণ এবং v ফ্রিকোয়েন্সি হলে,

$$\Delta E = h \times v \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{(ii)}$$

(এখানে h একটি ধ্রুবক রাশি। এটি প্লাঙ্কের ধ্রুবক নামে পরিচিত। ΔE-কে আর্গ এককে প্রকাশ করলে এবং v-কে প্রতি সেকেণ্ড এককে প্রকাশ করলে h-এর মান ৬.৬২৫×১০^{-২৭} আর্গ সেকেণ্ড হয়।)

উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে বোঝা যায়, একটা কোয়াণ্টামে কত সামান্য পরিমাণ শক্তি থাকতে পারে। সোডিয়াম-ডি আলোর তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা ৫.০৮৪৭×১০^{১৪} প্রতি সেকেণ্ডে। অতএব এর একটি কোয়াণ্টামে শক্তির পরিমাণ $\Delta E = ৬.৬২৫ \times ১০^{-২৭} \times ৫.০৮৪৭ \times ১০^{১৪} = ৩.৩৬৯ \times ১০^{-১২}$ আর্গ।

আমরা বোধ হয় এবার কম্প্‌টনের পরীক্ষার প্রকৃত রহস্য বুঝতে পারবো। ভেবে দেখুন,

কম্প্‌টনের পরীক্ষায় কি দেখা গিয়েছিল। একটি কার্বনের টুক্‌রাতে (তিনি হাল্‌কা মৌল হিসাবে কার্বনকেই বেছে নেন) এক্স-রশ্মি এসে পড়লে কার্বন থেকে দ্রুতবেগে ইলেকট্রন নিষ্ক্রান্ত হয় এবং কার্বন থেকে যে এক্স-রশ্মি বেরিয়ে আসে, তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য আগের চেয়ে বেশী।

প্লাঙ্ক উপরিউক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করলেন এই ভাবে :—ইলেকট্রন যখন পরমাণুর অভ্যন্তরে থাকে, তখন তার যা গতিশক্তি (Kinetic Energy) থাকে, বাইরের বেগবান ইলেকট্রনের গতিশক্তি তার চেয়ে বেশী। ইলেকট্রন এই গতিশক্তি সংগ্রহ করে এক্স-রশ্মি থেকে বা এক্স-রশ্মির প্রত্যেকটি কোয়ান্টাম থেকে। সুতরাং কোয়ান্টামে শক্তির পরিমাণ (ΔE) আগের চেয়ে হ্রাস পায়। $\Delta E = h\nu$; অতএব ΔE হ্রাস পেলে $h\nu$ হ্রাস পাবে। h একটি ধ্রুবক বা অপরিবর্তনীয় রাশি। কাজেই $h\nu$ হ্রাস পেলে শুধুমাত্র ν হ্রাস পাবে (ν = ফ্রিকোয়েন্সি। আমরা (i) নং সমীকরণ থেকে পেয়েছি $c = \lambda \times \nu$, অর্থাৎ c অপরিবর্তিত থাকলে $\nu \propto \frac{1}{\lambda}$ বা তরঙ্গের গতিবেগ অপরিবর্তিত থাকলে ν বাড়লে λ কমবে এবং ν কমলে λ কমবে। এখন যেহেতু এক্স-রশ্মির গতিবেগ অপরিবর্তনীয়, সেহেতু ν বা কম্পন-সংখ্যা হ্রাস পেলে λ বা তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বাড়বে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে আইনস্টাইনের একটি মূল্যবান অবদান আছে। প্লাঙ্ক কোয়ান্টামগুলিকে তরঙ্গের প্যাকেট বলে বর্ণনা করেছেন ; অর্থাৎ তাঁর তত্ত্বে আলোর তরঙ্গ-ধর্মকেই বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আইনস্টাইন আলোর কণিকা-ধর্মকেই বেশী প্রাধান্য দিলেন ; অর্থাৎ প্লাঙ্কের প্রবর্তিত কোয়ান্টামগুলিকে তিনি কণিকার মত মনে করলেন। এই কণিকাগুলির নাম তিনি দিলেন "ফোটন"। ফোটনের ভর এবং ভরবেগ আছে ; অর্থাৎ কণিকার সব ধর্মই এতে আছে। ফোটনের ভর এবং ভরবেগ পরিমাপ করতে তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত ভর ও শক্তি সম্পর্কিত সমীকরণ, অর্থাৎ $E = mc^2$-এর সাহায্য নেন। কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই সূত্রটিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সমীকরণ বলে বর্ণনা করেছেন। এই সমীকরণের E-কে যদি ফোটনের শক্তি মনে করা যায় এবং c যদি আলোকের গতিবেগ হয়, তবে m হবে ফোটনের ভর।

$$E = mc^2 \cdots\cdots (iii),$$

আবার প্লাঙ্কের সমীকরণ $E = h\nu \cdots\cdots\cdots (i)$

∴ (iii) ও (i)-কে সংযোজিত করে পাই $h\nu = mc^2 \cdots (iv)$

$$\therefore m = \frac{h\nu}{c^2} ;$$

অর্থাৎ ফোটনের ভর $\frac{h\nu}{c^2}$

যেহেতু ফোটনের বেগ আলোর গতিবেগের (c) সমান, সেহেতু ফোটনের ভরবেগ $= m \times c$.

এখন $m \times c = \frac{h\nu}{c^2} \times c = \frac{h\nu}{c}$

কিন্তু একটা জিনিষ কি পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, আমরা আবার সেই নিউটনের কণিকা-বাদেই যেন ফিরে এলাম ? তবে আলোক-কণিকা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট এবং নিউটনের কণিকাবাদের সঙ্গে হায়গেন্‌স্ বা ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদের এখন আর কোনও বিরোধ নেই ; অর্থাৎ শক্তির মধ্যে এখন তরঙ্গ-ধর্ম এবং কণিকা-ধর্ম উভয়কেই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। পারমাণবিক কণিকা বলে আমরা যাদের মনে করি, তাদের মধ্যেও এই তরঙ্গ ও কণিকার দ্বৈত ভাবের বিকাশ হয়। তবে সে আলোচনা এখানে করতে গেলে প্রবন্ধকে অকারণ ভারাক্রান্ত করা হবে এবং উচ্চ গণিত বাদ দিয়ে সে আলোচনা করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাই এই আলোচনার এখানেই ছেদ টানা হলো।

প্লাষ্টিক সার্জারী

ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা

যুদ্ধ মানুষের সমাজে আনে অকল্যাণ আর ধ্বংস। এই ধ্বংসের পরিমাণ কিছু নির্ণীত হয় তাৎক্ষণিক মূল্যে, কিছু বা নির্ণীত হয় দূরবিস্তারী ভবিষ্যতে। যুদ্ধে যারা প্রাণ দেয়, তাদের ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারটা মোটা হিসাব; সূক্ষ্ম হিসাবের আড়ালে থাকে সেই সব হতভাগ্যেরা—যারা তখনি মরে না, মরে' বেঁচে থাকে। যুদ্ধে আহত সেই সব হতভাগ্য—বিকৃত, বীভৎস বিকলাঙ্গেরা হীনমন্যতা নিয়ে বেঁচে থাকে—সমাজের কখনো আতঙ্কের, কখনো ঘৃণার, কখনো বা সহানুভূতির পাত্র হয়ে। কর্মজীবন, বিবাহিত জীবন, সামাজিক জীবন—হয়তো কোন জীবনের ছাড়পত্রই তাদের মেলে না—বিকৃত রূপের অপরাধে!

পর পর দুটি মহাযুদ্ধে এমনি অসংখ্য অভিশপ্ত বিকলাঙ্গেরা আজও অনেকে বেঁচে আছে ইউরোপের দেশে দেশে, বেঁচে আছে হিরোসিমা-নাগাসাকির পারমাণবিক অগ্নিদগ্ধ হয়ে জাপানের গ্রামে-নগরে আজ যুদ্ধ প্রত্যক্ষভাবে হানা দিয়েছে ভারতের দ্বারেও এই যুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতি যাই হোক—সেই সব আহত, বিকলাঙ্গ সৈনিক বা নাগরিকদের ভবিষ্যৎ সমাজে সুস্থরূপে পুনর্বাসনের চিন্তা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শারীরিক বিকৃতি আর রূপহীনতা—এর যন্ত্রণা আর বেদনা সর্বদেশে, সর্বকালে। নারীদের ক্ষেত্রে এই বিকৃতি আর রূপহীনতা তো সবচেয়ে বড় অভিশাপ। পুরুষদের ক্ষেত্রেও কি এই বেদনা কম? এই জীবন-যন্ত্রণা আমরা কেউ ভুলতে পারি না বলেই মানুষের যুগযুগান্তের সাধনা—এই রূপহীনতাকে, বিকৃতিকে উত্তরণের। সেই সাধনার ফল হচ্ছে—আজকের বিজ্ঞানের 'প্লাস্টিক সার্জারী'।

প্লাস্টিক সার্জারী কথাটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ এখনো নেই। দৃষ্টিগ্রাহ্য যে কোন অঙ্গের বাহ্যিক বিকৃতিকে যে অস্ত্রোপচারে পরিবর্তিত করে স্বাভাবিক রূপদান করা হয়—আধুনিক শল্য-চিকিৎসার সেই শাখাকে প্লাস্টিক সার্জারী বলা হয়। প্লাস্টিক সার্জারী যুক্ত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়—যে প্রচেষ্টায় দাঁত, মুখ, হাড়, চামড়া ও রক্ত-বিশেষজ্ঞদের যৌথ প্রচেষ্টা প্রায়শঃই প্রয়োজন।

'প্লাস্টিক সার্জারী' কথাটি এদেশে এখনো স্বল্প উচ্চারিত। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকায় এর প্রভূত উন্নতি ঘটেছে এবং এখনো ঘটছে। এই উন্নতির পিছনে প্রধানতঃ ছিল—গত দুটি মহাযুদ্ধ ও কোরিয়া যুদ্ধের আহত ও বিকৃত সৈনিকদের স্ব-রূপে ফিরিয়ে আনবার তাগিদ। ব্লাড ব্যাঙ্কের মত প্লাস্টিক সার্জারীও যুদ্ধের সমুদ্রমন্থনে উৎপন্ন অমৃত বললে অন্যায় হয় না।

তবু আজকের প্লাস্টিক সার্জারীর কথা বলতে গিয়ে শুধুই যুদ্ধের কথা বললে অবিচার হবে। নাগরিক জীবনে নানা আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত বিকৃতি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এর অবদান অপরিসীম

মানুষের দিকে তাকালে প্রথমেই তার মুখ নজরে পড়ে। তাই মুখের বিকৃতিই সবচেয়ে বড় বিকৃতি। বিজ্ঞানের প্রধান সংগ্রামও সেই বিকৃতিকে সুষ্ঠু আকৃতিতে ফিরিয়ে আনবার। মুখের বিকৃতি নানাভাবে ঘটতে পারে। জন্মগত বিকৃতি, যানবাহনের দুর্ঘটনাজনিত বিকৃতি, অগ্নিদগ্ধ হেতু বিকৃতি অথবা যুদ্ধের সময় ট্রেঞ্চ অথবা মুক্ত ক্ষেত্রে গোলাগুলি, বোমার টুকরা প্রভৃতির আঘাত-জনিত বিকৃতি। আজ প্রায় সব রকম ক্ষেত্রেই

প্লাস্টিক সার্জারী প্রযুক্ত হয় এবং একেবারে অসম্ভব না হলে সব রকম বিকৃতিকেই সুষ্ঠু আকৃতিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

জন্মগত বিকৃতি ছাড়া দুর্ঘটনাজনিত বিকৃতিতে প্লাস্টিক সার্জারী অবিলম্বে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। কারণ দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই দ্রুত প্লাস্টিক সার্জারীর ব্যবস্থা হলে অনেক সময়ই বিকৃতি নিরোধ সহজসাধ্য হয়, যা পরে প্লাস্টিক সার্জারী করলে দীর্ঘ সময়েও ফলপ্রদ না হতে পারে। নাগরিক জীবনের দুর্ঘটনা—যেমন, যান-বাহনের দুর্ঘটনা, অগ্নিদাহ প্রভৃতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো হলে সেখানে যৌথ প্রচেষ্টায় প্লাস্টিক সার্জারী প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ব্যক্তিকে দ্রুত পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে উপযুক্ত হাস-পাতালে আনা অনেক ক্ষেত্রেই ঘটে ওঠে না। কোরিয়ার যুদ্ধে এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আকাশপথে পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি বহুলাংশে এই সমস্যার সমাধান করেছে। সাধারণতঃ এখন যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিককে প্রাথমিক সাহায্য হিসাবে উপযুক্ত 'অ্যান্টিবায়োটিক' জাতীয় ওষুধ দিয়ে পরে প্লাস্টিক সার্জারীর উপযুক্ত হাসপাতালে যত শীঘ্র সম্ভব পাঠানোই রীতি।

প্লাস্টিক সার্জারীতে প্রধান কারিকুরী কাজ হলো মুখের বিকৃতি রোধ। মুখের আকৃতি রক্ষা করে প্রধান তিনটি অংশ—উপরের চোয়াল বা ম্যাক্‌সিলা, নীচের চোয়াল বা ম্যাণ্ডিব্‌ল্‌ এবং নাক। মুখের মাংসপেশীগুলি সাধারণভাবেই সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল বলে ভাবব্যঞ্জক পরি-বর্তনগুলি সহজেই ঘটে। দেহের অপরাপর অংশ অপেক্ষা সমস্ত মুখেই রক্ত-সরবরাহ অধিক মাত্রায় হয়ে থাকে। এর একটা সুবিধা এই যে, মুখের মাংসপেশী ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেই আহত মাংসপেশীতে বেশীমাত্রায় অস্ত্রোপচার করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, অধিক রক্ত চলাচলের ফলে মুখের ক্ষত সহজেই নিরাময় হয়ে ওঠে ও পচনশীল ক্ষত বা গ্যাংগ্রীন হয় না। অসুবিধা এই যে, অধিক রক্ত চলাচলের জন্যে মুখের আঘাত-গুলি থেকে বেশী রক্তপাত ঘটে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে হয়তো এই রক্তপাতই মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে।

উপরের চোয়ালের মাংসপেশীর মধ্যে বায়ু-পূর্ণ কোষ বা সাইনাস থাকে। উপরের চোয়ালের আঘাতে এই সাইনাসগুলি জখম হলে মুখাকৃতি বিকৃত হয়ে যায়। নীচের চোয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হলে মুখের সম্প্রসরণশীলতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া নীচের চোয়ালের পেশীতেই জিহ্বা যথাস্থানে আবদ্ধ থাকে বলে এই মাংস-পেশীগুলি জখম হলে জিভ্‌ ও মুখের বিকৃতি ঘটে—এমন কি, জিভ্‌ স্থানচ্যুত হয়ে শ্বাসনালীর পথে উল্টে গিয়ে শ্বাসরোধ করতে পারে।

এই দুটি কথা মনে রেখে প্লাস্টিক সার্জারীর ক্ষেত্রে প্রাথমিক কর্তব্য—মুখের রক্তপাত বন্ধ করা। এই রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে চাপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ দেওয়া হয়। ফলে সাইনাসগুলি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে থাকে। তারপর আহত ব্যক্তির জিভ্‌ যাতে স্থানচ্যুত না হয়, সে জন্যে তাকে বাইরে টেনে আহতকে উল্টোমুখে উবুড় করে দিতে হয়। এর ফলে শ্বাসনালীতে পতিত রক্তও বাইরে চলে আসে। এরপরই আহতকে অবিলম্বে উপযুক্ত হাসপাতালে পাঠানো হয়ে থাকে।

হাসপাতালে পৌঁছাবার পর রক্তপাতের কেন্দ্রগুলিতে যথাযথ বন্ধনী দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবিষ্ট কাঁচ, গুলির টুক্‌রা প্রভৃতি বের করা হয়, নচেৎ ঐগুলি পচনের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। চোয়ালের ভেঙে-যাওয়া হাড়ের টুক্‌রা প্রভৃতি অপসারিত না করেই রাখা হয় এবং পরে ঐ টুক্‌রাগুলিকে আবার যথাসম্ভব সাজিয়ে

সূক্ষ্ম তার বেঁধে স্বাভাবিক আকৃতিতে আনবার চেষ্টা করা হয়। যে সব হাড়ের টুক্‌রা বা ভাঙ্গা দাঁত জোড়া দেওয়া যায় না, সেগুলির পরিবর্তে বিশেষ প্লাস্টিকের ঐরূপ টুক্‌রা তৈরী করে বসিয়ে দেওয়া হয়। যথাযথভাবে এরূপ জোড়া দেবার কৌশল প্লাস্টিক সার্জারীর চরম উৎকর্ষ।

বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্লাস্টিক সার্জারীতে বিশেষ বিশেষ রকমের কৌশল অবলম্বিত হয়। যেমন, নাকের কোন বিকৃতি ঘটলে পাঁজরের হাড়ের অগ্রভাগে কার্টিলেজ নামে যে কোমলাস্থি থাকে, তারই টুক্‌রা কেটে হারানো নাক বা তার চেয়েও ভাল নাকের মাপে সেই কাটা টুক্‌রা মুখের যথাস্থানে বসানো হয়। তারপর মুখের অন্য অস্থি'র মধ্য দিয়ে গর্ত করে এই কৃত্রিম নাক যথাস্থানে বসিয়ে তার উপর নতুন চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।

প্লাস্টিক সার্জারীতে মুখের বড় রকম শূন্যতা পূরণের ক্ষেত্রেও এমনি কার্টিলেজের ব্যবস্থা করা হয়। সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন পাঁজর থেকে নরম অস্থি কেটে ছোট ছোট বহু টুক্‌রা ঐ শূন্যস্থানে ভরাট করে চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। যথাকালে ঐ কার্টিলেজগুলি নতুন গজানো মাংসপেশীর সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও শূন্যতাকে বেমালুম ঢেকে দিয়ে মুখাকৃতি অটুট রাখে।

প্লাস্টিক সার্জারীর আরেকটি বিস্ময়কর হাতিয়ার হলো ট্যান্টেলাম ধাতু। এই ধাতুর তৈরী যে কোন টুক্‌রা হাড়ের সঙ্গে বেমালুম মিলে যেতে পারে এবং হাড়ের বদলে ট্যান্টেলামের অংশ দিয়ে হাড়ের যে কোন প্রতিস্থাপনই প্রায় চলে। এই কারণেই এটি আজকাল প্লাস্টিক সার্জারীতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

হাড়ের বিকৃতি সংশোধনের আরেকটি বিচিত্র পন্থাও অবলম্বিত হয়। সুস্থ ও জীবন্ত হাড়ের সন্ত সৃষ্ট নরম অংশ চেঁচে ভাঙা হাড়ে প্রলেপ দিয়ে রাখলে ভাঙা হাড়ের বৃদ্ধি ঘটে ও পরবর্তী কালে ভাঙা অংশ বা বিকৃতি লুপ্ত হয়।

হাড় মেরামতের মত চামড়া মেরামতও প্লাস্টিক সার্জারীর আরেকটি প্রধান কৃতিত্ব। এক্ষেত্রেও নানা বিচিত্র পন্থা অবলম্বিত হয়। এখন প্লাস্টিক সার্জারীতে এক জায়গা থেকে চামড়া কেটে অপর জায়গায় প্রতিস্থাপন প্রায়ই করা হয়ে থাকে। অগ্নিদগ্ধ বা আহত স্থানের পোড়াদাগ বা কোঁচকানো নতুন চামড়া সহজেই এইভাবে প্রতিস্থাপিত চামড়া দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়। এই চামড়া প্রতিস্থাপন বা স্থানান্তরের সময় সাধারণতঃ ঢাকা জায়গা, যেমন—তলপেট, বুক, উরু প্রভৃতি জায়গার চামড়াই বেছে নেওয়া হয় এবং সেখান থেকে কেটে মুখে বা অন্যত্র লাগানো হয়। এই কাজে এখন অতি সূক্ষ্মভাবে চামড়া কেটে নেবার জন্যে ডার্মাটোম নামে একপ্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেন আমেরিকার বিখ্যাত প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ আর্ল সি. প্যাজেট। কেটে নেওয়া চামড়া অন্য জায়গায় জুড়তে গেলে পূর্বে বহু সূক্ষ্ম সেলাই দিয়ে তাকে যথাস্থানে লাগানো হতো। এখন আক্রান্ত স্থানে বিশেষ এক ধরণের ঔষধ প্রয়োগ করে তার উপর চামড়া লাগানো হয়। ঐ ঔষধের সংযোগে আক্রান্ত স্থানের রক্ত থেকে আঠার মত এক রকম জিনিষ জমে ওঠে এবং সেই আঠাতেই চামড়া দৃঢ়ভাবে আট্‌কে যায়, সেলাইয়ের প্রয়োজন হয় না।

চামড়া জোড়বার আরেকটি চমকপ্রদ পন্থা হলো 'পেডিকল গ্র্যাফ্‌ট্‌'। এর কৌশল অনেকটা গাছের কলম বাঁধবার মত। গলা বা বুকের কোন একটি অংশ বেছে নিয়ে ফলের খোসা ছাড়াবার মত তার একদিক থেকে লম্বালম্বি এক ফালি চামড়া কেটে ফেলা হয়। এই ফালির একটি মুখ শরীরের কাছাকাছি অপর এক অংশে এনে (যেমন হাতকে গলার

কাছে এনে) তার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়, অর্থাৎ চামড়ার একটি ফালির—দুই মুখ শরীরের দুই অংশে (এক অংশ গলায় বা বুকে—অপর অংশ হাতে) যুক্ত অবস্থায় থাকে। কয়েক দিন বাদে এই ফালির প্রথম মুখটি (অর্থাৎ গলার বা বুকের আদি অংশটি) কেটে দেওয়া হয়। ততদিনে ফালিটি হাতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এবার ঐ ফালিটি, মুখের যে জায়গায় চামড়া লাগানো দরকার, সেখানে ঐ ভাবেই অর্থাৎ প্রথম এক মুখ লাগিয়ে পরে কয়েক দিন বাদে কেটে অপর মুখটিও লাগিয়ে দেওয়া হয়।

হাড় ও চামড়া প্রতিস্থাপনের কৌশল একত্রে প্রয়োগ করে নষ্ট হয়ে যাওয়া চোয়াল, ঠোঁট—সব কিছুই তখন নতুন করে রূপ পায় প্লাস্টিক সার্জনদের হাতে এবং এই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ এমনই নিখুঁত উৎকর্ষতা লাভ করেছে যে, ভবিষ্যতে বিকৃতাঙ্গ বা কুরূপের সমস্যা একদিন হয়তো থাকবেই না।

প্লাস্টিক সার্জারী কোন কোন ক্ষেত্রে রূপান্তরণে সক্ষম হয় না। বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সে মাংসপেশী তন্তু, চর্ম যখন নতুন করে আর সৃষ্ট হয় না, তখন প্লাস্টিক সার্জারী প্রায় অসহায়। সে ক্ষেত্রেও অবশ্য বিজ্ঞান হার মানে নি। এসব ক্ষেত্রেও প্রথমতঃ বিকলাঙ্গের মুখে বিশেষ এক ধরণের উপাদান বা ‘মুলেজ’ ব্যবহার করা হয়। এটি অনেকটা ‘প্লাস্টার অব প্যারিস’ জাতীয় কাদার মত জিনিষ, যা পরে শুকিয়ে শক্ত হয়ে ওঠে। বিকলাঙ্গের মুখে বা অন্যত্র ‘মুলেজ’ প্রয়োগের পর তা নমনীয় থাকতে থাকতে ভাস্করের মত তা দিয়ে শূন্যতা পূরণ করে স্বাভাবিক রূপ অনুমান করে নেওয়া হয়। পরে ‘মুলেজ’ শক্ত হয়ে গেলে সেটা খুলে ফেলা হয় ও তার অনুকৃতিতে রবার বা প্লাস্টিকের হুবহু ছাঁচ প্রস্তুত করা হয়। স্বাভাবিক দেহবর্ণে রঞ্জিত এই ছাঁচের মুখোস ধারণ করলে তার আড়ালে তখন আসল মুখের বিকৃতি আর দৃষ্টিগোচর হয় না। চশমা পরবার মতই এই মুখোস ব্যবহারও সহজসাধ্য।

প্লাস্টিক সার্জারীর আরেকটি বিস্ময়কর অতি আধুনিক শাখা হলো সিনেপ্লাস্টিক অ্যাম্পুটেশন। এই শাখাটির প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত জটিল। সংক্ষেপে বলা যায়—এই শাখায় গবেষণার ফলে এখন কৃত্রিম হাত বা আঙুল, কেটে-যাওয়া হাতের সঙ্গে জুড়ে স্বাভাবিক হাতের মতই তাকে সঞ্চালন করা ও সকল প্রকার কাজ করা এখন বাস্তবে সম্ভব হয়েছে।

উপসংহারে একথাই বলা চলে যে, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি অসীম, সে শক্তি হার মানে না কখনও। তাই মানুষেরই ক্রূরতা ও বীভৎসতায় যে হতভাগ্য বিকলাঙ্গ অথবা অঙ্গহীন—তাকেও স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবনের ছাড়পত্র দিতে পারে মানুষই, তার বিজ্ঞানবুদ্ধির অন্তহীন ক্ষমতায়। সেই ক্ষমতা দিনে দিনে কল্যাণের বার্তা আনুক মানুষের জীবনে।

ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয়

দীপক বসু

প্রকৃতির বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের অনুসন্ধান ও তার বিভিন্ন রহস্য উদ্ঘাটনে মানুষের প্রচেষ্টা বোধ হয় মানুষের আদিকাল থেকেই চলে আসছে। তাই জল, স্থল, অন্তরীক্ষ আজ তার অধিকারে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের যৌথ অভিযানের এক চরম নিদর্শন হলো "আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসর।" জুলাই (১৯৫৭) থেকে ডিসেম্বর (১৯৫৮)—এই আঠারো মাসব্যাপী সময়ে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ একযোগে পরীক্ষাকার্য চালান, সূর্য ও পৃথিবীর নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

এই আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরেরই অন্যতম কার্যসূচী ছিল কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ আকাশে উঠেছিল। তারপর থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত শতাধিক মহাশূন্যগামী যান সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এরা যে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, সে কথা আজ আর কারো অবিদিত নেই। সাধারণ মানুষ অবশ্য প্রথম কয়েকটা কৃত্রিম উপগ্রহ দেখে যতটা উত্তেজিত হয়েছিল, ক্রমশঃ বোধহয় পুরনো হয়ে যাওয়ায় সে উত্তেজনা আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই পরের উপগ্রহগুলির বেলায় তাদের খুব বেশী আগ্রহ দেখা যায় নি। বৈজ্ঞানিকদের কাছে কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। কারণ প্রত্যেকটি উপগ্রহই পৃথিবী ও বাইরের জগৎ সম্বন্ধে তাঁদের এনে দিয়েছে নতুন সব তথ্য। তাই প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত উৎক্ষিপ্ত সবগুলি মহাকাশযান সম্বন্ধে তাঁরা সমান আগ্রহশীল।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসর ও মহাশূন্য-অভিযানের একটি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অবদান হলো ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয়ের আবিষ্কার। পৃথিবী থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে দুটি স্তরে ভাগ হয়ে শক্তিশালী বিদ্যুৎ-কণার দ্বারা গঠিত এই অঞ্চল রয়েছে। আবিষ্কর্তা আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জেমস্ ভ্যান অ্যালেনের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয়। প্রথমটি অর্থাৎ অন্তর্বলয়টি রয়েছে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছে—কেন্দ্র থেকে মোটামুটি ১৩,০০০ কিলোমিটার দূরে। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বহির্বলয়টি ২৫,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত (১নং চিত্র)। উভয় বলয়েরই আকৃতি তৃতীয়ার চাঁদের মত। শিং-এর মত দুই প্রান্ত যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে গিয়ে শেষ হয়েছে। যে কণিকাগুলির দ্বারা ভ্যান অ্যালেন অঞ্চল গঠিত, সেগুলি কিন্তু সেখানে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে নেই, মহাশূন্যে তাদের অবস্থিতির সঙ্গে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের একটা যোগাযোগ আছে। ১নং চিত্রে অঙ্কিত রেখাগুলির তাৎপর্য হলো এই যে, এক একটি রেখার উপরিস্থিত সকল স্থানে বিদ্যুৎ-কণার প্রভাব সমান। চিত্র থেকে পরিস্ফুট যে, চিহ্নিত দুটি ভ্যান অ্যালেন অঞ্চলে বিদ্যুৎ-কণার প্রভাব পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনেক গুণ বেশী। এখন দেখা গেছে যে, এই সম-প্রভাবসম্পন্ন রেখাগুলি মোটামুটিভাবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখার বরাবর রয়েছে। এই ঘটনা থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, ভ্যান অ্যালেন স্তরদ্বয়ের অন্তর্বর্তী কণিকাসমূহ সবই বিদ্যুৎ-কণা; কারণ নিরপেক্ষ কণিকার উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন প্রভাব থাকে না।

নানারকম অঙ্ক কষে এবং গবেষণাগারে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বাইরে গতিশীল বিদ্যুৎ-কণা চলতে চলতে

এসে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে আট্‌কে যেতে পারে। আজ থেকে অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল আগে নরওয়ের দু'জন পদার্থবিদ্‌ বার্কল্যাণ্ড ও ষ্টৌর্মার এই সত্য প্রথম উপলব্ধি করেন। আমরা জানি যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে মোটামুটিভাবে একটি সাধারণ চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের মত মনে করা যেতে পারে। এই দু'জন নরওয়ের বৈজ্ঞানিক নিষিদ্ধ (কালো) এলাকা দেখানো হয়েছে। সাদা অনুমোদিত অঞ্চলে অবস্থিত কণিকাগুলি একমাত্র শিং-এর মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, কালো নিষিদ্ধ অঞ্চলে তাদের প্রবেশ নিষেধ। বার্কল্যাণ্ড তাঁদের মতবাদ প্রমাণ করবার জন্যে একটি মডেল নির্মাণ করেছিলেন—তার নাম "টেরেলা"। একটি চুম্বকের গোলককে (পৃথিবী) একটি বায়ু-নিষ্কাশিত
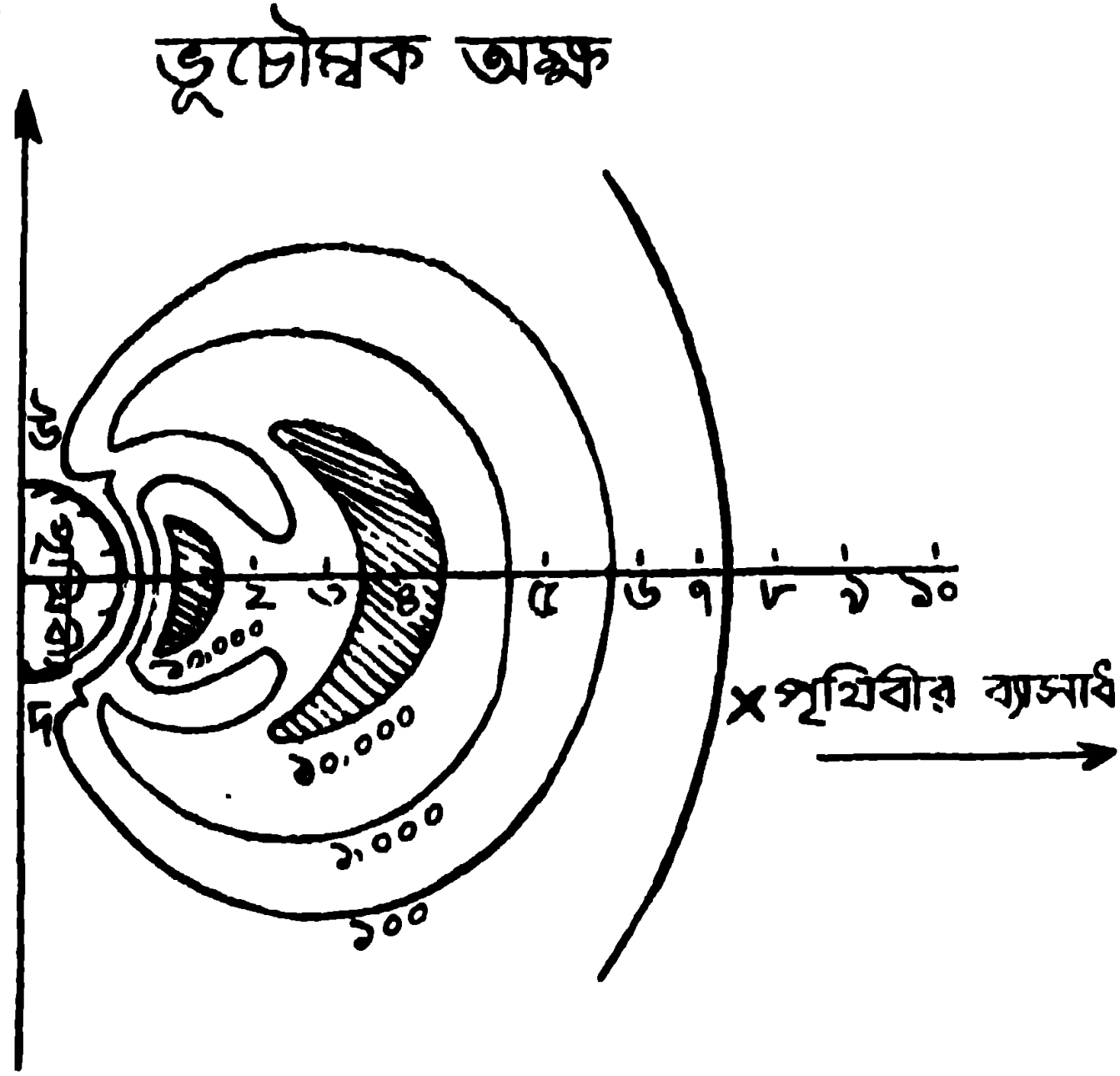
১নং চিত্র।

ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয়ের গঠন ও অবস্থান। রেখাগুলির পার্শ্বস্থিত সংখ্যা (১০০, ১০০০ ইত্যাদি) ঐসব অঞ্চলের একক ক্ষেত্রফলে এক সেকেণ্ডে পরিলক্ষিত বিদ্যুৎ-কণার সংখ্যা সূচিত করে। (পৃথিবীর ব্যাসার্ধ —৬,৩৬৮ কি. মি.)। চিত্রে পৃথিবীর এক দিক মাত্র দেখানো হয়েছে। ভূচৌম্বক অক্ষের চারদিকে চিত্রটিকে ঘোরালে প্রকৃত অবস্থা বোঝা যাবে।

বহুদিন ধরে এরূপ চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্যুৎ-কণার গতিবিধি সম্বন্ধে অনুসন্ধান-কার্য চালান। তাঁরা দেখান যে, এরূপ চুম্বকের চারদিকে বিদ্যুৎ-কণার গতিবিধির জন্যে দুটি নির্দিষ্ট এলাকা আছে—একটি "অনুমোদিত" এবং অপরটি "নিষিদ্ধ"।

অনুমোদিত অঞ্চলে বিদ্যুৎ-কণা অনায়াসে বিচরণ করতে পারে। কিন্তু নিষিদ্ধ অঞ্চলে বিদ্যুৎ-কণা থাকতে পারে না। ২নং চিত্রে পৃথিবীর চারদিকে অবস্থিত এই অনুমোদিত (সাদা) ও কক্ষে রেখে তার উপর ক্যাথোড-রশ্মি অর্থাৎ ইলেকট্রন বর্ষণ করা হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল—ইলেকট্রনগুলি গোলকের চারদিকে এমন-ভাবে সজ্জিত হয়েছে যে, তাথেকে অনুমোদিত ও নিষিদ্ধ এলাকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহই থাকলো না। এই ঘটনা ঘটেছিল ১৮৯৬ সালে।

এরপর ষাট বছর কেটে গেছে। রাশিয়ার প্রথম স্পুটনিক আকাশে উঠেছে। ভ্যান অ্যালেন ও তাঁর সহকর্মীরা তখন মহাজাগতিক রশ্মি

নিয়ে কাজ করছেন। মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে পরীক্ষা করবার জন্যেই ভ্যান অ্যালেন আমেরিকার দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১-এ একটি যন্ত্র বসিয়েছিলেন। অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখলেন যে, কিছুদূর যাবার পরেই তাঁর যন্ত্রে আর মহাজাগতিক রশ্মি (মহাজাগতিক রশ্মি বিদ্যুৎ-কণার দ্বারা গঠিত) ধরা পড়ছে না। স্বভাবতঃই ভ্যান অ্যালেন প্রথমে ভাবলেন যে, তাঁর যন্ত্রে কিছু গোলমাল অনুমানই সত্য। মহাজাগতিক রশ্মি সাধারণ অবস্থার হাজার গুণ বেশী হলে যন্ত্র বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর সিদ্ধান্তের চরম পরীক্ষার জন্যে ভ্যান অ্যালেন এক্সপ্লোরার-৪-এর সাহায্যে একটি নতুন ও উন্নত ধরণের যন্ত্র পাঠিয়ে তিনি তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হন।

১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মস্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের পঞ্চম অধি-
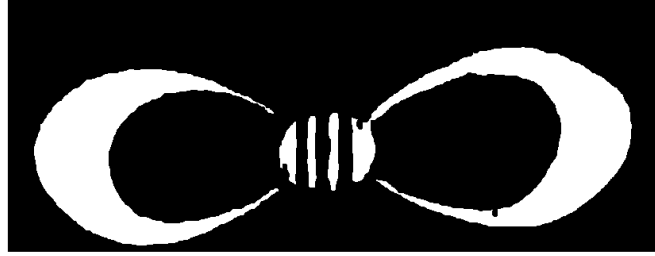
২নং চিত্র।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চারদিকে বহিরাগত বিদ্যুৎ-কণার জন্যে নির্দিষ্ট অনুমোদিত (সাদা) ও নিষিদ্ধ (কালো) অঞ্চল। ছবির কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী।

হয়েছে। তাই পরবর্তী উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-৩-এ (এক্সপ্লোরার-২ অকৃতকার্য) পুনরায় তিনি তাঁর সকল পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং একই রকম ফল লাভ করেন। নিজের যন্ত্রের নির্ভুলতা সম্বন্ধে এবার নিঃসন্দেহ হয়ে ভ্যান অ্যালেন তখন এই ঘটনাকে এক অভিনব উপায়ে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। নির্দিষ্ট উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব যদি তাঁর যন্ত্রের ক্ষমতার পক্ষে অত্যধিক হয়, তবে হয়তো যন্ত্র 'জাম্' হয়ে গিয়ে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবে কি ঐ সব উচ্চতায় মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাব অত বেশী? সেটা নির্ধারণ করবার জন্যে ভ্যান অ্যালেন অনুরূপ একটি যন্ত্রের সাহায্যে গবেষণাগারে পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে, তাঁর বেশনে ভ্যান অ্যালেন দৃপ্তকণ্ঠে তাঁর অভূতপূর্ব আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন—পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর হাজার কিলোমিটারের পর থেকে বিদ্যুৎ-কণার প্রভাব হঠাৎ হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। এই আবিষ্কার সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করে দিল। এই হলো ভ্যান অ্যালেনের প্রথম বলয় আবিষ্কারের কাহিনী। অধ্যাপক ডাঃ জেম্স্ ভ্যান অ্যালেন তাঁর যন্ত্রের নির্ভুলতার উপর নির্ভর করে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে সর্বপ্রথম এই স্তরের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেন। তাই এর নাম ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয়।

এদিকে রাশিয়ানরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ১৯৫৮ সালের ১৫ই মে স্পুটনিক-৩-এর সঙ্গে ভ্যান

অ্যালেনের মতই যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদ্বয়—ভার্ণব ও সুদাকভ্ এবং তাঁদের সহকর্মিবৃন্দ। তাঁদের যন্ত্রেও মেরু অঞ্চলের দিকে অনুরূপ ঘটনা ধরা পড়ে। এরপর ঐ বৎসরেই ৭ই ডিসেম্বর তারিখে উৎক্ষিপ্ত আমেরিকার পাইওনিয়ার-৩ উপগ্রহটি ভ্যান অ্যালেনের দ্বিতীয় বলয়টি আবিষ্কার করে। এক্সপ্লোরার উপগ্রহগুলি অত উপরে উঠতে পারে নি বলেই তারা দ্বিতীয় বলয়টির সন্ধান পায় নি। পাইওনিয়ার উপগ্রহটি ৯০,০০০ কিলোমিটারেরও উপরে উঠেছিল। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ভ্যান অ্যালেনের উপরিউক্ত দুটি স্তর ছাড়াও তৃতীয় একটি বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

আজ আমরা জানি যে, ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-বলয় হচ্ছে বার্কল্যাণ্ড-ষ্টোর্মারেরই "অনুমোদিত" অঞ্চল, ষাট বছর আগে কাগজে-কলমে ও গবেষণাগারে ছোট ছোট পরীক্ষার ফলে যার ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল। এতদিনে প্রকৃত পরীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণিত হলো এবং এও জানা গেল যে, ঐ অঞ্চল একাধিক স্তরে বিভক্ত হয়ে গঠিত, যার সন্ধান বার্কল্যাণ্ড ও ষ্টোর্মার দিতে পারেন নি।

এবার দেখা যাক, ভ্যান অ্যালেন স্তরের বিদ্যুৎ-কণাগুলির স্বরূপ কি? অর্থাৎ তারা কি জাতীয় বিদ্যুৎ-কণা এবং স্থির না গতিশীল, কি অবস্থায় আছে? আবিষ্কারের পর থেকে গত ৪।৫ বৎসরে আরও বহু মহাকাশযান প্রেরণ করে প্রথম ও দ্বিতীয় বলয়কে খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, অন্তর্বলয়টি প্রধানতঃ প্রোটন কণিকার দ্বারা গঠিত এবং বহির্বলয়টিতে আছে ইলেকট্রন কণিকা। অবশ্য উভয় বলয়েই এই দুই প্রকার মূল কণিকা ছাড়া কিছু কিছু পরিমাণে অন্য জাতীয় বিদ্যুৎ-কণার অস্তিত্বও দেখা যায়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই সব বিদ্যুৎ-কণা আসে কোথা থেকে? বৈজ্ঞানিকেরা যদিও একমত নন, তবুও মোটামুটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বাইরের স্তরের কণিকাগুলির উৎস হলো সূর্য এবং ভিতরের স্তরের কণিকাগুলি আসে বেশীর ভাগ মহাজাগতিক রশ্মি থেকে। সূর্য ও মহাজাগতিক রশ্মি থেকে আগত বিদ্যুৎ-কণাগুলি পৃথিবীর কাছে এসে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে পড়ে আটকে গিয়ে যথাক্রমে ভ্যান অ্যালেনের বহির্বলয় ও অন্তর্বলয় গঠন করে।

উভয় স্তরেই বিদ্যুৎ-কণাগুলি গতিশীল, তারা স্থির হয়ে এক স্থানে বসে নেই। কিন্তু তাদের এই গতি মোটেই খেয়াল-খুসীমত নয়—একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলে। একটা বিশেষ কণিকাকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, তার একসঙ্গে অনেকগুলি গতি আছে। (১) চৌম্বক বলরেখার চারদিকে চক্রাকারে ঘুরছে। চৌম্বক ক্ষেত্রে সব সময়েই বিদ্যুৎ-কণার এরূপ একটি গতি থাকে। (২) চৌম্বক বলরেখা বরাবর স্ক্রুর মত প্যাঁচানো পথে বিদ্যুৎ-কণা একবার উত্তর এবং একবার দক্ষিণ দিকে আসছে ও যাচ্ছে (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বলরেখা বরাবর বিদ্যুৎ-কণার একটা বেগ থাকে বলে উত্তর ও দক্ষিণে এই গতিটা সম্ভব হয়। বলরেখাগুলি যেখানে পৃথিবীর সন্নিকটে এসেছে, সেখানে তারা অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। প্যাঁচানো পথে এই সব স্থানে এসে বিদ্যুৎ-কণা প্রতিফলিত হয়ে যায়। এরই ফলে কণিকাটি উত্তর ও দক্ষিণে আসা-যাওয়া করতে থাকে। (৩) বিদ্যুৎ-কণিকা এক অক্ষরেখা থেকে অন্য অক্ষরেখায় সরে যায়। পূবে যাবে, না পশ্চিমে যাবে সেটা নির্ভর করে কণিকাটির বিদ্যুৎ-ধর্মের উপর—অর্থাৎ সে পজিটিভ না নেগেটিভ, তার উপর। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র শুধু উত্তর-দক্ষিণে নয়, উচ্চতার সঙ্গেও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এরই ফলে বিদ্যুৎ-কণা এই গতি প্রাপ্ত হয়। (৪) বিদ্যুৎ-কণা ক্রমশঃ উপরে ওঠে বা নীচে নেমে যায়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রকৃতপক্ষে ঠিক আদর্শ চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের মত নয় বলেই বিদ্যুৎ-কণা এইরূপ একটা গতি লাভ করে। ভ্যান অ্যালেন

বলয়ের প্রত্যেকটি বিদ্যুৎ-কণা এরূপ জটিল পথে পরিভ্রমণ করে চলছে।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর উপর মোটামুটি ৬০ কিলোমিটার থেকে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে আয়ন স্তর আছে (আয়নমণ্ডল), তা আমাদের দূর-পাল্লার বেতার যোগাযোগের পক্ষে অপরিহার্য। একটা কথা অনেকেরই মনে হবে যে, ভ্যান অ্যালেন বলয় আমাদের এরূপ কোন উপকার বা অপকার করছে কিনা? উপকারের কোন সম্ভাবনা এখনও দেখা যায় নি, তবে ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ-স্তরের অনিষ্টকর ক্ষমতা ইতিমধ্যেই পরিস্ফুট হয়েছে। মানুষের মহাশূন্য-যাত্রার পক্ষে এই স্তর একটা প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। অত্যন্ত শক্তিশালী বিকিরণ-জনিত ভ্যান অ্যালেন বলয়ের মধ্য দিয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মহাশূন্যের পথে যেতে হলে তাকে মেরু অঞ্চলের উপর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। কারণ ১নং চিত্র থেকে বোঝা যাবে যে, সেই এলাকায় বিদ্যুৎ-কণার প্রভাব খুব কম।

৩ নং চিত্র। ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের ফাঁদে আটকাবার পর বিদ্যুৎ-কণার স্ক্রুর মত প্যাচানো পথে উত্তর-দক্ষিণে গতি।

ভ্যান অ্যালেন বলয়ের আবিষ্কার আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর আগে একমাত্র বার্কল্যাণ্ড ও ষ্টৌর্মারের ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়া এরূপ কোন অঞ্চলের প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই ছিল না। গত ৪।৫ বৎসরে যদিও ভ্যান অ্যালেন স্তর সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছে, কিন্তু এখনও এর অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে। যেমন, বলয়গুলির উৎপত্তি, এদের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বিদ্যুৎ-কণিকার অভাব, কণিকাগুলির উৎস ইত্যাদি। ফলে বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন শাখা খুলে গেছে। এথেকে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-কণিকা, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হবে।

মৌলিক কণার স্বরূপ

সূর্যেন্দুবিকাশ কর

ইলেকট্রন, প্রোটন, মেসন প্রভৃতি মৌলিক-কণাগুলির আবিষ্কারের পর তাদের আকার ও ধর্ম সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ পেল বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। মৌলিক কণার স্বরূপ আজও গভীর রহস্যজালে আচ্ছন্ন—বিজ্ঞানের নব নব নিরীক্ষায় সেই সব রহস্যের আংশিক সমাধান হয়েছে মাত্র। ১৯৫১-৫২ খৃস্টাব্দে পরীক্ষায় দেখা গেল যে, অতি উচ্চ তেজসম্পন্ন কণিকাগুলির সংঘর্ষে প্রচুর অপরিচিত মৌলিক কণার সৃষ্টি হয়। সেই সব অপরিচিত কণিকার আকার প্রায় $১০^{-১৩}$ সেন্টিমিটার, আর যে সব কণিকার সংঘর্ষে এদের উৎপত্তি, তাদের গতিবেগ আলোর কাছাকাছি, অর্থাৎ সেকেণ্ডে প্রায় ৩×১০^{১০} সেন্টিমিটার। ফলে দেখা যায় যে, এদের উৎপত্তি-গত সংঘর্ষ-কাল প্রায় $১০^{-২৩}$ সেকেণ্ড। এই সব কণিকার গড় জীবনকাল প্রায় $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড। আমাদের কাছে এই সময় অত্যল্প হলেও সংঘর্ষ-কাল $১০^{-২৩}$ সেকেণ্ডের তুলনায় এই জীবনকাল যথেষ্ট দীর্ঘ—প্রায় $১০^{১৩}$ গুণ বেশী। তাই এদের সৃষ্টিজনিত শক্তিও ক্ষয়জনিত শক্তির চেয়ে প্রায় $১০^{১৩}$ গুণ বেশী। সৃষ্টি ও ক্ষয়জনিত কাল ও শক্তির এই বিপুল ব্যবধান একই মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এক রহস্যের সৃষ্টি করে। তাঁর সমাধানে বলা যায় যে, এই সব মৌলিক কণার সৃষ্টির সময় অনেকগুলি কণার একসঙ্গে জন্ম হয়। তারা পরস্পরের সঙ্গে তীব্র বিক্রিয়ায় জড়িত—এমন কি, সহজাত অন্যান্য কণার সঙ্গেও। কিন্তু এ-রকম একটি মৌলিক কণা যখন ক্ষয় পেয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন তার বিক্রিয়া হয় ক্ষীণ। ২নং সারণীতে বিক্রিয়ার শ্রেণীবিভাগ দেখানো হয়েছে। পরমাণু-কেন্দ্রীনের শক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কণিকা বা পাই-মেসন কণিকার সৃষ্টিজাত বিক্রিয়া তীব্র—আর পাই থেকে মিউ-মেসনে রূপান্তরে হয় ক্ষীণ বিক্রিয়া।

তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়া ফ্যারাডে ও ম্যাক্স-ওয়েলের মতবাদ থেকে সম্পূর্ণ জানা ছিল। মহাকর্ষ বিক্রিয়া ও সূর্য-নক্ষত্র প্রভৃতি বিশালদেহী জ্যোতিষ্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এই বিক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষীণ। মৌলিক কণার ক্ষেত্রে মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব সম্পর্কে আজ আমরা তিমিরেই আছি—তবে কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, মৌলিক কণার পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত শক্তির সঙ্গে মহাকর্ষ-শক্তির সমন্বয়ে একদিন আমরা বিশ্বের স্বরূপ জানতে পারবো।

মৌলিক কণার ক্ষেত্রে এখন আমরা নিত্যতা ও সমতার নিয়মের আলোচনা করবো। ১নং সারণীতে ত্রিশটি মৌলিক কণাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। বেরিয়ন গোষ্ঠীতে নিউট্রন ও প্রোটন ছাড়া মেসনগুলিকে হাইপেরন নামেও অভিহিত করা হয়। হাইপেরন অস্থায়ী মৌলিক কণা—যার ক্ষয়ে অন্ততঃ একটি নিউট্রন বা প্রোটন পাওয়া যায়। বেরিয়ন কণিকার বিপরীত কণা থাকে। বেরিয়নের নিত্যতার মতবাদে বলা হয় যে, বিশ্বের সমস্ত বেরিয়ন ও অ্যান্টিবেরিয়নের বিয়োগ ফল একটি নিত্যসংখ্যা। অনুরূপভাবে লেপ্‌টন কণিকাগোষ্ঠীরও নিত্যতা আছে। ৩নং সারণীতে দেখা যাবে যে, তিন শ্রেণীর বিক্রিয়াতে এই দুটি গোষ্ঠীর মৌলিক কণা পৃথকভাবে নিত্যতা বজায় রাখে। কিন্তু

বোসন শ্রেণীর কণিকাগুলি এ-রকম নিত্যতা বজায় রাখে না। তাই বেরিয়ন, লেপ্টন শ্রেণীর কণিকা যারা এই নিত্যতা বজায় রাখে, তাদের ফের্মিয়ন নামে সাধারণ শ্রেণীতে অভিহিত করা হয়। ফের্মিয়ন কণিকার ঘূর্ণন-সংখ্যা $\frac{1}{2}$, বোসন কণিকার ঘূর্ণন সংখ্যা ০ অথবা ১।

বেরিয়ন-সংখ্যা, লেপ্টন-সংখ্যা, ভরণ ও ঘূর্ণন-সংখ্যার নিত্যতা যে কোন বিক্রিয়াতে রক্ষিত হয়। ঘূর্ণন গতি ও রৈখিক গতিজনিত নিত্যতা বজায় থাকবার অর্থ হচ্ছে—দেশ ও কালের ব্যবধানে এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই। কোন বিক্রিয়ায় সমতা রক্ষা করাও প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম। রৈখিক ও ঘূর্ণন গতির সমতা তীব্র, ক্ষীণ বা তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়াতে রক্ষিত হয়। ৩নং সারণীতে বিভিন্ন বিক্রিয়ায় নিত্যতা ও সমতা বজায় থাকা বা না থাকার একটা আধুনিক ধারণা পাওয়া যাবে।

স্কেলার (Scalar) ও ভেক্টর (Vector) সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ধারণা থেকে আমরা জানি যে, কৌণিক ভরবেগের ঘূর্ণন ভেক্টর J, (2J+1) সংখ্যক দিকে অবস্থান করতে পারে। দেশের (Space) ব্যাপ্তিতে এই অবস্থান থেকে আমরা সমতা ও নিত্যতা যাচাই করি। মৌলিক কণার ক্ষেত্রে অনুরূপ আর একটি কথা আইসোটোপিক ঘূর্ণন আমরা প্রয়োগ করি। আইসোটোপিক ঘূর্ণন কিন্তু কৌণিক ভরবেগের মত দেশ (Space) সম্পর্কীয় নয়। ১নং সারণীতে নিউট্রনের আইসোটোপিক ঘূর্ণন T দেখা যায় $\frac{1}{2}$, অর্থাৎ (2T+1) সংখ্যক বা ২টি অবস্থায় নিউট্রন অবস্থান করে; এই ২টি অবস্থান হলো নিউট্রন ও প্রোটন। তফাৎ শুধু ভরণের সংযুক্তি বা বিযুক্তিতে। কিন্তু তাড়িতিক বিক্রিয়া কেন্দ্রিন বিক্রিয়া থেকে প্রায় ১০০ গুণ ক্ষীণতর। তাই কেন্দ্রিনের ক্ষেত্রে আমরা তাকে গণ্য করি না, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়াও তাই। কেন্দ্রিন-শক্তি নিউট্রন ও প্রোটন উভয়ের বেলায় একই রূপ। তাই ভরণের তক্‌মা বাইরে থাকলেও এরা একেরই দুটি অভিব্যক্তি। সেরূপ পাই-মেসনের তিনটি ভরণজনিত রূপও একই পায়নের তিনটি বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। কিন্তু ভরণকে গণ্য না করেও আমরা আইসোটোপিক দেশে (Space) এই অভিব্যক্তিগুলির সমতা ও নিত্যতা রক্ষিত হয় কিনা, যাচাই করতে পারি। ক্ষীণ বিক্রিয়ায় এই সমতা ও নিত্যতা বজায় থাকে না।

আইসোটোপিক ঘূর্ণনের সংজ্ঞা থেকে আমরা নিউট্রন, প্রোটনকে নিউক্লিয়ন আখ্যায় ও তিনটি পাই-মেসনকে পায়ন আখ্যায় একটি কণিকারূপে গণ্য করতে পারি। আইসোটোপিক দেশে যখন পায়ন তিনটি বিশেষ অবস্থায় ঘূর্ণিত হয়, তখন পায়নের তিনটি ভরণ অবস্থার পৃথকভাবে প্রকাশ হয় মাত্র—আর নিউক্লিয়নের ক্ষেত্রে নিউট্রন ও প্রোটন পরস্পর রূপান্তরিত হয়। যদি কোন বিক্রিয়া ভরণ অবস্থার উপর নির্ভর না করে, তবে এই বিক্রিয়ার ফলও যে কোন পায়নের ক্ষেত্রে সমান হবে। সাধারণ দেশে রৈখিক ও ঘূর্ণন গতির মত এক্ষেত্রেও আইসোটোপিক দেশে এই ঘূর্ণনের সমতা বজায় থাকে। ফলে অনুরূপ নিত্যতাও বজায় থাকে। তীব্র বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই সমতা ও নিত্যতা রক্ষিত হয়।

মৌলিক কণার ভিতর কে-মেসন ও হাইপেরনগুলি বিভিন্ন কণিকায় ভেঙে পড়বার জীবনকাল $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড। এ-রকম প্রত্যেকটি কণা ঐ একই সময়ে যে কণিকাগুলির জন্ম দেয়, তারা একই জন্মদাতা কণিকা থেকে সৃষ্ট হলেও ভিন্ন রূপ নেয়। যথা—

$$K^{\circ} \rightarrow \pi^{+} + \pi^{-}$$
$$\rightarrow \pi^{\circ} + \pi^{\circ}$$
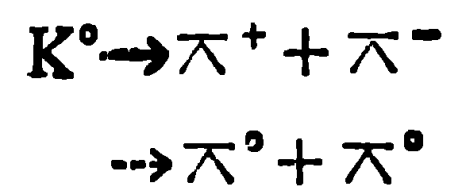
এখন $১০^{-১০}$ সেকেণ্ড তীব্র বিক্রিয়ার কাল থেকে প্রায় $১০^{১২}$ গুণ দীর্ঘতর। তাই এদের ক্ষয় বিটা-বিকিরণের (β-decay) মত ক্ষীণ বিক্রিয়া। এদের জন্ম তীব্র বিক্রিয়া থেকে অথচ ক্ষয় হলো ক্ষীণ বিক্রিয়া। তাই এদের অপরিচিত কণা আখ্যা দেওয়া

হয়। এই অপরিচয়ের মাত্রা S নিউক্লিয়ন বা পায়নের বেলায় 0 হবে। তীব্র বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে অপরিচয়ের মাত্রার নিত্যতা বজায় থাকে। কিন্তু ক্ষীণ বিক্রিয়ায় এই নিত্যতা বজায় থাকে না। হাইপেরনের ক্ষয় ও বিটা-বিকিরণ—এই দুই ক্ষীণ বিক্রিয়ার যোগাযোগ এখনও পাওয়া যায় নি বটে, তবে হাইপেরনের সৃষ্টি তীব্র বিক্রিয়ায় সাধারণ কণা (S=0) থেকে। কিন্তু এই সৃষ্টিতে একাধিক হাইপেরনের জন্ম হয়। এখন ধরা যাক, যদি দুটি হাইপেরন একযোগে জন্ম নেয়, তবে তাদের অপরিচয়ের মাত্রা +১ ও -১; অর্থাৎ তাদের মিলিত অপরিচয়ের মাত্রা 0 হবে। ফলে এই তীব্র বিক্রিয়ায় এই মাত্রার নিত্যতা বজায় থাকবে। অথচ এই দুটি কণিকার ক্ষয় হবে ক্ষীণ বিক্রিয়ায়। ফলে সে ক্ষেত্রে অপরিচয়ের মাত্রার নিত্যতা রক্ষিত হবে না।

ভরণ বৈপরীত্য (Conjugation) অথবা বিপরীত কণার সমতা তীব্র বিক্রিয়া ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রক্ষিত হয়। ফলে প্রোটন একই গতীয় অবস্থায় অ্যান্টিপ্রোটনে রূপান্তরিত হতে পারে—কিন্তু ক্ষীণ বিক্রিয়াজাত নিউট্রিনো একই গতীয় অবস্থার অ্যান্টিনিউট্রিনোতে রূপান্তরিত হতে পারে না।

ক্ষীণ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দর্পণ-সমতা (Mirror Symmetry) অথবা প্যারিটির (Parity) নিত্যতা রক্ষিত হয় না। প্যারিটি হলো কোন কণিকা বা কণিকাগোষ্ঠীর ওয়েভ ফাংশানের রূপ—এই সম্পর্কে পূর্বে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে ('জ্ঞান ও বিজ্ঞান'—অক্টোবর, ১৯৬১ দ্রষ্টব্য)। কোন বিক্রিয়ায় প্যারিটির নিত্যতা রক্ষিত হলে দর্পণ-প্রতিফলনে কণিকার বামাবর্ত ঘূর্ণন দক্ষিণাবর্ত ঘূর্ণনে রূপান্তরিত হবে। বিজ্ঞানী ইয়াং ও লী'র তাত্ত্বিক গবেষণা এবং ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ও উঘ্‌লার প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা যায় যে, একটি নির্দিষ্ট দিকের বিটা-নির্গমনে ইলেকট্রনগুলি দক্ষিণাবর্তে থাকে—দর্পণ-প্রতিফলনে এর রূপান্তর হয় না। ফলে ক্ষীণ বিক্রিয়ায় দর্পণ-প্রতিফলন সমতা নেই অথবা প্যারিটির নিত্যতা বজায় থাকে না। এখন দক্ষিণাবর্ত ইলেকট্রনের দর্পণ-প্রতিফলনে ইলেকট্রনকে যদি বিপরীত কণা পজিট্রনে রূপান্তরিত করা যায়, তবে প্যারিটির নিত্যতা রক্ষিত হবে।

বস্তু ও বিপরীত বস্তুর সঙ্গে প্যারিটির নিত্যতার এই সম্পর্কটুকু এখনও সঠিকভাবে জানা নেই। তীব্র ও ক্ষীণ বিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতির সমতার নিয়ম ও নিত্যতাবাদ একটি জটিল রূপ পরিগ্রহ করেছে—কণা ও বিপরীত কণার স্বরূপ নির্ণয়ের গবেষণায় হয়তো তার সমাধান হবে।

সময় বৈপরীত্য সমতা হলো—কোন বিক্রিয়া সময়ের বিপরীত দিকে একরূপ থাকবে, অর্থাৎ পরীক্ষাটি বিপরীতভাবেও চালিত হতে পারে। তীব্র বিক্রিয়া ও তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়ায় এই সমতা রক্ষিত হয়—পরে ক্ষীণ বিক্রিয়ায়ও এই সমতা বজায় থাকে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গেছে।

৩নং সারণীতে সমতা ও নিত্যতাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন বিক্রিয়ার স্বরূপ দেখানো হয়েছে। ক্ষীণ বিক্রিয়ার কয়েকটি ক্ষেত্রে সমতা ও নিত্যতা বজায় থাকে না। কেন থাকে না, সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। তাছাড়া এথেকে প্রায় $১০^{২৭}$ গুণ ক্ষীণতর মহাকর্ষ-শক্তির স্বরূপ বা এই শক্তিজাত ভরহীন গ্রেভিটন কণা সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণাই নেই। মৌলিক কণাগুলির ভর কেন বিভিন্ন, বিক্রিয়াগুলির শক্তির পার্থক্য কোথা থেকে আসে—এসব প্রশ্ন এখনও রহস্যাবৃত। মৌলিক কণা নব্যবিজ্ঞানকে এক অজানা রাজ্যের দ্বারে এনে উপস্থিত করেছে। সেই দ্বার উন্মুক্ত হলে হয়তো বিশ্বরহস্যের সমাধান সম্ভব হবে।

রণী ১

বেরিয়ন	ভরণ	ভর (মিলিয়ন ই. ভো)	ঘূর্ণন-সংখ্যা	আইসোটোপিক ঘূর্ণন-সংখ্যা	অপরিচয়ের মাত্রা	গড় জীবনকাল (সেকেণ্ডে)	জাত কণিকা	বিপরীত কণা
Ξ^- (জাই মাইনাস্)	$-e$	১৩১৯	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	-২	২×১০^{-১০}	$\pi^- + \Lambda$	$\bar{\Xi}^-$ (অ্যান্টিজাই প্লাস্)
Ξ^0 (জাই জিরো)	0	~ ১৩১১	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	-২	$\sim ২ \times ১০^{-১০}$	$\pi^0 + \Lambda$	$\bar{\Xi}^0$ (অ্যান্টিজাই জিরো)
Σ^- (সিগ্‌মা মাইনাস্)	$-e$	১১৯৬	$\frac{১}{২}$	১	-১	$১{\cdot}৬ \times ১০^{-১০}$	$\pi^- + n$	$\bar{\Sigma}^+$ (অ্যান্টিসিগ্‌মা প্লাস্)
Σ^0 (সিগ্‌মা জিরো)	0	১১৯২	$\frac{১}{২}$	১	-১	$\approx ১০^{-২০}$	$\gamma + \Lambda$	$\bar{\Sigma}^0$ (অ্যান্টিসিগ্‌মা জিরো)
Σ^+ (সিগ্‌মা প্লাস্)	$+e$	১১৯০	$\frac{১}{২}$	১	-১	$\approx ০{\cdot}৮ \times ১০^{-১০}$	$\pi^+ + n$ / $\pi^0 + p$	$\bar{\Sigma}^-$ (অ্যান্টিসিগ্‌মা মাইনাস্)
Λ (ল্যাম্‌ডা)	0	১১১৫	$\frac{১}{২}$	0	-১	২৫×১০^{-১০}	$\pi^- + p$ / $\pi^0 + n$	$\bar{\Lambda}$ (অ্যান্টিল্যাম্‌ডা)
n (নিউট্রন)	0	৯৪০	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	0	১×১০^{৩}	$e^- + \nu + p$	$\bar{n}$ (অ্যান্টিনিউট্রন)
p (প্রোটন)	$+e$	৯৩৮	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{২}$	0	স্থায়ী	—	$\bar{p}$ (অ্যান্টিপ্রোটন)
বোসন								
K^0 (কে জিরো)	0	৪৯৮	0	$\frac{১}{২}$	$+১$	১×১০^{-১০} / ৬×১০^{-৮}	$\pi^+ \pi^-$ / $\pi^0 + \pi^0$	$\bar{K}^0$ (অ্যান্টি কে জিরো)
K^+ (কে প্লাস্)	$+e$	৪৯৪	0	$\frac{১}{২}$	$+১$	$১{\cdot}২ \times ১০^{-৮}$	$\mu^+ + \nu$ / $\pi^+ + \pi^0$	K^- (কে মাইনাস্)
π^+ (পাই প্লাস্)	$+e$	১৪০	0	১	0	$২{\cdot}৬ \times ১০^{-৮}$	$\mu^+ \times \nu$	π^- (পাই মাইনাস্)
π^0 (পাই জিরো)	0	১৩৫	0	১	0	$< ১০^{-১৫}$	$\gamma + \gamma$	π^0
γ (ফোটন)	0	0	১	—	0	স্থায়ী	—	γ
লেপ্‌টন								
μ^- (মিউ মাইনাস্)	$-e$	১০৬	$\frac{১}{২}$	—	—	$২{\cdot}২৬ \times ১০^{-৬}$	$e^- + \nu + \bar{\nu}$	μ^+ (মিউ প্লাস্)
e^- (ইলেকট্রন)	$-e$	০·৫১১	$\frac{১}{২}$	—	—	স্থায়ী	—	e^+ (পজিট্রন)
ν (নিউট্রিনো)	0	0	$\frac{১}{২}$	—	—	স্থায়ী	—	$\bar{\nu}$ (অ্যান্টিনিউট্রিনো)

$e = ৪৮ \times ১০^{-১০}$ ইলেক্‌ট্রোষ্ট্যাটিক ইউনিট

মিলিয়ন ইলেক্‌ট্রন ভোল্ট $= ১.৬ \times ১০^{-৬}$ আর্গ

ঘূর্ণন-সংখ্যা = কৌণিক ভরবেগ $\times \frac{h}{2\pi}$; $\frac{h}{2\pi} = ১.০৫ \times ১০^{-২৭}$ আর্গ-সেকেণ্ড

কণা ও বিপরীত কণার ভর, ঘূর্ণন-সংখ্যা, জীবনকাল সমান, কিন্তু ভরণমাত্রা সমান ও বিপরীত চিহ্নসূচক।

তাদের অপরিচয়ের মাত্রা সমান ও বিপরীত চিহ্নসূচক।

সারণী ২

	আপেক্ষিক তীব্রতা
তীব্র বিক্রিয়া (কেন্দ্রীনজনিত)	১
তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়া	$১০^{-২}$
ক্ষীণ বিক্রিয়া (কণিকার ক্ষয়জনিত)	$১০^{-১৩}$
মহাকর্ষ বিক্রিয়া	$১০^{-৩৮}$

সারণী ৩

	তীব্র বিক্রিয়া	তড়িৎ-চুম্বকীয় বিক্রিয়া	ক্ষীণ বিক্রিয়া
রৈখিক গতির সমতা	আছে	আছে	আছে
ঘূর্ণন গতির সমতা	”	”	”
ভরণ নিত্যতা	”	”	”
বেরিয়ন নিত্যতা	”	”	”
লেপ্‌টন নিত্যতা	—	”	”
আইসোটোপিক সমতা	আছে	নেই	নেই
দর্পণ সমতা	আছে	আছে	নেই
কণা-বিপরীত কণা সমতা	”	”	”
সময় বৈপরীত্য সমতা	”	”	”
অপরিচয়ের নিত্যতা	”	”	নেই

সঞ্চয়ন

পোলিও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পৃথিবীর কোন দেশই পোলিওমায়েলাইটিসের আক্রমণ হইতে মুক্ত নহে। এই ভয়ঙ্কর রোগ শিশুদের পক্ষাঘাতে আক্রান্ত করে দীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বৈজ্ঞানিকগণ লাঙ্গুলহীন বানরদের (উল্লুক) মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত করিয়া তাহাদের মৃত্যুর পর এই রোগের বীজাণুকে উহাদের মস্তিষ্ক হইতে পৃথক করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অতঃপর তাঁহারা দেহের মধ্যে উহার বিরুদ্ধ উপাদানগুলি সৃষ্টি করিবার (অর্থাৎ যাহাতে মানুষ পোলিওর আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকে) উপায় খুঁজিতে থাকেন। আমেরিকান বিজ্ঞানী জোনাস সল্‌ক্ প্রথম যে টিকার কথা বলেন, তাহা হইল এই রোগের মৃত বীজাণু।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগ বিরল ছিল। যুদ্ধের পর ইহা সংক্রামক ব্যাধি রূপে সর্বত্র, বিশেষ করিয়া বাল্টিক অঞ্চলে নোভোসিবিব্স্ক এবং আলমা আতায় ছড়াইয়া পড়ে।

অচিরে মস্কোর ইনস্টিটিউটে সল্‌কের পদ্ধতিতে টিকা তৈয়ারীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহার অনেকগুলি ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। দ্বিতীয়তঃ ইহার কার্যকারিতা যথোপযুক্ত নহে এবং সর্বশেষ—এই ইনজেকশন তিন তিনবার দিতে হয়। তাই নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন হইল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশন্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সভ্য আলবার্ট সাইবিন পোলিও-মায়েলাইটিসের বীজাণু সংগ্রহ করিয়া তাহাকে এমন ভাবে পরিবর্তিত ও শক্তিহীন করেন, যাহার ফলে উহার ক্ষতিকারক শক্তি অবলুপ্ত হয়, অথচ উক্ত রোগ হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ও ইহার মধ্যে থাকে। সাইবিনের এই টিকা সস্তা এবং সুবিধাজনক হইলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহা সাফল্য লাভ করিল না। ইহাতে ব্যবসায়িক স্বার্থেরও খানিকটা ভূমিকা ছিল। আমেরিকার ঔষধ ব্যবসায়ীরা বিপুল পরিমাণে সল্‌কের টিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহার কিয়দংশ তাঁহাদের হাতে মজুদ ছিল। আর এক-একটির টিকার দামও ছিল প্রায় পাঁচ-ছয় ডলার।

সাইবিন পোলিওমায়েলাইটিসের এই বীজাণু-গুলিকে উপহার হিসাবে সোভিয়েট দেশে লইয়া আসেন। জীবন্ত এই টিকার ঔষধটির পরীক্ষার ব্যবস্থা হয় অধ্যাপক মিখাইল চুমাকভের গবেষণাগারে। অধ্যাপক চুমাকভ্ নিজের উপরেই প্রথম এই বীজাণু পরীক্ষা করেন। পূর্ণ নিরাপত্তা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বড় দাগের একটি ইনজেকশন লইলেন। সল্‌কের টিকার মত এই টিকায় মৃত বীজাণু নাই। ইহাতে যে বীজাণু আছে, তাহা প্রথমে রোগ সামান্য সংক্রমণ করিয়া পরে দেহকে সম্পূর্ণভাবে উহা হইতে নিরাপদ করিয়া দেয়।

উল্লুকের অণ্ডকোষ হইতে এই টিকা প্রস্তুত করা হয়। পেপ্‌সিনের সাহায্যে প্রথমে যান্ত্রিক ব্যবস্থায়, পরে রাসায়নিক পদ্ধতিতে উহা বিচূর্ণিত করিয়া ফেলা হয়। অতঃপর পোলিওমায়েলাইটিসের বীজাণু তৈয়ার করিবার কাজে উহা ব্যবহৃত হয়। একটি অ্যাম্পিউলেই ৩০০ ইনজেকশন থাকে এবং একটি উল্লুক এক লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করে।

পোলিওমায়েলাইটিসের জীবন্ত টিকার উৎপাদন

এবং ব্যাপক ব্যবহারে সোভিয়েট ইউনিয়ন বর্তমানে আমেরিকা অপেক্ষা অনেক আগাইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট চিকিৎসকগণই প্রথম ইহার উপযোগিতা উপলব্ধি করেন এবং সাহসের সঙ্গে ব্যবহার করিতে থাকেন।

জীবন্ত এই টিকা ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছে। সাইবিনের পক্ষে আছেন তাঁহার বিশ্বস্ত সমর্থকেরা। আবার তাঁহার বিপক্ষেও আছেন একদল দৃঢ়চেতা বিরোধী। অনেকে বললেন যে, অপরীক্ষিত এই টিকা ব্যবহারের সময় এখনও আসে নাই এবং প্রচ্ছন্নশক্তি বীজাণু হঠাৎ শক্তি ফিরিয়া পাইলে তাহা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক হইয়া সংক্রামক ব্যাধির সৃষ্টি করিতে পারে। অধ্যাপক চুমাকভ্ এই আশঙ্কার কথা অস্বীকার করেন। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা সাইবিনের জীবন্ত টিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া ইহা যে শিশুদের পক্ষে নির্দোষ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। অ্যাষ্টোনিয়ায় এই রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে অধ্যাপক চুমাকভ্ সেখানে গিয়া ব্যাপকভাবে এই টিকা দিতে স্থুরু করেন। রোগীর সংখ্যা বহুগুণ কমিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে এই টিকার সমর্থক দলে আরও অনেকে যোগদান করেন। বসন্তের মত পোলিওমায়েলাইটিসের বিরুদ্ধে টিকা নেওয়া সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

একটি লজেঞ্জুসে দুই ফোঁটা টিকা পুরিয়া এখানে যে ভাবে উহা ব্যবহার করা হয়, তাহা বেশ সুবিধাজনক ইনজেকশন লওয়া বেশ যন্ত্রণাদায়ক। শিশুরা চামচ দিয়া ঔষধ খাইতে চায় না। তাই ইহাকে একটি ছোট লজেঞ্জুসে ভরিয়া ব্যবহার করা হয়। এই লজেঞ্জুসটির আয়তন মাত্র আধ সেন্টিমিটার এবং ওজন এক গ্রাম মাত্র।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তুত এই জীবন্ত টিকা অন্যান্য দেশে চমৎকার কাজ করিতেছে। পোলিওমায়েলাইটিস ইনষ্টিটিউট ইহাকে সিংহল, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, কোরিয়া, চীন, জাপান এবং অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর নিকট পৌঁছাইয়া দেয়। যেখানেই ইহা ব্যবহৃত হয়, সেখানেই রোগের আক্রমণ হ্রাস পায়।

গ্রীষ্ম ও শরৎকালে সাধারণতঃ এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিত। এখন ব্যাপকভাবে এই টিকা ব্যবহার করিবার ফলে এই রোগের আক্রমণের হার অভাবনীয়রূপে কমিয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই টিকা লইয়াছে, এমন শিশুর সংখ্যা প্রতি বৎসরে ৭ কোটিতে পৌঁছিয়াছে। ছয় মাস বয়সের শিশু হইতে বিনামূল্যে এই টিকা দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে এই রোগের হার নয় গুণ কমিয়া গিয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে এই রোগ এখন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ইহার আক্রমণও খুব মৃদু হয় এবং ইহার ফলে পক্ষাঘাত দেখা দেয় না।

খোস-চুলকানি রোগ

ডাঃ এন. আই. পদভোরচান্নায়া এই সম্পর্কে লিখেছেন—নয়া দিল্লীর কলাবতীশরণ শিশু হাসপাতালে এসে জনৈকা মাতা জানালেন যে, তাঁর ৯ মাসের শিশুটির চর্মরোগ হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল—শিশুর গালে, থুৎনিতে এবং বিশেষ করে হাতের আঙ্গুল ও তালুতে এবং তলপেটে সর্বত্র অজস্র ফুস্‌কুড়ি উঠেছে। ত্বকে চুলকানির আঁচড় ও সামান্য জমাট রক্ত রয়েছে।

শিশুর মাকে তাঁর বড় শিশু দুটিকে নিয়ে আসতে বলা হলো। দেখা গেল, ঐ শিশু দুটিরও

ঐ একই রকম অবস্থা। মাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁরও কোন চর্মরোগ আছে কিনা। দেখা গেল তাঁর বুকে ও তলপেটে শিশুদের মতই ফুসকুড়ি রয়েছে।

শিশুদের পরীক্ষা করবার সময় লক্ষ্য করলাম, তারা খুব কাঁদছে আর সমানে গা চুলকাচ্ছে। মা জানালেন, রাতেই শিশুরা কষ্ট পায় বেশী। রাতে তাদের ঘুম হয় না, সর্বদা গা চুলকায়।

সব কিছু শুনে এবং চার জন রোগীকে পরীক্ষা করে বোঝা কঠিন হল না যে, কি ধরণের এই চর্মরোগ। দেখা গেল, এই চর্মরোগ এই পরিবারের সকলেরই আছে।

খোস-চুলকানি সকল বয়সের শিশুদেরই এক প্রকার চর্মরোগ। এক প্রকার পরাশ্রয়ী কীটাণু—খোস-কীটাণু থেকেই এই রোগের উৎপত্তি। আশে-পাশে যদি স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ না থাকে, বিশেস করে যদি বহু লোক গাদাগাদি করে বাস করে, তা-হলেই এই রোগ ছড়িয়ে যায়। রোগীর বিছানার চাদর ও কাপড়-চোপড় থেকে রোগ ছড়াতে পারে। আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ ছড়িয়ে পড়ে রোগীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে।

স্ত্রী-কীটাণু ত্বকের উপর আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ত্বকে সুড়ঙ্গ করে ফেলে। ফলে চুলকানি সুরু হয় এবং ফুস্কুড়ি দেখা দেয়। চুলকানি বাড়তে থাকে সন্ধ্যায়, বিশেস করে রাতে, যখন রোগী বিছানায় শুয়ে পড়ে এবং রোগীর শরীর গরম হয়ে যায়। এই সময়ে কীটাণুগুলি খুব সক্রিয় হয়ে ওঠে। কীটাণুগুলি ত্বকের আশ্রয়স্থলের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং ডিম পাড়ে। তারপর আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নতুন আশ্রয়স্থল সৃষ্টি করে। এই কার্যকলাপের ফলে ক্ষুদ্র রন্ধ্র দেখা দেয়, অতি ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি উঠে লম্বা আঁচড়ের মত দেখা দেয় এবং পরিষ্কার খোসের মত হয়। খোসের এই সুড়ঙ্গ লম্বালম্বি অথবা আঁকাবাঁকা হয়ে থাকে। অতি ক্ষুদ্র, কয়েক মিলিমিটার মাত্র লম্বা এবং চামড়ায় আঁচড়ের মত ময়লা ধূসর রঙের হয়। খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলে ত্বকের সুড়ঙ্গের মুখে কীটাণু দেখা যাবে। এদের চেহারা সাদা ডিম্বাকৃতি, তাতে থাকে একটা ক্ষুদ্র কালো বিন্দুর মত।

খোস-চুলকানির ফুস্কুড়ি সাধারণতঃ আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে ফুস্কুড়ি ওঠে হাত ও পায়ের তালুতে। তাছাড়া কনুই, পাছা, বুক, তলপেট, হাঁটু ও গোড়ালিতে খোস দেখা দিতে পারে। সাধারণতঃ মুখে খোস দেখা দেয় না। একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন—মেয়েদের স্তনে খোস হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে মাতার স্তন্যপায়ী শিশুরও এই ব্যাধি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু শিশুর মুখেও খোস দেখা দেয়। আমাদের রোগী সেই শিশুটির ক্ষেত্রে আমরা তাই দেখেছি। দুঃখের বিষয় যে, খোস-চুলকানির উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া হয় না। যথাসময়ে চিকিৎসা না করালে খোস-চুলকানি পরিবারের অন্যান্য লোকের ভিতর ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগ বেড়ে গেলে সারানো কঠিন হয়।

সময় থাকতে খোস-চুলকানির চিকিৎসা করানো উচিত এবং যতদিন সেরে না যায়, ততদিন চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া উচিত। একটা কীটাণুও যদি থাকে তাহলে সেটা আরও কীটাণুর জন্ম দেবে এবং আবার চুলকানি ছড়িয়ে পড়বে। ধৈর্য ধরে দীর্ঘকাল চিকিৎসা করালেই খোস-চুলকানি সম্পূর্ণ সেরে যায়।

খোস-পাঁচড়া ও চুলকানির চিকিৎসার নানা রকম পদ্ধতি আছে। সাধারণতঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সালফার মলম দেওয়া হয়। তাতে থাকে বেনজিল-বেনজোয়েড এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহ (দেমিয়ানোভিচ পদ্ধতি) সোডিয়াম হাইপোসাল-ফাইট। ফুস্কুড়ি দেখা দিলে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টো-মাইসিন জাতীয় অ্যান্টিবায়োটিকস্ প্রয়োগ করা হয়।

ভাল ফল পেতে হলে রোগীকে মলম বা ওষুধ প্রয়োগের পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

একেবারে কাঁধ থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ওষুধ লাগিয়ে ঘষে ঘষে শুকিয়ে ফেলতে হবে—বিশেষ করে লাগাতে হবে চুলকানির স্থানে। এই সময় রোগীর স্নান করা উচিত নয়। চিকিৎসা শেষ হবার পরেই সাবান দিয়ে স্নান করে কাপড়-চোপড় পরিবর্তন করা যেতে পারে। ত্বক-প্রদাহ যাতে না হয়, সে জন্যে প্রতি বার মলম লাগাবার পর ত্বকে, বিশেষ করে সন্ধিস্থলের ভিতরে ও বাইরে পাউডার লাগানো প্রয়োজন। শিশুদের ট্যালকম পাউডারে শ্বেতসার মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে।

শিশু এবং আর যাদের খোস হয়েছে, শুধু তাদের চিকিৎসা করালেই হবে না, এতে সংক্রমণের বিপদ থেকে যাবে। পরিবারে যাদেরই চুলকানি আছে বলে সন্দেহ হয়, তাদেরই চিকিৎসা করাতে হবে।

পরিবারে যাদেরই খোস-চুলকানি আছে বলে মনে হবে কিংবা শিশুরা যেখানে মিলিত হয়—যেমন স্কুলে, সেখানেও কারও চুলকানি থাকলে তাদের সবাইকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করানো উচিত। আক্রান্ত সকল ব্যক্তিকে একই সঙ্গে চিকিৎসা করানো উচিত। রোগীর কাপড়-চোপড় এবং বিছানার চাদর নির্বীজন করা প্রয়োজন। শিশুদের বিদ্যালয়ে খোস-পাঁচড়ায় আক্রান্ত শিশুদের আলাদা করে রাখা উচিত।

সম্পূর্ণ রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের স্কুল, লালনাগার, কিণ্ডার-গার্টেন খেলার মাঠে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

খোস-চুলকানি যদিও অঙ্গবিশেষের চর্মরোগ, তবু রোগ নিরাময়ের জন্যে গোটা দেহের পুষ্টি-সাধনও বিশেষ প্রয়োজন। তাই পুষ্টিকর খাদ্য এবং যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন এবং টনিক খাওয়া উচিত।

যে কোন প্রকার চর্মরোগ দেখা দিলেই ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে অন্য শিশুরাও রোগ সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচতে পারে।

মহাশূন্যের ভারশূন্যতার সঙ্গে নানা জটিল সমস্যা জড়িত

মহাকাশে দীর্ঘ পরিক্রমণকালে বহুক্ষণ স্থায়ী ভারশূন্য অবস্থা মহাকাশচারীদের দেহমনের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, বিজ্ঞানীদের কাছে সে প্রশ্ন এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে।

কমাণ্ডার ওয়াল্টার এম. শিরা ছয় বার পৃথিবী পরিক্রমাকালে নয় ঘণ্টা ভারশূন্য অবস্থায় ছিলেন। পরিক্রমণকালে তাঁর দেহ ও মনের উপর কোনও খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘকাল ভারশূন্য অবস্থায় থাকবার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের সংশয় এখনও কাটে নি।

মহাকাশচারী শিরার শূন্য-পরিক্রমার দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ নয় ঘণ্টাকাল ভারশূন্য অবস্থা সহ্য করতে সক্ষম। কিন্তু ভারশূন্যতা বা মাধ্যাকর্ষণশক্তির অনুপস্থিতিজনিত সমস্যা সফলভাবে নির্ধারণ করতে হলে আরও দীর্ঘকাল ধরে মহাকাশ পরিভ্রমণের প্রয়োজন। যদিও রাশিয়ান মহাকাশযাত্রীদের তিনদিন ও চারদিন-ব্যাপী ভূ-পরিক্রমা কালে ভারশূন্য অবস্থায় অবস্থানের সময় নিরাপদ ও দীর্ঘতর হয়েছিল, তবুও মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারেন নি। সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা তাঁদের মহাকাশযাত্রীদের মহাকাশ পরিক্রমাকালে দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কিত কোনও রিপোর্ট দেন নি।

মহাকাশ ভ্রমণকালে ভারশূন্য অবস্থায় থাকবার ফলে দৈহিক বিপর্যয়, মানসিক অসামঞ্জস্য, শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া আকস্মিকভাবে থেমে যাওয়াও আদৌ অসম্ভব নয়।

যে সব মার্কিন মহাকাশচারী কক্ষপথে প্রবেশের পূর্বে পাঁচ মিনিটকাল থেকে ন'ঘন্টাকাল পর্যন্ত মহাকাশে অবস্থান করে ভারশূন্য অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, বিজ্ঞানীরা অচিরেই এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। যেটুকু সময় তাঁরা ভারশূন্যতা উপলব্ধি করেছেন—তাতে ভারশূন্য অবস্থা তাঁদের কাছে একটা সুখকর অনুভূতি বলেই বোধ হয়েছে। লেফটেন্যান্ট এম. স্কট কার্পেন্টার বলেছেন—ভারশূন্য অবস্থা মহাকাশচারীদের স্নায়ুতে নেশা ধরিয়ে দিতে পারে।

তবে, কোনও মহাকাশচারীই ভারশূন্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত উত্তর দেবার মত দীর্ঘকাল মহাশূন্যে অবস্থান করেন নি। মহাকাশ-বৈমানিক জন এইচ গ্লেন বলেন, তাঁর ভারশূন্য অবস্থায় সাড়ে চার ঘন্টাব্যাপী মহাকাশ-ভ্রমণ অতীব সুখকর হয়েছিল। কিন্তু মহাকাশে অবস্থানের কাল আরও দীর্ঘ হলে মহাকাশ-ভ্রমণ সমভাবেই নিরাপদ ও সুখকর হবে কি না—সেটা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।

লেফটেন্যান্ট কর্ণেল গ্লেন বলেন, দীর্ঘকাল ধরে ভারশূন্য অবস্থা সহ্য করা এত কষ্টকর হয়ে উঠতে পারে যে, মহাকাশযানের মধ্যে কৃত্রিম উপায়ে কিছুটা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। মহাকাশযানের মধ্যে সব কিছুকেই যাতে বেঁধে রাখতে না হয়, সেই জন্যেই এই ব্যবস্থার প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভারশূন্য অবস্থায় বেঁধে না রাখা জিনিসগুলি মহাকাশযানের মধ্যে ইতস্ততঃ ভেসে বেড়ায়। বৈমানিক কার্পেন্টার তাঁর খাদ্যগ্রহণের সময় এই অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। মহাকাশ ভ্রমণের জন্যে তাঁকে যে সব শক্ত খাবার দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি খাবার চেষ্টা করতেই ভাসতে সুরু করেছিল।

তখন থেকেই বিজ্ঞানীরা ঠিক করেন, শুকনো খাবারগুলিকে বেঁধে রাখতে হবে—যাতে ভাসতে ভাসতে সেগুলি বায়ুনলের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বৈমানিকের শ্বাসরোধ করতে না পারে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বৈমানিকদের হজমঘটিত সমস্যা এখনও কিছুটা অমীমাংসিত রয়ে গেছে। একটি সমস্যা হচ্ছে, অন্ত্রের মধ্যে গ্যাস সৃষ্টি হলে মহাকাশযাত্রীদের শরীরে কি প্রতিক্রিয়া ঘটবে? তাঁরা বলেন, মহাকাশযাত্রীদের অন্ত্রের মধ্যে গ্যাস সঞ্চিত হলে দুঃসহ যন্ত্রণার সৃষ্টি হতে পারে। বর্তমানে অপেক্ষাকৃত স্বল্পকাল স্থায়ী ভারশূন্যতার অভিজ্ঞতা থেকে এই সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

মহাশূন্যের প্রায় বায়ুহীন অবস্থার প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত থাকবার জন্যে বৈমানিকেরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশেষভাবে নির্মিত পোষাক—প্রেসার স্যুট পরে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত গ্যাসের সমস্যা তত বেশী উদ্বেগজনক হবে না। তবে গ্যাসের সমস্যা নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানীরা একথা স্বীকার করেছেন যে, ভবিষ্যতে আরও দীর্ঘস্থায়ী ভ্রমণের সময় এই সমস্যা তীব্রতর হতে পারে। বিশেষ করে বায়ুপূর্ণ ক্যাপসুলে চড়ে মহাকাশ পাড়ি দেবার সময় ক্যাপসুলের গায়ে কোনও ছিদ্র দেখা দিলে মহাকাশযাত্রীর অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হয়ে উঠবে।

ভারশূন্য অবস্থায় ওড়বার সময় কোনও মার্কিন মহাকাশচারীই শারীরিক বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করেন নি। এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে। রাশিয়ানরা বলেছেন—মেজর ঘেরম্যান টিটভ ২৪ ঘন্টাব্যাপী মহাকাশ-ভ্রমণকালে প্রথম ছ-ঘন্টা শেষ হবার পরেই বমি করেন ও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

নাসার জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার গবেষণাগারে মহাকাশচারীর দৈহিক বিপর্যয়ের প্রশ্নটি সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা মহাকাশযাত্রা-সম্ভূত অসুস্থতা নিবারণের জন্যে ব্যাপকভাবে বৈমানিকদের ভেস্টিবুলার যন্ত্রটির

কাজকর্ম পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। মহাকাশ-যানের গতিবেগ, গতিবৃদ্ধি, গতিহ্রাস ও ভার-শূন্যতার ফলে মহাকাশযাত্রীর দেহে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং মহাকাশচারী এই পরিবর্তিত অবস্থা কতদূর সহ্য করতে সক্ষম হবেন, সে সম্পর্কে তাঁরা গবেষণা করছেন।

বৈমানিকদের মধ্য থেকে দৃঢ় স্নায়বিক শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি নির্বাচিত করলে তাঁদের মনস্তত্ত্ব ঘটিত বেশীরভাগ সমস্যাই আয়ত্তে আনা যেতে পারে। কিন্তু শারীরতাত্ত্বিক সমস্যাগুলি কিছুটা ভিন্ন ধরণের। সাধারণভাবে একথা স্বীকৃত যে, বহুক্ষণ ভারশূন্য অবস্থায় থাকলে পেশীগুলি শিথিল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একমাত্র প্রতিরোধমূলক ব্যায়াম বা পেশী সঞ্চালনের দ্বারাই এই শক্তিক্ষয় রোধ করা সম্ভব।

ভারশূন্য অবস্থা রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়ার উপর যে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, বিজ্ঞানীদের কাছে সেটা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মনে হয়, বিবর্তনের ফলে মানুষের দেহে এমন একটা রক্তসঞ্চলন-ব্যবস্থা গঠিত হয়, যেটা মাধ্যাকর্ষণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভারশূন্য অবস্থায় মানুষ কতকাল বাঁচতে পারে? বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভারশূন্যতার ফলে শরীরে সঞ্চালিত রক্তপ্রবাহ শিরা-উপশিরার শেষ প্রান্তে গিয়ে জমে যাবে এবং খুব কম পরিমাণ রক্তই হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসবে। এর ফলে হৃৎপিণ্ডের অবিচ্ছিন্ন কর্মপ্রবাহ চালু রাখা অসম্ভব হবে, রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া থেমে যাবে এবং মহাকাশ-যাত্রীর মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

মহাকাশে ভ্রমণকালে দৈহিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার ফলে একটা পরিমিত ধরণের পরিবর্তন ঘটেছে। মাধ্যাকর্ষণমুক্ত এলাকায় প্রবেশ করবার পরেই মহাকাশচারীর নাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসে। আবার পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় তাঁর নাড়ীর গতি স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

নাড়ীর গতি মন্থর হয়ে আসবার ব্যাপারটা মহাকাশচারীরা টের পান নি। তবে নাড়ীর অবস্থার যে ক্রমশঃই অবনতি ঘটবে, এমনও নয়। এ-পর্যন্ত নাড়ীর গতি কখনই এমন অবস্থায় পৌঁছায়নি, যাতে চিকিৎসকেরা সেটাকে সঙ্কট জনক বলে রায় দিতে পারেন। এমন কি, কোনও কোনও বিজ্ঞানী এই অবস্থাকে শুভ লক্ষণ বলেছেন। তাঁদের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যে ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে, এটা তারই প্রমাণ।

আবার কেউ কেউ বলেন, এটা একটা ভাবী অমঙ্গলের লক্ষণ। তাঁরা বলেন, এটা হয়তো মহাকাশ-ভ্রমণের স্থিতিকাল একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবার পূর্ব লক্ষণ। নাড়ীর গতি এই রকম মন্থর হয়ে এলে রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া হয়তো সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। কোনও পক্ষই নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন না যে, তাঁদের প্রতিপক্ষ ভ্রান্ত।

মহাকাশে ভ্রমণকালে রক্তসঞ্চলনের ব্যাপারে আর একটি গুরুতর সঙ্কট দেখা দিতে পারে। ভারশূন্য অবস্থায় থাকবার কালে পেশীর মত রক্ত-প্রবাহের পথগুলিও শিথিল হয়ে পড়বে। বিজ্ঞানীরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, ব্যায়ামের সাহায্যে এই শৈথিল্য দূর করা সম্ভব। পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করে রক্তপ্রবাহের পথকে শৈথিল্যমুক্ত করা যাবে বলে চিকিৎসকেরাও যুক্তি দেখিয়েছেন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ রাইট প্যাটারসন বিমান ঘাঁটির এরোস্পেস মেডিক্যাল লেবরেটরির ক্যাপ্টেন ডুয়েন ই. গ্রেভ্‌লিন এই অনুমানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। পরীক্ষাধীন ব্যক্তিকে জলে ডুবিয়ে রাখবার সময় তাঁরা দেখেছেন যে, ব্যায়ামের দ্বারা পেশীর কার্যকলাপের উন্নতি ঘটানো সম্ভব হলেও রক্তসঞ্চলন ব্যবস্থার বিপর্যয় রোধ করা যায় না।

ক্যাপ্টেন গ্রেভ্‌লিন অবশ্য রক্তসঞ্চলন-ব্যবস্থা

বজায় রাখবার একটা উপায় বের করেছেন। তাঁর মতে, দীর্ঘকালব্যাপী মহাকাশ-ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই উপায় কার্যকরী করা সম্ভব। বায়ুর চাপের দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রাদির সাহায্যে এটি রক্তসঞ্চালনের একটি প্রক্রিয়া, অনেকটা রক্তের চাপ মাপবার জন্যে ব্যবহৃত কাফের মত।

রক্তসঞ্চলন-ক্রিয়া সহ মানবদেহের পরাবর্তগুলি কিছুকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকলে ঐ সকল যন্ত্রের কার্যক্ষমতার অবনতি ঘটে। একথা সর্বজনবিদিত যে, রক্তসঞ্চলনের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রতিক্রিয়া নিবারিত করতে হলে পায়ের পেশীকে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চালিত করতে হয়। দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী হয়ে থাকা অথবা কর্মহীনতার পর আকস্মিক নড়াচড়া করলে (যেমন, হঠাৎ উঠে বসা বা দাঁড়ানো) দৈহিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। বিশ্রামকারী দেহযন্ত্র তার সকল পরাবর্তকে ঢিলে করে দেয়—আকস্মিক গতির জন্যে প্রস্তুত থাকে না সে। এর ফলেই বিপর্যয় ঘটে। ভারশূন্য পরিবেশেও শরীরের উপর অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। পরাবর্তসমূহ শিথিল থাকবার কালে পৃথিবীর আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের মুহূর্তে দেহযন্ত্রের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। হঠাৎ উঠে বসবার তুলনায় এই আলোড়ন এত প্রবল ও প্রক্ষিপ্ত হয় যে, মহাকাশচারীর দেহের উপর এর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দেখা দিতে পারে।

তিন হাজার বছরের প্রাচীন নিদর্শন

সম্প্রতি মিশরের হুবিয়ান মরুভূমি অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে গিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা যেমনই চিত্তাকর্ষক, ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকেও তেমনই অতুলনীয়।

এই অধ্যাপকের নাম কিথ সীল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে অধ্যাপক সীল শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের কয়েক জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে গিয়েছিলেন হুবিয়ান মরুভূমি অঞ্চলে।

মরু প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা এমন এক সমাধির কাছে এসে দাঁড়ালেন, যার আবিষ্কারের সঙ্গে ৪০ বছর পূর্বেকার রাজা টুটানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের তুলনাই শুধু চলতে পারে। তাঁদের সামনে তখন রয়েছে তিন হাজার বছরের প্রাচীন এক অনুদ্ঘাটিত রহস্যময় জগৎ।

এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অধ্যাপক সীলের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা বর্ণনা করে তিনি ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটকে লিখেছেন: সমাধির মাটি খুঁড়ে আরও খানিকটা উত্তরে গিয়ে আমরা একই সময়ের আরও কতকগুলি জিনিষ আবিষ্কার করলাম। সেগুলি অবশ্য সবই ছোটখাট রকমের। এরপর আমরা চতুষ্কোণ একটি সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলাম। অন্যান্য সমাধিক্ষেত্রের মত এখানেও পর পর সাত-আট স্তর সমাধি ছিল। পথ পরিষ্কার করে এবং কাঁচা ইটের দেয়াল ভেঙ্গে আমরা পশ্চিম দিকের প্রকোষ্ঠে গিয়ে প্রকাণ্ড বড় একটি মৃৎপাত্র দেখতে পেলাম। পাত্রটির কোথাও ভাঙ্গে নি। সেখানে বিস্ময়কর আরও অনেক মৃৎপাত্র ছিল।

মিঃ সীল সেখানে যে সব দ্রব্যাদি পেয়েছেন, তার মধ্যে ছিল তামা বা ব্রোঞ্জের পাত্র, তামার তৈরী ছোরা, তামার কলসী এবং গামলা। বাল্তি জাতীয় একটি পাত্রও পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরী আর্শী। আর্শীর হাতলটি এমনভাবে তৈরী, মনে হলো যেন একটি নগ্ন রমণী হেলান দিয়ে রয়েছে।

অধ্যাপক সীল বলেছেন: পরদিন আমরা ঐ সমাধিরই পূর্বদিকের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে

একই ধরণের আরও তিনটি তামার গামলা আবিষ্কার করি। কালো গ্র্যানিট পাথরের ছোট্ট একটি জার (সম্ভবতঃ মলম রাখবার জন্যে ব্যবহার করা হতো) সেখানে পাওয়া যায়।

এই প্রকোষ্ঠে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে আমরা এমন একটি বস্তু আবিষ্কার করি, যার মূল্য ঐতিহাসিক দিক থেকে অপরিসীম। এই কক্ষে একটি কফিন পাওয়া যায়, যার উপরে নাম খোদাই করা ছিল। সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন কোন গৃহকর্ত্রী—নাম সেনসেনবু। কিন্তু কফিনের উপরে লেখা দেখে মনে হয়, তিনি ইতিবু অথবা তাবি নামেও পরিচিতা ছিলেন। আমাদের ধারণা, প্রথমে ইনি তাবি নামে পরিচিতা ছিলেন এবং কোন লুবিয়ানকে বিয়ে করবার পর সেনসেনবু নামে পরিচিতা হয়েছিলেন।

অধ্যাপক সীল যে সব বস্তুর কথা উল্লেখ করেছেন, খৃষ্টের জন্মের ৫৭০ থেকে ১০৮৫ বছর পূর্বে ঐগুলি তৈরী হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। রাজা টুটানখামেনও ঐ সময়ই রাজত্ব করেছেন। অনেকের অনুমান, তিনি খৃষ্টের জন্মের ১৩৫০ বছর পূর্বে মারা যান।

মিশরে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনায় মিঃ সীল প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে নিযুক্ত আছেন। আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই আসোয়ান বাঁধের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হবে এবং বিরাট এক এলাকা চিরকালের মত জলমগ্ন হবার আগে এখানকার প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি সংগ্রহের জন্যে যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলেছে, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ও তাতে সাহায্য করছে।

মিঃ সীল মিশরের ভাষা ও প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ১৯৩৬ সাল থেকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

উল্কা-পর্যবেক্ষণে আধুনিক পদ্ধতি

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী

(১)

অন্ধকার মেঘশূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই, আলোক-কণার মত কি একটা হঠাৎ নেমে আসতে আসতে হারিয়ে গেল—ঠিক যেন একটা তারা খসে পড়লো। এরই নাম উল্কা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলবেন, তা নয়—তারা খসে পড়তে পারে না; কেন না, তারা বলতে আমরা যা জানি, সেগুলি হচ্ছে সূর্যের মত এক একটা বিশাল অগ্নি গোলক। উল্কা আসলে মহাশূন্যে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুপিণ্ড, যা প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসবার সময় (আপেক্ষিক গতি ১০ থেকে ৭০ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণে হঠাৎ জ্বলে ওঠে। সাধারণতঃ সমুদ্রপৃষ্ঠের ১২ থেকে ৮০ কিলোমিটারের মধ্যে এলেই এগুলি ওঠে। অপেক্ষাকৃত বড় আকারের উল্কা অবশ্য আরও নীচে নেমে আসতে পারে। এরা ঘন বায়ুস্তরে এসে ক্রমাগত ঘনীভবন (Compression) ও তনুভবন (Rarefaction) সৃষ্টি করলে শব্দ শোনা যায়। কখনও কখনও উল্কাপাতের পরেও আকাশে ঐ সব এঁকেবেঁকে জমতে থাকে—আমাদের পূর্বপুরুষেরা এগুলিকেই বলতেন—আগুনের সাপ (Fire Snakes)।

আকার খুব বড় এবং খুব ছোটও হয়ে থাকে। এরা মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি এদের ভিতর দিয়েই যাতায়াত

করে। সুতরাং এদের সম্বন্ধে আমরা যে সব তথ্যাদি জানতে পারি, তার সাহায্যে মহাশূন্য ও মহাশূন্যে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া সৌরজগতের ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তো খুব ভাল ভাবেই জানা যায়। বর্তমানে, বিশেষ করে এই রকেটের যুগে পৃথিবী থেকে অনেক উপরের এই সব পদার্থগুলিকে জানবার জন্যে দেশে-বিদেশে নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

প্রাচীনকালে উল্কাপাত নিয়ে অনেক অদ্ভুত গল্প প্রচলিত ছিল। গ্রীকরা বলতেন, সূর্যদেব হেলিয়স-এর ছেলে পেইথন স্বর্গ থেকে ঘোড়া চুরি করে আকাশপথে বড় বড় পাহাড়ের আকারে পৃথিবীতে এসে পড়েন এবং এটাই হচ্ছে উল্কা-পাতের কারণ। উত্তর আমেরিকা, আরব, চীন, কোরিয়া ও রুশ দেশে এই রকম আরও অনেক প্রাচীন কাহিনী প্রচলিত আছে।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস প্রথম বলেন যে, উল্কা মহাশূন্যে অবস্থিত কতকগুলি অদৃশ্য পদার্থ-কণা ছাড়া আর কিছুই নয়, যদিও প্রথম প্রথম অনেকেই এটা গ্রহণ করতে পারেন নি। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশেই উল্কা সম্বন্ধীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম সূত্রপাত হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ব্রেণ্ডিস্‌ ও বেন্‌জেন্‌বার্গ নামে দুজন জার্মান ছাত্র একই সময়ে দুটি দূরবর্তী স্থান থেকে উল্কাপাত পর্যবেক্ষণ করে তার উচ্চতা নির্ণয় করেন। ১৭৯৯ ও ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে যে উল্কাপাত হয়, তা বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ফরাসী জ্যোতির্বিদ আর্গো ও বারোৎ চৈনিক, কোরীয় ও জাপানী ঐতিহাসিক বিবরণ-গুলিকে নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তাঁরা দেখেন যে, ১৮৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব ও পশ্চিম গোলার্ধে যে লিওনিড উল্কা বর্ষণ হয়েছিল, সেরূপ বর্ষণ তারও আগে প্রায় ৩,৫০০ বছর ধরে ৩৩ বছর অন্তর অন্তর ঘটে আসছে। লিওনিড উল্কা বর্ষণের গতিপথ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, সেগুলির সঙ্গে কতকগুলি বড় বড় ধূমকেতুর গতিপথের সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও ধূমকেতু ও উল্কার মধ্যে যে কি সম্পর্ক, সেটা অনেক পরে জানা যায়।

সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উল্কা পর্যবেক্ষণ আরম্ভ হয় ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে। এই বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন ইংল্যাণ্ডের ডেনিং, ইটালীর সিয়া-পেরিলি, আমেরিকার নিউটন এবং আরও অনেকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে উল্কা পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে আধুনিক পদ্ধতির সূচনা হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় এল্‌কিন এবং রাশিয়ায় ষ্টার্ণবার্গ স্বতন্ত্রভাবে ঘূর্ণায়মান সাটার পদ্ধতির সাহায্যে উল্কার কৌণিক বেগ নির্ণয় করেন।

আলোকচিত্রের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে উল্কার সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ হয় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে হার্ভার্ড মানমন্দিরে—এফ. হুইপ্‌ল্‌-এর নেতৃত্বে। এই বিষয়ে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য এই সাফল্যের মূলে আধুনিকতম ক্যামেরার অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী। কেন না, যে সব উজ্জ্বল উল্কা আস্তে আস্তে অনুজ্জ্বল হয়ে যায় এবং যা খালি চোখে দেখা অসম্ভব, ক্যামেরার সাহায্যে তাদের চিত্র গ্রহণ করা যায়। এই গবেষণা থেকে বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ১২০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঘনত্ব, তাপ প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক খবর জানা গেছে। আরও জানা গেছে যে, এক দিকে যেমন খুব ঘন শক্ত উল্কাজাতীয় পদার্থ রয়েছে, সেই রকম খুব হাল্কা পদার্থও রয়েছে, যেগুলি উপরের বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে যাবার সময় ভেঙ্গে যেতে পারে। গত ২৫ বছর ধরে গবেষণা-কারীদের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এই উল্কাগুলির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। উল্কার আলোক বিশ্লেষণ থেকে তাদের গঠন সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা সম্ভব।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ক্যানাডার মিলম্যান ও তাঁর সহকর্মীরা স্পেক্টোগ্রাফের সাহায্যে গবেষণা

চালান। চেকোস্লোভাকিয়ায়ও এই উপায়ে অনেক মূল্যবান তথ্যাদি জানা সম্ভব হয়েছে।

উল্কা সম্বন্ধীয় গবেষণায় যতগুলি পদ্ধতি বর্তমানে অনুসরণ করা হয়, তাদের মধ্যে রেডার পদ্ধতির সাফল্যই সবচেয়ে বেশী। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের হে ও স্টুয়ার্ট উল্কা পর্যবেক্ষণের জন্যে প্রথম রেডার ব্যবহার করেন। পরে বৃটিশ বিজ্ঞানী ব্ল্যাকেট, অ্যাপ্‌ল্‌টন, রুশ বিজ্ঞানী কেচিক ও লেভিনও এই পদ্ধতিতে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন।

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বর্ষে (১৯৫৭-৫৮) জ্যোতির্বিদেরা কতকগুলি সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। সেগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে, আয়নোস্ফিয়ারের উপর উল্কা-বর্ষণের ফলাফল কি? এই সময়ে পৃথিবী-ব্যাপী যে উল্কা বিষয়ক গবেষণা হয়, তাতে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ক্যানাডার প্রচেষ্টা সবচেয়ে বেশী। কিন্তু ঠিক তখনই সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকার কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের ফলে এই গবেষণার কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। কারণ এই সব কৃত্রিম উপগ্রহে বিশেষ ধরণের এমন সব যন্ত্র পাঠানো হয়েছিল, যাদের উপর উল্কার আঘাতের ফলাফল চিহ্নিত হয়ে থাকতো। এভাবে উল্কা সম্বন্ধীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে। এর ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যেমন—জিওফিজিক্স, রেডিও-ফিজিক্স প্রভৃতির বহু উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

উল্কা সম্বন্ধীয় আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রধান তিনটি সমস্যা হচ্ছে:

১। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে উল্কা প্রবেশের ফলাফল কি?

২। উল্কাজাতীয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কি? অর্থাৎ তাদের গতি কিরূপ, তারা কত উপরে থাকে—ইত্যাদি।

৩। সৌরজগতের উৎপত্তি ও গঠনে উল্কার অবদান কি?

আমরা এখানে দ্বিতীয় সমস্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়; যথা—

১। চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ; ২। আলোকচিত্র বিশ্লেষণ; ৩। বেতার পদ্ধতি।

উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রথম পদ্ধতিটি ছিল একমাত্র ভরসা। খালি চোখে ঘন্টাখানেক নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে গড়ে প্রায় দশটি করে উল্কা চোখে পড়ে। তাদের গতিপথ অনুসন্ধান করে যদি পিছন দিকে বাড়ানো যায়, তবে দেখা যায় সেগুলি প্রায় একস্থানে এসে মিলেছে—অর্থাৎ এই সব উল্কাগুলি এক জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মোটামুটি সমান্তরাল-ভাবে চলছে (১নং চিত্র)। যে অঞ্চলগুলি থেকে এরা বেরিয়ে আসে, তাদের ব্যাস কয়েক ডিগ্রী এবং তাদের বলা হয় উল্কাবর্ষণের উৎস-স্থল (Radiants of Meteor Showers)

কিন্তু চাক্ষুষ পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, এতে প্রচুর সময় ও শক্তি নষ্ট হয় এবং ফলাফলও হয় ক্রটিপূর্ণ। আগেই বলা হয়েছে যে, আলোকচিত্রের সাহায্যে খুব ভালভাবে গবেষণা চালানো যায়। ডবল ক্যামেরার সাহায্যে উল্কার বেগ ও উচ্চতা জানা যায়। কিন্তু তবুও এই পদ্ধতিতে ক্রটি আছে। সর্বাপেক্ষা অনুভূতিবিশিষ্ট প্লেট ও ফিল্ম নিলেও একটি মাত্র উল্কার ছবি তুলতে ৫০ থেকে ১০০ ঘন্টার 'এক্সপোজার' দরকার হয়। অবশ্য অবজেক্টিভ লেন্সের সামনে একটি প্রিজম্‌ বা ডিফ্র্যাক্‌সন গ্রেটিং বসিয়ে যে বর্ণালী পাওয়া যায়, তার সাহায্যে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালানো সম্ভব। কিন্তু বর্তমান যুগে এসব ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র হচ্ছে—রেডার।

আজকাল কুয়াসা বা মেঘাচ্ছন্ন আকাশে—এমন কি, দিনের বেলায় প্রচণ্ড সূর্যালোকেও উল্কা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়েছে। খুব সাধারণ ধরণের রেডার, যা ৪ থেকে ১২ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যে কাজ করে, তা দিয়েই উল্কা দেখা সম্ভব। রেডার

থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গ কোন দূরবর্তী বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে আসতে যত সময় লাগে, তা থেকে বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। কেন না, ঐ তরঙ্গের গতি (প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০,০০০ কি. মি.) আমাদের জানা আছে। রেডার যন্ত্রের যে অংশে প্রতিফলিত তরঙ্গকে ধরা হয়, তা টেলিভিসনের ক্যাথোড রশ্মি টিউবের অনুরূপ। এই অংশের দ্বারা প্রতিফলিত তরঙ্গকে এক ঝাঁক ইলেকট্রনে রূপান্তরিত করা হয় এবং তারা রেডারের পর্দার উপর চিহ্ন এঁকে দেয়। এই চিহ্নের অবস্থান দেখে বেতার-তরঙ্গ ফিরে আসতে কত সময় লেগেছে, তা জানা যায় ও দূরত্ব মাপা যায়।

রেডারের বেতার-বার্তা প্রেরণের জন্যে এরিয়েল একটি মাত্র দিকেই সঙ্কেত পাঠায় এবং এই সঙ্কেত যদি কখনও দিক্‌চ্যুত হয়, তবে তার তীব্রতা (Intensity) দ্রুত কমে যায়।

যদি ক্যাথোড রশ্মি টিউবের পর্দাকে কিলোমিটারে চিহ্নিত করা যায়, তবে আমরা সরাসরি লক্ষ্যবস্তু অর্থাৎ উল্কার দূরত্ব জানতে পারি। কিন্তু আকাশের কোথায় কখন হঠাৎ উল্কা দেখা যাবে, তা জানা না থাকায় আমাদের আগে থেকে রেডার সেই দিকে ঘুরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সে জন্যে রেডারের এরিয়েলকে উল্লম্ব অক্ষের চারদিকে আস্তে আস্তে ক্রমাগত ঘোরানো হয়, যাতে সমস্ত আকাশকে পর্যবেক্ষণ করা সহজ হয়ে পড়ে। উল্কা রেডারের দৃশ্যের মধ্যে এসে পড়লেই একটি বেতার-প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন কারণে সাধারণতঃ ৫ মিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যই বেতার পর্যবেক্ষণের পক্ষে সুবিধাজনক। এর দ্বারা উল্কার সংখ্যা, তাদের মধ্যে দূরত্ব ও উচ্চতা এবং উৎসস্থলের (Radiant) সন্ধান পাওয়া যায়।

R

১নং চিত্র।

প্রথম দুটি সমস্যা যে সহজেই সমাধান করা যায়, তা বলা হয়েছে। কিন্তু রেডিয়্যান্টের অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যে যে পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাতে দুটি রেডারের প্রয়োজন। এদের

এরিয়েল দুটিকে পরস্পরের লম্বভাবে রাখা হয়। উল্কা থেকে প্রতিফলিত বেতার-সঙ্কেত উল্কার গতিপথের সঙ্গে লম্বভাবে আসে। সুতরাং ঐ উল্কার উৎস এমন একটি দিকে অবস্থিত, যা প্রত্যেক রেডারের মধ্যবর্তী রশ্মির দিক থেকে ৯০ ডিগ্রী দূরে অবস্থিত। তাছাড়া উজ্জ্বল উল্কাগুলির উৎস আর এক উপায়ে বের করা যায়। মোটামুটি ৬০ কিলোমিটার বাহুসমন্বিত একটি সমবাহু ত্রিভুজ কল্পনা করে তার শীর্ষবিন্দুত্রয়ের উপর তিনটি রেডার স্থাপন করা হয়। তারপর উল্কার পুচ্ছের উপর দুটি বিন্দুর দূরত্ব মাপা হয়। এথেকে উল্কাটির গতিপথের দিক এবং উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়।

আকাশের উচ্চস্তরে বাতাসের অস্তিত্ব, তার দিক ও গতি সম্বন্ধে জানা গেছে। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে[২] অবস্থিত বায়ুর ঘর্ষণে উল্কার পুচ্ছের আন্দোলন হয়। ফলে পুচ্ছের অন্তর্ধানের সময় প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য কমে যায় এবং যখন পুচ্ছ নিকটবর্তী হয় তখন ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। এটাই তথাকথিত ডপ্‌লার এফেক্ট। বেতার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমরা দৃষ্টিপথের রেখায় উল্কাপুচ্ছের আন্দোলনের পরিবর্তন ঠিক করতে পারি।

উল্কা-পর্যবেক্ষণের আধুনিক উপায়গুলি সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থ-
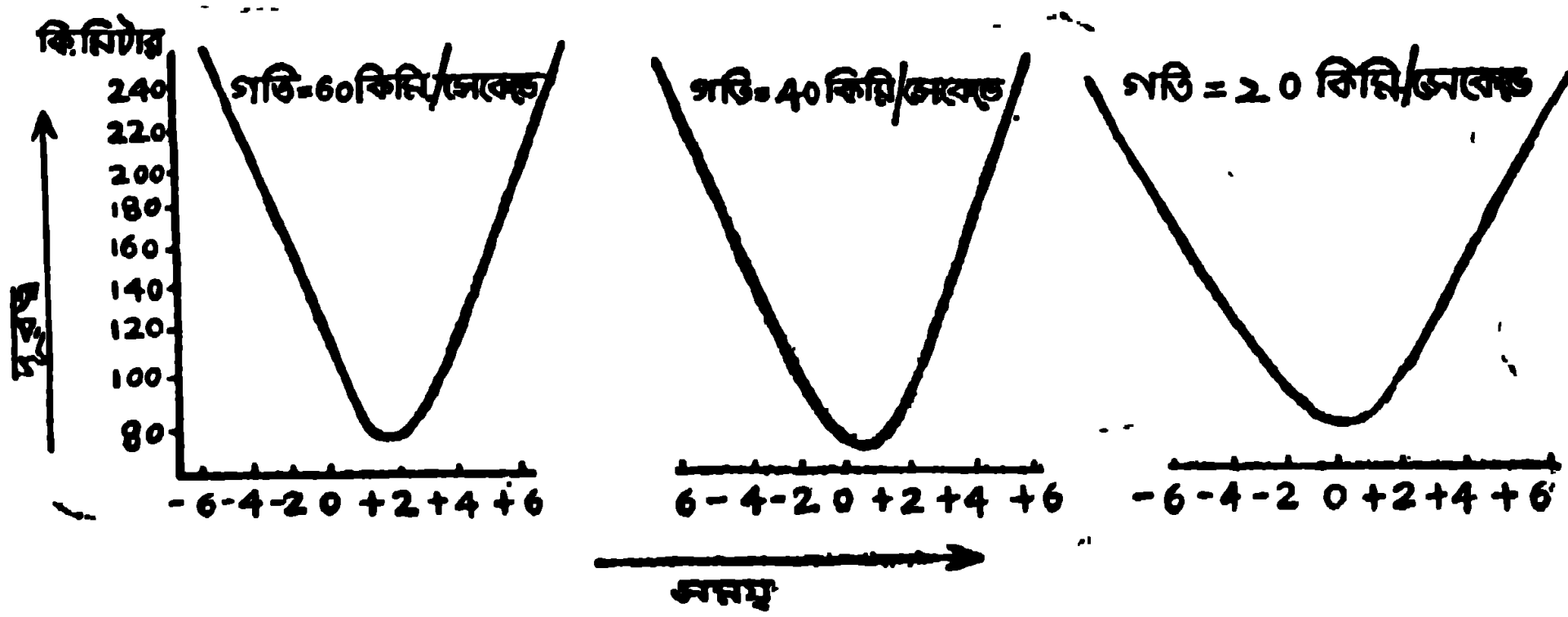
২নং চিত্র।

রেডারের সাহায্যে উল্কার গতিবেগ নির্ণয় করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে সব রেডার ৮ থেকে ১০ কি. মি. তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর কাজ করে, তাদের সাহায্যে উল্কার পুচ্ছ থেকে লম্বভাবে প্রতিফলিত বেতার-বিকিরণের পার্শ্বস্থিত প্রতিফলনও ধরা যায়। ফলে রেডারের পর্দার উপর সময়ের সঙ্গে উল্কার দূরত্বের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্যাথোড রশ্মির টিউবের পর্দার সাহায্যে আমরা যে Hyperbolic[১] বক্ররেখা পাই, তা উল্কার গতিবেগের একটি নিদর্শন। (২নং চিত্র)।

এছাড়া রেডার পদ্ধতির সাহায্যে অন্য অনেক জটিল উপায়ে উল্কা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। বর্তমানে এই বেতার-পদ্ধতিতে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে এই সব বিভিন্ন উপায় সমন্বয়ে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা দরকার, যদিও তার মধ্যে একটি পদ্ধতিকে মুখ্য এবং অন্যগুলিকে গৌণ হিসাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

---

(১) বিশেষ ধরণের জ্যামিতিক ক্ষেত্র।

(২) বায়ুমণ্ডলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—তার উপরের ভাগকে বলা হয় ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার এবং নীচের অংশকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার। যে রেখা এই দুটি অঞ্চলকে ভাগ করে তার নাম টোপোপজ্‌। বিষুবরেখার নিকট এর উচ্চতা ১৪ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলের নিকট উচ্চতা ৮ থেকে ১০ কিলোমিটার।

উনিশ-শ' বাষট্টি সালের ফের্মি পুরস্কার

শ্রীকমলেশ মজুমদার

১৯৬২ সালে 'ফের্মি পুরস্কার' (পদার্থবিদ্যায়) লাভ করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক এডওয়ার্ড টেলার। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু-শক্তি কমিশন পঞ্চাশ হাজার ডলার মূল্যের এই পুরস্কারটি দিয়ে থাকেন। পরমাণু-শক্তির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়ন বিষয়ে যাঁর অবদান অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক, তিনিই এই পুরস্কার লাভের যোগ্য। কমিশনের সাধারণ উপদেষ্টামণ্ডলী প্রতি বছর যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন করে এই পুরস্কার বিতরণ করেন। অধ্যাপক টেলারকে মনোনীত করে কমিটি বলেছেন—ইনি বর্তমান জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক চিন্তাবিদ এবং বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানে তাঁর অবদান অসামান্য। রসায়ন-বিজ্ঞান থেকে পদার্থ-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নোলজি থেকে বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ অংশ কোয়ান্টাম তত্ত্ব পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর অতুলনীয় মনীষার স্বাক্ষর বর্তমান।

অধ্যাপক টেলারের জন্ম ১৯০৮ সালে—বুডাপেষ্ট সহরে। কার্লস্রুতে সুরু হয় তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা, অথচ ১৯৩০ সালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডিগ্রি লাভ করেন। এখানে তিনি বিশ্ববিশ্রুত পদার্থ-বিজ্ঞানী হাইসেনবার্গের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর প্রভাবে টেলার যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং সেই প্রভাব আজও বিদ্যমান। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের পর তিনি গটিংগেনে জে. ফ্র্যাঙ্কের ইনষ্টিটিউশনে যোগদান করেন। এখানে থাকবার সময় আকৃষ্ট হন ভৌত রসায়নের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের কাজে। হিটলারের নাৎসী সরকার তাঁকে জার্মেনী ছাড়তে বাধ্য করলে তিনি প্রথমে লণ্ডনে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে চলে যান আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সময়ে তিনি পারমাণবিক পদার্থবিদ্যার দিকে অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রথমে শিকাগো এবং পরে লস্ আলামসে তিনি ইউরেনিয়াম প্রোজেক্ট নিয়ে কাজ করতে থাকেন। যুদ্ধের পরে লস্ আলামস, বার্কলে, লিভারমোর ইত্যাদি নানা স্থান ঘুরে বর্তমানে ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা শাখার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রধানতঃ তিনটি শাখায় তাঁর অবদান আছে—ভৌত রসায়ন, পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা, এবং সৃষ্টিতত্ত্ব। ভৌত রসায়ন তাঁর প্রথম আকর্ষণের বিষয় ছিল এবং এখন পর্যন্ত এই বিষয়ের চর্চা তিনি ছাড়েন নি। তাঁর প্রথম গবেষণা-পত্র "কোয়ান্টাম থিয়োরী অব দি হাইড্রোজেন মলিকিউলার আয়ন" বিজ্ঞান-জগতে এক অত্যুত্তম সংযোজন।

কিছুদিন আগে ব্রুসেল্‌স-এ এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লাণ্ডাউ এবং টেলারের উদ্ভাবিত তত্ত্ব নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত করা হয়।

সংক্রমণগত গতি (ট্র্যানজিশন্যাল মোসন) এবং অণুর কম্পমান গতির মধ্যে শক্তির বিনিময় অত্যন্ত মন্থর গতিতে হয়ে থাকে। এই মন্থরতার জন্যে শব্দ-পরিবাহী গ্যাস যখন পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত হয় তখন শব্দ-তরঙ্গে যে তাপবৃদ্ধি ঘটে, তা অণুর কম্পনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে না। তার ফলে শব্দের গতিবেগ বেড়ে যায়। শক্তি-বিনিময়ের শ্লথগতি আর একটি বিষয়কে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। "চুম্বকীয় শীতলতা পদ্ধতিতে" চৌম্বক শক্তি এবং সাধারণ সংক্রমণগত গতির মধ্যে এই বিনিময়ের কাজটি অতি মন্থর বেগসম্পন্ন। এর ফলে চৌম্বক তাপ এবং পরমাণুর সাধারণ গতির জন্যে উদ্ভূত তাপমানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়।

এই ছুটি তাপমাত্রা সমপর্যায়ে আসতে কয়েক ঘণ্টা বা আরো বেশী সময় লাগে। এই তথ্যটি টেলার সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন।

পরমাণু-বিজ্ঞানের বহুবিধ উন্নতিসাধনে ডাঃ টেলারের কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। হুইলার এবং হ্যাফ্‌-ষ্টাডের সঙ্গে একত্রে কাজ করেও তিনি অসংখ্য উল্লেখযোগ্য উন্নতিবিধান করেন। টেলার তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে একযোগে গবেষণার ফলে সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভারী নিউক্লিয়াস আল্‌ফা কণিকা দিয়ে তৈরী—সরাসরি কেন্দ্রক, প্রোটন এবং নিউট্রন দিয়ে গঠিত নয়। তিনি বললেন যে, এই মধ্যম বস্তু আল্‌ফা কণিকা একজোড়া প্রোটন আর একজোড়া নিউট্রন দিয়ে তৈরী। টেলারের এই সিদ্ধান্তে পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে যে এক যুগান্তর এনেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। টেলা-রের এই ধারণার সঙ্গে বিশেষভাবে জৈব অণুর গঠনের একটা নীতির বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়। জৈব অণুগুলি সাধারণতঃ পরমাণুর চেয়ে বড় বস্তু বা পরমাণুগুচ্ছের সাহায্যে গঠিত। উদাহরণ স্বরূপ—মিথাইল, ফিনাইল ইত্যাদি নানা র‍্যাডি-ক্যালের নাম বলা যেতে পারে। তাছাড়া আরো অনেক সাদৃশ্য বর্তমান।

সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে (কস্‌মোলোজি) ডাঃ টেলারের অবদানের প্রকৃত মূল্যায়নের সময় এখনো আসে নি। মৌলিক পদার্থ এবং মহাজাগতিক রশ্মির উদ্ভব সংক্রান্ত তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য সম্পর্কে এখনো নানা সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। অথচ এই সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নানা কাজের জন্যেই তিনি সাধারণের কাছে সমধিক পরিচিত। বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তিনিই সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে উগ্র এবং নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ের থার্মোনিউ-ক্লিয়ার রিয়্যাকশন সৃষ্টির সম্ভাবনা প্রকাশ করেন। টেলারের আগে বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, কেবল-মাত্র সূর্য এবং তারার মধ্যেই এই ধরণের বিক্রিয়া ঘটে থাকে। তীব্র বেগসম্পন্ন থার্মো-নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশনের আর এক নাম আমাদের খুবই পরিচিত—তা হলো হাইড্রোজেন বোমা। যুদ্ধের সময় টেলারই প্রথম এই জাতীয় বোমার সম্ভাব্যতার কথা বলেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, তখন ফিসন বা পরমাণু বোমারও কোন অস্তিত্ব ছিল না।

হাইড্রোজেন বোমার প্রচণ্ড শক্তিকে কল্যাণকর কাজে প্রয়োগ করবার নানাবিধ পরিকল্পনা তাঁরই সৃষ্টি। পোতাশ্রয় এবং খোল তৈরী করবার কাজে এবং আরো অন্যান্য কাজে এই শক্তি ব্যবহার করবার জন্যে তিনি যথেষ্ট আগ্রহী।

থার্মোনিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন থেকে শক্তি এবং বিদ্যুৎ তৈরী করবার পরিকল্পনা যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে টেলার অন্যতম। আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র বহু পরিশ্রমের ফলে এই দুরূহ কাজে সাফল্য অর্জন করেছেন। এর মূলে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে ডাঃ টেলারের উৎসাহ এবং অকুণ্ঠ সমর্থন।

ডাঃ টেলার সঙ্গীতপ্রিয়—ভালবাসেন কবিতা, লম্বা একটানা বেড়াতে আর হৈ চৈ করে আমোদ করতে তাঁর উৎসাহ অপরিসীম। যে কোন ধরণের হিংসা তাঁকে বিপর্যস্ত করে ফেলে, হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের সংবাদে তিনি নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন।

হাঙ্গেরীর নাগরিকেরা নাকি রসিক হয়, এমন একটা কথা চালু আছে সে দেশে—কথাটা অন্ততঃ ডাঃ টেলারের ক্ষেত্রে খুবই সত্য। তাঁর থলিতে প্রচুর মজার গল্প থাকে আর নানা ধরণের রসিকতা করতে তাঁর জুড়ি খুবই কম। কি রাজ-নৈতিক, কি বৈজ্ঞানিক—সব রকম আলোচনাতেই তাঁর আগ্রহ প্রচুর। তবে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা পেলে একেবারে ডুবে যান, তাহলেও জেগে থাকে তাঁর রসিক সত্তা। গুরুগম্ভীর আলোচনার মধ্যেও সরস অথচ লাগসই উক্তি করতে ভোলেন না। এর ফলে অধিকাংশ সময়ে আলোচনা-যুদ্ধে তাঁরই জয় হয়ে থাকে।

পতঙ্গ-রাজ্যে অনুকৃতি

রমেন দেবনাথ

জীব-জগৎ এক বিরাট সংগ্রামের ক্ষেত্র। এই সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বেঁচে থাকতে হলে নানারকম উপায় অবলম্বন করতে হয়। তন্মধ্যে ছদ্মবেশ ধারণ একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এর সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব গোপন রেখে শত্রুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সহজেই আত্মরক্ষা করা যায়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও এই ছদ্মবেশ বা আত্মগোপনের কৌশল দেখতে পাওয়া যায়। দুর্বল, নিরীহ প্রাণী ভক্ষক শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নিজের অস্তিত্ব গোপন রেখে বিস্বাদজনক অভক্ষ্য প্রাণীর আকৃতি নকল করে এবং এই ছদ্মবেশেই জীবন অতিবাহিত করে। ফলে, শত্রু এই ছদ্মবেশী প্রাণীকে অভক্ষ্য প্রাণী বলেই মনে করে এবং তাকে আক্রমণ করে না। এই ছদ্মবেশের আড়ালে যে তারই প্রিয় শিকারটি আত্মগোপন করে আছে—তা সে বুঝতেই পারে না। এই ভাবে ভক্ষক শত্রুদের বিভ্রান্ত করা হয়ে থাকে। আত্মরক্ষার জন্যে দুর্বল, ভক্ষ্য প্রাণী কর্তৃক অভক্ষ্য প্রাণীর আকৃতির অনুকরণকেই বলা হয় অনুকৃতি।

এই অনুকৃতির বিষয় সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন প্রকৃতি-বিজ্ঞানী বেট্‌স, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে। তিনি অ্যামাজন উপত্যকায় সুদীর্ঘ ১১ বছর ভ্রমণ করেন। তখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, কতকগুলি প্রজাপতি (যেগুলি দেখতে কালো, কদাকার এবং তাদের শরীর থেকে বিস্বাদজনক গন্ধ বের হয়) পাখী বা অন্যান্য প্রাণী কিছুতেই খেতে চায় না—সেগুলি

১নং চিত্র।

পত্র সদৃশ প্রজাপতি।

তাদের অভক্ষ্য। তারপর তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে, এই কদাকার প্রজাপতির সঙ্গে তাদেরই মত দেখতে কিন্তু ভিন্ন গণ এবং প্রজাতির প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়। এই শেষোক্ত প্রজাপতিগুলি পাখীদের খুবই উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু যেহেতু ঐ প্রজাপতিগুলি কদাকার, অভক্ষ্য প্রজাপতির আকৃতি অনুকরণ করেছে—সেহেতু তারা তাদের ভক্ষক শত্রুর আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়।

আবিষ্কারকের নাম অনুযায়ী এই অনুকৃতিকে বেটসীয় অনুকৃতি (Batesian Mimicry) বলা হয়ে থাকে। পরে মুলার ও পোল্টন অনুকৃতি সম্পর্কে অনেক নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন।

কোন বস্তুর অনুকরণ। এই ক্ষেত্রে পতঙ্গ যে পরিবেশে বাস করে, সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তার আকৃতি এবং প্রকৃতি গঠন করে। সাধারণতঃ গাছের পাতা, রং এবং ডালপালাকেই পতঙ্গেরা অনুকরণ করে। এই অনুকৃতির কতকগুলি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া হলো:

(ক) পত্রসদৃশ প্রজাপতির (Leaf-Butterfly)—এই প্রজাপতির মধ্যেই অনুকৃতির দৃষ্টান্ত বেশী পাওয়া যায়। এক রকম প্রজাপতি (Kallima) আছে, যেগুলি গাছের মরা পাতার আকৃতি অনুকরণ করে (১নং চিত্র)। এই প্রজাপতিকে উড়ন্ত অবস্থায় খুবই সুন্দর দেখায়, কিন্তু গাছে বসবার পর
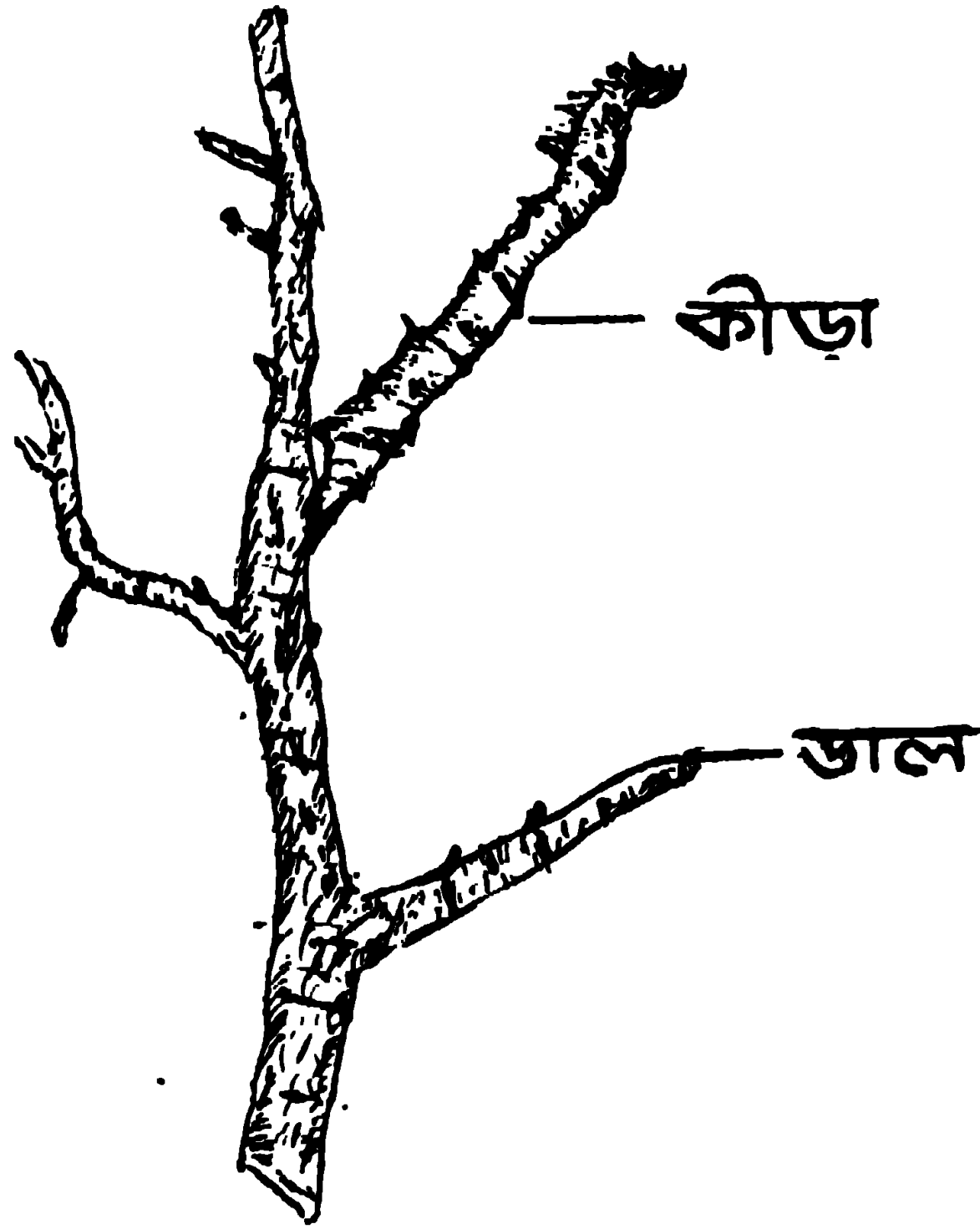
২নং চিত্র।
ডাল বা শাখাসদৃশ কীড়া

অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় কীট-পতঙ্গের মধ্যেই অনুকৃতির ব্যাপারটা বেশী দেখা যায়। এস্থলে আমরা পতঙ্গের অনুকৃতির বিষয় আলোচনা করবো।

অনুকৃতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—সেগুলি হলো—

(১) প্রাকৃতিক পরিবেশে পতঙ্গ কর্তৃক

তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না—যেন যাদুমন্ত্র বলে সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়। তার কারণ হলো—তাদের ডানাগুলি হুবহু পাতার মত—পাতার বোঁটা, মধ্যশিরা, শিরা-বিন্যাস এবং মরা পাতার রং—সব কিছুকেই প্রজাপতির পাখা অনুকরণ করে। তাই প্রজাপতিটি পাতার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

(খ) প্রজাপতির সমগোত্রীয় এক রকম পতঙ্গ আছে (Geometrid Moth), যাদের কীড়া (প্রজাপতির শৈশব অবস্থা) গাছের ডাল এবং রং অনুকরণ করে। এই অনুকৃতি এতই উন্নত ধরণের যে, অতি সন্ধানী দৃষ্টিও গাছের ডাল থেকে কীড়ার পার্থক্য বুঝতে পারে না (২নং চিত্র)।

(গ) চলন্ত-পাতা (Walking leaf)—এক রকমের পতঙ্গ (Phyllium) আছে যাদের ডানা এবং শরীরের রং গাছের মত সবুজ (৩নং চিত্র)। তাদের ডানাগুলিও দেখতে ঠিক পাতার মত—পাতার ন্যায় এই ডানাতেও বোঁটা, মধ্যশিরা, শিরা-বিন্যাস ইত্যাদি আছে। তাই এই পতঙ্গগুলি যখন চলে বেড়ায়, তখন মনে হয় যেন আস্ত পাতাই হেঁটে বেড়াচ্ছে। এজন্যে এই পতঙ্গগুলিকে চলন্ত-পাতা বলা হয়ে থাকে।

(ঘ) কাঠি-পোকা (Stick Insect)—এই পতঙ্গগুলি গাছের ডালপালাকে অনুকরণ করে। এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরু এবং লম্বা ধরণের। এদের অনুকৃতি এতই নিখুঁত যে, গাছের ডাল ব্যতীত এই পতঙ্গগুলিকে আর কিছুই ভাবা যায় না। প্রায় সর্বক্ষণই তারা গাছের ডালপালার মধ্যে নিশ্চলভাবে থাকে (৪নং চিত্র)। এমন কি ডিম পাড়বার সময়ও তারা এই অবস্থায় থেকেই ডিম পাড়ে।

(ঙ) এক ধরণের পতঙ্গ আছে, যারা গাছের গায়ে বা পাতায় পাতায় লাফিয়ে বেড়ায় (Tree hopper)—এই শ্রেণীর অন্তর্গত এক ধরণের পতঙ্গ (Umbonia) দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া যায়। এরা যখন গাছের উপর বসে, তখন তাদের পিঠের দিকটা সূচালো আকার ধারণ করে এবং দূর থেকে এদের তীক্ষ্ণ কাঁটার মত দেখায় (৫নং চিত্র)। তাই যে গাছে এই পতঙ্গগুলি থাকে, সেই গাছে পাখী বা অন্যান্য ভক্ষক প্রাণী কাঁটার ভয়ে বসে না, অথচ এই কাঁটা-সদৃশ পোকাগুলিই তাদের প্রিয় খাদ্য।

৩নং চিত্র। চলন্ত-পাতা

২। দ্বিতীয় প্রকারের অনুকৃতি হলো, নিরীহ ভক্ষ্য পতঙ্গ কর্তৃক অভক্ষ্য পতঙ্গের অনুকরণ (Sematic Mimicry)। একে বেট্সীয় অনুকৃতিও

বলা যেতে পারে। যে পতঙ্গকে অনুকরণ এরা করে তাকে আদর্শ বলা হয় এবং অনুকরণকারী পতঙ্গকে বলা হয় অনুকারক (Mimic)। আদর্শ পতঙ্গকে সব সময়ই কদাকার, বিস্বাদ এবং অভক্ষ্য হতে হবে। বোলতা, মৌমাছি, ভ্রমর, পিঁপড়ে ঐ প্রজাপতির ডানায় যে আঁশ থাকে তাও পড়ে যায় এবং মৌমাছির ডানার মত পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই মৌমাছির ছদ্মবেশ ধারণ করে' ভক্ষক শত্রুকে বিভ্রান্ত করে। এই প্রজাপতিগুলি মৌমাছির সঙ্গে মধু আহরণ করে বেড়ায়। কতকগুলি মাছি
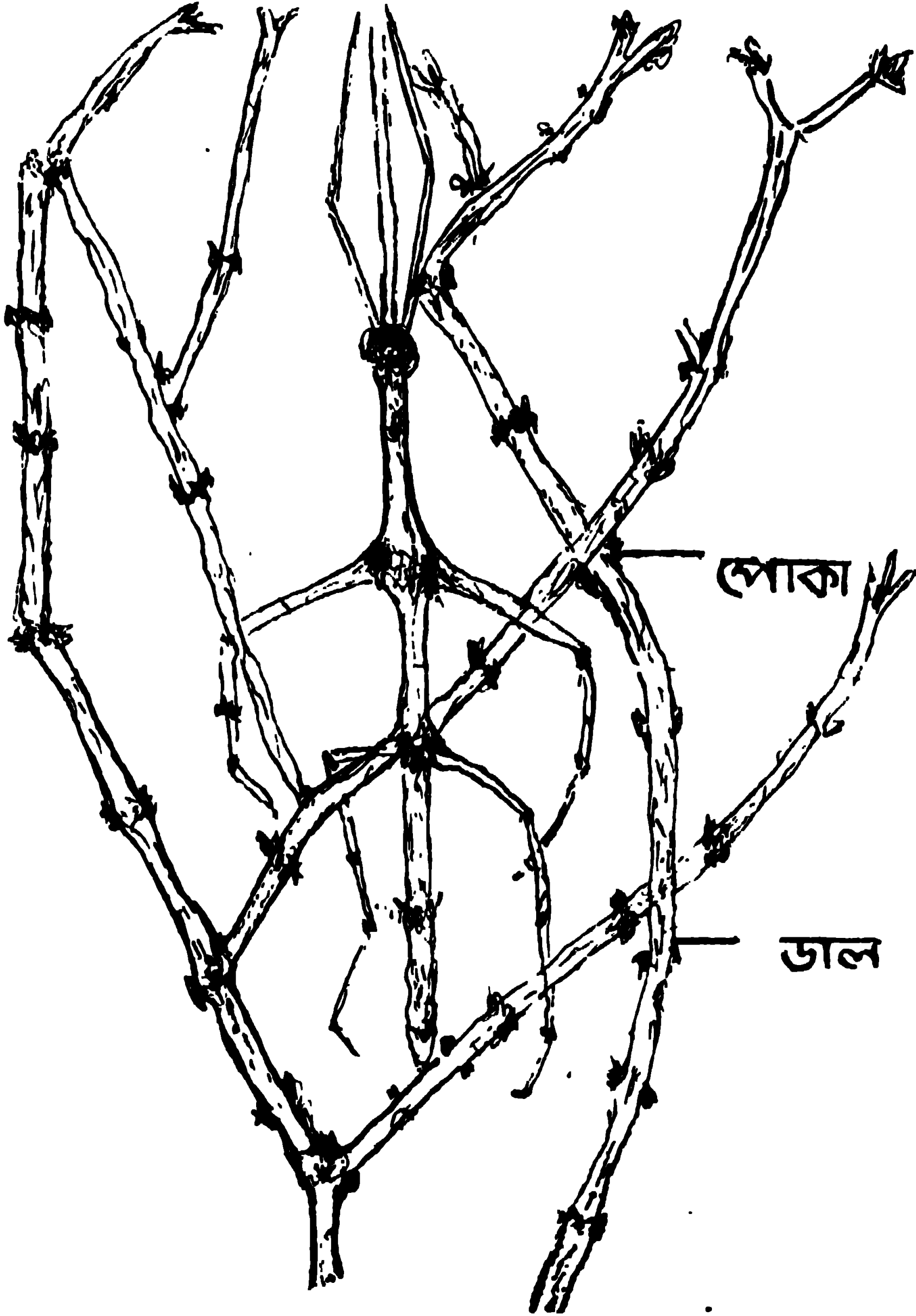
৪নং চিত্র। কাঠিসদৃশ পতঙ্গ।

ইত্যাদিকে পতঙ্গভুক প্রাণীরা খেতে চায় না। তাই বেশীর ভাগ নিরীহ ভক্ষ্য পতঙ্গ এদের আদর্শ করে এদের দেহাকৃতি নকল করে। কতকগুলি প্রজাপতি কালো ভ্রমরের অনুকরণ করে। মৌমাছির মত তাদের ডানায় রংও কালো। বোলতার আকৃতি অনুকরণ করে—এমন কি, বোলতার হুলকেও। কতকগুলি পিঁপড়েও আদর্শ-রূপে ব্যবহৃত হয়। বৃটিশ গায়নাতে একরকম পিঁপড়ে আছে, যেগুলি চলবার সময় তাদের পিঠে একটি পাতা বয়ে নিয়ে যায়। অনেক সময় এই

পিঁপড়ের সঙ্গে ভিন্ন জাতীয় পোকা দেখা যায়—যারা শত্রুকে ধাপ্পা দেবার জন্তে এই পিঁপড়েকে অনুকরণ করে। এই অনুকারীদের পিঠে সত্যিকারের পাতা নেই—কিন্তু শরীরের অংশকেই পাতার মত করে নেয় (৬নং চিত্র)।

পতঙ্গভুক প্রাণীদের অভক্ষ্য। এই তিনটি প্রজাতির প্রজাপতিকেই অনুকরণ করে ভিন্ন জাতির ভক্ষ্য স্ত্রী-প্রজাপতি (Papillo cenea)। পুরুষ প্রজাপতিগুলি কোন রকম অনুকরণ করে না। এই ধরণের অনুকৃতি খুবই সীমাবদ্ধ।
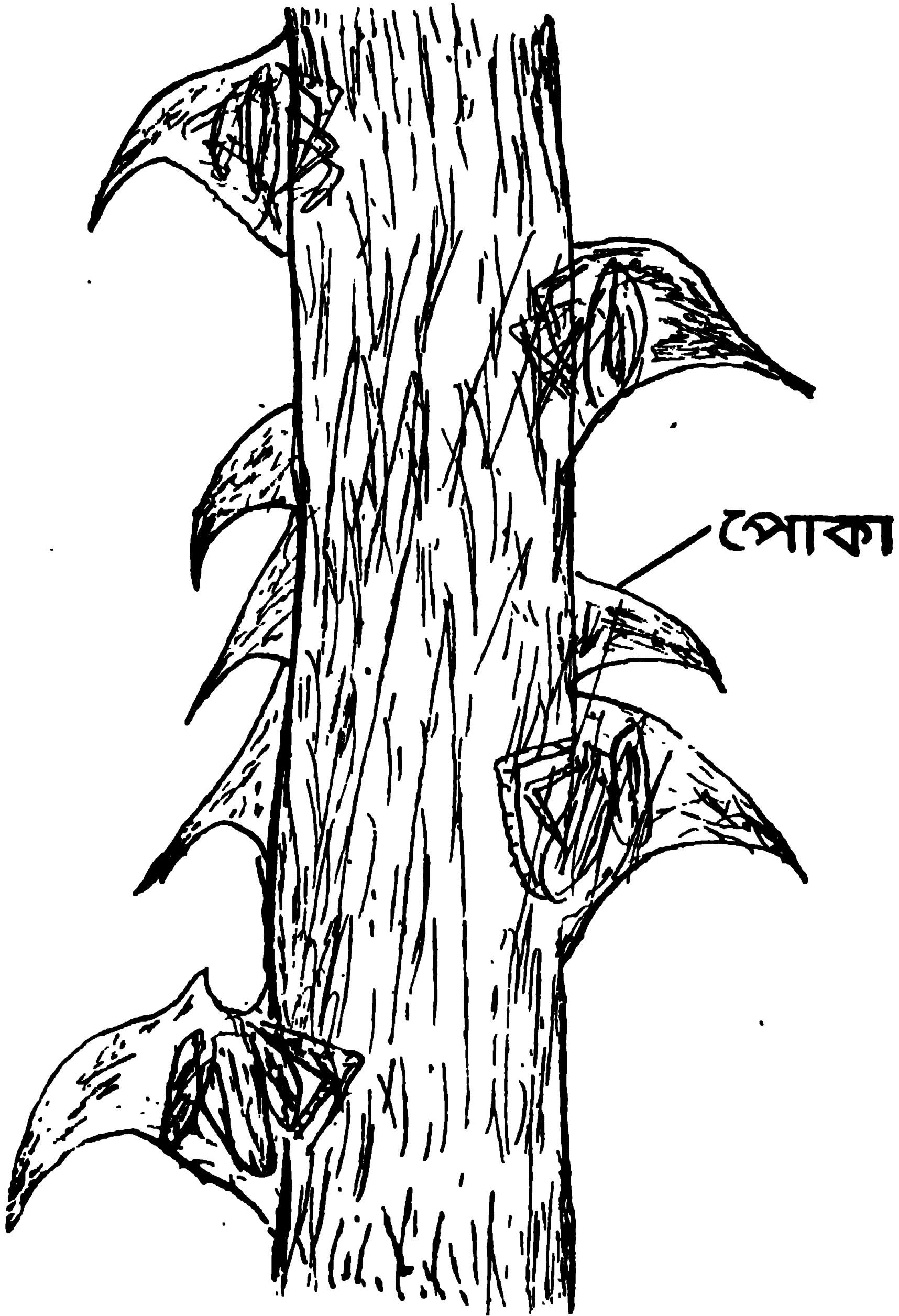
৫নং চিত্র। কাঁটাসদৃশ পতঙ্গ।

৩। তৃতীয় প্রকারের অনুকৃতি হলো, শুধু স্ত্রী বা পুরুষ পতঙ্গ কর্তৃক আদর্শ পতঙ্গের অনুকরণ করা (Epigamic Mimicry)। এর সাধারণ উদাহরণ হলো আফ্রিকার ডেনিয়াস প্রজাপতি। এই গণভুক্ত তিনটি প্রজাতি আছে—সবগুলিই

তিন প্রকারের অনুকৃতি উদাহরণসহ উপরে বর্ণিত হলো। কি করে এই অনুকৃতির উৎপত্তি হলো—সে সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। তবে সর্বাপেক্ষা গ্রহণীয় হলো ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতবাদ—প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলেই অনুকৃতির

উদ্ভব হয়েছে। শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পতঙ্গ গাছের ডাল, পাতা ইত্যাদির অনুকরণ করতে সুরু করে, ভক্ষ্য পতঙ্গ অভক্ষ্য আদর্শ আর তাদেরই গোত্রীয় যে সব পতঙ্গ এই অনুকরণ করতে পারে না, তারা শত্রু কর্তৃক বিনষ্ট হয়ে যায়। এই ভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনের
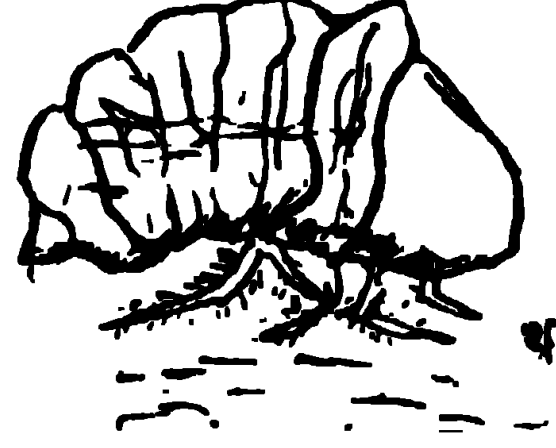
৬নং চিত্র।

ক—পিঁপড়ে খ—পিঁপড়ের আকৃতি অনুকরণকারী পতঙ্গ

পতঙ্গের অনুকরণ করে এবং যোগ্যতমের উদ্বর্তনের নিয়মানুযায়ী তারা জীবন-যুদ্ধে জয়লাভ করে ফলেই উন্নত ধরণের পূর্ণাঙ্গ অনুকৃতির উদ্ভব হয়।

ফারমেণ্টেশন

শ্রীশিবনারায়ণ ভট্টাচার্য

বাসি দুধ দিন দুই রেখে দিলে যেমন টকে যায়, তেমনি জলঢালা ভাত বাসি হলে পান্তা হয়, মিষ্ট রস—যেমন খেজুর রস, তাল রস ইত্যাদি বাতাসে অনেকক্ষণ রেখে দিলে গেঁজে যায়। এর ফলে প্রচুর ফেনার সৃষ্টি হয়, মনে হয় যেন রসটা ফুটছে। তাই এই প্রক্রিয়াকে গেঁজে যাওয়া বা ফারমেণ্টেশন বলে। খুব প্রাচীনকাল থেকেই এই প্রক্রিয়া জানা ছিল, কারণ তখন থেকেই এই প্রক্রিয়া বহু মানুষের নেশার খোরাক জুগিয়েছে। গেঁজে যাওয়ার ফলে চিনি জাতীয় পদার্থগুলি অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়। এই অ্যালকোহলই নেশার কারণ। কিন্তু কি ভাবে এই চিনি জাতীয় পদার্থগুলি (প্রধানতঃ গ্লুকোজ) অ্যালকোহলে পরিণত হয়, সে সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান খুব সম্প্রতিই হয়েছে।

লিবিগের ধারণা ছিল যে, মিষ্ট রস ইত্যাদির নাইট্রোজেন সমন্বিত উপাদানগুলি বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে অস্থায়ী হয়ে পড়ে এবং তাদের এই অস্থায়িত্ব চিনির অণুগুলিতে সঞ্চারিত করে। ফলে অস্থায়ী চিনির অণুগুলি ভেঙ্গে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয়।

এই ধারণা পাস্তুরের পরীক্ষার ফলে মিথ্যা প্রমাণিত হয়। ১৮৭৫ সালে তিনি দেখালেন যে, অক্সিজেনের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতিতে ফারমেণ্টেশন হতে পারে। আবার দুধ গেঁজে যাওয়ার কারণ নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখলেন যে, এই ফারমেণ্টেশন কতকগুলি জীবাণুর উপস্থিতিতেই ঘটে। যাতে এই সব জীবাণু প্রবেশ না করতে পারে, তার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করলেই আর দুধ টকে যায় না। অনুরূপভাবে চিনি জাতীয় পদার্থের ফারমেণ্টে-

শনের ক্ষেত্রেও তিনি দেখলেন যে, ঈষ্ট নামক জীবাণুই এর জন্যে দায়ী। সুতরাং তিনি মত প্রকাশ করলেন যে, ফারমেন্টেশন জীবনের সঙ্গে জড়িত কোন না কোন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু এই ধারণাও মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। ১৮৯৭ সালে বুকনার আবিষ্কার করলেন যে, জীবিত ঈষ্ট-কোষের বদলে ঈষ্ট-কোষ-নিঃসৃত রস দিয়েও ফারমেন্টেশন ঘটানো সম্ভব; সুতরাং ফারমেন্টেশনে জীবনের কোন হাত থাকা সম্ভব নয়। আবার এই ঈষ্ট-রসকে উত্তপ্ত করলে তার আর ফারমেন্টেশনের ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং ঈষ্ট-রসের মধ্যে নিশ্চয়ই এক বা একাধিক জৈব অনুঘটক থাকা স্বাভাবিক—যারা আসলে গ্লুকোজকে অ্যালকোহলে পরিণত করে।

এই সম্বন্ধে পরবর্তী উন্নতি ঘটে ১৯০৫ সালে হার্ডেন ও ইয়াং-এর গবেষণার ফলে। তাঁরা দেখলেন যে, সগুনিঃসৃত ঈষ্ট-রস গ্লুকোজ দ্রবণে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ফারমেন্টেশন আরম্ভ হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তা থেমে যায়। তখন যদি কিছু অজৈব ফস্‌ফরাস দেওয়া হয়, তবে আবার ফারমেন্টেশন আরম্ভ হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ফস্‌ফরাস ফুরিয়ে গেলে আবার ফারমেন্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। এই অজৈব ফস্‌ফরাসের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া থেকেই বোঝা যায় যে, নিশ্চয়ই তা গ্লুকোজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে কোন না কোন ফস্‌ফেট লবণ তৈরী করে। ফলে এই লবণ পৃথক করবার চেষ্টা চলে। অচিরেই ফ্রুক্টোজ ডাইফস্‌ফেট এবং পরে গ্লুকোজ ফস্‌ফেট ও ফ্রুক্টোজ ফস্‌ফেট পৃথক করা সম্ভব হলো। এগুলির মধ্যে তিনটিই গ্লুকোজের মত ফারমেন্টেশনে সক্ষম; অর্থাৎ ঈষ্ট-রসের সঙ্গে সংযোগ করলে সেগুলি অ্যালকোহলে পরিণত হয়। অতএব গ্লুকোজ সরাসরি একেবারে অ্যালকোহলে পরিণত হয় না। পরন্তু ধীরে ধীরে কতকগুলি মাধ্যমিক অস্থায়ী পদার্থের মারফৎ অ্যালকোহলে পরিণত হয়। অস্থায়ী মাধ্যমিকগুলির মধ্যে এই তিনটি ফস্‌ফেট লবণ প্রাথমিক। এদের প্রকৃতি দেখে সহজেই বোঝা যায় যে, গ্লুকোজ প্রথমে গ্লুকোজ ফস্‌ফেট, তারপর এই গ্লুকোজ ফস্‌ফেট ফ্রুক্টোজ ফস্‌ফেটে এবং পরিশেষে সেটি ফ্রুক্টোজ ডাইফস্‌ফেটে পরিণত হয়।

ফ্রুক্টোজ ডাইফস্‌ফেটকে অথবা গ্লুকোজকে অতঃপর যদি ঈষ্ট-রস ও কিছু আয়ডো-অ্যাসিটেটের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে অল্প পরিমাণ ৩-ফস্‌ফো-গ্লিসারেলডিহাইড পৃথক করা সম্ভব হয়। এটিকে আবার আরও ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে, এর সঙ্গে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফস্‌ফেট মেশানো আছে। সুতরাং নিশ্চয়ই ফ্রুক্টোজ ডাইফস্‌ফেট ভেঙ্গে গিয়ে এই দুটি পদার্থে পরিণত হয়।

আবার ফ্রুক্টোজ ডাইফস্‌ফেট কিম্বা গ্লিসারেল-ডিহাইড ফস্‌ফেটকে ঈষ্ট-রস ও ফ্লোরাইডের সঙ্গে মেশালে দেখা যাবে যে, ২টি ফস্‌ফোগ্লিসারিক অ্যাসিড পৃথক করা যাচ্ছে। এদের মধ্যে একটিতে ফস্‌ফরাস আছে অ্যাসিড থেকে ৩নং কার্বন পরমাণুতে, অপরটিতে ২নং পরমাণুতে। সুতরাং প্রথমটিই ৩-ফসফোগ্লিসারেলডিহাইড থেকে প্রথমে হয়, আর দ্বিতীয়টি পরে হয়। এগুলি কিন্তু গ্লিসারেলডিহাইডের রূপান্তর। সুতরাং পরবর্তী ধাপগুলিতে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফস্‌ফেট কোন রূপান্তর লাভ করে না। তবে দেখা গেছে যে, এটি নষ্ট হয় না, একটি বিশেষ জৈব অনুঘটক ফস্‌ফোট্রাইওজ আইসোমেরাজ-এর দ্বারা ক্রমে ক্রমে গ্লিসারেলডিহাইড ফস্‌ফেটে পরিণত হয়।

এই ফস্‌ফোগ্লিসারিক অ্যাসিডের পরবর্তী রূপান্তর ধরা যাবে যদি আবার ঈষ্ট-রসের সঙ্গে একে মিশিয়ে সেই মিশ্রণে ফ্লোরাইড দেওয়া যায়। ফ্লোরাইড না দিলে যথারীতি ফারমেন্টেশন হতো, কিন্তু ফ্লোরাইড দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফারমেন্টেশন বন্ধ হয়ে যাবে এবং মিশ্রণ থেকে ফস্‌ফো-এনল

পাইরুভেট নামে একটি নতুন পদার্থ পাওয়া যাবে। একই ফল হবে যদি ফস্‌ফোগ্লিসারিক অ্যাসিডটিকে সরাসরি ডায়ালাইজ্‌ড্‌ ঈষ্ট-রসের সঙ্গে মেশানো হয়। কিন্তু এর সঙ্গে ADP দিলে পাইরুভিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। সুতরাং ফস্‌ফোগ্লিসারিক অ্যাসিড প্রথমে ফস্‌ফো-এক্সল পাইরুভেট ও পরে পাইরুভিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। পাইরুভিক অ্যাসিড তারপর অ্যাসিট্যালডিহাইডে পরিণত হয়। তার প্রমাণ—পাইরুভিক অ্যাসিড ও ঈষ্ট-রসের মিশ্রণে বাইসালফাইট দিলে তা অ্যাসিট্যালডিহাইডের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে কঠিন পদার্থরূপে পৃথক হয়ে পড়ে। এই অ্যাসিট্যালডিহাইডই সর্বশেষে অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই বিস্তৃত ও জটিল প্রক্রিয়াটির সার্থকতা কি? অর্থাৎ গ্লুকোজ সরাসরি অ্যালকোহল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত না হয়ে এই জটিল পন্থা অবলম্বন করছে কেন? বলা বাহুল্য এই ফারমেণ্টেশন বিশেষ বিশেষ জীবাণুর দ্বারাই সর্বদা সজ্ঘটিত হয়। সুতরাং বুঝতে হবে, এটি নিশ্চয়ই এই সকল জীবাণুর কোন এক সমস্যার সঙ্গে জড়িত। এই সমস্যা হচ্ছে—শক্তি। জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজন তাদের দৈহিক উপাদানের সৃষ্টি। এই সৃষ্টি হয় খাদ্যকণাগুলির রাসায়নিক সংযোগে, বিভিন্ন অনুঘটকের সাহায্যে। আর এর জন্যে চাই প্রচুর শক্তি। কারণ যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটনের জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন। তেমনি কোন একটি বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের গঠনের মধ্যে কিছু পরিমাণ শক্তি বাঁধা থাকে বলা যায়। এই গঠনের পরিবর্তন হলে এই বাঁধা শক্তির পরিমাণও কম-বেশী হয়। পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন দ্রব্যটির বাঁধা শক্তি যদি কম হয়, তবে এই পরিবর্তনের ফলে প্রথমোক্ত দ্রব্যটির বাঁধা শক্তি কিছুটা ছাড়া পায়। যেমন গ্লুকোজের অ্যালকোহলে পরিণতির ফলে গ্লুকোজের অণু প্রতি ৫০,০০০ ক্যালরি তাপ ছাড়া পায়। এই শক্তিকে জীবাণুগুলি তাদের দৈহিক উপাদান সৃষ্টির কাজে লাগায়। তবে ছাড়া পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই শক্তিকে কাজে লাগানো যায় না। তাই সাধারণতঃ ATP (Adenosine triphosphate) এই শক্তিসমৃদ্ধ ফস্‌ফেট লবণ সৃষ্টির মাধ্যমে এই শক্তি সংরক্ষণ করা হয়। সাধারণতঃ একটি ATP সৃষ্টির জন্যে ১০,০০০ ক্যালরি তাপ প্রয়োজন হয় এবং একটি গ্লুকোজ অণুর ফারমেণ্টেশনের ফলে সাধারণতঃ দুটি ATP-র সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ ফারমেণ্টেশনের ফলে ছাড়া পাওয়া শক্তির প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ এই জীবাণুগুলি কাজে লাগায় এবং এটাই ফারমেণ্টেশনের সার্থকতা।

বিজ্ঞান-সংবাদ

'লেসার' আলোকরশ্মির সাহায্যে টেলি-ভিশন চিত্র প্রেরণে বিজ্ঞানীদের অভিনব সাফল্য

টোরেন্স (ক্যালিফোর্ণিয়া)—'লেসার' নামে পরিচিত অতি তীব্র এবং সূক্ষ্ম আলোকরশ্মির সাহায্যে টেলিভিশনের চিত্রাদি প্রেরণের সম্ভাবনা সম্পর্কে "নর্থ আমেরিকান এভিয়েশন কোম্পানীর" একদল বিজ্ঞানী যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতেছিলেন, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বর্তমানে মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে টেলিভিশনের চিত্রাদি প্রেরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু 'লেসার' আলোকরশ্মির শক্তির তুলনায় মাইক্রোওয়েভের শক্তি অতি তুচ্ছ। আটলান্টিক সমুদ্রের তলা দিয়া যে 'কেবল' পাতা হইয়াছে, তাহার সাহায্যে টেলিভিশনের একটি মাত্র চ্যানেল বা গতায়াতের পথ করাও সম্ভব নয়। আমেরিকার টেলস্টার উপগ্রহটি ঐরূপ একটি মাত্র পথ করিবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু লেসার আলোকরশ্মির একটি মাত্র সূক্ষ্ম ধারা এক কোটি টেলিভিশন চ্যানেল সৃষ্টি করিতে পারে। লেসার আলোকরশ্মির গবেষণায় এই অসাধারণ সাফল্য হইতে ভবিষ্যতে ভূপৃষ্ঠে এবং মহাশূন্যপথে যোগাযোগ সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। কল্পনাতীত দূরত্ব অতিক্রম করিবার ক্ষমতা থাকায় এই লেসার আলোকরশ্মিকে মহাশূন্যে ভ্রাম্যমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজে লাগানো যাইবে।

এখানকার বিজ্ঞানীদলের আবিষ্কৃত পন্থাটি সংক্ষেপে এইরূপ—হিলিয়াম ও নিয়ন গ্যাসের সাহায্যে প্রথমে লেসার আলোকের একটি সূক্ষ্ম রশ্মি সৃষ্টি করা হয়। এই রশ্মির মাধ্যমে টেলিভিশন সিগ্‌ন্যাল পাঠানো হয় এবং অপর একটি পদ্ধতির সাহায্যে ঐ সিগ্‌ন্যালগুলির রূপান্তর ঘটানো হয়। রূপান্তরিত সিগ্‌ন্যালগুলিকে অতঃপর টেলিভিশনের চিত্ররূপ দান করা হয়।

আয়নমণ্ডল সম্পর্কে নতুন তথ্য

ওয়াশিংটন—বৃটিশ উপগ্রহ এরিয়েল এবং ক্যানাডিয়ান উপগ্রহ অ্যালুয়েট আয়নমণ্ডল সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছে। বৈদ্যুতিক প্রবাহে পূর্ণ এই আয়নমণ্ডল আবহমণ্ডলেরই অংশ। পৃথিবীর এক বেতারকেন্দ্র থেকে দূরবর্তী কোন কেন্দ্রে সঙ্কেত পাঠাবার সময় আয়নমণ্ডলে তা প্রতিহত করে কোণাকুণি পথে পাঠানো হয়। আবহমণ্ডলের উপরিভাগ উত্তপ্ত করা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেতার সঙ্কেত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ব্যাপারে ভ্যান অ্যালেন বলয়ের যে ভূমিকা রয়েছে, এই উপগ্রহ দুটি সে সম্পর্কে প্রথম প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করেছে। এর আগে মনে করা হতো, সূর্য থেকে তেজ বিকিরণের ফলেই এসব ঘটে থাকে।

গত ১৩ই মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার গডার্ড স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে উপগ্রহ সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় বিজ্ঞানীরা উল্লিখিত তথ্য প্রকাশ করেছেন।

এরিয়েল মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় ১৯৬২ সালের ২৬শে এপ্রিল। এটিই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হিসাবে মহাশূন্যে প্রেরিত প্রথম উপগ্রহ। এতে আয়নমণ্ডলের নিম্নভাগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের উপযুক্ত করে যন্ত্রপাতি সন্নিবেশ করেছেন বৃটিশ বিজ্ঞানীরা। অ্যালুয়েট উপগ্রহটি তৈরী করেছেন

ক্যানাডার বিজ্ঞানীরা। উপরিভাগ থেকে আয়ন-মণ্ডল পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহের জন্যে ১৯৬২ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর এই উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপনকারী উপগ্রহ

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন এবং সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সাহায্য করবার জন্যে নতুন পর্যায়ের আবহাওয়া নির্ণায়ক কৃত্রিম উপগ্রহ চালু করবার প্রশ্নটি জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা (যুক্তরাষ্ট্র) বিবেচনা করছেন।

পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে এই সব কৃত্রিম উপগ্রহ সমুদ্রে ভাসমান বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত বয়া এবং দুর্গম অঞ্চলে স্থাপিত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা সমন্বিত আবহাওয়া-কেন্দ্র থেকে তথ্যাদি সংগ্রহ করবে। পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে ঐ উপগ্রহ তার সংগৃহীত তথ্যগুলি পৃথিবীর গ্রাহক-কেন্দ্রের নিকট প্রেরণ করবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানবার জন্যে যাদের আগ্রহ আছে, তাদের নিকট ঐ কেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার তথ্যাদি প্রেরণ করা হবে।

টাইরোস উপগ্রহের সাফল্য থেকে জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা (ন্যাসা) এই জাতীয় উপগ্রহ চালু করবার কথা বিবেচনা করছেন। প্রথম টাইরোস মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবার পর আড়াই মাস চালু ছিল এবং ঐ সময়ের মধ্যে আবহাওয়া সম্পর্কিত ২৩ হাজার ছবি বেতারে প্রেরণ করে। ৩নং টাইরোস ১৯৬১ সালের জুলাই মাসে মহাকাশে প্রেরিত হয় এবং আটলান্টিক মহাসাগরে ৫৫টি ও প্রশান্ত মহাসাগরে ১২টি ঝড়ের উৎপত্তি-স্থল নির্ণয় করে। তার এক বছর পরে ৫নং টাইরোস মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং গত ডিসেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের উৎপত্তির পূর্বাভাস জ্ঞাপন করে। কলকাতার আবহাওয়া অফিসের কর্মচারীগণ এই ঝড়ের যে পূর্বাভাস পেয়েছিলেন, তাদের সেই আশঙ্কা ৫নং টাইরোস থেকে প্রাপ্ত সংবাদের সঙ্গে মিলে যায় এবং সত্যে পরিণত হয়।

ন্যাসা কর্তৃপক্ষ বলেছেন, নতুন ধরণের উপগ্রহ থেকে আবহাওয়া সম্পর্কিত সংবাদাদি প্রাপ্তির ফলে সমুদ্রের আবহাওয়া সম্পর্কে লোকের জ্ঞান আরও বাড়বে। এর ফলে ঝড় এড়িয়ে জাহাজ চালাবার সতর্কবাণী আরও ভালভাবে প্রচার করা এবং ঝড়ের দরুণ জাহাজের ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে। সমুদ্রের কোথাও বরফের পাহাড় থাকলে তাও এই উপগ্রহের সহায়তায় জানা সম্ভব হবে।

সমুদ্রের বিভিন্ন জায়গায় যে সব বয়া রাখা হবে, সেগুলিতে সমুদ্র ও বায়ুর তাপ সংগ্রহ করা, ঢেউয়ের উচ্চতা এবং সমুদ্রের গভীরতা নিরূপণের জন্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি থাকবে। অতিশয় দুর্গম অঞ্চলে যে সব আবহাওয়া-কেন্দ্র থাকবে, সে-গুলিতেও তাপ পরিমাপ, বায়ুমণ্ডলের চাপ, বাতাসের গতি প্রভৃতি নিরূপণের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হবে।

ভূপৃষ্ঠের আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে যেমন কেন্দ্র থাকবে, তেমনি সমুদ্রের উপর ঝুলন্ত অবস্থায় বেলুন এবং জাহাজের সাহায্যে সমুদ্র সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে।

পৃথিবীর শতকরা ৮০ ভাগ জল; কাজেই নতুন পর্যায়ের কৃত্রিম উপগ্রহের সহায়তায় আবহাওয়া সম্পর্কিত সংবাদাদি আরও ভাল-ভাবে পূর্বেই জানা সম্ভব হবে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ ঃ সপ্তম সংখ্যা

পান্থ-পাদপ

এই গাছের পাতার গোড়ার দিকের ডাঁটাগুলি অনেকটা ফাঁপা এবং সেগুলি জলপূর্ণ থাকে। পাতার ডাঁটা কাটলেই প্রচুর জল নির্গত হয়। মাডাগাস্কারে এই গাছ দেখা যায়। অবশ্য আমাদের দেশেও কোন কোন জায়গায় এই গাছ রোপণ করা হয়েছে।

জীবাণুর কথা

জীবাণু পৃথিবীর অতি প্রাচীন অধিবাসী। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদের শক্তি অসাধারণ। জলে-স্থলে, আকাশে-বাতাসে, জীবিত ও মৃত শরীরে—সর্বত্রই এদের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অনেকেই অক্সিজেনের অভাবেও বেঁচে থাকতে পারে। খালি চোখে এদের দেখা যায় না, কিন্তু মাইক্রস্কোপের সাহায্যে এদের ক্রিয়াকলাপ দেখা যেতে পারে।

প্রসিদ্ধ জার্মান বৈজ্ঞানিক অ্যান্টন ডি. বেরী (১৮৩১-১৮৮৮) ছত্রাক থেকে সর্বপ্রথম জীবাণু পৃথক করতে সক্ষম হন। এরা এককোষী প্রাণী—আকারে এক মিলিমিটারের এক শত ভাগের একভাগেরও কম। এই এককোষী প্রাণীগুলি গোল, লম্বা, প্যাঁচানো ইত্যাদি নানা রকমের হতে পারে। অনেক সময় কয়েকটি কোষ একত্রিত হয়ে সূক্ষ্ম তন্তুর আকার ধারণ করে। প্রত্যেকটি কোষের নির্দিষ্ট দেয়াল থাকে। সাধারণতঃ এদের প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ বা জৈবপঙ্ক রং-বিহীন ও সমজাতীয় হয়, যদিও নানা রকমের রঞ্জক পদার্থ থাকতে পারে। প্রকৃত অর্থে এদের নিউক্লিয়াস অনুপস্থিত থাকে। এককোষী জীবাণুগুলিকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে:

১। ব্যাসিলি—এরা দেখতে সরু কাঠির মত—যেমন, ব্যাসিলাস টিটানি।

২। কক্সি—এদের আকার গোল—যেমন, ষ্ট্রেপ্‌টোকক্কাস।

৩। স্পাইরিলা—এদের আকার স্ক্রুর মত প্যাঁচানো—যেমন, স্পাইরিলাম।

৪। কমা—এরা দেখতে কমার মত—যেমন, ভাইব্রো কলেরি।

দুই রকমে এদের বংশবৃদ্ধি হয়ে থাকে: ১। কোষের মাঝামাঝি একটি সঙ্কোচন হয়। এই সঙ্কোচনটি ক্রমশঃ গভীর হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত কোষটি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। অনেক সময় প্রোটোপ্লাজম সঙ্কুচিত হয়ে পৃথক আকার ধারণ করে। তারপর চারপাশে একটি দেয়ালের সৃষ্টি করে। এদের "এণ্ডোস্পোর" বলে। এদের প্রতি-রোধক ক্ষমতা অপরিসীম। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা—যে কোন ঋতুতে এরা বেঁচে থাকতে পারে। ২। উপযুক্ত সময়ে কোষের দেয়াল ভেদ করে বীজরেণু বা স্পোর বেরিয়ে আসে এবং প্রত্যেকটি স্পোর থেকে একটি করে জীবাণু সৃষ্টি হয়।

অনেক সময় তন্তুর আকৃতিবিশিষ্ট জীবাণুর কোষের একদিকে "কোনিডিয়ার" (এরাও এক রকমের স্পোর) সৃষ্টি হয়। তন্তু থেকে এরা আলাদা হয়ে যায়; কিন্তু এণ্ডোস্পোরের মত এদের প্রতিরোধ শক্তি নেই। বাতাসে ভেসে বেড়াবার সময় এরা কোন জায়গায় স্থিতিলাভ করে এবং বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে।

জীবাণুদের কোষে ক্লোরোফিল থাকে না। স্বাভাবিক বাসস্থান ও পুষ্টির ভিত্তিতে এদের নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

১। স্যাপ্রোফাইটিক জীবাণু—মৃত উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থ যেখানে থাকে, এদের আবাস সেখানে। এরা উভচর। ঐ জৈব পদার্থকেই এরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর ধ্বংসের কারণ এরাই। আবার এদের উপস্থিতিই কোন পদার্থের পচে যাবার কারণ। তরল খাদ্যদ্রব্যাদি গেঁজে যাবার কারণও এরাই। এরূপ গেঁজে যাওয়াকে বলা হয় ফারমেণ্টেশন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঈষ্টের কথা বলা যেতে পারে।

২। পরজীবী জীবাণু—জীবন্ত প্রাণী ও গাছপালার শরীরকে নিজেদের আবাসস্থলে পরিণত করে এরা তাদেরই দেহ থেকে খাদ্য আহরণ করে। আমাদের অনেক রোগের কারণও জীবাণু, যেমন—টাইফয়েডের জীবাণু—ব্যাসিলাস টাইফি, আমাশয়ের জীবাণু—ব্যাক্টিরিয়াম ডিসেণ্ট্রি।

৩। অটোট্রফিক জীবাণু—নাইট্রোজেন স্থিতি এবং অজৈব পদার্থের জারণ (Oxidation) থেকেও বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক জীবাণু তাদের শক্তি আহরণ করে, যেমন—নাইট্রোসোমোনাস, অ্যাজোটোব্যাক্টর ইত্যাদি।

যদিও পৃথিবীতে মৃত্যুদূত হিসাবেই জীবাণুদের দুর্নাম আছে, তথাপি তারা আমাদের অনেক উপকারও করে থাকে। মৃত জীবজন্তুর দেহকে ধ্বংস করে তার প্রোটিন এরা স্বতন্ত্র করে। সেই প্রোটিন উপযুক্ত আকারে উদ্ভিদেরা আহরণ করে। নাইট্রোজেন স্থিতিতেও (Nitrogen fixation) এদের অবদান কম নয়। গোবর, মলমূত্র প্রভৃতিকে এরাই উপযুক্ত সারে পরিণত করে। তাছাড়া দুধকে দইয়ে পরিণত করবার জন্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টিরিয়া এবং সুরাসার থেকে ভিনিগার প্রস্তুত করবার জন্যে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ব্যাক্টিরিয়ার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়।

শ্রীজয়দেব মিশ্র

গঙ্গাফড়িং

গঙ্গাফড়িং তোমাদের বোধ হয় অপরিচিত নয়। এদের চালচলন এবং শারীরিক কলাকৌশল সহজেই নজরে পড়ে। আমাদের দেশে মাঠ, বনজঙ্গল, বাগান প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় সচরাচর এদের দেখা যায়। কীট-পতঙ্গের শ্রেণীভুক্ত হলেও তাদের চালচলনের তুলনায় এদের চালচলনে বেশ কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য কীট-পতঙ্গ একমাত্র সামনের দিক থেকে শত্রুর আগমন বা অন্য কোন রকম বিপদের আভাস টের পেতে পারে, কিন্তু পিছন বা পাশের দিক থেকে শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার পূর্বে বিপদের আভাস পায় না। এদের শরীরের গঠন এমনই যে, মাথা বা ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকে দেখবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু গঙ্গাফড়িং মাথা ঘুরিয়ে চতুর্দিকের অবস্থা দেখে নিতে পারে।

গঙ্গাফড়িঙের লম্বা গলাটা প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে। এরা মানুষ বা অন্যান্য উন্নত প্রাণীদের মত মাথা ও ঘাড় ঘুরিয়ে চারদিকের অবস্থা তদারক করে। এদের মাথা ঘোরাবার ভঙ্গীটি দেখবার মত। এরা গলাটাকে বাড়িয়ে তাকে হেলিয়ে দুলিয়ে আশে-পাশের অবস্থাটা দেখে নেয়।

গঙ্গাফড়িঙের একটি অদ্ভুত স্বভাব হচ্ছে, আবছা কিছু দেখলেই সামনের পা দুখানা প্রার্থনারত মানুষের মত হাতজোড় করবার ভঙ্গীতে মাথাটাকে উঁচু করে আগন্তুকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। যতক্ষণ আগন্তুকের পরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়—ততক্ষণ আর স্থান ত্যাগ করে তার কাছে যায় না—ঐ ভাবেই থাকে। বার বার লম্বা গলাটা হেলিয়ে দুলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে—আবছা বস্তুটা কি ? সমগ্র শরীরের প্রায় অর্ধেকের মত লম্বা গলাটার সাহায্যে গঙ্গাফড়িং অনেক দূর থেকেই শিকার বা শত্রুর গতিবিধি বুঝতে পারে। সময় সময় মাথাটাকে চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শত্রু কিংবা শিকারের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। পর্যবেক্ষণরত গঙ্গাফড়িংকে দেখলে মনে হয় না যে, এরা নিম্নস্তরের সাধারণ কীট-পতঙ্গের জ্ঞাতিভাই। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র নানা জাতের বিভিন্ন আকৃতির গঙ্গাফড়িং দেখা যায়। সামনের দুখানা পা-কে প্রার্থনারত মানুষের জোড়হাতের মত ভঙ্গীতে ভাঁজ করে রাখে বলে এদের সাধারণতঃ বলা হয়—প্রার্থনারত ম্যান্টিশ। আমাদের দেশে এরা সাধারণতঃ গঙ্গাইলাস বা গঙ্গাফড়িং নামে পরিচিত। অন্যান্য ফড়িঙের দেহাকৃতির সঙ্গে এদের চেহারার কিছুটা মিল দেখা যায়। কিন্তু এদের নাম গঙ্গাফড়িং হলো কেন—তা বলা শক্ত। কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা গঙ্গাফড়িংকে বলে "সাপের মাসী"। সাপ যেমন ফণা তুলে এদিক-ওদিক দোলাতে থাকে, এরাও তেমনি গলা উঁচু করে মাথা দোলাতে থাকে। সম্ভবতঃ

এজন্যেই এদের 'সাপের মাসী' বলা হয়। আসলে সাপের সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই। তবে —এরা খুবই হিংস্র প্রকৃতির।

পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের ৮০০-এরও বেশী গঙ্গাফড়িঙের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের দেশেও কুড়ি-পচিশ রকম বিভিন্ন জাতের গঙ্গাফড়িং আছে। তবে এদের মধ্যে সবুজ বা কচিকলাপাতা রঙের গঙ্গাফড়িংই সাধারণতঃ বেশী দেখা যায়।

সাধারণতঃ সবুজ গঙ্গাফড়িং আড়াই থেকে তিন ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের চেহারাও অদ্ভুত। সমগ্র দেহের মধ্যে পেটটা প্রায় ১½ ইঞ্চি লম্বা এবং সরু কাঠির মত গলাটা ১ থেকে ১½ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। মনে হয়—ড্যাবড্যাবে দুটা বড় চোখওয়ালা ত্রিভুজাকৃতি মাথাটা যেন আল্‌তোভাবে গলাটার উপর বসানো আছে। মাথার দু-পাশে শিঙের মত ছোট্ট দুটি শুঁড় আছে। গলা ও পেটের সংযোগস্থলে আছে একজোড়া চ্যাপ্টা পা। এই পা-দুখানার গঠন অদ্ভুত। পায়ের উপরে-নীচে অনেকগুলি কাঁটা করাতের দাঁতের মত সারবন্দিভাবে সাজানো। এই পা দুখানি শিকার ধরবার জন্যে হাতের কাজ করে, অর্থাৎ শিকারকে এরা এই পায়ের সাহায্যে সাঁড়াশীর মত কায়দায় শক্ত করে চেপে ধরে। গঙ্গাফড়িঙের সাঁড়াশীর মত এই পা-দুখানা ছাড়া বাকী চারখানা পা থাকে পেটের সামনের দিকে। এই চারখানা পায়ের প্রান্তভাগে খুব ছোট্ট বাঁকানো নখ থাকে। এই পায়ের সাহায্যে এরা লতাপাতা, গাছপালা প্রভৃতির উপর অনায়াসে চলাফেরা করতে পারে। সামনের দুটি পায়ের সাহায্যে এরা শত্রুকে আক্রমণ করে, শিকারকে চেপে ধরে এবং শিকারকে মুখে পুরে দেয়। সামনের পা-দুখানা এদের আত্মরক্ষা ও আক্রমণের প্রধান হাতিয়ার।

শিকার একবার গঙ্গাফড়িঙের সাঁড়াশীর মত পায়ের কবলে পড়লে সে আর পালাবার পথ পায় না। শিকারকে ঘায়েল করে ধীরে ধীরে তাকে উদরসাৎ করতে থাকে। নানা জাতীয় কীট-পতঙ্গ হচ্ছে এদের প্রধান শিকার। কোন কোন দেশে এমন কয়েক জাতের গঙ্গাফড়িং দেখা যায়—যারা সুবিধা পেলে ছোট ছোট পাখী, ব্যাং, টিকটিকি প্রভৃতি শিকার করে উদরসাৎ করে।

আমাদের দেশের সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িং স্বজাতীয় ছোট ছোট গঙ্গাফড়িংকে বাগে পেলে খেতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। স্ত্রী-গঙ্গাফড়িঙের দাপটে পুরুষ গঙ্গাফড়িং খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। সুযোগ পেলে স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং পুরুষদের উদরসাৎ করতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করে না। গাছপালা, লতাপাতার সবুজ রঙের সঙ্গে এদের দেহের রং এমনভাবে মিলে যায় যে, শিকারের পক্ষে বোঝা কঠিন হয় যে, শত্রু তার পাশেই রয়েছে। শত্রুরা অনেক সময় এদের খুঁজে বের করতে হিমসিম খেয়ে যায়—লতাপাতার মধ্যে এরা এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে যে, বোঝাই যায় না এরা কোথায় আছে। এদের গায়ের সবুজ রং আত্মরক্ষা ও শিকার ধরবার পক্ষে খুবই সহায়ক। শিকারের খোঁজ পেলে এরা এক পা-দুই পা করে

তার কাছে গিয়ে চুপচাপ অবস্থান করে—তারপর সুযোগ বুঝে হঠাৎ সাঁড়াশীর মত পা-ছুখানা দিয়ে শিকারকে প্রবল শক্তিতে চেপে ধরে। সাধারণতঃ এরা শিকারের সন্ধানে লতাপাতার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। দরকার মত এরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ডানা মেলে উড়ে যায়।

কোন কোন জাতের গঙ্গাফড়িং অদ্ভুত কৌশলে শিকারকে প্রতারিত করে। লতাপাতা বা পত্র-পল্লবের উপর এরা এমনভাবে বসে থাকে যে, দেখলে মনে হয়—ফুল বা কচিপাতা। সামান্য বাতাসে পাতা বা ফুলগুলি যেমন আস্তে আস্তে ছুলতে থাকে, এরাও ঠিক তেমনি ভাবেই আস্তে আস্তে দোল খেতে থাকে। অন্যান্য কীট-পতঙ্গ ভুল করে ওখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই গঙ্গাফড়িঙের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারায়। গঙ্গাফড়িঙের অনুকরণ ক্ষমতা খুবই নিখুঁত।

প্রার্থনার ভঙ্গীতে গঙ্গাফড়িং

ব্রেজিলের একজাতের ক্ষুদ্রাকৃতির গঙ্গাফড়িং উইপোকা শিকার করে খায়। এজন্যে তারা উইপোকার চেহারা অনুকরণ করে থাকে। আমাদের দেশের সবুজ, কালো-ডোরা-কাটা ধূসর রঙের গঙ্গাফড়িংকে লতাপাতার মধ্য থেকে অনেক সময় চিনে বের করা কঠিন হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কয়েক জাতের গঙ্গাফড়িং দেখা যায়—যাদের হাতে নিয়েও বোঝা যায় না—সেগুলি শুকনো পাতা, না কোন জীবন্ত প্রাণী। এমনই দেহের গঠন-কৌশল যে, দেখলে অবাক হতে হয়।

আমাদের দেশে নালা-ডোবা ও পুকুরের মধ্যে কিছুটা গঙ্গাফড়িঙের আকৃতিবিশিষ্ট একজাতের পতঙ্গ দেখা যায়। এদের মুখের সামনে সাঁড়াশীর মত দুখানা পা আছে—পা দুখানা ভাঁজ করা থাকে। এর সাহায্যেই এরা শিকার ধরে। এদেরও গঙ্গাফড়িং-এর মত ডানা আছে। দরকার হলে এক জলাশয় থেকে অন্য জলাশয়ে উড়ে যায়। এদের প্রধান শিকার হলো ছোট ছোট মাছ—সে জন্যে এদের বলা হয় মেছো-গঙ্গাফড়িং।

গঙ্গাফড়িং সম্বন্ধে পৃথিবীর কোন কোন দেশে অদ্ভুত বিশ্বাস প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীকরা মনে করতো—এরা হচ্ছে ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী। তুরস্ক ও আরব দেশের কোন কোন অধিবাসীর ধারণা ছিল—সর্বদাই এরা মক্কার দিকে মুখ করে প্রার্থনা করে। বোধ হয় এদের অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতির জন্যেই এসব ধারণার সৃষ্টি হয়েছে।

স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং সুপুরীর মত একদিকে সূচালো একটি গুটির মধ্যে ডিম পাড়ে। সেটা কোন গাছের ডালে আট্‌কে থাকে। প্রতিটি গুটির মধ্যে ২২ থেকে ৪০টা পর্যন্ত ডিম থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের সুরুতেই ডিম ফুটে বাচ্চাগুলি গুটি থেকে বেরিয়ে আসে। বাচ্চাদের দেহাকৃতি পূর্ণাঙ্গ গঙ্গাফড়িঙের মতই হয়, তবে বাচ্চা অবস্থায় তাদের গায়ের রং কালো হয় এবং ডানা থাকে না। ক্রমশঃ খোলস বদ্‌লে বাচ্চাগুলি পূর্ণাঙ্গ গঙ্গাফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। বাচ্চা গঙ্গাফড়িঙের চালচলনও খুব অদ্ভুত। ভয় পেলে সবাই ছুটে গিয়ে এক জায়গায় জমায়েৎ হয় এবং মাথা ঘুরিয়ে বা লম্বা গলা বাড়িয়ে চারদিকের অবস্থাটা ভাল করে বোঝবার চেষ্টা করে। ভয় কেটে গেলেই আবার এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি সুরু করে।

শ্রীদেবব্রত মণ্ডল

যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস

(কথায় ও চিত্রে)

১। আজ এবং আগামী কাল—বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীর চারদিকে বর্তমানে টেলিভিসন ও টেলিফোন সঙ্কেত 'রিলে' করা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কেউই বলতে পারেন না—বার্তা প্রেরণের ইতিহাসে ভবিষ্যতে আরও কি উন্নতি ঘটবে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই

১নং চিত্র।

মানুষ নিখুঁতভাবে বার্তা প্রেরণের চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু তখন সে চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

২। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সংবাদ জানাবার পদ্ধতি—প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ গুহার দেয়ালের গায়ে ছবি এঁকে মনের ভাব প্রকাশ করতো বা সঙ্কেত জানাতো। বিভিন্ন ছবির অর্থও ছিল বিভিন্ন। সম্ভবতঃ মানুষ এভাবেই প্রথম সংবাদ

আদান-প্রদান করতে থাকে। এর অনেক পরে লিখিত ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কোন

২নং চিত্র।

কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়—ছবির সাহায্যে সঙ্কেত পাঠাবার পদ্ধতি চালু হবার পরে মানুষের কথ্যভাষার উন্নতি হয়েছে।

৩। যুক্তরাষ্ট্রের আদিম অধিবাসীদের সংবাদ প্রেরণের কৌশল—আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা দূরবর্তী স্থানে বেশ কায়দা করে সংবাদ পাঠাতো। ধোঁয়া, ড্রাম বা কাঠের

৩নং চিত্র।

ফাঁপা গুঁড়ির সাহায্যে সঙ্কেত সৃষ্টি করে তারা 'রীলে' পদ্ধতিতে মাইলের পর মাইল কয়েক মিনিটের মধ্যে খবর পাঠিয়ে দিত। সংবাদ প্রেরণের সময় এরা সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করতো।

৪। রানারের সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ—বহু দেশেই রানারের সাহায্যে সংবাদ

পাঠানো হতো। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা এই পদ্ধতিতে সংবাদ প্রেরণ করলেও সংবাদ প্রেরণের ইতিহাসে এটি খুব পুরনো ঘটনা। পায়রার সাহায্যে বার্তা আদান-

৪নং চিত্র।

প্রদান বহুদিন যাবৎ চলেছিল। তারপর এই পদ্ধতিতে সংবাদ আদান-প্রদান বহুলাংশে বন্ধ হয়ে যায়। মাত্র কয়েক বছর হলো যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী পায়রার সাহায্যে সংবাদ পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে।

৫। সহরের সংবাদ-ঘোষক—আজকে যে রকম মুদ্রিত সংবাদ-পত্র দেখা যায়—প্রাচীনকালে কিন্তু সে রকম কোন সংবাদ-পত্র ছিল না। একজন লোক সহরের রাজপথ
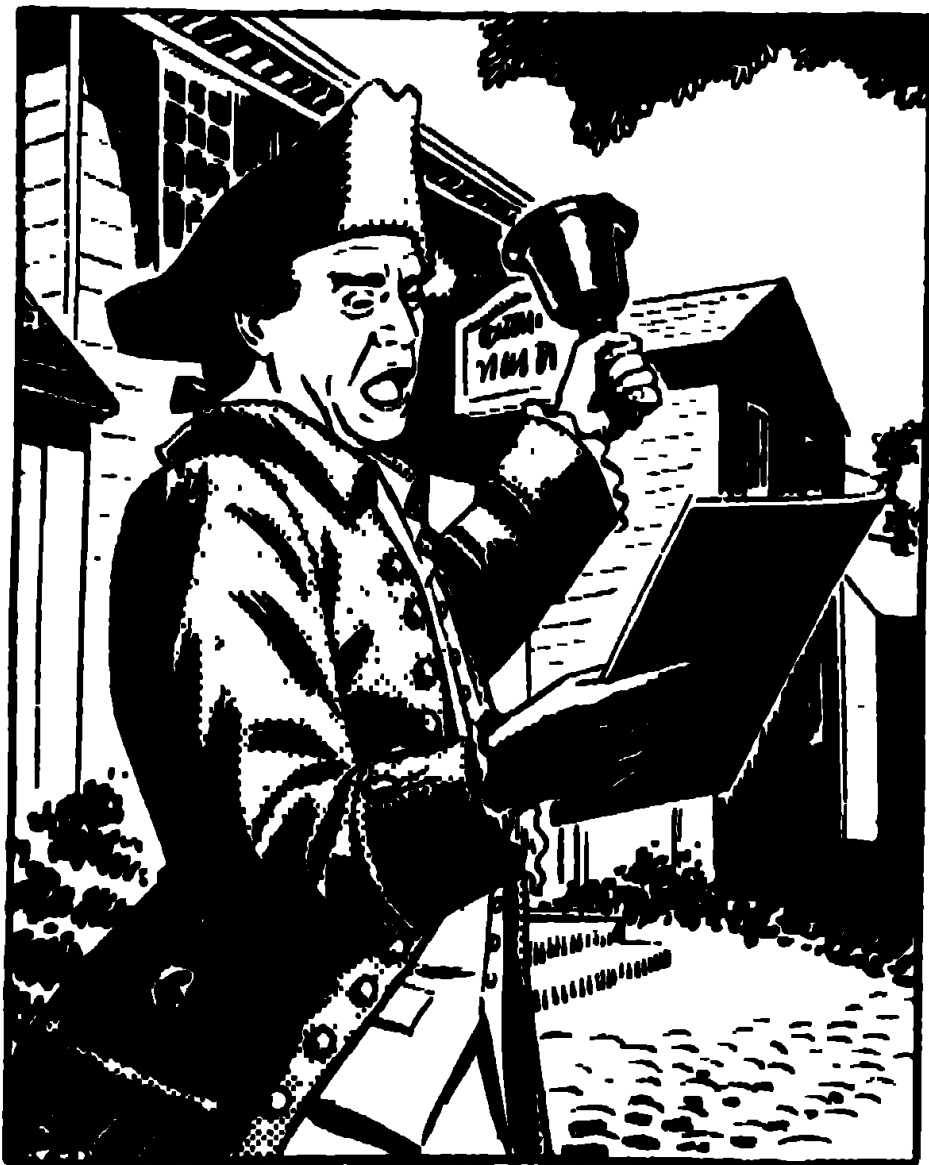
৫নং চিত্র।

দিয়ে বিভিন্ন সংবাদ ঘোষণা করে যেত। এক হিসাবে এই সংবাদ-ঘোষককেই "সংবাদ-পত্র" বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আজকের দিনে এই ধরণের চিন্তা বাতুলতা বলে মনে

হবে। কিন্তু তখনকার দিনে সাধারণ লোক সংবাদ-ঘোষকের মারফৎ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা খোঁজখবর পেত।

৬। যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রাচীন আদর্শ—ইংল্যাণ্ডের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে আমেরিকায় যখন লড়াই চলছিল, সেই সময়ে বিখ্যাত অশ্বারোহী পল রিভেরিয়ার স্বাধীনতা-প্রিয় যোদ্ধাদের এই সঙ্কেতটি জানিয়ে সাবধান করে দিতেন যে, গীর্জার চূড়ায়

৬নং চিত্র।

যদি একটা লণ্ঠন জ্বলতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে—শত্রু স্থলপথে আক্রমণ করবে, আর যদি দুটা লণ্ঠন জ্বলতে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে—শত্রু জলপথে আক্রমণ চালাবে।

৭। সংবাদ-পত্র—যোহান্স গুটেনবার্গের মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে সংবাদ

৭নং চিত্র।

আদান-প্রদানের ইতিহাসে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে। এর ফলে সহজে সংবাদ-পত্র, পুস্তক,

পত্রিকা ইত্যাদি মুদ্রণ করা সম্ভব হয়। ফলে মানুষ তার চিন্তাধারা সহজে প্রকাশ করবার সুযোগ পায় এবং বিভিন্ন খবর আরও বেশী পরিমাণে জানতে পারে। তাছাড়া মানুষ বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ জেনে সে সম্বন্ধে তাদের মত প্রকাশেও সক্ষম হয়।

৮। জেঙ্গার—ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ-পত্র প্রকাশক জন পিটার জেঙ্গারের বিচারের সংবাদ প্রকাশ সংবাদ প্রচারের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জেঙ্গারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল—তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন শাসনকর্তা ইংরেজদের

৮নং চিত্র।

বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করেছেন। বিচারে জেঙ্গার মুক্তি লাভ করেন এবং সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আজও যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদ-পত্রের সেই স্বাধীনতা বজায় আছে।

৯। ওয়েবষ্টার—১৮২৮ সালে নোহা ওয়েবষ্টার যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম একটি পূর্ণাঙ্গ
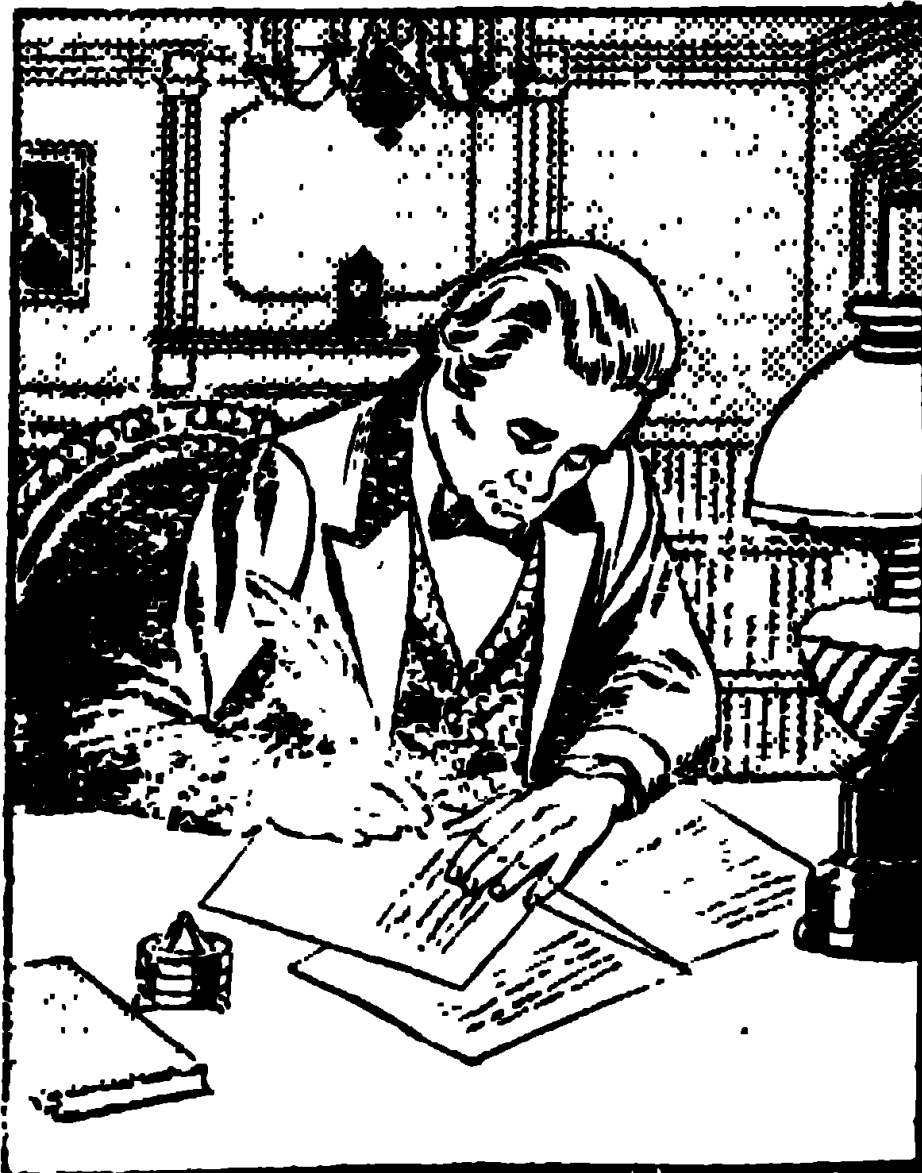
৯নং চিত্র।

অভিধান প্রণয়ন করেন। ফলে সাধারণ লোকের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সহজসাধ্য

হয় এবং জ্ঞানের বিস্তারও দ্রুততর হতে থাকে। ওয়েবষ্টারের অভিধান প্রকাশিত হবার পর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পসায়ারে প্রথম সাধারণের ব্যবহারোপযোগী পাঠাগার স্থাপিত হয়।

১০। সমুদ্রে সংবাদ-প্রেরণ—বেতারে বার্তা-প্রেরণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার আগে সমুদ্রে বার্তা-প্রেরণ খুবই অসুবিধাজনক ছিল। দিনের বেলায় সঙ্কেত-নির্দেশক পতাকা আর রাত্রিবেলায় আলোর সাহায্যে সঙ্কেত পাঠানো হতো। সীমাফোর পদ্ধতিতেও সংবাদ

১০নং চিত্র।

পাঠানো হতো। জরুরী অবস্থায় রকেটের সাহায্যেও সংবাদ প্রেরণ করা হতো। কুয়াশা থাকলে ঘণ্টা, শিঙ্গা, বাঁশী প্রভৃতির সাহায্যে সতর্কতামূলক সঙ্কেত জানানো হতো।

১১। মর্স—'ভগবান কি করেছেন'—এই কথাটিই ১৮৪৪ সালে প্রথম টেলিগ্রাফের

১১নং চিত্র.

সাহায্যে প্রেরিত হয়। সেই সময় টেলিগ্রাফের সাহায্যেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে

খুব তাড়াতাড়ি সংবাদ পাঠানো সম্ভব ছিল। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন চিত্রশিল্পী স্যামুয়েল এফ. বি. মর্স। সংবাদ-প্রেরণের ইতিহাসে টেলিগ্রাফের আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

১২। ঘোড়ার ডাক—১৮৬০ সালে মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অতি দ্রুত সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এই ব্যবস্থা "পনি এক্সপ্রেস" বা "দ্রুতগামী টাট্টু ঘোড়ার ডাক" হিসাবে বিখ্যাত। অবশ্য এই ব্যবস্থা দু-বছরেরও

১২নং চিত্র।

কম সময় চালু ছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। টেলিগ্রাফের লাইন বসিয়ে দ্রুত সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়। টাট্টু ঘোড়ার ডাক অল্পদিন স্থায়ী হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। টাট্টু ঘোড়ার ডাক সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তীও প্রচলিত ছিল।

১৩। টিলম্যান—১৮৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন বাদে

১৩নং চিত্র।

যুক্তরাষ্ট্রের টিলম্যান ভ্রাতৃদ্বয় কাঠকে কাগজে পরিণত করবার কৌশল আবিষ্কার করেন। ফলে পুস্তক, পত্রিকা প্রভৃতি প্রকাশের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়। কারণ কাগজের দামও আগের তুলনায় অনেক কমে যায়। অল্প খরচে বেশী পুস্তক, সংবাদ-পত্র, সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ায় সকলের পক্ষে তা সহজলভ্য হয়।

১৪। টাইপ রাইটার—১৮৬৭ সালে উইস্‌কন্‌সিনের অন্তর্গত মিলউইকিতে তিন ব্যক্তি প্রথম ব্যবহারোপযোগী টাইপ রাইটার যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হন। এই তিন জনের মধ্যে এই ব্যাপারে সর্বাধিক সুদক্ষ ব্যক্তির নাম ক্রিষ্টোফার সোলস্‌। সম্পাদনা ছিল তাঁর পেশা।
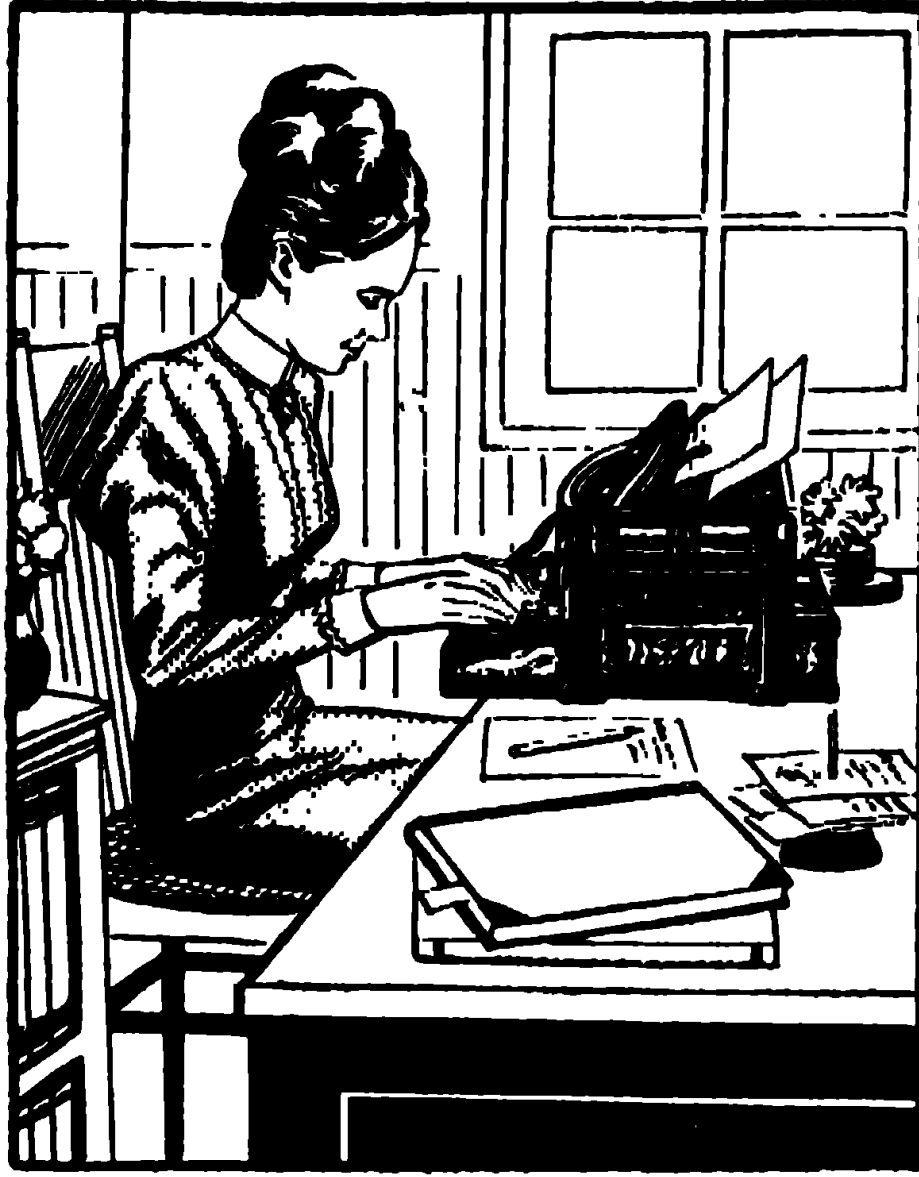
১৪নং চিত্র।

এঁরা টাইপ রাইটারকে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিক্রয় করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বর্তমানে শিক্ষা ও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে টাইপ রাইটার যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১৫। বেল—আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল কর্তৃক টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কারের পর
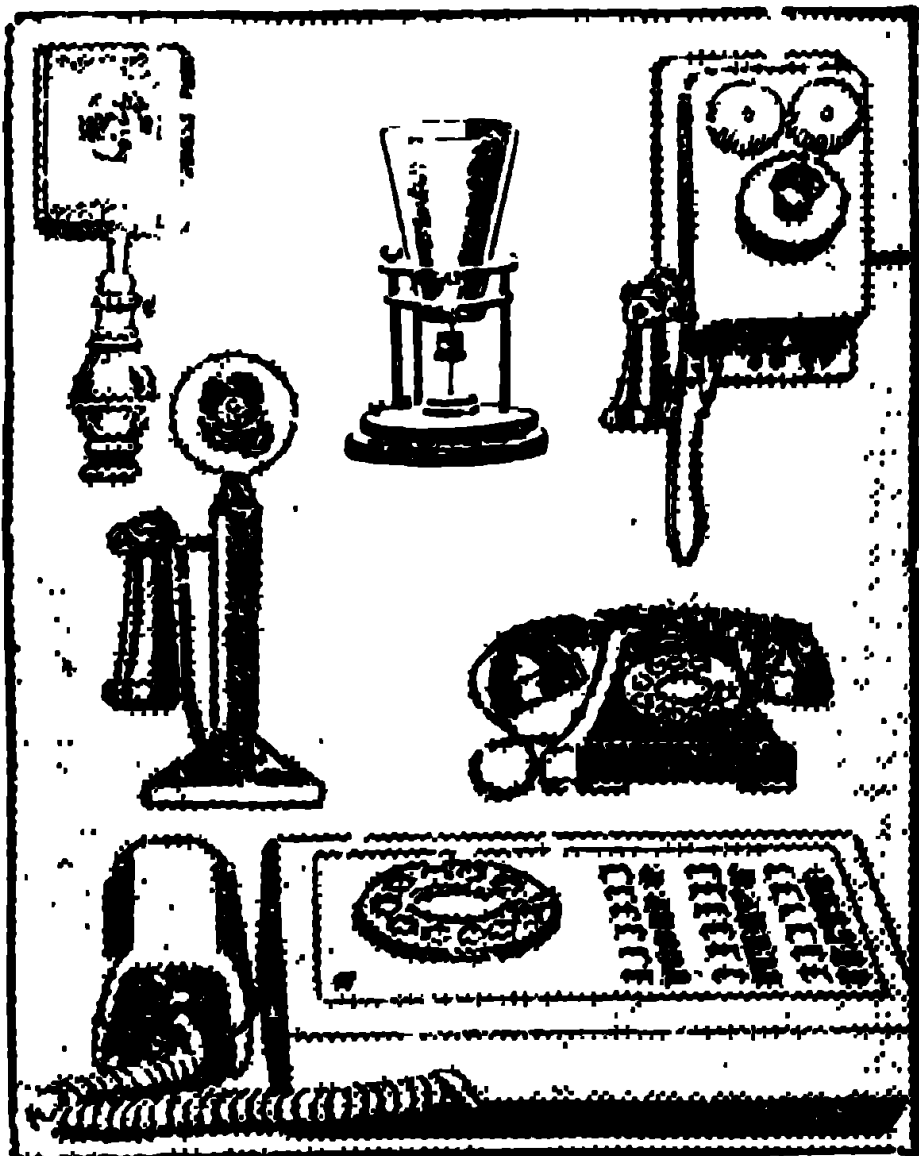
১৫নং চিত্র।

অনেকেই ভেবেছিলেন—বার্তা-প্রেরণ ব্যবস্থার উন্নতির শেষ অধ্যায় হচ্ছে টেলিফোন। ১৮৭৬ সালে গ্র্যাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর প্রথম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপিত হয় কনেকটিকাটের নিউহ্যাভেনে। আজ পৃথিবীর সবদেশেই টেলিফোন চালু হয়েছে এবং সংবাদ প্রেরণের ক্ষেত্রে টেলিফোনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৬। ফিল্ম—১৮২২ সাল নাগাদ ক্যামেরার সাহায্যে ফটো তোলা সম্ভব হয়। কিন্তু জর্জ ইষ্টম্যানের নমনীয় ফিল্ম আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত ক্যামেরার ব্যাপক সম্ভাবনার কথা উপলব্ধি করা যায় নি। ১৮৮৯ সালে ইষ্টম্যান এই ফিল্ম আবিষ্কার করেন। এর

১৬নং চিত্র।

আগে কাচের প্লেটেই নেগেটিভ তৈরী হতো। গুটানো ফিল্ম আবিষ্কৃত হবার পর প্রায় সকলের পক্ষেই ক্যামেরা ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

১৭। চলচ্চিত্র—ইষ্টম্যানের ফিল্ম আবিষ্কারের ফলে চলচ্চিত্র তোলবার ক্যা মেরা

১৭নং চিত্র

নির্মাণ করা সম্ভব হয়। ১৮৯৪ সালে টমাস এডিসন তাঁর প্রথম ক্যামেরা এবং প্রোজেক্টর যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন। ফলে চলচ্চিত্র-শিল্পের সূচনা হয়। আজ সারা পৃথিবীতে চলচ্চিত্র-শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। আনন্দদান করা ছাড়াও চলচ্চিত্রের সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে।

১৮। ডাকবাহী বিমান—১৯১৮ সালে বিমানের সাহায্যে পৃথিবীর প্রথম ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা ওয়াশিংটন. ডি. সি. এবং ফিলাডেলফিয়ার নিউইয়র্ক সহরের মধ্যে চালু হয়। বিমান চালাবার ব্যবস্থা তখন আজকের মত উন্নত ছিল না এবং যন্ত্রপাতিও নিখুঁত
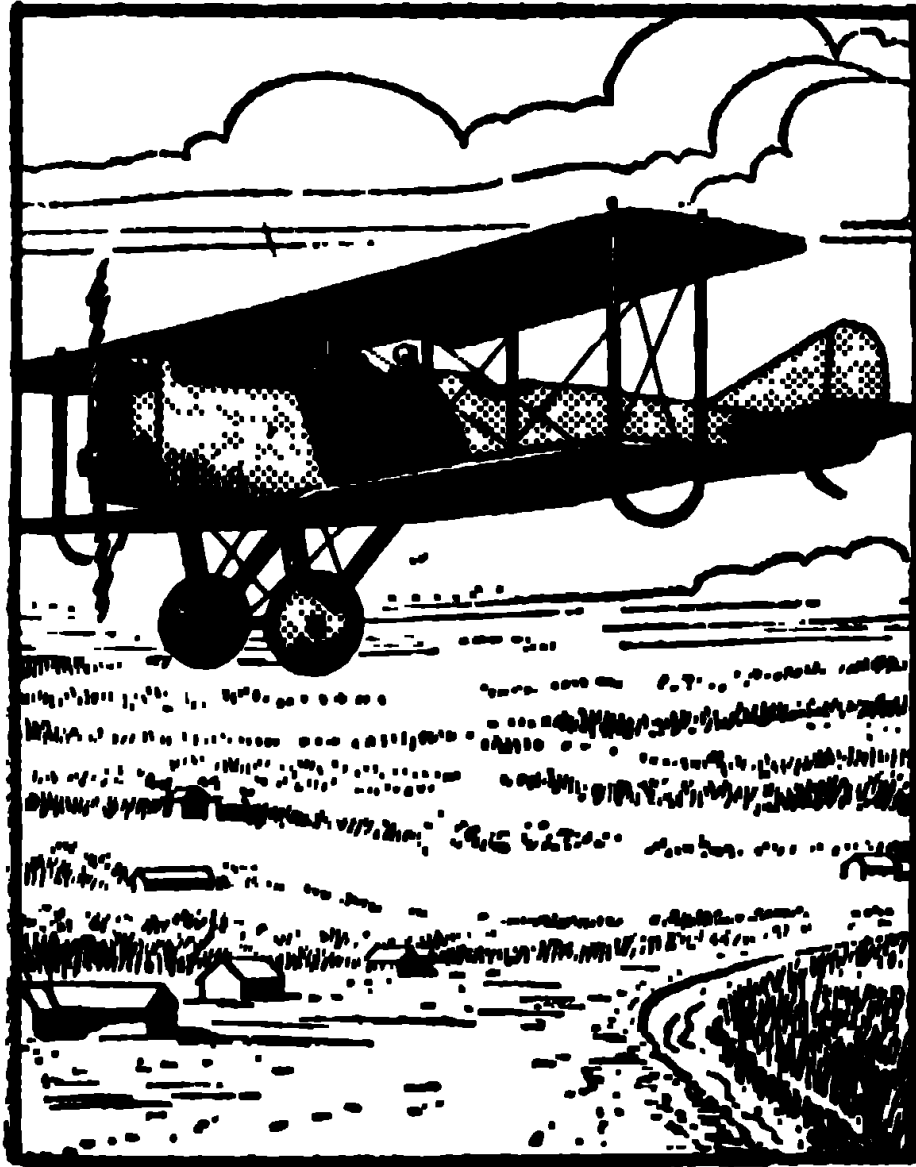
১৮নং চিত্র।

ছিল না। পরে অবশ্য বিমানের সাহায্যে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। আজ সারা পৃথিবীতে বিমানে ডাক প্রেরণ করা হয়।

১৯। রেডিও—যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা বিজ্ঞানী লি. ডি-ফরেষ্টের ছোট্ট অডিয়ন টিউব আবিষ্কারের ফলে রেডিও তৈরী সম্ভব হয়। অডিয়ন টিউবের সাহায্যে শব্দকে

জোয়ালো করা যায়। ১৯২০ সাল নাগাদ সারা পৃথিবীতে রেডিও-স্টেশন স্থাপিত হয়।

১৯নং চিত্র।

রেডিওর সাহায্যে প্রায় মুহূর্তের মধ্যে সংবাদ দূরবর্তী স্থানে পাঠানো সম্ভব হয়। তাছাড়া নিরাপদে বিমান ও জাহাজ চালনায় রেডিওর সাহায্য অপরিহার্য।

২০। টেলিভিসন—বার্তা-প্রেরণের ইতিহাসে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা—টেলিভিসনের আবিষ্কার। ১৯৪০ সালের শেষাশেষি টেলিভিসন আবিষ্কৃত হয়। টেলিভিসন আবিষ্কারের ফলে একস্থানের কোন অনুষ্ঠানের দৃশ্য অন্য স্থানে বসে সঙ্গে সঙ্গে দেখা

২০নং চিত্র।

যায়। টেলিভিসন আবিষ্কারে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার অ্যালেন ডু মন্টের দান যথেষ্ট। তাঁর বহু বছরের চেষ্টার ফলে কার্যোপযোগী টেলিভিসন সেট তৈরী সম্ভব হয়।

২১। যোগাযোগ ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ—যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে আরও বিস্ময়কর উন্নতিবিধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট আছেন। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে বার্তা-প্রেরণ এই প্রচেষ্টারই একটি অংশ। টেলিভিসনসহ হাত-টেলিফোন উদ্ভাবনের
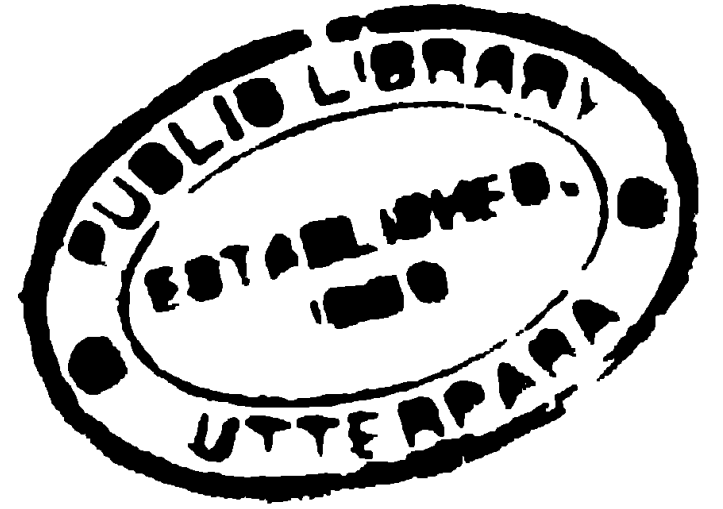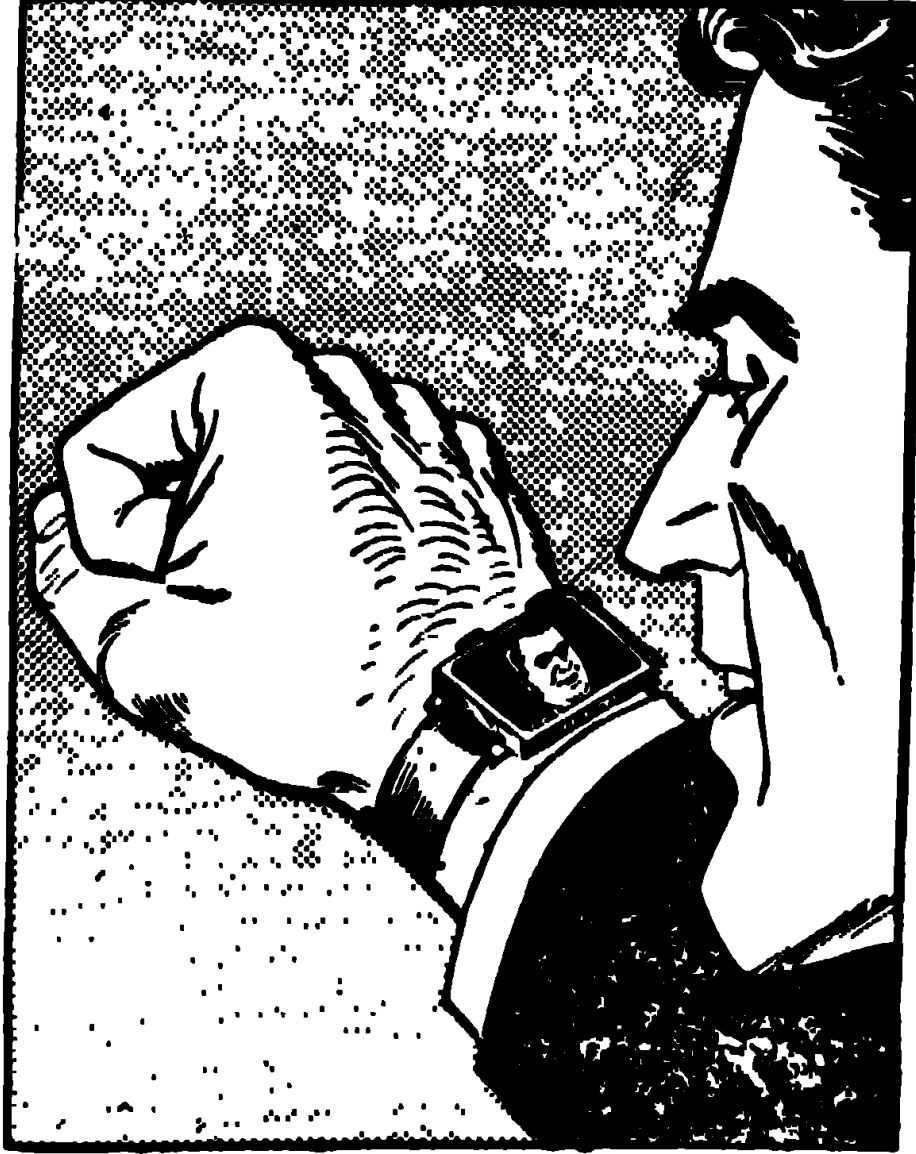
২১নং চিত্র।

জন্যে বিজ্ঞানীরা এখন গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসে যে একটি অকল্পনীয় ঘটনার সংযোজন হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিবিধ

সোভিয়েটের দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ পরিক্রমা

মনুষ্য-আরোহী সহ একখানা মহাকাশযান ১৪ই জুন শুক্রবার ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বৈকাল ৫-৩০ মিঃ-এ মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হয়।

মহাকাশচারীর নাম হইতেছে ভ্যালেরি বিকোভস্কী—তিনি ৮৮ মিনিটে প্রত্যেকবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহার পর গত ১৬ই জুন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী ভেলেন্টিনা টেরেস্কোভাও ভষ্টক-৬ মহাকাশযানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ সুরু করেন। মহাকাশচারীরা পৃথিবীর সঙ্গে বার্তা-বিনিময়ও করিয়াছেন।

মানব-দেহের উপর দীর্ঘস্থায়ী মহাকাশ-পরিক্রমার ফল কিরূপ হইতে পারে এবং যন্ত্রপাতিগুলি দীর্ঘস্থায়ী পরিক্রমার উপযোগী কি না, তাহা পরীক্ষা করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। পৃথিবী প্রদক্ষিণকালে মহাকাশযানের সর্বাধিক দূরত্ব ছিল ১৪৬ মাইল—সবচেয়ে কম দূরত্ব ছিল ১১২ মাইল। ১৯শে জুন দুইটি মহাকাশযানই পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী যাত্রীসহ নিরাপদে পৃথিবীতে অবতরণ করে।

ভারতীয় রকেট

হায়দরাবাদ হইতে ২১শে মে তারিখে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—এখানকার প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগারে দুই রকমের রকেট প্রস্তুত করা হইতেছে। ইহার একটি হইল ট্যাঙ্কধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে. রঘুরামাইয়া এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের বৈজ্ঞানিক

বিষয়ের উপদেষ্টা ডাঃ এস. ভগবস্তম ২১শে মে এই দুই ধরণের রকেট উৎক্ষেপ পরিদর্শন করেন।

প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন পরীক্ষাগার এবং প্রতিরক্ষা ইলেকট্রনিকস্ রিসার্চ লেবরেটরী যুক্তভাবে এই পরীক্ষা-কার্য সম্পাদন করেন।

যাঁহাদের চেষ্টায় এই রকেটগুলি প্রস্তুত হইতেছে, প্রতিরক্ষা উৎপাদন মন্ত্রী তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তুলসীর মাহাত্ম্য

নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ—'তুলসীতে' যক্ষ্মা-রোগের জীবাণুর বৃদ্ধি প্রতিরোধের শক্তি আছে বলিয়া দেখা গিয়াছে। ভারতে যুগের পর যুগ ধরিয়া এইরূপ ধারণা চলিয়া আসিতেছে যে, তুলসী ভেষজগুণসম্পন্ন এবং বহুপ্রকার ব্যাধিতে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বল্লভভাই প্যাটেল চেষ্ট ইনষ্টিটিউটে পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, তুলসী হইতে প্রাপ্ত তৈল যক্ষ্মা জীবাণুর প্রতিকূল।

আরও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, রসুনেও যক্ষ্মা জীবাণুর প্রতিকূল কিছু শক্তি আছে।

চাঁদে ভ্রমণের সমস্যা

গ্রহান্তরে ভ্রমণ যখন বাস্তবে পরিণত হবে এবং মানুষ যখন চন্দ্রে অবতরণ করবে, তখন সেই চন্দ্র-যাত্রীর সেখানে সফর করা সমস্যা হয়ে দেখা দিবে। কারণ কম্পাস বা দিক-নির্ণয় যন্ত্র চৌম্বক ক্ষেত্রের অভাবে কার্যকরী হবে না এবং সূর্যের সাহায্যে দিক নির্ণয় করাও সম্ভব হবে না। সুতরাং অভি-যাত্রীদের প্রতিপদে বেতার-সঙ্কেতের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

কলোরেডোর বোলডারস্থিত ন্যাশন্যাল ব্যুরো অব ষ্ট্যানডার্ডের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই সব সমস্যা দেখা দিবে বলে অনুমান করেছিলেন। চাঁদের উপরিভাগ ও অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁরা বলেছেন যে, চাঁদের উপরিভাগে ১৬ ওয়াটের একটি অ্যান্টিনা স্থাপন করলে ঐ স্থান থেকে ৬০ মাইলের মধ্যে বেতারে বার্তা আদান-প্রদান করা যাবে।

চন্দ্রের উপরিভাগের মত পরিবেশে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখছেন।

পরলোকে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৩১শে মে পরলোকগমন করেন। মৃত্যু-কালে তাঁহার প্রায় ৬৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পুত্র নারায়ণ বিদ্যারত্নের দৌহিত্র এবং তাঁহার সহধর্মিণী সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী। ক্ষিতীশপ্রসাদ আই, এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯১৯ সালে তিনি কেম্ব্রিজে যান এবং একটি থিসিস লিখিয়া "অ্যান্টনি উইলকিন্স" পুরস্কার লাভ করেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপলজি বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের এডুকেশন অফিসার পদে নিযুক্ত হন। ঐ পদে তিনি দীর্ঘ এগার বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরে তিনি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানথ্রোপলজির প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সালে তিনি ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের সহিত তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৯৪২ সালে তিনি নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তিনি বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে তিনি ইহার সদস্য ছিলেন।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্‌প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ | অগাষ্ট, ১৯৬৩ | অষ্টম সংখ্যা

আই. কিউ. বা বুদ্ধির মান

শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আই. কিউ (I. Q) বা Intelligence Quotient কথাটি সকলের কাছেই পরিচিত। কিন্তু উহা যে কি, তাহা আমরা অনেকেই জানি না। আই. কিউ হইল বুদ্ধি পরীক্ষার মান। দৈর্ঘ্য, ওজন, ঘনত্ব প্রভৃতির ন্যায় বুদ্ধিও যে মাপা যায়, ইহা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, বুদ্ধিও মাপা যায়। অবশ্য বুদ্ধি মাপিবার প্রণালী সুকুমার রায় বর্ণিত 'বিজ্ঞান-শিক্ষার' (আবোলতাবোল দ্রষ্টব্য) প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আলোচ্য প্রবন্ধে বুদ্ধির পরিমাপ লইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিব।

বুদ্ধি পরিমাপ করিবার আগে জানা দরকার, বুদ্ধি বলিতে আমরা কি বুঝি। বুদ্ধি কি জিনিষ, সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা এখনও নিঃসংশয় হইতে পারেন নাই। মানুষ ও বানর প্রভৃতি উন্নত শ্রেণীর প্রাণী ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে বুদ্ধির অস্তিত্বের কথাই অনেকে অস্বীকার করেন। এই বিষয়ে সঠিক উত্তর দিবার সময় এখনও আসে নাই এবং সঠিক উত্তর দেওয়াও বোধ হয় অসম্ভব। কারণ, বুদ্ধি জিনিষটা প্রত্যক্ষগোচর নহে। প্রাণীদের ব্যবহার হইতে আমরা উহা অনুমান করি। তবে কোন কোন প্রাণী (যেমন—পিপীলিকা) যেরূপ জটিল ব্যবহারের পরিচয় দেয়, তাহাতে উহাদের বুদ্ধি আছে বলিয়াই মনে হয়। সে যাহাই হউক, মানুষ ও মানুষের নিকট জ্ঞাতি যে সকল প্রাণী—তাহাদের যে বুদ্ধি আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদের সহিত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের ব্যবহার তুলনা করিলে দুইটি জিনিষ চোখে পড়ে:—তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা অবস্থার পরিবর্তনের সহিত তাল রাখিয়া নিজের আচরণ পরিবর্তিত করিতে পারে না এবং পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া নূতন সমস্যার সমাধান করিতে পারে না। আগুনের

শিখা দেখিলেই পতঙ্গ তাহাতে ঝাঁপ দিতে চায়, একবার পাখা পুড়িয়া গেলেও নিরস্ত হয় না। চোখের সামনে অন্য পতঙ্গগুলিকে মরিতে দেখিলেও দমে না। বৃষ্টি হইলেই লক্ষ লক্ষ উইপোকা আকাশে উড়িয়া পাখীদের হাতে প্রাণ হারায়; কিন্তু সেই জন্য উড়া বন্ধ করে না। একটি গোলকধাঁধার একদিকে কিছু খাবার এবং অন্যদিকে একটি ব্যাং ও একটি বিড়াল রাখিয়া দিলে দেখা যায়, বিড়ালটি দুই-একবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ঠিক পথটি খুঁজিয়া বাহির করে এবং তাহার পর সেই পথেই চলিতে থাকে। কিন্তু বোকা ব্যাং বহু চেষ্টার পর ঠিক পথটি বাহির করিলেও পরের বার পুনরায় ভুল করে; বারবার ঠেকিয়াও উহা শিখে না। এই যে ঠেকিয়া শিক্ষা করা এবং তদনুসারে নিজেদের ব্যবহার পরিবর্তিত করা ও পুরাতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাইয়া নূতন সমস্যার সমাধান করিবার ক্ষমতা—ইহাকেই বুদ্ধি বলিতে পারা যায়।

এখন এই বুদ্ধি কিসের উপর নির্ভর করে জানিতে পারিলে তাহা মাপিবার একটা ব্যবস্থা করা যায়। ফ্রেনোলজিষ্টরা মনে করিতেন যে, মস্তিষ্কের পরিমাণের উপর বুদ্ধি নির্ভর করে। এই মতবাদ অনুসারে মাথার আকৃতি দেখিয়া তাঁহারা বুদ্ধি স্থির করিতেন। এখন এই মত কেহ স্বীকার করেন না। এই মত মানিয়া লইলেও বুদ্ধি মাপা বড় সহজ হইত না। মস্তিষ্ক ওজন করিয়া বুদ্ধির পরিমাপ করা বুদ্ধিমানের কার্য নহে। বুদ্ধির কারণ যাহাই হউক, প্রত্যক্ষভাবে উহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই —অন্ততঃ সেরূপ কোন উপায় আমার জানা নাই। পাঠকদের ভিতর যদি কাহারও জানা থাকে, তবে জানাইলে বাধিত হইব। যেহেতু আমরা সোজা-সুজি বুদ্ধি মাপিতে পারি না, সেহেতু বাধ্য হইয়াই আমাদের বাঁকা পথ ধরিতে হয়। কোন্ ধরণের ব্যবহারকে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার বলে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। যাহাদের মধ্যে ঐ ব্যবহার দেখি তাহাদের বুদ্ধিমান বলি, আর যাহাদের মধ্যে উহার অভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহাদের বুদ্ধির অভাব আছে বলিয়া স্থির করি। আমরা সচরাচর এই রূপেই বুদ্ধির মাত্রা স্থির করি। কিন্তু এই প্রণালী সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ নহে। ইহার সহিত আমাদের ব্যক্তিগত রুচির প্রশ্ন জড়িত। বিশেস কারণে কোন ব্যক্তির প্রতি আমরা আকৃষ্ট হইতে পারি, যাহার সহিত বুদ্ধির কোন সম্পর্ক নাই। লোকের মুখের আকৃতি, তাহার পরিচ্ছদ, জাতি এবং আমাদের তৎকালীন মানসিক অবস্থার উপর তাহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যে অনেকটা নির্ভর করে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলে বুদ্ধির পরীক্ষায় আমরা যাহাকে উঁচু নম্বর দেই, প্রকৃতপক্ষে তাহার ততটা বুদ্ধি নাও থাকিতে পারে এবং ইহার বিপরীত ঘটাও বিচিত্র নহে।

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুদ্ধি পরীক্ষা করিতে গেলে প্রথমে বুদ্ধি পরিমাপের একটা ইউনিট বা একক স্থির করিতে হয়। আমরা জানি—দৈর্ঘ্যের একক ফুট বা সেণ্টিমিটার, ওজনের একক পাউণ্ড বা গ্র্যাম। কিন্তু এই সকলের দ্বারা বুদ্ধির পরিমাপ চলে না। এত গজ বুদ্ধি বা এত পাউণ্ড বুদ্ধির কোন অর্থ নাই। বুদ্ধির একক হইল বুদ্ধি বা আরও সঠিক-ভাবে বলিতে গেলে সাধারণ বুদ্ধি (Average intellect)। অধিকাংশ লোকের যে পরিমাণ বুদ্ধি থাকে, তাহাই হইল সাধারণ বুদ্ধি। আমরা জানি, একই বয়সের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বুদ্ধির অনেক তারতম্য থাকে। এই পার্থক্য হইতে বৈজ্ঞানিকেরা একটি গড় কল্পনা করিয়াছেন। ইহাকেই আমরা সাধারণ বুদ্ধি বলিতে পারি। দুই-একটি ব্যতিক্রমের কথা ছাড়িয়া দিলে এই পর্যন্তই আমা-দের বুদ্ধির দৌড়। যাহাদের বুদ্ধি সাধারণ অপেক্ষা বেশী, তাহাদের বুদ্ধিমান বলিতে পারি। যাহাদের বুদ্ধি ইহা অপেক্ষা কম, তাহাদের বোকা বলা যায়। ইহাই হইল বুদ্ধি পরীক্ষার মতবাদ। এবার দেখা যাউক আসল বুদ্ধি-পরীক্ষা কি করিয়া হয়।

বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্য কোন মনোবিজ্ঞানীর নিকট গেলে তিনি প্রথমে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিবেন। প্রশ্নগুলির মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত সহজ—এত সহজ যে, পাঁচ বৎসরের একটি শিশুও উহার সমাধান করিতে পারে। কতকগুলি তদপেক্ষা কঠিন। আবার কতকগুলি এত কঠিন যে, বয়স্ক লোকের পক্ষেও সেগুলির উত্তর দেওয়া শক্ত। প্রশ্ন ছাড়াও কতকগুলি বাস্তব সমস্যা থাকে। কে কত অল্প সময়ের মধ্যে কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া তাহার একটি মানসিক বয়স ঠিক করা হয়। মনে করুন, কোন ব্যক্তির মানসিক বয়স ১৫। ইহার অর্থ একটি ১৫ বৎসরের সাধারণ বালক একই সময়ের মধ্যে প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে। মানসিক বয়সকে প্রকৃত বয়স দিয়া ভাগ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাকে ১০০ দিয়া গুণ দিলে আমরা ঐ ব্যক্তির বুদ্ধির মান বা আই কিউ. পাই।

$$\text{আই. কিউ.} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

যাহার আই. কিউ. ১০০, তাহাকে সাধারণ বা স্বাভাবিক লোক বলা যায়। আই কিউ ১০০ অপেক্ষা যত বেশী, বুদ্ধি তত বেশী ধরিতে হইবে। কাহারও আই. কিউ. ১০০ অপেক্ষা কম হইলে তাহাকে হীনবুদ্ধির কোঠায় ফেলা যায়। আই. কিউ. ১০০-এর যত কাছাকাছি থাকে, ততই ভাল। কারণ নানা সমস্যাকণ্টকিত বর্তমান সমাজ-জীবনে আত্মরক্ষা করিয়া মোটামুটিভাবে বাঁচিয়া থাকিতেও খানিকটা বুদ্ধির দরকার হয়। কিন্তু জীবনের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান করাও হীনবুদ্ধিদের পক্ষে কঠিন। এই জন্য জগতে টিকিয়া থাকা তাহাদের পক্ষে একান্ত দুরূহ। যাহারা হীনবুদ্ধিদের একেবারে নীচের স্তরে থাকে, তাহাদের Imbecile বলে। বয়স হইলেও এই জাতীয় লোকেরা শিশুর মত থাকিয়া যায়। কেহ ইহাদের লালনপালনের ভার না লইলে ইহারা বাঁচিতে পারে না। ইহাদের চেয়ে আর একটু উপরে যাহারা, তাহাদের বলা হয় Idiot। ইহাদের বুদ্ধি চিরকাল ৭।৮ বৎসরের বালকের মত থাকে। অপরে দেখাশুনার ভার না লইলে ইহারাও বাঁচিতে পারে না। পরিণত বয়সেও যাহাদের বুদ্ধি ১২ বৎসরের বালকের মত থাকিয়া যায়, তাহাদের Moron বলে। ইহারা মোটামুটি নিজেদের দেখাশুনা করিতে পারে। সুযোগ ও চেষ্টা থাকিলে কোন অল্পবুদ্ধিসাধ্য বৃত্তি, যেমন—নানারকম হাতের কাজ বা দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জনও করিতে পারে। কিন্তু কোন প্রকার জটিল কাজ করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। ভালমন্দ বোধও কম থাকে এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের অভাবে ইহারা অনেক সময় বিপথে যাইয়া চোর, গুণ্ডা প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইউরোপ, আমেরিকায় এই শ্রেণীর অপরাধীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সুপথে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। উপরে যাহাদের কথা বলিলাম, তাহাদের বুদ্ধি সম্পূর্ণ বিকশিত হয় না। ইহা ছাড়া যাহারা স্বাভাবিক মানুষ—মোটের উপর যাহাদের লইয়া এই পৃথিবী, তাহাদের বুদ্ধি সাধারণতঃ ১৭।১৮ বৎসর পর্যন্ত বাড়ে। ঐ সময়ের মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক পূর্ণ বিকশিত হইয়া ওঠে। তাহার পর বুদ্ধি আর বাড়ে না।

বৈজ্ঞানিকেরা আই. কিউ. সম্বন্ধে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহা হইল এই যে, কোন ব্যক্তির আই. কিউ. মোটামুটি একই রকম থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়ে বটে, কিন্তু আই. কিউ-এর বিশেষ পরিবর্তন হয় না। শৈশবে বা বিদ্যালয়ে যাহারা বোকা থাকে, ভবিষ্যৎ জীবনেও তাহারা বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে না। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাল্যকালেও তাঁহারা কৃতী ছিলেন। অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম যে একেবারে নাই, তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায়, বিদ্যালয়ে ভাল ফল দেখাইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে বিশেষ সাফল্য

দেখাইতে পারেন নাই। আবার কেহ স্কুলে অখ্যাত ছাত্রজীবন কাটাইয়া পরে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, ইহাও আমরা দেখিতে পাই। লুই পাস্তুর, এডিসন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কথা সহজেই মনে পড়ে। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অনেক সময়েই বুদ্ধি ছাড়া অন্য কারণ থাকে। ছেলেবেলায় পড়াশুনার প্রতি বিরাগ, অধ্যবসায়ের অভাব প্রভৃতির উপর বিদ্যালয়ের ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে। আবার বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও মানসিক, চারিত্রিক বা অন্যান্য গুণের অভাবে উত্তর জীবন ব্যর্থ হইতে পারে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই নিয়মটি প্রযোজ্য।

বিভিন্ন লোকের মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য শুধু যে পরিমাণগত তাহা নহে, অনেকটা প্রকৃতিগতও বটে। এক এক জনের এক একদিকে প্রতিভা লক্ষ্য করা যায়। ছোটদের ভিতরেও দেখা যায়, কেহ অঙ্কে পারদর্শী, কেহ বা ভাল ছবি আঁকিতে পারে, কিন্তু অঙ্কে ফেল করে। কাহারও হয়তো ব্যাকরণ মোটেই মাথায় ঢোকে না, কিন্তু গান গাহিবার বা অভিনয় করিবার ক্ষমতা আছে। কেন এইরূপ হয়? স্পিয়ারম্যান বলেন, মানুষের বুদ্ধির দুইটি উপাদান আছে—একটি হইল সাধারণ উপাদান, অপরটি হইল বিশেষ উপাদান। কাহারও কাহারও ভিতর এই বিশেষ উপাদানটি অধিক পরিমাণে থাকে। ইহার ফলে বিশেষ দিকে তাহাদের প্রতিভা দেখা যায়। আর যাহাদের মধ্যে সাধারণ উপাদানটি বেশী থাকে, তাহারা সকল বিষয়েই ভাল করে। উপরের ১নং চিত্রের দ্বারা ব্যাপারটি বুঝান হইল।

A ও B উভয়েরই আই. কিউ. সমান। G বুদ্ধির সাধারণ উপাদান ও S_1 একটি বিশেষ ক্ষমতা—ধরা যাক, গান গাহিবার ক্ষমতা বুঝাইতেছে। B-এর ভিতরে S_1 বেশী থাকায় সে গান গাওয়ায় A-কে ছাড়াইয়া যাইবে, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে A-র সহিত পারিয়া উঠিবে না। যাহার যে দিকে বিশেষ প্রতিভা আছে, তাহাকে সেই দিকে শিক্ষা দিতে পারিলে সে জীবনে সাফল্যলাভ করিতে পারে। এই জন্য আজকাল বুদ্ধি-পরীক্ষায় বুদ্ধির এই বিশেষ দিকটার উপর জোর দেওয়া হয়। গতানুগতিক পদ্ধতিতে একটা আই. কিউ. স্থির না করিয়া বিভিন্ন বিষয়ে কাহার কিরূপ ক্ষমতা, তাহা মাপা হয়। এই জন্য অনেকগুলি পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে থার্ষ্টোনের এই পদ্ধতির নাম করা যাইতে পারে।

ছেলে ও মেয়েদের ভিতর কি বুদ্ধির কোন পার্থক্য দেখা যায়? আগে অনেকে মনে করিতেন, ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বুদ্ধি কম। কিন্তু বুদ্ধি মাপিয়া দেখা গিয়াছে যে, উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং মেয়েরা নিঃসংশয়ে ছেলেদের সহিত সমান অধিকার দাবী করিতে পারে। তবে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বুদ্ধির পার্থক্য দেখা যায় বটে! যেমন ছেলেরা অঙ্ক ও যন্ত্রবিদ্যায় ভাল এবং মেয়েরা সাধারণতঃ সাহিত্য, কলা প্রভৃতিতে ভাল করে। শিক্ষা ইহার একটা কারণ হইতে পারে।

ছেলে ও মেয়েদের ভিতর যেরূপ বুদ্ধির পার্থক্য দেখা যায় না, বিভিন্ন জাতির ভিতরেও সেইরূপ বুদ্ধির খুব পার্থক্য পাওয়া যায় নাই। নিগ্রো বা ইহুদীদের বুদ্ধি কম বলিয়া যে ধারণা আছে, তাহা নিতান্তই জাতিবিদ্বেষ প্রসূত।

A |——G——|——S_1——|

B |——G——|————S_1————|

১নং চিত্র।

আজকাল বুদ্ধি পরীক্ষার ব্যাপক প্রচলন হইয়াছে শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করেন। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মান ও শিক্ষণরীতি সাধারণ ছাত্রের উপযুক্ত। হীনবুদ্ধি ছাত্রদের নিকট উহা অত্যন্ত দুরূহ, সন্দেহ নাই। এই সকল ছাত্র যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই অন্য সকলের সহিত তাল রাখিতে পারে না ও পড়াশুনায় পিছাইয়া পড়ে। ইহাতে তাহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া গিয়া হীনমন্যতা দেখা দিতে পারে। আবার ভাল ছাত্রের নিকট সাধারণ পাঠ্যতালিকা নীরস ও এক-ঘেয়ে লাগে। ইহার ফলে পাঠে তাহার উৎসাহ ও উদ্যম চলিয়া যায়। বর্তমানে বুদ্ধি পরীক্ষা করিয়া এই সকল ছাত্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি বৃত্তিতে যথেষ্ট বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এই সকল ক্ষেত্রে ছাত্রভর্তির পূর্বে বুদ্ধি পরীক্ষার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও সৈন্যবিভাগে, মানসিক রোগের চিকিৎসায় ও অন্যান্য বহু ব্যাপারে বুদ্ধি-পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

পরিশেষে একটি কথা বলা বলা দরকার। বুদ্ধি ও বুদ্ধির প্রয়োগ এক নহে। জীবনে সাফল্যলাভ করিতে হইলে বুদ্ধি ছাড়াও অন্য অনেক গুণ থাকা দরকার। মনোবল, অধ্যবসায় প্রভৃতি না থাকিলে কেহই উন্নতি করিতে পারে না। এই জন্য বাস্তব জীবনে অনেক অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন লোকও তাহার চেয়ে বুদ্ধিমান লোককে ছড়াইয়া যায়। সুতরাং আই. কিউ কম হইলে নিরুৎসাহ হইবার কোন কারণ নাই। অবশ্য যতটা বুদ্ধি লইয়া জন্মগ্রহণ করা যায়, ততই ভাল। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখা দরকার, যাহাতে বুদ্ধির যথাযথ ও সুষ্ঠু পরিচালনা হয়

যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রগতি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

খৃষ্টপূর্ব ৪৯০ সালের কথা।

গ্রীষ্মের শেষ। প্রথম উষার নবীন কিরণপাতে ঈজিয়ান সাগরের বুকে নীলে-সোনায় মাখামাখি। আকাশ ও সমুদ্রে আলস্য-বিজরিত মন্থরতা। এমনি সময়ে এথেন্সবাসীরা সভয়ে লক্ষ্য করলো, একের পর এক যুদ্ধ জাহাজ সারি বেঁধে এগিয়ে আসছে দিক্‌চক্র অতিক্রম করে। অচিরেই তারা বুঝতে পারলো যে, পারস্যের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট দারায়ুসের অসংখ্য রণতরী দ্রুত এগিয়ে আসছে, এথেন্স আক্রমণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। পারস্যের সৈন্য-সংখ্যা এক লক্ষের কম নয়, অথচ সমগ্র এথেন্সের সৈন্য-সংখ্যা মাত্র নয় হাজার। এখন উপায়! তখনই স্থির হলো, এই দারুণ সঙ্কটকালে প্রতিবেশী স্পার্টার কাছে সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে।

স্পার্টার দূরত্ব প্রায় দু-শ' মাইল। অথচ বিপদের এই বার্তা অবিলম্বে পৌঁছানো দরকার সেখানে। এই অসাধ্য সাধন কে করতে পারবে? এই দুঃসাধ্য কাজের ভার পড়লো সে বছরের অলিম্পিক দৌড়-বিজয়ী যুবক ফিদিপ্পি দেসের উপর। স্বদেশ-প্রেমিক এই যুবক প্রাণপণে ছুটলো স্পার্টার দিকে। সে কখনও দৌড়ায়, কখনও হাঁটে। কখনও দুর্গম পাহাড়ে ওঠে, আবার কখনও লাফিয়ে পড়ে গিরিখাতে। কখনও কোন নদী হয়তো পথ রোধ করে দাঁড়ায়, তখন সে নির্দ্বিধায় অমিতবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীগর্ভে, সাঁতার কেটে চলে যায়

অনায়াসে। এমনি করে দুর্গম বন্ধুর পথে অবিরাম চলে মাত্র দুদিনের মধ্যেই সে পৌঁছে গেল তার গন্তব্যস্থলে। কর্তব্য সমাপন করে সে আবার ফিরে এলো সেই দুর্বার গতিতে। তারপর স্বদেশের সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলো ম্যারাথনের প্রান্তরে। অদ্ভুত সেই যুদ্ধ! এথেন্স বাসীরা এমন বিক্রম দেখালো যে, স্পার্টার সাহায্য-সৈন্যবাহিনী এসে পৌঁছাবার আগেই তারা জয়লাভ করলো। পরাজিত, পর্যুদস্ত পারস্যবাহিনী ডাঙ্গা থেকে পালিয়ে জাহাজে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো।

এই বিজয়-বার্তা এথেন্সে পৌঁছে দেবার ভার নিল ফিদিপ্পি দেস। ম্যারাথন থেকে এথেন্সের দূরত্ব মাত্র ছাব্বিশ মাইল। জয়ের আনন্দে আত্মহারা এই যুবক ছুটতে লাগলো প্রাণপণে—এমন দৌড় সে আর কোনদিন দৌড়ায় নি। এথেন্সের প্রাচীর তোরণের কাছে পৌঁছেই সে চীৎকার করে বলতে লাগলো—নগরবাসী তোমরা উৎসব কর, আমরা জয়লাভ করেছি। কিন্তু হায়! এই কথা বলতে বলতেই তার প্রাণহীন দেহ পথের উপর লুটিয়ে পড়লো। সেই ঘটনার স্মৃতি নিয়েই ১৮৯৬ সালের আধুনিক অলিম্পিকে "ম্যারাথন দৌড়" নামে ছাব্বিশ মাইল পথের দৌড়-প্রতিযোগিতার প্রচলন হয়েছে।

এই কাহিনীর কিন্তু শেষ এখানেই নয়। গ্রীক সৈন্যেরা যখন যুদ্ধজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে, সেই সময় সৈন্যাধ্যক্ষ মিল্টিয়াদিস হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, অদূরে এক পাহাড়ের চূড়ায় কি যেন হঠাৎ সূর্যের আলোয় ঝক্‌মক্ করে উঠলো। একটু অনুসন্ধান করতেই জানা গেল, এক বিশ্বাসঘাতক সৈনিক তার ঢালের সাহায্যে সূর্যালোক প্রতিফলিত করে পারস্য-বাহিনীর কাছে গোপনে সংবাদ পাঠাচ্ছিল। সে জানিয়েছে, এথেন্স নগরী সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে, এখনই উপকূল দিয়ে ঘুরে গিয়ে এথেন্স আক্রমণ করলে জয় সুনিশ্চিত। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ জানা মাত্র মিল্টিয়াদিস প্রমাদ গণলেন। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি তখনই স্থির করলেন, যেমন করেই হোক এখনই এথেন্স রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। রণক্লান্ত সৈন্যদের আর এক মুহূর্তও বিশ্রাম করতে না দিয়ে তখনই তাদের নিয়ে চললেন এথেন্সের দিকে।

পরদিন প্রভাতে পারস্যের রণতরীসমূহ জলপথ দিয়ে ঘুরে এথেন্সে পৌঁছালো। তারপর সৈন্য-বাহিনী বিপুল বিক্রমে সমুদ্রতীরে অবতরণ করলো। কিন্তু এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! সারি সারি সুসজ্জিত গ্রীক-সৈন্য যেন তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। তারা বিস্ময়ে হতবাক—কারণ, এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হবার জন্যে তারা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মাত্র একদিন আগেই তারা গ্রীকবাহিনীর কাছে পরাজিত হয়েছে। অবস্থা অনুকূল নয় বুঝতে পেরে তখন তারা বিনা-যুদ্ধেই রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল জাহাজে।

এথেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, প্রাচীন কালে দ্রুতগামী দূতই ছিল সংবাদ আদান-প্রদানের সর্বোৎকৃষ্ট সহায়। এরা কখনও যেত পায়ে হেঁটে, কখনও যেত ঘোড়ার পিঠে করে, আবার কখনও যেত উটের পিঠে চড়ে। আমাদের দেশে দুর্গম গ্রামাঞ্চলে এখনও দেখা যায়, একটা লোক ছুটতে ছুটতে চলেছে। পিঠে তার ডাকের থলে, কোমরে চাপরাশ, হাতে একটা সড়কী আর তার মাথায় দুটা ঘন্টা। লোকটির দৌড়ের তালে তালে শব্দ হয়—ঝুমুর ঝুমুর। লোকটি রাণার, সে সরকারী ডাক বয়ে নিয়ে যায়। তবে আগেকার দিনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জরুরী সংবাদ বহন করবার জন্যে দ্রুতগামী অশ্বারোহীর সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত কুকুরের গলায় বাঁধা তাবিজের মধ্যে ভরে চিঠিপত্র পাঠানো হতো, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষিত পায়রার পায়ে বাঁধা ছোট্ট তাবিজের মধ্যে ভরে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাঠানো হতো। কিন্তু এসব ব্যবস্থায় সময় যেমন লাগতো বেশী, তেমনি গোপনীয় সংবাদ যে

যথাস্থানে ঠিকমত পৌঁছাবেই, তার কোন নিশ্চয়তা থাকতো না। বিশেষ করে যুদ্ধের সময় কোন গোপনীয় সংবাদ দৈবাৎ শত্রুর কাছে পৌঁছালে দারুণ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকতো। এজন্যে মানুষ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে চেষ্টা করছে বহুকাল থেকেই।

আগেই বলেছি যে, আর্শির সাহায্যে সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত করে সংবাদ পাঠাবার ব্যবস্থাও সেকালে ছিল। এথেন্সের সেই বিশ্বাসঘাতক সৈনিকটি এই উপায়েই পারসিক সৈন্যদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে ছিল। দুঃখের বিষয়, তার এই কার্যকলাপ গোপন রাখা সম্ভব হয় নি, আর সে জন্যেই শেষ পর্যন্ত এথেন্স রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

এরূপ যন্ত্রের নাম দেওয়া হয়েছিল 'হিলিওগ্রাফ'। এর একটা সুবিধা ছিল এই যে, পূর্বনির্দিষ্ট 'কোড' অনুযায়ী সংবাদ পাঠানো হতো; কাজেই সকলে এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারতো না। শোনা যায়, আফগান যুদ্ধের সময় একটিমাত্র হিলিওগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে ৭০ মাইল দূরবর্তী স্থানে সংবাদ পাঠানো সম্ভব হয়েছিল।

আগে দ্রুত সংবাদ পাঠাবার উদ্দেশ্যে আর এক রকম ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এর নাম 'বেকন ফায়ার'। এজন্যে পূর্বের ব্যবস্থামত কোন বিশেষ স্থানে বিরাট অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হতো এবং তাই দেখে সাধারণ লোকেরা বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সময়মত সাবধান হতে পারতো। স্পেনদেশীয় নৌবহর 'আর্মাডা' যখন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করতে রওনা হয়, তখন সেই সংবাদ এই উপায়ে দ্রুত প্রচারিত হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এখনও ইউরোপের গির্জা এবং প্রাসাদের উপরে 'বেকন ফায়ার'-এর ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

আগেকার দিনে আফ্রিকা এবং আমেরিকার গভীর অরণ্যের আদিবাসীরা বিপদকালে সাঙ্কেতিক ঢাক বাজিয়ে দূরবর্তী গ্রামবাসীদের সতর্ক করে দিত। তারা আবার 'রিলে' প্রথায় সেই সংবাদ পাঠিয়ে দিত আরও দূরবর্তী গ্রামে। এই ভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিপদের সংবাদ দ্রুত ছড়িয়ে পড়তো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে সংবাদ আদান-প্রদানের কত বিচিত্র ব্যবস্থাই না প্রচলিত হয়েছিল! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সব পদ্ধতিতে কতকগুলি নির্দিষ্ট সংবাদই শুধু পাঠানো যেত, নতুন কোন সংবাদ পাঠানো চলতো না, আর ভাবের আদান-প্রদানও করা যেত না। কাজেই এসব ব্যবস্থায় মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তাই তারা দ্রুততর এবং উন্নততর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে সাধনা সুরু করেছিল।

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত সাধনার ফলে দৈবাৎ বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হলো। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লে গেল। বিজ্ঞানী ওয়রস্টেড প্রথম অনুভব করলেন যে, বিদ্যুতের গতিবেগ খুবই দ্রুত, কাজেই একে হয়তো দ্রুত সংবাদ প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, একটি তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ পাঠালে তার নিকটস্থ চুম্বক স্থানচ্যুত হয়। এরপর কুক্‌স এবং হুইট্‌ষ্টোন উভয়েই এই তথ্য সত্য বলে প্রমাণ করেন। আর এঁদেরই চেষ্টায় প্রথম টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়। তবে তা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি।

এতে পাঁচটি চুম্বক ছিল এবং প্রত্যেকটির অবস্থান লক্ষ্য করে তারপর ইংরেজী বর্ণমালার এক-একটি অক্ষর বুঝতে হতো। পাঁচটি চুম্বকের জন্যে পাঁচটি তার ব্যবহার করতে হতো। কাজেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর তেমন সমাদর হলো না। এভাবে দ্রুত সংবাদ পাঠানো যেত ঠিকই, কিন্তু এতগুলি চুম্বকের অবস্থান লক্ষ্য করে একটিমাত্র অক্ষর নির্ণয় করবার কাজ ছিল খুবই কঠিন, সময়ও লাগতো অনেক। তাই এই যন্ত্রটি জনপ্রিয় হলো না। তবে এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে;

কারণ এথেকেই একটি নতুন পথের সন্ধান পাওয়া গেল।

বিজ্ঞানী মর্স টেলিগ্রাফ-যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই এর অনেক উন্নতি সাধন করেন। তাঁর এই আবিষ্কার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি দেখলেন যে, একটি মাত্র তারের ভিতর দিয়েই যাবতীয় সংবাদ আদান-প্রদান করা যেতে পারে। এজন্যে একটি নতুন 'কোড'-ও তিনি আবিষ্কার করলেন। এতে একটি প্রেরক-যন্ত্র এবং একটি গ্রাহক-যন্ত্র ব্যবহার করা হলো। প্রেরক-যন্ত্রের বোতাম টিপে টিপে প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, আর গ্রাহক-যন্ত্রে বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্থায়িত্বকাল অনুসারে 'টরে' এবং 'টক্কা' (Dot and Dash) এই দু'রকম শব্দ হয়। 'টরে' এবং 'টক্কা' নানাভাবে সাজিয়ে ইংরেজী বর্ণমালার সবগুলি অক্ষর এবং শূন্য থেকে নয় অবধি সবগুলি সংখ্যার সঙ্কেত স্থির করা হলো। এর নাম দেওয়া হলো 'মর্স কোড।' এই কোড যে জানে, সে অতি সহজেই সংবাদের পাঠোদ্ধার করতে পারে। এই আবিষ্কার যেমন সহজ তেমনি চমকপ্রদ। অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর সব দেশেই টেলিগ্রাফ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলো। বলা বাহুল্য, আজও পৃথিবীর সর্বত্র এটিই দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের সবচেয়ে সহজ এবং সস্তা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

কিন্তু মানুষ এতেও সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সে ভাবতে লাগলো, কেমন করে দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়। নানাদেশে গবেষণা চলতে লাগলো। শেষে গ্র্যাহাম বেল ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করলেন। এর প্রেরক-যন্ত্রের সামনে কোন কথা বললে বায়ুস্তরে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা একটি পর্দাকে কাঁপায়। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত অঙ্গারচূর্ণ সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। এর ফলে যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহের প্রাবল্য বাড়ে-কমে। সংযোগ-তারের ভিতর দিয়ে এই প্রবাহ চলে যায় গ্রাহক-যন্ত্রে। সেখানে থাকে একটি তড়িৎ-চুম্বক। তার বাহুতে জড়ানো তার-কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবাহের তারতম্য যেমন হয়, চুম্বকের শক্তি সেই তালে বাড়ে-কমে। এজন্যে চুম্বকটি তার সম্মুখে অবস্থিত একটি পর্দাকে কখনও জোরে আবার কখনও আস্তে আকর্ষণ করে। তাই পর্দাটি কাঁপতে থাকে এবং শব্দটি পুনঃপ্রকাশিত হয়। টেলিফোনের সাহায্যে দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায়, ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। এজন্যে সকল সভ্যদেশেই টেলিফোন এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যে, টেলিফোন ছাড়া আধুনিক সভ্যসমাজের কথা কল্পনাই করা যায় না।

কিন্তু মানুষ এতেও সন্তুষ্ট হয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলো না। সে চেষ্টা করতে লাগলো, কেমন করে আকাশপথে বিনা তারে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। তারই ফলে বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর অবদানের সঙ্গে আমরা পরিচিত হতে পারলাম। এর নাম রেডিও বা বেতার।

বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-প্রবাহের এক নতুন সংজ্ঞা দেন ১৮৬৪ সালে। তিনি বলেন, আকাশে কোথাও যদি তড়িৎ-বলক্ষেত্রের তীব্রতা পরিবর্তিত হয়, তবে এই পরিবর্তনশীল বলক্ষেত্র তড়িৎ-প্রবাহের গুণ পায়। ফ্যারাডের মতে, পরিবর্তনশীল চৌম্বক বলক্ষেত্রকে ঘিরে তড়িৎ-বল-রেখার সৃষ্টি হয়। ম্যাক্সওয়েলের মতে, অনুরূপভাবে পরিবর্তনশীল তড়িৎ-বলক্ষেত্রকে ঘিরে চৌম্বক বল-ক্ষেত্রের আবির্ভাব হয়। তড়িৎ-বল এবং চৌম্বক বলের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান, তার গাণিতিক ভাষ্য দিলেন বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল। তিনি একথাও বললেন যে, দৃশ্য আলোক নিজেই তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কম।

ম্যাক্সওয়েলের এই গাণিতিক ভাষ্য বিশ বছরেরও উপর চাপা পড়ে রইল। অবশেষে ১৮৮৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হাইনরিখ হের্ৎজ পরীক্ষা-মূলকভাবে প্রমাণ করলেন ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-

চুম্বকীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি তড়িৎ-বলক্ষেত্রের দ্রুত দিক্ পরিবর্তন করাবার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে দেখা গেল, যন্ত্র থেকে তড়িৎ-চুম্বকীয় বলক্ষেত্র বিকিরিত হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে তরঙ্গের মত। এই তরঙ্গ ঈথারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় আলোর সমান বেগে। এভাবে হের্ৎজের পরীক্ষায় জন্ম হলো বেতার-তরঙ্গের। এর নাম দেওয়া হলো হের্ৎজ-তরঙ্গ।

তখন গবেষণা সুরু হলো মোটামুটি দু-দিক থেকে। একদলের উদ্দেশ্য হলো হের্ৎজ-তরঙ্গ এবং দৃশ্য আলোর মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করা। আর একদল চেষ্টা করতে লাগলেন, কেমন করে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। যাঁরা হের্ৎজীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন ইংরেজ বিজ্ঞানী সার অলিভার লজ এবং ফ্লেমিং, ইতালীয় বিজ্ঞানী রিঘি এবং ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। এঁরা প্রত্যেকেই হের্ৎজীয় তরঙ্গ সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করে স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। এই সব গবেষকদের গবেষণার ফলে ছোট মাপের তরঙ্গ অর্থাৎ 'মাইক্রো-ওয়েভের যে উন্নতি ঘটেছিল, তা এখন ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। আর এদিকে জগদীশচন্দ্রের অবদানই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

ইতালীর প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী মার্কনি কিন্তু বেতার-তরঙ্গের ব্যবহারিক দিকের উপরই নজর দিলেন বেশী। মার্কনির গবেষণার ফলে যখন হের্ৎজীয় তরঙ্গের উপর মডিউলেশন বা তরঙ্গের চেহারার ইচ্ছানুরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব হলো, তখনই বেতারে বার্তা প্রেরণের মূল সূত্রটি আবিষ্কৃত হলো বলা যায়। ব্যবহারিক জীবনে এই গবেষণার বিপুল সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে অনেকেই এই নবীন পথের যাত্রী হলেন। মার্কনি-গোষ্ঠীর বিজ্ঞানীরা দৃশ্য এবং অদৃশ্য তরঙ্গকে একসূত্রে গাঁথবার উদ্দেশ্যে গবেষণা করবার চাইতে বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে গবেষণা করাই শ্রেয়ঃ মনে করলেন। তাঁদের সাধনার ফলেই বেতার দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে গেল।

মার্কনি তাঁর বেতার-যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। পরের বছরই সংবাদ আদান-প্রদান করবার উদ্দেশ্যে এই যন্ত্র সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হলো ইংল্যাণ্ডে। এর তিন বছর পরেই সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনলো যে, তিনি ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে বেতারে সংবাদ পাঠাতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, ১৯০৭ সালের মধ্যেই জনসাধারণের জন্যে ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকার মধ্যে বিনা তারের টেলিগ্রাফ সার্ভিস চালু হয়ে গেল।

মার্কনির এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হলো। কারণ সেই থেকে সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষেও তারের সংযোগ ছাড়াই সব সময় বিভিন্ন বন্দরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলবার ব্যবস্থা প্রচলিত হলো। দৈবাৎ কোন বিপদ উপস্থিত হলে সঙ্গে সঙ্গে বেতার-সঙ্কেত পাঠিয়ে সাহায্য চাওয়া সম্ভবপর হলো। এজন্যে চলাচল ব্যবস্থায় এল যুগান্তর। পরবর্তী কালে বিমান চালনার ক্ষেত্রেও বেতার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এখন বেতারের কার্যপ্রণালী সম্পর্কে সামান্য দু'চার কথা বলবো। বেতারের কার্যপ্রণালী অনেকাংশে টেলিফোনের মতই। এতে গ্রাহক-যন্ত্রের সম্মুখে কোন শব্দ করলে টেলিফোনের মতই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তা বহু কম্পনযুক্ত দোলায়মান তড়িৎ-প্রবাহে রূপান্তরিত হয়। এই প্রবাহ অত্যন্ত মৃদু, কাজেই প্রসারক-যন্ত্রের সাহায্যে এর প্রাবল্য বর্ধিত করা হয় এবং পরে তারই সাহায্যে একপ্রকার দ্রুত কম্পমান তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের অর্থাৎ বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয়। এই তরঙ্গ আলোর সমান বেগে ধাবিত হয়; কাজেই তা মুহূর্তের মধ্যেই সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে

আসে। এই বেতার-তরঙ্গ যদি কোন তরঙ্গ-গ্রহণোপযোগী সহধ্বনিত (Tuned) বেতার গ্রাহক-যন্ত্রের বায়ুস্থ তার (Aerial) স্পর্শ করে, তবে সেই তারেও দোলায়মান প্রবাহের সৃষ্টি হয়। টেলিফোনের বেলায় গ্রাহক-যন্ত্রে পরিবর্তনশীল তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়ায় একটি পাত্‌লা পর্দা প্রকম্পিত হয় এবং তারই ফলে শব্দ পুনঃপ্রকাশিত হয়, একথা আমরা জানি। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রবাহ দ্বিমুখী এবং এর স্পন্দন-সংখ্যাও অত্যন্ত বেশী (দশ হাজার থেকে তিন কোটি); কাজেই এক্ষেত্রে পাত্‌লা পর্দাটি স্থির থাকবার ফলে শব্দ পুনরুৎপাদিত হতে পারবে না। এজন্যে বেতার-বিদ্যুৎ লাউড স্পীকারে পাঠাবার আগে একটি কার্বোরাণ্ডাম স্ফটিকের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে একাভিমুখী করে নেওয়া হয়। এই স্ফটিকের নাম ডিটেক্‌টর (পরবর্তীকালে এর বদলে 'ভাল্‌ভ' ব্যবহার করবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়)। এখন এই একাভিমুখী প্রবাহকে যদি লাউড স্পীকারে পাঠানো যায়, তবে পর্দাটি কেঁপে ওঠে এবং শব্দটি পুনঃপ্রকাশিত হয়।

বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন বেতার-বার্তার প্রচলন হতে সুরু করলো, তখন দেখা গেল যে, দূর-দূরান্তরে সংবাদ প্রেরণ করবার জন্যে প্রয়োজন হয় মাইক্রো-ওয়েভের তুলনায় অনেক বেশী লম্বা তরঙ্গের। দুই-পাঁচ গজী মাপের নয়, একেবারে হাজার-দশ হাজার গজী মাপের। এজন্যে মাইক্রো-ওয়েভ, অর্থাৎ এক ইঞ্চি, আধ ইঞ্চি মাপের তরঙ্গ সম্পর্কিত যাবতীয় গবেষণা তখনকার মত চাপা পড়ে গেল।

প্রথম দিকে বেতার-বার্তা প্রেরিত হতো মর্স কোডের সাহায্যে। প্রায় ত্রিশ বছরের গবেষণার ফলে প্রথম ট্র্যান্স-আটলাণ্টিক ওয়্যারলেস-টেলিফোন সার্ভিস চালু হলো ১৯২৭ সালে। ক্রমে বিভিন্ন দেশে অনেক বেতার প্রচার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলো, আর সেই সব অনুষ্ঠান শোনবার জন্যে ঘরে ঘরে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র বা রেডিও সেটের আমদানী হতে লাগলো।

বাস্তবিক লোকরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে রেডিও এখন গ্রামোফোনের চেয়েও অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে রেডার সম্বন্ধে কিছু না বললে প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে মাইক্রো-ওয়েভ অবহেলিত হয়েছিল, তারই এক বিস্ময়কর প্রয়োগ হয়েছে রেডারে। এর সাহায্যে মেঘ ও কুয়াশার মধ্যে কিংবা রাত্রির অন্ধকারেও দূরের জিনিষের ছবি তোলা সম্ভব হলো। এই ছবি ফটোগ্রাফের মত স্পষ্ট না হলেও এথেকে মাঠঘাট, গাছপালা, সহর-বাজার প্রভৃতি বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট পরিষ্কার হলো। কাজেই যুদ্ধের সময় রেডার খুব কাজে লাগলো। শুধু তাই নয়, ঘন কুয়াশা অথবা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও রেডারের সাহায্যে আশেপাশের সব কিছু দেখে অনায়াসে এবং নির্বিঘ্নে বিমান চালনা কিংবা জাহাজ চালনার ব্যবস্থা হলো। কাজেই এসব ক্ষেত্রে রেডার এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো। যুদ্ধের পরে যখন রেডার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রকাশিত হলো, তখন দেখা গেল যে, উনবিংশ শতাব্দীতে মাইক্রো-ওয়েভের গবেষকেরা যে সব যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন করেছিলেন, সেগুলির প্রায় সবই রেডারকে কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়েছে। আর এসবের অনেকগুলিরই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। এটা আমাদের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

এরাও উদ্ভিদ

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

ফুল নাই, ফল নাই, কাণ্ড নাই, পাতা নাই, মূলও নাই—তবুও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বলবেন, এরাও উদ্ভিদ। অবশ্য উদ্ভিদ-জগতের নিম্নতম শ্রেণীতে, উদ্ভিদ-সাম্রাজ্যের একেবারে প্রত্যন্ত দেশে এদের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। উদ্ভিদ-সমাজের এরা যেন 'পারিয়া'।

এই উদ্ভিদের (সঠিকভাবে বলতে গেলে উদ্ভিদ শ্রেণীটির—কারণ এরা একটা বিরাট গোষ্ঠীভুক্ত) নাম ব্যাক্টিরিয়া—সোজা কথায় আমরা যাদের বলি জীবাণু। বিবর্তনের ধারায় সৃষ্টির যে আদিমতম জীব পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছিল, তারা হচ্ছে কয়েক শ্রেণীর এককোষী জীব। জীবজগতের দুটি প্রধান বিভাগ—উদ্ভিদ ও প্রাণী। বিজ্ঞানীরা বলেন, এর মধ্যে উদ্ভিদই নাকি আগে জন্মেছিল। এই উদ্ভিদ-জগতের সর্বনিম্ন শ্রেণীতে আছে যারা, তাদের দেহ, কাণ্ড, পাতা, মূল—কিছুই আলাদা করে চেনবার উপায় নেই, সব যেন এক সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এদের বলা হয়েছে সমাঙ্গ-দেহী উদ্ভিদ বা থ্যালোফাইটা। এদের মধ্যে বহু এককোষী ও বহুকোষী উদ্ভিদ আছে। এককোষী-দের মধ্যে একটা বিশেষ শ্রেণীতে পড়েছে ব্যাক্টিরিয়া। সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের অন্য দুটি শ্রেণীর নাম হচ্ছে, অ্যালগি বা শ্যাওলা ও ফাঙ্গি বা ছত্রাক। এদের মধ্যে পার্থক্যের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—অ্যালগির মধ্যে ক্লোরোফিল বা সবুজ কণার উপস্থিতি, যা ছত্রাকের মধ্যে নেই। কোন কোন বিজ্ঞানী ব্যাক্টিরিয়াকে এই ছত্রাক শ্রেণীর প্রকারভেদ মনে করেন এবং কোন কোন ছত্রাকের মত দেহ-বিভাজনের দ্বারা বংশবৃদ্ধি করে বলে এদের নাম দিয়েছেন সিজোমাইসেটিস বা দেহ-বিভাজনক্ষম ছত্রাক।

ব্যাক্টিরিয়া আণুবীক্ষণিক জীব, শক্তিশালী অণুবীক্ষণ ছাড়া এদের দেখা যায় না। অধিকাংশেরই ব্যাস এক মিলিমিটারের এক হাজার ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও কম। আকার এত ক্ষুদ্র বলেই এদের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা দুরূহ। তবুও শক্তিশালী অণুবীক্ষণের নীচে বহুকাল পরীক্ষা করে এদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে। ব্যাক্টিরিয়া এক-কোষী জীব, কখন কখন কতকগুলি একত্রিত হয়ে সূত্রা-কারে, চাকতির আকারে বা অন্য নানারূপ অনিয়ত আকারে অবস্থান করে। ব্যাক্টিরিয়ার কোষের মধ্যে আছে প্রোটোপ্লাজম এবং তাকে ঘিরে থাকে একটা পাতলা পর্দা। প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে কতকগুলি ক্রোম্যাটিন-দানা দেখা যায়। প্রত্যেক জীবিত কোষেই এক বা একাধিক কেন্দ্রীন থাকে। কেন্দ্রীন হচ্ছে কোষের প্রাণস্বরূপ এবং এরা সব কিছুরই নির্ধারক। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার কোষের মধ্যে কেন্দ্রীনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। মনে হয়, ক্রোম্যাটিনের দানাগুলিই কেন্দ্রীনের কাজ করে। সাধারণ উদ্ভিদ-কোষের মত এদের প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে সবুজ কণিকা বা অন্য প্রকার প্লাস্টিড কণিকাও নেই, কিন্তু কয়েক প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে। এজন্যে এদের নানাপ্রকার রং দেখা যায়। এদের মধ্যে অনেকেরই এক বা একাধিক সূত্রাকার বহিরাঙ্গ আছে, তাদের সিলিয়া বলে। সিলিয়ার সাহায্যে এরা চলাফেরা করতে পারে। কোষের আকৃতি অনুসারে ব্যাক্টিরিয়ার কয়েকটি উপ-বিভাগ করা হয়েছে। কোষের আকার গোল গোল হলে সেগুলিকে বলে কক্কাস, দণ্ডাকার হলে ব্যাসিলাস এবং প্যাঁচানো স্প্রিং-এর মত হলে বলা হয় স্পিরিলাস। বর্ধিত আকারে কতকগুলি বিভিন্ন জাতের ব্যাক্টিরিয়ার ছবি এস্থলে দেখানো হয়েছে।

ব্যাক্টিরিয়া বংশ বৃদ্ধির জন্যে দু-রকম পন্থা অবলম্বন করে। দুটি পন্থাই অযৌন—কারণ এদের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই, অথবা দেহের মধ্যে পুং বা স্ত্রী-জননকোষও থাকে না। অনুকূল পরিবেশে, অর্থাৎ আশ্রয়দাতা জীব বা বস্তুর মধ্যে উপযুক্ত খাদ্যবস্তুর সন্ধান পেলে এরা সাধারণতঃ দেহ-বিভাজন প্রণালীতে বংশবিস্তার করে। প্রথমে একটি কোষ দুটি কোষে ভাগ হয়ে যায়। কক্কাস-কোষের মাঝখানটা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে, তারপর কোষটা আড়াআড়ি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ব্যাসিলাস-কোষ লম্বালম্বি দু-ভাগে বিভক্ত হয়। এভাবে একটা কোষ থেকে অনুরূপ দুটা কোষের উৎপত্তি হয়। এরূপ বিভাজন ক্রমাগত চলতে থাকে। অনুকূল অবস্থায় ব্যাক্টিরিয়া বংশবৃদ্ধিতে এতই সক্রিয় হয়ে ওঠে যে, বারো ঘন্টার মধ্যে একটি মাত্র ব্যাক্টিরিয়া থেকে প্রায় দেড়কোটি ব্যাক্টিরিয়া উৎপন্ন হতে পারে। এভাবে অল্পকালের মধ্যেই এরা বিশাল উপনিবেশ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রচণ্ডবেগে বংশবিস্তার অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে না, বৃদ্ধির পথে কতকগুলি বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ বাধা এসে পড়ে। আলোক বা অক্সিজেনের সংস্পর্শে অনেকেরই বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আবার এদের নিজেদের দেহ থেকে এমন কয়েকটি জৈবরাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যেগুলি এদের বংশবৃদ্ধি সংযত করে দেয়। আবার বহু ক্ষেত্রে এই বিশাল বাহিনী কর্তৃক অল্প সময়ের মধ্যেই খাদ্যবস্তু নিঃশেষিত হবার ফলে বংশবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

বংশবৃদ্ধির অন্য উপায়টি হলো স্পোর বা বীজরেণু গঠন। একে ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধির অবস্থা না বলে বিশ্রামের অবস্থা বললেই ঠিক হয়। প্রতিকূল অবস্থায়, অর্থাৎ আশ্রয়দাতা জীব বা পদার্থের মধ্যে খাদ্যের অভাব হলে ব্যাক্টিরিয়া এই উপায়ে আত্মরক্ষা করে। সাধারণতঃ ব্যাসিলাস গোষ্ঠী এই উপায় অবলম্বন করে। বহুসংখ্যক ব্যাক্টিরিয়া একত্রিত হয়ে একরূপ শ্লৈষ্মিক পদার্থের মধ্যে আবদ্ধ হয়। কোষগুলির প্রোটোপ্লাজম
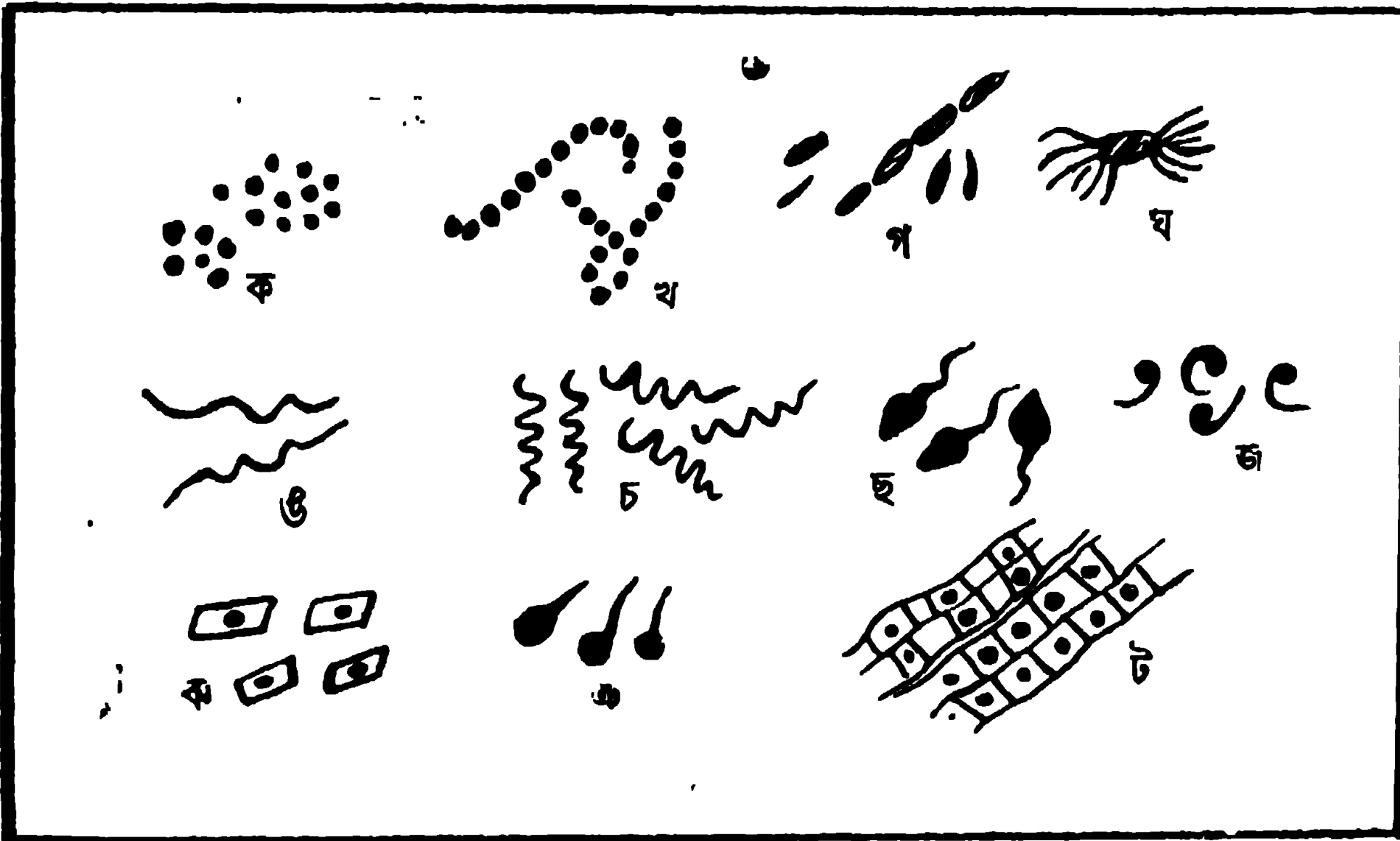
ক—ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস (ফোড়া), খ—ষ্ট্রেপটোকক্কাস (রক্তদুষ্টি), গ—ব্যাসিলাস (সাধারণ আকার), ঘ—বি. টাইফোসাস (টাইফয়েড), ঙ—স্পিরিলাস (সাধারণ আকার), চ—স্পিরোকিটি প্যালিডা (সিফিলিস), ছ—নাইট্রোসোমোনাস, জ—কমা ভিব্রিও (কলেরা), ঝ—বি. অ্যানথ্রাসিস (অ্যানথ্রাক্স), ঞ—বি. টিট্যানি (ধনুষ্টংকার), ট—ব্যাক্টিরিয়ার জুগ্লিয়া অবস্থা ও স্পোর গঠন।

কোষের মধ্যে ঘনীভূত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে যায় এবং তাদের চতুর্দিকে নতুন কোষ-প্রাচীরের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে এক বা একাধিক স্পোর বা বীজরেণু উৎপন্ন হয়। এই অবস্থাকে জুগ্লিয়া অবস্থা (Zooglea Stage) বলা হয়। নতুন উৎপন্ন কোষ-প্রাচীর সাধারণ অবস্থা থেকে অত্যধিক দুর্ভেদ্য। এই দুর্ভেদ্য দুর্গের অন্তরালে বীজরেণুগুলি সাংঘাতিক রকম তাপ ও শৈত্য সহ্য করে বেঁচে থাকতে পারে। ফুটন্ত জল (১০০° সেঃ) বা তরল বায়ুর (-১৯৫° সেঃ) মধ্যেও বহুকাল বেঁচে থাকতে পারে, এমন ব্যাসিলাসের সংখ্যাও কম নয়! এরূপ অবস্থায় এরা পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। খাদ্যের মধ্যে, জলের মধ্যে, বাতাসের মধ্যে, ধূলিকণার মধ্যে, সূক্ষ্মতম স্থানের মধ্যে—সর্বত্রই এদের অবাধ বিস্তৃতি। এই জন্যেই কোন খাদ্য-বস্তু বা অন্য কোন পদার্থ বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই তাতে হাজার হাজার ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। অনুকূল পরিবেশ পেলেই স্পোরগুলির কোষ-প্রাচীর দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে। তারপর স্পোরগুলির কোষ-প্রাচীর ভেঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক-একটি স্পোর থেকে এক-একটি সাধারণ ব্যাক্টিরিয়া-কোষের সৃষ্টি হয়। এরা তখন খাদ্য-বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করতে থাকে।

ব্যাক্টিরিয়ার শারীরবৃত্তীয় ও বিপাকীয় পদ্ধতি অতি বিচিত্র। আগেই বলা হয়েছে, এদের মধ্যে সবুজ কণা নেই, তাই এরা সাধারণ উদ্ভিদের মত শর্করাজাতীয় খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে না। সুতরাং বাধ্য হয়ে এদের পরজীবী বা পুরীষ-ভোজী (Saprophyte) হিসাবে জীবনধারণ করতে হয়। পরিপোষণের পদ্ধতি অনুসারে ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—

(১) পরজীবী ব্যাক্টিরিয়া—এরা খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে অন্য কোন জীবিত প্রাণী বা উদ্ভিদকে আশ্রয় করে থাকে। এরাই সাধারণতঃ জীবাণু বা রোগ-জীবাণু নামে পরিচিত। এরাই মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের অনেক রোগের মূল। তবে সব রকম পরজীবি ব্যাক্টিরিয়াই রোগের বাহক নয়। এদের মধ্যে কয়েকটি শ্রেণী সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমাদের মুখ ও নাকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর মধ্যে কয়েক প্রকার ব্যাক্টিরিয়া বাস করে, তারা আমাদের কোন অনিষ্ট করে না।

রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়া জীবিত প্রাণীর দেহতন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং অনুকূল পরিবেশে বিভাজন প্রক্রিয়ায় বংশবিস্তার করে এইরূপে রোগের সংক্রমণ হয় এই সময় ব্যাক্টিরিয়া আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে এবং একরূপ 'টক্সিন' বা বিষ ত্যাগ করতে থাকে। এই টক্সিন দেহতন্তু ও রক্তের মধ্যে জমে ওঠে এবং তাথেকেই রোগের অনিষ্টকারী প্রভাব দেখা দেয়। বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টিরিয়া বিভিন্ন প্রকার রোগের সৃষ্টি করে এবং এদের দ্বারা উৎপন্ন টক্সিনের প্রকৃতিও বিভিন্ন। অবশ্য এই সকল রোগজীবাণু ও তাদের টক্সিন থেকে দেহকে মুক্ত রাখবার বন্দোবস্তও দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিষেধক শক্তিরূপে বর্তমান থাকে।

রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়ার কয়েকটি শ্রেণী সম্পূর্ণ অবাতজীবী, অর্থাৎ এরা কেবল বিনা অক্সিজেনে বাঁচতে ও বংশবিস্তার করতে পারে। ধনুষ্টঙ্কার রোগের জীবাণু 'ব্যাসিলাস টিট্যানি' এই শ্রেণীর জীবাণু। কিন্তু বেশীর ভাগ রোগ-জীবাণু ঐচ্ছিক অবাতজীবী, অর্থাৎ এরা অবস্থা-বিশেষে বিনা অক্সিজেনে জীবন ধারণ করতে পারে, আবার অক্সিজেনের সংস্পর্শেও স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে পারে।

এই রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়া মানুষ ও

পশুর বিভিন্ন রকম মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণ ফোঁড়া থেকে আরম্ভ করে কলেরা, টাইফয়েড, ধনুষ্টঙ্কার, জলাতঙ্ক, যক্ষ্মা, ভেড়ার অ্যানথ্রাক্স প্রভৃতি বহু রকমের রোগ এই ব্যাক্টিরিয়াদেরই সৃষ্টি। কেবল মানুষ ও পশুই নয়, এরা উদ্ভিদকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে না। নানারূপ ব্যাক্টিরিয়াঘটিত রোগে প্রতি বছর কত যে শস্যহানি ঘটে, তার ইয়ত্তা নেই।

(২) পুরীসভোজী ব্যাক্টিরিয়া—এই শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়া মৃত বা গলিত জীবজন্তুর দেহ ও অন্যান্য পরিত্যক্ত জান্তব পদার্থের মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করে। এদের সঙ্গে প্রায়ই নানা শ্রেণীর অতি ক্ষুদ্র পুরীষভোজী প্রাণী ও ছত্রাকজাতীয় উদ্ভিদও বাস করে। এরা সম্মিলিতভাবে মৃত জৈব পদার্থ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতে থাকে এবং তার ফলে জৈব পদার্থের পচন ও ক্ষয় আরম্ভ হয়। ব্যাক্টিরিয়া জৈব পদার্থের মধ্যে বর্তমান জটিল যৌগগুলিকে অক্সিজেনের দ্বারা জারিত করে' অপেক্ষাকৃত সরল যৌগের সৃষ্টি করে। এর ফলে যে গতীয় উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা দৈহিক শক্তি লাভ করে। গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ পড়ে থাকলে কিছু দিনের মধ্যে তা যেন আপনা থেকেই পচে-গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। এই 'মাটির দেহ মাটিতে মিশে' যাওয়ার ব্যাপারটা যে ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাকেরই কাজ, তা বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে।

এই জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া সাধারণতঃ মানুষ ও অন্যান্য জীবের অনিষ্ট করে না, বরং পরোক্ষভাবে নানারূপ উপকারই করে। মৃত জীবদেহ ক্ষয় করে এরা নানারকম রোগ থেকে আমাদের মুক্তি দেয়। আবার জীবদেহকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে উদ্ভিদের জন্যে মাটির সার বৃদ্ধি করে। সারের জন্যে যে গোবর গাদা করে রাখা হয়, তাতে গোবর পচে ওঠে এবং তার মধ্যে প্রচুর উত্তাপ সৃষ্টি হয়। এই উত্তাপ ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা জৈব পদার্থের জারণ থেকে উৎপন্ন হয়। গোবর পচে একটা বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত না হলে উদ্ভিদের পক্ষে তা থেকে খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। অ্যালকোহল থেকে যে অ্যাসেটিক অ্যাসিডসম্পন্ন 'ভিনিগার' বা সুরাসার উৎপন্ন হয়, তাও এক ধরণের ব্যাক্টিরিয়ার কাজ। এদের নাম অ্যাসিটো ব্যাক্টর অ্যাসেটি।

মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত সার উৎপাদনের ব্যাপারে এক শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার বিশেষ অবদান আছে। বাতাসে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু উদ্ভিদ এই নাইট্রোজেনকে প্রত্যক্ষভাবে নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্যে রূপান্তরিত করতে পারে না, যদিও তার দেহপুষ্টির জন্যে এরূপ খাদ্যের যথেষ্ট প্রয়োজন। জমিতে শস্য উৎপাদনের ফলে সারের পরিমাণ প্রতি বছর ক্ষয় পেতে থাকে। বজ্র, বিদ্যুৎ ও বৃষ্টিপাতের ফলে অতি সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেন নাইট্রেটরূপে মাটিতে আসে। কিন্তু চাষীরা বহুকাল থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করে এসেছে যে, শুঁটিধারী শস্যের (যেমন—মটর, শিম, কলাই, ধঞ্চে প্রভৃতি) চাষ করলে পরের বছর জমিতে সার না কমে বরং বেড়ে যায়। তখন সেই জমিতে অন্য শস্যের চাষ ভাল হয়। তাছাড়া ঐ শুঁটিধারী শস্যগুলি খুব কম সারযুক্ত মাটিতেও ভালভাবে বৃদ্ধি পায়। এই ব্যাপারটা বহুদিন একটা ধাঁধার মত ছিল, কিন্তু বর্তমানে এর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে।

কয়েক শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে—তারা বাতাসের মুক্ত নাইট্রোজেন গ্রহণ করে তাকে নাইট্রোজেনঘটিত জৈব যৌগিকে পরিণত করতে পারে। এরা সাধারণতঃ মাটির মধ্যে বাস করে ও মাটিতে বর্তমান শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এরূপ দুটি ব্যাক্টিরিয়ার নাম অ্যাজোটো ব্যাকটর ক্রুকোক্কাম ও ক্লস্ট্রিডিয়াম পাস্তুরিয়ানাম। প্রথমোক্ত ব্যাক্টিরিয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে বাঁচতে পারে, অন্যটি কিন্তু অক্সিজেন

না থাকলেই বাঁচে। এজন্যে দেখা যায় ক্লস্ট্রিডিয়াম প্রায়ই অ্যাজোটো ব্যাকটর উপনিবেশের মধ্যে বাস করে। কারণ অ্যাজোটো ব্যাকটর মাটি থেকে অক্সিজেন সরিয়ে নিলেই ওদের বাঁচা সম্ভব হয়। এরা উভয়েই মাটিকে নাইট্রোজেন-সমৃদ্ধ করে তোলে।

শুঁটিধারী গাছের শিকড়ে এই জাতীয় আর এক ধরণের ব্যাক্টিরিয়া বাস করে। এরাও নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেন যৌগ উৎপন্ন করতে পারে। এদের নাম ব্যাসিলাস র‍্যাডিসিকোলা। এই জাতীয় গাছের শিকড়ে বহুসংখ্যক গুটি দেখা যায়। গুটিগুলি পরীক্ষা করলে উপরিউক্ত ব্যাক্টিরিয়া প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। এরা অবশ্য প্রথমতঃ মাটির মধ্যে বাস করে, তারপর গাছের মূলরোমের ভিতর দিয়ে মূলের মধ্যে চলে আসে এবং সেখানে বংশবিস্তার করতে থাকে। তার ফলে মূলের গায়ে অসংখ্য গুটি উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপারটিকে রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করলে ভুল হবে। এরা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের কোন অনিষ্ট তো করেই না, বরং উপকারই করে। এই ব্যাক্টিরিয়া নাইট্রোজেন থেকে নাইট্রোজেনঘটিত খাদ্য উৎপাদন করে এবং তার কিছু অংশ তারা নিজেদের পুষ্টির জন্যে গ্রহণ করে, বাকীটা আশ্রয়দাতা উদ্ভিদকে দান করে। এই দানটা দু'ভাগে হয় বলে মনে হয়। ব্যাক্টিরিয়া জীবিত অবস্থায় দেহ থেকে কিছু পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ নিঃসরণ করে এবং উদ্ভিদ তা মূলের সাহায্যে শোষণ করে নেয়। আবার ব্যাক্টিরিয়ার মৃত্যু হলে তাদের দেহের মধ্যে সঞ্চিত খাদ্যও উদ্ভিদ শোষণ করে। তারপর উদ্ভিদের সঞ্চিত নাইট্রোজেন সার মাটির মধ্যে চলে আসে। এর বদলে উদ্ভিদ ব্যাক্টিরিয়াকে কি দেয়? দেয় উদ্ভিদের মূলে সঞ্চিত শর্করাজাতীয় খাদ্য, ব্যাক্টিরিয়া যা গ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এরূপ যৌথ জীবনের উদাহরণ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে কয়েক ক্ষেত্রে দেখা যায়। একে বলে 'মিথোজীবিতা'।

এই ধরণের আরও দু'জাতের ব্যাক্টিরিয়া মাটির মধ্যে বাস করে। এদের মধ্যে 'নাইট্রোসোমোনাস' অ্যামোনিয়াকে জারিত করে নাইট্রাস অ্যাসিডে পরিণত করে এবং 'নাইট্রোব্যাক্টর' নাইট্রাস অ্যাসিডকে আরও জারিত করে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করে। এই দুটি ক্রিয়াকে নিম্নলিখিত সমীকরণের দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে—

$$2NH_3 + 3O_2 \rightarrow 2HNO_2 + 2H_2O + 179 \text{ ক্যালরি}$$

$$2HNO_2 + O_2 \rightarrow 2HNO_3 + 18 \text{ ক্যালরি}$$

এই রাসায়নিক ক্রিয়ায় ব্যবহৃত অ্যামোনিয়া জীবদেহের পচন থেকে উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে নানা শ্রেণীর নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। এরা উদ্ভিদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

মাটির মধ্যে আরও এক শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের কাজ উপরিউক্ত ব্যাক্টিরিয়ার ঠিক বিপরীত। এরা মাটির মধ্যে বর্তমান নাইট্রেটকে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসে রূপান্তরিত করতে পারে। এরা সম্পূর্ণ অবাতজীবী। বাতাসে এরা নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা করে।

আমাদের চোখের আড়ালে এক বিশাল ব্যাক্টিরিয়া সাম্রাজ্য বর্তমান। এদের অধিবাসীদের সংখ্যা যেমন সীমাহীন, তেমনি এদের জাতি-প্রজাতির সংখ্যাও বিরাট। গবেষণার ফলে ক্রমশঃ নতুন নতুন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে এমন সব ব্যাক্টিরিয়ার সন্ধান পাওয়া গেছে, যারা গন্ধক ও লৌহের যৌগ, মিথেন, কার্বন—এমন কি, হাইড্রোজেনকেও জারিত করতে পারে। এগুলির আবিষ্কারের ফলে জীব-বিজ্ঞানীদের একটা ধারণার পরিবর্তন হয়েছে যে, ব্যাক্টিরিয়া খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে

সম্পূর্ণভাবে জীবিত ও মৃত জৈব পদার্থের উপর নির্ভরশীল; উপরিউক্ত ব্যাক্টিরিয়া কিন্তু সাধারণ উদ্ভিদের মত ক্লোরোফিলের সাহায্য ব্যতিরেকেই সরল অজৈব যৌগিক, এমন কি—মৌলিক পদার্থ থেকেও নিজেদের খাদ্য উৎপন্ন করতে পারে। জীব-বিজ্ঞানে এটি এক বিচিত্র ব্যাপার। এই শ্রেণীর ব্যাক্টিরিয়াদের বলা চলে স্বভোজী, অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণ ব্যাপারে এরা অন্য জীবের উপর আদৌ নির্ভরশীল নয়।

পরিশেষে একটা প্রশ্ন থেকে যায়, ব্যাক্টিরিয়াদের উদ্ভিদ বলা হয় কেন? এদের প্রাণী বলতে বাধা কোথায়? উদ্ভিদের সঙ্গে প্রাণীর যে একটা বিভেদ রেখা আছে, নিম্নতম জীবদের ক্ষেত্রে সেই সীমারেখা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। কিন্তু উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য আছে—উদ্ভিদ-কোষের সেলুলোজ কোষ-প্রাচীর আছে, যা প্রাণী-কোষের নেই। ব্যাক্টিরিয়ার কোষ-প্রাচীর থাকে, তাই একে বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ শ্রেণীতেই ফেলেছেন।

রোগবাহী ব্যাক্টিরিয়া একদিকে যেমন মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে' আমাদের অকল্যাণ সাধন করে, অন্যদিকে উপকারী ব্যাক্টিরিয়াও তেমন প্রতিনিয়ত নানাভাবে আমাদের কল্যাণ সাধন করে থাকে। সুতরাং ব্যাক্টিরিয়া মাত্রেই অনিষ্টকারী, এই ধারণা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। ব্যাক্টিরিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও খুব সীমাবদ্ধ, ভবিষ্যতে এদের সম্বন্ধে আমরা যতই অধিক জ্ঞান লাভ করবো, ততই শারীর ও কৃষি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর উন্নতি সম্ভব হবে।

স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশু

শ্রীঅমলকুমার মিত্র

ইংরেজীতে 'নার্ভাস চাইল্ড' বলতে ছেলে-মেয়েদের অনেক রকমের অসুখের কথা বোঝায়। মানসিক অস্থিরতা, মানসিক অবসাদ, বদমেজাজ, খিটখিটে স্বভাব, অত্যধিক আনন্দ, অত্যধিক দুঃখ প্রভৃতি মানসিক অসুস্থতার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়াও স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশু ক্ষুধাহীনতা, নিদ্রাহীনতা, অজীর্ণ এবং হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখে কষ্ট পায়। এসব ছেলেমেয়েদের কু-অভ্যাস বলতে আঙ্গুল চোষা, নখ কামড়ানো, চিম্‌টি কাটা প্রভৃতি বোঝায়। কথাবার্তার মধ্যে আনুভূতিক চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। ভাবাবেগ-বশতঃ শরীর ও মনের উপর শাসন হারিয়ে ফেলে এরা নিজেরাও কষ্ট পায়, অপরকেও কষ্ট দেয়।

বলিষ্ঠ, সতেজ চেহারা বলতে যা বোঝায়, স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুর চেহারা সেরূপ নয়। চোখে দুশ্চিন্তার চাউনি, মুখে একপ্রকার বিষণ্ণ হাসি—সব মিলে গভীর মানসিক অস্থিরতার পূর্ণাঙ্গ ছবি। কথা বলতে গেলে এরা ঘেমে নেয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। মাষ্টার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে এরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। একবার জামার কলার মুখে পোরে, আর একবার সার্টের বোতাম ধরে টানা হ্যাঁচড়া করে। কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার ও চালচলনের মধ্যে সব সময়েই একটা অস্থিরতার ভাব ফুটে ওঠে। মনস্তত্ত্ববিদ্‌ হাচিংসনের মতে, ঘুমের সময়েও এদের ঘুম শান্তিপূর্ণ হয় না। ঘুমের সময় বারংবার ভয় পেয়ে কেঁপে ওঠে, ছটফট করে, ঘুমের ঘোরে কথা বলে। খাওয়াদাওয়া নিয়ে এদের খুঁৎখুঁতে ভাবের কথা কারো অজানা নয়। অন্যান্য ছেলে-

মেয়েদের তুলনায় পেটের অসুখও এদের বেশী হয়।

এসবের কারণ কি, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত। সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে এর কারণ দুটি—শারীরিক এবং আনুভূতিক। দুটিই অবশ্য পরস্পর সংশ্লিষ্ট। শারীরিক কারণসমূহের মধ্যে সুস্থতা ও অসুস্থতার প্রভাব। জীবনযাত্রা নির্বাহের বিভিন্ন অভ্যাস এবং আনুভূতিক কারণসমূহের মধ্যে আনুভূতিক প্রতিক্রিয়া জাগানো যে কোন অভিজ্ঞতাই স্নায়বিক দুর্বলতার মানসিক কারণ হিসাবে নির্দেশ করা যায়।

স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশু সমস্যাকণ্টকিত সমাজের সমস্যা বাড়ায় বই কমায় না। ঘরে এবং ঘরের বাইরে অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা এদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে তিনটি বিষয়ের প্রতি বিশেসভাবে দৃষ্টি দিতে হবে :—

(১) জন্মগত স্নায়ুমণ্ডলী, (২) দৈহিক স্বাস্থ্য এবং (৩) পরিবেশ।

শিশুর জন্মগত মানসিক বিশেসত্ব এবং গুণ অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ধরণের প্রতিক্রিয়া হয়—এটা আমরা জানি। আবার বিভিন্ন ব্যক্তির স্নায়ুমণ্ডলী বিভিন্ন হবার দরুণ একই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া হতে পারে—এটাও ঠিক। আমরা যদি শিশুদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের কথা জেনে নিয়ে তাদের মানসিক গুণাবলীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি, তাহলে কিছু পরিমাণে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। শৈশবে বহুদিন শক্ত রোগে কষ্ট পেলে, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে, অপুষ্টি এবং দুর্বলতাজনিত রোগে ভুগলে শিশুর দুর্বল স্নায়ুগুলি সহজেই উত্তেজিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে।

অনেকের মতে স্নায়বিক অস্থিরতা জন্মগত। মা যদি গর্ভাবস্থায় স্নায়বিক অস্থিরতায় ভোগেন, সন্তানের উপরও সে উত্তেজনা বর্তায়। অনেকে আবার ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁরা বলেন—পরিবেশের প্রভাবই শিশুকে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত করে তোলে। মা-বাবার ব্যবহার, শিক্ষা, শাসনের উপরই শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শিশু-পরিচালনায় পিতামাতা নিজেদের অজ্ঞাতসারে অনেক সময়ে অনেক ভুলত্রুটি করে ফেলেন। শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে একদিন অতি মাত্রায় কঠোর হওয়া এবং পরদিন আদর দিয়ে তাকে মাথায় তোলা—কোনটাই মঙ্গলজনক নয়। পিতামাতার এই অনিশ্চিত ব্যবহারে শিশুদের জীবন অশান্তিতে ভরে ওঠে।

ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ এবং পরিমিত শক্তির কথা চিন্তা না করে আমরা অনেক সময়ে বড় ভুল করি। পরীক্ষায় প্রথম হতেই হবে—এই কথা বারবার বলে আমরা শিশুদের উপর অত্যধিক চাপ দিই। পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল প্রদর্শন করতে না পারলে তাদের উপর দুর্ব্যবহার করি। এতে কাজের কাজ হয় না কিছুই, বরং অনিষ্টই সাধন করা হয় বেশী। সারাদিন স্কুলে পড়াশুনা করে আসবার পর ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃই একটু খেলাধূলা করতে চায়, বেড়াতে যেতে চায়। কিন্তু অনেক মা-বাবাই ছেলেমেয়েদের খেলাধুলাকে ভাল চোখে দেখেন না। তাঁরা মনে করেন—এতে পড়ার ক্ষতি হয়। ফলে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই পড়াশুনা, শিষ্টাচার এবং ভদ্রতা শিখতে শিখতে ছেলেমেয়েদের কেটে যায়। এইভাবে আদেশ-উপদেশের বোঝা চাপিয়ে শিশুকে যন্ত্রচালিত করে রাখবার ফলে সে গভীর বিরক্তি এবং উত্তেজনা অনুভব করে। ডাক্তার রিচার্ডসন প্রমুখ অনেক মনস্তত্ত্ববিদের মতে—অভিভাবকের দুশ্চিন্তা, কঠোর শাসন, পিতামাতার অসুখী দাম্পত্যজীবন এবং অতিমাত্রায় নৈতিকতার চাপেই শিশুরা স্নায়বিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

স্কুলের কু-পরিবেশও অনেক ক্ষেত্রে শিশুর মনে অস্থিরতা এনে দেয়। সব ছেলেমেয়ের বুদ্ধিবৃত্তি একই রকমের হয় না। একই বয়সের দুটি ছেলে—একজনের হয়তো বেশী বুদ্ধি, আর একজনের কম। সে জন্যে যতদূর সম্ভব শিশুর মানসিক শক্তি অনুযায়ী ক্রমানুসারে তাঁদের স্কুলের শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। এর অন্যথা হলে ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তির পার্থক্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের যে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করলে খুবই অপকার করা হয়। যে শিশু শ্রেণী-কক্ষে কার্যধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, সে বড় উদ্বেগ অনুভব করে। শিক্ষক মহাশয়েরাও এসব পিছিয়ে-পড়া শিশুদের উপর অত্যন্ত বিরূপ হয়ে ওঠেন। ফলে শিশুর মনে স্কুলের পরিবেশটাই জেলখানার আকার ধারণ করে। এমন পরিস্থিতিতে ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে আমরা কি আশা করতে পারি?

শিশুরা কেন স্নায়বিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এতক্ষণ তাই আলোচনা করা গেল। এসব কারণের জন্যে তাদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটে।

উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ছেলে-মেয়েরা স্নায়বিক রোগে কষ্ট পাচ্ছে।

১। খাওয়া-দাওয়ায় ওজর-আপত্তি—স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুরা খেতে বসলেই 'এটা খাব', 'ওটা খাব না' করতে থাকে। এভাবে মায়ের উপর প্রভুত্ব খাটাতে চেষ্টা করে। মা-ও যখন দেখেন ছেলে না খেয়ে থাকবে, তখন তার আব্দার মেনে নিয়ে আদর করে, প্রয়োজন হলে পয়সা পর্যন্ত দিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে চেষ্টা করেন। এইভাবে মাকে জব্দ হতে দেখলে শিশু প্রায় প্রত্যহ একই অভিনয় করে' নিজের অভীষ্ট সাধনে প্রয়াসী হয়। খাবার সময় মা এবং ছেলের মধ্যে যে খণ্ডযুদ্ধের সৃষ্টি হয় এবং তাতে যে অশান্তিময় পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাতে হাজার ভাল খাবার পেলেও শিশু যে উপকৃত হতে পারে না, সেটা আমরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারি।

২। একমাত্র সন্তানের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ছেলের খাওয়া, শোয়া, পড়াশুনা, অসুখ-বিসুখ—সবটাতেই মা বড় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই দুর্বলতার সুবিধা নিয়ে সে খাবার সময় বমি করে কিংবা বমি করবার ভাব দেখিয়ে মাকে ভয় দেখায়। ইংরেজীতে একে 'নার্ভাস ভোমিটিং' বলা হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, এভাবে বমি করে শিশু মায়ের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে প্রয়াস পায় এবং মনের অনেক ইচ্ছা পূরণ করে।

৩। পরাজয়ের ভয়, অকৃতকার্য হবার আশঙ্কা—স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুদের আর একটি লক্ষণ। অতি প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চাকাঙ্খী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে এই লক্ষণ আরো বেশী প্রকাশ পায়। এসব ছেলেমেয়েদের পিতামাতা তাঁদের সন্তানদের কাছ থেকে অনেক আশা করেন এবং আশানুরূপ ফল না পেলে ঘরে যে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তাতে শিশুর মনে নানারূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তখন শারীরিক এবং মানসিক কঠোর কষ্ট স্বীকার করেও তারা অভিভাবকদের সন্তুষ্ট করবার জন্যে উঠেপড়ে লাগে। শরীরের দিকে না তাকিয়ে দিনরাত পড়াশুনা করে, নিজের ইচ্ছা এবং অভিভাবকের ইচ্ছা পূর্ণ করতে যত্নবান হয়। এসব কষ্ট ছাড়াও সব সময়ে একটা আশঙ্কা—'এত পড়েও যদি কিছু না হয়'—তাদের অস্থির করে তোলে এবং স্নায়বিক দুর্বলতার সৃষ্টি করে।

৪। স্নায়বিক রোগগ্রস্ত শিশুরা নিজেদের প্রত্যেকটি ব্যবহার, কথাবার্তা এবং চালচলন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকে। আদর্শ ছেলেমেয়ের অভিনয় করতে গিয়ে তারা অতি ছোটখাট বিষয় সম্পর্কেও ভয়ানক ন্যায়বান এবং সচেতন থাকে। ঘরের শিক্ষার জন্যেই যে এরূপ হয়, সে কথা অল্প

ি করলেই বোঝা যাবে। নৈতিকতার গোড়ামিতে অন্ধ অনেক মা-বাবাই ছেলেমেয়েদের অনবরত ধর্মের ভয় দেখান। ছোটখাট দুষ্কার্যগুলিকে বিরাট রূপে, ভয়ঙ্কর রূপে শিশুদের সামনে উপস্থিত করেন এবং প্রত্যেকটি পদক্ষেপে পাপ পুণ্যের প্রশ্ন তুলে গভীর উদ্বেগ এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তখন ছেলেমেয়েরাও শিশুসুলভ স্বাভাবিক ইচ্ছা, আকাঙ্খা এবং আচরণ দমন করে আদর্শস্থানীয় হতে প্রয়াস পায়। এর ফলে নিজেদের মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে কম বেগ পেতে হয় না। অভিভাবক এবং শিক্ষকের প্রতি অস্বাভাবিক কর্তব্যবোধ এবং পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ সম্বন্ধে অস্বাভাবিক আতঙ্ক—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে শিশুকে বড়ই অসহায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। এভাবে ঘরে মা-বাবা, স্কুলে শিক্ষক এবং সবার উপর 'ঈশ্বরের' ভয় স্নায়বিক রোগের বীজ বপন করে এবং শিশুকে মানসিক সংঘাত ও অশান্তির মধ্যে দিন কাটাতে হয়। শিশুদের কাছে সব সময়ে নৈতিক আদর্শের কথা প্রচার করা এবং শিশুসুলভ সব কাজের মধ্যেই ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্মের প্রশ্ন এনে সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবন-ছন্দের গতিকে ব্যাহত করা অত্যন্ত অনুচিত। শিশুর মানসিক শক্তি এবং স্বভাবের বিরুদ্ধে জোর করে ধরে-বেঁধে তাকে 'ভাল ছেলে' করতে গেলে, সে কোনদিনই মানুষ হয়ে উঠতে পারবে না।

টেলস্টার

সোমনাথ চক্রবর্তী

"আমি ফ্রেড ক্যাপেল, অ্যাণ্ডোভার মেইন থেকে বলছি। আমার কথাগুলি টেলস্টার থেকে রিলে করা হচ্ছে……কি রকম শুনতে পাচ্ছেন?" সেখান থেকে চার-শ' মাইল দূরে রাজধানী ওয়াশিংটনে বসে উপরাষ্ট্রপতি লাইডন বি. জনসন কথাগুলি শুনছিলেন। উত্তরে বললেন "আপনার কথা চমৎকার শোনা যাচ্ছে"—এই হলো টেলস্টারের মাধ্যমে প্রথম বার্তা বিনিময়।

১৯৬২ সালের ১০ই জুলাই সন্ধ্যা ৭টা ২৮ মিনিটের (E D-T) সময় ঘটনাটি ঘটে। এর ঠিক পনেরো ঘণ্টা আগে ভোরবেলা ১৭০ পাউণ্ড ওজনের টেলস্টার উপগ্রহটিকে নিয়ে ৯০ ফুট লম্বা থর-ডেল্টা রকেট প্রচণ্ড গর্জনে ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল থেকে মহাশূন্যে যাত্রা করে। উপগ্রহটি ১৫৭'৮ মিনিটে নিজ কক্ষে পৌঁছে যায় এবং পৃথিবীর ৩৫০৩ থেকে ৫৯৩ মাইল দূরে বিষুব রেখার সঙ্গে ৪৪.৮° কোণ করে ঘুরতে থাকে।

অতি প্রাচীনকালে আগুন জ্বালিয়ে বা ঢাক পিটিয়ে দূর-দূরান্তে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ প্রেরণের উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সংবাদ প্রেরণের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হয়। ১৮৩২ সালে স্যামুয়েল মর্স টেলিগ্রাফে সঙ্কেত প্রেরণের উপায় উদ্ভাবন করেন। আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল ১৮৭৬ সালে টেলিফোন আবিষ্কার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ১৮৯৫ সালে ইটালীর গুগ্‌লিএল্‌মো মার্কনি বেতার আবিষ্কার করে তারের সাহায্য ব্যতিরেকে বহুদূরে খবর আদান-প্রদানের ব্যবস্থায় নবযুগের সূচনা করেন। ১৯০১ সালে

আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে প্রথম খবর প্রেরিত হয়।

১৮৫৮ সালে প্রথম আটলাণ্টিক মহাসাগরের এপাড়-ওপাড়ে কেব্‌লের সাহায্যে বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং রাণী ভিক্টোরিয়া ও রাষ্ট্রপতি বুকনান পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ১৯১৫ সালে হনলুলু, প্যারিস ও ওয়াশিংটনের মধ্য প্রথম বেতার টেলিফোন সংযোগ করা হয় এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ১৯২৭ সাল থেকে ইউরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৭ সালে প্রেরিত খবরের সংখ্যা ছিল ১১০০০ এবং ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা হয়েছে চল্লিশ লক্ষেরও বেশী।

এণ্ডোভারে বেল টেলিফোন কোম্পানী এক অদ্ভুত ধরণের গম্বুজাকৃতি বিরাট গৃহ নির্মাণ করেন। এর মধ্য টেলস্টার থেকে প্রতিফলিত অতি ক্ষীণ সিগ্‌ন্যাল ধরবার জন্যে ৩৮০ টন ওজনের একটি অ্যাণ্টিনা স্থাপন করেছেন। ফ্রান্সেও ঠিক একই রকমের একটি অ্যাণ্টিনা স্থাপিত হয়েছে।

১০ই জুলাই (১৯৬২) সন্ধ্যা ৭টা ১৭ মিঃ (E.D.T) টেলস্টারকে প্রথম হাইতির উপর দেখা যায় এবং ৭টা ২৮ মিঃ (E.D.T) ফ্রেডারিক ক্যাপেলের কথা টেলস্টারে প্রতিফলিত করে অ্যাণ্ডোভারে ধরা হয় এবং ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। এই সময় টেলস্টার প্রতি ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইল বেগে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছিল। ৭টা ৪৫ মিঃ-এ (E.D.T) ফ্রান্স জানায় যে, সে টেলস্টার থেকে প্রতিফলিত কথা এবং টেলিভিসনের ছবি ধরতে সক্ষম হয়েছে। উপগ্রহকে বার্তা প্রেরণের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহারের চিন্তা নতুন নয়। মানুষ যখন রকেটের সাহায্যে কোন বস্তুকে মহাশূন্যে প্রেরণের চিন্তা করছিল, সম্ভবতঃ তখন থেকেই এর দ্বারা খবর আদান-প্রদানের সম্ভাব্যতার কথাও চিন্তা করেছিল। কিন্তু কোন চিন্তাকে কাজে রূপ দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। এজন্যে রকেট-বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্‌স এবং উপগ্রহ নির্মাণের কাজে অধিকতর উন্নতি সাধনের প্রয়োজন।

বার্তা প্রেরণের এই ব্যবস্থা খুবই সাধারণ। মহাশূন্যে উপগ্রহটি (কিরূপে তৈরী হয়েছে তার উপর নির্ভর করে) হয় রেডিও-তরঙ্গগুলিকে প্রতিফলিত করবে—আয়না যেমন আলোক-রশ্মি প্রতিফলিত করে, অথবা এটি একটি ছোট নকল রেডিও স্টেসনরূপে কাজ করবে এবং পৃথিবী থেকে পাঠানো তরঙ্গ গ্রহণ করে আরেক স্থানে পাঠিয়ে দেবে। সবই হবে অবশ্য স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায়। প্রথম শ্রেণীর উপগ্রহকে বলা হয় Passive Satellite এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর উপ-গ্রহকে বলা হয় Active Satellite। টেলস্টার দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি উদাহরণ।

যেহেতু রেডিও-তরঙ্গ সরল রেখায় চলে, সেহেতু উপগ্রহটিকে এমন এক উচ্চতায় রাখতে হবে, যাতে সেটা প্রেরিত তরঙ্গের আওতায় পড়ে। কিন্তু ঠিক উচ্চতা কতটা? যত ছোট কক্ষে উপগ্রহটি ঘুরবে, ততই তার গতি বেশী হবে এবং পৃথিবীর উপরিস্থিত খবর প্রেরক স্থানের উপর দিয়ে অতি দ্রুত অতিক্রম করবে। কাজেই ক্রমাগত খবর 'রিলে' করতে হলে অনেক উপগ্রহের প্রয়োজন হবে। এক হাজার মাইল উচ্চতায় কোন উপগ্রহের পক্ষে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে দু-ঘণ্টা সময় লাগে, ১২০০০ মাইল উচ্চতায় এগারো ঘণ্টারও বেশী এবং ২২৩০০ মাইল উচ্চতায় ঠিক ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ উপগ্রহের গতি পৃথিবীর গতির সমান হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, যদি উপগ্রহটি হাজার মাইল উচ্চতায় থাকে, তাহলে ক্রমাগত খবর আদান-প্রদানের জন্যে চার-শ' উপগ্রহের প্রয়োজন হবে। ৫০০০ মাইল উচ্চতায় এই সংখ্যা দাঁড়াবে চল্লিশে। তবে ২২,৩০০ মাইল উচ্চতায় তিনটি উপগ্রহের দ্বারাই এই কাজ করা হবে। যেখানে প্রতিটি উপগ্রহের জন্যে দু'কোটি থেকে পনেরো কোটি টাকা খরচ হয়, সেখানে স্বভাবতঃই বৈজ্ঞানিকেরা

সবচেয়ে কম সংখ্যক উপগ্রহের দ্বারা কাজ চালাবার কথা চিন্তা করবেন।

দ্বিতীয় চিন্তা হচ্ছে খবর প্রেরণ এবং গ্রহণের বিষয়। ২২,৩০০ মাইল দূরে রেডিও-তরঙ্গ যেতে এবং ফিরে আসতে প্রায় ০.৬ সেকেণ্ড সময় লাগে। কাজেই গ্রাহক-যন্ত্রে যখন কোন খবর ধরা হবে, তখন এক প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হবে যাতে পরিষ্কার শোনা সম্ভব হবে না। এই জন্যে আপাততঃ কম উচ্চতায় পরীক্ষা চলছে।

"প্যাসিভ" শ্রেণীর উপগ্রহের গঠন অনেক সহজ হবার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা এদিকে বেশী আকৃষ্ট হয়েছেন। যদিও উপগ্রহটির গঠন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু এর জন্যে প্রেরক এবং গ্রাহক-যন্ত্র অনেক শক্তিশালী করতে হবে—যা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালানো সম্ভব নয়।

"অ্যাকটিভ" শ্রেণীর উপগ্রহ নিজে অনেক জটিল হলেও প্রেরক এবং গ্রাহক-যন্ত্র অনেক কম জটিল। এতে প্রধান ব্যাপার হচ্ছে উপগ্রহটির মধ্য শক্তি তৈরীর ব্যবস্থা।

১৯৬০ সালের ৪ঠা অক্টোবর ইউ. এস. আর্মি সিগ্ন্যাল কোর থেকে "অ্যাকটিভ" শ্রেণীর একটি উপগ্রহ পাঠানো হয়। ৫০০ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটি সূর্যরশ্মিকে বিদ্যুতে পরিবর্তন করবার জন্যে Silicon Solar Cell দ্বারা আবৃত ছিল এবং ১৫৮ মাইল উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যে চারটি করে প্রেরক এবং ধারক যন্ত্র ও পাঁচটি টেপ রেকর্ডারও ছিল। যখনই উপগ্রহটি পৃথিবীর বিশেস কোন স্থানের উপর দিয়ে যায়—তখনই প্রেরিত খবর টেপ রেকর্ডারে ধরে নেয় এবং পরে সেই খবরগুলিই প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পাঠিয়ে দেয়।

টেলস্টার এবং রিলেতে বিশেস কোন তফাৎ নেই। টেলস্টার গোলাকার ও রিলে অষ্টভুজ প্রিজম। ৩০০০ মাইল উর্ধ্বে বিষুব রেখার সঙ্গে ৪৫° থেকে ৫০° ডিগ্রী কোণে অবস্থান করে। টেলস্টারের কক্ষপথ ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়ের মধ্য দিয়ে গেছে। টেলস্টারে কেবল বিকিরণ পরিমাপের জন্যে ১১৫ রকম বিষয় আছে। টেলস্টার ৪১৭০ মেগাসাইকলে বার্তা প্রেরণ করে। যদি টেলস্টার ৩০০০ মাইল উচ্চতা থেকে আড়াই ওয়াট শক্তিতে সিগ্ন্যাল পাঠায়, তাহলে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে পৌঁছুতে তা এক-শ' কোটি ভাগের এক ভাগের সমান হয়ে যায় এবং তাকে ধরবার জন্যে হর্ণের মত বিরাট এরিয়েলের প্রয়োজন হয়। এই হর্ণ অ্যান্টিনায় MASER নামে এক রকম অত্যাশ্চর্য কেলাস (Ruby crystal) থাকে। MASER-এর পুরো নাম হচ্ছে Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation। এই "মাসার" আধুনিক বিজ্ঞানের এক অত্যাশ্চর্য অবদান। ডাঃ চার্লস এইচ. টাউনস্ ১৯৫৪ সালে "মাসার" আবিষ্কার করেন। এই "মাসার" যখন তরল হিলিয়ামে (-২৬৯°c) ঠাণ্ডা করা হয়, তখন এটা টেলস্টার থেকে প্রেরিত সিগন্যালের একশত ভাগের এক ভাগকে আমাদের কানে শোনবার মত বর্ধিত করে তোলে—যা অন্য কোন বৈদ্যুতিক অ্যামপ্লিফায়ারের দ্বারা সম্ভব নয়।

এসব উপগ্রহগুলিকে থর-ডেল্টা রকেটের সাহায্যে মহাশূন্যে পাঠানো হয়। সাধারণতঃ এই থর-ডেল্টা রকেটের সাহায্যে ৫০০ পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহকে ৩০০ মাইল উচ্চ কক্ষে স্থাপন করা যায়। উপগ্রহের ওজন কমিয়ে এবং ক্ষেপণের কোণ বদল করে উপগ্রহগুলিকে ডিম্বাকৃতি কক্ষে স্থাপন করা হয়। এই থর-ডেল্টা রকেটের শক্তি একটি বিশেষ ওজন ও দূরত্বে সীমাবদ্ধ। এই সীমাবদ্ধতা দূর করবার জন্যে অন্য এক ধরণের শক্তিশালী রকেট ব্যবহার করা হবে, যার নাম 'অ্যাটলাস এজেনা বি'। এটা ৬০০ পাউণ্ড ওজনের উপগ্রহকে ১২০০০ মাইল উচ্চ গোলাকার কক্ষে স্থাপন করতে সক্ষম। তাছাড়া একই রকেটের সাহায্যে একাধিক উপগ্রহ শূন্যে প্রেরণের জন্যে গবেষণা চলছে এবং এই প্রচেষ্টা সফল হলে আর্থিক লাভ হবে প্রচুর।

আগে সৌর-কোষের (Solar cell) উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। সৌর-কোষের কাজ হলো সূর্যরশ্মিকে বিদ্যুতে পরিবর্তিত করা। টেলস্টারটি এই সৌর-কোষের দ্বারা আবৃত থাকে—যার সংখ্যা ৩৬০০ এবং এর দ্বারা ৬৫ ওয়াট শক্তি উৎপন্ন হয়। সৌর-কোষ তৈরী করতে প্রচুর খরচ হয় এবং টেলস্টার যখন পৃথিবীর ছায়ার মধ্য দিয়ে যায়, তখন কোন রূপ শক্তি তৈরী করতে পারে না। কাজেই ক্রমাগত খবর পাঠাবার জন্যে টেলস্টারের মধ্যে ব্যাটারীও রাখা প্রয়োজন—যা অহেতুক উপগ্রহটির ওজন বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন যে, মহাশূন্যে বিকিরণ ইত্যাদির দ্বারা সৌর-কোষগুলির কার্যক্ষমতা কমে যায়। দেখা গেছে যে, যদি স্যাফায়ার-এর পাত্‌লা আবরণ দিয়ে সৌর-কোষগুলিকে ঢেকে দেওয়া যায়, তাহলে কোষগুলি বেশী দিন কার্যক্ষম থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে, এমন একদিন আসবে যখন টেলস্টারের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোন অংশে খবর পাঠানো যাবে এবং তাছাড়াও এটি টেলিভিসনে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনবে। তখন যে কেউ পৃথিবীর যে কোন অংশে ফোন করবার জন্যে সংখ্যা ডায়াল করতে পারবে। টেলিগ্রাম এবং টেলিফটো অনেক দ্রুত পাঠানো যাবে। সারা দুনিয়ার সব খবর নিমেষের মধ্য সর্বত্র পৌঁছে যাবে।

সঞ্চয়ন

হাজার হাজার দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে

একজন অন্ধ ব্যক্তি বিশ্বের সমস্ত অন্ধদের জন্য এক নূতন আশার বাণী বহন করিয়া সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার নাম মিঃ জন উইলসন। ইনি 'রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক সংস্থার কর্মাধ্যক্ষ। অন্ধত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম চালাইবার জন্য তিনি যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন, তাহারই চূড়ান্ত রূপ দিবার জন্য তিনি বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইয়াছেন।

২০শে মে হইতে ৩১ মে পর্যন্ত মালয়ে এক বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই সম্মেলনে উপরিউক্ত পরিকল্পনাটি আলোচিত হয়। পরিকল্পনাটি কার্যকরী হইলে এশিয়ার সহস্র সহস্র দৃষ্টিহীন ব্যক্তি বিশেষ ভাবে উপকৃত হইবে এবং অনেকে দৃষ্টিও ফিরিয়া পাইবে।

মিঃ উইলসন ১২ বৎসর বয়সে অন্ধ হইয়া যান। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহার পরিকল্পনাটি সারা বিশ্বের সমর্থন লাভ করিবে।

মিঃ উইলসনের বিশ্বপরিক্রমা সম্পর্কে 'রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ডের' জনৈক মুখপাত্র বলেন: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এক বৎসর ধরিয়া এই মর্মে প্রচার চালাইয়া আসেন যে, এশিয়াবাসীদের মধ্যে যে অন্ধত্বের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়, তাহার অধিকাংশই নিবারণ করা যায়। এই প্রচার অভিযানে মিঃ উইলসন এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। সোসাইটি মনে করেন যে, অন্ধত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অভিযান চালাইবার এখন সময় আসিয়াছে এবং সেই অভিযানে কমনওয়েলথ নেতৃত্ব করিতে পারে।

লণ্ডনে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মিঃ উইলসন বলেন যে, বিশ্বের মোট ১০,০০০,০০০ অন্ধ ব্যক্তির দুই-তৃতীয়াংশ এশিয়ায় বাস করে। ইহা সকলে

জানেন যে, ইহাদের মধ্যে হাজার হাজার লোক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আমি আমার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি রচনা করিয়াছি।

অন্ধত্ব বিরোধী অভিযান সম্পর্কিত কতকগুলি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ উইলসন বলেন—ভারতে যে ২,০০০,০০০ অন্ধ ব্যক্তি আছে, তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ট্র্যাকোমা রোগে দৃষ্টি হারাইয়াছে। ট্র্যাকোমা রোগ অ্যান্টিবায়োটিক বা সাল্‌ফা ঔষধ প্রয়োগে সারানো যায়। মিঃ উইলসন বলেন যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এই সকল ঔষধ প্রয়োগ করিয়া ট্র্যাকোমা রোগ ও অন্ধত্ব নিরাময়ের জন্য ব্যাপকভাবে চেষ্টা করা হইবে।

তিনি বলেন অন্ধত্বের আর একটি কারণ হইল ক্যাটার্যাক্ট বা ছানি—মাত্র ২০টি মিনিটের অপারেশনে যাহা দূর করা যায়। বর্তমানে এই অপারেশন করিবার মত যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার নাই। আমাদের কাজ হইবে ছানি কাটিবার জন্য আরও অধিক সংখ্যক ডাক্তার সরবরাহ করা।

তিনি বলেন—তৃতীয় কারণ হইল, অপুষ্টি অথবা শিশুদের খাদ্যে ভিটামিনের অভাব। যে সকল আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুধার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতেছে, এই অভাব মিটাইবার জন্যও আমরা তাহাদের সহযোগিতায় কিছু করিতে পারি।

তাঁহার পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হইলে মালয় সম্মেলনের পর ইহা কার্যে পরিণত করা হইবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী এশিয়ায় কল্যাণমূলক কাজকর্মও বৃদ্ধি পাইবে। এই কাজকর্ম হইল অন্ধ শিশুদের শিক্ষাদান করা এবং অন্ধ ব্যক্তিদের ট্রেনিং দিয়া কোন কাজের উপযুক্ত করিয়া তোলা

মিঃ উইলসন বলেন: আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীর যে সকল গবর্ণমেন্ট ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অন্ধদের কল্যাণের জন্য কাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই পরস্পরের কাজে সহযোগিতা করিবেন। কমনওয়েলথ এই ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করিবে এবং আমি আশা করি যে, আমেরিকার কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলির সহায়তায় আমরা এমন কাজ করিতে পারিব যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে অন্ধদের সংখ্যা অনেক হ্রাস পাইবে।

'রয়েল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দি ব্লাইণ্ড' গত ১২ বৎসর ধরিয়া অন্ধদের কল্যাণ, শিক্ষা, কর্মে নিয়োগ এবং অন্ধত্ব যথাসম্ভব নিবারণের জন্য কাজ করিয়া যাইতেছেন। সোসাইটি এই ধরণের কাজে নিযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত সর্বতোভাবে সহযোগিতা করিয়া থাকেন।

আবহাওয়া ও পরমাণু

এই সম্বন্ধে ডাঃ ব্যালিস স্তিরা লিখেছেন—পারমাণবিক আবহবিদ্যা বা নিউক্লিয়ার মিটিওরোলজির আলোচ্য বিষয় হলো, পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে সব তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, সেগুলির প্রকৃতি ও ধর্ম অনুশীলন করা। বিজ্ঞানের এই শাখাটির উৎপত্তি ঘটে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গমস্থলে; যেমন—তেজস্ক্রিয়া ও মহাজাগতিক বিকিরণ, ভূ-তেজস্ক্রিয়া, পৃথিবীর আবহমণ্ডলের ভৌতিক অবস্থাবৈগুণ্য ও তেজস্ক্রিয় রসায়ন।

গত শতকের শেষের দিকে জানা যায়, ভূপৃষ্ঠ ও মাটিতে যেসব তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের (ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাকটিনুরেনিয়াম) অস্তিত্ব আছে, সেগুলির ক্ষয়প্রাপ্তির কোন একটি পর্যায়ে এক ধরণের গ্যাসীয় বস্তুর উৎপত্তি হয়। পরবর্তীকালে এই ব্যাপারটার নাম দেওয়া হয়—ইমানেশন বা নিঃসরণ। এই "মাটির শ্বাস-ক্রিয়া" কালে ওই গ্যাসীয় ইমানেশন আবহমণ্ডলে মিশে যায়।

তিন রকমের ইমানেশন আছে বলে এ-পর্যন্ত জানা গেছে—রেডিয়াম, থোরিয়াম ও অ্যাক্টিনিয়ামের নিঃসরণ—যে ইমানেশনগুলিকে বলা হয়, যথাক্রমে রেডন, থোরন ও অ্যাক্টিনন। এদের সবগুলিই অস্থায়ী ও ক্ষয়প্রবণ। এই সকল পদার্থের অর্ধ-জীবনকাল, অর্থাৎ নিঃসরণ-প্রক্রিয়া সুরু হবার সময় যে পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছিল, সেই পরিমাণটুকু তেজস্ক্রিয় ইমানেশনের ফলে বিশ্লিষ্ট হয়ে অর্ধেকে পরিণত হতে সময় নেয়—রেডনের ক্ষেত্রে প্রায় ৪ দিন, থোরনের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৫ সেকেণ্ড এবং অ্যাক্টিননের ক্ষেত্রে প্রায় ৪ সেকেণ্ড।

বিশ্লিষ্ট হবার কালে গ্যাসগুলি প্রথমে উপনীত হয় বিসমাথ, সীসা আর পোলোনিয়ামের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে এবং শেষ পর্যন্ত পরিণত হয় স্থায়ী ও তেজস্ক্রিয়াবিহীন সীসায়। তেজস্ক্রিয় কঠিন পদার্থগুলির পরমাণু বাতাসে ভাসতে ভাসতে অণুবীক্ষণাতীত ধূলিকণার উপর নেমে আসে।

বাতাসে যে ধূলা ওড়ে, সেই ধূলার মধ্যে মিশে থাকে ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, অ্যাক্টিনিয়াম, পটাসিয়াম ও অন্যান্য পদার্থের তেজস্ক্রিয় পরমাণু। আবহমণ্ডলীয় তেজস্ক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে এসব অতিসূক্ষ্ম ধূলিকণা—আকারে ১ মাইক্রনেরও ভগ্নাংশ মাত্র—দীর্ঘকাল ধরে (এমন কি, কয়েক বছর ধরে) বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলে স্থায়ী মৌলিক পদার্থগুলির তেজস্ক্রিয় কণাও পাওয়া গেছে। এগুলি হলো—ট্রাইটিয়াম (হাইড্রোজেনের তেজস্ক্রিয় পরমাণু), কার্বন (পারমাণবিক ভার বা অ্যাটমিক ওয়েট (১৪), বেরিলিয়াম (৭ ও ১০), সোডিয়াম (২২), সিলিকন (২২), ফস্‌ফরাস (৩২ ও ৩৩), সালফার (৩৫) এবং ক্লোরিন (৩৬ ও ৩৯)।

ভূবিদ্যার দিক থেকে এই সমস্ত পদার্থের অর্ধ-জীবনকাল বিভিন্ন রকম—৩৫ মিনিট থেকে ২৭ লক্ষ বছর। সুতরাং এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে এদের উৎপত্তি হতে পারে না; কারণ সে ক্ষেত্রে এদের বহু আগেই ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটতো। অতএব ধরে নিতে হবে যে, এদের উৎপত্তি হয়েছে আমাদের সমকালেই—সব সময়েই এই প্রক্রিয়া চলছে। গত দুই দশক ধরে এই প্রক্রিয়াটির আবিষ্কার হয়েছে এবং অনুশীলন চলেছে, যার ফলে দেখা গেছে—বায়ুমণ্ডলে এসব মৌলিক পদার্থগুলির উৎপত্তি ঘটে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে, অর্থাৎ মহাশূন্য থেকে যে সব বিপুল শক্তিবাহী কণা পৃথিবীতে অনবরত প্রচণ্ড বেগে এসে পড়ছে। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ধন তড়িতাবিষ্ট কণা, অর্থাৎ প্রোটন, কিংবা হাল্‌কা মৌলিক পদার্থগুলির নিউক্লিয়াসই মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ায়, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে না ঢুকে পড়ে। লক্ষ লক্ষ বছরে তাদের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে কল্পনাতীত রকমের প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ দ্রুতগতি-সম্পন্ন কণিকার উৎপত্তি তারকার গভীর অন্তর্দেশেও হতে পারে। এই প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন কণিকা যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন তারা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধিয়ে নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আইসোটোপিক ও রাসায়নিক সংযুতির প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। মহাজাগতিক রশ্মির তীব্রতা এবং তার ফলে বাতাসের উপাদানগুলির সংযুতি যদি কোন দিন বদ্‌লে যায়, তাহলে বায়ুমণ্ডলের অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? বিজ্ঞানীরা ইদানীং এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করছেন।

তেজস্ক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর আবহাওয়া দূষিত হবার ব্যাপারে মানুষের ক্রিয়াকলাপেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার পৃথিবীর আবহাওয়াকে বিশেষ কিছু দূষিত না করলেও পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার ফলে বহু নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ উৎপাদনকারী

শত শত তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের উদ্ভব ঘটে, যার ফলে হ্রস্ব-আয়ুর পদার্থ এবং কয়েক দশক ধরে গামা-রশ্মি ও বিটা-রশ্মি বিকিরণকারী পদার্থগুলির ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটে। এই মহাজাগতিক ধূলিকণা ও উল্কাকণার সঙ্গে তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিও বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

পার্থিব বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থকণিকার এই অবিরাম প্রবেশ শেষ পর্যন্ত এক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতো—যদি বিপরীত এক শোধন-প্রক্রিয়া সেই সঙ্গে না থাকতো। ৬০ বছরব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, বাতাসে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ মোটের উপর অপরিবর্তিত এবং বিশুদ্ধিকরণের কাজটাও বেশ সক্রিয় রয়েছে। বায়ুমণ্ডলীয় তেজস্ক্রিয়ার হ্রাসপ্রাপ্তির একটা কারণ হলো তেজস্ক্রিয়ার ক্ষয়। কিন্তু একমাত্র এটিই আবহমণ্ডলের বর্তমান তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণের কারণ নয়। গবেষণার ফলে দেখা গেছে, তেজস্ক্রিয় কণা তুষারপাত বা বৃষ্টিপাতের সঙ্গে নেমে এসে মাটিতে আশ্রয় নেয়। তাছাড়া সামান্য কিছু তেজস্ক্রিয়া অবশ্যই মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রায় নিখুঁত এক ভারসাম্য রেখেই তেজস্ক্রিয়াজনিত দূষ্টি ও শোধনের প্রক্রিয়া চলে।

বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ নিয়মিত ও অনিয়মিত দুই ভাবেই পরিবর্তিত হয়। নিয়মিত পরিবর্তনটা ঋতু-আবর্তন ও আহ্নিক পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। অনিয়মিত ও ইতস্ততঃ পরিবর্তন ঘটে বায়ুমণ্ডলীয় প্রবাহ ও আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে। পৃথিবীর যে সব অংশে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সমাবেশ ঘটেছে বেশী পরিমাণে, সাধারণ বায়ুপ্রবাহ সেই সব অঞ্চল থেকে সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়ে মোটের উপর সমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়। শান্ত ও পরিষ্কার আবহাওয়ায় বেশ স্পষ্ট রকম একটা আহ্নিক তেজস্ক্রিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সকালের দিকে প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণ সর্বোচ্চ, আর মনুষ্য-সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়ার পরিমাণ সর্বনিম্ন থাকে এবং বিকালের দিকে এই অবস্থাটা ঠিক উল্টে যায়।

পারমাণবিক আবহবিদ্যার একটি সমস্যা হলো, তেজস্ক্রিয় পদার্থের কোথায় কি পরিমাণ সমাবেশ ঘটেছে, সেটা নির্ণয় করা। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়ার ভৌগোলিক সমাবেশ অনেকাংশে নির্ভর করে পৃথিবীর যে অংশে সেটা নির্ণয় করা হচ্ছে, সেই অংশের ভূতাত্ত্বিক গঠনের উপর। পক্ষান্তরে, মনুষ্য-সৃষ্ট তেজস্ক্রিয়ার ভৌগোলিক সমাবেশ সাধারণ বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

আবহমণ্ডলীয় তেজস্ক্রিয়ার অনুশীলন আবহবিদ্যার অনেক নতুন দিকের উপর আলোকপাত করতে পারে। বাতাস, বৃষ্টিজল ও মেঘে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সমাবেশ সম্বন্ধে অনুশীলন করে কতকগুলি আবহ-প্রক্রিয়ার সময় হিসেব করা সম্ভব। যেমন—লিথুয়ানিয়ার বিজ্ঞানীরা বৃষ্টির একটি ফোঁটার "আয়ু"—অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে একটি বৃষ্টি-ফোঁটা কতক্ষণ থাকে, সেই সময়টুকু হিসাব করে বের করেছেন।

মাপজোক ও পর্যবেক্ষণের কাজকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলাটা এই স্বয়ংক্রিয়করণ ও সাইবারনেটিক্স-এর যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আবহমণ্ডলীয় তেজস্ক্রিয়া সম্পর্কে গবেষণাও অনিবার্যভাবে এই পথে অগ্রসর হবে। এর জন্যে ইতিমধ্যেই বহু রকমের ফিল্টার (বৈদ্যুতিক ফিল্টার সহ) তৈরী করা হয়েছে। বাতাস ও মাটিতে তেজস্ক্রিয় কণার সমাবেশ এবং তার সঙ্গে আবহাওয়ার সম্পর্কের বিষয়ে অনুসন্ধান চালাবার জন্যে ভিল্নিয়ুসে (রাশিয়া) একটি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

প্লাষ্টিকের ব্যবহার প্রসারণ

উন্নততর প্লাস্টিকের নতুন নতুন ব্যবহার যুক্ত-রাষ্ট্রের পণ্যের বাজারে এখন নিত্যই পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বছরে ৩০ লক্ষ টনেরও বেশী প্লাস্টিক যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয়। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের এক প্লাস্টিকের ব্যবহার এখন দেখা যাচ্ছে বিমান ও মোটরগাড়ীর জানালা নির্মাণে। বিচ্ছুরিত আলোর দ্যুতিতে চোখ যাতে ঝল্‌সে না যায়, সেই উদ্দেশ্যেই এই প্লাস্টিক নির্মিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা আলট্রাভায়োলেট রশ্মি শোসণকারী এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবন করেছেন, যা প্লাস্টিকের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই নতুন প্লাস্টিকের মধ্য দিয়ে সূর্যের ক্ষতিকারক আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি প্রবেশ করতে পারে না। সাধারণ প্লাস্টিকে সূর্যের আলো পড়লে অনেক সময়েই তা বিবর্ণ হয়ে যায়। তখন এগুলি অনেক কাজের পক্ষেই অচল হয়ে পড়ে।

মোটর গাড়ীর জানালার শার্সি এখন নির্মাণ করা হচ্ছে এই নতুন প্লাস্টিকের সাহায্যে। এই প্লাস্টিকের চাদর থাকে মাঝখানে, আর তার দু-ধারে থাকে কাচ। বিমানের জানালার ভিতরের দিকে থাকে এই প্লাস্টিকের শার্সি, আর বাইরের দিকটাতে থাকে কাচ।

নিউজার্সির ওয়েনে অবস্থিত সায়নামিড ইন্টারন্যাশন্যালের মতে—এই নতুন ধরণের প্লাস্টিক আবিষ্কারের ফলে গৃহনির্মাণ, নৌকা ও আসবাবপত্র নির্মাণ, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রস্তুত করা এবং বাইরের আরও নানাবিধ কাজে প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্ভব হবে। এই নতুন রাসায়নিক পদার্থ ও প্লাস্টিকের সঙ্গে মিশ্রণের জন্যে আরও নানা রকম রাসায়নিকের অন্যতম প্রধান উৎপাদনকারী হচ্ছে সায়নামিড ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানীটি।

সূর্যের রশ্মি এই প্লাস্টিকের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। রৌদ্রালোক গৃহের অভ্যন্তরে যে সব সামগ্রীর ক্ষতিসাধন করতে পারে, সেগুলির ক্ষেত্রে এই ধরণের প্লাস্টিক ব্যবহার করা যেতে পারে; যেমন—জানালা-দরজার পর্দা, আসবাবপত্র প্রভৃতি।

ফ্লুরেসেন্ট আলোর আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ঘরের যে সব জায়গায় পড়ে, যেমন—মেঝের টালী প্রভৃতিতে ঐ আলট্রাভায়োলেট রশ্মিশোষণকারী এই নতুন রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত প্লাস্টিক ব্যবহার করা যায়।

আসবাবপত্রে প্লাস্টিকের ধরণের কোন কোন আবরণের মধ্যে এখন আলট্রাভায়োলেট রশ্মি-শোসক ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে এই আবরণ দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং কাঠের রং বিবর্ণ হয় না।

ছাদ, স্কাইলাইট, বেড়া প্রভৃতিতে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের চাদর, বৃক্ষলতাদিকে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ থেকে রক্ষাকল্পে নির্মিত গ্রীনহাউসের আচ্ছাদনের জন্যে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পাত্‌লা চাদর, জাহাজে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের দড়ি, যা শনের দড়ির চেয়ে দ্বি টেঁকসই এবং দোকানের পণ্যদ্রব্যাদি রক্ষার্থে প্রদর্শনী-গবাক্ষে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের পরিবর্তে এই নতুন প্লাস্টিক খুবই কার্যকরী হবে।

আলট্রাভায়োলেট শোষকের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার দেখা যায়, উজ্জ্বল রঙের দ্বারা জেট বিমানকে চিহ্নিতকরণের কাজে। এই শোষক ব্যবহারের ফলে রং কখনও ম্লান হয় না। কাজেই উজ্জ্বল রঙে বিমানটি সহজেই দৃষ্টিগোচরে আসে এবং এভাবে সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব হয়। কোন বিমান যদি কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে অবতরণে বাধ্য হয়, তার উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের জন্যে অনুসন্ধানী দল সহজেই তার সন্ধান পেতে পারে।

এমন কয়েক ধরণের প্লাস্টিক আছে, যা উৎপাদন করতে হলে উচ্চতাপের প্রয়োজন হয়। ঐ প্লাস্টিক যাতে এই উচ্চতাপ সহ্য করতে

পারে, সে জন্যে তার সঙ্গে অ্যান্টি-অক্সিডেণ্ট নামে আর এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়।

আরও একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে, যা প্লাস্টিকের সঙ্গে মিশ্রিত হলে ঐ প্লাস্টিকের ঝুড়ি, বোতল, গ্রামোফোন রেকর্ড প্রভৃতির উপর ধূলা জমতে দেয় না।

সায়নামিড ইণ্টারন্যাশন্যালের জনৈক পদস্থ কর্মচারী বলেছেন—নতুন নতুন ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের কত যে নিত্য নতুন ব্যবহার দেখা যাবে, তা আর বলে শেষ করা যায় না। নতুন নতুন উন্নততর মিশ্রণের সাহায্যে এর প্রয়োগ-ক্ষেত্র আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে রসায়ন-বিজ্ঞানীদের গবেষণা চলতেই থাকবে।

মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি

ভারতবর্ষের, তথা ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার উপর মৌসুমী বায়ুর প্রভাব অপরিসীম। আবহ-বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে সম্যক অবহিত এবং দীর্ঘকাল ধরে নানা গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। কিন্তু আরব সাগর ও বঙ্গোপ-সাগরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পর্যবেক্ষণ বা সেখান থেকে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করবার সুযোগ না থাকায় তাঁদের পক্ষে মৌসুমী বায়ুর রহস্যজাল ভেদ করা সম্ভব হয় নি।

ভারতে মৌসুমী বায়ুর প্রবাহ নির্ভর করে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরে বায়ুর গতিবিধি ও চাপের উপর। এতদিন পর্যন্ত এই দুটি এলাকায় আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবার কোন রকম ব্যবস্থা না থাকায় যে সব নৈসর্গিক কারণে মৌসুমী বায়ুর সৃষ্টি হয়, তা প্রত্যক্ষ-ভাবে জানা যায় নি—অনুমান করে তত্ত্বাদি স্থির হয়েছে। অথচ মৌসুমী বায়ুর আগমন ঠিকমত নির্ধারণ করতে হলে এই সব নৈসর্গিক কারণ জানা বিশেষ দরকার। ভারতের আবহ-বিজ্ঞানীদের জন্যে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আবহ দপ্তরের চারখানি গবেসণা-বিমান এই সব তথ্য সংগ্রহ করছে। আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর সমীক্ষার কর্মসূচীতে যুক্তরাষ্ট্রের তরফে বিমানগুলি এভাবে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিমানগুলির মূল ঘাঁটি হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার অন্তর্গত মিয়ামি বীচে। সেখানে এগুলির সাহায্যে বিভাগীয় গবেষকেরা ঝড়, সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত নানা বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন। চালক ও বিভাগীয় গবেষক সহ এই বিমান চারখানি গত ৩০শে এপ্রিল থেকে বোম্বাইতে রয়েছে।

বিমানগুলি এদেশে থাকবে তিন মাস। এই সময়ের মধ্যে ভারত মহাসাগর অঞ্চলে বারংবার ঘোরাফেরা করে তারা নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করবে। এই কাজের জন্যে এগুলি বহুবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত। এই বিমানগুলি যে সব তথ্য সংগ্রহ করবে, তার সাহায্যে আবহ-বিজ্ঞানী-দের পক্ষে মৌসুমী বায়ুর রহস্যভেদ করা সহজতর হবে।

মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হলে বিশ্বব্যাপী বায়ু-প্রবাহের গতি-প্রকৃতি উপলব্ধি করতে হবে। অনাবৃষ্টি, প্লাবন এবং বায়ুমণ্ডলের মাঝামাঝি স্তরে অত্যধিক তাপ কিম্বা শৈত্যাবস্থা প্রভৃতি আবহাওয়া সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয়ের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এর সঙ্গে। বিমানগুলি সমুদ্র-বিজ্ঞান বিষয়ক জাহাজগুলির সহযোগিতায় নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। এর মধ্যে কয়েকটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো সাইক্লোন, টাইফুন, হারিকেন প্রভৃতি বিভিন্ন ঝড়ের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করা। বাতাস অকস্মাৎ খুব বেশী রকম উত্তপ্ত হবার পরেই

এই সব সামুদ্রিক ঝটিকার সৃষ্টি হয়। এই তাপের সৃষ্টি এবং বায়ুমণ্ডলে তার প্রবাহের রূপ ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করাই হবে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত আবহ-গবেষকেরাও এই বিষয়ে সবিশেষ উৎসাহী। কারণ দেশে ঝড় বা সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক করে দেবার দায়িত্ব তাঁদের।

ভারত মহাসাগর সমীক্ষা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কর্মসূচী উপলক্ষে নানা দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা এদেশে এসেছেন। তাঁরা যে সব তথ্য সংগ্রহ করবেন, তার ফলে আবহমণ্ডল, সমুদ্র, সমুদ্র ও বাতাসের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের পরিসর বিস্তৃত হবে এবং তার ফলে সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হবে।

এই চারখানি দূরপাল্লার বিমান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক শ' ফুট থেকে সুরু করে ৪০০০০ ফুট উর্ধ্বে উড়তে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সায়েন্স ফাউণ্ডেশন এবং আবহ দপ্তরের আনুকূল্যে বিমানগুলি এই আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করছে।

বিমান চারখানির মধ্যে দুখানি হলো ডিসি-৬ বিমান। এগুলি ২৩০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে উঠতে পারে এবং সাধারণভাবে এগুলির পাল্লা হলো ৩০০০ মাইল। অপর একখানি হলো ক্যানবেরা জেট বিমানের রূপান্তর। এটি ৪৮,০০০ ফুট উঁচুতে উঠতে সক্ষম এবং পাল্লা সাধারণভাবে ১৭০০ মাইল। চতুর্থ বিমানখানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের একখানি সামরিক বিমান। এখানি স্বল্প উচ্চতায় চলাফেরা করে এবং এর পাল্লা ১৭০০ মাইল। এই বিমানগুলিতে বায়ুর চাপ, তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা পরিমাপক আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানাবিধ যন্ত্রপাতি ছাড়াও অনেক রকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি রয়েছে। বিমানগুলি উড়ে যাবার সময় সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি সেই স্তরে বাতাসের গতিপথ, গতিবেগ বাতাসের বিক্ষুব্ধ অবস্থা এবং আর্দ্রতা নির্ধারণ করবে।

বিমানগুলিতে দূরপাল্লার রেডার আছে। এগুলির সাহায্যে মেঘে বৃষ্টি হবার অবস্থা আছে কি না, তা ধরা যাবে এবং তাথেকে আবহাওয়া কতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে, তাও ধরা পড়বে। তাছাড়া বিমানগুলি যাতে আপনা থেকেই সুষ্ঠুভাবে চলাচল করতে পারে, তার জন্যে এক বিশেষ ধরণের রেডার রয়েছে এই সব বিমানে।

এসব যন্ত্রপাতি ছাড়াও বিমানগুলিতে আছে ফটো তোলবার সাজসরঞ্জাম। চলবার পথে যে সব মেঘ আসবে, তাদের ধারাবাহিক চিত্রগ্রহণ করা হবে এগুলির সাহায্যে। বিমানগুলি চলার পথে যে সব তথ্য সংগ্রহ করবে, তা সংখ্যার মাধ্যমে একটি ম্যাগনেটিক টেপ-এ লিপিবদ্ধ থাকবে। বিমানগুলি ঘাঁটিতে ফিরে আসবার পর ইলেক্‌ট্রনিক কম্পিউটারে অল্প সময়ের মধ্যেই তার পাঠোদ্ধার করা যাবে। বোম্বাই-এর এসো ইনকর্পোরেটেড (Esso. Inc.) এই কাজের জন্যে একটি কম্পিউটার যন্ত্র ব্যবহার করতে দিয়েছে।

এই গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডের ঘাঁটি হিসাবে বোম্বাই প্রকৃতই উপযুক্ত স্থান। এখানকার বিমানঘাঁটির বিভিন্ন ব্যবস্থা খুবই উৎকৃষ্ট। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি এখানকার পাল্লার মধ্যে থাকবার ফলে এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে অনুকূল স্থান।

ছোটদের বিজ্ঞান প্রদর্শনী

রমাপ্রসাদ সরকার

কৌতূহল শিশুমনের নিত্যসঙ্গী। অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, অদেখাকে দেখবার আগ্রহ তাকে সব সময় পেয়ে বসে। অপরিসীম অনুসন্ধিৎসায় ভরা শিশুর চোখে বিশ্বজগৎ মূর্ত হয়ে ওঠে "কি" ও "কেন"—এই দুটি শব্দের ভিতর দিয়ে। অনভ্যস্ত দৃষ্টি আর অনভিজ্ঞ মন নিয়ে সে যেন মহাবিশ্বের সব রহস্যকে জানতে-বুঝতে-শিখতে চায়। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততার চাপে শিশুমনের সেই একান্ত স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসাকে আমরা স্বাগত জানাতে পারি না, সাদর সম্বর্ধনায় তার মনকে ভরে দিতে পারি না তাকে ভবিষ্যতের মহান আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু এটা সকলেই বুঝতে পারি যে, আজকের এই শিশুদের মানসিক ক্ষুধা মেটান এবং তাদের বিজ্ঞান-সচেতন করে তোলা একান্ত দরকার।

শিশুদের মনের এই চাহিদা মেটাবার জন্যে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন "শিশুদের জন্যে বিজ্ঞান" প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা—শিশুদের মনে হাসি-খেলার মাধ্যমে বিজ্ঞানের সুদূরপ্রসারী আবিষ্কারের একটি সংক্ষিপ্ত ও সুবিন্যস্ত পরিচয় দেবার। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রদর্শনী লক্ষ্য করেছিল, কেমন করে শিশুর মনে জানবার, দেখবার এবং শেখবার এক অপূর্ব আগ্রহকে রূপ দেওয়া যায়, কেমন করে শিশুকে শেখানো যায় তার মনের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে। এই প্রদর্শনীটি শুধু শিশুদের মধ্যেই নয়, জনসাধারণের মধ্যেও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অবদানের কথা সহজভাবে পৌঁছে দেবার আয়োজন করেছিল। লর্ড সিন্‌হা রোডের শ্রীশিক্ষায়তনে ১০ই থেকে ১৯শে মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই অপূর্ব প্রদর্শনীটি তাই প্রতিদিনই বিপুল সংখ্যক দর্শক সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীশিক্ষায়তনের প্রাঙ্গণে প্রবেশের পর প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী নানারকম বৈজ্ঞানিক মডেল, চার্ট ও যন্ত্রপাতি। ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী এইসব বিপুল সংখ্যক মডেল আর চার্ট আমাদের তৃপ্তি দিয়েছিল এই কারণে যে, আজ আর ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু পুঁথির পাতায় মন আবদ্ধ রাখতেই ব্যস্ত নয়। যে সব অগুণতি শিশু এবং কিশোর-কিশোরীরা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল, তাদের মনে প্রেরণা জেগেছিল নতুন কিছু সৃষ্টি করবার।

এরপর ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগ। এখানে মডেল বিশেষ কিছু না থাকলেও বাচনভঙ্গীর চমৎকারিত্বে গ্রহনক্ষত্রের খুঁটিনাটি খবর জেনে নিতে কারুর অসুবিধা হয় নি, বরং সকলে বেশ আকৃষ্টই হয়েছিলেন। বিভিন্ন গ্রহের আকৃতি, তাদের অবস্থান ও সেই অবস্থান পরিবর্তনের হার ইত্যাদির সঙ্গে ছায়াপথ, নীহারিকা প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচিতি এখানে দেওয়া হয়েছিল। সেই সঙ্গে তিনটি মডেলের সাহায্যে গ্রহণ, ঋতুপরিবর্তন ও চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধিও সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছিল।

উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ব্যাপক আয়োজন ছিল। শিশুমনের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্ভিদ ও তাদের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, যেমন—অঙ্গার আত্তীকরণ, শ্বাসকার্য ইত্যাদির পরিচয় ঘটিয়ে দেবার। বহু দুর্লভ উদ্ভিদের নিদর্শন এখানে সমবেত করা হয়েছিল, ছোটরা যাদের কথা শুধু বইয়েতেই পড়ে বা গল্পেই

শোনে, চোখে কোনদিনই দেখতে পায় না। শিবপুরের বাগানে তো আর সকলের যাওয়া হয়ে ওঠে না! তাই অনেকেই হয়তো এই প্রথম দর্শন পেয়েছিল বনচাঁড়াল, লজ্জাবতী, লবঙ্গ আর দারুচিনি গাছের। অবাক হয়ে সবাই দেখছিল অনেক শোনা সেই কীট-পতঙ্গভুক গাছগুলিকে। জীবদেহের রস এরা নিংড়ে বের করে নিয়ে বেঁচে থাকে। আর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে সবাই দেখেছিল উদ্ভিদ-কোষের উপাদান।

এর পর "আমাদের পৃথিবী" বিভাগে ছিল অজস্র উপকরণ, ছোটদের মনে দাগ কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দেরও যা আনন্দ দান করতে অক্ষম হয় নি। ছিল সঙ্কোচন ও প্রসরণশীল পাথর—অনেকটা রবারের মত। ছিল স্বপ্নে-দেখা সেই রাজকন্যার প্রাসাদের উপাদান—প্রবাল কীটের কঙ্কাল। আরও ছিল সুন্দর সুন্দর সব জীবাশ্ম। এদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন মডেল, যাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "পাথর-মাটি-সোনা-আমি" নামে মডেলটি। এতে সবকিছুর একত্র সমাবেশ হয়েছিল—নদী, হ্রদ, পর্বত, আগ্নেয়গিরি, তৈলখনি ইত্যাদি।

পশুপাখীদের ঘরে শিশুমনের সঙ্গে অপূর্ব সব পাখী আর বিচিত্র সব পশুর পরিচয় ঘটিয়ে দেবার এক হৃদয়গ্রাহী প্রচেষ্টাকে লক্ষ্য করে আনন্দিত হওয়া গেল। দুর্লভ পাখী আর দুষ্প্রাপ্য জন্তুর নিদর্শনে এই বিভাগটি সমৃদ্ধ ছিল। যদিও একথা সত্য যে, যে সব পশুপাখীর নিদর্শন সংগ্রহ করা হয়েছিল, তাদের প্রাণ ছিল না, তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, সেই সব নিদর্শনের ভিতরে যে অভিব্যক্তি ছিল, তা শুধু শিশুদেরই নয়, বয়স্কদের মনেও আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। আরও আনন্দের কথা এই যে, যাঁরা এই বিভাগে দর্শনীয় বিষয়ের পরিচিতি দেবার ভার নিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের অপূর্ব বাচনভঙ্গীর সাহায্যে এই সব মৃতের মধ্যেও প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন—"খোকা হোক্," "বউ কথা কও," কোকিল ইত্যাদি পাখীর কণ্ঠস্বরকে বক্তব্যের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলে ছিলেন।
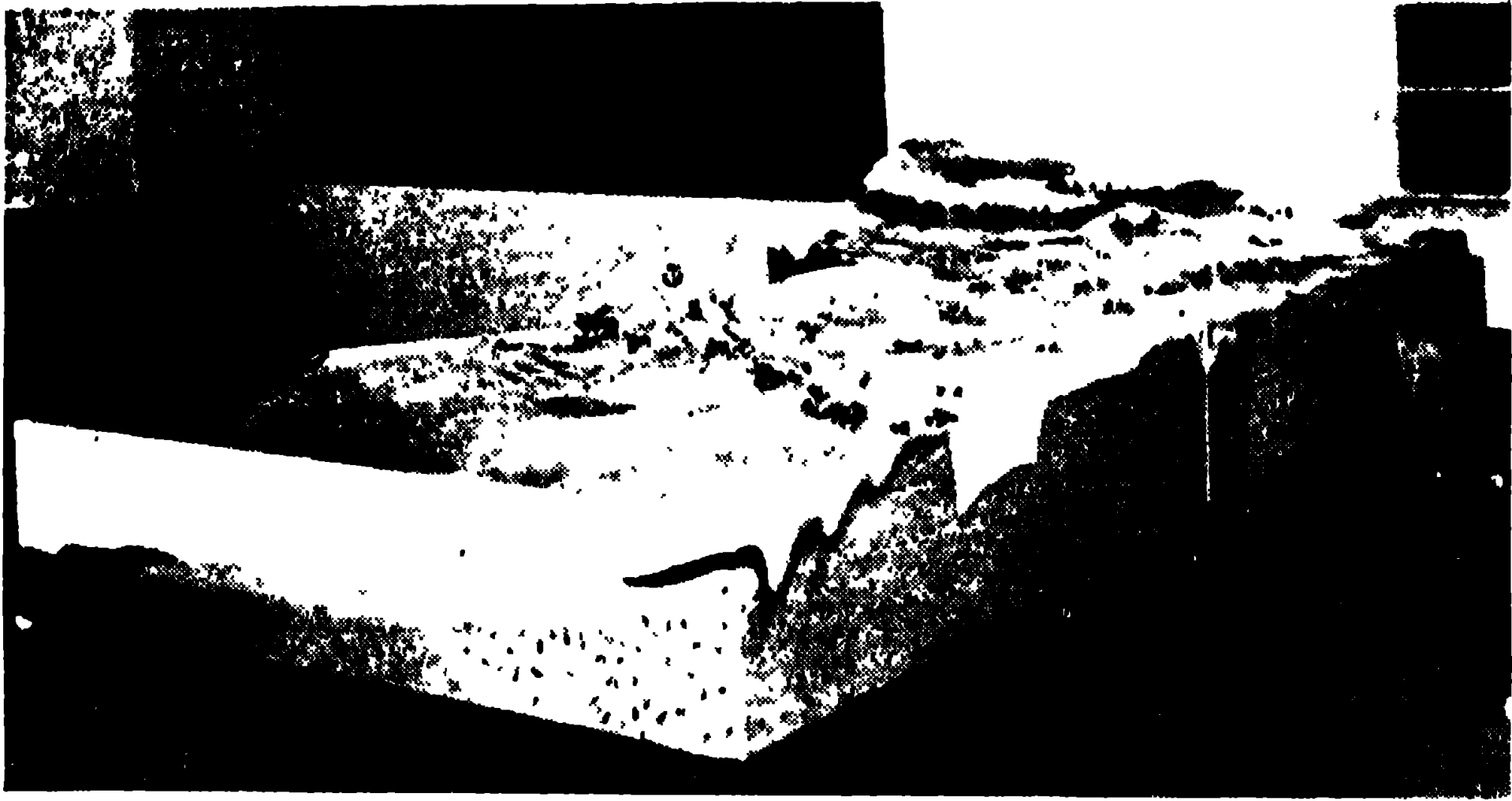
'আমাদের পৃথিবী' বিভাগে 'পাথর-মাটি-সোনা- আমি' নামক মডেল

"মানুষের উৎপত্তি" বিভাগে বিভিন্ন চিত্র ও দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের সাহায্যে এঁরা ক্রমবিবর্তন-বাদটিকে সুন্দর করে তুলে ধরেছিলেন দর্শকদের সামনে। প্রাচীন জীবজগৎ ও তাথেকে মানুষের উৎপত্তির ক্রমবিকাশের ধারা এখানে লক্ষ্য করা গেল। বিভিন্ন দেশের আদিম অধীবাসীদের জীবনযাপন প্রণালীর নিদর্শন এই বিভাগটিকে বেশ সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

এর পরের বিভাগ মানব-দেহতত্ত্ব সম্পর্কে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত এই শারীরবিদ্যা বিভাগে সকলের পরিচয় ঘটেছিল দেহযন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কার্যকলাপের সঙ্গে। খাদ্যপ্রাণ আর সুসম খাদ্যের সঙ্গে পরিচয় ও রেডিও ইনষ্টিটিউট অব সার্ভিস ইঞ্জিনীয়ারিং (R. I. S. E) পরিচালিত এই বৃহত্তম বিভাগে দর্শকদের পরিচয় ঘটেছিল আরও বড় এক জ্ঞানরাজ্যের সঙ্গে। সবাইকে চম্‌কে দেবার জন্যেই বোধ হয় প্রথমে অন্ধকার ঘরে দেখানো হচ্ছিল নকল রামধনু।

প্রাণীজগৎ বিভাগের একটি নিদর্শন।

করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হয়েছিল গিনি-পিগ্ আর ব্যাঙের ব্যবচ্ছেদ।

এর পরেই লোকবিজ্ঞান বিভাগ। প্রধানতঃ কিশোর কল্যাণ পরিষদ, স্কটিশচার্চ কলেজিয়েট স্কুল তার পরেই দর্শকদের দৃষ্টিপথে আনা হয়েছিল ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তৈরী এক মহল। কার্যকরী মোটর সহ এরোপ্লেন, ট্রানজিষ্টর সেট, ডিমের ভেতরের বাচ্চাপাখী, পেরিস্কোপ ইত্যাদি দেখতে

দেখতে শিশুরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছিল। লোকবিজ্ঞানের তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন আর কলিং বেল-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সকলে গিয়ে সমবেত হয়েছিল 'হীরো'র স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারার কার্য-প্রণালী বুঝতে—একবার জল দিয়ে চালিয়ে দিলে তাতেই সে কাজ করে যায়। এর পরে সবাইকে আরও অবাক করে দেবার জন্যেই বোধহয় রাখা হয়েছিল নকল কুয়াশার উৎপাদন ব্যবস্থা। তাছাড়াও এই বিভাগের "রঙীন আলোর নিশানা" সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। খুব কম চাপের গ্যাসের ভিতর দিয়ে তড়িৎ-শক্তি পাঠিয়ে তৈরী হচ্ছিলো রং-বেরঙের আলো—ঠিক যেমন আলো ব্যবহার করা হয় রাস্তার বিজ্ঞাপনে। এই বিভাগে শিশুদের যা বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করেছিল, সেটি হচ্ছে প্রশ্নোত্তরের বোর্ড। সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল শিশুদের। প্রশ্নোত্তর বোর্ডের প্রত্যেক প্রশ্নের জন্যে দেওয়া তিনটি করে উত্তরের মধ্যে ঠিক উত্তরটির সঙ্গে তড়িৎ-সংযোগ করলে জ্বলে ওঠে সবুজ আলো, অন্যথায় লাল আলো। খেলাচ্ছলে শিশুদের মনকে পরখ করবার এই ব্যবস্থাটি খুবই সুন্দর হয়েছিল। লোকবিজ্ঞানের চতুর্থ কক্ষে প্রবেশ করতেই দর্শকদের তাক্ লাগিয়ে দিয়েছিল বেতার-তরঙ্গের অদ্ভুত কারসাজি। সংযোগবিহীন টিউব লাইট হাতে থেকে জলছিল বেতার-তরঙ্গের ক্রিয়ায়। বাস চলছিল দূরস্থিত চালকের বেতার-যন্ত্রের নির্দেশে। এসব জিনিষের কার্যপ্রণালী ঠিক আয়ত্ত করতে না পারলেও জানবার আগ্রহ যে শিশুমনে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল—সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তাছাড়া লোকবিজ্ঞানের বিভিন্ন পুস্তক ও পত্রিকার সংগ্রহও এই বিভাগের শ্রেষ্ঠত্বের আর এক কারণ।

এর পরের বিভাগটি ছিল—মহাশূন্য বিজয়। অবাক বিস্ময়ে সকলে তাকিয়ে দেখেছিল—মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস, মহাকাশের গঠন ও তার আচার-ব্যবহার। কৌতুহলী শিশু মনও বুঝি সেই সঙ্গে সব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে পড়তে চাইছিল মহাকাশ যাত্রায়!

পরবর্তী বিভাগ "আমাদের ভারতে"। ভারতের বৈজ্ঞানিক কৃষ্টির পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল ভারতের শিল্পোন্নতির সব নিদর্শন। ভারতের যে সব বিজ্ঞান-সাধক সম্মানের উচ্চ আসনে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন—তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিসহ আলেখ্য এখানে তুলে ধরা হয়েছিল।

সর্বশেষ বিভাগ "বিজ্ঞান ও শিল্প"। বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্পমহাবিদ্যালয়ের ছাত্র পরিচালিত এই বিভাগে শিশুদের দেখানো হচ্ছিল, বৈদ্যুতিক পাখার কলাকৌশল আর সুলেখা কালির জন্ম-ইতিহাস। দেখানো হচ্ছিল, খনি-গর্ভ থেকে কয়লা উপরে তোলবার সরঞ্জাম, দামোদর উপত্যকার বিস্ময়কর প্রগতির সব নিদর্শন। আরও ছিল অক্সিজেন উদ্ধারের যন্ত্র-বিবরণী—এমনি আরো কত কি। সবাই দেখছিল বৈদ্যুতিক ট্রেনের অপূর্ব গতিবিধি। এই বিস্ময়কর মায়াপুরী থেকে বেরিয়ে অডিটরিয়ামে গিয়ে চলচ্চিত্র দেখবার আগে সবাই একবার দেখে যাচ্ছিল মাঠের পাশে তৈরী-করা ছোট কাচের কারখানা।

বর্তমান যুগে বিজ্ঞান মানুষের জীবনের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে যুক্ত যে, বিজ্ঞানকে পরিহার করে দৈনন্দিন জীবনে চলা অসম্ভব। বর্তমান যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলতে হলে বিজ্ঞানের সাধারণ বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিশুদের জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্নগুলির সদুত্তর দেবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জন-সাধারণকে বিজ্ঞানসচেতন করে তোলবার জন্যে এই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের নিরলস প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই প্রদর্শনীতে বিষয়বস্তুগুলির বিভাগীয় বিন্যাস ছাড়া আর একটি জিনিসও

বেশ লক্ষ্য করবার মত সেটি হচ্ছে এই যে, প্রতি বিভাগেই দর্শনীয় বস্তুগুলিকে বেশ পর্যায়-ক্রমিকভাবে রাখা হয়েছে, শিশুরা যাতে দেখতে গিয়ে খেই হারিয়ে না ফেলে। এই সঙ্গে এটাও উল্লেখযোগ্য যে, বিষয়-বিশ্লেষণের ভার দেওয়া হয়েছিল তরুণ ছাত্রছাত্রীদেরই উপর। তারা অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে সমস্ত দর্শনীয় বিষয় খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। ফলে যারা বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের জ্ঞান আর ধারণা যেমন স্পষ্ট, তেমনি যারা দেখতে গিয়েছে, তাদের কৌতূহলও বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এদের এই নিষ্ঠার জন্যেই প্রদর্শনীটি সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠেছিল। প্রদর্শনীর সঙ্গে বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু তথ্যপূর্ণ চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবায় ফলে দর্শকেরা বিশেষভাবেই লাভবান হয়েছেন। এই প্রদর্শনী উপলক্ষে যে স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার সবগুলি রচনা শিশুদের উপযোগী না হলেও প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ভালই হয়েছে বলতে হবে।

তিলাপিয়া মাছ

শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী

আজকাল পৃথিবীতে যে হারে খাদ্যসমস্যা বেড়ে চলছে—তাতে নতুন নতুন খাদ্যের সন্ধান না পেলে এই খাদ্যাভাব মোচনের কোন উপায় হবে কিনা সন্দেহ। সম্প্রতি বিশ্বের খাদ্য ও কৃষি-সংস্থার বিশেষজ্ঞগণের এক সমীক্ষায় পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিতে খাদ্যশস্যের নিদারুণ ঘাটতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ অঞ্চলে যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়—তার পরিমাণ দ্বিগুণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে সমীক্ষার রিপোর্টে বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায়—সমগ্র ভারতবর্ষে তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেও প্রোটিন খাদ্যের নিদারুণ অভাব রয়েছে। কেবল ক্ষুধা দূর করা নয়, পুষ্টির দিকেও নজর দেওয়া দরকার। পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান এবং মাছ, মাংস প্রভৃতি প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির চেষ্টা করতে হবে! বিশ্বের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আরও বলেছেন—আগামী দশ বছরে যদি খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি, অর্থাৎ খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা না যায়, তাহলে পৃথিবীর ১০ কোটি থেকে ১৫ কোটি লোক অনাহার ও অপুষ্টিতে মৃত্যু বরণ করবে। পৃথিবীর স্বল্পোন্নত অঞ্চলের কোটি কোটি লোক বছরের পর বছর দেহ গঠনের অন্যতম মূল্যবান উপাদান জান্তব প্রোটিন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এই সমস্যা সমাধান করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য—এমন কোন খাদ্যের সন্ধান করা, যা সহজলভ্য এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ। কোন কোন বিজ্ঞানী তো খাদ্যাভাব দূরীকরণের জন্যে কীট-পতঙ্গকে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় স্থান দিতে বলেছেন। তাঁদের মতে—কীট-পতঙ্গের শরীরে মানবদেহের পক্ষে পুষ্টিকর উপাদান রয়েছে। যাহোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানীদের নজর পড়ে তিলাপিয়া মাছের উপর। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে দেখা যায়—খাদ্য হিসাবে তিলাপিয়া মাছের ব্যবহার নানা কারণে লাভজনক। তিলা-পিয়া মাছ থেকে উপযুক্ত পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া সম্ভব। তাছাড়া এই মাছগুলি সহজলভ্য এবং সস্তায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। অনুন্নত অঞ্চলে

প্রোটিনের অভাব দূরীকরণে তিলাপিয়া মাছের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তিলাপিয়া মাছের কথা বহুদিন পৃথিবীর অনেক দেশেই অজ্ঞাত ছিল। এদের আদি বাসভূমি ছিল পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিকের উপকূলবর্তী সমুদ্রে। অন্যত্র নাকি এই মাছ আর দেখা যেত না। কবে থেকে তিলাপিয়া মাছ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তার সঠিক ইতিহাস জানা যায় নি। তবে যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায়—১৯৩৯ সালে জাভার একটি হ্রদে কয়েকটা তিলাপিয়া মাছ পাওয়া যায়। কেমন করে তারা আদি বাসস্থল থেকে জাভার উপস্থিত হলো, তার ইতিহাসও অজ্ঞাত। এক ব্যক্তি এই মাছগুলি দেখে অবাক হয়ে যান এবং সেগুলিকে ধরে তিনি এক মৎস্য-বিশেষজ্ঞকে দেন। তিনি নানাভাবে খোঁজ-খবর করে এই মাছ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই থেকেই তিলাপিয়ার আধুনিক ইতিহাস সুরু হয়।

প্রথম প্রথম তিলাপিয়াকে খাদ্য হিসাবে খুব বেশী গুরুত্ব দিতে অনেকেই উৎসাহী ছিলেন না। অনেকের মনে নানা দ্বিধা ও সন্দেহ ছিল। পরে অবশ্য তিলাপিয়া মাছের উপকারিতা ও সহজলভ্যতার কথা চিন্তা করে সে সব দ্বিধা ও সন্দেহ দূর হয়েছে।

আমাদের দেশেও তিলাপিয়া মাছ এখন যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হচ্ছে, অথচ কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে তিলাপিয়া মাছের নামও কেউ জানতো না। এই মাছের আর একটি নামও আমাদের দেশে চালু আছে—আমেরিকান কৈ। এই বিচিত্র নামকরণের কারণ নির্ণয় করা শক্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে অন্যান্য জ্যান্ত মাছের তুলনায় তিলাপিয়া মাছ দামে সস্তা। তিলাপিয়া মাছের দেহাকৃতির সঙ্গে আমাদের দেশের ন্যাদস বা নয়না মাছের দৈহিক গঠনে কিছুটা মিল আছে। উত্তর আমেরিকার 'সানফিস' নামক মাছের সঙ্গেও তিলাপিয়া মাছের দৈহিক সাদৃশ্য আছে। তিলাপিয়া মাছের প্রধান খাদ্য হচ্ছে শ্যাওলা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ এবং প্ল্যাঙ্কটন। যতদূর জানা যায়—আমাদের দেশে

পুরুষ তিলাপিয়া মাছ।

সর্বপ্রথম ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলম্বোর মৎস্য গবেষণা মন্দির থেকে ৫০০ জীবন্ত তিলাপিয়া মাদ্রাজের মৎস্য গবেষণা মন্দিরে আনা হয়। উদ্দেশ্য ছিল—ভারতীয় আবহাওয়ায় তিলাপিয়া মাছের চাষ সম্পর্কে গবেষণা করা।

তিলাপিয়া মাছ খুব কম রোগাক্রান্ত হয়। এরা অতি দ্রুত প্রচুর সংখ্যায় বংশবৃদ্ধি করে। এক জোড়া তিলাপিয়া মাছ পুকুরে ছাড়া হলে কোন কোন ক্ষেত্রে এক বছরের মধ্যে মাছের সংখ্যা হবে প্রায় ১০ হাজার। চার মাসের মধ্যে মাছগুলি খাবার করতে সক্ষম। কিন্তু তিলাপিয়া মাছের ব্যাপক বংশ-বৃদ্ধি, তাদের দৈহিক বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ছোট অবস্থা থেকেই স্ত্রী-তিলাপিয়া ডিম পাড়তে সুরু করে। ফলে মাছের সংখ্যা প্রচুর বাড়ে এবং পুকুরে এদের খাদ্যাভাব ঘটে। বছরে এরা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একাধিক বার ডিম পাড়ে। খাদ্যাভাবের ফলে কোন মাছই ঠিকমত বাড়তে পারে না। ছোট ছোট মাছে পুকুর ভর্তি হয়ে যায়। কিন্তু সেগুলি খেতে সুস্বাদু হয় না। তবে চেষ্টা ও যত্নের দ্বারা এই অসুবিধা দূর করা
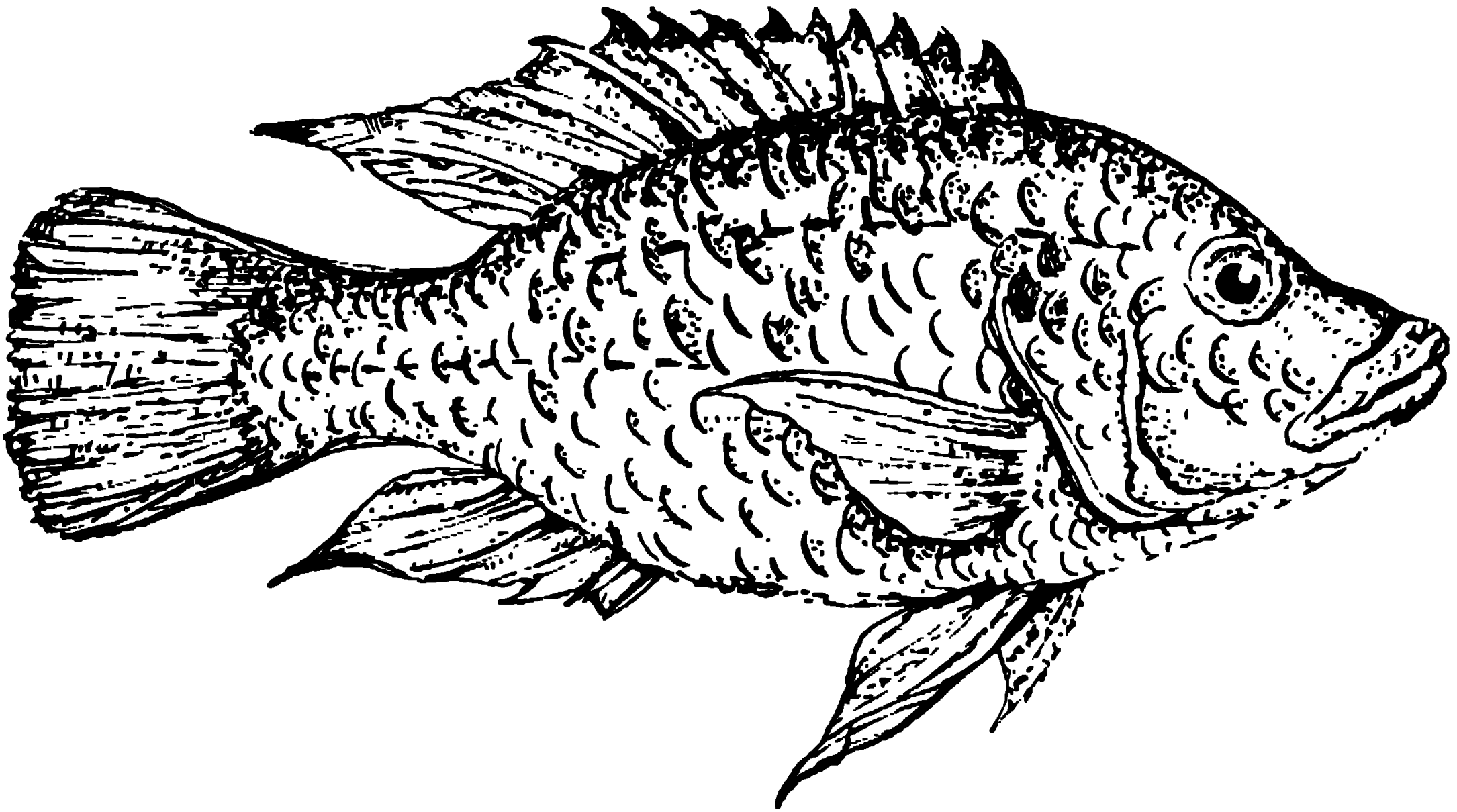
স্ত্রী-তিলাপিয়া মাছ।

উপযোগী হয়। এক পোয়া বা তারও বেশী ওজনের মাছগুলি খেতে সুস্বাদু। এই মাছ নানা ভাবে মুখরোচক করে রান্না করা যায়। মিঠা বা নোনা জলের যে কোন পুকুর-ডোবা-খাল-বিলে তিলাপিয়া মাছের চাষ করা যায় এবং এই মাছের চাষে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শ্যামদেশ, ইন্দোনেশিয়া, আফ্রিকা, মালয়, সিংহল, জ্যামেইকা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আমেরিকা, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশে তিলাপিয়া মাছের চাষ বিস্তৃতি লাভ করেছে। যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায় এরা বংশবৃদ্ধি যায়। ইতিমধ্যেই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তিলাপিয়া মাছের মধ্যে বর্ণসঙ্কর উৎপাদন করে কেবল পুরুষ তিলাপিয়া মাছ উৎপাদন করা যায়।

মানুষের খাদ্য হিসাবে তিলাপিয়া মাছের ব্যবহার আধুনিক ঘটনা। কিন্তু খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বছর আগের মিশরের সমাধি মন্দিরের গায়ে এক জোড়া ছোট মাছের ছবি অঙ্কিত দেখা গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই মাছ তিলাপিয়া নিলোটিকা (Tilapia nilotica) নামে পরিচিত। এই মাছ তিলাপিয়া মাছেরই সমগোত্রীয়। মিশর, প্যালেষ্টাইন

প্রভৃতি দেশে এই জাতীয় মাছ মূল্যবান খাদ্য হিসাবে বিবেচিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, তিলাপিয়া মাছের চাসে বিশেষ পরিশ্রম নেই। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার জন্যে পুকুরে সার দিতে হয়। এই সার প্রয়োগে পুকুরের নিম্নস্তরের উদ্ভিদের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পর্যাপ্ত পরিমাণে এই সব জলজ উদ্ভিদ খেতে পেলে তিলাপিয়ার দৈহিক ওজনও বাড়ে।

তিলাপিয়া মাছের চাস করবার সময় মাছের চারাগুলি কিছুটা বড় হওয়া মাত্র তাদের অন্য একটি পুকুরে ছেড়ে দেওয়া দরকার। মাছের চারাগুলি এই দ্বিতীয় পুকুরে দ্রুতগতিতে বড় হতে থাকে। মাছের সংখ্যা অনুপাতে পুকুরে মাছের অন্যান্য খাদ্য হিসাব করে দেওয়া উচিত। মাছগুলি বেশ বড় হবার পর জল থেকে ধরে এনে বিক্রয় করা হয়।

পুকুর খুব তাড়াতাড়ি তিলাপিয়ার অসংখ্য বাচ্চায় ভর্তি হয়। সাধারণতঃ ডিম পাড়বার পর স্ত্রী-মাছ ডিমগুলিকে মুখের মধ্যে পুরে ফেলে। ৪০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত ডিম এরা মুখের মধ্যে রাখতে পারে। ডিমগুলিকে গলার থলির মধ্যে রেখে এরা অনবরত কুলকুচার মত কায়দায় ডিমগুলিকে নাড়ায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার পরেও তারা মাছের মুখের মধ্যেই থাকে এবং আধ ইঞ্চির মত বড় হলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। তখন তারা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করে। এভাবে ডিমগুলিকে যত্ন করবার ফলে শত্রুরা এদের ডিম নষ্ট করতে পারে না। এটাও এদের অস্বাভাবিক সংখ্যা-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। একটি ঘটনায় দেখা গেছে—৪ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে ১৫০টা পূর্ণবয়স্ক তিলাপিয়া মাছ থেকে ১৫,০০০ এবং আর একটি ক্ষেত্রে ১৪টা পূর্ণবয়স্ক তিলাপিয়া মাছ থেকে আড়াই মাসে ১৪০০০ বাচ্চা উৎপন্ন হয়েছে।

পৃথিবীর বহু দেশেই ছোট ছোট মাছ খাওয়া হয় সত্য, কিন্তু বৃহদাকৃতির মাছে মাংস বেশী থাকায় তাদের পুষ্টিমূল্যও বেশী এবং খাওয়াও সুবিধাজনক। ছোট তিলাপিয়া মাছের খাদ্যমূল্য থাকলেও স্বাদ বড় মাছের মত হয় না। একটা বড় তিলাপিয়া থেকে খাদ্যোপযোগী যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়, ৪৫টা ছোট তিলাপিয়া থেকে সেই পরিমাণ মাছ পাওয়া যায় না। পৃথিবীর অনেক দেশেই ছিপে তিলাপিয়া মাছ ধরা হয়। আবার কোন কোন দেশে মাছ ধরবার জন্যে টানা জাল ও বেরা জাল ব্যবহার করা হয়।

নোনা জলে তিলাপিয়া মাছ চাষ করে দেখা গেছে - ডিম পাড়বার হার নোনা জলে কম হয়। মনে হয়—প্রজনন ক্ষমতার উপর জলের লবণাক্ততার কিছুটা প্রভাব আছে। আবার কোন কোন জাতের তিলাপিয়া মাছের খুব বেশী পরিমাণে লবণাক্ততা সহ্য করবার ক্ষমতা আছে। ইন্দোনেশিয়া এবং আরও কয়েক স্থানে নোনা জলেই সাধারণতঃ তিলাপিয়া মাছের চাষ হয়।

কোন কোন দেশে একটি পুকুরে সমান পরিমাপের ছোট ছোট তিলাপিয়ার বাচ্চা ছেড়ে দিয়ে সেগুলিকে ডিম পাড়বার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশী করে খাবার দিয়ে বড় করবার চেষ্টা হয়। ডিম পাড়বার অবস্থায় এলে পুকুরের জল বের করে দিয়ে মাছগুলিকে ধরা হয়। এই ভাবে যে সব মাছের চাষ হয়, সেগুলি খুব বড় না হলেও তাদের দেহ সুগঠিত হয়। কোন কোন জাতের তিলাপিয়া মাছকে সিমুল আলুর পাতা খাইয়ে দেখা গেছে, তারা খুব দ্রুতগতিতে বড় হয়ে ওঠে। অনেক সময় তিলাপিয়া মাছের পুকুরে তিলাপিয়া-শিকারী মাছ পোষা হয়। এদের সংখ্যা অবশ্য হিসাব করে পুকুরে ছাড়া হয়। এই সব শিকারী মাছ বেশ কিছু তিলাপিয়ার বাচ্চা উদরসাৎ করে পুকুরে তাদের অস্বাভাবিক ভীড় কমিয়ে দেয়। ফলে অবশিষ্ট তিলাপিয়ার দৈহিক বৃদ্ধি আশানুরূপ হয়—কারণ তখন তারা উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পায়।

ত্রিনিদাদে তিলাপিয়া চাষের পুকুরে গুপ্পাবিন, পূর্ব আফ্রিকায় নাইল পার্চ, ক্যামেরুনে বাস, জ্যামেইকায় টারপন প্রভৃতি তিলাপিয়া-শিকারী মাছ রেখে ভাল ফল পাওয়া গেছে। তবে সব ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি সাফল্যমণ্ডিত হয় না। এই পদ্ধতিতে অসুবিধা অনেক। এমন সংখ্যক শিকারী মাছ রাখতে হবে, যাতে পুকুরের সব তিলাপিয়া মাছ খেয়ে তারা উজাড় করে না দেয়। মাঝে মাঝে পুকুরের জল একেবারে বের করে দিয়ে মাছগুলিকে দেখা দরকার। চাষের উপযুক্ত পরিমাণে মাছ রেখে বাদবাকী ফেলে বা নষ্ট করে দিতে হয়।

স্ত্রী ও পুরুষ মাছ আলাদা আলাদা পুকুরে চাষ করতে পারলে এদের সংখ্যা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। মাছের দেহের রং, ডিম্বনালীর মুখের বহির্দেশের গঠন দেখে স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করা যায়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ছোট ছোট তিলাপিয়া মাছের স্ত্রী ও পুরুষ নির্ণয় করতে পারেন।

স্ত্রী-তিলাপিয়ার তুলনায় পুরুষ তিলাপিয়ার বৃদ্ধি হয় খুব তাড়াতাড়ি। স্ত্রী-বাচ্চাগুলিকে আলাদা করে বেছে বাতিল করে দেওয়া হয়। শুধু পুরুষ বাচ্চাগুলি চাষের পুকুরে ছাড়া হয়। বাচ্চাগুলি একটু বড় হলে আবার বাছাই করা হয় শরীরের রং দেখে—তাদের মধ্যে কোন স্ত্রী তিলাপিয়া আছে কিনা। যদি কোনক্রমে একটি স্ত্রী তিলাপিয়া পুকুরে থেকে যায়, তবে এদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। কতগুলি পুরুষ মাছ একটা চাষের পুকুরে ছাড়া হবে, তা আগে থেকেই হিসাব করা হয়। এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত মাছের দৈহিক আয়তন ও বৃদ্ধি খুব চমৎকার হয়। তবে এই পদ্ধতিতে চাষ করলে স্ত্রী-মাছগুলির একেবারে সমূলে বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। সে জন্যে বর্ণসঙ্কর ঘটিয়ে পুরুষ তিলাপিয়া উৎপন্ন করা হয়েছে। ফলে স্ত্রী পুরুষ চেনবার হাঙ্গামা করতে হয় না এবং ইচ্ছা-মত পুরুষ মাছ উৎপাদন করা চলে। বর্ণসঙ্কর-জাত পুরুষ মাছগুলি প্রজনন ক্ষমতাবিশিষ্ট। এদের বৃদ্ধিও অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে হয়। সাধারণতঃ ছয় মাসে এদের দৈহিক ওজন হয় প্রায় আধ সের। এরা অন্যান্য তিলাপিয়া মাছের তুলনায় খুব বেশী তেজীয়ান হয়।

তিলাপিয়া মাছ নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনও চলছে। কিভাবে এদের উৎপাদন বৈজ্ঞানিক উপায়ে আরও সহজসাধ্য এবং দ্রুত করা যায়, সেই সম্পর্কে চেষ্টা চলছে। তিলাপিয়া মাছের ব্যাপক উৎপাদনে বিশ্বের অনুন্নত অঞ্চলের প্রোটিন ঘাটতির পরিমাণ যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে—সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার

শ্রীসন্তোষকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ নিজের কাজের জন্যে গাছপালা আর পশুর সাহায্য নিতে অভ্যস্ত। মাত্র কয়েক যুগ আগে মানুষ জীবাণুর উপকারিতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ঈষ্টের সাহায্যে মদ্য প্রস্তুত করতে জানতো। অবশ্য অনেকের তখন একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, ওগুলি কোন অলৌকিক উপায়েই হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ১৬৭৬ সালে ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক অ্যান্টনী ভ্যান লিউয়েনহোয়েকই প্রথম ঐ জীবাণুর কোষ সম্বন্ধে গবেষণা করেন, একটি শক্তিশালী আতস কাচের সাহায্যে। এর পর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বিভিন্ন জীবাণুর আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন। এর পরেই আসে জীবাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণযুগ। কারণ ঊনবিংশ শতকে পরপর কতকগুলি বিস্ময়কর আবিষ্কার হওয়ায় ভবিষ্যতের অনেকগুলি আবিষ্কারের উপর তার প্রভাব দেখা যায়। এই সম্বন্ধে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দেন ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। তিনি প্রায় ত্রিশ বছরের উপর মদ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁর অর্জিত জ্ঞান ছিল ব্যাপক। ১৮৭৬ সালে এই বিষয়ে তিনি একটি একটি পুস্তকও প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে তিনি নানা ধরণের অ্যালকোহল, ল্যাকটিক ও অ্যাসেটিক অ্যাসিড সম্বন্ধে তাঁর গবেষণালব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করেন। জীবাণুর জন্যে যে ঐগুলি 'ফারমেণ্ট' করে বা গেঁজে যায়, তার প্রভূত প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করেন। এই বিষয়ে অন্য আর একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার হয় জার্মান বৈজ্ঞানিক রবার্ট ককের দ্বারা। তিনি বিভিন্ন ধরণের জীবাণু আলাদাভাবে পালন করতে সক্ষম হন। এই আবিষ্কার মদ্য তৈরীর ব্যবসায়ের প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এই আবিষ্কারের আগে নানা ধরণের জীবাণুর মিশ্রণের সাহায্যে মদ গাজানো হতো। কিন্তু রবার্ট ককের আবিষ্কারের ফলে কোন্ বিশেষ ধরণের জীবাণু ঐ কাজের উপযুক্ত, তা দেখে নেবার পর ঐ বিশেষ জীবাণুই প্রয়োগ করা চলতো।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জৈব রসায়নের জন্ম হয়। এই সময়, অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে বুখনার ভ্রাতৃদ্বয় ঈষ্টের সাহায্যে মদ গাজাবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে ঐ বিষয়ে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। এই সময় অন্যান্য জীবাণুর গঠন সম্বন্ধেও বহুল গবেষণার সূত্রপাত হয়। প্রকৃত পক্ষে এর ফলেই বর্তমানে শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার নিশ্চিত পথ ধরে চলতে সুরু করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটেনে অ্যাসিটোনের বিশেষ অভাব দেখা দেয়। বারুদ গলাবার জন্যে অ্যাসিটোনের প্রয়োজন হয়। এর ফলে যুদ্ধের ব্যাপারে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ফলে বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে অন্য কোন দ্রাবকের সন্ধান করতে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ বৈজ্ঞানিক উইজম্যান একটি বিশেষ ধরণের জীবাণু (Clostridium acetobutylicum) সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন। কৃত্রিম রবার প্রস্তুতের সময় ঐ জীবাণুর সাহায্যে বুটানল প্রস্তুত হয়। এর সঙ্গে অ্যাসিটোনও কিছু পরিমাণে মিশ্রিত থাকে। এই আবিষ্কারই বৃটেনকে যুদ্ধের সময় বিপদ থেকে উদ্ধার করে বলা চলে। উইজম্যান পরে ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে জীবাণুর সাহায্যে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করবার উপায় আবিষ্কার হওয়ায় এই বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার হয়। খাদ্য সম্বন্ধীয় শিল্পে এই অ্যাসিডের বহুল প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে জীবাণুর সাহায্যে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুত হয়, সেই জীবাণুকে ২০০ বছর আগে অ্যালব্রেক ভন হ্যালার ক্ষতিকর বলেছিলেন। কারণ প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই এই জীবাণু (Aspergillus niger) সমস্ত কাজ বিনষ্ট করে ফেলতো। সেই কারণে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা আনতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়েছে। বর্তমানে এই জীবাণুই সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয়।

এই ধরনের জীবাণুর ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন সম্ভব হওয়ায় আরও বহু আবিষ্কারের পথ খুলে যায়। এই সময় নানা ধরণের জৈব অ্যাসিড, যথা—ল্যাকটিক ও গ্লুকোনিক অ্যাসিড এই জীবাণুর সাহায্যে প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হতে থাকে। এই সময় ইথানল নামক একটি মূল্যবান শিল্পজাত দ্রাবক গুড়ের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হয়। বিশেষ ধরণের ঈষ্টের সাহায্যেই তা সম্ভব হয়। এই সময়ে আরও দেখা যায়—ইথানল থেকে প্রচুর পরিমাণ গ্লিসারলও প্রস্তুত করা সম্ভব—যদিও বর্তমানে ঐ উপায়ে গ্লিসারল প্রস্তুত হয় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্রাকৃতিক রবারের অভাব হওয়ায় বিশেষভাবে কৃত্রিম রবারের প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ সময় Bacillus polymyxa এবং Aerobacter aerogenes—এই দুই ধরণের জীবাণুর সাহায্যে কৃত্রিম রবার প্রস্তুতের ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি ও প্রসার লাভ করে। তবুও মানুষের ইতিহাস সবচেয়ে বিস্ময়কর ও প্রয়োজনীয় যে আবিষ্কার এই জীবাণুর সাহায্যে সম্ভব হয়েছে, তা হলো অ্যান্টিবয়োটিক। এই অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারে মানুষ, জন্তু-জানোয়ার ও উদ্ভিদ-জগতের বহু উপকার সাধিত হচ্ছে। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবাণুর সাহায্য ছাড়াই অতি সস্তায় কৃত্রিম বহুবিধবস্তু প্রস্তুত করা সম্ভব। যেমন—পেট্রোলিয়াম শোধনের সময় বহুল পরিমাণে কৃত্রিম অ্যালকোহল পাওয়া যায় ইথিলিন থেকে। ফলে জীবাণু-বিজ্ঞানীরা এই সম্পর্কে বিশেষভাবে গবেষণায় ব্যাপৃত হয়েছেন।

বর্তমানে শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে কতকগুলি বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে জীবাণুর রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং অতি আধুনিক আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করবার আগে জীবাণুর আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন

অণুবীক্ষণের সাহায্যে যে সব জীবাণু দেখা যায়, বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ সে সব জীবাণু সম্বন্ধেই গবেষণা করেন। একমাত্র প্রোটোজোয়া ছাড়া বাকীগুলিকে এক ধরণের সজীব উদ্ভিদ জাতীয় বলা চলে। এদের মধ্যে আছে অ্যালগি, ব্যাক্টিরিয়া ও ছত্রাক। জীবাণুগুলির গঠন অত্যন্ত সরল। এদের মধ্যে অনেকগুলিরই একটি মাত্র কোষ থাকে।

রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে জানা গেছে যে, জীবাণুর কোষগুলি নানা ধরণের জটিল জৈব পদার্থের দ্বারা গঠিত। এদের মধ্যে আছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন আর নানা ধরণের অ্যাসিড। বহু জীবাণুর কোষের অর্ধেক ওজন নির্ভর করে প্রোটিনের উপর। জীবাণুর বিকাশের জন্যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় সব সময়েই। কোন কোন জীবাণু নতুন নতুন কোষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় জল, কার্বন ডাইঅক্সাইড আর নাইট্রোজেনের সাহায্যে। এগুলিকে বলা হয় 'অটোট্রপস্'। এই জীবাণুগুলির জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, তা আসে সূর্য থেকে। এদের মধ্যেকার ক্লোরোফিলই এই কাজ করতে সক্ষম। চিনির সাহায্যেও কোন কোন বিশেষ জীবাণু বংশবৃদ্ধি করে থাকে। সেই কারণে জীবাণুবিদ্দের বিভিন্ন জীবাণুর খাদ্য সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল থাকা অবশ্য প্রয়োজন। তাছাড়া

জীবাণু—অক্সিজেন, তাপ ও অ্যাসিডের কম-বেশী পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। কোষের মধ্যে খাদ্যের বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জীবাণুর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

বর্তমানে জীবাণুর সাহায্যে মদ্যজাতীয় পদার্থ উৎপাদনের পরেই অ্যান্টিবায়োটিকের স্থান। গত পনেরো বছরে এই অ্যান্টিবায়োটিকের উৎপাদন জীবাণু-শিল্পে বিপ্লবের সূচনা করেছে। ১৯২৯ সালে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিয়াম নোটাটাম নামক ছত্রাক (জীবাণু) আবিষ্কার করেন। এর সাহায্যেই তিনি পেনিসিলিন উৎপাদন করেন। ১৯৪০ সাল থেকে প্রকৃতপক্ষে ওষুধ হিসাবে পেনিসিলিনের ব্যবহার সুরু হয়। এই সময় অক্সফোর্ডের কয়েকজন বিজ্ঞানী—হাওয়ার্ড ফ্লোরী ও আর্নষ্ট চেন-এর সাহায্যে নতুন ভাবে পেনিসিলিনের ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করতে থাকেন। যুদ্ধাবস্থা বিশেষ করে এই বিষয়ে গবেষণার গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কার হওয়ার ফলে জীবাণু-বিজ্ঞানীরা আরও অন্য ধরণের অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেন।

অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভূত সাফল্যের ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে জীবাণুর ব্যবহারও ত্বরান্বিত হয়েছে। এর ফলে অন্যান্য বহু বিষয়েও উন্নতির লক্ষণ দেখা গেছে। বিশেষতঃ এই জন্যে জীব-বিজ্ঞানী ও জৈব-রাসায়নিকের গভীর সহযোগিতা প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞের মতে—পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ অর্ধভুক্ত থাকে। এই অংশ যে খাদ্য গ্রহণ করে, তা হয় প্রোটিনবিহীন অথবা বিশেষ ভাবে খাদ্যপ্রাণযুক্ত নয়। রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য সংস্থা এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করেছেন। বর্তমানে অবশ্য সবচেয়ে আশ্চর্যজনক আবিষ্কার হচ্ছে, খাদ্য হিসাবে জীবাণুর ব্যবহার। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে, জীবাণুর মধ্যে অতি উচ্চস্তরের প্রোটিন ও বি-ভিটামিনের অস্তিত্ব আছে। এগুলি মানুষ বা অন্য প্রাণীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে এস্থলে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যেতে পারে—ভবিষ্যতে জীবাণু-বিজ্ঞান আরও দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হবে এবং মানুষের নানাবিধ উপকার সাধন করবে। মানুষ অবশ্যই জীবাণুর সাহায্যে তার প্রয়োজনীয় বহু উল্লেখযোগ্য পদার্থই প্রস্তুত করতে থাকবে।

দুটি নয়ন মেলে

মীরা চক্রবর্তী

শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোগুলিও আজকাল সন্ধ্যার দিকে বড়ই ম্লান হয়ে জ্বলে। কম আলোতে কাজ করতে কষ্ট হয়। চোখের উপর জোর পড়ে। তবু মানুষের চোখ কোনমতে কাজ চালিয়ে নেয়। দেখবার জন্যে আলো অপরিহার্য, এই পুরনো কথাই যেন নতুন করে অনুভূত হচ্ছে আজকাল। অবশ্য দেখবার কাজে আলো ছাড়া আরও দুটি জিনিসের কথা আসে। একটি চোখ, অপরটি হলো দৃষ্টিচেতনা গ্রহণের উপযোগী মস্তিষ্ক। এই তিন সত্তার সহজ মিতালীতেই বিশাল সৃষ্টি-রাজ্যের দৃষ্টিবেদ্য লীলা দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, পর্যাপ্ত আলোতে দেখবার কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলে। আর স্বল্প আলোর আব্‌ছা মায়া একটি কুহেলীভরা দৃষ্টিচেতনা কোনমতে বজায় রাখতে পারে। হিসাব করে দেখা গেছে—অমাবস্যা

রাতের আকাশভরা তারার ক্ষীণপ্রভা প্রত্যক্ষ সূর্যালোকের ঔজ্জ্বল্যের দশ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র। তবু চোখ সইয়ে নিলে নক্ষত্রের ঐ ক্ষীণ আলোতেও কোন মতে পথচলা যে সম্ভব, একথা মানতেই হয়। অবশ্য স্বল্পালোকে রঙের চুলচেরা হেরফের বিচার করা চলে না। পর্যাপ্ত আলোতে রং তো বটেই, দ্রষ্টব্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণও করা যায়। অত্যল্প আলোকে একপ্রকার দৃষ্টিচেতনা উদ্রিক্ত হয় এবং পর্যাপ্ত আলোকে উদ্রিক্ত হয় অন্য আর এক রকম দৃষ্টিবোধ। এই দুই প্রকার দৃষ্টিচেতনার প্রতিটি তার স্বীয় স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এই দুই চেতনার দুটি পৃথক নামও বৈজ্ঞানিক ভাষায় পাওয়া যায় :—

(১) স্বল্পতম আলোকোদ্রিক্ত দৃষ্টি, সংক্ষেপে স্বল্পালোকী দৃষ্টি (Scotoptic Vision)।

(২) পর্যাপ্ত আলোকোদ্ভাসিত দৃষ্টি, সংক্ষেপে পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টি (Photoptic Vision)।

স্বল্পালোকী দৃষ্টি ও পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টির চেতনা চোখ থেকে মস্তিষ্কে পৌঁছায় দুটি পৃথক ব্যবস্থা ও মাধ্যমের মারফৎ। সে আলোচনায় পরে আসা যাবে। আপাততঃ সরাসরি পরীক্ষায় চোখের দ্বৈত ভূমিকা সম্বন্ধে যে সব তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার একটা প্রাথমিক পর্যালোচনা প্রাসঙ্গিক হবে।

সাদা আলো যে সাতটি রঙের অন্তরঙ্গ পরিণয়ের ফল, তা আমরা প্রায় সবাই জানি। বেগুনী (Violet), গাঢ়নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange), লাল (Red)—এই সাত রঙের ইংরেজী প্রতিশব্দকয়টির আদ্যাক্ষরগুলি পর পর সাজিয়েই সপ্তবর্ণের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী প্রতীক সুপরিচিত "VIBGYOR" শব্দটি তৈরী হয়েছে। অধ্যাপক গিবসন, টিণ্ড্যাল, এমার্সন, বুমা প্রমুখ বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছেন যে, সূর্যালোক-বিচ্ছুরিত বর্ণালীতে হলুদ-সবুজ অংশই স্বাভাবিক পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টিতে সব চেয়ে বেশী উজ্জ্বল বলে মনে হয়। সপ্তবর্ণ-শ্রেণীর উজ্জ্বলতম এই হলুদ-সবুজ মধ্যমার এক পাশে আছে কমলা-লাল রং, আর অন্য পাশে আছে নীল-বেগুনী রং। হলুদ-সবুজ থেকে সুরু করলে দেখা যায় যে, যতদূরে যাওয়া যায়, দুই পাশেরই বর্ণসজ্জা তত ম্লান থেকে ম্লানতর হতে থাকে। গভীরতর অনুসন্ধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নীল-বেগুনী প্রান্তের প্রভা কমলা-লাল প্রান্তের প্রভা অপেক্ষা ক্ষিপ্রতর হারে ক্ষীয়মান।

মানুষের রং দেখবার ও রং চেনবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ওয়ালটারস্, রাইট প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ যে সব মূল্যবান তথ্যাদি এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, বিশ্ববিশ্রুত ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন তাঁর নিজ পরীক্ষাগারে ঐ সব তথ্যাদি যাঁচাই করে ১৯৬০ সালে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, পরীক্ষাগারের উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থার সহায়তায় স্বাভাবিক পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টিতে কমপক্ষে অন্ততঃ আড়াই-শ' রকমের রং সূর্যালোক-বিচ্ছুরিত বর্ণালীতে দেখা সম্ভব। অবশ্য তার জন্যে কিছু অনুশীলনের প্রয়োজন। পরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, স্বাভাবিক পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টিতে কমলা ও হলুদ রঙের মধ্যস্থিত সীমারেখা তীক্ষ্ণ ও নির্দিষ্ট সেই রকম সবুজ ও নীলের মধ্যবর্তী সীমানাও সুস্পষ্ট। কিন্তু হলুদ ও সবুজের মধ্যবর্তী সীমারেখা অত্যন্ত আবছা এবং অস্পষ্ট। আবার নীল-বেগুনী রঙের অন্তর্বর্তী প্রান্তসীমা একটি চওড়া পটির মত বলে মনে হয়। এই জন্যেই সেকালের বিজ্ঞানী নিউটন নীল-বেগুনীর মধ্যে প্রতীয়মান প্রশস্ত সীমানাকে ১৬৬৫ সালে গাঢ়নীল (Indigo)—এই বিশেষ নাম দিয়েছিলেন।

স্বল্পালোকী দৃষ্টিতে লাল, কমলা, হলুদ, নীল, বেগুনী প্রভৃতি বর্ণসজ্জার কোন দ্যোতনাই যে থাকে না, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। বস্তুতঃ ঘোর লাল রং প্রায়ান্ধকার স্বল্পালোকে কালো বলে মনে হয়। দামী চুনীর মালা কম আলোতে

মুখ কালো করে থাকে। স্বল্পালোকী দৃষ্টিতে বর্ণালীর সবুজ পটির অংশটুকুই সর্বাধিক দীপ্তিমান। তবে সবুজ রঙের আব্‌ছা একটু আভাস পাওয়া গেলেও রঙের সম্পূর্ণ বোধ স্কোটপ্‌টিক দৃষ্টিতে থাকে না। ফটোপ্‌টিক্‌ ও স্কোটপ্‌টিক্‌ দৃষ্টিতে উদ্রিক্ত চেতনার তথ্য মোটামুটি বলা হলো।

চোখের এই দুই রকম দেখার মস্তিষ্কে পরিবাহিত হবার পদ্ধতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্প প্রচলিত। এই প্রকল্পগুলি কি ভাবে আমাদের চোখের গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবার সে কথা কিছু আলোচনা করা যাক।

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্গে ফটোগ্রাফিক ক্যামেরার প্রায়ই তুলনা করা হয়। এই সব তুলনায় গঠনগত সাদৃশ্যের কথাই শুনা যায়। চোখ আর ক্যামেরা—এই দুই যন্ত্রের কাঠামোই হলো এক ধরণের রন্ধ্রবিহীন কোটর। ঐ কোটরের সামনের দিকে থাকে প্রতিবিম্ব সুষ্ঠুরূপে ভিতরের পর্দায় ফেলবার জন্যে লেন্স-সমন্বিত উপযুক্ত প্রতিসরণের ব্যবস্থা। কিন্তু চোখ আর ক্যামেরার যান্ত্রিক উদ্দেশ্য ও ব্যবহারিক প্রয়োগ পৃথক পৃথক রকমের। ফটো-ফিল্মে নেওয়া ছবি একটি স্থায়ী ব্যাপার। ফিল্মের এক জায়গায় একটি ছবিই নেওয়া চলে। চোখের আভ্যন্তরীণ পর্দা, যার নাম রেটিনা, সেখানে আপতিত প্রতিবিম্ব কিন্তু স্থায়ী নয়। প্রতিবিম্বের চেতনা মস্তিষ্কে চালান করে দিয়েই রেটিনা খালাস। রেটিনা তখন আবার নতুন প্রতিবিম্ব গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রেটিনা একাধিক প্রতিবিম্ব গ্রহণের উপযোগী পর্দা। প্রতিবিম্ব গ্রহণের কাজে রেটিনার যে অংশটুকু সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'চোখের ফাওাস্'। অপথ্যালমোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে সুচারুরূপে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ফাণ্ডাসের এক জায়গায় ছোট্ট টোল-খাওয়া গর্তের মত একটু জায়গা আছে। এই অংশটির নাম ফোভিয়া সেন্ট্রালিস্। ফোভিয়া সেন্ট্রালিস রক্তবর্ণের। ফোভিয়ার পরিবৃত্তিক অংশে রক্তবাহী কোন শিরা-উপশিরা নেই। ফোভিয়া সেন্ট্রালিস পরিবেষ্টনকারী এই বৃত্তীয় অংশের নাম ম্যাকুলা লুটিয়া। সমগ্র ফাণ্ডাসের ভিতর ম্যাকুলা লুটিয়ার রঙই গাঢ়তম।

প্রায় এক-শ' বছর আগে চক্ষু-বিশেষজ্ঞ ম্যাক্স স্যুল্‌টজে এক প্রকল্পে ঘোষণা করেন যে, ফাণ্ডাসের অন্তস্তলে যে সব সূক্ষ্ম ঝিল্লী আছে, তার কতকগুলির প্রান্তভাগ স্তম্ভের আকার-বিশিষ্ট (Cylindrical)। কতকগুলি আবার শঙ্কুর (Cone) আকার-সম্পন্ন। বহু নিশাচর প্রাণীর চোখের উপর ছুরি চালিয়ে শল্য-ভিত্তিক পরীক্ষার পর অধ্যাপক স্যুল্‌টজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শঙ্কুর আকার-বিশিষ্ট স্নায়ুগুলি পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টির মাধ্যম এবং লাঠির আকারের স্নায়ুসমূহ স্বল্পালোকী দৃষ্টির মাধ্যম। অধ্যাপক স্যুল্‌টজের প্রকল্পে কিন্তু পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টির বর্ণবিশ্লেষণী ক্ষমতার যাবতীয় খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য যথাযথরূপে ব্যাখ্যাত হয় নি।

১৯৬০ সালে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন দৃষ্টি-চেতনা পরিবাহী মাধ্যম ও প্রকরণ সম্পর্কে নতুন এক প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন। প্রকল্পটি পরীক্ষা-প্রতিষ্ঠিত ও যুক্তি-সমর্থিত। এই প্রকল্পে তিনি বলেছেন যে, রেটিনার উপর তিন রকম বর্ণকণিকার প্রলেপ আছে। এই সব বর্ণকণিকার প্রলেপই হলো পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টির মাধ্যম। বর্ণকণিকার উপর আলোক শক্তি আপতিত হলে তারা ঐ শক্তির কম্পন ও আন্দোলনে আবিষ্ট হয়—উত্তেজিত হয়। বর্ণকণিকাগুলি তখন ঐ সংগৃহীত উত্তেজনা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত করে দিয়ে দৃষ্টির দ্যোতনা জাগায়। উত্তেজনা সঞ্চালিত করে দেবার পর বর্ণকণিকাগুলি আবার তাদের নিজস্ব স্থিরাবস্থায় ফিরে আসে, নতুন উত্তেজনা গ্রহণ ও সঞ্চালনের

জন্যে পুনরুপযোগী হয়ে। উত্তেজনা সঞ্চালিত করা ও নবকর্ম সম্পাদনের উপযোগী হয়ে বর্ণকণিকাগুলির স্থিরাবস্থায় ফিরে আসা—এই দুই-এর মধ্যে সময়ের ব্যবধান হলো $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড। এই ব্যবধানই দৃষ্টির স্থিতিকাল নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

নিরবচ্ছিন্ন বর্ণালী এক এক অংশে এক এক ধরণের বর্ণকণিকা আলোকশক্তি গ্রহণ ও সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করে।

(১) স্বাভাবিক পর্যাপ্ত-আলোকী দৃষ্টিতে বেগুনী, নীল ও ফিকে সবুজ রঙের বোধ যে বর্ণকণিকার মধ্যস্থতায় সংগৃহীত হয়ে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয়, তার নাম জ্যান্থোফিল। রসায়নের ভাষায় এই বর্ণকণিকা লুটিন নামেও পরিচিত। লুটিনের রাসায়নিক সঙ্কেত হলো $C_{40}\ H_{56}\ O_2$। মুরগীর ডিমের কুসুমে অনেকটা জ্যান্থোফিল থাকে। কুসুমের উজ্জ্বল হলুদ রঙের কারণ হলো এই জ্যান্থোফিলের উপস্থিতি। জ্যান্থোফিল আমরা খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে গ্রহণ করি এবং তা রক্তচলাচলের ভিতর দিয়ে সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। শরীরের ভিতরের কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জ্যান্থোফিল দেহাভ্যন্তরে উৎপাদিত হয় না।

(২) গাঢ় সবুজ, হলুদ ও ফিকে কমলা রঙের পরিবহন ঘটায় ফেরোহিম (Ferroheme) বর্ণকণিকার মাধ্যমে। ফেরোহিম বর্ণকণিকা স্বল্পখ্যাত হলেও একটি হেমি-যৌগের (Heme-Compound) বিশেষ খ্যাতি আছে। গ্লোবিন কণার সঙ্গে মিলিত হওয়াতে উৎপন্ন হিমোগ্লোবিন যৌগের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। রক্তের লোহিতসারে উপস্থিতির জন্যে হিমোগ্লোবিন নামটি বেশ পরিচিত বলেই মনে হয়। আমাদের শরীরের ভিতর যে সব রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, তাথেকেই ফেরোহিম তৈরী হয় আমাদের দেহাভ্যন্তরে।

(৩) গাঢ় কমলা থেকে ঘোর লাল রঙের চেতনা পরিবাহিত হয় ফেরিহিম বর্ণকণিকার মাধ্যমে। ফেরিহিম বর্ণকণিকাও দেহাভ্যন্তরেই প্রজনিত হয়।

বস্তুতঃ অপথ্যালমোস্কোপ যন্ত্রে ফাণ্ডাস পরীক্ষা করে এই সব বর্ণকণিকার অস্তিত্বের বাস্তব সাক্ষ্যও মেলে। ম্যাকুলা লুটিয়ার গাঢ় হলুদ রঙের সঙ্গে জ্যান্থোফিলের উপস্থিতির প্রকল্প বেশ খাপ খায়। আবার ফোভিয়া সেণ্ট্রালিস্-এর গাঢ় রক্তবর্ণ ফেরো-ফেরিহিমের অস্তিত্ব-জ্ঞাপক বলে ধরে নেওয়াটা স্বাভাবিক।

(৪) স্বল্পালোকী দৃষ্টির পরিবহন-প্রকরণে চতুর্থ এক রকম বর্ণকণিকার গাঢ় প্রলেপই হলো ক্রিয়াশীল মাধ্যম। প্রলেপ গাঢ় হওয়ায় সামান্য উত্তেজনাও এতে ধরা পড়ে এবং স্পন্দনের সাড়া জাগায়। পর্যাপ্ত আলোকের তীব্র স্পন্দনের আন্দোলন আবেগের সংস্পর্শে এলে এই চতুর্থ বর্ণকণিকায় এক বিশেষ ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে এই প্রলেপ তার স্পন্দন-সংবেদনশীলতা হারিয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে। স্বল্প আলো থেকে পর্যাপ্ত আলোতে এলে প্রথমটায় চোখ ঝল্‌সে যাবার যে অনুভূতি হয়, তা এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিঘটনকাল। আবার পর্যাপ্ত আলোকের আন্দোলন আবেগের হাত থেকে অব্যাহতি পেলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ নির্জীব বর্ণকণিকার স্পন্দন সংবেদনশীলতা পুনরুজ্জীবিত হয়। আমরা পর্যাপ্ত-আলো থেকে স্বল্পালোকে এলে উক্ত "কিছুক্ষণকেই" চোখ সইয়ে নেবার সময় বলে ধরে থাকি।

অধ্যাপক রামন প্রবর্তিত নব-প্রকল্পে দুই প্রকার দৃষ্টি-চেতনার যাবতীয় ধর্মগুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। তাছাড়া বর্ণবোধী দৃষ্টির যাবতীয় ক্ষমতা ও অক্ষমতার অনুপম বিশ্লেষণ এই প্রকল্পে সম্ভব। প্রকল্পটি সন্দেহাতীতরূপে হয়তো এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি, তবু অধ্যাপক রামনের পরীক্ষাভিত্তিক তত্ত্ব যেমন শাণিত বুদ্ধিদীপ্ত তেমনই হৃদয়গ্রাহী। গত ৭-৫-৬৩ তারিখের ষ্টেটসম্যান দৈনিকে প্রকাশিত এক সংবাদে বলা হয়েছে যে, মার্কিন

বিজ্ঞানী ডাঃ পল্ লিয়েবম্যান এক অভিনব মাইক্রোস্পেকট্রোফটোমিটার যন্ত্র নির্মাণ করেছেন এবং তার সাহায্যে রেটিনার ঐ সব বর্ণকণিকা-গুলিকে আলাদা আলাদা করে সনাক্ত করেছেন। ডাঃ লিয়েবম্যানের পরীক্ষায় অধ্যাপক রামনের প্রকল্পিত বর্ণকণিকাগুলির রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কতটা সমর্থিত হয়েছে, তার সঠিক বিবরণ অবশ্য এখনও পাওয়া যায় নি।

বিজ্ঞান-সংবাদ

পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে হিলিয়াম গ্যাসের সন্ধান

নবতম মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরার-১৭ প্রমাণ করেছে—পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় হিলিয়াম গ্যাসের একটি স্তর আছে।

হিলিয়াম হাল্কা ও নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বায়ুমণ্ডল ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত বেলুনকে স্ফীত করবার জন্যে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অন্য আরও নানা কাজে এর প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর মাটির অনেক নীচে এই গ্যাস পাওয়া যায়। এখান থেকে এই গ্যাস নিষ্ক্রিয়ভাবে অবিরাম আবহমণ্ডলে উত্থিত হচ্ছে।

কক্ষ-পরিক্রমারত এক্সপ্লোরার-১৭ বেতারযোগে যে সব তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, তাতে জানা যাচ্ছে, আগে যতখানি মনে করা হতো তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ হিলিয়াম পৃথিবীর ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে জমা রয়েছে।

জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার বিজ্ঞানীরা ওয়াশিংটনে মার্কিন ভূপদার্থ-বিজ্ঞান ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলনে এক্সপ্লোরারের এই নতুন আবিষ্কারের বিবরণ দেওয়া হয়।

আবহমণ্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উপাদান পর্যালোচনার জন্যে গত ২রা এপ্রিল কেপ কেনাভেরাল থেকে এক্সপ্লোরার-১৭ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল।

মানুষের দেহে তেজস্ক্রিয়তার প্রতিক্রিয়া

প্রকৃতিতেই যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রয়েছে, মানুষ দীর্ঘকাল তার সংস্পর্শে থাকলে তার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা নির্ধারণের জন্যে যুক্তরাষ্ট্র গবেষণা সুরু করেছে।

এই ধরণের গবেষণা এর আগে আর হয় নি। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের ৪টি অঙ্গরাষ্ট্রের ৫০ হাজার অধিবাসীকে নিয়ে এই গবেষণার কাজ চলবে। এঁরা যে জল পান করে, তাতে স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ রেডিয়াম আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সার্জন জেনারেল ডাঃ লুথার এল. টেরী সম্প্রতি এই গবেষণার কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, পারমাণবিক শক্তি কমিশন এবং জন-স্বাস্থ্য বিভাগ যুক্তভাবে এই গবেষণা করবেন।

এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মানুষের দেহে এই তেজস্ক্রিয়তা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে কি প্রতিক্রিয়া আনতে পারে, তা এখনও প্রায় অজানা রয়ে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সারাজীবন তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে থাকবার ফলে ক্যান্সার হতে পারে কি না, এই গবেষণার ফলে তা নির্ধারিত হতে পারে।

ইলিনয়, আইওয়া, মিনেসোটা ও উইস্কন্সিনের কয়েকটি রাষ্ট্র বেছে নেওয়া হয়েছে এই গবেষণার জন্যে। কারণ ইতিপূর্বে পারমাণবিক শক্তি কমিশনের এক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, এই অঞ্চলে গভীর কূপের জলে স্বাভাবিক

অপেক্ষা বেশী রেডিয়াম আছে। এই রেডিয়াম স্বাভাবিকভাবেই এসেছে, এটি পারমাণবিক ভস্মের ফল নয়।

ভূত্বকের উপাদানের সন্ধান

কি কি উপাদানের দ্বারা ভূত্বক গঠিত হয়েছে, সেটা নিরূপণ করা যতটা কঠিন আগে মনে হয়েছিল, বর্তমানে তা আর তত কঠিন নয় বলেই মার্কিন বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ভূত্বক সম্পর্কে তথ্য সন্ধানের জন্যে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রগর্ভের মাটি খুঁড়ে মৃত্তিকার শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছুবেন।

এই সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি সন্ধানের জন্যে গত বছর পুর্টোরিকোর উপকূলে এক হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত মৃত্তিকা খোঁড়া হয়। মৃত্তিকা খুঁড়ে ভূপৃষ্ঠের এক হাজার ফুট নীচে সারপেন্টাইন শ্রেণীর পাথর পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, অতিশয় কঠিন ব্যাসাল্টের লাভা শ্রেণীর পাথর ভেদ না করে কেবল সারপেন্টাইন শ্রেণীর পাথর ভেদ করে ভূপৃষ্ঠের শেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছানো যাবে।

গত বছর পুর্টোরিকোয় মৃত্তিকা খুঁড়ে যে শ্রেণীর পাথর পাওয়া গেছে, সমুদ্রগর্ভে মৃত্তিকা খুঁড়েও অনুরূপ পাথর পাওয়া যাবে বলে অনুমিত হয়।

গত বছর পুর্টোরিকোয় ভূত্বক পরীক্ষা করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, সে সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরী করেছে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউণ্ডেশন। ভূত্বক পরীক্ষার জন্যে বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে সংস্থা গঠন করা হয়েছে, ডাঃ হ্যারি এন. হেস তার চেয়ারম্যান।

পরমাণু চূর্ণীকরণের নতুন যন্ত্র

পদার্থের মৌলিক প্রকৃতি অনুসন্ধানের জন্যে পরমাণু চূর্ণ করবার যে নতুন যন্ত্রটি আমেরিকায় তৈরী হয়েছে। সম্প্রতি সাফল্যের সঙ্গে তার পরীক্ষা সমাপ্ত হয়।

প্রোটন চূর্ণ করবার এই যন্ত্রটি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরষ্টাল গবেষণাগারে স্থাপন করা হয়েছে।

মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশনের উদ্যোগে ১২ লক্ষ ডলার ব্যয়ে নির্মিত এই যন্ত্রটি পরিচালনা করবেন প্রিন্সটন ও পেন্সিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। এই যন্ত্রটির বিশেষত্ব এই যে, নিউ-ইয়র্কের ব্রুকহ্যাভেনের প্রোটন অ্যাক্সিলারেটরটির চেয়ে এই যন্ত্রটি এক শত গুণ দ্রুতবেগে কাজ করবে।

এই যন্ত্রটি প্রায় আলোকের গতিবেগসম্পন্ন প্রোটন বা হাইড্রোজেন পরমাণুগুলিকে চূর্ণ করে লক্ষ লক্ষ মেসন সৃষ্টি করে।

মার্কিন পরমাণু-শক্তি কমিশন বলেছেন, যন্ত্রটি যদিও অত্যন্ত জটিল, তবুও বিজ্ঞানের ছাত্র ও গবেষকদের ব্যবহারযোগ্য করে এটিকে তৈরী করা হয়েছে। যন্ত্রটির পরিকল্পনা রচিত হয় ১৯৫৪ সালে এবং ১৯৫৬ সাল থেকে এটি তৈরীর কাজে হাত দেওয়া হয়। এই যন্ত্রটি নির্মাণের জন্যে খরচ হয়েছে ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার

শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র

লাটিন আমেরিকায় অতিশয় শক্তিশালী একটি রেডিওটেলিস্কোপ যন্ত্র বসানো হয়েছে, দক্ষিণ আকাশের নক্ষত্ররাজি ও ছায়াপথের সন্ধানের জন্যে।

যুক্তরাষ্ট্র ও লাটিন আমেরিকান সরকার এবং বেসরকারী সংস্থার মধ্যে সহযোগিতার ফলে এই যন্ত্রটি বসানো সম্ভব হয়েছে।

৯০ ফুট ব্যাসের এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটি আর্জেন্টিনার লা প্লাটার কাছাকাছি অ্যাণ্ডিস পর্বতের উপরে স্থাপন করা হয়েছে। এটি স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করেছে কার্ণেগী ইনষ্টিটিউশন এবং যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান ফাউণ্ডেশন।

এই যন্ত্রটি স্থাপনের ফলে বিজ্ঞানীরা সমগ্র দক্ষিণ আকাশ পর্যবেক্ষণে সুযোগ পাবেন। বর্তমানে এরূপ একটি যন্ত্র কেবল অষ্ট্রেলিয়ার সিডনিতে আছে। কিন্তু তার সাহায্যে দক্ষিণ আকাশ পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়।

পাটের উৎপাদন দ্বিগুণ বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন

ভারতের কেন্দ্রীয় পাট কমিটির পাট চাষ গবেষণা কেন্দ্র একর প্রতি পাট উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার এক অতি সহজ ও সুলভ পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছেন।

গবেষণা কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাদা পাটগাছের (ক্যাপসুলারিস) পাতার উপরে ইউরিয়া ছিটাইয়া দিলে পাটের উৎপাদন শতকরা ১১৬ ভাগ বেশী হয়। তোসা (ওলিটোরিয়াস) পাটের ক্ষেত্রে উৎপাদন ৬৫ শতাংশ বাড়ে।

ইউরিয়া অতি সহজে দ্রবীভূত হয় বলিয়া পাটগাছে নাইট্রোজেন সার দিবার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। পাটের পাতা ইউরিয়া অতি সহজে গ্রহণ করিতে পারে। ইউরিয়া প্রশমিত দ্রব্য বলিয়া ইহা পাটের পাতার কোন রকম ক্ষতি করে না।

গবেষণা কেন্দ্র প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ৪৩০ গ্যালন জলে ২০ কিলোগ্র্যাম ইউরিয়া মিশ্রিত করিয়া ৪ বার সমান ভাগে পাতার উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। পাটের গাছ যখন ৩৫ হইতে ৪০ দিনের মত বড় হয়, তখন প্রথমবার ইউরিয়া দ্রব পাটগাছের পাতায় ছিটাইয়া দিতে হয়। ইহার পর এক সপ্তাহ অন্তর ৩ বার অনুরূপভাবে ছিটাইয়া দেওয়া প্রয়োজন।

ছিটাইবার দিন সকাল বেলায় পাট পাতার নিচের দিক হইতে ইউরিয়া দ্রব ছিটাইয়া দিতে হয়। ইউরিয়া মিশ্রিত জল সাধারণভাবে ছিটাইয়া দিলেও চলে। তবে হস্তচালিত স্প্রেয়ারের সাহায্যে ছিটাইয়া দিলে অল্প সময়ে ও সহজে কাজ সম্পন্ন করা যায়।

মধ্যএশিয়ায় মরুভূমিতে ক্যাক্‌টাস্ চাষ

মধ্যএশিয়ার মরুভূমিতে একদিকে যেমন সেচ নালা ও জলাধার নির্মাণের দীর্ঘমেয়াদী কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনই এই সব মরুভূমিতে স্থানে স্থানে ক্যাক্‌টাসের (মনসাগাছ) চাষ আরম্ভ করা হয়েছে। প্রথম বছরের শীতের পর ক্যাক্‌টাসগুলি বেশ বড় হয়েছে। এই গাছ আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার নীরস অঞ্চলে জন্মায়। এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়। এদের টিস্যু বা তন্তুগুলি জলাধার বিশেষ। মাসের পর মাস তাতে জল জমা থাকে। এদের কাণ্ডগুলি পশুদের প্রিয় খাদ্য। ক্যাক্‌টাস খেলে তাদের আর জলের প্রয়োজন হয় না।

আশা করা যায় যে, ক্যাক্‌টাস চাষের ফলে এই সব নীরস অঞ্চল একদিন সরস পশু চারণভূমিতে পরিণত হবে। তাছাড়া ক্যাক্‌টাস বালি ধরে রাখতে পারে। ফলে মরুভূমির সম্প্রসারণ রোধ করা যায়।

নতুন ক্যাক্‌টাস উৎপাদনের ব্যাপারে রাশিয়াও যোগ দিয়েছে। আশা করা যায়, বিজ্ঞানীরা আরও উন্নত শ্রেণীর ক্যাক্‌টাস উদ্ভাবন করতে পারবেন।

ছত্রাক থেকে প্রোটিন সংগ্রহের ব্যবস্থা

আমেরিকার ওহিয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রাকবিজ্ঞানী ডাঃ উইলিয়াম ডি. গ্রে জানিয়েছেন যে, চৌদ্দ-শ' লোকের প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পঞ্চাশ হাজার গ্যালনের একটি আধারে রাখা ছত্রাক থেকে পূরণ করা যেতে পারে। ইনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞান এবং গাছপালার নিদান-তত্ত্ব বিষয়ের অধ্যাপক।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, প্রোটিন-সমৃদ্ধ এই জিনিষটি স্বাদগন্ধবিহীন। দেখতে অনেকটা রান্নাকরা ক্যাভিয়ার মাছের মত। এই সকল ছত্রাক শুকিয়ে ময়দার মত গুঁড়া করে বিস্কুটের মত করে অথবা বড়ি বানিয়ে রাখা যেতে পারে। এখনই এই জিনিষটি মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। বর্তমানে এটি গবাদি পশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব মিটাবার জন্যে ব্যবহৃত হতে পারে।

ডাঃ গ্রের মতে, বিশ্বের খাদ্য ঘাটতির মূলে আছে প্রোটিনের ঘাট্‌তি। এজন্যে তিনি গত তিন বছর ধরে হাজার রকমের ছত্রাক নিয়ে একটি সংশ্লেষিত প্রোটিন তৈরীর জন্যে গবেষণা করছেন। শ্বেতসার জিনিষটি প্রচুর পরিমাণে পৃথিবীতে পাওয়া যায়। ডাঃ গ্রের গবেষণাগারে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় শ্বেতসার ও অজৈব নাইট্রোজেনকে প্রোটিনে পরিণত করা হয়। শ্বেতসার ও অজৈব নাইট্রোজেনের মোট ওজনের এক ষষ্ঠাংশ প্রোটিনে পরিণত হয়ে থাকে।

হুকওয়ার্মের নতুন ভেষজ

হুকওয়ার্মে আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা ও আন্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। এই রোগে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে থাকে।

"ডি. এন. পি. ডিসোফেনল" নামে কুকুরের হুকওয়ার্ম রোগের একটি নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। ঔষধটি আবিষ্কার করেছেন নিউজার্সির প্রিন্সটনে অবস্থিত সাইনেমাইড ইন্টারন্যাশন্যাল কোম্পানী। কুকুর এই রোগে বিশেষ করে ভোগে মনুষ্যদেহেও কুকুর থেকে এই রোগ সংক্রামিত হয়ে থাকে। এই ভেষজের আবিষ্কর্তা জানিয়েছেন যে, কুকুরের তিন রকম হুকওয়ার্ম রোগে এই ঔষধ প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এই ঔষধের কোন প্রতিক্রিয়াও হয় না। এই নতুন ঔষধটি ইনজেকশন দিতে হয় বলে কুকুরের উপর প্রয়োগের সুবিধাও অনেক বেশী।

নারী ও পুরুষের দেহে ঔষধের ক্রিয়ার তারতম্য

পুরুষ ও নারীদেহে বিভিন্ন ঔষধের ক্রিয়ায় কোন তারতম্য হয় কি না, সে বিষয়ে মিজুরীর সেন্টলুই-এর গ্রোভ গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন যে, পুরুষের তুলনায় নারী-দেহের উপর অ্যাসপিরিন, ক্যাফিন প্রভৃতি ভেসজের ক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুস্থ এবং অসুস্থ উভয় প্রকার দেহেই এই ঔসধ প্রয়োগ করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। ভেষজ গ্রহণ করবার পর দেহের নানারকমের লক্ষণ, উপসর্গ ও প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞানীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া ঔসধ দেবার পূর্বে তাঁরা ঐ সব ব্যক্তিদের ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছেন। পরিণামে রোগচিকিৎসায় ঔষধের ফল নারী ও পুরুস দেহে একই প্রকার হলেও সমসংখ্যক নারী ও পুরুষের উপর একই ঔসধ প্রয়োগের পর দেখা গেছে, পুরুষের তুলনায় অধিক সংখ্যক নারী সেই ঔসধে উপকৃত হয়েছে।

পুস্তক পরিচয়

আকাশ ও পৃথিবী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্লিশিং কোং প্রাঃ লিঃ; ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭; পৃঃ—৩২৬; মূল্য দশ টাকা।

আকাশ ও পৃথিবীর কথা জানিবার জন্য মানুষের একটা স্বাভাবিক কৌতূহল থাকিলেও এই সম্বন্ধে অনেকেরই কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। আলোচ্য পুস্তকখানিতে লেখক আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদি সম্পর্কিত বিবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যাদি অতি প্রাঞ্জল ভাসায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আকাশ পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহ-নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জিত হইয়াছিল, পুস্তক-খানির প্রথম পরিচ্ছেদে লেখক সেই সকল পৌরাণিক কাহিনীর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহ, ধূমকেতু, উল্কা প্রভৃতি এবং সৌরজগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে মানুষের মহাকাশ জয়ের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যৎ অভিযানের কথা আলোচিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নক্ষত্র-জগৎ এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে মহাজাগতিক রশ্মি সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে।

পুস্তকখানির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ—ইহাতে রঙীন চিত্র, রেখা চিত্র ও ফটোগ্রাফ মিলাইয়া প্রায় দুই শতের মত ছবি আছে। এই সকল চিত্রের সাহায্যে সাধারণ পাঠকের পক্ষে জটিল বিষয়বস্তুও সহজবোধ্য হইবে। বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনায় সাবলীল প্রকাশভঙ্গী যে পুস্তকখানিকে সর্বস্তরের পাঠকের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া তুলিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। —গ

আজকের সেরা মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী; আজকের সেরা মার্কিন রসায়ন-বিজ্ঞানী; আজকের সেরা মার্কিন জীববিজ্ঞানী—ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ ইন-ফরমেশন সার্ভিস, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত ও বিতরিত।

এই তিনখানি পুস্তিকাতে সর্বসমেত সতের জন বিশিষ্ট মার্কিন বিজ্ঞানীর জীবনী ও তাঁদের বৈজ্ঞানিক অবদানের পরিচয় সংক্ষেপে প্রদান করা হয়েছে। প্রথম পুস্তিকাটিতে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত পদার্থ-বিজ্ঞানী ইসাডোর আইজ্যাক রোধ, ট্র্যানজিষ্টরের জনক ডাঃ উইলিয়াম শক্‌লে, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী এডোয়ার্ড এম. পারসেল, বাব্‌ল্ চেম্বার উদ্ভাবক ডোনাল্ড এ. গ্লেসার, 'মেসার' আবিষ্কর্তা চার্লস এইচ টাউনস্, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত এমিলিও জি. সেগ্রে—এই ছয়জন খ্যাতনামা মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানীর কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় পুস্তিকাটিতে 'রাসায়নিক বন্ধনের' প্রকৃতি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধানের জন্যে প্রখ্যাত ডাঃ লাইনাস কার্ল পলিং, পলিমার গবেষণার জন্যে প্রখ্যাত ডাঃ রবার্ট বি. উডওয়ার্ড, নতুন মৌলিক পদার্থের আবিষ্কর্তা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ডাঃ গ্লেন থিওডোর সীবর্গ, পারমাণবিক ঘড়ি আবিষ্কর্তা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ডাঃ উইলার্ড ফ্রাঙ্ক লিবি এবং আলোকসংশ্লেষণ গবেষণার অন্যতম পুরোধা নোবেল পুরস্কারজয়ী ডাঃ মেলভিন ক্যালভিনের অবদান বিবৃত হয়েছে।

তৃতীয় পুস্তিকায় প্রখ্যাত প্রজননবিদ্যা বিশারদ ডাঃ জর্জ ডব্লিউ বীড্‌ল্, বংশগতি ও প্রকরণ বিষয়ক গবেষণার জন্যে প্রখ্যাত ডাঃ জস্যুয়া লেডারবার্গ এবং ডাঃ এডওয়ার্ড এল. টেটাস, শিশু পক্ষাঘাত প্রতি-ষেধক টিকা-উদ্ভাবক ডাঃ জন ফ্রাঙ্কলিন অ্যাণ্ডার্স এবং ডি-এন-এ ও আর-এন-এ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে প্রখ্যাত ডাঃ সেভেরো ওচোয়া এবং ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গের অবদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছয় জন জীববিজ্ঞানীই শারীরবৃত্ত ও ভেষজ-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন। এথেকে এঁদের অবদানের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

এই পুস্তিকা তিনখানি আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের কয়েকজন দিকপালের সঙ্গে যেমন সাধারণ পরিচয় ঘটিয়ে দেয়, তেমনি তাঁদের সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে জানবার প্রেরণা যোগায়। র. ব.

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অগাষ্ট—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ ঃ অষ্টম সংখ্যা
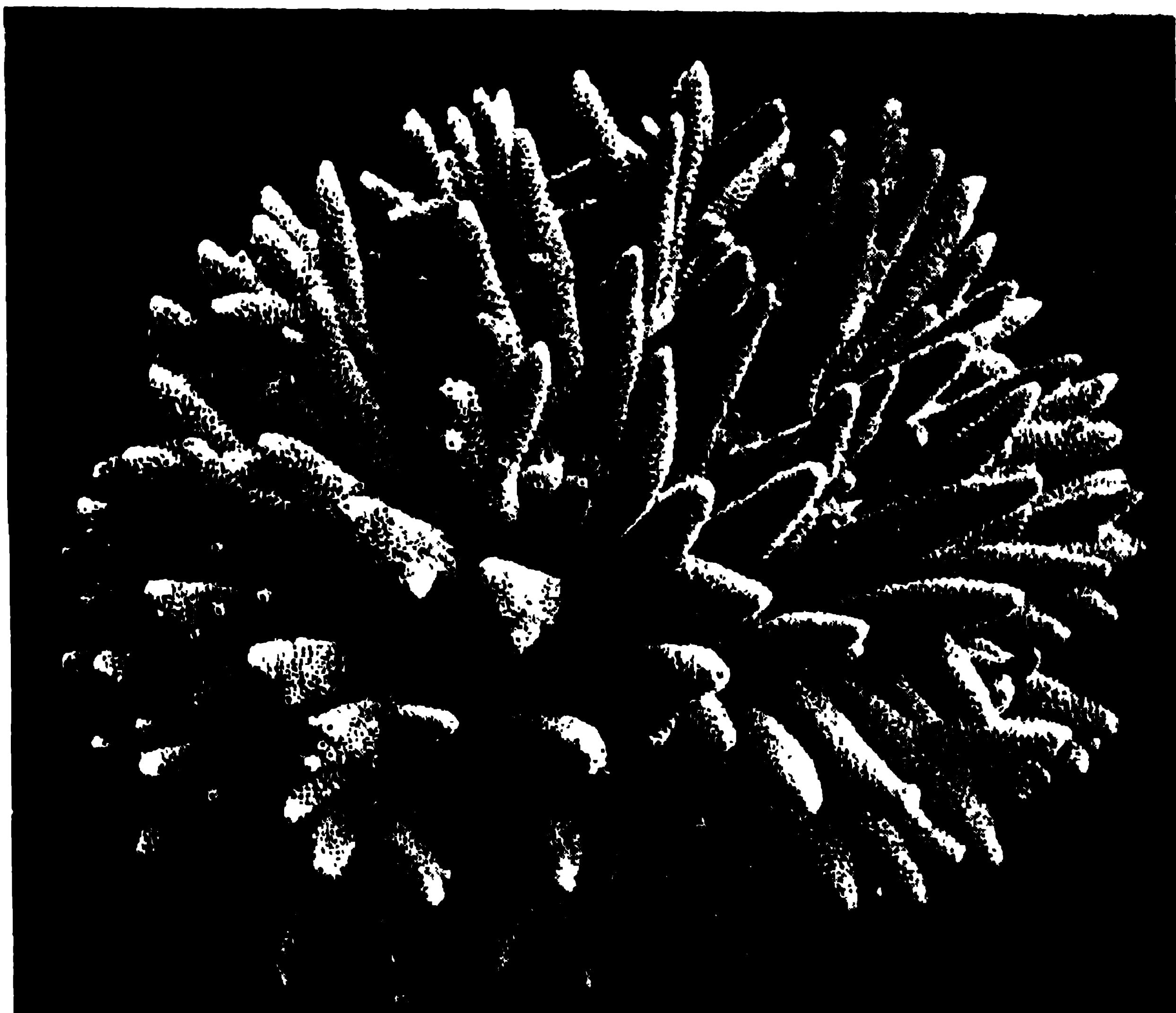
হরিণের শৃঙ্গসদৃশ প্রবাল

প্রবালটির প্রত্যেকটি শৃঙ্গের গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঁটার মত যে সব দাগ দেখা যায় — সেগুলি হচ্ছে ভিতরকার ক্ষুদ্রাকার প্রাণীগুলির (পলিপ) বাসস্থলের দরজা।

বুদ্ধিমান যন্ত্র

বুদ্ধিমান কথাটা আমরা সাধারণতঃ ব্যবহার করি মানুষের ক্ষেত্রেই, সময় সময় দু-একটা পশুপক্ষীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। কিন্তু যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তার কথায় বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কথাটা কিন্তু অবিশ্বাস্য নয়—সত্য সত্যই এমন সব যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যেগুলি বুদ্ধিমান মানুষের মতই কাজ করে। এই যন্ত্র গণিতের সব রকমের জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারে। সরবরাহ-করা খবরাখবর ছাঁটাই-বাছাই করতে পারে এবং মনেও রাখতে পারে। তাছাড়া কাজকর্ম করেও তড়িদ্‌গতিতে। সেকেণ্ডে হাজার বার গুণ আর পাঁচ-শ' বার ভাগ করাও এর কাছে কিছুই নয়। যে সব শক্ত অঙ্ক কষতে সুদক্ষ গণিতজ্ঞেরও দীর্ঘ সময় লাগে, সুব্যবস্থিত যন্ত্র তা করে দেয় মিনিটখানেকের মধ্যে। এই যন্ত্রকে বলা হয় কম্পিউটার। কম্পিউটারের কার্যপ্রণালীর কথা শুনলে অবাক হয়ে যেতে হয়। অঙ্ক কষবার সময় সাধারণ লোকের পক্ষে প্রতি দুই-শত ঘরে গড়ে একটা করে ভুল হয়। আর এই যন্ত্রের ভুল এক পরার্ধ বারে একবারেরও কম। শুধু অঙ্ক কষবার কথাই নয়, বড় বড় রাসায়নিক ও অন্যান্য কারখানা, তৈলশোধনাগার প্রভৃতি চালাতে শুধু এই রকম এক একটা যন্ত্রই যথেষ্ট। একটা গোটা আবহাওয়া অফিসের হিসাব-নিকাশ এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত ব্যাপারেও এই যন্ত্র নির্ভুলভাবে কাজ করে। অধিকতর কার্যোপযোগী করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা এই যন্ত্রের আরও উন্নতিসাধনের চেষ্টা করছেন। ফলে ক্রমশঃই উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে। এই সব কম্পিউটারকে মোটামুটি দু-ভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরণের নাম ডিজিট্যাল কম্পিউটার, আর এক ধরণের যন্ত্রের নাম অ্যানালগ কম্পিউটার। অঙ্ক কষা বা নিয়ম-বাঁধা কোন কাজ করবার যন্ত্রকে ডিজিট্যাল কম্পিউটার বলা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি অংশ থাকে—(১) অঙ্ক কষবার যন্ত্র ; (২) কি উপায়ে অঙ্ক কষা হবে, তা ঠিক করবার যন্ত্র ; (৩) মনে রাখবার যন্ত্র—যা আগের পাওয়া সব তথ্য মনে করে রাখে পরবর্তী কাজের জন্যে (যেমন—অঙ্ক কষবার সময় আমরা মনে মনে বলি—তিন ছয়ে আঠারোর আট, হাতে থাকে এক··· ইত্যাদি)। এক রকম চৌম্বক ফিতা এবং ক্যাথোড-রে টিউব মনে রাখবার কাজটা করে দেয়। কম্পিউটারের অঙ্ক কষবার ব্যাপারটাও বেশ মজার। আমরা যেমন এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা আর শূন্য দিয়ে অঙ্ক কষি, এই যন্ত্র কিন্তু সেটি করে কেবল এক আর শূন্য দিয়ে। এতে অঙ্ক কষাটা যন্ত্রের পক্ষে সহজ হয়ে আসে।

অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয় অন্যান্য ধরণের বিশেষ কাজের জন্যে। যেখানে আপাতদৃষ্টিতে বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন, যেমন—গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ বা লাউড স্পীকারের আওয়াজ প্রয়োজনমত বাড়ানো-কমানো প্রভৃতি কাজ।

সব রকমের যন্ত্রকেই অবশ্য তথ্য এবং কাজের ধরণ আগে থেকে জানিয়ে দিতে হয়। তারপর যন্ত্রটা ভেবেচিন্তে উত্তরটা জানিয়ে দেবে নির্দিষ্ট জায়গায়। একটা অ্যানালগ কম্পিউটারে দিনের তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, গতি ও আর্দ্রতার হিসাব দিয়ে একটা বোতাম টিপলেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঐ যন্ত্রটাই বলে দেবে। হয়তো বললো—"ঝড়বৃষ্টি" চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই।

আগেই বলেছি, বৈজ্ঞানিকেরা অধিকতর কার্যক্ষম নতুন নতুন কম্পিউটার যন্ত্র উদ্ভাবন করবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। এরকম দু-একটা যন্ত্রের কথা শোন। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজিতে একটা নতুন যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। জটিল যন্ত্রাদির সূক্ষ্ম অংশগুলি নিখুঁতভাবে তৈরী করতে এর জুড়ি নেই। যে ধরণের জিনিষ প্রয়োজন, তার ডিজাইন দেওয়া হয় এই যন্ত্রটিকে, আর দেওয়া হয় কাঁচামাল। তার পরেই নিশ্চিন্ত। দরকারী হিসাবপত্র করে নিয়ে তৈরী করবার যন্ত্র (যেমন—লেদ, প্লেনিং মেশিন, মিলিং মেশিন, ড্রিল ইত্যাদি) ঠিক্‌মত চালিয়ে নিখুঁত যন্ত্রাংশটি তৈরী করে দেয় ঐ কম্পিউটার। মানুষের দক্ষতাকেও হার মানিয়ে দেয় এই যন্ত্র। এসব নিখুঁত যন্ত্রাংশের দরকার হয় রকেট, প্লেন, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতির জন্যে। (যন্ত্রে দেবার আগে অবশ্য ডিজাইনটিকে যন্ত্রের বোধগম্যভাবে অনূদিত করে নেওয়া হয়)।

আমরা আগেই বলেছি, সাধারণ কম্পিউটার কেবল মাত্র সরবরাহ করা তথ্য মনে করে রাখতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এমন একটা যন্ত্র তৈরীর চেষ্টা করছেন, যা "অভিজ্ঞতার" সাহায্যে কাজ করতে পারবে এবং সেই জ্ঞান তার ইলেক্‌ট্রনিক ভাঁড়ারে রেখে দিতে পারবে। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক এই ধরণের একটা যন্ত্র প্রায় তৈরীও করে ফেলেছেন। এর নাম তিনি দিয়েছেন "পারসেপট্রন"। এই যন্ত্র প্রথম প্রথম কাজ করতে একটু আধটু ভুল করবে বটে; তবে এর আবিষ্কারক আশা করেন যে, "বয়সের সঙ্গে এর অভিজ্ঞতাও বাড়বে"। এটি হবে মানুষের তৈরী প্রথম যন্ত্র, যা বুঝতে এবং চিনতে শিখবে। এই যন্ত্রের একটা চোখ আছে, যা চার শত ফটো-সেল (আলোক-তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপায়িত করাই ফটো-সেলের কাজ) দিয়ে তৈরী। এই যন্ত্রটি যা দেখবে, তাই মনে রাখবে। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন যে, শীঘ্রই এমন ধরণের পারসেপট্রন তৈরী করা সম্ভব হবে, যা মানুষ চিনতে পারবে, আর দেখবামাত্রই নাম ধরে ডেকে উঠবে। এই যন্ত্র ছাপার লেখা পড়তে পারবে, আর কথায় নির্দেশও দিতে পারবে। অবশ্য ইংল্যাণ্ডের একদল গবেষক মোটামুটি এই ধরণের একটা যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। এর অক্ষর-জ্ঞান বেশ পাকা। ছাপানো সোজা লেখা সে গড়গড় করে পড়ে যায়, ঠিক মানুষের মত কণ্ঠস্বরে। তারপর ছবি মনে রাখবার মত কম্পিউটারও তৈরী হচ্ছে। কোন লোককে একবার দেখবার পর তার সঙ্কেতটি জানিয়ে রাখলেই ভবিষ্যতে যে কোন সময় সে আসবামাত্রই যন্ত্রের পর্দায় তার ছবি ফুটে উঠবে।

এই সেদিন পত্রিকায় দেখছিলাম—ত্রু-একটা কম্পিউটার নাকি তাদের দেওয়া শব্দ থেকে বাক্য—এমন কি, কবিতাও তৈরী করেছে। এই যন্ত্রে তৈরী একটি কবিতা দেখলাম—অবশ্য ত্রুর্বোধ্য ও জটিল। তবে অদূর ভবিষ্যতে যন্ত্রের তৈরী কবিতা এবং মানুষের তৈরী কবিতায় বোধ হয় পার্থক্যই থাকবে না!

যন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে বাহাত্রুরী দেখিয়েছেন আমেরিকার ন্যাশান্যাল ক্যান্ রেজিষ্ট্রার কোম্পানীর বৈজ্ঞানিকেরা। নতুন এক ধরণের চৌম্বকায়িত সূক্ষ্ম কাচদণ্ডের সাহায্যে তাঁরা ক্ষুদে এক কম্পিউটার তৈরী করেছেন। সাধারণ অতিকায় কম্পিউটারের চেয়েও মনে রাখবার ক্ষমতা এর অনেক বেশী, অথচ আকারে একটি স্যুট্‌কেশের মত। ট্র্যানজিষ্টর দিয়ে তৈরী হাল্কা একরকম কম্পিউটারও হালে তৈরী হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা আশা করছেন যে, বিমানে উড্ডয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় একটি পকেট সাইজের নির্দেশক কম্পিউটারও তাঁরা শীঘ্রই বাজারে ছাড়তে পারবেন।

এরপর হয়তো বাড়ীতে বাড়ীতে খবরদারী কম্পিউটার টেবিলে বসানো থাকবে—ছোট ছেলেদের পড়ার উপর নজর রাখবে কিংবা বলবে—দাঁত নিয়ে নখ কাটছ কেন? আবার হয়তো বলবে—বাইরে তাকাচ্ছ কেন, মন দিয়ে পড়। আর তোমাকে ভূগোল পড়তে তো মোটেই দেখি না। তবে ভয়ের কারণ নেই, কারণ সে সব যন্ত্র তৈরী হতে আমাদের সবচেয়ে ছোট্ট বন্ধুটিও তার ভূগোল পড়ার দিন অনেক পিছনে ফেলে আসবে।

এই আশ্চর্য যন্ত্রের মনে রাখবার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে হয়তো একটা যান্ত্রিক এন্‌সাইক্লোপিডিয়া তৈরী করা যাবে—তাকে যে কোন প্রশ্ন করলেই উত্তর মিলবে। অবশ্য আমাদের ভাষার মার-প্যাঁচ থেকে প্রশ্নটা বুঝে নিতে যন্ত্রের খুবই কষ্ট হবে। তাই এক আইনজ্ঞ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের বোধগম্য সাধারণ একটা ভাষা তৈরী করতে লেগেছেন। যে ভাষার সব কথারই মাত্র একটা করে মানে থাকবে এবং আর কোন প্রতিশব্দ থাকবে না।

অনুবাদক টাইপ রাইটার তো অনেক আগেই বেরিয়েছে—এক ভাষায় টাইপ করা থাকলে তা অন্য ভাষায় অনুবাদ করে দিতে পারবে। এবার শোনলাম নতুন এক রকম কম্পিউটার দিয়ে নাকি লেখা পড়েই অনুবাদ করাবার চেষ্টা হচ্ছে। ব্যাকরণগত অশুদ্ধি হয়তো কিছু হবে, তবে অর্থ বিভ্রাট না থাকলেই হলো।

তপনকুমার ঘোষাল

জলস্তম্ভ

ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের অংশবিশেষের তাপ ও চাপের আকস্মিক তারতম্যের ফলে সমুদ্র, হ্রদ প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। আমরা এই বিস্ময়কর দৃশ্যের সহিত পরিচিত নই। জলস্তম্ভের উৎপত্তি হয় সাধারণতঃ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের সমুদ্রে, চীন ও জাপানের সমুদ্রে এবং মেক্সিকো উপসাগরে। ফ্লোরিডা ও প্যালেষ্টাইনের উপকূলবর্তী সমুদ্রেও জলস্তম্ভ দেখা যায়।

টর্ণেডো* এবং জলস্তম্ভ সমগোত্রীয়। টর্ণেডো হইতেই জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। স্থলভাগের বায়ুমণ্ডলে যে সকল নৈসর্গিক পরিবর্তনের জন্য টর্ণেডোর উৎপত্তি হয়, সমুদ্রের উপরিস্থিত বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতির সেইরূপ পরিবর্তন হইলে ঊর্ধ্বমুখী বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের জলরাশিকে উপরের দিকে উত্তোলিত করিবার ফলে জলস্তম্ভের উৎপত্তি হয়। টর্ণেডো এবং জলস্তম্ভ উভয়েই আত্মপ্রকাশ করে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুতে। ইহাদের অভ্যন্তরের অল্পপরিসর বায়ুতে নিম্নচাপের ফলে যে V-আকৃতির ফানেলের ন্যায় গোলাকার ঊর্ধ্বমুখী ঘূর্ণায়মান বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাই সমুদ্রের জলরাশিকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লয় এবং উত্থিত জলরাশি সুদীর্ঘ স্তম্ভের আকারে দৃষ্টিগোচর হয়। এই ঘূর্ণন উত্তর-গোলার্ধে বামাবর্তে এবং দক্ষিণ-গোলার্ধে দক্ষিণাবর্তে সংঘটিত হয়। এই সময়ে ইহার পার্শ্ববর্তী বায়ুতে চাপের আধিক্য থাকে। সাধারণতঃ দুইটি ভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতাযুক্ত বিপরীতমুখী বায়ুপ্রবাহের সংযোগস্থলে বায়ুর এইরূপ আকস্মিক অবস্থার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সূর্যের উত্তাপও বায়ুমণ্ডলের এই অবস্থা সৃষ্টি করিতে খুবই সহায়ক হয়। সেই জন্য জলস্তম্ভ সাধারণতঃ অপরাহ্নেই দেখা যায়, রাত্রিকালে ইহার উৎপত্তি অজ্ঞাত। জলস্তম্ভের আবির্ভাবের পূর্বে বায়ুমণ্ডল শান্ত থাকে, কিন্তু তাপ অধিক থাকে এবং অনতিউচ্চে কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘ (Nimbo-Cumulus) দেখা যায়।

এইরূপ ঘন কৃষ্ণ মেঘের তলদেশ হইতেই বায়ুতে মোচাকৃতি নিম্নচাপযুক্ত ফানেলের সৃষ্টি হয় এবং ইহার প্রান্তীয় দীর্ঘ নলটি সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হয়। সমুদ্রের জল তখন আন্দোলিত হইয়া ঘূর্ণায়মান বায়ুর সহিত ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির ফলে ইহার অভ্যন্তর জলশূন্য থাকে।

*টর্ণেডো—তীব্র গতিসম্পন্ন অপরিসর ফানেলের আকৃতির ঘূর্ণায়মান প্রবল বায়ুপ্রবাহকে টর্ণেডো বলে। ইহার ধ্বংসাত্মক কার্যাবলী কয়েক মিনিটের মধ্যে যে ভয়াবহ আকার ধারণ করে, তাহা অবর্ণনীয়। বায়ুমণ্ডলের অতি তাপ ও আর্দ্রতা টর্ণেডো উৎপত্তির প্রধান কারণ। ইহার ঘূর্ণনের দিক জলস্তম্ভের মতই এবং ভ্রমণপথ শত শত মাইলও হইতে পারে।

টর্ণেডো ও জলস্তম্ভের সঞ্চলনের গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত হইতে পারে, কিন্তু ইহাদের অভ্যন্তরের ঘূর্ণায়মান বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় শতাধিক মাইলেরও অধিক হয়। জলস্তম্ভের ব্যাস খুবই সঙ্কীর্ণ—মাত্র কয়েক গজ এবং ইহার মধ্যের বায়ু তীব্রবেগে আলোড়িত হইলেও পার্শ্ববর্তী দুই শত গজ মাত্র দূরের বায়ুতে কোন চাঞ্চল্য লক্ষিত হয় না। টর্ণেডোর ন্যায় জলস্তম্ভের ধ্বংসলীলা প্রবল হইতে পারে না। কারণ, ইহার স্থায়িত্ব কদাচিৎ এক ঘণ্টার অধিক হয় এবং ইহার ভ্রমণপথও কয়েক মাইল মাত্র। ইহা ছোট ছোট জলযানের ক্ষতি করিতে সক্ষম হইলেও প্রসারতা কম হইবার ফলে জাহাজের বিশেষ ক্ষতিসাধন করিতে পারে না।

শ্রীহৃষীকেশ রায়

স্টোন ফিস

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব উপকূল বরাবর বিস্তৃত গ্রেট বেরিয়ার রিফ-এ কুৎসিৎ আকৃতির একপ্রকার বিপজ্জনক মাছ দেখতে পাওয়া যায়। এদের নাম Synancea Horrida বা স্টোন ফিস। সাগরের অগভীর জলে প্রবালপুঞ্জের মধ্যে এরা বাস করে। এই মাছ দশ ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। জল থেকে তুলে ডাঙ্গায় রাখলে এরা কয়েক ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আত্মরক্ষা করবার ব্যাপারে—যাকে অভিযোজন বলা হয়—এরা খুবই ওস্তাদ। দেহটাকে বাঁকিয়ে অগভীর জলে শিলাস্তূপের মধ্যে স্টোন ফিস এমন নিশ্চলভাবে পড়ে থাকে যে, দেখলে মনে হয় বুঝি বা একটুক্‌রা মৃত প্রবাল। এদের দেহের চামড়া অজস্র আঁচিল বা গুটিকায় ভরা। চামড়ার উপরে শ্যাওলা জমে সবুজ রঙের একটি আস্তরণ সৃষ্টি করে। দেখে মনে হয়, দেহে বুঝি ছেৎলা জমেছে। দেহটি কুব্জাকৃতির এবং সর্বত্রই খাঁজকাটা—সাধারণ মাছের কোন বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের দেহের তলদেশ বরাবর পাখীর ডানার মত আকৃতিবিশিষ্ট পাখনা সাজানো আছে। জলের নীচে ষ্টোন ফিস ধীরে ধীরে তার পাখনা নাড়ে আর চুপচাপ বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। মাথার উপরে বসানো দুটি ক্ষুদ্র চোখের সাহায্যে সে আশপাশের সব কিছুই দেখতে পায়।

জলের স্রোতে কত ছোট ছোট মাছ ভেসে যায়। তাদের অধিকাংশই ছদ্মবেশী স্টোন ফিসকে চিনতে পারে না বলেই তারা স্টোন ফিসের অর্ধবৃত্তাকার মুখে গিয়ে পড়ে। এই মাছের পিঠে আছে ১৩টি কাঁটার সারি। কাঁটাগুলি পাত্‌লা চামড়ার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সাধারণ অবস্থায় এই কাঁটার সারি পিঠের উপর নেপ্‌টে পড়ে

থাকে, কিন্তু প্রাণীটি উত্তেজিত হলে কাঁটার সারি খাড়া হয়ে ওঠে। খাড়া হওয়া কাঁটাগুলিকে ঈষৎ স্বচ্ছ কাচের সূঁচ বলে ভ্রম হয়। প্রসারিত অবস্থায় সেগুলি দৈর্ঘ্যে আধ ইঞ্চি পরিমিত হয়ে থাকে। এই কাঁটাগুলির ডগা এতই ধারালো যে, সেগুলি পাতলা জুতার তলা সহজেই ভেদ করতে পারে। উত্তেজিত স্টোন ফিসের কাঁটার বিষ অতি ভয়ানক। কোনক্রমে স্টোন ফিসের কাঁটা বিঁধলে তীব্র জ্বালা ও বেদনার কারণ হয়। সেই অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণা উপশমের জন্যে রোগীকে অনেক সময় বেদনানাশক ওষুধ প্রয়োগ করে অজ্ঞান করে রাখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। তাই 'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ' অঞ্চলের অধিবাসীরা এই ভীষণ দর্শন প্রাণীটির ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকে। তারা এই অঞ্চলে খালি পায়ে কেন, পাত্‌লা চামড়ার তলাযুক্ত জুতা পরেও হাঁটতে সাহস করে না।
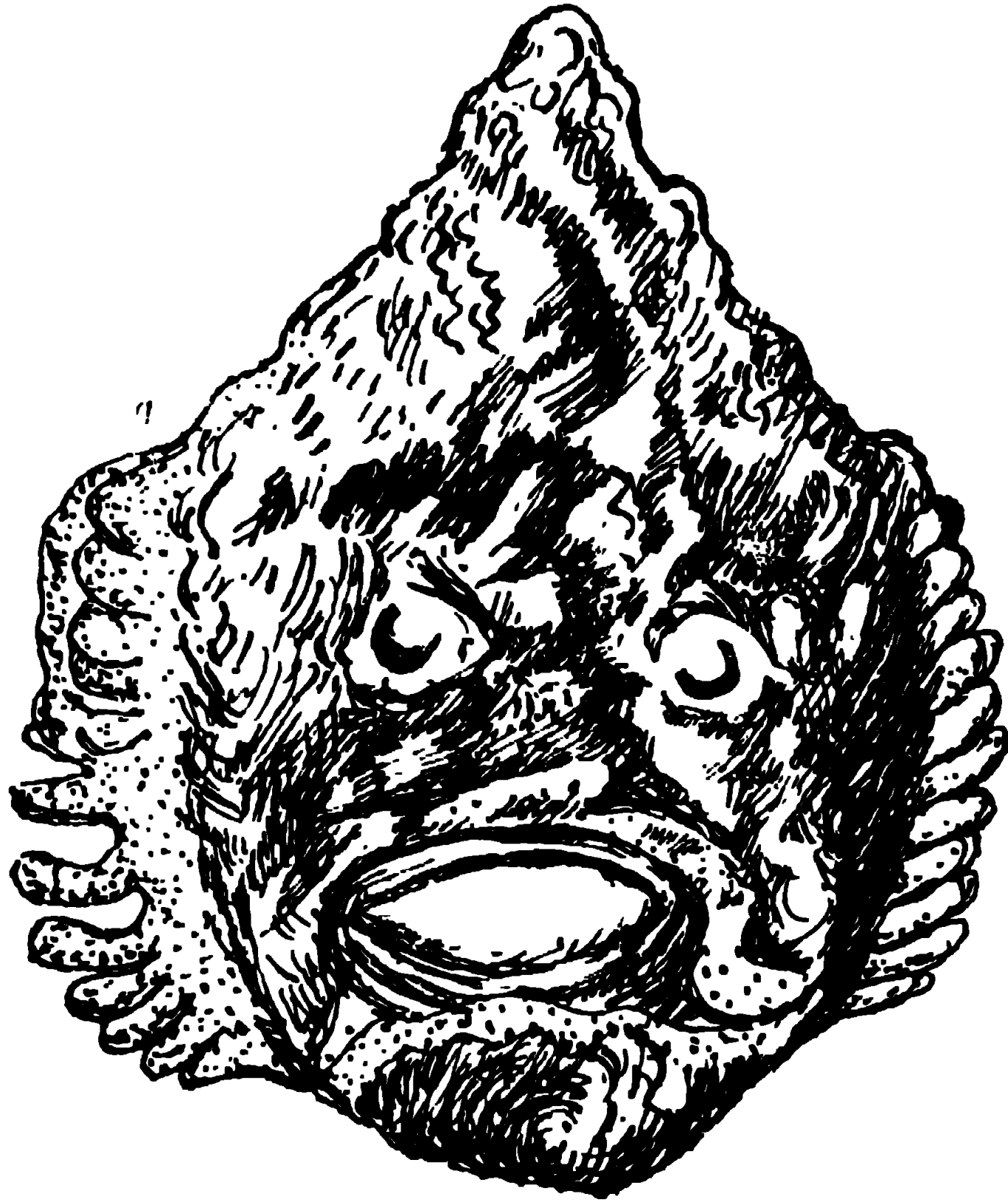
স্টোন ফিস

প্রাণী-বিজ্ঞানী আর্থার ক্লার্ক একদিন বৈকালে গ্রেট বেরিয়ার রিফ অঞ্চলে বেড়াবার সময় এক জায়গায় স্রোতহীন অগভীর জলে একটি বড় শিলার পাশে এক ডিম্বাকার বস্তু দেখতে পান। হাতের বর্শাটি দিয়ে বস্তুটিকে স্বল্প খোঁচা মেরে তিনি বুঝতে পারলেন যে, ওটি কোন কঠিন বস্তু নয়। তিনি দ্বিতীয় খোঁচাটি মারলেন বেশ জোরে। তাতে বস্তুটি জলের মধ্যে প্রায় ৬ ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো—

পরমুহূর্তেই আবার আত্মগোপনের চেষ্টা করলো। ক্লার্কের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, ওটি আর কিছুই নয়—স্টোন ফিস। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল সেটিকে সংগ্রহ করবার ব্যাপারে। ক্লার্কের কাছে ছিল একটি কাচের বাক্স এবং রুটি কাটবার একটি লম্বা ছুরি। তা দিয়েই তিনি সমস্যার সমাধান করলেন। ক্লার্ক ছুরির ফলা দিয়ে প্রাণীটিকে তুলে অতি সাবধানে রাখলেন কাচের বাক্সের ভিতর। মাছটি কিন্তু তাতে একটুও আপত্তি জানালো না। নিশ্চল হয়েই সে পড়ে রইলো তার নতুন আশ্রয়ে।

ক্লার্ক পরে মাছটিকে অল্প জলপূর্ণ একটি চৌবাচ্চায় রেখে তার চারপাশে ছড়িয়ে দিলেন বালি ও অনেকগুলি প্রবাল খণ্ড। উদ্দেশ্য—বন্দী যেন বুঝতে না পারে যে, সে তার স্বাভাবিক আশ্রয়চ্যুত হয়েছে।

এই নতুন পরিবেশে তিনি মাছটির চালচলন ও দৈহিক গঠন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেন। দেখলেন যে, প্রাণীটি জলে সাঁতার কাটতে পারে না। কোন কারণে উত্তেজিত হলে সে জোঁকের মত করে বেঁকে ফুলে ওঠে—তাকে ঠিক লাফানো বলা চলে না। আর মাঝে মাঝে জীবটি তার পাখনার সাহায্যে আশ্রয়স্থল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করে।

গ্রেট বেরিয়ার রিফে অনেক স্টোন ফিস থাকলেও তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নয়। ক্লার্ক উক্ত স্টোন ফিসটির সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অপ্রত্যাশিতভাবে। অতি প্রখর সন্ধানী দৃষ্টি এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সম্যক জ্ঞান না থাকলে স্টোন ফিসের অস্তিত্ব নির্ণয় করা অসম্ভব। সিডনী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণী-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডার্কিন গ্রেট বেরিয়ার রিফ সম্পর্কে একটি অতি মনোরম তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধ্যাপক তাঁর সারা জীবনে বহু চেষ্টা করে ঐ অঞ্চলে একটি স্টোন ফিসেরও দর্শন লাভ করেন নি।

অমরনাথ রায়

জানবার কথা

১। আমাদের জানা সব রকম পদার্থের মধ্যে হীরা হচ্ছে সর্বাপেক্ষা কঠিন এবং

১নং চিত্র।

অবিনাশী। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও—হীরা কিন্তু কার্বন, অর্থাৎ অঙ্গারে তৈরী। বিশেষজ্ঞেরা বলেন—বাতাসের সংস্পর্শে যথেষ্ট পরিমাণে উত্তপ্ত করলে হীরা পুড়ে যায়।

২। ওয়াশিংটন, ডি. সি-এর কার্নেগী ইনষ্টিটিউসনের সুপ্রজনন-বিদ্যা বিভাগের

২নং চিত্র।

হিসাব অনুযায়ী—মানুষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হবার সময় থেকে (অর্থাৎ প্রায় সাত হাজার বছর আগে থেকে) ৩০ বিলিয়ন লোক পৃথিবীতে বাস করেছে।

৩। বিশেষজ্ঞদের ধারণা—বাজি রেখে সব রকম খেলার মধ্যে পাশা-খেলাই
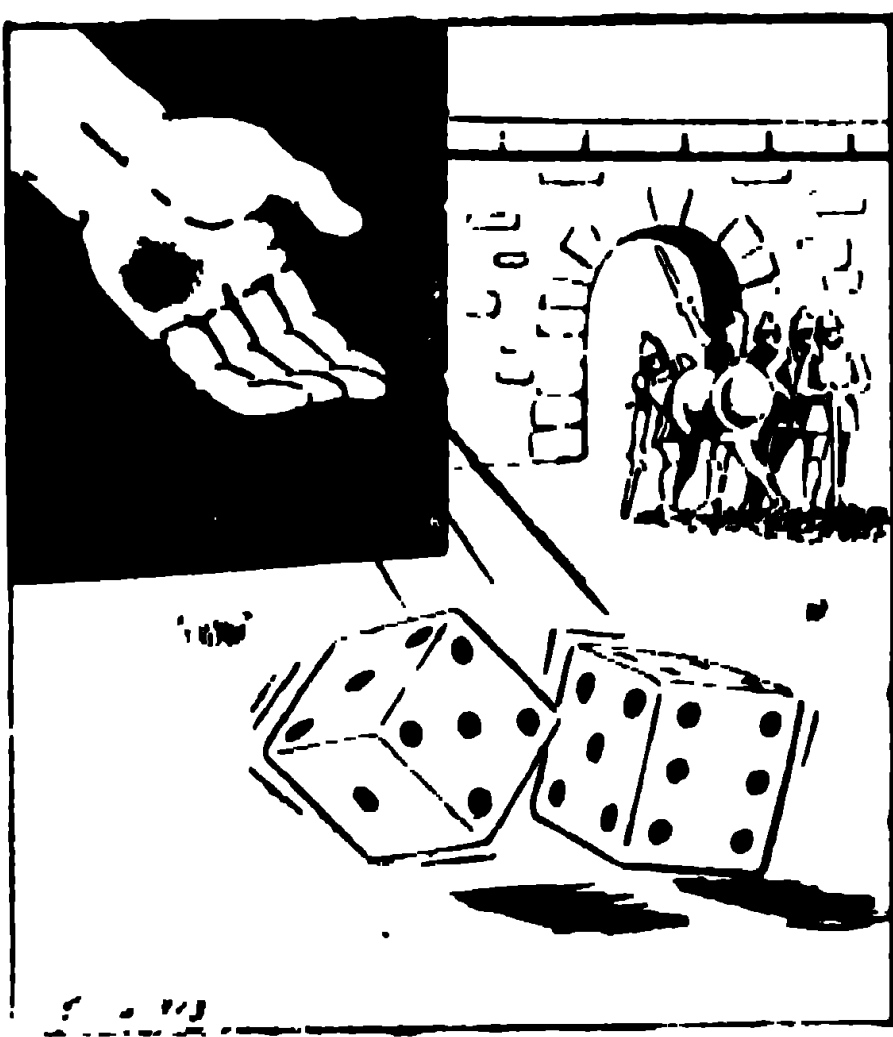
৩নং চিত্র।

বোধহয় সর্বাপেক্ষা পুরাতন। প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে পাশা খেলার প্রচলন ছিল। মহাভারতেও পাশা খেলার কথা পাওয়া যায়।

৪। প্রাগৈতিহাসিক যুগে যে সব সরীসৃপজাতীয় প্রাণী পৃথিবীতে বাস করতো, তারা ধরাপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই সব প্রাণীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহদাকৃতির ছিল ডাইনোসোর। এত বড় স্থলচর প্রাণী আর জন্মায় নি। দৈর্ঘ্যে এর

৪নং চিত্র।

পরিমাপ ছিল ৮০ ফুট। মাথার তুলনায় এদের শিরদাঁড়ায় মগজের অংশ ছিল বেশী। মেরুদণ্ডের এই মগজ পিছনের পা এবং লেজের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতো।

৫। আমাদের সমস্ত শক্তি পৃথিবীর থেকে আসে। বহুদূরে অবস্থিত সূর্য পরোক্ষভাবে আমাদের দিচ্ছে কয়লা এবং তেলের সঞ্চিত শক্তি—প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনী শক্তি।
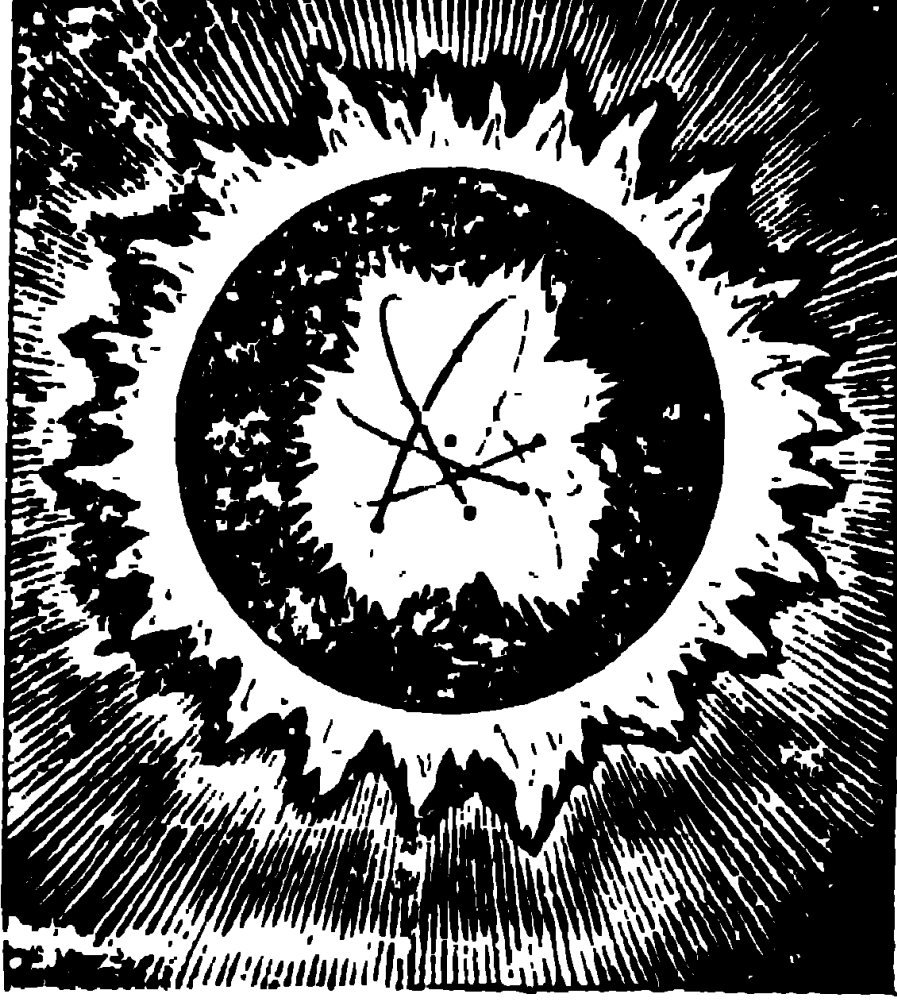
৫নং চিত্র।

বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন—সূর্যের এই অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর শক্তি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে আবদ্ধ। পরমাণুর এই বিপুল শক্তি মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে ব্যবহারের চেষ্টা চলছে।

৬। বিজ্ঞানীরা বলেন—মহাশূন্যযান ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইল বেগে চললে তার পক্ষে

৬নং চিত্র।

দশ ঘণ্টার মধ্যে চাঁদে পৌঁছান সম্ভব। এই গতিবেগে মহাশূন্যযান ৫৮ দিনে মঙ্গল ও ৪৩ দিনে শুক্রগ্রহে পৌঁছুতে পারবে।

৭। **পঞ্চাশ বছর আগেও—কয়লা থেকে যে ধোঁয়া উৎপন্ন হতো, তা মানুষের কোন কাজে লাগতো না** বরং তা অপকারই করতো। যে সব স্থানে ধোঁয়া উপরে ওঠবার বিশেষ ব্যবস্থা নেই, সেখানে ধোঁয়ার উৎপাত যে কি মারাত্মক, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই

৭নং চিত্র

জানে। শীতকালে ধোঁয়ার জন্যে টেকাই দায়। এই ধোঁয়াকে বিজ্ঞানীরা বর্তমানে মানুষের কাজে লাগিয়েছেন। ধোঁয়া থেকে তাঁরা কীটঘ্ন পদার্থ, কৃত্রিম রবার, রং, বার্ণিস, সুরভি, অ্যাসপিরিন এবং আরও অন্যান্য পদার্থ তৈরী করছেন।

৮। ঘড়িকে কম্পাস বলা চলে। একটা ঘড়ির মুখ (ডায়েল) উপরের দিকে রেখে—

৮নং চিত্র।

তার ঘণ্টার কাঁটাটি সূর্যের দিকে রাখলে ঘণ্টার কাঁটা এবং ১২টার মধ্যবর্তী পথ উত্তর গোলার্ধে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ দিক গোলার্ধে উত্তর দিক নির্দেশ করবে।

৯। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, মানুষ যে শব্দ ২০ ফুট দূর থেকে শুনতে পায় না -কুকুর ৮০ ফুট দূর থেকেও তা শুনতে পায়। মানুষের ঘ্রাণশক্তি কুকুরের ঘ্রাণশক্তির

৯নং চিত্র।

তুলনায় এতই কম যে, তা কল্পনা করা যায় না। এই পার্থক্যের তুলনা চলতে পারে—খুব কম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোকের কোন রং বোঝবার ক্ষমতার সঙ্গে।

১০। লবণ পৃথিবীর সাধারণ একটি খনিজ পদার্থ। কিন্তু বহু শতাব্দী যাবৎ লবণের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ। প্রাচীন যুগে অপরাধীকে লবণহীন খাদ্য দেওয়া হতো। এটাও এক ধরণের কঠিন শাস্তি ছিল। ইংরেজী Salary কথাটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ Salarium থেকে। Salarium মানে হলো 'লবণের টাকা'। রোমান সৈন্যদের লবণ

১০নং চিত্র।

কেনবার জন্যে এই ভাতা দেওয়া হতো। ইটালীর একটা রাস্তার নাম হলো Viasalaria, অর্থাৎ লবণের রাস্তা। ঐ রাস্তা দিয়ে প্রচুর লবণ আমদানী-রপ্তানী হতো। মধ্যযুগে

ইউরোপে সামাজিক পদমর্যাদা স্থির হতো লবণের মাপকাঠিতে। যিনি সামাজিক মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হতেন, তিনিই টেবিলে রক্ষিত লবণের উপরের দিকে বসতেন। প্রাচীন কালে একসঙ্গে বসে লবণ খেয়ে বন্ধুত্ব করা হতো। আমাদের সমাজেও লবণ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে; যেমন—নুন খাই যার গুণ গাই তার; 'নিমকহারাম, 'লবণ জ্ঞান নেই' ইত্যাদি। এথেকে বোঝা যায়, মানবসমাজের সঙ্গে লবণ কিরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাগর, মহাসাগর, হ্রদ এবং খনিতে লবণ পাওয়া যায়। এক সময় লবণের জন্যে যুদ্ধও হয়েছিল। এই যুদ্ধের ফলে নতুন রাস্তা এবং সহরেরও উৎপত্তি ঘটেছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যে এক সময়ে লবণকে টাকা হিসাবে গণ্য করা হতো।

বিবিধ

উত্তর ভারতে পঙ্গপালের আক্রমণ সম্ভাবনা

লণ্ডনের পঙ্গপালবিরোধী গবেষণা কেন্দ্র হইতে সম্প্রতি প্রচারিত এক রিপোর্টে পাকিস্তান এবং উত্তর ভারতের সিন্ধু, রাজস্থান এবং অন্যান্য প্রতিবেশী এলাকাগুলিতে পঙ্গপালের আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, কোন অলক্ষিত ঝাঁক এবং সেই সঙ্গে আফ্রিকা এবং এশিয়ায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপাল পরবর্তী তিনমাস কালে ইন্টার-ট্রপিক্যাল কনভারজেন্স জোন-এ (যেখানে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌশুমী বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক উত্তরমুখী বায়ুর সহিত আসিয়া মিলিত হয়) গিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে। সেই জন্য কেবল পাকিস্তান, ভারত এবং ইথিওপিয়ারই নয়, দক্ষিণ আরব, সুদান এবং উত্তর সোমালী উপদ্বীপেও পঙ্গপালের যাত্রাপথের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

কেরলে আন্তর্জাতিক আবহ-রকেট ঘাঁটি

জেনেভা হইতে এ. এফ. পি. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—ভারতের কেরল রাজ্যের থুম্বা নামক স্থানে একটি আন্তর্জাতিক আবহ-রকেট উৎক্ষেপণ ঘাঁটি স্থাপন করা সম্ভব কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠাইবার সিদ্ধান্ত ২৯শে মে গ্রহণ করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন "মহাশূন্যের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সংস্থার" বিজ্ঞান ও কারিগরী কমিটি। বিশেষজ্ঞ দলে বিভিন্ন দেশের পাঁচজন প্রতিনিধি থাকিবেন।

সমুদ্রের তলায় সঞ্চিত ধাতব দ্রব্য

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব মেরিন রিসোর্সেস-এর ডাঃ জন এল মেরো আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির ১৪৪তম বার্ষিক অধিবেশনে বলেছেন যে, নিকেল, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, তামা প্রভৃতি খনি থেকে সংগ্রহ করবার যে খরচ পড়ে, তার শতকরা ৫০ অথবা ৭৫ ভাগ খরচে এই সকল ধাতু সমুদ্রের তলা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। সমুদ্রের তলায় পিণ্ডাকারে প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল ধাতু সঞ্চিত রয়েছে এবং সৃষ্টি হচ্ছে।

কোন্ জায়গায় যে ঐ সকল ধাতব পিণ্ড সঞ্চিত রয়েছে, তা টেলিভিশন ক্যামেরার সাহায্যে জানা

যায় এবং যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সকল পিণ্ড উত্তোলন করা যেতে পারে।

ডাঃ মেরো এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সারা বছরে যে পরিমাণ নিকেল ব্যবহার করা হয়, তার শতকরা ৫০ ভাগ, কোবাল্টের শতকরা একুশ ভাগ এবং অন্যান্য ধাতব দ্রব্য একবার চেষ্টার ফলে সংগৃহীত হতে পারে। এই পর্যন্ত সমুদ্র সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয় নি বলেই এই সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টাও চলে নি।

অতি-আধুনিক পরীক্ষক

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' জানাইতেছেন, পরীক্ষকের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে।

দেখা গিয়াছে যে, পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে যে নম্বর দিতেন, "ইলেকট্রনিক পরীক্ষক"-ও অভ্রান্তভাবে সে নম্বরই দিয়াছে।

'টাস' আরও জানান, লেনিনগ্রাডের একটি টেক্‌নিক্যাল কলেজে পাইকারী হারে "ইলেকট্রনিক পরীক্ষক" উৎপাদন করা হইতেছে অতঃপর সেখানে "ইলেকট্রনিক পরীক্ষক যন্ত্র" ছাত্রদের পরীক্ষা লইবে।

আবহাওয়া-নির্ধারক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র 'নোম্যাড'

বঙ্গোপসাগরে আবহাওয়া-নির্ধারক একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র শীঘ্রই স্থাপিত হইতেছে। ইহা স্থাপিত হইবার পর ভারতীয় আবহবিদ্‌গণ প্রতি ছয় ঘণ্টা অন্তর এই যন্ত্রের মারফৎ জলবায়ুর গতি-প্রকৃতির পরিবর্তনের কথা জানিতে পারিবেন এবং তাঁহারা পূর্ব হইতে সতর্ক হইবার সুযোগ পাইবেন।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস সম্পর্কে সংবাদাদি এই যন্ত্রে ধরা পড়িবে এবং সেগুলি বেতারের মারফৎ উপকূলবর্তী আবহাওয়া অফিসসমূহে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে। আবহাওয়া অফিসের পক্ষে আবহবার্তা সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া তখন সহজ হইবে। ইহা ছাড়া কলিকাতা বন্দরে যে সকল জাহাজ প্রবেশ করিবে বা যেগুলি বন্দর ত্যাগ করিবে, তাহাদের সম্পর্কেও আবহবার্তা সংক্রান্ত বুলেটিন প্রকাশ করিবার সুবিধা হইবে। আগামী অক্টোবর-নবেম্বর মাসে এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কাজ চালু হইবে। বঙ্গোপসাগরে ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যা প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যন্ত্র স্থাপনে সহায়তা করিতেছেন।

এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির ওজন আট টন। যন্ত্রটি ভারতে ইতিমধ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে আটশত মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের কেন্দ্রস্থলে যন্ত্রটি স্থাপন করা হইবে।

এই যন্ত্রটির নাম 'নোম্যাড'। আবহ-বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, বঙ্গোপসাগরে ঝড় ও ঘূর্ণিবাত্যার উদ্ভব সম্পর্কে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটি পুরা দুই দিন আগে সতর্ক করিয়া দিতে পারিবে। এখন মার্কিন বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা ইহার কাজ চালু হইবে। শেষপর্যন্ত ভারত সরকার ইহার পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

মস্তিষ্ক ও যকৃতেই রক্তের তাপমাত্রা সর্বাধিক

উইস্‌কন্‌সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শারীর-বিজ্ঞানী জানিয়েছেন যে, দেহের সর্বাধিক তপ্ত রক্ত প্রবাহিত হয় মস্তিষ্ক ও লিভার বা যকৃৎ থেকে। একটি সূক্ষ্ম তাপ-সন্ধানী যন্ত্রের সাহায্যে এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই পর্যালোচনার ফলে আরও জানা গেছে যে, ফুস্‌ফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসবার সময় রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায় বা তাপমাত্রা নামতে থাকে বলে জনসাধারণের যে ধারণা আছে, তা সত্য নয়। তবে ফুস্‌ফুসের রক্তপ্রবাহী

নালিকার খুবই কাছে আসে বাইরের বাতাস, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু তাতেও ঐ রক্তের তাপমাত্রা হ্রাস পায় না

এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে, দেহের ফুস্‌ফুস ও যকৃতে সর্বাধিক রাসায়নিক রূপান্তর, অর্থাৎ মেটাবলিজম বা বিপাক-ক্রিয়া হয়ে থাকে। প্রাণশক্তিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে বা খাদ্যবস্তুর রূপান্তর সাধন করে শক্তি বা এনার্জি সংগ্রহে এবং পুরনো কোষসমূহকে বাতিল করে দিয়ে নতুন কোষ সৃষ্টিতে এই দুটি প্রত্যঙ্গ খুবই ব্যস্ত থাকে। এই অতিরিক্ত কাজের জন্যেই ঐ দুটি অঙ্গে তাপমাত্রা খুব বেশী থাকে।

যে কোন আবহাওয়ায় যে কোন গাছপালা জন্মাতে পারে না

যে কোন গাছপালা যে কোন আবহাওয়ায় জন্মাতে পারে না। যেমন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের কোন গাছপালা অতি ঠাণ্ডা জায়গায় জন্মাতে পারে না। ক্যালিফোর্ণিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ডাঃ জেম্‌স্‌ ক্লসন এর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, প্রতিটি বৃক্ষের বংশগতির মূলে যে ধরণের জার্ম-প্লাজম রয়েছে, তার উপরই তাদের এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য নির্ভর করে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের কোন কোন গাছ অতিরিক্ত শীতে মরে যায়, কিন্তু পাইন প্রভৃতি গাছ তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে গেলেও বেঁচে থাকে—এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে তিনি তা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, যে সব বস্তুর জন্যে বৃক্ষের সহনশীলতা থাকে, তা লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে হয়তো নষ্ট হয়ে যায়।

থলেতে রুটি এবং অন্য পণ্যদ্রব্যাদি ভর্তি করবার যন্ত্র

যে সব ব্যবসায়ী পাউরুটি বা এই জাতীয় পণ্যাদি থলেতে ভর্তি করে বাজারে বিক্রয় করেন, তাঁদের শ্রম লাঘবের জন্যে আমেরিকায় একটি যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে "ব্যাগ এ থন"।

এক সঙ্গে পর পর সাজানো কতকগুলি থলে যন্ত্রটির উপর একটি বারকোসে রাখা হয়। যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় থলের মুখ হাওয়াতে আপনা থেকেই খুলে যায় এবং যন্ত্রের চালক থলের ভিতরে পণ্য ভরে দেয়। একটি থলে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি থলের মুখ খুলে যায়। এই ভাবে এক মিনিটের মধ্যে ৩০টি পাউরুটি থলেতে ভর্তি করা যায়।

এক সঙ্গে এক হাজার পর্যন্ত থলে ভর্তি করবার জন্যে রাখা যায় এবং একাধিক পণ্যও ভর্তি করা যায়। নিউইয়র্ক লং-আয়ল্যাণ্ড সহরের ব্যাগ প্যাকেজিং মেশিনারী কোম্পানি এই যন্ত্রের নির্মাতা। যন্ত্রটির ওজন ৩০ পাউণ্ডের কাছাকাছি এবং হাতে করে বয়ে নেওয়া চলে।

মহাকাশ-যুগে গ্র্যাফাইটের গুরুত্ব

সাধারণ পেন্‌সিলে যে সকল কালো সীসা বা গ্র্যাফাইট ব্যবহৃত হয়ে থাকে, মহাকাশ-যুগে তাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই বেড়ে যাবে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রকেটের মুখে গ্র্যাফাইট ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, এই পদার্থটি মহাকাশে অতিরিক্ত তাপ সহ্য করতে পারে। অন্যান্য ধাতু ৪০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইটে গলে যায়। কিন্তু গ্র্যাফাইট ৪৭০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত তাপ সহ্য করতে পারে।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ | নবম সংখ্যা

রক্তের শ্রেণীবিভাগ

শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে, বেশী দিনের কথা নয় যখন সামান্য কারণেই চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে রোগীর দেহ থেকে রক্তপাতের বিধান ছিল। যক্ষ্মারোগ হয়েছে—মুখ দিয়ে রক্ত উঠছে, অতএব দেহে রক্তাধিক্য ঘটেছে। ডাক্তার বললেন—রোগীর শরীর থেকে কিছুটা রক্ত বের করে দিতে হবে। আজকাল অসুস্থ ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত বের করা তো হয়ই না, উপরন্তু রোগীর শিরায় রক্ত প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। আজ 'ব্লাড ট্র্যান্স-ফিউসন' কথাটা আমাদের অত্যন্ত পরিচিত, ততোধিক পরিচিত 'ব্লাড ব্যাঙ্ক' কথাটা—যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তির শরীর থেকে রক্ত নিয়ে জরুরী অবস্থায় রোগীর প্রয়োজনে ব্যবহার করবার জন্যে জমা রাখা হয়।

'ব্লাড ট্র্যান্সফিউসন' কথাটা আমাদের পরিচিত হলেও কাজটা কিন্তু খুব সহজ নয়। কোন দাতার শরীর থেকে রক্ত নেবার পর রোগীর দেহে সেই রক্ত প্রবেশ করাবার পূর্ব পর্যন্ত কতকগুলি পদ্ধতি পালন করতে হয়, যেগুলি পালন না করলে রোগীর উপকারের পরিবর্তে অপকার হবারই সম্ভাবনা—কারণ মানব সমাজের শ্রেণীবিভাগের মত রক্তেরও শ্রেণীবিভাগ আছে। রক্ত সমগোত্রীয় না হলে তা রোগীর দেহে প্রবেশ করালে বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। রক্তের এই শ্রেণীবিভাগই বর্তমান প্রসঙ্গের আলোচ্য বিষয়।

রক্তের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে কিছু বলবার পূর্বে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন। অ্যান্টিজেন হচ্ছে, যে কোন বহিরাগত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ, যা বাইরে থেকে ইন্‌জেকসন করে কোন প্রাণীর দেহে ঢুকিয়ে দিলে তার শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরী করে। এই অ্যান্টিবডিও

জাতে প্রোটিন—প্লাজমার গ্লোবিউলিন থেকে এর জন্ম। এই অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এই বিক্রিয়া শরীরের ভিতরেও হতে পারে অথবা শরীরের বাইরেও ঘটানো যেতে পারে। এই বিক্রিয়ায় কখনও উভয়ে মিলে থিতিয়ে যায়, কখনও বা চাপ চাপ জমাট বেঁধে যায়। এরূপ বিভিন্ন ধরণের বিক্রিয়া হতে পারে। অ্যান্টিজেন বিভিন্ন রকমের হতে পারে, কিন্তু তাকে প্রোটিন এবং শরীরের পক্ষে আগন্তুক হতে হবেই; যথা—যে কোন রোগ-জীবাণু, ডিমের অ্যালবুমিন বা অন্য প্রাণীর রক্ত কণিকা ইত্যাদি।

এই 'অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি' তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রক্তের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। ১৯০১ সালে ল্যাণ্ডস্টেইনার এবং ১৯০৭ সালে জেইনস্কি ও মস্ রক্তের শ্রেণীবিভাগ করেন। এর মধ্যে ল্যাণ্ডস্টেইনারের শ্রেণীবিভাগই সুবিধাজনক ও বহুজনস্বীকৃত। রক্তের শ্রেণীবিভাগ যে অ্যান্টিজেনকে ভিত্তি করে করা হয়েছে, তাকে বলা হয় আইসো-অ্যাগ্লুটিনোজেন। এটি থাকে রক্তের লোহিত কণিকার ভিতর। এর অনুরূপ অ্যান্টিবডিকে বলা হয় আইসো-অ্যাগ্লুটিনিন। এটা থাকে রক্তের প্লাজমার অংশে। এই অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির বিক্রিয়ার ফলে রক্ত-কণিকাগুলি দানা বেঁধে যায়। একে বলা হয় আইসো-অ্যাগ্লুটিনেশন এবং তারপরে ভেঙে যেতে থাকে, অর্থাৎ হিমোলিসিস হয়। মানুষের রক্তে A এবং B দু-রকম আইসো-অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে। এদের অনুরূপ অ্যান্টিবডি হচ্ছে অ্যান্টি-A বা α এবং অ্যান্টি-B বা β। দেখা গেছে, যে কোন লোকের রক্তে যে আইসো-অ্যাগ্লুটিনোজেন থাকে, তার প্লাজমায় তার অনুরূপ অ্যান্টিবডি থাকে না—তা যদি থাকতো তবে বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো।

লোহিত কণিকায় এই A ও B অ্যান্টিজেনের (সংক্ষিপ্ততার জন্যে এখন থেকে আইসো-অ্যাগ্লুটিনোজেনকে অ্যান্টিজেন এবং আইসো-অ্যাগ্লুটিনিনকে অ্যান্টিবডি বলবো)। অস্তিত্ব অনুযায়ী মানুষের রক্তকে A, B, AB এবং O গ্রুপ—এই চার ভাগে করা হয়েছে।

A গ্রুপের লোহিত কণিকায় থাকে A অ্যান্টিজেন এবং প্লাজমায় থাকে β অ্যান্টিবডি। B গ্রুপের লোহিত কণিকায় থাকে B অ্যান্টিজেন, আর প্লাজমায় থাকে α অ্যান্টিবডি।

AB গ্রুপের লোহিত কণিকায় থাকে A ও B উভয় অ্যান্টিজেন। প্লাজমায় কোন অ্যান্টিবডি থাকে না। O গ্রুপের লোহিত কণিকায় কোন অ্যান্টিজেন থাকে না, প্লাজমায় α ও β দুটি অ্যান্টিবডিই থাকে।

সংক্ষেপে নীচের তালিকার সাহায্যে রক্তের বিভাগ খুব সহজেই বোঝা যাবে।

	লোহিত কণিকায়	প্লাজমায়
গ্রুপ	Iso-agglutinogen	Iso-agglutinin
A	A	β
B	B	α
AB	AB	—
O	—	$\alpha\beta$

১৯০১ সালে ল্যাণ্ডস্টেইনার ABO সিস্টেমে এই চারটি বিভাগ করেন। তারপর দেখা যায় যে, A অ্যান্টিজেনের আবার দুটি অংশ আছে—A_1 A_2। তাহলে মোট গ্রুপের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ছয়টি —A_1, A_2, A_1B, A_2B, B এবং O; কিন্তু সহজে বোঝবার জন্যে আমরা মূল চারটি বিভাগ নিয়েই আলোচনা করবো।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—ব্লাড ট্র্যান্সফিউসন করতে গেলে দাতা ও গ্রহীতার রক্তে দু-রকম বিক্রিয়া ঘটতে পারে। প্রথমটি হতে পারে—দাতার রক্তের লোহিত কণিকার সঙ্গে গ্রহীতার রক্তের প্লাজমার; অপরটি হতে পারে দাতার প্লাজমার সঙ্গে গ্রহীতার লোহিত কণিকার। তবে দাতার রক্তের প্লাজমা গ্রহীতার রক্তে মিশে

এতটা পরিমাণে হাল্কা (diluted) হয়ে যায় যে, দাতার প্লাজমার সঙ্গে গ্রহীতার রক্ত-কণিকার বিক্রিয়া ঘটা সম্ভব নয়। কাজেই ব্লাড ট্রান্স-ফিউসন করতে গেলে বিশেষভাবে দাতার লোহিত কণিকার সঙ্গে গ্রহীতার প্লাজমার সম্ভাব্য বিক্রিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। কেন না, দাতার লোহিত কণিকা জমাট বেঁধে গ্রহীতার রক্তস্রোতে 'এম্বলিজম' ইত্যাদি উপসর্গের সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের রক্তের লোহিত কণিকা ও প্লাজমার সম্ভাব্য বিক্রিয়া এখানে দেওয়া হলো।

এই চার্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, A গ্রুপের কোন লোক তার নিজের গ্রুপের এবং O গ্রুপের লোকের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারবে। B গ্রুপের কোন লোকের দেহে সেই গ্রুপের বা O গ্রুপের রক্ত দেওয়া যাবে। AB গ্রুপ যে কোন গ্রুপের কাছ থেকে রক্ত নিতে পারবে। আর O গ্রুপের রক্তে কেবল মাত্র O গ্রুপ ছাড়া অন্য রক্ত দেওয়াই যাবে না। তবে দাতা হিসেবে O গ্রুপ আদর্শ—যে কোন গ্রুপকেই সে রক্ত দিতে পারবে। এজন্যেই তাকে বলা হয় সার্বজনীন দাতা (Universal donor)। অপর পক্ষে AB গ্রুপ দেবার বেলায় নিজের গ্রুপ ছাড়া কাউকেই দেওয়া চলবে না। কিন্তু নেবার বেলায় সকলের কাছ থেকেই নিতে পারবে (Universal recipient)। তাহলে সংক্ষেপে বলতে গেলে—যে কোন গ্রুপের রক্তে সেই গ্রুপের রক্ত দেওয়া যাবেই। তাছাড়া কোন্ গ্রুপের রক্ত কোন্ গ্রুপে দেওয়া যাবে বা যাবে না, ১নং চিত্রটি দেখলেই তা বোঝা যাবে।

O A B AB

⟶ = দেওয়া যাবে।
⟶ (॥) = দেওয়া যাবে না।
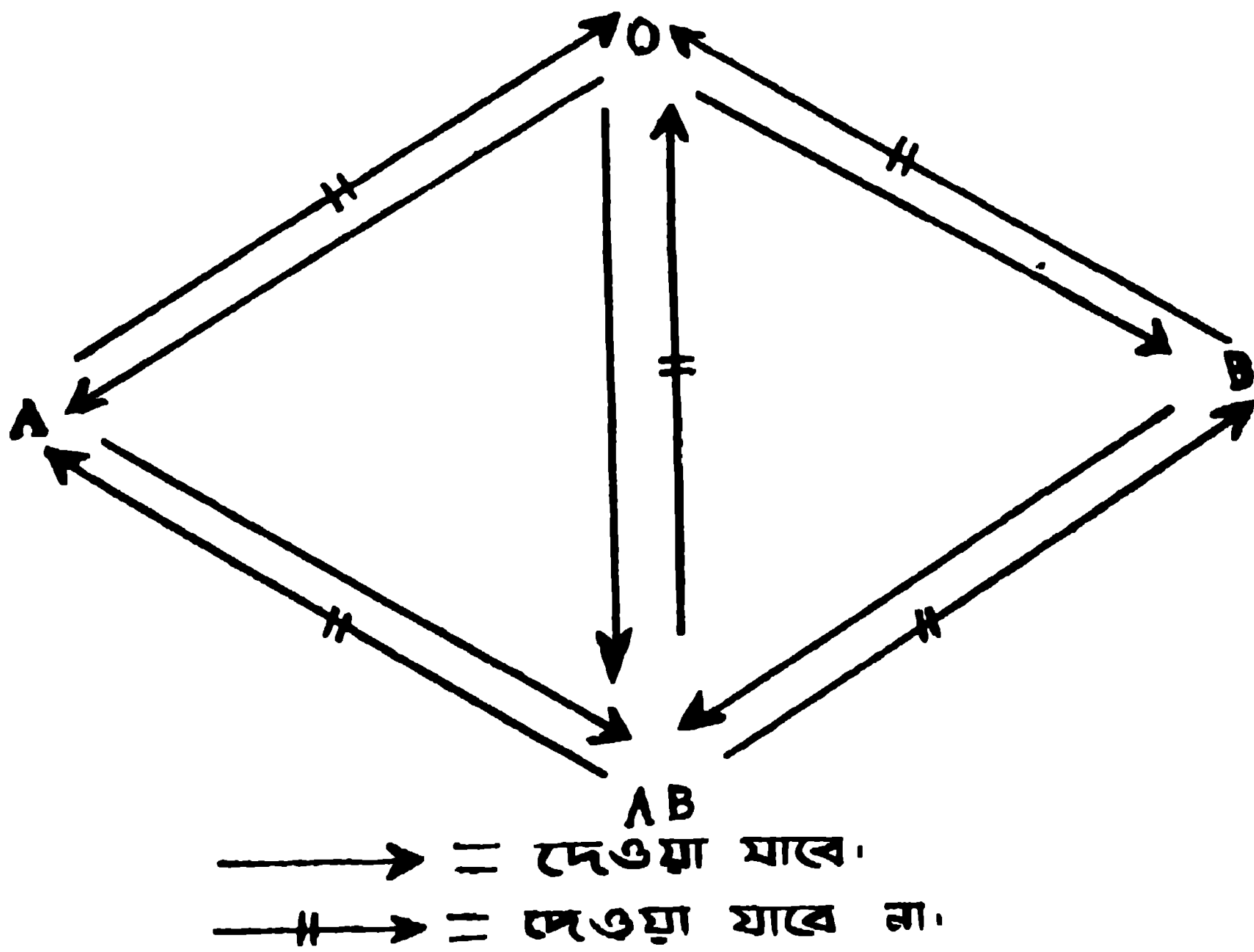
১নং চিত্র

দাতার লোহিত কণিকা (Iso-agglutinogen)	গ্রহীতার প্লাজমা (Iso-agglutinin) β (গ্রুপ A)	α (গ্রুপ B)	O (গ্রুপ AB)	αβ (গ্রুপ O)
A	−	+	−	+
B	+	−	−	+
AB	+	+	−	+
O	−	−	−	−

\+ = বিক্রিয়া ঘটবে (Agglutination)।
− = কোন বিক্রিয়া হবে না।

মনে করা যাক, একজন লোকের দেহ থেকে রক্ত নিয়ে একটি রোগীর দেহে দিতে হবে। আমরা কি করবো? প্রথমতঃ দু-জনেরই রক্ত নিলাম

এবং তারা কে কোন্ গ্রুপের, তা নির্ণয় করলাম। রক্তের বিভাগ আমরা বের করতে পারি স্লাইড বা টেষ্ট টিউবে করে। চারটি স্লাইড নেওয়া হলো। প্রত্যেকটির মাঝামাঝি একটা দাগ দিয়ে প্রত্যেকটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হলো। এখন সমস্ত স্লাইডগুলির এক অর্ধাংশে এক ফোঁটা অ্যান্টি-A বা α সিরাম এবং অপর অর্ধাংশে এক ফোঁটা করে অ্যান্টি-B বা β সিরাম নিলাম। তারপর যার রক্তের গ্রুপ জানতে হবে, তার রক্ত থেকে লোহিত কণিকা আলাদা করে স্যালাইন দ্রবণে মিশিয়ে দু-ফোঁটা করে প্রত্যেক ভাগে দেওয়া হলো। প্রত্যেকটা স্লাইড মিনিট দুয়েক একটু নাড়াচাড়া করে মিনিট কুড়ির জন্যে রেখে দেওয়া হলো। সাধারণতঃ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অ্যাগ্লুটিনেশন সুরু হয়ে যায়। নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রথমে খালি চোখে ও পরে অণুবীক্ষণে দেখা হলো—রক্তকণিকাগুলি দানা বেঁধেছে কি না। ফলাফল নির্ধারণ করা হলো নিম্নলিখিতভাবে—

অ্যান্টি-A সিরাম (α-isoagglutinin)	অ্যান্টি-B সিরাম (β-isoagglutinin)	গ্রুপ
+	–	A
–	+	B
+	+	AB
–	–	O

\+ = অ্যাগ্লুটিনেশন হয়েছে।

– = বিক্রিয়া হয় নি।

অনুরূপভাবে রক্তের শ্রেণীবিভাগ টেষ্ট টিউবে করেও নির্ধারণ করা যায় এবং এই টেষ্ট টিউব পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত বেশী নির্ভরযোগ্য। এভাবে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হলো। যদি দু'জনের গ্রুপ এমন হয় যে, একের রক্ত অন্যের দেহে দেওয়া যেতে পারে, তাহলেও কিন্তু সরাসরি রক্ত প্রদান করা হয় না। আগে দাতা ও গ্রহীতার রক্ত সরাসরি ক্রস-ম্যাচ (Cross-match) করানো হয়। দুজনের রক্ত নিয়ে তা থেকে কণিকা ও প্লাজমা আলাদা করা হয়। তারপর দাতার কণিকা ও গ্রহীতার প্লাজমা মিশিয়ে দেখা দরকার, কোন বিক্রিয়া হচ্ছে কি না। যদি না হয়, তাহলেই এই দাতার রক্ত গ্রহীতাকে দেওয়া যাবে।

মানুষের রক্তের এই যে শ্রেণীবিভাগ, এটা জন্মসূত্রে লাভ করা একটি বৈশিষ্ট্য (Mendelian Dominant)। আগে মনে করা হতো—রক্তের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে ক্রোমোসোমে A ও B জিনের অস্তিত্বের উপর এবং O গ্রুপ মানে, ক্রোমোসোমে A ও B উভয় জিনেরই অনুপস্থিতি। কিন্তু আজকাল বার্ণষ্টেনের মতবাদই সর্বজনসম্মত। এতে বলা হয়েছে যে, A, B এবং O—এই তিনটি জিনের দ্বারা রক্তের গ্রুপ নির্ণীত হয়। এখন জানা গেছে—মানব-কোষের ২৪ জোড়া ক্রোমোসোমের মধ্যে প্রত্যেক জোড়ার একটি সে লাভ করে পিতার কাছ থেকে, অন্যটি মাতার কাছ থেকে। প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমে থাকে ABO-এর একটি জিন। যেমন—পিতা যদি A গ্রুপের হয় এবং মা হয় B গ্রুপের, তাহলে পিতার কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমোসোমে থাকবে A জিন এবং মাতার কাছ থেকে পাওয়া ক্রোমোসোমে থাকবে B জিন। ক্রোমোসোমে যে জিন থাকবে, রক্তে তদনুরূপ অ্যান্টিজেন তৈরী হবে, অর্থাৎ তাহলে সন্তান হবে A B গ্রুপের। ABO—এই তিনটি জিন থেকে সম্ভাব্য যে সব জেনেটিক গঠন আমরা পেতে পারি, তা হলো—AA, AO, AB, BB, BO এবং OO। এর মধ্যে AA ও AO-কে A গ্রুপ, BO ও BB-কে B গ্রুপ, AB-কে AB গ্রুপ এবং OO-কে O গ্রুপ ধরা হয়।

M, N এবং P অ্যান্টিজেন—১৯২৭ সালে ল্যাণ্ডষ্টেইনারই আবার আবিষ্কার করেন যে, লোহিত কণিকায় আরও দু-রকম অ্যান্টিজেন আছে—M এবং N। তদনুযায়ী তিন রকম শ্রেণী-

বিভাগ পাওয়া গেল—M, N এবং MN; কিন্তু মানুষের রক্তে এদের অনুরূপ অ্যান্টিবডি থাকে না, আর অ্যান্টিজেন হিসেবে এরা দুর্বল, অর্থাৎ শরীরে ঢুকিয়ে দিলে অ্যান্টিবডি তৈরী করতে পারে না।

তারপর জানা গেল—P অ্যান্টিজেনের অস্তিত্ব; কিন্তু এরও অনুরূপ অ্যান্টিবডি, অর্থাৎ অ্যান্টি-P অ্যান্টিবডি রক্তে থাকে না। অতএব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দিক থেকে M, N ও P সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নেই।

রিসাস্ অ্যান্টিজেন (Rhesus factor)—১৯৪০ সালে ল্যাণ্ডস্টেইনারই এই অ্যান্টিজেনটির সন্ধান পান। এই রিসাস অ্যান্টিজেনটিও রক্তের লোহিত কণিকায় থাকে, তবে এর অনুরূপ কোন অ্যান্টিবডি সাধারণতঃ মানুষের রক্তে থাকে না। তবে যেহেতু এটা একটা অ্যান্টিজেন, সেহেতু যদি কোন লোকের রক্তে, যাতে রিসাস অ্যান্টিজেন নেই, সেটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তার রক্তে এর বিরোধী অ্যান্টিবডি তৈরী হবে। ইউরোপীয়দের মধ্যে দেখা গেছে, শতকরা ৮৫ জন রিসাস-পজিটিভ, অর্থাৎ তাদের রক্তে রিসাস অ্যান্টিজেন আছে; আর শতকরা ১৫ জন রিসাস-নিগেটিভ। ভারতবর্ষে শতকরা ৯০ জন রিসাস-পজিটিভ, আর ১০ জন রিসাস-নিগেটিভ। এখন ABO শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী দুজন লোক একই গ্রুপের হতে পারে, তবু তাদের একজন রিসাস-পজিটিভ এবং অন্যজন রিসাস-নিগেটিভ হতে পারে। মনে করা যাক, একজন লোকের দেহে রক্ত দিতে হবে এবং তার গ্রুপ B। যেহেতু ABO বিভাগে একই গ্রুপের দাতার রক্ত তাকে দেওয়া যায়, সেহেতু তাকে একজন B গ্রুপের দাতার রক্ত দেওয়া হলো। লক্ষ্য করা হলো না যে, দাতা রিসাস-পজিটিভ আর গ্রহীতা রিসাস-নিগেটিভ। যাহোক, প্রথমবার কোন অঘটন ঘটলো না। রক্তের ভিতর রিসাস অ্যান্টিজেন নিজের অ্যান্টিবডি তৈরী করতে লাগলো। তারপর আবার হয়তো সেই রোগীর রক্তের প্রয়োজন ঘটলো। এবারও তাকে সেই একই দাতার রক্ত দেওয়া হলো। এবার আর রোগী নিষ্কৃতি পেল না। তার রক্তের রিসাস অ্যান্টিবডি দাতার কণিকার রিসাস-অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালো।

এই রিসাস-অ্যান্টিজেন নিয়ে মাঝে মাঝে আর একটা গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। মনে করা যাক, পিতামাতার মধ্যে পিতা রিসাস-পজিটিভ এবং মাতা নিগেটিভ। মাতা অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভস্থ সন্তান হলো রিসাস-পজিটিভ। গর্ভস্থ সন্তানের রক্তের লোহিত কণিকা প্লাসেণ্টা দিয়ে মাতৃরক্তে প্রবেশ করলো। ফলে মাতার রক্তে রিসাস-অ্যান্টিবডি তৈরী হলো। সেই অ্যান্টিবডি আবার সন্তানের রক্তে ফিরে এলো। ফলে সন্তানের রক্তে রিসাস-অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়া ঘটলো। এর ফলে মৃত সন্তান প্রসব হতে পারে অথবা জন্মের পরেই সন্তানের হাইড্রপস্ ফিটালিস (Hydrops foetalis) বা পেঁচোয় পাওয়া ইত্যাদি সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে যে জাতিতে রিসাস-নেগেটিভের সংখ্যা খুব কম, স্বাভাবিক কারণেই তাদের মধ্যে এই সব অঘটনের সংখ্যা খুব কম।

কয়লার কথা

আব্দুল হক খন্দকার

বিশ্বপ্রকৃতি নানা বিচিত্র রঙের লীলা-প্রাঙ্গন সাতরঙা রামধনুর বর্ণসমষ্টি কত নয়নাভিরাম! সকাল ও সন্ধ্যার মেঘমালায় ক্ষণে ক্ষণে কত রঙের সমাবেশ ঘটে, পাতায় ও ফুলে কত বিচিত্র বর্ণ বিকশিত হয়—কিন্তু নিকষকালো আলকাত্‌রা থেকে বিজ্ঞানীরা শুধু যে প্রকৃতির এমনি বহুবিধ বিচিত্র রং প্রস্তুত করেছেন তা নয়, প্রকৃতিতে যে সব রঙের আভাস মাত্র নেই, সে সবও এই কালো কুৎসিত পদার্থ থেকে বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন! আর শুধু কি রং? এই দুর্গন্ধযুক্ত আলকাত্‌রা থেকেই বিজ্ঞানীরা তৈরী করেছেন কত জাতের সুগন্ধি, যা প্রকৃতির সেরা পুষ্প-সুরভিকেও হার মানায়। আবার এই তিক্ত ও বিষাক্ত পদার্থ থেকেই তৈরী হয় সবচেয়ে অধিক মিষ্টদ্রব্য "এন্‌প্রোপোক্সি", যার মিষ্টত্ব প্রকৃতিজাত চিনি বা মধুর চেয়েও চার হাজার গুণ বেশী। তাছাড়া নানা জাতের বিস্ফোরক, আলোকচিত্র গ্রহণের বিভিন্ন দ্রব্য, ব্যাধি ও অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার ঔষধ এই কালো কুৎসিত আলকাত্‌রা থেকেই আজকাল তৈরী হয়। ধরতে গেলে আলকাত্‌রা যেন বিজ্ঞান-জগতের এক বিচিত্র কামধেনু—মানুষের প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই যেন বিজ্ঞানীরা ইচ্ছা করলে এথেকে তৈরী করতে পারেন।

অবশ্য বিজ্ঞানীদের এই বিরাট সাফল্য খুব বেশী দিনের কথা নয়। কালো কয়লা যে অনন্ত রত্নের আকর, সে কথা উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের তেমন জানা ছিল না। কয়লাকে শুধু মাত্র জ্বালানী কিম্বা কোক্ হিসাবেই ধাতু নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহার করা হতো। তখনকার দিনে উন্মুক্ত প্রান্তরে কয়লা জ্বালিয়ে কোক্ তৈরী করায় কত মূল্যবান দ্রব্য যে বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে যেত, কত অমূল্য সম্পদ যে এমনিভাবে মানুষ নিজেদের অজ্ঞতায় নষ্ট করতো, তা ভাবলে আপশোষ করতে হয়।

যাহোক, বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় কালো কয়লার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেতে থাকে অনেকটা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে। ইয়র্কসায়ারের রেভারেণ্ড জন ক্লেটন কয়লাকে বদ্ধপাত্রে উত্তপ্ত করে একপ্রকার কালো তেল ও জ্বালানী গ্যাস তৈরী করেন, কিন্তু তাকে কোন ব্যবহারিক কাজে লাগাবার সন্ধান তিনি দিতে পারেন নি। তারপর ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম মারডক নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার কয়লা থেকে গ্যাস তৈরী করে তাই দিয়ে অন্ধকারে পথ চলবার এক প্রকার টর্চবাতি তৈরী করেন এবং পরে তিনি ছোটখাটো একটি গ্যাস তৈরীর কল তৈরী করে তাঁর বসত বাড়ীটি আলোকিত করতে সক্ষম্ হন। মারডকের এই প্রচেষ্টা ও সাফল্য লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিছু-দিনের মধ্যেই তিনি এক সুতাকলের কারখানা সম্পূর্ণ গ্যাসের আলোয় আলোকিত করবার ভার পান। ১৮০৭ সালে লণ্ডন সহরের কিছু অংশ যখন গ্যাসের আলোতে আলোকিত করে সুফল পাওয়া গেল, তখন প্রচুর পরিমাণে এই গ্যাস তৈরী করবার জন্যে ১৮১০ সালে লণ্ডনে সর্বপ্রথম একটি গ্যাস কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হলো। তারপর ক্রমেই প্রয়োজনের তাগিদে আয়োজনও বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং অচিরেই নিত্য নতুন গ্যাস

তৈরীর কারখানা নানা জায়গায় স্থাপিত হতে লাগলো।

গ্যাসের বাতি সেদিনের লোকের কাছে ছিল এক বিস্ময়কর বস্তু। কেন না, সেকালে আলোর জন্যে যে কেরোসিন বা মোম বাতির প্রচলন ছিল, তার ঔজ্জ্বল্য ছিল অনেক কম; আর সবচেয়ে যা আকর্ষণীয় ছিল তা হলো এই যে, গ্যাস বাতিতে কোন সল্‌তে ব্যবহারের বালাই ছিল না তবুও নতুন কিছুর প্রতি মানুষের যে সংস্কারগত বিরূপ মনোভাব দেখা যায়, তার প্রকাশ এক্ষেত্রেও প্রথমটায় দেখা দিয়েছিল। কেউ কেউ তাই অভিযোগ করেন—এই গ্যাস বাতাসকে বিষাক্ত করবে। কেউ কেউ বিস্ফোরণ ঘটবার বা ঘরবাড়ী পোড়বার আশঙ্কায় গ্যাস বাতির প্রচলন বন্ধ করবার জন্যে পার্লামেন্টে লড়াই করেন। অবশ্য তার কারণও যে একেবারে ছিল না, তা নয়। সেকালের যন্ত্রপাতি তেমন উন্নত ধরণের ছিল না বলে দু'একটা ছোট-খাটো অঘটন প্রথম দিকে ঘটেছিল। কিন্তু মানুষ একদিকে যেমন সহজাত সংস্কারের বশীভূত, অন্যদিকে তেমনি আবার সুবিধাবাদী। কাজেই উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ও পরিবাহী নলের সাহায্যে যখন সস্তায় উজ্জ্বলতর আলো পাওয়ার সুযোগ ঘটলো, তখন উৎসাহভরে তাকে বরণ করে নিতে কারুর আর তেমন দ্বিধাদ্বন্দ্ব রইলো না।

কিন্তু চিরদিন কারোর সমান যায় না। বিজলী বাতির আবির্ভাবে গ্যাস কোম্পানীগুলির দুর্দিনও ঘনিয়ে আসলো। কিন্তু পর পর কয়েকটি আকস্মিক ঘটনা একদিকে যেমন গ্যাস কোম্পানীগুলিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল, অন্যদিকে তেমনি আবার কালো কয়লার অনন্ত রত্নরাজির সন্ধানের দিক উদ্‌ঘাটিত করলো। গ্যাস তৈরীর কারখানাগুলি এতে শুধু যে বেঁচে উঠলো তা নয়, এই গ্যাস তৈরীর সূত্রে প্রাপ্ত অ্যামোনিয়া ও আলকাত্‌রা থেকে নানাবিধ দ্রব্যাদি তৈরী করবার প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে নানা দিকে নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে লাগলো।

বিজলী বাতি যখন গ্যাস বাতির ঔজ্জ্বল্যকে নিষ্প্রভ করে দিয়ে তার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো, তখন বুন্‌সেন নামে এক বিজ্ঞানী গ্যাসকে জ্বালানীর কাজে ব্যবহার করবার জন্যে এক রকম বার্নার আবিষ্কার করেন। এতে গ্যাসের প্রয়োজনীতার আর একদিক উন্মুক্ত হলো। অন্য-দিকে আবার ওয়েল্‌স্ ব্যাক নামে এক বিজ্ঞানী গ্যাসের সাহায্যে বিজলী বাতির সমকক্ষ উজ্জ্বল আলো উৎপাদনের একপ্রকার ম্যান্টেল তৈরী করেন। ওয়েল্‌স্ ব্যাকের এই ম্যান্টেল আবিষ্কার অবশ্য আকস্মিকভাবেই ঘটেছিল। বিরল মৃত্তিকা নিয়ে একদিন তিনি যখন গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন হঠাৎ খানিকটা উত্তপ্ত দ্রব্য পাত্র থেকে উপ্‌চে নীচর অ্যাসবেষ্টস বোর্ডে পড়ে বার্নারের শিখার সংস্পর্শে এসে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করে জ্বলতে লাগলো। এই আকস্মিক ঘটনা ওয়েল্‌স্ ব্যাকের গবেষণার ধারাকে একেবারে অন্যপথে চালিত করলো। তখন থেকেই তিনি গ্যাস ও বিরল মৃত্তিকার সাহায্যে উজ্জ্বলতর আলো তৈরী করবার চেষ্টা চালাতে লাগলেন। অবশ্য সফলতা তাঁর সহজে আসে নি। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের পর তিনি এক কার্যকরী ম্যান্টেল তৈরী করতে সক্ষম হন। যাহোক, এই আবিষ্কারের ফলে গ্যাস কোম্পানীগুলিকে আর পথে বসতে হলো না; কারণ তাপ ও আলোর যুগপৎ কাজে গ্যাসের ব্যবহার, গ্যাসের প্রয়োজন ও চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দিল। গ্যাস কোম্পানীগুলির দুর্দিন শুধু যে এমনিভাবে কেটে গেল, তা নয়—পরের দিকে নানা আবিক্রিয়ার ফলে দিন দিন তাদের সংখ্যা ও কলেবর ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

গ্যাস তৈরীর সূত্রে যে উপজাত দ্রব্য পাওয়া যেত, তার মধ্যে জ্বালানী হিসাবে ও

ধাতু নিষ্কাশনের কাজে কোকের চাহিদা ছিল। গ্যাস পরিস্রুত করবার আধার থেকে যে উপজাত দ্রব্যগুলি উদ্ধার করা হতো, তাথেকে কিছু পরিমাণ জমির সার ও ফেরোসায়ানাইড তৈরী হতো। কিন্তু সবচেয়ে বেশী পরিমাণে যে উপজাত দ্রব্য অ্যামোনিয়া ও আলকাত্‌রা প্রভৃতি পাওয়া যেত, তার কোন প্রয়োজনীয়তার কথা জানা ছিল না। সেগুলিকে সরিয়ে ফেলবার জন্যে কোম্পানীগুলির মাথাব্যথার অন্ত ছিল না। দুর্গন্ধ ও বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে বাতাসকে দূষিত করা ছাড়াও সেগুলি জমির ফসল নষ্ট করতো বলে আস্তানার কাছাকাছি ফেলবার উপায় ছিল না। জল কলুষিত করা ছাড়াও মাছ বা অন্যান্য জলচর প্রাণীকে ধ্বংস করে বলে নদী-নালাতেও সেগুলি ফেলা নিষিদ্ধ ছিল। অগত্যা সেগুলিকে ব্যারেলে বোঝাই করে সুদূর সমুদ্রে ফেলে আসতে হতো। কিন্তু সে পরিস্থিতিরও একদিন পরিবর্তন ঘটলো। বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় এই অকেজো পদার্থ থেকে নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য তৈরী করবার পথ প্রশস্ত হলো—আর সেই সূত্রে গ্যাস কোম্পানী-গুলির শুধু যে মাথাব্যথা দূর হলো—তা নয়, এই অকেজো পদার্থগুলিই তখন তাদের কাছে মূল্যবান সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে লাগলো।

অ্যামোনিয়া থেকে তৈরী হলো জমির সার—অ্যামোনিয়াম সালফেট, রুটি তৈরীর জন্যে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট এবং গন্ধদ্রব্য, বিস্ফোরক প্রভৃতি প্রস্তুতির জন্যে নাইট্রিক অ্যাসিড। অন্য দিকে আবার আলকাত্‌রা থেকে নানাবিধ শিল্প-দ্রব্যাদি প্রস্তুতের পথ উন্মুক্ত করলেন যুবক বিজ্ঞানী ম্যান্‌স্‌ফিল্ড।

আলকাত্‌রাকে উত্তপ্ত করলে কোলটার ন্যাপথা নামক একপ্রকার জ্বালানী তেল পাওয়া যেত। ম্যান্‌স্‌ফিল্ড এই ন্যাপথা নিয়ে কাজ সুরু করেন এবং গভীর অধ্যবসায়ে তাথেকে বেন্‌জিন, কারবলিক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন, অ্যানথ্রাসিন প্রভৃতি পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন। বিবিধ শিল্পে এসব দ্রব্য ব্যবহারের কথা চিন্তা করে তিনি সেগুলিকে তৈরি করবার জন্যে ছোটখাটো একটি কারখানা স্থাপন করেন। জিনিষগুলি তৈরীর কাজ সুষ্ঠুভাবেই চলছিল; কিন্তু একদিন দেখা গেল, পাত্রের তরল দ্রব্যগুলি যেন খুব বেশী টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। ম্যান্‌স্‌ফিল্ড তাই তাপ কমাবার জন্যে ঘরের মধ্যে ছুটে গেলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যাওয়ার আগেই সেই ফুটন্ত তেল পাত্র থেকে উপ্‌চে ঘরের মেঝেতে পড়তে লাগলো। বিপদ সত্ত্বেও ম্যান্‌স্‌ফিল্ড কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে না এসে নানাভাবে তাপ কমাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। পরিশেষে যা ঘটবার তাই ঘটলো—সহসা মেঝের উপর ছড়ানো তেলে আগুন ধরে গেল, আর সেই আগুন চারদিক থেকে মানস্‌ফিল্ডকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। লোকজন ছুটে এসে কোন প্রকারে তাঁকে উদ্ধার করলো বটে, কিন্তু তাঁকে আর বাঁচানো গেল না—হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হলো। আলকাত্‌রা শিল্পের গোড়াপত্তনে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী ও অত্যুৎসাহী যুবকের অকাল মৃত্যু হলো। কিন্তু মৃত্যুকে বরণ করে যে পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেলেন, সেই পথে অনেক বিজ্ঞানীর কর্মপ্রচেষ্টা অতি শীঘ্রই মিলিত হলো এবং তাঁদের কর্মোৎসাহে অচিরেই নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের বিরাট আয়োজন এক আলকাত্‌রাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো।

যাহোক, যুবক ম্যান্‌স্‌ফিল্ডের উদ্দীপনা যে কিশোর চিত্তকে সবচেয়ে গভীরভাবে উদ্দীপিত ও আন্দোলিত করলো তাঁর নাম উইলিয়াম পার্কিন। রসায়ন শাস্ত্রের প্রতি তিনি প্রথম থেকেই এতটা আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, মাত্র ১৭ বছর বয়সেই প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী হফ্‌ম্যান তাঁকে গবেষণার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন। গবেষণার কাজে পার্কিনের এতটা উৎসাহ ছিল যে, অপরিপক্ক জ্ঞান নিয়েই তিনি অবসর সময়েও নিজ

বাড়ীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকতেন। ম্যালেরিয়ার ঔষধ ছিল তখন একমাত্র কুইনীন—আর তার দামও ছিল অত্যধিক। পার্কিন আলকাত্রা থেকে কিনান্থ্রিন পৃথক করে তা-থেকে কুইনীন প্রস্তুতের জন্যে মনস্থ করেন। সেদিন পার্কিনের পক্ষে এই অভিযান ছিল সত্যই বেপরোয়া! তখনকার দিনে কুইনীনের গঠন-প্রকৃতি জানা ছিল না, সংশ্লেষণ প্রথারও তেমন উন্নতি ঘটে নি যে, মাত্র সতেরো বছরের এক বালক বিজ্ঞানীর পক্ষে সে কঠিন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে! বিষয়টি যে কত দুরূহ তার গুরুত্ব এতেই উপলব্ধি করা যায় যে, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বহুল উন্নতি সাধিত হলেও মাত্র কয়েক বছর আগে একদল অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীর দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে এই কুইনীন তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু অদম্য উৎসাহে মানুষ অসম্ভবের বেড়াজালও ডিঙিয়ে যাবার প্রয়াসী হয়। তাই পার্কিন সেই বালক বয়সেই এমনি অসম্ভব কাজে হাত দিয়েছিলেন—কেন না, অজ্ঞতার চেয়ে তাঁর উদ্দীপনাই ছিল অত্যধিক।

যাহোক, ১৮৫৬ সালে পার্কিন নিজ বাড়ীতে—নিজের হাতে গড়া ছোট বীক্ষণাগারে বড় দিনের অবকাশে এই দুরূহ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এক দিন শেষ বেলা পর্যন্ত কাজ করেও আশানুরূপ কোন ফল পাওয়া গেল না। পার্কিন ক্লান্ত ও নৈরাশ্যে অবসন্ন। কিন্তু হঠাৎ কি খেয়ালে তিনি সমস্ত পাত্রের দ্রব্যগুলিকে একত্রে মেশালেন। কিন্তু কি আশ্চর্য—এক অপরূপ উজ্জ্বল বর্ণ ক্ষণিকের জন্যে উদ্ভাসিত হয়ে ক্ষণিকেই মিলিয়ে গেল। পরিশেষে পাত্রের তলদেশে পড়ে রইলো এক কালো রঙের কুশ্রী তলানী। অন্য কেউ হলে হয়তো এই কালো রঙের প্রতি তেমন আগ্রহশীল হতেন না—দূরেই নিক্ষেপ করতেন! কিন্তু পার্কিন ছিলেন অন্য ছাঁচে গড়া। তিনি তাই সেটিকে ফেলে না দিয়ে তার মধ্যে সেই ক্ষণিক দেখা বর্ণের সন্ধান করবার মনস্থ করলেন! উজ্জ্বল বর্ণের ক্ষণিক আভাস তাঁর দিনান্তের সমস্ত ক্লান্তি ঘুচিয়ে দিয়েছে—দেহ-মন তাঁর এখন উৎফুল্ল ও উজ্জীবিত। পরম উৎসাহে তিনি তাই আবার কাজ সুরু করলেন এবং এক সময়ে অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করতে গিয়ে সেই কালো তলানী থেকেই উদ্ধার করলেন এক অপরূপ রং—যার নাম হলো "মভ্"। এই মভ্ই হলো অ্যানিলিন—আলকাত্রা থেকে মানুষের তৈরী সর্বপ্রথম কৃত্রিম রং।

কৃত্রিম উপায়ে কুইনীন তৈরীর অসাধ্য সাধন করতে গিয়ে পার্কিন অজান্তে আবিষ্কার করলেন এক কৃত্রিম রং—কেন না, এই রং যে এমনিভাবে তৈরী হবে, তার কল্পনাও তিনি কোন দিন করতে পারেন নি। তাছাড়া আরও মজার কথা এই যে, সেই পরীক্ষায় তিনি যে অ্যানিলিন ব্যবহার করে-ছিলেন তাও বিশুদ্ধ ছিল না—তাঁর অজান্তে সেই অ্যানিলিনে টলুইডিন নামে একটি পদার্থ মিশ্রিত ছিল এবং এই টলুইডিন মিশ্রিত ছিল বলেই সে দিন এমনিভাবে সেই অপরূপ রংটির আবির্ভাব ঘটেছিল।

আজকাল অবশ্য কোন গবেষণা পার্কিনের মত এমন এলোমেলোভাবে পরিচালিত হয় না—আর তার সমর্থনও নেই। সম্ভাবনার দিক যেখানে পরিস্ফুট, সেখানেই মাত্র চেষ্টা চলে—তবু অসমর্থিত মত ও পথ কোন কোন ক্ষেত্রে যে কি বিরাট সাফল্য এনে দিতে পারে, পার্কিনের মভ্ আবিষ্কার তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পার্কিন যদি বিশুদ্ধ অ্যানিলিনে সে দিন কাজ সুরু করতেন, আর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সমস্ত দ্রব্যগুলিকে খেয়ালের বশে না মেশাতেন, তবে কৃত্রিম রঙের আকস্মিক আবিষ্কার সে দিন সম্ভব হতো না এবং আলকাত্রা যে কত বিচিত্র রঙের আধার, তা বিজ্ঞানীদের কাছে আরও কতকাল যে অজানা থাকতো, তা বলা যায় না।

যাহোক, এই যুগান্তকারী আবিষ্কার যখন হলো,

তখন পার্কিন ১৮ বছরের বালক মাত্র। তিনি প্রচুর পরিমাণে এই রং তৈরীর জন্যে কারখানা খোলবার মনস্থ করলেন। এদিকে পরীক্ষামূলক-ভাবে রং তৈরী করবার কারখানাগুলিতে কিছু রং পাঠিয়ে সন্তোষজনক ফলও পাওয়া গেল।

রঙের কারিগরেরা পার্কিনের কৃত্রিম রঙের প্রতি যথেষ্ট উৎসাহ দেখালো। কাজেই রঙের কারখানা স্থাপনের চিন্তা নিয়ে পার্কিন তখন দিবারাত্রি নানা জনের কাছে ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগলেন। অথচ এদিকে তাঁর তখন অভিজ্ঞতাই বা কতটুকু! ব্যবসায়-বুদ্ধি তো দূরের কথা— শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কি করে চলে, তার ধারণাও তাঁর ছিল না—এমন কি, রাসায়নিক কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তেমন চাক্ষুস পরিচয়ও ঘটে নি। তবুও তিনি বড় বড় শিল্পপতিদের কাছে ধন্না দিলেন। শেষ পর্যন্ত সরকারের কাছেও আবেদন করলেন—কিন্তু কোন কিছুতেই ফল হলো না— কেউই এই বালক বিজ্ঞানীর কথায় কর্ণপাত করলেন না। পার্কিন কিন্তু তবুও দমলেন না—শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর বাবা ও এক ভাইকে রাজী করিয়ে ছোটখাটো এক রঙের কারখানা খোলেন।

একাগ্র প্রচেষ্টা কখনও বিফলে যায় না— পার্কিনের উদ্যম ও পরিশ্রম সার্থক হলো—তিনি সেই রঙের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করলেন এবং বিজ্ঞানী হিসাবেও প্রভূত সম্মানের অধিকারী হলেন। পার্কিন ধনী হলেন বটে, কিন্তু উদ্যমশীল সেই বালক বিজ্ঞানীর দূরদৃষ্টি ও কথাকে আমল না দিয়ে ইংল্যাণ্ড সেদিন যে ভুল করেছিল, সে জন্যে তাদের পদ্ধতি যদিও ইংল্যাণ্ডেই পার্কিনের দ্বারা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল, তবুও রঙের ব্যবসায়ে একাধিপত্য বিস্তার করলো জার্মেনী। পার্কিনের শিক্ষক হফ্‌ম্যান তখন অবসর গ্রহণ করে তাঁর নিজ দেশ জার্মেনীতে ফিরে গেলেন এবং পার্কিনের গবেষণালব্ধ জ্ঞান তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। জার্মেনীর শিল্পপতিরা—এমন কি, সেখানকার সরকার পর্য্যন্ত হফ্‌ম্যানকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এলেন। তাই অচিরে আলকাত্‌রা থেকে নানা জাতের রং সেখানে আবিষ্কৃত হতে লাগলো, আর বৃটেন তার সংস্কার ও অদূরদর্শিতার ফলে সর্বপ্রথম কৃত্রিম রং আবিষ্কার ও প্রস্তুত করেও রং প্রস্তুতির প্রতিযোগিতায় নির্মমভাবে পরাজিত হলো!

যাহোক, পার্কিনের সাফল্যের কথা যখন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে গেল, তখন শত শত বিজ্ঞানী আলকাত্‌রা থেকে কৃত্রিম রং প্রস্তুতের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন। ফরাসী দেশের রেনার্ড ও ফেরানক বিখ্যাত ম্যাজেণ্টা রং চালু করলেন। তারপর চললো একাদিক্রমে নানারকম রঙের আবিষ্কার ও তার প্রচলন।

রাসায়নিক আবিষ্ক্রিয়া জাতি ও মানুষের জীবনে কতটা যে বিপ্লব ও বিপর্যয় ঘটাতে পারে, তার এক উজ্জ্বল নিদর্শন কৃত্রিম টার্কিরেড ও নীলের আবিষ্কার। মঁাদার গাছের শিকড় থেকে প্রাকৃতিক টার্কিরেড পাওয়া যেত এবং সে জন্যে ফরাসী দেশে এককালে প্রচুর পরিমাণে মঁাদার গাছের চাষ হতো। এজন্যে অন্ততঃ তিন কোটি টাকা বিদেশ থেকে ফরাসীদের ঘরে আসতো, কিন্তু কালে সব কিছুই একেবারে বদ্‌লে গেল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে দু'জন ফরাসী বিজ্ঞানী যদিও প্রমাণ করলেন যে, মঁাদার গাছের টার্কিরেড আসলে অ্যালিজারিন নামক এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ, তবু অ্যালিজারিনের গঠন-প্রকৃতি ও তা সস্তায় তৈরী করবার কোন পন্থা অনেককাল আবিষ্কৃত হলো না। কিন্তু প্রায় ৪০ বছর পর যখন প্রমাণিত হলো যে, অ্যালিজারিনের এক বিশিষ্ট অঙ্গ আলকাত্‌রার অ্যানথ্রাসিন, তখন কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন তৈরী করা নিয়ে পার্কিন ও জার্মান বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু হলো। মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে, ইংল্যাণ্ডে পার্কিন এবং জার্মেনীতে ক্যারো, গ্র্যাব এবং লিবারম্যান প্রায় একই সময়ে আলকত্‌রাজাত দ্রব্য থেকে অ্যালিজারিন

তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। আলকাত্‌রার অ্যানথ্রাসিন থেকে সস্তায় অ্যালিজারিন তৈরী হবার ফলে ফরাসী দেশের মঁাদার চাষের উপর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং সত্যিই ভোজবাজির মত একদিন যেন ফরাসী দেশের সমস্ত মঁাদার চাষ মিলিয়ে গেল। অবস্থা বিপর্যয় এমনি দাঁড়ালো, যে দেশ এককালে এই রঙের ছিল প্রধান উৎপাদক, সেই দেশকে তাদের লাল রঙের পোষাক তৈরীর রঙের জন্যে জার্মেনীর দ্বারস্থ হতে হলো।

ঠিক এমনি ধারার বিপত্তি একদিন ভারতীয় নীল চাষেও দেখা দিল। এককালে ভারত থেকে অন্ততঃ ৬ কোটি টাকার নীল বিদেশে রপ্তানী হতো, আর তার সেরা আমদানীকারক ছিল জার্মেনী। অ্যালিজারিনের সাফল্য আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকে কৃত্রিম নীল তৈরীর দিকে বিজ্ঞানীদের উদ্বুদ্ধ করলো। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী বায়ার যদিও আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকে কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরীর কয়েক প্রকার প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন কিন্তু তাতে অসম্ভব খরচ পড়ায় তাদের কাজে লাগানো গেল না। নীল তৈরী সহজ ও সুলভ দাঁড়ায় যদি অবশ্য সস্তায় প্রচুর পরিমাণে থ্যালিক অ্যাসিড তৈরী করা যায়, আর তার উৎস হয় আলকাত্‌রাজাত ন্যাপথালিন। তখনকার দিনে ন্যাপথালিনের বিশেষ ব্যবহার ছিল না এবং সে জন্যে তার তেমন দামও ছিল না—বরং যে সব কারখানায় উপজাত হিসাবে তা পাওয়া যেত, সে সব কারখানা থেকে তা সরিয়ে নিলে তার মালিকেরা খুসীই হতেন। ন্যাপথালিন থেকে নীল তৈরীর চেষ্টায় জার্মেনীর এক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠান তাই পরিশেষে এগিয়ে আসে এবং প্রচুর অর্থ-ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে বহু বিজ্ঞানীকে এই গবেষণার কাজে নিযুক্ত করে। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এ নিয়ে পুরাদমে কাজ চলে এবং সে জন্যে প্রায় ৩ কোটি টাকা খরচও হয়ে যায়, কিন্তু কোন উপায়ে ন্যাপথালিন থেকে তৈরী থ্যালিক অ্যাসিডের পরিমাণ বাড়ানো গেল না। এতদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে যখন সাফল্যের কোন নিশানা দেখা গেল না, তখন সে কাজে আরও অর্থব্যয় ক্রমেই কোম্পানীটির পক্ষে পীড়াদায়ক হয়ে উঠলো। অবস্থা যখন এরূপ তখন হঠাৎ আবার এক চমকপ্রদ আকস্মিক আবিষ্কার এতদিনের নৈরাশ্য ও বিফলতাকে একেবারে চরম সাফল্যের পথে এনে দিল। সেই গবেষণার কাজে লিপ্ত এক বিজ্ঞানী একদিন এক প্রক্রিয়ায় ন্যাপথালিন থেকে উদ্ভুত থ্যালিক আসিডের পরিমাণ লক্ষ্য করে অবাক হয়ে গেলেন—যদিও গবেষণার লক্ষ্য ছিল একমাত্র তাই। বিস্ময়ের কারণ অবশ্য এই যে, ইতিপূর্বে এই প্রক্রিয়ায় থ্যালিক অ্যাসিডের এত বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যায় নি! তাই আশাতীত সাফল্য দেখেও বিজ্ঞানী গভীর সমস্যায় পড়ে ভাবতে লাগলেন---কেমন করে এটা সম্ভব হলো? অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানের পর শেষ পর্যন্ত যা জানা গেল, তা খুবই কৌতুকাবহ! যে বালক ভৃত্যটিকে তিনি গত রাত্রে কোন পাত্রস্থিত দ্রব্যগুলিকে মাঝে মাঝে নেড়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন—সে যে একটি থার্মোমিটারের সাহায্যে তা সম্পন্ন করতে গিয়ে পাত্রের মধ্যেই সেটিকে ভেঙ্গে ফেলেছিল, তা কে জানতো! ভৃত্যের স্বীকারোক্তিতে তার অপকীর্তির কথা যখন জানা গেল, তখন এক বিরাট সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল। জানা গেল যে, ভাঙ্গা থার্মোমিটারের পারদই প্রক্রিয়াটিতে অনুঘটকের কাজ করে থ্যালিক অ্যাসিডের পরিমাণ এমনি আশাতীত-ভাবে বাড়িয়ে তুলেছে। ন্যাপথালিন থেকে তাই প্রচুর থ্যালিক অ্যাসিড, তথা কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুতের পন্থা শেষ পর্যন্ত জার্মেনীর এক কোম্পানীর এক বালক ভৃত্যের অসাবধানতায়—একটি থার্মোমিটার ভাঙবার অপকীর্তির সূত্রে আবিষ্কৃত হলো এবং প্রতিষ্ঠানটির অজস্র অর্থব্যয়কে এমনি আকস্মিক-ভাবে একদিন সার্থক করে তুললো। জার্মেনীর এই প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃতিজাত নীলের চেয়ে অনেক ➡

সস্তায় কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরী করতে লাগলো। এক কালে যে দেশ নিজে বাইরে থেকে নীল আমদানী করতো, সেই জার্মেনীই আবার সব দেশে নীল রপ্তানী সুরু করলো।

কুইনীনকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকে বিভিন্ন রকমের রং তৈরী হতে লাগলো, তেমনি আবার সে সব দ্রব্য থেকে বিভিন্ন রোগের ঔষধ প্রস্তুতও সুরু হলো। কুইনীনকে বিশ্লেষিত করে যখন আলকাত্‌রাজাত দ্রব্যের অন্যতম কুইনোলীন পাওয়া গেল, তখন বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন যে, কুইনোলীনের বিভিন্ন সংযোগজাত দ্রব্যও হয়তো কুইনীনের মত অনেকটা গুণসম্পন্ন হবে এবং তা কুইনীনের বদলে ম্যালেরিয়ার ঔষধ হিসাবে হয়তো উপযোগী হবে! বেষণায়ও তেমনি ফল পাওয়া গেল এবং থ্যালিন ও কেইরীন নামে দুটি মূল্যবান ঔষধ বাজারে চালু হলো। এর মধ্যে থ্যালিনকে আবার পীতজ্বরেও বেশ ফলপ্রসূ হতে দেখা গেল। ১৮৮৩ সালে ডাঃ নর্‌ কুইনীনের চেয়ে অনেক সস্তা অথচ উপকারী ঔষধ অ্যান্টিপাইরীন আবিষ্কার করেন এবং তার তিন বছর পরে আবার আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হলো মূল্যবান আর একটি জ্বরের ঔষধ—অ্যাসি-ট্যানিলাইড ঘটনাটি ঘটলো এক চর্মরোগীকে নিয়ে। ডাঃ ক্যান ও হেপ্‌-এর কাছে জ্বর নিয়ে এক চর্মরোগী চিকিৎসার জন্যে হাজির হলো। ডাক্তারদ্বয় সে রোগীকে ন্যাপথালিন খাইয়ে তার চর্মরোগের চিকিৎসা করবার সিদ্ধান্ত করেন। এক অ্যান্টিপাইরীন কারখানায় তাঁদের এক বন্ধু কাজ করতেন। তাঁর কাছেই তাঁরা এই পরীক্ষার জন্যে কিছু ন্যাপথালিন চেয়ে পাঠালেন। বন্ধুটি তাঁর এক কর্মচারীকে কিছু ন্যাপথালিন পাঠাতে বলে দিলেন। জিনিষ পেয়ে পরীক্ষা সুরু হলো, কিন্তু আসলে চর্মরোগের উপর এর কোন ক্রিয়া দেখা গেল না; তবে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল অন্ত-ভাবে—রোগীর যে জ্বর ছিল তা দ্রুত কমতে লাগলো। এদিকে ঔষধও প্রায় ফুরিয়ে এল। কাজেই বন্ধুটির কাছে আরও কিছু ন্যাপথালিনের জন্যে আবার তাঁদের অনুরোধ গেল—কিন্তু এবারে সেই বন্ধুটি নিজেই সে অনুরোধ পালন করলেন। আবার পরীক্ষা চললো, কিন্তু আশ্চর্য, রোগীর জ্বর এবার আর মোটেই কম্‌তির দিকে গেল না। চিকিৎসকদ্বয়ের কাছে ব্যাপারটি বেশ রহস্যজনক মনে হলো এবং সেই রহস্য উদ্ঘাটন করতে গিয়ে জানা গেল যে, বন্ধুটি ঠিক ঠিক ন্যাপথালিন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আগের বার তিনি যে বালক কর্মচারীটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে ভুলক্রমে ন্যাপথালিনের পরিবর্তে পাঠিয়েছিল অ্যাসি-ট্যানিলাইড। কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরীর মত এবারও তাই এক বালক ভৃত্যের অসাবধানতায় অ্যান্টিপাইরীন তৈরীর কারখানার মধ্য থেকে তারই প্রতিদ্বন্দ্বী জ্বরের ঔষধ অ্যাসিট্যানিলাইড আবিষ্কৃত হলো। অবশ্য যে সব ঔষধের উল্লেখ এই পর্যন্ত করা হলো, তা কিন্তু অনেক পরের আবিষ্কার। আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকে যে ঔষধটি সর্বপ্রথম তৈরী হয়, তা হলো—স্যালি-সাইলিক অ্যাসিড, যা বাত-বেদনার ঔষধ হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়।

নানাপ্রকার ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে একদিকে যেমন নানা ঔষধের আবিষ্কার হলো, তেমনি আবার আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকেই পিক্‌রিক অ্যাসিড, টি. এন. টি., লাইডাইট, মেলেনাইট প্রভৃতি শক্তিশালী বিস্ফোরক তৈরী করে ধ্বংসাত্মক কাজেও তা নিয়োজিত হতে লাগলো। রঞ্জক দ্রব্য, ঔষধ এবং বিস্ফোরক দ্রব্য ছাড়াও আলোকচিত্রের জন্যে প্রায় সকল রকম ফিল্ম ও ডেভেলাপার, কাঠ ও ধাতু দ্রব্যাদি রং করবার জন্যে বিভিন্ন রকমের বার্নিস, নানাপ্রকার প্লাষ্টিক, কৃত্রিম চাঁচ, হাড় ও অ্যাম্বার, বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রয়োজনীয় নানাবিধ সরঞ্জাম আজকাল

আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। কয়লা থেকে সম্পূর্ণ রাসায়নিক উপায়ে যত খুসী অ্যালকোহল ও পেট্রোল তৈরী করাও সম্ভব। আলকাত্‌রার পীচ রাস্তা-ঘাট নির্মাণের কাজে এবং ক্রিয়োজোট অয়েল রেল লাইনের স্লিপার, ঘরবাড়ীর খুঁটি, দীর্ঘস্থায়ী ও পচন থেকে রক্ষার কাজে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আলকাত্‌রার বেন্‌জিন রং তৈরীর কাজে লাগা ছাড়াও দ্রুত-যানবাহন চালাবার কাজে ও পশমী জিনিষ পরিস্রুত করার কাজে নিয়োজিত হয়। কয়লা থেকে গ্যাস তৈরীর সময় উপজাত দ্রব্য হিসেবে যে গ্যাস-কার্বন পাওয়া যায়, তা দিয়ে বৈদ্যুতিক শলাকা, পেন্সিল, কলকব্জার তেল তৈরী হয়—এমন কি, গ্যাসের চিমনিতে যে কালো ময়লা জমে, তাথেকেও নানা রকমের রং ও পালিস তৈরী হয়।

বেন্‌জাইল অ্যাসিটেট, কুমারীন, নাইট্রো-বেন্‌জিন, আয়োনোন, কৃত্রিম কস্তুরী প্রভৃতি সুগন্ধি পদার্থ আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য থেকে সস্তায় তৈরী করা সম্ভব হওয়ায় আজকাল সব রকম ফুল ও ফলের সুরভি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হয়ে থাকে। শুধু যে প্রকৃতিজাত পুষ্পের সুগন্ধিকে দুর্গন্ধবিশিষ্ট আলকাত্‌রা হার মানিয়েছে তা নয়, প্রকৃতিজাত চিনি ও মধুর মিষ্টত্বকেও চার হাজার গুণ ছাড়িয়ে গেছে আলকাত্‌রাজাত এনপ্রোপোক্সি। মধুর চেয়ে ৫৫০ গুণ মিষ্টি স্যাকারিনও এই আলকাত্‌রাজাত পদার্থ। পার্কিন যেমন তাঁর অজান্তে মভ্ আবিষ্কার করেছিলেন, ফলবার্গ নামে এক বিজ্ঞানীও তেমনি অজান্তে এই অতি মিষ্ট দ্রব্যটির সন্ধান পেয়েছিলেন। ফলবার্গ হপ্‌কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আলকাত্‌রাজাত দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন; কিন্তু এই বিজ্ঞানীর স্বভাব ছিল একটু অদ্ভুত ধরণের। মিষ্টদ্রব্য তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না এবং সে জন্যে তিনি তাঁর খাবারে কোন মিষ্টদ্রব্য ব্যবহার করতে গৃহকর্ত্রীকে বিশেষভাবেই নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু একদিন খেতে বসে যে খাবারই তিনি হাতে নেন, সেটাই মিষ্টির জন্যে আর মুখে দিতে পারেন না। যে জিনিষ তিনি পছন্দ করেন না এবং যা তিনি নিষেধ করেছিলেন, তারই যেন বিশেষ আয়োজন সব কিছুতে লক্ষ্য করে তিনি একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে টেবিলের সব জিনিষ আছ্‌ড়ে ছুড়ে ভাঙ্গতে লাগলেন, ব্যাপার দেখে গৃহকর্ত্রী ছুটে এল—আর বিজ্ঞানী মারমুখী হয়ে তাঁর খাবারে এত মিষ্টি দেওয়া হয়েছে কেন, জানতে চাইলেন। গৃহকর্ত্রী তো অবাক! বারবার সে যখন হলফ করে বলতে লাগলো যে, তাঁর খাবারে কোন মিষ্টিদ্রব্যের কণামাত্রও ব্যবহার করে নি, তখন অবাক হওয়ার পালা এল বিজ্ঞানীর। তবে কি তাঁর হাতের আঙ্গুলেই রয়েছে এই মিষ্টির উৎস? মুখে আঙ্গুল দিয়ে দেখেন—ঠিক তাই! কিন্তু কি আশ্চর্য—কাজ থেকে ফেরবার সময় তিনি তো ভাল করেই হাত ধুয়ে এসেছিলেন এবং তার পরে তিনি তো কোন মিষ্টিদ্রব্যে হাত লাগান নি! আবার তিনি হাত ধুয়ে ফেললেন; কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, আঙ্গুলের মিষ্টত্ব তাতে যেন আরও বেড়ে গেল। ব্যাপার কি? তবে কি তাঁর আজকের গবেষণার কাজে এমন এক অলৌকিক মিষ্টদ্রব্যের আবির্ভাব ঘটেছে, যার মিষ্টত্ব শত প্রক্ষালনেও বিদূরিত হয় না? তাই গৃহকর্ত্রীকে তেমনি বিমূঢ় অবস্থায় রেখে সেই মুহূর্তেই তিনি গবেষণাগারে ছুটে গেলেন এবং পাগলের মত একের পর এক তাঁর তৈরী দ্রব্যগুলির স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন এবং এমনি কৌতুকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়েই মধুর চেয়ে পাঁচ-শ' গুণ তীব্র মিষ্টদ্রব্য—স্যাকারিন আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

পার্কিনের সেই আকস্মিক আবিষ্কারের পর থেকে নিত্য নতুন কত অগণিত দ্রব্য যে আবিষ্কৃত হয়েছে এই কালো কয়লা থেকে, তার ইয়ত্তা নেই। এদের সকলকার কথা বলা তো দূরের কথা, প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করাও বোধ করি কঠিন!

হৃদ্‌যন্ত্রের পটুতা ও অপটুতা

শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার

সকলেই জানে, হৃৎপিণ্ডের প্রধান কাজ হলো ক্রমাগত কাজ করে ও শক্তি উৎপাদন করে রক্তের সঞ্চালন বজায় রাখা। খাদ্যজাত রসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তি ও তাপে পরিণত করা এই কাজের প্রধান অঙ্গ। এই যান্ত্রিক শক্তির কতক অংশ রক্তকে চালনা করে, বাকী অংশ তাপের আকারে শরীরের সর্বত্র বিকিরিত হয়। যে হৃদ্‌যন্ত্র এই যান্ত্রিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে করতে পারে, তাকেই কর্মপটু যন্ত্র বলা যায়। আর যখন রক্তের এই চালনা করা হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে কঠিন হয়, তখনই সে অপটু হয় বা 'ফেল' করে।

যে অবস্থায় রক্ত সঞ্চালন যথাযথভাবে চলে না, সে অবস্থায় হৃদ্‌যন্ত্রের সঙ্গে অন্য শারীরিক যন্ত্রের সহযোগিতা করবার আবশ্যক হয়। এই সময়ে হৃৎপিণ্ডকেও নিজের স্বাভাবিক কাজ চালাবার জন্যে বাড়্‌তি বা সঞ্চিত শক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। এই অবস্থাকে হার্ট ফেলিয়োর (Heart failure) বলে। এই সময়ে শরীরে এই অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা যায়—শ্বাসকষ্ট, জোরে জোরে শ্বাস নেবার আবশ্যকতা, শরীরে বিশেষ বিশেষ স্থানে শোথ, চর্মের নীলাভা, যকৃতের আয়তন বৃদ্ধি ইত্যাদি।

হৃৎপিণ্ড, শিরা, ধমনী ও তাদের ক্ষুদ্রতর ও ক্ষুদ্রতম শাখাগুলি এবং রক্তের কৈশিক নালীগুলি মিলে একটি জটিল নাড়ী-বিধানের সৃষ্টি করে। এই বিধানের প্রত্যেক বিভিন্ন অংশের রক্ত ধারণ ও চালনের শক্তি সীমাবদ্ধ। হৃদ্‌যন্ত্রের পেষণ বা চাপেই রক্ত এদের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং তার পাম্পিং-এর কাজের পটুতা অনুসারে রক্তপ্রবাহের গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। বিধানের কোন অংশে প্রতিবন্ধকতা থাকলে বা বাড়লে এই গতিবেগ প্রতিহত হয় এবং যখন রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, তখন তার বেগ ও শক্তি কমে যায়।

হৃদ্‌যন্ত্রে এক সঙ্গে দুটি পাম্প পরপর কাজ করে। দক্ষিণ এবং বাম ভেন্ট্রিকল একটির পর আরেকটি সঙ্কুচিত হয়। প্রত্যেক ভেন্ট্রিকলের সঙ্গে যে একটি করে অরিকল থাকে, সেখানে তন্তু ও বিধান-থেকে রক্ত এসে সঞ্চিত হয়। এই দুই প্রকোষ্ঠের যোগস্থলে কয়েক রকম ভাল্‌ভ থাকে, যার উপযুক্ত ক্রিয়ায় রক্ত একই নির্দিষ্ট দিকে পরিচালিত হয়, বিপরীত দিকে ফিরে যেতে পারে না। হৃদ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব বা আবশ্যকও নয়।

হৃদ্‌যন্ত্রের প্রধান নাড়ীগুলি স্থিতিস্থাপক পাত্রও বটে, নলও বটে। তাদের পরিসর বাড়তে বা কমতে পারে। এই কারণে হৃৎপিণ্ডের সিস্টোলের সময় বহিষ্কৃত রক্তকে তারা স্থান করে দিতে পারে। পরমুহূর্তেই আবার ডায়াস্টোলের সময় নিজেদের সঙ্কোচনের ফলে রক্তের অগ্রগতিকে সাহায্য করতে পারে। এই ভাবে নাড়ীর মধ্যে রক্তের চাপ সিস্টোলের সময় বাড়ে ও ডায়াস্টোলের সময় কমে। এওর্টা নামক প্রধান ধমনীর এই চাপ ১২৫ মিলিমিটার পারদের সমান। ফুস্‌ফুসের ধমনীতে এর পরিমাণ ২৫ মিলিমিটার মাত্র।

ক্ষুদ্রতর ধমনী ও শিরাগুলির পরিসর ক্ষুদ্র বলে রক্তের প্রবাহ সবচেয়ে বেশী বাধা পায় এবং এখানে রক্তে বাহিত শক্তির সবচেয়ে বেশী অপচয় ঘটে। শরীরের কোন অংশের শিরা ও ধমনীতে কতখানি রক্ত থাকবে বা চলবে, তার নিয়ন্ত্রণ করে প্রথমতঃ কয়েকটি হর্মোন ও দ্বিতীয়তঃ স্নায়ুবিধানের বিশেষ অংশ (Autonomous nervous system)।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, শরীরের প্রত্যেক অংশে রক্তের পরিমাণ সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে না। রক্তের কতক অংশের সাময়িক সঞ্চয়ের জন্যে বিশেষ বিশেষ ভাণ্ডার আছে। এই ভাণ্ডার-গুলিতে রক্তের পরিমাণ যত বাড়ে, শরীরের অন্যত্র সঞ্চালিত মোট রক্তের পরিমাণ তত কমে। তার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের Output-ও কমে বা বাড়ে।

ধমনীতে কোন কারণে রক্তের চাপ বাড়লে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-সংখ্যা আপনা-আপনিই কমে যায়। তার ফলে প্রত্যেক স্পন্দনে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ রক্ত সিস্টোলের সময় বেরিয়ে আসে। তবে যাদের রক্তের চাপ স্থায়ীভাবে বেশী, তাদের এই স্পন্দন-সংখ্যা কিন্তু পূর্ববৎ থাকে বা বেড়ে যায় এবং তার ফলে হৃৎপিণ্ডের কাজও বাড়ে। ধমনীতে চাপ বৃদ্ধিকর বাধা থাকলে এই কাজ কমে যায়। অন্যপক্ষে শিরাগুলি থেকে যে রক্ত ফিরে আসে, তার পরিমাণ কোন কারণে বাড়লে এই কাজ বেড়ে যায় এবং রক্তের চাপও বাড়তে পারে।

কোন কোন অবস্থায় হৃৎস্পন্দনের নিয়মিত 'তাল' বদ্‌লে যায়। তার ফলে **Premature Systole** বা **Auricular fibrillation** দেখা যায়। সিস্টোল স্বাভাবিকভাবে না চললে রক্ত পূর্ণমাত্রায় বেরিয়ে যেতে পারে না। কারণ রক্ত অরিকল থেকে ভেণ্ট্রিকলে পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসে না এবং সেমিলুনার ভাল্‌ভগুলিও পূর্ণমাত্রায় খুলে যায় না। আবার ভেণ্ট্রিকলের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশীগুলি মুচড়ে যাওয়ার ফলে এই রকম হতে পারে। পেরিকার্ডিয়ামে জল জমলে বা তা কঠিন হয়ে গেলে ভেণ্ট্রিকলগুলি ডায়াস্টোলের সময় উপযুক্ত-ভাবে ভর্তি হতে বাধা পায়। আশেপাশে টিউমার জন্মালেও এই রকম ঘটতে পারে। এসব অবস্থায় হৃৎপেশীর সঙ্কোচনশীলতা অব্যাহত থাকলেও কোন উপকার হয় না।

কোন কোন রোগে এই সঙ্কোচনশীলতা কমে গেলে সিস্টোলের পূর্ণফল পাওয়া যায় না, তখন হৃৎপিণ্ডকে স্পন্দন-হার বাড়াতে হয়। বাইরের তাপ বেশী বাড়লে শরীরের রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির বেগ বাড়ে। আর খুব বেশী হলে কোন কোন প্রকারের কোস নষ্ট হয়ে যায়। আবার রাসায়নিক বস্তুর মধ্যে কোন কোনটি তন্তু বা কোষের এনজাইম-গুলির ক্ষতি করে, তখন রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির গোলমাল ঘটে। স্বাভাবিক বিক্রিয়া-জাত ত্যাজ্য বস্তুগুলি শরীর থেকে দ্রুত নির্গত না হলেও এমন ক্ষতি হয়। আবার ব্যাক্টিরিয়া বা তাদের দেহ-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ হৃদ্‌যন্ত্রের মাংসপেশীর নানা রকম ক্ষতি করতে পারে।

রক্তের সঞ্চালন উপযুক্তভাবে বজায় না রাখতে পারলে হৃৎপেশীর এই ক্ষতি সবচেয়ে বেশী হয়। আবার এই পেশীগুলি অপটু হলে হৃৎপিণ্ডের নিজের ধমনীতে (করোনারী আর্টারি) রক্তের সঞ্চালন কমে যায়। এভাবে **Arrythmia**, 'শক' ইত্যাদির কুফলগুলি ঘুরে ঘুরে বেড়ে যায়। এর পরিণামে বিভিন্ন তন্তু এবং হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন সরবরাহের কম্‌তি এবং হৃৎপিণ্ডের পটুতারও উত্তরোত্তর হ্রাস ঘটে।

কোন কোন অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের মোট আয়তন বেড়ে যায়। পেশীগুলিও দৈর্ঘ্য, আয়তন এবং ওজনে বাড়ে। এমন হলে হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ অপেক্ষাকৃত ভালভাবে চলে এবং পেশীগুলির সঙ্কোচনশীলতা কিছু কমলেও ক্ষতি হয় না। তবে এই অবস্থা শরীরের আবশ্যকতা অনুসারে ধীরে ধীরে ঘটে। কোন যান্ত্রিক পাম্প অবশ্য এভাবে

নিজের কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে না। দুঃখের বিষয়, করোনারী ধমনীগুলি কিন্তু এই পেশীর বৃদ্ধির তালে তালে বাড়তে পারে না। হৃদ্‌যন্ত্রের অন্য পেশীগুলি বড় হয়ে গেলে তাদের রক্ত-সরবরাহকারী নালীগুলি সেই তালে না বাড়ায় তাদের পোষক বস্তু ও অক্সিজেন জোগান দেওয়া উত্তরোত্তর কঠিন হতে থাকে। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় পেশীগুলি বাড়বার ফলে যে উপকার হতে পারতো, তা সীমায় পৌঁছে বা শেষ হয়ে যায়।

হৃৎস্পন্দনের হার বাড়িয়ে ডায়াস্টোলে আনীত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে বা পেশীগুলির আয়তন বাড়িয়ে যে উপকার হয়, তা পরস্পর নিরপেক্ষভাবে ঘটে না। ব্যায়ামে অভ্যস্ত লোকের বা খেলোয়াড়-দের হৃদ্‌যন্ত্রের আয়তন ট্রেনিং-এর ফলে সাধারণের চেয়ে এই ভাবে বেড়ে যায় বটে, কিন্তু তাদের স্পন্দনের হার বাড়ে না—বরং কিছু কমই থাকে। রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে গোড়ার দিকে আবার আবশ্যকের ফলে হৃৎপেশীর পুষ্টি বাড়লেও হৃদ্‌যন্ত্রের মোট আয়তন অনেক ক্ষেত্রে বাড়ে না।

স্বাভাবিক বা সুস্থ এবং অস্বাভাবিক বা অসুস্থ হৃদ্‌যন্ত্রের মধ্যে প্রভেদ করা কঠিন। হৃৎপিণ্ডের আয়তন বাড়তে বাড়তে এক অবস্থায় তার বেশী কাজ করবার শক্তি সীমায় পৌঁছে যায়। তেমনি হৃৎস্পন্দনের হার বাড়তে বাড়তে এক অবস্থায় ডায়াস্টোলে ফিরে-আসা রক্তের পরিমাণ কমে যায়—সুতরাং স্পন্দন বাড়বার উপকার শেষ হয়ে যায়। করোনারী ধমনীতে রক্ত-সরবরাহ কমলে এই দুই প্রয়াসেও হৃদ্‌ক্রিয়া অটুট রাখা কঠিন হয়ে আসে।

হৃৎপিণ্ড সাধারণ অবস্থায় যে পরিমাণ কাজ করে এবং যে বেশী পরিমাণ কাজ সে আবশ্যক হলে করতে পারে, এই দুইয়ের বিভেদকে হৃদ্‌যন্ত্রের 'সঞ্চিত শক্তি' (Cardiac reserve) বলা যায়। যতই কাজ বাড়ানো যায়, ততই এই সঞ্চিত শক্তির মাত্রা কমে যায়। আবার অসুস্থ অবস্থায় তার কাজ করবার সহজ শক্তি এবং সঞ্চিত শক্তি উভয়ই কমে যায়। বিভিন্ন রোগে এই কমতি বিভিন্ন মাত্রায় ঘটে। যখন এই কার্যশক্তি ও সঞ্চিত শক্তি খুবই কমে যায়, তখন রোগীকে বিছানা ছেড়ে উঠতে দেওয়া হয় না—কারণ সামান্য নড়াচড়াতে এমন অপটু হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হতে পারে।

কার্যশক্তি যখন কার্যের আবশ্যকতাকে অতিক্রম না করে (অর্থাৎ সঞ্চিত শক্তি যখন নিম্ন সীমায় পৌঁছে), তখন প্রথমে ক্লান্তি বা অবসাদ, বুকে বেদনা, শ্বাসকষ্ট, স্থানীয় রক্তসঞ্চয় ও শোথ দেখা যায়। অন্য কারণগুলি বাদ দিতে পারলে ডাক্তার এগুলি লক্ষ্য করেই হৃদ্‌যন্ত্রের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ মোটামুটি বুঝে নেন। তখন হৃদ্‌যন্ত্রের কাজের চাপ কমাবার জন্যে রোগীকে যথোচিত বিশ্রামের উপদেশ দেন। হৃৎপেশীর সঙ্কোচন-শক্তি কমলে ধমনীতে রক্তের চাপও কমে বা সিস্টোলের Output কমে অথবা দুই রকম লক্ষণই এক সঙ্গে ঘটে। তবে রোগী বিশ্রাম না নিলে প্রথমে ফুস্‌ফুসে ও পরে শিরা-বিধানে রক্ত সঞ্চয় হয় ; অর্থাৎ সেখান থেকে রক্ত ডায়াস্টোলে দক্ষিণ অরিকল ও ভেন্ট্রিকলে বেশী পরিমাণে ফিরে আসে। তার ফলে সিস্টোলের Output একে-বারে কমে যায় না বটে, কিন্তু হৃদ্‌যন্ত্রের আয়তন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এই অবস্থা ডাক্তারের স্টেথিস্কোপে ধরা পড়ে। তাছাড়া, হৃৎস্পন্দনের হারও বাড়তে পারে—যার ফলে এই রক্তসঞ্চয়ের লক্ষণ কিছুটা কমে। কিন্তু হার্ট ফেলিয়োর কিংবা হৃৎপেশীর স্থানীয় গ্যাংগ্রীন অবস্থায় হৃৎপেশীর সঙ্কোচশীলতাই প্রথমে কমে যায় এবং সে অবস্থা দূর করবার জন্যে হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে যায়, অর্থাৎ তাকে দ্রুত তালে কাজ করতে হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হৃৎপেশীর দুর্বলতা থাকলে কোন সময়ে ফুস্‌ফুসে বা অন্যত্র রক্ত সঞ্চয়ের (Congestion) লক্ষণই প্রবল হবে,

আবার কোন সময়ে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যশক্তিই হ্রাস পাবে। তবে দুই অবস্থা এক সঙ্গে ঘটাও বিচিত্র নয়। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্যে যে সব কাজ করতে হয়, তার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যশক্তির উপর যে চাপ পড়ে, তাছাড়া কিছু অস্বাভাবিক চাপও কোন কোন অবস্থায় বা রোগে সৃষ্টি হয়। হৃদ্‌যন্ত্রের অপটুতা ঘটলে এই সব চাপ কমাবার জন্যে ডাক্তার রোগীর বেশী কাজ একেবারে বন্ধ করে দেন। দরকার হলে তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেন। ঔষধের সাহায্যে হৃৎপেশীর কার্যশক্তি বাড়াবার চেষ্টা মোটেই সফল হয় না। কারণ এই যন্ত্র অক্সিজেন সরবরাহের কম্‌তি সহ্য করতে পারে না। কাজের চাপ বাড়ালে করোনারী ধমনীতে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহে ঘাট্‌তি পড়ে ও হৃদ্‌যন্ত্রের সাধারণ অংশ ও এই বিশেষ অংশ পরস্পরের ক্ষতি করতে থাকে।

জীবাণু-জগৎ

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের অধিবাসী অ্যান্টনি লিউয়েনহোয়েক (১৬৩২-১৭২৩) সর্বপ্রথম প্রচার করেন—জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে অতি ক্ষুদ্র অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু বর্তমান। তিনি বিবর্ধক কাচের সাহায্যেই এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লিউয়েনহোয়েক সর্বসমেত চারি শত অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করেন। এই সকল অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কেবল একটি করিয়া বিবর্ধক কাচ থাকিত, যাহার ব্যাস এক ইঞ্চির আট ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহার দ্বারা কোন ক্ষুদ্র বস্তুকে ১০০ হইতে ২০০ গুণ বড় দেখা যাইত। লিউয়েন-হোয়েক ডোবার জলে অতি ক্ষুদ্র জীবাণুর সন্ধান পান, তিনিই প্রথম বীজকোষ (Sperm cell) আবিষ্কার করেন এবং রক্তে লোহিত কণিকার অস্তিত্ব দেখেন।

আধুনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে কোন বস্তুকণাকে ১৫০০ হইতে ২৫০০ গুণ পর্যন্ত বড় দেখায়, আর ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে যে কোন সূক্ষ্ম পদার্থের লক্ষ গুণ বড় ছবি তোলা যায়।

মাটি, জল ও বাতাসে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু বাস করে। এই সকল ক্ষুদ্রতম জীবাণু অত্যন্ত কঠিন-প্রাণ। বেলুনের সাহায্যে আকাশের ৯৭০০০ হাজার ফুট ঊর্ধ্বস্তরের বাতাস আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতেও যথেষ্ট পরিমাণ জীবাণু-বীজের অস্তিত্ব আছে। ঊর্ধ্বাকাশ হইতে পতিত হিমশীতল শিলাতেও জীবাণু-বীজ পাওয়া যায়। অন্য দিকে ২৪০০০ ফুট নীচে সাগরতলেও অনেক প্রকার জীবাণুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এখানে জলের চাপ সাধারণ বাতাসের চাপের চেয়ে প্রায় ৮০০ গুণ বেশী। ঈষ্ট-কোষ (Yeast cell) ৮০০০ গুণ বেশী বাতাসের চাপ সহ্য করিতে পারে। সাহারা মরুভূমির শুষ্ক তপ্ত বালুকাতেও জীবাণুর অবস্থিতির কথা জানা গিয়াছে। এই স্থান হইতে সংগৃহীত পনেরো গ্রেণ বালুকাতে অসংখ্য রকমের জীবাণুর অস্তিত্ব দেখা গিয়াছে।

তিন হাজার ফুট গভীর পেট্রোল কূপেও বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুর সন্ধান পাইয়াছেন। তেত্রিশ হাজার ফুট নীচে কয়লাস্তরে জীবাণুর অবস্থিতি দেখা গিয়াছে। যে সকল উষ্ণ প্রস্রবণের

তাপমাত্রা ৯২° সেন্টিগ্রেড, সেখানেও জীবাণু-বিশেষের অস্তিত্ব দেখা যায়। উচ্চতম পর্বতশিখর ও বরফ শিলাতেও জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়। মেরুসমুদ্রেও জীবাণুর অবস্থিতির কথা প্রমাণিত হইয়াছে। এক রকম সিলিকন জীবাণু আছে, যাহারা সুকঠিন গ্র্যানিট ও ব্যাসাল্ট পাথরকেও আক্রমণ করিয়া ক্ষয়িত করে।

জীবাণুর জীবন −২৭৩° সেন্টিগ্রেড হইতে + ১১০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা অবধি সীমাবদ্ধ, আর ইহাদের কোন কোনটির পক্ষে ০ হইতে ৮০০০ পর্যন্ত বায়ুচাপ সহনীয়। তবে একথা ঠিক যে, সাধারণ বায়ুচাপে এবং ২০° সেন্টিগ্রেড হইতে ৪৭° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে অধিকাংশ জীবাণু উৎকর্ষ লাভ করে।

জীবাণুগুলিকে প্রাথমিক প্রাণী (Protozoa), বীজাণু (Bacteria) ও বিষাণু (Virus)—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। বলা বাহুল্য, সমস্ত জীবাণুর শরীরই একটি মাত্র কোষে গঠিত। এই সমস্ত এককোষী জীবের আহার-বিহার ও বংশবিস্তারের প্রণালী বিচিত্র। ইহাদের সুনির্দিষ্ট কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। ইহারা সমস্ত দেহ-প্রাচীরের মধ্য দিয়াই আহার্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ও দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া দেয়। জীবাণুর শরীর গঠনের জন্ম আমাদের মতই চিনি ও ছানাজাতীয় পদার্থ এবং চর্বির প্রয়োজন হয়।

সমস্ত জীবাণুই বংশবিস্তারের সময় নিজের শরীর দ্বিধা বিভক্ত করে। এইরূপে নিজ নিজ দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া ইহারা নূতন জীবনের সৃষ্টি করে। অনুকূল অবস্থায় প্রাথমিক এককোষী প্রাণীরা প্রতি একঘণ্টা অন্তর দেহ-বিভাগ করে, আর বীজাণুরা আধ ঘণ্টা অন্তর শরীর বিভক্ত করে। বড় বড় এককোষী প্রাণী কয়েক দিন হইতে কয়েক মাস অন্তর বংশবৃদ্ধি করে। একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি—এইভাবে জ্যামিতিক নিয়মে ইহারা সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া থাকে। তাপ বা বিষ প্রয়োগ না করিলে ইহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহারা অমর।

সচরাচর অনুকূল আবেষ্টনীতে একটি বীজাণু প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর দ্বিধা বিভক্ত হয়। সুতরাং ৩০ মিনিটে প্রত্যেকটি বীজাণু ২টি হইয়া যায়, ১ ঘণ্টায় ৪টি, দেড় ঘণ্টায় ৮টি, ২ ঘণ্টায় ১৬, ৩ ঘণ্টায় ৬৪, ৪ ঘণ্টায় ২৫৬, ৫ ঘণ্টায় ১০২৪, ১০ ঘণ্টায় ২২১৪৪ এবং ২০ ঘণ্টায় ১৯১৬৬৭২০০০০০ হয়, আর তখন সম্মিলিত বীজাণুদের ওজন হইবে প্রায় ১ রতির মত। ৪০ ঘণ্টায় ইহাদের ওজন হইবে ৫০৮৭২৩ মণ। সাধারণতঃ এরূপ সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ শত্রুবৃদ্ধি অথবা খাদ্যের অল্পতা ঘটিলে কিম্বা আবেষ্টনী অতিরিক্ত গরম, ঠাণ্ডা বা শুষ্ক হইয়া গেলে বংশবৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে স্থগিত হইয়া যায়। ইহা ছাড়া জীবাণুদের দেহনিঃসৃত দূষিত দ্রব্যের পরিমাণ বেশী হইয়া গেলেও বংশবিস্তার আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া যায়।

জীবাণুরা যে সর্বদাই দেহ-বিভাগ করে, তাহা নহে, এক এক সময় দুইটি জীবাণু সম্মিলিত হইয়া এককোষ, একদেহ ও একপ্রাণ হইয়া যায়।

সাধারণতঃ অধিকাংশ প্রাথমিক প্রাণীকোষ সচল, আর বীজাণুরা অচল। বীজাণুদের মধ্যে আবার টাইফয়েড ও কলেরার বীজাণু বেশ নড়াচড়া করিতে পারে। জীব-বিজ্ঞানীরা প্রাথমিক জীবকোষকে প্রাণী এবং বীজাণুকে উদ্ভিদশ্রেণীর মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন। বিষাণু বা ভাইরাস যেন জড় ও জীবের মধ্যবর্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। প্রত্যেক প্রাথমিক প্রাণীর কোষকেন্দ্র (Nucleus) আছে, কিন্তু বীজাণু (Becteria) ও বিষাণুর (Virus) কোন কোষকেন্দ্র নাই।

ডোবার জলে কখনও কখনও প্যারামিসিয়াম্ নামক বিভিন্ন আকৃতির অনেক রকম এককোষী প্রাণী দেখা যায়। ইহাদের শরীরের বিস্তার এক ইঞ্চির শতভাগের একভাগেরও কম। যাঁহাদের

দৃষ্টিশক্তি খুব প্রখর, তাঁহারা ইহাদের খালি চোখেই দেখিতে পারেন। কিন্তু ১০ × শক্তিবিশিষ্ট বিবর্ধক কাচের সাহায্যে সকলেই ইহাদের প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। একটি পাত্‌লা কাচের উপর এক ফোঁটা পুকুরের জল স্থাপন করিয়া আলোকের সম্মুখে ধরিয়া দশ শক্তিবিশিষ্ট বিবর্ধক কাচ দিয়া পর্যবেক্ষণ করিলে অনেক সময় সচল প্যারামিসিয়াম বা এককোষী প্রাণী সুস্পষ্ট দেখা যায়।

অধিকাংশ এককোষী প্রাণী তাহাদের শরীর সংলগ্ন এক বা একাধিক সূত্রবৎ শোঁয়া নাড়িয়া জলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। কোন কোন পুষ্করিণীর স্থির জল অসংখ্য উদ্ভিদাণুর জন্যই সবুজাভ দেখায়। লোহিত সাগরের রং অগণিত জীবাণুর উপস্থিতির জন্যই রক্তাভ। মিশরের পিরামিডসমূহ যে পাথরে তৈয়ারী তাহা অগণিত এককোষী প্রাণীর সিলিকা-নির্মিত দেহাবরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুষ্করিণীর জলে অ্যামিবা নামক এককোষী জীব দেখা যায়। ইহারা পর্যায়ক্রমে নিজেদের শরীর প্রসারিত ও সঙ্কুচিত করিয়া জলের ভিতর ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাথমিক এককোষী প্রাণী এক ইঞ্চির শতভাগের একভাগ হইতে এক ইঞ্চির ১২০০০ ভাগের একভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, আর বীজাণুগুলি ১২৫০০০ ইঞ্চি হইতে আধ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। এক প্রকার নিউমোনিয়ার বীজাণু হইল ক্ষুদ্রতম, আর বৃহত্তম বীজাণু হইল গন্ধক বীজাণু, যাহারা প্রায় এক সেণ্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। সে জন্য ইহাদের খালি চোখেও দেখা সম্ভব। বীজাণু তিন রকমের হয়—গোলাকার, দণ্ডাকার ও বক্রাকার। বিষাণু বীজাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের দেখা যায় না। ইহাদের পর্যবেক্ষণ করিতে হইলে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্য প্রয়োজন। বিষাণু ৩১২৫০০০০ ইঞ্চি হইতে ১৫৬২৫০ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়।

সাধারণ পোর্সিলিনের ফিল্‌টারের দ্বারা প্রাথমিক জীবকোষ এবং সমস্ত বীজাণু ছাঁকিয়া লওয়া যায়। কিন্তু বিষাণু এতই ছোট যে, ইহারা চিনামাটির ছাঁকুনির মধ্য দিয়াও যাতায়াত করিতে পারে। বিষাণুর আর একটা বিশেষত্ব এই যে, উহারা জ্যামিতিক আকারে দানা বাঁধিতে পারে। জীবন্ত জীবকোষ ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে বিষাণু বংশবিস্তার করিতে পারে না। সেই জন্য ইহারা ডিমের কুসুম, সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদ-শরীরেই কেবল বর্ধিত হয়। অন্যদিকে আদিম প্রাণীকোষ ও প্রায় সমস্ত বীজাণুই মাংসরস ও অ্যাগার অ্যাগার নামক সামুদ্রিক উদ্ভিদ-নির্যাস এবং অন্যান্য রাসায়নিক মাধ্যমে সহজেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

ঈষ্টের একটা বিশেষত্ব এই যে, উহারা অক্সিজেন ব্যতিরেকেও জীবনধারণ করিতে পারে। বটুলিনাস বীজাণু (Botulinus) ও ধনুষ্টঙ্কারের (Tetanus) জীবাণুরও এই ক্ষমতা আছে। নিষ্ক্রিয় (Spores) অবস্থায় জীবাণু তিন বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। —১৯০° সেণ্টিগ্রেড ঠাণ্ডা তরল বায়ুর মধ্যে নিমজ্জিত রাখা সত্ত্বেও কোন কোন জীবাণু-বীজকে ছয় মাস পর্যন্ত সজীব থাকিতে দেখা গিয়াছে। তবে সাধারণতঃ সম্মিলিতভাবে আধ ঘণ্টাকাল ১২০° সেণ্টিগ্রেড তাপ ও বাষ্পের চাপ প্রয়োগ করিলে সমস্ত জীবাণুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। জীবাণু ধ্বংসের কাজে সচরাচর ক্লোরিনযুক্ত চুন, কার্বলিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট ব্যবহৃত হয়।

এখন সকলেই জানেন—খাদ্য, পানীয় বা বাতাসের সহিত কিম্বা জীবজন্তুর সাহায্যে শরীরে সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু প্রবেশ করিলে নানারকম রোগ হইতে পারে। যেমন—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, নিদ্রারোগ এবং রক্ত-অতিসার প্রাথমিক প্রাণীকোষ কর্তৃক সৃষ্ট হয়। আর কলেরা, কুষ্ঠ, প্লেগ ও যক্ষ্মা ইত্যাদি বীজাণু সঞ্চারের জন্য উৎপন্ন হয়। বসন্ত, হাম, গলস্ফীতি, পীতজ্বর, পলিও, জলাতঙ্ক ও সর্দিজ্বর ইত্যাদি বিষাণু সংক্রমণের জন্য সঙ্ঘটিত হয়।

কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত সংক্রামক রোগের আসল কারণ অধিকাংশ লোকেরই অজ্ঞাত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও হেসারের মত বিজ্ঞানী বিশ্বাস করিতেন যে, মহামারীর হেতু সূর্য-গ্রহণ, ধূমকেতু, ভূমিকম্প, বন্যা বা অগ্ন্যুৎপাত। তবে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে থিউসাইডাইড নামক গ্রীক মনীষী আন্দাজে বলেন—প্লেগ ব্যাধি খুব সম্ভব সজীব সংক্রমণের জন্যই (Contagium Virum) হয়। রোমান ঋষি ভারো খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে মনে করিতেন, ম্যালেরিয়া জ্বর একরকম অতিক্ষুদ্র অদৃশ্য জীবাণু কর্তৃক মানবদেহে সঞ্চারিত হয়।

যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ রোগ-বীজাণু আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। নীচে কয়েক জাতীয় জীবাণু আবিষ্কারের সময় এবং কয়েক জন আবিষ্কারকের নাম দেওয়া হইল।

প্লেগ	১৮৯৪	ইয়ারসেন
কলেরা	১৮৮৩	কক্
বসন্ত		প্যাশ্চেন
যক্ষ্মা	১৮৮২	কক্
কুষ্ঠ	১৮৭১	হানসেন
সিফিলিস	১৯০৫	শডিন
ম্যালেরিয়া	১৮৮০	ল্যাভেরান
রক্তদুষ্টি	১৮৮০	পাস্তুর
ডিপথিরিয়া	১৮৮৪	ক্লিবস ও লোয়েফ্লার

মহামারীর প্রকোপে কেমন করিয়া ব্যাপকভাবে প্রাণহানি ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র ১১৭৬ সালের মন্বন্তর উপলক্ষ্য করিয়া তাহার এক ভয়াবহ চিত্র আনন্দমঠে অঙ্কিত করিয়াছেন।

চতুর্দশ শতাব্দীতে ব্ল্যাকডেথ নামক ভয়াবহ প্লেগব্যাধি প্রথমে চীনদেশে আরম্ভ হইয়া ঐ অঞ্চলের সাড়ে তিন কোটি লোক নিঃশেষ করে। তাহার পর এই ব্যাধি সমগ্র ইউরোপে পরিব্যাপ্ত হয় এবং ইহার কবলে পড়িয়া প্রায় আড়াই কোটি লোক নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে সংক্রামক সর্দিজ্বর (Influenza) সমস্ত পৃথিবী-ময় ছড়াইয়া পড়ে, তাহাতে মৃত্যুর হার চারি বৎসরে যুদ্ধে নিহত সৈন্য-সংখ্যা অপেক্ষাও অনেক অধিক হইয়াছিল। কেবল লণ্ডন সহরেই এই জ্বরে ১৮০০০ লোকের জীবনান্ত হয়, আর এই দেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল ৬০ লক্ষ।

প্রায় এক দশক পূর্বেও ভারতে সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা এইরূপ ছিল—

ম্যালেরিয়া	১২৫০০০০
	৫০০০০০
বসন্ত	৭০০০০
কলেরা	২০০০০
প্লেগ	২০০০০

বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তু বিভিন্ন জীবাণু কর্তৃক সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। যেমন—কুষ্ঠ-ব্যাধি মানুষ ছাড়া অন্য কোন ইতর প্রাণীর মধ্যে সংক্রমণ করা যায় না। অপর দিকে, অ্যানথ্রাক্স রোগ গরু, ঘোড়া ও ভেড়া প্রভৃতি পশুদের গুরুতর রকমই হয়, কিন্তু কুকুর, ইঁদুর ও মুরগীর মোটেই হয় না। বসন্ত ও যক্ষ্মা আবার গরু ও মানুষ উভয়েরই হয়। জীবাণুর জোর এক প্রাণী হইতে অন্য প্রাণীতে সংক্রমণের সময় কিম্বা পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে কম-বেশী হইতে পারে। জীবাণু যে শুধু মানুষের মধ্যেই রোগ সঞ্চার করে তাহাই নয়, উহারা অনেক সময় চাসের ফসল ও শাকসব্জীর প্রচুর অনিষ্ট সাধন করে।

আমাদের শরীরে জীবাণু জয় করিবার দুই রকম ব্যবস্থা আছে। রক্তরসের মধ্যে যে শ্বেত কণিকা থাকে, তাহারা বিজাতীয় কোন জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই উদরসাৎ করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া বিজাতীয় বীজাণুর আক্রমণ ঘটিলেই শরীরে এমন একরকম বিষ-বিধ্বংসী পদার্থ উৎপন্ন হয়, যাহা জীবাণু ও তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষ একযোগে বিনষ্ট করে।

ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধির মৃত কিম্বা নির্বীর্য জীবাণু অথবা

তাহাদের দেহ-নিঃসৃত বিষ সামান্য পরিমাণে টিকা রূপে শরীরে গ্রহণ করিয়া আমরা বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধ করিয়া থাকি। ১৭৯৬ সালে সুবিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার সর্ব-প্রথম টিকা দিবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী উদ্ভাবন করেন। ১৮৮৫ সালে ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগ প্রতিরোধ করিবার অভিনব উপায় আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিলেন, ক্ষিপ্ত কুকুরদষ্ট ব্যক্তির দেহে জলাতঙ্ক ব্যাধির নির্বীর্য বিষাণু পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিলে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা জন্মায় এবং রোগীও রক্ষা পায়।

শত বৎসর পূর্বে কোন অস্ত্রোপচার হইলেই জীবাণু সংক্রমণের জন্য প্রায়ই ক্ষত দূষিত হইয়া শতকরা ৪৫ জনের প্রাণহানি ঘটিত। ১৮৬৭ সাল হইতে বিখ্যাত ইংরেজ অস্ত্রচিকিৎসক লর্ড লিষ্টার অস্ত্রচিকিৎসার সময় কার্বলিক অ্যাসিড দিয়া যন্ত্রপাতি ও রোগীর ক্ষত বিশোধন করিবার প্রথা প্রথম প্রচলন করেন। ইহার ফলে তখনই মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়া মাত্র ১৫%-এ দাঁড়ায়। লিষ্টারের প্রায় কুড়ি বৎসর আগেই হাঙ্গেরীর ডাক্তার সেমেলওয়েজ (১৮১৮-'৬৫) ধাত্রীবিদ্যা-সংক্রান্ত কার্যে বিশোধনের জন্য জলের সহিত ক্লোরিনযুক্ত চুন ব্যবহার করিয়া বিশেষ সুফল পাইয়াছিলেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু পরস্পরের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রায়ই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লুই পাস্তুর প্রথম লক্ষ্য করেন যে, অ্যানথ্রাক্স জীবাণু সাধারণতঃ মাংসের সুরুয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু যদি কোনক্রমে উহার মধ্যে গলনজীবাণু প্রবেশলাভ করে, তাহা হইলে তাহারা অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করিয়া পূর্বোক্ত অ্যানথ্রাক্স জীবাণুগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত ও নির্জীব করে। তাহার পর মেচ্‌নিকফ আবার প্রমাণ করেন যে, দধির বীজাণু অনায়াসে গলনজীবীদের বংশবিস্তার নিবারণ করিতে পারে। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে প্রথম পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, পেনিসিলিয়াম ছত্রাকাণু এইভাবেই অনেক প্রকার রোগ-বীজাণুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়া থাকে।

ঈষৎ আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য যে সহজেই পচিয়া নষ্ট হয়, তাহার কারণও জীবাণুর ক্রিয়া। আহার্য দ্রব্য রেফ্রিজারেটরে হিমশীতল অবস্থায় রক্ষা করিতে পারিলে অনেক দিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকে। মাছ ও মাংস লবণাক্ত করিয়া রাখিলেও কিছুদিন ঠিক থাকে। ইহা ছাড়া দুধ, ফল, মাছ বা মাংস টিনের কৌটায় ভরিয়া উহার মুখ রাং-ঝাল দিয়া বন্ধ করিবার পূর্বে ২৩০° ফারেনহাইট উত্তাপ প্রয়োগ করিলে খাদ্যের মধ্যস্থিত জীবাণুগুলি মরিয়া যায় এবং ঐ সকল দ্রব্য অনেক দিন অবধি টাট্‌কা থাকে।

জীবাণু যে কেবল আমাদের অপকারই করে তাহা নহে, কতকগুলি জীবাণু আমাদের জীবন-যাত্রার পক্ষে অপরিহার্য। যেমন—ঈষ্ট (Yeast)। আঙুরের রস, মধু কিম্বা গুড়ে জল মিশাইয়া উহাতে খামি বা ঈষ্ট দিলে কিছুকাল পরে সমস্ত দ্রব্যটি গাঁজিয়া মদ্য উৎপন্ন করে। এইরূপে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধে দম্বল বা দই-উৎপাদক বীজাণু নিক্ষেপ করিলে কয়েক ঘণ্টা পরে ঐ দুধ দইয়ে পরিণত হয়। শির্কা বা ভিনিগার প্রস্তুত করিতে হইলেও জীবাণুর সাহায্য লইতে হয়। মদ্যে শির্কা-বীজাণু নিক্ষেপ করিলে কিয়ৎকাল পরে ঐ মদ অম্লরসে পরিণত হয়। পাঁউরুটি তৈয়ারী করিতে গেলেও খামি বা ঈষ্টের প্রয়োজন। মাখা আটা বা ময়দার মধ্যে ঈষ্ট দিলে অঙ্গারাম্ল গ্যাস উৎপন্ন হয়, আর সমস্ত জিনিষটা ফাঁপিয়া ফুলিয়া ছিদ্রবহুল হইয়া যায়। ইহার পর পাঁউরুটি অগ্নির তাপে সেঁকা হয়।

মটরশুঁটি ও শিম গাছের শিকড়ে একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু বাসা বাঁধে। ইহারা সোজাসুজি বাতাস হইতে নাইট্রোজেন গ্যাস গ্রহণ করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। মানব-সভ্যতার প্রারম্ভ

হইতেই দধিবীজ, শির্কাণু ও ঈষ্ট প্রভৃতি উপকারী জীবাণুগুলিকে সযত্নে নির্বাচন ও প্রতিপালন করা হইয়াছে।

সজীব শরীর সহজেই জীবাণুর প্রভাব প্রতিহত করে, কিন্তু কোন জীব মরিয়া গেলেই অগণিত গলনজীবাণুর আক্রমণে মৃতদেহ বিকৃত ও বিগলিত হইয়া পুনর্বার জল, বায়ু ও মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায়। সুতরাং নূতন প্রাণী ও উদ্ভিদ তাহাদের শরীর গঠনের সকল উপাদান আবার সহজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে। প্রকৃতির রাজ্যে কণামাত্র বস্তুও বিনষ্ট হয় না।

পুরীর সমুদ্রজল অন্ধকার রাত্রিতে আলোক-উদ্ভাসিত দেখিয়া অনেকেই হয়তো বিস্মিত হইয়াছেন। সমুদ্রজলের আলো বিকিরণের কারণ, নক্‌টিলুকা মিলিয়ারিসনামক আলোক-বিকিরণকারী অসংখ্য জীবাণুর অস্তিত্ব।

পচনশীল খড় ও ঘাসপাতার স্তূপে বিনা কারণে কখনও কখনও আপনা হইতেই হঠাৎ আগুন লাগিয়া যাইতে দেখা যায়। ইহার হেতু, তাপ-উৎপাদক জীবাণুর ক্রিয়াশীলতা।

এক রকম বীজাণু গন্ধকঘটিত হাইড্রোজেন গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জীবনধারণ করে। আর এক প্রকার জীবাণু অ্যামোনিয়া গ্যাসকে বিশ্লিষ্ট করিয়া প্রাণধারণ করে। সাধারণতঃ লবণাক্ত পদার্থে কোন জীবাণু জন্মায় না, কিন্তু এমন এক জাতীয় রক্তাভ বীজাণু আছে, যাহারা লবণের দানার উপরেও বাসা বাঁধিতে পারে। মোম ও ন্যাপথালিন ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, পৃথিবীতে এরূপ জীবাণুরও অস্তিত্ব আছে।

জলের কলের লোহার নলে কখনও কখনও এক রকম লৌহ-জীবাণু উৎপন্ন হয়। ইহারা লৌহ অক্সাইড উৎপাদন করিয়া এক এক সময় সমস্ত নলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। ইটের বাড়ী এবং সিমেন্ট-লৌহ ও প্রস্তরখণ্ডের সমন্বয়ে নির্মিত সৌধও জীবাণুর আক্রমণ হইতে নিস্তার পায় না। গন্ধক-জীবাণু ও নাইট্রোজেন-জীবাণু যথাক্রমে সাল-ফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিড সৃষ্টি করিয়া কালক্রমে বাড়ীর শক্ত দেয়াল ও কঠিন কংক্রিটও বিনষ্ট করিয়া ফেলে।

আর্দ্র আবহাওয়ায় কখনও কখনও রুটির গায়ে রক্তবিন্দুর মত এক রকম লাল রঙের দাগ ধরিতে দেখা যায়। মধ্যযুগে ইউরোপের কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা ইহাকে অলৌকিক কোন ব্যাপার মনে করিয়া অত্যন্ত আতঙ্কিত হইত। বলা বাহুল্য ইহার হেতুও রক্তবর্ণোৎপাদক এক রকম বীজাণু। আমাদের দেশে বাটনা বাটিবার শিলেও সময় সময় একপ্রকার ছত্রাকাণু জন্মিয়া লোকের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

টাস্‌কানির উষ্ণ প্রস্রবণে একজাতীয় বোরেসিক্‌ বীজাণু আছে, যাহারা ১০% সালফিউ-রিক অ্যাসিড দ্রবে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকে। সমুদ্রের মধ্যে এমন জীবাণুও আছে, যাহারা জাহাজ হইতে পতিত খনিজ তৈলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। এমন এক শ্রেণীর জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, যাহারা অঙ্গারের সহিত বায়ুর অক্সিজেন সম্মিলিত করিয়া উহাকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত করে। সেই জন্য বনে-জঙ্গলে নির্বাপিত অগ্নির অঙ্গারাবশেষ ক্রমশঃ বায়ুর সঙ্গে মিশিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

এই জগতেই যে কেবল জীবাণুর অস্তিত্ব আছে তাহাই নয়, জ্যোতির্বিদেরা মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই দুইটি গ্রহে উদ্ভিদ ও জীবাণুর অবস্থিতির খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

উত্তাপ ও জীবন

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়

উত্তাপের সহিত আমাদের যে নিগূঢ় সম্পর্ক, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রায় সকলেরই আছে। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যেমন আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় এবং আমরা ঠাণ্ডা খুঁজিয়া বেড়াই, দারুণ শীতেও তেমনই আমাদের শরীরকে গরম রাখিবার জন্য ব্যস্ত হই এবং গরম পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া শরীরের তাপ রক্ষার জন্য সচেষ্ট হই। এই তাপমাত্রার অত্যধিক হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। প্রতি বৎসর প্রচণ্ড শীত ও গ্রীষ্মে কতগুলি লোক প্রাণ হারায়, তাহা সংবাদপত্রের বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। সাধারণতঃ একটা নাতিশীতোষ্ণ তাপমাত্রায় আমরা থাকি ভাল ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি। সেই কারণেই সভ্য মানব আজকাল তাহার বাসভবন, আপিস, প্রমোদশালা, রেলগাড়ী প্রভৃতিতেও কৃত্রিম উপায়ে তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিতেছে।

সাধারণতঃ জড় পদার্থের কোনও নিজস্ব উত্তাপ থাকে না। তাহারা যখন যে পরিবেশের মধ্যে থাকে, তখন সেই পরিবেশেরই তাপমাত্রা বরণ করিয়া লয়। কিন্তু প্রাণীদের কথা স্বতন্ত্র। জীবনের সহিত তাপের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। তাপ-মাত্রার একটা নির্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই প্রাণের উদ্ভব ও প্রসার সম্ভব। প্রাণীরা যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণ (প্রাণীভেদে কিছুটা তারতম্য হইলেও) তাপ উৎপাদন ও বিকিরণ করে এবং তাহাদের দেহের তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় সংরক্ষণ করিয়া যায়। ইহাই জীবনের ধর্ম এবং জীবের মৃত্যু হইলেই কেবল এই তাপ উৎপাদন ও বিকিরণ বন্ধ হয়। পৃথিবীতে জীবন উদ্ভবের প্রথম ধাপে আলোক অপেক্ষা তাপমাত্রা যে অধিকতর প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা সর্বাপেক্ষা আদিম প্রাণী ব্যাক্টিরিয়াগুলির আচরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। ব্যাক্টিরিয়াগুলি উদ্ভিদজাতীয় হইলেও পত্রহরিৎবিহীন। কিন্তু ক্লোরোফিল না থাকিলে সূর্যরশ্মি কাজে লাগাইবার উপায় নাই।

তাপমাত্রার একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই কেবল জীবনের উদ্ভব, প্রসার ও বৃদ্ধি ঘটিতে পারে বলিয়া প্রাণের আবির্ভাব অতি বিস্ময়কর ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইলেও এই বিশাল বিশ্বের এক অতি তুচ্ছাতিতুচ্ছ নগণ্য অংশেই প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভবপর। কারণ মহাকাশে যে লক্ষ কোটি নক্ষত্র জ্বল জ্বল করিতেছে, সেগুলির তাপমাত্রা এতই অধিক (কয়েক সহস্র ডিগ্রী) যে, তাহাতে প্রাণ তো দূরের কথা, কোনও পদার্থই নিমেষে বাষ্পাকারে পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। এই জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড-গুলি মহাকাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; তাহা আবার এতই ঠাণ্ডা (চরম শৈত্যের মাত্র ৪° সেঃ উপরে অর্থাৎ-২৬৯° সেঃ) যে, এখানেও কোন জীব তিষ্ঠিতে পারে না। একদিকে যেমন চরম উত্তাপ, অন্যদিকে তেমনই চরম শৈত্য। নক্ষত্র হইতে বিচ্ছিন্ন অংশ-গুলি—যাহাদিগকে গ্রহ বলা হয়, তাহাদের মধ্যে যেগুলি লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া শীতল হইয়া জীবের উদ্ভব ও প্রসারের উপযোগী পরিবেশযুক্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র সেইগুলিতেই প্রাণের আবির্ভাব ও প্রসার সম্ভব। একে তো যে ভাবে সূর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে এবং অপর নক্ষত্র হইতে গ্রহসকলের জন্ম হয় বলিয়া পণ্ডিত-দের ধারণা, তাহা মহাকাশে অতিশয় বিরল ঘটনা। তাহার পর, গ্রহমাত্রেই যে শীতল হইলে তাহাতে জীবের উদ্ভব হইবে তাহা নহে। কেবল যে গ্রহগুলি

আদি নক্ষত্র হইতে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিত এবং উহা হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ উত্তাপ লাভ করিয়া জীব আবির্ভাব ও পোষণের উপযোগী পরিবেশযুক্ত হইয়াছে মাত্র, সেগুলিতেই প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব। এক লক্ষ নক্ষত্রের মধ্যে একটিতেও এইরূপ পরিবেশযুক্ত গ্রহ আছে কিনা সন্দেহ। চন্দ্র আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া অত্যধিক শীতল হইয়া গিয়াছে। আমাদের পৃথিবীও আরও কয়েক কোটি মাইল সূর্যের নিকটে বা দূরে থাকিলে তাহাতেও জীবের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। পৃথিবী সূর্য হইতে সঠিক মাত্রার সূর্যকিরণ (উত্তাপ ও আলোক) পাইতেছে বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া আছি। এই তাপমাত্রার সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলেই আমাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবার সম্ভাবনা।

জীবনের সহিত উত্তাপের এই যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহার কারণ, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি তাহা পণ্ডিতগণের মতে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য জীবকোষের সমন্বয়ে প্রাণীদেহ গঠিত, তাহাদের অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রাসায়নিক প্রক্রিয়া হইতে উদ্ভূত বৈদ্যুতিক শক্তির অভিব্যক্তি মাত্র। জীবন সম্পর্কিত এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি তাপমাত্রার একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে চলে। জীবাণু সম্পর্কিত গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ৩৭° সেঃ বা ইহার অব্যবহিত নিকটবর্তী তাপমাত্রায় সাধারণতঃ তাহারা সর্বাপেক্ষা বেশী বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে এবং ইহার উপরের দিকে বা নীচে যতই উত্তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইয়া থাকে, বংশবিস্তারও সেই অনুপাতে ক্রমশঃ মন্দীভূত হইতে থাকে। সাধারণতঃ 0° সেঃ উত্তাপে জীবকোষের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি এতই মন্দীভূত হয় যে, জীবনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় না এবং ৫০° সেঃ বা ইহার উর্ধ্বে আদৌ বংশবৃদ্ধি হয় না। তাপমাত্রার সহিত জীবাণুগুলির এই যে সম্পর্ক, তাহা মোটামুটিভাবে সকল জীবের সম্বন্ধেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। সেই কারণেই প্রাণের উদ্ভবের জন্যও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর তাপমাত্রা প্রয়োজন। প্রাণরক্ষা বা প্রাণের স্বাভাবিক কার্যগুলি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইবার জন্য বাহিরের তাপমাত্রা যাহাই হউক না কেন, প্রাণীদেহের তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় থাকা আবশ্যক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রাণীরা যতক্ষণ জীবিত থাকে, ততক্ষণই কিছুটা তাপ উৎপাদন ও বিকিরণ করিয়া থাকে। এই উত্তাপ প্রাণীরা তাহাদের প্রয়োজনমত ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের একটা অংশ দহনের দ্বারা উৎপন্ন করে। খাদ্যগ্রহণ ও তাহার আত্তীকরণ জীবনের একটা অন্যতম প্রধান ধর্ম। খাদ্যগ্রহণ করিয়া প্রাণীরা তাহা নিম্নলিখিত কার্যে ব্যবহার করিতে পারে:—(১) শরীরের অপচয় পরিপূরণ, (২) শরীর গঠন ও বৃদ্ধিসাধন, (৩) শরীরের তাপ সংরক্ষণ এবং (৪) গমনাগমন ও জীবনধারণের উপযোগী নানাবিধ কর্ম নিষ্পন্ন করিবার জন্য শক্তি উৎপাদন। ইহার মধ্যে প্রথম দুই প্রকারের কার্য উদ্ভিদ বা জন্তু সকল শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রায় সমানভাবেই চলে। তাপ উৎপাদনের জন্য ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের যে একটা অংশ দহন করিবার আবশ্যক হয়, এই দহন-প্রক্রিয়া অন্যান্য দহন-প্রক্রিয়ার ন্যায় অক্সিজেন সহযোগেই নিষ্পন্ন হয়। দেহের তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় রক্ষা করিবার জন্য যে তাপের আবশ্যক হয়, তাহা প্রাণীর প্রয়োজন অনুসারে ও শ্রেণীভেদে কিছুটা বিভিন্ন হইলেও একই শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যে সুস্থ অবস্থায় কিছুটা ঐক্য থাকে। এই দৈহিক তাপমাত্রা স্থির রাখিবার কৌশল আমাদের দেহের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে (মস্তিষ্কের তাপ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র)। যদি দৈহিক তাপ উৎপাদনের পরিমাণ প্রয়োজনাধিক হয় অথবা পারিপার্শ্বিক উত্তাপ বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ঘামিয়া উঠি এবং ঐ ঘামের বাষ্পায়নের দ্বারা দেহ শীতল করিবার চেষ্টা হয়। অন্যদিকে আবার তাপ উৎপাদন হ্রাস পাইলে বা শারীরিক উত্তাপের অপচয় ঘটিলে আমরা কাঁপিতে

থাকি এবং এই কম্পনের দ্বারা দৈহিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উদ্ভিদের চলাফেরা করিবার আবশ্যক হয় না বলিয়া তাপ উৎপাদনের জন্য এই দহনকার্য (শ্বাস-ক্রিয়া) খুব মৃদুভাবেই চলিতে থাকে। অধিকন্তু তাহারা খাদ্যদ্রব্য দহনের দ্বারা যে সামান্য তাপ উৎপাদন করে তাহাই আবার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত ও অন্যান্য গঠনকার্যে নিয়োগ করে বলিয়া তাহাদের দেহের তাপমাত্রা পারিপার্শ্বিক তাপমাত্রার প্রায় সমান থাকে।

উদ্ভিদেতর অন্যান্য প্রাণীদের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অল্পবিস্তর গতিশীল না হইয়া উপায় নাই। তাহাদের শরীরের উত্তাপও সেই কারণে কিছুটা বেশী। দৈহিক উত্তাপ সংরক্ষণের জন্য এই তাপ উৎপাদন প্রাণীদের অনাহারে থাকাকালেও একেবারে বন্ধ হয় না। তখন গ্লাইকোজেন, স্নেহপদার্থ ও অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে প্রোটিন প্রভৃতি দেহের সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য দহনের দ্বারা এই তাপ উৎপাদন চলিতে থাকে এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ইহা একেবারে বন্ধ হয় না; কারণ ইহাই জীবনের অন্যতম প্রধান ধর্ম।

দৈহিক তাপমাত্রাভেদে উদ্ভিদেতর প্রাণীদেরকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যদিও এই বিভাগ একেবারে সর্বাংশে নিখুঁত নয়।

১। উষ্ণরক্তী (Warm blooded)—মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে সমস্ত স্তন্যপায়ী (Mammals) ও পক্ষী প্রভৃতি কতকগুলি অস্তন্যপায়ী প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। ইহাদের শরীরের তাপমাত্রা অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় অনেক বেশী।

হংসচঞ্চু প্ল্যাটিপাস ও মেরুদণ্ডী পিপীলিকাভুক একিড্‌না অস্তন্যপায়ী জীবের ন্যায় ডিম পাড়ে বটে, কিন্তু ডিম হইতে শাবক বাহির হইবার পর মাতৃদুগ্ধেই পরিপুষ্ট হয়। ইহারা স্তন্যপায়ী জীবগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আদিম এবং অস্তন্যপায়ী ও স্তন্যপায়ী জীবের সামারেখায় অবস্থিত। ইহারাও উষ্ণরক্তী।

২। শীতলরক্তী (Cold blooded):—সকল অমেরুদণ্ডী প্রাণী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মৎস্য, উভচর (Amphibia) ও সরীসৃপ এই পর্যায়ভুক্ত। ইহাদের শরীরের উত্তাপ উষ্ণরক্তী প্রাণীদের তুলনায় অনেক কম। কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর গড় দৈহিক তাপমাত্রা নিম্নের তালিকায় প্রদত্ত হইল:—

মেরুদণ্ডী স্তন্যপায়ী

তাপমাত্রা ফারেনহাইট ডিগ্রিতে

বানর—৯৯	গাধা—৯৮
কুকুর—১০২	হাতী—১০০
বিড়াল—১০২	ঘোড়া—৯৯
গরু—১০২	খরগোস—১০০
ছাগল—১০৪	বড় ইঁদুর—১০২
ভেড়া—১০৪	কাঠবিড়ালী—১০২
বাঘ—৯৯	গিনিপিগ—১০০
শূকর—১০৫	শুশুক—১০০
শৃগাল—১০১-১০২	

মেরুদণ্ডী অস্তন্যপায়ী পক্ষীজাতীয়

চড়ুই—১০৮	মুরগী শাবক—১১১
কাক—১০৯	দাঁড় কাক—১০৭
পাতিহাঁস—১০৯	মুরগী—১০৮
রাজহাঁস—১১১	টিয়া পাখী—১০৬

শীতলরক্তী

তাপমাত্রা ফারেনহাইট ডিগ্রিতে

জোনাকী—৭৪
ঝিনুক—৮২
ব্যাং—৫৮-৬৩
জোঁক—৫৭
শামুক—৭৬
সাপ—৬৮-৮৪

উপরের তালিকা হইতে দেখা যায় যে, উষ্ণরক্তী প্রাণীদের মধ্যে পক্ষীদের স্বাভাবিক দৈহিক তাপই সর্বাপেক্ষা অধিক। এই উচ্চ দৈহিক তাপমাত্রা অধিক চাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতার দ্যোতক। স্তন্যপায়ী জীবগণের (মানুষেরও) দৈহিক তাপমাত্রা পক্ষীদের তুলনায় কিছুটা কম হইলেও মোটামুটি প্রায় একই, তবে প্রজাতি-ভেদে সামান্য তারতম্য থাকে। সুস্থাবস্থায় মানুষের দৈহিক তাপমাত্রা গড়ে ৯৮'৪° ফাঃ, কিন্তু দিবারাত্রির মধ্যে কিছুটা কমবেশী হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় এবং রাত্রি ৪ ঘটিকা পর্যন্ত ইহা সর্বাপেক্ষা কম থাকে, আবার সন্ধ্যার দিকে তেমনই কিছুটা (১° আন্দাজ) বেশী হয়। তিমি ও শুশুক জলচর প্রাণী হইলেও ইহারা মৎস্য নহে। ইহারা ডিম পাড়ে না, শাবক প্রসব করে ও স্তন্যপায়ী। সেই কারণে অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবগণের ন্যায় ইহারা উষ্ণরক্তী শ্রেণীভুক্ত। বাদুড় একটি অদ্ভুত জীব। গ্রীষ্মকালে বাদুড়ের দৈহিক তাপ উষ্ণরক্তী পক্ষীদের মতই হয় বটে; কিন্তু শীতকালে ইহারা যখন শীত-ঘুমে কাটায়, তখন ইহাদের শরীর খুব শীতল হইয়া যায় এবং জড়পিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করে।

সাধারণভাবে ৩৭° সেণ্টিগ্রেড বা তাহার নিকটবর্তী তাপমাত্রা জীবদের বংশবৃদ্ধির পক্ষে উপযোগী হইলেও প্রাণীজগতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম এবং উষ্ণতা বা শৈত্যের সহনশীলতার দৃষ্টান্ত একেবারে বিরল নয়। কতকগুলি জীবাণু O° সেণ্টিগ্রেড শৈত্যেও বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। সাধারণ Haybacillus. ৬° সেঃ উত্তাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কোন কোন উষ্ণপ্রস্রবণে Cyanoplyceae (Blue-green algae) যেগুলি ক্রমবিকাশের ধাপে Bacteria ও Algae-এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত, সেগুলি ৬৩° সেঃ উত্তাপ সহ্য করিতে পারে এবং ৭৩° সেঃ উত্তাপে মরিয়া যায়। ৮৯° সেঃ উত্তাপেও Bacteria-কে জীবিত থাকিতে দেখা যায় এবং কতকগুলি বীজভূত জীবাণু (Spores of certain bacilli) ১০৫° সেঃ উত্তাপেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আইসল্যাণ্ড এবং অন্যান্য কতকগুলি স্থানের উষ্ণপ্রস্রবণগুলিতে কতকগুলি কীট-পতঙ্গ জাতীয় জীব দেখা যায়, যাহারা ৭০° সেঃ উত্তাপও সহ্য করিতে পারে। এই তাপমাত্রায় সাধারণতঃ জীবদেহের প্রোটিনগুলি ডেলা বাঁধিয়া যায় এবং জীবের মৃত্যু ঘটে। ইহা জীবের তাপ সহনশীলতার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উপরের দিকে এই সহনশীলতার একটা সীমা থাকিলেও নীচের দিকে, অর্থাৎ কি পরিমাণ বিশুষ্ক শৈত্য প্রাণী সহ্য করিতে পারে, তাহা এক প্রকার অসীম বলিলেই হয়। কতকগুলি বীজভূত জীবাণু তরল হাইড্রোজেনের (প্রায় -২৫০° সেঃ) শৈত্যে রাখা হইলেও জীবিত থাকিতে দেখা যায়। যে শৈত্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি সংঘটিত হইতে পারে, ইহা তাহার বহু নীচে। এই তথ্য হইতেই পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই পৃথিবীতেই প্রাথমিকভাবে জীবের উদ্ভব হয় নাই, গ্রহান্তর হইতে আগত এই সকল বীজভূত জীবাণু হইতেই পৃথিবীতে জীবের সূত্রপাত হইয়াছিল।

পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য স্বাবলম্বনের পথে

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের প্রধান কর্তব্য হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় রূপদান করা। কেন না, সমাজের সর্বস্তরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি না ঘটলে একদিকে

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপক প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে গিয়ে দেখা গেল, শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা এখনও গোবরের যুগেই রয়ে গেছি। গোবর যতই পবিত্র বা জ্বালানী প্রস্তুতের
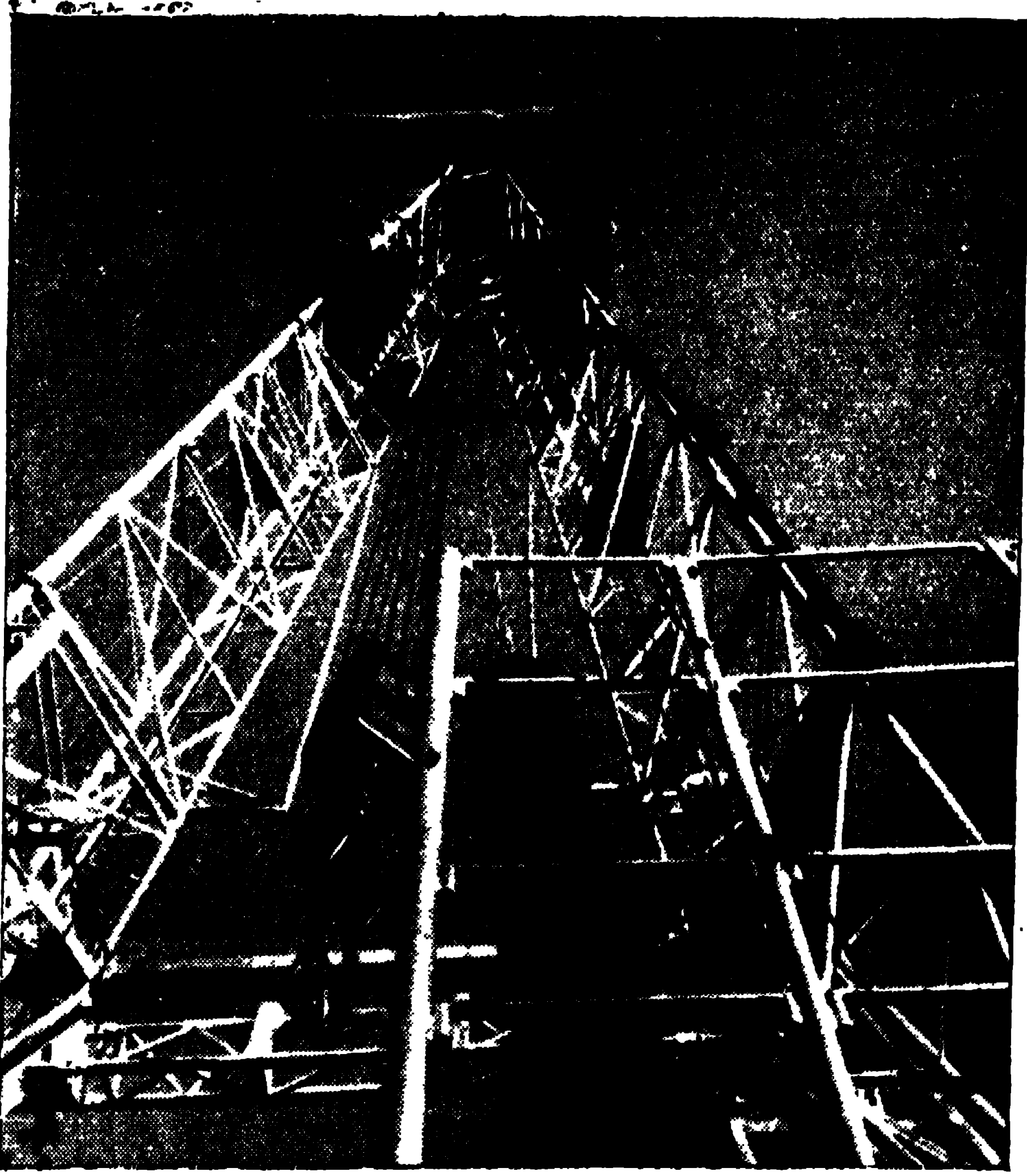
১নং চিত্র।

গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরের এক তৈলকূপের ডেরিকের দৃশ্য।

যেমন দেশের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হবে, অপর দিকে তেমনি স্বাধীনতা নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। এমন কি—প্রভূত মূল্য দিয়ে আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করেছি, তা রক্ষা করাও হয়তো দুরূহ হয়ে উঠবে।

উপযোগী হোক, বৃহৎ শিল্প, ট্র্যাক্টর, বাস, বিমান ও জাহাজ চালনায় তা একেবারেই অচল।

আধুনিক যুগে শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কয়লা ও বিদ্যুৎ ছাড়া পেট্রোলই হলো সর্বাপেক্ষা

প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কৃষি, শিল্প, পরিবহন এবং প্রতিরক্ষায় পেট্রোল আজ অপরিহার্য।

১৯৪৮ সালে ভারতে পেট্রোলজাত দ্রব্যের চাহিদা ছিল ২৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৬০ সালে তা বেড়ে গিয়ে ৭৬ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়; অর্থাৎ চাহিদা বছরে প্রায় ১০.৬ শতাংশ হারে বেড়ে গেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে চাহিদা হবে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ মেট্রিক টন।

কিছুকাল আগেও ভারতের প্রয়োজনীয় পেট্রোলজাত দ্রব্যের প্রায় সবটাই আমদানী করা হতো। কেবলমাত্র ডিগবয় শোধনাগারে ৫ লক্ষ টন পেট্রোলজাত দ্রব্য উৎপন্ন হতো। এইভাবে পেট্রোল ও তজ্জাত দ্রব্যের জন্যে প্রতি বছরই বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়ে যেত। বৈদেশিক মুদ্রার এই অপচয় বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে সরকার দেশেই শোধনাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন।

স্বাধীন ভারতের প্রথম শোধনাগার স্থাপিত হয় ট্রম্বেতে। এর মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম কোম্পানী। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে এখানে উৎপাদন আরম্ভ হয়। এর পরেই ট্রম্বেতে বার্মাশেলের একটি শোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা হলো ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। তৃতীয় শোধনাগারটি স্থাপিত হয়েছে বিশাখাপত্তনমে। এর মালিক হলো ক্যালটেক্স। এখানে বছরে ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্য উৎপন্ন হবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের

২নং চিত্র।
গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরে তৈলকূপ খননের দৃশ্য।

চাহিদাও বেড়ে চলে তখন আরও অনেকগুলি শোধনাগার স্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির প্রস্তাবে স্থির হয় যে, ভবিষ্যতে প্রধানতঃ সরকারী উদ্যোগেই তৈল শিল্পের উন্নতি সাধিত হবে। সরকারী উদ্যোগে শোধনাগার নির্মাণ, পরিচালনা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৮ সালে ইণ্ডিয়ান রিফাইনারিজ হয়। প্রথমটির জন্যে রুমানিয়ার এবং দ্বিতীয়টির জন্যে রাশিয়ার সাহায্যে পাওয়া যায়।

এর মধ্যে ভারত সরকার বার্মা অয়েল কোম্পানীর সহযোগিতায় খনিজ তেল অনুসন্ধানের জন্যে অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। এই সংস্থা কয়েক স্থানে খনিজ তেল আবিষ্কারে সাফল্যলাভ করে।
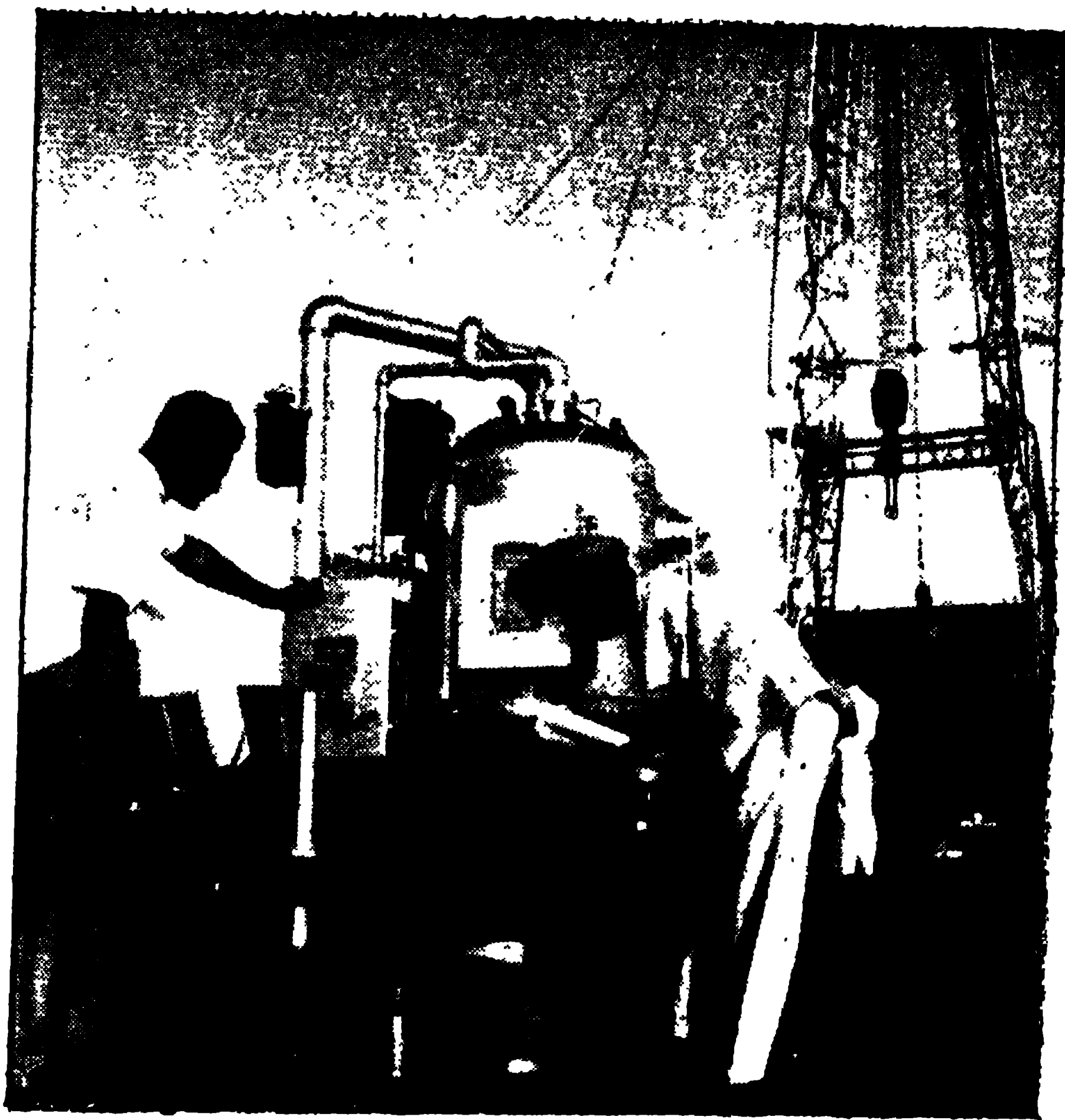
৩নং চিত্র।

গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরে অবস্থিত একটি নতুন তৈলকূপের ডেরিক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির দৃশ্য।

লিঃ নামে একটি সরকারী সংস্থা গঠন করা হয়। গৌহাটির কাছে নূনমাটিতে সাড়ে সাত লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার একটি এবং বিহারের বারাউনিতে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার আর একটি শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করা

গুজরাটের আঙ্কেলেশ্বরে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন খনিজ তেলের সন্ধান পান। এই তেল শোধনের জন্যে রাশিয়ায় সহযোগিতায় আর একটি শোধনাগার স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়। এর ক্ষমতা হবে ২০ লক্ষ মেট্রিক টন।

এভাবেই সরকারী উদ্যোগে খনিজ তেল শোধনের মোট ক্ষমতা দাঁড়াবে ৪১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন।

দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে এই ক্ষমতাও যথেষ্ট নয়। কাজেই সরকারকে শোধনাগারগুলির উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণে উদ্যোগী হতে হয়েছে। নুনমাটি শোধনাগারটির ক্ষমতা বাড়িয়ে সাড়ে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন করা হচ্ছে। স্থাপন করা হবে। এর উৎপাদন ক্ষমতা হবে ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন।

উৎপাদন সুরু হবার পর থেকেই শোধনাগারগুলির উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। পাঁচ বছরে 'এস্সো' প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ১২ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪ লক্ষ মেট্রিক টন। বার্মাশেলের উৎপাদন ২০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে

৪নং চিত্র।

আসামের নুনমাটিতে অপরিশোধিত তৈল শোধনের প্ল্যাণ্ট।

বারাউনি ও কোইয়ালী শোধনাগারের প্রত্যেকটির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে করা হবে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপ্স্ পেট্রোলিয়াম-এর সহযোগিতায় কোচিনে একটি শোধনাগার এবং ক্যালটেক্স প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। এখন বেসরকারী উদ্যোগে তেল শোধনের ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ৭৪ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন।

১৯৬৬ সালে দেশে পেট্রোল ও পেট্রোলজাত দ্রব্যের চাহিদা হবে প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সে সময়ে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের মোট উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়াবে ১ কোটি ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কাজেই চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন ক্ষমতা কিছু বেশীই থেকে যাবে। তখন পেট্রোল এবং পেট্রোলজাত দ্রব্যে দেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠলেও সরকার পরবর্তী পরিকল্পনা-কালে চাহিদা কিভাবে মেটানো যেতে পারে, তা এখন থেকেই বিবেচনা করে দেখছেন। আশা করা যায়, এই সময়ের পরে এই অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্যে ভারতকে আর পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না।

ক্যান্সার

আর্কাদি সিমোনিয়ান এই সম্বন্ধে লিখেছেন —ক্যান্সার ব্যাধির কারণতত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানীরা বহুকাল যাবৎ চিন্তা করে আসছেন। তাঁদের নিরলস গবেষণার ফলে এই বিষয়ে অনেক কথা জানা গেছে এবং আরো অনেক কথা ভবিষ্যতে জানা যাবে। আশা করা যায়, ক্যান্সার রোগ কেন হয় ও কিভাবে হয়, তার একটা সদুত্তর পেতে খুব বেশী কাল অপেক্ষা করতে হবে না।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ক্যান্সারের কারণ যদি একপ্রকার ভাইরাসই হয়, তথাপি বলতেই হবে এই ভাইরাসের প্রভাব টিউমারের আবির্ভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই প্রাথমিক অমঙ্গল সাধনের পরে ব্যাধির পরবর্তী ক্রমবিকাশে ভাইরাসের কোন ভূমিকা নেই। এমন যদি হয় যে, ক্যান্সারের কোন ভাইরাস নেই এবং এই ব্যাধির সূত্রপাত হয় বিবিধ শারীরিক ও রাসায়নিক কারণে—তাহলে ?

টিউমারের মারাত্মক বৃদ্ধির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশদ পর্যালোচনা থেকে এই প্রশ্নের একটা উত্তর মিলতে পারে।

ক্যান্সার রোগের মূল কারণ বা উৎস সম্পর্কে অর্বুদবিদ্যা-বিশেষজ্ঞেরা শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্তেই পৌঁছুন না কেন, একটা বিষয় ইতিমধ্যেই তাঁদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, টিউমারের মারাত্মক বৃদ্ধির প্রধান প্রধান কারণগুলির একটি হচ্ছে—সেল্ বা কোষের মধ্যে মেটাবলিজম বা বিপাক-ক্রিয়ার ব্যত্যয়।

বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে টিউমার সৃষ্টি করে দেখেছেন, টিস্যু বা তন্তুর মধ্যে কোষের সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যাপক লুয়ারসাব সারাসিদ্জে বলেছেন—কিছু কাল আগে পর্যন্তও মনে করা হতো, কোষগত কার্যকলাপের প্রাবল্যের ফলে তন্তুর মধ্যে কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তন্তুর বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনুশীলন করে অঙ্গসংস্থানবিদেরা বহুসংখ্যক কোষকে বিভাজনের অবস্থায় দেখতে পান। আমরা আমাদের ইন্‌ষ্টিটিউটে এক নতুন পদ্ধতির সাহায্যে এই অনুমানের সত্যতা নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছি। আমরা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি। আমাদের মতে, কোষগুলির সংখ্যা-বৃদ্ধি থেকেই হয়তো টিউমার দেখা দেয়—কোষের কার্যকলাপের অবদমনের ফলে।

কোষের বিপাক-ক্রিয়া যখন বিঘ্নিত হয়, তখন কোষগুলির বিভাজনের কালচক্র বৃদ্ধি পায়। কোষের পরিবেশ পরিবর্তিত হয় এবং তার পুষ্টির অবনতি ঘটে। কিন্তু দু-একটি কোষ অবস্থার অবনতির সময় অধিকতর দ্রুততার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এই কোষগুলির শ্লথগতির

শৃঙ্খলা লঙ্ঘন করে সামনে ঝুঁকে পড়ে' এক মারাত্মক ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

অধ্যাপক সারাসিদ্‌জ সম্প্রতি এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন ওয়ার-স মহানগরীতে অনুষ্ঠিত হিস্টো-কেমিস্টদের প্রথম আন্তর্জাতিক আলোচনার আসরে।

ঐ আলোচনার আসরে যোগদানকারী ফরাসী অর্বুদবিদ্যাবিশেষজ্ঞ সেসিলিয়া ভেঁদ্রোল ও পোল্যাণ্ডের চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ডুস্ক বলেন যে, তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলের নৈকট্য ও সাদৃশ্য আছে।

ইস্পাত-শিল্প উন্নয়নে মুক্ত-কুণ্ড চুল্লী

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

ইস্পাতকে বাদ দিয়ে বর্তমান সভ্যতার কথা চিন্তা করা যায় না। প্রচুর পরিমাণে ভাল ইস্পাত সস্তায় উৎপাদন করা সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ যন্ত্র-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার এই ঐন্দ্রজালিক উন্নতি ছিল কল্পনাতীত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সার হেনরী বেসিমার বিখ্যাত কনভার্টার চুল্লী আবিষ্কার করেন, যা 'বেসিমার কনভার্টার' নামে সর্বত্র পরিচিত। এই চুল্লীতে তোড়-চুল্লী (Blast Furnace) থেকে নির্গত গলিত পিগ-লোহাকে ইস্পাতে পরিণত করা যায়। ফলে, এই প্রথম প্রচুর পরিমাণে ইস্পাত তৈরী করা সম্ভব হলো। এই ইস্পাত যেমন দামে সস্তা, গুণেও তেমনি ভাল। এই চুল্লী আবিষ্কারের পূর্বে সিমেন্টেশন পদ্ধতিতে অথবা ক্রুসিব্‌ল্-এর মধ্যে গলিয়ে কিছু কিছু ইস্পাত তৈরী হতো। কিন্তু এসব ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ বেশী থাকায় এগুলি হতো খুবই শক্ত। ফলে নানারকম প্রয়োজনে সহজে এগুলিকে নানাভাবে বাঁকিয়ে বিভিন্ন রকম রূপ দেওয়া সম্ভব হতো না। অন্যদিকে পেটাই লোহা (Wrought iron) নামক যে অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ লোহা তখন তৈরী হতো, তার মধ্যে কার্বন একরকম না থাকায় সেগুলি হতো খুবই নরম। ফলে এই পেটাই লোহা দিয়ে কোন শক্ত এবং স্থায়ী যন্ত্রাংশ তৈরী করা সুবিধাজনক হতো না। কিন্তু বেসিমার চুল্লী থেকে যে নরম ইস্পাত পাওয়া গেল, সেগুলির গুণাবলী অতি নমনীয় পেটাই লোহা এবং অত্যন্ত শক্ত ক্রুসিবল্ ইস্পাতের মাঝামাঝি। কাজেই নানারকম যন্ত্র তৈরী, যন্ত্র-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন কাজে তার উপযোগিতা দেখা গেল। এতদিন পর্যন্ত ইস্পাতের ব্যবহার ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। ছুরি, কাঁচি, দা, তলোয়ার প্রভৃতি নানারকম কাটবার যন্ত্র, নানারকম জিনিষ খোদাই করবার যন্ত্র, ছোট এবং সরল গঠনের কোন যন্ত্র এবং অন্যান্য ছোটখাট জিনিষ তৈরী করতেই সাধারণতঃ তার ব্যবহার হতো। এবার সুরু হলো সুদীর্ঘ রেলপথ বসাবার কাজ, নদীর উপর বড় বড় সেতু নির্মাণ, বিশাল আকৃতির অট্টালিকার কাঠামো তৈরী এবং নানারকম জটিল ও শক্তিশালী যন্ত্র নির্মাণের কাজ।

বেসিমার তাঁর এই ইস্পাত উৎপাদন পদ্ধতির পেটেন্ট নিয়েছিলেন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ফলে তাঁর অনুমতি ছাড়া আর কারো পক্ষে এই পদ্ধতিতে ইস্পাত তৈরী করা সম্ভব ছিল না। কাজেই নানা জায়গায় জোর চেষ্টা চলতে থাকে, অন্য কোন নতুন কৌশলে পিগ লোহা থেকে ইস্পাত তৈরী করা যায় কিনা। বহুকাল আগে ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রোমার ইস্পাত তৈরীর একটা নতুন পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর

মতে, রিভারবারেটরী বা অনুরূপ কোন চুল্লীতে ঢালাই লোহা (Cast iron) এবং পেটাই লোহাকে একত্রে গলিয়ে মেশালেই ইস্পাত তৈরী হওয়া সম্ভব। সে সময়ে এই বিষয়ে কিছুটা চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় নি। বেসিমারের সাফল্য লাভের পর এই বিষয়ে আবার চেষ্টা সুরু হয়। কিন্তু এই ব্যাপারে একটা খুব বড় অসুবিধা দেখা গেল যে, ইস্পাত তৈরীর জন্যে যে পরিমাণ তাপমাত্রা দরকার, তা কিছুতেই তোলা সম্ভব নয়। অধিক উদ্বায়ী পদার্থযুক্ত কাচা কয়লা জ্বালিয়ে এবং তার উপরে উচ্চ চাপে হাওয়া ঢুকিয়ে তাপমাত্রা কিছু বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু চুল্লীতে গলিত পিগ লোহা যতই ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠতে থাকে, ততই গলনাঙ্ক বৃদ্ধির ফলে তার তরলতা কমে গিয়ে আঠার মত হয়ে ওঠে; অর্থাৎ ইস্পাতকে গলিত তরল অবস্থায় রাখবার জন্যে যে পরিমাণ তাপের দরকার, তা এই পদ্ধতিতে পাওয়া সম্ভব নয়। উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ফ্রান্সের সিরাই নামক স্থানে এমিলী ও তাঁর পুত্র পেরী মার্টিন এই বিসয়ে কাজ করছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করে দেখছিলেন, কাচ তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত একটা রিভারবারেটরী চুল্লীকে একটু অদল-বদল করে নিয়ে তার মধ্যে ইস্পাত তৈরী করা যায় কি না। কয়েক বছর ধরে নানাভাবে চেষ্টা করেও তাঁরা প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা তুলতে পারলেন না এবং বুঝলেন যে, ঠাণ্ডা হাওয়া ব্যবহার করে ইস্পাতকে গলিত অবস্থায় রাখবার উপযোগী তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

এদিকে প্রায় একই সময়ে ইংল্যাণ্ডে কার্ল উইলহেল্‌ম্‌ সিমেনস্‌ কাচ তৈরীর চুল্লীতে পুনরুৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা তাপ বৃদ্ধির কৌশল আবিষ্কার করেন। সিমেনস্‌ জাতিতে জার্মান, কিন্তু ইংল্যাণ্ডের নাগরিক ছিলেন। তিনি চুল্লীর কুণ্ড থেকে নির্গত দগ্ধাবশিষ্ট অত্যন্ত উত্তপ্ত গ্যাস এবং ধোঁয়ার তাপকে একটি বিশেষ কৌশলে চুল্লীতে প্রবেশকারী হাওয়া উত্তপ্ত করবার জন্যে ব্যবহার করেন। কৌশলটি এই রকম—উত্তপ্ত ধোঁয়া এবং গ্যাস চুল্লীর পাশে অবস্থিত একটা নাতিদীর্ঘ সুড়ঙ্গ-পথের মধ্য দিয়ে চালিত করা হয়। ঐ সুড়ঙ্গের ভিতরটায় অগ্নিসহ ইটের আস্তরণ দেওয়া থাকে। ফলে উত্তপ্ত গ্যাসের স্পর্শে সুড়ঙ্গ-পথটি গরম হয়। এবার বাইরে থেকে টেনে নেওয়া ঠাণ্ডা হাওয়া যদি এই গরম সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তবে পথের স্পর্শে হাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এভাবে পূর্বোত্তপ্ত হাওয়া যদি চুল্লীতে ঢুকে কয়লার দহনে সাহায্য করে, তবে যে অগ্নিশিখা তৈরী হবে, তার তাপ অনেক বেশী হবে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সিমেনস্‌ তাঁর এই তাপ-পুনরুৎপাদন পদ্ধতির পেটেন্ট নেন।

সিমেন্‌স্‌-এর এই নতুন পদ্ধতির সাফল্যের সংবাদ ফ্রান্সের মার্টিন পরিবারে গিয়ে পৌঁছুতে দেরী হলো না। তাঁরা তখন তাঁদের ইস্পাত তৈরীর চুল্লীতে এই তাপ পুনরুৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করবার জন্যে সিমেন্‌স্‌-এর কাছ থেকে লাইসেন্স নিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁরা প্রথম তাঁদের চুল্লীতে ইস্পাত উৎপাদন করতে সক্ষম হন। তাদের পদ্ধতির নাম “পিগ এবং স্ক্র্যাপ পদ্ধতি” (Pig and Scrap process); কারণ তাঁরা পিগ লোহার সঙ্গে পেটাই লোহার ছাটাই টুক্‌রা একত্রে গালিয়ে ইস্পাত তৈরী করেছিলেন। পিগ লোহার মধ্যে কার্বনের পরিমাণ খুব বেশী, পেটাই লোহায় খুব কম, আর ইস্পাতে মাঝামাঝি। কাজেই পিগ লোহার সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে পেটাই লোহা মেশালে লোহার মধ্যেকার কার্বন-ঘনতা বিভিন্ন মাত্রায় কমে যাবে এবং বিভিন্ন রকমের ইস্পাত তৈরী হবে। মার্টিনরা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁদের এই নতুন ইস্পাত তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে পেটেন্ট নেন। এই হলো মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীর (Open Hearth Furnace) জন্মের ইতিহাস।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্ভবতঃ মার্টিনদের এই

সাফল্যের সংবাদ পেয়েই সিমেন্‌স্ স্বয়ং ইস্পাত তৈরীর কাজে তাঁর তাপ-পুনরুৎপাদন পদ্ধতিটি ব্যবহার করে দেখতে মনস্থ করেন এবং তাঁর উদ্ভাবনী প্রতিভাকে কাচ-শিল্প থেকে ফিরিয়ে ইস্পাত-শিল্পে নিবিষ্ট করান। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দেই তিনি তাঁর চুল্লীতে ইস্পাত তৈরী করতে সক্ষম হন। তাঁর পদ্ধতিটি মার্টিনদের পদ্ধতি থেকে একটু আলাদা। এই পদ্ধতির নাম 'পিগ এবং আকরিক পদ্ধতি' (Pig and Ore process)। কারণ এখানে পিগ লোহার সঙ্গে কিছুটা আকরিক লোহা মিশিয়ে তাদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে ইস্পাত তৈরী হতো। পিগ লোহার মধ্যে কার্বনের পরিমাণ বেশী। ইস্পাত তৈরী করতে হলে এই কার্বনের পরিমাণ কমিয়ে আনা দরকার, অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পিগ লোহা থেকে কিছুটা কার্বনকে পুড়িয়ে বের করে দেওয়া দরকার। লৌহ আকরিক আসলে আয়রন অক্সাইড। কাজেই চুল্লীর মধ্যে পিগ লোহার সঙ্গে মিশিয়ে তাকে উত্তপ্ত করলে আয়রন অক্সাইড ভেঙে তাথেকে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হবে। এই অক্সিজেন পিগ লোহার ভিতরকার কিছুটা কার্বন পুড়িয়ে কার্বন মনক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস হিসাবে চুল্লী থেকে বেরিয়ে যাবে। ইস্পাতে যতটুকু অবশিষ্ট কার্বন রাখবার দরকার, তা বাদে পিগ লোহার মধ্যেকার বাকী কার্বনটুকু পোড়াবার জন্যে যতটুকু আকরিক দরকার, হিসাবমত ঠিক ততটুকু আকরিক ব্যবহার করা হয়। এভাবে আকরিকের পরিমাণ কম-বেশী করে বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ইস্পাত তৈরী করা সম্ভব।

ইস্পাত তৈরীর চুল্লী নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সিমেন্‌স্ তাঁর তাপ-পুনরুৎপাদন পদ্ধতিটির প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। তিনিই প্রথম চুল্লীর জ্বালানী-কুণ্ডকে চুল্লী থেকে আলাদা করেন এবং কঠিন জ্বালানী অর্থাৎ কয়লার বদলে গ্যাসের সাহায্যে চুল্লীর কুণ্ডে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেন। এজন্যে বাইরে একটা গ্যাস-উৎপাদক যন্ত্র বসাতে হয়েছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আধুনিক মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীর মূল সংগঠন এবং ক্রিয়া-কৌশলগুলি প্রায় সবই তাঁর হাতে রূপায়িত হয়। এগুলি হলো—(১) গ্যাসীয় জ্বালানী ব্যবহার, (২) গ্যাস এবং হাওয়া উভয়কেই পূর্বোত্তপ্ত করবার জন্যে তাপ-পুনরুৎপাদক সুড়ঙ্গ ব্যবহার, (৩) সিলিকা-ইট দিয়ে তৈরী চুল্লীর হাল্কা ছাদ এবং (৪) লৌহ আকরিকের দ্বারা পিগ লোহার বিশুদ্ধিকরণ।

সিমেন্‌স্-এর চুল্লীর অন্তর্দেয়াল আগাগোড়া, অর্থাৎ ছাদ, পার্শ্বদেয়াল এবং কুণ্ডস্থান (Hearth) প্রভৃতি সিলিকা জাতীয় অগ্নিসহ ইট দিয়ে তৈরী ছিল। ফলে এই চুল্লী বর্তমান অম্লাত্মক মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীর (Acid Open Hearth Furnace) মতই ছিল। তখন পর্যন্তও ক্ষারীয় (Basic) পদ্ধতির ব্যবহার উদ্ভাবিত হয় নি। ফলে এই চুল্লীতে পিগ লোহার মধ্যেকার সালফার (গন্ধক) এবং ফস্‌ফরাস নামক দুটি ক্ষতিকর মল দূর করা যেত না। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে টমাস এবং গিলক্রাইষ্ট নামক দুজন ইংরেজ ধাতুবিদ বেসিমার চুল্লীতে ক্ষারীয় পদ্ধতি ব্যবহার করে ফস্‌ফরাস এবং সালফার দূরীকরণের কৌশল আবিষ্কার করেন। তাঁদের এই সাফল্যের সংবাদ ইউরোপ ও আমেরিকায় খুব দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে সর্বত্র চেষ্টা চলতে থাকে কি ভাবে বেসিমার চুল্লীতে ব্যবহৃত পদ্ধতির মূল কৌশলটি মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীতেও ব্যবহার করা যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ওহিও নামক স্থানে গোয়েজ এবং ওয়েলম্যান প্রথম ক্ষারীয় পদ্ধতিতে মুক্ত-কুণ্ড চুল্লীতে ইস্পাত তৈরী করতে সক্ষম হন। ইউরোপে প্রথম হয় ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, ওয়েলস-এর ব্রিম্বো নামক স্থানে। ধাতু-বিদের নাম জে. এইচ. ডার্বি।

এই চুল্লীতে তাপ-সৃষ্টিকারী অগ্নিশিখা সোজা-সুজি চুল্লীর কুণ্ডে প্রবেশ করে এবং ধাতুর গলন ও শোধন-ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেয়, অর্থাৎ এখানে চুল্লীর কুণ্ড এবং কুণ্ডস্থ ধাতু অগ্নিশিখার কাছে মুক্ত। এই জন্যেই চুলীর নাম 'মুক্ত-কুণ্ড চুল্লী' এবং এই নামই সাধারণভাবে সর্বত্র প্রচলিত। তবে অনেক সময় একে সিমেন্‌স্-মার্টিন চুল্লীও বলা হয় এবং ফ্রান্সে একেই মার্টিন-চুল্লী নামে অভিহিত করা হয়। অনেক সময় আবার সিমেন্‌স্ চুল্লী বলতে শুধু অম্ল-পদ্ধতি (Acid process), সিমেন্‌স-মার্টিন চুল্লী বলতে শুধু ক্ষারীয় পদ্ধতি (Basic process) এবং মুক্ত-কুণ্ড চুল্লী বলতে অম্ল বা ক্ষারীয়—উভয় পদ্ধতিকেই বোঝানো হয়ে থাকে।

পাখীর বাসা

নাজিম্ উদ্দিন আহম্মদ

পাখীরা কেবল নীড়ই রচনা করে না—সৌকর্য ও পরিপাট্যের জন্যে পাখীর বাসার একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যে কারণে বসবাসের নিমিত্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্থায়ী নিবাসকে আমরা "বাসা" বলে উল্লেখ করি, পাখীদের বাসা নির্মাণেও সে সব কারণ বর্তমান। বিভিন্ন জাতি, উপজাতি এবং বর্ণ বৈচিত্র্যের মত পাখীর বাসারও বৈচিত্র্যের সীমা নেই। আদিম পাখীদের বাসা নির্মাণের পদ্ধতি সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মত। মাটির মধ্যে গর্ত করে বাসা তৈরী হয়।

বিবর্তনবাদীদের মতে, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকে পক্ষী জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব—এটি হলো তার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু আধুনিক পাখীরা, পৃথিবীতে যাদের আবির্ভাব ঘটেছে অপেক্ষাকৃত পরে—ঘাস-পাতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বয়নোপযোগী উপকরণের সাহায্যে বৃতি, স্থলী বা ডিম্বাকৃতির বাসা নির্মাণ করে। কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখীরা কিন্তু বাসা নির্মাণ করে না, অন্য পাখীদের বাসায় ডিম পেড়ে পরভৃতিক জীবনযাপন করে।

বিভিন্ন প্রকার পাখীদের বাসা নির্মাণের জন্যে স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ কৌশল বিভিন্ন।

(ক) স্থান নির্বাচন :—পাখীদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে তারা গাছের শাখায় অথবা কোটরে, পাহাড়ের উপর অথবা কন্দরে, মরুভূমির বালির উপর অথবা মাটির নীচে, সমুদ্রতীরের বালি অথবা পাথরের নুড়ির মধ্যে বাসা নির্মাণ করে।

অস্ট্রিচ বা উটপাখীরা ডিমগুলিকে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মত জমা করে মরুভূমির উত্তপ্ত বালির উপর।

গ্যানেট—এই সামুদ্রিক পাখীরা চতুর্দিকে জল-বেষ্টিত দ্বীপে বা পাহাড়ের উপর সামুদ্রিক উদ্ভিদের সাহায্যে বাসা বাঁধে।

ঈগল—সাধারণতঃ উঁচু গাছের পত্রহীন শাখায় বাসা বাঁধে। এই ব্যাপারে শকুনের রুচিও অনুরূপ।

হামিংবার্ড—হামিংবার্ড পছন্দ করে ছায়াচ্ছন্ন ঘন ঝোপের নিম্নদেশ।

বক—আমাদের দেশের সাদা ও নিশাচর বকেরা বাসা নির্মাণের জন্যে নদী বা জলাশয়ের নিকটবর্তী উচ্চ কিন্তু ঝোপযুক্ত গাছ পছন্দ করে। বকের বাসা যেন একটি আদর্শ অবলোকন-কেন্দ্রের (Observatory) হিসেবে কাজে আসে।

কার্যক্ষেত্রে এই স্থান নির্বাচন এত দীর্ঘকাল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে ওঠে যে, এর ফলে প্রচুর ডিম এবং শাবকের প্রাণহানি ঘটে।

হোট্‌জিন—ব্রেজিলের হোট্‌জিনেরা নদীর উপর প্রলম্বিত ডালে বাসা বাঁধে। এর একটা বিশেষ কারণ আছে। হোট্‌জিন-শাবক চোখ ফোটবার পর থেকেই পা ও ডানার সাহায্যে গাছের শাখায় শাখায় ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। কিন্তু বিপত্তি ঘটে তখন, যখন কোন বানর বা গেছো-সাপ এই সময় আবির্ভূত হয়।

এরূপ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হলে এই পক্ষীশাবকেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করে এবং বিপদ দূরীভূত হলে আবাব পুর্বস্থানে ফিরে আসে। (ব্রাইটওয়েল—১৯৪৯)

মরু-রেন—অ্যারিজোনার মরু অঞ্চলের রেন পাখীরা বিশাল ফণীমনসা গাছের কাণ্ডে বাসা প্রস্তুত করে। এই গাছের কাণ্ড ঘন কাঁটার আস্তরণে ঢাকা থাকে। কিন্তু এই অধ্যবসায়ী পাখীরা কঠিন শ্রমে তারই মধ্যে বাসা বেঁধে হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে।

পেট্রেল—সরীসৃপদের আমরা গৃহসহচররূপে কল্পনা করতেও অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার একপ্রকার সামুদ্রিক পাখী, পেট্রেল কার্যতঃ তাই করে থাকে এবং নিরাপত্তার দিক থেকে লাভবানই হয়।

সরীসৃপ গোষ্ঠীর এক অপস্রিয়মান শাখার প্রতিনিধি প্রায় তিন ফুট লম্বা টটেরা নামক গিরগিটি সদৃশ প্রাণী সমুদ্র সন্নিহিত অঞ্চলে নরম মাটিতে নখরের সাহায্যে নির্মিত সুড়ঙ্গে বাস করে। এই সুড়ঙ্গের দক্ষিণ দিকে এরা ডিম পাড়ে এবং বাম দিকটি অধিকার করে পেট্রেলরা।

(খ) নীড়-বৈচিত্র্য—পাখীরা চঞ্চু ও পদদ্বয়ের সাহায্যে বাসা নির্মাণের উপকরণগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তি অনুসারে সাজিয়ে তদনুসারে বাসার রূপ দান করে।

সোয়ালো—মাটির সঙ্গে কাঠ-কুটা মিশিয়ে, ঐ মিশ্রণের সাহায্যে ভূমির উপর কলসীর আকারে বাসা প্রস্তুত করে। বাসার অভ্যন্তরে পালক ও ঘাসের আস্তরণ দিয়ে আরামদায়ক করে তোলে।

মাছরাঙ্গা—খরগোস, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীদের পরিত্যক্ত সুড়ঙ্গের মধ্যে মাছের কাঁটা ও পালকের গালিচা বিছিয়ে মাছরাঙ্গা বাসা প্রস্তুত করে।

অস্‌প্রে—পক্ষী সমাজে “এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং” রচনার কৃতিত্ব এরাই অর্জন করেছে। মিঃ চেরী কিয়ারটন (১৯৪৯) লক্ষ্য করেছেন—একজোড়া অস্‌প্রে বিগত কয়েক বছর যাবৎ একই বাসা মেরামত ও ব্যবহারের ফলে বাসাটির উচ্চতা ২০ ফুটের উপর দাঁড়িয়েছিল।

টুনটুনি—দুটি কখনো বা তিনটি ঝুলন্ত ডুমুরের পাতার ধারে ঠোঁট দিয়ে ছিদ্র করে তুলার আঁশের সাহায্যে সেলাই করে জুড়ে দেয়। এরূপে সেলাই-করা পাতা দুটির “পকেটের” মধ্যে মসৃণ ঘাস বা তুলা বিছিয়ে তৈরী হয় এদের বাসা। টুনটুনির বাসা পক্ষী-জগতে সীবন-শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বাবুই—বাবুইদের পুরুষ পাখীটি পরিণয়ের পুর্বে নিজেই বাসা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করে। তাল, নারিকেল বা খেজুর গাছের পাতার অগ্রভাগে ঐ সকল পাতারই সূক্ষ্ম ফালি নিয়ে চঞ্চু ও পায়ের অঙ্গুলির সাহায্যে মনোরম ঝুলন্ত বাসা তৈরী করে। এই ঝুলন্ত বাসায় একটি কক্ষ এবং মোটা নলের মত একটি যাতায়াতের পথ থাকে। কথিত আছে, এরা অন্ধকার রাত্রে বাসার ভিতরে জোনাকীর দীপ জ্বালে।

বাসার কাজ সম্পন্ন হবার পর কোন স্ত্রী-পাখী নিকটে উপস্থিত হলে পুরুষ পাখী নৃত্য ও সঙ্গীতের দ্বারা নিজের বাসায় তাকে আমন্ত্রণ জানায়।

স্ত্রী-পাখী কর্তৃক পুরুষ পাখী নির্বাচন তার সঙ্গীত এবং বাসা নির্মাণের উৎকর্ষতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। (মুখার্জী ১৯৫৭)

ধনেশ—আফ্রিকা ও এশিয়ার ধনেশ

(Hornbill) পাখীদের স্ত্রী-পাখীটি প্রজনন ঋতুতে গাছের কোটরে অবস্থান করে। পুরুষ পাখীটি তখন রজন জাতীয় পদার্থের সঙ্গে অন্যান্য বস্তু ও মুখের লালা মিশিয়ে সামান্য ফাঁক রেখে কোটরের প্রবেশ-পথটি সম্পূর্ণরূপে বুজিয়ে দেয়। উপরের ফাকটুকু দিয়ে স্বেচ্ছায় অন্তরীণ স্ত্রী-পাখীটির খাদ্য গ্রহণ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ অব্যাহত থাকে। এই ভাবে ধনেশ পাখীদের বাসাটি সাপ ও অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য দুর্গবিশেষে পরিণত হয়।

পুরুষ পাখীটির উপর তখন থেকে অন্তরীণ স্ত্রী-পাখী এবং তার শাবকগুলির ভরণ-পোষণের ভার পরে। স্ত্রী-পাখীটি প্রথমদিকে দুর্বল হলেও পরে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে, কিন্তু খাদ্যের দাবী ক্রমাগত বাড়বার ফলে পুরুষ পাখী ক্লান্তি ও অবসাদে ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যু বরণ করে।

অস্ট্রিচ্—অস্ট্রিচের পুরুষেরা প্রায় ২০টির মত ডিম রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয়। এদের ডানা ওড়বার কাজে না লাগলেও প্রায় ২০টি ডিমকে আচ্ছাদন করে রাখতে পারে। স্ত্রী-পাখীরা কদাচিৎ এই বিষয়ে পুরুষ পাখীকে সাহায্য করে।

মরুভূমির অস্বাভাবিক অঞ্চলে পুরুষ পাখীটির প্রধান কাজ হলো বালির অত্যধিক উত্তাপ নিরোধ করে ডিমগুলিকে রক্ষা করা। এই ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে সৌরতাপেই ডিমগুলি ফুটে বাচ্চা বের হয়।

জৈব বিবর্তনের ধারার কথা চিন্তা করলে অষ্ট্রিচদের ডিম ফোটবার পদ্ধতির মধ্যে আধুনিক সরীসৃপের ডিমের সাদৃশ্য মোটেই আকস্মিক নয়। অষ্ট্রেলিয়ার ব্রাশটার্কি পাখীদের মধ্যে সরীসৃপের এই বৈশিষ্ট্যটির সর্বাধিক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রাশ্টার্কি—প্রজনন ঋতুতে একই পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পাখীরা যখন কেবল খাদ্য সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকে, তখন পুরুষ পাখীটি লম্বা বলিষ্ঠ পায়ের সাহায্যে পিছনের দিকে ঠেলে ঠেলে শুষ্ক পাতা ও জঞ্জালের বিরাট স্তূপ নির্মাণ করে। এই স্তূপের মধ্যে স্ত্রী-পাখীরা বৃত্তাকারে ডিমগুলি সাজিয়ে রাখে। এই জঞ্জালের অভ্যন্তরে পচনক্রিয়ার ফলে যে তাপ সঞ্চারিত হয়, তাতে ডিমগুলি ফুটে শাবক নির্গত হয়।

মাঝে মাঝে পুরুষ পাখীটি এই জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে মাথাটি প্রবেশ করিয়ে জিহ্বার সাহায্যে তাপ পরীক্ষা করে এবং প্রয়োজনানুসারে ডিমের সন্নিহিত অঞ্চলে জঞ্জাল যোগ করে উপযুক্ত তাপ সঞ্চার করে অথবা স্তূপ থেকে কিছু জঞ্জাল অপসারিত করে প্রয়োজনাতিরিক্ত তাপ বিকিরণের সহায়তা করে।

(গ) পাখীদের নীড় ও আত্মরক্ষা—জীবন-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে আত্মগোপনে সহায়ক রঙের জন্যে পাখীরা হিংস্র প্রাণীদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলতে পারে।

বলয়িত প্লোভার (Ringed Plover) এক প্রকার বিশেষ রং ও আকারের পাথরের নুড়ির মধ্যে ডিম পাড়ে। এদের ডিমগুলি পাথরের সঙ্গে এমন মিলে যায় যে, তাদের শত্রুরা সেগুলিকে সহজে বিনষ্ট করতে পারে না। (ফিসার-১৯৪১)

ডাব্লিউ এ. ফিলিপ (১৯৪০) সিংহলের একপ্রকার শ্রাইক্ বা শিকারী পাখীর বিস্ময়কর বাসার বর্ণনা দিয়েছেন।

পাখীর বাসাটি লাইকেন আর গাছের বক্কলের রঙের সঙ্গে কেবল সামঞ্জস্য রেখেই তৈরী হয় না, পরন্তু স্থান নির্বাচন ও নির্মাণ-কৌশলের গুণে বাসাটি গাছের একটি ভগ্ন শাখার গাঁট বা সন্ধিস্থল বলে ভ্রম হয়।

মাতা-পিতা খাদ্যান্বেষণে গেলে শাবকগুলি বাসায় এমন নিশ্চল-নিস্পন্দ অবস্থায় অপেক্ষা করে যে, বারো ফুট দূর থেকেও এদের জীবন্ত প্রাণী বলে চেনা যায় না। শাবকগুলির উর্ধ্বমুখী চঞ্চুগুলিকে মনে হয় যেন হঠাৎ ভেঙ্গে-যাওয়া শাখাটির কেন্দ্রীয়

মজ্জার তীক্ষ্ণ কোণযুক্ত ভগ্নাংশবিশেষ। এইরূপে শাবকগুলি নিখুঁতভাবে মুণ্ডিত শাখার অনুকরণ করে।

(ঘ) নীড় রচনায় পক্ষী-মানসিকতা—পাখীদের প্রকৃতিগত অভ্যাস ও সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে মর্গ্যান (১৯৩৫) মন্তব্য করেছেন—একটি বিশেষ উপায়ে বাসা নির্মাণ বিশেষ বিশেষ উপজাতীয় পাখীদের সহজাত প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু ওয়ালেসের (১৯৪৯) অভিমত হলো—কোন একটি বিশেষ ধরণের নীড় রচনার প্রেরণা নিহিত থাকে পাখীদের বংশধারার মধ্যে। তাই বিশেষ প্রজাতির পাখীদের বাসার নির্দিষ্ট উপকরণ ও নীড় রচনার মধ্যে তাদের বৈশিষ্ট্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে বংশপরম্পরায় অনুসৃত হয়ে থাকে।"

টুনটুনি বা বাবুই পাখীর বাসা নির্মাণ যাঁরা মনোনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন, বুদ্ধিবৃত্তি ব্যতিরেকে কেবল সহজাত প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করে অনুরূপ নীড় রচনা এবং ক্রমোন্নতির পথে এত নিখুঁতভাবে অগ্রসর হওয়া সত্যই সম্ভব কি না, সে কথা তাঁদের মনে আসা স্বাভাবিক।

তাছাড়া, ভীষণদর্শন টটেরার সঙ্গে পেট্রেলদের কেবল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতির অনুসরণই নয়, দিবারাত্র পরস্পরের সঙ্গে বাসা রক্ষার দায়িত্ব বিনিময়ের মধ্যে সাধারণ বাসাটির নিরাপত্তা যে ভাবে রক্ষিত হয়, তা কেবল সহজাত প্রবৃত্তির ফল বলে ভাবতে বিস্ময় লাগে।

পরন্তু পক্ষিতত্ত্ববিদেরা ব্রাশটার্কির স্তূপাকৃতির বাসায় পরীক্ষামূলকভাবে যন্ত্রপাতি বসিয়ে অতিরিক্ত তাপ সঞ্চার বা তাপমাত্রা হ্রাস করে দেখেছেন, পুরুষ পাখীটি তার জিহ্বারূপ নিখুঁত জৈব তাপমান যন্ত্র দিয়ে উপরিউক্ত উপায়ে অভাবনীয়-রূপে অভিলষিত নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষণের ব্যবস্থা করে তাঁদের সকল যান্ত্রিক প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে। (ব্রাইটওয়েল-১৯৪৯)

আমরা জানি, যে সব পাখীরা মানুষের বসতির মধ্যে বাসা নির্মাণ করে, তারা মানুষের ব্যবহার্য দড়ি, কাগজ, পরিত্যক্ত কাপড়, কম্বল ও প্লাস্টিকের অংশ সংগ্রহ করে বাসা বাঁধে—এমন কি, মনুষ্য-নির্মিত নকল বাসাও তারা গ্রহণ করে।

এসব আচরণ লক্ষ্য করে জীববিজ্ঞানী নিউম্যান (১৯৫৯) যে মন্তব্য করেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য—পাখীরা বাসা বাঁধবার ব্যাপারে কেবল চিরাচরিত রীতিই অনুসরণ করে না, প্রয়োজন অনুসারে বুদ্ধি করে বিভিন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতেও এরা অপারগ নয়।

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র গত ১৩ই অগাষ্ট (১৯৬৩) মঙ্গলবার পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৩ বৎসর। ভারতে বেতার সম্পর্কিত গবেষণার তিনি ছিলেন পথিকৃৎ। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা, তথা ভারতের বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণার ক্ষেত্র হইতে এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা অপসৃত হইয়া গেল।

শিশিরকুমার ১৮৯০ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জয়কৃষ্ণ মিত্র। ভাগলপুরে জিলা স্কুলে এবং টি. এন. জে. কলেজে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১২ সালে পদার্থবিদ্যায় এম. এস-সি. পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি বিহার ও বাংলার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯১৯ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করিবার পর তিনি প্যারিসে যান এবং সেখানে সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফ্যাব্রির সঙ্গে গবেষণা করেন। সরবোর্ন হইতে ১৯২২ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বেতার-সংযোগের জন্য তিন-ইলেকট্রোড ভাল্‌ভের আবিষ্কার হয়। ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য তিনি নান্‌সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স-এ যোগদান করিতে যান। ১৯২৩ সালে দেশে প্রত্যাবর্তন করিবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তখন হইতে তিনি পোষ্টগ্রাজুয়েট পর্যায়ে 'বেতার' শিক্ষণের সূত্রপাত করেন। পদার্থ-বিদ্যার পরীক্ষাগারেই তিনি 'বেতার' সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। তাঁহার চেষ্টার ফলেই ভারতের বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সের এম. এস-সি কোর্সে 'বেতার' বিশেষ বিষয়রূপে গৃহীত হয়। তাঁহার চেষ্টায় ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও-ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স পৃথক বিভাগ হিসাবে স্থাপিত হয়। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সদস্য হিসাবে তিনি পরিষদকে দিয়া একটি বেতার-গবেষণা কমিটি গঠন করেন এবং ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

আয়নমণ্ডল ও আবহমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণার ফলে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহারই চেষ্টায় হরিণঘাটায় 'আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড ষ্টেশন' স্থাপিত হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের অর্থ সাহায্যে ঐ ষ্টেশনটি পুনর্গঠিত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালে "আপার অ্যাটমোস্ফিয়ার" নামক তাঁহার পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর বিশ্বের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়িয়া যায়। ১৯৫২ সালে এই পুস্তকটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। আবহমণ্ডল সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্য তিনি ১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন।

তাঁহার বিজ্ঞান সাধনা ও গবেষণার জন্য তাঁহাকে ১৯৩৫ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ সিলভার জুবিলী মেডেল, ১৯৪৩ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসো-সিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের জয়কৃষ্ণ মুখার্জী স্বর্ণপদক, ১৯৫৬ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞান কংগ্রেস পদক এবং ১৯৬১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

অধ্যাপক মিত্র ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। ইহার পর তিনি পদার্থবিদ্যার স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ১৯৫৬ সালে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে পদত্যাগ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ঐ সালেই ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

অধ্যাপক মিত্র ১৯৫১-৫২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৫৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৬-৫৮ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েসন এবং ১৯৫৯-৬০ সালে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সভাপতি ছিলেন। তিনি আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বৎসরের ভারতীয় কমিটি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এবং দেশীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

সদা কর্মব্যস্ত জীবনেও অধ্যাপক মিত্র মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহী ছিলেন। বিজ্ঞানের দুরূহ তত্ত্বসমূহও তিনি সহজবোধ্যভাবে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের ষষ্ঠ-বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক মিত্র বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের উপযোগিতা সম্পর্কে যে কথা বলিয়াছিলেন—তাহার কিয়দংশ পাঠক-পাঠিকাদের অবগতির জন্য উদ্ধৃত করিতেছি—

"পত্রিকাটি (জ্ঞান ও বিজ্ঞান) যখন প্রতি মাসে আমার হাতে আসে ও আমি যখন পাতা উল্টে এর বিভিন্ন লেখকের লেখা প্রবন্ধসম্ভার দেখি, তখন আমার ব্যক্তিগত জীবনের প্রায় ৪০ বছর আগেকার একটা সঙ্কল্পের কথা মনে পড়ে যায়। সঙ্কল্প করেছিলাম যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের কথা লিখে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করবো। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা বা প্রবন্ধ লেখায় কোনও আবশ্যকতা বা কার্যকারিতা আছে কি না, যা নিয়ে আজকাল অনেক রকম তর্ক বিতর্ক হয়—সে প্রশ্ন মনেই ওঠে নি। এর প্রয়োজনীয়তা কেন যে স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিয়েছিলাম, তার কারণ বোধ হয়—আমি আমার ছাত্রাবস্থায় সে সময়কার বাংলা মাসিক পত্রিকায় যে সব বিজ্ঞানের প্রবন্ধ বের হতো, তা আগ্রহ সহকারে পড়তাম এবং পড়ে আনন্দ ও শিক্ষা দুই-ই লাভ করতাম। সে সময়কার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক ও তাঁদের লেখার কথা এখনও আমার মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এখনও যদি সে সময়কার পুরনো পত্রিকা হাতে পাই তো এখনও সেসব লেখা আবার পড়ি। লেখকদের মধ্যে নাম করতে পারি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, জগদানন্দ রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু আর সৌভাগ্যক্রমে এখনও জীবিত আছেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। বোধ হয়, এই সব লেখকদের মত আমার লেখাও একদিন লোকে পড়বে, পড়ে শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করবে ও আমিও একদিন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক হিসাবে এঁদের মত সুপরিচিত হব, এই আকাঙ্খা আমাকে বাংলায় প্রবন্ধ লেখায় প্ররোচিত করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সঙ্কল্পে দৃঢ়তার অভাবে ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতার জন্যে আমার আকাঙ্খা পূর্ণ হয় নি, যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করেই আমি কিছু কিছু লেখা সুরু করেছিলাম।"

"প্রায় ৪০ বছর আগে বাংলায় এই দুটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা, যা আমার বিশেষ করে মনে আছে তা শ্রোতাদের মধ্যে প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে আরও জানবার আগ্রহ। এই আগ্রহ যা দেখেছিলাম তা আমার আশাতীত। অথচ শ্রোতাদের মধ্যে বিজ্ঞানের ছাত্র বিশেষ কেউই ছিলেন না। শ্রোতাদের

অধিকাংশই ছিলেন তখনকার দিনের সাধারণ প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজের লোক উকিল, স্কুলের শিক্ষক, গবর্ণমেণ্ট অফিসের সাধারণ চাকুরে ইত্যাদি। বাংলা ভাষাভাষীর জন্যে বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার উপযোগিতা সম্পর্কে আমার যদি বা কিছু সংশয় ছিল, তা এই অভিজ্ঞতা থেকে সেদিন সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছিল।"

অধ্যাপক মিত্রের মৃত্যুতে ভারতের বিজ্ঞান-জগতে অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি।

টোম্যাটো বা বিলাতী বেগুন

অমিয়নাথ মিত্র

টোম্যাটো বা বিলাতী বেগুন একান্তভাবে পাশ্চাত্যের দান। পাশ্চাত্যের ভাণ্ডার থেকে যে সব আহার্য-পদার্থ ভারতীয় জনজীবনে প্রবেশ করেছে, তার মধ্যে টোম্যাটো নিঃসন্দেহে এক অপূর্ব রসায়ন। এর নাম বেগুন কিন্তু একাধারে এত গুণ বোধ হয় আর কোন আহার্য-উদ্ভিদে সম্ভবে না। অল্প আয়াসে প্রভূত পরিমাণে উৎপাদন-শক্তিসম্পন্ন এই টোম্যাটো কেবল সুস্বাদুই নয়, একে সর্বরোগহর ঔষধও বলা চলে। লেটুস বা বীটে যে পরিমাণ এ বা বি ভিটামিন থাকে, কমলা, পাতিলেবু বা অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলে যে পরিমাণ ভিটামিন-সি থাকে, কাঁচা বা সিদ্ধ টোম্যাটোতে সবগুলি ভিটামিনই প্রায় সেই পরিমাণে থাকে। এমন কি, মাখমে যতটা ভিটামিন থাকে, টোম্যাটোর শুষ্ক শাঁসে তদপেক্ষা অধিক ভিটামিন পাওয়া যায়। টোম্যাটোতে তিন রকমের অম্লশক্তি পাওয়া যায়—ম্যালিক অ্যাসিড, যা আমরা আপেলে পাই, সাইট্রিক অ্যাসিড—যা কমলা, পাতিলেবু বা অন্যান্য লেবুজাতীয় ফলে পাওয়া যায় এবং শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী—বিশেষতঃ স্নায়ুমণ্ডলীর পক্ষে, সেই ফস্‌ফোরিক অ্যাসিডও টোম্যাটোতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। সব রকম আহার্য-বস্তুর মধ্যে টোম্যাটোই সবচেয়ে বেশী ভিটামিনসমৃদ্ধ। কিন্তু কতকগুলি ভিটামিন ও কিছু অম্লশক্তিই এর প্রধান সম্বল নয়। নানাপ্রকার ধাতব পদার্থও টোম্যাটোতে আছে; যেমন—প্রোটিন, ফস্‌ফেট, পটাস লাইম, সোডিয়াম, সালফার বা গন্ধক জাতীয় পদার্থ, ক্লোরিন এবং প্রচুর পরিমাণে লৌহ এই ফলটির মধ্যে পাওয়া যায়। আমাদের শরীরে রক্ত তৈরীর ব্যাপারে লৌহ একটি অপরিহার্য বস্তু। মাংসের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে লৌহ বর্তমান, কিন্তু দেখা গেছে, পুষ্টিসাধনের দিক দিয়ে শাকসব্‌জীর অভ্যন্তরস্থ লৌহ অধিকতর মাত্রায় কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। কারণ এটি অতি সহজেই শরীরে শোষিত হয়।

টোম্যাটোর রোগপ্রতিরোধ ও নানারকম ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষমতাও অদ্ভুত। দুর্বল, রুগ্ন লোকের, বিশেষতঃ অপুষ্ট শিশুদের পক্ষে টোম্যাটো একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। পুষ্টিহীনতায় আক্রান্ত শিশুদের অন্য ঔষধের অভাবে শুধুমাত্র টোম্যাটোর রস খাইয়ে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। পুষ্টিহীনতার দরুণ চক্ষুরোগেও এটি বিশেষ ফলপ্রদ; কারণ এর মধ্যে অতি বেশী পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে। রিকেট্‌স্ এবং স্কার্ভি রোগে টোম্যাটোর রস অত্যন্ত হিতকারী—এটি বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত সত্য। গুরুভোজনের পর, বিশেষতঃ আমিষ ভোজনের

পর ছ'চারটি টোম্যাটো সেবনে ভুক্তদ্রব্য অতি সহজেই হজম হয়ে যায়, কারণ গুরুপাক ও প্রচুর মশলাযুক্ত খাদ্য গ্রহণে কিছু পরিমাণ টক্সিন বা বিস উৎপাদনের দরুণ যে অসুস্থতা জন্মে, টোম্যাটোর রস সেই টক্সিনকে দ্রবীভূত করে। অধিক পরিমাণে মদ্য জাতীয় দ্রব্য সেবনে শরীরে যে বিস উৎপন্ন হয়, টোম্যাটোর রস তাও দ্রবীভূত করে। তাই রক্ত পরিষ্কারে টোম্যাটোর রস একটি বিশিষ্ট পানীয়। বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগীদের টোম্যাটো শুধু একটি খাদ্যই নয়, ঔষধও বটে। অম্লরোগীরা ভোজনের ঠিক পূর্বে কিছুটা টোম্যাটোর রস পান করলে অম্লরোগের প্রকোপ থেকে নিস্তার পেতে পারে। সব রকম শাক-সব্জীর মধ্যে টোম্যাটোই শ্রেষ্ঠ এবং এর দ্বারা পাকস্থলী ও অন্ত্র সুস্থ ও সবল হয়। মেদবৃদ্ধি নিবারণে টোম্যাটো খাদ্য এবং ঔষধ দুই-ই—এটি বহু বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত অভিমত। চর্মরোগে টোম্যাটোর এই অত্যাশ্চর্য উপকারিতা দেখে বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ্গণ আহার্য-বস্তুর মধ্যে টোম্যাটোর এক অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। তাই সুস্থ বা অসুস্থ লোকের দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকায় টোম্যাটোর নিশ্চিত স্থান থাকা উচিত।

বিজ্ঞান-সংবাদ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সর্বাধিক শক্তিশালী বেতার যন্ত্র

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড়ের আভাস-সন্ধানী রেডার রয়েছে নয়াদিল্লীর সফদরজঙ্গ বিমান বন্দরে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা এজন্যে অনেক টাকার সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছেন। এসব যন্ত্রের সাহায্যে তিন-শ' মাইলের মধ্যে ঝড়, বৃষ্টি, বরফপাত ও তাদের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বাভাস জ্ঞাপন করা যাবে। তাছাড়া ঐ সকল ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে মেঘের গঠনপ্রণালী সম্পর্কেও সঠিক তথ্য সরবরাহ এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। মেঘ, ঝড় প্রভৃতি আসবার চার ঘণ্টা পূর্বে তাদের সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারলে আবহবিজ্ঞানী ও বৈমানিকদের খুবই কাজে লাগবে।

আবহাওয়া খারাপ থাকলে দিনরাত্রি সর্বক্ষণই সন্ধানী দৃষ্টি রাখা হয়। এই রেডারের একটি অতিরিক্ত ইউনিট রাখা হয়েছে সফদরজঙ্গ বিমান-বন্দরের আবহবিজ্ঞান সম্পর্কিত ব্রিফিং রুমে। আবহবিজ্ঞান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী অন্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত আবহবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন, সেই সব তথ্য এই রেডারের সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাদির সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার সুযোগ পান। বৈমানিকদের দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার ব্যাপারে এই রেডার যন্ত্রের সাহায্যে প্রাপ্ত তথ্য বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

সফদরজঙ্গ ও পালাম বিমান-বন্দরের এয়ার ট্র্যাফিক কণ্ট্রোল বিভাগকে এই সব তথ্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সরবরাহ করবার জন্যে দেওয়া হয়ে থাকে।

স্বল্প ব্যয়ে দুধ তৈরীর যন্ত্র

আমেরিকার একটি প্রতিষ্ঠান এমন একটি নতুন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন, যা মাখন-তোলা গুঁড়া দুধের সঙ্গে মাখন মিশিয়ে প্রকৃত দুধ প্রস্তুত করতে

পারে। উপাদান ও স্বাদের দিক থেকে এই দুধ টাট্‌কা দুধেরই মত।

নতুন উদ্ভাবিত যন্ত্রটিতে দুধ উৎপাদন স্বল্প ব্যয়সাধ্য। এই যন্ত্র একটি দ্রুতগতিশীল মোটরের সাহায্যে মাখন-তোলা গুঁড়া দুধের মধ্যে জল ও মাখন মেশায়। এভাবে উৎপাদিত দুধের মধ্যে স্নেহপদার্থ পুরামাত্রায় বজায় থাকে।

নিউইয়র্কের অন্তর্গত হুড্‌সনের গিফোর্ড উড কোম্পানী এই যন্ত্রটি উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্রে উৎপাদিত প্রতি গ্লাস দুধের দাম এক সেন্টেরও কম পড়বে।

মানুষের হৃৎপিণ্ড দৈনিক এক লক্ষবার স্পন্দিত হয়

মানুষের হৃৎস্পন্দন নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি এক গবেষণা হয়েছে। গবেষণার ফলে জানা গেছে, সাধারণভাবে একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড গড়ে দৈনিক এক লক্ষ বারেরও বেশী স্পন্দিত হয়। গবেষণাকালে তাঁরা এক শত সুস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন। সিগারেট প্যাকেটের মত আয়তনের একটি ক্ষুদ্র হৃৎস্পন্দন গণনা-যন্ত্রের সাহায্যে এই পরীক্ষাকার্য চালানো হয়। প্রত্যেক লোককে তিনবার বা তারও বেশী পরীক্ষা করা হয়।

যে সব লোকের হৃৎস্পন্দন পরীক্ষা করা হয়, তাঁদের বয়স ছিল ১৬ থেকে ৬৫ বছরের মধ্যে। এঁদের মধ্যে ছিলেন শিক্ষক, ছাত্র, কেরাণী ও অন্যান্য অফিসকর্মী এবং সেই ধরণের লোক, যাঁরা হাল্‌কা শ্রমের কাজ করেন। পরীক্ষায় দেখা গেছে, ২৪ ঘন্টায় একজন মানুষের হৃৎস্পন্দনের মোট সংখ্যা বিভিন্ন সময়ে মোটামুটি একই থাকে। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের স্পন্দন একই রকম হয় না। কারও বা স্পন্দনের সংখ্যা ২৪ ঘন্টায় ৯৮ হাজার হয়েছে, আবার কারও বা ১ লক্ষ ৩৫ হাজার হয়েছে।

মঙ্গলগ্রহে বাষ্পের অস্তিত্ব

মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গলগ্রহে জলীয় বাষ্পের অস্তিত্ব এই সর্বপ্রথম সুনির্দিষ্টভাবে আবিষ্কার করেছেন।

তাঁরা বলেন, পৃথিবীর আবহাওয়ার সঙ্গে তুলনায় মঙ্গলগ্রহে এই বাষ্পের পরিমাণ খুবই কম। তবে অতি ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্বের পক্ষে এই পরিমাণ বাষ্পই যথেষ্ট।

ক্যালিফোর্ণিয়া ইনষ্টিটিউট অব টেক্‌নোলজীর বিজ্ঞানীরা মাউন্ট উইলসন ও মাউন্ট প্যালোমারে রাখা শক্তিশালী দূরবীক্ষণে ধৃত মঙ্গলগ্রহের আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে এই বাষ্পের সন্ধান পেয়েছেন।

মার্কিন রেডার ও আবহমণ্ডলে বহু উর্ধ্বে প্রেরিত বেলুনের সাহায্যে সম্প্রতি মঙ্গলগ্রহ সম্পর্কে যে সব গবেষণা করা হয়েছে, তার ফলাফলের সঙ্গে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই আবিষ্কার পুরাপুরি মিলে গেছে।

কৃত্রিম রাসায়নিক কাঠ

মার্কিন বিজ্ঞানীরা কাঠের একটি বিকল্প পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা মনে করেন, বহুবিধ ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হবে।

ওহিয়োর অ্যাক্রনে অবস্থিত গুডইয়ার রিসার্চ লেবরেটরীতে গবেষণার ফলে কঠিন রবার, রজন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে এই কৃত্রিম কাঠ প্রস্তুত করা হয়েছে।

গুডইয়ার জানাচ্ছেন, এই কৃত্রিম কাঠ দিয়ে বন্দুকের কুঁদা, ক্রিকেটের উইকেট, গলফ্‌ ষ্টিকের মাথা, জুতার ফরমা, মেয়েদের জুতার উঁচু গোড়ালী প্রভৃতি তৈরী হচ্ছে।

এই রাসায়নিক কাঠ ব্যবহারিক দিক থেকে সম্পূর্ণ উপযোগী, বরং একদিক থেকে এর উপযোগিতা প্রাকৃতিক কাঠ অপেক্ষাও বেশী। আর্দ্রতায় কাঠের ক্ষতি হয়, কিন্তু রাসায়নিক কাঠের কোনই বিকৃতি ঘটে না।

পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রগুলির জন্য সুলভ ইন্ধন প্লুটোনিয়াম

বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা ১৫ বৎসরের গবেষণার পর এইটুকু বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা পারমাণবিক শক্তি-কেন্দ্রগুলির জন্য সুলভ ইন্ধন হিসাবে প্লুটোনিয়াম ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের মূল্য হ্রাস করিতে সক্ষম হইবেন।

বৃটিশ অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্লুটোনিয়াম প্রোসেসিং-এর এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং এই পদ্ধতি তাঁহারা অল্ডারম্যাস্টন, হারওয়েলথ, উইনস্ক্রিথ ও হার্থ-এর গবেষণা-কেন্দ্রগুলির পারমাণবিক ফার্নেস-গুলিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন।

এই পর্যন্ত প্লুটোনিয়াম-ইউরেনিয়াম ইন্ধনের এক উপজাত পদার্থ অ্যাটম বোমার জন্য অথবা হাইড্রোজেন বোমার ট্রিগারের জন্য বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। ১৫ বৎসর ধরিয়া বর্তমান গবেষণা চলিয়াছে।

অ্যাটমিক এনার্জি অথরিটি আশা করেন যে, এই পরীক্ষার ফলে এমন একটি প্লুটোনিয়াম রিয়্যাক্টরের মডেল নির্মাণ সম্ভব হইবে, যাহা কেবল বিস্ফোরক পদার্থ না জ্বালাইয়া অন্যান্য ফার্নেসের জন্য অধিকতর পরিমাণে প্লুটোনিয়াম অথবা বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম উৎপাদন করিতে পারিবে।

বিলহারজিয়াসিস রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

পরজীবীঘটিত বিলহারজিয়াসিস নামক এক কঠিন রোগ সম্পর্কে যে সকল বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা সম্প্রতি এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা ঐ রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যথেষ্ট শক্তি যোগাইবে।

যে ধরণের শামুক এই রোগের বাহক, কেন্টের শেল্ রিসার্চ লিমিটেডের উডষ্টক কৃষি গবেষণা-কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকেরা কয়েক বৎসরের চেষ্টায় সেই ধরণের শামুক প্রজননে সক্ষম হন এবং এই শামুক লইয়া পরীক্ষা-কার্য পরিচালনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—এশিয়া, আফ্রিকা, ক্যারিবিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্ব ভূমধ্য-সাগর অঞ্চলে আনুমানিক ১৫০,০০০,০০০ লোক এই রোগে ভুগিতেছে।

শেল্ রিসার্চের বৈজ্ঞানিক কর্তৃক উদ্ভাবিত রাসায়নিক পদার্থের নমুনা এখন আফ্রিকা ও জাপানে স্বাস্থ্য-বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরীক্ষিত হইতেছে। এই পদার্থগুলি বিলহারজিয়াস জীবাণু-বাহী শামুকগুলিকে ধ্বংস করিলেও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের কোন ক্ষতি করিবে না।

সর্পদংশনের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত প্রতিষেধক

প্রাণীদেহে "হেপারিন" নামে একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ আছে। এই পদার্থটি রক্তের জমাট-বাধা প্রতিরোধ করে। সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে—প্রাণীদেহে এই পদার্থটি সর্প-দংশন, মৌমাছির হুল ফোটানো এবং নানাপ্রকার বিষ সংক্রমণের ক্ষেত্রে প্রকৃতিদত্ত প্রতিষেধকের কাজ করে। এই বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট ডি-হিগিনবোথাম। তিনি ইঁদুরের দেহে সাপের বিষ ও অন্যান্য বিষ ইন্‌জেক্‌শন করে এই দেহজ প্রতিষেধকের বিষ-প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পর্কে পরীক্ষা করেন। তাতে দেখা গেছে, হেপারিন এই সব বিষের বিষক্রিয়া নষ্ট করে দেয়। এছাড়া হেপারিন অ্যালার্জি, কাটা, পোড়া এবং নানারূপ ছোটখাট আঘাতের ক্ষেত্রেও দেহকে বিষক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

পতঙ্গের কীটঘ্ন প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্পর্কে গবেষণা

জৈব ফস্‌ফরাস মিশ্রিত কীটঘ্ন ডায়াজিনন এবং ডি-ডি-টি ও লিন্‌ডেন প্রভৃতি ক্লোরিন মিশ্রিত

কীটঘ্ন রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া রোধ করবার ক্ষমতা পতঙ্গের মধ্যে কতটা আছে, সেটা নির্ণয়ের জন্যে রাটজার্স কলেজ অব এগ্রিকালচার-এর একদল পতঙ্গবিদ্ গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা পরিচালনা করছেন ডাঃ অ্যাণ্ড্রু জে. ফরগ্যাশ। গবেষণার ফলে তাঁরা দেখেছেন যে, যে পতঙ্গদের এই প্রকার প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশী আছে, তারা ধীরে ধীরে আপন দেহে কীটঘ্ন পদার্থ শোষণ করে নেয়।

গবেষকেরা আরও প্রমাণ পেয়েছেন যে, পতঙ্গ দেহে ডি-ডি-টি প্রতিরোধক ক্ষমতা গড়ে উঠলে তারা এই কীটঘ্ন পদার্থ অঙ্গীভূত করে আপন দেহজ এক প্রকার এনজাইমের সাহায্যে ডি-ডি-ই নামক রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত করে। ডি-ডি-টির অণুর মধ্যস্থিত মাত্র একটি পরমাণুর হেরফের ঘটলে পতঙ্গদেহের উল্লিখিত এনজাইমের কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে ডি-ডি-টির অণুতে এই ধরণের পরিবর্তন ঘটানো হলে পতঙ্গেরাও স্বল্পকালের মধ্যেই তাকে ধাতস্থ করে নেয়।

পতঙ্গদেহের কোন্ অংশ কীটঘ্ন পদার্থ শুষে নেয় বা শুষে নিতে পারে না, তা নির্ণয় করবার জন্যে এই গবেষকেরা তেজস্ক্রিয় ফস্ফরাস ব্যবহার করছেন।

মুরগীর ছানার বুদ্ধিমত্তা

মুরগীর ছানা সমবয়সী অপর যে কোন প্রাণীর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান—এই তথ্য সম্প্রতি পেন্সিলভ্যানিয়া স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আবিষ্কার করেছেন। হোয়াইট লেগহর্ণ শ্রেণীর মুরগীর ছানা দু-সপ্তাহ বয়সে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এমন সব কাজ করে, যা অন্ততঃ দু-বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত রেসাস জাতীয় বানরের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

মুরগীর ছানার মগজ সুগঠিত নয়। তথাপি তারা খাবারের যন্ত্রের যথাস্থানে ঠুক্‌রে খাবার বের করে নিতে কয়েক দিনের মধ্যেই শিখে যায়। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, মুরগীর ছানার সহজেই বস্তুজ্ঞান জন্মায়। ফলে তাদের আর অন্ধের মত হাত্‌ড়াতে হয় না। গবেষকেরা আরও দেখেছেন যে, নবজাত মুরগী ছানার চলচ্ছক্তি বিকাশের ক্ষমতা যেন একটু বেশী মাত্রাতেই থাকে।

মহাকাশে কার্যকরী পারমাণবিক রিয়্যাক্টরের নিরাপত্তা পরীক্ষা

মহাকাশে পারমাণবিক রিয়্যাক্টরকে কার্যকরী করবার বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এই সূত্রে সম্প্রতি একটি নকল বা ডামি রিয়্যাক্টর মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল। এই পরীক্ষা থেকে যে ফল পাওয়া গেছে, তা মহাশূন্যে কার্যকরী রিয়্যাক্টরের নক্সা প্রণয়নে সবিশেষ সহায়ক হবে। বৈজ্ঞানিকেরা এমনভাবে এই রিয়্যাক্টর তৈরী করতে চাইছেন, যাতে পৃথিবীর কক্ষচ্যুত হয়ে মহাশূন্যে প্রবেশ করতেই সেটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।

সম্প্রতি ভার্জিনিয়ার ওয়ালপ্‌স্ আইল্যাণ্ড থেকে স্কাউট রকেটের সাহায্যে উল্লিখিত নকল রিয়্যাক্টরটিকে আটলান্টিক সামুদ্রিক অঞ্চলে ৯৫ মাইল উর্ধ্বে পাঠানো হয়। রিয়্যাক্টরের সঙ্গে যন্ত্রপাতি সমন্বিত একটি প্যাকেটও উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। এগুলির মোট ওজন ছিল ৪৮০ পাউণ্ড।

রিয়্যাক্টর এবং প্যাকেটটির আবহমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশ করবার সময় গতি ছিল ঘণ্টায় ১৫০০০ মাইল। রিয়্যাক্টর প্রভৃতি এই গতিতে আবহমণ্ডলে প্রবেশ করলে বাতাসের ঘর্ষণে সব কিছু জ্বলেপুড়ে খাক হবে কিনা এবং তেজস্ক্রিয় উপাদানও নিরাপদরূপে ভস্মীভূত হবে কিনা, তাই ছিল বিচার্য বিষয়।

যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু শক্তি কমিশনের জনৈক মুখপাত্র এই পরীক্ষা অন্তে বলেছেন যে, একটি শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে সব কিছুর উপর

নজর রাখা হয়েছিল। নকল রিয়্যাক্টরের মধ্যে পারমাণবিক ইন্ধনের পরিবর্তে রক্ষিত স্ট্রনসিয়াম, সোনা এবং রূপা ইত্যাদি ভস্মীভূত হবার সময় টক্‌টকে লাল, সবুজ, সাদা ও গাঢ় সবুজ রঙের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এর সবই ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

পর্যবেক্ষকেরাও ধাতুগুলির ভস্মীভূত হওয়া দেখেছিলেন—যেন নয়টি তারা ঝিক্‌মিক্ করছিল।

মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত বস্তুগুলির কিয়দংশ অদাহ্য আবরণে আবৃত ছিল। প্যারাসুট সহযোগে তা বারমুডার দক্ষিণ-পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে।

সেগুলি উদ্ধার করবার পর তা থেকেও নানা-রূপ তথ্য আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

গর্ভবতী নারীর পায়ের পেশী সঙ্কোচনের যন্ত্রণা উপশমের উপায়

গর্ভাবস্থার শেষ দিকে মেয়েদের পায়ের গুলে খিল ধরে যায়। সেটি অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। ভেষজ প্রয়োগে যে এই যন্ত্রণার হাত থেকে অধিকাংশ গর্ভবতী স্ত্রীলোককেই রক্ষা করা যায়, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক চিকিৎসক সে কথা জানিয়েছেন।

নিউজার্সির রোজেল সহরের ডাঃ হারসেল এস. মার্ফি সম্প্রতি আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় বলেছেন যে, ১০০ জন গর্ভবতী স্ত্রীলোককে তিনি আইসোপেরিন হাইড্রোক্লোরাইড সেবন করিয়ে দেখেছেন যে, ঐরূপ পেশী সঙ্কোচনের ক্ষেত্রে ঔষধটি বিশেস কার্যকরী এবং নিরাপদও বটে।

ডাঃ মার্ফি আরও বলেন যে, উক্ত ঔষধ সেবনে উল্লিখিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৮৫ জন খুব ভাল ফল পেয়েছেন এবং ১১ জনের ক্ষেত্রে ঔষধটি বেশ কার্যকরী হয়েছে। অবশিষ্ট ৪ জনের ক্ষেত্রে ঔষধের বিশেষ কোন বা আদৌ কোন ফল দেখা যায় নি। পরীক্ষা করে ডাঃ মার্ফি আরও দেখেছেন যে, ঔষধটির কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি বা পাকস্থলীতেও কোনরূপ গোলযোগ ঘটে নি।

হৃৎপিণ্ডে শল্য-চিকিৎসার ক্ষেত্রে উন্নতি

অক্সফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ ইনফারমারিতে শল্য-চিকিৎসকগণ প্রধান ধমনী 'অ্যাওর্টা', যাহা হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়, তাহাতে ত্রুটিযুক্ত ভাল্‌ভ্‌ পরিবর্তনের নূতন এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন। বর্তমানে প্লাষ্টিক ভাল্‌ভ্‌ ব্যবহারের যে রীতি রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেক বেশী ফলপ্রদ হইয়াছে এবং ইহাতে রোগীর আয়ু অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নূতন পদ্ধতিতে শল্য-চিকিৎসকগণ দুর্ঘটনায় নিহত তরুণ ব্যক্তিদের হৃৎপিণ্ড হইতে সাউণ্ড ভাল্‌ভ্‌ সরাইয়া লইতেছেন। সাধারণতঃ ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদের ভাল্‌ভ্‌গুলিতে কিছু কিছু ত্রুটি থাকিয়া যায়, যাহার ফলে নূতন পদ্ধতিতে তাহার ব্যবহার অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। তরুণ বয়স্কদের ভাল্‌ভ্‌গুলি সাধারণতঃ দোষমুক্ত হয় এবং তাহা নয় মাস পর্যন্ত বায়ুশূন্য অবস্থায় বীজাণু-মুক্ত এবং শুষ্ক ও জমাট রাখা সম্ভব। এই ভাল্‌ভ্‌গুলি পরে প্রয়োজনমত ত্রুটিমুক্ত অ্যাওর্টিক ভাল্‌ভ্‌ পরিবর্তনের কাজে লাগানো যায়।

ডাঃ সি ডুরান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সার্জারির ন্যুফিল্ড অধ্যাপক পি. আর এলিসনের সহিত এই সম্পর্কে কাজ করিতেছেন। এক সাক্ষাৎ-কারে তিনি বলেন যে, এই ভাল্‌ভ্‌ সম্পর্কে সমস্যা কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। প্রধান সমস্যা হইল উপযুক্ত ভাল্‌ভের সরবরাহ।

শূকর ছানার হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ্‌ কুকুরের দেহে সংস্থাপন করিয়া এখন যে পরীক্ষা চলিয়াছে, তাহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে উপযুক্ত ভাল্‌ভের অভাব হয়তো মিটানো যাইবে।

ডাঃ ডুরান বলেন, ইহাতে গ্র্যাফটিংসংক্রান্ত কোনরূপ সমস্যা দেখা দিবে না, কারণ কোলাজেন নামক এক স্বাভাবিক পদার্থের দ্বারা এই ভাল্‌ভ্‌-গুলি তৈয়ারী এবং ইহা প্রতিক্রিয়া-প্রতিরোধক।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

ডলফিন

বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ অ্যারিয়নের গল্প মনে পড়ে। বিদেশে এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় যোগদান করে তিনি শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ বলে বিবেচিত হন এবং বহু মূল্যবান পুরস্কারাদি লাভ করেন। পুরস্কারের সামগ্রীসহ একটি জাহাজে চড়ে অ্যারিয়ন ফিরে আসছিলেন স্বদেশে। জাহাজের নাবিকেরা অ্যারিয়নের পুরস্কারের সামগ্রীগুলি দেখে প্রলুব্ধ হয়। চক্রান্ত করে তারা তাঁকে সমুদ্রের জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে জাহাজ নিয়ে দেশে ফিরে আসে।

এদিকে একটি বৃহদাকার সামুদ্রিক জীব অ্যারিয়নের জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে আসে এবং তাঁকে পিঠে করে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছে দেয় সমুদ্রতটে। বৃহদাকার এই সামুদ্রিক জীবটি হচ্ছে ডলফিন। এই কাহিনী সত্য কি মিথ্যা, তা আমাদের বিচার্য নয়, তবে ডলফিন যে পূর্ণবয়স্ক একটি মানুষকে পিঠে চড়িয়ে অনায়াসে দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে—একথা সত্য।

সমুদ্রের বাসিন্দা ডলফিন—মাছ নয়—স্তন্যপায়ী মেরুদণ্ডী প্রাণী। দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৮ থেকে ১২ ফুট, ওজন আনুমানিক ৩০০ পাউণ্ড, মাথাটি ছোট, ঠোঁটটি লম্বা। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ডলফিন চোখে দেখতে পায়, কানে শুনতে পায়, মুখে নানারকম শব্দ করে মায়ের ডাকে সাড়া দেয়। মায়ের পেটে অবস্থিত স্তনের দুটি বোঁটা থেকে দুধ টেনে খায়।

সদ্যোজাত ডলফিন শিশুর দাঁত থাকে না। কয়েক সপ্তাহ পরে দাঁত গজায়। উপরের চোয়াল অপেক্ষা নীচের চোয়ালে দাঁতের সংখ্যা কম। এদের একটি মাত্র নাসারন্ধ্র থাকে। তারই সাহায্যে এরা শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়। ছয় মিনিট সময় পর্যন্ত এরা জলে সম্পূর্ণ ডুবে থাকতে পারে। তারপরই জলের উপরে মাথা তুলতে হয়—শ্বাস নেবার জন্যে।

ডলফিনের দেহটি টর্পেডোর আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ায় জলের বাধা কম পায়—ফলে ওরা দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে। কোন কোন ডলফিনকে ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগেও সাঁতার কাটতে দেখা গেছে। মুখের ঠিক পশ্চাতেই ওদের

চোখ—অনেকটা মানুষের চোখেরই মত। এদের শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। স্কুইড, পিলকার্ড, ম্যাকারেল প্রভৃতি সামুদ্রিক মাছ শিকার করে এরা জীবনধারণ করে। কোন কোন শ্রেণীর ডলফিন আবার সম্পূর্ণ নিরামিষাশী।

প্রধানতঃ আকৃতিগত পার্থক্য অনুযায়ী ডলফিনদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রিসোর ডলফিনের মুখে একটিও দাঁত নেই, দেহের চামড়ায় লম্বা লম্বা দাগকাটা। এই শ্রেণীর ডলফিনের এই দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। ভূমধ্যসাগর এবং আমেরিকার আটলান্টিক উপকূলে বোতল-নাসা ডলফিনদের অধিক সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। তেল নিষ্কাশনের জন্যে এদের শিকার করা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলবর্তী সাগরের জলে হেভিসাইড ডলফিনদের বাস। এদের পিঠ এবং দেহের দু'পাশের চামড়া সাদা ও কালো রঙে রঞ্জিত। এটাই ওদের বৈশিষ্ট্য।
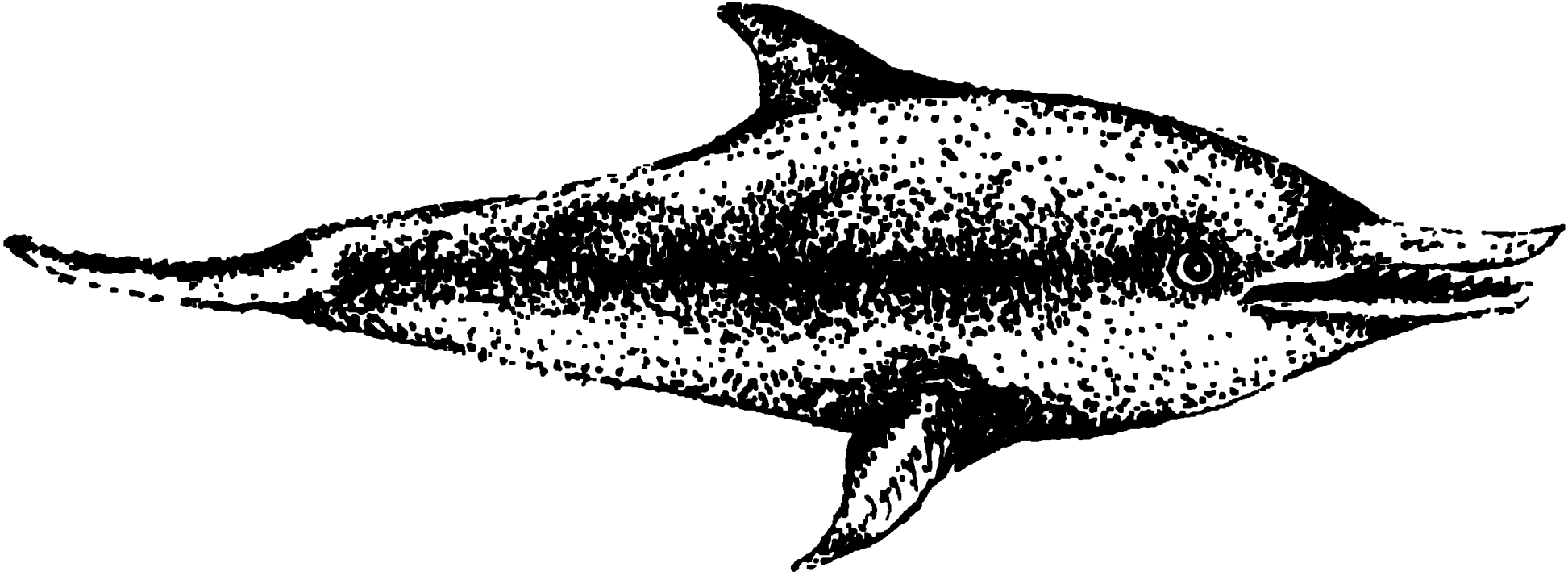
ডলফিন।

ডলফিন খুব ক্রীড়ামোদী। মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে ওরা ওস্তাদ। নিউজিল্যাণ্ডের এক বালকের খেলার সাথী ছিল একটি ডলফিন। বালকটি রবারের বল ছুঁড়ে দিত প্রাণীটির দিকে। প্রাণীটি জল থেকে মুখ তুলে নাক দিয়ে আঘাত করে বলটিকে ফেরত পাঠিয়ে দিত ছেলেটির কাছে। এমনিভাবে ওদের বল খেলা চলতো।

ডলফিন অনুকরণপ্রিয় প্রাণী। জলের তলা দিয়ে ডুবোজাহাজ যায়। ডলফিন জাহাজের ইঞ্জিনের শব্দ শুনে ঠিক সে রকম শব্দ সৃষ্টি করতে পারে—মানুষের উচ্চ স্বরের হাসির অনুকরণ করতে পারে—পাখীর শিস্ দেবার মত শব্দ করতে পারে। কবজাযুক্ত দরজায় যেমন আওয়াজ হয়—ওরা সেরূপ আওয়াজ করে থাকে।

ডক্টর ওলসন নামে একজন প্রাণী-বিজ্ঞানী দুটি ডলফিনকে একবার খুব মজার কাণ্ড করতে দেখেছিলেন। একটি ডলফিন তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে লাল রঙের একটি স্ন্যাপার মাছের লেজ চেপে ধরছিল এবং পিছন দিকে সাঁতরে আসছিল বেশ কয়েক ফুট। তারপর কোন ক্ষতি না করেই মাছটিকে মাঝে মাঝে ছেড়ে দিচ্ছিল। আর একটি ডলফিন একটি সামুদ্রিক কচ্ছপকে তার নাকের উপর বসিয়ে সাঁতার কাটছিল।

হাঙর শিকারে ডলফিনরা ওস্তাদ। হাঙর দেখলেই ওরা মুখে এক ধরণের শব্দ করে। সঙ্গে সঙ্গে দলের আরও কয়েকটি ডলফিন ঘটনাস্থলে দ্রুত হাজির হয়। তারপর সবাই একে একে আক্রমণ চালায় হাঙরটির উপর। তার পাকস্থলী, মাথা ও কান্‌কোর পশ্চাদ্ভাগে ক্রমাগত আঘাত করতে থাকে। সে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে হাঙর নির্জীব হয়ে পড়ে।

অমরনাথ রায়

তেরো মাসে বছর

আজ কি বার, কত তারিখ—এই কথা জিজ্ঞাসা করলে এখনকার একটি শিশুও ক্যালেণ্ডার দেখে বলে দিতে পারবে। মাস, তারিখ বলে দেবার জন্যে আমাদের চারপাশে রয়েছে ক্যালেণ্ডার, রেডিও, ঘড়ি, খবরের কাগজ। এদের দৌলতে প্রায় সকলেই ভুলতে বসেছে যে, ক্যালেণ্ডারের তারিখ এবং ঘড়ির সময় পৃথিবীর আহ্নিক এবং বার্ষিক গতির উপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে।

ক্যালেণ্ডার এবং ঘড়ির আবিষ্কার হবার আগে সময় জানতে হলে দিনে সূর্য এবং রাত্রে নক্ষত্রের উপর নির্ভর করতে হতো।

পৃথিবীর আদিম অধিবাসীরা লক্ষ্য করলো যে, রাত্রি থেকে দিন যত বেশী বড় হতে থাকে, উত্তাপ ততই বাড়তে থাকে—আর উত্তাপ বাড়লেই তারা বুঝতে পারতো তাদের শস্য বপনের সময় নিকটবর্তী।

দিন দীর্ঘ হলেই মিশরের আদি অধিবাসীরা বুঝতে পারতো, এবার নীলনদে বান আসবার সময় এগিয়ে আসছে। কিছুদিনের মধ্যেই নীলনদ দুই কূল প্লাবিত করে রোদে ফাটা শস্যভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবে, আর সেই জলেই হবে তাদের সমস্ত বছরের অন্নসংস্থান।

কাজেই নীলনদে ঠিক কখন বন্যা আসবে, তার উপর মিশরীয়দের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করতো। মিশরীয় রাজপুরুষেরা লক্ষ্য করলো—ভোরবেলা সূর্য এবং সীরিয়াস নামে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রকে যখন একসঙ্গে আকাশে উঠতে দেখা যায়, তার কয়েক দিনের মধ্যেই নীলনদে বান আসে। নীলনদের বন্যার গুরুত্ব লক্ষ্য করে রাজপুরোহিতেরা সূর্যের গতিবিধির উপর খুব ভাল করে নজর রাখতে সুরু করলো।

এই পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, সূর্য এবং সীরিয়াস ঠিক একই গতিতে ঘোরে না। একদিন দুজনে একসঙ্গে উঠলে পরদিনই সূর্য সীরিয়াস থেকে কিছু পরে উঠবে। এভাবে ঠিক ৯১ দিন পরে যখন সূর্য উঠলো, তখন সীরিয়াস মধ্য-আকাশে এবং

১৮২ দিন পরে সূর্য যখন পূবদিকে উদিত হচ্ছে, সীরিয়াস তখন পশ্চিমে অস্ত যাচ্ছে। আবার ৩৬৫ দিন পর অবশ্য দুজনে একসঙ্গেই উদিত হলো—নীলনদে বান ডাকলো এবং নতুন বছর সুরু হলো।

চাঁদের পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় নিয়ে এক-একটি মাসের সৃষ্টি হলো। এই সময় হলো ২৯½ দিন। কিন্তু যেহেতু ৩৬৫ দিনকে ২৯½ দ্বারা পূর্ণসংখ্যায় ভাগ করা যায় না, সেহেতু বছরকে পুরাপুরি মাসে ভাগ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো।

খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দেরও আগে ব্যাবিলনীয়েরা যে পাঁজি ব্যবহার করতো, তাতে তারা ৩৬০ দিনের বছরকে ১২টি সমান মাসে ভাগ করেছিল। কিন্তু সূর্যের পর্যায়-কাল ৩৬৫ দিন, ৩৬০ দিন নয়। কাজেই ব্যাবিলনীয়দের পাঁজি অনুসরণ করলে কয়েক বছর পরেই দেখা যাবে যে, পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সময় বিশৃঙ্খলভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে।

সে যুগের ব্যাবিলনীয়েরাও এই বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিল। তারা চান্দ্র এবং সৌর বছরের এই তারতম্য দূর করবার জন্যে এক অভিনব পন্থা মেনে চলতো। রাজা এবং রাজপুরোহিতের পরামর্শ অনুযায়ী তারা কয়েক বছর পর পর একটি বছর ১৩ মাসে ধার্য করতো। এই বিশেষ মাসকে বলা হতো মলমাস।

মাসকেও এক এক ভাগে পাঁচ দিন করে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। পরে সাতটি গ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সাত দিনে সপ্তাহের কথা তাদের মাথায় আসে। তাছাড়া সাত সংখ্যাকে আগেও তারা যাদুগুণসম্পন্ন সংখ্যা হিসাবে গণ্য করতো।

মিশরীয় ধর্মযাজকেরা লক্ষ্য করলো যে, ৩৬৫ দিনে যদি এক বছর ধরা যায়, তাহলে দেখা যায়—চার বছর পর সূর্য সীরিয়াসের এক ঘণ্টা আগেই আকাশে দেখা দিয়েছে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যেই তাঁরা খুব উঁচু ধর্মমন্দির তৈরী করলো এবং তাদের চূড়া থেকে সীরিয়াসের গতিবিধি সম্বন্ধে খুব ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করলো। বহু দিনের চেষ্টার ফলে তাঁরা জানতে পারলো যে, সূর্য এবং সীরিয়াস ৩৬৫ দিন পরে নয়, ৩৬৫¼ দিন পরে একসঙ্গে ওঠে।

তাই তাঁরা প্রতি চতুর্থ বছরের সঙ্গে একটি দিন যোগ করবার রীতি প্রবর্তন করলো। মিশরীয়েরা অবশ্য ক্যালেণ্ডারে এই রীতির প্রবর্তন করে নি, জুলিয়াস সীজারের আমলে সর্বপ্রথম এই লীপ-ইয়ারের প্রবর্তন হয়।

ধীরে ধীরে আরও অনেক পরীক্ষার পর জানা গেল যে, প্রতি বছরে দিনের সংখ্যা ৩৬৫¼ থেকে কিছু কম। আসল সংখ্যা হলো ৩৬৫.২৪২২ দিন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরী এই ত্রুটি সংশোধন করেন। তিনি ঠিক করলেন যে, কেবল চতুর্থটি ছাড়া পূর্বের অন্য শতাব্দীর বছরগুলিকে লীপ-ইয়ার হিসাবে ধরা হবে না।

বিংশ শতাব্দীর মাঝে এসে আজও আমরা এই ক্যালেণ্ডারই ব্যবহার করি। আবিষ্কর্তার নামানুসারে এর নাম হয়েছে গ্রেগরীয়ান ক্যালেণ্ডার।

সুনিচাপ্রসন্ন কর

উদ্ভিদ-জগতে পরজীবিতা

মাংসাশী জীবজন্তুরা অপরের রক্ত-মাংসে জীবিকানির্বাহ করে এবং নিরামিষাশী জীবজন্তুরা উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপরই নির্ভর করে। মানুষে মানুষে যখন কাটাকাটি খুনাখুনি করে, তখনও আমরা বলি—মানুষ রক্তলোলুপ হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রাণী-জগতের মত উদ্ভিদ-জগতে হানাহানি না দেখা গেলেও কতকগুলি উদ্ভিদ অপর উদ্ভিদের দেহরস শোষণ করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। উদ্ভিদের দেহে খাদ্য সঞ্চালিত হয় তরল পদার্থের মাধ্যমে। কোন উদ্ভিদকে ছেদন করলেই খানিকটা তরল পদার্থ বা রস বেরিয়ে আসে। এই রস উদ্ভিদের দেহে প্রবাহিত হয় নানা শিরা-উপশিরার মাধ্যমে। মাটি থেকে রস নিয়ে এবং বায়ুমণ্ডলের বিশেষ উপাদান থেকে উদ্ভিদ সাধারণতঃ নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করতে পারে। কিন্তু কতকগুলি উদ্ভিদ আছে যাদের এই ক্ষমতা নেই এবং তারা পরনির্ভরশীল; অর্থাৎ তারা জীবনধারণের জন্যে খাদ্য আহরণ করে অন্য উদ্ভিদের রস শোষণ করে। এই উদ্ভিদগুলিকে শোষক গাছ বা পরগাছা (Parasite) বলা হয়। এরা জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু পোষক (Host) গাছ থেকে শোষণ করে নেয়। কাজেই এদের পরদেহ শোষণে পুষ্টির ব্যাপারটাকে পরজীবিতা বলা হয়ে থাকে।

স্বর্ণলতা
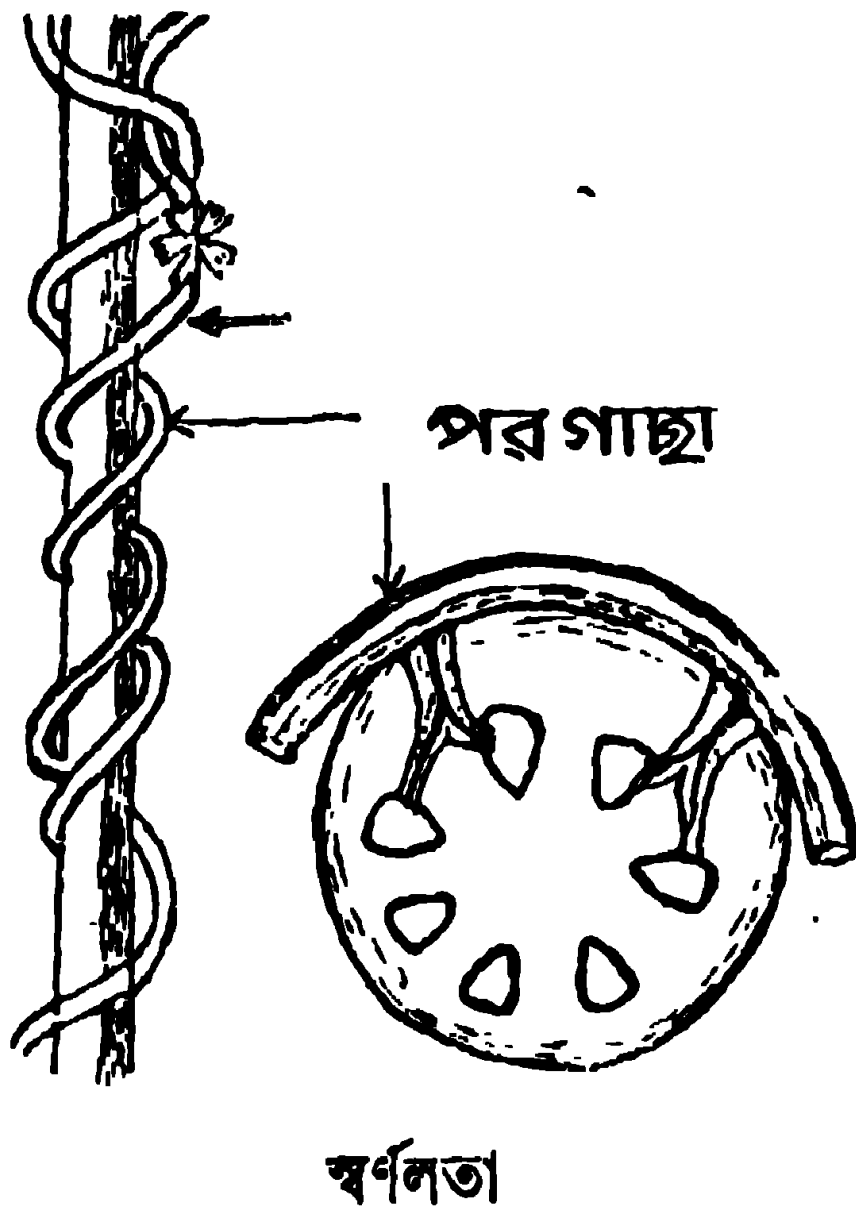
অতি নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে এই পরজীবিতার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বিশেষ করে ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদে এই পরজীবিতা বেশী দেখা যায়। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের দেহে সবুজকণিকা থাকে না, কাজেই তারা নিজেদের খাদ্য তৈরী করতে পারে না। তাই এরা খাদ্যের জন্যে অন্য উদ্ভিদের উপর নির্ভর করে

থাকে। এরা পোষক গাছের খাদ্য নিয়ে জীবনধারণ করে। ফলে, সেই পোষক গাছ ক্রমশঃ তার জীবনশক্তি হারিয়ে ফেলে। এরূপ পরগাছাগুলির মধ্যে Coheat Rust, Potato Blight, Corn Smut বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা অনেক কৃষিজাত শস্য আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতিসাধন করে।

পরগাছা যে গাছে জন্মায় সে গাছ থেকে খাদ্য বা রস শোষণ করবার জন্যে এক প্রকার বিশেষ মূল সৃষ্টি করে। সে মূলগুলিকে বলে শোষক মূল (Haustoria)। পরগাছার মধ্যে কতকগুলি সম্পূর্ণ পরনির্ভরশীল, অর্থাৎ সমস্ত খাদ্য পোষক গাছ থেকেই সংগ্রহ করে। আবার কতকগুলি আংশিক পরনির্ভরশীল, অর্থাৎ এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে এবং সে জন্যেই এদের সবুজ দেখায়। পরগাছা সাধারণতঃ কাণ্ড বা মূলের উপর জন্মায় এবং সমস্ত খাদ্য সে কাণ্ড বা মূল থেকে সংগ্রহ করে। কাণ্ডের গায়ের পরগাছাগুলির মধ্যে স্বর্ণলতা বা Dodder (cuscuta) এবং আকাশবেল (Cassytha) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
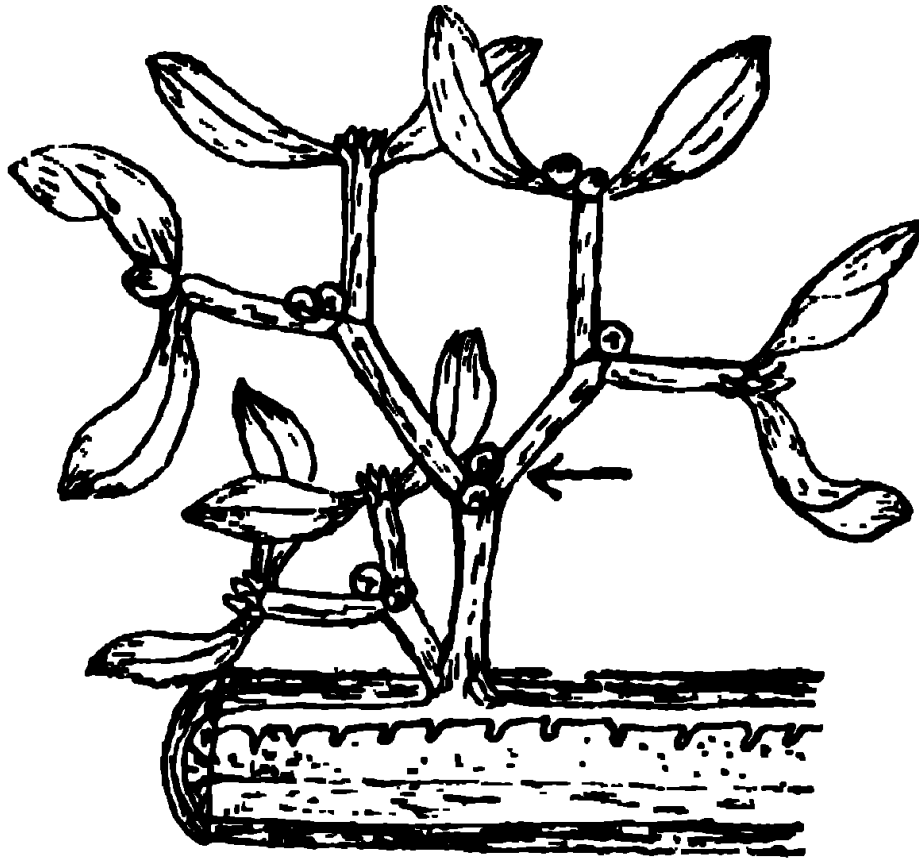
বান্দাগাছ

স্বর্ণলতা রস শোষণ করবার সময় পোষক গাছের চারদিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে এবং কুণ্ডলীর ভিতরের দিকে কতকগুলি আঠালো চক্রাকার যন্ত্র (Adhesive disc) তৈরী হয়, যা থেকে শোষক মূল পোষক গাছের কোষে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে সেই পরগাছার সঙ্গে পোষক গাছের খাদ্যবাহী তন্তুগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং রস শোষণ করে। স্বর্ণলতা নিজের খাদ্য ও জলের জন্যে পোষক গাছের উপর নির্ভর করে; কিন্তু যে পোষক গাছ তাকে বাঁচিয়ে রাখে, সমস্ত রস শোষিত হওয়ায় সে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যেতে থকে।

স্বর্ণলতা ছাড়া বান্দা গাছ (Viscum) এবং মান্দা গাছ (Loranthus) নামক কতকগুলি উদ্ভিদ আছে, যারা আংশিকভাবে অন্য গাছের কাণ্ডের উপর নির্ভরশীল। এদের

খাদ্যের কিয়দংশ এরা নিজেরাই প্রস্তুত করে এবং বাকী অংশ পোষক গাছ থেকে আদায় করে নেয়।

বেলানোফোরা, অরব্রাঙ্কী প্রভৃতি কতকগুলি গাছ নিজেদের খাদ্য প্রাণের জন্যে সম্পূর্ণরূপে পোষক গাছের মূলের উপর নির্ভরশীল। তাই এদের ক্ষুদ্র বীজ যখনই অন্য পোষক গাছের মূলের সংস্পর্শে আসে, তখনই অঙ্কুরোদগম হয় এবং ক্রমশঃ উক্ত গাছের মূলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকে। এমনি করেই সে পরের রস শোষণ করে নিজের জীবনীশক্তি সঞ্চয় করে।

অরব্রাঙ্কী

সুমাত্রা ও জাভায় রাফ্লেশিয়া নামে এই জাতীয় আর একরকম উদ্ভিদ দেখা যায়, যা ভাইটিস্ গাছের মূলের উপর নির্ভরশীল। এই উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর সূতার ন্যায় কাণ্ডটি অতিকায় ফুল বহন করে—এত বড় ফুল উদ্ভিদ-জগতে বিরল। এমন কি, সুগন্ধী চন্দন গাছ (Santalum album) অন্য গাছের মূলের উপর আংশিক পরভোজী।

পরগাছাগুলির মধ্যে ফেসিলেরিয়ার জীবনধারণ প্রণালী দেখলে আশ্চর্য লাগে। কেন না, এরা নির্ভর করে অন্য একটি গাছের (Loranthus) উপর, যে নিজেই পরগাছা। ফেসিলেরিয়ার জীবনধারণ প্রণালী দেখলে মনে হয়, যেন সে "চোরের উপর বাটপাড়ি" করে খায়।

উদ্ভিদ-জগতে এরূপ খাদ্য-খাদক সম্পর্ক—সত্যই বিচিত্র। এই সম্বন্ধে অনেকের হয়তো সঠিক ধারণা নেই। তবে এদের জীবনধারণ প্রণালী সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া এবং এদের কবল থেকে কৃষিজাত শস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্ভিদকে রক্ষা করা খুবই দরকার। এই সব শোষক গাছের বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট পোষক গাছ আছে এবং তাদের অঙ্কুরোদগম তখনই হয়, যখন এরা ঐ নির্দিষ্ট পোষক গাছের সংস্পর্শে আসে। তাই মনে হয় পোষক গাছ যেন শোষক গাছগুলির কাছে জন্ম-জন্মান্তর থেকেই ঋণী।

ভূমেন দেওয়ান

হিমবাহ ও বরফ-যুগ

পৃথিবীতে সর্বসাকুল্যে ৩৫ কোটি ঘনমাইল পরিমাণ জল আছে। পৃথিবীর সমগ্র জলসম্পদের মাত্র শতকরা ১ ভাগ কঠিন অবস্থায়, অর্থাৎ বরফ বা তুষার রূপে থাকে। কি ভাবে জলের তিন অবস্থায় সূক্ষ্ম অনুপাত বজায় থাকে, সেটা সমীক্ষা করে দেখা গেছে যে, পৃথিবীতে যেখানে যেখানে জল বরফ বা তুষারের আকারে স্তূপীকৃত হয়ে আছে, সেই স্তূপগুলিই এই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করে। সেই জন্যে বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি খুব মনযোগের সঙ্গে পৃথিবীর এই তুষারাবরণ সম্বন্ধে অনুশীলন করেছেন। একে হিমবাহ-বিজ্ঞান বলা হয়।

হিমবাহ পৃথিবীর স্থলভাগের শতকরা দশ ভাগ বা প্রায় ৬০ লক্ষ বর্গমাইল আচ্ছন্ন করে আছে। অর্থাৎ পৃথিবী-পৃষ্ঠের তিন ভাগ তরল অবস্থার জলে ঢাকা, আর যে এক ভাগ স্থল তারও আবার ১০ ভাগের এক ভাগ কঠিন অবস্থার জলের দ্বারা আচ্ছাদিত। আর গ্যাসীয় জল বা জলীয় বাষ্প তো সর্বত্র বিদ্যমান। তবে স্থলভাগের যে অংশ বরফে আচ্ছন্ন, তার মধ্যে কি পরিমাণ বরফ আছে, তার এখনও সঠিক পরিমাণ করা যায় নি। কেন না, দক্ষিণ মেরুতে বিরাট মহাদেশ বরফের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন। গত চার বছর থেকে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা ভীষণ শৈত্যের মধ্যে এর পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্যে ব্যস্ত আছেন।

তুষারাচ্ছন্ন সমগ্র স্থলভাগের শতকরা ৮৬ ভাগ দক্ষিণ মেরু মহাদেশে অবস্থিত। বাকী দশ ভাগ গ্রীনল্যাণ্ডে আর বাকী চার ভাগ পৃথিবী-পৃষ্ঠের বিভিন্ন পর্বত-শিখর ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে আছে। উচ্চ পর্বতের শিখরে যে হাজার হাজার মাইল হিমবাহ থাকে, তাদের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের আবহাওয়ার পরিবর্তনের খুব ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। হিমবাহ বা বরফস্তূপের সমস্ত জল যদি কঠিন অবস্থা থেকে তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহলে সমুদ্রের জলরাশি ৬৫ফুট থেকে ২০০ফুট পর্যন্ত স্ফীত হয়ে উঠবে। যেখানেই শীতের সময় তুষারপাত হয়, সেখানেই গ্রীষ্মের সময় কিছু গলে যায়। যে সব জায়গায় গ্রীষ্মে শীতের সমস্ত তুষার গলে না যায়, সেখানেই তুষার জমতে থাকে। তারপর নিজের ভারে আর মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে নীচের দিকে নামতে থাকে, কঠিন বরফের নদীর আকারে। একেই বলে হিমবাহ। সবচেয়ে ঠাণ্ডা দেশেই যে হিমবাহ বেশী হয়, তা নয়। অ্যালাস্কার দক্ষিণাংশের সমুদ্র-উপকূলেই হিমবাহের সবচেয়ে বেশী ছড়াছড়ি, যদিও অ্যালাস্কায় সবচেয়ে কম ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা কম হলেও তুষারপাত ঐখানেই বেশী হয়। সমুদ্রজাত জলীয় বাষ্প ঐ খানেই বেশী। হিমবাহের উপাদান কঠিন জল হলেও নিজ ভারে আস্তে আস্তে তরল জলের মতই এগিয়ে যায়, তারপর নীচে যথেষ্ট গরম জায়গায় এলে তরলাবস্থায়

পরিণত হয়। গ্রীনল্যাণ্ড বা অ্যালাস্কার মত শীতপ্রধান দেশে হিমবাহ সমুদ্র পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। জমির ঢাল অনুযায়ী হিমবাহের গতিবেগের অনেক তারতম্য হয়।

পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যত তুষারাবৃত অঞ্চল আছে, তার হিসাব মোটামুটি এরূপ—

এশিয়া—	৪৮৭০০	বর্গমাইল
ইউরোপ—	৪১০০	”
আফ্রিকা—	১২	”
উত্তর আমেরিকা—	২৯৭০০	”
দক্ষিণ আমেরিকা—	৯৭০০	”
গ্রীনল্যাণ্ড—	৬৯৫০০০	”
ক্যানাডীয় মেরুপ্রদেশ—	৫৯২০০	”
ইউরোপীয় মেরুপ্রদেশ—	৪৮১০০	”
দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ—	৪৮৮৪২০০	”

এমন এক এক সময় গেছে, যখন কোথাও হিমবাহের অস্তিত্ব ছিল না। আবার এক এক সময় বর্তমানের বরফাচ্ছাদিত অংশের অনেক গুণ বেশী অংশ তুষারাচ্ছন্ন ছিল। এই সকল যুগকে বরফ-যুগ বলা হয়। পৃথিবীর ইতিহাসের সাম্প্রতিক দশ লক্ষ বছরের মধ্যে এরূপ চারটি বরফ-যুগের চিহ্ন এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল যেটি, সে যুগে পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় শতকরা ৩২ ভাগ হিমবাহের নীচে ঢাকা ছিল। এই বরফ-যুগের মধ্যে মধ্যে আবার উষ্ণ বাতাবরণ অনেক দিন স্থায়ী হয়েছে, যখন এই হিমবাহ প্রায় লোপ পেয়েছে। বর্তমান যুগটি এই দুই যুগের মাঝামাঝি।

সম্প্রতি যে বরফ-যুগ গেছে, তখন সমুদ্রের তলদেশ এখনকার চেয়ে প্রায় ২৫০ ফুট নীচে ছিল। পৃথিবীর স্থলভাগের তাপ ছিল এখনকার চেয়ে গড়ে ৭ থেকে ১৪ ডিগ্রী কম। পাঁচটি মহাদেশের প্রত্যেকটিতে প্রায় ১০ লক্ষ বর্গমাইল বরফে ঢাকা ছিল। এর মধ্যে উত্তর আমেরিকা, সাইবেরিয়া ও ইউরোপের বরফ একেবারেই গলে গেছে, কেবল গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ মেরুতে এখনও আছে, আর পর্বত-পৃষ্ঠে হিমবাহগুলি গুটিয়ে ছোট হয়ে গেছে। বরফের এই শেষ সমৃদ্ধি ঘটে খৃষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৫০০ বছরের মধ্যে। তারপর ১০০০ খৃষ্টাব্দে আবার অবনতি ঘটে। পরে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে হিমবাহগুলি আবার বর্ধিত হতে আরম্ভ করে। গত একশত বছরে সমগ্র পৃথিবীর তুষারস্তূপ আবার ছোট হয়ে আসছে এবং সমুদ্রের তলদেশ শতাব্দীতে প্রায় আড়াই ইঞ্চি বেড়েছে।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

জানবার কথা

১। আজকাল আমরা নানারকমের সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করি। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবতে পার—মানুষ এসব সুগন্ধি দ্রব্য'হাল আমলে ব্যবহার করছে—তা কিন্তু মোটেই নয়। জানা গেছে—মিশরীয়েরা প্রায় ৩০০০ বছর আগেও মুখে একরকম
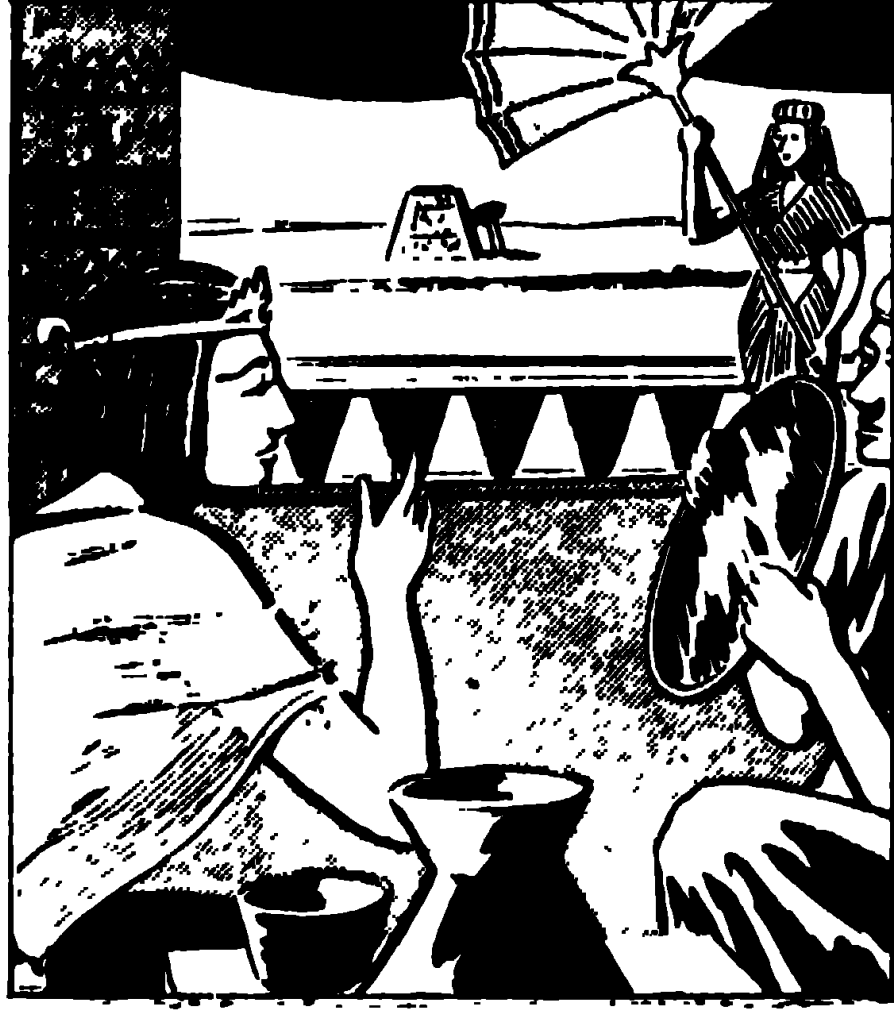
১নং চিত্র

সুগন্ধি ক্রীম মাখতো। প্রাচীন মিশরীয় সমাধি মন্দিরের মধ্যে যে সব কারুকার্য খচিত পাত্র পাওয়া গেছে, তাদের সুবাস নাকি আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

২। অনেক সময় আমরা সময় হাত-পা ও মাথার সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করি। ভাষাবিদ্‌দের মতে—মুখ হাত-পা-আঙুল ও শারীরিক কসরতের দ্বারা প্রায়

২নং চিত্র।

৭০০,০০০ বিভিন্ন ভাব-প্রকাশক আকার-ইঙ্গিত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করা যায়। এসব আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা একটা পূর্ণ-বিকশিত ভাষার অনুরূপ কাজ চালানো যেতে পারে।

৩। পুরুষ পাখীরা কেবল গানের জন্যেই গান করে না। আনন্দ প্রকাশ করা ছাড়াও—স্ত্রী-পাখীকে আকৃষ্ট করা এবং তাদের সীমার মধ্যে অনধিকার প্রবেশকারীকে

৩নং চিত্র।

হটিয়ে দেওয়াই তাদের গানের প্রধান উদ্দেশ্য। যে অল্প সংখ্যক প্রজাতির স্ত্রী-পাখীরা গান গায়—তাদের মধ্যে কার্ডিনাল পাখীর নাম উল্লেখযোগ্য।

৪। মেক্সিকোর বিখ্যাত 'লাফানো মটরের' কথা তোমরা হয়তো কেউ কেউ শুনে থাকবে। মটরগুলি খুবই অদ্ভুত—টেবিল বা কোন জায়গায় রেখে দিলে সেগুলি কিছুক্ষণ পর পর আপনা-আপনিই লাফিয়ে থাকে। এদের লাফানোর দৃশ্য দেখে বেশ মজা পাওয়া যায়। আসলে কিন্তু মটরগুলি নিজেরা লাফায় না। এই মটর

৪নং চিত্র

হচ্ছে এক রকম গাছের বীজ। একজাতীয় মথের (Tortricid moth) লার্ভা বা শূককীট মটরগুলির মধ্যে থাকে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলে এরা এভাবে লাফিয়ে থাকে। শূককীট মটরের ভিতরের দিকে দৃঢ়ভাবে কামড়ে ধরে শরীরের পিছন দিক দিয়ে সজোরে মটরের নীচের দিকে আঘাত করে। তার ফলেই মটরটি লাফিয়ে ওঠে।

৫। নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হ্যারল্ড জে. বল পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে কীট-পতঙ্গকে পালন করলে তাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও ওজন

৫নং চিত্র।

আলোর মধ্যে বর্ধিত কীট-পতঙ্গের তুলনায় অনেক বেশী হয়। ফলে তাদের দেহাকৃতিও আলোর মধ্যে বর্ধিত কীট-পতঙ্গের তুলনায় অনেক বড় হয়।

৬। চিড়িয়াখানায় তোমরা কুমীর দেখেছ। এদের গায়ে যেমন জোর, স্বভাবও তেমনি উগ্র। এক জাতীয় কুমীরকে অ্যালিগেটর (Alligator) বলা হয়। কিন্তু পৃথিবীর

৬নং চিত্র।

মাত্র দুটি জায়গায় অ্যালিগেটর দেখা যায়—দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীন দেশের ইয়াংসি নদীতে। কেন যে এরা কেবল এই দুটি স্থানকেই বাসস্থান হিসাবে নির্বাচন করেছে—জীব-বিজ্ঞানীরা তার কোন সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি। মজার কথা হচ্ছে—স্থান দুটির পারস্পরিক দূরত্ব সামান্য নয়।

৭। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে ছোট কিন্তু দ্রুতগামী এক ধরণের জলযান নির্মিত হয়েছে। এই জলযান নিম্নে সংলগ্ন ডানার মত যন্ত্রের সাহায্যে জলের উপর দিয়ে বিস্ময়কর
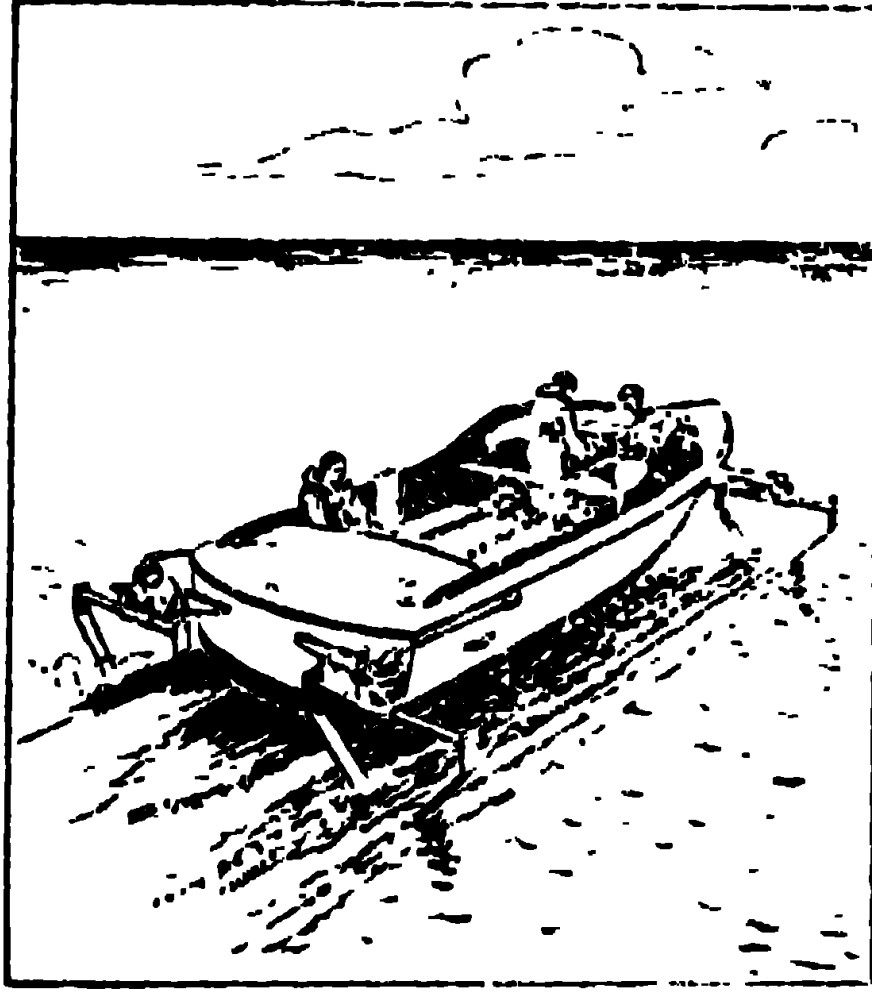
৭নং চিত্র।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়। জলযানটি সম্প্রতি নির্মিত হলেও—এর মূল সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন টেলিফোনের আবিষ্কর্তা বিশ্ববিখ্যাত আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম বেল।

৮। বিশ্ববিখ্যাত মহিলা হেলেন কেলারের নাম তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। তাঁর দু'বছর বয়স পূর্ণ না হতেই গুরুতর রোগে তিনি কালা, বোবা ও অন্ধ হয়ে যান। তার পরে তিনি লিখতে-পড়তে ও কথা বলতে শিখেছেন। এখন তাঁর বয়স ৭৫ বছর

৮নং চিত্র।

ছাড়িয়ে গেছে। এত বেশী বয়সেও তিনি সম্পূর্ণ কর্মক্ষম এবং কাজে তাঁর উৎসাহও অপরিসীম। অঙ্গহানির জন্যে যারা অক্ষম, হেলেন কেলারের জীবনাদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টা তাঁদের যথেষ্ট প্রেরণা যোগায়। এইরকম অক্ষম লোকদের সুখ-সুবিধার জন্যে হেলেন কেলার আত্মনিয়োগ করেছেন।

৯। গ্রীনল্যাণ্ডে এত বরফ আছে যে, সেই বরফের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবীকে ১৭

৯নং চিত্র।

ফুট পুরু একটা জমাট আস্তরণে আচ্ছাদিত করা সম্ভব। এই সব বরফ যদি হঠাৎ এক সঙ্গে গলে যায়, তবে পৃথিবীর মাহাসাগরগুলির জল ২৪ ফুট উঁচু হয়ে উঠবে।

১০। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতির মুদ্রিত পুস্তকটি সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে কংগ্রেস লাইব্রেরীতে রাখা হয়েছে। এর চেয়ে ছোট কোন মুদ্রিত পুস্তক নাকি আর দেখা যায় নি। পুস্তকটির পাতার সংখ্যা ১১ এবং তাতে লেখা
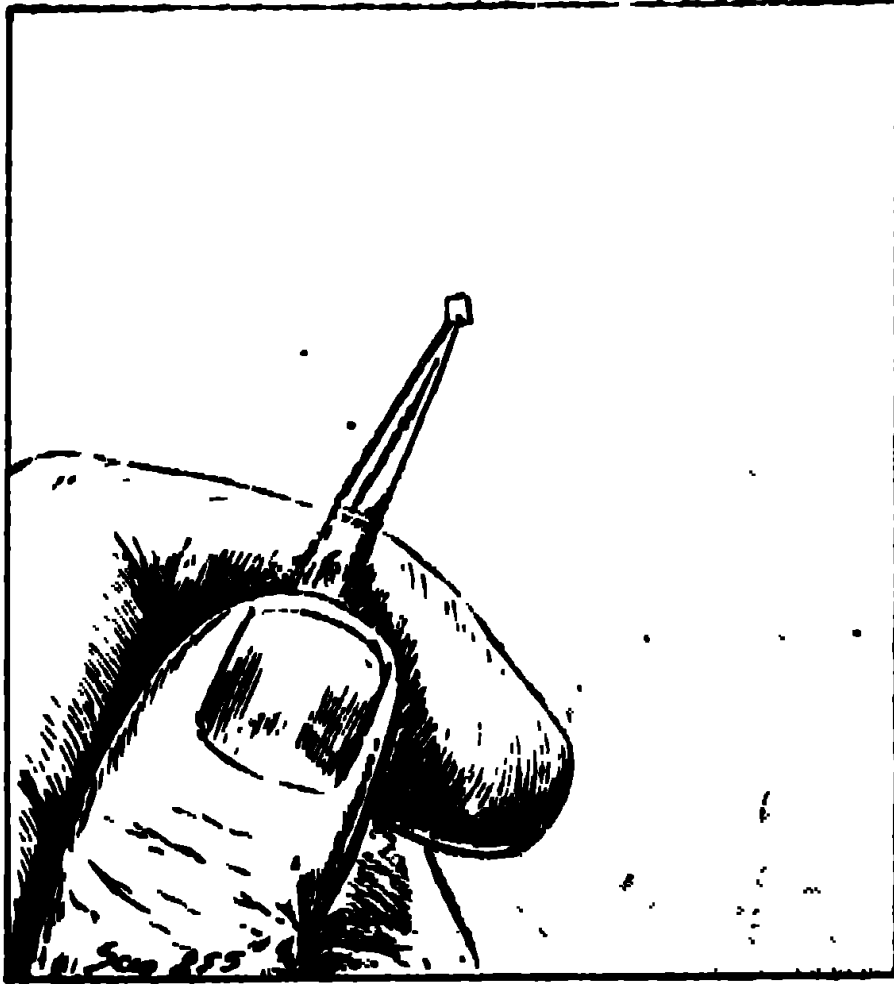
১০নং চিত্র।

আছে—প্রভুর প্রার্থনা। পুস্তকটির চারদিকের মাপ হচ্ছে এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

১১। যুক্তরাষ্ট্রের কৃত্রিম উপগ্রহ এক্সপ্লোরারকে পৃথিবী থেকে ২১৯ মাইল দূরত্বে মহাকাশে উৎক্ষেপ করা হয়েছিল। এক্সপ্লোরার সোভিয়েট স্পুটনিক-১ থেকে ৭৬ মাইল

এবং স্পুটনিক-২ থেকে ৮৯ মাইল এগিয়েছিল। এক্সপ্লোরার পৃথিবী থেকে ১৫৮৭ মাইল

১১নং চিত্র।

দূরে যায় এবং এটি হচ্ছে তার কক্ষপথের দূরতম স্থান। সোভিয়েট স্পুটনিক-১ এবং ২ পৃথিবী থেকে যথাক্রমে ৫৮৩ এবং ১০৫৬ মাইল দূরে পৌঁচেছিল।

১২। প্রাণীদের শীতঘুম সম্বন্ধে বোধ হয় তোমরা কিছু জান। শীতঘুম হচ্ছে, শীতকালে কোন কোন প্রাণীর একটানা লম্বা বিশ্রাম। শীতঘুমের সময় দেখে মনে হয়—তাদের দেহে প্রাণ নেই। আসলে কিন্তু এরা মরে যায় না। তবে

১২নং চিত্র।

তাদের দেহে প্রাণের লক্ষণ সহজে বোঝা যায় না। এক জাতের গেছোবেড়াল (Woodchuck) স্বাভাবিক সময়ে প্রতি মিনিটে ৩০ বার শ্বাসক্রিয়া চালায়। কোন কারণে উত্তেজিত হলে তার শ্বাসক্রিয়ার হার অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে মিনিটে ১০০ দাঁড়ায়। কিন্তু শীতঘুমের সময় সে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর একবার শ্বাসক্রিয়া চালায়। শীতঘুমের সময় তার নাড়ীর গতি ৮০ থেকে কমে প্রতি মিনিটে ৪ বা ৫-এ দাঁড়ায়।

বিবিধ

তৃতীয় বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মারক' বক্তৃতা

১০ই অগাষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজস্থিত 'সাহা ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স'-এর বক্তৃতা-গৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে তৃতীয় বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মারক বক্তৃতা' অনুষ্ঠিত হয়। এই বক্তৃতা দেন অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় 'অতিকায় অণুর অভিনব কাহিনী' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে তিনি অতিকায় অণুতত্ত্ব এবং উহার ব্যবহারিক প্রয়োগের বিভিন্ন উদাহরণ চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, অণুর সৃষ্টিমূলক ব্যবহার বিশ্বে মানুষের জীবনযাত্রা এবং অশন-বসন-ব্যসনের ক্ষেত্রে যুগান্তর আনিয়াছে। পারমাণবিক বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগের সম্ভাবনায় পৃথিবী আজ আতঙ্কিত; কিন্তু উহার সৃষ্টিমূলক দিকটি মানুষ গড়িবার, ধ্বংসের জন্য নহে।

উচ্চ পর্বতের উপযোগী আবাস

নয়াদিল্লী, ৪ঠা অগাষ্ট—সম্প্রতি প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা একটি নূতন ধরণের গৃহ-নির্মাণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই গৃহগুলি উচ্চ পর্বতে সৈন্য ও অভিযাত্রীদের পক্ষে খুবই উপযোগী হইবে। এই গৃহগুলি ঘণ্টায় ১০০ মাইল গতি-সম্পন্ন বায়ুর বেগ প্রতিহত করিতে পারিবে। হিমাঙ্কের ৩০ ডিগ্রী কম সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়ও এই ঘরগুলিতে বাস করা যাইবে। এই ঘরগুলির ছাদে প্রচুর বরফ জমা হইলেও ভাঙিবার আশঙ্কা নাই।

তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ-কেন্দ্র

নয়াদিল্লী ১১ই অগাষ্ট—১৯৬৭ সাল হইতে তারাপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন সুরু হইবে এবং ১৯৬৮ সাল হইতে পূর্ণ-গতিতে কাজ চলিবে।

প্রকাশ, নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের পরামর্শ কমিটির এক বৈঠকে পারমাণবিক শক্তি দপ্তরের সেক্রেটারী ডাঃ হোমি জে. ভাবা এই সংবাদ দিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সভাপতিত্বে কমিটির বৈঠক হয়।

গারো পাহাড় জেলায় কয়লা আবিষ্কৃত

নয়াদিল্লী ২০শে অগাষ্ট— ও. ভি. আলাগেশান ২০শে অগাষ্ট রাজ্য সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, ভারতবর্ষের ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা আসামের গারো পাহাড় জেলার অন্তর্গত নাঙ্গালবিবরার নিকট পশ্চিম দবংগিরি কয়লা খনি অঞ্চলে ভূগর্ভে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ টন কয়লার সন্ধান পাইয়াছে। এই কয়লা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, তবে ইহাতে গন্ধকের পরিমাণ বেশী আছে।

জাতীয় কয়লা উন্নয়ন কর্পোরেশনকে এই কয়লা উত্তোলনের ভার দেওয়া হইয়াছে। এই কয়লার দ্বারা আসাম সরকারের নাঙ্গালবিবরা তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের চাহিদা পুরণ করা হইবে। শ্রীআলাগেশান আরও বলেন যে, বর্ষার মরশুম শেষ হইয়া গেলেই এই স্থানে কয়লা উত্তোলনের কাজ আরম্ভ করা হইবে।

দক্ষিণ মেরুর তাপমাত্রা

ওয়েলিংটন, ১৫ই জুলাই—দক্ষিণ মেরুর আমুণ্ড-সন-স্কট ঘাটি হইতে বিজ্ঞানীরা জানাইয়াছেন যে, সেখানে শীতের তীব্রতা এবার সর্বকালের রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে—তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী হইতে ১০৯.৮ ডিগ্রী কম (ফাঃ)। ১৯৫৯ সালের রেকর্ড ছিল ১০৯.৫ ডিগ্রী (ফাঃ)।

গুজরাটে ফ্লোরোস্পার খনিজের সন্ধান

ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা গুজরাটের আম্বডোঙ্গার অঞ্চলে ফ্লোরোস্পার খনিজের সন্ধান পাইয়াছেন। এই পর্যন্ত এই অঞ্চলের ২৬টি বিভিন্ন স্থানে এই খনিজ সঞ্চিত আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রথম খনিজ স্তরের হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে যে, এই সকল স্থান হইতে দশ লক্ষ মেট্রিক টন ফ্লোরোস্পার পাওয়া যাইতে পারে।

ফ্লোরোস্পার ইস্পাত শিল্পে ফ্লাক্স হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ব্যতীত তামা, দস্তা, ম্যাগ্নেসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতু গলাইতেও ইহা ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

সূচনাতেই শিশুদেহে বিষাক্ত টিউমার নির্ণয়ের নূতন পন্থা

নিউরোব্লাষ্টোমা শৈশবের এক মারাত্মক ব্যাধি। এ হলো এক ধরণের বিষাক্ত টিউমার। সূচনাতেই এই রোগ নির্ণয় করা এতদিন সম্ভব ছিল না। কিন্তু এখন তা সম্ভব বলে "জার্নাল অব দি আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন"-এর এক সংবাদে জানা গেছে।

ফ্লোরিডার গেন্সভিলের ডাঃ ক্লাইভ এম. উইলিয়াম্‌স্‌ এবং ডাঃ মেলভিন গ্রীয়ার জানিয়েছেন যে, এই টিউমার হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর দেহে অতিরিক্ত পরিমাণে "ডোপা" নামক একটি রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই আবিষ্কার থেকেই এখন সূচনায় রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে; কারণ প্রস্রাব পরীক্ষা করে দেহে এই রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব ধরা যায়।

ইতিপূর্বে এই রোগ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে হলে বায়োপ্সি (রোগীর দেহতন্তু সংগ্রহ করে পরীক্ষা) করতে হতো। প্রায়ই দেখা যেত, এই পদ্ধতিতে নিঃসন্দেহ হবার পূর্বেই রোগীর সর্বদেহে টিউমারের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে ৬০টি রাষ্ট্রের সহযোগিতা

১৯৬৩-৬৫ সালের মধ্যে আবহাওয়া, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে ভারত, পাকিস্তান, ইস্রায়েল, ইরান, তুরস্ক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি ৬০টিরও বেশী রাষ্ট্রের সম্মিলিত সহযোগিতায় তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়েছে। মহাকাশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের এ একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলে আমেরিকায় জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ডেপুটি ডিরেক্টর হিউ ড্রাইডেন মন্তব্য করেছেন।

ভারত, পাকিস্তান এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে ভূতলস্থিত যন্ত্রাপাতির সাহায্যে তথ্যাদি সংগৃহীত হবে।

গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসায় ডিজিটেলিসের প্রয়োগ

হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায়ই সাধারণতঃ ডিজিটেলিস নামে ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। আমেরিকার ম্যারিল্যাণ্ডস্থিত বেথেস্‌ডার কেনেথে সাইমন এবং এল. বনটিং নামে দুজন চিকিৎসক গ্লুকোমা রোগে এই ঔষধটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পেয়েছেন। এই চক্ষুরোগে দৃষ্টিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা ষোলটি রোগীর উপর এই ঔষধটি প্রয়োগ করেছিলেন।

বর্তমানে অ্যাসিটাজোলেমাইড নামে একটি ঔষধ গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। এই রোগের যে সকল উপসর্গের দরুণ অ্যাসিটাজোলেমাইডের প্রয়োগ সম্ভব হয় না, তাঁরা সে সকল ক্ষেত্রে ডিজিটেলিস প্রয়োগের সুপারিশ করেছেন। আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত আর্টাইভ্‌স্‌ অব অপ্‌থ্যালমোলোজী নামে সাময়িক পত্রে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। মিঃ সাইমন ও মিঃ বন্টিং ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউটস অব হেলথের চক্ষুরোগ চিকিৎসা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ | অক্টোবর, ১৯৬৩ | দশম সংখ্যা

খাদ্য ও রাসায়নিক পদার্থ

শ্রীপশুপতি সাধুখাঁ

শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে মানুষের প্রয়োজন সুসম ও পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য। মানুষ তার খাদ্যের জন্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত উপকরণের অধিকাংশকেই খাদ্যোপযোগী করবার জন্যে আমরা নানারকম পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে থাকি। খাদ্য-সংরক্ষণ, খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি, খাদ্যকে রঞ্জিত করে আকর্ষণীয় করা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রায়ই আমরা প্রস্তুত খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিই নানারকম রাসায়নিক পদার্থ—যেগুলি শরীরের কোন ক্ষতি করে না। এই সকল রাসায়নিক পদার্থকে বলা হয়--ইন্‌টেন্‌শন্যাল অ্যাডিটিভ্‌স্‌। এছাড়া খাদ্যের প্যাকিং, ষ্টোরেজ, প্রসেসিং প্রভৃতির সুবিধার জন্যে ব্যবহৃত হয় নানারকম রাসায়নিক পদার্থ। এদের আমরা বলি ইন্‌সিডেন্টাল অ্যাডিটিভ্‌স্‌।

খাদ্য সংরক্ষণ

জীবাণু শূন্য করা ও জীবাণুর আক্রমণ প্রতি-রোধের জন্যে খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার অপরিহার্য। রুটি, কেক ও অন্যান্য খাদ্য বাতাসের সংস্পর্শে, বিশেষতঃ ভিজা আবহাওয়ায় রেখে দিলে তার উপর সাদা আস্তরণ পড়ে। এগুলি হলো নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ এবং এদের বলা হয় মোল্ড। রুটি বা কেকে মোল্ডের আক্রমণ রোধ করবার জন্যে অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ডাই-অ্যাসিটেট, ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ, সোডিয়াম প্রোপিয়োনেট ব্যবহৃত হয়। মাইক্রো-অরগ্যানিজমের আক্রমণ থেকে খাদ্যকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার আমাদের বহু পরিচিত। অল্প সময়ের জন্যে মাছ-মাংস সংরক্ষণে আমরা বাড়ীতে সাধারণ লবণ ব্যবহার করি। বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে লবণের এই ব্যবহার। লবণের

সম্পৃক্ত দ্রবণে ·২-·৫% সোডিয়াম নাইট্রাইট বা সোডিয়াম নাইট্রেট দিয়ে সেই দ্রবণকেও মাছ সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়। ইথিলিন, প্রোপিলিন অক্সাইড, মিথাইল ব্রোমাইড জমাট-বাঁধা সামগ্রী সংরক্ষণে বিশেস কার্যকরী এবং বহুল ব্যবহৃত। কারণ এই সকল পদার্থ উদ্বায়ী বলে সহজেই এদের দূর করা যায়। ফলজাত দ্রব্যে সোডিয়াম বেন্‌জয়েট (·১%) ও সালফার ডাইঅক্সাইডের (·০৩৫%) ব্যবহার আছে। নকল মাখন ও অন্যান্য বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীকে মোল্ডের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সোরবিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। আরো মজার কথা—বিশেস কয়েক প্রকার কাঠ পুড়িয়ে তার ধোঁয়া দিয়েও খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। এই ধোঁয়ায় থাকে ফরম্যালডিহাইড, ক্রিয়োজোট, ফেনল, পাইরোলিগ্‌নিয়াস অ্যাসিড প্রভৃতি জৈব-রাসায়নিক পদার্থ—যেগুলি জীবাণু প্রতিসেধকের কাজ করে।

জারণ-প্রতিষেধক

মাখন প্রভৃতি বাতাসের সংস্পর্শে থাকলে কয়েক দিন পরে তাতে দুর্গন্ধ হয় এবং তার রংও নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ হলো—বাতাসের অক্সিজেন মাখনকে জারিত করে আলোক, জলীয় বাষ্প, তামা প্রভৃতি এই জারণ-ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ক্যাটিকল, হাইড্রোকুইনোন, টলুইন, অ্যাস্‌করবিক অ্যাসিড, কেফালিন (সয়াবিন তেল থেকে পাওয়া যায়), টেকোফেরল (উদ্ভিদ-জাত তেল থেকে পাওয়া যায়) প্রভৃতি জারণ প্রতিষেধক হিসেবে বহুল ব্যবহৃত। এদের প্রত্যেকটিই কিন্তু ব্যবহার করতে হয় খুব অল্প মাত্রায়। মাংসের পচন রোধ করবার জন্যে মাংস প্যাকিং-এ প্রোপাইল গ্যালেট-এর ব্যবহার আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে—কলা, আপেল, পীচ, আলু প্রভৃতির খোসা ছাড়াবার পর কালো বা বাদামী দাগ পড়ে। এর কারণ হলো, এই সব ফলে—বিশেস করে খুব পাকা অবস্থায় জারক এন্‌জাইম (Oxidising enzyme) থাকে। বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এন্‌জাইমের সাহায্যে যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলে, তার ফলেই ফলের গায়ে কালো বা বাদামী দাগ পড়ে। থায়োকারবোনেট বা থায়োইউরিয়ার খুব পাত্‌লা দ্রবণে ডুবিয়ে নিলে এই জারণ-ক্রিয়া হয় না। সাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করলে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের জারণ-প্রতিষেধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়

খাদ্য-রঞ্জক

আমাদের খাবারের অনেক কিছু রং করা হয়। এর কারণ হলো—ক্রেতার কাছে খাদ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলা। খাদ্যে ব্যবহৃত রঞ্জক পদার্থ-গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(১) প্রাকৃতিক রঞ্জক—লাল, কমলা, সবুজ প্রায় সব রকম রংই প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ক্লোরোফিল (সবুজ কণিকা), অ্যানাটো (উজ্জ্বল কমলা), ক্যারামেল (ধূসর) প্রভৃতি খাদ্য-রঞ্জক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পুডিং, মদ প্রভৃতিতে ক্যারামেল ব্যবহার করা হয়।

(২) আলকাত্‌রাজাত রং—আলকাত্‌রা-জাত রঙের সংখ্যা প্রায় ১৫০০—কতকগুলি ক্ষারধর্মী, আর কিছু অম্লধর্মী। খাদ্যে ক্ষারধর্মী রঞ্জকের ব্যবহার নিষিদ্ধ। অম্লধর্মী অনেক রঞ্জক পদার্থ শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই মাত্র ১১টি অম্লধর্মী রঞ্জক পদার্থ খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। ফল ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, অ্যালকোহলবিহীন পানীয়, বিস্কুট, জেলী, আইসক্রীম প্রভৃতি রঙীন করতে আলকাত্‌রাজাত রঙের ব্যবহার আছে।

(৩) অজৈব রঞ্জক-এদের মধ্যে থাকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ, যেগুলি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশী হলে শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়ে থাকে। তাই খাদ্যে এদের ব্যবহার সীমিত।

খাদ্য ও বিরঞ্জক (Bleaching agents)

টাটকা ময়দার মধ্যে থাকে প্রাকৃতিক রঞ্জক পদার্থ, যার ফলে এটা দেখতে হয় ঈষৎ হলদে। হলদে রংকে নষ্ট করবার জন্যে বিভিন্ন জারক পদার্থ (Oxidising agents)—অ্যামোনিয়াম পারসালফেট, পটাসিয়াম ব্রোমেট, ক্লোরিন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। এরা প্রাকৃতিক রংগুলিকে বিরঞ্জিত করে নষ্ট করে দেয় বটে, কিন্তু নিজেরা রূপান্তরিত হয় অন্য যৌগিকে, যেগুলি শরীরের পক্ষে সব সময় বাঞ্ছনীয় নয়। তাই আজকাল অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়—যেগুলি খাদ্যবস্তুকে বিরঞ্জিত করে, কিন্তু ক্ষতিকর কোন নতুন পদার্থ সৃষ্টি করে না।

পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি

শরীরে বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক পদার্থের অভাব ঘটলে নানারকম রোগ দেখা দিতে পারে। আয়োডিনের অভাবে গলার থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়। একে বলা হয় গয়টার। এই রোগে সাধারণ লবণের সঙ্গে অল্প পরিমাণ KI মিশ্রিত করে ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুদের হাড় সুসমঞ্জসভাবে বৃদ্ধি পায় না। এই রোগের নাম রিকেট। এর কারণ হলো শিশুদের দেহে হাড়ের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম, ফস্‌ফরাস ও ভিটামিন-ডি-এর অভাব। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস দুধের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। তাই এই রোগে দুধের সঙ্গে ভিটামিন-ডি মিশ্রিত করে শিশুদের খেতে দেওয়া হয়। বর্তমানে ময়দা বা রুটির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে থিয়ামিন (Vitamin B_1), রিবোফ্লেভিন (Vitamin B_2), নিয়াসিন প্রভৃতি মিশ্রিত করা হয়। পেলাগ্রা রোগে গায়ের চামড়া কুঁচকে শুষ্ক হয়ে যায়। রোগের প্রতিরোধে এই সমস্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি খুবই কার্যকরী। এছাড়াও সাধারণভাবে পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধির জন্যে ভিটামিন-এ, লাইসাইন, মিথায়োনাইন প্রভৃতি ফলজাত খাদ্য, ডাল, মাখন প্রভৃতিতে মিশ্রিত করা হয়।

মিষ্টি খাবার

খাদ্যকে মিষ্টি করবার জন্যে আমরা চিনি ছাড়া অন্যান্য জিনিষও ব্যবহার করি। এদের মধ্যে আলকাত্‌রা থেকে প্রস্তুত স্যাকারিন প্রধান। স্যাকারিন চিনির চেয়ে প্রায় ৫৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। তাছাড়া অ্যামোনিয়াম বা সোডিয়াম সাইক্লোহেক্সিলসালফামেট, প্যারাফিনিটাইল-ডাইন ইউরিয়া ব্যবহৃত হতো। এগুলি চিনির চেয়ে প্রায় ১০০-২৫০ গুণ বেশী মিষ্টি। কিন্তু আমেরিকার Food and Drug Adulteration-এর গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, স্যাকারিন ছাড়া এই সব "কৃত্রিম চিনি" শরীরের থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ড ও রক্তের পক্ষে ক্ষতিকর। তাই আইন করে এগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

ইমালসিফিকেশন এবং ষ্টেবিলাইজার

তেল বা তেলজাতীয় পদার্থ জলে মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিলে একটা ঘোলাটে মিশ্রণ পাওয়া যায়। এগুলি হলো জলে তেলের ইমালসন। ইমালসনগুলি সাধারণতঃ খুব স্থায়ী নয়—বিভিন্ন উপাদান তাড়াতাড়ি পৃথক স্তরে ভাগ হয়ে যায়। ইমালসনকে স্থায়ী করবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ইমালসিফাইং এজেন্ট। বাজারে যে সব আচার কিনতে পাওয়া যায়, তাতে অনেক সময় সুগন্ধি তেল মিশানো হয়। কিন্তু উপযুক্ত ইমালসিফাইং এজেন্ট না দিলে সুগন্ধি তৈল পুরাপুরি মিশতে পারে না। একই কারণে বিভিন্ন পানীয়ের মধ্যে ইমালসিফাইং এজেন্ট মিশ্রিত করা হয়। ষ্টিয়ারিল-২ ল্যাকটিলিক অ্যাসিড এই রকম একটি পদার্থ।

আইসক্রীম ও জমানো খাদ্যে লেসিথিন, জিলাটিন, ডাইসোডিয়াম ফস্‌ফেট, সোডিয়াম

সাইট্রেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, পেক্‌টিন, স্যাপোনিন ব্যবহার করা হয় জ্যাম, জেলি প্রভৃতি খাদ্য প্রস্তুতিতে।

গুঁড়া খাবার যেমন—গুঁড়া দুধ, সাধারণ লবণ, গুঁড়া চিনি ইত্যাদিতে অল্প পরিমাণে মিশিয়ে দেওয়া হয় ক্যালসিয়াম সিলিকেট বা ম্যাগ্‌নেসিয়াম সিলিকেট, যাতে গুঁড়া জিনিস সহজে দানা না বাঁধে।

অনেক খাদ্য, বিশেষ করে পানীয় ইত্যাদিতে, যেমন—ভিনিগারে মিশে থাকে আয়রন বা অন্যান্য খনিজ পদার্থ। এদের দূর করবার জন্যে ব্যবহৃত হয় ক্ল্যারিফাইং এজেন্ট—জল বাষ্পীভূত হয়ে খাদ্যকে যাতে শুষ্ক করতে না পারে, তার জন্যে গ্লুকোজ, গ্লিসারিন, প্রোপিলিন, গ্লাইকল ব্যবহার করা হয়। আবার খাদ্য প্রোসেসিং-এর সুবিধার জন্যে ক্যালসিয়ামের লবণ, যথা—ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট, সাইট্রেট, ক্যালসিয়াম হেক্সামেটাফস্‌ফেট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

তবে রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে নানারকম খনিজ পদার্থ খাদ্যে মিশ্রিত হয়ে যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী হলে এরা শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়ে থাকে। কাজেই এই সব খনিজ পদার্থ-যুক্ত রাসায়নিকগুলি খুব পরিমিত মাত্রায় খাদ্যে মিশ্রিত করা উচিত। কতকগুলি খনিজ পদার্থের খাদ্যে গ্রহণীয় পরিমাণ দেওয়া গেল—

খনিজ পদার্থ বা ধাতু	প্রতি ১০ লক্ষ একক খাদ্যে পরিমাণ	খাদ্যের প্রকার
আর্সেনিক (As)*	০.৫	— পানীয়
	১.০	— অন্যান্য খাদ্য
কপার (Cu)	২০	— পানীয়
	৩০-১০০	— অন্যান্য খাদ্য
লেড (Pb)	০.৫	— পানীয়
	১.০	— ফলজাত খাদ্য
	২৫	— অন্যান্য খাদ্য
জিঙ্ক (Zn)	৫.০	— পানীয়
	১০০	— অন্যান্য খাদ্য

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় ১০৮টি রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। আমেরিকায় এই সম্পর্কে গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, এদের মধ্যে ৪২৮টি রাসায়নিক শরীরের কোন ক্ষতি করে না। তাই বাকী ২৭৬টি রাসায়নিক পদার্থ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

* আর্সেনিককে ঠিক ধাতু বলা যায় না।

পৃথিবীর বয়স কত ?

রঞ্জিৎরঞ্জন দত্তগুপ্ত

পৃথিবীর কথা বলতে গেলে প্রথম যে প্রশ্নটা মনে আসে, সেটা হচ্ছে—পৃথিবী কি সনাতন, না এরও কোন আদি আছে? হিসেব কষে পণ্ডিতেরা বলেন যে, পৃথিবী তো পৃথিবী, সারাটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরও একটা বয়স আছে। বস্তুতঃপক্ষে হাবলের মতানুসারে এই ব্রহ্মাণ্ডের বয়স অনুমান প্রায় দু-শ' কোটি বছর।

হাবলের হিসাব বুঝতে ডপ্‌লারের একটা সূত্র জেনে রাখা প্রয়োজন। এই সূত্রে জানা যায় যে, কোন আলোর উৎস যদি ক্রমশঃ দূরে সরতে থাকে,

তবে সেই উৎস থেকে নির্গত আলো আমাদের কাছে ক্রমশঃ লাল বলে প্রতীয়মান হতে থাকবে। অপরপক্ষে বলা চলে—কোন আলো ক্রমশঃ লাল বলে মনে হতে থাকলে বুঝতে হবে, সেই আলোর উৎস আমাদের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। হাবল লক্ষ্য করলেন—কোটি কোটি নক্ষত্রে গড়া এক-একটি নীহারিকার আলোও যেন ক্রমে ক্রমে লাল হয়ে আসছে (খালি চোখে অবশ্য এ-রকমটা দেখা যাবে না—এর জন্যে বর্ণালী বিশ্লেষণের প্রয়োজন)। অতএব ডপ্‌লারের সূত্রানুসারে বুঝতে হবে যে, নীহারিকাগুলি পরস্পরের কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। এই থেকে হাবল কল্পনা করেন যে, আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একটা অতিকায় বেলুনবিশেষ, নীহারিকাগুলি তারই উপরে এক একটি বিরাট বিন্দু মাত্র এবং তারা একে অপরের কাছ থেকে দ্রুত অপসৃত হচ্ছে। ঐ রকম একটা ছবি কল্পনা করে হাবল হিসাব করলেন—প্রায় দু-শ' কোটি বছর আগে ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থ প্রায় একই স্থানে একটি কেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। হাবলের এই অনুমান আজকাল অবশ্য কিছু কম বলে বিবেচিত হয়। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের পর অনুমান করা হয়েছে যে, ব্রহ্মাণ্ডের বয়স প্রকৃতপক্ষে প্রায় পাঁচ-শ' কোটি বছরের কাছাকাছি।

ব্রহ্মাণ্ড ছেড়ে এবার প্রথম প্রশ্নে আসা যাক—পৃথিবীর বয়স কত? বস্তুতঃ এখনই এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা চলে যে, পৃথিবীটা যেহেতু ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভূত কোন বস্তু নয়, সেহেতু এর বয়সও পাঁচ-শ' কোটি বছরের মধ্যেই হবে।

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের আর কোন উপায় আছে কি? এই প্রশ্নের মীমাংসাকল্পে বিজ্ঞানীরা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অবশেষে ঊর্ধ্বে ও অধেঃ অঙ্গুলী নির্দেশ করেন। প্রথমে ঊর্ধ্বদেশেই দৃষ্টি স্থাপন করা যাক।

বয়স বিচারের একটা সোজা উপায় হচ্ছে, সন্ততিবর্গের খবর নেওয়া—বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠের বয়স অনুমান করা। একেবারে বেদবাক্য না হলেও বয়স নির্ধারণের এটা একটা উপায় বটে! বিজ্ঞানীরাও তাই পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্রের দিকে নজর দিলেন। চন্দ্রের গড়ন এবং বাড় লক্ষ্য করে তার বয়স নিরূপণে লেগে গেলেন তাঁরা। অবশেষে দেখা গেল—লোকে যা-ই বলুক না কেন, চাঁদ মোটেই পুরাপুরি গোলাকার নয়—বস্তুতঃ পৃথিবীর দিকটায় চাঁদের সামান্য একটু স্ফীতি লক্ষ্য করা যায়।

জোয়ার-ভাটা আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি এবং সকলেই জানি যে, এর প্রধান একটা কারণ চন্দ্রের আকর্ষণ। হিসাব কষে জেফ্‌রী আর একটু জানালেন যে, যদিও জোয়ার-ভাটা একটা বিশুদ্ধ আকর্ষণের ফল, তথাপি এর প্রভাবে সমুদ্রবক্ষে যে জলস্ফীতি হয়, তার জন্যে পৃথিবী এবং তার দুদিকের দুই জলরাশি—এই তিনে মিলে এক অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে। জেফ্‌রীর অনুমান অনুসারে এই অসামঞ্জস্যের ফলে চন্দ্র এবং পৃথিবীর মধ্যে এক বিকর্ষণ শক্তির উদ্ভব হয় এবং তার প্রভাবে পৃথিবী থেকে চন্দ্র প্রতি শতাব্দীতে কয়েক ফুট হিসাবে ক্রমেই দূরে সরে যায়। এই হিসাবে পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে বর্তমান দূরত্বে সরে আসতে সময় লেগেছে প্রায় চার-শ' কোটি বছর; অর্থাৎ চন্দ্রের বয়স প্রায় চার-শ' কোটি বছর।

চন্দ্রের বয়স যদি চার-শ' কোটি বছর হয়, তবে সে যা থেকে উৎপন্ন হয়েছে—সেই পৃথিবীর বয়স কত? পূর্বে চন্দ্রের স্ফীতির উল্লেখ করা হয়েছে। জেফ্‌রীর হিসাব মতে এটা সম্ভব হয়েছে—চন্দ্র তরল থেকে কঠিন পদার্থে পরিণত হবার সময়। সে সময় চন্দ্রের দূরত্ব ছিল কম—বর্তমান দূরত্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এই নৈকট্যের জন্যে চন্দ্রের উপর পৃথিবীর দিকটায় টানও ছিল বেশী। তাই জমাট বাঁধবার সময় পৃথিবীর দিকটায়

চন্দ্রের এই স্ফীতির আবির্ভাব। সেই সুদূর অতীতে পৃথিবীতে সমুদ্রের গভীরতা ছিল অনেক কম এবং হিসাবে দেখা যায় যে, তারই ফলে চন্দ্রের অপসরণ বেগও ছিল অতি দ্রুত। প্রকৃত-পক্ষে প্রথম এক-তৃতীয়াংশ পথ অতিক্রম করতে চন্দ্রের খুব বেশী একটা সময় লাগে নি। এদিকে আবার চন্দ্রের উৎপত্তি পৃথিবী থেকে, কাজেই এই পর্যায়ে চন্দ্র তরল থাকায় পৃথিবীও তরল ছিল বলে ধরা যায়; অর্থাৎ পৃথিবীর তখন প্রথমাবস্থা। অতএব এই হিসাব অনুসারে পৃথিবীর প্রথমাবস্থা ছিল প্রায় চার-শ' কোটি বছর আগে। সুতরাং এখানে হাবলের সূত্রে প্রাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডের সংশোধিত বয়স উল্লেখ করে বলা যায় যে, পৃথিবীর বয়স আনুমানিক চার-শ' থেকে পাঁচ-শ' কোটি বছরের মধ্যে।

ঊর্ধ্ব থেকে এবার অধঃ নেমে আসা যাক —একেবারে সমুদ্রগর্ভে। অসংখ্য নদী অজস্র ধারায় কত রকমের মাটিই না বয়ে নিয়ে গেছে সমুদ্র-বক্ষে। যুগ যুগ ধরে সে সব পাথর আর মাটি সংমিশ্রিত হয়ে অবশেষে সমুদ্রেরই গর্ভে জমা হয়ে গেছে। সমুদ্রগর্ভের এই মাটিই যে পৃথিবীবক্ষের নমুনার একটা প্রকৃষ্ট গড়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই মাটিরই সামান্য অংশের বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত আছে পৃথিবীর বয়সের প্রকৃত হদিস। নীচে সেই বিশ্লেষণ-পদ্ধতি মোটামুটি উল্লেখ করা গেল।

তেজস্ক্রিয়তার কথা আমরা জানি। ইউ-রেনিয়াম বিভাজনের ফলে যে সীসার উৎপত্তি হয়, তাও আমাদের জানা আছে। সাধারণতঃ এভাবে উৎপন্ন সীসা এবং স্বাভাবিক সীসা মাটির মধ্যে এক সঙ্গে অবস্থান করে। তাই বোঝা দুষ্কর, কতটা সীসা ইউরেনিয়াম বিভাজনজনিত, আর কতটা সীসা স্বাভাবিক পর্যায়ের। এই পরিমাণ-গত ভেদটা জানবার জন্যে পৃথিবী-বক্ষে কি পরিমাণ সীসা বিদ্যমান, সেটা প্রথমে নির্ণয় করা হয়। বলা প্রয়োজন যে, উল্কাপিণ্ডে অবস্থিত সমস্ত সীসাই স্বাভাবিক পর্যায়ের। অতএব সমুদ্রগর্ভ থেকে আহরিত পৃথিবীর মাটির পূর্বোল্লিখিত এক টুক্‌রা নমুনা থেকে উল্কাপিণ্ডে প্রাপ্ত স্বাভাবিক পর্যায়ের সীসার পরিমাণ বাদ দিলে শুধু তেজস্ক্রিয়-তার ফলে উদ্ভূত সীসাই অবশিষ্ট থাকে। ইউরেনিয়াম বিভাজনের ফলে এই অবশিষ্ট পরিমাণ সীসার উদ্ভব হতে কি পরিমাণ সময় লেগেছিল, তার একটা হিসাব করা চলে। এদিকে আবার পৃথিবীর সুরু থেকেই তেজস্ক্রিয়তার এই ভাঙ্গন-প্রক্রিয়া চালু ছিল। অতএব এভাবে নির্ণীত কালকে পৃথিবীর বয়স গণ্য করা যেতে পারে। এই হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বয়স দাঁড়ায় প্রায় সাড়ে চার-শ' কোটি বছর।

আজকাল বিভিন্ন পদ্ধতিতে পৃথিবীর বয়সের হিসাব করা হচ্ছে। তবে সব রকম পদ্ধতির গণনার ফল মেনে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, আদি থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের এই পৃথিবীর প্রায় চার থেকে পাঁচ-শ' কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

গ্রহের উপাদান

শ্রীসুভাষকুমার সিকদার

সূর্য ও পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের রাসায়নিক উপাদান এক হওয়ায় অনেকে মনে করেছিলেন যে, সূর্য থেকে উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলির সৃষ্টি করেছে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, অনেক নক্ষত্রের সঙ্গে সূর্যের রাসায়নিক উপাদানের হুবহু সাদৃশ্য বিদ্যমান। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মতবাদের রচয়িতা অটো স্মিথ বলেছেন যে, সূর্যের চতুর্দিকে বিচরণশীল একটা ধূলিকণার মেঘ থেকে বহুকালের বিবর্তনের ফলে ধূলিকণার সংযুক্তির দরুণ পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই ধূলিমেঘ সূর্যের মত উত্তপ্ত ছিল না। পূর্বোক্ত আবিষ্কারের ফলে এই মতবাদের সপক্ষে এই যুক্তি পাওয়া গেল যে, এই ধূলিকণার মেঘ যে ভাবেই সৃষ্ট হোক না কেন, তার রাসায়নিক উপাদান সূর্যের মতই হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসাবে বিশ্বের রাসায়নিক উপাদানের শতকরা ৯০ ভাগই হাইড্রোজেন ও ৯ ভাগ হিলিয়াম (পরমাণুর হিসাবে)। তার পরের উপাদানগুলি হলো অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন—একযোগে মাত্র ·৩%। অন্যান্য উপাদানগুলির মধ্যে আছে সিলিকন ও ধাতুসমূহ। উপযুক্ত অবস্থায় কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে কার্বন ডাইঅক্সাইড, অ্যামোনিয়া, জল ও মিথেন উৎপন্ন করে। অনুরূপভাবে ভারী পদার্থগুলির সঙ্গে অক্সিজেনের সংযোগে সিলিকন ডাইঅক্সাইড, ফেরিক অক্সাইড, অ্যালুমিনা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের এই সাধারণ উপাদানের তুলনায় পৃথিবীতে নাইট্রোজেনের ১০,০০০ গুণ অক্সিজেন বর্তমান। মৃত্তিকার শিলাতে অক্সাইড ও অন্যান্য যৌগিক পদার্থে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন আটক আছে, কিন্তু নাইট্রোজেনের যৌগিক পদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতা কম। অন্যান্য উপাদানের মধ্যে হিলিয়াম ও আর্গন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষয় থেকে উৎপন্ন হচ্ছে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলির মধ্যে ক্রিপ্টন, জেনন ও নিয়ন পৃথিবীতে নিতান্ত অল্প; অর্থাৎ এক কথায়, অন্যান্য গ্রহগুলির তুলনায় পৃথিবীতে বেশী অক্সিজেন ও কম হাইড্রোজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি আছে।

স্মিথের মতবাদ অনুযায়ী সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণশীল ধূলিমেঘ এক ঘন চাকৃতির সৃষ্টি করেছিল, যার মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করতো না। ফলে সূর্যের কাছের অংশ উত্তপ্ত হতো, আর দূরের প্রান্তের উত্তাপ নেমে গিয়েছিল হিমরেখার ২১০° নীচে। এই থেকে বোঝা যায় যে, সূর্যের নিকটবর্তী প্রান্তে ধাতু ও কঠিন পদার্থ জড়ো হয়েছিল, আর অপর প্রান্তে গ্যাসীয় পদার্থগুলি জমে কঠিন হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে গ্রহ সৃষ্টির সময় সূর্যের নিকটের গ্রহগুলি কঠিন পদার্থে ও দূরের গ্রহগুলি গ্যাসীয় পদার্থে তৈরী হয়েছে। পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি দূরের গ্রহগুলির রাসায়নিক উপাদানের বৃহত্তম অংশ গ্যাসীয় অবস্থায় রয়েছে। এভাবে গ্রহগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পৃথিবী, বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি ও দ্বিতীয় ভাগে বৃহত্তর গ্রহগুলি। প্লুটো গ্যাসীয় চাকৃতির শেষ প্রান্ত থেকে সৃষ্ট বলে এর আয়তন কম; তবু রাসায়নিক উপাদানের দিক দিয়ে একে বৃহত্তর গ্রহগুলির পর্যায়েই ফেলতে হবে।

স্মিথের আগে পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল, তদনুযায়ী সূর্য থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে-আসা উত্তপ্ত গ্যাসীয় পিণ্ড থেকে বিভিন্ন গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম অবস্থায় বিশ্বের যাবতীয় উপাদানই সব গ্রহের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান ছিল। যে সব গ্রহ আকারে বড় এবং যাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বেশী, তারা হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতি হাল্‌কা গ্যাসগুলিকে ধরে রাখতে পারতো। আর ছোট আকারের গ্রহগুলির মাধ্যাকর্ষণ কম, কাজেই হাল্‌কা গ্যাসগুলিকে ধরে রাখবার ক্ষমতাও কম। কাজেই ছোট গ্রহগুলিতে হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের পরিমাণও কম। অতএব দেখা যাচ্ছে, গ্রহগুলির উপাদান গ্রহের আয়তন ও মাধ্যাকর্ষণের উপর নির্ভর করে।

এই ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা সন্দিহান হলেন—যখন দেখা গেল যে, শনির উপগ্রহ টিটানের মিথেন ও অ্যামোনিয়া সমন্বিত একটি ঘন বায়ুমণ্ডল আছে। টিটান ভরে পৃথিবীর ৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র, তাই এর মাধ্যাকর্ষণও খুব কম। এই কারণে হাল্‌কা গ্যাসগুলির এ-থেকে বেরিয়ে যাবারই কথা। তাছাড়া দূরত্ব সূর্য থেকে বেশী হওয়ায় এর উত্তাপ-১৫০° সেন্টিগ্রেড। পূর্বাবস্থায় এর উত্তাপ যদি অন্ততঃ 0° সেন্টিগ্রেড হতো, তাহলেই টিটান আর সব গ্যাস ধরে রাখতে পারতো না। এখন দুটি কথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতির সঙ্গে ভরের বিশেষ সম্বন্ধ নেই, আর গ্রহগুলির উৎপত্তিকালে সকলেই উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল না। তা যদি হতো, তাহলে বর্তমানে টিটানের কোন বায়ুমণ্ডল থাকতো না।

দেখা যাবে, এই মতবাদ পৃথিবীর বেলায়ও কার্যকরী হচ্ছে না। পৃথিবীতে সৌরজগতের তুলনায় নাইট্রোজেনের অনুপাত কম, আর হিলিয়াম, ক্রিপ্টন, জেনন তো একেবারেই কম। যদি বলা হয়—হিলিয়াম হাল্‌কা গ্যাস, কাজেই মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে গেছে—তাহলে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনেরও সমপরিমাণে হারিয়ে যাবার কথা; কারণ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রায় সমান (যথাক্রমে ১৫ ও ১৬)। আবার জেনন ও ক্রিপ্টন অক্সিজেন থেকে ভারী, কিন্তু এই গ্যাসগুলির স্বল্পতার কারণ কি? এই মতবাদ এখানে নিরুত্তর। অতএব পৃথিবীর উৎপত্তির সময়ে সব উপাদান পৃথিবীতে অবস্থিত ছিল—এই কথা স্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ কঠিন পদার্থেই পৃথিবীর সৃষ্টি, যেমনটি বর্তমান মতবাদে বলছে।

প্রথম বিভাগের গ্রহগুলির মধ্যে বুধ ছাড়া মঙ্গল, শুক্র ও পৃথিবীর ঘনত্বের মান বিশেষ লক্ষণীয়। এদের ঘনত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে; যেমন—মঙ্গলের ঘনত্ব প্রতিঘন সেন্টিমিটারে ৩'৯ গ্র্যাম, শুক্রগ্রহের ৫'১ ও পৃথিবীর ৫'৫২। এদের রাসায়নিক উপাদান এক এবং ভরের পার্থক্যই ঘনত্বের অসমতার কারণ। ভর যত বেশী, মাধ্যাকর্ষণ ও বাইরের স্তরগুলির চাপ তত বেশী। বাইরের চাপ বেশী হলে পদার্থ সঙ্কুচিত হয়ে ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। বুধ সূর্যের নিকটতম বলে উচ্চতাপের প্রভাবে একমাত্র ভারী পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়েছে। তাই এর ভর পৃথিবীর ভরের আট-দশমাংশ হলেও ঘনত্ব প্রায় পৃথিবীর সমান। পৃথিবী থেকে যতই বৃহদাকার গ্রহগুলির দিকে যাওয়া যায়, ঘনত্ব ততই কমে। কারণ ঐ গ্রহগুলি গ্যাসীয় পদার্থে গড়া। একটি বিষয় লক্ষণীয়—আয়ো, ইউরোপা, গ্যানিমিডি ও ক্যালিষ্টো নামে বৃহস্পতির যে চারটি উপগ্রহ গ্যালিলিও আবিষ্কার করেছিলেন, তাদের প্রথম দুটির ঘনত্ব শেষের দুটির চেয়ে বেশী। এই তথ্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলা হয় যে, উপগ্রহ সৃষ্টির সময় বৃহস্পতির উপরিভাগ উত্তপ্ত ছিল এবং তাকে ঘিরে সূর্যের অনুরূপ একটি ধূলিমেঘ ছিল। যে ভাবে সূর্যের ধূলিমেঘ থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে, সেভাবেই বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

বৃহস্পতি থেকে দূরত্ব যত বেশী, উপগ্রহের উপাদানে হাল্‌কা গ্যাসের ততই আধিক্য, তাই ঘনত্বও কম। এথেকে বোঝা যায়, উপগ্রহ সৃষ্টির সময় বৃহস্পতি ছিল উত্তপ্ত, বর্তমানে যা আর উত্তপ্ত নয়। বৃহস্পতির প্রবল মাধ্যাকর্ষণের ফলে উল্কাপিণ্ডের মত শিলাখণ্ডগুলি বৃহস্পতির বুকে আছড়ে পড়তো, আর ঘর্ষণের ফলে গতিশক্তি উত্তাপে পরিণত হতো। এভাবে বৃহস্পতি সম্পূর্ণরূপে উত্তপ্ত হয়েছিল।

বৃহদাকার গ্রহগুলির মধ্যে বৃহস্পতি ও শনি ভরে ইউরেনাস ও নেপচুনের চেয়ে বড়। কিন্তু এদের ঘনত্ব ইউরেনাস ও নেপচুনের ঘনত্বের চেয়ে কম। বৃহস্পতি ও শনি হাল্‌কা গ্যাসে পরিপূর্ণ বলে এরকম হয়েছে। বৃহস্পতি ভরে শনির চেয়ে বড়, তাই এর ঘনত্বও বেশী। নেপচুনের ভর ইউরেনাসের প্রায় সমান, কিন্তু ঘনত্ব বেশী; কারণ নেপচুনে ভারী পদার্থের পরিমাণ বেশী। তত্ত্বীয় জ্ঞান প্রয়োগে দেখা যায় যে, বৃহস্পতির চাপে ও তাপে এর সমান ভর সমন্বিত সব গ্যাসের আয়তন (একমাত্র হাইড্রোজেন ছাড়া) বৃহস্পতির বর্তমান আয়তনের কম। এথেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বৃহস্পতির অধিকাংশই হাইড্রোজেনে গড়া। হিসাবে এই পরিমাণ শতকরা ৮০ ভাগ বা তারও বেশী। অনুরূপভাবে শনির উপাদানের শতকরা ৭৫ ভাগই হাইড্রোজেন। বৃহস্পতির পর থেকে প্লুটো পর্যন্ত ক্রমশঃ হাইড্রোজেন কমেছে। যদিও অত্যন্ত দূরে থাকবার ফলে প্লুটোর উপাদান ও অন্যান্য বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধি নিতান্ত সীমিত।

কেমিলুমিনেসেন্স

শ্রীভাস্কর ঘোষ

প্রতি মুহূর্তে বিশ্বের রূপ বদ্‌লাচ্ছে। ঠিক আগের মুহূর্তে যে অবস্থা, যে পারিপার্শ্বিক এবং তৎসংলগ্ন যে ঘটনাগুলি পর পর ঘটেছিল, তাদের প্রকাশ নিমেষের মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বিবর্তনকে সাক্ষী রেখেই একদা শক্তির রূপান্তর গ্রহণের কথা সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে শুধু যে স্বীকৃতি পেয়েছিল তাই নয়, প্রচুর সমাদরও লাভ করেছিল। কোন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনাকে বিশেষ দৃষ্টিতে না দেখে শক্তির রূপান্তরের দৃষ্টিতে দেখাই বাঞ্ছনীয়।

কেমিলুমিনেসেন্স হচ্ছে রাসায়নিক শক্তির পূর্ণতঃ বা অংশতঃ আলোকে রূপান্তরের ফলে উৎপন্ন দৃশ্যমান জ্যোতি। এই জ্যোতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ক্ষীণ। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। লুমিনেসেন্স বলতে এমন এক ধরণের আলোক বিকিরণকে বুঝায়, যার সঙ্গে তাপের সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। মোটের উপর লুমিনেসেন্সকে উত্তাপবিহীন আলোক বলেই অভিহিত করা যায়। ৫০০° সে. এর কম তাপমাত্রায় কোন বস্তু থেকে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বিকিরণ বা দৃশ্যমান আলোক নির্গত হলে তা আমাদের অনুভূতির সীমার মধ্যে আসে না। কিন্তু তাপ প্রয়োগ না করে যদি কোন উপায়ে ঘরের সাধারণ তাপাঙ্কে আলোক উৎপন্ন করা যায় এবং সেটা আমাদের গ্রাহ্যের সীমানায় আসে, তবেই তাকে আমরা লুমিনেসেন্স বলে থাকি। লুমিনেসেন্স তিন রকমের; যথা—ফ্লোরেসেন্স (Fluorescence), ফস্‌ফরেসেন্স, (Phospho-

rescence)এবং কেমিলুমিনেসেন্স (Chemiluminescence)। আবার এর মধ্যেও প্রথম ছুটি থেকে কেমিলুমিনেসেন্সের পার্থক্য এই যে, এখানে আলোককে দৃশ্যমান করতে কোন পৃথক মাধ্যম লাগে। ফ্লোরেসেন্স বা ফসফরেসেন্সের ক্ষেত্রে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি সেই বিশেষ বস্তুটির উপর পড়লে তবেই দৃশ্যমান আলোক বিকিরণ সম্ভব হবে। কিন্তু কেমিলুমিনেসেন্সে রাসায়নিক বিক্রিয়াই এই বিকিরণ উৎপন্ন করে থাকে। অবশ্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলেই এই আলোকের উৎপত্তি হয়, অথবা কোন কারণে আলোকের উদ্ভব হয় বলেই বিক্রিয়াটি হতে সহায়তা করে, তা বলা কঠিন।

এক হিসেবে কেমিলুমিনেসেন্ট বিক্রিয়াগুলিকে ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়ার বিপরীত বলে অভিহিত করা চলতে পারে। কারণ ফটোকেমিক্যাল বিক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে আলোকের শোষণের উপর নির্ভর করে। তার ফলে একের কারণ অপরের ঘটনায় পর্যবসিত হয়।

যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াতেই সব অণুগুলি অংশগ্রহণ করতে পারে না। যেগুলি অংশগ্রহণ করে, তাদের বলা হয় ক্রিয়াশীল। প্রথমে যখন উপাদানগুলিকে একত্রিত করে বিক্রিয়া ঘটবার উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, তখন কিছু পরিমাণ শক্তি ঐ ক্রিয়াশীল অণু গঠন করবার জন্যে প্রয়োজন হয়। এজন্যে দেখা যায় যে, তাপশক্তির প্রয়োগে অধিকাংশ বিক্রিয়াই সহজে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এখন এই ক্রিয়াশীল অণুগুলি পরস্পরের মধ্যে অন্তঃক্রিয়া করে যখন শেষ স্তরে এসে উপস্থিত হয়, তখন আর তাদের সেই অতিরিক্ত শক্তিটুকু ধরে রাখবার সামর্থ্য থাকে না। ফলে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রিয়া শেষ হওয়া মাত্র এই পরিত্যক্ত শক্তি বিভিন্ন রূপান্তরিত আকারে মানুষের অনুভূতিগ্রাহ্য হয়। অবশ্য অনেক স্থলে বিক্রিয়ার মধ্যবর্তী স্তরেই এই পরিত্যক্ত শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তিকে বলে বিক্রিয়া তাপ। যদি এই শক্তি-বিকিরণের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক হয়, তবেই আমরা এই আলোক-বিকিরণকারী বিক্রিয়াটিকে কেমিলুমিনেসেন্ট বলি।

রূপান্তরিত আলোক-শক্তি প্রায়ই তাপ সমন্বিত হয়ে থাকে। ইলেকট্রিক বাল্বে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রথমে তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে ফিলামেন্টটিকে উত্তপ্ত করে এবং ফিলামেন্টটি অত্যধিক উত্তপ্ত হলেই আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু কেমিলুমিনেসেন্ট বিক্রিয়ায় যে আলোক উৎপন্ন হয়, তার অনুভূতিগ্রাহ্য কোন উষ্ণতাই নেই।

সাদা ফস্ফরাসকে জারিত করলে প্রথমে ট্রাইঅক্সাইড এবং পরে আরও জারিত হয়ে পেন্টোক্সাইড উৎপন্ন হয়। বায়ুর অক্সিজেন যদি অল্প চাপে -১০° সে. থেকে ৪০° সে. তাপাঙ্কের মধ্যে ফস্ফরাসকে জারিত করে, তবে এক ধরণের সবুজাভ-সাদা আলোক নির্গত হয়।

. বৈজ্ঞানিক পোলানী এবং তাঁর সহকর্মীরা বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তার ফলাফল থেকে বলেছেন যে, বিক্রিয়াগুলি চেন বা শিকলের মত একের পর এক বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে এবং প্রত্যেক স্তরেই আলোকরশ্মি বিকিরিত হয়ে থাকে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতির বাষ্পের সঙ্গে হ্যালোজেন গোষ্ঠীর* যে কোন মৌলের বিক্রিয়ার ফলেও ওই একই ধরণের আলোকের উদ্ভব হয়। সোডিয়াম বাষ্প আর ক্লোরিন গ্যাস যদি $১০^{-২}$ মি. মি থেকে $১০^{-৩}$ মি. মি. চাপে বিপরীতমুখে মিশ্রিত করা হয়, তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড তৈরী হবে, আর সঙ্গে

* হ্যালোজেন—ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন ও আয়োডিনকে হ্যালোজেন গোষ্ঠীর অন্তর্গত বলা হয়। ল্যাটিন ভাষায় হ্যালো—সমুদ্র-লবণ; আর জেন্স্—উৎপন্ন করে।

সঙ্গে কেমিলুমিনেসেন্স-এর সৃষ্টি হবে সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংযুক্তি বিক্রিয়ায় প্রতি ১০০০টি অণুর গঠনের ফলে মাত্র ১ কোয়ান্টাম শক্তি উৎপন্ন হয়। আবার সোডিয়াম আয়োডাইডের সংযোজনের ক্ষেত্রে ২০০০টি অণুর গঠনের ফলে ১ কোয়ান্টাম শক্তি নির্গত হয়। এথেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, কেমিলুমিনেসেন্স সৃষ্টির জন্যে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন, তা বিক্রিয়ার তাপ-শক্তির চেয়ে অনেক কম। সাধারণতঃ এই উদ্বৃত্ত শক্তিটুকু অণুর গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়; অর্থাৎ কেমিলুমিনেসেন্স বিক্রিয়ায়—বিক্রিয়ার তাপশক্তি= উৎপন্ন আলোকশক্তি+গঠিত অণুর গতিশক্তি।

বৈজ্ঞানিক ট্রাউস যে বিক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে দর্শনীয় হলো—Orthoaminophthalic cyclic hydrazine-এর ক্ষারীয় দ্রবণের জারণক্রিয়া। এই রাসায়নিক পদার্থটি হলুদ রঙের গুঁড়ার মত এই হাইড্রাজিনের সঙ্গে সামান্য H_2O_2 এবং লঘু কষ্টিক সোডা মিশিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের ক্ষারীয় দ্রবণের উপর ফেললে প্রত্যেকটি ফোঁটার পতনের সঙ্গে সঙ্গে সবুজাভ আলোর উৎপত্তি হয়। তবে এই আলো ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ-চমকের মত। যদি পটাসিয়াম ফেরিসায়ানাইডের পরিবর্তে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ব্যবহৃত হয়, তবে উৎপন্ন আলোর রং হয় নীলাভ। উভয় ক্ষেত্রেই রাসায়নিক পরিবর্তন জটিল হলেও শেষ পর্যন্ত Orthoaminophthalic Acid এই জারণের ফলে উৎপন্ন হয়।

ষ্ট্রন্‌সিয়াম সালফেটকে অধঃক্ষেপিত করবার সময় যে আলো উৎপন্ন হয়, তার জ্যোতি অনেক কম। অন্ধকার ঘরে ষ্ট্রনসিয়াম ক্লোরাইড এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিলে ষ্ট্রনসিয়াম সালফেট অধঃক্ষেপিত হয়।

এছাড়া পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেটের সঙ্গে সিলিকোন হাইড্রোক্সাইডের জারণ ঘটলেও অনুরূপ আলোক উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াটি ১৯২৫ সালে বৈজ্ঞানিক কসি কর্তৃক সম্পন্ন হয় এবং তিনি আলোকের উজ্জ্বলতার তুলনা দিতে গিয়ে বলেন যে, ৩২ ক্যাঃ. পাঃ দীপের সাহায্যে দেড় মিটার দূরের সাদা সমতল ক্ষেত্র যতটা আলোকিত হয়, এই আলোকের পরিমাণ ততটুকুই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতটা বস্তুতে বিক্রিয়া হয়, তার তুলনায় বিকিরণের পরিমাণ খুবই কম।

জোনাকী পোকার আলো বিকিরণও এই কেমিলুমিনেসেন্সের ব্যাপার। জোনাকীর দেহে যে প্রোটিন আছে, তা লুসিফেরিন (Luciferin)* নামক বিশেষ একধরণের পদার্থ সমন্বিত। বায়ুতে যখনই এই লুসিফেরিনের জারণ ঘটে তখনই একটি ক্ষীণ রশ্মি দৃশ্যমান হয় এবং একেই আমরা জোনাকীর আলো বলে থাকি। জোনাকির আলো একটানা নির্গত হয় না। সম্ভবতঃ শ্বাস গ্রহণের সময় গৃহীত অক্সিজেন লুসিফেরিনকে জারিত করে উদ্দীপ্ত করে তোলে। কেমিলুমিনেসেন্সের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ জোনাকীর আলো। এই আলো ৫৭০০ অ্যাংষ্ট্রম তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের আলোই মানুষের দৃষ্টিতে সর্বাধিক সংবেদী।

যে সব পোড়ো জমিতে কাঠ বা উদ্ভিদজাতীয় বস্তুর পচন হয়, সেখানেও বোধ হয় এই একই কারণে মাঝে মাঝে উত্তাপবিহীন আলো দৃষ্টিগোচর হয়। এছাড়া অনেক রকম সামুদ্রিক প্রাণী, আণুবীক্ষণিক কীটাণু এবং মাছের মধ্যেও ফস্‌ফরেসেন্স নামে পরিচিত স্নিগ্ধ আলো বিকিরণের দৃশ্য দেখা যায়।

তেজস্ক্রিয়তার মত কেমিলুমিনেসেন্সও এক ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা। কৃত্রিম উপায়ে এরূপ ঘটনা সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে বলে মনে হয় না। যে কয়েকটি মুষ্টিমেয় বিক্রিয়ায় এই ঘটনার স্বাক্ষর আছে, তাদের নিয়েই গবেষণা চলেছে

* লুসিফেরিন থেকে তৈরী হয় বলেই এক-ধরণের দেশলাইকে লুসিফার ম্যাচ বলে।

আমরা ভয় পাই কেন?

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোবিজ্ঞানে ভয় সম্বন্ধে আলোচনার অভাব নেই। শারীরবাদী মনস্তত্ত্ববিদেরা ভয় সম্পর্কিত অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। ভয় মানুষের সহজাত সংস্কার। শৈশব থেকেই মনের কোণে ভয় বাসা বেঁধে থাকে এবং বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যদিও কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিচার করায় তার প্রাধান্য মন থেকে অনেক কমে যায়, তবুও তা নির্মূল হয় না—একথা ঠিক।

মনোবিজ্ঞানীরা যেমন মনে করেন ভয় এক ধরণের সহজাত বৃত্তি—তার জন্যে যেমন কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না—তেমনি আত্মরক্ষাও এক রকমের সহজাত প্রবৃত্তি। ভয়েরই পরিপূরক—আত্মরক্ষা (Self-Preservation)। ভয় না পেলে আত্মরক্ষার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেমন সাপ দেখে যদি কেউ আচমকা ভয় পান, তবেই তিনি আত্মরক্ষার জন্যে ছুটে পালিয়ে যাবেন, সাপ না দেখলে সে ক্ষেত্রে পালাবার কোন প্রয়োজনই নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের অনুসরণে বলা যায়—ভয় এবং আত্মরক্ষার মধ্যে কার্য-কারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান।

প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রাণীমাত্রেই ভয় পায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্ষমতায় যখন আঘাত লাগে, তখনই সে ভয় পায়। সে তখন তার হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে এবং তার জন্যে আত্মরক্ষা করতে চায়। বেঁচে থাকবার জন্যে, প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, সে তার সর্বশক্তি দিয়ে তা প্রয়োগ করতে চায়।

অনেকের মতে—ভয় হচ্ছে জীবনরক্ষার অনুকূল। মানুষের ভয় কোথাও অহেতুক, কোথাও সহেতুক। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, ভয় মানুষের মনের একটি স্থায়ী ভাব। সাহিত্যিকেরা এই স্থায়ী ভাবকে বিভাবাদির সাহায্যে ভয়ানক রসে পরিণত করেন। ভয়ানক রসও মনোবিজ্ঞানে এক জাতীয় আবেগ (Emotion) বলে স্বীকৃত।

ভয় অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ, না সহজাত—এ নিয়ে মতানৈক্যের অভাব নেই। অনেকে ভয়কে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলে স্বীকার করতে চান না। তাঁরা প্রমাণ দেখিয়ে বলেন—অন্ধকার, জোর শব্দ, মা'র অদর্শন, জন্তু-জানোয়ার, অচেনা লোক ইত্যাদি অনেক বিষয়ই তো ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মনে ভয়ের উদ্রেক করে! ভয় যদি অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ হয়, তাহলে মাত্র চার-পাঁচ বছরের সামান্য সময়ের মধ্যে এই জাতীয় অভিজ্ঞতা জন্মায় কেমন করে? প্রশ্নটি শুনে মনে হবে, প্রশ্নকর্তার শিশু-মনস্তত্ত্বের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় নেই। কেন না, এই কথা সকলেই জানেন, বিশেষতঃ ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকেই ভয় সম্বন্ধে এক ধরণের আবেগ মনের কোণে বাসা বাঁধতে থাকে, যথার্থ শিক্ষা এবং অভিভাবকের অভাবে। অবশ্য শিক্ষার অপ্রতুলতার জন্যে দায়ী অভিভাবকেরাই—এই কথাটি গভীরভাবে ভেবে দেখা উচিত।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মাত্র কয়েকটি বিষয়ের ভয় সহজাত—তাছাড়া সবই অভিজ্ঞতাপ্রসূত। আচমকা কিছু দেখে ভয়, বাজ পড়বার শব্দে ভয় ইত্যাদি অভিজ্ঞতালব্ধ। অভিভাবকেরা ভয় দেখিয়ে খাওয়ান বা ঘুম পাড়ান। এতে তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হয় ঠিকই, কিন্তু ভয়ের কথা বারবার শোনাবার ফলে তা সংস্কারে পরিণত হয় এবং 'সর্পভ্রমে রজ্জু' কথাটির বাস্তবে পরিণতি ঘটে।

মনোবিজ্ঞানে যাকে অন্তর্দর্শন বলা হয়েছে, ভয়ের ক্ষেত্রে তার কথা এসে পড়ে। যে মুহূর্তে আমি ভয় পাই, ঠিক সেই মুহূর্তেই ভাবটিকে লক্ষ্য করতে পারি না। যখন খুব ভয় পাই, তখন ভয়কে বিশ্লেষণ করতে পারি না—কারণ, মন তখন ভয়ে পরিপূর্ণ। তখন দ্রষ্টা এবং দ্রষ্টব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না ; কিন্তু কিছু সময় পরে পার্থক্য বুঝতে পারা যায়। তখন হয়তো আমি চিন্তা করি, সামান্য একটা ব্যাপারে এতখানি ভয় না পেলেও চলতো। এর আগে পর্যন্ত কিন্তু আমার বিচার-শক্তি ছিল না, এখন সে শক্তি ফিরে এসেছে। এখন তাই নিরপেক্ষভাবে মনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছি। তাহলে পূর্ববর্তী ভয় (সাপ দেখে চঞ্চল এবং অস্থির আমি) এবং পরবর্তী মনোভাব (বিচারকের প্রশান্ত ভাব)—সম্পূর্ণ পৃথক। একেই মনোবিজ্ঞানে অন্তর্দর্শন বা Introspection বলে !

অনেকে ভয়ের পরিমাপের জন্যে পরীক্ষামূলক পর্যবেক্ষণ বা Experiment-এর পক্ষপাতী। কিন্তু এই ধরণের পরীক্ষার অসুবিধা আছে—বিশেষতঃ মনের উপর পরীক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। যেমন—আমি কারোর ভয়ের স্বরূপ পরীক্ষা করে দেখতে চাই, কিন্তু যে অবস্থায় ভয় হয়, ঠিক সেই অবস্থায় পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। ইন্দ্র বেড়াতে বেড়াতে জঙ্গলের কাছে অদ্ভুত একটা জন্তু দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো, ঠিক সেই সময়ে এবং সেই অবস্থায় তার মানসিক অবস্থা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু ইন্দ্র যেই আমাকে দেখতে পেল, তখনই তার আসল ভয় চলে গেছে। তখন পরীক্ষা করে যথাযথ ফল পাওয়া যাবে না।

মনোবিজ্ঞানে আর এক ধরণের ভয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, যাকে লজ্জার নামান্তর বলা চলে। এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ভয়ের বশবর্তী হয়ে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন না। এঁদের অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ বলা হয়। অনেকে আছেন, যাঁরা কোন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন। বলা বাহুল্য, এ সবই লজ্জাজনিত ভয়। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে অনেকে প্রয়োজন বা ইচ্ছা অনুযায়ী খেতে পারেন না। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের আত্মবোধ জেগে ওঠে।

এসব ছাড়া ট্রামের তার ছিঁড়ে পড়বার ভয়, বজ্রপাতের ভয়, বাড়ী ভেঙে পড়ার ভয় ও জন্তু-জানোয়ারের ভয় ইত্যাদি প্রত্যেক মানুষের মনেই কম বা বেশী পরিমাণে থাকে। সামান্য কারণে অনেকে খুব বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। ম্যানিয়া বা বাতিক এই জাতীয় ভয়ের অন্যতম আসক্তি। Psycho-analysis-এর দ্বারা এই জাতীয় ভয় অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়। মনঃসমীক্ষণের স্রষ্টা ফ্রয়েডের মতে, আতঙ্কগ্রস্ত রোগীর সঙ্গে চিকিৎসক যদি একাত্ম হতে পারেন, তাহলে রোগীর ভয়ের কারণ নির্ণয়ে মোটেই অসুবিধা হয় না। অবশ্য চিকিৎসক ও রোগীর মধ্যে এই অবাধ অনুষঙ্গ (Free association) হওয়ার পেছনে উভয়ের সমান সহযোগিতার প্রয়োজন। অনেকের ভয় পাওয়ার কারণ হয় তো খুবই সামান্য, কিন্তু লজ্জায় মনঃ-সমীক্ষকের কাছে সে কথা গোপন করায় ভুল চিকিৎসাও হতে পারে। এই জাতীয় ভয়ের বৈশিষ্ট্য হলো ভবিষ্যৎ দর্শন। সামান্য জ্বর হলে অনেকের মনে নানা কঠিন রোগ হবার সন্দেহ জাগে। এই জাতীয় ভয়ের চেতনা মোটেই মারাত্মক নয়।

শুধু তাই নয়—অযৌক্তিক, অহেতুক ও অস্বাভাবিক ভয়ও অনেকের মধ্যে দেখা যায়। মনোবিদেরা এই জাতীয় ভয়কে মানসিক বিকৃতির দর্পণ বলে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের মনে মৃত্যুভয় খুব বেশী থাকে, কিন্তু এই ধরণের ভয় একান্তই অহেতুক। কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সমাজে যত রকমের ভয় আছে, মৃত্যুভয় হচ্ছে সবার উপরে। মৃত্যু-রহস্য আজও অনুদ্ঘাটিত ; তাই মৃত্যুভয় হচ্ছে

অজানার বিভীষিকা। মৃত্যু আমাদের চোখে একটি সীমাহীন, দুর্জ্ঞেয়, দুরধিগম্য রহস্য। এই মৃত্যু-ভয়কে জয় করবার পাশ্চাত্য নির্দেশ হলো—Auto suggestion, যার পারিভাষিক শব্দ—'ভাবনা'; অর্থাৎ কিনা মৃত্যুর ভয় করে কোন লাভ নেই। ভয় করে মৃত্যুকে এড়াতে পেরেছেন—এমন কোন মানুষ পৃথিবীতে নেই!

প্রত্যেক আবেগের মত ভয়েরও দৈহিক পরিবর্তনজনিত বহিঃপ্রকাশ ঘটে। মনোবিজ্ঞানী ল্যাং এই মতের সমর্থক। ভয় পেলে গা শির্ শির্ করে, চোখের তারা অস্বাভাবিক বড় হয়ে ওঠে, সারা দেহ কাঁপতে থাকে, বুকের ওঠানামা বেড়ে যায়, অজস্র ঘাম হয়। এ সবই হয় হর্মোন বা উত্তেজক রসের প্রভাবে।

মাটির কথা

সবিতা ঘোষ

মাটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ছোটবেলা থেকেই; কিন্তু এর প্রকৃত রূপটির সঠিক খবর আমরা ক'জনই বা জানি! সাধারণতঃ মাটি বলতে বোঝায় এমন একটি প্রাকৃতিক বস্তু, যার প্রধান উপকরণ হলো কয়েকটি খনিজ পদার্থ। এই খনিজ পদার্থগুলি খুব ছোট ছোট স্ফটিকের আকারে থাকে এবং এদের কাঠামো (Lattice) প্রধানতঃ Hydrous aluminium Silicate অথবা কখনও Hydrous magnesium Silicate দ্বারা তৈরী হয়। আমরা জানি যে, মাটিতে জল মেশালে তা নমনীয় হয় এবং ঐ নমনীয়তা নির্ভর করে খনিজ উপাদানগুলির প্রকৃতি এবং তাদের দানার আয়তনের ক্ষুদ্রতার উপর। এখন ঐ খনিজ উপাদানগুলির গঠনভঙ্গী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

অভ্রের গঠনে যেমন অনেকগুলি স্তর সমান্তরাল-ভাবে সাজানো থাকে, ঠিক একই ধরণের স্তর-বিন্যাস মৃত্তিকার খনিজ উপাদানগুলির মধ্যেও দেখা যায়। কোন্ নিয়মের বশবর্তী হয়ে ঐ স্তরগুলির সৃষ্টি হয়েছে, তা জানা গেছে উপাদান-গুলির একক-স্ফটিকের উপর বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা চালিয়ে। সাধারণতঃ এই সব সমান্তরাল পারমাণবিক স্তরগুলির মধ্যে থাকে Si, Al. O, (OH) এবং কখনও কখনও এদের সঙ্গে Mg, Fe অথবা অন্য কোন মৌলিক পদার্থের পরমাণুও যোগ দেয়। বিভিন্ন স্তরের মধ্যে এই পরমাণু-গুলি সমান্তরাল আস্তরণের মত বিন্যস্ত থাকে এবং এই ধরণের বিন্যাসের মধ্যে একটি বেশ সমতা (Symmetry) লক্ষ্য করা যায়—সাধারণতঃ ষড়ভুজাকৃতি সমতা (Hexagonal Symmetry) থাকে। বিভিন্ন স্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন দৃঢ়-ভাবে আবদ্ধ থাকে, যাতে তারা অপেক্ষাকৃত সরল অথচ বেশ স্থায়ী একটি কাঠামো গঠন করে। এই স্তরগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ রাখতে কয়েকটি বল-এর (Force) প্রয়োজন হয়। ঐ সকল বল ও স্তরগুলির বিন্যাসের সমতা একসঙ্গে মিলে স্ফটিকগুলির গঠন-কৌশলের মধ্যে এনে দেয় বৈচিত্র্য। অক্সিজেনের পরমাণুগুলি সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম এবং কখনও বা পরমাণুকে ঘিরে সৃষ্টি করে চতুস্তলীয় মণ্ডলী (Tetrahedral

group) এবং ঐ মণ্ডলীগুলি আবার ষড়ভুজাকৃতি সমতার দ্বারা আস্তরণের মধ্যে পরস্পরকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। এছাড়াও অক্সিজেন এবং (OH) আয়নগুলি Al, Mg, Fe প্রভৃতি পরমাণুগুলিকে ঘিরে অষ্টতলীয় (Octahedral) মণ্ডলীর সৃষ্টি করে। ১নং ও ২নং ছবি দুটি দেখলে পরমাণুগুলির স্তরবিন্যাস সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

আছে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই স্তরগুলির একটি করে প্রকৃতি-নির্দেশক বেধ আছে। রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে স্তরগুলির ঐ বেধ মাপা যায় এবং ঐ উপাদানগুলিকে তাদের প্রকৃতি-নির্দেশক বেধের পার্থক্য হিসাবে কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। যথা—(১) কেওলিনাইট গোষ্ঠী, (২) মণ্টমোরিলোনাইট গোষ্ঠী, (৩) ইল্লাইট

অক্সিজেন

সিলিকন
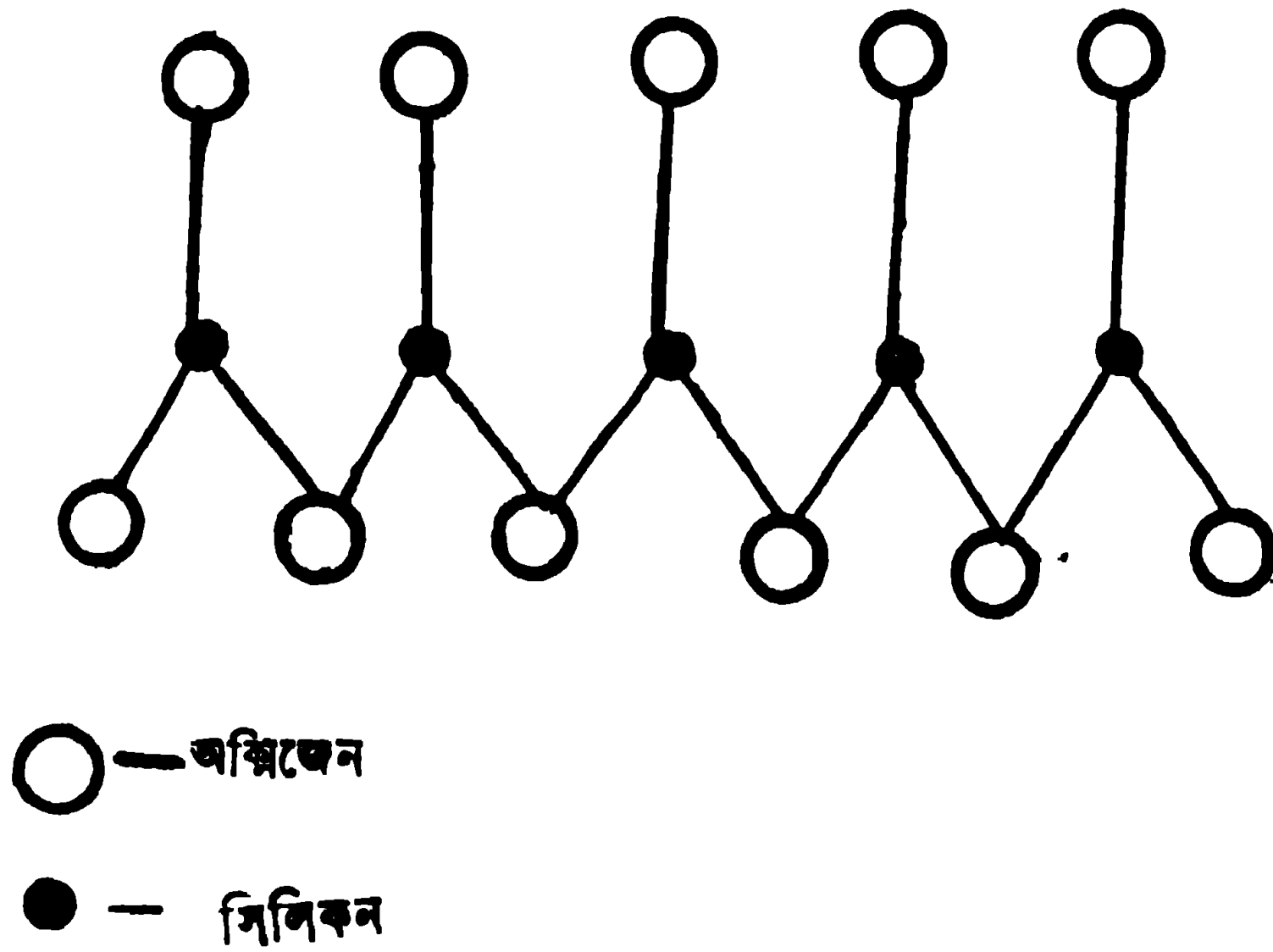
১নং চিত্র।

চতুস্তলীয় মণ্ডলী।

এই জালের মত সমতলক্ষেত্রগুলির আয়তন প্রায় একই হওয়ার দরুণ মিশ্রিত চতুস্তলীয়—অষ্টতলীয় স্তরগুলির সৃষ্টি বেশ সহজেই হয়। এই স্তরগুলি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ হতে পারে কিংবা নাও হতে পারে। এদের বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষতা নির্ভর করে একই স্তরের পরমাণুগুলির পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তনের উপর। এই স্থান পরিবর্তনের ধারা বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুস্তলীয় আস্তরণের মধ্যে Al-এর স্থানে Si এবং অষ্টতলীয় আস্তরণের মধ্যে Mg, Fe এবং Al পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করতে পারে।

প্রতিটি খনিজ উপাদানের স্তরগুলির এক-একটি বিশেষ ধরণের গঠন-কৌশল বা কাঠামো

গোষ্ঠী, (৪) ক্লোরাইট গোষ্ঠী এবং (৫ ভারমিকুলাইট গোষ্ঠী।

কেওলিনাইট গোষ্ঠী—এই শ্রেণীর খনিজ উপাদানগুলির গঠন-কৌশল যে সঙ্কেতের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তা হলো $Al_2(Si_2O_5)(OH)_4$। রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে এদের প্রকৃতি-নির্দেশক আন্তস্তরিক ব্যবধান মাপা হয়েছে এবং তা হলো ৭·১৪ অ্যাংষ্ট্রম।

আবার বৈষম্যমূলক তাপীয় বিশ্লেষণের দ্বারা এই গোষ্ঠীটিকে সনাক্ত করা যায়। একে উত্তপ্ত করলে যথাক্রমে ৫০০° থেকে ৭০০° সেঃ-এর মধ্যে একটি তাপগ্রাহক চূড়া (Endothermic peak), ৯৫০° থেকে ১০০০° সেঃ-এর মধ্যে একটি তাপত্যাজক চূড়া (Exothermic peak)

এবং ১১৫০° থেকে ১২৫০° সেঃ-এর মধ্যে আর একটি তাপত্যজক চূড়া পাওয়া যায়।

মণ্টমরিলোনাইট গোষ্ঠী—এই গোষ্ঠীটির বিশেষত্ব এই যে, একই স্তরের পরমাণুগুলি পরস্পরের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে। এর ফলে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ থাকে না এবং ঋণ-তড়িৎ যুক্ত হয়। সুতরাং স্তরগুলিকে বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ করবার জন্যে বাইরে থেকে অন্য ধনায়নের প্রয়োজন হয়। যে সমস্ত বল-এর দ্বারা স্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, এক্ষেত্রে সেগুলি খুব ক্ষীণ হওয়ার দরুণ জল এবং অন্যান্য ধনায়ন (H^+, Mg^{2+}, Ca^{2+} ইত্যাদি) দুটি স্তরের অন্তর্বর্তী স্থানে প্রবেশ করে ঐ আন্তস্তরিক ব্যবধানের পরিবর্তন ঘটায়। আবার এক ধরণের আন্তস্তরিক ধনায়ন অন্য ধরণের ধনায়নের সঙ্গে বিনিময় করা সম্ভব হয় এবং তা নির্ভর করে পদার্থটির ধনায়ন বিনিময় ক্ষমতার (Cation exchange capacity) উপর। রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে দেখা গেছে যে, এই উপাদানটির প্রকৃতি নির্দেশক আন্তস্তরিক ব্যবধান ১৪ অ্যাংষ্ট্রম থেকে

○ এবং ◌ — অক্সিজেন

● — সিলিকন

২নং চিত্র।

আস্তরণের মধ্যে ষড়ভুজাকৃতি সমতা।

১৮ অ্যাংষ্ট্রম পর্যন্ত হয় এবং সেটা নির্ভর করে আন্তস্তরিক ধনায়নের প্রকৃতির উপর।

ইলাইট গোষ্ঠী—এই শ্রেণীটি শুভ্র অভ্রের সঙ্গে তুলনীয়—যদিও কিছু প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে; যেমন—পটাশের পরিমাণ অভ্রের চেয়ে ইলাইটে অনেক কম এবং জলের পরিমাণ বেশী। রঞ্জেন-রশ্মির সাহায্যে ছবি নিলে দেখা যায় যে, এর প্রকৃতি-নির্দেশক আন্তস্তরিক ব্যবধান ১০ অ্যাংষ্ট্রম।

ক্লোরাইট গোষ্ঠী—এই শ্রেণীটির গঠনে থাকে Mg ও Al-এর Hydrous silicate এবং কিছু পরিমাণ লৌহ, ক্রোমিয়াম অথবা ম্যাঙ্গানিজ। এর প্রকৃতি-নির্দেশক আন্তস্তরিক ব্যবধান ১৪ অ্যাংষ্ট্রম এবং এই পদার্থটিকে ৫০০° থেকে ৬০০° সে.-এর মধ্যে উত্তপ্ত করলেও ঐ আন্তস্তরিক ব্যবধানের কোনও পরিবর্তন ঘটে না।

ভারমিকুলাইট গোষ্ঠী—এই খনিজ উপাদানটিকে যদিও দেখতে অনেকটা অভ্রের মত, তবুও অভ্রের সঙ্গে এর পার্থক্য অনেক। অভ্রের প্রকৃতি-নির্দেশক আন্তস্তরিক ব্যবধান ১০ অ্যাংষ্ট্রম

ও ভারমিকুলাইটের ১৪ অ্যাংষ্ট্রম এবং এর আন্তস্তরিক ধনায়নগুলি অন্য ধনায়নের সঙ্গে বিনিময় করা সম্ভব। কিন্তু অভ্রের ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ভারমিকুলাইটকে উত্তপ্ত করলে সেটা ফেঁপে (Exfoliation) ওঠে এবং এই অবস্থায় এর আয়তন আগের চেয়ে প্রায় তিরিশ গুণ বেড়ে যায়। আবার ক্লোরাইট ও ভারমিকুলাইট, এই দুই গোষ্ঠীরই আন্তস্তরিক ব্যবধান ১৪ অ্যাংষ্ট্রম। কিন্তু পার্থক্য এই যে, ১০০° সে.-এ ভারমিকুলাইটকে উত্তপ্ত করলে এর আন্তস্তরিক ব্যবধান ১৪ অ্যাংষ্ট্রম থেকে কমে ৯.৩ অ্যাংষ্ট্রম হয়।

সাধারণতঃ এইগুলিই হচ্ছে মৃত্তিকার প্রধান খনিজ উপকরণ। এছাড়া মিশ্রিত শ্রেণীর উপাদানও কিছু আছে; যেমন—অভ্র। ভারমিকুলাইট-এর আন্তস্তরিক মিশ্রণ এবং এই মিশ্রণের অনুপাতও বিভিন্ন হতে পারে। এই দুই শ্রেণীর মিশ্রিত ফলকে হাইড্রোবায়োটাইট বলে—যাকে উত্তপ্ত করলে ফেঁপে ওঠে এবং যার আন্তস্তরিক ব্যবধান ১১.৫ অ্যাংষ্ট্রম।

আবার ভারমিকুলাইট-ক্লোরাইট স্তরের মিশ্রণও দেখা যায়। কিন্তু এই মিশ্রণে যদি ক্লোরাইট স্তরের সংখ্যা অল্প হয়, তবে প্রকৃত ভারমিকুলাইট থেকে এই মিশ্রণের পার্থক্য ধরা খুবই শক্ত।

প্রকৃতপক্ষে মৃত্তিকাতে এই সব অজৈব উপাদানের সঙ্গে কিছু পরিমাণ জৈব উপাদানও বিভিন্ন অনুপাতে মিশে থাকে। মিশ্রণের অনুপাতের এই বিভিন্নতার ফলেই পৃথিবী কোথাও উর্বর ও শস্যশ্যামল, আবার কোথাও অনুর্বর এবং রুক্ষ।

উপজাতীয় অঞ্চলে মদ্য-প্রস্তুতি ও পুষ্টিবিজ্ঞানের ‌ ‌তে মদ্যপান

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার রায়

জল ও দুধের কথা ছেড়ে দিলে বোধ হয় এমন কোন পানীয় নেই, যা মদের মত ব্যাপকভাবে প্রচলিত। জনসংখ্যা দিয়ে এই ব্যাপকতার পরিমাপ করা হচ্ছে না—ব্যাপকতার পরিমাপ হচ্ছে আন্তর্জাতিকতা এবং প্রচলন কালের দীর্ঘতা। পৃথিবীর এমন সমাজ বা দেশ খুব কমই আছে, যেখানকার কিছু সংখ্যক লোক মাদক দ্রব্যের কোন না কোন রূপের প্রতি আসক্ত নয়। সমাজের শিক্ষাদীক্ষা, সভ্যতার মান, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতির সঙ্গে মদ্যপানের বিস্তৃতির খুব একটা সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয় না। রুশীয়দের যেমন আছে ভড্‌কা, স্কচ্‌দের হুইস্কি, ফরাসীদের ওয়াইন, তেমনি আছে সাঁওতালদের পচাই বা গভীর অরণ্যে ঢাকা অ্যামাজন নদীর অববাহিকার উপজাতীয়দের ছিছা। চার-পাঁচ হাজার বছর আগেও মানুষ যে মদ তৈরী করতে জানতো এবং তৈরী করতো, তার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মনে হয় কৃষিজীবন গড়ে ওঠবার আগেই মানুষ মদ তৈরী করতে আরম্ভ করেছিল। গাঁজাবার জন্যে শস্য না থাকলেও শর্করাসমৃদ্ধ ফল ও মধু মিলতো বনে। কৃষিকেন্দ্রিক জীবন গড়ে ওঠে নি—এমন আদিম সমাজ পৃথিবীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ অষ্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়। বনে-জঙ্গলে পশুপাখী শিকার ও ফলমূল সংগ্রহ করেই তারা জীবনযাপন করে। তারাও মদ্যপানে অভ্যস্ত।

শিল্পোন্নত বা কৃষিপ্রধান দেশে মদ তৈরীর জন্যে বড় বড় কারখানা গড়ে উঠেছে। সেখানে

মদ্যপায়ীদের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের মদ তৈরী হয়ে থাকে। মদ্যপায়ীরা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকান থেকে সে সব মদ ক্রয় করে নিজেদের মদ্য-তৃষ্ণা দূর করতে পারে। ব্যক্তিগতভাবে মদ তৈরীর অধিকার বা সুবিধা কারোর নেই। কিন্তু অরণ্য ও পর্বতসঙ্কুল বিভিন্ন আদিবাসী অঞ্চলে, বিশেষতঃ যে সব অঞ্চলের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগের ব্যবস্থা ক্ষীণ, সেখানে মদ তৈরী করবার কারখানা নেই। এসব অঞ্চলের আদিবাসী-দের মদ্যপ্রীতি কিছুমাত্র কম নয়! তাই সাধারণতঃ তারা নিজেরাই নিজেদের পানীয় প্রস্তুত করে নেয়। মদ গাঁজাবার কাজটা রন্ধনাদি কাজের মতই গৃহিণীদের উপর ন্যস্ত থাকে।

বিভিন্ন দেশের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে মদ্য প্রস্তুত করবার যে বিচিত্র প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বলা এবং পুষ্টিবিজ্ঞানের দৃষ্টি-কোণ থেকে এই সব পানীয়ের গুণাগুণ বিচার করাই বর্তমান প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এস্থলে যাবতীয় বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়।

গ্লুকোজ, শ্বেতসার ও অ্যালকোহল

বিভিন্ন দেশের আদিবাসী অঞ্চলে মদ্য-প্রস্তুতির যে সব কৌতূহলজনক প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে, সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে হলে মদ্য-প্রস্তুতির মূল বিষয়টি জানা দরকার।

মদের মূল বস্তু হচ্ছে ইথাইল অ্যালকোহল। স্কচ্ হুইস্কিই হোক আর তাড়িই হোক, তাতে অ্যাল-কোহল থাকবেই। তৈরী করবার পদ্ধতির উপর মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ নির্ভর করে। মদে যত বেশী অ্যালকোহল থাকবে, মদ্যপানে মত্ততাও তত বেশী হবে। স্কচ্ হুইস্কির মত উগ্র পানীয়ে অ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগের কাছাকাছি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার বিয়ারজাতীয় পানীয়ে অ্যালকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা চার-পাঁচ ভাগের ভিতরেই থাকে।

অ্যালকোহল তৈরীর মূল বস্তু হচ্ছে গ্লুকোজ বা ঐ জাতীয় শর্করা। কিন্তু গ্লুকোজের অ্যালকোহলে পরিণতি সরাসরি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় হয় না। এই রাসায়নিক পরিবর্তনের জন্যে প্রয়োজন ঈষ্ট নামক আণুবীক্ষণিক এককোষী উদ্ভিদ। আমাদের দেহের নানাপ্রকার জৈবরাসায়নিক ক্রিয়া ও দেহের নতুন নতুন কোষ গঠনের জন্যে শক্তির প্রয়োজন। সে শক্তি আমরা মূলতঃ খাদ্যের গ্লুকোজ থেকে পাই। এই গ্লুকোজ আমাদের দেহকোষে নানাপ্রকার জটিল জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে যেতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলে পরিণত হয় এবং শক্তির উন্মোচন ঘটে। এই শক্তিই দেহের বিভিন্ন জটিল জৈবরাসায়নিক ক্রিয়ার শক্তি যোগায়। এক কথায় বলা যায় যে, নতুন নতুন কোষ গঠনে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা পাওয়া যায় গ্লুকোজ অণুর রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে। ঈষ্টের কোষবৃদ্ধির (অর্থাৎ বংশবৃদ্ধি, কারণ ঈষ্ট এককোষী উদ্ভিদ) জন্যেও শক্তির প্রয়োজন এবং তাও আসে গ্লুকোজ থেকে। তবে ঈষ্ট গ্লুকোজকে জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত না করে অ্যালকোহল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত করে। পরিবর্তনের ছবিটা এই রকম:—

জীবদেহে:

গ্লুকোজ + অক্সিজেন ——→ কার্বন ডাইঅক্সা-ইড + জল + শক্তি

ঈষ্টকোষে:

গ্লুকোজ ——→ অ্যালকোহল + কার্বন ডাই অক্সাইড + শক্তি

জীবের দেহকোষে বা ঈষ্টের কোষে গ্লুকোজের রাসায়নিক পরিবর্তন হয় ধাপে ধাপে। রাসায়নিক পরিবর্তনের কাজটা দোতলা থেকে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে নীচের তলায় নামবার মত। এক এক ধাপ সিঁড়ি অতিক্রম করা হচ্ছে, জটিল জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়ার এক এক ধাপ ভাঙ্গা। এই ধাপ ভাঙ্গা

রাসায়নিক ক্রিয়ার যান্ত্রিক হচ্ছে এন্‌জাইম গোষ্ঠী। এক এক ধাপের কাজ করছে এক এক এন্‌জাইম। ছয় নম্বর সিঁড়ির ধাপ ভাঙার কাজ সাত নম্বর সিঁড়ির এন্‌জাইম দিয়ে করানো যায় না।

অনুকূল পরিবেশে কোন পাত্রে গ্লুকোজ দ্রবণ নিয়ে তাতে উপযুক্ত পরিমাণে খনিজ লবণ, বিভিন্ন ভিটামিন ও নাইট্রোজেনঘটিত দ্রব্য (যেমন

মদ তৈরী করতে কিন্তু গ্লুকোজ দ্রবণ ব্যবহার করা হয় না—করা হয় গ্লুকোজ আছে এমন ফলের রস (যেমন—আঙুরের রস), আলু বা শ্বেতসারসমৃদ্ধ শস্যাদি। গাঁজাবার পর তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা চার-পাঁচ ভাগ থেকে শতকরা দশ-বারো ভাগ পর্যন্ত হয়ে থাকে। তবে এই গাঁজানো দ্রব্য চোলাই বা পাতন

শাল্লীমদিরা সংগ্রহের জন্যে শাল্লীবৃক্ষে আরোহণ করছে। মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার উপজাতি-অধ্যুষিত অঞ্চল। (লেখক কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র)

অ্যামিনো অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি) মিশিয়ে কয়েকটি ঈষ্ট-কোষ ছেড়ে দিলেই ঈষ্টের বংশবৃদ্ধি সুরু হয়ে যাবে এবং গ্লুকোজ থেকে অ্যালকোহলের সৃষ্টি হতে থাকবে।

ঈষ্ট-কোষ কর্তৃক গ্লুকোজের এই রাসায়নিক পরিবর্তনকে বলে অ্যালকোহলিক ফারমেণ্টেশন।

(Distillation) করে অ্যালকোহলের পরিমাণ আরও অনেক বাড়িয়ে দেওয়া যায়। রম, পুইকিস ইত্যাদি এই রকম পাতিত মদ। পাতিত মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত উঠতে পারে।

আলু বা শ্বেতসারসমৃদ্ধ খাদ্যশস্য গাঁজিয়ে মদ

তৈরী করা হয় বটে, কিন্তু ঈষ্ট-কোষ সোজাসুজি শ্বেতসারকে অ্যালকোহলে পরিণত করতে পারে না। তথাপি কেমন করে ঈষ্ট-কোষের সাহায্যে শ্বেতসার থেকে অ্যালকোহল পাওয়া যায়, তা বুঝতে হলে শ্বেতসার আর গ্লুকোজ অণুর সম্পর্কটা জানা দরকার। শ্বেতসারের অণু প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি গ্লুকোজ অণুর সমষ্টি। ঠিক গ্লুকোজ নয়, একটু ছাটকাট করা গ্লুকোজের অণু। এই ছাটকাট করা গ্লুকোজে অণুর মালাই হচ্ছে শ্বেতসার বা ষ্টার্চের অণু। এই ছাটকাট করা গ্লুকোজকে আমরা যদি গ্লুকোজাংশ বলি, তবে শ্বেতসারের অণুটা হবে এই রকম :—

গ্লুকোজাংশ — গ্লুকোজাংশ — গ্লুকোজাংশ—গ্লুকোজাংশ—গ্লুকোজাংশ—ইত্যাদি। অ্যাসিড বা বিশেষ বিশেষ এন্‌জাইম দিয়ে শ্বেতসারের অণুকে ভেঙ্গে টুক্‌রা টুক্‌রা করে গ্লুকোজে (গ্লুকোজাংশ নয়) পরিবর্তিত করা যায়। খাদ্যের শ্বেতসার রক্তে মিশবার আগে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই পরিবর্তন সাধিত হয় কয়েকটি এন্‌জাইমের দ্বারা। খাদ্য যখন চিবানো হয়, তখন শ্বেতসার আংশিকভাবে মল্টোজে পরিণত হয়। মুখের লালাতে অ্যামিলেজ নামে যে এন্‌জাইম আছে, তাই শ্বেতসারকে আংশিক মল্টোজে পরিণত করে। দুটি গ্লুকোজাংশ নিয়ে গঠিত হয় একটি মল্টোজের অণু :—

গ্লুকোজাংশ—গ্লুকোজাংশ
মল্টোজ

খাদ্য অন্ত্রে পৌঁছুবার পর শ্বেতসারের বাকী অপরিবর্তিত অংশও মল্টোজে পরিণত হয় প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অ্যামিলেজের ক্রিয়ার ফলে। অন্ত্রেই মল্টোজ শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়, মল্টেজ নামে এন্‌জাইমের ক্রিয়ায়। একটি মল্টোজের অণু ভেঙ্গে গিয়ে সৃষ্টি করে দুটি গ্লুকোজ-অণুর। ঈষ্টের কোষে মল্টেজ এন্‌জাইম আছে, কিন্তু অ্যামিলেজ এন্‌জাইম নেই। তাই ঈষ্টের কোষ মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করতে পারে, কিন্তু শ্বেতসারকে মল্টোজে পরিণত করতে পারে না। কাজেই ঈষ্ট-কোষের সাহায্যে শ্বেতসার গাঁজাতে হলে তাকে আগে মল্টোজে পরিণত করে নিতেই হবে। তবেই ঈষ্টের কোষ মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে গাঁজান-ক্রিয়া সুরু করতে পারবে।

শ্বেতসারকে মল্টোজে রূপান্তরিত করা হয় মল্ট দিয়ে। মল্টে ডায়াষ্টেজ নামে একটি এন্‌জাইম আছে, যাকে আমরা উদ্ভিদ অ্যামিলেজও বলতে পারি। অঙ্কুরিত শস্যে, বিশেষতঃ অঙ্কুরিত বার্লি-শস্যে প্রচুর পরিমাণে ডায়াষ্টেজ পাওয়া যায়। শ্বেতসারকে মল্টোজে পরিণত করতে অঙ্কুরিত বার্লির ডায়াষ্টেজই ব্যবহার করা হয়। বার্লি-শস্য অঙ্কুরিত হবার পর শুকিয়ে নিয়ে চূর্ণ করা হয়। এই চূর্ণের নামই মল্ট। চূর্ণকরা বার্লি-শস্যের সঙ্গেই ডায়াষ্টেজ মিশ্রিত থাকে। আলু, গম, চা'ল ইত্যাদি গাঁজাবার পূর্বে সিদ্ধ করে মণ্ডের আকারে নিয়ে তাতে বিশেষ পরিমাণে মল্ট মিশিয়ে দেওয়া হয়। মল্টের সান্নিধ্যে খানিকটা সময় থাকবার দরুণ শ্বেতসার মল্টোজে পরিণত হয়। শ্বেতসারকে মল্টোজে পরিণত করে তাতে দেওয়া হয় ঈষ্টের কোষ। গাঁজাবার কাজ সুরু হয়ে যায়। গাঁজানো শেষ হয়ে গেলে পানীয়ে অ্যালকোহলের পরিমাণ বাড়াবার জন্যে গাঁজিত দ্রব্য চোলাই করা হয়। শস্য, আলু ইত্যাদি থেকে মদ তৈরীর এই হচ্ছে মূল কথা।

প্রায় প্রত্যেক দেশের আদিবাসী অঞ্চলেই কোন না কোন রকম অ্যালকোহলীয় পানীয় ব্যবহার করা হয়। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, নাচগান ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠান তো মদ্যপান ছাড়া চলেই না। তাছাড়া বহু জায়গায় দৈনন্দিন জীবনেও অল্পবিস্তর মদ্যপান করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ অঞ্চলেই চোলাইবর্জিত বা অপরিস্রুত বিয়ার জাতীয় মদই বেশী চলে।

আদিবাসী অঞ্চলে মদ্য-প্রস্তুতি

উত্তর আমেরিকা

মদ তৈরীর জন্যে কি কাঁচামাল, অর্থাৎ কোন্ জাতীয় শর্করা বা শ্বেতসারসমৃদ্ধ পদার্থ গাঁজিয়ে মদ তৈরী করা হবে, তা নির্ভর করে স্থানীয় কৃষিজাত বা অরণ্যজাত শস্য, ফলমূল বা বৃক্ষাদির উপর। উত্তর আমেরিকার মরু অঞ্চল এবং দক্ষিণ পূর্ব মেক্সিকোর বিভিন্ন শাখার রেড-ইণ্ডিয়ানেরা অ্যাগেভ নামক গাছের রস ও কাণ্ডের শাঁসালো অগ্রভাগ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে। কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে ফুলের ছড়া বের হবার সময় হলে কাণ্ডের মাঝখানটা খুঁড়ে বেশ দীর্ঘ এবং গভীর একটা গর্ত করা হয়। সেই গর্তে শর্করাবহুল রস (অর্থাৎ যাতে গ্লুকোজ এবং গ্লুকোজের সমধর্মী ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি শর্করা রয়েছে) সঞ্চিত হতে থাকে। রোজ চার থেকে সাত লিটার পর্যন্ত রস সঞ্চিত হয় এবং এক একটা গাছ তিন থেকে ছয়-মাস পর্যন্ত রস দেয়। এই রসের সঙ্গে ঈষ্টবহুল পুরনো গাঁজানো রসের তলানি মিশিয়ে একটি পাত্রে রেখে দিলেই রসের চিনি গেঁজে যায়। মরু অঞ্চলে স্বভাবতঃ জলের অভাব; তাই সেই অঞ্চলের লোকের কাছে আগেভের রস বিধাতার এক আশীর্বাদ স্বরূপ।

অনেক সময় গাছের রস সঞ্চয় করবার আগেই কাণ্ডের শ্বেতসারসমৃদ্ধ অগ্রভাগ কেটে নিয়ে সে-গুলিকে পোড়ানো হয়। তারপর দগ্ধ শাঁসালো অংশটা টুক্‌রা টুক্‌রা করে কেটে এবং থেৎলে নিয়ে শ্বেতসারের মণ্ড তৈরী করা করা হয়। তারপর ডায়াষ্টেজ ও ঈষ্ট-কোষ মিশিয়ে তা গাঁজানো হয়।

মেরু অঞ্চলে মনসাজাতীয় বড় বড় গাছ (Tuna cactus) জন্মায়। সে সব গাছে বিশেষ ঋতুতে সুমিষ্ট রসযুক্ত ফল ধরে প্রচুর। গ্রামের লোকজন টুনা ক্যাক্‌টাসের বন থেকে ফল সংগ্রহ করে জলে সিদ্ধ করে নেয়। বেশ কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে ফলের রস ঘন হয়ে গুড়ের মত হয়ে যায়। তারপর সে গুড় মাটির হাঁড়িতে ঢেলে হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে ঘরে রেখে দেওয়া হয়। সার্ব-জনীন উৎসবের দিনে প্রত্যেক বাড়ী থেকে চাঁদা করে এই ফলের গুড় নিয়ে আসা হয়। ফলের গুড়ের সঙ্গে জল মিশিয়ে ও কিছু ঈষ্টের কোষ দিয়ে তাকে গাঁজানো হয় একটা বিরাট জালার মধ্যে। জালার নীচে অল্প অল্প আগুন জ্বলতে থাকে, যাতে জল মিশ্রিত গুড় সামান্য উত্তাপ পেতে পারে। এই সামান্য উত্তাপে গাজবার কাজটা ভাল ভাবে হয়।

এ ছাড়া ভুট্টা, জংলী আনারস ইত্যাদি গাঁজি-য়েও মদ তৈরী হয়। ভুট্টা গাঁজাবার আগে তা অঙ্কুরিত করা হয়—প্রয়োজনীয় ডায়াষ্টেজ ভুট্টা থেকেই পাওয়া যায়

দক্ষিণ আমেরিকা

অ্যামাজন নদীর বিস্তৃত অববাহিকা ও আরও অনেক অঞ্চল জুড়ে রয়েছে কোকামা, ওমাগুয়া, টুকান, তাড়ওয়ারা আর ওয়াকান ইত্যাদি উপ-জাতি। নানারকম মদ এদের প্রিয় পানীয়। এরা সাধারণতঃ ভুট্টা ও ক্যাসাভা বা ম্যানিওকের মূল গাঁজিয়ে মদ প্রস্তুত করে। তাছাড়া নানাপ্রকার বন্যফল, আনারস, কলা ইত্যাদি গাঁজিয়েও মদ তৈরী করা হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার বহু উপজাতীয় অঞ্চলে এক বিচিত্র উপায়ে শ্বেতসারকে মল্টোজে পরিণত করা হয়। উদ্ভিজ্জ অ্যামিলেজ (ডায়াষ্টেজ) প্রয়োগ না করে প্রয়োগ করা হয় মুখের লালার অ্যামিলেজ। আগেই বলা হয়েছে, শ্বেতসারসমৃদ্ধ খাদ্য চিবুলে মুখের লালার অ্যামিলেজ খাদ্যের শ্বেতসারকে আংশিকভাবে মল্টোজে পরিণত করে। বলা বাহুল্য, মুখের লালার এই কার্যকারিতা উপজাতীয়দের জানা নেই—তবুও তারা অভিজ্ঞতা থেকেই জেনে নিয়েছে যে, মদ গাঁজাবার প্রথম ধাপের কাজে মুখের লালা সবিশেষ কার্যকরী।

এই প্রাথমিক কাজটা তারা থুথু দিয়েই করে থাকে। খানিকটা ক্যাসাভা বা ভুট্টার ময়দা মুখে নিয়ে চিবুতে থাকে মেয়েরা। কিছুক্ষণ চিবানোর পর লালামিশ্রিত চিবানো ময়দা রাখা হয় একটা পাত্রে। এই রকম চিবানো চলতেই থাকে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ লালামিশ্রিত ময়দা জমলে তা রেখে দেওয়া হয় খানিকটা সময়। এই সময়ের ভিতর শ্বেতসার মল্টোজে পরিণত হয়ে যায়। তারপর পরিমাণ মত জল আর ঈষ্টের কোষ মিশিয়ে তা যথারীতি গাঁজানো হয়। অনেক সময় ময়দা না চিবিয়ে প্রথমেই তা জলে গুলে জাল দিয়ে লেই তৈরী করা হয়। ঠাণ্ডা লেইয়ে বাড়ীর সবাই থুথু ফেলতে থাকে। পর্যাপ্ত পরিমাণ থুথু ফেলবার পর থুথুমিশ্রিত ময়দার লেই ঢেকে রাখা হয় খানিকটা সময়। তারপর গাঁজাবার পালা। মুখ-নিঃসৃত থুথুও মানুষের কাছে কত মূল্যবান!

অনেক উপজাতি তালজাতীয় গাছের রস গাঁজিয়েও মদ তৈরী করে। রস গাঁজানো হয় কাটা তাল গাছের গুঁড়িতে। গাছের গুঁড়ির মাঝখানটা চিরে ভিতরের অংশ ফেলে দিয়ে গুঁড়িটা বসিয়ে দেওয়া হয় দু'পাশের খুঁটির উপরে। চেরা জায়গা দিয়ে রস ঢেলে দেওয়া হয়। তালগাছের অনেকটা ফাঁপা গুঁড়িই হয়ে যায় তালরস গাঁজাবার পাত্র।

গাঁজান-প্রক্রিয়ার সহায়তায় মদকে একটু ঝাঁঝালো করা বা মদে পছন্দমত গন্ধ আনবার জন্যে অনেক সময় চর্বিত শ্বেতসার, তালরস ইত্যাদির সঙ্গে ফার্নগুঁড়ির টুক্‌রা, তালগাছের শাঁসালো ডগা, ভেড়া বা ছাগলের নাদি ইত্যাদি মিশিয়ে দেওয়া হয়।

আফ্রিকা

উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার উপজাতীয় অঞ্চলে প্রধানতঃ নানা জাতীয় মিলেট শস্য, বিশেষ করে সরগুম, মদ তৈরীর উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। স্থানে স্থানে মধু গাঁজিয়েও মদ তৈরী করা হয়। উত্তর রোডেশিয়ার লাম্বা উপজাতির মধু গাঁজাবার রীতিটি চমকপ্রদ। মৌচাকের মধু (মধুতে গাঁজাবার মত গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ দুটি শর্করাই আছে) আর মৌমাছির শূককীট—এই দুটি জিনিষই মধুমদিরা তৈরী করবার কাজে লাগানো হয়। বড় একটা লাউয়ের খোলার (Calabash) ভিতরে শূককীটগুলি রাখা হয়, আর তাতে দেওয়া হয় খানিকটা ভুট্টার ময়দা। লাউয়ের খোলার মুখটা ঢেকে এই অবস্থায় রেখে দেওয়া হয় একদিন। পরের দিন সকাল বেলায় লাউয়ের খোলার মুখ খুলে দিয়ে বেশ খানিকটা জল মিশানো মধু ঢেলে দেওয়া হয় আর তার সঙ্গে দেওয়া হয় একটু ঈষ্টবহুল পুরনো মদের তলানী। তারপর খোলাটাকে বেশ করে ঝেঁকে নিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এভাবে দু-দিন কেটে যাবার পর মধু গেঁজে গিয়ে মদে পরিণত হয়। এই জাতীয় মধুমদিরায় নাকি খুব নেশা হয়। মৌমাছির শূককীট কেন দেওয়া হয়, তা আমার জানা নেই, তবে মনে হয় শূককীটের দেহ-নিঃসৃত রসে অ্যামিলেজ থাকে এবং তা ভুট্টার ময়দার শ্বেতসারকে মল্টোজে পরিণত করে। হয়তো শূককীটের রস মধুটাকে ঝাঁঝালো করে তোলে।

অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়ায় এমন অনেক উপজাতি আছে, যাদের জীবন আজও সংগ্রহ-ভিত্তিক। কৃষির কাজ তারা করে না। এদের মদ তৈরীর দু'-একটি বিচিত্র পদ্ধতির কথা বলছি।

বনের মধু এদের একটি প্রিয় খাদ্য। মধু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে মধু গাঁজিয়েই এরা মদ তৈরী করে। মৌচাকের মধু পাওয়া না গেলে কাজে লাগায় বনের ফুল। মধু আছে,

এমন ফুল ঋতুবিশেষে প্রচুর পাওয়া যায়। সেই ফুলগুলি জলে ভিজিয়ে রাখলেই মধু জলের সঙ্গে মিশে যায়। জল মিশানো ফুলের মধু থেকে তৈরী হয় মধুমদিরা।

ভিক্টোরিয়া প্রদেশের মারে ডার্লিং জেলার কয়েকটি অঞ্চলের আদিবাসীরা পতঙ্গবিশেষের দেহ-নিঃসৃত জমাটবাঁধা মিষ্টদ্রব্য গাঁজিয়ে মদ তৈরী করে। সাইলা শ্রেণীর (Psylla family) পতঙ্গের শূককীট কয়েক জাতীয় ইউক্যালিপটাস গাছের পাতায় আশ্রয় নেয়। শূককীটের দেহ-নিঃসৃত রস শূককীটের চারধারে কয়েকটি ক্ষুদ্র মোচার (Cone) আকার নিয়ে জমা হয় এবং শূককীট এই জমাটবাঁধা আবরণের ভিতরেই থেকে যায়। এই মোচাকৃতি জমাটবাঁধা দেহ-নিঃসৃত রসকে আদিবাসীরা বলে লারাপ। গ্রীষ্মকালে গাছের পাতায় পাতায় সময় সময় এত লারাপ জমে যে, মনে হয় গাছের পাতা বুঝি তুষারে ছেয়ে গেছে। লারাপের স্বাদ মিষ্টি, রং সাদা বা ফিকে হলুদ। এর প্রধান রাসায়নিক উপাদান সম্ভবতঃ গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ কিংবা ম্যানোজ নামক শর্করা। গ্লুকোজ আর ম্যানোজের রাসায়নিক সম্পর্কটা খুব ঘনিষ্ঠ। ঈষ্টের কোষ ম্যানোজ গাঁজিয়েও অ্যালকোহলের সৃষ্টি করতে পারে। লারাপ আমাদের চিনির মতই আদিবাসীদের একটি প্রিয় খাদ্য। লারাপের চিনি গাঁজিয়েই আদিবাসীরা একরকম অ্যালকোহলীয় পানীয় তৈরী করে।

ভারতবর্ষ

ভারতের প্রায় প্রত্যেক রাজ্যেই নানা উপজাতি রয়েছে। তবে উপজাতীয়দের অধিকাংশই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম ও নেফাতে। প্রায় সকল উপজাতীয় অঞ্চলেই মদ একটি জনপ্রিয় পানীয়। চোলাইবর্জিত বিয়ারজাতীয় এবং চোলাই-করা হুইস্কি বা ব্রাণ্ডিজাতীয় পানীয়, উভয়েরই প্রচলন আছে। তবে অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলের মত ভারতের উপজাতীয় অঞ্চলেও চোলাইবর্জিত মদই বেশী পান করা হয়। এই চোলাইবর্জিত পানীয় সাধারণতঃ নানা জাতীয় মিলেট (চিনী, কাউন, রাগি ইত্যাদি হলো মিলেট জাতীয় শস্য) ও চা'ল গাঁজিয়ে তৈরী করা হয়। নেফার উপজাতীয়েরা মদ তৈরীর জন্যে মিলেট গাঁজায়। বাস্তারের মারিয়া এবং উড়িষ্যার গাদাভাদের মধ্যেও এর জনপ্রিয়তা রয়েছে। নেফার উপজাতীয়েরা এর নাম দিয়েছে আপাং, আর গাদাভারা লাণ্ডা। অধিকাংশ উপজাতীয় অঞ্চলেই চা'ল গাঁজিয়ে মদ তৈরী করা হয়। বিভিন্ন নামে এর পরিচিতি। কোথাও ডিপ্পাং, কোথাও পচাই, কোথাও চুয়াক, কোথাও পেণ্ডাম, কোথাও কানিধান, কোথাও বা হাণ্ডি। নেফার নিকটে নাগারা বন থেকে সংগৃহীত কন্দের শ্বেতসার গাঁজিয়েও মদ তৈরী করে।

ভারতের আদিবাসী অঞ্চলে চোলাইবর্জিত মদ তৈরীর পদ্ধতিটা মোটামুটি এই রকম—প্রথমে চা'ল বা মিলেট ফুটিয়ে রাখা হয় একটা মাটির পাত্রে। সেটা ঠাণ্ডা হলে উপযুক্ত পরিমাণ গাঁজাবার দ্রব্য মিশিয়ে দেওয়া হয়। গাঁজাবার দ্রব্য চা'লের গুঁড়া দিয়ে তৈরী গোটা কয়েক মার্বেল আকৃতির গুটিকা। অবশ্য তাতে শুধু চা'লের গুঁড়াই থাকে না—ডায়েষ্টেজ ও ঈষ্টের কোষও থাকে। গাঁজন-দ্রব্য মিশাবার পর পাত্রটা কলাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়, দিন তিনেক। সিদ্ধ চা'ল বা মিলেট গেঁজে যায় এই সময়ের মধ্যেই। তখন তাতে বেশ খানিকটা জল মিশিয়ে বাঁশের তৈরী ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হয়। ছাঁকনির ভিতর দিয়ে চোঁয়ানো তরল জিনিসটাই হলো পানীয়।

চোলাই-করা মদ তৈরী হয় মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে, যেখানে মহুয়া ফুল প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছের তলায় অজস্র মহুয়া ফুল ঝরে পড়ে। টাট্‌কা রসালো মহুয়া ফুলে শতকরা চৌদ্দ-পনেরো

ভাগ চিনি থাকে। আদিবাসীরা ফুল সংগ্রহ করে ঘরে শুকিয়ে রেখে দেয়। হাটে-বাজারে সে ফুল বিক্রী হয়। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভাটিয়াল ছাড়া চোলাই করবার অধিকার কারোর নেই। শুকনো মহুয়া ফুল বড় বড় জালায় ভিজিয়ে রাখা হয় দিন পাঁচেক। ভিজাবার আগে পাত্রের জলে পুরনো গাঁজানো ফুলের রস অথবা ঈষ্ট-কোস আছে, এরকম চিটাগুড় দেওয়া হয় কিছুটা। মহুয়ার চিনি গেঁজে গেলে গাঁজন দ্রব্য চোলাই করা হয়। মহুয়ার মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে সাধারণতঃ শতকরা কুড়ি থেকে ত্রিশ ভাগ। কয়েকটি উপজাতীয় অঞ্চলে (যেমন, ত্রিপুরার উপ-জাতীয় অঞ্চল) চা'লের বিয়ারও চোলাই করা হয়। এরকম চোলাই-করা মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ। তবে অনেক সময়ে চোলাই-করা মদ দ্বিতীয়বার চোলাই করাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগে দাঁড়ায়।

মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলা এবং উড়িষ্যার কুরাপুট ও গঞ্জাম জেলায় সাগু-পাম জন্মে। স্থানীয় উপজাতীয়েরা ঐ গাছের নাম দিয়েছে শাল্পী। গাছের বয়স সাত-আট বছর হলে কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে একটা বড় পুষ্পগুচ্ছ বের হয়—যেমন বের হয় কলাগাছের মোচা। পুষ্প-গুচ্ছের উপরের দিকটা কেটে নিলে গুচ্ছের গোড়ার দিকটা থেকে যায়। তখন কাটা অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা মিষ্ট রস পড়তে থাকে। শাল্পীর রস সঞ্চিত হয় গাছে বাঁধা হাড়িতে। হাঁড়িতে পুরনো রসও থাকে কিছুটা। পুরনো রসের সংস্পর্শে এসে টাট্‌কা রসও গেঁজে যায়। গাছ থেকে গাঁজানো রস পেড়ে নিয়ে সুরা-রসিকেরা গাছের নীচে বসেই তা নিঃশেষ করে।

মদ ও পুষ্টি

আমরা দেখেছি, উপজাতীয় অঞ্চলে চোলাই-বর্জিত পানীয়ই বেশী চলে এবং সে সব পানীয়ের অধিকাংশের উপাদানই চা'ল, মিলেট ইত্যাদি খাদ্য-শস্য গাঁজানো দ্রব্যে জল মিশিয়ে চালুনী বা ঐ জাতীয় জিনিষ দিয়ে ছেঁকে নিলেই পানীয় তৈরী হয়। ছেঁকে নিলেও খাদ্যশস্যের পুষ্টিকর অংশের (যেমন—অপরিবর্তিত শ্বেতসার, প্রোটিন, খনিজ লবণ ও বিভিন্ন ভিটামিন) বেশীর ভাগ পরিস্রুত পানীয়ের সঙ্গে চলে আসে। এই জন্যেই এই সব পানীয়ের যথেষ্ট খাদ্যমূল্য আছে। অবশ্য পানীয়টা কি ভাবে তৈরী হবে, অর্থাৎ খাদ্যশস্য গাঁজাবার পদ্ধতি, ছাঁকবার পদ্ধতি ইত্যাদির উপর পুষ্টিমূল্য (Nutritive value) নির্ভর করে। এই পুষ্টি-মূল্যের জন্যেই দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন উপজাতি ঋতুবিশেষে চোলাইবর্জিত ভুট্টার মদকে প্রধান খাদ্য এবং প্রধান পানীয়রূপে গ্রহণ করতে পারে। চোলাইবর্জিত বা অপরিস্রুত মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা দুই থেকে পাঁচ ভাগের ভিতর থাকে। তার অর্থ, এক বোতল (পাঁচ শত মিলিলিটার) পানীয়ে অ্যালকোহল থাকে দশ থেকে পঁচিশ মিলিলিটার। সুরার মত্ততা এবং অন্যান্য কুফলের মূলে রয়েছে অ্যালকোহল। চোলাইবর্জিত মদে অ্যালকোহলের পরিমাণ কম থাকায় তা পরিমিত পরিমাণে পান করা হয়তো দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক নয়।

গাছের মিষ্টরস গাঁজিয়ে যে পানীয় তৈরী করা হয়, তাতেও অ্যালকোহলের পরিমাণ বেশী থাকে না। শাল্পীর গাঁজানো রসে অনেক ক্ষেত্রেই অ্যালকোহলের পরিমাণ শতকরা দু-ভাগেরও কম থাকে। এই গাঁজানো রসেও ক্যালরি প্রোটিন, নানারকম ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। বলা বাহুল্য, টাট্‌কা রসে যে পুষ্টিকগুলি (Nutrient) থাকে, তা গাঁজানো রসে পাওয়া যায়। তবে গাঁজান-ক্রিয়ার ফলে অনেক সময় কয়েকটি ভিটামিনের পরিমাণ বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ঈষ্টের কোষ, বিশেষ করে বি-কমপ্লেক্স পরিবারভুক্ত কয়েকটি ভিটামিনের পরিমাণ বাড়াতে পারে।

ইষ্টের বংশবৃদ্ধির ফলে মিষ্ট রসে বা খাদ্যশস্যে যে ভিটামিন ছিল না বা নাম মাত্র ছিল, তা নতুন করে তৈরী হতে পারে।

চোলাই করা বা পাতিত অ্যালকোহলীয় পানীয়ে অ্যালকোহলের পরিমাণ থাকে অনেক বেশী। সুতরাং পাতিত মদিরার দৈহিক ও নৈতিক অবনতি ঘটাবার ক্ষমতাও অনেক বেশী। ভারতের উপজাতীয় অঞ্চলে যে সব চোলাই করা মদ পান করা হয়. তাতে অ্যালকোহলের পরিমাণ সাধারণতঃ শতকরা পনেরো থেকে ত্রিশের ভিতর থাকে। খাদ্যের শ্বেতসার, প্রোটিন ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ থেকে আমরা যেমন ক্যালরি বা শক্তি পাই, তেমনি অ্যালকোহল থেকেও আমরা শক্তি পেতে পারি। এক গ্র্যাম শ্বেতসার বা প্রোটিন থেকে চার ক্যালরী, এক গ্র্যাম স্নেহ পদার্থ থেকে নয় ক্যালরী আর এক গ্র্যাম অ্যালকোহল থেকে সাত ক্যালরী শক্তি পাওয়া যায়। পাতিত মদ্যে জল আর অ্যালকোহল ছাড়া কিছু থাকে না—সুতরাং পাতিত মদ্য থেকে ক্যালরী বা শক্তি ছাড়া আর কোন পুষ্টিক পাওয়া যায় না। দেহের প্রয়োজনীয় ক্যালরীর জন্যে যদি আংশিকভাবেও পাতিত মদ্যের উপর নির্ভর করা যায়, তবে খাদ্য সুসমতা হারিয়ে ফেলতে পারে। ধরা যাক, ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত কোন গ্রামের পুরুষেরা রোজ গড়ে পাঁচ-শ' মিলিলিটার বা একবোতল করে মহুয়া সরাব পান করে। মহুয়া সরাবে যদি শতকরা পঁচিশ ভাগ অ্যালকোহল থাকে, তবে পাঁচ-শ' মিলিলিটার থেকে এক-শ' পঁচিশ মিলিলিটার অ্যালকোহল বা মোটামুটি এক-শ' গ্র্যাম অ্যালকোহল পাওয়া যাবে। সুতরাং ঐ অ্যালকোহল থেকে পাওয়া যাবে সাত-শ' ক্যালরী। যদি পুরুষ প্রতি শক্তির প্রয়োজনীয়তা হয় আঠাশ শত ক্যালরী, তবে বাকী একুশ ক্যালরী তারা খাবার থেকে নেবে। সরাব পান না করলে সবটা ক্যালরীই খাদ্য থেকে আসতো। উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরী পাবার জন্যে যখন আমরা খাদ্য খাই, তখন ক্যালরী পাওয়ার সঙ্গে অন্যান্য পুষ্টিকও পেয়ে থাকি। ভাত বা রুটি শুধু ক্যালরীরই উৎস নয়—প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদিরও উৎস। পাতিত মদ থেকে ক্যালরী ছাড়া আর কোন পুষ্টিক পাওয়া যায় না, তাই আঠাশ শত ক্যালরী পাওয়া যায়, এমন খাদ্য থেকে যে সব পুষ্টিক পাওয়া যেত, তার অভাব ঘটে। সরাব পান করবার দরুণ ক্যালরীর সমতা রক্ষিত হয়, কিন্তু অন্যান্য পুষ্টিকের অভাব ঘটে। একথা বলা যায়—যারা অত্যধিক পরিমাণে চোলাই করা মদ্য পান করে, তাদের অপুষ্টিজনিত রোগভোগের সম্ভাবনা থাকে। সম্ভবতঃ ব্যাপকভাবে ভারতের কোন আদিবাসী অঞ্চলেই এতটা পাতিত মদ্য পান করা হয় না। তবে এর ব্যতিক্রম হিসাবে কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত গ্রাম বা জনোপনিবেশ যে নেই, তা বলা যায় না।

মদ্যপান উপজাতীয়দের কৃষ্টি, ধর্ম ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। যদি তা সম্পূর্ণ বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় নাও হয়, তবে অন্ততঃ দেখতে হবে, চোলাই করা বা পাতিত মদ্যের প্রচলন যেন ক্রমশঃ কমে আসে। শুধু উৎসব অনুষ্ঠানে পরিমিত পরিমাণে অপাতিত মদ্যপানজনিত স্বাস্থ্যহানি বা সামাজিক সমস্যা উদ্ভব হবার সম্ভাবনা থাকে না।

সঞ্চয়ন

ভারতে তৈরী প্যারাসুট

ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রহরারত জওয়ানদের কাছে ভোরবেলায় বিমানের গোঙানি এক শুভদিনের সঙ্কেত বাণী। হঠাৎ কিছুক্ষণ তাঁদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা দেয়। তারপর তাঁরা আকাশের ঐ অ্যালুমিনিয়াম পক্ষী থেকে নেমে-আসা সাদা রঙের ক্ষুদে তাঁবুগুলির সন্ধান সুরু করেন।

এভাবেই দুর্ভেদ্য অগ্রবর্তী এলাকায় জওয়ানদের জন্যে রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেওয়া হয়। ভারতীয় বিমান বাহিনী আজ কয়েক মাস ধরেই অক্লান্তভাবে ঐ কাজ করে যাচ্ছেন। এই কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো প্যারাসুট।

ভারতের অস্ত্র-কারখানাগুলিতে আজ হাজার হাজার প্যারাসুট তৈরী হচ্ছে—তৈরী হচ্ছে দেশীয় সামগ্রী দিয়ে। আজকের এই জরুরী অবস্থার চাহিদা পূরণের জন্যে উৎপাদন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

প্যারাসুটের কাপড় কাটা হচ্ছে।

ভারতে তৈরী ঐ প্যারাসুটগুলির সাহায্যে রসদ আর অস্ত্রশস্ত্র যেমন নামান যায়, তেমনিই প্রয়োজন হলে দুর্গম যুদ্ধক্ষেত্রে বৈমানিক ও ছত্রী বাহিনীও পৌঁছে দেওয়া যায়।

প্যারাসুট তৈরীর জন্যে যে সব প্যানেল ব্যবহৃত হয়, তাও ভারতেই তৈরী। নাইলনের ফিতাই হলো প্যারাসুটের প্রধান উপকরণ। প্যারাসুটের প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরীর কাজে বেসরকারী

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে প্যারাসুটযোগে মাল নামানো হচ্ছে

প্যারাসুট তৈরীর কাজ খুবই জটিল। এর কাজ অত্যন্ত নিপুণ ও সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। কাঁটায় কাঁটায় সবটুকু করতে হয়—সামান্যতম এদিক-ওদিক হলেই বিপদ। তৈরীর সময় প্রতিটি যন্ত্রাংশ নিখুঁত আছে কিনা, পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। কাঁচা উপকরণ বাছাই করতে হয়, খুব সাবধানে। পরীক্ষকেরা সব চুলচেরা বিচার করেন। কেন না, তাঁদের বিচারে এতটুকু ভুলচুক থেকে গেলে অন্যকে ভীষণ রকম খেসারত দিতে হবে।

সংস্থাগুলি প্রতিরক্ষা কারখানাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করছেন।

প্যারাসুটের সাহায্যে প্রায় সব কিছুই সরবরাহ করা যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনী অগ্রবর্তী অঞ্চলে ডিম, ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্যান্ত পশু—এমন কি, জীপও আকাশ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় সেনা বাহিনীর জন্যে।

জীবাণু বহু শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের অন্তরায়

জীবাণু কেবল মানুষের শত্রুই নয়, তারা মানুষের পরম মিত্রও বটে। এমন যে দই, যাকে বলা হয় পরমায়ুবর্ধক, তাও জীবাণু ছাড়া উৎপাদিত হয় না। তথাকথিত বহু বিস্ময়কর ভেষজ ও টিকার জন্যেও প্রয়োজন হয় জীবাণুর।

বর্তমানে আমেরিকায় রবার্ট গ্যাথরী নামে জনৈক চিকিৎসক কোন কোন শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হওয়ার মূলে কোন জীবাণু আছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখছেন। তাঁর এই তথ্য-সন্ধানী প্রক্রিয়া একটু অদ্ভুত। তিনি জীবাণুগুলিকে খাদ্য না দিয়ে উপবাসী রাখেন। তারপর নবজাতকের দেহের এক ফোঁটা রক্তের মধ্যে তাদের বাড়তে দেন। যদি দেখা যায়, ঐ রক্তে তাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে, তাহলেই বুঝতে হবে ঐ শিশুর রক্তে এমন জিনিষ রয়েছে—যার জন্যে এর মানসিক বৃত্তির বিকাশ ঘটে না। সুতরাং মস্তিষ্কের ক্ষতি করতে পারে—এই রকম খাদ্য শিশুকে কম দিতে হবে এবং তার জন্যে বিশেষ ধরণের পথ্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাঃ গ্যাথরী নিউইয়র্কের বাফেলোস্থিত শিশু-হাসপাতালের চিকিৎসক এবং শিশুদের রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন। তাছাড়া তিনি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিশুরোগ সম্পর্কে অধ্যাপনাও করেন। তিনি বাফেলোর নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে অ্যাসোসিয়েট প্রোফেসর।

তাঁর মতে, কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য শিশুর দেহ গ্রহণ করবার পক্ষে অক্ষম হলেই তা তার শরীরে জমা হয় এবং মস্তিষ্কের ক্ষতি করে থাকে। তবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আগে থেকেই তা জানতে পারলে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে এবং প্রকৃতির এই ত্রুটি সংশোধন সম্ভব হতে পারে।

ডাঃ গ্যাথরী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—আমরা যতদূর জানি শিশুর দেহে খাদ্যের রাসায়নিক বিপাক-ক্রিয়ায় ২৮ রকমের ত্রুটি দেখা দিয়ে থাকে। সেগুলি শিশুর মস্তিষ্কের যথাযথ গঠনে প্রতিবন্ধক হতে পারে।

দেহকোষ থেকে নিঃসৃত এন্‌জাইম বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এক এক রকম এন্‌জাইমের এক এক রকম নির্দিষ্ট রাসায়নিক শক্তি দেখা যায়। কোন কোন এন্‌জাইমের অভাব ঘটলে বা রাসায়নিক পদার্থের পৌনঃপুনিক প্রতিক্রিয়া পুরাপুরি না হলে দেহে কোন কোন বস্তুর আতিশয্য ঘটে এবং সে সব বস্তু জমা হয়ে দেহের ক্ষতি করে থাকে।

ফিনাইলে লেনাইন শিশুদেহের জন্যে অতি পুষ্টিকর পদার্থ। কি কারণে শিশুর দেহ এই পদার্থটি গ্রহণ করতে পারে না, তা ডাঃ গ্যাথরীর গবেষণার পূর্বে জানা ছিল না। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ না হওয়ার মূলে আছে শিশুর দেহের ফিনাইল কেটোনুরিয়া বা এই ফিনাইলে লেনাইন গ্রহণ করবার অক্ষমতা—সংক্ষেপে "পি কে ইউ"। এই বিষয়টি পরীক্ষা করবার পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন।

তাঁর মতে—কোন কোন শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তের মধ্যে মানসিক শক্তি বিকাশের প্রতিকূল এই জিনিষটির পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং সেটি তার মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়। আগে থেকেই এই সম্পর্কে কিছু জানা গেলে এর দরুণ শিশুর অস্বাভাবিক প্রকৃতি গড়ে ওঠবার আগেই বিশেষ পথ্যের ব্যবস্থা করে' তা প্রতিরোধ করা যেতে পারে।

ব্যাসিলাস সাবটেলিস একপ্রকার জীবাণু। এই সকল জীবাণুকে অত্যাবশ্যক পুষ্টিকর পদার্থ থেকে বঞ্চিত করে তাদের সাহায্যে এই বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হয়।

ডাঃ গ্যাথরী এই ক্ষুধার্ত জীবাণুগুলিকে একটি আঠালো বস্তুর সঙ্গে মিশিয়ে একটি পিরিচে রাখেন। তার উপরে রাখেন এক টুকরা ফিলটার পেপার। এই ফিলটার পেপারে আগেই শিশুর সামান্য একটু রক্ত মাখিয়ে দেওয়া হয়। শিশুর রক্তে অস্বাভাবিক পরিমাণে ফিনাইলে লেনাইন থাকলে ঐ সকল ক্ষুধার্ত জীবাণু বাড়তে থাকে এবং ঐ ফিলটার পেপারের চারদিকে জমা হয় ও ধোঁয়াটে দাগের সৃষ্টি করে। রক্তের উপাদান-গুলি স্বাভাবিক পরিমাণে থাকলে এই সকল জীবাণু ঐ রক্তের মধ্যে খাবার পায় না বলেই শুকিয়ে যেতে থাকে।

এই অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিটি বর্তমানে মার্কিন জনস্বাস্থ্য দপ্তর বা পাবলিক হেলথ সার্ভিসের চিলড্রেন্‌স্ ব্যুরোর অর্থ সাহায্যে ছয় লক্ষ নব-জাতকের উপর পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

সম্প্রতি ম্যাসাচুসেটস্ হাসপাতালে ত্রিশ হাজার শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় সাতটি শিশুর ফিনাইলে লেনাইন গ্রহণ করবার অক্ষমতা, অর্থাৎ পি-কে-ইউ রোগ ধরা পড়ে। এই ত্রুটি ধরা না পড়লে এই সাতটি শিশুর প্রত্যেকটিরই বুদ্ধিবৃত্তি বিকশিত না হবার ফলে পরনির্ভরশীল হবার জন্যে সারাজীবন লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো।

দেহযন্ত্রের যে ক্রিয়ার ফলে পুষ্টিকর পদার্থ-সমূহ জৈবপদার্থে পরিণত হয়ে থাকে—তাতে নানারকমের ত্রুটি ঘটলেই দেহের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটে। অন্যান্য যে সকল ত্রুটির ফলে শিশুর মানসিক বিকাশে বিঘ্ন ঘটে, ডাঃ গ্যাথরী বর্তমানে সে সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করছেন।

আবার তিনি উপবাসী জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা সুরু করেন। শিশুর রক্তে ও মূত্রে এই সব জীবাণু পুষ্ট হয়ে ওঠে কিনা, এবার তারই পরীক্ষা চলে। সেই সকল জীবাণু তাতে পুষ্ট হয়ে উঠলেই তা শিশুর পক্ষে মারাত্মক হয়। তারপর জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্যে তিনি তাতে একটি রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করেন।

অনেক রকম জীবাণু আছে এবং তাদের বৃদ্ধি বন্ধ করবার জন্যেও অনেক রকমের রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। ডাঃ গ্যাথরী প্রত্যেকটি শিশুর রক্তে এবং মূত্রে এই সকল জীবাণু রেখে নানাভাবে পরীক্ষা করে দেখছেন।

আর কোনও জীবাণু যদি এই প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধি পায়, তাহলে মানসিক রোগের রহস্য সন্ধানে তিনি আরও খানিকটা এগিয়ে যাবেন বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

সমুদ্র থেকে ভেষজ আহরণ

সমুদ্র শুধু রত্নাকর নয়, খাদ্যেরও আকর—একথা আজ অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সমুদ্রজাত খাদ্য হয়তো পৃথিবীর খাদ্যাভাব নিরসনে প্রভূত সাহায্য করবে। আর একজন বিজ্ঞানী—ডাঃ পল বার্কহোল্ডার সমুদ্রকে ভেষজের আকর বলে মনে করেন। ডাঃ বার্কহোল্ডার নিউইয়র্কের প্যালিসেডেজ-এ ল্যামণ্ট অবজারভেটরীর জীববিদ্যা শাখার চেয়ারম্যান। তাঁর ধারণা, সমুদ্র-জাত ভেষজ একদিন রোগক্লিষ্ট পৃথিবীকে নিরাময় করে তুলতে সাহায্য করবে।

সমুদ্র থেকে ভেষজ সন্ধান করবার জন্যে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামণ্ট জিওলজিক্যাল অবজারভেটরীর জীব-বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ধরণের লেবরেটরী তৈরী করছেন। এই ক্ষুদ্রাকৃতি, সহজে স্থানান্তরযোগ্য লেবরেটরীটি দূরদূরান্তে নিয়ে গিয়ে তাঁরা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাবেন।

লেবরেটরীটি হবে অ্যালুমিনিয়ামের। গাড়ী অথবা জাহাজে করে দূরদূরান্তে, যেমন—প্রবাল দ্বীপ বা কোন দ্বীপপুঞ্জ কিংবা মেরুপ্রদেশে নিয়ে গিয়ে সরেজমিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানো যাবে। লেবরেটরীটি হবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। অ্যান্টিবায়োটিক এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে ভৈষজ্যগুণ সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম থাকবে এই ক্ষুদ্র লেবরেটরীতে।

স্থির হয়েছে, সমুদ্র থেকে ভেষজ আহরণ সংক্রান্ত গবেষণা জীব-বিজ্ঞানীরা চালাবেন দক্ষিণ আমেরিকার সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে টিয়েরা ডেল ফুয়েগো দ্বীপপুঞ্জে, দক্ষিণ মেরু এলাকার পামার উপদ্বীপ অঞ্চলে এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে। ভারত মহাসাগরে গবেষণা চালানো হবে সেশেল দ্বীপপুঞ্জ ও মালদ্বীপে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে নিউক্যালেডোনিয়া, ফিজি, সামোয়া, তাহিতি. প্যালমাইরা ও হাওয়াই দ্বীপে।

ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন—খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ও ঔষধের জন্যে মানুষ বরাবরই নির্ভর করে এসেছে ভূপৃষ্ঠস্থ নৈসর্গিক সম্পদের উপর। পলিনেশিয়াতেই মানুষ সর্বপ্রথম বিরাট এক ভূখণ্ডের উপর বসতি স্থাপন করে। কয়েক শতাব্দী ধরে তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে জলের অচ্ছেদ্য সম্পর্ক এবং সমুদ্র থেকেই তারা জীবনধারণের উপাদান সংগ্রহ করে।

পাশ্চাত্য জগতে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ স্বতঃই খাদ্য ও ঔষধের জন্যে স্থলচর প্রাণী ও বনজঙ্গলের গাছগাছড়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই কারণেই আধুনিক ফার্মাকোপিয়াতে যত মূল ঔষধের নাম রয়েছে, তার সব কিছুই আহৃত হয় গাছপালা থেকে। এমন কি, সাম্প্রতিক কালে অ্যান্টিবায়োটিক নিয়েও যা কিছু কাজ হয়েছে, তারও ভিত্তি হলো স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী, জলজ কিছু নয়।

ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন যে, বর্তমান যুগের সমগ্র কারিগরি দক্ষতা দিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান প্রয়োগ করে প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল প্রাচীর ও দ্বীপপুঞ্জের জলে নতুন ভেষজ সম্পর্কে গবেষণা করলে সমুদ্রের জলে প্রাণীদেহে কার্যকরী এমন সব বস্তুর সন্ধান পাওয়া যাবে, যা হয়তো নতুন ও উন্নত ধরণের ভেষজের সন্ধানে মানুষকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

সমুদ্র থেকে অ্যাগার (একপ্রকার সামুদ্রিক গুল্ম থেকে প্রস্তুত এই বস্তুটি ভেষজ এবং জীবাণুবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয়), কড্‌লিভার অয়েল এবং খাদ্যাদিতে ব্যবহার করা হয়—এরকম নানা জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে। আবার মাছের তেল থেকে প্রাপ্ত কোলেষ্টেরল ব্যবহৃত হয় হাইড্রোফিলিক পেট্রোলেটাম তৈরী করতে।

সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল বা জীবাশ্মও ভেষজে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন যে, মাছের ফসিল থেকে প্রস্তুত ইক্‌থামল এর এক দৃষ্টান্ত। কার্বাঙ্কল এবং ত্বক বা অন্তঃত্বক সংক্রান্ত নানারূপ রোগের চিকিৎসার জন্যে মলমে ইক্‌থামল ব্যবহার করা হয়। সাল্‌ফা ড্রাগ কিংবা অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের বহু পূর্বে এই মলম দিয়ে বেদনাদায়ক কাটা ঘা অল্প সময়ের মধ্যে সারিয়ে তোলা হতো।

তিনি আরও বলেন যে, ব্রোমিন, আয়োডিন এবং ম্যাগ্‌নেসিয়াম বহুদিন যাবৎই সমুদ্র থেকে আহরণ করা হচ্ছে। কয়েক বছর আগেও একপ্রকার সামুদ্রিক গুল্মের ছাই থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আয়োডিন তৈরী করা হতো। বর্তমানে এটি তৈরী হয় সোরা কিংবা লোনা জল থেকে। ব্রোমিন আহরণ করা হয় সমুদ্র অথবা লোনা জল থেকে। ইলেক্ট্রোলিসিস পদ্ধতি কিংবা ক্লোরিন পৃথকীকরণের দ্বারা ব্রোমিন সংগ্রহ করা হয়। ভূগর্ভস্থ লোনা জল কিংবা সমুদ্রের জল থেকে ম্যাগ্‌নেসিয়াম ক্লোরাইড সংগৃহীত হয়।

ডাঃ বার্কহোল্ডার আরও বলেন যে, উল্লিখিত বস্তুগুলি ব্যতীত আরও অনেক কিছু রয়েছে বিশাল সমুদ্রের অতলে। কিন্তু জানা নেই বলেই সেগুলি ভেষজ-বিজ্ঞানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। স্ট্রিক-

নিন, অ্যাট্রোপিন, কিউরেরার প্রভৃতি নানারূপ বিষাক্ত গাছগাছড়া থেকে আজকাল নানারূপ ঔষধ তৈরী হচ্ছে। এগুলি ব্যবহারের পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে বলেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

ডাঃ বার্কহোল্ডারের মতে, সামুদ্রিক লতাগুল্ম ও মৎস্যাদির বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক গুণ সম্পর্কে গবেষণা করবার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে এখন। এগুলিকে সর্বতোমভাবে মানুষের কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে হবে।

তিনি বলেন যে, সমুদ্রে যে নানারকম ভেষজ পাওয়া যাবে তার যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। প্রাথমিকভাবে যতটুকু জানা গেছে, তাতে মনে হয় কোন কোন জাতের অক্টোপাশের শরীরে অ্যাড্রিনেলিন, নরঅ্যাড্রিনেলিন এবং ডোপাসেটিক অ্যাসিড রয়েছে।

সামুদ্রিক পোকামাকড়, শামুক, জেলিফিস্, ষ্টোনফিস ও নানারকম মাছ বেশ বিষাক্ত। ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন যে, এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানুষকে খাদ্যের বিসক্রিয়া থেকে রক্ষা করতে হবে এবং ঠিকমত গবেষণা করলে এই সবের নতুন কার্যকরী ঔষধও পাওয়া যেতে পারে।

তিনি বলেন, ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট্স্ অব হেলথ-এ আমরা প্রমাণ করেছি যে, অ্যাবালোন (এক প্রকার ঝিনুক) এবং শুক্তিতে এমন অনেক পদার্থ রয়েছে, যার যথার্থ প্রয়োগ ঘটলে ইঁদুরের দেহে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং পোলিওর ভাইরাস ধ্বংস করে। ভাইরাস বিধ্বংসী এই পদার্থটির নাম পাওলিন।

শুক্তি (ক্ল্যাম জাতীয়), অক্টোপাস, জেলিফিস ও অন্যান্য অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভৈসজ্যগুণ রয়েছে বলে ডাঃ বার্কহোল্ডার জানান। এদের মধ্যে ইন্ডোল নামক মৌল রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে, আবার অক্টোপাসের মধ্যে সেরোটোনিন রয়েছে। গবেষকেরা মনে করেন, এই পদার্থটিই প্রকৃতিস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ হবার কারণ।

সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ রকমের লতাগুল্ম, প্রাণী ও মাইক্রোব রয়েছে—শুধুমাত্র মাছই আছে ২০,০০০ রকমের। সব রকমের সম্পদই আছে এখানে, তাছাড়া খনিজ পদার্থও আছে। ডাঃ বার্কহোল্ডার বলেন যে, এই সম্পর্কে জানতে হবে, একে ব্যবহার করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নতুন ঔষধ সমুদ্র থেকে পাবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। জলজ বস্তু থেকে জীব-বিজ্ঞান, রসায়ন এবং ভেষজ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত অনেক কিছু আবিষ্কৃত হতে পারে। এই সম্পর্কে আমরা যা জানি, তা হলো সমুদ্রের তুলনায় এক বিন্দু জলের মত।

সমুদ্রের লতাগুল্ম এবং প্রাণী থেকে আশ্চর্য রকমের নতুন ঔষধ আবিষ্কার করতে হলে আমাদের আরও অনেক কিছু জানতে হবে এবং সম্ভবতঃ নতুন পদ্ধতিও আবিষ্কার করতে হবে।

ক্যান্সারের বিরুদ্ধে জেহাদ

ভয়াবহ ব্যাধি ক্যান্সার—এই দুরন্ত অভিশাপের বিরুদ্ধে আজ বিজ্ঞানীরা একযোগে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, অবিরত গবেষণা করে চলেছেন আরোগ্যমূলক ভেষজ উদ্ভাবনের প্রয়াসে।

মার্কিন বিজ্ঞানীদের এই ব্যাপক প্রচেষ্টাকে সুসংহত করে তোলবার জন্যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার একটি বিশেষ সংস্থা বা এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই 'ক্যান্সার কেমোথিরাপি ন্যাশন্যাল সার্ভিস সেন্টার'-এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটনের উপকণ্ঠে মেরীল্যাণ্ডের সিলভার স্প্রিং-এ অবস্থিত।

সংস্থাটি একদিকে যেমন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে এই বিপুল অভিযানের সামগ্রিক পরিকল্পনা করে,

অপরদিকে তেমনই লক্ষ্য রাখে—যাতে দু'জন বিজ্ঞানীর গবেষণাকার্য একই রকমের না হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য বিজ্ঞানী যে গবেষণা চালাচ্ছেন, তার ফলাফলের তুলনামূলক বিচার করে এই সংস্থা।

ভেষজ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ক্যান্সার সেন্টারের এই প্রয়াস অতুলনীয়—এইরূপ বিপুল ও সুসংহত প্রয়াস আর কখনও দেখা যায় নি।

এই সব কিছুরই উদ্দেশ্য হলো, এই দুরন্ত ব্যাধির আক্রমণ থেকে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে উদ্ধার করা। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই প্রতি বছর এই ব্যাধিতে ২ লক্ষ ৮০ হাজার লোক প্রাণ হারায়।

সংস্থাটির নামের অন্তর্ভুক্ত 'কেমোথিরাপি' শব্দটি থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রয়াস চলছে ক্যান্সারের চিকিৎসায় ফলপ্রসূ কেমিক্যাল বা রাসায়নিক পদার্থগুলিকে কেন্দ্র করে। নানাপ্রকার রাসায়নিকের সংমিশ্রণে উদ্ভূত কিংবা কৃত্রিম উপায়ে তৈরী প্রায় ৫০,০০০ রকমের রাসায়নিক পদার্থের ক্যান্সার প্রতিরোধের গুণাগুণ নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা প্রতি বছরই গবেষণা করেন। এই সব রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংস্থাটিতে রেকর্ড করে রাখা হয়।

বিশেষজ্ঞেরা এই সব গবেষণা করেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, ব্যক্তিগত গবেষণাগার এবং অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাতে। তবে বহু ক্ষেত্রেই এই গবেষণা হয় সরকারের উদ্যোগে।

ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ব্যাধির উপশম করে এবং তাদের বেশী দিন বেঁচে থাকতে সাহায্য করে—এই রকম বহু ওষুধ আবিষ্কারের কাজ অনেকখানি এগিয়েছে। এর আংশিক কৃতিত্ব এই ক্যান্সার সেন্টারের। ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এর কর্মীরা নিরলসভাবে এই বিষয়ে উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছেন।

এত চেষ্টা সত্ত্বেও একমাত্র "মেথোট্রেক্সেট" ব্যতীত এমন আর কোন ভেষজ আবিষ্কৃত হয় নি, যার প্রয়োগে ক্যান্সার আরোগ্য হতে পারে কিংবা ঐ রোগ প্রতিরোধ করা যেতে পারে। এই ওষুধটি আবার শুধুমাত্র একটি বিশেষ ধরণের ক্যান্সারের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হয়—তা হলো চোরিকারসিনোমা নামক ক্যান্সার। শুধুমাত্র মেয়েদের মধ্যেই এই ক্যান্সার দেখা যায় এবং এর আক্রমণের সংখ্যাও আবার নগণ্য। এই রোগে আক্রান্ত কতিপয় স্ত্রীলোককে এই ওষুধটির সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং তারা পাঁচ বছরেরও বেশী বেঁচে আছে।

উল্লিখিত একটি মাত্র ওষুধ ছাড়া ক্যান্সার নিরাময়ের আর দুটি পন্থা আছে—অস্ত্রোপচার এবং রেডিওথিরাপি। অনেক দিন ধরেই এই দুই ধরণের চিকিৎসা চলছে। এই দুই প্রকার চিকিৎসার পদ্ধতি এবং সাজসরঞ্জামেরও যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে।

ক্যান্সার চিকিৎসায় অস্ত্রোপচারই বোধ হয় সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি। এর মাধ্যমে যেখানে ক্যান্সার হয়েছে, সেই অংশটি কেটে বের করে নেওয়া হয়। রেডিওথিরাপি হলো এক্স-রে কিংবা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মির সাহায্যে ক্যান্সার ক্ষত পুড়িয়ে দেওয়া কিংবা তার বৃদ্ধি বন্ধ করে দেওয়া।

তবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়লে অস্ত্রোপচার বা রেডিওথিরাপি করে বিশেষ ফল হয় না। আবার শরীরের এমন অনেক স্থানে ক্যান্সার হয়, যেখানে অস্ত্রোপচার বা রেডিওথিরাপি করতে গেলে দেহের কোন গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রেও এই ধরণের চিকিৎসায় ফল হয় না।

বিশেষ করে এই রকমের ক্যান্সারের জন্যেই কার্যকরী ভেষজ আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

লিউকেমিয়া বা রক্তে ক্যান্সার হলে সেক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার কিংবা রেডিওথিরাপি নিষ্ফল। মাত্র ১৫ বছর পূর্বেও লিউকেমিয়া রোগে গুরুতর-

ভাবে আক্রান্ত হলে সেই শিশু তিন-চার মাসের বেশী বাঁচতো না।

ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্রে পাঁচটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে গত তিন বছরে যে তিনটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কৃতিত্ব ক্যান্সার সেণ্টারের। এই ওষুধগুলির প্রয়োগে আক্রান্ত শিশুদের এক বছরের বেশী বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। তবে লিউকেমিয়া আরোগ্য করতে পারে, এই রকম কোন কিছু এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

ক্যান্সার রোগে নিরাময়ের সম্ভাবনাপূর্ণ কোন রাসায়নিক দ্রব্য উদ্ভাবিত হলে ক্যান্সার সেণ্টারের মারফৎ তা প্রাথমিক পরীক্ষার জন্যে গবেষণা-কেন্দ্রগুলিতে পাঠানো হয়। গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ক্যান্সারযুক্ত দেহকোষের উপর প্রথম পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষা সার্থক হলে পরবর্তী পর্যায়ে পরীক্ষা চালানো হয় জীবজন্তুর উপর।

জীবজন্তুর উপর পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের ক্যান্সারের উপর ঐ নতুন রাসায়নিকের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় করেন। এছাড়া এই পরীক্ষার মাধ্যমে ভেষজ কিরূপ মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে এবং এর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে সবও নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব কিছু পরীক্ষা করবার পরেই মাত্র বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-মূলকভাবে মানবদেহে ওষুধ প্রয়োগ করেন। একে বলা হয় "ক্লিনিক্যাল ষ্টাডিজ"। তবুও সাবধানতা হিসাবে এই পরীক্ষা প্রথমে করা হয় এমন সব ক্যান্সার রোগীর উপর, যাদের ভাল হবার আর কোন আশাই থাকে না।

হাজারটা ওষুধ নিয়ে পরীক্ষা করলে তার মধ্যে একটি মাত্র শেষ পর্যায়ে, অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল ষ্টাডির পর্যায়ে পৌঁছায়।

কেমোথিরাপি নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন আশার আলো দেখা গেছে—তা হলো "কম্বিনেশন থিরাপি"। এই প্রক্রিয়ায় অস্ত্রোপচার বা রেডিওথিরাপির সঙ্গে একযোগে রাসায়নিক ভেষজ ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতির সার্থকতা বিশেষভাবে দেখা গেছে স্তনের ক্যান্সারের চিকিৎসায়। এই ধরণের রোগীদের উপর যেখানে শুধুমাত্র অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, সেই সব ক্ষেত্রে প্রায় অর্ধেকের মধ্যে এই রোগ পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু অস্ত্রোপচার ও ভেষজ একযোগে প্রয়োগ করে দেখা গেছে—রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র এক-চতুর্থাংশ রোগীর মধ্যে।

ক্যান্সার সেণ্টারের এই কার্যকলাপের জন্যে বছরে প্রায় ৩ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়। ২৪টি দলে ভাগ হয়ে প্রায় ১০০ গবেষক বিনা পারিশ্রমিকে সেণ্টারের কাজ করেন।

এই সব গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন মেডিক্যাল জার্ণ্যাল মারফৎ সমগ্র পৃথিবীতে চিকিৎসক, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের কাছে পৌঁছায়।

সেমিকণ্ডাক্টর

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী

কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বছর আগে বায়ুশূন্য ভাল্‌ভ টিউব নামে যে জিনিষটির আবিষ্কার হয়েছিল, বিজ্ঞানজগতে তার প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত নয়। উত্তপ্ত ক্যাথোড প্লেট প্রচুর শক্তি নষ্ট করে—তাছাড়া এদের গঠন এত বেশী জটিল যে, এগুলিকে খুব ছোট করে তৈরী করা সম্ভব নয়। বাড়ীতে যে সব রেডিও বা টেলিভিসন সেট ব্যবহার করা হয়, তাদের কথা বাদ দিলেও অন্য এমন সব যন্ত্র আছে—যেগুলি তৈরী করতে হাজার খানেক ভাল্‌ভের দরকার হয়। যেমন—ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। স্বভাবতঃই এদের আকার খুব বড় হতে বাধ্য। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহ, মহাকাশ যান ইত্যাদি তৈরী করবার জন্যে প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে—এদের আয়তন বড় হলে চলবে না। সুতরাং বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে পারেন—এমন জিনিস আবিষ্কার করা যায় কিনা, যা ভাল্‌ভের মত কাজ করবে অথচ আকারে খুব ছোট হবে।

পদার্থবিদেরা প্রয়োজনমত জিনিষ বের করলেন, নাম তার—সেমিকণ্ডাক্টর। এই নতুন জিনিষের আয়তন হলো মাত্র ০'০১ ঘন সে মি। এতে না আছে অ্যানাড বা ক্যাথোড, না আছে গ্রিড। সাধারণতঃ ভাল্‌ভে যা দরকার হয়, তার কিছুই এতে লাগে না; অথচ ভাল্‌বের মত বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে এরা পরিশোধন ও পরিবর্ধন করতে পারে।

কিন্তু এই সেমিকণ্ডাক্টর কি জিনিষ? বিজ্ঞান-জগতে কণ্ডাক্টর বা পরিবাহী নামে অনেক ধাতুর পরিচয় আমরা পাই, যার ভিতর দিয়ে তড়িৎ অবাধে চলাচল করতে পারে। আবার এমন জিনিষেরও আমরা নাম জানি, যেমন—রবার, অভ্র, গন্ধক ইত্যাদি—যাদের ভিতর দিয়ে কোন তড়িৎ যাতায়াত করতে পারে না। সেই জন্যে তাদের নাম ইনস্যুলেটর বা অন্তরক। কিন্তু এই ধাতু ও অন্তরকের মাঝামাঝি প্রচুর পদার্থ রয়েছে—যাদের প্রকৃতি পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি রকমের। সেগুলিই হচ্ছে সেমিকণ্ডাক্টর। সাধারণতঃ ধাতুর অক্সাইড, গ্র্যাফাইট, সেলেনিয়াম, জার্মেনিয়াম, টেলেরিয়াম ইত্যাদি এই দলে পড়ে যদিও খনিজ পদার্থের মধ্যে এই সব জিনিষ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তথাপি বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা দেয় নি। গত কয়েক দশক ধরে মাত্র এগুলিকে জানা সম্ভব হয়েছে।

পরিবাহী অপেক্ষা অন্তরকের দিক থেকে সেমি-কণ্ডাক্টরের ধর্ম বিচার করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কেন না, কোন অপরিবাহী স্ফটিক যখন ত্রুটিযুক্ত হয়, তখনই তা সেমিকণ্ডাক্টরের রূপ নেয়।

সেমিকণ্ডাক্টরগুলি মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে জার্মেনিয়াম। পিরিয়ডিক টেবল-এ এর স্থান চতুর্থ গ্রুপে। এই গ্রুপেই আবার কার্বনের স্থান। সুতরাং এর ধর্ম হচ্ছে অপরিবাহী। কারণ এর পরমাণুর বাইরের কক্ষে আছে চারটি আবর্তন-শীল ইলেকট্রন, যারা রাসায়নিক বিক্রিয়া বা তড়িৎ-পরিবহনে অংশ গ্রহণ করে। স্ফটিকাকারে পরিণত করবার পর জার্মেনিয়ামের পরমাণুগুলি একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী স্থান গ্রহণ করে, যাতে প্রত্যেক পরমাণু অন্য চারটি পরমাণুর সঙ্গে দুই-ইলেকট্রন-বিশিষ্ট বণ্ড (Bond) তৈরী করে এবং অল্প তাপে খুব স্থিতিশীল হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন মুক্ত ইলেকট্রন না থাকবার দরুণ বিশুদ্ধ জার্মেনিয়ামের একটি স্ফটিক অল্প উত্তাপে অন্তরকের কাজ করে।

কারণ একমাত্র মুক্ত ইলেকট্রনের উপস্থিতির জন্যেই ধাতুগুলি পরিবাহীর কাজ করে।

বাইরে থেকে কোন অতিরিক্ত ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দিয়ে বা ভিতরে একটি ইলেকট্রনের জন্যে খালি জায়গা (Hole) করে দিয়ে সেমিকণ্ডাক্টরকে পরিবাহী করা হয়। স্ফটিককে অধিক উত্তাপ দিলেই তার মধ্যে পরমাণুর গঠন ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ তার স্থিতিশীলতা নষ্ট হয় এবং স্ফটিক পরিবাহীর ধর্ম পায়। কিন্তু জার্মেনিয়ামের স্ফটিকের মধ্যে আর্সেনিক (পঞ্চম গ্রুপ) অথবা গ্যালিয়ামের (তৃতীয় গ্রুপ) পরমাণু ভেজাল হিসাবে ঢুকিয়ে দিয়ে পরিবাহী করা হয়ে থাকে। পঞ্চম গ্রুপের এই পরমাণুগুলির বাইরের কক্ষে যে পাঁচটি ইলেকট্রন আছে, তার চারটি জোড়-ইলেকট্রন বণ্ড তৈরী করবার ফলে মাত্র একটি ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় থাকে। সুতরাং আর্সেনিক ভেজাল দেবার ফলে যে অতিরিক্ত ঋণাত্মক ইলেকট্রন জার্মেনিয়ামের মধ্যে আসে, সেগুলি চারদিকে অবাধে চলাচল করে জার্মেনিয়ামকে পরিবাহী করে তোলে। এই রকমের জার্মেনিয়ামকে এন-টাইপ জার্মেনিয়াম বলে। আবার যদি তৃতীয় গ্রুপের গ্যালিয়াম বা ইণ্ডিয়াম জার্মেনিয়ামের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে জার্মেনিয়াম-স্ফটিকের কিছু কিছু পরমাণুর স্থানে ইণ্ডিয়ামের পরমাণু চলে যাবে। কিন্তু ইণ্ডিয়ামের পরমাণুতে বাইরের কক্ষে মাত্র তিনটি ইলেকট্রন থাকবার দরুণ জার্মেনিয়ামের একটি বণ্ড ফাঁকা থেকে যাবে। এই ফাঁকা জায়গা পূর্ণ করবার জন্যে পাশের পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন চলে এলে ইণ্ডিয়াম পরমাণু একটি ইলেকট্রন বেশী পাওয়ার ফলে ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। এভাবে একজায়গা পূর্ণ করতে গিয়ে আর একজায়গায় ফাঁক বা ঘাটতি সৃষ্টির দ্বারা ইলেকট্রনকে গতিশীল করে জার্মেনিয়ামকে পরিবাহী করা হয়। এই ধরণের সেমিকণ্ডাক্টরকে বলা হয় পি-টাইপ সেমিকণ্ডাক্টর।

এখন দেখা যাক—ঐ গতিশীল মুক্ত ইলেকট্রনের কি কাজ। পাউলির "এক্সক্লুশন প্রিন্সপল্" অনুযায়ী স্ফটিকের বণ্ডের মধ্যে ঐ ইলেকট্রনের যাওয়া নিষেধ। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, সেগুলি স্থির অবস্থাতেও নেই, কারণ তাতে তাপশক্তি আছে। তাছাড়া জানা গেছে যে, একবার চলতে আরম্ভ করে একই সরলরেখা বরাবর সেগুলি $১০^{-৫}$ সে. মি পর্যন্ত যায়, পরে দিগ্চ্যুত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে এত বেশী দূরত্ব সাধারণ কল্পনার বাইরে—কেন না, দুটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর মধ্যে যতটা ফাঁক, তার চেয়ে এই দূরত্ব ১০০০ গুণ বেশী। চিন্তার বিষয় এই যে, পরমাণুগুলির বাধা অতিক্রম করে ঐ ইলেকট্রন কেমন করে অতটা পথ গেল?

বিজ্ঞানও পিছিয়ে নেই। সে বললো—ইলেকট্রনের প্রকৃতি দুই রকমের—বস্তু প্রকৃতি (Particle aspect) ও তরঙ্গ প্রকৃতি (Wave aspect)। এখানে ইলেকট্রনের তরঙ্গ প্রকৃতি অধিকতর কার্যকরী এবং জার্মেনিয়াম-স্ফটিকের পরমাণুগুলি নির্দিষ্ট শৃঙ্খলে বাঁধা রয়েছে বলে ইলেকট্রনের তরঙ্গ অবাধে তাদের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারে।

প্রশ্নেরও শেষ নেই! ইলেকট্রনের তরঙ্গ প্রকৃতি ধরে নিলে এটা স্বাভাবিক যে, ইলেকট্রন অবাধে সরলরেখায় একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে পারে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তো অতটা যায় না। এর কারণ কি? উত্তর এই যে—যে তাপ ইলেকট্রনগুলিকে গতিশীল করে, তা স্ফটিককে সর্বত্র একই অবস্থায় রাখে না। কেন না, পরমাণুগুলি তাদের গড় অবস্থাকে কেন্দ্র করে কম্পিত হয়; স্বভাবতঃই স্ফটিকের একটি একক পরবর্তী একক থেকে কিছুটা পৃথক হয়। যদি তাপ আরও বাড়ানো যায়, তবে স্ফটিকের সুসমঞ্জস গঠন আরও বেশী নষ্ট হয় এবং মুক্ত ইলেকট্রনের সরলরেখায় যাওয়ায় প্রতিবারের দৈর্ঘ্যও কমে যায়।

এখন দেখা যাক, সেমিকণ্ডাক্টরকে কি ভাবে কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

(ক) রেক্টিফিকেশন বা পরিশোধন—

রেক্টিফিকেশন বা পরিশোধন বলতে বোঝায় এমন একটা পায়, যা তড়িৎ-প্রবাহকে একদিকে অল্প বাধা দেয় এবং অপরদিকে ভীষণ বাধা দেয়। এভাবেই বায়ুশূন্য ভাল্‌ভ পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহকে পরিশোধন করে একদিকে প্রচুর তড়িৎ-প্রবাহ এবং অন্যদিকে শূন্য প্রবাহের সৃষ্টি করে। সেমিকণ্ডাক্টর আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, পি-টাইপ ও এন-টাইপের জার্মেনিয়ামকে পাশা-পাশি রেখে খুব ভাল পরিশোধকরূপে ব্যবহার করা যায়।

করতে পারে না। এভাবে উচ্চ প্রতিরোধের সৃষ্টি করা হয়। এই অবস্থাকে তাপসমতা বা থার্ম্যাল ইকুইলিব্রিয়াম বলে (১নং চিত্র)।

এখন যদি এন-টাইপের সঙ্গে ব্যাটারীর পজিটিভ টার্মিন্যাল এবং পি-টাইপের সঙ্গে নেগেটিভ টার্মিন্যাল যোগ করা যায়, তবে দুই অংশের সীমানায় প্রতিরোধ আরও বেড়ে যাওয়ার দরুণ ইলেকট্রন অধিক পরিমাণে প্রতিহত হবে এবং তার ফলে তড়িৎ-প্রবাহ অনেক কমে যাবে (২নং চিত্র)।

কিন্তু যদি ব্যাটারীর নেগেটিভ এন-টাইপের

পি এন
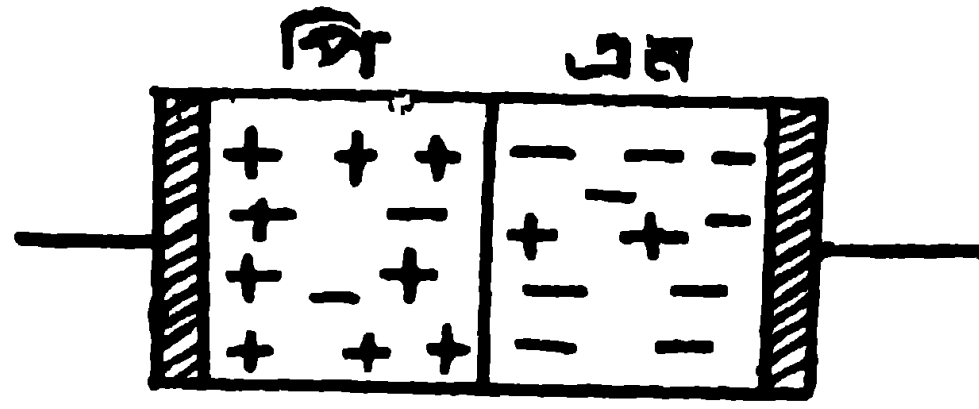
(১)

১নং চিত্র।

এন-টাইপের জার্মেনিয়ামে যত ইলেকট্রন মুক্ত অবস্থায় আছে, পি-টাইপের জার্মেনিয়ামে ততটা ফাঁকা জায়গা (Hole) থাকে। এই দুই ধরণের সেমিকণ্ডাক্টরকে পাশাপাশি রাখলে এন-টাইপের অংশ থেকে পি-টাইপের মধ্যে ইলেকট্রন প্রবেশ করে এবং পি-টাইপের সীমানায় জমা হয়ে তারা

সঙ্গে ও পজিটিভ পি-টাইপের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে সীমানায় প্রতিরোধ কমে যাওয়ার ফলে প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রন চলাচল করতে পারে বলে অধিক তড়িৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয় (৩নং চিত্র)।

এই সেমিকণ্ডাক্টরকে পরিশোধক হিসাবে ব্যবহার করতে হলে পরিবর্তী বিভব ব্যবহার করা

পি এন

(২)
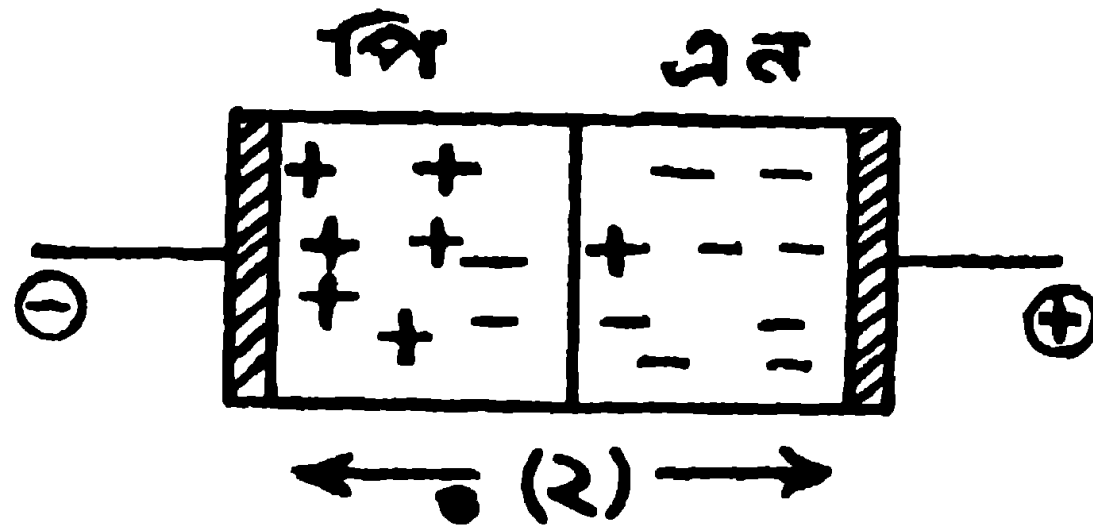
২নং চিত্র।

সেখানে ঋণাত্মক আধানের সৃষ্টি করে আর বেশী ইলেকট্রনকে ঢুকতে দেয় না। এভাবে দুই অংশের সীমানায় একটি বিভব-প্রভেদের সৃষ্টি হয় এবং ইলেকট্রন এক অংশ থেকে আর এক অংশে প্রবেশ

হয়। ফলে এন-টাইপ ও পি-টাইপের জার্মেনিয়াম পর্যায়ক্রমে বিপরীত আধানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সীমান্তরেখার নিকট প্রতিরোধও পর্যায়ক্রমে কম-বেশী হয়। সুতরাং এই দুই প্রকারের সেমিকণ্ডা-

ট্রের ভিতর দিয়ে একটি দিকে মাত্র অধিক পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং অন্য দিকে খুবই কম যায়। এভাবে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহকে

৩নং চিত্র।

পরিশোধন করে একই দিকে প্রবহমান তড়িতে রূপান্তরিত করা হয়। একে বলা হয় সেমিকণ্ডাক্টর ডায়োড

এন পি এন

৪নং চিত্র।
পরিবর্ধন। তাপ সমতা।

(খ) পরিবর্ধন—

যে ইলেকট্রিক ভাল্‌ভকে পরিশোধকরূপে ব্যবহার করা হয়, তাকে ডায়োড বলে এবং তার

এন পি এন

৫নং চিত্র।
ইলেকট্রন নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

ভিতর শুধু একটি অ্যানোড ও একটি ক্যাথোড থাকে। একে পরিবর্ধকরূপে ব্যবহার করতে হলে অ্যানোড ও ক্যাথোড-এর মাঝামাঝি জায়গায় গ্রিড ব্যবহার করা হয়। তখন ঐ যন্ত্রের নাম হয়—ট্রায়োড। সেমিকণ্ডাক্টরকে যখন পরিবর্ধক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন পরিশোধনের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রের সঙ্গে আর একটি জিনিস যোগ করা হয় এবং তখন একে সেমিকণ্ডাক্টর ট্রায়োড বা ট্র্যানজিস্টর বলে। দুই পাশে দুটি এন-টাইপের জার্মেনিয়ামের মাঝে একটি পি-টাইপের জার্মেনিয়াম যোগ করতে হয় (৪নং চিত্র)।

এভাবে দুটি সেমিকণ্ডাক্টর ডায়োডকে পাশাপাশি রাখা হলো। একটির সঙ্গে ব্যাটারীর সামনের দিকে যোগ করা হলো ও অপরটিকে বিপরীত দিকে যোগ করা হলো। ফলে প্রথম

ডায়োডটির সীমারেখায় তড়িৎ প্রতিবন্ধক খুবই কম হবে, কিন্তু দ্বিতীয় ডায়োডটির সীমান্ত রেখায় ঐ বাধা ভীষণ বেড়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত পরিবর্ধিত আকারে তড়িৎ-প্রবাহ পাওয়া যাবে (৫নং চিত্র)।

ইলেকট্রনিক কম্পিউটরে পূর্বে প্রায় ১২৫০টি ভাল্ভ-এর দরকার হতো। কিন্তু এখন সেমিকণ্ডাক্টর ব্যবহার করায় বিদ্যুৎশক্তি প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ কম লাগে। আগে যেখানে লাগতো ৬·২ কিলোওয়াট, এখন সেখানে লাগে মাত্র ৩১০ ওয়াট। অথচ যন্ত্রের আকার আগের চেয়ে অর্ধেক ও বর্তমানে আর কৃত্রিম উপায়ে একে ঠাণ্ডা রাখতে হয় না। তাছাড়া এগুলি আগের চেয়ে বেশী দিন টেঁকে।

সেমিকণ্ডাক্টরের প্রয়োগ কেবলমাত্র বেতার ইঞ্জিনীয়ারিং-এ সীমাবদ্ধ নয়, বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু ব্যাপারে এর প্রয়োগ লক্ষণীয়। সেমিকণ্ডাক্টরের বিদ্যুৎ-পরিবহন ক্ষমতা তাপের সঙ্গে পরিবর্তনশীল বলে এর সাহায্যে এমন যন্ত্র তৈরী করা সম্ভব, যা দিয়ে তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। এদের বলা হয় থার্মিষ্টর। এর সাহায্যে ০°০০০৫° ডিগ্রী তাপ পরিবর্তনও লক্ষ্য করা সম্ভব। তাছাড়া সেমিকণ্ডাক্টরের দৌলতে তাপ-শক্তিকে সহজে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়।

অদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে, যখন এই সেমিকণ্ডাক্টরের কল্যাণে থার্মোইলেকট্রিক ব্যাটারী শীতকালে ঘর গরম রাখবে আর গরমকালে ঠাণ্ডা রাখবে। বর্তমানে এই জিনিষটির অদ্ভুত ধর্ম সম্বন্ধে এত নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে যে, আগামী দিনে প্রাত্যহিক ব্যাপারে এর ব্যবহার হবে অপরিহার্য।

প্যাঁচার কথা

শ্রীদেবব্রত মণ্ডল

আমাদের দেশের পাখীর মধ্যে প্যাঁচার সঙ্গে প্রায় অনেকেরই পরিচয় তেমন নেই। কারণ দিনের বেলায় প্যাঁচার দেখা পাওয়া খুব কঠিন—দৈবাৎ দিনের বেলায় এদের দেখা যায়। এরা নিশাচর শিকারী পাখী—শিকারের খোঁজে রাত্রিতে একাকী ঘুরে বেড়ায়, কখনও দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে না।

কথায় বলে—প্যাঁচার মত জ্ঞানী। বোধহয় ভারিক্কী চাল-চলনের জন্যে তাদের জ্ঞানী বলা হয়। আসলে প্যাঁচা খুব নির্বোধ পাখী—সহজেই শত্রুর ফাঁদে পা দিয়ে বিপদ বরণ করে। বাচ্চা অবস্থায় পোষ মানিয়ে দেখা গেছে, প্যাঁচা দিব্যি পোষ মানে—বড় হয়েও সে পালককে ছেড়ে যেতে চায় না।

প্যাঁচা সাধারণ পাখী হলেও এদের মুখের গড়ন অন্যান্য পাখীর তুলনায় একেবারে পৃথক। দেখেই মনে হয়—কিম্ভুতকিমাকার। প্যাঁচার মুখাকৃতি যেন একখানা গোলাকার চ্যাপ্টা থালার মত। শিকারী বেড়ালের চোখের মত মাঝখানে বড় বড় গোলাকার দুটি ড্যাবডেবে চোখ। চোখের চতুর্দিকের ছোট ছোট পালকগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, দেখে মনে হয়—ঠোঁটটা যেন নাকের মত উঁচু হয়ে আছে। এদের দৃষ্টিশক্তি এবং শ্রবণশক্তি খুবই প্রখর। শিকার এদের চোখে ধূলা দিতে কদাচিৎ সক্ষম হয়। শিকারের চলাফেরায় যদি কোন শব্দ হয়—তাহলেই এরা সহজে বুঝতে পারে। প্যাঁচার শিকারী পাখী হিসাবে খ্যাতি আছে। ছোট বড় নানা রকমের প্যাঁচা দেখা যায়। এদের

মধ্যে হুতোম প্যাঁচাই সব চেয়ে বড়। হুতোম প্যাঁচারও রকমারি আছে। এক রকমের হুতোম প্যাঁচার মাথার উত্তরদিকে পালকের ঝুঁটি থাকে। এই ঝুঁটি অনেকটা বিড়ালের কানের মত দেখতে। কান দুটি সাধারণতঃ খাড়াভাবে থাকে। প্যাঁচার চোখ দুটির গঠন-বৈচিত্র্যে সহজেই নজরে পড়ে। সমগ্র দেহের অনুপাতে চোখ দুটি খুবই বড়। এরা রাত্রিবেলায় শিকারের খোঁজে বেরোয়, দিনের বেলায় প্যাঁচাকে চোখ মেলা বা বোজা অবস্থায় অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায়। অনেকের ধারণা এরা দিনের বেলায় দেখতে পায় না; কিন্তু সেটা ঠিক নয়। দিনের বেলায় এদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হ্রাস পেলেও দেখতে খুব অসুবিধা হয় না।

পৃথিবীর নানা দেশে প্রধানতঃ দুই জাতের প্যাঁচা দেখা যায়—একরকম কুণো প্যাঁচা, আর একরকম ঝুঁটিওয়ালা বা ঝুঁটিশূন্য বুনো প্যাঁচা। এদের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে—কুণো প্যাঁচা—Strigidae এবং বুনো প্যাঁচা—Bubonidae। আবার এই দুই জাতের প্যাঁচার মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর দু-শয়েরও বেশী প্যাঁচা দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় প্যাঁচার আকৃতি-প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়।

বুনো প্যাঁচা।

কুণো প্যাঁচারা অধিকাংশই ঘরের কোণে, পুরনো বাড়ীর ফাটলে, পরিত্যক্ত গুদামে বা অন্য কোন নিরিবিলি জায়গায় বাসস্থান নির্বাচন করে। কুণো প্যাঁচার দেহাকৃতি বুনো প্যাঁচার তুলনায় অনেক ছোট।

ঝুঁটিওয়ালা বুনো প্যাঁচারা বড় বড় গাছের কোটরে বাসা তৈরী করে। এদের বাসা তৈরীর উপাদান খুবই সামান্য। সাধারণতঃ অর্ধভুক্ত পাখীর পালক, হাড়গোড় প্রভৃতির সঙ্গে সামান্য ঘাসপাতা বা খড়কুটা সংগ্রহ করে এরা বাসা তৈরী করে। কিন্তু বাসা তৈরীর মধ্যে কোন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেউ কেউ আবার অন্যের পরিত্যক্ত বাসায় আশ্রয় নেয়। আবার কোন কোন জাতের প্যাঁচা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বা অন্য কোন প্রাণীর গর্তে বাস করে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে সুরু করে শীতপ্রধান দেশ পর্যন্ত—পৃথিবীর সর্বত্র প্যাঁচা দেখতে পাওয়া যায়। এই সব প্যাঁচারা সাধারণতঃ লম্বায় ছয়-সাত ইঞ্চি থেকে ছ' ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। অধিকাংশ প্যাঁচার গায়ের রং সামান্য সাদা ও ধূসর রঙে মিশ্রিত। তবে ধূসর, বাদামী, হল্‌দে, সোনালী এবং সাদা রঙের প্যাঁচাও দেখা যায়। এদের সর্বশরীর—এমন কি, পায়ের নখগুলি পর্যন্ত পালকে ঢাকা থাকে। এদের পায়ে বাঁকানো শক্ত নখ আছে। প্যাঁচার নখ এবং বাঁকানো ঠোঁটই হচ্ছে শিকার ধরবার হাতিয়ার। নখগুলি এত ধারালো ও শক্তিশালী যে, শিকার একবার এদের কবলে পড়লে অক্ষত দেহে মুক্তি পেতে পারে না। নখ দিয়ে এমন করে আঁকড়ে ধরে যে, নখ ছাড়িয়ে নেওয়া রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

কুণো প্যাঁচা

প্যাঁচা ইঁদুরের মারাত্মক শত্রু। ইঁদুর দেখলে আর কথা নেই—যে কোন রকমেই হোক তাকে আক্রমণ করবেই। কোথায়ও কোথায়ও ইঁদুরের উৎপাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে প্যাঁচার সাহায্য নেওয়া হয়। দিনের তুলনায় রাত্রিতেই ইঁদুরের উৎপাত বেশী হয়। এছাড়া ফসলের ক্ষতিকর

অনেক পোকামাকড়ও এরা উদরসাৎ করে। কোন কোন জাতের পঁ্যাচা হাঁস, মুরগী প্রভৃতিকেও আক্রমণ করতে ইতস্ততঃ করে না। পালকেরা নানারকম ব্যবস্থায় এদের আক্রমণ থেকে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা রক্ষা করে। পঁ্যাচা ব্যাং, মাছ, নানাবিধ পাখীও শিকার করে খায়।

আক্রমণ-স্থলে এরা শিকার উদরসাৎ করে না। নখের সাহায্যে শিকারকে বাসায় নিয়ে আসে। আহারের সময় এরা হিস্ হিস্ শব্দ করে। ভোজনপর্ব সমাধা করবার পর বাসার কাছেই শিকারের হাড়গোড়, পালক ইত্যাদি জড়ো করে রাখে। কখনও কখনও ছোট ছোট প্রাণীর স্তূপীকৃত হাড়গোড় দেখে টের পাওয়া যায়—সেখানে পঁ্যাচার বাসা আছে। ওড়বার সময় পঁ্যাচার ডানার কোন শব্দ হয় না। ফলে হতভাগ্য শিকার আক্রান্ত হবার পূর্বে শত্রুর আগমন টের পায় না। পঁ্যাচার বাসস্থান নির্ণয় করা অনেক সময় সহজসাধ্য হলেও এদের দেখা পাওয়া কঠিন। কারণ এদের গায়ের কটা রং বাসস্থলের রঙের সঙ্গে এমনই মিশে যায় যে, সহজে এদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোন শব্দ না করে এমনভাবে আত্মগোপন করে থাকে যে, খুব কাছে গেলেও সহজে বোঝা যায় না, সেখানে পঁ্যাচা বসে আছে। এই আত্মগোপনের ক্ষমতার জন্যে এরা সহজেই শত্রুর চোখে ধূলি দিতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে—পঁ্যাচা দিনের আলো সহ্য করতে পারে না—চোখ বন্ধ করে নিদ্রা যায় বা চুপচাপ বসে থাকে। শত্রুর আগমন টের পেলে—তাদের ড্যাবড্যাবে চোখ দুটা মেলে মাথা দুলিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে থাকে। এই সময় তাদের ঝুঁটির পালক খাড়া হয়ে ওঠে। সর্বদাই বিপদের আশঙ্কায় সতর্ক থাকে। এদের চোখ বড় এবং দৃষ্টিশক্তি প্রখর হওয়া সত্ত্বেও একপাশে সরে দাঁড়ালে পঁ্যাচা ঠিক ভালভাবে দেখতে পায় না। শত্রুর গতিবিধি দেখে এরা আত্মরক্ষা বা পাল্টা আক্রমণের জন্যে উদ্যোগী হয়। এই সময় পঁ্যাচার মুখভঙ্গী অদ্ভুতাকার ধারণ করে।

শত্রু কাছাকাছি এসে পড়লে পঁ্যাচা সাপের মত ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে থাকে এবং ঠোঁট দিয়ে খট্‌খট্ আওয়াজ করে শত্রুর মনে ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করে। এসব সত্ত্বেও শত্রু যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়—তবে পঁ্যাচা পালাবার চেষ্টা করে এবং উড়ে গিয়ে গাছপালার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। চোখের সামনে উড়ে গিয়ে অন্যস্থানে বসলেও শত্রু সহজে এদের খুঁজে বের করতে পারে না। গায়ের ধূসর ও কালো ডোরার জন্যে ডালপালার মধ্য থেকে খুঁজে বের করা কঠিন। কিন্তু নির্বুদ্ধিতার জন্যেই এরা শেষ রক্ষা করতে পারে না—শত্রুর হাতে ধরা পড়ে।

কাক পঁাচাকে খুবই উত্যক্ত করে—একবার যদি পঁ্যাচার দেখা পায়, তবে আর কথা নেই। সবাই মিলে এক সঙ্গে কর্কশ স্বরে চীৎকার করে তাড়া করে এবং সুবিধা পেলেই ঠোক্‌রাতে থাকে। পঁ্যাচার কোটরে ছানা ধরবার জন্যে হাত ঢুকিয়ে যাদের পঁ্যাচার ঠোঁটের দংশনে রক্তপাত হয়, তাদের পঁ্যাচার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ধারণা জন্মে যে, সাপে কামড়েছে। এই ভীতির ফলে অনেকে গাছ থেকে পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে—ইঁদুর হচ্ছে পঁ্যাচার প্রিয় খাদ্য। পঁ্যাচার বাসার আশেপাশে নেংটি ইঁদুর কদাচিৎ দেখা যায়। বাসায় বাচ্চা থাকলে এদের খাদ্য সংগ্রহের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। প্রতি দশ-বারো মিনিট বাদে বাদে পঁ্যাচা এক একটা শিকার ধরে বাসায় নিয়ে আসে। অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে পঁ্যাচা শিকারের সন্ধানে বহির্গত হয়। শিকারে প্রবৃত্ত হবার আগে—এরা গাছের উঁচু ডালে বসে গুরুগম্ভীর স্বরে কিছুক্ষণ ডাকতে থাকে। তারপর শিকার ধরতে যায়।

অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এরা জলের উপরে সন্তরণকারী মাছকে ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যায়। সময় সময় দুটি প্যাঁচা একত্রিত হলেই মারামারি, ঝগড়াঝাটি সুরু হয়। দুজনেই কর্কশ স্বরে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করতে থাকে এবং পরস্পরকে ভয় দেখাবার জন্যে ঠোঁট দিয়ে খটখট আওয়াজ করে। কখনও কখনও এক প্রকার অদ্ভুত কিচির-মিচির শব্দ করতে শোনা যায়। রাত্রির প্রহরে প্রহরে দুটি প্যাঁচা একত্রে কিচির-মিচির শব্দ করে ডাকে। কখনও কখনও বিড়ালের মত 'মিউ মিউ' শব্দ করে।

ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ঈগল-প্যাঁচা নামে এক জাতের হুতোম প্যাঁচা দেখা যায়। এরা নিঃশব্দে উড়ে গিয়ে খরগোস, ছাগল-ছানা প্রভৃতিকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। উত্তর মেরু সন্নিহিত বরফে ঢাকা অঞ্চলে এক জাতের সাদা প্যাঁচা দেখা যায়। এদের মাথায় পালকের ঝুঁটি নেই। এরা ছোট ছোট প্রাণী শিকার করে উদরসাৎ করে।

সাধারণতঃ আমাদের দেশে দু-তিন রকমের প্যাঁচা দেখা যায়। ছোট ছোট প্যাঁচাদের মধ্যে ধূসর রঙের প্যাঁচাই বেশী। হুতোম প্যাঁচারা প্রায় দেড় ফুটেরও বেশী বড় হয়। আমাদের দেশের সাদা প্যাঁচাকেই লক্ষ্মী-প্যাঁচা বলা হয়। কালো অথবা ধূসর বর্ণের ছোট প্যাঁচাকে কাল-প্যাঁচা বা নিমপ্যাঁচা বলা হয়ে থাকে। কাল-পুরুষকে লোকে যমরাজ বলে জানে। কাক ও প্যাঁচা নাকি যমরাজের দূত। কাকেরা দিনের বেলায় এবং প্যাঁচারা রাত্রিবেলায় যমরাজের দূতের কাজ চালায়। সম্ভবতঃ এই জন্যেই সাধারণের মধ্যে প্যাঁচা সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার আছে—এদের বিড়ালের মত মিউ মিউ বা নিম নিম শব্দ নাকি যমরাজকে ডেকে আনবার সঙ্কেত। এই সব কারণে প্যাঁচাকে লোকে ভয় করে।

জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমাদের দেশে ছোট ছোট প্যাঁচা কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু জ্যোৎস্না রাত্রিতে হুতোম প্যাঁচা প্রায়ই দেখা যায়। পল্লীগ্রামে বড় বড় গাছের উপরে বা একটু নিরিবিলি জায়গায় সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ বাদে হুতোম-প্যাঁচার দেখা পাওয়া যায়। কোন কোন অঞ্চলে এরা 'ভুতুম' নামে পরিচিত। প্রত্যহই সন্ধ্যার সময় এরা যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে গুরু-গম্ভীর শব্দে "বুবুমবুম" শব্দে ডাকতে থাকে। বহুদূর থেকে এই আওয়াজ শোনা যায়—এই আওয়াজ কর্কশ নয়। ঘনায়মান অন্ধকারের নিস্তব্ধতার সঙ্গে হুতোম প্যাঁচার এই গুরুগম্ভীর শব্দের একটা সঙ্গতি অনুভব করা যায়। কেউ কেউ বলেন—হুতোম প্যাঁচারা এই ডাকের দ্বারা 'মগরেবের' আজান দেয়। এই ডাকের সময় হুতোম প্যাঁচাকে পরিষ্কার দেখা যায়। ডাকবার সময় এদের ঠোঁটের নীচ থেকে গলা ও গাল ফুলে একটা বলের আকার ধারণ করে। তখন এদের চেহারা আরও ভয়ঙ্কর দেখায়।

স্ত্রী প্যাঁচা ৩।৪ থেকে ৭।৮টি পর্যন্ত গোলাকার সাদা রঙের ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ এরা এক সঙ্গে সব ডিম পাড়ে না। কিছুদিন বাদে বাদে ডিম পাড়ে। এজন্যেই এদের বাসায় বাচ্চার পাশে দেখা যায় আরও কয়েকটি ডিম রয়েছে। বাচ্চার আহার যোগান এবং ডিমে তা' দেওয়া এক সঙ্গেই চলতে থাকে। ডিম ও বাচ্চার খবরদারীর জন্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কখনও কখনও দেখা যায়, স্ত্রী ও পুরুষ এক সঙ্গে ডিমে তা' দিচ্ছে।

বিজ্ঞান-সংবাদ

প্লাস্টিক সার্জারির মারফৎ বালকের কান লাভ

পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটি গ্রীক বালকের সম্প্রতি বৃটেনে চিকিৎসা হয়। তাহার কান বা কানের ছিদ্রপথ বলিয়া কিছুই ছিল না। চিকিৎসার পর বালকটি কান লাভ করিয়া জুলাই মাসের শেষে তাহার দেশ এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। কান লাভ করিবার ফলে এখন সে দেখিতে স্বাভাবিক একজন মানুষের মতই হইয়াছে।

বালকটি হইল এরিস্টাইড্‌স্ গোলিয়েলমো। তাহার মাতা তাহাকে গত অক্টোবর মাসে বৃটেনে লইয়া আসেন। এই সময় হইতে সে অক্সফোর্ডের চার্চিল হাসপাতালে একজন প্লাস্টিক সার্জনের অধীনে চিকিৎসিত হইয়া আসিয়াছে। এই নয় মাসে তাহার উপর ১২ বার অপারেশন হইয়াছে। এখন তাহার হিয়ারিং এইড-এরও কোন প্রয়োজন নাই। সে ইহা ছাড়াই স্বাভাবিক একজন মানুষের মত শুনিতে পাইতেছে।

বালকটির পাঁজরার শেষাংশের কার্টিলেজ বা তরুণাস্থি লইয়া তাহার দুইটি কান তৈয়ার করা হইয়াছে এবং গ্র্যাফটিং-এর জন্য চামড়া লওয়া হইয়াছে তাহার শরীরের অন্য অংশ হইতে। কানের ছিদ্রপথ তৈয়ারির জন্য কর্ণ-নাসিকা-গলদেশ বিশেষজ্ঞকে দুইবার অপারেশন করিতে হয়।

এই ধরণের অপারেশন পূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু নয় মাসে তাহা কখনও সম্পূর্ণ করা যায় নাই। সাধারণতঃ একটি কান তৈয়ারিতে সময় দরকার এক বৎসর।

গোলিয়েলমোর এই দুরবস্থার প্রতি এথেন্সের বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী লেডি মারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে তিনি লণ্ডনের ইণ্টারন্যাশন্যাল হেল্প ফর চিলড্রেন ফাণ্ডের সাহায্য চাহিয়া পাঠান।

এই তহবিলটি একটি স্বেচ্ছা-সংগঠনের। ১৯৪৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের যে সকল শিশুকে সাহায্য করিবার কেহ নাই, সেই সকল শিশুকে সাহায্য করাই ইহার উদ্দেশ্য। তহবিলটি বালকটিকে চার্চিল হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দিবার সর্বরকম ব্যবস্থা করিয়া দেয় এবং এই নয় মাস ধরিয়া বালকটি ও তাহার মাতার শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জরুরী হাসপাতাল হিসাবে এই চার্চিল হাসপাতালটি নির্মিত হয়। সার উইনস্টন চার্চিলের নামানুসারে ইহার নামকরণ হয়। ইহা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ হাসপাতালের অঙ্গ।

তৈল নিক্ষেপ করিয়া মরু অঞ্চলগুলিতে বৃক্ষ উৎপাদনের প্রয়াস

'এসো' পেট্রোলিয়াম গবেষণার বিজ্ঞানীরা (যাঁহারা বৃটনে, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মরু অঞ্চলগুলিতে তৈল ব্যবহার করিয়া বালুকা চলাচল বন্ধ করা সম্পর্কে পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছেন) পশ্চিম জার্মেনীর অন্তর্গত ফ্রাঙ্কফুর্টে ষষ্ঠ বিশ্ব পেট্রোলিয়াম কংগ্রেসে তাঁহাদের গবেষণার ফলাফল উৎসাহ-ব্যঞ্জক বলিয়া জানাইয়াছেন।

এই গবেষণার অধিকাংশই পরিচালিত হয় বার্কশায়ারের অন্তর্গত এবিংডনের 'এসো' রিসার্চ লেবরেটরিসমূহে। সাহারা হইতে সংগৃহীত বালুকা লইয়া প্রস্তুত বালিয়াড়ি লেবরেটরিতে উইণ্ড টানেল টেস্টে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়াম তৈলের সাহায্যে বালিয়াড়িটিকে স্থিতিশীল করিবার পর দেখা যায়

বায়ুর গতিবেগ উত্তর আফ্রিকায় বায়ুর গতিবেগ অপেক্ষা অধিক হইলেও (উত্তর আফ্রিকার কোন কোন স্থানে বায়ুর গতিবেগ হইল ৬০ হইতে ৭০ মাইল) বালুকা স্থানান্তরিত হয় না এবং তাহা স্থিতিশীল থাকে। ব্যবহৃত তৈলের পরিমাণ ও গুণ এবিংডনের উইণ্ড টানেলে গৃহীত পরিমাপের ভিত্তিতে স্থির করা হয়।

'এসো' জানাইয়াছেন যে, এই পদ্ধতিতে ট্রিপলিটানিয়ায় ইতিমধ্যে সাফল্যের সহিত অ্যাকশিয়া ও ইউক্যালিপটাসের চারাগাছ সংরক্ষণ করা গিয়াছে। বালিয়াড়িগুলির উপর তৈল নিক্ষেপ করিয়া বালুকার চলাচলের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয় এবং এইভাবে গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা রক্ষা করা হয়। এক বৎসরের মধ্যে চারাগাছগুলি ছয় ফুট লম্বা হয় এবং তাহারা নিজেরাই বায়ুর বেগ প্রতিরোধ করিবার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে।

এই পরীক্ষার ফলে পশ্চিম সিরিয়ায় ৫০ হেক্টর পরিমাণ বালিয়াড়ি স্থিতিশীল করিবার এক কন্ট্রাক্ট লাভ করা গিয়াছে।

পিলানি ও বিকানীরের (রাজস্থান) মরু অঞ্চলেও পরীক্ষা-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। আর্জেন্টিনায় পরীক্ষা পরিচালিত হইয়াছে লনা পাম্পা ও বুয়েনস আয়ারসে এবং কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইয়াছে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম টেক্সাসে।

'এসো'র গবেষণা-কর্মীগণ দাবী করিয়াছেন যে, তৈল নিক্ষেপের ফলে কোন কোন স্থানে ঘাস পর্যন্ত জন্মাইয়াছে।

চীর গাছের পাতা হইতে পশম

আসাম হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত হিমালয় পর্বতমালার নিম্নাঞ্চল বরাবর প্রচুর পরিমাণে পাইন বা চীর গাছ জন্মিয়া থাকে। এই গাছ হইতে তার্পিন তেল ও ধূপ তৈরী করা হয়। বড় বড় চীর গাছ কাটিয়া তাহার কাঠ দিয়া প্যাকিং বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

চীর গাছের পাতা সাধারণতঃ ফেলিয়া দেওয়া হয়। তবে কোনও কোনও স্থানে পাতন যন্ত্রের সাহায্যে পাতা হইতে উদ্বায়ী তৈল প্রস্তুত করা হয়। এখন পর্যন্ত ইহা কুটীরশিল্পের পর্যায়েই রহিয়া গিয়াছে।

পাতনের পর যে আঁশযুক্ত পাতা পাওয়া যায়, তাহা হইতে পাইন-উল বা চীর-পশম তৈরী করা সম্ভব হইয়াছে। ইহার দ্বারা গদি, তোষক প্রস্তুত করা যায় এবং শুভ্র চীর-পশম দিয়া মোটা কাপড়ও বোনা চলিতে পারে।

পরিত্যক্ত চীর-পাতা লোহার কড়াইয়ে শতকরা ২ ভাগ কষ্টিক সোডাযুক্ত জলে প্রায় আধ ঘণ্টা সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে আঁশ পৃথক হইয়া যায়। পৃথক করিয়া লইবার পর আঁশগুলি পরিষ্কার জলে কয়েকবার ধুইয়া লইলে বর্ণহীন আঁশ পাওয়া যায়। চীর-পশম হইল এই শুষ্ক আঁশ।

জম্মুর আঞ্চলিক গবেষণাগার এই পশমকে ব্লিচ করিয়া সাদা পশম প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রথমে আঁশগুলি ৭ শতাংশ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ১৫ মিনিট কাল ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তারপর ধৌত করিয়া সেগুলিকে ০.৫ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে ২ ঘণ্টাকাল রাখিতে হয়। পুনরায় ধৌত করিয়া সামান্য অম্লযুক্ত ৩২.৫ শতাংশ ব্লিচিং পাউডার দ্রবণে আধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহার পর আঁশগুলি ভাল করিয়া ধুইয়া লইলে সাদা চীর-পশম পাওয়া যায়। এই পশমকে রং করাও চলে।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

অক্টোবর—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ : দশম সংখ্যা
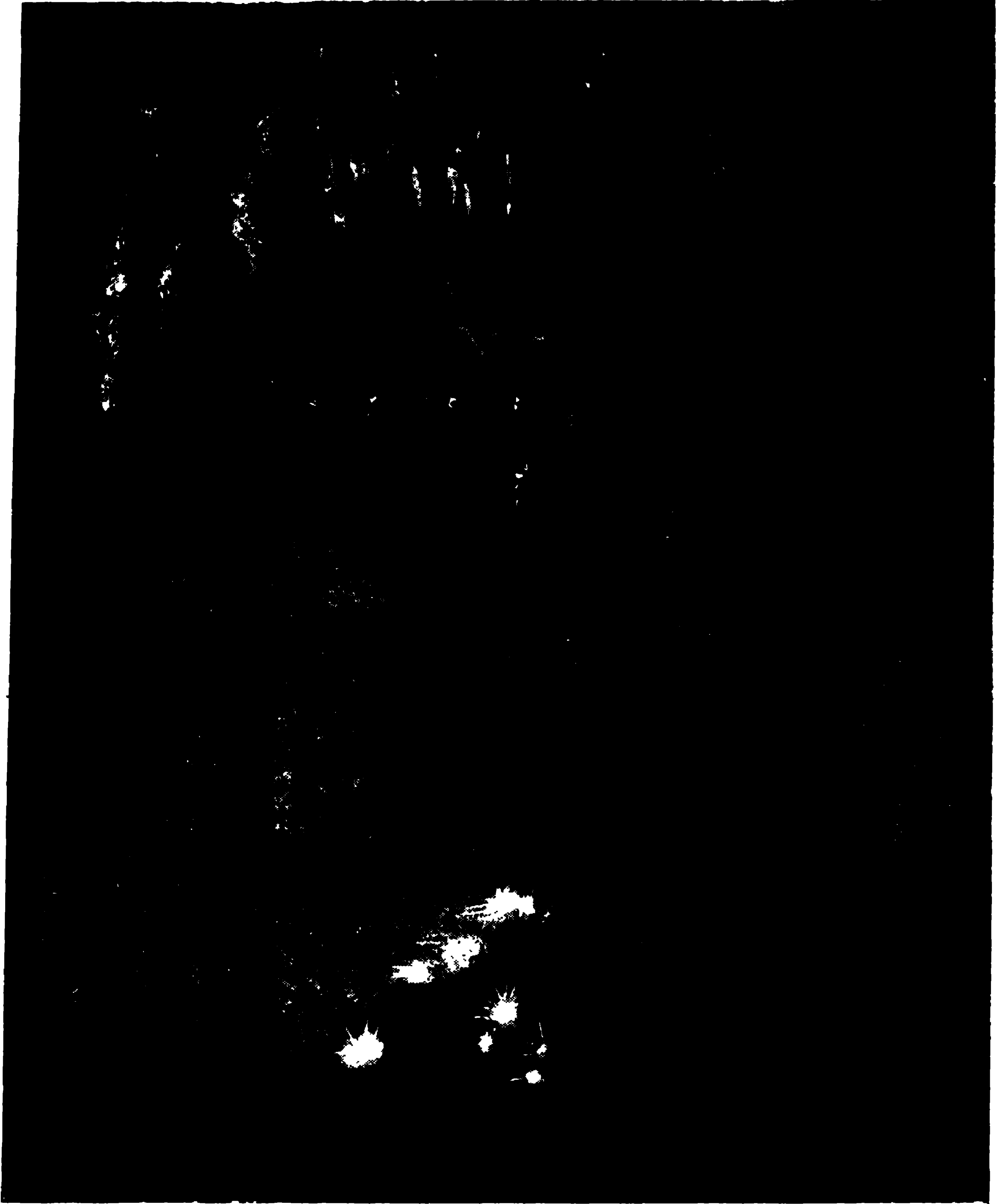
গাছপালায় আচ্ছাদিত বনভূমিতে আলো-দেওয়া ব্যাঙের ছাতা। এই ব্যাঙের ছাতার উপরের ছত্রাকার অংশটি প্রস্ফুটিত হইলেই তাহার নীচের দিক হইতে স্নিগ্ধ নীলাভ আলো নির্গত হইতে দেখা যায়।

তারকার বিস্ফোরণ

অনেক ক্ষেত্রেই বিস্ফোরণের আগে তারকা এত ক্ষীণ থাকে যে, একে খালি চোখে দেখা যায় না। তাই টেলিস্কোপ আবিষ্কারের আগে জ্যোতির্বিদেরা মনে করতেন—আকাশে নিশ্চয়ই একটা নতুন তারকার জন্ম হয়েছে। এই কারণেই তাঁরা তারকার বিস্ফোরণের নাম দিয়েছিলেন নোভা বা নবতারকা।

খৃষ্টের জন্মের সময়ে বেথলেহেমের আকাশে যে উজ্জ্বল তারকাটি কয়েক দিনের জন্যে দেখা গিয়েছিল, সেটা একটা নোভা। তবে প্রথম ঐতিহাসিক নোভার খবর পাওয়া যায়, ডেনমার্কের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকো ব্রাহীর লেখায়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি আকাশে একটা অতি উজ্জ্বল নোভা দেখতে পেয়েছিলেন। সেই নোভাটা প্রায় শুকতারার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে আর একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর একটি নোভা দেখেছিলেন। তারপর কয়েক শতাব্দী ধরে খালি চোখে দেখা যায়, এরকম কোন তারকার বিস্ফোরণ ঘটে নি। শেষে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অ্যাকুইলা রাশিতে আবার একটা নোভা দেখা যায়। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা হলো লুব্ধক। এই নোভাটা কিছুদিনের জন্যে লুব্ধকের চেয়েও বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

নোভাগুলি সাধারণতঃ সূর্যের চেয়ে ২৫০০০ থেকে ২০০০০০ গুণ বেশী উজ্জ্বল হয়। মহাকাশে অসংখ্য তারকা আছে বলেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাদের বিস্ফোরণ সম্বন্ধে গবেষণা করতে পেরেছেন। আমাদের গ্যালাক্সিতে বছরে কুড়িটি নোভার আবির্ভাব হয়; কিন্তু আমাদের গ্যালাক্সির বাইরে আরও যে সব গ্যালাক্সি আছে, তাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এরূপ বিস্ফোরণ ঘটে থাকে। এই ধারণার বশেই অধ্যাপক জুইকি আকাশে সুবিধামত কয়েক শত এক্সট্রা-গ্যালাকটিক নীহারিকা বেছে নেন এবং প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই তাদের ছবি তুলতে থাকেন, স্পিড ক্যামেরা দিয়ে। মাস দুয়েক পরে ১৯৩৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে সুদূর এক নীহারিকায় একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এই নীহারিকাটির নাম এন, জি, সি-৪১৫৭ এবং সেটা পৃথিবী থেকে পঁচিশের পিঠে আঠারোটা শূন্য দিলে যত মাইল হয়, ততদূরে ছিল। বিস্ফোরণটা আসলে সেদিন রাত্রেই ঘটে নি—যে দিন ঘটেছিল, সে দিন অধ্যাপক জুইকি তো দূরের কথা—পৃথিবীতে মানুষেরই জন্ম হয় নি। কেন না, অতদূর থেকে আলো আসতে সময় লেগেছে প্রায় ৪০ লক্ষ বছর। অতদূর থেকে যখন অতখানি আলোর ঝলক ফটোগ্রাফির প্লেটে ফুটে উঠেছে, তখন বিস্ফোরণটা নিশ্চয়ই ভীষণ রকমের। একে সুপারনোভা বলা হয়।

প্রথম সুপারনোভার সাক্ষাৎ মিলেছিল ১৮৮৫ সালে অ্যানড্রোমিডা নীহারিকায়। ১৮৮৫ সালের পর থেকে আরও অনেক সুপারনোভা দেখা গেছে। একটা গ্যালাক্সিতে তো মাত্র ১৬ বছরের মধ্যেই তিন তিনটি সুপারনোভা দেখা গিয়েছিল। সাধারণতঃ প্রতি গ্যালাক্সিতে ৬০০ বছর অন্তর একটা করে সুপারনোভার সৃষ্টি হয়।

বিস্ফোরণের ফলে তারাগুলির চারপাশ থেকে একটা কুণ্ডলী ঠিক্‌রে বেরিয়ে এসে ক্রমশঃ প্রসারিত হতে থাকে। কখনও কখনও বিভিন্ন গতিতে দু-তিনটি কুণ্ডলীও বেরিয়ে আসে। এই বাষ্পীয় কুণ্ডলীর প্রসারণের গতি, নোভার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ছ শ' মাইল। সুপারনোভার বেলায় কিন্তু এই প্রসারণের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০০ মাইলের চেয়েও বেশী হতে দেখা গেছে। বিস্ফোরণের কিছুদিনের মধ্যে তারকাগুলি যে যার নিজের চেহারা ফিরে পেলেও তাদের চারপাশে বাষ্পের কুণ্ডলীর প্রসারণ তখনও চলতে থাকে। এই কুণ্ডলী সমেত তারকাগুলিকে একটা ভুল নামে প্ল্যানেটারি নেবুলা বলা হয়। বিস্ফোরণের ফলে তারকা থেকে শুধু যে বাষ্পের কুণ্ডলী বেরিয়ে আসে তাই নয়, কখনও কখনও অনেক বেশী দুর্ঘটনাও ঘটে। ১৯৩৪ সালে হারকিউলিস নক্ষত্রের কাছে একটা নোভা দেখা গিয়েছিল। সুপারনোভার বিস্ফোরণ এত প্রচণ্ড যে, তার ফলে বোধ হয় সমগ্র তারকাটিই বাষ্পে পরিণত হয়ে যায়। তার প্রকৃষ্ট নমুনা ক্র্যাব নীহারিকা। সিগ্‌নাস্‌ রাশিতে সরু তারের মত যে নীহারিকাটি দেখা যায় সেটার সুপারনোভা থেকেই জন্ম হয়েছে।

কিন্তু আমাদের সূর্যও তো আসলে একটা তারকা। সেও তো একদিন ফেটে যেতে পারে। সূর্য ফাট্‌লে পৃথিবীর চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আজ অবধি যত নোভা ও সুপারনোভার সাক্ষাৎ মিলেছে, প্রত্যেকেরই আদি রং হয় উজ্জ্বল সাদা, না হয় নীলাভ। সুতরাং মাঝারি উত্তপ্ত হল্‌দে সূর্যের বিস্ফোরণের নিশ্চয়ই এখনও সময় হয় নি। আমরা জানি, আমাদের গ্যালাক্সিতে প্রতি বছর প্রায় ২০টা করে নোভা দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকদের মতে, মহাবিশ্বের বয়স ৬০০ কোটি বছর। সুতরাং এই ছ-শ' কোটি বছরে আমাদের গ্যালাক্সিতেই ১২০০০ কোটি তারকার বিস্ফোরণ ঘটেছে। কিন্তু আমাদের গ্যালক্সিতে তারকা আছে মাত্র ১০০০০ কোটি। আমাদের সূর্যের বিস্ফোরণ যদিও বা ঘটে, যে হারে বিজ্ঞানের উন্নতি হচ্ছে, তাতে আশা করা যায়, ততদিনে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীটাকে সৌরজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাবার কায়দা আয়ত্ত করতে পারবেন।

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

জান কি?

মৌমাছির রাসায়নিক কারখানা

ছোট মৌচাকটির মধ্যে হাজার হাজার মৌমাছি বড়ই কর্মব্যস্ত—তাদের বীক্ষণাগারে নানা রকম রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করতে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে আমাদের অতি পরিচিত মধু। এই বীক্ষণাগারটি চলে প্রধানতঃ তিনটি উপাদান নিয়ে—জল, ফুলের পরাগ আর ফুলের মিষ্ট রস। এই তিনটি অতি সাধারণ উপাদান নিয়ে তারা মধু তৈরী তো করেই, তাছাড়া ফরমিক অ্যাসিড, মোম আর তাদের শিশুদের উপযোগী বিবিধ খাদ্যও প্রস্তুত করে।

ফুলে ফুলে ঘুরে মৌমাছি তার সংগৃহীত মিষ্ট রস পাকস্থলীর সঞ্চয়-কোষে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আমাদের ব্যবহার উপযোগী মধুতে পরিণত করে। এই কাজটি সম্পন্ন হয় মৌমাছির চাকে ফেরবার পথে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে। চাকে ফিরে মৌমাছি সেই মধু ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে সঞ্চয় করে এবং তাতে কিছু ফরমিক অ্যাসিড দিয়ে দেয় সংরক্ষণের জন্যে। মৌচাকের কক্ষগুলি জলনিরোধক ও তাপনিয়ন্ত্রিত। এই মধুর গুণাগুণ নির্ভর করে বিভিন্ন ফুলের মিষ্ট রসের উপাদানের উপর।

মোম তৈরীর পদ্ধতিটা আরও জটিল। কতকগুলি মৌমাছি অতিরিক্ত মধু পান করে মৌচাকের কোন দৃঢ়সংলগ্ন স্থানে ঝুলে থাকে। তাদের দেহের বিশেষ পেশীর সঞ্চালনে তলপেটের এক নির্দিষ্ট স্থান থেকে মোম নির্গত হয়। অন্যান্য মৌমাছিরা সেই মোম সংগ্রহ করে মৌচাক গঠন করে।

এরূপ রাসায়নিক কারখানা মৌমাছির শরীরের বিভিন্ন অংশে রয়েছে।

মধুমক্ষিকার সমবায় সমিতি

অবাক হবার কথা নয় কি? বুদ্ধিজীবী মানুষ যে সমবায় সমিতি সুশৃঙ্খলায় পরিচালনা করতে হিমশিম খেয়ে যায়, মৌমাছিরা তাই সুশৃঙ্খলায় চালিয়ে যাচ্ছে বছরের পর বছর।

মৌমাছি সামাজিক জীব। মৌচাকটি যেন এক বিশাল কারখানা—চারদিকে কর্মব্যস্ততা। একক কোন মৌমাছির সাধ্য নেই যে, মৌচাকের কোন সম্পদ একাকী ভোগ করে—যেমন তাদের কেউ একাকী পারে না মৌচাক তৈরী করতে বা তাতে মধু সংগ্রহ করতে। পরস্পরের সহযোগিতায় মোম তৈরী হয়, মৌচাক গড়ে ওঠে, আবার কক্ষে কক্ষে মধু সঞ্চিত হয়। মৌচাকের গঠন দেখলে বুঝা যায়—আকার, আয়তনে সবগুলি একই রকমের। মৌমাছি যেন স্থপতিবিদ্যাতেও পটু। কোন কোন

মৌমাছি আবার এক রকম ফিকে খয়েরী রঙের মোমের মত আঠালো পদার্থ তৈরী করে। তার সাহায্যে সিমেণ্টের মত তারা চাকের ফাটল, ছিদ্র প্রভৃতি বন্ধ করে।

একদল মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে কক্ষে সঞ্চয় করবার পর অপর একদল তা সংরক্ষণের জন্যে তাতে পরিমাণ মত ফরমিক অ্যাসিড ঢেলে দেয়। আর একদল তাদের ডানা দিয়ে বাতাস করতে থাকে, যাতে মধুর মধ্যে জল থাকলে সেই জল বাষ্প হয়ে নিঃশেষে বেরিয়ে যায়। পরস্পরের সহযোগিতা না থাকলে এত রকমারী কাজ একা কারোর পক্ষে করা সম্ভব নয়। এখানে সবাই কর্মব্যস্ত, সবাই যে যার কাজ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে করে যাচ্ছে। তাই তারা তাদের শ্রমের ফল ভোগ করে সবাই সমানভাবে। কাজেই মৌমাছির কাছ থেকে আমরা প্রেরণা গ্রহণ করতে পারি ?

শ্রীহৃষীকেশ রায়

কাচের কথা

আজ থেকে প্রায় ৩০০০ বছর আগে সর্বপ্রথম মিশরে কাচের আবিষ্কার হয়। এখন থেকে প্রায় ২০০০ বছর আগের মিশরের বেলিয়াসের মন্দিরের ইটে কাচের এনামেল করা ছিল। তার অনেক বছর পরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর কাচ শিল্পের প্রধান কেন্দ্ররূপে খ্যাতিলাভ করে। বর্তমান যুগে কাচশিল্পের অদ্ভুত উন্নতি হয়েছে। বস্তুতঃ কাচশিল্পই মানবের প্রথম রাসায়নিক শিল্প।

কাচ কি করে তৈরী করা হয় ?

কাচ কোন মৌলিক পদার্থ নয়। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে কাচ তৈরী হয়। তবে বিভিন্ন কাচের জন্যে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন।

কাচ সাধারণতঃ ছয় প্রকার। যথা—(১) নরম কাচ, (২) শক্ত কাচ, (৩) বোতলের কাচ, (৪) ফ্লিণ্ট কাচ, (৫) জেনা কাচ, (৬) পাইরেক্স কাচ।

এক এক রকম কাচ এক এক রকম উপাদানে তৈরী। আবার বিভিন্ন প্রকারের কাচ বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। যথা—

(১) নরম কাচের দ্বারা গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি, কাচের নল, জানালার কাচ ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এই কাচ বালি, সোডা ও চুনের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

(২) শক্ত কাচ উচ্চ তাপসহ যন্ত্রপাতি তৈরী করবার কাজে লাগে। এই কাচ বালি, পটাস ও চুনের মিশ্রণে উৎপন্ন হয়।

(৩) বোতলের কাচ, নরম কাচের উপাদানের সঙ্গে একটু লোহার অক্সাইড মিশ্রিত করে তৈরী করা হয়।

(৪) ফ্লিন্ট কাচ—এই বিশেষ ধরণের কাচের দ্বারা লেন্স, প্রিজম্, বৈদ্যুতিক বাতির বাল্‌ব, কৃত্রিম রত্ন ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এই কাচ তৈরী করতে বালি, পটাস, লেড অক্সাইড প্রভৃতির প্রয়োজন হয়।

(৫) জেনা একটি বিশেষ ধরণের কাচ। এই কাচ তৈরী করতে বেরিক অক্সাইড, বালি, জিঙ্ক অক্সাইড এবং অল্প পটাস প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়।

(৬) পাইরেক্স নামক বিশেষ ধরণের কাচ তৈরী হয় বেরিক অক্সাইড, বালি, অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও সোডা প্রভৃতি রসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে। যে ধরণের কাচ তৈরী করতে হবে, তাতে প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সঙ্গে পুরনো ভাঙ্গা কাচ মেশানো হয়। তারপর এক সঙ্গে সব কিছু মেসিনের মধ্যে ফেলা হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেসিন থেকে পদার্থগুলি চূর্ণ হয়ে বেরিয়ে আসে। এখন মিশ্রিত পদার্থকে বড় বড় পাত্রে ভরে প্রোডিউসার নামক একপ্রকার জ্বালানী গ্যাসের দ্বারা ১৪০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের মত উত্তপ্ত করা হয়।

এই অত্যধিক তাপে সমস্ত উপাদানগুলি গলে যায়। তারপর আস্তে আস্তে ঐ গলিত উপাদানকে ঠাণ্ডা করা হয়। যখন ঐ গলিত পদার্থ অপেক্ষাকৃত ঘন এবং বুদ্‌বুদশূন্য হয়, তখন ঐ পদার্থে নল ডুবিয়ে তুলে আনা হয় এবং ব্লো করে অর্থাৎ নলে ফুঁ দিয়ে বিভিন্ন আকারের কাচের জিনিষপত্র তৈরী করা হয়। আবার ঐ গলিত ঘন পদার্থকে ছাঁচে ফেলে এবং রোলারে চেপে বিভিন্ন আকারের কাচের ব্যবহারিক দ্রব্যাদি এবং কাচের সিট্ তৈরী হয়।

আপাতদৃষ্টিতে এই কাজটা সহজ মনে হলেও—এটি মোটেই সহজ কাজ নয়। নরম কাচ থেকে বাজারে কাচের জিনিষপত্র হিসাবে আসতে অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

প্রথমে গলিত কাচ ছাঁচে ঢেলে তাকে ৮০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় কিছুক্ষণ রাখা হয়। তারপর ৩০০ এবং ৪০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কয়েক দিন রাখবার পর আরও কম উষ্ণতায় কয়েক দিন রেখে ব্যবহারিক কাচের দ্রব্যগুলি বাজারে পাঠানো হয়।

কেমন করে বিভিন্ন রঙের কাচ তৈরী করা হয় তা সংক্ষেপে বলছি।

বিভিন্ন রঙের কাচ প্রস্তুত করবার জন্যে গলিত অবস্থাতেই কাচের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়। যেমন—নীল কাচ প্রস্তুত করতে হলে গলিত কাচে কোবাল্ট ও কপার অক্সাইড, লাল কাচ প্রস্তুত করতে সিলেথিয়াস ও কপার অক্সাইড এবং বেগুনী, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি রঙের কাচ প্রস্তুত করতে সাধারণতঃ যথাক্রমে ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড, ক্রোমিয়াম অক্সাইড বা ফেরিক অক্সাইড ও সিলেথিয়াস সালফাইড প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। দুধের মত সাদা কাচ তৈরী করতে সাধারণতঃ গলিত অবস্থায় কাচে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা হাড়ের গুঁড়া মিশ্রিত করা হয়।

শিশিরকান্তি রায়

আইভান প্যাভ্‌লভ

রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ যদি পিছনে মোটর সাইকেল ষ্টার্টের আওয়াজ শুনি, তাহলে আমরা চম্‌কে পিছনে ফিরে তাকাই বা লাফিয়ে সরে যাই। কিন্তু কেন আমরা অমন লাফিয়ে উঠি? আসলে এর মধ্যে ভয়ের কোন কারণ নেই। ভয়ের কোন কথা তখন আমরা চিন্তাও করি না, কারণ চিন্তা করবার সময় তখন থাকে না। যেই মাত্র শব্দ শুনি তখনই লাফিয়ে উঠি। শুধু তাই নয়—হঠাৎ কোন জোর আওয়াজ হলে আমাদের সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে। ছোট্ট একটা ধূলিকণা আমাদের চোখে পড়বার উপক্রম হলে আমরা চোখ বুজি। একটা ধূলিকণা যদি নাকে প্রবেশ করে, আমরা হাঁচতে থাকি; কিংবা খাবার সময় খাদ্যের টুক্‌রা যদি শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে, তখন আমরা বিষম খাই।

আমরা এই ধরণের যে কাজগুলি করি, সেগুলিকে বলা হয় প্রতিবর্তী ক্রিয়া, অর্থাৎ Reflex action। এই সব কাজ করা কিন্তু আমাদের শিখতে হয় না মোটেই। ছোট্ট শিশুও বয়স্কের মত একই ভাবে এই সব কাজ করে। আমরা প্রতিবর্তী ক্রিয়ার সহজাত শক্তি নিয়েই এই পৃথিবীতে আসি এবং সৌভাগ্যক্রমে এই সব কাজগুলি আমাদের দেহকে সুস্থ, সবল ও নিরাপদ রাখতে সাহায্য করে।

এই প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলির জন্যে আমরা আগে থেকে কিছু ভাবি না, কারণ ভাববার অবসরই পাই না। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু এই অভাবিত ক্রিয়া সম্পর্কে অনেক চিন্তা করেছেন। এই প্রতিবর্তী ক্রিয়া সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বজনস্বীকৃত বৈজ্ঞানিক হলেন আইভান প্যাভ্‌লভ। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৪৯ সালে ১৪ই সেপ্টেম্বর। তিনি ছিলেন রাশিয়ার রিয়াজাম শহরের এক গ্রাম্য যাজকের ছেলে। তাঁর বাবা তাঁকে উচ্চশিক্ষার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁকে শিক্ষার পথ বেছে নেবার জন্যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। প্যাভ্‌লভ একটি ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে সেখানে এমন একজনের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পান—যিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক ও ধর্মযাজক। এই শিক্ষানুরাগী যাজকই প্যাভ্‌লভের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছিলেন।

প্যাভ্‌লভ সেই ধর্ম-প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় নিয়ে বিজ্ঞান পড়বার জন্যে পিটার্স-বার্গের ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভর্তি হন। প্যাভ্‌লভ এখানে এসে মস্তিষ্কের প্রতিবর্তী ক্রিয়া নামে একটি বই পড়েন। সেই বইটির বিষয়বস্তু ছিল—দৈহিক ক্রিয়া এবং মানসিক ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্ণয়। এই বইখানা পড়েই তিনি নিজের ভবিষ্যৎ শিক্ষালাভের পথ ও লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেন। তিনি ডাক্তার হতে

চেয়েছিলেন—যাতে দেহ-বিজ্ঞানের অধ্যাপনার বৃত্তি গ্রহণ করতে পারেন। প্যাভ্‌লভ সামরিক চিকিৎসা বিদ্যায়তন থেকে স্নাতক হয়ে ডাক্তারি পড়া শেষ করেন। তারপর তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা সুরু করেন এবং সেন্ট পিটার্সবার্গে এক ডাক্তারখানার মধ্যেই একটি লেবরেটরী তৈরী করেন।

লেবরেটরীটি কিন্তু খুবই ছোট। প্যাভ্‌লভের সাহায্যের জন্যে কোন সহকারী ছিল না। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্যে খুব অল্প জিনিষপত্রই ছিল। কারণ তিনি তাঁর স্বল্প আয়ের অধিকাংশই নিজের গবেষণা-কার্যে ব্যয় করতেন। গবেষণার কাজের জন্যে অচিরেই তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকদের দ্বারা সম্বর্ধিত হয়েছিলেন। প্যাভ্‌লভের বয়স যখন ৪১ বছর, সেই সময় তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গের প্রয়োগ-শিক্ষা গবেষণা-কেন্দ্রের দেহ-বিজ্ঞান গবেষণাগারের ভেষজবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন।

প্যাভ্‌লভের পৌষ্টিক তন্ত্র (Digestive system) সম্বন্ধে গবেষণা তাঁকে আন্তর্জাতিক সম্মান লাভের সুযোগ এনে দেয়। ১৯০৪ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি পৌষ্টিক তন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় ও বিশ্লেষণ করেন। প্যাভ্‌লভ বিশ্বাস করতেন যে, দৈহিক যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এরও বেশ কিছুকাল পরে বৈজ্ঞানিকেরা দেহের পরিপাক-ক্রিয়ার উপর পিটুইটারী, থাইরয়েড প্রভৃতি নালীবিহীন গ্রন্থিনিঃসৃত অন্তঃস্রাবী রসের প্রভাব কতখানি, তা জানতে পেরেছিলেন।

আইভান প্যাভ্‌লভের ধৈর্য ছিল অপরিসীম, আর ছিল নিরলস উদ্যম ও অটুট আত্মবিশ্বাস। প্যাভ্‌লভ তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করেন কুকুরের পৌষ্টিক তন্ত্রের উপর। এই প্রচেষ্টায় তিনি কুকুরের পরিপাক-যন্ত্রের উপর সর্বাপেক্ষা কম আঘাত দিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে কুকুরের পাকস্থলীর ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করবার জন্যে এক কৌশলপূর্ণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পর পর তিরিশটি কুকুরের উপর তাঁর পরীক্ষা বিফল হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিরুৎসাহ হন নি। একত্রিশ বারের পরীক্ষায় তিনি সাফল্য লাভ করেন। চূড়ান্ত সাফল্য লাভের দিনটিতে তিনি আনন্দে নৃত্য করে উঠেছিলেন।

পৌষ্টিক তন্ত্রের পরীক্ষা প্যাভ্‌লভকে এনে দিয়েছিল নোবেল পুরস্কার, কিন্তু 'আবশ্যিক প্রতিবর্তী ক্রিয়ার' পরীক্ষা তাঁকে বিশ্বব্যাপী কীর্তি ও খ্যাতির অধিকারী করেছিল। যখন তিনি কুকুরের পৌষ্টিক তন্ত্রের পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় আর একটি বিষয়ের প্রতি তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সেটা হলো খাদ্য সম্পর্কে কুকুরের প্রতিক্রিয়া। তিনি জানতেন—শুধু খাদ্য পেলেই যে কুকুরের মুখবিবর লালাসিক্ত হয়ে ওঠে, তা নয়—খাদ্য দেখলেও কুকুরের মুখ থেকে লালাক্ষরণ হয়। বিজ্ঞানীরা জানতেন যে, কুকুরের মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হয় খাদ্য পরিপাকের জন্যে, যেমন প্রত্যেকটি

মানুষের হয়। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, জীবের মুখে লালাক্ষরণ শারীরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্যেই হয়ে থাকে। কিন্তু কুকুরকে যখন খাদ্য দেখানো হয়, তখনই তার মুখ থেকে লালা ঝরে কেন?

এক অনাগত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাঁর প্রাথমিক অনুমানের কথা প্যাভ্‌লভ প্রচার করলেন। এই অনুমান তখনকার বৈজ্ঞানিক চিন্তারাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করলো। প্যাভ্‌লভ বললেন—খাদ্য দেখবামাত্র কুকুরের মুখের লালাক্ষরণ তার মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফলেও হতে পারে। শুধু দৈহিক প্রক্রিয়ার ফলে বোধ হয় ওটা সম্ভব নয়। এই বিষয় নিয়ে প্যাভ্‌লভ একটি পরীক্ষা করেন। সেই পরীক্ষায় একটি কুকুরকে একটা ছোট ফাঁকা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। খাবার সময় প্রত্যেক বার একটা ঘণ্টা বাজাবার পরেই কুকুরটার সামনে খাদ্য রাখা হতো এবং তৎক্ষণাৎ তার মুখ দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই লালা ঝরতে থাকতো। এই রকম অনেকবার করবার পর তিনি দেখলেন, নির্দিষ্ট সময়ে কুকুরটিকে খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেই তার মুখ থেকে লালা নিঃসৃত হতে থাকে। প্যাভ্‌লভ প্রমাণ করে দেখালেন যে, তিনি কুকুরটির 'আবস্থিক প্রতিবর্তী প্রতিক্রিয়ার' রূপান্তর সাধন করেছেন। খাদ্য দেখলে যেমন, ঘণ্টার শব্দ শুনলেও কুকুরটির তেমনি লালা নিঃসৃত হয়ে থাকে।

প্যাভ্‌লভ আর একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরীক্ষা করেন। অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি কুকুরকে খাবার দিলেন। সেই সময় ঘরের আলো-রেখাটি হলো বৃত্তাকার। কিন্তু অন্যবার যখন ডিম্বাকার আলোরেখার আলো জ্বালানো হলো, তখন কোন খাবার দেওয়া হলো না। কুকুরটি সহজেই বুঝতে পারলো, যখন বৃত্তাকার আলোটি দেখা যাবে, তখনই খাদ্য পাওয়া যাবে। ডিম্বাকার আলোককে ক্রমশঃ গোলাকার করে আনা হতে লাগলো। কুকুরটি তখন আর বুঝতে পারলো না—কোন্‌টি বৃত্ত, আর কোন্‌টি ঈষৎ ডিম্বাকৃতি আলোর রেখা। সংশয়ের অস্থিরতায় সে আলো-রেখার গণ্ডীর মধ্যে ছুটাছুটি করতে লাগলো। প্যাভ্‌লভ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলেন যে, লালা নিঃসরণ তার অর্থাৎ কুকুরের মানসিক প্রতিক্রিয়া, দৈহিক প্রতিক্রিয়া নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্যাভ্‌লভের এই পরীক্ষা থেকে অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। প্যাভ্‌লভের এই চিন্তাধারা, অর্থাৎ 'আবস্থিক প্রতিক্রিয়ার' মতবাদ শুধু যে পশুর বেলায়ই প্রযোজ্য, তা নয়—মানুষের বেলায়ও তা সমানভাবে প্রযোজ্য। যেমন কোন শিশুর পিতামাতা যদি কুকুর, বিদ্যুৎ বা সমুদ্রকে ভয় করেন, তবে সেই শিশুও এই তিনটি জিনিষকে ভয় করবে। কিন্তু পিতামাতা যদি ভয়শূন্য হয়, তবে শিশুটিও নির্ভীক হবে।

মোটামুটিভাবে, প্যাভ্‌লভ তাঁর জীবনব্যাপী সাধনায় যা প্রমাণ করেছেন, তা হচ্ছে এই যে, কোন পশুকে কোন এক 'আবস্থিক প্রতিক্রিয়ায়' অভ্যস্ত করানো

যত সহজ, তাকে পুনরায় অন্য এক 'আবশ্যিক প্রতিক্রিয়ায়' অভ্যস্ত করানোও ততই সহজ। আর এই সিদ্ধান্ত শুধু পশুদের বেলায়ই নয়, মানুষের সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তৎকালীন সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট প্যাভ্‌লভকে প্রচুর আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতামূলক উৎসাহ দিয়েছিলেন।

আইভান প্যাভ্‌লভ ১৯৩৬ সালে লোকান্তরিত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। দেহ-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের সেতুবন্ধনের প্রথম পথিকৃৎ হিসাবে চিরবরেণ্য বৈজ্ঞানিক আইভান প্যাভ্‌লভের নাম বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

শ্রীপ্রবীরকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

জলের রূপকথা

দেবু বিজ্ঞানের ছাত্র। তার আশা, বড় হয়ে সেও একজন নামকরা বিজ্ঞানী হবে। ক্লাসের সে সেরা ছাত্র। তাই বিজ্ঞানের মাষ্টার মশাই তাকে খুব ভালবাসেন, সব কিছুই ভাল করে বুঝিয়ে দেন। দেবুও সব কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনে, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। আজ তাদের ক্লাসে জল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাষ্টার মশাই কতকগুলি মজার পরীক্ষা দেখিয়েছেন। রাত্রে পড়বার টেবিলে বসে দেবু সেই সব কথাই চিন্তা করছিল। তার সামনে রয়েছে একটা কাচের কুঁজা, আর তাতে খানিকটা পরিষ্কার জল টলটল করছে। দেবু একদৃষ্টে তারই দিকে তাকিয়ে আছে, আর গালে হাত দিয়ে একমনে ভাবছে।

হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন অত্যন্ত মৃদুস্বরে তাকে ডাকছে—এই শুনছো! দেবু অবাক হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এই সময় কে যেন আবার ফিস্ ফিস্ করে বললো—এই দেবু শুনছো! আমি তোমাকেই ডাকছি। এই যে আমি এই কুঁজার ভিতর থেকে কথা বলছি।

দেবু তো একেবারে অবাক! সে কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না, অথচ এই শান্ত মৃদু স্বর বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ তার মনে পড়লো আরব্যোপন্যাসের সেই দৈত্যটার কথা। দারুণ আতঙ্কে তার হাত-পা হিম হয়ে গেল। চীৎকার করে সে বলতে চাইলো—না না তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলতে চাই না, তুমি ঐ কুঁজার মধ্যেই থাক, তোমার এখন বেরিয়ে এসে কাজ নেই। কিন্তু ভয়ে তার গলা বুঁজে এসেছিল, তাই গলা দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুলো, কোন কথাই বোঝা গেল না।

তার এই করুণ অবস্থা দেখে কুঁজার মধ্যেকার অশরীরী আত্মাটি খিল্ খিল্ করে

হেসে উঠলো। সে বললো—দেবু, ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় কিচ্ছু বলবো না। আমি একজন জলপরী, এই কুঁজার মধ্যে থাকি। আমি এখান থেকে দেখি, তুমি রোজ রোজ কেমন মন দিয়ে লেখাপড়া কর। কত কথা ভাব। এজন্যে তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে, তোমার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করে। আজকে তোমায় একটা খুব মজার গল্প বলবো, শুনবে? এমন মিষ্টি কথা শুনলে কার না ভাল লাগে। দেবুও অনেকখানি আশ্বস্ত হলো। কিন্তু ভয়ে ও বিস্ময়ে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, তার মুখ দিয়ে কথা ফুটলো না, কোন প্রকারে ঘাড় নেড়ে জানালো যে, সে গল্প শুনতে প্রস্তুত। জলপরী তার গল্প সুরু করলো।

অ-নে-ক অ-নে-ক দিন আগের কথা। একটা পাহাড়ের কোলে ছিল একটা হ্রদ, আর তার মধ্যে ছিল অসংখ্য জলকণা। কিন্তু তারা খুব মিলেমিশে থাকতো। কখনও কারো সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করতো না। তারা বন্ধুভাবে নিজেদের মধ্যে আশ্রয় দিয়েছিল ছোট-বড় অনেক মাছকে। মাছগুলি জল কেটে কেটে চারদিকে ঘুরে বেড়াতো, লাফাতো, ডিগবাজী খেতো। জলকণাগুলিও সারাদিন তাদের সঙ্গে খেলায় মেতে থাকতো। পাহাড়ের কোণে একটা ঝরণা ছিল। সেখান দিয়ে ঝির ঝির করে কত জল ঝরে পড়তো। হ্রদের জলে থাকতো এক জলপরী। সে রোজ সেখানে আসতো স্নান করতে, খেলা করতে। তাকে ঘিরে মাছদের সঙ্গে সঙ্গে জলকণারাও মনের আনন্দে নাচতো, গাইতো, খেলা করতো। এমনি করে খুব সুখেই তাদের দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল।

আর একটা মজার কথা শোন। এক-একটি জলকণা, কিন্তু তার মধ্যে ছিল তিনজন করে। একের মধ্যে তিন, কেমন মজার—তাই না? এরা তিনজন কিন্তু সব সময়েই হাত ধরাধরি করে একসঙ্গে থাকতো। এদের বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। এরা চলতো-ফিরতো, কাজকর্ম করতো সব একসঙ্গে। কাজেই তিনজন হলেও তাদের একজনই বলা চলে।

এদের একটির নাম অক্সিজেন। সে একটু স্থূলকায়, ওজনে ভারী। এর হাত হলো দুটি। কিন্তু সে খুব ধীর স্থির আর বিচক্ষণ। প্রতিটি অক্সিজেনের সঙ্গে থাকে দুটি করে হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন যেমন ছোট, তেমনি হাল্‌কা, আর ভারী ছট্‌ফটে। এর হাতও মাত্র একটি। বিধাতার নিয়মে একটি অক্সিজেন তার দু'হাত দিয়ে দুটি হাইড্রোজেনকে ধরে আছে দৃঢ়মুষ্টিতে। এই বাঁধন সহজে আল্‌গা হয় না। এজন্যে তাদের চলাফেরা সবই একসঙ্গে করতে হয়। হাইড্রোজেন ছট্‌ফট করলেও পালাতে পারে না। অতিরিক্ত হাত না থাকায় অন্য কাউকে আঁকড়ে ধরতেও পারে না। তাই বলে তাদের কারো মনে কোন ক্ষোভ নেই। কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব।

হাইড্রোজেনদের মনেও কোন দুঃখ ছিল না। তারা যে পরাধীন, এই চিন্তা তাদের মনে কখনও স্থান পায় নি। তাই তারা এভাবে অক্সিজেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা

হয়ে থাকতে কখনও আপত্তি করে নি। তারা মনে করতো, এই হলো বিধাতার বিধান। তাই তারা সন্তুষ্ট চিত্তেই সব সময় অক্সিজেনদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতো, মিলেমিশে কাজকর্ম করতো।

এই শান্ত স্থির জলাশয়ের জল ছিল যেমন পরিষ্কার, তেমনি মিষ্টি। তাই দূর দুরান্ত থেকে গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁখে করে সেখানে আসতো, ঐ মিষ্টি জল ভরে নিতে। জলকণারাও ভাবতো, এভাবে মানুষের সেবায় লাগতে পেরে তাদের জীবন সার্থক হলো।

এমনি করে বেশ শান্তিতে নিরুপদ্রবে তাদের দিন কাটছিল। কিন্তু কালক্রমে তাদের মধ্যে কয়েকটি দুষ্টের আবির্ভাব হলো। এরা হাইড্রোজেন সম্প্রদায়ের। দলের সবার কানে কানে তারা কুমন্ত্রণা দিতে লাগলো। ফিস্ ফিস্ করে তারা বলতে লাগলো—আমরাই হলাম সবচেয়ে কুলীন—কারণ আমরাই সবচেয়ে সূক্ষ্ম, সবচেয়ে হাল্কা। অক্সিজেনরা সংখ্যায় কত কম, অথচ তারাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করছে। আমরা কেন এসব পেটমোটা গোবরগণেশ অক্সিজেনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে থাকবো? এদের জন্যেই তো আমরা স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারি না, এমন কি—চলা-ফেরাও করতে পারি না। এদের কবল থেকে আমাদের মুক্তি চাই, আমরা চাই স্বাধীন হতে।

এদের মধ্যে যারা বিজ্ঞ তারা এদের ভেদবুদ্ধি দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলো। তারা অনেক করে বোঝালো যে, এতে কারও কোন মঙ্গল হবে না। অনুনয় করে বললো—দেখ বাছারা, তোমরা এই ভেদবুদ্ধি পরিহার কর, সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ কর। কিন্তু ছোকরারা তাদের কথায় কর্ণপাত করলো না। উল্টে তারা বলতে লাগলো, —ভাই সব, তোমরা কেউ ওদের কথায় কান দিও না। ওরা হলো অক্সিজেনের চর। কাজেই অক্সিজেনের স্বার্থেই ওরা কথা বলছে।

ছোকরা হাইড্রোজেনরা দিনরাত পরামর্শ করতে লাগলো—আসলে নানারকম চক্রান্ত করতে লাগলো। অবশেষে তারা এক ভয়ঙ্কর মতলব স্থির করলো। কিন্তু এ হলো নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করবার মত।

একাজে তাদের সহায় হলো ভুশণ্ডি কাক। সেটা দেখতে যেমন কালো কদাকার, তেমনি কর্কশ তার গলার আওয়াজ। সবার উপরে তার খ্যাতি ছিল কূটবুদ্ধির জন্যে। ছোকরা হাইড্রোজেনদের কুপরামর্শে এই কাক নানা জায়গা থেকে ঠোঁটে করে নানা-রকম জীবাণু এনে সেই হ্রদের জলে ছেড়ে দিল। এসব জীবাণু কিল্‌বিল করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো, দ্রুত বংশবিস্তার করতে লাগলো। দেখতে দেখতে হ্রদের জল লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি বীজাণুতে ছেয়ে গেল। এভাবে হ্রদের জল বিষিয়ে উঠলো। চারদিকে মহামারী লেগে গেল। মাছগুলি সব একে একে মরে ভেসে উঠতে লাগলো।

হ্রদের চারদিকে কাক, চিল আর শকুনের ভিড় জমে উঠলো। আতঙ্কিত গ্রামের মেয়েরা কেউ আর সেখানে আসে না জল নিতে। চারদিকে বিষাদের ছায়া নেমে এলো।

জলপরী তখন সূর্যদেবের স্মরণ নিল। তাঁর কাছে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা জানালো—প্রভু! দুর্মতি দূর করে এদের সুমতি দাও। এই দারুণ বিপদ থেকে আমাদের পরিত্রাণ করো।

সূর্যদেব তখন জলকণাদের ডেকে বললেন—তোমাদের এমনি করে ঝগড়া-বিবাদ করে সৃষ্টি নষ্ট করতে আমি দেব না। তোমরা কে কে আমার সঙ্গে যাবে, চল তোমাদের নিয়ে যাই দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে। সেখানেই এর মীমাংসা হবে।

একথা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহী হাইড্রোজেনেরা তাদের সঙ্গী অক্সিজেনদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে উঠে পড়লো। সূর্যদেবের রথে করে তারা এক নিমেষেই পৌঁছে গেল দেবরাজ ইন্দ্রের দরবারে।

দেবরাজ তাঁর সভায় এই আগন্তুকদের দেখে খুবই অবাক হলেন। তাদের সেখানে আগমনের হেতু কি, তাই জিজ্ঞেস করলেন। প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেনরা সব এক সঙ্গে চীৎকার করে তাদের দাবী জানাতে লাগলো। কারও কথা শোনা যায় না, কারও কথা বোঝা যায় না—সে এক তুমুল হট্টগোল। দেবরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হলেন, দুন্দুভি বাজিয়ে সবাইকে চুপ করতে বললেন। কিন্তু কে কার কথা শোনে! দেবরাজের সভায় এমন দৃশ্য কেউ কোন দিন দেখে নি। এদের ধৃষ্টতা দেখে দেবরাজ বিস্ময়ে হতবাক, সভাসদেরা সব হতভম্ব। দেবরাজ ক্রোধে গর্জ্জন করে উঠলেন, দুন্দুভিতে আঘাত করে সবাইকে স্তব্ধ হতে বললেন। তাঁর এই অগ্নিমূর্তি দেখে সবাই চুপ করলো। তখন তিনি অক্সিজেনদের বললেন তাদের বক্তব্য পেশ করতে। এতে হাইড্রোজেনরা মনে মনে খুবই চটে গেল, তবুও তারা তখনকার মত চুপ করে রইলো।

অক্সিজেনদের একজন প্রতিনিধি তখন ধীর স্থিরভাবে অত্যন্ত নম্রস্বরে তাদের মহান দায়িত্বের কথা এবং সেই দায়িত্ব তারা কিরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে, হাই-ড্রোজেনদের সঙ্গে তারা কেমন মিলেমিশে কাজ করছে—এসব কথা বুঝিয়ে বলতে লাগলো। হাইড্রোজেনদের যে সর্দার সে এতে প্রমাদ গণলো। সে যখন দেখলো যে, তাদের কুমতলব ফেঁসে যাবার দাখিল, তখন সে রাগে, নিষ্ফল আক্রোশে একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লো। সে চীৎকার করে উঠলো—ভাই সব! এই হতভাগা পেট-মোটা শয়তানগুলি চিরকাল আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখবার মতলবে এসব কথা বলছে। এদের কোন কথা বলতে দিও না। আমরা তো সংখ্যায় বেশী, আমরা কেন চিরকাল এদের ভয় করে থাকবো? এস, আমরা সবাই মিলে এক সঙ্গে এদের আক্রমণ করি। ভাই সব, এক্ষুনি এদের মুখ বন্ধ করে দাও চিরকালের মত।

সঙ্গে সঙ্গে মার মার, কাট কাট শব্দ করে হাইড্রোজেনরা সবাই মিলে অক্সিজেনদের আক্রমণ করলো। তাদের আঁচড়ে, কামড়ে, কিল-ঘুষি ও লাথি মেরে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো। আগেই বলেছি, অক্সিজেনরা সংখ্যায় অল্প, তার উপরে তারা হলো স্থূলকায় এবং অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির। কাজেই তারা হাইড্রোজেনদের এরূপ হিংস্র আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না। অচিরেই ধরাশায়ী হয়ে তারা পরিত্রাহী চীৎকার করতে লাগলো—বাঁচান! বাঁচান! দেবরাজ, আমাদের রক্ষা করুন।

তাঁর চোখের সামনেই যে এমন একটা ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা দেবরাজ কল্পনাও করতে পারেন নি। এসব দেখে তিনি বুঝলেন, পৃথিবীতে শিষ্টাচার, নিয়ম, শৃঙ্খলাবোধ একেবারে লোপ পেয়েছে। ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি হুঙ্কার দিয়ে ওঠলেন, দারুণ আক্রোশে বজ্র ছুঁড়ে মারলেন। সেই ভয়ঙ্কর গর্জনে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। বজ্রের আঘাতে জলকণাগুলি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। একদিকে ছিটকে পড়লো হাইড্রোজেন, অন্যদিকে অক্সিজেন।

কিন্তু দুর্দান্ত হাইড্রোজেনরা এতে একটুও বিচলিত হলো না। নতুন স্বাধীনতার আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা হাসতে হাসতে, লাফাতে লাফাতে ছুটতে লাগলো আকাশের দিকে। তারা মনে করলো, তারা তো সবচেয়ে সূক্ষ্ম এবং হাল্কা; কাজেই তারা অনায়াসে পৌঁছে যাবে নক্ষত্রখচিত ঐ আকাশে—দেবতাদের বাসভূমিতে। সেখানে গিয়ে তারা স্বতন্ত্র স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলবে। হতভাগা অক্সিজেনরা পড়ে থাকবে নীচে, কোন দিনই আর তাদের নাগাল পাবে না।

হাইড্রোজেনরা শোঁ শোঁ করে উপর দিকে উঠতে লাগলো—উচু থেকে ক্রমে আরও উচুতে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই বায়ুমণ্ডলের শেষসীমায় গিয়ে তাদের ঊর্ধ্বগতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নক্ষত্রলোকে পৌঁছুবার ব্যাকুল বাসনায় তারা ছুটাছুটি, লাফালাফি করতে লাগলো। কিন্তু হায়—তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। কিছুতেই তারা পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে যেতে পারলো না। তাদের অবস্থা হলো ত্রিশঙ্কুর মত—স্বর্গেও নয়, আবার মর্ত্যেও নয়। পৃথিবীর জনমানব থেকে বহুদূরে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্কর্মার মত তারা ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

এদিকে দুষ্কৃতকারী হাইড্রোজেনদের সাজা দিতে গিয়ে নিরীহ সদাচারী অক্সিজেন-দেরও শাস্তি হলো দেখে অনেকেরই মনে দুঃখ হলো। তাদের কেউ কেউ দেবরাজের কাছে আবেদন জানালেন, এর প্রতিবিধানের জন্যে। তখন দেবরাজ বললেন—যারা সৎ এবং মহৎ তাদের কখনও কোন অনিষ্ট হয় না। অক্সিজেনরা সৎ এবং মহৎ, পরের হিতার্থেই তাদের জীবন উৎসর্গীকৃত। অক্সিজেনরা এখন মর্ত্যে ফিরে যাক, সেখানে গিয়ে জীবের শ্বাসক্রিয়া এবং যাবতীয় দহন ক্রিয়ায় তারা সহায়তা করতে থাকুক।

অক্সিজেনরা তো বাতাসের চেয়ে সামান্য ভারী। তাই তারা বাতাসে ভর করে

ধীরে ধীরে নেমে এল পৃথিবীতে। সেখানে এসে দেবরাজের অভিপ্রায় অনুসারে তারা জীবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই মর্ত্যের জীবদের কাছে তারা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। অক্সিজেনদের গুণের কথা সবার মুখে মুখে ফিরতে লাগলো।

এদিকে নিষ্কর্মার মত ঘুরতে ঘুরতে হাইড্রোজেনরা ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। কেউ তাদের ডাকে না, আদর করে না, ভালবাসে না। তারা যে আগুন জ্বালাবে সে উপায়টুকুও নেই, কারণ তাহলেও তো অক্সিজেনের সহায়তা দরকার। এজন্যে হাইড্রোজেনরা নিষ্ফল আক্রোশে শুধু গজরাতে লাগলো। এমন বেকার বৈচিত্র্যহীন জীবন কার ভাল লাগে বল? তাছাড়া সবার মুখে অক্সিজেনদের গুণের কথা শুনে শুনে তাদের মন খারাপ হয়ে যায়, হিংসায় বুক ফেটে যায়। কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। কারণ, এটা তো তাদেরই কৃতকর্মের ফল। এখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারছে, অক্সিজেনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে তারা কি ভুলই না করেছে! তারা ভাবে, এর প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই?

শেষে একদিন সবাই মিলে পরামর্শ করে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা জানালো—প্রভু! আমাদের অপরাধ মার্জনা কর। আমাদের ভুল আমরা বুঝতে পেরেছি। আমাদের খুব শিক্ষা হয়েছে। হে দেব! এমন নিঃসঙ্গ জীবন আর ভাল লাগে না। ফিরিয়ে দাও সেই শান্ত স্নিগ্ধ মধুর জীবন। আমাদের আবার মিলিয়ে দাও অক্সিজেনদের সঙ্গে। এমন পৃথক হয়ে আমরা আর থাকতে চাই না। আমরা আবার মিলেমিশে কাজ করতে চাই।

তাদের এই করুণ প্রার্থনা শুনে দেবরাজের মন গলে গেল। ঈশানের মেঘকে ডেকে তিনি বললেন—যাও হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনদের আমার কাছে নিয়ে এস।

তাঁর আদেশ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিপালিত হলো। হাইড্রোজেনরা এবারে মাথা হেঁট করে রইলো, দুষ্টু অপরাধী বালকদের মত। দেবরাজের আদেশে তারা আবার আগের মতই অক্সিজেনদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালো। তখন দেবরাজ বললেন—বজ্র দিয়ে স্পর্শ করা মাত্রই এরা আবার মিলে যাবে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হবে। হে ঈশানের মেঘ, তুমি তখন এদের বহন করে নিয়ে যাবে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত সেই ছোট্ট হ্রদে, এদের পৌঁছে দেবে এদের পুরাতন আবাসে। এই বলে দেবরাজ বজ্র দিয়ে তাদের ছুঁয়ে দিলেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, আওয়াজ হলো—কড়-কড়-কড়াৎ।

* * * * *

একটা বিকট শব্দে দেবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল, সে ধড়মড় করে উঠে বসলো। বাইরে মেঘের ঘনঘটা, মুহুর্মুহু বাজ পড়ছে। সে বুঝলো, পড়বার টেবিলে মাথা

রেখেই সে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, এখন বাজ পড়বার শব্দে জেগে উঠেছে। দারুণ গুমোট, সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ। তাকিয়ে দেখলো, টেবিলের উপরে রয়েছে কাঁচের কুঁজা, তাতে পরিষ্কার টলটলে জল। দেবু সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিল।

প্রসাদ গুহ

বিবিধ

সবুজের সংরক্ষণ

রাশিয়ার প্রকৃতি সংরক্ষণ কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ইগব প্রোকোফিয়েভ লিখিয়াছেন যে, একটা শিল্পাঞ্চলের চিমনি হইতে প্রত্যহ প্রায় চার শত টন সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস উত্থিত হইয়া আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। এই বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় হইল—বৃক্ষলতাপূর্ণ পার্ক ও উদ্যান গড়িয়া তোলা।

কিন্তু শিল্পাঞ্চলে কলকারখানার পরিত্যক্ত ছাই ও ধূলিকণা পাতার সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে কলকারখানার বেশ কিছু দূর পর্যন্ত গাছপালা জন্মিতে পারে না। আবার বৃক্ষলতা না জন্মিলে শিল্পাঞ্চলে মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা করা সম্ভব নয়।

এই সমস্যা সমাধানের দুইটি পথ হইতে পারে। একটি হইল—কলকারখানার ছাই ও অন্যান্য পরিত্যক্ত দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করা, অর্থাৎ কলকারখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া। কিন্তু তাহা সম্ভব নয়। আর একটি পথ হইল সহর ও শিল্পাঞ্চল হইতে সবুজের উচ্ছেদ সাধন। তাহাও অসম্ভব।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা এই উভয়-মুখী সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ইতিমধ্যে কিছুটা সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে কলকারখানার গ্যাস শোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কয়লাখনির গুঁড়া ও ধূলি পরিত্যক্ত খনিগুলিকে ভরাট করিবার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু কারখানার বয়লারের ছাই পুনরায় ব্যবহার করা চলে না। প্রত্যেক কলকারখানার পাশেই তাই ছাইয়ের গাদা জমিয়া উঠে।

বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভাবিলেন, এই ছাইগাদার উপর বৃক্ষলতা জন্মান সম্ভব কি না? দেখা গেল, অনেক গাছই ছাইগাদায় জন্মে না। যেগুলি জন্মে, সেগুলি বৃষ্টিতে ধুইয়া যায় বা ঝড়-বাতাসে উড়িয়া যায়।

রুশ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বি. ওয়াই. সিগালফ ছাইগাদার উপর এক স্তর মাটি ফেলিয়া তাহাতে সার দিয়া ঘাসের বীজ বুনিয়া দিলেন। এক বছরের মধ্যেই ছাইগাদা ঘাসে ঢাকিয়া গেল। ছাই-গাদার উপর মাটির স্তর থাকায় বৃষ্টি বা ঝড়ে ঘাস ভাসিয়া বা উড়িয়া যায় না। ঘাসের শিকড় ক্রমে ছাইগাদার মধ্যে প্রবেশ করে।

বৃটেনের বিজ্ঞানী আই. হান্ট, ডি. পি. ফেরান্ট ও আই. ভি. টমসন এবং জার্মেনীর ওয়েইল অনুরূপ পদ্ধতিতে কাজ করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই পদ্ধতির একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে ব্যয় খুব বেশী হয়।

রাশিয়ার স্ভেরডলোভস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক

ডি ডি. তারশেভস্ক একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া সবুজ সংরক্ষণের কাজ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ছাইগাদার উপর বুলডোজারের সাহায্যে মাত্র এক ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পুরু মাটি ফেলিয়া দেন। তারপর সার দিয়া মাটির উপর রোড রোলার চালাইয়া ছাইয়ের ভিতরে শক্ত করিয়া মাটি বসাইয়া দেওয়া হয়। এই মাটিকে বীজ বুনিবার আগে জল দিয়া ভিজাইয়া লওয়া হয়। তাড়াতাড়ি ঘাস গজাইবার জন্য সাধারণতঃ যে পরিমাণ বীজ দেওয়া হয়, এই ক্ষেত্রে তাহার দ্বিগুণ বীজ ব্যবহার করা হয়। প্রথম বছরে দ্বিতীয়বার সার দেওয়া হয়। দেখা গেল শরৎকালের মধ্যেই সমগ্র ছাইগাদা সবুজ ঘাসে ছাইয়া গিয়াছে। পরে এই জমিতে ফল ও তরিতরকারী আবাদ করিয়া সুফল পাওয়া গিয়াছে।

কিন্তু বড় বড় ধাতু কারখানার পরিত্যক্ত স্লাগ এবং ধাতুখনির পরিত্যক্ত খনিজ স্তরের উপর ঘাস জন্মান সম্ভব নয়। সেগুলি অন্যভাবে ব্যবহার করা দরকার। বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই এই সকল পরিত্যক্ত দ্রব্য হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। এখন পরিত্যক্ত খনিজ হইতে সালফিউরিক অ্যাসিড ও অন্যান্য মূল্যবান রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হইতেছে। এই ভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হইতে থাকিলে ভবিষ্যতে পরিত্যক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া আর কিছু থাকিবে না।

গুঁড়া মাখন

অষ্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা গুঁড়া মাখন তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে।

গুঁড়া মাখনে সাধারণ মাখনের মতই ৮২ শতাংশ স্নেহপদার্থ থাকে। তাহা ছাড়াও ইহাতে ১৫ শতাংশ দুধের প্রোটিন ও কিছু পরিমাণ খনিজ দ্রব্য থাকে।

তবে জল দিয়া এই গুঁড়া মাখন হইতে সাধারণ মাখন তৈয়ার করা যায় না। ইহা আইসক্রীম, কেক, সস্ প্রভৃতি দ্রব্য তৈয়ার করিতে ব্যবহার করা চলে। গরম আবহাওয়ায় ইহা সাধারণ মাখনের মত গলিয়া যায় না। অবশ্য সাধারণ মাখনের তুলনায় ইহার দাম কিছু বেশী পড়ে।

আনারসের ছিব্ড়া হইতে অক্স্যালিক অ্যাসিড

জোরহাটের আঞ্চলিক গবেষণাগার আনারসের ছিব্ড়া হইতে অক্স্যালিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। আসামে প্রায় ৬ হাজার একর জমিতে আনারসের চাষ হইয়া থাকে এবং বৎসরে প্রায় ৩২,৮৫৭ টন আনারস উৎপন্ন হয়। এই বিপুল পরিমাণ আনারসের পরিত্যক্ত অংশ অক্স্যালিক অ্যাসিড প্রস্তুতের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে।

অক্স্যালিক অ্যাসিড বিভিন্ন শিল্পে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৎসরে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার এই অ্যাসিড আমদানী করা হইয়া থাকে।

সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎ-শক্তিতে পরিণত করবার জেনারেটর

আমেরিকার ওয়েস্টিং হাউস কর্পোরেশন মহাশূন্যযানের জন্যে সৌরশক্তিকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করবার একটি অভিনব জেনারেটর তৈরী করেছেন। কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ আর. ডব্লিউ. এসারে সম্প্রতি বলেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে এই থার্মোইলেক্ট্রিক বা তাপবৈদ্যুতিক জেনারেটরের সাহায্যে দশ ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। এই চেষ্টা সফল হলে মহাকাশে ব্যবহারের জন্যে বৃহত্তর এবং আরও শক্তিশালী জেনারেটর তৈরী সম্ভব হবে।

দুই রকমের দুটি ধাতুখণ্ডের সংযোগস্থলে তাপ

প্রয়োগ করলে যে ইলেকট্রন-স্রোত প্রবাহিত হয়, তাতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়। এই ব্যবস্থাকেই এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে।

কৃত্রিম উপগ্রহে সৌরশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রতিফলক ব্যবহার করা হবে। এই কেন্দ্রীভূত রশ্মি প্রতিফলিত হবে থার্মোইলেকট্রিক জেনারেটরের উপর। ঐ জেনারেটরে থাকবে লিথিয়াম হাইড্রাইড।

উপগ্রহটির উপরে যখন পৃথিবীর ছায়া পড়বে তখন এর তাপমাত্রা দ্রুত হিমাঙ্কের নীচে নেমে আসবে, লিথিয়াম হাইড্রাইড ঘনীভূত হয়ে কঠিন আকার ধারণ করবে। ঐ সময়ে, অর্থাৎ ঐ ছায়ার আবরণ ছাড়িয়ে সূর্যালোকিত অংশে আসা পর্যন্ত লিথিয়াম হাইড্রাইড যথেষ্ট তাপ বিকিরণ করবে এবং তারই ফলে বিদ্যুৎ প্রবাহ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এই পরীক্ষামূলক চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হলে এই পদ্ধতিতে কয়েক শত ওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনকারী জেনারেটর তৈরী করা হবে এবং ৯০ মিনিটে যে সকল কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমা করবে, তাতে ঐগুলি ব্যবহৃত হবে। ঐ সকল উপগ্রহ ৫৫ মিনিট থাকবে সূর্যলোকিত অঞ্চলে, আর ৩৫ মিনিট থাকবে পৃথিবীর ছায়ায়।

সার্জনদের বীজাণু-সংক্রমণ থেকে রক্ষার নতুন ব্যবস্থা

হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করবার সময় সার্জনের দেহে রোগ-বীজাণুর প্রবেশ রোধ করবার জন্যে নতুন এক ধরণের মুখাবরণ (সার্জিক্যাল মাস্ক) আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কর্তা ডাঃ পল নিকোলাস ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিনে মাইক্রোবায়োলজি শাখার সহযোগী অধ্যাপক।

অস্ত্রোপচারকালে এই মাস্ক সার্জনের দেহে রোগ-সংক্রমণকারী ব্যাক্টিরিয়ার প্রবেশ নিরোধ করে। শতকরা ৯৭টি ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই নতুন মাস্ক কার্যকরী হয়। বর্তমানে যে সব সার্জিক্যাল গজের তৈরী মাস্ক ব্যবহার করা হয়, সেগুলি শতকরা মাত্র ১০টি ক্ষেত্রে কার্যকরী। এই সব তথ্য ইউটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেণ্টারের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে।

এই নতুন মুখাবরণ দেখতে অনেকটা প্রচলিত মুখাবরণের মত। এই জিনিষটি সার্জনের নাক ও মুখ ঢেকে চিবুকের খানিকটা নীচু পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তাছাড়া এটা নাকেমুখে চেপে থাকে না, একটু ফুলে থাকে।

নতুন মুখাবরণের দু-দিকে রয়েছে কাপড়ের আস্তরণ এবং মাঝখানে মোলায়েম কাচের তন্তুর প্যাড। এই কাচের তন্তুগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং স্থিরবিদ্যুৎস্পৃষ্ট বা ইলেকট্রোষ্ট্যাটিক। বীজাণুগুলি এই কাচের তন্তুতে আট্‌কা পড়ে যায়।

ভারত মহাসাগরের স্রোতধারা সম্পর্কে নতুন তথ্য

নিরক্ষবৃত্তের এলাকায় ভারত মহাসাগরের স্রোতধারার সঙ্গে অন্যান্য মহাসাগরের স্রোতধারার মিল নেই। এই স্রোত কোথাও ক্ষীণ, কোথাও বা প্রবল, সমভাবে প্রবাহিত নয়। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত প্রবল মৌসুমী বায়ুই হয়তো নিরক্ষবৃত্তের এলাকায় এই অস্বাভাবিক স্রোত সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে—রোড আয়ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন এ. নস. এই মন্তব্য করেছেন। ভারত মহাসাগরের আন্তর্জাতিক তথ্যসন্ধানী অভিযানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তিনি অংশ গ্রহণ করছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের উদ্যোগে স্ক্রিপ‍্স্ ইনষ্টিটিউশন অব ওশ্যানোগ্র্যাফী এবং রোড অ্যায়ল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করছেন। স্ক্রিপ‍্স্ ইনষ্টিটিউশন অব ওশ্যানোগ্র্যাফীর আরগো নামে জাহাজটি গত বছর সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত তিন মাসের জন্যে এই মহাসাগরে তথ্যসন্ধানের কাজে নিযুক্ত ছিল।

ক্যান্সারের কারণ নির্ণয়ের অভিনব পদ্ধতি

দেহের আভ্যন্তরীণ ক্যান্সারের কারণ নির্ণয় খুবই কঠিন ব্যাপার। স্যানফ্রান্সিকোর ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ রাসেল জে. এরিকসন কর্তৃক সম্প্রতি এই রোগ নির্ণয়ের অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদ্ধতিতে তলপেট ও বক্ষস্থলে জমাট অতিরিক্ত তরল পদার্থের সাহায্যেই এই রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ডাঃ এরিকসন পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, ক্যান্সার আক্রান্ত সেল বা কোষ থেকে সুস্থ কোষের তুলনায় দ্বিগুণ থেকে দশগুণ পর্যন্ত ল্যাক্‌টিক ডিহাইড্রোজিনেস নামে এন্‌জাইম নির্গত হয়ে থাকে। কোষের শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই এন্‌জাইম অনুঘটকের (ক্যাটালিষ্টের) কাজ করে এবং সব রকম কোষই তা ব্যবহার করে থাকে। এর সাহায্যে এই রোগ পরীক্ষার প্রক্রিয়া অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় নতুন অ্যান্টিবায়োটিক

১৯৫৯ সালে গ্রিসিও ফুলভিন নামে একটি নতুন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এই ঔষধটির প্রয়োগের ক্ষেত্র অনেকখানি প্রসারিত হয়েছে। অ্যান্‌জিনা পেক্টোরিস নামে হৃদ্‌রোগে এই ঔষধটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে—বুকের যন্ত্রণা উপশম হয়েছে। নিউ অরলিয়েন্সের টুলেন স্কুল অব মেডিসিনের গবেষকেরা এই আবিষ্কার করেছেন। জনৈক বয়স্ক রোগীর দেহে চর্মরোগের চিকিৎসায় এই ঔষধটি প্রয়োগ করা হয়। তিনি অ্যান্‌জিনা পেক্টোরিস রোগেও ভুগছিলেন। এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে তাঁর বুকের যন্ত্রণার উপশম হয় ও অ্যান্‌জিনা পেক্টোরিসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পান। চিকিৎসকেরা এর পর দশটি রোগীর হৃদ্‌রোগের চিকিৎসায় এই ঔষধটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পান। সপ্তাহে যারা অন্ততঃ ২০ বার অ্যান্‌জিনা পেক্টোরিস রোগে আক্রান্ত হতেন, এই ঔষধ প্রয়োগের ফলে সেই সংখ্যাও অনেকটা হ্রাস পায়।

ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বলতম বস্তুর সন্ধান

মাউণ্ট উইলসন ও প্যালোমার মানমন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ডে বহু দূরবর্তী পাঁচটি উজ্জ্বল তারকা সমন্বিত ছায়াপথের নির্দেশ করেছেন। ঐ সকল ছায়াপথের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও ভাঙ্গাগড়া চলছে। এর ফলে পৃথিবী থেকে এরা এত উজ্জ্বল দেখায় যে, আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এতকাল মনে করে এসেছেন ঐ সকল তারকা রয়েছে পৃথিবীরই ছায়াপথের মধ্যে। এদের মধ্যে দুটি পৃথিবীর ছায়াপথের নক্ষত্র থেকে একুশ গুণ উজ্জ্বলতর। পৃথিবীর ছায়াপথের মধ্যে সূর্যসহ দশহাজার কোটি নক্ষত্র রয়েছে। এই সকল ছায়াপথ আবিষ্কারের ফলে এই কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্তমান দূরবীক্ষণের সাহায্যে একহাজার কোটি থেকে বারো-শ' কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত বস্তুর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান মত হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড সম্প্রসারণশীল, ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই একটি অন্যটি থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। সুতরাং এর পরে এক হাজার কোটি বা বারো-শ' কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত বস্তুর সন্ধান দূরবীক্ষণের সাহায্যে আর পাওয়া যাবে না। কারণ ঐ সকল তারকা অতি দ্রুত বহু দূরে সরে যাচ্ছে এবং আলোর গতির তুলনায় এদের এই সরে যাওয়ার গতি অনেক বেশী। তাদের আলোক পৃথিবীতে কোন দিনই এসে পৌঁছুবে না। (এক আলোকবর্ষ দূরত্ব বললে এক বছরে আলোকরশ্মি যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, তাই বুঝায়। আলোক প্রতি সেকেণ্ডে চলে ১৮৬৩২৬ মাইল। সুতরাং এক বছরে আলোকের গতি হবে ১৮৬৩২৬ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল)।

খাদ্য কি ভাবে দেহে শক্তি সঞ্চার করে?

খাদ্য কি ভাবে দেহে শক্তি সঞ্চার করে এবং তা কি ভাবে শক্তিতে রূপান্তরিত হয়—শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তার সন্ধান করেছেন। তাঁরা দেখেছেন যে, দেহের জীবন্ত কোষে শক্তি সঞ্চারিত হয় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর সাহায্যে। খাদ্যই হলো সেই শক্তির উৎস। অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা দেহ-কোষে ঐ সকল অণুর সন্ধান পেয়েছেন। এদের মাথা পলকাটা এবং দেহ লম্বা চোঙের মত। দেহ ও মস্তক দুটিরই আয়তন এক ইঞ্চির এককোটি ভাগেরও কম। মানুষের দেহ-কোষে ৫০ থেকে ৫০০০ মাইটোকন্‌ড্রিয়া রয়েছে। তাদের সাহায্যেই খাদ্যের অণু থেকে ঐ কোষে জারণ বা অক্সিডেশন ক্রিয়ায় শক্তি সঞ্চারিত হয়ে থাকে। এই রাসায়নিক রূপান্তর সাধনে ৭০ রকমের বিভিন্ন এন্‌জাইম ও কো-এন্‌জাইম সংশ্লিষ্ট রয়েছে, ২০ রকম এন্‌জাইম রয়েছে দেহ-কোষের ঐ প্রাথমিক অণুসমূহেই।

পাণ্ডু রাজার ঢিবির প্রাচীনত্ব

অজয় উপত্যকায় পাণ্ডু রাজার ঢিবির দ্বিতীয় যুগ তিন হাজার বছরেরও বেশী প্রাচীন। ঐ যুগের কাল খৃষ্টপূর্ব ১০১২ হইতে খৃষ্টপূর্ব ১১৩২ সাল। ঐ ঢিবি হইতে সংগৃহীত নিদর্শনের 'রেডিও কার্বন' পরীক্ষার দ্বারা এই সময় নির্ধারিত হইয়াছে।

প্রকাশ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় ঐ রেডিও-কার্বন পরীক্ষার শেষে সম্প্রতি উপরিউক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের এক মুখপাত্র বলেন যে, ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের এই সিদ্ধান্তের পর বাংলা দেশ এশিয়ার তাম্র ও ব্রোঞ্জ সভ্যতার মানচিত্রে সন্দেহাতীতভাবে স্থান লাভ করিল। তিনি বলেন, পাণ্ডু রাজার ঢিবির প্রথম যুগের সভ্যতা আরও প্রায় ২০০ বছর, অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় ৩৩০০ বছরের মত প্রাচীন। আগামী শীতকালে ঐ ঢিবিতে আরও ব্যাপক খনন-কার্যের পরিকল্পনা হইতেছে বলিয়া তিনি জানান।

নিদ্রা-বিদায়

লণ্ডন, ৯ই সেপ্টেম্বর—এই শতাব্দীর শেষাশেষি মানুষের মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমাইলেই চলিবে।

"মেডিক্যাল নিউজ" পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে থাটনের মানসিক রোগ চিকিৎসা হাসপালের বিশেষজ্ঞ ডাঃ নরসিংহম্ পাই বলেন, শতাব্দীর পর শতাব্দী, মানুষের নিদ্রা হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে এবং তাহা আরম্ভ হইয়াছে অন্ধকার দূর করিবার জন্য কৃত্রিম আলো আবিষ্কারের দিন হইতে। মানব বিবর্তনের পথে নিদ্রার প্রয়োজন আরও হ্রাস পাইবে। ডাঃ পাই আরও বলেন, হাতে দরকারী কাজ থাকে না বলিয়াই নিদ্রার প্রয়োজন।

জাগিয়া থাকিবার উৎসাহ যাহারা পায় না, তাহারাই সর্বক্ষণ ঘুমের প্রয়োজন বোধ করে।

চন্দ্রলোকে প্রথম মানব-অভিযান

নিউইয়র্ক, ১লা সেপ্টেম্বর—'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকায় প্রকাশ, কারিগরী ও অন্যান্য কয়েকটি সমস্যা দেখা দেওয়ায় চন্দ্রলোকে প্রথম মার্কিন মানব-অভিযানের তারিখ পিছাইয়া যাইতেছে

বর্তমান দশকের শেষাশেষি চন্দ্রলোকে মানুষ পাঠানো সম্ভব হইবে কিনা, সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে। প্রস্তুতি পর্বে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে পৃথিবীর চতুর্দিকস্থ কক্ষপথে পরীক্ষামূলক প্রথম পরিক্রমার যে সঙ্কল্প এতদিন ছিল, ১৯৬৫ সালের শেষ ভাগে বা ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে তাহা হয়তো সম্ভব হইতে পারে।

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা ছুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

সম্পাদক—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য**

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

জন্ম—২৪শে অক্টোবর, ১৮৯০ মৃত্যু—১৩ই অগাষ্ট, ১৯৬৩

[শ্রীকল্যাণকুমার মিত্রের সৌজন্যে]

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ নভেম্বর, ১৯৬৩ একাদশ সংখ্যা

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে (আপার সারকুলার রোড) বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে আজকাল বিজ্ঞানের নানাবিধ শাখার শিক্ষার বন্দোবস্ত হয়েছে। প্রথম যখন এই বাড়ীর গোড়াপত্তন হয়, তখন ওই তিনতলা বাড়ী কেবলমাত্র উচ্চাঙ্গের রসায়নশাস্ত্রের শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত হবে—এই অনেকে মনে করতেন। আচার্য রায় যখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এই বাড়ীতে গবেষণা সুরু করেন, তখনও এই ধরণের কথাই বিজ্ঞানীমহলে শোনা যেত। অবশ্য তারকনাথ পালিত এবং রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে যে দান বিশ্ববিদ্যালয় পেয়েছিলেন, তা বিভিন্ন রকম বিজ্ঞানের শিক্ষায় নিয়োজিত হবে—এই নির্দেশ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ও তা-ই চেয়েছিলেন। তবে তখন মহাযুদ্ধের হিড়িক চলছে। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের অধ্যাপক যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তাঁরা তখন সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করতে পারেন নি। অধ্যাপক রামন তখনও সেকালের সরকারী বিভাগে কাজ করছেন। ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু এবং অধ্যাপক আগরকার তখন জার্মেনীতে অন্তরীণ। তবু সার আশুতোষ মনে করলেন অচিরে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্লাশ সুরু করা দরকার। যন্ত্রপাতির অভাব নানাভাবে মেটাবার চেষ্টা হলো। কতক যন্ত্রপাতি জাতীয় শিক্ষাপরিষদে পাওয়া গেল, কতক আনা হলো বহরমপুর-কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে। শিবপুরেও তখন সূক্ষ্ম কাজের উপযোগী কয়েকটা যন্ত্র ছিল, যা বহুদিন আগে আনা হলেও সাধারণ শিক্ষার কাজে লাগতো না। জার্মান অধ্যাপক ব্রুল ভেবেছিলেন, এদেশীয় ছেলেরা সূক্ষ্ম মাপজোখে দক্ষ হবে। তাই থিওডোলাইট, মানদণ্ড ইত্যাদি যা সংগ্রহ করেছিলেন, তা তখনকার যুগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রার্থীদের পরীক্ষার সময় চমক ও ভীতি উদ্রেক করতো।

সার আশুতোষের আগ্রহে ১৯১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুনভাবে শিক্ষা-দীক্ষার আয়োজন হলো। পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্লাসও সুরু হবে। এজন্যে জনকয়েক নবীন ডিগ্রীধারীদের তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানের লেকচারার নিযুক্ত করে সতেরো সাল থেকে স্নাতকোত্তর ক্লাস সুরু করে দিলেন। ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র সেই সময় এসে যোগদান করলেন। সার সি. ভি রামন তখনও ২১০ নম্বরের বহুবাজার ষ্ট্রীটে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে এসে সরকারী কাজের পর যা কিছু তাঁর অবসর মিলতো, সবই গবেষণার কাজে লাগাতেন। তাঁর উৎসাহ অনেকের মনে আশার সঞ্চার করেছিল। উচ্চাঙ্গের গবেষণা করবার দুরাশা অনেকেরই হয়েছিল। তাই তাঁরাও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে প্রোফেসর রামনের কাছে গবেষণা সুরু করলেন।

এদিকে উচ্চাঙ্গ গণিতের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে ডাঃ গণেশপ্রসাদ কিছুদিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। তিনি সার আশুতোষকে সাহায্য করবার জন্যে ছাত্রদের গবেষণার কাজে লাগিয়ে দিলেন। এঁরা প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য হয়ে ডক্টরেট উপাধি পেয়েছিলেন। পরে এই দলের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে শিক্ষকের কাজ গ্রহণ করেন।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ও ফণীভূষণ ঘোষ, এঁরা দুজনেই, আলোক-তরঙ্গ বাধা পেলে কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়ে অন্ধকার রাজ্যেও আলোছায়ার বিচিত্র সমাবেশ সৃষ্টি করে—তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে মিত্র মশায়ের কাজ ছিল এই ধরণের। সেই সময়-কার আনি-দুয়ানির যে বিচিত্র রকম ঢেউ খেলানো বেড় ছিল, আলো সেই বাধাকে ডিঙিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে ছায়ারাজ্যে প্রবেশ করতো, তাদের বিচিত্র সমাবেশ সম্পর্কে ডাঃ মিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতেন। এই ভাবে পরীক্ষায় যে নতুন তত্ত্ব প্রকাশিত হলো, তা নবীন বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছিলেন ম্যাক্সওয়েলের তরঙ্গবাদ দিয়ে বুঝতে। এই ধরণের কাজ এদেশে একেবারে নতুন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তখন পদার্থ-বিজ্ঞানের কাজ থেকে সরে গিয়ে উদ্ভিদ-জগতে প্রাণের বিচিত্র অভিব্যক্তির রহস্য উদ্ঘাটনে নিমগ্ন রয়েছেন। পদার্থ-বিজ্ঞানীরা তাই তাঁর কাছে বিশেষ আমল পেত না। অধ্যাপক রামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাভিলাষী ছাত্রদের পথ নির্দেশ করে এদেশে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন।

গতানুগতিকভাবে বিজ্ঞান কলেজে স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু হলো। কিছুকাল পরে ডাঃ রামন পালিত অধ্যাপক হয়ে যোগদান করলেন। তবে তাঁর নিজের গবেষণা নিয়ে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে কাজ করতেন। যে সব ছাত্র তাঁর কাছে গবেষণাধীন ছিল, তারা সব সময় বহুবাজারেই কাজ করতো, যদিও আধুনিক যন্ত্রপাতি সবই পালিত ফাণ্ড থেকে কেনা হয়েছিল। কিছুদিন পরে ডাঃ রমনের ঐকান্তিক সাধনা সাফল্য লাভ করলো এবং বিজ্ঞান-লক্ষ্মী তাঁকে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। যে নতুন ধরণের কাজ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সেই তথ্য উদ্ঘাটনের দরুণ নোবেল পুরস্কার তাঁর ভাগ্যে জুটলো। ডাঃ মিত্র ও অন্যান্য নবীন ছাত্রেরা তাঁরই অনুকরণে গবেষণা ও অধ্যাপনা—এই দুই কাজেই নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

কিছুদিন বাদে ডাঃ মিত্র ফরাসী দেশে গিয়ে নতুন ধরণের কাজকর্ম সুরু করলেন। যুদ্ধোত্তর কালে ইলেক্ট্রন ভাল্‌বের উচ্চাঙ্গের বিকাশের ফলে বিদ্যুৎ-বার্তা প্রেরণ তখন সহজসাধ্য হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের কম্পন তুলে ইথারের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বহু দূরে সংবাদ প্রেরণ করা যায়—এই বিস্ময়কর আবিষ্কার প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যেই ঘটেছিল। আগে বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, হাজার হাজার মাইল দূরে খবর পাঠাতে হলে

সেই অনুযায়ী শক্তিশালী প্রেরকের সাহায্য নিতে হবে। এখন দেখা গেল, ছোটখাটো তরঙ্গের সাহায্যে এই ধরণের খবরও বহু দূরদেশে পাঠানো যায় ও ইলেকট্রন ভাল্‌ভের গুণে তার ক্ষীণশক্তি স্ফীত করে সহজ শ্রবণযোগ্য করা যায়। কুজপৃষ্ঠ পৃথিবীর উপরে অবস্থিত গবেষণাগার থেকে যে তরঙ্গ উৎপন্ন করা হতো, তা পৃথিবীর বিশেষ আকৃতির জন্যে সমতল আশ্রয় করে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে না—গণিতজ্ঞেরা এটা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। কাজেই অন্য ধরণে এই ক্ষুদ্রকায় তরঙ্গের প্রসার চলেছে—এটা বিজ্ঞানীরা বুঝলেন। এইভাবে নজর পড়লো হেভিসাইড ও অ্যাপলটন-এর কল্পিত উচ্চাকাশের আয়নমণ্ডলের দিকে। ছোট ছোট তরঙ্গগুলি প্রথমে উর্ধ্বে ছুটে গিয়ে এই আয়নমণ্ডলে প্রতিহত হয়ে আবার পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে। তখন আয়নমণ্ডল প্রায় আরসীর মত কাজ করে। বিরাট বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে গেলেও তরঙ্গের শক্তির বিশেষ হ্রাস পায় না বলেই এই ধরণের সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছিল—এটা বিজ্ঞানীরা বুঝলেন। যে সব বিজ্ঞানী এই নতুন আবিষ্কৃত রাজ্যে কাজ করতে এগিয়ে এলেন, ডাঃ মিত্র তাঁদের মধ্যে একজন এবং ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম। এঁরই উৎসাহে আকাশবাণীর প্রাক্‌-যুগেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান কলেজ থেকে নানাবিধ চিত্তাকর্ষক প্রোগ্রাম প্রচার করা হতো। তার কথা হয়তো এখনো অনেকের মনে আছে।

ফ্রান্স থেকে ফিরে আসবার পর ডাঃ মিত্র বেতার বিভাগ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন এবং পেলেনও অনেক উৎসাহী ছাত্র। পরে ডাঃ রামন চলে যাবার পর তিনি রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক হলেন এবং নানাভাবে গবেষণা চলতে লাগলো। রক্ষিত, ভড় প্রমুখ কৃতী ছাত্রেরা, যাঁরা তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা পান—তাঁরা বেতার বিষয়ে নতুন নতুন কাজ করে যশস্বী হয়েছেন। উচ্চাকাশে আয়নমণ্ডল কি করে সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে ডাঃ মিত্র অনেক দিন গবেষণা করেছিলেন। যে গবেষক গোষ্ঠী তিনি একত্র করেছিলেন, তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আয়নমণ্ডল সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন, যাতে ডাঃ মিত্রের সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। বিদেশ থেকেও এলো তার স্বীকৃতি।

বেতার-বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স-এর একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ গঠনের জন্যে ডাঃ মিত্র বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উভয়েই উপলব্ধি করলেন, এই বিষয়টি পদার্থ-বিজ্ঞানের অংশ হিসাবে অনুশীলিত হওয়ার চাইতে একটি সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ বিভাগ গঠন করা প্রয়োজন। তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের মধ্যে একটি নতুন গবেষণা-কেন্দ্র সৃষ্টি হলো। সেখানে ডাঃ মিত্র যে কাজ আরম্ভ করেন, তার নানা দিকে ব্যবহার ও বিকাশ চলেছে।

সারা জীবন বিজ্ঞান-সাধনার কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি একটি সতেজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর ছাত্রেরা তাঁরই পরিকল্পনা রূপায়িত করবার জন্যে পরিশ্রম করছেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি যে বিজ্ঞানের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন, তা সকলের সামনে পথনির্দেশক হিসাবে সারা দিক দীপ্ত করে রাখবে।

সেই যুগে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের কথা প্রচার করবার জন্যে যে অল্পসংখ্যক কৃতী লেখক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ডাঃ মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তাঁর প্রথম থেকেই যথেষ্ট সদ্ভাব ও সম্প্রীতি ছিল। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর এই বিশেষ সংখ্যায় তাঁর জীবনের এই কথা স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের অবদান

শঙ্করসেবক বড়াল

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় আয়নমণ্ডল ও ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কিত গবেষণায় অতিবাহিত করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে যখন তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন, তখন বেতারের নতুন যুগ। বেতার-তরঙ্গে দূরপাল্লার যোগাযোগ সবে সম্ভব হয়েছে। রেডিও ভাল্‌ভ্‌ আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবী-পৃষ্ঠের বক্রতা সত্ত্বেও কি ভাবে বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান সঞ্চিত হয়েছে। পৃথিবী থেকে উঁচু দিকে ধাবমান বেতার-তরঙ্গগুলিকে আয়নোস্ফিয়ার নামে যে আয়নটি পৃথিবী-পৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়, তার সন্ধানও তখন পাওয়া গেছে। সারা পৃথিবীতে তখন বেতারের ক্ষেত্রে অনুশীলনরত পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এই আয়নোস্ফিয়ারের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনে আগ্রহান্বিত হয়েছেন। ঠিক সেই সময়ে আমাদের ভারতবর্ষে এই বিষয়ে প্রথম মনোনিবেশ করেন বেতার যুগের যুগাবতার অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র।

ভূপৃষ্ঠচারী বেতার-তরঙ্গ ও আয়নোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত শূন্যচারী বেতার-তরঙ্গ কি ভাবে প্রবাহিত হয়, তাদের প্রবাহের পথে জল, মাটি বা তড়িৎযুক্ত বাতাস যা কিছু পড়ে তাদের কি প্রভাব এবং বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠ ও আকাশ সম্বন্ধীয় কি কি বৈজ্ঞানিক তথ্য বোধগম্য হয়—এই নিয়েই অধ্যাপক মিত্রের কাজ সুরু হলো। কাজের পরিধি ক্রমেই স্রোতের ধারার মত ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু ক্রমশঃ প্রসারিত হলো ঊর্ধ্বাকাশ ও আবহবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—মেরুজ্যোতি, অমানিশার আকাশের আলো, সৌরতেজ, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ইত্যাদি নানান বিষয়ে। এক বিরাট শিষ্যদলের নেতৃত্ব নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন। সারা বিশ্ব তাঁর গবেষণার ফল মেনে নিল। তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে সম্মানিত হলেন। ঊর্ধ্বাকাশ সম্বন্ধীয় সারা পৃথিবীব্যাপী গবেষণার বিষয় লিপিবদ্ধ করে তিনি এক পুস্তক প্রণয়ন করলেন। তাঁর অন্যান্য কাজ বাদ দিলেও শুধু এই পুস্তকের জন্যেই তিনি বিজ্ঞানীসমাজে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আকাশ ও মহাকাশ সম্বন্ধীয় গবেষণাগারগুলিতে তাঁর এই পুস্তক গীতা বা মহাভারতের মতই সমাদৃত। এই পুস্তক প্রণয়ন সম্বন্ধে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এড্‌ওয়ার্ড অ্যাপল্‌টন বলেছেন—এই বৃহৎ পুস্তক এক অসীম সাহসের মূর্ত প্রতীক। এই বইটি লিখে অধ্যাপক মিত্র সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। ঊর্ধ্বাকাশ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এই পুস্তকখানি অপরিহার্য। এটি ঊর্ধ্বাকাশের বাইবেল।

বাস্তবিকই ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যেই তাঁর এই পুস্তকের দুটি সংস্করণ নিঃশেষিত হয়ে যায়। ভারতের বাইরের বৈজ্ঞানিক সমাজই এই পুস্তকের বেশীর ভাগ ক্রয় করেন। আজ পর্যন্ত এই প্রকারের বৈজ্ঞানিক মহাভারত আর কেউ লিখে উঠতে পারেন নি। রাশিয়াতেও তাঁর বই সম্মানিত, সমাদৃত ও রুশভাষায় অনূদিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের স্বদেশীয় ব্যক্তির এই যে বিজয়বার্তা পৃথিবী জুড়ে ঘোষিত হয়েছে, এটি

আনন্দেরই কথা। আনন্দ প্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্য ও সবলতা প্রকাশের প্রয়োজন, সে বল বা স্বাস্থ্য বুঝি আমাদের নেই! অধ্যাপক মিত্রের কীর্তি একটি বৃহৎ কীর্তি। এই বৃহৎ কীর্তি কিরূপে সংক্ষেপে পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপিত করবো, তা জানি না। ছোটমুখে বড় কথা বলে যাব। পাঠকবর্গ ক্ষমা করবেন।

তখন ভারতবর্ষে মাত্র কয়েকটি মধ্যম তরঙ্গের বেতার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই কেন্দ্রগুলির প্রভাবের পরিধি তখনও জানা যায় নি। প্রেরক যন্ত্র থেকে যতদূর যাওয়া যায়, বেতার-তরঙ্গের ক্ষেত্র ততই ক্ষীণ হয়ে আসে। স্থানীয় জল ও মাটি কি ভাবে বেতার-তরঙ্গের শক্তি শোষণ করে, তা মধ্যম তরঙ্গের বেতার-কেন্দ্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়। ভারতবর্ষে এই বিষয়ে প্রথম কাজ সুরু করেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র।

বেতারে বার্তা প্রেরণের কৌশল জানবার পর সরকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি প্রথম প্রথম দীর্ঘ ও মধ্যম তরঙ্গের ব্যবহার সুরু করে। সৌখীন বেতার-উৎসাহীদের জন্যে তখন ২০০ মিটারের কম দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ বেঁধে দেওয়া হয়। এই বেতার-উৎসাহীরাই কিন্তু প্রথম দেখালেন যে, দূরপাল্লার যোগাযোগে হ্রস্ব তরঙ্গের ব্যবহার সবচেয়ে উপযোগী। হ্রস্ব তরঙ্গে যোগাযোগ মধ্যম তরঙ্গ বা দীর্ঘ তরঙ্গ অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে এবং অল্পায়াসে সাধিত হয়। হ্রস্ব তরঙ্গের এই প্রয়োগের পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক মহলে কৌতূহল জাগিয়ে তুললো। কয়েক বছরের মধ্যেই বেতার-বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে হ্রস্ব তরঙ্গের কদর বেড়ে গেল। প্রমাণিত হলো যে, আয়নোস্ফিয়ারে প্রবাহকালে হ্রস্ব তরঙ্গের শক্তি অন্যান্য তরঙ্গের শক্তি অপেক্ষা অনেক কম শোষিত হয়।

ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডল ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে ছড়িয়ে গেছে। তার শেষ সীমারেখা কয়েক হাজার মাইলেরও উপরে। তবে এই বায়ুর আস্তরণকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়—ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার ও এক্সোস্ফিয়ার। পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে ৫০ কিলোমিটার থেকে আরম্ভ করে অন্যূন ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত আয়নোস্ফিয়ারের বিস্তৃতি। আয়নোস্ফিয়ারের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী। মুক্ত ইলেকট্রন ও ধনতড়িৎ, ঋণতড়িৎ-বিশিষ্ট আয়ন আছে বলেই এই বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী। বায়ুস্তরের উপর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে এই আয়নোস্ফিয়ারের সৃষ্টি। বিজ্ঞানের দিক থেকে এই আয়ন সৃষ্টির অনুশীলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই অনুশীলনে অণুর বিভাজন, ইলেকট্রন ও আয়নের সংযোজন, সূর্যরশ্মির শোষণ ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সূর্যতেজে আয়নোস্ফিয়ারের সৃষ্টি। তাই দিনে-রাতে, শীতে-গ্রীষ্মে এবং সৌরতেজের চক্রপরিবর্তনে এর রূপ বদ্‌লায়। আবার পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ আছে। আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানবার জন্যে তাই পৃথিবীতে অনেক মানমন্দিরের প্রয়োজন।

আয়নোস্ফিয়ারে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন থেকে একদিকে যেমন সবচেয়ে উপযোগী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সিদ্ধান্ত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি প্রতিফলিত তরঙ্গের প্রকৃতি থেকে আয়নমণ্ডলের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক শিশিরকুমার মিত্র এই সব তথ্য আহরণ করবার চেষ্টা করেন। আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলির সৃষ্টির সঠিক কারণ নির্ণয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে অধ্যাপক মিত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। যে সময়ে অধ্যাপক মিত্র তাঁর গবেষণা করেন, তখন ঊর্ধ্ববায়ুস্তর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বেতার-তরঙ্গের সাহায্য ছাড়া পাওয়া যেত না। আজ যে ঊর্ধ্বাকাশে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো সম্ভব হয়েছে, তার মূলে আছে এই

বায়ুস্তর সম্বন্ধে বেতার-তরঙ্গলব্ধ প্রারম্ভিক জ্ঞান। এই প্রাথমিক জ্ঞানের মূলে যে সব শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অবদান আছে, অধ্যাপক মিত্র তাঁদের মধ্যে একজন।

বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা বললেন—আয়নোস্ফিয়ারের সর্বনিম্নে একটি স্তর থাকা সম্ভব, যা হ্রস্ব ও মধ্যম তরঙ্গকে শোষণ করে এবং অতিদীর্ঘ তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে। কিন্তু সম্ভাবনাই প্রমাণ নয়! কেবল অনুমান বা যুক্তিবলে এর অস্তিত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না—প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবশ্যক। অধ্যাপক মিত্রের তত্ত্বাবধানে যে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা সুরু হলো, সেই যন্ত্রে এই শোষণকারী D-স্তর সর্ব প্রথম ধরা পড়লো।

সূর্যগ্রহণের সময় আয়নমণ্ডলে যে সব দ্রুত পরিবর্তন সুরু হয়, তার অনুধাবনে অনেক মূল্যবান বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগৃহীত হয়। যাঁরা সর্বপ্রথম সূর্যগ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে আয়নোস্ফিয়ারের পর্যবেক্ষণ চালান, অধ্যাপক মিত্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বে সবচেয়ে বেশীবার এই পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে এবং অনেক মূল্যবান তথ্যও পাওয়া গেছে।

আয়নোস্ফিয়ার সংক্রান্ত গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে অধ্যাপক মিত্র আরও অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার মূল সূত্রান্বেসণে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। মেরু-জ্যোতির বর্ণালীর উৎস সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক নিবন্ধগুলি পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকমহলে প্রশংসা অর্জন করলো। অমানিশার আকাশের আলো কি ভাবে সৃষ্টি হচ্ছে, তারও মৌলিক কারণ তিনি দিলেন। এই আলোকের উৎস আমাদের এই গ্রহের আয়নোস্ফিয়ার—একথা তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলেন। বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরের সঙ্গে উর্ধ্বাকাশের আয়নমণ্ডলের অবস্থা পরিবর্তনের কোন যোগাযোগ আছে কি না, সে সম্বন্ধেও তিনি তাঁর গবেষণা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাস সৃষ্টি করে তার আলোকের উৎস সম্বন্ধেও তিনি আলোকপাত করেন।

১৯৩২-'৩৩ সালে আন্তর্জাতিক মেরুবছরের কাজ সুরু হয়। সেই সময় আয়নোস্ফিয়ার ও পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে সারা পৃথিবীব্যাপী এক গবেষণার কাজ চালানো হয়। ইউরোপের অনেক দেশ এতে অংশ গ্রহণ করে। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষই এই গবেষণায় অংশ গ্রহণ করে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে অংশ নেয় কেবলমাত্র অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ। এরপরে ভারতবর্ষে বেতার আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করবার কাজ তিনিই প্রথম আরম্ভ করেন। আজ ভারতীয় বিমান সংস্থা, রেডিও-প্রবাহ সংস্থা. বৈদেশিক রেডিও-টেলিফোন সংস্থা, আকাশবাণী প্রভৃতি এই কাজের মর্ম পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করছেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

১৯৫৭-'৫৮ সালে আন্তর্জাতিক ভূপদার্থতাত্ত্বিক বছর (I. G. Y.) নামে আর একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা বছর সুরু হয়। আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এই গবেষণার একটি বড় অংশ ছিল। ভারতবর্ষে এই সময়েও অধ্যাপক মিত্রের নেতৃত্বে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

বিশ্বের বিজ্ঞান সংস্থায় অধ্যাপক মিত্রের মহান নেতৃত্ব ভারতবর্ষকে অলঙ্কৃত করেছে। ১৯৪৯ সালে আমেরিকায় আন্তর্জাতিক আয়নোস্ফিয়ার কনফারেন্সে তিনি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। বিশ্বের বেতার-বিজ্ঞান সংস্থায় ১৯৫২ সালে সিড্‌নী অধিবেশনে ও ১৯৫৪ সালে হেগ্‌ অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসাবে তিনি যোগদান করেন ও এই সংস্থার আয়নোস্ফেরিক কমিশনে নেতৃত্ব করেন।

অধ্যাপক মিত্র বেতার-বিজ্ঞানে ভারতবর্ষে কাজ সুরু করেন সর্বপ্রথম। আজ ভারতবর্ষে ২০-৩০টি গবেষণাগারে ক্ষুদ্র বা বৃহদাকারে

আয়নোস্ফিয়ার যা ঐ সংক্রান্ত গবেষণা চলছে। এর প্রত্যেকটিতে যাঁরা নেতৃত্ব করেছেন, তাঁরা সকলেই অধ্যাপক মিত্রের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ষ্টিটিউট অব রেডিও-ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্স, হরিণঘাটার আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড ষ্টেশন তাঁর অনেক কীর্তির মধ্যে দুটি জলন্ত কীর্তি। উর্ধ্বাকাশ সম্বন্ধীয় বইখানি আবার সারা পৃথিবীতে এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকেরই কীর্তি ঘোষিত করছে। আয়নোস্ফিয়ার সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর নেতৃত্ব শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বের সকল লোকই মেনে নিয়েছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মৌলিক অবদান বিশ্ববাসী স্বীকার করে নিয়েছে।

আজ ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক মহাকাশ অভিযান সংস্থায় অংশগ্রহণ করেছে—উর্ধ্বাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের চেষ্টা করছে। অধ্যাপক মিত্রের অবর্তমানে ভারতের এই প্রচেষ্টা আজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের বেতার-গবেষণার প্রথম দিকের কথা

শ্রীহৃষীকেশ রক্ষিত

আমার জীবনে যে কয়জন শিক্ষকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শিশিরকুমার অন্যতম। ছাত্রদের প্রতি দরদ ছিল তাঁর অসীম, অথচ সাধারণ রীতিবিরুদ্ধভাবে কোন ছাত্রের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব দেখাতে শুনি নি। ছাত্রদের প্রতি তাঁর স্নেহ ও সহানুভূতি কখনও কখনও এমন আকার ধারণ করেছে যে, তাঁর আপন পুত্রদেরও বিক্ষুব্ধ করেছে শুনেছি। বাইরে সাধারণতঃ তিনি খুব গম্ভীর, কখনও বা কঠোর থাকলেও তাঁর অন্তর ছিল অতি কোমল।

আমার মনে আছে, যখন ১৯২৮ সালে এম. এস-সি পাশ করবার পর তাঁর কাছে বেতার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে যাই, তখন প্রথমে মোটেই উৎসাহ দেন নি এবং কেন গবেষণা করবার ইচ্ছা হয়েছে, সে সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন। সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যখন বোঝালেন—আমি তাঁর কাছে বেতার সম্পর্কে কাজ করা স্থির করেছি, তখন বল্লেন—আমার কাছে তো এখন কোন ছাত্র-বৃত্তি নেই, তুমি কেমন করে কাজ করবে? সে প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, তবে সকল কথা শুনে বিশেষ সহানুভূতির সঙ্গে বলেছিলেন—যদি ভাল কাজ করতে পার, তাহলে একটা বৃত্তির চেষ্ট করবো। আসলে কিন্তু ভাল কাজের অপেক্ষা না করেই আমার জন্যে একটি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। যে দিন তাঁর গবেষণাগারে প্রথম যাই, সেদিন তাঁর রিসার্চ স্কলার বন্ধুবর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেছিলেন—এখানে কাজ করতে এসেছেন বটে, তবে পুরস্কারও পাবেন না, তিরস্কারও পাবেন না। তাঁর এই কথায় সত্যই একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু হতাশ হই নি। পরবর্তী কালে আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিন্তু একেবারে বিপরীত হয়েছে।

আমার উপর প্রথম ভার পড়ে গবেষণাগারে যে বিশালকায় Atmospheric Recorder ছিল, তার Amplifier-এর ভাল্‌ভগুলি পরীক্ষা করে দেখবার। এখনকার মত Valve tester তখন

ছিল না, তাই মামুলি প্রথায় Characteristic টেনে প্রতিটি ভাল্‌ভের অবস্থা স্থির করতে হতো। কাজের ফলাফল নিয়ে যখন অধ্যাপকের কাছে যাই, তখন সব দেখে তিনি মন্তব্য করে-ছিলেন হুঁঃ, ভাল্‌ভগুলির বেশীর ভাগই তো ভাল আছে, সন্দেহজনক যা দু-একটা আছে তা বদল করে রেকর্ডারটা চালু করবার চেষ্টা কর। তাঁর কাছে কাজের বিশেষ উৎসাহ বা সক্রিয় সাহায্য না পেলেও তিনি যে বিরূপ মন্তব্য করেন নি, সেটাই যথেষ্ট পুরস্কার বলে মেনে নিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে একদিন অধ্যাপক রামন ইংল্যাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি অধ্যাপক মিত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইলেকট্রন-স্তর যে আলোকের গতির পরিবর্তন করতে পারে, তাতে সেই ইঙ্গিত ছিল। আমরা তখনই গবেষণাগারের মধ্যে তা প্রমাণ করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করতে লেগে যাই। আমাদের বিচারের ফলাফল ১৯২৯ সালে 'Nature' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্রের গবেষণার সেই হয় প্রথম কাজ। কাগজে কলমে আমাদের বিচারের ফল আশাপ্রদ এবং পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা সম্ভব মনে হয়েছিল বটে, তবু বহু পরিশ্রম করেও আমরা পরীক্ষার দ্বারা তা প্রমাণ করতে সক্ষম হই নি। তার কারণ এখন সম্যক উপলব্ধি করলেও তখনকার দিনে আমাদের চিন্তাধারায় তার স্থান ছিল না।

ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে কলিকাতায় বেতার-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল; প্রেরক যন্ত্র ও এরিয়েল বসানো হয়েছিল কাশীপুরের টালা অঞ্চলে। টালার কাছাকাছি কোন কোন অঞ্চল এবং আরও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীরা অভিযোগ করতে থাকেন যে, তাঁরা বেতারের অনুষ্ঠান ভালভাবে শুনতে পারছেন না। অভিযোগের কথা অধ্যাপক মিত্রের গোচরে আনা হলে আমরা বিচার করে দেখলাম যে, বেতার-তরঙ্গের এই আপাত-প্রতীয়মান অনিয়মের, অর্থাৎ প্রেরক যন্ত্র থেকে সমান দূরে দুই স্থানে বেতার-তরঙ্গের শক্তি অসমান হবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই বিষয়ে সুনিশ্চিত হবার জন্যে আমরা তখন কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের তরঙ্গের শক্তি কলিকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে কোথায় কেমন হয়, তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা করি এবং ফলাফল Philosophical Magazine পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমরা গবেষণাগারেই তৈরী করে নিয়েছিলাম এবং অধ্যাপক মিত্র আমাদের যথেষ্ট উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তখনকার দিনে গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ছিল এবং বহু পরিশ্রম করে তা আয়ত্ত করতে হতো। ফলে গবেষণার দ্বারা কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে বেশ সময় লাগতো। আমাদের এই প্রচেষ্টায় গবেষণাগারের সহকারী শ্রীসোমেশ চৌধুরী মহাশয় নানাভাবে, সময়ে অসময়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ভূ-তরঙ্গের গতি-বিধিসংক্রান্ত এই গবেষণার দ্বারা একদিকে যেমন বেতার শ্রোতাদের উপরিউক্ত অভিযোগ-গুলি সম্বন্ধে সঠিক সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়েছিল, তেমনি ভারতীয় ভূমির তড়িৎ-পরিবাহিতা সম্পর্কেও অনেক তথ্য আমরা জানতে পেরেছিলাম। ভারতবর্ষে এই ধরণের গবেষণা আমরাই প্রথম করেছিলাম।

এই গবেষণার জন্যে ভাড়া করা মোটর গাড়ীতে আমাদের যন্ত্রপাতি বসিয়ে সহর ও সহরতলীর বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা করেছি (চৌধুরীবাবু সঙ্গে থেকে সহায়তা করতেন) এবং অনেকদিন সারা দুপুর প্রচণ্ড রোদে এইভাবে ঘোরাঘুরি করে বেলা সাড়ে তিনটা-চারটার সময় কলেজে ফিরতাম। কোনদিন বেশী দেরী হলে অধ্যাপককে আমাদের ফেরবার প্রতীক্ষায় অধীরভাবে সময় কাটাতে

দেখেছি। যদি কোন দিন উল্লেখযোগ্য ফল পেয়ে ফেরবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জানাতে গিয়েছি, তিনি বলেছেন—থাক, থাক—পরে শুনবো, আগে একটু ঠাণ্ডা হয়ে নাও। এই রকম ঘটনা হয়তো খুবই সামান্য, কিন্তু এসব ছোট ঘটনার মধ্য দিয়েই মানুষের স্বরূপের সন্ধান পাওয়া যায়।

ভূ-তরঙ্গের গতিবিধি সম্পর্কে আমরা যখন এসব পরীক্ষা করছিলাম, তখন বিদেশে—বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে, ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উপরে কেনেলী-হেভিসাইড পরিকল্পিত তড়িৎ-পরিবাহী স্তরের অস্তিত্ব এবং তার বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে জোর পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল। কেনেলী-হেভিসাইড স্তর উর্ধ্বগামী বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয় এবং তারই ফলে দূরবর্তী দেশের মধ্যে বেতারে সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্ভব হয় বলে অনুমান করা হয়েছিল। আকাশ-তরঙ্গ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উর্ধ্বাকাশের তড়িৎ-পরিবাহী স্তর সম্বন্ধে আরও তথ্য সংগ্রহ করবার আমাদের ইচ্ছা হয়। কয়েক বছর আগে ইংল্যাণ্ডে অধ্যাপক অ্যাপল্টন যে পদ্ধতিতে এই পরীক্ষা করেছিলেন, সেই পদ্ধতিতেই আমাদের পরীক্ষা করা স্থির হলো ; কারণ আমাদের আয়ত্তাধীন যন্ত্রপাতির কথা বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাই সবচেয়ে বেশী সুবিধা-জনক মনে হয়েছিল। কলিকাতার সরকারী বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রেরিত মিডিয়াম তরঙ্গের সাহায্যেই এই পরীক্ষা চালানো হয়েছিল এবং বেতার-কেন্দ্রের কর্মকর্তারা আমাদের প্রয়োজনমত—এমন কি, অতি প্রত্যুষে আমাদের পরীক্ষার জন্যে প্রেরক যন্ত্র চালিয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন।

গবেষণার জন্যে যে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ছিল, তার সবই আমরা নিজেরা তৈরী করেছিলাম এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ থাকায় যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল, তাছাড়া সময়ও লেগেছিল অনেক। পরীক্ষার পদ্ধতির প্রয়োজন অনুযায়ী এমন একটি স্থান নির্বাচন করতে হয়েছিল, যেখানে দিনের বেলায় কেবল ভূ-তরঙ্গ এবং রাত্রিতে ভূ-তরঙ্গ ও আকাশ তরঙ্গ উভয়ই বর্তমান থাকবে, অথচ আকাশ-তরঙ্গের তুলনায় ভূ তরঙ্গ অনেক বেশী শক্তিশালী হবে। ভূ-তরঙ্গের গতিবিধি সম্বন্ধে আমাদের পূর্বের গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং অন্যান্য তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে আমরা স্থির করেছিলাম যে, কলিকাতা থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে দৌলতপুরে আমাদের গবে-ষণার ঘাঁটি করলে কাজের সুবিধা হবে। প্রাথমিক পরীক্ষার জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়ে দৌলতপুরে যাই এবং কয়েক দিন পরীক্ষার দ্বারা যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা নিয়ে কলিকাতায় ফিরে আসি। অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির হয় যে, দৌলতপুরেই আমাদের কাজের সুবিধা হবে। এই সিদ্ধান্তের পর আমাদের পরীক্ষার জন্যে যাবতীয় সাজসরঞ্জাম দৌলতপুরে নিয়ে গিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। দৌলতপুরে প্রায় দু-মাস একাই পরীক্ষা চালিয়েছি। দৌলতপুর কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্বচন্দ্র নাগ মহাশয় এই সময় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। যখন যা উল্লেখযোগ্য তথ্য পেতাম, অধ্যাপক মিত্রকে চিঠি লিখে জানাতাম এবং খুব তৎপরতার সঙ্গেই তিনি উত্তর দিতেন। তখনকার দিনে নিজের সীমাবদ্ধ জ্ঞান সম্বল করে দূর বিদেশে একা গবেষণা চালানো যে কত কঠিন ছিল, তা এখন উপলব্ধি করা কঠিন। পরীক্ষার মধ্যে যন্ত্রপাতির গোলমালের জন্যে এক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, অধ্যাপক মিত্রও হতাশ হয়ে পড়ে-ছিলেন। অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত আমরা সফলকাম হয়েছিলাম। এই পরীক্ষার দ্বারা আমরা একদিকে যেমন হেভিসাইড-স্তর সম্বন্ধে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পেরেছিলাম, তেমনি অপরদিকে গবেষণার যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এবং নিজেদের উপর বিশ্বাস ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এই পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে Philo-sophical Magazine-এ প্রকাশিত হয়েছিল

ইতিমধ্যে অ্যাপলটন তাঁর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ঊর্ধ্বাকাশে দুটি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক স্তর আছে—নীচেরটির নাম দেওয়া হয়েছিল E-স্তর এবং উপরটির F-স্তর। আমরা দৌলতপুরে ঘাঁটি করে কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের মিডিয়াম তরঙ্গমালার সাহায্যে যে গবেষণা করেছিলাম, তাতে কেবলমাত্র E-স্তরের অস্তিত্ব এবং তার বিশেষ ধর্ম সম্বন্ধেই কিছু তথ্য জানতে পেরেছিলাম। দূরবর্তী দেশে বেতার-তরঙ্গের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের কাজে বৈদ্যুতিক স্তরগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা আমাদের গবেষণা নতুন করে চালিয়ে যাওয়া স্থির করি। কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের মিডিয়াম তরঙ্গমালা এই নতুন কাজে সহায়ক হয় নি; কারণ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই কাজে আমেরিকার ব্রেইট ও টিউভ যে পন্থায় ঊর্ধ্বাকাশে বৈদ্যুতিক স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিলেন, সেই পন্থাই বেশী কার্যকরী বিবেচনায় আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম।

আমাদের কাজের উপযুক্ত গ্রাহক ও প্রেরক যন্ত্র দুইই তৈরী করে নিতে হয়েছিল। কত যে পরিশ্রম হয়েছিল এবং সময় লেগেছিল তার ইয়ত্তা নেই এবং কত যে ভুল গোড়ায় করেছিলাম, তা মনে হলে এখন হাসি পায়। কিন্তু তখন আমাদের সাহায্য করবার বা পরামর্শ দেবার কেউ ছিল না—নিজেরাই ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শিখতাম। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অধ্যাপক মিত্রের অভিজ্ঞতা ছিল আমাদের চেয়েও কম, সুতরাং সময় সময় তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়তেন। তবে তাঁকে নিরুৎসাহ হতে দেখি নি। আমাদের কাজে এত বেশী আনন্দ ও অনুরাগ দেখাতেন যে, শেষ পর্যন্ত সকল কাজেই আমরা সফল হয়েছিলাম।

প্রেরক যন্ত্র তৈরী করে বিজ্ঞান কলেজে গবেষণাগারে স্থাপন করা হলো এবং নিজেদেরই তৈরী বিশেষ গ্রাহক যন্ত্র নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা আরম্ভ করা হলো কাশীপুরে টালায় কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রের একটি ছোট ঘরে। সেখানে যাবার প্রধান কারণ ছিল, টেলিফোনে বিজ্ঞান কলেজের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা। প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র এবং আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সবই ছিল বিশেষ ধরণের এবং তাদের কাজের উপযোগী করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিল। যে দিন ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দায় নিঃসন্দেহে ঊর্ধ্বাকাশের আয়নমণ্ডল থেকে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলনের নিদর্শন স্বরূপ বৈদ্যুতিক প্রতিধ্বনি বা Echo-র সন্ধান পাই এবং বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক মিত্রকে সকল অবস্থা বিশ্লেষণ করে বোঝাই, সে দিন তাঁকে এত উৎসাহিত ও উত্তেজিত দেখেছিলাম যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। ক্রমশঃ আমাদের যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধন করে পরীক্ষা চালানো হয় এবং কিছুদিন একটি ছোট মোটর বাসে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বিজ্ঞান কলেজের প্রেরক যন্ত্র থেকে বিভিন্ন দূরত্বে এবং বিভিন্ন দিকে পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফল যথাসময়ে Philosophical Magazine-এ প্রকাশিত হয়।

যখন আমরা মোটর বাসে যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বিভিন্ন স্থানে পরীক্ষা করছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছিলাম যে, প্রেরক যন্ত্র থেকে অন্ততঃ ৪০০ গজের বেশী দূরে গেলে তবেই Echo দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের আগে অ্যাপলটন ও তাঁর সহকর্মীরা প্রেরক যন্ত্র থেকে মাত্র ১৮০ গজ দূরেও Echo দেখেছিলেন; এর চেয়ে কাছে কেউ তখন Echo দেখতে পান নি। আমরা দেখলাম, যদি একই স্থানে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র থাকে, তাহলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়—একজন কর্মী একাই প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র চালিয়ে সব কাজ করতে পারে। এর জন্যে নানা চেষ্টার পর ১৯৩৩ সালে আমরা সফল হই এবং ফলাফল 'Nature' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

প্রথম যে দিন সন্ধ্যার পর আমরা সফলতা অর্জন করি, তখন অধ্যাপক মিত্র গবেষণাগারে এসে Echo দেখে যে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, তা চিরকাল আমার মনে থাকবে। প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র একই স্থানে পাশাপাশি বসিয়ে Echo লক্ষ্য করবার কথা কেউ এর আগে প্রকাশ করেন নি। আমরা একই এরিয়েলকে প্রেরণ ও গ্রহণের কাজে লাগিয়েছিলাম এই ব্যবস্থাও কেউ আমাদের আগে প্রকাশ করেন নি। অনেকে মন্তব্য করেন—আমাদের এই কাজ ভবিষ্যৎ রেডারের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

এর আগে ১৯৩২-'৩৩ সালে আন্তর্জাতিক মেরু-বর্ষে অংশ গ্রহণ করে কলিকাতা অঞ্চলে আয়নমণ্ডল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবার ভার আমরা নিয়েছিলাম। পনেরো দিন পর পর স্থানীয় মধ্যাহ্নে ও মধ্যরাত্রিতে আয়নমণ্ডলের উচ্চতা মাপা হতো এবং মাসে একদিন করে সারাদিন-রাতে প্রতি ঘণ্টায় একবার করে উচ্চতা মাপা হতো। প্রেরক যন্ত্র ছিল বিজ্ঞান কলেজে এবং চালাবার ভার নিয়েছিলেন প্রধানতঃ চৌধুরী বাবু। গ্রাহক যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছিল অধ্যাপক মিত্রের বালীগঞ্জের বাড়ীতে। আমরা যখন তাঁর বাড়ীতে কাজে ব্যস্ত থাকতাম, তখন আমাদের থাকা-খাওয়া ও কাজের যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয়, সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। দুর্গাপূজার ছুটিতে তখন প্রতি বছরই তিনি ভাগলপুরে যেতেন; কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের যাতে কোন অসুবিধা না হয়, তার জন্যে প্রত্যেক জিনিষের সুবন্দোবস্ত করে যেতেন।

এভাবে আয়নমণ্ডল সম্পর্কিত যে গবেষণার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাতেই অধ্যাপক মিত্র জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। ছাত্র হিসাবে তাঁর কাছে যে স্নেহ, ভালবাসা ও সহানুভূতি পেয়েছি, তা লিখে শেষ করা যায় না। যতদিন জীবিত থাকবো, ততদিন তাঁর স্নেহের দান স্মরণ করে গর্ববোধ করবো। আজ তিনি সশরীরে নেই—আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা যে, তিনি অমরধামে শান্তি লাভ করুন এবং আমাদের কাজে প্রেরণা দিন।

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ

রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

জাতীয় অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়ের স্মৃতিচারণায় আজ কত কথাই না মনে পড়ছে! ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহের কয়েকটি দিন আমার স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে আছে। ঐ সময়ে লাহোরে ছিল ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন। ঐ দিনগুলি আমার কাছে চিরস্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য; কারণ ঐ সময়েই আমাদের দেশের কয়েকজন প্রখ্যাতনামা ব্যক্তির সঙ্গে সর্বপ্রথম পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। প্রথমতঃ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সৌজন্যে ও সুব্যবস্থায় তদানীন্তন লাহোর হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ আইন ব্যবহারজীবী এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ মহাজনের

গৃহে সাদরে অতিথিভাবে থাকবার সুযোগ আমার ঘটেছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রতিনিধিদের জন্যে আয়োজিত তক্ষশিলাগামী স্পেশাল ট্রেনের একই কামরায় সহযাত্রী হিসেবে আমার পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হয়েছিল শিশিরকুমার মিত্র, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, স্নেহময় দত্ত প্রমুখ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সঙ্গে, যা পরে পরিণত হয়েছিল বিশেষ অন্তরঙ্গ স্নেহের সম্বন্ধে। অবশ্য তার আগেও তাঁদের কখনও কখনও দূর থেকে দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হিসেবে প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখেছি—যেমন দেখেছি তারই আগের বছর কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে। তখন অধ্যাপক মিত্র ছিলেন কংগ্রেসের সেক্রেটারী, কিন্তু তখন তাঁর মত স্বল্পবাক গম্ভীর মুখবিশিষ্ট অধ্যাপকের কাছে ঘেঁষে পরিচিত হবার মত সাহস হয় নি। ঐ কালটিকে মনে রাখবার মত তৃতীয় আর একটি কারণও আছে। তক্ষশীলা স্টেশনে ট্রেন পৌছামাত্র তক্ষশীলার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক যাদুঘরের তদানীন্তন কিউরেটার মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত সে দিন যে ভাবে তাঁর সম্পর্কিত ভাই পাটনার অধ্যাপক প্রমথ দাশগুপ্ত এবং সম্পূর্ণ অপরিচিত আমাকে কোন এক অজ্ঞাত বিশেষ অপরাধের জন্যে গ্রেপ্তারী-পরওয়ানা বলে গ্রেপ্তার করে তাঁর গাড়ীতে (পুলিশ-ভ্যান ?) পুরে, বিচারক তাঁর পত্নীর সম্মুখে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন এবং নানা পত্রিকায় মনের উত্তেজনাকর ভ্রমণ-কাহিনী লেখবার শাস্তিস্বরূপ বারবার নানা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় গলাধঃকরণের নিগ্রহ (?) মাথা পেতে নিতে হয়েছিল, তা ঐ ভাবে দণ্ডপ্রাপ্ত কোন আসামীর পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।

এরই এক বছর আট মাস পরের ঘটনা। স্থান—ঢাকুরিয়া লেক (বর্তমানে রবীন্দ্র সরোবর); কাল—অপরাহ্ন, তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪০ সাল, উপলক্ষ—দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের জন্যে সেখানকার মডেল ইয়ট ক্লাবটি (Model Yatch Club) উঠে যাওয়ার পর ৺ মিঃ ডি. সি. ঘোষ, ৺ মিঃ মোমিন মিঃ কালীপ্রসাদ খৈতান, ডক্টর কালিদাস নাগ, যতীন্দ্রমোহন মজুমদার প্রভৃতির ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় সেখানে ক্লাবের গৃহের উল্টোদিকে রাস্তা ও লেকের মধ্যবর্তী বাগানে 'চক্রবৈঠক' নামক ক্লাবের উদ্বোধন উৎসব। চক্রবৈঠক ক্লাবের উৎসাহী সভ্য হিসেবে সেখানে ডাঃ মিত্রের সঙ্গে স্থাপিত হলো যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—তাই কালক্রমে সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে পরিণত হয়েছিল একটি অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে। সোনার শিকলটি শুধু চক্রবৈঠক ক্লাবের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি—শিক্ষা, বিজ্ঞান, সমাজ, পরিবার—সকল ক্ষেত্রেই একটু একটু করে শুধু তাঁর সান্নিধ্যেই আমাকে টেনে নিয়ে যায় নি, একেবারে তাঁর বুকের মধ্যে পরিপূর্ণ ভালবাসার সাগরেও টেনে নিয়েছিল। কি বিশ্ববিদ্যালয়, কি মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ, কি ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্স, কি এশিয়াটিক সোসাইটি, কি যাদবপুর, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স—সকল ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিস্তার লাভ করেছিল। তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে আমার বড় ভাইয়ের মত। এক কথায়—"Friend, philosopher and guide," আর আমি ছিলাম তাঁর কাছে চির অনুগামী প্রিয় লক্ষ্মণ-ভাইটির মত।

১৯৪২ সালে জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেবার ফলে শৈশবেই জমজমাট ক্লাবটি সামরিক প্রয়োজনে গৃহচ্যুত হয়েছিল। এই অবস্থায় সভ্যদের গৃহে গৃহেই হতো ক্লাবের মিলন-অনুষ্ঠানগুলি—অনেকটা ছাড়া-ভাঙ্গা গোছের। অবশেষে যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে ১৯৪৭ সালে যখন বাস্তহারা ক্লাব আবার ভগ্ন ও জীর্ণ গৃহ ফিরে পেল, তখনই অধ্যাপক মিত্র হলেন তার সভাপতি বা কর্ণধার। আর-একরকম দেউলে, অর্থাৎ কোষশূন্য কোষাধ্যক্ষ করা হলো আমাকে। বোধহয় তার পরের বছরই কর্মসচিবের ভার নিলেন

শ্রীশচীন বাগচি। আর কেউ আসুক বা না আসুক, আমরা তিনজন প্রতি সন্ধ্যায় ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় যথাসময়ে মিলিত হতাম চক্রবৈঠকে-লেক-এর তীরে রম্য-উদ্যানে। শচীনদা তো চিরকালের বলিয়ে-কইয়ে বৈঠকী মানুষ, আমিও কতকটা তাই। কিন্তু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, নামকরা অধ্যাপক গুরু-গম্ভীর অধ্যাপক মিত্র চিরকালই স্বল্পবাক। তাই আমরা প্রথমে কতকটা সমীহ করেই তাঁর উপস্থিতিতে কথাবার্তা বলতাম এবং তার মধ্যে বেশীই ছিল—কেমন করে আবার আমাদের প্রিয় ক্লাবটিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন বিস্ময়ে অবাক হয়ে আমরা লক্ষ্য করলাম, ঝুনো নারকেলের কঠিন আবরণে ঢাকা সুস্বাদু খাদ্য ও সুমিষ্ট পানীয়ের মত ছদ্ম গাম্ভীর্যের আবরণে ঢাকা অধ্যাপক-বিজ্ঞানী মিত্রের মধ্যে অতি অমায়িক, হাস্য-পরিহাসপ্রিয় একজন উঁচুদরের মজলিশী মানুষকে। অন্যান্য সদস্যেরা প্রায়ই এসে দেখতেন যে, "ত্রিণি উগ্রবীর্যাণি" আগেই যথাস্থানে বসে আছেন। তাই কেউ কেউ আমাদের বিশিষ্ট নামকরণ করেছিলেন—চক্রবৈঠকের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

চক্রবৈঠকের কেবল কয়েজন নামকরা ব্যবসায়ী সদস্য ছাড়া আর কোন সদস্যই কেউ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করলে নিজ নিজ বৃত্তি বা বিশিষ্ট জ্ঞান সম্বন্ধে কোন কথার উল্লেখ করতেন না। চক্রবৈঠকে অধ্যাপক মিত্র বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বা অধ্যাপক ছিলেন না, ছিলেন শিশুর মত সরল, অতি অমায়িক—সকলের সঙ্গেই একভাবে মেলামেশাকারী বৈঠকী মানুষ। চক্রবৈঠক লেকের দক্ষিণা হাওয়ায় খুলে যেত তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মুখের আগল, আর বদ্ধ মৃৎপ্রাচীরের কারা থেকে একটি মাত্র ছিদ্রপথে যে ভাবে বেরিয়ে আসে সুশীতল ঝরণা, তেমনি বেরিয়ে আসতো তাঁর মুখে বৈঠকী গল্প ও হাস্য-পরিহাসের অনাবিল ধারা। কিন্তু এর মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রকাশ পেত তাঁর বৈজ্ঞানিক অনন্যসাধারণ চিন্তার ধারা। কি সরল ও সহজভাবে তিনি প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে দিতেন দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি! কখনো কখনো আলোচনা হতো দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে। তিনি বলতেন, দেশের মন্ত্রী বা নেতাদের অক্ষমতার সমালোচনা করে কি হবে, যতদিন আমরা জনসাধারণের চরিত্রের মানোন্নয়ন না করতে পারি। যে যেমন তার সরকারও তেমনি ছাড়া আর কি হবে, সুতরাং চোর বা জোচ্চোরের ভোটে যে নির্বাচিত হবে, সেও তাদেরই মত যোগ্য (?) প্রতিনিধি ছাড়া আর কি হবে? আবার বলতেন—যে দেশে বছরে পঞ্চাশ লাখ করে লোক বাড়ছে, সেখানে খাদ্য-সমস্যা কোন দিনই মিটতে পারে না। এর প্রতিকারের জন্যে "জন্মনিয়ন্ত্রণ" ব্যবস্থার তিনি ছিলেন সমর্থক। এই সম্বন্ধে বলতেন—মধ্যবিত্ত ঘরে লোকে তা বোঝে এবং অর্থনৈতিক কারণে আপনিই প্রজনন সীমিত, কিন্তু নিম্নবিত্ত বা নীচুস্তরে আছে যারা, তাদের মধ্যে চাই ব্যাপক প্রচার। তাঁরই অনুরোধক্রমে আমার এই বিষয়ে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার-পরিকল্পনা' নামক ছোট বইখানি লেখা এবং প্রকাশককে অনুরোধ করি, যাতে বইখানি যতদূর সম্ভব স্বল্পমূল্যে জনসাধারণের হাতে পৌঁছায়, তার ব্যবস্থা করতে।

চক্রবৈঠকের সদস্যেরা সময়ে সময়ে কলকাতার বাইরে গিয়েও আড্ডা জমাতেন; একেবারে কাছে ডায়মণ্ড হারবার থেকে সুদূর কাশ্মীর (অমরনাথ) পর্যন্ত। অধ্যাপক মিত্রের রক্তের চাপ অধিক থাকায় দূরে কোথাও না গেলেও কাছেপিঠে হুগলী, ডায়মণ্ড হারবার, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে ক্লাবের আড্ডায় নিজের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটলেও আমাদের সঙ্গী হতেন। প্রতি বছর দুর্গাপূজার নবমী তিথিতে উত্তরপাড়ায় শ্রীযুক্ত বলাইলাল মুখোপাধ্যায়ের সাদর আমন্ত্রণে আমরা যেতাম এবং শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী

মুখোপাধ্যায়ের আদর, আপ্যায়ন ও ভূরিভোজনে তৃপ্ত হয়ে ফিরে আসতাম। ডাঃ মিত্র ছিলেন অতি মিতাহারী, কিন্তু আমাদের কোন কোন সদস্যের মধ্যে প্রায়ই খাওয়াদাওয়ার প্রতি-যোগিতা চলতো। একবার এমনি খেতে বসে 'আরো খাবো'র জের চলছে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে রাত্রি দশটার দিকে। ফিরতে যত বেশী রাত হবে, ততই শহরে নবমী রাতের ক্রমবর্ধমান ভীড় ঠেলে আসতে হবে। গৃহকর্ত্রী হাসিমুখে সগুপ্রস্তুত উপাদেয় গরম জিলিপির থালা হাতে শচীনদার পাতে বেশ এক গোছা দিয়ে বললেন, আর কিছু চাই? গম্ভীরভাবে অধ্যাপক মিত্র বল্লেন—হাঁ চাই বৈ কি, এখন চাই একটি বাঘ। কথাটা শুনে সকলেরই চোখ কপালে উঠলো—গৃহকর্ত্রীর চোখেও সপ্রশ্ন দৃষ্টি। একটু হেসে অধ্যাপক মিত্র বললেন—হঁা, এখন একটা জ্যান্ত বাঘ এসে ওঁকে খেলেই ওঁর খাওয়ার শেষ হবে, তার আগে তো নয়! সকলের সশব্দ হাসিতে ঘরখানি ফেটে পড়বার উপক্রম হলো। শচীনদা একসঙ্গে অবশিষ্ট দুখানি জিলিপি মুখে পুরে খাওয়া ছেড়ে উঠতে বাধ্য হলেন—কিছু বলবার চেষ্টা করেন নি, বিষম খাওয়ার ভয়ে।

চক্রবৈঠকের সদস্যেরা যেন একটি যৌথ পরিবারভুক্ত গোষ্ঠী—এ কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। বিশ্ববিদ্যালয়, সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড, নানা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কিংবা ক্লাব বা সোসাইটি প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে ক্লাবের সদস্যেরা যখনই তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হতেন, তখনই তিনি যথাসাধ্য তাঁদের সাহায্য করতেন। তিনি ছিলেন কলিকাতা রোটারী ক্লাবের বহু পুরাতন সম্মানিত সভ্য এবং একজন প্রাক্তন সভাপতিও। সেখানকার সভ্যপদ-প্রার্থী কোন একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'চক্রবৈঠক' ক্লাবেরও সদস্য হবেন, এই সর্তে ঐ ব্যাপারে সাহায্য করেন। আবার চক্রবৈঠকেরও কোন কোন সভ্যকে রোটারী ক্লাবের সদস্য হতে অনুরূপ-ভাবে সাহায্য করেন। কিন্তু এমনি একটি ব্যাপারে যখন কয়েকজন রোটারিয়ান একজোট হয়ে অন্যায়ভাবে তাঁর একটি প্রস্তাবকে বানচাল করবার চেষ্টা করেন, তখন তিনি, চক্রবৈঠকের আর একজন চক্রী জিতেন মুখার্জি এবং তাঁর বহু পুরাতন বন্ধু—রোটারী ক্লাবের সদস্য ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডাক্তার অমূল্য উকিলও সে কারণে রোটারি ক্লাবের সভ্যপদ ছেড়ে আসতে দ্বিধা করেন নি। একই ভাবে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর পরিচালনা কমিটির সদস্যপদও তিনি ছেড়েছিলেন মতদ্বৈধতার ফলে। দু'দুবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডি-কেটের মনোনয়ন পেয়ে এবং ডাক্তার সুবোধ মিত্রের আকস্মিক মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্যের পদ নিতে স্বীকৃত হন নি।

মাত্র দু'বছর আগে যখন চক্রবৈঠকের সেক্রেটারী অশোক চৌধুরীর হঠাৎ পুরীতে বি. এন. আর হোটেলে মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছালো, তখন তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবার পর অশ্রুসজল চোখে বললেন—সে কি! সে যে আমার ছেলের মত, সেই আগে চলে গেল! এক কথায় বলতে হয়—শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক ও মনীষী, এসব খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ অথচ স্নেহপ্রবণ খাঁটি মানুষ হিসেবে একদিকে বজ্রের মত কঠিন কর্তব্যনিষ্ঠা ও অন-মনীয়তা এবং অন্যদিকে কুসুমের মত কোমল মানবিকতাই ছিল তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আমার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম স্নেহ। আজ সেই মহাপ্রাণ আর ইহজগতে নেই, তবু কত কথাই মনে পড়ছে। ১৯৫১ সালে বাংলা

ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ পুস্তকের জন্যে আমার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরসিংহ দাস পুরস্কার' প্রাপ্তিতে আমার প্রতিবাদ সত্ত্বেও চক্রবৈঠকের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আমার গলায় নিজের হাতে ফুলের মালার আকারে তাঁর অনাবিল স্নেহের মালা পরিয়ে দিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে পশ্চিম ইউরোপ, ১৯৫৫ সালে পূর্ব ইউরোপ, ১৯৬০ সালে জাপান ও থাইল্যাণ্ড এবং মাত্র কয়েক মাস আগে মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের পর যখনই দেশে ফিরে এসেছি, চক্রবৈঠকের বিশেষ বিশেষ সভানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে জানতে চেয়েছেন আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা, আর পরিশেষে সভাপতির ভাষণে বলেছেন সরস করে তুলনামূলকভাবে নিজের আগেকার অভিজ্ঞতার কথা। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েট অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের বিশেষ আমন্ত্রণে যখন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার সঙ্গে মস্কোতে পারমাণবিক শক্তি সম্মেলনে গিয়েছিলাম, তখন দুর্ভাগ্যক্রমে সুপ্রসিদ্ধ বলশোয় থিয়েটার প্রেক্ষাগৃহে আমার সোনার খাপযুক্ত পার্কার-৫১ কলমটি চুরি হয়ে গেছে শুনে তিনি তাঁর স্নেহাতিশয্যে আমাকে ঐরূপ শুধু একটি কলমই নয়, পুরাপুরি একটি পার্কার সেটই উপহার দিয়েছিলেন। তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসার নিদর্শন এবং স্নেহাশীর্বাদ-পূত সে উপহারটি আমার কাছে একটি অমূল্য সম্পদ।

চক্রবৈঠকের মনোরম উদ্যানটি ছিল আমাদের মধ্যে বাইরের নানা বিষয়ের সঙ্গে পারস্পরিক ও পারিবারিক নানা বিষয়েরও আলোচনার স্থান। প্রায়শঃ সমানুবর্তিতার ফলে আমরা দুজনই প্রায় একসঙ্গেই গিয়ে সে বাগানে উপস্থিত হতাম, তখন অন্যের উপস্থিতির আগেই হতো এরকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কথাবার্তা। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে তিনিই একাধারে ছিলেন দুটি মাতৃহীন ছেলের পিতামাতা। অবশ্য এই দায়িত্ব বহনে তাঁর শ্যালিকা মাধুরী দেবীর সহায়তা না পেলে তিনি যে এই গুরু-দায়িত্বভার একা সুষ্ঠুভাবে বহন করতে পারতেন না, সে কথা অসংখ্যবার বলতেন—আর মাধুরী দেবীর কোন কারণে শরীর অসুস্থ হলে তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতেন। বহুদিন পর্যন্ত একমাত্র নাতনীই ছিল তার নয়নের মণি। প্রায়ই সে টন্‌সিলের রোগে ভুগতো। এজন্যে তাঁর মনে ছিল অত্যন্ত উদ্বেগ। নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অপারেশনের কথা বললে আমাকে কনসাল্ট না করে তিনি তাতে সম্মত হন নি এবং এই সর্তে রাজী হয়েছিলেন যে, আমাকে ঐ সময়ে অবশ্যই কাছে থাকতে হবে।

অনেক সময়েই তাঁর নিজের হৃৎপেশীর অক্ষমতা (Cardiac insufficiency) থাকাতে এ-সম্বন্ধে নতুন নতুন কি কি তথ্য গবেষণার ফলে জানা গেছে, তা আমার কাছে জানতে চাইতেন এবং নিজেও এ-সম্বন্ধে পড়াশুনা করতেন যথেষ্ট। এক একবার বলতেন, বিদেশে এই বিষয়ে যে রকম গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার জন্যে যদি কোন ভাল সার্জন তাঁর শরীরের উপর এই বিষয়ে কোন পরীক্ষা করতে চান, তো তিনি হাসিমুখে তাঁর হাতে নিজকে সমর্পণ করতে রাজী আছেন। অনেক সময় আরো একটি কথা বলতেন—আমার মৃত্যুর পর মৃতদেহের 'পোস্টমর্টেম' যেন অবশ্যই হয়, যদি তাঁরা আমার হার্টকে কেটে কোন নতুন তথ্যের সন্ধান পান, তবে ভবিষ্যতে আমার মত রোগীদের উপকার হবে। আরো বলতেন—মৃত্যুর পর আমাকে না পুড়িয়ে বরং আমার দেহকে যদি কোন মেডিক্যাল কলেজের শব-ব্যবচ্ছেদ গৃহে ছেলেদের হাতে ডিসেক্‌শনের জন্যে দেওয়া হয়, তবে আমি সুখী হবো। এমনি কথা শুনেছিলাম আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী ডাক্তারের মুখে, যিনি তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন, যেন তাঁর মৃতদেহকে ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদ-গৃহে অবশ্যই পাঠানো হয়। তিনি হচ্ছেন ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস। মনে-প্রাণে, ধ্যান-জ্ঞানে,

জপে-তপে ও নিদ্রা-জাগরণে একনিষ্ঠ বিজ্ঞানী ছাড়া এমন ইচ্ছা আর কে প্রকাশ করতে পারেন?

বড় ছেলে অশোক বহুদিন পর্যন্ত বিয়ে করতে চায় নি—সেই ছিল মনের মস্ত বড় ক্ষোভ। মাঝে মাঝে আমাক বলতেন—অশোক মাঝে মাঝে ছুটিতে ইউরোপে যায়, আমি তাকে বলেছি, দেশে হোক বিদেশে হোক, যেখানে তার পছন্দ, সে বিয়ে করুক, তাতেই আমি সুখী হবো। কিছুদিন পরেই ছুটিতে দেশে এসে যখন সে মাতৃসমা মাসীমার পছন্দ-করা মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী হলো, তখন তাঁর আনন্দের অবধি ছিল না। অশোকের বৌভাতের রাত্রিতে স্বভাবাত্মসংযমী অধ্যাপক মিত্রের মুখে যে আনন্দের ছটা দেখেছিলাম, আগে আর কখনো তেমনটি দেখতে পাই নি। আর একটি নাতনী তাঁর সংসারে এসেছে, অর্থাৎ অশোকের একটি মেয়ে হয়েছে, সে খবর তিনি নিজেই আমাদের টেলিফোন করে জানিয়েছিলেন আনন্দের সঙ্গে। আমার পত্নী ও আমি খুবই খুসী হয়েছিলাম, তাঁর আনন্দের অংশীদাররূপে। কিন্তু তার পরেই হঠাৎ একি বিনা মেঘে বজ্রপাত! এই ক্ষণিক আনন্দের রেশ মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ চমকের মতই হঠাৎ দেখা দিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। অসুখ-বিসুখের কথা কিছুই জানা ছিল না, হঠাৎ এডেন থেকে নিদারুণ সংবাদ এল যে, প্রাণাধিক জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক আর ইহলোকে নেই। নিয়তির একি নিষ্ঠুর পরিহাস! মাত্র কয়েক মাস আগেই আর এক অশোকের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে তিনি পুত্রবিয়োগ ব্যথার কথা উল্লেখ করেছিলেন; এবার পুত্রপ্রতিম নয়, প্রাণাধিক পুত্র অশোকও তার পুনরাবৃত্তি করে চলে গেল মহাপ্রস্থানের পথে! সদ্য পুত্র-বিয়োগে কাতর পিতার কাছে বসে আমার মনে হয়েছিল, এরই নাম কি ছায়া-পূর্বগামিনী? এভাবে পুত্রশোকে মুহ্যমান হলেও কর্তব্যনিষ্ঠ অধ্যাপক মিত্র নানা ক্ষেত্র থেকে, এমন কি তাঁর অতি প্রিয় চক্রবৈঠক থেকেও নিজেকে অনেকটা সরিয়ে নিয়ে প্রাণাধিকা বড় বৌমা ও দুটি নাতনীর ভবিষ্যতের জন্যে ব্যবস্থায় আত্মনিয়োগ করেন। কথায় আছে—দুর্ভাগ্য কখনো একা আসে না। অধ্যাপক মিত্রেরও বোধ হয় তেমনি দুঃসময় এসেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই ডাক্তার একমাত্র ছোট ভাইটিও মারা গেলেন। মনে হলো যেন ভগবান পরীক্ষা করতে চান—তাঁর সহ্যশক্তি ও মনোবলের।

অন্যদিকে না চাইতেই দেশ ও বিদেশের সর্বোচ্চ সম্মানগুলি এসে পৌঁচেছে। ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল সোসাইটি তাঁকে ফেলো মনোনীত করলেন, ভারত সরকার প্রথমে তাঁকে "পদ্মবিভূষণ" উপাধি এবং পরে জাতীয় অধ্যাপক মনোনীত করে সম্মান দেখালেন। কিন্তু শোকাচ্ছন্ন মনে এগুলি আর কোন আনন্দ বা তৃপ্তির সঞ্চার করতে পারছে না। তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ নিকট বন্ধুরা তাঁর জাতীয় অধ্যাপক-পদ প্রাপ্তিতে চক্রবৈঠকে তাঁর যথোচিত সম্বর্ধনার জন্যে তাঁর অনুমতি চাইলেন। তিনি প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হন নি। শেষে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি রাজী হলেন এই সর্তে যে, চক্রবৈঠকের মধ্যেই সেটি সীমায়িত থাকবে (কেবল তাঁর দু'একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া) এবং সকল প্রকারের আড়ম্বর বর্জন করা হবে। আরো অনেকেই ঐ প্রকার অনুরোধ করলেও তিনি কিছুতেই রাজী হন নি। ইদানীং তিনি আগের মত নিয়মিতভাবে চক্রবৈঠকে যেতেন না, কেবল স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে প্রতি সন্ধ্যায় একবার করে লেকের কাছে বেড়িয়ে বাড়ীতে চলে এসে নিজের পরিবারের মধ্যে অর্থাৎ ছেলে, দুটি বৌমা, তিনটি নাতনী ও একমাত্র নাতির সঙ্গে থাকতেই ভালবাসতেন। তা সত্ত্বেও প্রায়ই টেলিফোনে চক্রবৈঠকের প্রাত্যহিক খুঁটিনাটি বিষয় জানতে চাইতেন এবং নানা বিষয়ে সুচিন্তিত পরামর্শ দিতেন।

১৯৬২ সালের অগাষ্ট মাসে চক্রবৈঠক ক্লাবের গৃহ ও বাগানের উন্নতির জন্যে থিয়েটার করে যখন টাকা তোলবার কথা হয়, তখন তিনি শুধু মুখেই উৎসাহ জানান নি, তাঁর শোকসন্তপ্ত অবস্থায় সংকোচবশে আমরা কেউ তাঁর কাছে তাঁর ডোনেশন আনতে না যাওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে ১০০৲ টাকার একখানি চেক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চক্রবৈঠকের ছোটখাটো লাইব্রেরীটি তাঁরই সৃষ্টি। প্রতি মাসেই কেনবার জন্যে বইয়ের নাম লিখে পাঠাতেন এবং নিজেও নিয়মিত ঐ লাইব্রেরী থেকে বই নিয়ে পড়তেন। এথেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, চক্রবৈঠক তাঁর কাছে কত প্রিয় ছিল এবং এর সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যে তিনি শেষ দিন পর্যন্ত চিন্তা করে গেছেন।

১৯৬৩ সালের ১৩ই অগাষ্ট শুধু বাংলা দেশের পক্ষেই নয়, গোটা ভারতবর্ষের পক্ষেও একটি অবিস্মরণীয় দুর্দিন ; কারণ ঐ দিনে ভারতমাতা শুধু শ্রেষ্ঠ, প্রাজ্ঞ, মনীষী বিজ্ঞানীই নয়, একজন খাঁটি মানুষের মত সুসন্তানকেও হারিয়েছেন, যাঁর স্থান ভবিষ্যতে কখনো পূর্ণ হবে বলে মনে হয় না। সদ্য অভিহত অবস্থায় এখনো ঠিকমত বুঝতে পারছি না যে, তাঁর আকস্মিক তিরোধানের সঙ্গে কতখানি হারালাম। হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে কোন নির্জন সন্ধ্যায় চক্রবৈঠক লেকের পাড়ে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় বসে সঠিক উপলব্ধি করতে পারবো—সে হারানোর পরিমাপটুকু। আজ এই স্মৃতিতর্পণ-মুহূর্তে ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি—অমর্ত্যলোকে তাঁর বিদেহী আত্মা সুখ-দুঃখের অতীত হয়ে চিরশান্তি লাভ করুক।

ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র ও বেতার-বিজ্ঞান

শ্রীসুধাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় চৌত্রিশ বৎসর আগেকার কথা মনে পড়ে—যখন অধ্যাপক মিত্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি তখন আমাদের কনভোকেশন উপলক্ষে বেতার-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং বেতার যন্ত্রের সাহায্যে দেখান যে, বিনাতারে কি ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি আকাশপথে ছড়াইয়া যায়। আমরা তখন ছাত্র—তাঁহার বেতার-যন্ত্র চালনার সাহায্য করিয়াছিলাম। তাহার পর বহুবার তাঁহার সহিত বেতার-গবেষণার সূত্রে কাজ করিয়াছি এবং সামান্য যাহা কিছু শিখিয়াছি, তাহা তাঁহারই নির্দেশে। অল্প কথায় এই মাত্র বলা যায় যে, তাঁহার ছাত্র হওয়া পরম সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

তিনি ছিলেন একজন আদর্শ অধ্যাপক ও গবেষণার অধ্যক্ষ। কোনও জটিল তত্ত্বকে সহজ করিয়া বুঝাইবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অসাধারণ। আদর্শ গবেষণার অধ্যক্ষস্বরূপ তিনি সর্বপ্রথম আমাদের দেশে বেতার-গবেষণার ভিত্তি স্থাপন করেন। তখন এই দেশে একটিও বেতার-প্রসারক যন্ত্র বা রেডিও ট্র্যান্সমিটার ছিল না। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশের আর্থিক উন্নতি নির্ভর করে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্তারের উপর এবং এই আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি নির্ভর করে দেশের লোকের সেই বিজ্ঞানের সহিত পরিচয় ও তাহাকে কাজে লাগাইবার ক্ষমতার উপর। তাই তিনি সর্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্-

বিদ্যালয়ে বেতার-বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করেন ও তাহাতে কৃতকার্য হন। তাহার পর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহার যুক্তি ও সাহায্যে বেতার-বিজ্ঞান পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহারই ফলে আজ প্রায় প্রত্যেক বিজ্ঞানের কেন্দ্রে বেতার-বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণা উচ্চতম স্থান অধিকার করিয়াছে।

অধ্যাপক মিত্র প্রথম বেতার-গবেষণা আরম্ভ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট একটি লেবরে-টরিতে এবং প্রসঙ্গ ছিল, বেতার-তরঙ্গের পৃথিবীর উপর দিয়া ও উচ্চ আকাশপথের ভিতর দিয়া অভিযান। তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার নিজের লেবরে-টরিতে তৈয়ারী যন্ত্র দিয়া দেখান যে, কিভাবে বেতার-তরঙ্গ উচ্চ আকাশের আয়নযুক্ত স্তর বা আয়নোস্ফিয়ার হইতে ফিরিয়া আসে। ক্রমেই রেডিও ও ইলেকট্রনিক্স-এর প্রচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অধ্যাপক মিত্রের গবেষণার সীমা আয়নো-স্ফিয়ার অতিক্রম করিয়া বহুদূরে গিয়া পৌঁছিল। তাহারই ফলে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত পুস্তক "আপার অ্যাটমসফিয়ার" লিখিয়াছিলেন ও তাঁহার বেতার-বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কারের জন্য রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু সেই স্বনামধন্য পুরুষ দেখিলেন যে, বেতার-বিজ্ঞানকে আর সামান্য একটি ছোট লেবরে-টরিতে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। বহু চেষ্টার ফলে তাই আজ তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে Institute of Radio Physics and Electronics-এর স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন, যেখানে বিশেষরূপে বেতার-বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহাই হইল আমাদের আদর্শ অধ্যাপকের পরিচয়। তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ আজ আমাদের দেশব্যাপী হইয়া রহিয়াছে তাঁহার বহু ছাত্র-ছাত্রী চারিদিকে বেতার-বিজ্ঞানের গবেষণা করিতেছেন। আজ তাঁহারই জন্য এই দেশে ঘরে ঘরে রেডিও সেট দেখা যাই-তেছে ও পরে ঐরূপই ট্র্যানজিস্টর সেট ও টেলি-ভিসন সেট দেখা যাইবে। প্রত্যেক নর-নারীর বেতার-বিজ্ঞানের অন্ততঃ সাধারণ কিছু জ্ঞান থাকিবে। বেতার-বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য বহু দেশ নিজের শিল্প উন্নয়ন করিয়া সমৃদ্ধশালী হইয়াছে। আশা করি, আমাদের দেশবাসীও সেইরূপ বেতার-বিজ্ঞানের বিস্তার ও সাহায্যে দেশের দারিদ্র্য মোচন করিবেন ও ডাঃ মিত্রের স্বপ্ন সফল করিবেন এবং তাঁহার নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবেন।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

সতীশরঞ্জন খাস্তগীর

আমার ছাত্রজীবনে অনেক প্রতিভাশালী ও খ্যাতিমান বিজ্ঞানীকে শিক্ষাগুরুরূপে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র অন্যতম। ১৯১২ সনে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পদার্থবিদ্যায় তিনি এম. এস.-সি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিছুদিন বিহার ও বাংলার কয়েকটি কলেজে শিক্ষকতা করবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন। এই সময়ে অধ্যাপক চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের কাছে তিনি আলোকের বিচ্ছুরণ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ১৯১৯ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান ডি. এস-সি. উপাধি পান। ঠিক সেই বছরেই পদার্থ-বিদ্যায় এম.এস-সি কোর্সে তাঁকে আমরা অধ্যাপকরূপে পাই। তিনি আলোক-বিজ্ঞান এমন সুন্দরভাবে আমাদের পড়িয়েছিলেন যে, এত বছর পরেও যখনই সেই সময়ের সমপাঠীরা অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের অধ্যাপনার কথা আলোচনা করি, তখনই একবাক্যে তাঁর সহজ ও সরল শিক্ষা-পদ্ধতি ও জটিল বিষয়ের মূলগত ভাবটি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করবার আশ্চর্য ক্ষমতার প্রশংসা না করে পারি না। এখনও মনে পড়ে, ক্লাশের প্রথম দিনে তিনি আমাদের প্রত্যেককে তাঁর সদ্য প্রকাশিত নিবন্ধের পুনর্মুদ্রণ উপহার দিয়েছিলেন। এর বছরখানেক পরেই অধ্যাপক মিত্র প্যারিসে যান ও সেখানে সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ফাব্রির নিকট স্পেক্ট্রোস্-কোপি সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা করে ১৯২২ সনে সরবোর্ন থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। প্যারিসে ডাঃ গুঁতোর গবেষণাগারে ডিস্চার্জ টিউব-এর ভিতর দ্রুত বৈদ্যুতিক স্পন্দনের কাজে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। থার্মিওনিক ভ্যাল্‌ভ নিয়ে কাজ সেই সময়ে সবে সুরু হয়েছে—ন্যান্‌সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্‌ষ্টিটিউট অব ফিসিক্স-এ তিনি কিছুদিন থেকে এ-বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। মাদাম কুরির গবেষণাগারেও তিনি কিছুদিন ছিলেন।

১৯২৩ সনে দেশে ফিরে এলে ডাঃ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় খয়রা অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে আমি বিদ্যার্থী হিসেবে বিদেশে। কলিকাতায় সায়েন্স কলেজে তিনি তখন থেকেই পোষ্ট-গ্রাজুয়েট পর্যায়ে বেতার-শিক্ষণের সূত্রপাত করেন। শুধু তাই নয়, কয়েক জন গুণী ছাত্র নিয়ে তিনি আয়নমণ্ডল (Ionosphere) সম্পর্কে সুচিন্তিত পরিকল্পনানুসারে গবেষণার কাজ সুরু করেন। মনে পড়ে, আমি যখন ১৯২৬ সনে বিদেশ থেকে ফিরে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি—তখন তিনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্রকে সাদরে অভিনন্দিত করেন। তাঁর গবেষণাগারে তখন বিদ্যুৎপাতজনিত বৈদ্যুতিক বিক্ষেপ—যাকে সাধারণতঃ ইংরেজী ভাষায় অ্যাটমস্‌ফেরিক্স বলা হয়—এই সম্পর্কে গবেষণার জন্যে তিনি বিরাট এরিয়েল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি খাটিয়েছিলেন। এই সময়েই কলিকাতা সায়েন্স কলেজে 2CZ নামে তিনি এক বেতার প্রেরক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই বেতার প্রেরক কেন্দ্র থেকে তখন নিয়মিত-

ভাবে বক্তৃতা ও গান-বাজনার প্রোগ্রাম চলতো। দেশ-বিদেশ থেকে 2CZ স্টেশনের সুগ্রাহিতা সম্বন্ধে যে সব চিঠিপত্র তিনি পেয়েছিলেন, সানন্দে ও সাগ্রহে তিনি আমায় পড়ে শোনাতেন। বেতার-বিজ্ঞান সম্পর্কে শিল্প সম্বন্ধীয় বিশিষ্ট জ্ঞান এইভাবেই তিনি নিজের হাতে শিখেছিলেন। তখনকার দিনের তাঁর ছাত্রেরা অনেকেই অল ইণ্ডিয়া রেডিও ও অন্যান্য বেতার শিল্প প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। আয়নমণ্ডল নিয়ে ধারাবাহিকভাবে যে সব উচ্চাঙ্গের গবেষণা অধ্যাপক মিত্র করে গেছেন—তা আজ সর্বজনবিদিত। লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি আয়নমণ্ডল সম্বন্ধে তাঁর বহুবর্ষব্যাপী মৌলিক গবেষণার জন্যে ১৯৫৮ সনে তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন। ১৯৬২ সনে তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ঐ বছরেই ভারতের রাষ্ট্রপতি তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতবর্ষের নানা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন—এর তালিকা দেওয়া নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। ১৯৩৫ সনে তাঁকে পঞ্চম জর্জ জুবিলি পদক, ১৯৪৩ সনে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদ (Indian Association for the Cultivation of Science) থেকে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্বর্ণপদক, ১৯৫৩ সনে এশিয়াটিক সোসাইটির বিজ্ঞান কংগ্রেস পদক ও ১৯৬১ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী স্বর্ণপদক দেওয়া হয়।

১৯৩৫ সন পর্যন্ত অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। এর পর তিনি রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপকরূপে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত কাজ করেন। আমি বাংলাদেশের বাইরে থাকায় অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে সচরাচর দেখা-সাক্ষাৎ হতো না। তবে যখনই দেখা হয়েছে, তিনি তাঁর গবেষণার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমায় বিবৃত করেছেন। ইংল্যাণ্ডে সার এড্ওয়ার্ড অ্যাপ্ল্টন আয়নমণ্ডল নিয়ে যে সব কাজ করেছিলেন, কলিকাতায় অধ্যাপক মিত্র মহাশয় ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত, ডাঃ প্রেম শ্যাম, ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়, ডাঃ সরযূপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সুধাংশু দেব, ডাঃ বড়াল, ডাঃ অশেষ মিত্র, ডাঃ অরুণ সাহা প্রভৃতি বহু গুণী ছাত্রদের সাহায্যে সেই বিষয় নিয়েই নানা দিক দিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। পৃথিবী থেকে ৯০ কিলোমিটার উর্ধ্বে E-স্তর কি করে সম্ভব হলো—এই প্রশ্নের উত্তর কোনও বিজ্ঞানীই সে সময় দিতে পারেন নি। ১৯৩৮ সনে অধ্যাপক মিত্র ও ডাঃ ভড় এর সুমীমাংসা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যদিও এই তত্ত্ব আজ অচল বলে অনেকে মনে করেন—তবু এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত অনেক পরিকল্পনা ও পদ্ধতি বিশেষভাবেই প্রশংসার যোগ্য। D-স্তর নিয়ে ডাঃ শ্যামের সহযোগিতায় অধ্যাপক মিত্র যে সব সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আজ বিজ্ঞান-জগৎ তা মেনে নিয়েছে। ডাঃ সুধাংশু দেবের সহযোগিতায় অধ্যাপক মিত্র ডিস্চার্জ টিউবের ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহ ও বিক্ষেপের উপর আলোকের প্রভাব নিয়ে যে সব নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, তা তত্ত্ব ও তথ্যের দিক দিয়ে মূল্যবান মনে করি। আয়নমণ্ডলে বেতার-তরঙ্গের শোষণ (absorption) সম্পর্কে তাঁর পরিচালনায় যে সব গবেষণা হয়েছে—বিজ্ঞান-জগতে তার আদর হয়েছে। বেতার-বিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার জন্যে অধ্যাপক মিত্র ১৯৪৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও ফিজিক্স্ ও ইলেকট্রনিক্স্ নামে এক পৃথক বিভাগের স্থাপনা করেন। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের সদস্য হিসেবে তিনি একটি বেতার-গবেষণা কমিটি (Radio Research Committee) গঠন করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮ সন পর্যন্ত তিনি এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় হরিণঘাটায়

আয়নোস্ফিয়ার ফিল্ড স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। সম্প্রতি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস্ কমিশন এই স্টেশনটির পুনর্গঠনের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। রেডিও ওয়েভ প্রোপাগেশন সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি যে এক গবেষণা-কেন্দ্রের সূচনা হয়েছে—তাঁর মূলেও ছিলেন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র।

অধ্যাপক মিত্রের 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' নামক পুস্তকটি ১৯৪৭ সনে প্রকাশিত হয়। বইখানায় আবহমণ্ডল সম্পর্কে নানা গবেষণামূলক তথ্য সুন্দরভাবে সংগৃহীত আছে। সারা বিশ্বের পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে এই পুস্তক এক অমূল্য সম্পদ। এই পুস্তকটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এইবার ব্যক্তিগত কতকগুলি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। অধ্যাপক মিত্র আমার গুরুস্থানীয় অধ্যাপক হলেও তিনি আমার আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। তিনি স্পেক্‌ট্রোস্কোপি ছেড়ে বেতার-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা করে বিজ্ঞান-জগতে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি বিদেশে অধ্যাপক বার্ক্লার কাছে রঞ্জেন-রশ্মি নিয়ে ৪ বছর কাজ করেছিলাম। দেশে ফিরে এসেও কয়েক বছর ঐ বিষয় নিয়ে গবেষণা করি। রঞ্জেন-রশ্মি সম্বন্ধে গবেষণার কাজে নানা বাধা ও অসুবিধা হওয়ায় বেতার-বিজ্ঞানে আমি গবেষণা সুরু করি। তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। এই সময়ে অধ্যাপক মিত্রের উৎসাহ ও সাহায্য না পেলে বেতার-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। তিনি বলেছিলেন—আমার যা বই বা জার্নাল দরকার, যা যন্ত্রপাতির নিতান্ত প্রয়োজন—তিনি সবই আমায় তাঁর গবেষণাগার থেকে দেবেন। আমি তাঁরই গবেষণার পথ অনুসরণ করে আজ যা কিছু নতুন তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশিত করেছি, তার জন্যে অধ্যাপক মিত্রের নিকট চির-ঋণী। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে —তাঁর কাছ থেকেও এই সম্পর্কে নানা উপদেশ ও সাহায্য পেয়েছি, সে কথাও আজ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি।

অধ্যাপক মিত্র শুধু বিজ্ঞানের গবেষণা নিয়েই তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করতেন না—সামাজিক ও পারিবারিক নানা বিষয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে সহানুভূতি, সাহচর্য ও সাহায্য পেয়েছি। আজ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন—তাঁর স্মৃতি আমাদের মনে চিরজাগরূক থাকবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বিদেহী আত্মার চিরকল্যাণ হোক, এই প্রার্থনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি।

উচ্চতর বায়ুমণ্ডল বহির্ভূত গবেষণা ও অধ্যাপক মিত্র

সুধাংশুশেখর দেব

আয়নমণ্ডল, তথা উচ্চতর বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণার জন্য অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। দেশ ও বিদেশের যে সব উচ্চ সম্মান তিনি লাভ করিয়া গিয়াছেন, সে সবই বিজ্ঞানের এই বিভাগটিকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য। তাঁহার রচিত যে গ্রন্থখানি বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়নের সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র অভিনন্দিত হইয়াছিল, তাহার বিষয়বস্তুও বিজ্ঞানের এই বিশেষ বিভাগে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল কারণে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব যে, উচ্চতর বায়ুমণ্ডল ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য কোনও বিভাগে অধ্যাপক মিত্রের অবদান তেমন কিছু নাই। বিশদ পর্যালোচনায় কিন্তু এই জাতীয় ধারণা ভুল প্রমাণিত হইতে বাধ্য। তাঁহার প্রতিভা ছিল ব্যাপক এবং ইহারই ফলে প্রধানতঃ উচ্চতর বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত গবেষণায় ব্যাপৃত থাকিলেও বিজ্ঞানের আরও কয়েকটি বিভাগেও উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছে। এই অবদান হইতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কতকগুলি বিচিত্র ফলাফলই যে শুধু পাওয়া গিয়াছিল তাহা নহে, স্থায়ী গবেষকমণ্ডলীর পত্তনও ক্ষেত্রবিশেষে হইয়াছিল। অপেক্ষাকৃত স্বল্প আলোচিত অধ্যাপক মিত্রের বৈজ্ঞানিক অবদানের এই দিকটায় কিছুটা আলোকসম্পাত করিবার তাই প্রয়োজন রহিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধ ইহারই এক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বলা বাহুল্য, গৌণ হইলেও তাঁহার এই জাতীয় গবেষণার পরিধি নিতান্ত সীমিত নহে। বর্তমান আলোচনাটি তাই অনিবার্য কারণেই হইবে সংক্ষিপ্ত আকারের।

বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ—পূর্বেই উল্লেখ হইয়াছে যে, আয়নমণ্ডল এবং উচ্চতর বায়ুমণ্ডল বহির্ভূত একাধিক বিভাগে অধ্যাপক মিত্রের অবদান রহিয়াছে। পরবর্তী আলোচনার সুবিধার জন্য প্রথমেই ঐ বিভাগগুলির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায় যে আলো ও বর্ণালী সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহা হয়তো অনেকেই জানেন। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার খাতিরে প্রথমেই এই বিভাগটির নাম করিতে হয়। আয়নমণ্ডলে ইলেকট্রন এবং আয়নসমূহের পারস্পরিক সংঘাত এবং উহাদের সহিত তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের সংযোগে যে সকল ভৌতিক প্রক্রিয়ার উদ্ভব হওয়া সম্ভব, সেই সম্পর্কে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি প্রধান উপায় হইতেছে—গ্যাসীয় মোক্ষণ (Discharge) সম্পর্কিত গবেষণা। তাহা ছাড়া যে বস্তুটির উদ্ভাবনের ফলে বেতার-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে, সেই রেডিও-ভাল্‌বের সঙ্গেও গ্যাসীয় মোক্ষণের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। সম্ভবতঃ এই দুইটি কারণেই অধ্যাপক মিত্রের কার্যসূচীতে প্রথমে গ্যাসীয় মোক্ষণ এবং পরে রেডিও-ভাল্‌ব সংক্রান্ত গবেষণা স্থান পাইয়াছিল। ইহা ছাড়া ইলেকট্রনিক সার্কিট সংক্রান্ত কাজও তাঁহার গবেষণাগারে নিয়মিত-ভাবে হইয়াছে। ইনষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্‌স্‌ স্থাপিত হইবার পর ভাল্‌ব ও সার্কিট্‌ বিষয়ক গবেষণার সুযোগ বিশেষ-ভাবে প্রসারিত হয় এবং তাঁহারই উৎসাহ দানের ফলে একদল তরুণ কর্মী ঐ ইনষ্টিটিউটে বর্তমান ভাল্‌ব ও কম্পিউটর গবেষণাগারের গোড়া পত্তন করেন।

আলোক সংক্রান্ত গবেষণা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর হইতে আরম্ভ করিয়া প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত অধ্যাপক মিত্রের বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী প্রধানতঃ আলোক সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যায় সীমাবদ্ধ ছিল। স্লিট (Slit) জাতীয় বাধার জন্য আলোর প্রতিবক্রণ বিন্যাস (Diffraction pattern) পাওয়া যায়। উহার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। স্লিটের জ্যামিতিক গঠনে ত্রুটি থাকিবার জন্য প্রতিবক্রণ বিন্যাস কি ভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে, সেই সম্বন্ধে অধ্যাপক মিত্র বিশদভাবে গবেষণা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রবন্ধের আকারে তৎকালীন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক পত্রিকা Philosophical Magazine-এ প্রকাশিত হয়। প্যারিসে তিনি যে সকল গবেষণা করেন, তাহার প্রধান উপজীব্য ছিল বর্ণালী-বিশ্লেষণ। তখনকার দিনে পদার্থের বর্ণালী-রশ্মিসমূহের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঠিক পরিমাপ করা গবেষণার এক বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু ছিল। অধ্যাপক মিত্র এই জাতীয় কতকগুলি পরিমাপ করেন তামার নিকট অতিবেগুনী অংশে (২০০০-২৩০০ Å)।

বর্ণালী সংক্রান্ত কাজের মধ্য দিয়াই তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় পদার্থের গঠন বিষয়ক প্রশ্নের দিকে। মেণ্ডেলীফ-কৃত মৌলিক পদার্থের পর্যাবর্ত শ্রেণী-বিভাগের (Periodic Classification) কথা সকলেই অবগত আছেন। যখন এই শ্রেণীবিভাগের পরিকল্পনা করা হয়, তখন পদার্থের গঠন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই সীমাবদ্ধ। পরবর্তী কালে অনেকেই নবলব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে ঐ শ্রেণী-বিভাগীয় ছক (Table) নূতনভাবে সাজাইতে চেষ্টা করেন, যাহাতে মৌলিক উপাদানগুলির সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি স্পষ্টতর এবং আরও বিশদভাবে উহাতে স্থান পায়। ১৯৩১ সালে অধ্যাপক মিত্র তাঁহার নিজের উদ্ভাবিত অনুরূপ এক ছকের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন Philosophical Magazine-এ। ইহার একাধিক বৈশিষ্ট্য তাঁহার মৌলিক চিন্তাশক্তি ও বিশ্লেষণ-ধর্মী মনের পরিচায়ক। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পরবর্তী কালে এই ছকটি তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি আপার অ্যাটমোস্ফীয়ারে' সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

গ্যাসীয় মোক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা—গ্যাসীয় মোক্ষণ সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্রের প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় Journal de Physique-এ ১৯২৩ সালে, যখন রেডিও-ভাল্‌বের বলিতে গেলে শৈশব অবস্থা। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সীর ভোল্টেজ তরঙ্গে গ্যাসের বিদারণাঙ্ক (Breakdown point) নির্ণয় করা। প্রথম এই কাজটি করা হইয়াছিল ফ্রান্সে থাকিবার কালে। অবশ্য স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরেও তিনি এই বিভাগে কাজ চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিয়া গবেষণাগারে নিয়মিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় কয়েক বৎসর পরে। ১৯৩০ সাল হইতে তাঁহার অধীনে সম্পাদিত গ্যাসীয় মোক্ষণ সম্পর্কিত গবেষণার বর্ণনা নিয়মিতভাবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, প্রথম দিককার অধিকাংশ কাজই হয় উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী মোক্ষণ (High frequency discharge) সম্পর্কে। প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ Nature-এর ১৯৩০ সালের ৩০শে অগাষ্ট সংখ্যায়। বিষয়বস্তু ছিল মোক্ষণ পাত্রে পটেন্‌সিয়েলের স্থানগত মানভেদ (Spatial variation) নির্ণয় করা। সাধারণ ডি. সি. মোক্ষণে এই জাতীয় পরিমাপের জন্য ল্যাংমুইর ও মট-স্মিথ ১৯২৩ সালে যে পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন, অধ্যাপক মিত্রের গবেষণাগারে ব্যানার্জী (ডি) ও গাঙ্গুলী উহারই কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করেন, যাহাতে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সীর এ. সি. মোক্ষণেও অনুরূপ পরিমাপ সম্ভব হয়। শেষোক্ত রকমের মোক্ষণ

এমন এক জটিল ব্যাপার, যাহার সহজ কোনও বর্ণনা দেওয়া মুস্কিল। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করিতে গিয়া অধ্যাপক মিত্র ইহার এক আশ্চর্য রকমের সরল প্রতিকৃতি কল্পনা করেন। সাধারণ দুইটি ডি. সি. মোক্ষণ পাত্র পিঠাপিঠি যুক্ত করিয়া দিলে যাহা হয়, এ. সি. মোক্ষণ পাত্র অনেকটা তাই—ইহাই হইতেছে এই নূতন কল্পনার ভিত্তি। বলা বাহুল্য, প্রতিকৃতিটি সর্বাংশে সত্য নহে। তথাপি পরবর্তী কালের অনেক বৈজ্ঞানিকই এই প্রতিকৃতিটি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আয়নমণ্ডলের গবেষণায় পরীক্ষাগারে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। প্রধানতঃ এই কারণেই আয়নিত বায়ুর ডাইলেক্ট্রিক কনষ্ট্যান্ট-এর পরিমাপ করিবার গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্র অবহিত ছিলেন। লেচার তাঁহার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আল্‌ট্রা-হাই-ফ্রিকোয়েন্সীতে এই জাতীয় পরিমাপ করিতে চেষ্টা করেন ১৯৩৫ সালে। এই পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা বিখ্যাত এক্‌নেস-লারমোর প্রকল্প নিশ্চিতরূপে সমর্থিত হয়।

মেঘশূন্য ঘন অন্ধকার নৈশাকাশ হইতে যে ক্ষীণ আলোর ধারা পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহার উৎপত্তি-রহস্য কি? এই প্রশ্নের দিকে অধ্যাপক মিত্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়। বলা বাহুল্য, এই রহস্য উদ্ঘাটনে তিনি সত্বরই কিছুটা সাফল্য লাভও করেন। ইহার পরেই ১৯৪৩ সালে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অনুরূপ আর এক সমস্যা—অ্যাক্‌টিভ নাইট্রোজেনের প্রতি। এই জাতীয় নাইট্রোজেন মোক্ষণ পাত্রে সহজেই পাওয়া যায়। অ্যাক্‌টিভ নাইট্রোজেনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, বৈদ্যুতিক উত্তেজনার আধার ভোল্টেজ তুলিয়া নিলেও ইহা অনেকক্ষণ ধরিয়া আলো বিকিরণ করিতে থাকে। অধ্যাপক মিত্র তাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সূর্যাস্তের পরেও নৈশাকাশের রশ্মি যে উপায়ে টিকিয়া থাকে, অ্যাক্‌টিভ নাইট্রোজেনের স্থলেও সেই একই উপায় কার্যকরী হওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে তাঁহার নূতন প্রকল্পটি হইতেছে এই—মোক্ষণের ফলে নাইট্রোজেন-অণু আয়ন ও ইলেকট্রনে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সাধারণ অবস্থায় হাল্‌কা ইলেকট্রনগুলি ত্বরিদ্গতিতে মোক্ষণ পাত্রের দেওয়ালে গিয়া এক ক্ষীণ আবরণের সৃষ্টি করে। ভোল্টেজ তুলিয়া লইবার পর আয়নগুলি কালক্রমে দেওয়ালে আসিয়া পৌঁছায় এবং ইলেকট্রনের সঙ্গে অতি দ্রুত পুনরায় একীভূত হয়। এই পুনরেকীভবনের (recombination) পূর্ব ও পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে অবস্থার তারতম্যের জন্য সর্বদাই কিছুটা অতিরিক্ত শক্তির আবির্ভাব ঘটে, যাহা দেওয়াল শোষণ করিয়া লইয়া পুনরেকীভবনের পথ সুগম করিয়া দেয়। কোনও কারণে যদি দেওয়ালে পূর্বোক্ত ইলেকট্রন আবরণের সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে অবশ্য এই সুবিধাটুকু আর বজায় থাকে না। এই অবস্থায় পুনরেকীভবন ঘটিতে পারে মোক্ষণ পাত্রের মধ্যে এবং ঘটিতে পারে তখনই, যখন উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়া অতিরিক্ত শক্তিটুকু শোষণ করিয়া নিতে তৃতীয় কোনও অণু অথবা পরমাণু উপস্থিত থাকে। উহাতে এই জাতীয় ত্রিপাক্ষিক সংঘাতের (three body collision) সম্ভাবনা সাধারণতঃ খুবই কম হইয়া থাকে। এই অবস্থায় ভোল্টেজ তুলিয়া নিলেও মোক্ষণে সৃষ্ট বিকিরণধর্মী আয়নগুলি সঙ্গে সঙ্গে অণুতে রূপান্তরিত না হইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারে। অধ্যাপক মিত্র কল্পনা করেন যে, নাইট্রোজেন মোক্ষণ পাত্রের গায়ে ইলেকট্রন আবরণের সৃষ্টি হইতে পারে না, কারণ উহাতে পূর্বেই পড়ে নাইট্রোজেন অণুর এক প্রলেপ, যাহার ইলেকট্রন-আসক্তি (Electron affinity) প্রায় শূন্যের কোঠায়। এই সহজ, সরল প্রকল্পের খুঁটিনাটির কিছু কিছু পরিবর্তন তিনি সময়ে সময়ে করিয়াছিলেন সত্য, তথাপি ইহা যে তৎকালীন

বৈজ্ঞানিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষভাবে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এই সম্পর্কে তাঁহার রচিত অন্যতম পুস্তক 'Active Nitrogen—A New Theory' প্রভৃত সমাদর লাভ করে এবং বিশ্বের প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় উহার প্রশংসাসূচক সমালোচনা বাহির হয়। অ্যাক্টিভ নাইট্রোজেন সম্পর্কে অধ্যাপক মিত্র অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইগুলির মধ্যে ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪৮ সাল এবং ১৫ই মে, ১৯৫৩ সালের Physical Review-তে প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক মিত্র যখন অ্যাক্টিভ নাইট্রোজেন সম্পর্কিত তাঁহার নিজস্ব প্রকল্পকে রূপদান করিতে-ছিলেন, প্রায় তখনই কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক যোশী লক্ষ্য করিলেন যে, ওজোনাধার জাতীয় মোক্ষণ পাত্রে আলো ফেলিলে ক্ষেত্র-বিশেষে মোক্ষণজনিত কারেন্টের প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। পাত্রে ক্লোরিন অথবা অন্য কোন হ্যালোজেন জাতীয় উপাদান থাকিলে ঐ অবস্থায় কারেন্ট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হ্রাস পায়। তথ্যটি আবিষ্কৃত হইবার অনেক দিন পরেও ইহার উৎপত্তি-রহস্য অজ্ঞাত থাকিয়া যায়। ১৯৪৫ সালে অধ্যাপক মিত্রের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হয় এবং অচিরেই তিনি বুঝিতে পারেন যে, ওজোনাধার মোক্ষণ সম্পর্কে আমাদের সুষ্ঠু ধারণার অভাব এবং পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের বিক্ষিপ্ততা ও যথোপযুক্ত সমীক্ষার অক্ষমতাই যোশী আবিষ্কৃত তথ্যটির রহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। ওজোনাধার মোক্ষণে যে পাত্রের গায়ে ইলেক্‌ট্রন আবরণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হইবে, প্রথমেই তিনি সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। প্রধানতঃ এই চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া তিনি ও তাঁহার সহকর্মীরা ওজোনাধার মোক্ষণেরর এক সহজ ও বোধগম্য চিত্র তুলিয়া ধরিলেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে উহার মুখ্য বক্তব্যগুলির সত্যতাও প্রমাণ করিলেন। অতঃপর পরীক্ষালব্ধ বিক্ষিপ্ত ফলাফলের যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বিন্যাস ও বিশ্লেষণের সাহায্যে উহারও প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া যোশী আবিষ্কৃত তথ্যটির উৎপত্তি-রহস্যের উপর আলোক সম্পাতেও তাঁহারা অনেকটা সফলকাম হইয়াছিলেন। এই পর্যায়েও অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, যাহার মধ্যে Journal of Indian Chemical Society, ১৯৪৮ ও Journal of Chemical Physics, ১৯৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেডিও-ভাল্‌ব—বেতার-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির মূলে রহিয়াছে রেডিও-ভাল্‌ব এবং এই বিষয়েও যাহাতে ভারতে গবেষণা হয়, সেদিকে অধ্যাপক মিত্র বরাবরই আগ্রহশীল ছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করিবার মত আর্থিক সঙ্গতির অভাবে বহুদিন পর্যন্ত এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কিছু করিয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। ভারত সরকারের অধীনে ১৯৪২ সালে বেতার গবেষণা পরিষদ সংস্থাপিত হবার পর তিনি ক্ষেত্র গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় রেডিও-ভাল্‌ব তৈয়ারীর একটি পাইলট যন্ত্র স্থাপনের পরিকল্পনা পরিষদের নিকট দাখিল করেন। ইহারই ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতার-বিজ্ঞান বিভাগে ১৯৪৬-'৪৭ সালে স্থাপিত হয় ভারতে ভাল্‌ব সংক্রান্ত প্রথম গবেষণা-কেন্দ্র। কেন্দ্রটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ভাল্‌ব তৈয়ারীর সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই ব্যাপারে প্রসংশনীয় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়। এই জাতীয় শিল্প সংক্রান্ত গবেষণায় ও নানাবিধ মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাহার কিছু ব্যতিক্রম হয় নাই। ভাল্‌ব তৈয়ার করিতে গিয়া উহার ডিজাইন পদ্ধতির নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা এখানকার কর্মীদের দৃষ্টিপথে আসে

এইগুলির সংশোধন ও সম্পূর্ণতা সাধনের ব্যাপারে তাঁহারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—উপবৃত্তাকার (Elliptic) গঠনযুক্ত ভাল্ব ডিজাইনের নূতন পদ্ধতি বীম (Beam) ভাল্বের কার্যপ্রণালীর উন্নততর গাণিতিক ব্যাখ্যা এবং অক্সাইড প্রলেপযুক্ত ক্যাথোডের অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থের বিসক্রিয়ার উপর নূতন আলোক-সম্পাত।

প্রাথমিক পর্যায়ে ভাল্ব সংক্রান্ত গবেষণার অর্থ যোগান দেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (C. S. I. R.)। ইন্‌ষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্‌স্-এর পত্তনের পর ভাল্ব-গবেষণাগারটিকে উহার স্থায়ী বিভাগে পরিণত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গবেষণাগারটিকে প্রসারিত করিয়া উহাতে আধুনিকতম মাইক্রো-ওয়েভ ভাল্ব বিষয়ক গবেষণার ব্যবস্থা করিবার কথাও অধ্যাপক মিত্রের মনে উদিত হয়। পরিকল্পনা পেশ করিয়া প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে বেশ কিছুটা সময় কাটিয়া যায় এবং তিনি অধ্যক্ষতার পদ হইতে অবসর গ্রহণের সামান্য কয়েক দিন পূর্বে এই পুনর্গঠন কার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয়। পরে অবশ্য তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য অধ্যাপক ভড়ের উৎসাহ দান ও কর্মকুশলতার ফলে এই পরিকল্পনার দ্রুত ও সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হইযাছিল।

সার্কিট বিষয়ক গবেষণা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার-বিজ্ঞান বিভাগ স্থাপিত হইবার পর হইতে সার্কিট সংক্রান্ত গবেষণা বরাবরই সেখানে কিছু না কিছু হইয়াছে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে—ভোল্টেজ সুস্থিতার (Voltage stabiliser) সম্পর্কে ব্যানার্জীর (বি. এম.) গবেষণার কথা। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় গবেষণায় অধ্যাপক মিত্রের ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ প্রেরণা ও উৎসাহ দাতার। সার্কিট বিষয়ক গবেষণায়ও সুসংহত প্রচেষ্টার সুযোগ আসে ইন্‌ষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিক্‌স্ স্থাপনের পর। ১৯৫১-'৫২ সালে একদল তরুণ কর্মী একটি স্থায়ী সার্কিট গবেষণাগার স্থাপনে অগ্রণী হইলে অধ্যাপক মিত্রের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। এই প্রচেষ্টা হইতেই কালক্রমে রূপ গ্রহণ করে বর্তমান কম্পিউটর গবেষণাগার, যাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সুখ্যাতি লাভে সক্ষম হইয়াছে।

উপসংহার—পরিশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপরে যে সব বিভাগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা ছাড়াও ছোটখাটো আরও নানা বিভাগে কিছু কিছু গবেষণা অধ্যাপক মিত্রের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ তত্ত্বাবধানে বা উৎসাহদানে সম্ভব হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, মাইক্রোফোন ও লাউডস্পীকার, নিউক্লিয়ার ম্যাগ্নেটিক রেজোন্যান্স ও ট্র্যানজিষ্টর সংক্রান্ত গবেষণার কথা। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সব কিছুর আলোচনা সম্ভব হইল না। তবে যেটুকু বলা হইল তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, বৈজ্ঞনিক হিসাবে অধ্যাপক মিত্রের অবদান কতটা ব্যাপক ছিল। শুধু উচ্চতর বায়ুমণ্ডল নহে, বেতার-বিজ্ঞানের আর নানা বিভাগে গবেষণার সূত্রপাত এই দেশে হইতে পারিয়াছিল তাঁহারই দূরদৃষ্টি ও উৎসাহদানের ফলে। সুতরাং এই দেশে বেতার-গবেষণার পথিকৃৎ বলিয়া তাঁহাকে যে প্রশস্তি জ্ঞাপন করা হয়, তাহা সর্বাংশে তাঁহার প্রাপ্য অভিধা।

[বিগত ২৯শে মার্চ অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র সপ্তম Saha Memorial Lecture হিসেবে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল Physics of the Earth's Outer Space। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার তরফ থেকে তাঁর এই বক্তৃতাটির বঙ্গানুবাদের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার জন্যে তিনি সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি; তবে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যেন তাঁর সহকর্মীদের ভিতর কেউ ঐ বক্তৃতাটিকে ভিত্তি করে বাংলায় পুরাপুরি সম্ভব না হলেও অংশবিশেষ তর্জমা করে। বর্তমান এই স্মৃতি-সংখ্যায় তাঁর সেই ইচ্ছার পরিপূরক হিসেবে পর পর দুটি প্রবন্ধ—দূরবর্তী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র—শ্রীশুভেন্দু দত্ত ও ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল—শ্রীদীপক বসু পরিবেশন করা হলো।]

স

দূরবর্তী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র ও আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্র

শ্রীশুভেন্দু দত্ত

পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি আছে—এ কথা বলার মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই। কিন্তু এই চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তার ও রূপ বিশ্লেষণ করবার মধ্যে অভিনবত্ব আজও আছে। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে মোটামুটিভাবে দ্বিমেরুজ বলা যায়। দণ্ড-চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের যে রূপ তাহাই দ্বিমেরুজ চৌম্বক ক্ষেত্র (১ (ক) চিত্র)। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা, ভূকেন্দ্রে অবস্থিত দণ্ড-চুম্বকের মতই (১ (খ) চিত্র)। তবে ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর ভৌগলিক উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু থেকে ভিন্ন—ভৌগলিক উত্তর মেরুর প্রায় ৯° পশ্চিমে ভূ-চুম্বকের উত্তর মেরুর অবস্থান। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য প্রায় ০'২৪ গস্ (কলকাতার উপরও প্রায় ঐ রকমই)। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তার প্রায় ৬০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ধরা হয়। এই ক্ষেত্রকে বলা হয় ম্যাগ্‌নেটো-স্ফিয়ার।

পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের এই রূপ কিন্তু বহির্বিশ্বের প্রভাবমুক্ত নয়। বহুকাল থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা লক্ষ্য করেছেন, উচ্চ বায়ুমণ্ডলের কোন অবোধ্য ঘটনা ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, এই চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে মনে হয় পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের কোন এক যোগসূত্র আছে। এই সম্ভাব্য যোগসূত্র আরও পরিচিত রূপ ধারণ করে বেতার-সংযোগ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে বেতার-সংযোগ ব্যাহত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, সৌরকলঙ্ক ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বিমেরুজ রূপের পরিবর্তন ঘটায়। এই ঘটনাকেই বলা হয় 'চৌম্বক ঝটিকা'। এই চৌম্বক ঝটিকার সুরু হয় কখনও অকস্মাৎ, কখনও বা ধীরে ধীরে বেশ কিছুটা সময় নিয়ে। সাধারণতঃ এই ঝটিকার প্রভাব কয়েক ঘণ্টা থাকে। কখনও কখনও বেশ কয়েক দিন অন্তর অন্তর চৌম্বক ঝটিকা দেখা যায়। এই

অন্তরটা প্রায় ২৭ দিন। অন্যদিকে আয়নোস্ফিয়ার ও মেরুজ্যোতির গবেষকগণ মনে করেন, সূর্য থেকে বিদ্যুৎকণা প্রবাহ এসে পৃথিবীর উচ্চ-বায়ুমণ্ডলে আঘাত করে—যার ফলে এই স্থানের বায়ুস্তর আয়নিত হয় আর সময় সময় এথেকে আলোক-বিচ্ছুরণও দেখা যায়। এই বিদ্যুৎ-কণা-প্রবাহের আসবার পথ নির্ণয় করে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র—যা এই কণা-প্রবাহকে মেরুপ্রদেশের দিকে কেন্দ্রীভূত হতেও সাহায্য করে (২ নং চিত্র)।

এই সব ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে আর এক ধরণের গবেষণা দেখা যায়। এই গবেষণার সূত্রপাত হয় বৃটেনে ১৬০০ খৃষ্টাব্দে। এই সময় ডাঃ গিলবার্ট একটি চুম্বক পাথরের গোলক তৈরী করে তার চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা সুরু করেন। এই গোলকের নামকরণ হয় টেরেলা বা ক্ষুদে পৃথিবী। এই ক্ষুদে পৃথিবীর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা আবার করা হয় আমেরিকায়—আজ থেকে প্রায় বছর বারো আগে। ১৯০০ সালে
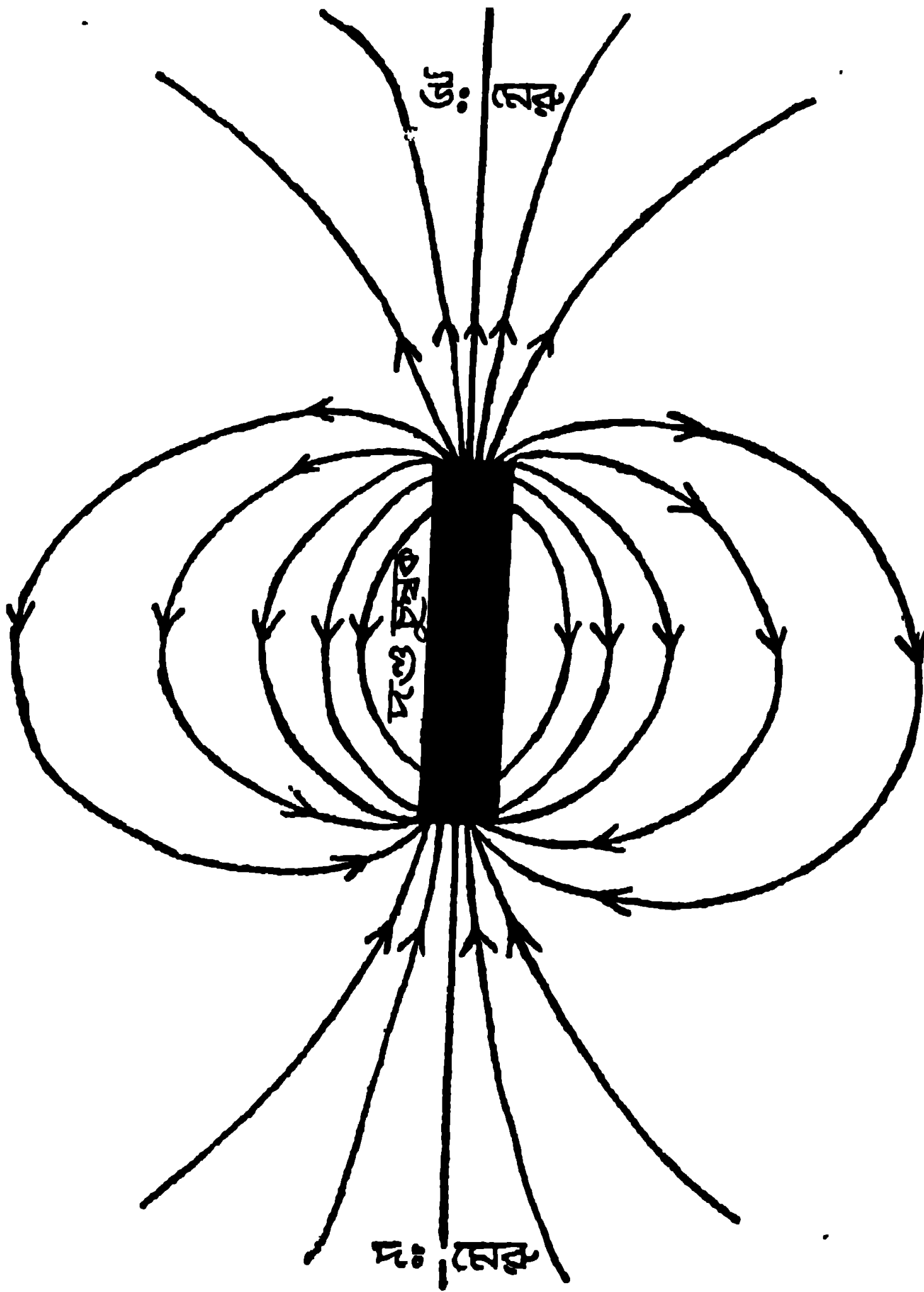
১নং চিত্র (ক)। দণ্ডচুম্বকের বলরেখা (দ্বিমেরুজ চৌম্বক ক্ষেত্র)।

মহাজাগতিক রশ্মির গবেষকদের মতে, এই বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ শুধুমাত্র সূর্য থেকে নয়, মহাশূন্য থেকেও আসে। এদের পথও কোন এক চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখা—আর এই চৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তার এই জগৎ ছাড়িয়ে মহাশূন্যেও।

ষ্টোর্মার সূর্য থেকে বিদ্যুৎকণা-প্রবাহের স্বরূপ ও তজ্জনিত মেরুজ্যোতি ও পৃথিবী বেষ্টনকারী তড়িৎ-প্রবাহের রূপ সম্পর্কে এক প্রকল্পের অবতারণা করেন। আমেরিকায় বেনেট এই প্রকল্পের সত্যতা নিরূপণের জন্যে ক্ষুদে পৃথিবীর উপর ইলেকট্রন

বর্ষণ করেন। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র কেবলমাত্র পথ নির্দেশক নয়—কণা-প্রবাহকে কেন্দ্রীভূত হতেও সাহায্য করে।

এখন এক সমস্যা দেখা গেল—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র না হয় বিদ্যুৎকণা-প্রবাহের পথ নির্দেশ করে, কিন্তু বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ কি এই চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না? এই সম্পর্কে ১৯৩১ সালে চ্যাপ্‌ম্যান ও ফেরারো এক সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁদের মতে, সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎকণা-প্রবাহের সংঘাতে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সূর্যের দিকে ফেরানো মুখটা (দিনের দিকটা) খানিকটা চেপ্টে যাবে; কিন্তু বিপরীত দিকের অবস্থা সম্বন্ধে তখনও কিছু বলা যায় না। ১৯৬২ সালে পিডিংটন দেখান যে, বিদ্যুৎকণা-প্রবাহ ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময় ম্যাগ্নেটো-স্ফিয়ারের রাতের দিকটা টেনে লেজের মত লম্বা করে দিয়ে যাবে। বস্তুতঃ এখন ছবিতে (৩নং চিত্র) দেখানো ম্যাগ্নেটোস্ফিয়ারের রূপটাই মোটামুটি সর্বজনস্বীকৃত। এই বিশেষ ধরণের প্রতিরূপের নামকরণ হয়েছে—Tear drop model। ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এই রূপটা কিন্তু আমরা পৃথিবীতে বসে বুঝতে পারবো না। এই প্রতিরূপের সন্ধান মিলবে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রায় সীমানায় গিয়ে—ভূ-কেন্দ্র থেকে প্রায় ৬০,০০০ কিলোমিটার গেলে। সব চেয়ে আশার কথা এই যে, রকেটের যুগে এই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়েছে। এক্সপ্লোরার-১০ ও পাইওনিয়ার-৫ ম্যাগ্‌নেটো-স্ফিয়ারকে দূর থেকে প্রায় অশ্রুবিন্দুর মতই দেখেছে। পৃথিবী থেকে বহুদূরে গিয়ে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের এই আকৃতিটা ধরা পড়ে বলে একে বলা হয়—দূরবর্তী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র (Distant Geomagnetic Field)।
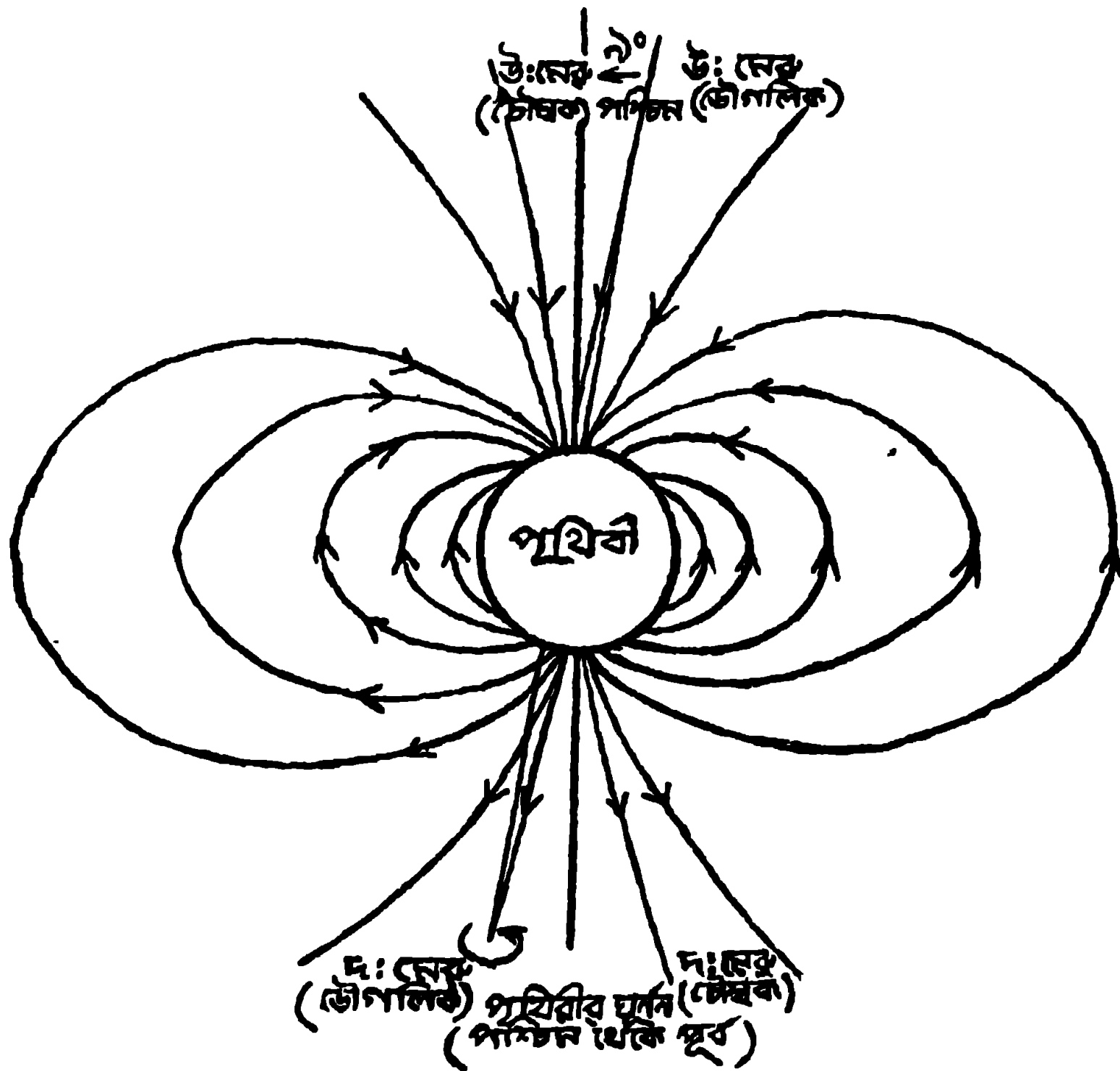
১নং চিত্র (খ)। ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের দ্বিমেরুজ রূপ (ম্যাগ্‌নেটোস্ফিয়ার)

এই দূরবর্তী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্র পেরিয়ে গিয়ে আর এক চৌম্বক ক্ষেত্রের সন্ধান মিলে। তাকে বলা হয় আন্তগ্র্হ চৌম্বক ক্ষেত্র (Interplanetary Magnetic Field)। এই আন্তগ্র্হ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য কয়েক গামার মত (এক

গামা = $১০^{-৫}$ গস্)—পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের প্রায় এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। পূর্বেই বলা হয়েছে, এই চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটা আবছা ধারণা বৈজ্ঞানিকদের মনে বহুকাল আগে থেকেই ছিল। বর্তমানে কৃত্রিম গ্রহ ও রকেটযানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের সরাসরি মান নিরূপণ করা সম্ভব হয়েছে। এ-পর্যন্ত পৃথিবী থেকে মাত্র কয়েক লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান পাওয়া গেছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে মেরিনার-২-এর মত অন্যান্য গ্রহ ও সূর্যের দিকে পাঠানো রকেটগুলি থেকে এই সম্বন্ধে আরও ভালভাবে জানা যাবে। তবে একথা সুনিশ্চিত যে, এই চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পূর্ণরূপে সূর্যের সঙ্গে যুক্ত ও সূর্যের উপর নির্ভরশীল। সে জন্যে আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে সূর্যের চৌম্বক ক্ষেত্র সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার—আর এই সৌরচৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তারেই আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের উৎপত্তি।
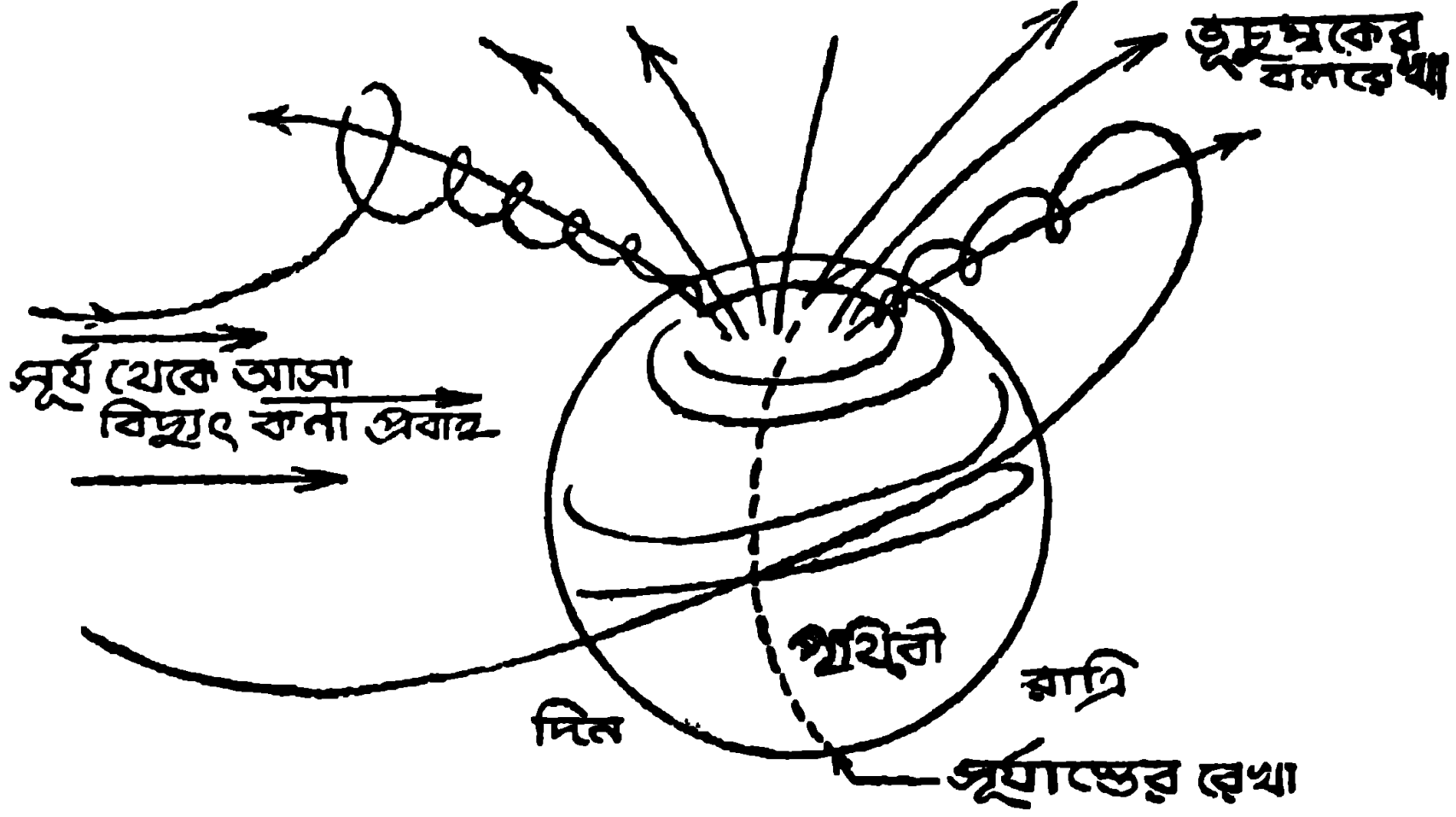
২নং চিত্র। সূর্য থেকে আসা বিদ্যুৎকণা-প্রবাহের পথ নির্দেশ করে ভূ-চুম্বকের বলরেখা।
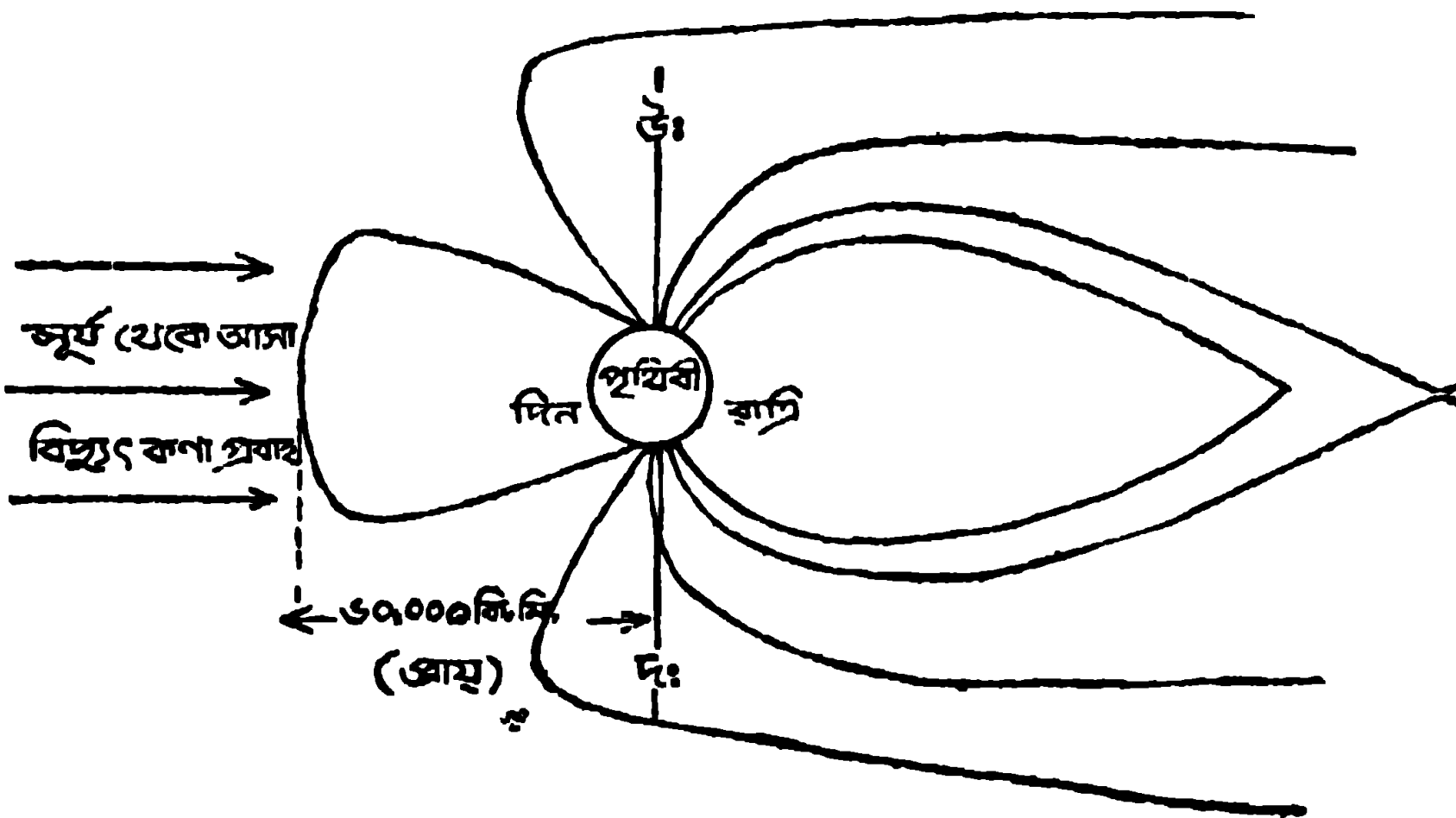
৩নং চিত্র। দূরবর্তী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের রূপ। সূর্য থেকে আসা বিদ্যুৎকণা-প্রবাহের চাপে দিনের দিকটা চেপ্টে গেছে, আর রাতের দিকটা লেজের মত লম্বা হয়ে গেছে।

সূর্যের পৃথিবীর মত দ্বিমেরুজ কোন চৌম্বক

ক্ষেত্র আছে কি না, সে সম্পর্কে মতভেদ আজও আছে। তবে আশা করা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর মত সূর্যেরও একটা দ্বিমেরুজ চৌম্বক ক্ষেত্র থাকা সম্ভব—আর তার প্রাবল্য প্রায় ১ গস্-এর মত (৪নং চিত্র)। সূর্যের চৌম্বক মেরুর সঙ্গে তার যাবে, তা কিন্তু আমরা আজকাল আগে থেকেই আন্দাজ করতে পারি। আরও দেখা গেছে যে, প্রায় এগারো বছর বাদে বাদে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সর্বাধিক হয়। একেই বলা হয় 'Eleven year sunspot cycle'। গত কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৫৭
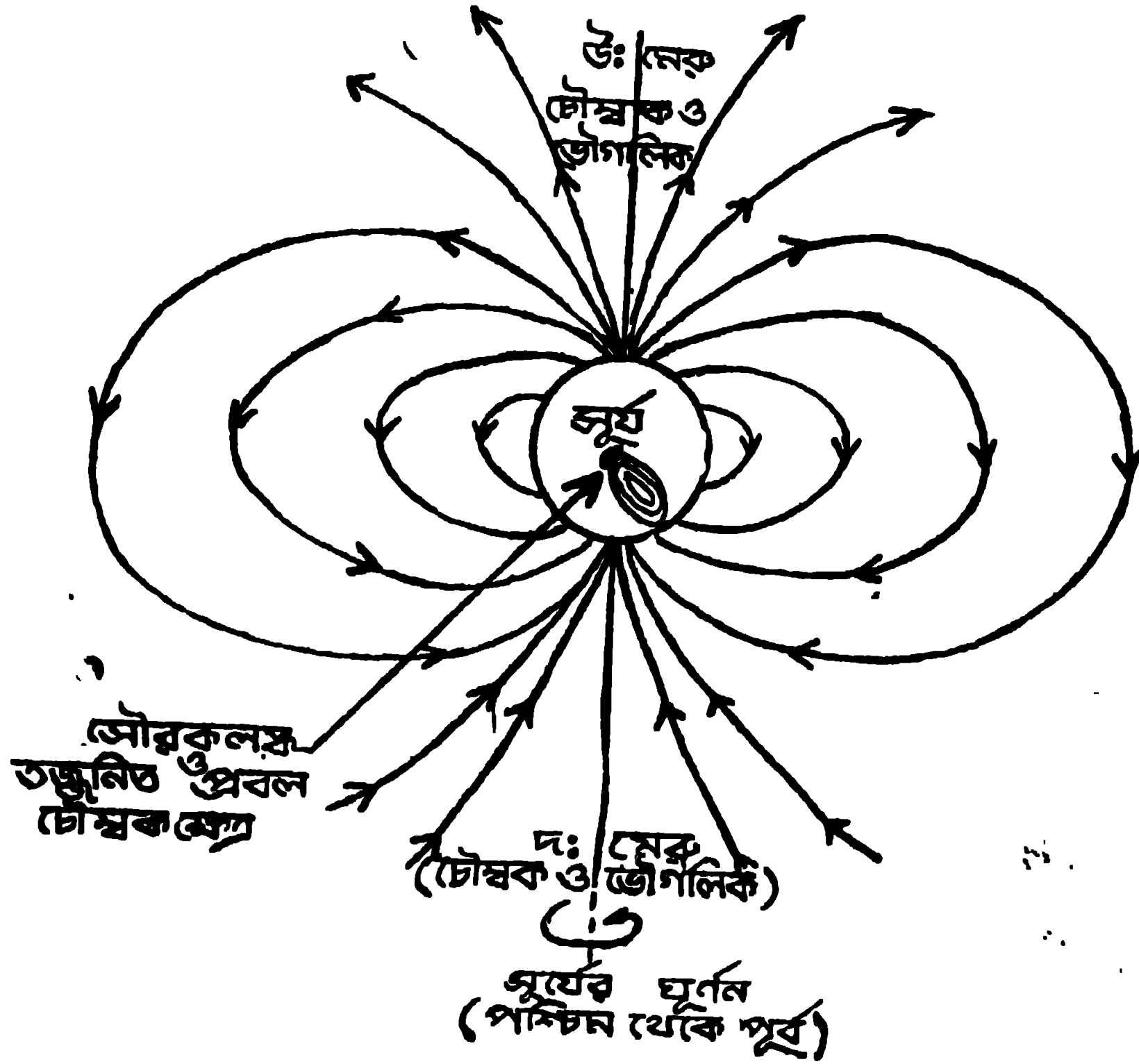
৪নং চিত্র। সূর্যের দ্বিমেরুজ চৌম্বক ক্ষেত্র ও সৌরকলঙ্কের প্রবল চৌম্বক ক্ষেত্র।

ভৌগলিক মেরুর কোন অবস্থানের ব্যবধান নেই। সূর্য পৃথিবীর মতই তার মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে। সম্পূর্ণ একপাক ঘুরতে সূর্যের প্রায় আমাদের ২৭ দিন সময় লাগে। কিন্তু সূর্যের চৌম্বক মেরুর চিহ্ন অর্থাৎ উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু, পৃথিবীর চৌম্বক মেরুর চিহ্নের মত স্থির নয়—মাঝে মাঝে এই মেরুচিহ্ন বদলে যায়, অর্থাৎ উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর চিহ্ন পায়, আর দক্ষিণ মেরু উত্তর মেরুর চিহ্ন পায়। মনে হয়, এর সঙ্গে 'Eleven year sunspot cycle'-এর কোন যোগাযোগ আছে। সৌরকলঙ্ক আমরা সূর্যের উপর কালো কালো ছাপের মত দেখি—কিন্তু এই স্থানগুলি আসলে প্রবল চৌম্বক শক্তিসম্পন্ন অঞ্চল। সূর্যের উপর এই সৌরকলঙ্ক কতগুলি দেখা যাবে, না সালে সৌরকলঙ্কের সংখ্যা সর্বাধিক হয়। আশা করা যায়, আবার ১৯৬৮ সালে এই সংখ্যা সর্বাধিক হবে। এই সৌরকলঙ্কের জন্যেই ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক ঝটিকার সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ঝটিকার প্রাবল্য নির্ভর করে সৌরকলঙ্কের আয়তনের উপর ও অনেকাংশে সংখ্যার উপরও। সূর্যের ঘূর্ণনের ফলে একটি সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর দিকে ২৭ দিন অন্তর ফিরে আসে, সে জন্যে অনেক সময় ২৭ দিন অন্তর অন্তর চৌম্বক ঝটিকার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যে সময় সৌরকলঙ্ক থাকে না, তাকে বলা হয় সূর্যের শান্ত দিন (Quiet day sun)।

মোটামুটি দুই ভাবে সৌরচৌম্বক ক্ষেত্র আন্তগ্র্হ অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। পার্কারের মতে, সূর্যের করোনার তাপমাত্রা খুব বেশী (প্রায় দশ

লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড) হওয়ার জন্যে সেই অঞ্চলের গ্যাস (প্রধানতঃ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম) আয়নিত হয়ে যায় এবং প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ৩০০ কিলোমিটার বেগে বেরিয়ে আসতে থাকে। এই বেরিয়ে-আসা আয়নিত গ্যাস তাদের সঙ্গে সৌর-চৌম্বক ক্ষেত্রকেও টেনে আনে আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে। এই প্রতিরূপের নাম দেওয়া হয়েছে Solar wind বা সৌর বায়ু। সূর্যের ঘূর্ণনের ফলে এই আয়নিত মত। এই বর্ধিত গতিবেগসম্পন্ন সৌর বায়ু পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে এসে চৌম্বক ঝটিকার সৃষ্টি করে।

গোল্ড সৌরচৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তারের আর এক প্রক্রিয়ার কথা বলেন—তিনি এটির নাম দেন Magnetic tongue model বা চৌম্বক জিহ্বার প্রতিরূপ। এই প্রতিরূপে কল্পনা করা হয় যে, সৌর-কলঙ্কের অঞ্চল থেকে চৌম্বক ক্ষেত্রের বলরেখাগুলি
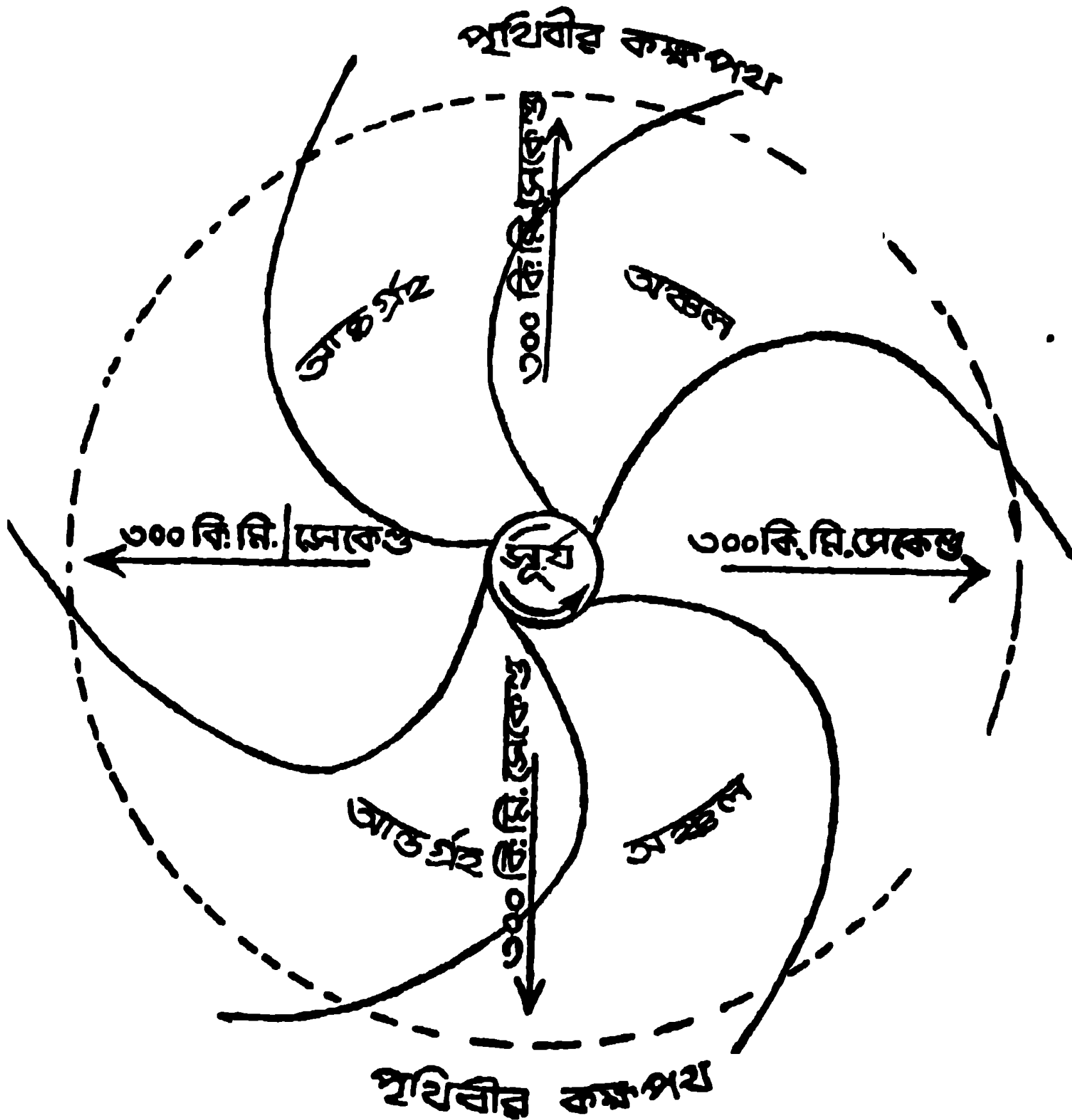
৫নং চিত্র। সৌরবায়ুর দ্বারা বিস্তৃত সৌরচৌম্বক ক্ষেত্র শান্ত দিনের আন্তর্গ্রহ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। চিত্রে দেখানো বক্ররেখাগুলি সৌরবায়ুর গতিপথ সূচিত করে।

গ্যাস-প্রবাহের গতিপথ বেঁকে যায় (৫ নং চিত্র)। সৌর বায়ুর এই চিত্র সূর্যের শান্ত দিনে দেখা যায়। সে সময়ে আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য এর উপরই নির্ভর করে। সৌরকলঙ্ক দেখা গেলে, সেই সৌরকলঙ্কের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে-আসা আয়নিত গ্যাসের গতিবেগ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়—প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় হাজার কিলোমিটারের জিহ্বার মত বেরিয়ে আসে (৬ নং চিত্র)। এরও গতিবেগ প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে হাজার কিলোমিটারের মত। যখন এই চৌম্বক জিহ্বা ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সংস্পর্শে আসে, তখন দেখা যায় চৌম্বক ঝটিকা। আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে এই চৌম্বক জিহ্বার প্রাবল্য বেশ ধীরে ধীরে কমে—তাই সূর্যের শান্ত দিনগুলিতেও আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য দেখা যায়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে—এই সব প্রতিরূপের সঙ্গে বাস্তবের সংযোগ কতখানি? রকেট-প্রেরিত তথ্যাদি থেকে দেখা যায়—সৌরচৌম্বক ক্ষেত্রের বিস্তারে উপরিউক্ত দুই প্রক্রিয়াই অংশ গ্রহণ করে। সৌরকলঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বৃদ্ধি ও বিদ্যুৎকণা-প্রবাহের গতিবেগ বৃদ্ধিরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাছাড়া মহাজাগতিক রশ্মি, মেরুজ্যোতি, আয়নোস্ফিয়ার বা উচ্চ বায়ুমণ্ডলের অনুসন্ধান থেকেও ঐ দুই প্রতিরূপের সহায়ক তথ্যাদি পাওয়া যায়। পরিশেষে এটুকু বলা যায় যে, রকেট-বিজ্ঞানের অগ্রগতি থেকে মনে হয়—অদূর ভবিষ্যতেই এই আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্র ও দূরবর্তী ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের সরাসরি মান নিরূপণের দ্বারা সঠিক চিত্র তৈরী করা সম্ভব হবে, আর সেটা আলোচিত প্রতিরূপগুলি থেকে খুব একটা ভিন্ন ধরণের হবে না।
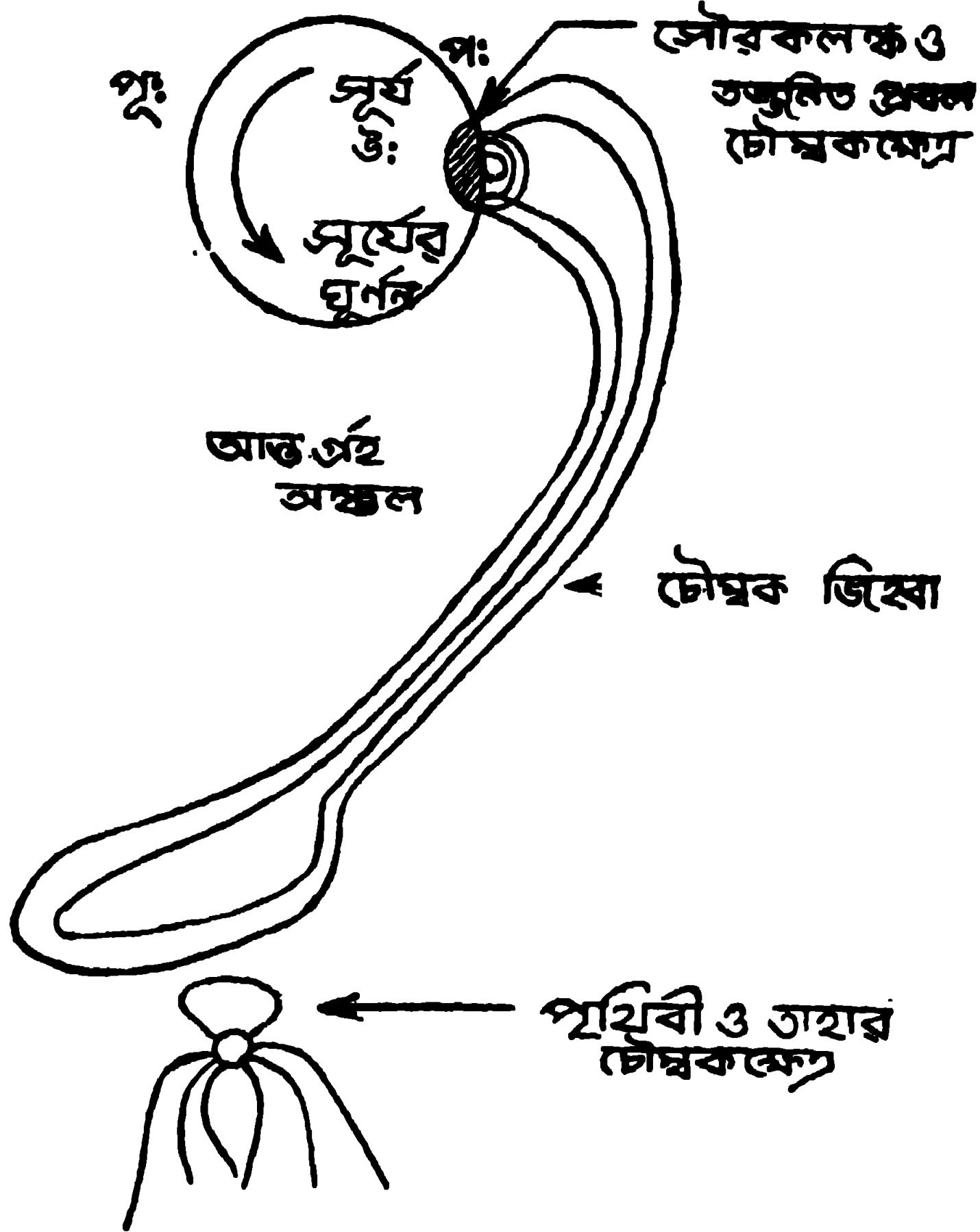
৬নং চিত্র। আন্তর্গ্রহ চৌম্বক ক্ষেত্রের 'চৌম্বক জিহ্বা প্রতিরূপ'। সেকেণ্ডে হাজার কিলোমিটার বেগে সৌরকলঙ্কের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসে।

উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল

শ্রীদীপক বসু

একথা সকলেই জানেন যে, ভূপৃষ্ঠের উপর বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বাতাসের একটা আস্তরণ আছে —যার নাম বায়ুমণ্ডল। নানা কারণে এই বায়ুমণ্ডল আমাদের জীবনধারণের জন্যে অপরিহার্য। বাতাসের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়া ছাড়া প্রাণী-জগৎ জীবনধারণ করতে পারে না, বাতাসের মাধ্যম ছাড়া শব্দ পরিবাহিত হয় না। সূর্য থেকে আগত প্রচণ্ড শক্তিশালী বিভিন্ন রশ্মিমালার আক্রমণ থেকে বায়ুমণ্ডলই আমাদের রক্ষা করে।

বায়ুমণ্ডলের এই জাতীয় বিবিধ উপকারিতার কথা অনেক আগেই মানুষ উপলব্ধি করেছে, তাই বহুকাল থেকেই সে বায়ুমণ্ডলকে বিশদভাবে জানবার ও বোঝবার চেষ্টা করছে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গঠন-রহস্য, স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য এবং উর্ধ্বাকাশে কতদূর পর্যন্ত এর অস্তিত্ব—এই সব সম্বন্ধে বর্তমানে অনেক কিছুই জানা গেছে। পর্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের সুবিধার জন্যে এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলকে মোটামুটি-ভাবে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে—ট্রপোস্ফিয়ার, ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, আয়নোস্ফিয়ার ও এক্সোস্ফিয়ার (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এদের মধ্যে ট্রপোস্ফিয়ার ও ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারকে বলা যায় নিম্ন বায়ুমণ্ডল; আর আয়নোস্ফিয়ার ও এক্সোস্ফিয়ারকে নিয়ে হলো উচ্চ বায়ুমণ্ডল। ঝড়, বৃষ্টি, মেঘ, তুষার-পাত—ইত্যাদি আকাশের যে সব প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত—সেগুলি সবই ঘটে নিম্ন বায়ুমণ্ডলে। অপর পক্ষে—মেরুজ্যোতি, বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন, চৌম্বক ঝটিকা ইত্যাদি যে সব ঘটনা অনেকের কাছে স্বল্প পরিচিত, সেগুলি ঘটে উচ্চ বায়ুমণ্ডলে।

নিম্ন বায়ুমণ্ডলের ঘটনাগুলি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং পরীক্ষাকার্যের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ বলে প্রথম দিকে এই অঞ্চল নিয়েই গবেষণা সুরু হয়। কিন্তু মানুষের অনুসন্ধিৎসার বুঝি কখনও শেষ নেই! তাই ক্রমশঃ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বায়ুমণ্ডলের উচ্চ অংশগুলির উপর। উচ্চাকাশ সম্বন্ধে গবেষণার জন্যে বিজ্ঞানের অনেক দিক থেকেই সাড়া পাওয়া গেল; যেমন—পদার্থবিদ্যা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূ-পদার্থতত্ত্ব প্রভৃতি। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় গড়ে উঠলো নানারকম অভিনব পদ্ধতি। উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিভিন্ন গবেষণা-পদ্ধতি ও তাথেকে প্রাপ্ত ঐ অঞ্চল সম্পর্কে আমাদের আধুনিক ধারণা—এসবই হলো বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

প্রথমতঃ যে সব বিচিত্র প্রণালীতে উচ্চাকাশ সম্পর্কে গবেষণা চালানো হয়েছে ও হচ্ছে, নিম্নে সে সব বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করা হলো।

(১) আয়নোস্ফেরিক রেকর্ডার—পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডল সৌরশক্তির একটা বিরাট অংশ গ্রহণ করে। ফলে ঐ সব স্থান অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, সূর্য থেকে আগত নানা জাতীয় শক্তিশালী রশ্মি উচ্চ বায়ুমণ্ডলের পরমাণুগুলি থেকে ইলেকট্রন বিচ্যুতি ঘটিয়ে তাদের আয়নে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ভূপৃষ্ঠের উপর প্রায় ৫০ কি. মি. থেকে ৫০০ কি মি. পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইলেকট্রন ও আয়নের দ্বারা গঠিত এবং এরই নাম আয়নো-স্ফিয়ার। আয়নোস্ফিয়ার প্রধানতঃ চারটি স্তরে বিভক্ত। নীচে থেকে সুরু করে যথাক্রমে ডি, ই, এফ-১, ও এফ-২—এই চারটি ইংরেজী অক্ষর দিয়ে তাদের অভিহিত করা হয় (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

ইলেকট্রনের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে আয়নো-স্ফিয়ারের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গের বিভিন্ন গুণাবলী পরীক্ষা করে ঐ অঞ্চলের ইলেকট্রনের ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়, এরূপ যন্ত্রের নাম আয়নোস্ফেরিক রেকর্ডার।

(২) কৃত্রিম উপগ্রহ—উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের আবির্ভাব হয় ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ-তাত্ত্বিক বছর নামে পরিচিত জুলাই (১৯৫৭) থেকে ডিসেম্বর (১৯৫৮) পর্যন্ত আঠারো মাস-ব্যাপী সময়ে সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা একযোগে ব্যাপকভাবে পরীক্ষাকার্য চালান, সূর্য ও পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলকে কেন্দ্র করে এই অনুষ্ঠানেরই

১নং চিত্র। এক্সোস্ফিয়ার সমন্বিত পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের চিত্ররূপ।
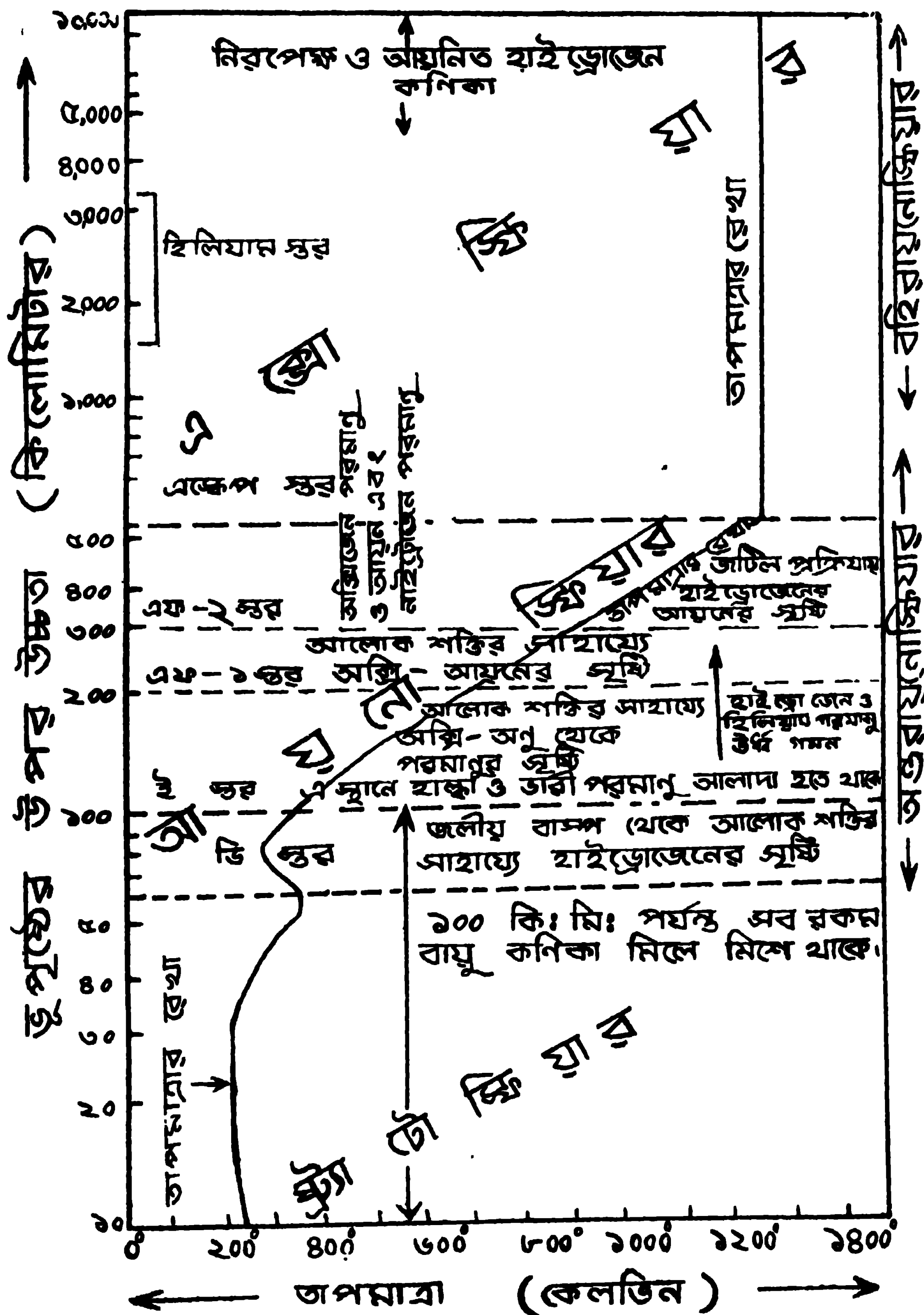
অন্যতম কর্মসূচী ছিল—কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-১ আকাশে উঠেছিল। তারপর থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত শতাধিক মহাশূন্যগামী উপগ্রহ সাফল্যের সঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকটি উপগ্রহই মহাকাশ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের এনে দিয়েছে নতুন সব তথ্য।

উপায় আছে। প্রত্যেক উপগ্রহই তার সঙ্গে নিয়ে যায় নানাবিধ যন্ত্রপাতি। এদের মধ্যে থাকে এক বা একাধিক বেতার-প্রেরক যন্ত্র। বিদ্যুৎ-পরিবাহী আয়নিত স্তরগুলির মধ্য দিয়ে আসবার সময় উপগ্রহ থেকে প্রক্ষিপ্ত বেতার-তরঙ্গমালার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। তরঙ্গমালার এই পরিবর্তন থেকে এবং উর্ধ্বে প্রেরিত যন্ত্রপাতি থেকে উচ্চ
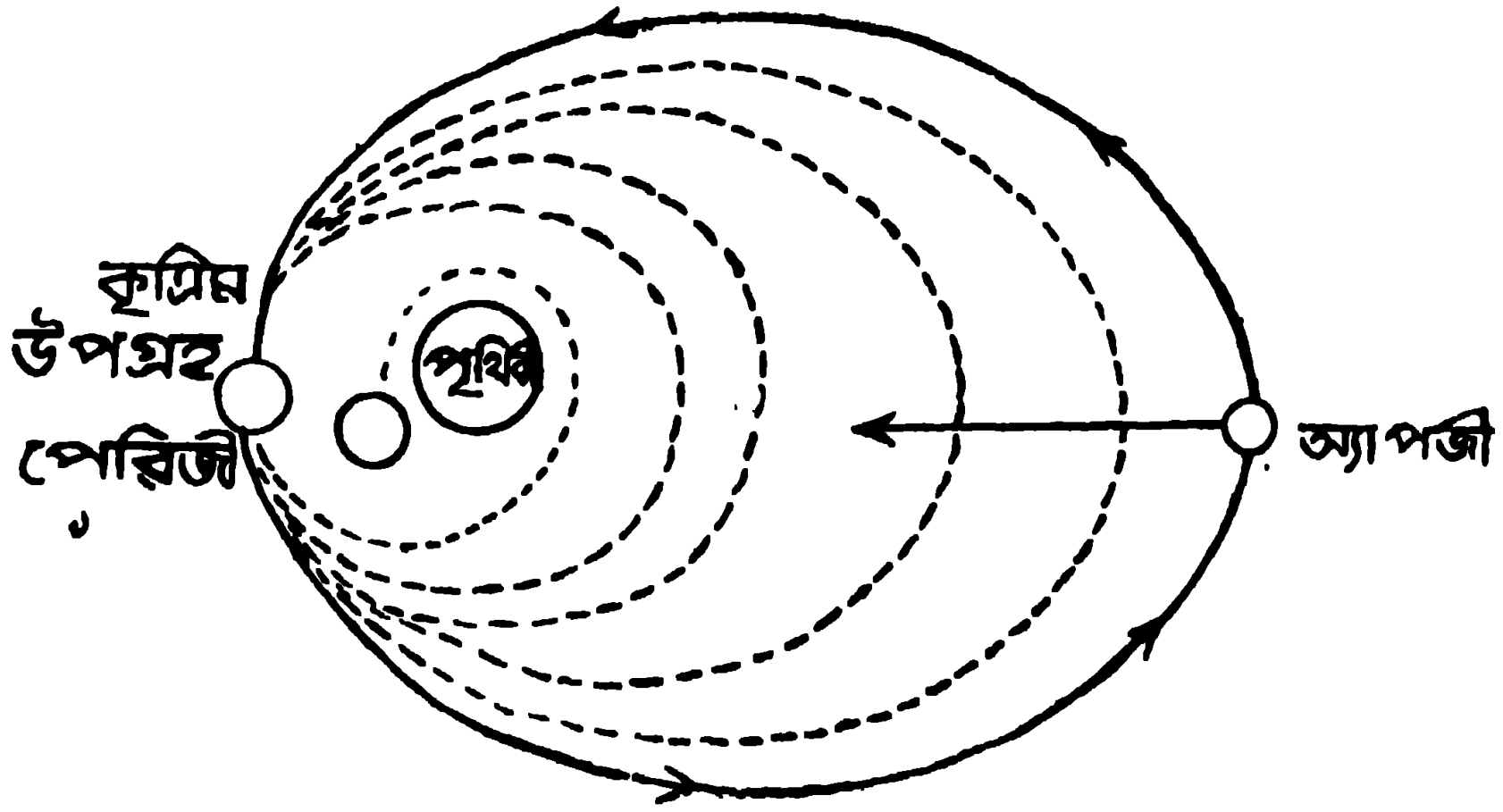
২নং চিত্র। কৃত্রিম উপগ্রহের ভ্রমণ-পথ। বায়ুকণিকার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে গতিপথ ক্রমশঃ গুটিয়ে আসে।

কৃত্রিম উপগ্রহ মোটামুটি উপবৃত্তাকার পথে পৃথিবীর চারদিক পরিক্রমা করে। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উর্ধ্বাকাশের বায়ুকণিকার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে উপগ্রহের গতিবেগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। পরিক্রমণ-পথও ক্রমশঃ গুটিয়ে আসে (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই গতিবেগ হ্রাসের পরিমাণ থেকে ঐ সব অঞ্চলে বায়ুকণিকার ঘনত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ একথাও জানা আছে যে, আমাদের পৃথিবী ঠিক গোলাকার নয়, অনেকটা কমলালেবুর মত চ্যাপ্টা। তাই কৃত্রিম উপগ্রহের উপর আদর্শ গোলাকার পৃথিবীর যে টান হওয়া উচিত ছিল, বাস্তব ক্ষেত্রে তা হয় না। এর ফলে উপগ্রহের গতিপথ ক্রমশঃ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই পরিবর্তন থেকেও বায়ুকণিকার পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে। তাছাড়া কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উচ্চাকাশ সম্পর্কে গবেষণার আরও প্রকৃষ্ট

বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানতে পারা গেছে।

(৩) চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে বেতার-প্রতিধ্বনি—১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত চার বছরকাল ইংল্যাণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এক অভিনব পরীক্ষাকার্য চালিয়েছিলেন। বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ তাঁরা চন্দ্রের দিকে প্রক্ষেপ করেন। চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে ঐ সব তরঙ্গমালা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আগত তরঙ্গমালার মতই চন্দ্রে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গও বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসবার পথে ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে নানারকম তথ্য বহন করে নিয়ে আসে। এসব থেকে আয়নিত অঞ্চলে ইলেকট্রনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়েছে।

(৪) হুইস্‌লার বিদ্যুৎ—অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে, আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে

তা থেকে বড় বড় দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে তাদের ধরা যায়। একটি বিশেষ ধরণের এই জাতীয় বিদ্যুতের নাম দেওয়া হয়েছে হুইস্‌লার। কারণ বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে এদের শীষ (হুইস্‌ল্) দেবার মত শোনায়। হুইস্‌লার থেকে উদ্ভূত বেতার-তরঙ্গমালা সৃষ্ট অঞ্চল থেকে পৃথিবীর চৌম্বক বলরেখা বরাবর বায়ুমণ্ডলের বহিরাংশের ইলেকট্রন কণিকার মাধ্যমে এক গোলার্ধ থেকে অপর গোলার্ধে চলে যায় (৩নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় গোলার্ধে প্রতিফলিত হয়ে তারা পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আসে। এই ভাবে কয়েকবার এক গোলার্ধ থেকে অপর গোলার্ধে আসা যাওয়া করতে পারে। স্বভাবতঃই তরঙ্গমালার গতিপথ নির্ভর করে ঐ অঞ্চলে ইলেকট্রনের পরিমাণের উপর। ফলে এই গতিপথ থেকেও উচ্চ বায়ুমণ্ডলে ইলেকট্রনের ঘনত্ব নিরূপণ করা যায়।

উপরিউক্ত বিভিন্ন উপায়ে উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যাদির সাহায্যে ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে নিম্নরূপ ধারণা স্থিরীকৃত হয়েছে (১ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আমরা জানি যে, বায়ুমণ্ডল প্রধানতঃ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, জলীয় বাষ্প এবং সামান্য পরিমাণে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের দ্বারা গঠিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০ কি মি. পর্যন্ত সকল প্রকার বায়ুকণিকা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একই সঙ্গে অবস্থান করে। কিন্তু তার উপরে গিয়ে এদের একতা নষ্ট হয়ে যায়। তারা নিজেদের মধ্যে পৃথক হতে আরম্ভ করে। স্বভাবতঃই যে সব কণিকা অপেক্ষাকৃত হাল্কা, তারা উপরে চলে যায়। অবশিষ্ট যারা নীচে পড়ে থাকে, তারা অন্যদের তুলনায় বেশী ভারী।

হাল্কা কণিকার মধ্যে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুই প্রধান। ভূপৃষ্ঠের উপর ইউরেনিয়াম ও নানা জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে হিলিয়াম গ্যাস নির্গত হয়। আর ৮০ কি মি.-এর উপর সূর্যকিরণের সাহায্যে জলীয় বাষ্প থেকে ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার কথা জানা গেছে। হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন অত্যন্ত হাল্কা বলে নীচে বা মধ্যবর্তী অঞ্চলে থাকতে পারে না—সোজা উপরে উঠে যায়। এমন কি, উচ্চ বায়ুমণ্ডলেও এদের দেখতে পাওয়া যায় না। এরা চলে যায় বায়ুমণ্ডলের একেবারে বহিরাংশে—এক্সোস্ফিয়ারে। এই অঞ্চলে এক জটিল প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে হাইড্রোজেন আয়নেরও সৃষ্টি হয়।

এদিকে ১২০ কি. মি.-এর উপর আলোক-রশ্মির প্রচণ্ড শক্তি অক্সিজেন অণুকে ভেঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হয়। ফলে এখান থেকেই নাইট্রোজেনের তুলনায় অক্সিজেন পরমাণুর অনুপাত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এফ-স্তরের উপরে আলোক-শক্তিই আবার অক্সিজেন পরমাণু থেকে ইলেকট্রনের বিচ্যুতি ঘটিয়ে অক্সিজেন আয়নের সৃষ্টি করতে পারে। তাই ৩৫০ কি. মি.-এর উপরে অক্সিজেন পরমাণু আর অক্সিজেন আয়নই বায়ুকণিকার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। তাছাড়া অবশ্য আলোচ্য স্থানে সামান্য পরিমাণে নাইট্রোজেনও পাওয়া যায়।

৫৫০ কি. মি.-এর উপরের অবস্থা একটু অন্যরূপ। বায়ুমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে কণিকাগুলি সর্বদাই পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে। যে কোন কণিকাকে উপর দিকে ঠেলে দিলেও মাধ্যাকর্ষণের টানে এবং উপরিস্থিত অন্য কণিকাসমূহের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে সে বেশী উপরে যেতে পারে না। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ধাক্কাধাক্কির পরিমাণ এবং মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি উভয়ই হ্রাস পায়। এভাবে একটি বিশেষ উচ্চতায় এসে কোন কণিকাকে ঊর্ধ্বমুখে ধাক্কা দিলে দেখা যায় যে, সে বহু ঊর্ধ্বে চলে গিয়ে উপবৃত্তাকার পথ পরিভ্রমণ করবার পর আবার নীচে নেমে দূরবর্তী কোন স্থানে

এসে পড়ে (৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। এই জাতীয় কণিকা নিয়েই বায়ুমণ্ডলের বহিরাংশ বা এক্সোস্ফিয়ার অঞ্চল গঠিত। ৫৫০ কি. মি. উচ্চতা থেকে বায়ুকণিকাসমূহের এরূপ উর্ধ্বগতি সুরু হয় এবং এটাই হলো এক্সোস্ফিয়ারের তলদেশ। এই অঞ্চলের কণিকাগুলি বায়ুমণ্ডল ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে বলে একে বলা যেতে পারে পলায়নী স্তর।

পলায়নী স্তরের ঠিক উপরে—ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ কি. মি. পর্যন্ত এলাকার গঠন ঐ স্তরের তলদেশে—প্রধান প্রধান কণিকাসমূহের (এক-স্তরের উপরের দিকেও যাদের পাওয়া যায়) পরিমাণ প্রতি ঘনসেণ্টিমিটারে $১০^৭$ এবং ১৫০০ কি মি.-এ এই ঘনত্ব কমে গিয়ে দাঁড়ায় $১০^৪$ ঘ. সে. মি.। হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা নীচের দিকে নগণ্য হলেও শেষোক্ত উচ্চতায় তা প্রাধান্য লাভ করে। বায়ুমণ্ডলের একেবারে বহিরাংশে—পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ৫ ব্যাসার্ধ দূরে—হাইড্রোজেন আয়নের সংখ্যা দেখা যায় প্রতি ঘ. সে. মি.-এ কয়েক শত।
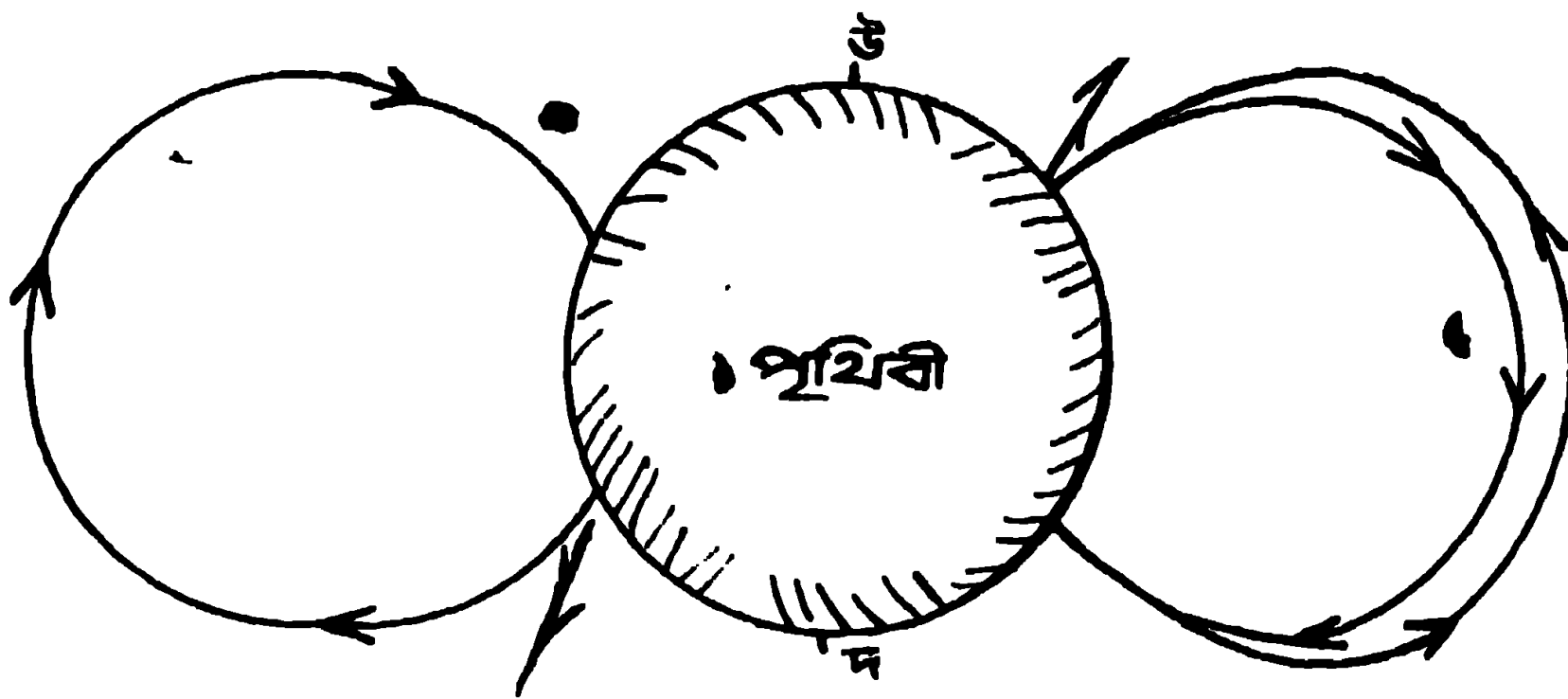
৩নং চিত্র। হুইস্লার জাতীয় বিদ্যুৎ থেকে উদ্ভূত প্রাকৃতিক বেতার-তরঙ্গের গতিপথ।

ঠিক নীচের মতই, অর্থাৎ সেখানেও আছে প্রধানতঃ অক্সিজেন পরমাণু ও আয়ন এবং কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন পরমাণু। কিন্তু আর একটু উপরে উঠলেই তাদের স্থান অধিকার করে লঘু কণিকার দল—প্রথমে হিলিয়াম পরমাণু ও আয়ন (১২০০-৩৪০০ কি. মি.) এবং তারপর হাইড্রোজেন পরমাণু ও আয়ন। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে অঙ্কিত ৫নং ও ৬নং চিত্রে আলোচ্য অবস্থাটি দেখানো হয়েছে। ছবিতে হিলিয়াম দেখানো হয় নি, কারণ এর সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য এখনও পাওয়া যায় নি। শুধু এটুকু জানা গেছে যে, মোটামুটি ২০০০ কি. মি. পুরু একটি স্তর হিসাবে হিলিয়াম ১২০০ কি. মি. থেকে ৩৪০০ কি. মি. উচ্চতায় অবস্থান করছে।

এই দুটি চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৫৫০ কি. মি. উচ্চতায়—অর্থাৎ এক্সোস্ফিয়ারের পক্ষান্তরে এই স্থানে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যা প্রতি ঘ. সে. মি-এ এক শতেরও কম। তাই হাইড্রোজেন আয়নকেই বলা চলে আলোচ্য অঞ্চলের প্রধান বায়ুকণিকা।

১নং চিত্রে দেখা যাবে যে, ১০০ কি. মি. উচ্চতায় উষ্ণতার পরিমাণ ৩০০°, তারপর থেকে উষ্ণতা ক্রমশঃ সমানভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাড়তে বাড়তে পলায়নী স্তরে এসে উষ্ণতা দাঁড়ায় ১২৫০°। এরপর সমগ্র এক্সোস্ফিয়ার হলো সমতাপীয় অঞ্চল, অর্থাৎ ৫৫০ কিঃ মিঃ-এর উপরে উত্তাপ সর্বত্র সমান। উচ্চতার সঙ্গে তার কোন পরিবর্তন হয় না।

উচ্চাকাশের গঠন সম্বন্ধে যে মতবাদ উপরে দেওয়া হলো—সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন; তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ ও তা নিয়ে গবেষণার

পরেই উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে।

অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীর এই বায়ুমণ্ডলের শেষ কোথায় এবং সে অঞ্চলের অবস্থা কিরূপ? তার ওপারেই বা কি আছে? আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল. গ্রহ-উপগ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চল—যাকে বলা যেতে পারে আন্তর্গ্রাহিক অঞ্চল—সেটা একেবারে শূন্য, অর্থাৎ সেখানে কিছুই নেই। বর্তমানে দেখা গেছে যে, ঐ স্থানও মণ্ডলের শেষ সীমা। আন্তর্গ্রাহিক ধূলিকণা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ওরা পৃথিবীর কেউ নয়। কিন্তু বায়ুকণিকাসমূহ শেষ সীমা পর্যন্ত ঐ শক্তির দ্বারা পরিচালিত। ১০ পার্থিব ব্যাসার্ধেরও বেশী দূরে দুই প্রকার কণিকার ঘনত্বের মধ্যে এরূপ সমতা লক্ষ্য করা যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। আন্তর্গ্রাহিক ধূলিকণার মধ্যে যেগুলি বিদ্যুৎ-কণা—অর্থাৎ প্রোটন ও ইলেকট্রন—তাদের উৎস হলো সূর্য। এছাড়া সৌর-
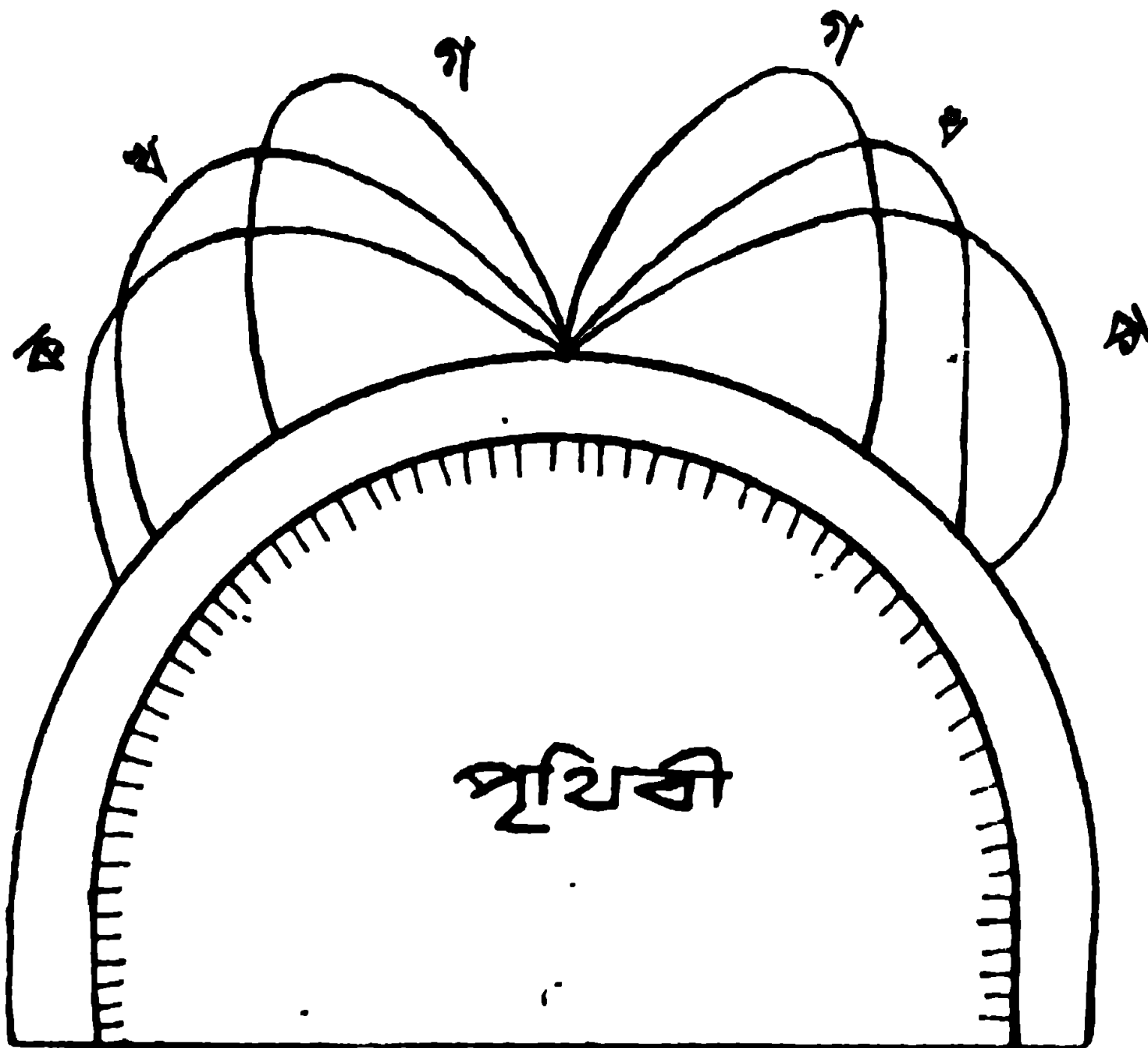
৪নং চিত্র। পলায়নী স্তরে বায়ুকণিকার উর্ধ্বগতি। এদের গতিবেগ সেকেণ্ডে ৩.৫ কিঃ মিঃ হয়। কখ ও গ বিভিন্ন কোণে উৎক্ষিপ্ত কণিকার গতিপথ সূচিত করে।

বিভিন্ন কণিকার দ্বারা গঠিত, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে আন্তর্গ্রাহিক ধূলিকণা। এদের মধ্যে বিদ্যুৎ-কণিকা ও নিরপেক্ষ কণিকা—দুই প্রকার কণিকাই আছে। এদিকে আমরা জানি যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে ওঠা যায়, বায়ুমণ্ডলও ততই হাল্কা হতে থাকে; অর্থাৎ বায়ুকণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। এভাবে এক জায়গায় এসে বায়ুকণিকার ঘনত্ব কমতে কমতে আন্তর্গ্রাহিক ধূলিকণার ঘনত্বের সঙ্গে সমান হয়ে যায়। বর্তমান ধারণা অনুযায়ী এই অঞ্চলই হলো বায়ু-জগতের বাইরে থেকে আগত নিরপেক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণুও কিছু পরিমাণে এখানে পাওয়া যায়। তবে সৌরকণিকার (প্রতি ঘ. সে. মি.-এ ৩০০) তুলনায় হাইড্রোজেনের সংখ্যা (প্রতি ঘ সে. মি -এ ৩ মাত্র) নিতান্ত সামান্য।

সূর্যাস্তের কিছু পরে আকাশের যে স্থানে সূর্য নেমে যায়, ঠিক সেই স্থানেই অনেক সময়ে এক ধরণের আলো দেখতে পাওয়া যায়। এর নাম জোডিয়াকের আলো। আন্তর্গ্রাহিক ধূলিকণার মধ্যস্থিত ইলেকট্রনের মধ্যে সূর্যালোক

বিচ্ছুরিত হয়ে এই আলোর সৃষ্টি করে বলে বিশ্বাস। ফলে এই আলো-কে পর্যবেক্ষণ করে ঐ অঞ্চলের ইলেকট্রনের ঘনত্ব নিরূপণ করা হয়েছে। কোন কোন হিসাব অনুযায়ী সূর্য থেকে পৃথিবী যত দূরে আছে, সেই দূরত্বে সূর্য থেকে আগত ইলেক্ট্রনের সংখ্যা প্রতি ঘ. সে. মি.-এ ৬০০ এবং তাদের উষ্ণতা ১০০০°। এত কম উত্তাপ মেনে নিতে অনেকেই আবার রাজী নন! তাঁদের মতে ঐ সব অঞ্চলে উত্তাপ আরও বেশী। তাঁরা সৃষ্ট, পার্থিব বায়ুকণিকার দ্বারা নয়। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র আবার ব্যাপারটিকে জটিলতর করে ফেলেছে। কারণ এর জন্যে সৌরবিদ্যুৎ-কণিকাগুলি খুব সহজে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, চৌম্বক ক্ষেত্র তাদের গতিপথকে পৃথিবীর দিক থেকে পরিবর্তিত করে দেয়। কিন্তু দেখা গেছে যে, সূর্য থেকে আগত বিদ্যুৎ-কণিকাগুলির সঙ্গেও কিছুটা চৌম্বক ক্ষেত্র জড়িত থাকে। এই দুই চৌম্বক ক্ষেত্রের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে
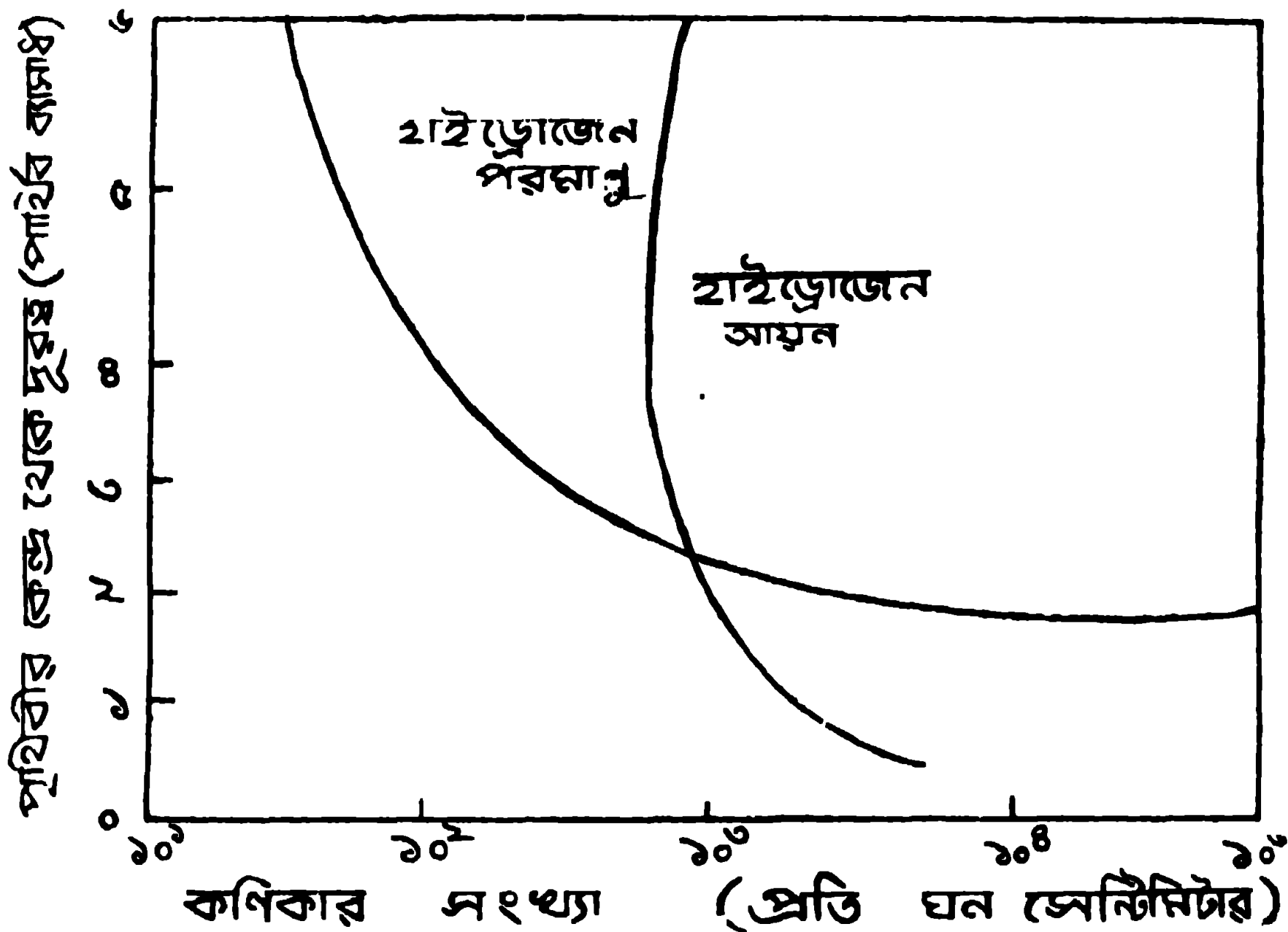
৫নং চিত্র। বিভিন্ন উচ্চতায় হাইড্রোজেন পরমাণু ও হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব।

আরও বলেন যে, এক্সোস্ফিয়ার ও আন্তর্গ্রাহিক অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিকভাবে কণিকার আদান-প্রদান চলে। অত্যন্ত দ্রুতগামী হাইড্রোজেন পরমাণু ও আয়ন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হিলিয়াম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল থেকে পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু তারা বেশী দূর যেতে পারে না। সূর্যের আকর্ষণে আটকে গিয়ে আন্তর্গ্রাহিক অঞ্চলেই থেকে যায়। অপর পক্ষে, হাইড্রোজেন ও আয়ন বাইরে থেকে মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, এক্সোস্ফিয়ার—অন্ততঃ তার বহিরাংশ সূর্যের বহিরাঞ্চল (করোনা) থেকে আগত কণিকার দ্বারা হুইস্‌লার বিদ্যুৎ যে পথে প্রবাহিত হয়, সৌরকণিকাগুলি সেই পথে বায়ুমণ্ডলের ভিতরে প্রবেশ করে। সৌরকণিকার দ্বারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বহিরাংশের গঠন সম্পর্কে এরূপ মতবাদের বিরুদ্ধে খুব বেশী কিছু বলবার নেই। আবার পার্থিব কণিকার দ্বারা গঠন সম্পর্কিত মতবাদও সমপরিমাণে বলশালী। প্রকৃতপক্ষে কোন্ উৎস থেকে আগত কণিকাসমূহ বায়ুমণ্ডলের বহিরাংশ গঠনের জন্যে দায়ী, তা স্থিরীকৃত হবে একমাত্র আরও অনেক তথ্য সংগ্রহ, সে সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ ও গবেষণার সাহায্যে।

এতক্ষণ বিভিন্ন প্রকার পরমাণু ও আয়ন জাতীয়

কণিকা সম্বন্ধে বলা হলো। এগুলি ছাড়া উর্ধ্বাকাশে আর এক জাতীয় কণিকাও আছে—সে হলো ইলেকট্রন। এফ-স্তর পর্যন্ত আয়নমণ্ডলে ইলেক্‌ট্রনের ঘনত্ব মাপা হয় নীচে থেকে আয়নোস্ফেরিক রেকর্ডারের সাহায্যে। এফ-স্তরের উপরের অংশ পর্যবেক্ষণের বিবিধ পদ্ধতির কথা আগেই বলা হয়েছে। ঐগুলি ছাড়া সম্প্রতি আর একটি অভিনব প্রণালীর উদ্ভব হয়েছে। ছোট্ট একটি

৭ নং চিত্রে ভূপৃষ্ঠের উপর বহুদূর পর্যন্ত বিভিন্ন উচ্চতায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব দেখানো হয়েছে। হুইস্‌লার জাতীয় বিদ্যুৎ সম্পর্কিত পর্যবেক্ষণ থেকে গৃহীত তথ্যের সাহায্যে চিত্রটি অঙ্কিত।

ইলেকট্রন এবং সর্বাপেক্ষা লঘু কণিকা—হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন আয়নের দ্বারা গঠিত এক্সোস্ফিয়ারকে বলা যেতে পারে বহিরায়নোস্ফিয়ার; আর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন জাতীয় গুরুভার আয়নের
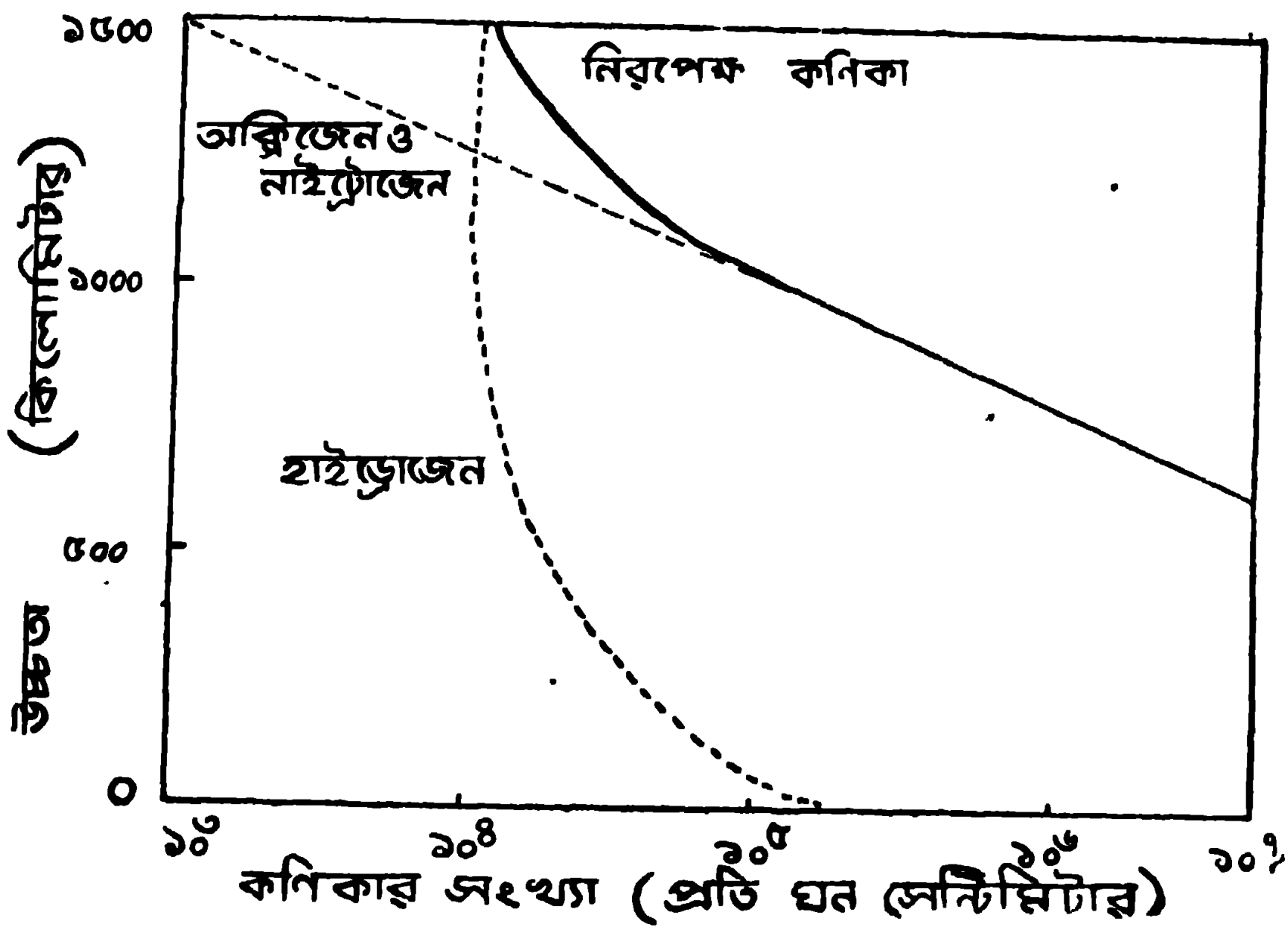
৬নং চিত্র। বিভিন্ন উচ্চতায় আয়নোস্ফিয়ারের অপেক্ষাকৃত ভারী কণিকার ঘনত্ব। তুলনার জন্যে চিত্রে হাইড্রোজেনও দেখানো হয়েছে।

আয়নোস্ফেরিক রেকর্ডার রকেটের সাহায্যে আয়নোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়। নীচের রেকর্ডারের মতই রকেটবাহিত রেকর্ডার আয়নোস্ফিয়ারের উপর-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত বেতার-তরঙ্গ গ্রহণ করে। আয়নোস্ফিয়ারের অপর দিকটা এতদিন আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। এই পদ্ধতির ফলে তারও রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হয়েছে। ঐরূপ পর্যবেক্ষণের ফলে এমন সব তথ্য পাওয়া গেছে, যা থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে যে, এফ-স্তরের উপরে আরও একটি স্তর আছে। এর আনুমানিক উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮০০-১০০০ কি. মি.।

দ্বারা গঠিত অঞ্চলের নাম দেওয়া চলে অন্তরায়নোস্ফিয়ার।

উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বলা হলো, তা মোটেই সম্পূর্ণ নয়। আলোচনাকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে অনেক কিছুই বাদ দেওয়া হয়েছে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে এত পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া গেছে যে, সে সব এখনও অনুশীলন করে দেখা হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বর্তমানে তোলা হয়েছে। রকেট বা উপগ্রহ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবার সময় সেই অঞ্চলকে

বিশেষভাবে আলোড়িত করে যায়। তাই মহাকাশ-যান-বাহিত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি থেকে ঐ আলোড়িত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বেতার-তরঙ্গ-বাহিত তথ্য সঠিক ও নির্ভরযোগ্য কিনা, তা ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থতাত্ত্বিক বছরে গৃহীত সব তথ্যের এখনও পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় নি। ১৯৬৩-'৬৪ সালে আবার হচ্ছে আন্তর্জাতিক শান্ত সূর্য বছর। আবার সারা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকেরা একযোগে পরীক্ষাকার্য করতে সক্ষম নয়। কিন্তু গবেষণা কেবল এই দুটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে পর্যবেক্ষণ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—একথা বৈজ্ঞানিক সমাজ উপলব্ধি করেছেন। তাই উন্নত দেশগুলির সহযোগিতায় গঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এই সংস্থা অনুন্নত দেশগুলিকে রকেট দিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে পর্যবেক্ষণের কাজে সাহায্য করবে।

উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত-

ইলেকট্রনের সংখ্যা (প্রতি ঘন সেন্টিমিটার)

পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব (পার্থিব ব্যাসার্ধ)
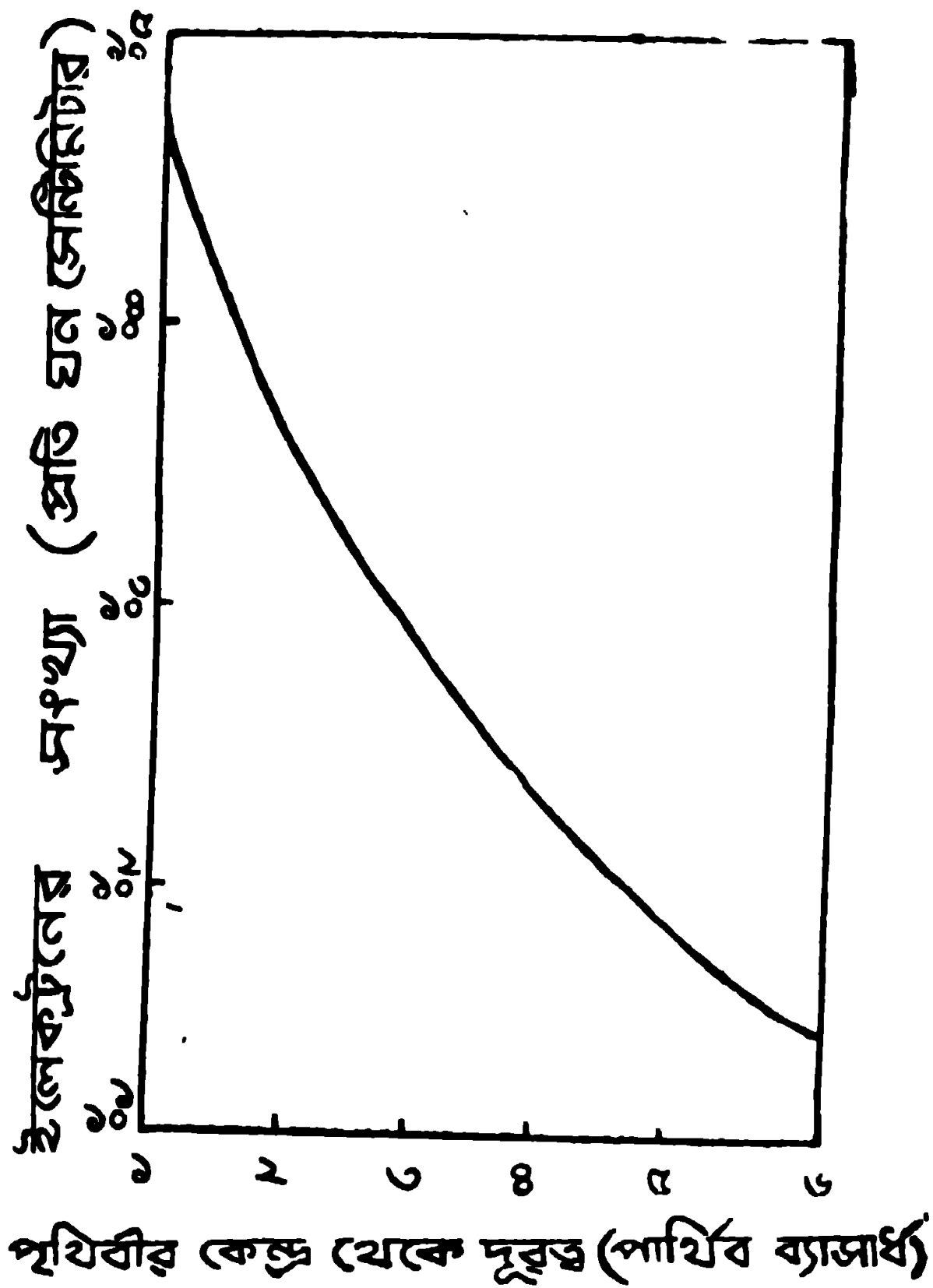
৭২ চিত্র। হুইস্‌লার জাতীয় বিদ্যুৎ থেকে উদ্ভূত বেতার-তরঙ্গের গতিপথের পর্যবেক্ষণ দ্বারা নির্ণীত বিভিন্ন উচ্চতায় ইলেকট্রনের ঘনত্ব।

চালাচ্ছেন শান্ত সূর্য ও উচ্চ বায়ুমণ্ডলকে নিয়ে। এই সব পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা শেষ হলে পর হয়তো উচ্চাকাশ সম্বন্ধে এখনকার অনেক সমস্যার সমাধান হবে। বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা ও সেখানকার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে হয়তো তখন সঠিকভাবে বলা যাবে।

রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ে উচ্চাকাশে গবেষণা এখনও রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর কারণ, বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন দেশ ঐ ব্যাপারে এত বেশী অর্থব্যয় বর্ষের অবদান কম নয়! প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর পূর্বে কলকাতায় আয়নোস্ফিয়ার সংক্রান্ত গবেষণাগার স্থাপিত হয়। ১৯২৭-'২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতার গবেষণাগার প্রাচ্যদেশে এই জাতীয় গবেষণাগারগুলির মধ্যে প্রথম এবং ১৯৩২-'৩৩ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মেরু বছরের অনুষ্ঠান-সূচীতে যোগদান করেছিল একমাত্র ভারতীয় কেন্দ্র। পরে ভারতের অন্যান্য স্থানেও উচ্চবায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ সুরু হয়েছে—তাদের মধ্যে আমেদাবাদ, দিল্লী

ও ওয়াণ্টেগার প্রধান। আমাদের দেশে বর্তমানে মহাকাশ সম্বন্ধে উৎসাহী বহু সংখ্যক গবেষক আছেন। তাঁরা যদি গবেষণার বিষয়বস্তু ঠিক ভাবে বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী সীমিত স্থান ও ওজনের মধ্যে যন্ত্রপাতি তৈরী করতে পারেন, তাহলে অন্য দেশের নির্মিত উপগ্রহে এই যন্ত্র বসিয়ে পর্যবেক্ষণ নেওয়া সম্ভব হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে, সম্প্রতি ভারত সরকার কেরালাতে রকেট উৎক্ষেপের একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে মনস্থ করেছেন। আশা করা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশের উচ্চ বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে উৎসাহী গবেষকমণ্ডলী ঐ অনুষ্ঠানের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

অধ্যাপক-স্মরণে

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ভড়

দিনপঞ্জী লেখবার বাতিক নেই, বড়াই করবার মত স্মৃতিশক্তিও নেই। তাই পুরনো কথা বলতে গেলে প্রতিপদে হোঁচট খেতে হয়। অতীত জীবনের পাতা উল্টালে দেখি, বেশীর ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। শুধু পড়ে আছে পরীক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকে দাগ কাটা অংশের মত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার অস্পষ্ট অনুলিপি। এমনি বিচ্ছিন্ন ঘটনা স্মরণ করে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলবো।

(১)

কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বছর আগেকার কথা। আমরা কয়েকজন ছাত্র মফস্বলের কলেজ থেকে বি. এস-সি পাশ করে কলকাতায় বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিদ্যায় এম এস-সি পড়তে এলাম। আজও মনে পড়ে, অনাগত ভবিষ্যতে এম এস-সি পাশ করবার গৌরব লাভের আশায় সে দিন যত না আনন্দিত হয়েছিলাম, তার চেয়ে যাঁদের শুধু নাম শুনেছি, এমন কয়েকজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর সান্নিধ্যলাভ করবো, এই সম্ভাবনা মনটাকে অনেক বেশী আলোড়িত করেছিল। এঁদেরই একজন অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র।

কবে কি উপলক্ষ্যে অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম, তা মনে পড়ে না। তবে প্রথম যে দিন তিনি আমাদের ক্লাশ নিতে এলেন, সে দিনের কথা বেশ মনে আছে। সাড়ে দশটায় ক্লাশ সুরু হওয়ার কথা। আমরা উন্মুখ হয়ে বসে আছি। কিছুদিন আগেই কলেজের সেশন আরম্ভ হয়েছে, আমরা প্রতিদিন আসছি যাচ্ছি, কিন্তু অধ্যাপক মিত্রকে তখনও ভাল করে দেখি নি। আজ সে সুযোগ হবে। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে দশটা বাজতে তিনি ক্লাশ ঘরে পদার্পণ করলেন। ঋজু সুঠাম দেহ, প্রশস্ত ললাট, মাথায় ঘনকৃষ্ণ কেশদাম সযত্ন বিন্যস্ত। ঠিক সাড়ে এগারটায় বক্তৃতা শেষ করে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। প্রায় এক ঘণ্টাব্যাপী তাঁর এই বক্তৃতায় না ছিল বাগবাহুল্য, না ছিল অস্পষ্টতার অনুমাত্র অবকাশ। ক্লাশে বসে নিছক পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে এমন সুসংবদ্ধ ও মার্জিত বক্তৃতা ইতিপূর্বে কখনও শুনি নি। সে দিনের প্রথম পরিচয়েই মানসপটে অঙ্কিত হয়ে রইলো বেশভূষায়, চালচলনে এবং বাচনভঙ্গীমায় একটি পরিপাটি মানুষের ছবি।

(২)

এম. এস-সি পরীক্ষায় আমার বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল ওয়্যারলেস বা বেতার-বিজ্ঞান। পাশ করবার কিছুদিন পরেই অধ্যাপক

মিত্রের বেতার গবেষণাগারে এই বিষয়ে রিসার্চ করবার সুযোগ জুটে গেল।

সুযোগ তো জুটলো, কিন্তু সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কে? প্রথম কয়েক মাস রিসার্চের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারলাম না। বেতার-বিজ্ঞান সম্পর্কিত জনপ্রিয় ইংরেজী পত্রিকা 'ওয়্যারলেস ওয়ার্ল্ড' পড়া, স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ওয়্যারলেসের এক্স-পেরিমেন্টগুলির তত্ত্বাবধান করা, আর তারই ফাঁকে ফাঁকে অগ্রবর্তী গবেষকগণের কার্যকলাপ দেখা—এই তিনটি কাজেই বেশ আনন্দ পেতাম। মাসিক পঁচাত্তর টাকা বৃত্তি পাই, সুতরাং বেকার অপবাদের আশঙ্কা নেই। নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটতে লাগলো।

কিন্তু গোল বাঁধলো একদিন। সকালের দিকে লেবরেটরীতে বসে সহকর্মীদের সঙ্গে বসে খোস-গল্প করছি, এমন সময় বেয়ারা এসে জানালো, সাহেব ডাকছেন। এরকম অঘটন ইতিপূর্বে বড় একটা ঘটে নি। দু'একটি সামান্য কথা ছাড়া অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে বাক্যালাপের এতদিন কোনও প্রয়োজন ঘটে নি। পারতপক্ষে তাঁর ঘরে তো ঢোকতামই না—কচিৎ কখনও বারান্দায় মুখামুখি দেখা হয়ে গেলে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারলে বাঁচতাম। অশ্রদ্ধার কথা নয়, কেমন যেন ভয় পেতাম। তাই ডেকেছেন শুনে ঘাবড়ে গেলাম। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম—কাকে ডাকছেন, আমাকে? সে সকল সন্দেহ নিরসন করে "হ্যাঁ আপনাকে" বলে নিশ্চিন্তে বেরিয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে যথাসম্ভব মনোবল সঞ্চয় করে অধ্যাপক সকাশে হাজির হলাম, প্রায় কাঠগড়ার আসামীর মত অবস্থা।

সঠিক তারিখ মনে নেই—শুধু মনে আছে, সেটা ১৯৩৫ সালের মধ্যভাগের ঘটনা। এতকাল পরে সে দিনের কথোপকথনের সারমর্ম যেটুকু মনে আছে, তাই লিপিবদ্ধ করলাম।

অধ্যাপক—তুমি এখন কি করছ?

আমি—একটু-আধটু পড়াশুনা করি।

—কি পড়?

—বেশীর ভাগ 'ওয়্যারলেস ওয়ার্ল্ড' পড়ি।

—আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা করেছ?

—যৎসামান্য পড়েছি।

এর পর তিনি ম্যাক্সওয়েলের ইলেক্ট্রোম্যাগ্‌-নেটিক থিয়োরী থেকে সুরু করে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার মধ্যে বেতার-সংযোগ স্থাপনে মার্কোনীর সাফল্য, এই সাফল্যে প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি এবং এই সূত্রে উচ্চাকাশে আয়নমণ্ডলের অস্তিত্বের প্রমাণলাভ—এই সকল তথ্য সন্নিবেশিত করে সহজভাষায় একটি প্রবন্ধ রচনা করতে বললেন। বড় জোর দশ মিনিটের মধ্যে সব কথাবার্তা শেষ করে তিনি আমাকে বিদায় দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে মনে হলো—একটা ভয়ঙ্কর ফাঁড়া কেটে গেল।

অধ্যাপকের আদেশমত প্রবন্ধ লেখবার কথা ভাবতে বসে আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল, এতো বই পড়ে গল্প লেখা—এর মধ্যে গবেষণার আছে কি? তবু বিগত দিনের উদ্দেশ্যহীন ও নিশ্চিন্ত কালক্ষেপের পরিবর্তে অধ্যাপক কর্তৃক নির্দিষ্ট কার্যভার পেয়ে খুসীই হয়েছিলাম। অচিরেই প্রবন্ধ লেখবার কাজে রীতিমত আত্মনিয়োগ করলাম। কত বই পত্র হাঁট্‌কে কত মক্‌শ করে দিস্তার পর দিস্তা কাগজ নষ্ট হলো। কিছুতেই মনের মত লেখা আর হয় না। এমনি করে বোধ হয় মাসাধিক কাল কেটে যাবার পর টাইপ করা চৌদ্দ-পনেরো পৃষ্ঠার মত একটি রচনা খাড়া করে একদিন ভয়ে ভয়ে অধ্যাপক সমীপে নিবেদন করলাম। সম্ভবতঃ সে দিন তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, কাগজগুলি আমার হাত থেকে নিয়ে একটু উল্টেপাল্টে দেখেই বললেন, এটা এখন আমার কাছে থাক, পরে দেখবো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেরিয়ে এলাম।

এরপর ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয় নি, তিনিও কোন দিন আমার কাছে ওই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নি। সে দিন বুঝি নি, কিন্তু উত্তরকালে সুস্পষ্টভাবে এই সত্য উপলব্ধি করেছি যে, অধ্যাপক মিত্রের সেই প্রথম আদেশের মধ্যে নিহিত ছিল গুরুর ইষ্টমন্ত্র। সেই প্রবন্ধ রচনার প্রচেষ্টাই আমার অনভিজ্ঞ মনে আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে কৌতূহল জাগিয়ে আমাকে এই বিষয়ে গবেষণায় দীক্ষিত করেছিল।

(৩)

পাঠকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে—বেতার-বিজ্ঞানের গবেষণাগার, সেখানে নভোমণ্ডলের আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে এত কৌতূহলের কারণ কি? এক কথায় এর উত্তর—আয়নোস্ফিয়ারের সঙ্গে দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এখানে আসল ব্যাপারটা আর একটু পরিষ্কার করে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। জলপথে বা স্থলপথে ধাবমান বেতার-তরঙ্গ এত দ্রুত নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, তদ্দ্বারা দেশ-দেশান্তরে বেতার-বার্তা আদান-প্রদানের কাজ চলে না। কিন্তু ঊর্ধ্বপথে ধাবিত বেতার-তরঙ্গ অক্ষুণ্ণ শক্তিতে অগ্রসর হয়। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত আয়নোস্ফিয়ার এই ঊর্ধ্বগামী তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে' ভূপৃষ্ঠে ফিরিয়ে দেয়। আয়নোস্ফিয়ারের এই প্রতিফলন-প্রক্রিয়াই পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে বেতার-সংযোগ সহজসাধ্য করেছে। এর মধ্যে আরও একটু কথা আছে। আয়নোস্ফিয়ারের প্রতিফলন ক্ষমতা স্থিতিশীল নয়। নৈসর্গিক নানা কারণে এর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কখনও কখনও এমন বিপর্যয়ও ঘটে যে, আয়নোস্ফিয়ার অগ্রগামী বেতার-তরঙ্গকে ফিরিয়ে না দিয়ে তার সমস্ত শক্তি আত্মসাৎ করে ফেলে। তখন দূরপাল্লার বেতার যোগাযোগ সম্পূর্ণ রহিত হয়ে যায়। এই সব কারণে উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের অন্তর্বর্তী আয়নোস্ফিয়ারের অবস্থা, প্রকৃতি, ধর্ম ইত্যাদি খুঁটিনাটি জানবার প্রচেষ্টা বেতার-বিজ্ঞানীদের পক্ষে শুধু স্বাভাবিক নয়, একান্ত প্রয়োজনীয়।

১৯৩৫ সালের শেষভাগে অধ্যাপক মিত্র বিলাতে চলে গেলেন। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্রের কার্যকলাপ পরিদর্শন করে তিনি দেশে ফিরলেন। উচ্চতর বায়ুমণ্ডল, তথা আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে আধুনিকতম গবেষণালব্ধ সকল তথ্য সঙ্কলন করে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করবার বাসনা কিছুকাল আগে থেকেই তাঁর মনে বাসা বাঁধছিল। আভাস-ইঙ্গিতে আমরাও তা বুঝতে পারছিলাম। এখন বিলাত থেকে ফিরে এসে সে বাসনা দৃঢ় সংকল্পের রূপ নিল। ইতিমধ্যে তাঁর গবেষণা-কেন্দ্রে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞান-কর্মী সমবেত হয়েছেন এবং আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে গবেষণায় তাঁদের কাজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও লাভ করেছে। অধ্যাপক মিত্র এই গবেষক সম্প্রদায়ের সামনে তাঁর সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করলেন।

পরিকল্পিত পুস্তকের কাঠামো খাড়া করতেই বেশ কিছুদিন কেটে গেল। তারপর সকলকে ডেকে তিনি এই কাঠামো সবিস্তারে বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে এক একজনকে বিশেষ বিশেষ অংশের খসড়া প্রস্তুত করবার ভার দিলেন। ধীরে ধীরে কাজ সুরু হয়ে গেল। একদিকে বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা, অন্যদিকে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণা-কেন্দ্রে সংগৃহীত নবতম তথ্যসমূহ সমাবেশের আবশ্যকতা—এই দুই কারণে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করতে প্রায় দশ বছর অতিবাহিত হলো। এই দীর্ঘকালব্যাপী প্রস্তুতির বোঝা বহন করতে অধ্যাপক মিত্র যে ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে আমরা সকলেই বিস্মিত হয়েছিলাম। পুস্তকের নামকরণ হলো "আপার অ্যাটমস্ফিয়ার"।

(৪)

পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হবার কিছুকাল আগে থেকেই প্রশ্ন উঠলো প্রকাশক হবে কে? সকলেরই ইচ্ছা ইংল্যাণ্ড বা আমেরিকার কোন প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই পুস্তক প্রকাশিত হোক। দু'তিনটি বিখ্যাত কোম্পানীকে পুস্তকের বিষয়সূচীসহ পত্রাঘাত করলেন অধ্যাপক মিত্র, কিন্তু তাঁরা কেউ এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিতে রাজী হলেন না। লণ্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানী থেকে এই পত্রের যে উত্তর পাওয়া গেল, উল্লেখযোগ্য মনে করে তার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এখানে লিপিবদ্ধ করলাম:

"মহাশয়, প্রেরিত পত্র ও 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' গ্রন্থের বিষয়সূচী আমরা যত্নসহকারে বিবেচনা করেছি। আপনার নাম আমাদের কাছে সুবিদিত। সুতরাং আমাদের স্থির বিশ্বাস পুস্তকখানি উচ্চাঙ্গের হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে এই পুস্তক প্রকাশনের ভার গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

প্রথমতঃ এই বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যয় হবে অত্যধিক। পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ হয় যে, এই ব্যয় সঙ্কুলান করবার মত পর্যাপ্ত বিক্রয় এই ধরণের গ্রন্থের পক্ষে সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, আমরা অনুমান করি এই গ্রন্থ প্রকাশনের ভার গ্রহণ করলে আমাদের প্রভূত আর্থিক ক্ষতি হবে।"

এত দিনের পরিশ্রমের পর এই ধরণের উত্তর পেয়ে অধ্যাপক মিত্র তো বটেই, আমরাও মুসড়ে পড়লাম। কিন্তু তিনি হাল ছাড়লেন না।

তখন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর সভাপতি অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। বিদেশী প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তিনি ওয়াকেরহাল ছিলেন। তাঁরই সুপারিশে এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে শেষ পর্যন্ত এই গ্রন্থ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হলো। প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রন্থ আশাতীত সমাদর লাভ করলো। সারা দুনিয়ার নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা অধ্যাপক মিত্রের এই অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ম্যাকমিলান কোম্পানীর মত সুবিখ্যাত সংস্থার অনুমান ও হিসাব মিথ্যা প্রমাণ করে তিন বছরের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের দু'হাজার কপি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেল। এশিয়াটিক সোসাইটি সৎসাহসের পুরস্কারস্বরূপ লাভবান হলেন, অধ্যাপক মিত্রের ললাটে অঙ্কিত হলো জয়টিকা।

নিঃশেষিত পুস্তকের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্যে এশিয়াটিক সোসাইটি অধ্যাপক মিত্রের নিকট এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব করলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, এই ধরণের আধুনিকতম গবেষণাপ্রসূত জ্ঞান ও তথ্য সম্বলিত পুস্তকের অসুবিধা এই যে, প্রতি সংস্করণে এর যথোপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন একান্ত আবশ্যক। অধিকন্তু, আলোচ্য বিষয়ে গবেষণা যদি দ্রুত প্রগতিশীল হয়, তাহলে নতুন সংস্করণ প্রণয়নের কাজ বিশেষ আয়াসসাধ্য হয়। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের বিষয়টি এই পর্যায়ভুক্ত। তথাপি অধ্যাপক মিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নের প্রস্তাব গ্রহণ করেন ১৯৫০ সালে এবং বহুল পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে এই সংস্করণ প্রকাশিত হলো ১৯৫২ সালে।

(৫)

ভারতবর্ষে আয়নোস্ফিয়ার সম্বন্ধে গবেষণার প্রথম পূজারী অধ্যাপক মিত্র। উচ্চতর বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত এই বিশাল আয়নমণ্ডলের সম্যক পরিচয় পেতে হলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শত শত পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজন। অথচ ভারতবর্ষের মত বিস্তৃত ভূখণ্ডে তখন কলকাতায় একটি মাত্র গবেষণা-কেন্দ্র। ফলপ্রসূ গবেষণার পক্ষে এই অবস্থা নিতান্তই অসন্তোষজনক। অধ্যাপক মিত্র

স্বদেশের এই দুরবস্থা ।করণের পথে পদক্ষেপ করলেন ১৯৩৫ সালে।

কিন্তু পরাধীন দেশে এই পথের অন্তরায় অনেক; দেশের বিভিন্ন স্থানে গবেষণা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ব্যবস্থা করবার জন্যে প্রথমেই প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীয় গবেষণা পরিষদ। সরকারের আনুকূল্য ছাড়া এরূপ একটি সংস্থা গঠন অসম্ভব। কিন্তু তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের আর যাই থাকুক, ভারতবাসীর বিজ্ঞান-সাধনার প্রতি কৃপা-দৃষ্টি কোনও কালেই ছিল না। ইংল্যাণ্ডে অবস্থান-কালে ১৯৩৬ সালের ৫ই মে তারিখে অধ্যাপক মিত্র পিকাডিলীর এক হোটেলে ওই দেশের শীর্ষ-স্থানীয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন পদার্থ-বিজ্ঞানীকে এক নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। প্রধান অতিথি হলেন বেতার-বিজ্ঞানীদের নেতৃস্থানীয় সার ই. ভি. অ্যাপলটন। ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের "রেডিও রিসার্চ বোর্ড"-এর অনুরূপ একটি বেতার গবেষণা পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করবার উদ্দেশ্যেই এই নৈশভোজের আয়োজন। উপস্থিত সকলেই এরূপ একটি সংসদ গঠনের পক্ষে নানা যুক্তির উল্লেখ করলেন। বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ আর. গ্রেগরী ভারতবর্ষে একটি বেতার গবেষণা পরিষদ গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত সম্পাদকীয় লিখলেন

দেশে ফিরে অধ্যাপক মিত্র ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের অভিমত, নেচার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতির উল্লেখ করে দিল্লীর দপ্তরে হানা দিলেন। বলা আবশ্যক, এই ব্যাপারে তিনি অমূল্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার। অধ্যাপক সাহা তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়নোস্ফিয়ার সংক্রান্ত গবেষণা আরম্ভ করেছেন। ভারতবর্ষে ব্রডকাষ্টিং এবং বেতার গবেষণার প্রসার ও উন্নয়নের ব্যবস্থায় ভারত সরকারকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্যে নব প্রতিষ্ঠিত 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকায় তিনিও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ তেজস্বী ভাষায় অনেক লেখালেখি করলেন। কিন্তু আমলাতন্ত্রের পাষাণসৌধ শুধু লেখনীর আঘাতে বিচলিত হলো না।

১৯৩৮ সালে অধ্যাপক সাহা ফিরে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপকের পদে। দুই অধ্যাপক সম্মিলিত হলেন একই বিজ্ঞান মন্দিরে—পূর্ব পরিচিতি পর্যবসিত হলো অকৃত্রিম বন্ধুত্বে। ইতিমধ্যে ভারতের রাজ-নৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে সুরু হয়েছে। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এমন কয়েকজন সদস্য স্থান লাভ করেছেন, যাঁরা দেশের সত্যিকার ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণ সাধনে ব্যগ্র। ওদিকে আসন্ন মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে উদ্বিগ্ন বৃটিশ ক্যাবিনেট ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি ও আনুগত্য অর্জনে সচেষ্ট। এই পরি-স্থিতির মধ্যে ১৯৪০ সালে কমার্স বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে বিজ্ঞান ও শিল্প সংক্রান্ত গবেষণার উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে গঠিত হলো 'বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ'।

কালবিলম্ব না করে অধ্যাপক মিত্র তাঁর প্রস্তাব এই বোর্ডের কাছে পেশ করলেন। এত দিনের লেখা-লেখির ফলে প্রস্তাবের গুরুত্ব সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মহলের সকলেই অবহিত ছিলেন ১৯৪২ সালে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হলো রেডিও রিসার্চ কমিটি। অধ্যাপক মিত্র হলেন তার প্রথম সভাপতি। এই কমিটির পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে সুপরিকল্পিত বেতার-গবেষণাগার স্থাপনের সুযোগ ঘটলো।

(৬)

প্রকৃত কর্মীর কখনও কর্মের অভাব হয় না—একটি শেষ হতে না হতেই আর একটি এসে জোটে। বেতার-গবেষণা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর্ব শেষ না হতেই আর এক নতুন সমস্যা প্রকট হয়ে উঠলো।

এতদিন পর্যন্ত বেতার-বিজ্ঞান পদার্থ-বিজ্ঞানের

শাখা হিসাবেই গণ্য হতো এবং এই হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নবজাত বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল। পরে অন্যান্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ ব্যবস্থাই প্রচলিত হয়। কিন্তু সে দিন যে বিজ্ঞান ছিল নবোদ্গত পল্লব মাত্র, অভাবনীয় ক্ষিপ্রতায় বেড়ে উঠে শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে পনেরো বছরের মধ্যে সে বৃহৎ মহীরুহের আকার ধারণ করলো। স্বর্গীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এই দ্রুত প্রগতিশীল বিজ্ঞানকে পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তরালে অবরুদ্ধ রাখা অসম্ভব হয়ে উঠলো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনাতেই এবং তার কিছু পূর্বেও বেতার-বিজ্ঞানের কল্যাণে যে সব নতুন নতুন যন্ত্র ও কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত পাঠ্যক্রমে তাদের স্থান দেওয়া সম্ভব নয়—কিছুকাল যাবৎ এই সত্য আমরা সকলেই উপলব্ধি করছিলাম। যে পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে আমরা স্নাতকোত্তর ছাত্রদের শিক্ষা দিই, আধুনিকতম বেতার-গবেষণার পক্ষে তা নিতান্তই সামান্য। তাছাড়া চাকুরীর ক্ষেত্রেও এই সীমাবদ্ধ পাঠ্যক্রমে শিক্ষিত ছাত্রদের মূল্য ক্ষীয়মান। এই অপ্রীতিকর অবস্থার প্রতিকার করতে হলে বেতার-বিজ্ঞানকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়ে এর পাঠ্যক্রমের আমূল সংস্কার ছাড়া গত্যন্তর নেই—আমাদের এই ধারণা অধ্যাপক মিত্রের নিকট নিবেদন করলাম।

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত এক সায়েন্টিফিক মিশনের সদস্যরূপে তিনি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা পরিভ্রমণে গেলেন। সেখানে বেতার-বিজ্ঞান ও ইলেক্‌ট্রনিক্সের বিস্ময়কর অগ্রগতির চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে দেশে ফিরেই এই দুটি বিষয়ের জন্যে একটি স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রবর্তনের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করলেন। নানা কমিটি, সাব কমিটি ও বোর্ডের মধ্যে এই প্রস্তাব বহুদিন ধরে ঘোরাফেরা করলো, কিন্তু অর্থাভাবে এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত হলো না। ১৯৪৭ সালে 'অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন-এর একটি পরিদর্শক কমিটি প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে কি কি করা যায়—সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে এলেন। অধ্যাপক মিত্রের বেতার-বিজ্ঞান ও ইলেক্‌ট্রনিক্সের জন্যে স্বতন্ত্র স্নাতকোত্তর বিভাগ প্রবর্তনের প্রস্তাব তাঁরা অনুমোদন করলেন এবং এই উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যেরও সুপারিশ করলেন। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিজ্ঞান কলেজ প্রাঙ্গণে 'ইনিষ্টিটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যাণ্ড ইলেক্‌ট্রনিক্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। নবপ্রবর্তিত স্নাতকোত্তর বিভাগ এবং পূর্বতন বেতার গবেষণা-কেন্দ্র—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দুটি প্রতিষ্ঠান সন্নিবদ্ধ হলো এই ইনষ্টিটিউটে

(৭)

নবনির্মিত ইন্‌ষ্টিটিউট ভবনে স্নাতকোত্তর বিভাগের কাজ ও আনুসঙ্গিক গবেষণার কাজ সুরু হলো ১৯৫২ সালে। কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হরিণঘাটার 'ফীল্ড ষ্টেশন'-এ নিছক আয়নোস্ফিয়ার সংক্রান্ত গবেষণার সকল কাজ স্থানান্তরিত হলো ১৯৫৫ সালে। একদিকে রেডিও ফিজিক্স ও ইলেক্‌ট্রনিক্সের উচ্চতম শিক্ষার সুযোগ ও অন্যদিকে এই বিষয়ে আধুনিকতম গবেষণার সুবিধা—এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যাপক মিত্র যে প্রচেষ্টা সুরু করেছিলেন তার সার্থক পরিণতি ঘটলো।

এই বছরেই নভেম্বর মাসে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করতে হলো। এরই কিছুদিন আগে একদিন পূর্বাহ্ণে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন। এমন প্রতিদিনই ডাকেন, তবে দিনান্তে ইন্‌ষ্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যাবার কিছু আগে। সকালের দিকে

ডাক পড়ায় বোঝলাম বিশেষ কোনও প্রয়োজন হয়েছে। ঘরে ঢুকতেই একখানি বই এগিয়ে দিয়ে বললেন—এটা দেখো। নীল রঙের মলাট. মোটা বাঁধানো বই। রুশভাষায় লেখা বইয়ের নাম পড়তে পারলাম না। পাতা ওল্টাতেই নজরে পড়লো কয়েকখানি ছবি। এ তো আমাদের 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' বইয়ের ছবি! তখন তিনি ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দিয়ে বললেন—রাশিয়ানরা আমাদের 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার'-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেছে। প্রথিতযশা ভারতীয় আবহতত্ত্ববিদ ডাঃ কে. আর রমানাথন রাশিয়া গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে এই বইখানি ভারতীয়ের লেখা বইয়ের অনুবাদ বলে উপহার দিয়েছেন। ডাঃ রমানাথন সেখানি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন দেখবার জন্যে। দীর্ঘকাল অধ্যাপক মিত্রের সান্নিধ্যে থেকেছি, তাঁর মুখের ভাবে আনন্দ, বিষাদ, ক্রোধ প্রভৃতি মানবিক অনুভূতির সহজ প্রকাশ খুব কমই দেখেছি, কিন্তু সেদিন লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর মুখে আত্মগরিমার অপূর্ব অভিব্যক্তি।

১৯৫৬ সালের শেষের দিকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের 'বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন'-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পদে মনোনীত হলেন। কিন্তু নিয়মিতভাবে ইনষ্টিটিউটে আসবার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারলেন না। অ্যাডমিনিষ্ট্রেটরের কার্যভার গ্রহণের কিছুকাল পরে একদিন এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে খবর পেলেন যে, 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' গ্রন্থের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্যে দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হবার সম্ভাবনা দেখা যায়; অতএব এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। অধ্যাপক মিত্র বিচলিত হলেন। ইন্টারন্যাশন্যাল জিওফিজিক্যাল ইয়ারের (১৯৫৭-'৫৮) কার্যকাল শেষ হবার কিছু পরে একদিন তিনি এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্যে আবশ্যকীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে গুরুতর আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের পর সাত বছর অতিবাহিত হয়েছে। এরই মধ্যে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এবং পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণের ফলে উচ্চাকাশ সম্বন্ধে বিপুল তথ্যসম্ভার সংগৃহীত হয়েছে। গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের জন্যে এগুলির সঙ্কলন, অনুশীলন, সমন্বয় সাধন এবং যথাযোগ্য ক্রমানুসারে সন্নিবেশ প্রভৃতি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে চাই একান্ত অভিজ্ঞ কর্মীর সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রম। যে কয়জন সহকর্মী হাতের কাছে আছেন, তাঁরা সকলেই সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ও ক্রমবর্ধমান ইনষ্টিটিউটের শিক্ষণ, গবেষণা ও আনুসঙ্গিক নানাকাজে সারাদিন ব্যাপৃত থাকেন। সবচেয়ে বড় কথা, অধ্যাপকের নিজের একান্ত সময়াভাব এবং প্রতিকূল স্বাস্থ্য। এই সকল বিষয় বিবেচনা করে তৃতীয় সংস্করণ প্রণয়নের পরিকল্পনা তখনকার মত স্থগিত রাখাই স্থির হলো।

(৮)

এই আলোচনার কিছুকাল পরের কথা। ১৯৬১ সালের ১০ই জানুয়ারী। সকালে ইনষ্টিটিউটে প্রবেশ করে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছি, বারান্দায় কয়েকজন বেয়ারা ও অ্যাসিস্ট্যান্ট দাঁড়িয়ে। তাদের চাউনিতে যেন কিসের ইঙ্গিত! ঘরে ঢুকে বসতেই একজন সহকর্মী এসে বললেন, সার—খুব খারাপ খবর, প্রফেসার মিত্রের বড় ছেলে মারা গেছেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। কই, তাঁর কোনও অসুস্থতার খবর তো শুনি নি! সহকর্মী আরও বললেন—এডেন থেকে আজই সকালে কেব্‌লগ্রাম এসেছে, গত রাত্রে হঠাৎ হার্টফেল করেছেন। তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম বালীগঞ্জে অধ্যাপকের গৃহাভিমুখে। জনাকীর্ণ কক্ষ নিস্তব্ধ। দেয়াল-সংলগ্ন একটি আর্ম চেয়ারে তিনি বসে রয়েছেন, মর্মান্তিক বেদনায় মুখমণ্ডল মসীলিপ্ত। পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন—যতীন, অশোক মারা গেছে।

এই কয়টি শব্দ উচ্চারণ শেষ না হতেই তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এল—আর থাকতে পারলেন না, ফুক্‌রে কেঁদে ওঠলেন। প্রিয় পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুতে পিতৃহৃদয়ের পুঞ্জীভূত বেদনা সংযমের সকল বাঁধ চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নির্গত হলো অশ্রুধারায়। অধ্যাপক মিত্রের চোখে জল—এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য অসহনীয়। একটু প্রশমিত হবার পর সময়োচিত দু'একটি কথাবার্তা বলে বিদায় নিলাম। ফেরবার পথে একটি কথা বারবার মনে হচ্ছিল, অতুলনীয় আত্মসংযমে যার মজ্জাগত অধিকার, কি নিদারুণ মর্মবেদনায় সেই মানুষটির গণ্ড বেয়ে ঝরে পড়লো অশ্রুবিন্দু !

একে তো কিছুকাল যাবৎ হৃদ্‌রোগে ভুগছিলেন, তার উপর ঘটলো এই অভাবনীয় বিপর্যয়। আমরা সকলে আশঙ্কা করলাম, এই বুঝি তাঁর কর্মময় জীবনের অবসানের সূচনা কিন্তু যে বিধাতা পুত্রশোক দেন, তিনিই দেন বিস্মৃতি। ধীরে ধীরে আবার তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলেন, হৃদ্‌রোগের লক্ষণও অনেকটা প্রশমিত হলো।

১৯৬২ সালের ১৬ই মার্চ—সন্ধ্যা আসন্ন। সে দিন অধ্যাপক মিত্র ইনষ্টিটিউটে আসেন নি। আমি একা ঘরে বসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠলো—তিনি বাড়ী থেকে ফোন করছেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার ঘরে আর কেউ আছে? আমি "না" বলাতে তিনি বলতে লাগলেন—দেখ, তোমায় একটা সুখবর জানাচ্ছি, কথাটা এখন খুব গোপন রেখো। দিল্লী থেকে আজ হুমায়ুন কবীরের চিঠি পেয়েছি—প্রধান মন্ত্রী আমাকে ন্যাশন্যাল প্রোফেসরের পদে নিয়োগ করবার সুপারিশ করেছেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপারটা গোপনীয় রাখবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন তিনি। তাই অধ্যাপক আমাকে একাধিকবার সতর্ক করে দিলেন, কথাটা যেন আর কারও কাছে প্রকাশ না করি। কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো, দেড় বছর আগেকার পুত্র শোকাতুর পিতা বিজ্ঞান-সাধকের কর্মময় জীবন ফিরে পাওয়ার পূর্বাভাসে যেন আবার দৃপ্ত হয়ে উঠেছেন।

(৯)

১৯৬২ সালের ১০ই এপ্রিল ন্যাশন্যাল প্রোফেসরের পদে মনোনীত হবার চূড়ান্ত সংবাদ সরকারীভাবে প্রকাশিত হলো। বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি এই পদ গ্রহণ করলেন ১লা মে তারিখে। তাঁর গবেষণাকার্যে সাহায্য করবার জন্যে নিযুক্ত হলেন তিনজন সহকারী। 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ রচনার বিলীয়মান বাসনা আবার বলবৎ হতে লাগলো।

অধ্যাপক মিত্রের নানা গুণের মধ্যে এক মহৎ গুণ ছিল—তাঁর নিরপেক্ষ বিচারশক্তি। যে কোনও বিষয়ের মীমাংসা করতে হলে তিনি সকল দিক দিয়ে ব্যাপারটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বহুক্ষেত্রে তাঁর নিরপেক্ষ বিচার-শক্তি দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু পরিণত বয়সে 'আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ রচনার অদম্য আকাঙ্খা তাঁর বিচারবুদ্ধিকে খর্ব করে দিয়েছিল। ঈপ্সিত কার্যের গুরুত্ব, লোকাভাব, সময়াভাব, নিজের দ্রুত স্বাস্থ্যনাশ —বাস্তবের এই সব বাধা-বিঘ্ন তিনি যেন কিছুতেই স্বীকার করতে পারছিলেন না। কয়েক দিন একটু সুস্থ থাকলেই মনে করতেন, ওসব বাধা অতিক্রম করা অসম্ভব হবে না, আবার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়তেন।

মৃত্যুর মাস দুই পূর্বে তাঁর সঙ্গে এই সম্বন্ধে আমার শেষ আলোচনা হয়েছিল। সে দিন তাঁকে বলেছিলাম, কিছুদিন এই নতুন সংস্করণ রচনার কথা ভুলে থাকলে তাঁর মানসিক উদ্বেগ কমবে, স্বাস্থ্যেরও নিশ্চিত উন্নতি হবে। তারপর এক দিন

সকলে মিলে গ্রন্থের যে অংশ তাঁর সবচেয়ে প্রিয়, সেই আয়নোস্ফিয়ার সংক্রান্ত অংশটুকুর আবশ্যক মত পরিবর্ধন সাধন করবার পরিকল্পনা করা যাবে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে কয়েক দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতার বাইরে গেলাম। ফিরে এসে শোনলাম, তিন-চার দিন আগে হঠাৎ তাঁর খুব শ্বাসকষ্ট হয়েছিল, এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। ছুটির শেষে ইনষ্টিটিউটে এলাম ১৩ই অগাষ্ট তারিখে। ঘরে ঢুকেই তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন করলাম, তাঁর পুত্রবধূ খবর দিলেন—তিনি অনেক সুস্থ আছেন। সেদিন এম. টেক-এর 'ভাইভা-ভোসি' পরীক্ষা। স্থির করলাম পরীক্ষা শেষে বৈকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরবো। কিন্তু পরীক্ষার কাজ সে দিন আর করতে হলো না। টেলিফোন ছেড়ে ঘরে ঢুকে সহ-পরীক্ষকের সঙ্গে কিছুক্ষণ প্রারম্ভিক আলাপ করছি, এমন সময় বিজ্ঞান কলেজের সেক্রেটারী টেলিফোন করলেন প্রোফেসর মিত্র পরলোক গমন করেছেন, তখনও পনেরো মিনিট হয় নি, তাঁর বাড়ী থেকে খবর জেনেছি—তিনি অনেকটা সুস্থ আছেন। এইটুকু সময়ের মধ্যে এ কি আকস্মিক দুর্ঘটনা! পরীক্ষার কাজ সে দিনের মত বন্ধ করে দিয়ে সকলে মিলে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে বহুলোক সমবেত হয়েছেন। যে কক্ষে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, সেই কক্ষে ঢুকতেই চম্‌কে গেলাম। বত্রিশ বছর আগে দেখা সেই পরিপাটি মানুষটি, সেই প্রশস্ত ললাট, সুঠাম দেহ ও পরিচ্ছন্ন বেশ—আজ চির-নিদ্রায় নিদ্রিত। অতীতের কত স্মৃতি এক সঙ্গে বাঁধভাঙ্গা জলস্রোতের মত মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠলো। বহুদিনের সঞ্চিত শ্রদ্ধা এই মানুষটির চরণে উজাড় করে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের স্মৃতি-প্রসঙ্গে

দেবেন্দ্রমোহন বসু

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র সম্পর্কে আমার সবচেয়ে পুরাতন স্মৃতির কথা যখন মনে আনবার চেষ্টা করি, তখন তাঁর সঙ্গে দুটি সাক্ষাৎকারের কথা আমার মনে পড়ে। প্রথমটি ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক আগে এবং দ্বিতীয়টি যুদ্ধ পরিসমাপ্তির কিছুদিন পরে। আর এই দুটির বেলাতেই সময়টা ছিল এমন, যখন আমি দীর্ঘকাল ইউরোপে কাটিয়ে সবে দেশে ফিরেছি। ১৯১৩ সালের জানুয়ারী মাসে আমি প্রায় বছর পাঁচেক কেম্‌ব্রিজ এবং লণ্ডনে কাটাবার পর দেশে ফিরে আসি। আমার ফেরবার কয়েক মাস পরেই সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আমাকে বি এস-সি পরীক্ষায় স্কটিশ চার্চ কলেজ কেন্দ্রে পদার্থবিদ্যায় Practical এর পরীক্ষক নিয়োগ করেন। স্বর্গতঃ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর জায়গায় আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। ঐ সময় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অতিশয় প্রতিভাবান একদল ছাত্র ছিলেন—একথা বিভিন্ন উপলক্ষে আমি অন্যত্র দু-একবার উল্লেখ করেছি। নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন বিভাগে সার আশুতোষ পরে এঁদের অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র এই ছাত্রগোষ্ঠীর চেয়ে কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন—১৯১২ সালেই তিনি পদার্থবিদ্যায় এম এস-সি পাশ করে গেছেন। সেই সময় সম্ভবতঃ তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্রের

কাছে গবেষক ছাত্র হিসাবে কাজ করছিলেন। একদিন সকালে শিশিরকুমার আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন, একথা আমি বেশ স্মরণ করতে পারি। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর শরীর ছিল ক্ষীণকায়, পরিধানে ধুতি এবং মটকার চাদর। যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলাম, তাদের কোনও একটিতে পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করতে গেলে কি রকম খরচ পড়বে, সে সম্পর্কে ডাঃ মিত্র আমার কাছে কিছু খোঁজখবর জানতে চাইলেন। আমার মনে হয়, সাগরপারে গিয়ে উচ্চশিক্ষালাভ এবং গবেষণা করবার যে সযত্নলালিত অভিলাস্ তাঁর মনে ছিল, তা পূর্ণ করবার মত তাঁর আর্থিক সঙ্গতি সে সময়ে ছিল না। তবে পরবর্তী কালে রেডিও-সঙ্কেত প্রেরণ সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ গড়ে ওঠবার কথা যখন চিন্তা করি, তখন মনে হয় ভাগ্যের এই বিধান তাঁর অনুকূলেই গেছে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় ঘোস অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হয় এবং আমি এই পদে নিযুক্ত হই। আমি যাতে জার্মেনীতে গিয়ে সেখানের কোনও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করতে পারি তার জন্যে আমাকে দু-বছরের ছুটি মঞ্জুর করা হয়। তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার ডাঃ পি. ব্রুল আমাকে গোটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে বলেন। কিন্তু তাঁর উপদেশ অমান্য করে আমি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করায় তিনি বিশেষ প্রীত হলেন না। আমি ইতিমধ্যেই প্ল্যাঙ্ক, নার্নষ্ট এবং রুবেন্স্-এর খ্যাতির কথা শুনেছিলাম। ১৯১৪ সালের মে মাসে আমি বার্লিনে উপনীত হই। সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় আমার দেশে প্রত্যাবর্তন ১৯১৯ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত বিলম্বিত হলো। এই সময়ে সারা জার্মেনীতে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার যত দিক্‌পাল পণ্ডিত ছিলেন, সকলেই বার্লিনে সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন সুইজারল্যাণ্ড থেকে আগত আইনষ্টাইন এবং গটিংগেন থেকে ডিবাই এবং বার্ন্। এই দীর্ঘস্থায়ী বিদেশ-বাসের সময়ে আমি তত্ত্বীয় পদার্থবিদ্যার সকল শাখা সম্পর্কেই গভীরভাবে অনুশীলন করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অধ্যাপক প্ল্যাঙ্ক প্রদত্ত তিন বছরব্যাপী এক বক্তৃতামালা হলো এই শাস্ত্রচর্চার মুখবন্ধস্বরূপ। যুদ্ধ চলবার সময়ে ইলেক্‌ট্রনিক ভাল্‌ভ-এর প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল এবং তার ফলে বার্তা-বিনিময় ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধ যখন থেমে আসছে, তখন এই সব খবর আমাদের কানে এসে পৌছাতে লাগলো।

আমি যখন পদার্থবিদ্যা বিভাগে কাজে যোগ দেই, সেই সময় পদার্থবিদ্যা বিভাগের পালিত অধ্যাপক সি. ভি. রামন মহাশয়ের গবেষণাগারে ওখানের অনেক অধ্যাপক আলোকতত্ত্ব সম্পর্কিত নানা সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এঁদের মধ্যে এস কে. ব্যানার্জি, ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ, শিশির কুমার মিত্র, বি. বি রায় এবং ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। শিশিরকুমার মিত্র এবং বি. বি. রায়—এই দুজনের ডি. এস-সি থীসিসের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলাম। অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে তাঁর থীসিসের কতকগুলি দরকারী অংশ সম্পর্কে আমার যে আলোচনা হয়েছিল, সে কথা আমি বেশ স্মরণ করতে পারি।

ফরাসী দেশ থেকে ফিরে আসবার পর ডাঃ মিত্র পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপকের কার্যভার গ্রহণ করেন এবং Radio Propagation সংক্রান্ত গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতে বেতার বিষয়ক গবেষণার তিনিই হলেন পুরোধা। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশের বিভিন্ন জায়গায় বেতার এবং ব্রডকাষ্টিং সংক্রান্ত নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। চৌকোণা কাঠের ফ্রেমওয়ালা যে বেতার গ্রাহক-যন্ত্রটি নিয়ে

ডাঃ মিত্র Atmospherics সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান প্রথম আরম্ভ করেন, সেটির কথা আমার বেশ মনে আছে। বেতার-তরঙ্গ সম্পর্কে তিনি যে সব জনপ্রিয় বক্তৃতা দিতেন, তার অনেকগুলি আমার শোনবার সুযোগ হয়েছে এবং এর ফলে আমি বেশ উপকৃত হয়েছি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অধ্যাপক শিশির কুমারের বহুবিধ অবদানের কথা আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তিরা বলবেন। বিজ্ঞান কলেজের সেই গোড়ার দিনগুলি থেকে আরম্ভ করে নানা বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অব ইণ্ডিয়া, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালক সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাজে তাঁর সংস্পর্শে এসেছি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই আমরা তাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি।

একটি ব্যাপারে আমাদের অনেকের সঙ্গে ডাঃ মিত্রের প্রভেদ লক্ষ্য করেছি—তিনি কখনই অসংখ্য সংস্থার কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবার পক্ষপাতী ছিলেন না এবং যে কয়টি প্রতিষ্ঠানের কাজ তিনি হাতে নিয়েছিলেন, তার সবগুলিই তিনি যত্ন সহকারে নিখুঁতভাবে করতেন। বৃথা শক্তিক্ষয় না করে তাঁর কর্মোদ্যমকে তিনি শুধু সেই সব ক্ষেত্রেই নিয়োগ করতেন, যেখানে তিনি বুঝতেন যে, তা সত্যিকারের ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে।

শিশির-স্মরণে

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ

বিগত ১৩ই অগাষ্ট মধ্যাহ্নে শিশিরের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিলাম। প্রথমে মন মানতে চায় নি, কারণ তার কয়েক দিন আগেও খবর পেয়েছিলাম যে, সে শারীরিক সুস্থ আছে এবং যথারীতি বিজ্ঞান কলেজে যাতায়াত করছে। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার 'শিশির স্মৃতি সংখ্যা'য় স্মৃতি-কথা কিছু লিখে দিতে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়েছি। দেশের এই প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর আত্মার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিষদের সময়োপযোগী স্মৃতি-তর্পণের সঙ্কল্প প্রশংসনীয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা-জীবনে আমরা ছিলাম সমসাময়িক। শিশির পদার্থবিদ্যায় এম এস-সি এবং আমি গণিতশাস্ত্রে এম. এ একই বছরে এখান থেকে পাশ করি। সেটা ১৯১২ সালের কথা। কর্মজীবনেও আমরা উভয়েই সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন পদাধিকারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি। পিছনে ফেলে-আসা বহু বছরের অনেক কথা ও ঘটনাই আজ স্মৃতিপথে ভেসে উঠছে। কিন্তু সব কিছুকে সুসংবদ্ধ করে লিপিবদ্ধ করবার মত মানসিক সজীবতা বা শারীরিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছি; কাজেই বিজ্ঞান পরিষদের চাহিদা যথাযথভাবে মেটাতে পারবো না। অনুরোধও উপেক্ষা করতে পারি নি, তাই সামান্য দু'একটা কথা মাত্র বলবো।

অধ্যবসায় ও কর্তব্যনিষ্ঠা মানুষের জীবনে যে যশ ও সাফল্যের পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে, শিশিরের জীবনালেখ্য তার জলন্ত নিদর্শন। ছাত্রজীবনে তার মেধার পরিচয় প্রথম পাওয়া গিয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায়। কর্মজীবনে প্রবেশ করবার পর থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল সে বিজ্ঞানের শিক্ষা ও গবেষণার সাধনা করে গেছে। আজ তার বিশেষ পরিচয় —দেশের সেরা বিজ্ঞানী-

দের মধ্যে সে অন্যতম, ভারতবর্ষে বেতার-বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার সে-ই পথিকৃৎ। সুদীর্ঘ কাল বিজ্ঞানের সেবা করে দেশ-বিদেশের প্রায় সর্বপ্রকার সম্মানেই সে আজ অলঙ্কৃত। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তার নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়। সে ছিল স্বল্পভাষী। আপাত গম্ভীর প্রকৃতির হলেও বন্ধুমহলে আলাপ-আলোচনায় তার হাস্যরসিক সতেজ মজলিসী মনের পরিচয় আমরা সব সময়েই পেয়েছি।

তার আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, সেটা আমি তারই কথাতেই লিপিবদ্ধ করতে চাই। কয়েক বছর আগের ঘটনা—সকালবেলা সংবাদপত্রে খবর পেলাম, জাতীয় সরকার শিশিরকে পদ্মভূষণ উপাধি দানে অলঙ্কৃত করেছেন। অভিনন্দন জানাবার জন্যে টেলিফোন করি। বললাম—'কে, শিশির? তোমার দেখছি চতুর্দিকে জয়জয়কার, ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত রয়্যাল সোসাইটি সদস্য নির্বাচন করলো, জাতীয় সরকার আজ পদ্মভূষণে অলঙ্কৃত করলো—খুবই আনন্দ ও গৌরবের কথা। তোমাকে টেলিফোনের মাধ্যমেই তাই অভিনন্দন জানাবার বাসনা হলো। পরিষ্কার মনে পড়ে, বন্ধুবর অভিনন্দনের বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে যে কথাগুলি বলেছিল, তাতে তার অন্তরঙ্গতার পরিচয়ে যথার্থ খুশী হয়েছিলাম। সে বলেছিল—দেখ, সতীশ—যতই দিন যাচ্ছে আশে-পাশে পরিচিত বন্ধুবান্ধবের দল থেকে তুমি আমি বলবার মত লোকের সংখ্যা খুবই দ্রুত কমে যাচ্ছে। কাজেই আজ প্রভাতে বহু অভিনন্দনের ভিতরে তোমার স্বভাবসুলভ বাচনভঙ্গীতে বন্ধুত্বের অকৃত্রিম আন্তরিকতায় আমি বিশেষ আনন্দিত হলাম।

শিশির আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। জীবন-সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছি। শিশিরের বিয়োগে আজ আমিও বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারছি তার ওই কথাগুলি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ, কানে এখনও বাজছে। 'তুমি আমি'র বন্ধুত্বের তালিকা থেকে আর একজন বিদায় নিল। তার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি—আর প্রার্থনা করি, তারই আরব্ধ সব কাজ তার অগণিত কৃতী ছাত্রগোষ্ঠী যেন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন—বেতার-বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার মহান ঐতিহ্যকে যেন অম্লান রাখতে পারেন।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত

ভারতবর্ষে মুষ্টিমেয় যে সব বিজ্ঞানী সুদীর্ঘ কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন, গবেষণা-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছেন, মাতৃভূমিতে বিজ্ঞান-শিক্ষা ও গবেষণার প্রসারকল্পে বিভিন্ন সংস্থা স্থাপন করে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন এবং যাঁরা ভবিষ্যতের জন্যে বৈজ্ঞানিক-বংশধর রেখে গেছেন—অধ্যাপক মিত্র তাঁদের অন্যতম। বিগত ১৩ই অগাষ্ট ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।

১৮৯০ সালে ২৪শে অক্টোবর শিশিরকুমার কলকাতার মধ্যবিত্ত এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মিত্রের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার কোন্নগরে। মাতা শরৎকুমারী ছিলেন মেদিনীপুর নিবাসী স্বর্গীয় দুর্গানারায়ণ বসু মহাশয়ের কন্যা এবং প্রখ্যাত মনীষী স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী। কোন্নগরের মিত্র পরিবার ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বী। কিন্তু জয়কৃষ্ণ ছাত্রজীবনেই ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বভাবতঃই পরিবারের অশান্তির কারণ হয়ে ওঠেন। দৃঢ়চিত্ত জয়কৃষ্ণের মনোভাবের কিছুতেই পরিবর্তন হলো না, উপরন্তু সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মমতে বিয়ে করলেন। ফলে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটলো এবং তিনি মেদিনীপুরেই বসবাস করতে লাগলেন। ১৮৮৯ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। স্বামী, স্ত্রী, দুই পুত্র সতীশকুমার ও সন্তোষকুমার এবং শিশু কন্যা প্রতিভা—পাঁচজনের সংসার। শিক্ষকতা ও টিউশনীর স্বল্প আয়ে জয়কৃষ্ণ পরিবার প্রতিপালন করতে থাকেন। শরৎকুমারী দেবী দেখলেন যে, স্বামীর স্বল্প আয়ে সংসার চালনা করে সন্তানদের লেখাপড়ার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করা কষ্টসাধ্য—তাই তিনি সঙ্কল্প করলেন একটা কিছু শিখে উপার্জনক্ষম হবেন। তাঁর সেই বাসনা জয়কৃষ্ণ পুরণ করলেন। ডাক্তারী শিক্ষার জন্যে স্ত্রীকে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। তদানীন্তন সমাজে সাধারণ স্ত্রীশিক্ষারই বিশেষ প্রচলন ছিল না—সে ক্ষেত্রে ডাক্তারী শিক্ষার এই সিদ্ধান্তে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই যথেষ্ট সৎসাহস ও মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন, সন্দেহ নেই। জয়কৃষ্ণ ছিলেন উদার মতাবলম্বী এবং সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ মনীষিবৃন্দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং স্ত্রীর শিক্ষার ব্যাপারে তিনি তাঁদের পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিলেন। শিশিরকুমারের জন্ম হলো ১৮৯০ সালে এবং তার ঠিক দু'বছর বাদে শরৎকুমারী দেবী সসম্মানে পরীক্ষায় পাশ করলেন। শিশিরকুমারের জন্মকালটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জননীর বিশেষ ব্রত, সাধনা, মনোবল ও একাগ্রতার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে রইলো শিশিরকুমারের মধ্যে।

পত্নী ভাগলপুরের লেডী ডাফরিন হাসপাতালে কার্যভার গ্রহণ করলেন বলে জয়কৃষ্ণকে সপরিবারে ভাগলপুরে চলে যেতে হলো এবং তিনিও সেখানকার মিউনিসিপ্যাল অফিসে একটি চাকরী পেলেন। সেখানে তাঁদের কনিষ্ঠ পুত্র সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ভাগলপুরে স্থায়ীভাবেই বাস করতে হবে, তাই জয়কৃষ্ণ কয়েক বছরের মধ্যেই নিজস্ব বাড়ী নির্মাণ করলেন। শিশিরকুমার ও তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভ্রাতা ভাগলপুর জেলা স্কুলে লেখাপড়া করতে লাগলেন। আর্থিক অসচ্ছলতার তখন কিছুটা লাঘব হয়েছিল বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের প্রতি

ভাগ্যবিধাতা নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন ছিলেন না। পরিবারে ঘোর দুর্যোগ নেমে এলো। ১৮৯৮ সালে জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশকুমার এবং ঠিক পাঁচ বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় পুত্র সন্তোষকুমার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। শোকাহত জয়কৃষ্ণ সর্বপ্রকার সহ্যশক্তি হারিয়ে ফেললেন, তাঁর চরম মানসিক অবসাদ ঘটলো এবং অল্পদিনের মধ্যে পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হলেন। পরপর ভ্রাতৃবিয়োগজনিত দুঃখ, চোখের সামনে পঙ্গু, বাক্‌শক্তিহীন পিতৃদেবের অসহায় অবস্থা—এই দুর্যোগ ও বিষাদময় পরিস্থিতির মধ্যে শিশিরকুমারের এন্ট্রান্স পরীক্ষার দিন এগিয়ে এলো। ভরসা—ধৈর্যের প্রতিমূর্তি মাতৃদেবীর অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ। যথাসময়ে এন্ট্রান্স পাশ করে শিশিরকুমার ভাগলপুরেই টি এন জে কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হন। জয়কৃষ্ণের শারীরিক অবস্থার দিন দিন অবনতি ঘটতে লাগলো এবং পুত্রের এফ. এ. পরীক্ষার কিছুদিন পূর্বে তিনি পরলোক গমন করলেন। অসহায় পিতৃহীন সন্তানদের জননীই তখন সব পিতামাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য তখন একা তাঁরই। শোকাহত হয়েও শরৎকুমারী দেবী ভেঙ্গে পড়েন নি, সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিজের শোক, দুঃখ ভুলে গিয়ে তিনি কর্মক্ষেত্রে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা—ছেলেদের 'মানুষ' করা

বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবল অনুরাগ শিশিরকুমারের শৈশবেই মানসপটে অঙ্কিত হয়েছিল। কলকাতার ভাল কোন কলেজে বি. এস্‌-সি পড়বার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা তিনি জননীকে জানান। শরৎকুমারী দেবী এই ব্যাপারেও যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিলেন। আর্থিক অনটন বা পুত্রের সান্নিধ্য থেকে সাময়িক বঞ্চিত হবার অস্বস্তির কথা তাঁর মনে স্থান পেল না। তিনি পুত্রকে প্রেসিডেন্সী কলেজেই ভর্তি করিয়ে দিলেন এবং শিশিরকুমারের পিসেমশাই স্বর্গতঃ শ্যামাচরণ চন্দ মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন ছিলেন বিজ্ঞানের দুই দিক্‌পাল—আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। এই দুই বিজ্ঞানী শিশিরকুমারের মনকে অলক্ষ্যেই কিরূপ প্রভাবিত করেছিলেন, সে কথার উল্লেখ 'আমার বিজ্ঞান-চর্চা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি করেছেন। যে প্রতিভার অঙ্কুর শিশিরকুমারের মধ্যে সুপ্ত ছিল, তা প্রকাশিত হবার সুষ্ঠু পরিবেশ এতদিনে হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাতেই শিশিরকুমার তাঁর প্রতিভার প্রথম পরিচয় দিয়ে সকলকে বিস্মিত করলেন। সেটা ১৯১২ সালের কথা, তিনি পদার্থবিদ্যায় এম. এস্‌-সি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করলেন। শোকাতুরা জননীর অক্লান্ত পরিশ্রম সে দিন সত্যি সার্থক হলো—পুত্রেরও মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

পাশ করবার পর শিশিরকুমার কয়েক মাস আচার্য জগদীশচন্দ্রের কাছে গবেষক হিসেবে ছিলেন, কিন্তু পারিবারিক অসচ্ছলতার দরুণ তাঁর চাকরী করবার বিশেষ প্রয়োজন হলো। তিনি প্রথমে ভাগলপুর টি এন. জে কলেজে এবং পরে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করেন। ১৯১৪ সালে বরিশাল নিবাসী স্বর্গীয় (রায়বাহাদুর) হরকিশোর বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা সন্তান লীলাবতী দেবীর সঙ্গে শিশিরকুমার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। হরকিশোরের যখন পত্নী-বিয়োগ ঘটে, লীলাবতীর বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। বড় সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম, ভাই-বোনদের দেখাশুনা, এক কথায়—গৃহিণীপণার গুরুদায়িত্ব লীলাদেবীই বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে পালন করেন। এমনি গৃহকর্মনিপুণা পত্নীলাভে পারিবারিক জীবনের বহুবিধ কাজকর্মের ব্যাপারে শিশিরকুমার বিশেষভাবে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

শিশিরকুমারকে বেশী দিন মফস্বলে কাটাতে হলো না। ভবিষ্যৎ যাঁর বহু সম্ভাবনাপূর্ণ, ভাগ্যবিধাতা তাঁর প্রতি সুপ্রসন্ন এবং ঠিক সময়ে

ঠিক সুযোগটিও অপ্রত্যাশিতভাবেই তাঁর সামনে উপস্থিত হয়। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ডাক এলো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার স্নাতোকত্তর বিভাগ গঠনের কাজে দেশের কয়েকজন সেরা ছাত্রদের সঙ্গে শিশির-কুমারকেও তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯১৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কার্য-ভার গ্রহণ করলেন। গড়পারের এক ভাড়া বাড়ীতে সপরিবারে এসে উঠলেন। এখানেই তাঁর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অতি অল্প বয়সেই পুত্রটি মারা গেলেন। প্রায় দু'বছর বাদে এক বছরের ব্যবধানে পরপর জন্মগ্রহণ করলেন অশোককুমার ও কল্যাণকুমার।

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই শিশির-কুমার বিজ্ঞানের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। পদার্থবিদ্যার তদানীন্তন সার তারকনাথ পালিত অধ্যাপক সার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামনের অধীনে Interference and Diffraction of Light সম্বন্ধে গবেষণা করে ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি. ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর তিনি বিদেশে যান। প্যারীসে সোরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতিমান অধ্যাপক ফ্যাব্রির অধীনে আলোক-তরঙ্গ বিষয়ক গবেষণা করে তথাকার ডি. এস-সি হন। কয়েক মাস মাদাম কুরীর অধীনে কাজ করবার সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। ইলেক্‌ট্রন টিউব বা রেডিও ভাল্‌ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে তিনি ন্যান্সী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক গুতনের কাছেও কিছুদিন কাজ করেন এবং রেডিও বা বেতার-বিজ্ঞানের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা উপলব্ধি করতে পারেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে এই সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে সার আশুতোষের মতামত জানতে চেয়ে তিনি চিঠি লিখলেন। পূর্ণ সমর্থন ও অনুপ্রেরণার কথা জানিয়ে সার আশুতোষ লিখলেন—

Council of Post Graduate Teaching
Senate House,
Calcutta,
10-5-1923

My dear Dr. Sisir,

I am glad to receive your letter dated 18th April and to hear that you have been so successful in your work. I shall anxiously look forward to your thesis which I hope will come by the next mail. The course of investigation you suggest as to signals by wireless telegraphy is very attractive. Do please draw up a scheme and make it as inexpensive as possible. I shall see what we can do. But you may rest assured that there will be plenty of opposition. That need not frighten us; we shall have to fight our way through. I am looking forward to your return in November........................

yours affectionately
(Sd/-) Asutosh Mukherjee

১৯২৩ সালের শেষের দিকেই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং পদার্থবিদ্যার 'খয়রা অধ্যাপক' পদে অধিষ্ঠিত হন। সার আশুতোষের সমর্থনেই বেতার-বিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণায় প্রবৃত্ত হন। বাড়ীতে এবং কলেজে—দুদিকেই তিনি তখন গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত। কয়েক বছরের মধ্যে ৯নং হিন্দুস্থান রোডে নিজ বাড়ী নির্মাণের কাজ ও অপরদিকে পদার্থবিদ্যা বিভাগে বেতার-বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার উপযুক্ত পরীক্ষাগার গঠনের কাজ একই সঙ্গে এগিয়ে চললো। অবশ্য প্রথমটির অনেক দায়িত্বই তাঁর সুযোগ্যাপত্নী বহন করেছিলেন। ভারতবর্ষে সর্ব-

প্রথম এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই বেতার-বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার প্রথম প্রবর্তন হয়। অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক মিত্রের কর্মবহুল জীবনের বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা অন্যান্য প্রবন্ধে করা হয়েছে, তাই পুনরাবৃত্তি না করে তাঁর এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ধারাবাহিকভাবে শুধুমাত্র ঘটনাপঞ্জী পরিবেশন করা হবে। অধ্যাপক-জীবনের কয়েক বছরের মধ্যেই অধ্যাপক মিত্র পেলেন একদল কৃতী শিষ্য। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উচ্চাকাশের আবহমণ্ডল, বিশেষ করে আয়নমণ্ডল বিষয়ক গবেষণা প্রাচ্যদেশে সর্বপ্রথম কলকাতায়ই করা হলো। এঁরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করলেন। ১৯৩২-৩৩ সালে আয়োজিত Second International Polar Year-এ আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভারতবর্ষে একমাত্র এই গবেষণাগারই অংশগ্রহণ করেছিল।

১৯৩৫ সালের প্রথমদিকে তাঁর জননী ভাগলপুরে দেহত্যাগ করেন। অধ্যাপক মিত্র এতে পুনরায় নিদারুণ শোক পেলেন। বছরের শেষের দিকে তিনি দ্বিতীয়বার বিদেশে গেলেন। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পদার্থবিদ্যার স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। দুটি বিশেষ মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে তখন তিনি মনোনিবেশ করেন। প্রথমতঃ ইংল্যাণ্ডের রেডিও রিসার্চ বোর্ডের অনুরূপ ভারতবর্ষে একটি বোর্ড গঠন করা, দ্বিতীয়তঃ 'Upper Atmosphere' শীর্ষক বিভিন্ন তথ্যবহুল একখানা পুস্তক প্রণয়ন করা। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অনুপ্রেরণা ও সাহচর্যে কিভাবে বহু বাধা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ১৯৪২ সালে C. S. I. R-এর অধীনে Radio Research Board-এর সৃষ্টি হলো এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্যবর্গের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'Upper Atmosphere' ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হলো, সে সব কথা ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। Radio Research Board-এর প্রথম চেয়ারম্যান (১৯৪৩-'৪৮) তাঁকেই করা হয়েছিল।

১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান মিশনের অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি তৃতীয় বার বিদেশে যান। রেডিও-ইলেকট্রনিক্সের দ্রুত প্রসার বিশেষভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রেডিও ইলেক্ট্রনিক্সে পৃথকভাবে স্নাতকোত্তর শিক্ষার প্রবর্তনও ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়। ১৯৪৯ সালে গড়ে উঠলো তাঁর অক্ষয় কীর্তি Institute of Radio Physics & Electronics। আয়নমণ্ডল বিষয়ক গবেষণার প্রসারকল্পে ১৯৫৫ সালে C. S. I. R-এর অর্থ সাহায্যে গড়ে তোলেন হরিণঘাটায় Ionosphere Field Station। এই বছরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যভার থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনের বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক মিত্র বিভিন্ন সুযোগ্য শিষ্যবর্গের সহযোগিতায় Atmospherics, Discharge through Gases, Light of the Night Sky, Ionosphere, Active Nitrogen. প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে Emeritus Professor এবং C. S. I. R. কর্তৃপক্ষ Field Station-এর Investigator-in-charge পদে সমাসীন রেখে বিজ্ঞানীর যোগ্য সম্মান দেখিয়েছেন।

১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী স্বর্গতঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ অনুরোধে তিনি West Bengal Board of Secondary Education-এর Administrator-এর পদ গ্রহণ করেন। শুনেছিলাম একটা বিশেষ সর্তে তিনি রাজী হয়েছিলেন—সেটা হলো এই যে, অন্ততঃ সপ্তাহে দুদিন তিনি বিজ্ঞান কলেজে এসে

গবেষণার কাজ দেখাশুনা করতে পারবেন। প্রায় ছ'বছর তিনি Administrator পদে ছিলেন। শোনা যায় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ গ্রহণের জন্যেও তিনি ডাঃ রায় কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু বয়োঃবৃদ্ধিজনিত শারীরিক অবনতির অজুহাতে তিনি কখনই এই প্রস্তাবে সম্মত হন নি।

১৯৫৮ সালে ইংল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত রয়েল সোসাইটি অধ্যাপক মিত্রকে তাঁর বৈজ্ঞানিক জীবনের বিভিন্ন অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে সদস্য পদে নির্বাচন করেন। একই বছরে ঐ সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। মনে পড়ে—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আয়োজিত এই দুই খ্যাতিমান বিজ্ঞানীর সম্বর্ধনা সভায় অধ্যাপক মিত্র উদাত্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তাঁর ছাত্র ও সহকর্মীদের প্রতি, বিশেষভাবে নামোল্লেখ করেছিলেন ডাঃ ঋষিকেশ রক্ষিত ও ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়ের। এটা গর্বের বিষয় যে, বর্তমান ভারতবর্ষে রেডিও ইলেক্‌ট্রনিক্সের শিক্ষা ও গবেষণার যত সংস্থা গড়ে উঠেছে, তার অধিকাংশের পুরোভাগেই রয়েছেন অধ্যাপক মিত্রের প্রাক্তন ছাত্রেরা।

পারিবারিক জীবনেও তখন তিনি পরম সুখী। দুই পুত্র স্ব স্ব কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত; পুত্রবধূদ্বয় ও নাতি-নাতিনীদের সান্নিধ্যে তিনি পরিতৃপ্ত। অবসর বিনোদনের জন্যে রয়েছে দাবা খেলা, সান্ধ্য-ভ্রমণ ও চক্রবৈঠক ক্লাব। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস—বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এডেনে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ডাঃ অশোককুমার মিত্র অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জীবনসায়াহ্নে অভাবনীয় এই শোকাবেগ অসীম ধৈর্যের প্রতিমূর্তি শিশির কুমারের পক্ষেও সহ্য করা সম্ভব হলো না। তাঁর দেহ ও মনে দেখা দিল ভাঙ্গনের সূচনা।

১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ভারত সরকার শিশিরকুমারকে জাতীয় অধ্যাপক পদে বরণ করে সম্মানিত করেন। তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার সার্থক রূপায়ণ Institute of Radio Physics & Electronics-এ তিনি ফিরে এলেন। ভারত সরকারের University Grants Commission-এর প্রবর্তিত 'Centre for Advanced Studies Scheme-এর Expert Committee-র তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে Institute of Radio Physics & Electronics সম্প্রতি Radio Wave Propagation, Upper Atmosphere & Radio Astronomy-তে ভারতবর্ষে উচ্চতর গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত হয়েছে এবং এই Institute-এর বর্তমান প্রধান—অধ্যাপক মিত্রের সুযোগ্য শিষ্য ও কর্মজীবনের উত্তরাধিকারী ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড়ের নেতৃত্বে এই কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজকর্ম অনেকটা এগিয়ে এসেছে।

অধ্যাপক মিত্র তাঁর বহু ব্যস্ততার মধ্যেও আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন, যে কথা অনেকেই হয়তো জানেন না। Scientific American, Discovery, Endeavour প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে তাঁকে প্রায়ই আক্ষেপ করতে শুনেছি যে, বিদেশে বিশেষজ্ঞেরা 'Popularization of Science' সম্বন্ধে কত যত্নবান, কিন্তু আমাদের দেশে বড়ই অবহেলিত। তিনি নিজে এই কাজে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতেন, প্রবন্ধ লিখতেন, ছাত্রদের বক্তৃতা ও লেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাঁর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বেতার কথিকায় অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গেছে। বক্তৃতা ও লেখার ব্যাপারে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বাংলায় কি ইংরেজীতে বক্তৃতা ও লেখার তার বিশেষ ভঙ্গীমা বা Style অনেকের কাছেই সুবিদিত। জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রবর্তিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আদর্শে তিনি

বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন ও 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার পরম শুভানুধ্যায়ী ছিলেন।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি যে সব গুরুত্ব-পূর্ণ পদাধিকারে সম্মানিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেযোগ্য—Chairman, Radio Reseach Board (1943-48); President, Asiatic Society (1251-52); General President, Indian Science Congress (1955); President, National Institute of Sciences (1959-60); President, Indian Science News Association (1956-58); President, Rotary Club, Calcutta ইত্যাদি। তিনি Indian National Committee for I. G. Y.-র সদস্য ছিলেন, দেশের ও বিদেশের অনেক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য-ভুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য Journal of Atmospheric & Terrestrial Physics এবং Planetary & Space Science। তাঁর খ্যাতির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নানাবিধ স্বর্ণপদকের দ্বারা পুরস্কৃত হয়েছিলেন—King George V Silver Jubilee Medal (1935); Joy Kissen Mukherjee Medal of the Indian Association for the Cultivation of Science (1943); Science Congress Medal of Asiatic Society (1956) এবং Sir Debaprasad Sarbadhikary Gold Medal of Calcutta University (1961)। ১৯৬২ সালের জাতীয় সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণে' অলঙ্কৃত করেছেন। গত বছর জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে তিনি স্বেচ্ছায় এবং অকুণ্ঠ-চিত্তে তার সম্মানসূচক সবগুলি স্বর্ণপদকই দান করে গেছেন।

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাঁর দূরদৃষ্টি, কর্তব্য-নিষ্ঠা, সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও নিয়মানুবর্তিতা। চলাফেরা, কথাবার্তা, বেশভূষা ও আচার-ব্যবহার সব কিছুর মধ্যেই তাঁর স্বকীয় বিশেষ একটা আভিজাত্য ছিল। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন প্রভূত যশ, খ্যাতি ও সাফল্যের অধিকারী। অপর পক্ষে পারিবারিক জীবনে তিনি একটানা সুখভোগের অধিকারী বেশী দিন হতে পারেন নি। জীবনের বিভিন্ন সময়ের প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় তিনি হয়েছেন অবসন্ন। জননীর চারিত্রিক গুণাবলীর উত্তরাধিকারী শিশিরকুমার সব বাধা, সব শোকই সহ্য করে-ছিলেন, জীবনসায়াহ্নে শুধু পারেন নি পুত্রশোক ভুলতে। জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়ে তিনি অনেকের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। কৈশোরে জননীর প্রভাব, কর্মজীবনে আচার্য জগদীশচন্দ্র, সার আশুতোষ, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অনুপ্রেরণা এবং সর্বোপরি তাঁর প্রিয় শিষ্যবর্গের অকুণ্ঠ সহ-যোগিতার বিষয় তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে উল্লেখ করে গেছেন।

বিগত ১৩ই অগাষ্ট মধ্যাহ্নে ৭৩ বছর বয়সে এই সার্থক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটলো। Coronary Asthma রোগে মাত্র তিন দিন ভুগে তিনি সজ্ঞানে পরলোক গমন করলেন। অগণিত ছাত্র, বন্ধু ও বিভিন্ন সংস্থার শ্রদ্ধার স্মারক শ্বেত পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত তাঁর নশ্বরদেহ কেওড়াতলা মহাশ্মশানে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই ভস্মীভূত করা হলো। বাংলা, তথা ভারতের আর একটি সুসন্তানের হলো জীবনাবসান। কিন্তু তাঁর আত্মা অমর হয়ে রইলো তাঁরই সৃষ্ট বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে—রেখে গেলেন একটা মহান ঐতিহ্য!

সঙ্কলন

[পুরাতন পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত অধ্যাপক মিত্রের 'আমার বিজ্ঞান-চর্চা' শীর্ষক কথিকাটি উদ্ধৃত করা হলো। নিজের লেখা থেকেই তাঁর জীবনের মূল সূত্রটি সুস্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হবে। স]

আমার বিজ্ঞান-চর্চা

বিজ্ঞান-চর্চায় কেন যে আত্মনিয়োগ করলাম, সে কথা ভাবতে গেলে অতীতে ছেলেবেলাকার অনেক কথাই মনে এসে পড়ে। ছেলেবেলায় এমন সব ছোট ছোট ঘটনা ঘটে, যা চিরদিনের জন্য মনের উপরে রেখাপাত করে দেয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমার সর্বপ্রথম আগ্রহ বোধ হয় এইরূপ একটা ঘটনা থেকেই হয়েছিল। যখন আমার বয়স ৭।৮ বছর সে সময়ে কলকাতায় রামচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি বেলুনে উঠেছিলেন। বেলুন গড়ের মাঠে উঠে বসিরহাটে গিয়ে নেমেছিল। এই ব্যাপারে একটা ছড়া সে সময়ে প্রচলিত হয়েছিল। ছড়াটি এইরূপ—

উঠল বেলুন গড়ের মাঠে,
নামল গিয়ে বসির হাটে॥

বেলুন কিরূপে আকাশে উঠে একথা আমার স্বর্গগত বড়দাদাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বেলুন ওড়ার প্রক্রিয়া মোটামুটি বুঝিয়ে দেন, আর বেলুনের আবিষ্কার যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের প্রয়োগে হয়েছে, তাও বলে দেন। যতদূর স্মরণ করতে পারি তাতে মনে হয় যে, সেই সময়ে সর্বপ্রথম আমার মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগে। আমাদের ছেলেবেলায় যে সব মাসিক পত্রিকা বের হতো সেগুলিও আমার বিজ্ঞান শিক্ষা ও আলোচনার দিকে ঝোঁক বাড়াবার জন্যে কতক পরিমাণে দায়ী। পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ থাকত। আমি এগুলি দেখতে পেলেই পড়ে ফেলতাম। কোনটা বুঝতাম, কোনটা বুঝতাম না—কোনটা হয়তো আংশিকভাবে বোধগম্য হতো। কয়েকটা প্রবন্ধের কথা এখনও মনে পড়ে। এখনও পেলে সে প্রবন্ধগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিই। আর এখনও মনে হয়, এমন লেখা আজকাল বুঝি আর বের হয় না। 'মুকুলে' জগদীশচন্দ্রের 'গাছের কথা', আর ৺উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সেকালের কথা', এই দুটির প্রত্যেক খুঁটিনাটি, প্রত্যেকটি ছবি এখনও মনে আছে। একবার 'প্রবাসীতে' ৺উপেন্দ্র রায়চৌধুরী আর যোগেশচন্দ্র রায়ের মধ্যে "উদয়াস্তের সময় চন্দ্র, সূর্য বড় দেখায় কেন?"—এই নিয়ে বাদানুবাদ চলেছিল। আর একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'প্রদীপ' পত্রিকায় বেতার-বার্তা সম্বন্ধে। মার্কনি তখন সবেমাত্র বেতার প্রচলন করেছেন. আর তাই নিয়ে সাময়িক পত্রিকাতে লেখালেখি চলছে। প্রবন্ধটি তখন মোটেই বুঝতে পারি নি, তবে তার দুটা একটা কথা এখনও মনে আছে। প্রেরক আর গ্রাহক যন্ত্রের

নক্সা দেওয়া হয়েছিল আর তাতে যন্ত্রের একটা অংশের নাম Coherer ছিল। Coherer কি—অনেক দিন পরে বুঝতে পারি। আমরা যখন স্কুলে পড়ি, তখন জগদীশচন্দ্রের সজীব ও নির্জীব পদার্থের সাড়া সম্বন্ধে গবেষণা চলছে ও প্রবাসীতে এই বিষয়ে জগদানন্দ রায়ের লেখা প্রায়ই বের হচ্ছে। প্রবন্ধগুলি ভাল বুঝতে পারতাম না, তবুও উল্টে-পাল্টে দেখতাম। শুধু একটা সংবাদে মনের মধ্যে খুব কৌতূহল হয়েছিল। কাগজে পড়লাম জগদীশ-চন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে, গাছেরও প্রাণ আছে। কথাটার অর্থ বেশীর ভাগ লোকেই সে সময়ে ধরতে পারেন নি। আজও হয়তো অনেকে পারেন না।

আমাদের পাঠ্যাবস্থায় জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র—এই দুই মনীষীর কথা অহরহ শুনতাম। আর এরাই তখন আমাদের কাছে আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সে জন্যে যখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার জন্যে এলাম, তখন এঁদের কাছে এসে মনে হতো যেন দুই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছি। এঁরা কি নিয়ে গবেষণা করছেন, কি তথ্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছেন—এসব জানবার জন্যে খুবই কৌতূহল হতো। কোন সুযোগ পেলে জগদীশচন্দ্রের গাছের সাড়া লিপিবদ্ধ করবার যন্ত্র অথবা তাঁর বেতার-তরঙ্গ উৎপাদন করবার যন্ত্র উঁকি মেরে দেখতাম! তখনও ছাত্রের পড়া পড়ছি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ কিছুই জানি না, সে জন্যে শুধু দূর থেকে যন্ত্রগুলি দেখতাম, আর মনে শ্রদ্ধা-নিসৃত বিস্ময়ের উদ্রেক হতো। খুব ছেলে বয়সে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে মনের মধ্যে যে অঙ্কুরোদগম হয়েছিল, কলেজে ছাত্রজীবনে ঐ সব পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে ইচ্ছা ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শে পরিণত হয়েছিল। সে সময়ে মনে হতো, কোন রকমে যদি গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করতে পারি, তাহলে সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাটিয়ে দেব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করবার পর ৩।৪ বছর কলকাতার বাইরে মফস্বলের কলেজে কাটাতে হয়। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে কিছু করতে পারি নি। তবে বৈজ্ঞানিক তথ্য সকলকে জানাবার জন্যে মনের মধ্যে খুব আগ্রহ হতো। সে জন্যে যেখানে কাজ করতাম, সেখানে কলেজের পরীক্ষাগারে বৈজ্ঞানিক তথ্য বোঝাবার জন্যে সহজবোধ্য Demonstration experiment খাড়া করতাম ও তা দেখিয়ে বক্তৃতা দিতাম। বাংলায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও মাঝে মাঝে লিখে মাসিক পত্রিকাতে পাঠাতাম। কিন্তু অপরিচিত লেখক ও কাঁচা হাতের লেখা বলে বেশীর ভাগ লেখাই ফিরে আসত। আর কোনটা যদিও বা বের হতো, তা বহু বিলম্বে। অনেক দিন আগেকার একটা বক্তৃতার কথা এখনও মনে পড়ে। একটা মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯১৪ সালে প্রায় আট মাস ভাগলপুরে ছিলেন। তখনও তিনি দেশনায়ক হন নি, কিন্তু ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তখন তাঁর প্রচুর খ্যাতি হয়েছে। ভাগলপুরের 'সঙ্গীত সমাজে' চিত্তরঞ্জনকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে একটা সভা হয় ও আমি সেই সভায় নানারূপ পরীক্ষা দেখিয়ে 'সঙ্গীত বিজ্ঞান' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিই। সরল ভাষায় বক্তৃতা দিবার জন্যে চিত্তরঞ্জন আমাকে প্রশংসা করেন ও আমার বক্তৃতাটি প্রবন্ধরূপে লিখে তাঁর মাসিক পত্রিকা 'নারায়ণে' ছাপান। চিত্তরঞ্জনের প্রশংসার জন্যে সে সময়ে মনে খুব গর্ব অনুভব করেছিলাম এবং বক্তৃতা দেওয়া ও বাংলা লেখা দুইয়েতেই আমার উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছিল।

মফস্বলে ৩।৪ বৎসর ঘোরবার পর কলকাতায় আসা ও গবেষণা-কার্যে আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ হয়। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলকাতায় ১৯১৬ সালে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপিত হয় ও আমি এখানে এসে যোগ-

দান করি। সে সময়ে বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে আমার সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক সি. ভি. রামন, মেঘনাদ সাহা, ঢাকার সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি। অধ্যাপক রামন আমাদের চাইতে বয়সে বড় ও সেই সময়েই বৈজ্ঞানিক গবেষকরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আমি আমার প্রথম গবেষণা করি অধ্যাপক রামনের সাহচর্যে। গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল আলোকের বিকিরণ। যখন প্রথম গবেষণা-প্রবন্ধ বিলাতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশিত হলো, তখন মনে কিরূপ আত্মপ্রসাদ লাভ করে-ছিলাম, তা এখনও মনে পড়ে। সেই সময় অর্থাৎ ২০।২২ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষকের সংখ্যা খুব অল্প ছিল। গবেষণার প্রতিষ্ঠানও বেশী ছিল না। কলকাতার বিজ্ঞান কলেজ সে সময়ে উচ্চ শ্রেণীর গবেষণার জন্যে ভারতবর্ষে একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। ভারবর্ষে এখন অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, অনেক গবেষণাগার হয়েছে, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ এখনও যে শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির মধ্যে অন্যতম, সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

বিজ্ঞান কলেজে ৪।৫ বছর কাজ করবার পর বিদেশে গিয়ে নতুন শিক্ষালাভ করবার সুযোগ উপস্থিত হয় ও ১৯২০ সালে ফ্রান্সে যাই। তখন গত মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে ও সেই সঙ্গে রেডিও টেলিফোনির আবিষ্কার হয়েছে। রেডিও টেলিফোনির আবিষ্কারের মূলে ছিল Valve, যা আপনারা আজকাল রেডিও সেটে অহরহ দেখে থাকেন। যুদ্ধের সময় Valve সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হয়েছিল। কিন্তু বিবদমান জাতিরা গবেষণার ফল সাধারণের কাছে প্রকাশ করে নি। যুদ্ধ অবসান হবার সঙ্গে সঙ্গেই Valve সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সাধারণের কাছে প্রকাশিত হলো ও Valve-এর অদ্ভুত গুণ পদার্থ-বিজ্ঞানের অনেক জটিল পরীক্ষণের কার্যে লাগাবার উপায় বের হতে লাগলো। আমি যখন ফ্রান্সে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, তখন Valve নিয়ে সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানেই নানারূপ কাজ চলছে। এমন কি, সাধারণ লোক, যাদের বিজ্ঞানের দিকে সামান্য একটু ঝোঁক আছে, তারাও Valve নিয়ে নিজেদের বাড়ীতে নানারূপ পরীক্ষা সুরু করেছে। এই সব দেখে আমি স্থির করলাম যে, Valve নিয়ে কিছু গবেষণা করবো। সে সময়ে ফ্রান্সে Nancy বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Gutton, Valve সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে ৬।৭ মাস Valve নিয়ে কাজ করি। বেতার সম্বন্ধে গবেষণা করবার প্রথম হাতেখড়ি আমার এখানেই হয়।

১৯২৪ সালে বিদেশ থেকে ফিরে দেখলাম যে, আমাদের দেশে বেতার সম্বন্ধে লোকের সবেমাত্র একটু কৌতূহলের উদ্রেক হতে সুরু করেছে। Indian States and Eastern Agency নামে একটি কোম্পানী হাইকোর্টের কাছে একটি প্রেরক যন্ত্র স্থাপন করে সাধারণের কাছে বেতার ব্রড-কাষ্টিং-এর বিষয় বিজ্ঞাপিত করছেন। সেই সঙ্গে বেতারের বিষয় আলোচনার জন্যে Radio Club of Bengal নামে একটি প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হয়েছে। এই Radio Club-এর প্রথম সভাপতি ছিলেন কলকাতা Station-এর অধুনা ডিরেক্টর মিঃ ষ্টেপ্‌লটন। আমি খুব উৎসাহের সঙ্গে এই ক্লাবে যোগ দিয়েছিলাম। তখন ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী স্থাপিত হয় নি বলে নিয়মিতরূপে কোন রকম বেতার প্রোগ্রামও ছিল না। রেডিও ক্লাবে ও বিজ্ঞান কলেজে আমরা সে জন্যে দুটি বেতার যন্ত্র স্থাপন করি ও তাথেকে কয়েক বছর নিয়মিত-ভাবে বেতার প্রোগ্রাম পাঠানো হয়। ১৯২৬ সালে ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী স্থাপিত হয়। তখন আমাদের এই প্রেরক যন্ত্রের কাজ বন্ধ করে দিতে হয়।

বিজ্ঞান কলেজেই সে সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে

একমাত্র বেতার গবেষণার প্রতিষ্ঠান ছিল। পৃথিবীর বৃত্তপৃষ্ঠ অনুসরণ করে বেতার-তরঙ্গ এক দেশ থেকে আর এক দেশে কিরূপে যায়, সে সম্বন্ধে আমরা বিজ্ঞান কলেজে গবেষণা সুরু করি। পৃথিবীর পৃষ্ঠের ৬০।৭০ মাইল উপরে পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে একটি বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলক স্তর আছে। বেতার-তরঙ্গ সে জন্যে পৃথিবীপৃষ্ঠ ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে না—কিছু দূর উপরে উঠে এই প্রতিফলক স্তরে ধাক্কা খেয়ে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। এই প্রতিফলক স্তর আছে বলেই আমরা দূরদেশ, যেমন—ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা থেকে প্রেরিত বেতার-বার্তা ধরতে পারি। আমাদের দেশে এই প্রতিফলক স্তর ঠিক কতটা উচ্চে, ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর উচ্চতার কি রকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, স্তরের উৎপত্তির কারণ কি—ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। এই গবেষণায় আমার সহ-কারী ডাঃ হৃষীকেশ রক্ষিত আমাকে প্রভূত সাহায্য করেন। স্তর সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কয়েক বছর আগে আমার গবেষণার সহকারী ডাঃ যতীন্দ্রনাথ ভড় ২৫ মাইল উর্ধ্বে নতুন একটি বিদ্যুৎ-প্রতিফলক স্তর আবিষ্কার করেন। ৩ বছর পূর্বে আমি যখন একবার ইংল্যাণ্ডে যাই, তখন এই আবিষ্কারের কথা সেখানকার গবেষকমণ্ডলীর কাছে বললে তাঁরা অনেকেই এই স্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করতে রাজী হন নি। কিন্তু আমি বিলাতে থাকা-কালেই আমেরিকার West Virginia বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অধ্যাপক Colwell এইরূপ স্তরের সন্ধান পেয়েছেন বলে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা "Nature"-এ একটি বিবরণী দেন। আমরা যে এর আগেই এই স্তর আবিষ্কার করেছি, তা তিনি জানতেন না। Nature-এ আমি এই সম্বন্ধে চিঠি লিখলে পরে তিনি আমাদের আবিষ্কার স্বীকার করেন ও বিলাতের অন্যান্য গবেষকেরাও আমাদের আবিষ্কৃত স্তর যে বাস্তবিকই আছে, তাও মেনে নেন।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে আমার বক্তব্য আজ শেষ করবো। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক, লেখক বা চিত্রশিল্পী কেউ ইচ্ছা বা চেষ্টা করে হতে পারে না। এঁদের অসাধারণ প্রতিভা এঁরা জন্মের সঙ্গেই লাভ করেন। সেই কারণে মনে হতে পারে যে, উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, উচ্চশ্রেণীর লেখা বা প্রথম শ্রেণীর চিত্র শুধু এইরূপ প্রতিভাসম্পন্ন লোকের দ্বারা হওয়াই সম্ভব। এ-কথা মোটামুটি ভাবে লেখক বা চিত্রশিল্পী সম্বন্ধে খাটে। পাঁচজন সাধারণ চিত্রশিল্পী একজোটে কাজ করে প্রথম শ্রেণীর চিত্র আঁকতে পারবেন না। পাঁচজন সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন কবিও একসঙ্গে চেষ্টা করে একটা প্রথম শ্রেণীর কবিতা রচনা করতে পারবেন না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রকৃতি কিন্তু একটু অন্য রকমের। উচ্চাঙ্গের আবিষ্কার যে শুধু প্রথম শ্রেণীর অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকই করতে পারেন, তা নয়। পাঁচজন সাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক যদি একযোগে কাজ করেন, তাহলে তাঁরাও উচ্চাঙ্গের গবেষণা বা আবিষ্কার করতে পারেন। এই কারণে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সহ-যোগিতার দাম খুব বেশী। আমার গবেষণা কার্যে যদি কিছু সাফল্য হয়ে থাকে, তার জন্যে আমি আমার সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে বহু পরিমাণে ঋণী। এই সুযোগে আমি তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শিশিরকুমার মিত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কর্তৃক ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড হইতে প্রকাশিত এবং গুপ্তপ্রেশ
৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ষোড়শ বর্ষ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ দ্বাদশ সংখ্যা

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

পরিণত বয়স হলেও অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের মৃত্যুকে বলতে হবে আকস্মিক। তাঁর আত্মীয়স্বজন ও নিকট বন্ধুবান্ধব কেউ এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না বা প্রস্তুত হবার অবকাশও পান নি। যে সোমবার দ্বিপ্রহরে তাঁর মৃত্যু হয়, তার আগের বুধবার সন্ধ্যাকালেও রাত্রি ৯টা অবধি বর্তমান লেখকের সঙ্গে তাঁর নানা কথাবার্তা হয়, রবীন্দ্র সরোবরের মুক্তাকাশের তলে প্রাত্যহিক নিয়ম মতে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময়েও তিনি রবীন্দ্র সরোবরে বায়ুসেবনে এসেছিলেন, কিন্তু অসুস্থবোধ করে সহসা ফিরে যান। এমন কি, মৃত্যুদিবসের সকালবেলায়ও খবর পাওয়া যায়—তিনি অপেক্ষাকৃত ভালই আছেন। তাঁর অসুখ যে গুরুতর হয়েছিল বা গুরুতর হবার কোন সম্ভাবনা ছিল, এরূপ আশঙ্কা তাঁর চিকিৎসকও করেন নি। তাই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদে প্রিয়পরিজন ও অনুরক্ত বন্ধুজন সবাই মর্মান্তিক আঘাত পান। লেখক তাঁদের মধ্যে একজন।

ভারতের যে অল্প কয়েকজন বিজ্ঞানী তাঁদের গবেষণার উৎকর্ষের ফলে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী-মহলে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, অধ্যাপক মিত্র ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমাদের দেশে বেতার ও রেডিও-বিজ্ঞানের তিনি ছিলেন পথিকৃৎ এবং তাঁরই পরিচালনায় গড়ে উঠেছে ভারতীয় রেডিও-বিজ্ঞানী সম্প্রদায়। বিজ্ঞানের এই বিশিষ্ট শাখার শিক্ষা, গবেষণা বা সংগঠনে ভারতবর্ষে আজ যাঁরা অগ্রণী তাঁদের অনেকেই হচ্ছেন অধ্যাপক মিত্রের কৃতী শিষ্য কিম্বা প্রশিষ্য। তাঁর মৃত্যু ভারতীয় বিজ্ঞানের একটি অপূরণীয় ক্ষতি। বাংলা দেশের পক্ষে এটা একটা বড় রকমের দুর্ভাগ্য। বাংলার বড়ই দুর্দিন চলেছে গত ৭।৮ বছরব্যাপী। বঙ্গজননীর বহু কৃতী-

বিজ্ঞানী সন্তান এই কয় বছরের মধ্যে পর পর পরলোকে প্রয়াণ করেছেন বাংলাকে নিঃস্ব এবং নিঃসহায় করে। এঁদের মধ্যে বিশেষ করে নাম করা যায়—ডাক্তার মেঘনাদ সাহা, ডাক্তার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাক্তার বীরেশচন্দ্র গুহ, ডাক্তার নিখিল-রঞ্জন সেন এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্রের। এঁরা সবাই বিজ্ঞানের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ছিলেন এক একজন দিকপাল। ডাক্তার সাহা এবং অধ্যাপক মিত্র ছিলেন আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী-মহলে সুপরিচিত ও শ্রদ্ধার পাত্র। আজ বাংলার তরুণ বিজ্ঞানকর্মীদের কেউ যে তাঁদের অভাব পূরণ বা স্থান অধিকার করতে পারবেন, এরূপ সম্ভাবনা দেখি না। বছর বছর বিজ্ঞানকর্মীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেড়ে চলেছে ; তা সত্ত্বেও এ-কথা বললে হয়তো অসঙ্গত হবে না যে, বাংলার এক গৌরবোজ্জল বিজ্ঞানের যুগের অবসানের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ, আমাদের দেশে যাঁরা অধ্যাপক মিত্রের মত বিজ্ঞানের যুগপ্রবর্তক এবং বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যাঁরা তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠা থেকে বিচলিত হন নি, অর্থ ও যশোলিপ্সা যাঁদের লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি, বিজ্ঞান-সাধনায় তাঁদের সেই নিষ্ঠা এবং একাগ্রতার দৃষ্টান্ত আধুনিক বিজ্ঞানকর্মীদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। অথচ স্বাধীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার যে বহু অনুকূল অবস্থা ও পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, ভারত ও প্রাদেশিক সরকার যে এই উদ্দেশ্যে অর্থব্যয়ে অকৃপণ—একথা অস্বীকার করা যায় না।

অধ্যাপক মিত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল্যায়ন করা আমার কাজ নয়। রেডিও ও বেতার-বিজ্ঞানের যাঁরা বিশেষজ্ঞ অথবা তাঁর কৃতী শিষ্য, তাঁরাই এ-সম্বন্ধে আলোচনা করবার একমাত্র অধিকারী। তবে আমরা সবাই জানি যে, তাঁর লেখা "উর্ধ্বাকাশের আবহমণ্ডল" (Upper Atmosphere) শীর্ষক বইখানি বৈজ্ঞানিক জগতে একটি বিশেষ মূল্যবান প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে সমাদৃত হয়েছে। বইখানির দুটি সংস্করণই অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ তিনি তার তৃতীয় সংস্করণ করে যেতে পারেন নি। কিছুকাল আগে বইখানি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আপন চেষ্টা, সাধনা ও উচ্চাঙ্গের গবেষণায় অধ্যাপক মিত্র বিশ্ববিজ্ঞান সমাজে খ্যাতিলাভ করে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। এই কারণে তিনি আমাদের বরেণ্য। কিন্তু তাঁকে আমরা আরো বিশেষ করে শ্রদ্ধা করি যেহেতু তিনি শুধু নিজে বড় হন নি, নিজে শুধু জ্ঞানী ও গুণী হন নি, পরন্তু যারা তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর কাছে বিজ্ঞানের শিক্ষালাভ করেছে, তাদের অনেককেই তিনি বড় করে, জ্ঞানী করে ও গুণবান করে গেছেন। সোনা সকলের কাছেই মূল্যবান, কিন্তু যে জিনিষ অন্য কিছুকে সোনায় পরিণত করে তার মূল্য আরো বেশী ; অধ্যাপক মিত্রের বেলায় একথা বলা চলে।

অধ্যাপক মিত্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯১৯-'২০ সালে, আমি যখন বিজ্ঞান কলেজের চাকরীতে যোগদান করি। কিন্তু তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ ঘটে তখন, যখন আমি বালিগঞ্জে বাসা করি ১৯৩০ সালে তাঁর বাড়ীর খুবই সন্নিকটে। বালিগঞ্জে তখন বিরল বসতি। হিন্দুস্থান রোডের আশেপাশে আমরা কয়েকজন শিক্ষক, অফিসার, উকীল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী বন্ধুর মধ্যে সকাল-বিকাল দেখাশুনা হতো। পাড়ার মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের শারীর-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ীতে আমাদের মেলামেশার আস্তানা ছিল। তাঁর বাড়ীর বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে উদ্যানের একপাশে একটি চালাঘরে আমরা সমবেত হতাম প্রতিরাতে ৯টায় আহারের পর। রাত ১০টা-১০½টা অবধি আমাদের আলোচনা চলতো নানা বিষয়ে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন,

ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, সমর-নীতি ইত্যাদি এমন কোন বিষয় ছিল না, যা ঐ আলোচনা থেকে বাদ পড়তো—এমন কি; ব্যক্তি-বিশেষের সমালোচনা বা চরিত্র-বিশ্লেষণও নয়। এছাড়া প্রতি রবিবার ও ছুটির দিন সকালে ১০টায় ঐ চালাঘরে বসতো দাবাখেলার আড্ডা। অধ্যাপক মিত্র এর কোনটাতেই কামাই করতেন না। তিনি ছিলেন খুব নিয়মিত সদস্য। বছর-খানেক কি তারও কিছুদিন পরে রাতের বৈঠকটি যায় একপ্রকার ভেঙ্গে। কিন্তু রবিবার ও ছুটির দিনে দাবার প্রতিযোগিতা চলে রীতিমত সকল বাধাবিঘ্ন এড়িয়ে। অধ্যাপক মিত্রই এই বৈঠকটি চালু রেখেছিলেন তাঁর মৃত্যুর আগের সপ্তাহ অবধি। অবশ্য বৈঠকটি অধ্যাপক ভট্টাচার্যের মৃত্যুর কিছুকাল পরে অধ্যাপক মিত্রের নিজবাটীতে স্থানান্তরিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কলিকাতার রাস্তাঘাটের আলোক নিয়ন্ত্রণের ফলে অন্ধকারে চলাফেরা কঠিন ছিল, তখন অধ্যাপক মিত্র ও আমরা কয়েক বন্ধু মিলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় রাসবিহারী এভিনিউর দেশপ্রিয় পার্কে বসে গল্প-গুজব করতাম। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমাদের এই সান্ধ্যমিলন স্থানান্তরিত হয় লেকে, বর্তমান রবীন্দ্র সরোবরে। এখানে অধ্যাপক মিত্র উপস্থিত থাকতেন সপ্তাহে ৫ দিন করে। বাকী দু'দিন তিনি যোগ দিতেন লেকের চক্রবৈঠক ক্লাবে। ঐ ক্লাবের তিনি ছিলেন সদস্য এবং এক সময়ে সভাপতি। বন্ধুবিয়োগের ফলে ও অন্যবিধ কারণে লেকে আমাদের সান্ধ্যবৈঠকের সদস্যের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে দু'জনে ঠেকেছিল—আমাতে আর অধ্যাপক মিত্রে। এতেনে তাঁর বড় ছেলের মৃত্যুর পর তিনি চক্রবৈঠকে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছিলেন। লেকেও মাসাবধি বায়ুসেবনে আসতেন না। কিন্তু পরে নিয়মিতভাবে প্রতিসন্ধ্যায় এসে রাত প্রায় ৯টা অবধি থাকতেন। তখন তিনি আর আমি—আমরা দু'জন বসে নানা আলোচনা ও পরস্পর ভাববিনিময়ে সময় কাটাতাম। পারতপক্ষে আমরা লেকে আসতে কখনো কামাই করতাম না—কি দুর্দিন, কি ঝড়বৃষ্টির দুর্যোগের মধ্যেও। তিনি গাড়ী করে এসে অল্প পায়চারী করে একটি বেঞ্চে বসে থাকতেন, আমি খানিকক্ষণ ঘুরে বা পাকচক্কর দিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে জুটতাম। বহু বছর তাঁর সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার ফলে আমাদের মধ্যে বিশেষ অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং মানুষ হিসাবে তাঁকে জানবার আমার সুযোগ ঘটেছিল অসাধারণ। কারণ, তাঁর কর্মজীবনের সকল বিষয়েই তিনি আমার সঙ্গে খোলাখুলি-ভাবে আলোচনা করতেন—এমন কি, নিজের আয়ব্যয়, ঘরকন্নার বিষয়েও। এছাড়া কয়েকটি জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানেও তাঁর সঙ্গে কাজ করবার আমার সুযোগ ছিল; যেমন—ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদে (Indian Association for the Cultivation of Science), বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (Science and Culture) শীর্ষক পত্রিকা পরিচালনায় এবং ভারতীয় বিজ্ঞান সভার (Science Congress) কাজে। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তিনি বহু বছর যাবৎ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গোড়ায় সম্পাদক হিসাবে, পরে তার কাউন্সিলের সদস্য, ট্রাষ্টি এবং কিছুকালের জন্যে অধিসভাপতি (Vice-President) হিসাবে। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি (Science and Culture) নামক পত্রিকার পরি-চালক সমিতির তিনি ছিলেন কিছুকালের জন্যে সভাপতি (President) এবং অনেক বছর ব্যাপী কর্মসচিব (Secretary), সম্পাদক (Editor) এবং অধিসভাপতি। ভারতীয় বিজ্ঞান সভার তিনি এক সময়ে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং বহু বছরব্যাপী কর্মসচিব

হিসাবে এবং কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হিসাবে তিনি তার সেবা করে গেছেন। অনেক জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ও বৈজ্ঞানিক সংগঠনের সঙ্গে অধ্যাপক মিত্রের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, রোটারি ক্লাব, হিন্দুস্থান ইনসিউরেন্স, বাথগেট কোম্পানী, ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী ইত্যাদি। ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন কয়েক বছর আগে। অনেক বছর যাবৎ তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের (Secondary Education Board) ছিলেন পরিচালক (Administrator)। সকল ক্ষেত্রেই রেখে গেছেন তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ।

দীর্ঘকালব্যাপী সাহচর্যে অধ্যাপক মিত্রের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হয়েছে এবং মানুষ হিসাবে তাঁকে যেরূপ জানতে পেরেছি, তা এক কথায় প্রকাশ করতে হলে বলা যায়—তিনি ছিলেন মনেপ্রাণে একজন নিষ্ঠাবান কর্মী। শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠা ছিল তাঁর সকল কর্মের নিয়ামক। প্রথম জীবনে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল বলেই হয়তো তিনি মানুষের জীবনে শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার মূল্য নিরূপণে সক্ষম হয়েছিলেন। গীতাকার এই সত্যই ঘোষণা করে গেছেন—"শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম"। জীবনের ছোট-বড় সকল কাজেই এই সত্যের অনুসরণই ছিল তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াস। তাই মানুষ হিসাবে অধ্যাপক মিত্রের জীবনের মূল্যায়ন করতে হলে বলতে হয়—তাঁর জীবন ছিল কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা, নিয়মনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যনিষ্ঠার প্রতীক।

ছোট-বড় সকল প্রকার কাজ যথাসম্ভব দোষ-ত্রুটি পরিহারপূর্বক সুচারুরূপে সম্পাদনের প্রয়াসে ছিল অধ্যাপক মিত্রের অকৃত্রিম অনুরাগ এবং ঐকান্তিক শ্রদ্ধা—সে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জটিল সমস্যা সমাধানই হোক, বৈজ্ঞানিক বা সাংস্কৃতিক প্রবন্ধ রচনাই হোক, এমন কি—কোন পত্রের উত্তর দেওয়াই হোক, অথবা ঘরকন্নার দৈনন্দিন কাজকর্মের বিধিব্যবস্থা করাই হোক। কোথায় কমা, সেমিকোলন বাদ পড়েছে, কোথায় শব্দ প্রয়োগে ঐক্যের অভাব ঘটেছে—যেমন, এক জায়গায় Professor এবং অন্যত্র লেখা হয়েছে Prof., আবার কোথায় ইটালিক্সের বদলে রোমান টাইপ বসেছে—এসব খুঁটিনাটি তাঁর সতর্ক নজর কখনো এড়িয়ে যেতে পারতো না। কোন রচনা তিনি দু-তিনবার সংশোধনে মার্জিত না করে ছাপাতে দিতেন না। এই ছিল তাঁর বাঁধা নিয়ম। তিনি যা লিখতেন তাতে ভাষার ঐশ্বর্য বা আড়ম্বর থাকতো না বটে—কিন্তু সৌষ্ঠব, সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার শ্রী ফুটে উঠতো। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের এটিই হচ্ছে স্বভাবসুলভ। উচ্ছ্বাসের হাওয়া বা অনাবশ্যক ও অতিরঞ্জিত বাক্যের কুয়াসায় বক্তব্য বিষয়কে জটিল বা দুর্গম করে তোলা ছিল তাঁর কাছে অসহনীয়—রচনার অসারতার পরিচায়ক বলেই তাকে তিনি গণ্য করতেন।

শাসন এবং সংগঠনের ক্ষেত্রেও অধ্যাপক মিত্রের কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিয়মনিষ্ঠার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের ছোট-খাটো কাজে এর অনেক দৃষ্টান্ত মেলে। এই অবস্থায় সাধারণতঃ মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে সভ্যতা-ভব্যতার পোষাকে সাজাবার বিশেষ অবকাশ পায় না। এসব অসতর্ক মুহূর্তের ব্যবহার ও কার্যকলাপে মানুষের প্রকৃত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে।

বিজ্ঞান কলেজে রেডিও রিসার্চ বিভাগে তিনি যখন পরিচালক ছিলেন, সে সময় বিজ্ঞান কলেজ থেকে হরিণঘাটার গবেষণাস্থলে যাবার জন্যে একটি জিপ গাড়ী কেনা হয়। গবেষণা সংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্যে তিনি সেটা

কাকেও ব্যবহার করতে অনুমতি দিতেন না—নিজে তো করতেনই না। নেহাৎ কারো কলেজ সংক্রান্ত কোন কাজে ব্যবহার করতে হলে তাকে মাইল পিছু নির্দিষ্ট হারে ভাড়া দিতে হতো। এই প্রসঙ্গে তাঁর সৌন্দর্যনিষ্ঠার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বহু বছর যাবৎ কলেজের ঘরবাড়ী ও তার বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বড়ই অযত্নে রক্ষিত ও অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন থাকতো। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে ছিল গোয়ালাদের খাটাল। বাগান করবার ও তার রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে মালী নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও বাগানের কোন লক্ষণ ছিল না। এই সময়ে অধ্যাপক মিত্রেরই বিশেষ চেষ্টায় প্রথম গৃহরক্ষণ কমিটি (House Committee) গঠিত হয় এবং তিনিই তাঁর সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর ফলে বিজ্ঞান কলেজের চেহারা অনেকটা বদ্‌লে যায়। প্রাঙ্গণ থেকে গোয়ালা এবং গরুর দল চলে যায়, মালীরা চারধারে ফুলের বাগান গড়ে তোলে এবং ঘরদোর, স্নানাগা ও শৌচাগারগুলি সকাল-বিকাল ধোয়া-পোছার ব্যবস্থায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের পরিচালক থাকাকালীন ঐ পরিষদের বহু কল্যাণকর সংস্কার তিনি করে গেছেন। অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে যে জড়তা, অসর্তকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে দায়িত্ববোধের অভাব ছিল, যা দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে সকল অফিসেই অল্পবিস্তর দেখা যায়, তা দূরীকরণে তাঁর ছিল বিশেষ মনোযোগ। এ-প্রসঙ্গে তাঁর কাছে বহু ঘটনার কথা শুনেছি। তারই একটির কথা এখানে উল্লেখ করবো। কোন বালিকা স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী তাঁর স্কুলের কোন বিশেষ কাজের জন্যে অধ্যাপক মিত্রের নামে কি একটা আবেদন পত্র রেজিষ্ট্রি ডাকে পাঠান। দশ-বারো দিন পরেও কোন প্রাপ্তি-সংবাদ না পেয়ে ভদ্রমহিলা অধ্যাপক মিত্রের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন। অফিস সংক্রান্ত কোন বিষয়ে কারো সঙ্গে বাড়ীতে দেখা করা তিনি পছন্দ করতেন না। এ-ক্ষেত্রেও তিনি শিক্ষয়িত্রী মহোদয়াকে সে কথা জানান। ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন, অফিসের ঠিকানায় তাঁকে রেজিষ্ট্রী ডাকে চিঠি দিয়েও জবাব না পাওয়ায় বাড়ীতে এসেছেন। ডাঃ মিত্র ভদ্রমহিলাকে তাঁর অফিসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি প্রথমে শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন নি—কেন না, ১০।১২ দিনেও রেজিষ্ট্রী করা চিঠি না পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। তথাপি তিনি সেদিন অফিসে গিয়ে প্রথমেই খোঁজ করেন, কোন রেজিষ্ট্রী চিঠি তাঁর নামে কিছুদিন আগে এসেছে কি না। অনেক অনুসন্ধানের পর সে রেজিষ্ট্রী চিঠি বেরুলো। নয় দিন আগে ঐ চিঠি গ্রহণ করেছেন এক কর্মচারী। তিনি সে চিঠি পাঠিয়ে দেন যিনি বন্টন করেন তাঁর অফিসে, দিন দুই পরে। বন্টনকারী কর্মচারী আবার দু'দিন পরে পাঠালেন পরিচালকের খাস অফিসে। খাস অফিস থেকে পরিচালক অধ্যাপক মিত্র পেলেন তাঁর অনুসন্ধানের ফলে প্রায় ৮।৯ দিন পরে। অথচ যে কর্মচারী চিঠি প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কাজ করেন এক তলায় এবং পরিচালক বসেন দোতলায়, অর্থাৎ চিঠিখানির একতলা থেকে দোতলায় উঠতে লাগলো ৮।৯ দিন। অধ্যাপক মিত্র এর জন্যে কৈফিয়ৎ চাওয়ায় জবাব পেলেন—মাঝে ছুটি ছিল এবং একদিন পিওন ছিল না বলে গ্রহণকারী চিঠিখানি বন্টনকারীর নিকট পাঠাতে পারেন নি। অথচ বন্টনকারী কাজ করেন গ্রহণকারীর দু'খানি ঘরের পরে। অফিসের কর্মচারীদের এ-রকমের গাফিলতি ও দায়িত্ববোধের অভাবের অনেক গল্প তাঁর কাছে শুনেছি। এই প্রকারের লেপাফাদুরস্তি বা অফিসের বাহ্যিক বিধি-বিধানের নির্মম অত্যাচারের ফলে যে সাধারণের কি অসুবিধা ও অনেক সময়ে নিদারুণ ক্ষতি হয়, সে বিষয়ে তিনি বিশেষ

সতর্ক ছিলেন। এসব অর্থহীন অথচ সাধারণের অসুবিধা ও ক্ষতিজনক ব্যবস্থার বহুল সংস্কার করেছিলেন তিনি তাঁর কার্য্যকালে, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের অফিসে।

ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের সভাপতি থাকাকালীন অধ্যাপক মিত্র এক সময় আমাকে বলেন—দেখুন, ইনষ্টিটিউটের ফেলো নির্বাচনে বহু গলদ আছে; এর কিছু বিহিত করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে এর জন্যে বড় ধরাধরি করেন, যা বিধিনিষিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, নির্বাচক সমিতির সদস্যেরাও অনেক স্থলে নিরপেক্ষভাবে মতামত দেন না। পক্ষ সমর্থন ও আশ্রিতবাৎসল্যের (প্রচ্ছন্নভাবে) দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ফলে সকল সময়ে যোগ্যতমের নির্বাচন হয় না। এর প্রতিবিধানের জন্যে তিনি তাঁর কার্যকালে একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, কাউন্সিলের অনুমোদন নিয়ে। নির্বাচক সমিতির রিপোর্টগুলি তিনি কাউন্সিলে দেবার আগে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার রিপোর্ট যাবতীয় কাগজ-পত্র সহ ঐ শাখাতে কোন প্রবীণ ও বিচক্ষণ সদস্যের নিকট মতামতের জন্যে পাঠাতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যায়—জীববিদ্যার অধ্যাপক হলডেনকে, ভূবিদ্যায় অধ্যাপক ওয়াডিয়াকে, সংখ্যা-বিজ্ঞানে অধ্যাপক মহলানবীশকে—ইত্যাদি। পরে নির্বাচক সমিতির রিপোর্টের সঙ্গে এসব বিশেষজ্ঞদের মতামতও কাউন্সিলে পেশ করতেন। যোগ্যতমের যাতে নির্বাচন হয় এবং কোন প্রকার অন্যায়-অবিচার না হয়, সে বিষয়ে তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। অবশ্য এসব কাজ তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে বিশ্রব্ধভাবে সম্পাদন করতেন। জানি না, এই ব্যবস্থা এখন কতটা পালন করা হয়!

এই সময়কার আর একটি ঘটনার কথা বলবো এখানে। দিল্লীতে ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউটের বার্ষিক অধিবেশন হবে। সভাপতি হিসাবে অধ্যাপক মিত্রের উপস্থিত থাকবার কথা। কিন্তু তাঁর শরীর তখন অসুস্থ। তথাপি দিল্লী যাবার জন্যে প্লেনের টিকিট কাটলেন তিনি। যাবার দিন দেখা দিল ভীষণ দুর্যোগ। সকাল থেকে চললো দারুণ ঝড়বৃষ্টি। কলিকাতার রাস্তাঘাট গেল জলে ডুবে। অধ্যাপক মিত্র তাঁর নিজের গাড়ী করে চললেন দমদম এরোড্রোমের পথে। নানা ঘুরপাক করে দমদমে পৌঁছলেন। প্লেন ছাড়বার কথা রাত প্রায় ১০টা কি ১১টায়। শোনলেন প্লেন তখন ছাড়বে না। ঝড়বৃষ্টি যদি কমে তবে রাত ১টা কি ২টায় ছাড়তে পারে। বসে রইলেন সেখানে অপেক্ষা করে। ২টার সময় জানানো হলো প্লেন আর সে রাত্রিতে ছাড়বে না। অগত্যা তাঁকে ফিরে আসতে হলো বাড়ীতে বাধ্য হয়ে। অসুস্থ শরীরে সারারাত অনিদ্রায় কাটিয়ে ভোরবেলায় বাড়ী এসে পৌঁছলেন। এই ব্যাপার জানতে পেরে তাঁকে যখন বললাম যে, এরূপ হঠকারিতায় বিপদ ঘটতে পারে, তিনি তখন উত্তর দিলেন—একটা দায়িত্ব আছে তো! নিজেকে বিপন্ন করে দায়িত্ব পালনের প্রয়াস কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচায়ক সন্দেহ নেই—বিশেষতঃ দায়িত্বটা যখন এক্ষেত্রে এমন কিছু গুরুতর ছিল না।

অধ্যাপক মিত্রের নীতি, নিয়মনিষ্ঠা এবং স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করবো এখন। ১৯৫৫ সালে বরোদায় ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। আমাদের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুকে সায়েন্স কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করবার জন্যে আহ্বান করবার রীতি প্রচলিত হয়েছে। বৃটিশ আমলে এই কাজের জন্যে বড়লাটকে আমন্ত্রণ করা হতো। মঞ্চের উপর প্রথম চারটি আসন সংরক্ষিত করা হয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু, কংগ্রেসের সভাপতি, প্রদেশপতি এবং কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির জন্যে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী

কংগ্রেসের সভাপতির আসন হওয়া উচিত মধ্যস্থলে, তার দক্ষিণে প্রধান অতিথি উদ্বোধকের এবং বামে রাজ্যপাল ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির। কংগ্রেসের সভাপতিরই সভার কার্য নির্বাহ করবার কথা। কিন্তু কি কারণে বলা যায় না, ১৯৫৪ সাল অবধি প্রধানমন্ত্রীরই বসবার ব্যবস্থা ছিল মধ্যস্থলে এবং সভার কার্য পরিচালিত হতো তাঁরই নির্দেশমতে। অধ্যাপক মিত্র এরূপ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক মনে করে বরোদায় তার সংস্কার বিধান করেন ও কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে সভার কার্য পরিচালনা করেন। তিনিই প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করে প্রধান অতিথি হিসাবে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন উদ্বোধন করবার জন্যে আহ্বান করেন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন, বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা রোটারি ক্লাব ইত্যাদি আরো অনেক বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অধ্যাপক মিত্রের বিশেষ যোগাযোগ ছিল, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রেও তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা ও ন্যায়নিষ্ঠার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। তার বিবরণ দিয়ে ও দৃষ্টান্তের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না।

শুধু কাজকর্ম ও গবেষণায় নয়, অধ্যাপক মিত্র ছিলেন মনেপ্রাণে বিজ্ঞানী। যুক্তিবাদ হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই যুক্তিবাদই ছিল তাঁর সকল প্রকার চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির প্রধান অবলম্বন। বুদ্ধিবিচার ও যুক্তি দিয়ে যা সমর্থন করা যায় না, এরূপ কোন বিশ্বাসে তাঁর আস্থা ছিল না সে ধর্মসংক্রান্তই হোক কিংবা সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান বা সংস্কার সম্পর্কিতই হোক। মানবাত্মা ও চেতনার স্বরূপ এবং জন্মান্তরবাদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার বহু আলাপ-আলোচনা হয়েছে, বিশেষতঃ তাঁর বড় ছেলের মৃত্যুর পর। এসব বিষয়ে আমাদের মধ্যে মতের মিল হতো না অনেক সময়। জন্মান্তরবাদে তাঁর বিশ্বাস ছিল না কিংবা বিশ্বাস করতে তিনি দ্বিধাবোধ করতেন, কেন না, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে তার প্রমাণ মিলে না। তিনি বলতেন—একটা অনাদি, অনন্ত চেতন্ সত্তা রয়েছে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে; ব্যক্তিগত মানবচেতনা তারই কণিকাবিশেষ—অনুকূল অবস্থায় জড়দেহ আশ্রয় করে হয় তার অভিব্যক্তি। মৃত্যুর পর সে চেতন কণিকা যায় অনন্ত চেতন সত্তার মধ্যে বিলোপ হয়ে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে এটিই সরল ব্যাখ্যা বলে তিনি মনে করতেন, জন্মান্তর মানতে গেলে বিষয়টি জটিল হয়ে ওঠে এবং এমন সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, যার সমাধান মিলতে পারে না কোন প্রমাণ বা যুক্তিবিচারে—এটাই ছিল তাঁর সিদ্ধান্ত। জন্মান্তর ও কর্মবাদের সমর্থন করতাম বলে তিনি আমার প্রতি কটাক্ষ করে বলতেন—আপনি বিজ্ঞানী হয়ে অবিজ্ঞানীর মত তর্ক করছেন। কিন্তু লেখকের ধারণা—বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর তাঁর গভীর শ্রদ্ধা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কার থেকে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে পারেন নি। কেন না, এক সময়ে তর্কচ্ছলে তিনি আমাকে বলেছিলেন—মৃত্যুর পরও যদি মানবাত্মার কোন অস্তিত্ব থাকে, তবে আমি আমার বড় ছেলের আত্মার কোন সন্ধান পাচ্ছি না কেন? বোঝা যায় যে, তিনি সত্যই ব্যাকুল ছিলেন জন্মান্তর বিশ্বাসের জন্যে—কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ ছিল তার প্রধান অন্তরায়।

প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, বহুযুগের পরাধীনতার ফলে আমরা আমাদের কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা ও সত্যাবিষ্কারের শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। এর প্রধান কারণ, কর্মে নেই আমাদের নিষ্ঠা এবং সত্যে নেই শ্রদ্ধা। অধ্যাপক মিত্রের জীবনী হচ্ছে কর্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সত্যের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত যদি আজ বাংলার ছাত্রছাত্রীদের মনে কর্মপ্রীতি ও সত্যানুরাগ জাগিয়ে তুলতে পারে, তবেই তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রয়াস সার্থক হবে।

বিজ্ঞানী হিসাবে অধ্যাপক মিত্র দেশে-বিদেশে বহু খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভারত সরকার তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন জাতীয় অধ্যাপক নিয়োজিত করে। কিন্তু বিজ্ঞানী হয়ে তিনি শুধু সত্যের পূজারীই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সুন্দরেরও উপাসক। তাঁর গোছালো স্বভাব, নিপুণ ও সুচারুভাবে সকল কর্ম সম্পাদনের প্রয়াস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি, ঘরে-বাইরে শোভানুরাগ এবং নিয়মনিষ্ঠাই তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়তার অভ্রান্ত পরিচায়ক। সত্য এবং সুন্দরের অনুসরণই ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। শিব বা কল্যাণের দর্শনলাভে হয় এই সাধনার সিদ্ধি। আজ আমরা তাঁর পরলোকগত আত্মার কল্যাণ কামনা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

নিষিদ্ধ খাদ্য

শ্রীঅলোকা রায়

যে খাদ্যে আমরা অভ্যস্ত তার প্রতি আমাদের যেমন দুর্বলতা আছে, তেমনি অভ্যস্ত নই এমন খাদ্যের উপর রয়েছে বিরূপতা। মিঠা জলের মাছের অর্ধেক দরে সমুদ্রের মাছ পাওয়া গেলেও তাদের দিকে সহজে মুখ ফিরাই না। এই বিরূপতা শুধু বাঙালীদের একচেটিয়া নয়, এটা সকল দেশের সকল মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। ভারত-ভ্রমণে এসে ভ্রমণবিলাসী মার্কিনী মুসাফিরকে যদি ডাল, ভাত, চাপাটি, সম্বরম, প্যাড়া ও লাড্ডুর উপর নির্ভর করতে হয়, তাহলে তাঁর তাজমহল বা মহাবলীপুরম দেখা ঘুচে যাবে—ফিরতি প্লেনেই তিনি নিউইয়র্কে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। অপরিচিত খাদ্যের উপর মানুষের বিরূপতা কত তীব্র হতে পারে, তার একটা উদাহরণ ইতিহাসের পাতা থেকে দিচ্ছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের কথা। শ্বেত ঔপনিবেশিকেরা ক্ষেতখামারে শ্রমিকের কাজ করবার জন্যে বহু ক্রীতদাস নিয়ে যায় ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে। দাসগুলিকে পেটভরে খাওয়ানোটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ওদের পেট ভরে খেতে দিলে লাভের অঙ্কটা মনোমত হয় না। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজে ফসল বেশী হতো না, ভাল জমিতে চাষ করা হতো শুধু আখ। তাই বিদেশ থেকে শস্য আনতে হতো। এর জন্যে বেশ খরচা পড়তো। শ্বেত মালিকেরা দাসগুলির পেটভরা নিয়ে মাথা ঘামাতো না, যদি তার সঙ্গে কাজ আদায় করবার সম্পর্কটি না থাকতো। গরুকে পেট ভরে ঘাস-বিচুলী না দিলে গরুও যে জোয়াল টানতে পারে না! সমস্যা হলো অল্প খরচে কি করে দাসগুলির পেট ভরানো যায়।

জাহাজের এক বিখ্যাত ক্যাপ্টেন ব্লাই মুস্কিলের সম্ভাব্য আসানের পরামর্শ দিলেন। সাউথ সী দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের এক প্রধান খাদ্য ব্রেডফ্রুট। পেট ভরাবার মত বেশ বড় বড় ফল, ফলেও সেখানে প্রচুর। ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের পতিত জমিতে এই ফলের চাষ করতে পারলে দাসগুলিকে খাওয়াবার সমস্যা মিটে যায়। মালিকদের মনে

কথাটা লাগলো। সাউথ সী দ্বীপপুঞ্জ থেকে বীজ এনে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজে ব্রেডফ্রুটের চাষ সুরু করা হলো। অপর্যাপ্ত ফসল ফললো। কিন্তু মুস্কিলের আসান হলো না। কারণ গোড়াতেই ছিল গলদ। নিগ্রো ক্রীতদাসেরা পেটভরে ব্রেডফ্রুট খাবে কিনা, সে কথা মালিকেরা চিন্তা করে নি। যাদের কোন রকম স্বাধীন চিন্তা করবার অধিকার নেই, তাদের যে খাদ্যের ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা থাকতে পারে, একথা মালিকদের মনেই হয় নি। দাসেরা কিন্তু নতুন খাদ্যের প্রতি কোন রকম উৎসাহই দেখালো না। আধপেটা খেয়ে রইলো, পিঠ পেতে হাজার চাবুক নিল তবুও ব্রেডফ্রুট খেলো না কেউ। শেষে মালিকেরা হতাশ হয়ে ঘোড়া-গরুকে ব্রেডফ্রুট খেতে দিল। ব্রেডফ্রুট কিন্তু অখাদ্য-কুখাদ্য কিছু নয়, বরং সুখাদ্যই বলা যায়।

অপরিচিত খাদ্যবস্তুর প্রতি মানুষের বিরূপতা থাকলেও দেখা যায়, এক কালের সম্পূর্ণ অপরিচিত খাদ্যও ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে ওঠে। তার রসাস্বাদনে আমরা অভ্যস্ত হতে আরম্ভ করি, শেষে সেই খাদ্যই আমাদের প্রিয় খাদ্যের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। দাসপ্রথা রহিত হবার বহুদিন পরে ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের অধিবাসীরা ব্রেডফ্রুট খেতে সুরু করে। আজ ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজের কেউ হয়তো ব্রেড-ফ্রুটের নামে মুখ বাঁকায় না। ইউরোপে আলু আর টোম্যাটোর চাষ জনপ্রিয় করে তুলতে বহু বছর লেগেছে। এই সেদিন পর্যন্তও ইংল্যাণ্ডের বহু রক্ষণশীল লোক টোম্যাটো পরিহার করে চলতো। তারা মনে করতো, টোম্যাটোর সঙ্গে ক্যান্সার রোগের একটা চাপা সম্পর্ক আছে।

একদা অপরিচিত খাদ্য পরিচিত জনপ্রিয় খাদ্যে পরিণত হয়। আবার বহু দেশে বহু জনের বিচারে উত্তম বলে পরিচিত খাদ্যও যুগ যুগ ধরে আমরা বিষবৎ পরিহার করে চলি, যদি সে খাদ্যের উপর সামাজিক বাধা-নিষেধ থাকে—ইংরেজিতে যাকে বলে 'ফুড ট্যাবু'।

ধর্মের অনুশাসন থাকলে তো কথাই নেই। পৃথিবীর বহুদেশের জনগণের প্রিয় খাদ্য, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ গোমাংসের কথা বলা যেতে পারে। এমন একদিন গেছে যখন গোমাংস একবার দাঁতে কাটলেই সমস্ত হিন্দুত্ব ধুয়েমুছে যেত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যুক্ত বাংলায় যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়, তাতে কয়েক লক্ষ চাষী-মজুর না খেয়ে মারা যায়। প্রায়ই দেখা যেত, বহু হিন্দু চাষী পরিবারের লোকেরা দীর্ঘদিন অনাহারের চরম যন্ত্রণা সহ্য করেছে, অনেকে না খেয়ে মারাও গেছে—তথাপি বাড়ীর গাই, বলদ বা বাছুরগুলির সংখ্যা কমে নি। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা এরূপ পরিস্থিতিটাকে অবাস্তব বলে মনে করেছেন। গোয়াল ঘরে সুখাদ্যের উৎস থাকা সত্ত্বেও মানুষ না খেয়ে মারা যায় কি করে! বৃটিশ উত্তর বোর্ণিওর দু-একটি উপজাতি ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জাতি বোধ হয় গোমাংসের প্রতি এতটা বীতস্পৃহ নয়। ডায়েক উপজাতির লোকেরা গোমাংসের সঙ্গে সঙ্গে গোজাত সমস্ত খাদ্যবস্তু বর্জন করেছে। দুধ, মাখন, ঘি তাদের অবশ্য পরিত্যাজ্য খাদ্য। একবার এক ইংরেজ ভদ্রলোক কোন ডায়েক সর্দারকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন। মাছ, মাংস, ডিম কিছুই খেল না সর্দার। কারণ সব খাদ্যই রান্নার সময় মাখনের স্পর্শ পেয়েছিল। এ-ও দেখা গেছে, বহু ডায়েক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও গোমাংস গ্রহণ করে নি।

গোদুগ্ধকে আমরা অমৃত জ্ঞান করি। পুষ্টি-কারিতার বিচারে দুধের স্থান অদ্বিতীয়। কিন্তু দুধ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে, এমন জাতিও আছে। ডায়েকরা যে দুধকে নিষিদ্ধ খাদ্য বলে ধরে নিয়েছে, সে কথা তো একটু আগেই বলেছি। ভারত-সীমান্তের আও নাগারা দুধকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলে। দুধের গন্ধ নাকি ওদের ধাতে সয় না। হেন জন্তু নেই যার মাংস ওরা খায় না। এমন কি, মরা জন্তুর মাংসেও তাদের আপত্তি নেই।

পুরুষদের পানীয় যদি কিছু থাকে, তা হলো ভাতের পচাই। দুধ? দুধ তো খায় বাছুরে। দুধ খেলেই সাহস, হিম্মৎ সব উবে যাবে। রেড ইণ্ডিয়ানদের বহু শাখার লোকদেরও দুধ সম্বন্ধে এই রকম ধারণা। ভিয়েটনামের লোকেরাও গরুর দুধকে তালিকায় স্থান দিতে নারাজ। দুধ তাদের কাছে রীতিমত বর্জনীয় খাদ্য। তবে ইদানীং তারা টিনে-বন্দী ঘন বা শুক্‌নো দুধ খেতে আরম্ভ করেছে। তাও যে সে টিনের দুধ নয়! যে টিনের গায়ে কয়েকটা বাচ্চা সমেত পাখীর বাসার ছবি রয়েছে, সে টিনের দুধ খেতে আপত্তি নেই—টিনের দুধ যে পাখীর দুধে পরিণত হয়েছে! পাখীর দুধ খেতে আপত্তির কি আছে? আসলে পাখীর বাসা মার্কা জমানো দুধ বিশেষ কোন কোম্পানীর তৈরী। যারা জমানো দুধ খাচ্ছে, তারা ঠিকই জানে ওটা গরুর দুধ। তবে গরুর দুধকে পাখীর দুধ না বললে বিবেক শুদ্ধি হবে কি করে? শোনা যায়, আজকাল কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা মাছ খেতে সুরু করেছেন। তাঁরা মাছকে আর মাছ বলেন না, বলেন 'জলপদ্মম'। যাকে বলে ভাবের ঘরে চুরি!

ডিম, তরিতরকারী, ফল বা মাছ যাদের কাছে সম্পূর্ণ বর্জনীয়, এমন জনসমষ্টিও রয়েছে। আফ্রিকার জুলুরা ডিম খেত না—কেন না, ডিম খাওয়ার মধ্যে রাক্ষুসে লোভের গন্ধ রয়েছে; কারণ ডিম থেকে যে বাচ্চা হয়! বছরে ঋতুবিশেষে প্রচুর মুরগীর ডিম পাওয়া গেলেও কেউ ডিম খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন উপজাতীয় লোক-দের শাকসব্জী খাওয়ার ব্যাপারে সামাজিক বাধা-নিষেধ রয়েছে। শাকসব্জী গরু-ভেড়ার মত অবলা নিরীহ জীবের খাদ্য—বুদ্ধিমান, শক্তিমান, সাহসী মানুষের তা খাওয়া উচিত নয়। দক্ষিণপূর্ব সলোমন দ্বীপপুঞ্জের এক উপজাতি ওলওয়া। ওদের দেশে প্রচুর কলা জন্মায় অথচ ওলওয়ারা কলা খাওয়া বর্জন করেছে। কারণটা অদ্ভুত। কলা খেলে যে পূর্বপুরুষদের খাওয়া হয়! তাদের বিশ্বাস, দেহ-ত্যাগের পর ওলওয়াদের আত্মা কদলীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চিম আফ্রিকার বহু উপজাতি কমলালেবুর উপর বীতশ্রদ্ধ। কমলালেবু খেলে নাকি চারিত্রিক দৃঢ়তা নষ্ট হয়ে যায়—মন দুর্বল হয়ে পড়ে।

শিল্প-বিজ্ঞানে উন্নত আধুনিক জাপানের বহু অঞ্চলের অধিবাসীরাও খাদ্যে বাধা-নিষেধ মেনে চলে। ওখানকার স্যামন মাছ খুব সুস্বাদু। কাকাওকা প্রদেশের অধিবাসীদের কেউ কিন্তু স্যামন মাছ খায় না। কারণ পাঁচশত বছরের পুরাতন স্যামন দেবতার মন্দির রয়েছে ওই অঞ্চলে। নদী-নালাতে সময় সময় এত স্যামন ভেসে আসে যে, নৌকা থেকে হাত বাড়ালেই দু-চারটা ধরা যায়। তবুও কেউ স্যামন ধরে না। অক্টোপাসের মাংস জাপানীদের খুব প্রিয় খাদ্য। কিন্তু জাপানের কারী অঞ্চলের লোকেরা কেউ অক্টোপাস খায় না। অক্টোপাস না কি আদ্যিকালের এক বুড়ো দেবতাকে ডাকাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর খাদ্য গ্রহণে বিচিত্র রকমের অজস্র বাধা-নিষেধের কথা লিখতে গেলে মহাভারত তৈরী হয়ে যাবে। এমন অনেক খাদ্য আছে, যা স্থান-বিশেষে আংশিকরূপে বর্জন করা হয়েছে। কোন খাদ্য হয়তো পুরুষদের খেতে বাধা নেই, বাধা আছে মেয়েদের। যুবক-যুবতীদের কাছে যা নিষিদ্ধ, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আবার সেটা দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে। তবে মনে হয় নিষেধটা মেয়েদের উপর খাটানো হয় বেশী। একটা উদাহরণ তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে! তথাকথিত উচ্চ বর্ণের হিন্দু বিধবারা মাছ, মাংস পেঁয়াজ, রসুন, মুসুর ডাল খেতে পারেন না। সিদ্ধ চা'ল তাঁরা বর্জন করে চলেন।

নাগাদের এক শাখা রেঙমা নাগা। রেঙমা পুরুষেরা বাঁদরের মাংস খেতে পারে, কিন্তু মেয়েরা

নয়। বাঁদরেরা তো গোলা থেকে শস্য চুরি করে খায় যখন তখন। চোর বাঁদরের মাংস খেলে মেয়েদের স্বভাবও বাঁদরের মত হয়ে যাবে। পুরুষ? তারা তো সব কিছু দিব্যি হজম করে ফেলতে পারে। আর যদি নাই পারে তাতেই বা বলবার কি আছে? কর্তার দোষ কোন দোষই নয়! এদের যুবক-যুবতীরা টিয়ার মাংস খায় না। সব সময়ই তো টিয়ারা কিছু না কিছুর মধ্যে মুখ লাগাচ্ছে—যা লোভী টিয়ারা! তাদের বিশ্বাস, অস্থিরচিত্ত যুবক-যুবতীরা লোভী টিয়ার মাংস খেলে তৃতীয় রিপুর প্রভাবটা সহজেই তাদের মধ্যে অতি প্রবলরূপে দেখা দেবে। আর পাঁঠার মাংসও যুবক-যুবতীরা খেতে পারে না। প্রথম রিপুর প্রভাবটা পাঁঠার উপর নাকি একটু অধিক মাত্রায় রয়েছে। আর ওর প্রভাবটা যে সাংঘাতিক সংক্রামক! প্রবীণদের কোন কিছুতে দোষ নেই—তারা যে কাম, ক্রোধ জয়ী পরমহংস!

ভিক্টোরিয়ার বহু উপজাতির মধ্যে এই ধরণের বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা এমু বা কয়েক জাতীয় পশুপাখীর সুস্বাদু মাংস খেতে পায় না। এ-রকম পশুপাখীর মাংস খাওয়া প্রবীণদের একচেটিয়া অধিকার। আফ্রিকার কোন কোন জাতির মেয়েদের মধ্যে ডিম খাওয়া নিষেধ। আমাদের দেশের বাইগা উপজাতির মেয়েরা ডিম খেতে পারে না। কারণ একই। প্রধান রিপুর প্রভাব থেকে মেয়েদের যতটা বাঁচিয়ে রাখা যায়, ততই মঙ্গল!

কাফীর জাতির সমাজ-কর্তারা খাদ্যে বাধা-নিষেধের বিধান প্রদানের সময় পুরুষদের উপরই বেশী নজর রেখেছিল। শূকর, খরগোশ, হাঁস, মুরগী—এসব নোংরা জীবের মাংস পুরুষেরা খেতে পারতো না। বিধাতা নোংরা জীবের সৃষ্টি করেছেন মেয়েদের জন্যে। মেয়েদের পক্ষে তা হয়েছিল শাপে বর।

কাবাবিশ নামক উপজাতির মধ্যে দুগ্ধপানের যে বিচিত্র প্রথা রয়েছে, তাকে অনায়াসে বলা যায়—একম অদ্বিতীয়ম। পুরুষদের জন্যে বরাদ্দ উটের দুধ, মেয়েদের জন্যে গরুর দুধ, আর বাচ্চাদের জন্যে ছাগলের দুধ। খাদ্য-বিধির গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই কারও! আবার চীন, জাপান এবং ব্রহ্মদেশের রক্ষণশীল লোকেরা মনে করে, বয়স্কদের দুধ খাওয়া একেবারেই উচিত নয়।

আংশিক বাধা-নিষেধের একটা দিক রয়েছে। এই বাধা-নিষেধ ঋতু বা সময়ভিত্তিক। কোন খাদ্য হয়তো বর্ষাতে খাওয়া চলে, কিন্তু শীতকালে খাওয়া চলে না অথবা হয়তো বিশেষ পূজাপার্বণ শেষ না হলে তা খাওয়া চলে না। এ-রকম ছত্রিশ গণ্ডা বাধা-নিষেধ আমাদের বাঙালী হিন্দু সমাজেই আছে। পৌষ মাস চলে গেলে অনেক পরিবার মূলা খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সরস্বতী পূজার আগে অনেকে কুল খান না। অনেকে হয়তো পুরা কার্তিক মাসটা মাছ না খেয়ে কাটিয়ে দেন। জাপানে সামাজিক বা পারিবারিক উৎসবের প্রাচুর্য রয়েছে। বিভিন্ন উৎসবের দিনগুলিতে বিভিন্ন খাদ্য, খাদ্যতালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। কোন উৎসবে হয়তো ভাত খাওয়া হয় না, কোন উৎসবে বা খাওয়া হয় না জোয়ার-গম। আবার ডিম, মুরগী বা সমুদ্রজাত খাদ্যও বাদ পড়ে কিছু কিছু।

এই ধরণের বাধা-নিষেধ ছাড়াও আছে বিভিন্ন খাদ্য সংমিশ্রণের বাধা-নিষেধ। পূর্ববাংলার কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা মনে করতেন যে, দুধে লবণ বা পেঁয়াজ দিলে তা গোরক্তে পরিণত হয়। চিচিঙ্গা সহযোগে ডিম রান্নার কোন প্রণালী আছে কিনা জানি না। তবে অন্ধ্রপ্রদেশের এক ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসে আমাদের বাড়ীর আঙ্গিনায় চিচিঙ্গা সমারোহে মণ্ডিত চিচিঙ্গা লতা দেখে বারে বারে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন, চিচিঙ্গা যেন 'এগ কারিতে' না দিই। জাপানী গৃহিণীরা খাদ্য সংমিশ্রণে অত্যন্ত সাবধানী

ও হিসাবী। মাখনে ভাজা ছোট সামুদ্রিক চিংড়ি ও কাঁকড়ার সঙ্গে তরমুজ খাওয়া চলে না। খাওয়া চলে না তিল দিয়ে রাঁধা অক্টোপাসের মাংস। এক সঙ্গে দু-রকম সামুদ্রিক মাছের দোমিশালী তরকারী খায় না কেউ। মিষ্টিআলু সিদ্ধ মাছের সঙ্গে একপাতে দেওয়া যাবে না। খরগোসের মাংসের সঙ্গে টাট্কা আদা, মুরগীর ডিমের সঙ্গে রসুন বা চিংড়ির সঙ্গে কমলালেবু চলবে না।

খাদ্য খাওয়ার অসংখ্য রকম বাধা-নিষেধের সঙ্গে কোন যুক্তি সব সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন একটি বিশেষ নিষেধ ঠিক কোন্ কালে প্রচলিত হলো, তাও ঠিক জানবার উপায় নেই। তবে অনেকগুলি বাধা-নিষেধ কোন কালে যে প্রয়োজনের তাগিদে প্রচলিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। যেমন, হিন্দুদের গোমাংস বর্জন। শুনতে পাই, আর্যেরা যখন উত্তর ভারতে প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলে, তখন গোমাংস ভক্ষণে তাদের আপত্তি ছিল না। কিন্তু গো-দুগ্ধজাত খাদ্যবস্তুর জন্যে গো-পালনে বিশেষরূপে মন দিতেই গো-পাল, গোধনে পরিণত হয়ে যায়। আর হয়তো এই গো-পাল সংরক্ষণের জন্যেই গোবধ নিসিদ্ধ হয়ে যায়। গো-পালনের উপর নির্ভরশীল আফ্রিকার বহু উপজাতি আজও সীমাবদ্ধভাবে গোমাংস বর্জন করে চলে। যথেচ্ছা গোবধ থেকেও তারা বিরত রয়েছে।

আগেই বলেছি, সমাজ-ব্যবস্থা অনুসারে বিশেষ কতকগুলি প্রাণীর মাংস অনেক উপজাতির সমর্থ যুবকেরা খেতে পারে না। কিন্তু বৃদ্ধদের তা খেতে কোন বাধা নেই। শিকার করা যুবকদের দায়িত্ব। বাধা-নিষেধ আরোপ না করলে বুড়োদের সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ থেকে একেবারে বাদ পড়বার সম্ভাবনা থাকে। অক্ষম বৃদ্ধদের জন্যে একটু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হবে বৈকি!

অস্ট্রেলিয়ার কোন উপজাতি বাচ্চা পশুপক্ষীর মাংস বর্জন করে চলে। বাচ্চা খেয়ে নিকাশ করলে শিকার করবার মত পশুপাখী মিলবে কোথা থেকে?

কিন্তু এমন অনেক বাধা-নিষেধ আছে, যা শরীর রক্ষার পরিপন্থী ও দেহে অপুষ্টিজনিত রোগ বৃদ্ধির সহায়ক। যেমন, হিন্দু বিধবাদের আতপ-চালের উপর নির্ভরতা। আমরা খাদ্য থেকে রোজ যতটা ভিটামিন-বি$_1$ (থিয়ামিন) পাই, তার শতকরা পঁচাত্তর ভাগই আসে চাল থেকে। অবশ্য চালটা যদি সিদ্ধচাল হয়। আতপচালে, বিশেষতঃ পুরনো আতপচালে ভিটামিন-বি$_1$-র পরিমাণ সিদ্ধ চালের তুলনায় খুবই কম থাকে। এমন কি সিদ্ধ চালে যতটা ভিটামিন-বি$_1$ থাকে, আতপচালে তার এক-তৃতীয়াংশও থাকে না। কাজেই সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের যে সমস্ত বিধবারা আতপচাল, বিশেষতঃ পুরনো আতপচালের ভাত খেয়ে থাকেন, তাদের ভিটামিন-বি$_1$ অভাবজনিত রোগে ভোগবার খুবই সম্ভাবনা থাকে। আমরা জান্তব প্রোটিন পাই সামান্যই। জান্তব প্রোটিন যা পাই, তার সবটুকুই পাই প্রতিদিনের বরাদ্দ এক টুক্রা মাছ থেকে। দুধ-ডিম খাবার ভাগ্য আর কয়জনের হয়? হিন্দুর বিধবারা সেটুকু থেকেও বঞ্চিত।

খাদ্যে বাধা-নিষেধ একদল বিশেষ সম্প্রদায়ের খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মৃত্যুর কারণ হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কয়েকজন গোড়া রুশ খৃষ্টান ধর্মযাজক প্রচার কার্যের জন্যে বের হয়ে উত্তর রাশিয়ার এক জনশূন্য অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাদের এক অল্পবয়স্ক পরিচারক ছিল। ঐ অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ ও মাংসের অভাব ছিল না মোটেই। কিন্তু দলীয় ধর্মীয় অনুশাসনে প্রাণী-হত্যা করে টাট্কা মাছ-মাংস খাওয়া নিষেধ ছিল। ফলে টিনে বন্দী খাদ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয় তাদের। বহুদিনের টিনে বন্দী খাদ্যে ভিটা-মিন-সি নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমাগত ভিটামিন-সি বর্জিত খাদ্য খেয়ে স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়ে দলের সমস্ত ধর্মযাজকই মারা পড়েন। শুধু দলের

পরিচারকটি স্কার্ভির হাত থেকে বেঁচে যায়। পরিচারকটি টিনে রক্ষিত খাদ্য মোটেই পছন্দ করতো না, আর সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণীদের মাংস খাওয়ায় তার বাধা ছিল না। সুতরাং টাট্‌কা মাছ-মাংস খেয়ে প্রয়োজনীয় ভিটামিন-সি পাওয়ার দরুণ স্কার্ভির হাত থেকে সে বেঁচে যায়।

আফ্রিকার মুবা উপজাতির বহু শাখার ভিতর গো-পালনের রেওয়াজ আছে। দুধ পাওয়াও যায় প্রচুর। কিন্তু স্বামীর ঘরে আসবার পর মেয়েরা দুধ খেতে পায় না—যে পর্যন্ত দু-একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়। অথচ এই সময় তারা কোন বিকল্প পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। গর্ভবতী বা সন্তানবতী জননীরা দুধ স্পর্শ না করবার দরুণ প্রথম দিকের সন্তানেরা প্রায়ই দুর্বল হয়।

বেলজিয়ান কঙ্গোর কোন কোন উপজাতির সন্তানসম্ভবা মেয়েরা গর্ভস্থ শিশুর মঙ্গল কামনা করে তাদের খাদ্যতালিকাটি সঙ্কুচিত করে। একে একে সাধারণ খাদ্যের প্রায় সবগুলি বাদ দিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা নির্ভর করতে থাকে ক্যাসেভার (মূলজাতীয় খাদ্যের) উপর। বিবিধ মিশ্র খাদ্য খাওয়ার দরুণ খাদ্য অনেকটা সুষম হয়ে থাকে—কিন্তু শুধুমাত্র ক্যাসেভার উপর নির্ভর করাতে সে সুষমতা ভেঙ্গে যায়। একটা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে গর্ভাবস্থায় অপুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার দরুণ মায়েদের কোলে ক্ষীণজীবী শিশুরা আসে। আর আতুড় ঘরেই পাইকারী হারে তারা মারা পড়ে।

বিভিন্ন দেশে খাদ্যের যে অসংখ্য বাধা-নিষেধ রয়েছে, তার সামান্য পরিচয়ই বর্তমান প্রবন্ধে দেবার চেষ্টা করেছি। এই সম্বন্ধে সুসংবদ্ধ গবেষণা বা গ্রন্থ রচনা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এমন কি, বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা খাদ্য গ্রহণে যে বাধা-নিষেধ মেনে চলেন, তার একটা সামগ্রিক পরিচয়ও আমরা জানি না। আমার মনে হয়, কেউ এ-পর্যন্ত তা সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করেন নি।

বিষধর মাছ

শ্রীআশীষকুমার মাইতি

বিষযন্ত্রের সঙ্গে বিষাক্ত সাপের নামই বিশেষ ভাবে জড়িত; কিন্তু বিভিন্ন মাছেও বেশ উন্নত ধরণের কার্যকরী বিষযন্ত্র আছে। সাধারণতঃ শিকার ধরা অথবা আত্মরক্ষার জন্যে মাছের কান্‌কোর উপর বা পাখ্‌নার সঙ্গে যে কাঁটা থাকে, সেগুলির সঙ্গে বিষগ্রন্থির সমন্বয়ে বিষযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। এই সব বিষযন্ত্রের গঠন খুবই সরল প্রকৃতির এবং বিষগ্রন্থিগুলি দেহত্বকের উপরের স্তরের কোষের বিশেষ সমষ্টির দ্বারা গঠিত এবং সম্ভবতঃ মাছের এই যন্ত্র শুধু আত্মরক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হয়।

মাছের কাঁটার দ্বারা সৃষ্ট ক্ষত, যন্ত্রণা এবং ঘা যে মাছের এক সুনির্দিষ্ট বিষযন্ত্রের ক্রিয়ার ফল, এই ধারণা আধুনিক। আগে বিশ্বাস করা হতো যে, কাঁটার উপরের শ্লেষ্মাই ঘা এবং যন্ত্রণার জন্যে দায়ী।

তরুণাস্থিবিশিষ্ট মাছ বা Chondrichthyes-এর মধ্যে কয়েক জাতের হাঙ্গর, শঙ্কর মাছ এবং সিমেরার (Chimaera) শরীরে বেশ কার্যকরী বিষযন্ত্র দেখা যায়। এগুলি সবই সামুদ্রিক মাছ।

কাঁটাওয়ালা হাঙর বা Squalus (চিত্র—১ক) Heterodontus এবং সিমেরার (চিত্র—১খ) পিঠের পাখ্‌নায় যে বিষাক্ত কাঁটা থাকে, তার সঙ্গে থাকে এক ধবধবে সাদা রঙের বিষগ্রন্থি। এই গ্রন্থির কোষগুলি একপ্রকার তীব্র বিষ উৎপাদন করে, যার ক্রিয়ায় অত্যন্ত বেদনাদায়ক—এমন কি, বিপজ্জনক ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। হাত অথবা পায়ে কাঁটাওয়ালা হাঙরের বিষাক্ত কাটা বিদ্ধ হয়ে অনেক সময় ঐসব অঙ্গের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা ফিরে পেতে বেশ কয়েক দিন সময় লাগে। গভীর সাগরে ট্রলিং-এর সাহায্যে এই হাঙর প্রচুর ধরা হয় এবং উৎকৃষ্ট খাদ্য হিসাবে বাজারে বিক্রয় হয়। কিন্তু ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই এই মাছের বিষাক্ত কাঁটা দুটিকে সাবধানে কেটে ফেলা হয়।

কয়েক জাতীয় শঙ্কর মাছের (যথা-Myliobatis চিত্র-২, Dasyatis চিত্র-৩ক) লেজের গোড়ার দিকে খুব শক্ত, চ্যাপ্টা এবং প্রায় ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা (কখন কখন ৮ থেকে ১৫ ইঞ্চি লম্বা) একটি, কখনও একই সঙ্গে দু তিনটি বিষাক্ত কাঁটা থাকে (চিত্র-৩খ)। এই কাঁটার দুটি ধার করাতের মত দাঁতওয়ালা এবং এর দু-পাশের প্রান্ত বরাবর দুটি অতি সূক্ষ্ম নালী থাকে, যার মধ্যে বিষ-উৎপাদক এক প্রকার উজ্জ্বল সাদা রঙের বিষগ্রন্থি থাকে। এই
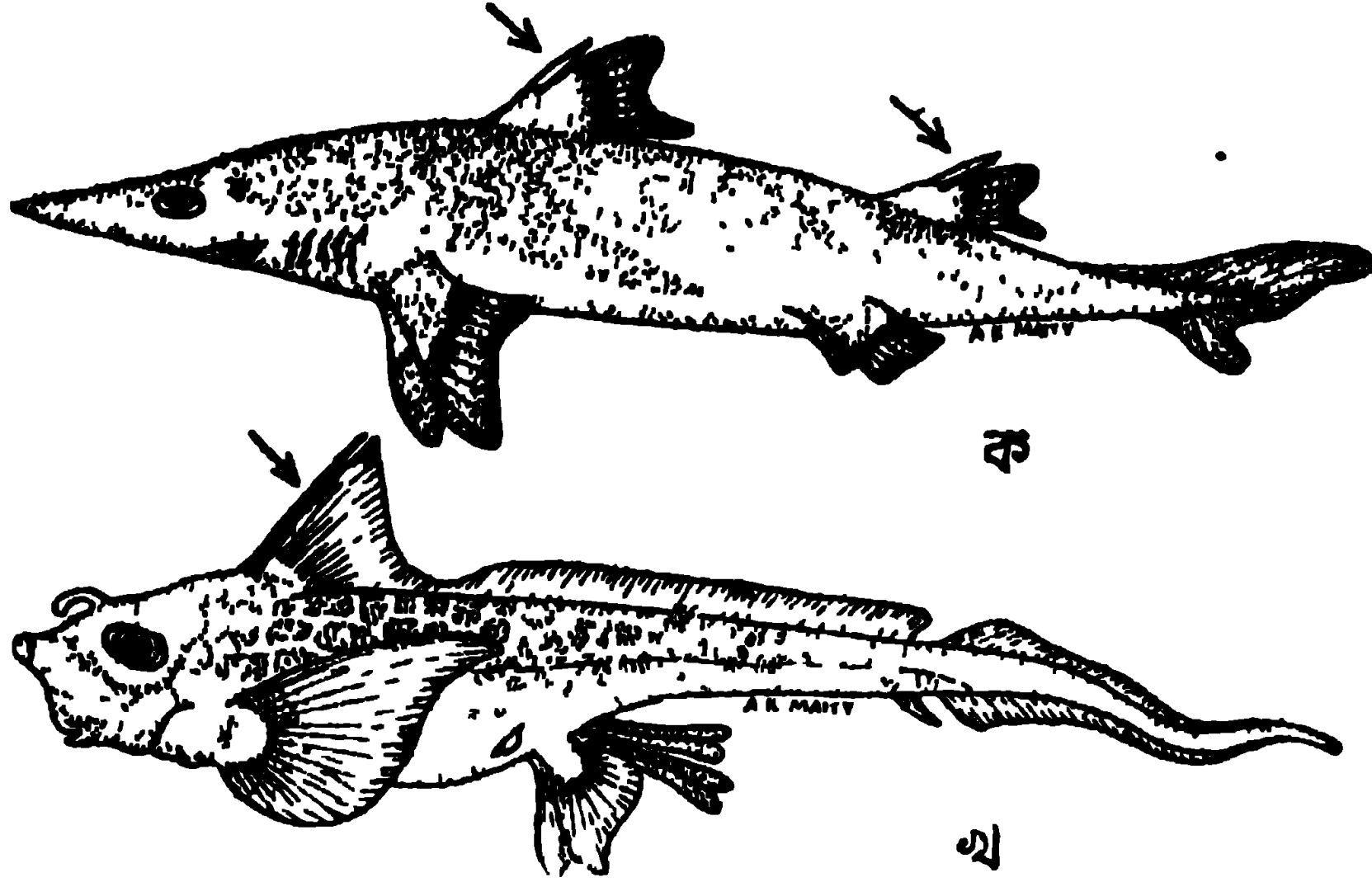
১নং চিত্র। ক—কাটাওয়ালা হাঙর। খ—সিমেরা। তীর চিহ্নের দ্বারা বিষাক্ত কাটার অবস্থান দেখানো হয়েছে।

২নং চিত্র। শঙ্করমাছ। লেজের গোড়ার বিষাক্ত কাঁটাটি দেখা যাচ্ছে।

মাছের এই কাঁটা এক মারাত্মক অস্ত্র। মাছটি যখন লেজের ঝাপ্‌টা দেয় অথবা শিকারের শরীর লেজের সাহায্যে জড়িয়ে ধরে কাঁটা বিদ্ধ করে, তখন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বীভৎস ক্ষত উৎপন্ন হয়। এর বিষক্রিয়ার ফলে সাংঘাতিক খেঁচুনি হতে থাকে এবং আক্রান্ত প্রাণীর মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

ক

খ

৩নং চিত্র। ক—শঙ্কর মাছ। মাছটির লেজের গোড়ায় বিষাক্ত কাঁটাটি দেখা যাচ্ছে। খ—ঐ মাছের লেজের গোড়ার কাঁটাটি বিশদ-ভাবে দেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে দুটি কাঁটা দেখা যাচ্ছে।

অস্থিবিশিষ্ট মাছ বা Osteichthyes-এর মধ্যে প্রায় চল্লিশটি প্রজাতির উল্লেখযোগ্য বিষযন্ত্র আছে এবং সেগুলি অপেক্ষাকৃত জটিল ধরণের।

উত্তর আমেরিকার নদীর কয়েক জাতীয় জিওল মাছ (যথা—Noturus, Schilbeodes ইত্যাদি) এবং আমাদের দেশের শিঙি (Heteropnenstes, মাগুর (Clarias). ট্যাংরা (Mystus) ইত্যাদি জিওল মাছের বুকের পাখনার বাইরের দিকের কাঁটাটি খুবই মজবুত চ্যাপ্টা আকৃতির এবং এর একটি অথবা দু'টি ধারই করাতের মত দাঁতওয়ালা। এই কাঁটাগুলির উপর চামড়ার যে পাত্‌লা আবরণী থাকে, তার কোষগুলি বিষ উৎপাদন করে। কাঁটার সাহায্যে ক্ষত সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ বিষাক্ত কোষগুলি থেকে বিষ বেরিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে কয়েকটি মাছের পিঠের পাখ্‌নার সঙ্গে সংলগ্ন শক্ত কাঁটাটিও বিষাক্ত। আমাদের দেশের শিঙি (চিত্র-৪), মাগুর, ট্যাংরা (চিত্র-৫) ইত্যাদি মাছের বুকের পাখ্‌নার এই কাটার আঘাতে যন্ত্রণাদায়ক ক্ষতের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। জীবন্ত অবস্থায় এসব মাছকে অসাবধানে নাড়াচাড়া করতে গেলেই এরা কাঁটা বিঁধিয়ে দেয়। যদিও

এদের বিষক্রিয়ার ফল খুব মারাত্মক হয় না, তবুও এসব মাছের কাঁটা বিঁধবার ফলে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বেশ যন্ত্রণা হতে থাকে।

সামুদ্রিক উইভার মাছের (Trachinus, চিত্র-৬) পিঠের পাখ্‌নার অগ্রভাগেরটির প্রথম ৫।৬টি

৪নং চিত্র। শিঙ্গি মাছ। বক্ষ পাখ্‌না সংলগ্ন বিষাক্ত কাঁটা দেখানো হয়েছে।

কাঁটার সঙ্গে এবং প্রতিটি কান্‌কোর উপর অবস্থিত লম্বা, অতি সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট ধারালো একটি কাঁটার সঙ্গে বিষগ্রন্থি থাকে (চিত্র-৭ক, খ)। কান্‌কোর কাঁটার প্রায় সবটাই পাত্‌লা চামড়ার দ্বারা ঢাকা

৫নং চিত্র। ট্যাংরা মাছ। এই ছবিতেও মাছটির বক্ষ পাখ্‌না-সংলগ্ন বিষাক্ত কাঁটা দেখানো হয়েছে।

থাকে, কেবল সূক্ষ্ম প্রান্তটি বেরিয়ে থাকে। এই কাঁটাটির দু-ধার দিয়ে দুটি বেশ গভীর নালী বা খাঁজ দেখা যায়, যার মধ্যে বিষগ্রন্থি থাকে (চিত্র-৭ খ) এই বিষগ্রন্থি থেকে কোন নালিকা বেরুতে দেখা যায় না। তাই মনে হয়, কাঁটা বিদ্ধ হবার পর ঐ গ্রন্থির কোষগুলি ভেঙ্গে গিয়ে বিষ কাঁটার নালিকা দুটির মধ্য দিয়ে গড়িয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে। এই মাছের বিষের তীব্রতা মারাত্মক ধরণের; কারণ সাপের বিষের মত এই বিষও রক্ত-সঞ্চালনতন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। সাধারণতঃ সমুদ্রোপকূলে স্নানরত অবস্থায় অনেকেই এই মাছকে হঠাৎ মাড়িয়ে ফেলে কণ্টক-বিদ্ধ হন। বিদ্ধ হবার পর জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে এক অসহ্য যন্ত্রণা হতে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে এই যন্ত্রণা বেশ কয়েক ঘন্টা—এমন কি, সারা দিনও থাকতে পারে। এই যন্ত্রণা প্রথমে শুধু কণ্টক-বিদ্ধ স্থানে সুরু হয়, কিন্তু তারপর ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ অঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে। যন্ত্রণার তীব্রতায় অনেকে পাগলের মত হয়ে যায় এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বুক ধড়ফড়, জ্বর, ভুল বকা, পিত্তবমি এবং সংজ্ঞাহীনতা দেখা দিতে পারে। যদিও এ-রকম এক বা একাধিক উপসর্গ অন্যান্য বিষাক্ত মাছের কাঁটা বিঁধবার ফলেও দেখা দিতে পারে, কিন্তু উইভার মাছের বিষক্রিয়ার ফলে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়।

নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রে কুৎসিত-দর্শন এক প্রকার বিষাক্ত কাঁকড়াবিছা মাছ (Synanceia, চিত্র-৮) দেখা যায়, যার বিষযন্ত্র খুবই কার্যকরী। এই মাছের পিঠের পাখনা-সংলগ্ন কাঁটাগুলির গোড়ায় দেহত্বকের ঠিক নীচেই বিষগ্রন্থিগুলি অবস্থিত এবং প্রতি গ্রন্থি থেকে একটি লম্বা নলী বেরিয়ে কাঁটার দু-দিকের দুটি লম্বা এবং গভীর খাঁজের মধ্য দিয়ে চলে গেছে (চিত্র-৮)। জীবন্ত মাছকে সাপের বিষদাঁতের মতই এই কাঁটাগুলি ফাঁপা, অনেকটা ইঞ্জেকশনের সূচের মত। এই কাঁটাগুলির গোড়ায় দেহত্বকের নীচেই বিষগ্রন্থি অবস্থিত। কাঁটা বিদ্ধ হবার পর ফাঁপা কাঁটার মধ্যেকার নালিকার মধ্য দিয়ে বিষ ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে।

বিষের তীব্রতা শুধু যে বিভিন্ন জাতীয় মাছেই বিভিন্ন প্রকার, তাই-ই নয়—একই জাতের বিভিন্ন মাছেও বিষের তীব্রতার বেশ তারতম্য দেখা যায়। কাঁটাওয়ালা শঙ্কর মাছের (Dasyatis) এবং উইভার মাছের বিষের তীব্রতা বিষধর মাছদের মধ্যে সর্বাধিক বলে মনে হয়। কাঁটাওয়ালা হাঙ্গরের (Squalus) বিষক্রিয়া মারাত্মক না হলেও খুবই যন্ত্রণাদায়ক।
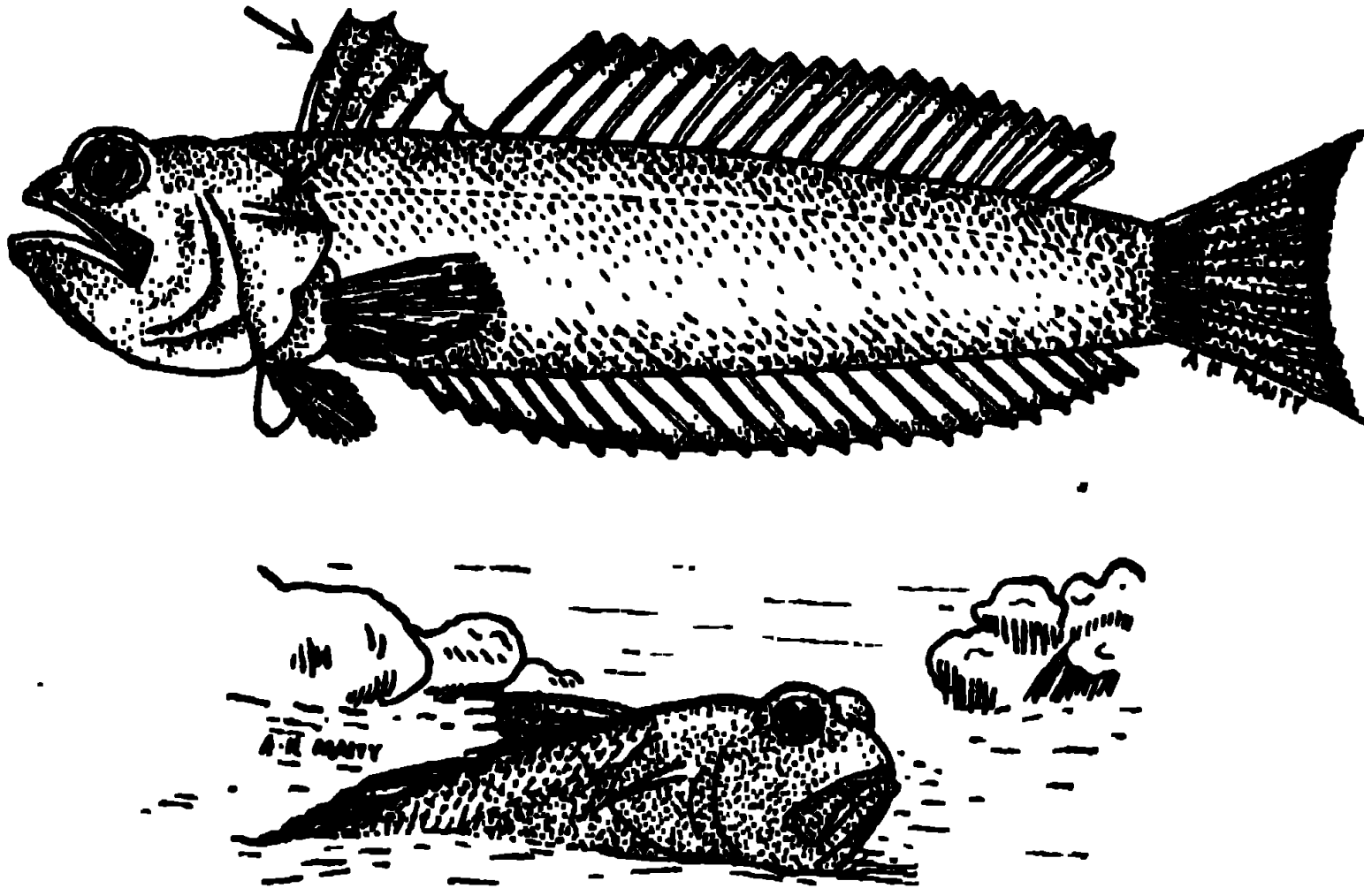
৬নং চিত্র। উইভার মাছ। উপরে—সম্পূর্ণ মাছ। তীর চিহ্নের দ্বারা বিষাক্ত কাঁটাগুলি দেখানো হয়েছে। নীচে—মাছটি অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় বালির মধ্যে লুকিয়ে আছে।

অসাবধানে নাড়াচাড়া করলেই কাঁটা বিদ্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। এই মাছগুলি অনেক সময় বালির মধ্যে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় লুকিয়ে থাকে এবং খালি পায়ে জলের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাবার সময় এর উপর পা পড়লেই পিঠের কাঁটা পায়ে ফুটে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চাপেই বিষগ্রন্থি থেকে বিষ বেরিয়ে ক্ষতস্থানে প্রবেশ করে।

আমেরিকার নিরক্ষীয় অঞ্চলে বিষাক্ত ব্যাং-মাছের (Thalassophryne) বিষযন্ত্র খুবই উন্নত ধরণের এবং মাছের বিষযন্ত্রের মধ্যে এটিই মনে হয় সবচেয়ে উন্নত। এই মাছের পিঠের পাখনার অগ্রভাগেরটির প্রথম দুটি কাঁটা এবং কান্‌কোর উপরের কাঁটাগুলি বিষগ্রন্থির সঙ্গে সংযুক্ত। বিষধর

যদিও এখন পর্যন্ত মাছের বিষক্রিয়ার উপযুক্ত কোন প্রতিষেধকই আবিষ্কৃত হয় নি, তবুও প্রাথমিক শুশ্রূষা এবং অন্যান্য যন্ত্রণা লাঘবকারী সাধারণ চিকিৎসার দ্বারা যন্ত্রণার তীব্রতা বহুলাংশেই কমানো যায় এবং অন্য উপসর্গেরও উপশম হয়। তবে তীব্র বিষধর মাছের কাঁটা বিদ্ধ হবার পর যত কম সময়ের মধ্যে চিকিৎসা আরম্ভ করা যায়, ততই ভাল।

সাধারণতঃ জিওল মাছ, শঙ্কর মাছ ইত্যাদির কাঁটা বিঁধবার ফলে উন্মুক্ত ক্ষতের সৃষ্টি হয়। বিদ্ধ হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব এই ক্ষত ঠাণ্ডা লবণ জলের সাহায্যে ধুয়ে ফেলতে পারলে খুবই উপকার পাওয়া যায়। তবে উইভার মাছের কাঁটা বিঁধবার ফলে বিষ দেহত্বক ভেদ করে রক্তস্রোতের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করে। তাই এর চিকিৎসা কোন কোন শঙ্কর মাছের বিষ রক্তস্রোতে মিশে গিয়ে হৃদ্‌যন্ত্র আক্রমণ করে। এর জন্যে দ্রুত চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

বিষাক্ত মাছের দ্বারা বিদ্ধ হলে আরও এক ধরণের চিকিৎসায় খুব উপকার পাওয়া যায়। বিদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্ধস্থানের ঠিক উপরে শক্ত দড়ি বা সুতার সাহায্যে খুব শক্ত বাঁধন দিয়ে

ক

খ
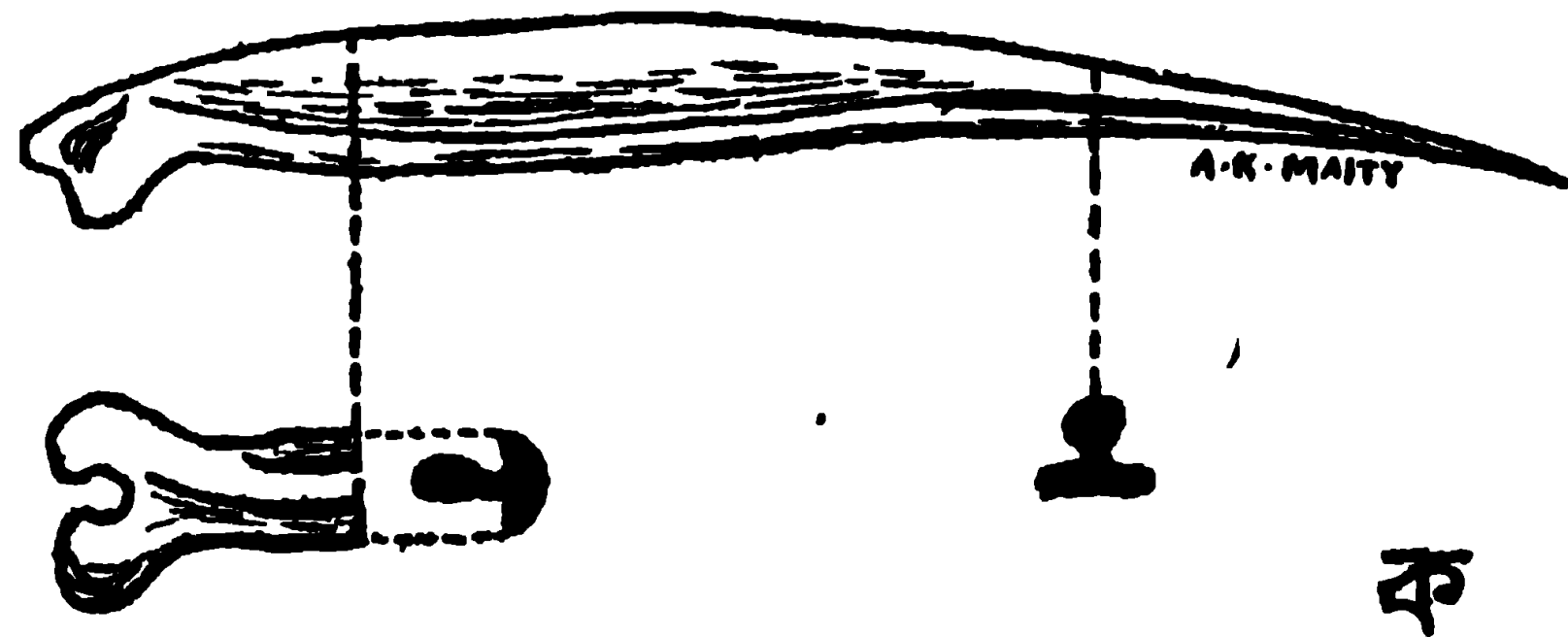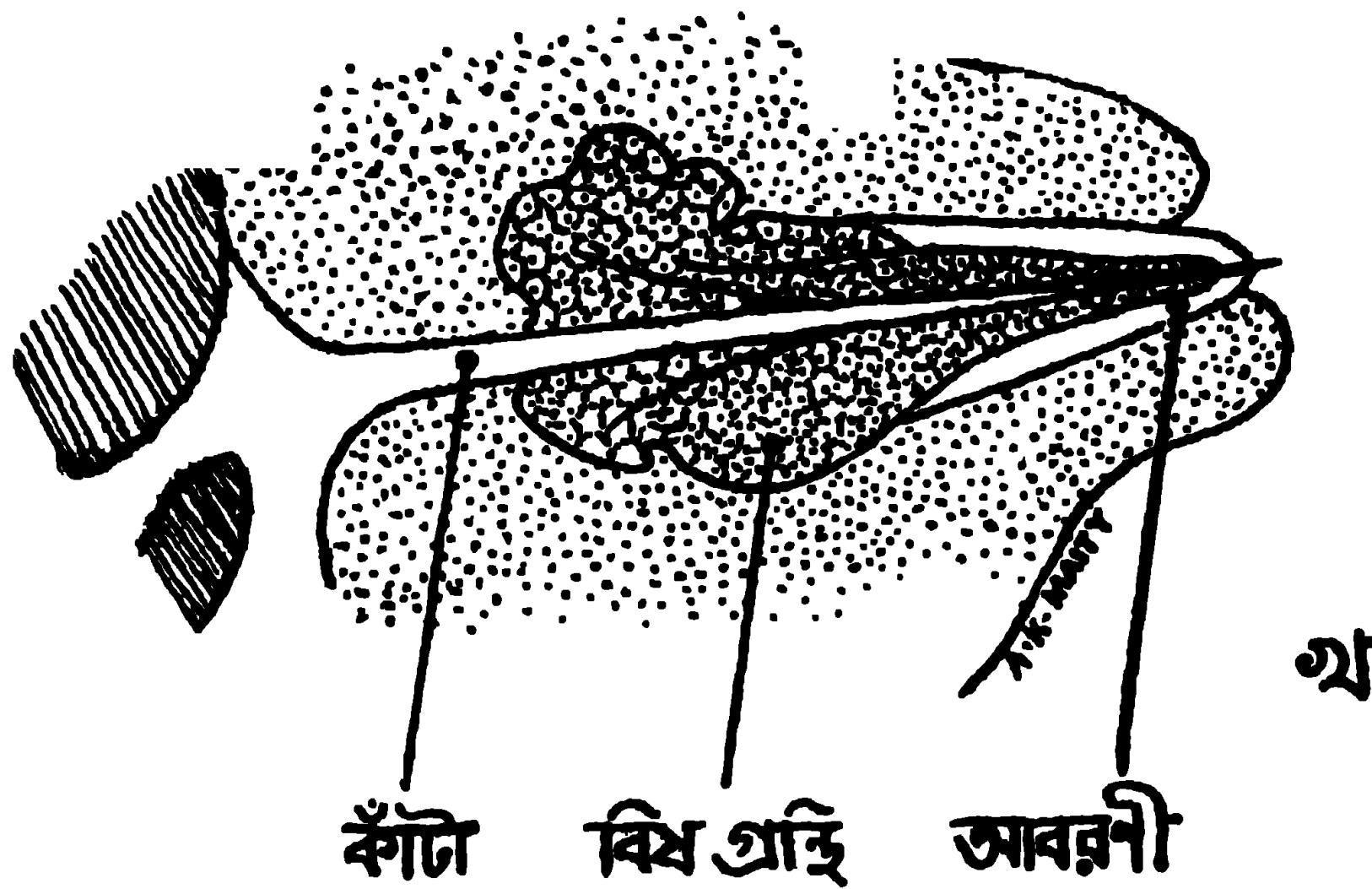
কাঁটা বিষগ্রন্থি আবরণী

১নং চিত্র। ক—উইভার মাছের পৃষ্ঠ-পাখনা সংলগ্ন একটি বিষাক্ত কাঁটা এবং তার খাঁজগুলি দেখানো হয়েছে। খ—ঐ মাছের কান্‌কোর কাঁটা এবং তৎসংলগ্ন বিষযন্ত্র ও তার বিভিন্ন অংশ বিশদভাবে দেখানো হয়েছে।

অপেক্ষাকৃত কঠিন। বিদ্ধ হবার পর যত শীঘ্র সম্ভব বিদ্ধ অঙ্গটিকে, সহ্য করা যায় এই রকম সর্বাধিক উষ্ণ জলে আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখলে খুবই উপকার হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য প্রচলিত যন্ত্রণা লাঘবকারী চিকিৎসা চালাতে হবে। যদি মুখে বা শরীরের অন্য অংশে কাঁটা বিদ্ধ হয়, তবে বিদ্ধস্থানে গরম কম্প্রেস লাগানো চলতে পারে। বিদ্ধ অঙ্গে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দিতে হবে। এই অবস্থায় বিদ্ধ অঙ্গটিকে (হাত অথবা পা) বরফ জলে পাঁচ-দশ মিনিট ডুবিয়ে রাখবার পর বাঁধন খুলে ফেলা যেতে পারে; কিন্তু অঙ্গটিকে ঐ অবস্থায় বরফ জলে অন্ততঃ দু'ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখা প্রয়োজন। কোন কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতে, শতকরা ৫ ভাগ পটাশ পারম্যাঙ্গানেটের দ্রবণ (Condy's fluid)

কয়েক ফোঁটা ক্ষতস্থানে ইঞ্জেকশন দিলে দ্রুত যন্ত্রণার লাঘব হয় এবং পরে ঘা হবার সম্ভাবনাও থাকে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ফর্ম্যালিনের তীব্র দ্রবণ ক্ষতস্থানে ইঞ্জেকশন দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা বন্ধ হয় এবং ক্ষতস্থানের ঘা শীঘ্রই শুকিয়ে যায়।

৮নং চিত্র বিষাক্ত কাঁকড়াবিছা মাছ, বাঁ দিকে—বিষগ্রন্থিসহ ঐ মাছের পৃষ্ঠ-পাখনার একটি বিষাক্ত কাঁটা দেখানো হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট বিষযন্ত্র ছাড়াও এমন অনেক সামুদ্রিক মাছ আছে, যাদের শরীরে মারাত্মক বিষাক্ত অ্যালকালয়েড জাতীয় পদার্থ থাকে। এই সব বিষাক্ত মাছ আহার্য হিসেবে গ্রহণ করলেই পক্ষাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অনবরত দাস্ত হতে থাকে এবং পেটের খেঁচুনি থেকে সুরু হয়ে ধীরে ধীরে শরীরের সমস্ত মাংসপেশীর সাংঘাতিক খেঁচুনি হতে থাকে। ক্রমে হৃদ্‌যন্ত্রের প্যারালিসিসের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়।

এই ধরণের বিষক্রিয়াকে "সিগুয়াটেরা বিষক্রিয়া" **(Ciguatera poisoning)** বলা হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের সমুদ্রের (প্রধানতঃ প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের) ৩০০টি বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে এই ধরণের বিষ পাওয়া যায় এই ধরণের বিষক্রিয়া খুবই অনিশ্চিত এবং এ-থেকে রক্ষা পাওয়াও খুব কঠিন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, একই প্রজাতির মাছ একস্থানে সম্পূর্ণ নির্বিষ হলেও অন্যস্থানে তা মারাত্মকরূপে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। সম্ভবতঃ ঐসব প্রজাতির মাছগুলি নিজেরা নির্বিষ, কিন্তু তারা বিষাক্ত সামুদ্রিক প্রাণী (যথা—সামুদ্রিক শুক্তি, সিলেন্টেরেট অথবা কণ্টকত্বক্ প্রাণী) অথবা সামুদ্রিক গুল্ম আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে' বিষাক্ত হয়ে পড়ে। মৎস্যভুক নির্বিষ মাছেরা আবার এই সব বিষাক্ত মাছ খেয়ে নিজেরা বিষাক্ত হয়ে পড়ে। নিজের শরীরে মারাত্মক বিষাক্ত পদার্থ থাকা সত্ত্বেও এসব মাছের জীবনধারণে কোন ব্যাঘাত হয় না; কিন্তু এদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলেই বিষক্রিয়ার লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়। রান্নার তাপে এই ধরণের বিষ নষ্ট হয় না এবং এর কোন প্রতি-ষেধকও এ-পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। শুধুমাত্র উত্তেজক এবং বমনোৎপাদক ওষুধ ছাড়া এই মারাত্মক বিষক্রিয়ার আর কোন চিকিৎসাই নেই।

অন্যান্য কয়েক জাতের মাছ বছরের অন্য সময় নির্বিষ হলেও প্রজননের সময় অত্যন্ত বিষাক্ত হয়ে ওঠে। কারণ এদের জননেন্দ্রিয়ে এই সময় বিষ

উৎপন্ন হয়। এই সময় এসব মাছ বা তাদের ডিম খাওয়া খুবই বিপজ্জনক।

আরও অন্ত ধরণের কয়েক জাতীয় সামুদ্রিক মাছের মাংসপেশীগুলি নির্বিষ হলেও বছরের সব সময়েই এদের যকৃতে, জননেন্দ্রিয়ে, অন্ত্রে এবং দেহত্বকে বিষ পাওয়া যায়। গ্লোব মাছ (Chilomycterus, চিত্র ৯-ক), সজারু মাছ (Diodon, চিত্র-৯খ) ইত্যাদি এই ধরণের বিষাক্ত মাছ। কিন্তু এদের মাংস সুস্বাদু হওয়ায় জাপানে খাদ্য হিসেবে এই মাছের ব্যবহার প্রচলিত আছে। জাপানে এই মাছের মাংসকে ফুগু বলা হয় এবং সে দেশে যে সব রেস্তোরাঁয় ফুগু রান্না হয়, সেখানে ঐ কাজের জন্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত এবং দক্ষ পাচকের সাহায্য নেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানে প্রতি বছর ফুগুর মারাত্মক বিষক্রিয়ায় এখনও বহুলোক মারা যায়।

খ

৯নং চিত্র। ক—গ্লোব মাছ। খ—সজারু মাছ। এদের কোন সুনির্দিষ্ট বিষযন্ত্র নেই এবং মাংসপেশীগুলিও নির্বিষ, কিন্তু এদের দেহের অন্যান্য অংশে মারাত্মক বিষ থাকে।

নিরক্ষীয় অঞ্চলে শঙ্কর মাছ এবং হাঙর (বিশেষতঃ এদের লিভার) খাওয়ার পরে বিষক্রিয়ার ফলে অনেকেরই মৃত্যু হয়। এই ধরণের বিষের ক্রিয়ার রাসায়নিক প্রকৃতি সম্বন্ধে এখনও কিছুই জানা যায় নি।

কয়েকটি অতি উপাদেয় সামুদ্রিক মাছ (যথা— Tuna, Bonito, Mackerel, চিত্র-১০, Shipjack ইত্যাদি) যদি বাসী অবস্থায় অথবা ভালভাবে সংরক্ষিত না করে খাওয়া হয়, তবে এক অদ্ভুত ধরণের বিষক্রিয়া হতে দেখা হয়। সাধারণ উষ্ণতায় ঘরের মধ্যে কিম্বা সূর্যালোকে এই মাছ কয়েক ঘন্টা পড়ে থাকলে এদের মাংস বিষাক্ত হয়ে ওঠে। কারণ ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে এসব মাছের মাংসপেশীর একটি রাসায়নিক পদার্থ পরিবর্তিত হয়ে হিষ্টামিনের মত একরকম বিষে পরিণত হয়। এই বিষক্রিয়ার লক্ষণ ভয়াবহ

অ্যালার্জিরূপে প্রকাশ পায়। অজ্ঞাত কোন কারণে কেবলমাত্র এই ধরণের Scombroid মাছের মাংসপেশীতেই এরূপ বিষোৎপাদন প্রায়ই হতে দেখা যায়।

মাছের বিষযন্ত্রের তেমন কোন উন্নতি হয় নি। সাধারণতঃ বিষধর মাছকে জীবন্ত অবস্থায় অসাবধানে নাড়াচাড়া না করলে মাছের বিষযন্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হবার কোন সম্ভাবনা মানুষের নেই।
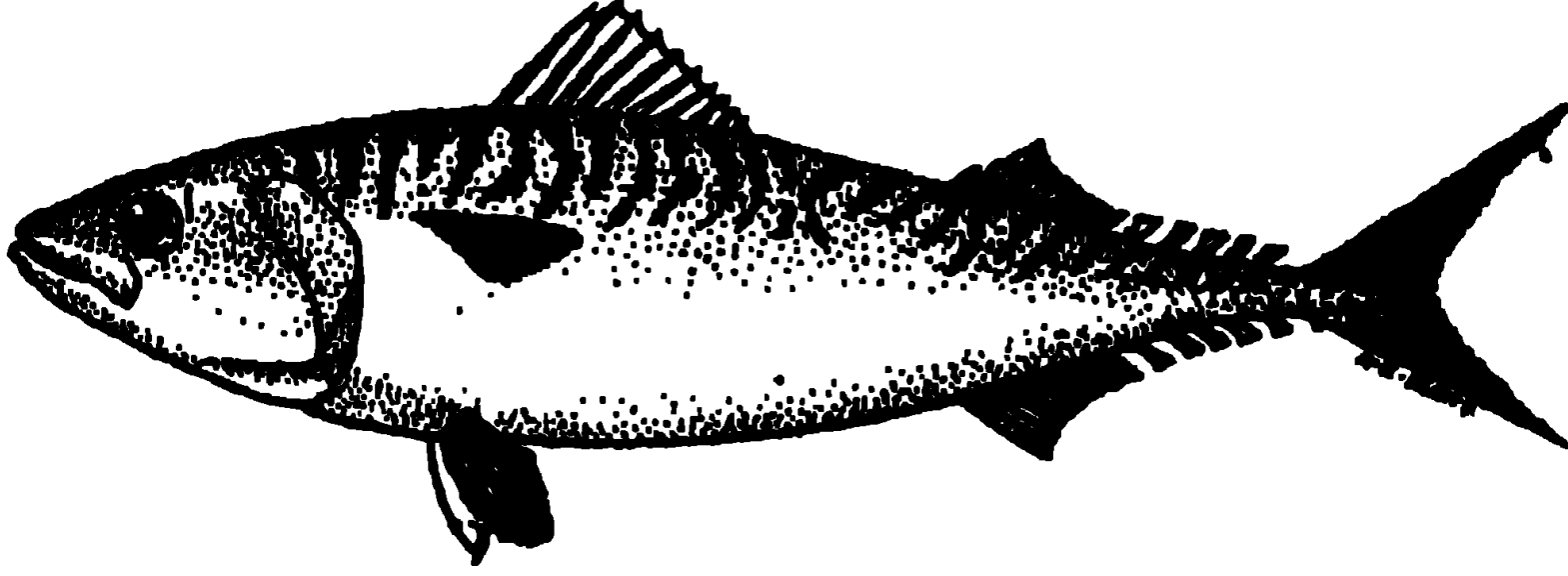
১০নং চিত্র। অতি উপাদেয় সামুদ্রিক মাছ। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়ার ফলে এই মাছই মারাত্মক বিষাক্ত হয়ে উঠে।

ভীরু স্বভাব এবং জলজ আবাসের জন্যে মাছেরা প্রায় সব সময়েই শত্রুর দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকতে সক্ষম হয় এবং এই কারণে এরা স্বভাবতঃই বহিঃশত্রুর থেকে নিরাপদ। মনে হয় এই কারণেই বিষাক্ত সাপের বিষযন্ত্রের মত বিষাক্ত

প্রকৃতিতে জীবনসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে মাছের বিষযন্ত্র এবং তাদের শরীরের বিষাক্ত পদার্থ স্বাভাবিক শত্রুদের নিবৃত্ত অথবা ধ্বংস করে সম্ভবতঃ মাছের জীবনধারণ এবং আত্মরক্ষায় খুবই সহায়তা করে থাকে।

ধবল বা শ্বেতি

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

একই রোগের বিভিন্ন নাম—কেউ বলেন ধবল, কেউ বলে থাকেন শ্বেতি। চিকিৎসাশাস্ত্রে এর নাম ভিটিলিগো। এই নামটা আমাদের তেমন পরিচিত নয়—এর আটপৌরে নাম লিউকোডারমিয়ার সঙ্গেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী। অনেকের মুখে শুনে থাকবেন ধবল কথাটা বলবার সঙ্গে কুষ্ঠ শব্দটিও জুড়ে দেন, তার ফলে পুরা নাম হয় ধবল কুষ্ঠ। সাধারণের বিশ্বাস অনেকটা ঐ ধরণের। যাঁরা অতটা গোঁড়া নন, তাঁরা মনে করেন—গায়ের চামড়ার রং সাদা হয়ে যাওয়া এক ধরণের ছোঁয়াচে চর্মরোগ। এখানে গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, রোগটার সঙ্গে কুষ্ঠ রোগের তিলমাত্র সম্পর্ক নেই, আর চর্মরোগ হলেও ছোঁয়াচে নয় বলেই বিশেষজ্ঞদের ধারণা। তবে কয়েকটি বিশেষ রোগের প্রভাবে চামড়ার বাদামী রং যদি উঠে যায়, তাহলে সেই সাদা অংশ ছুঁলে রোগ হবে কিনা—তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে। যেমন ধরুন—সিফিলিস রোগ। এই রোগ হলে মেয়েদের ঘাড়ের চামড়া সাদা হয়ে যায়, এরূপ দেখা গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এদের ঘাড়ের ঐ সাদা অংশে হাত লাগালে সুস্থ লোকের ঘাড়ে ঐ রোগ সংক্রামিত হবে কি না? এর উত্তরে

বলবো যে, কেবলমাত্র স্পর্শ করলে কোন ক্ষতি নেই, তবে কোন মেয়ে যদি রোগিণীর বিশেষ সংস্পর্শে এসে রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে তারও গলদেশ বা ঘাড়ের চামড়ার রং পাল্টে যায়।

ধবল বা শ্বেতি রোগ কেমন, তা কাউকে বলে বোঝাতে হবে না। কলকাতার রাস্তাঘাটে হামেশা শ্বেতগাত্র মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক কালে এই রোগের আক্রমণ বেড়ে গেছে বলে অনেকে অনুমান করেন। যাঁর এই রোগ হয় তিনি খুবই মুসড়ে পড়েন—অবশ্য তার কারণও যে নেই, তা নয়—রোগটি একবার হলে আর অঙ্গ ছাড়তে চায় না। একটু জায়গা নিয়ে তার ব্যূহ রচনা সুরু হয়, শেষ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ অধিকার করে বসে। চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বত্র যদি সাদা হয়ে যায়, তাহলে একরকম চলে, কিন্তু মাঝে মাঝে কালো বা সাদা অংশ দ্বীপের মত থেকে মনোবেদনার কারণ ঘটায়। একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যায়, ধবল রোগযুক্ত লোকেরা সর্বদাই মানুষের সমাবেশে সঙ্কুচিত হয়ে থাকেন। এর কারণ এও বটে যে, শিক্ষিত বা আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও এদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন।

ধবল রোগ জন্ম থেকে নিয়ে অনেকে আসে, আবার অনেকের পরে কোন কারণে হয়ে থাকে। এই কারণটি যে কি, তা আজ পর্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায় নি। এজন্যে চিকিৎসকদের উদ্বেগ রোগীদের চেয়ে বেশী। গায়ের কোন অংশে ঘা হলে বা ছড়ে গেলে সেই আহত স্থান থেকে এই রোগের উদ্ভব হয় বলে অনেকে মনে করেন; কিন্তু এই ধারণা সত্য নয়। যে জায়গাটা সাদা হয়, তার চারপাশের চামড়া স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী গাঢ় রঙের হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই রোগ উপসর্গ-বিহীনভাবে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। খুব অল্প ক্ষেত্রেই রোগ অবর্ধিত অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকে।

চামড়ার রং বাদামী বা কালো কেন, তা নিয়ে অনেকের কৌতূহল থাকতে পারে এবং ধবল রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়ে ঐ কথাটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। চামড়ার রঙের জন্যে দায়ী এক বিশেষ ধরণের কণিকা—তার নাম মেলানিন। শুধু গায়ের চামড়ায় নয়—চুল, চোখের মধ্যেকার করয়েড স্তরে, মস্তিষ্কের সাবষ্ট্যানসিয়া নায়েগ্রা প্রভৃতির মধ্যে মেলানিন কণিকা প্রচুর পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। সূর্যের আলোকের মধ্যে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বা অতিবেগুনী আলো এবং মহাজাগতিক রশ্মি (কিছু পরিমাণে) ও কয়েক ধরণের তেজস্ক্রিয় রশ্মির হাত থেকে দেহত্বক, চুল. চোখকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছে মেলানিন কণিকা। সূর্যের তপ্ত রশ্মির মধ্যে যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের গাত্রচর্ম গাঢ় বাদামী হয়। এর কারণ হচ্ছে মেলানিন কণিকার অত্যধিক বৃদ্ধি। বিশেষভাবে অতিবেগুনী রশ্মির হাত থেকে দেহকে বাঁচাবার জন্যে মেলানিন কণিকার প্রস্তুতকার্য হয় তীব্রতর। চামড়া কাল্‌চে হয় বলে আমরা বলে থাকি রোদে-পোড়া। চোখের করয়েড স্তরে মেলানিন কণিকার প্রাচুর্য থাকবার ফলে চোখের ভিতরের অংশ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পরিণত হয়। চোখের কর্মশক্তি অব্যাহত রাখবার জন্যে এই ধরণের অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষের প্রয়োজন। মস্তিষ্কের যে বিশেষ অংশে মেলানিনের অস্তিত্ব টের পাওয়া গেছে,—তার কাজ কি, তা সঠিকভাবে জানা যায় নি। এবারে কথা উঠবে এই কণিকার উৎপত্তি হলো কোথা থেকে? এ-সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। আমরা এখানে কয়েক জনের মতামত নিয়ে আলোচনা করবো।

বিগত ১৯৫১ সালে বার্গ চর্মে কণিকার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে—মেলানিন কণিকার পিতামহ হচ্ছে টাইরোসিন। এটি এক ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড। টাইরোসিন কেবল মাত্র মেলানিন প্রস্তুতিকরণেই সাহায্য করে না, কিড্‌নীর

উপরে টুপীর মত লেপ্টে থাকা অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির মেডালা অংশ থেকে অ্যাড্রিন্যালিনও তৈরী করে। এছাড়া টাইরোসিন থাইরক্সিন এবং ডাই-হাইড্রক্সি-ফেনিল-অ্যালানিন নামে এক জটিল গঠনের অ্যামিনো অ্যাসিডঘটিত পদার্থ সৃষ্টি করে। শেষোক্ত বস্তুটিকে সংক্ষেপে বলা হয় ডোপা (Dopa)। ডোপা টাইরোসিনেজ নামে এক প্রকার অনুঘটকের সহায়তায় মেলানিন কণিকা ও নর-অ্যাড্রিন্যালিন এবং শেষেরটি থেকে অ্যাড্রিন্যালিনে পরিণত হয়।

বার্ণের অনেক আগে ১৯২৬ সালে রেপার মেলানিনের উৎপত্তি সম্বন্ধে তথ্য জানিয়েছিলেন। তিনি জানান, টাইরোসিন থেকে মেলানিন তৈরী হয় একথা সত্য, কিন্তু তার ধাপ তিনটি। প্রথমে টাইরোসিন অক্সিজেনের দহনে রক্তবর্ণ কণিকার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঐ রক্তিম কণিকা তার রং হারিয়ে ফেলে। তৃতীয় স্তরে বর্ণশূন্য কণিকা অক্সিজেনের দহনক্রিয়ার প্রভাবে পরিণত হয় মেলানিন কণিকায়।

এর এক বছর পরে ১৯২৭ সালে ব্লচ এক পরীক্ষাকার্যের আয়োজন করেন। খানিকটা কোঁচকানো চামড়া (আগে বরফের মধ্যে বা ফর্ম্যালিনে রাখা হয়) ডোপার এক বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন দ্রবণে (pH 7·4) ডুবিয়ে দেওয়া হলো। দেখা গেল যে, ধবলযুক্ত অংশে মেলানিন কণিকা জাগে নি, অথচ অন্যভাগে প্রচুর পরিমাণে কণিকা সঞ্চিত হয়েছে। ডাঃ ব্লচ মনে করতেন যে, ডোপা থেকে মেলানিন তৈরী হয় ডোপা-অক্সিডেজ নামে এক ধরণের জৈব অনুঘটকের সাহায্যে।

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে একটা কথা জানা গেল যে, দেহচর্মে যদি সালফাড্রিল (—SH) বিভাগের আধিক্য থাকে, তাহলে মেলানিন প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত জন্মে। তাহলে একথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে—যদি কোন প্রকারে উল্লিখিত গোষ্ঠীর পরিমাণ কমানো যায়, তবে মেলানিন কণিকার জন্মহার দ্রুত হয়। যে কথা এখানে বলা হলো, তার একটা কারণের হদিস পাওয়া গেছে। পণ্ডিতেরা বলেন, মেলানিনের সৃষ্টিকর্তা টাইরোসিন জিনিষটাই এন্‌জাইম জাতীয় বা অনুঘটক শ্রেণীর। এর মধ্যে তামার অংশ আছে, আর সালফাড্রিল (গন্ধক-ঘটিত দ্রব্য) গোষ্ঠীর কোন দ্রব্য তামার সঙ্গে মিশে যে নতুন রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তা টাইরোসিনের মেলানিন প্রস্তুতকার্যে বাধা সৃষ্টি করে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ভেষজের নাম করা প্রয়োজন, যেগুলি কণিকা সৃষ্টিতে বাধা আরোপ করে। সেগুলি হচ্ছে—

(১) ডাইমারক্যাপটোপ্রোপানল অথবা BAL
(২) থায়োইউরিয়া
(৩) থায়োইউরাসিল

এরা সবই গন্ধকঘটিত জৈব পদার্থ। এছাড়া হাইড্রোকুইনোন গোষ্ঠীর দ্রব্যও চামড়ার রং তুলে সাদা করে।

বিশেষতঃ রবার কারখানায় কর্মীদের চামড়ার স্বাভাবিক রং অতি শীঘ্রই উঠে যায়। কারণ এখানে সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হয় মনোবেঞ্জাইল ইথার অব হাইড্রোকুইনোন।

এছাড়া খাদ্যে কতকগুলি ভিটামিনের অভাব ঘটলে দেহত্বকের রঙের হেরফের ঘটে। নিকো-টিনিক অ্যাসিডের অভাবজনিত পেলাগ্রা রোগে আক্রান্ত কোন রোগীর দেহের যে অংশে বেশী সূর্যের আলো পড়ে, সেখানে মেলানিন কণিকার আধিক্য ঘটে থাকে।

থাইরক্সিন এবং ইষ্ট্রোজেন হর্মোনও চর্ম-কণিকা প্রস্তুতিকরণে সাহায্য করে বলে জানা গেছে। অ্যাণ্ড্রোজেন (পুং হর্মোন) পুরুষের চামড়াতে মেলানিন কণিকা সৃষ্টির কাজে অন্যতম সহায়ক। কণিকা তৈরীর কাজে অ্যাড্রিন্যাল হর্মোনের ভূমিকা ঠিক প্রত্যক্ষ নয়। পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত মেলানোফোর হর্মোন অ্যাড্রি-ন্যাল হর্মোনের প্রভাবে সক্রিয় হয়। অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির কর্মক্ষমতা হ্রাস পেলে A. C. T. H.

(Adreno-corticotropic Hormone) দিয়ে চিকিৎসা চালানো হয়। এখন লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, চামড়ার রং ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে। এর মানে আর কিছুই নয়—বিজ্ঞানীরা মনে করেন, A. C. T. H-এর মধ্যে মেলানোফোর হর্মোন থাকে। যেহেতু মেলানিন এবং অ্যাড্রিন্যালিন উভয়েই ডোপা থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির নিষ্ক্রিয়তায় অ্যাড্রিন্যালিন কম পরিমাণে প্রস্তুত হয়। তার জন্যে অনেক পরিমাণ ডোপা অক্সিডাইজ্‌ড্‌ হয়ে মেলানিন তৈরি করে।

১৯৫৪ সালে হুইট্‌লক্‌ গবেষণার ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, A. C. T. H-এর সাহায্যে সালফাড্রিল র‍্যাডিক্যালকে (—SH) নিষ্ক্রিয় করে ফেলতে পারলে মেলানিন কণিকা তাড়াতাড়ি উৎপন্ন হয়।

যৌবন সমাগম এবং ঋতুর অবলুপ্তিকালে (Menopause) এই রোগের প্রাবল্য দেখা যায়। মেয়েরা অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হন। সাদা চামড়ার চেয়ে কালো চামড়ার লোকেরাই অধিক সংখ্যায় এই বিকৃতির কবলে পড়েন। ধবল রোগের কারণ জানা যায় নি। তবে দেখা গেছে যে, কোন 'শক্‌'-এর পরে এই রোগের সূত্রপাত হয়েছে। তবে সব ক্ষেত্রেই অবশ্য একথা প্রযোজ্য নয়।

নানা রোগের সঙ্গে এই বিকৃতি আরম্ভ হতে দেখা গেছে। ঘড়ির সঙ্গে নাইলনের ব্যাণ্ড যাঁরা ব্যবহার করেন, তাঁদের অনেকের ঠিক ঐ অংশটুকুতে ধবল সৃষ্টি হতে দেখা গেছে।

নানা রকম চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, তবে কোনটাতেই ঠিক সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় নি এ-পর্যন্ত। স্বর্ণঘটিত দ্রব্য ইনজেক্‌শন করে বা বার্গামটের তেল সাদা জায়গায় বুলিয়ে কণিকা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা অনেক দিন ধরেই চালু ছিল।

কপার সালফেট বা তুঁতে এবং হাইপোফস্‌ফাইটের সিরাপের সাহায্যে সর্বাঙ্গে শ্বেতি রোগগ্রস্ত এক মহিলাকে বেশ ভাল করা সম্ভব হয়েছে। আলট্রাভায়োলেট আলোর সাহায্যে মেলানিন কণিকা তৈরীর কাজে কিছু সুফল পাওয়া গেছে।

১৯৫৬ সালে কলকাতা ট্রপিক্যাল স্কুল হাসপাতালের ডাঃ ব্যানার্জী ও ডাঃ চক্রবর্তী বৈচি বীজের তেলের সাহায্যে চিকিৎসা করে ধবল রোগীদের শতকরা প্রায় পঁচাত্তর জনকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন। এই তেলের ব্যবহার মুখের চামড়ার ধবল বা শ্বেতি নিরাময়ে কার্যকরী হলেও শরীরের অন্যান্য অঙ্গে তেমন সুফল প্রদান করে না। প্রাচীন কালে মিশরে এই রোগের এক ধরণের ওষুধ ছিল। Amni Majus এবং El-Mofty ফল থেকে তৈরী এই ওষুধ কার্যকরী বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৪৮ সালে ফাহমি এবং সাডি অ্যাম্মোইডিন, অ্যাম্মিডিন এবং মাজুডিন নামে তিনটি দ্রব্য আবিষ্কার করেন। অ্যাম্মোইডিন এবং অ্যাম্মিডিনের টিংচার কম্পাউণ্ড সাদা জায়গায় প্রলেপ দিয়ে সূর্যালোকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এতে কিছু সুফল যে পাওয়া যায় নি, তা বলা যায় না।

সঞ্চয়ন

কুমেরু অঞ্চলের রহস্য

কুমেরুর আকর্ষণ মানুষ বহুকাল ধরে উপলব্ধি করে আসছে—কিন্তু এই আকর্ষণ তার তুষারাবৃত রূপের জন্যে নয়, অনুদঘাটিত রহস্যের জন্যে। কুমেরু অঞ্চলে যে সব বৃটিশ ঘাঁটি আছে, সেগুলি এখন বিশুদ্ধ গবেষণার কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। এই গবেষণার ফলাফল হয়তো একদিন সাহায্য করবে এই স্বল্পজ্ঞাত মহাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে। বহুকাল আগেই কুমেরুতে সার্ভের কাজ সুরু হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার সহায়তা করা। এই অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে প্রধান প্রধান আবিষ্কারের কৃতিত্ব বৃটেনের।

১৬৭৫ সালে অ্যান্টনি ডি লা রক-এর অধীনে পরিচালিত বৃটিশ অভিযাত্রীদল আবিষ্কার করেন সাউথ জর্জিয়া এবং তার সার্ভের কাজ প্রথম সম্পাদন করেন স্বনামখ্যাত ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক। ১৭৭৫ সালে ক্যাপ্টেন কুক আবিষ্কার করেন সাউথ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ এবং ১৮১৯ সালে উইলিয়াম স্মিথ তাঁর জাহাজ নিয়ে যান সাউথ শেটল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ ছাড়িয়ে আরও কিছু দূরে। পরবর্তী বছরে এডওয়ার্ড ব্রান্সফিল্ড প্রথম নক্সা প্রস্তুত করেন কুমেরুর মূল ভূখণ্ডের একটা বিরাট অংশের। তার পর ১৮২১ সালে জর্জ পাওয়েল আবিষ্কার করেন সাউথ অর্কনি দ্বীপপুঞ্জ।

এই শতকে বিভিন্ন জাতির অভিযাত্রীদের স্থলপথে দক্ষিণমেরু অতিক্রমের চেষ্টা করিতে দেখা গেছে। নরউইজিয়ান আমুণ্ডসেন এই চেষ্টা করেন ১৯১১ সালে, বৃটেনের ক্যাপ্টেন স্কট করেন ১৯১২ সালে, বৃটেনের সার ভিভিয়ান ফুক্স ও নিউজিল্যাণ্ডের সার এডমণ্ড হিলারি করেন ১৯৫৮ সালে, রুশরা করেন ১৯৫৯ সালে।

বৃটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভের ডিরেক্টর হলেন ৫৫ বছর বয়স্ক সার ভিভিয়ান ফুক্স, যিনি ১৯৫৬-১৯৫৮ সালে কমনওয়েলথ কুমেরু অতিক্রম অভিযানে নেতৃত্ব করবার জন্যে বিভিন্ন জাতীর কাছ থেকে বহুরকমের সম্মান লাভ করেছেন।

তাঁর পরিচালনাধীনে প্রায় ১০০ বিজ্ঞানী, কারিগর এবং চিকিৎসক কুমেরুর সব রকম চ্যালেঞ্জ তুচ্ছ করে বিশুদ্ধ গবেষণার সমস্যাবলী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তাঁরা আরও চেষ্টা করেছেন, মানুষের শরীরে এই ধরণের কঠিন অবস্থায় কি রকমের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

পরবর্তী গ্রীষ্মে একটা বড় কাজ হবে গ্র্যাহাম ল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত চার্চিল উপদ্বীপে বিমানযোগে একটি সার্ভে পার্টি পাঠানো। অক্টোবর মাসে সার্ভের একটি ছোট নৌবহর—এই নৌবহরে আছে তিনটি জাহাজ—পুনরায় যাত্রা করবে জিনিষ-পত্র এবং রিলিফ ষ্টাফ নিয়ে দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে। এই তিনটি জাহাজের মধ্যে একটিকে পথ করে অগ্রসর হতে হবে ওডেল সমুদ্রে ১০০ মাইলব্যাপী ভাসমান বরফের মধ্য দিয়ে।

রাজকীয় গবেষণা জাহাজ জন বিস্কো এই জাহাজগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এটির অধিনায়কত্ব করেন উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাপ্টেন উইলিয়াম জনস্টন। যাঁর নামে এই জাহাজটির নামকরণ হয়েছে, সেই বৃটিশ অভিযাত্রী ১৮৩০-'৩২ সালের প্রথম যুগে কুমেরু পরিক্রমা করে যান। ১৮৩২ সালে যে এডেলেইড দ্বীপের তিনি নামকরণ করেন, সেই দ্বীপের উত্তরে অবস্থিত বিস্কো দ্বীপপুঞ্জ আজ

তাঁর স্মৃতি বহন করছে। গ্র্যাহাম ল্যাণ্ডের নামও বিস্মৃত দেওয়া।

দ্বিতীয় জাহাজ হলো—শ্যাকলটন। এটি সুইডেনে ১৯৫৪ সালে নির্মিত হয়। প্রথমে বরফের মধ্যে কাজ করবার জন্যে নির্মিত হলেও পরে এর যথেষ্ট সংস্কার করা হয়, কঠিন কুমেরু সমুদ্রে কাজ করবার উপযোগী করে তোলবার জন্যে। তার নামকরণ হয় অপর এক বিখ্যাত বৃটিশ অভিযাত্রী সার আর্নেস্ট শ্যাকলটনের নামানুসারে। ইনি ১৯২২ সালে কুমেরুতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তৃতীয় জাহাজটি হলো কিস্টাডান—১,২৩৯ টনের। এটি এই বছর পরে কোন এক সময়ে সাদাম্পটন থেকে কুমেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করবে। সার্ভে কর্তৃপক্ষ এই জাহাজটি ডেনমার্ক থেকে গ্রহণ করেছেন তিন বছরের জন্যে। আরও একটি জাহাজ, নাম প্রোটেক্টর, এই সঙ্গে এদের কাজকর্মে সাহায্য করবে। এর কাজ হবে প্রধানতঃ পেট্রোলিং বা পর্যবেক্ষণ। এখন এই জাহাজটিকে পোর্টস্মাউথে আধুনিক সাজসরঞ্জামে সজ্জিত করা হচ্ছে।

সার্ভে বিজ্ঞানীরা নানা ধরণের কাজকর্মের সঙ্গে সমুদ্রের তলদেশ থেকে নানাবিধ প্রাণী উদ্ধার করে সামুদ্রিক জীবনও পরীক্ষা করে দেখবেন। সিগরিন দ্বীপ থেকে সংগৃহীত সামুদ্রিক প্রাণীর নির্বাচিত নমুনা এখন পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে, বৃটেনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের কুইন মেরি কলেজের বায়োলজিক্যাল লেবরেটরিতে।

সার্ভে বিজ্ঞানীদের অন্যান্য কাজের মধ্যে আছে প্রায় অজ্ঞাত টোটান পর্বতমালায় অভিযান পরিচালনা। এই পর্বতমালাটি কয়েক বছর পূর্বে বিমানে সার্ভের কাজ পরিচালনার সময় আবিষ্কৃত হয়। তাছাড়া আছে স্থানিক ও ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণের কাজ, তরঙ্গ-গতির উপর সামুদ্রিক তুষারের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা এবং সীল মৎস্যের সংখ্যা নির্ণয় সহ সাধারণভাবে জীববিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস, কুমেরু সমুদ্রে এক ধরণের সীল আছে কম করেও ৫,০০০,০০০।

সার ভিভিয়ান ফুক্স এই দুরধিগম্য অঞ্চলের আকর্ষণের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—অনাবিষ্কৃত বিশ্বের এই অংশ মানুষকে বহুকাল ধরে হাতছানি দিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ তার রহস্য উদ্ঘাটনে সে ভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে নি, তার অক্ষমতার জন্যে। কুমেরু অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে হলে চাই সঙ্কল্প এবং সেই সঙ্গে বিচারবোধ।

রোগের চিকিৎসায় মহাকাশ-বিজ্ঞান

আমেরিকার মহাকাশ-সন্ধান গবেষণায় ভেষজ-বিজ্ঞানের অশেষ উপকার হয়েছে নানা দিক থেকে। মার্কিন মহাকাশচারী যতবারই অসীম, অজ্ঞাত মহাকাশের পথে পাড়ি দিয়েছেন, ততবারই এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে কিছু-না-কিছু সাহায্য হয়েছে।

প্রোজেক্ট মার্কারী নামে মনুষ্য-চালিত মহাকাশযান পরিকল্পনা মাত্র কয়েক বছর চালু হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে চিকিৎসাশাস্ত্রে এর অবদান উল্লেখযোগ্য রূপ নিয়েছে।

মহাশূন্যে মহাকাশচারীদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্তের চাপ পরিমাপ করবার জন্যে যে অতিক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে, তা এখন হাসপাতালসমূহ ও চিকিৎসদের কাজে লাগছে। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসকেরা ঐ সকল পরীক্ষা আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে করতে সক্ষম হয়েছেন, যা ইতিপূর্বে সম্ভব ছিল না।

যে সব অতিক্ষুদ্র সংবেদনশীল যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেগুলি এত নিখুঁত যে, হৃৎপিণ্ডের

গোলযোগ সংক্রান্ত কোন সংবাদ বেতার বা টেলিফোনযোগে অপর কোন মহাদেশের ডাক্তারকে জানানো যেতে পারে এবং এভাবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীকে দিয়ে এর বিশ্লেষণ করিয়ে নেওয়া যায়। বার্তাবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ টেলস্টার বেতারযোগে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম পাঠিয়েছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে মহাকাশ ভেষজ-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্যে একটি অতিক্ষুদ্র প্রেরকযন্ত্র ও গ্রাহকযন্ত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। বর্তমানে চিকিৎসকেরা তাদের মোটর গাড়ী বা বাসভবন থেকে হাসপাতাল, রোগী বা তাঁদের অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারেন এই যন্ত্রগুলির সাহায্যে।

হাইড্রাজাইন থেকে প্রাপ্ত একটি তরল রাসায়নিক দ্রব্য বর্তমানে যক্ষ্মা ও কোন কোন ধরণের মানসিক অসুস্থতা নিরাময়ে খুব কার্যকরী হয় বলে দেখা গেছে। এই তরল রাসায়নিক পদার্থটি মূলতঃ ক্ষেপণাস্ত্র চালনার কাজে ব্যবহার-কল্পে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

মহাকাশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত যে সকল আধুনিকতম তথ্য পাওয়া গেছে, তা সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়েছে এই গবেষণার ফলে। মূলতঃ মহাকাশচারী নির্বাচনের জন্যেই যে স্বয়ংক্রিয় এবং বিশেষভাবে পাঞ্চ করা কার্ডের ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছিল, তা এখন চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্পর্কিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থায় অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ করা হচ্ছে এবং এতে সময়ও লাগছে অনেক কম।

মহাকাশ গবেষণার ফলে আর একটি যে নতুন আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে, সেটি হলো তন্তু-নির্মিত কাচ। দাঁত সম্পর্কিত অস্ত্রোপচারের সময় এই বিশেষ ধরণের কাচ মুখের মধ্যে স্থাপন করলে শল্যচিকিৎসক ও তাঁর সহকারীদের চোখে মুখগহ্বরের স্পষ্টতর রূপ ফুটে ওঠে। এতে অস্ত্রোপচারে অনেকখানি সুবিধা হয়।

তেজস্ক্রিয়তা প্রতিরোধক ভেষজ উদ্ভাবনের কাজে অনেকখানি অগ্রগতি হয়েছে। এই ওষুধ গ্রহণ করে রোগী রঞ্জেন-রশ্মি প্রভৃতির সম্মুখীন হতে পারবে।

মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে যে উপকার হয়েছে, তাও উপেক্ষা করবার মত নয়। প্রত্যেক মহাকাশ-চারীকে যথেষ্ট কঠোরতার মধ্যে সময় কাটাতে হয় বলে পৃথিবীর মানুষ কতখানি কঠোরতা ও চাপ সহ্য করতে পারে এবং কর্মজীবনে ও পারিবারিক জীবনে তাদের উপর এর প্রভাব কতখানি, তা এখন ডাক্তারেরা আরও ভালরূপে জানতে পারছেন।

মার্কিন বিমান বহরের অধীন মহাকাশ ভেষজ-বিজ্ঞান স্কুলের ডাঃ লরেন্স ল্যাম বলেছেন যে, মহাকাচারীদের নির্বাচনের ব্যাপারে যে ধরণের চিকিৎসা-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজন হয়, মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে তার অবদান অনেকখানি।

চন্দ্রলোকে যাত্রা

একদা চন্দ্রলোকে যাত্রার অর্থ ছিল—দুর্লভকে লাভের প্রয়াস—অনায়ত্তকে লাভের বাসনা। কিন্তু সেই অলভ্যও আজ প্রায় ধরাছোঁয়ার গণ্ডীর কোঠায় পৌঁছে গেছে।

১৯৭০ সালের আগে, হয়তো বা '৬৯ সাল নাগাদ তিনটি মানুষ চাঁদে পৌঁছে যাবে; অর্থাৎ এতে হয়তো মানুষের অন্যতম বাঞ্ছিত স্বপ্ন রূপায়িত হবে। কিন্তু মানুষের চাঁদে পৌঁছানোটা এত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেন? কাজ সফল হবার পথে সমস্যা ও বাধা-বিপত্তি কি কি? এসব

প্রশ্নের জবাব মিলবে মার্কিন 'অ্যাপলো প্রকল্পে'।

অবশ্য অ্যাপলো মহাকাশযানটি এখনও পূর্ণাঙ্গ হয় নি। এই যান তিনটি মানুষকে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী দুই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল শূন্যপথে বয়ে নিয়ে যাবে। চাঁদের কক্ষপথে চালিয়ে নেবে এর চালক, আর অন্য দুই জন মহাকাশচারী চাঁদের পিঠে নেমে পড়বার জন্যে যান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। এভাবে চাঁদে অবতরণ ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন অ্যাপলো প্রকল্পের লক্ষ্য। 'আত্মানাং বিদ্ধি'—নিজেকে জান, মানুষের বিজ্ঞতা ও বোধির চরমোৎকর্ষ এই নীতিবাক্যে নিহিত। বহু শতক আগে এই উক্তি করা হয়েছিল। তার বহু পরে অ্যাপলো প্রকল্পের জন্ম। মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশবিদ্যা পরিষদের কর্মসচিব ডাঃ এডোয়ার্ড সি. ওয়েলচ্ আমেরিকার চন্দ্রাভিমুখী মানুষবাহিত মহাকাশ-ভ্রমণ সম্পর্কে বলেছেন—

জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখার কথা আমি জানি না, যেখানে নিজের সম্পর্কে জানা ও পড়াশুনার এত দরকার হয়। মহাকাশে বিভিন্ন চাপ ও অবস্থায় মানুষের মনের প্রতিক্রিয়া, মহাকাশের বৈরী প্রকৃতির বিরুদ্ধে রক্ষায় উপায় এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবজনিত অবস্থায় ব্যবস্থা অবলম্বন ও বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয়। এই সবই আধুনিক, আগে কদাচ আমরা এভাবে চিন্তা করি নি, কাজও করি নি। মনে হয়, চন্দ্রলোকে যাত্রার তাগিদ ও কর্মসূচী থেকে যে পরিমাণ জ্ঞান ও সুযোগ লাভের শুভক্ষণ উপস্থিত হয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। আমাদের জগতে এটা হলো এক নতুন সীমান্ত।'

চন্দ্রলোকে যাত্রায় মানুষকে তৈরী করে তুলতে ১৫০ ডিগ্রী তাপাঙ্ক থেকে ২৫০ ডিগ্রী হিমাঙ্কের নীচের পরিবেশে বেঁচে থাকা ও সুচারুরূপে কাজ চালাবার উপযোগী উপকরণ ও যন্ত্র নির্মাণের জন্যে যথেষ্ট গবেষণা চালানো হচ্ছে। পরিপূর্ণ শূন্যতায় চাঁদের বায়ুহীন অবস্থায় তাকে টিঁকে থাকতে হবে।

পৃথিবী থেকে চাঁদে, আর চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আনাগোনার দূরত্ব ৫ লক্ষ মাইলের মত। তবে মহাকাশ পাড়ি দেবার সময় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উল্কাকণার হামলা ও মহাজাগতিক রশ্মিপাতের বিপদাশঙ্কা বর্তমান। অবশ্য রেঞ্জার, রোমার ও সার্ভেয়ার জাতীয় স্বয়ংক্রিয় কৃত্রিম উপগ্রহগুলি মানুষের আগে চাঁদে পৌঁছে যাবে। চাঁদের পরিবেশ, তার গঠনপ্রণালী ও বহির্ভাগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। যদি যান্ত্রিক কৃত্রিম উপগ্রহগুলি এসব তথ্য জোগাড় করে পৃথিবীর মানুষের কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে চাঁদে পাঠানো, অথবা মহাকাশের প্রতিকূল পরিমণ্ডলে যাবতীয় বিপদের মুখে ঠেলে দেবার প্রয়োজনটা কোন্ খানে ?

ডাঃ ওয়েলচ্ কিন্তু এসবের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

'মহাশূন্যে অসংখ্য বিষয় পর্যবেক্ষণের আছে। এগুলি শুধু মানুষের পক্ষেই সম্ভব। আবার মহাকাশযানের যন্ত্র চালনায় মানুষই সাম্য বজায় রাখতে পারে। হয়তো এসবের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো—কোন্ ধরণের যন্ত্র মানুষের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে পারে—অন্ততঃপক্ষে মহাশূন্যে তার কাজে সহায়ক হতে পারে, সে বিষয় প্রত্যক্ষভাবে অবহিত হবার জন্যেই মহাকাশবিহারে মানুষকে পাঠানো দরকার।

মানুষের সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করা ছাড়াও অ্যাপেলোর তথাকথিত লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়ের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া দরকার। চন্দ্রে বিহারের উপযোগী মনুষ্য-বাহিত মহাকাশযান উৎক্ষেপণের পক্ষে অত্যাবশ্যক সব জটিল যন্ত্র এই বিষয়ের অন্তর্গত। মার্কিন জাতীয় বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার মনুষ্য-বাহিত মহাকাশ-

যাত্রা দপ্তরের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্রেনার্ড হোম্‌স্‌ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সমস্যার নিম্নোক্ত বিবরণ দিয়েছেন—'আমরা কেপ ক্যানাভেরাল থেকে রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহ সহ আনুমানিক যাট লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বস্তু উর্ধ্বাকাশে প্রেরণ করবো। এর মধ্যে শেষ পর্যায়ে ৯০ হাজার পাউণ্ডের রকেট ও উপগ্রহ ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল বেগে মহাকাশে ধাবিত হবে। তারপর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলে তিনজন মহাকাশচারী যখন পৃথিবীর বায়ুস্তর ভেদ করে ভূতলে নেমে আসবে, তখন তাদের মহাকাশযানের মোট ওজন থাকবে মাত্র ৯ হাজার পাউণ্ড। এছাড়া আর একটা খুব বড় রকমের সমস্যাও আছে; যথা—অতি দ্রুততালে রচিত সময়-সূচীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় সম্পদের সমন্বয়ের কাজে হাজার কয়েক বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিভোগী মানুষের একটি লক্ষ্য-সাধনে একযোগে কর্মতৎপরতার মহড়া।

প্রাচীন গ্রীক উপকথায় অ্যাপোলো রূপ ও বলিষ্ঠ যৌবনের দেবতা বলে খ্যাত। তিনি নাকি স্বর্গে আলো-ঝলমল চার ঘোড়ার রথ চালিয়ে থাকেন। কিন্তু চন্দ্রলোকযাত্রী তিনটি মনুষ্য-বাহিত দ্যুতিময় যে মহাকাশযানটি স্বর্গের পানে ছুটে চলবে, তার বৈশিষ্ট্যই আলাদা রকমের। অ্যাপোলো মহাকাশযানটির গড়ন স্তম্ভভিত্তিক পিরামিডের মত। এর চূড়ায় থাকবে একটি টাওয়ার এর তলায় রকেটের সঙ্কেত মহাকাশ-যাত্রীকে দেবে। এটিও নীচেকার রকেটের মত মহাকাশযান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। মহাকাশ-যানের থাকবে তিনটি অংশ। একটিতে থাকবেন মহাকাশযানের চালক, একটিতে ভূতলস্থিত সংবাদ সংগ্রাহক ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আর একটি অংশ থেকে চন্দ্র উপগ্রহে অবতরণ ও সেখান থেকে ফিরে আসবার ব্যবস্থা হবে। একটি অংশকে বলা হয় কম্যাণ্ড মডিউল। তার নীচে থাকবে লুনার এক্সকার্সন মডিউল। স্যাটার্ন-৫ রকেটের সাহায্যে এই মহাকাশযান মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হবে।

স্যাটার্ন-৫ রকেটের আছে তিনটি পর্যায়। এই অমিত শক্তিধর বুষ্টার রকেট প্রায় ৯০ লক্ষ পাউণ্ড ওজনের বস্তু তীরবেগে চালাবার শক্তি ধারণ করে। তবে প্রথম স্তর থেকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে দেবার সময় এর ৭৫ লক্ষ পাউণ্ডের বস্তু চালাবার শক্তি থাকবে। মামুলি জ্বালানীর সাহায্যে এসব বেগ সঞ্চার করা হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে অমিত শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে যে গতি উৎপন্ন হবে, তাতে স্যাটার্ন-৫ রকেটটি অ্যাপোলো মহাকাশযানকে বিদ্যুৎবেগে চাঁদের দিকে ঠেলে দেবে।

যখন মহাকাশযানটি চাঁদের নিকটবর্তী হবে, তখন এর ছয় জন মহাকাশযাত্রী যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদে নেমে পড়বে। এর পর দিন দুয়েক চাঁদে থেকে তারা আবার কম্যাণ্ড মোডিউলে করে পৃথিবীর দিকে যাত্রা সুরু করবে। তবে কি মানুষের ভূতলে সফল প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমেরিকার মনুষ্যবাহিত মহাকাশযানের চন্দ্রলোক যাত্রার কর্ম-সূচীরও ইতি ঘটবে? ডাঃ হোম্‌সের মতে কিন্তু এটা হলো সূচনা মাত্র। পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপকভাবে চাঁদে নানা তথ্যানুসন্ধানের কাজ চালানো হবে। এই কাজ শেষ হবার পর বিভিন্ন গ্রহে যাত্রার কাজ আরম্ভ হবে।

মানুষের চন্দ্রলোকে যাত্রা এই দশকের একটি বড় রকমের দুঃসাহসিক কাজ বলে গণ্য হবে। এর ফলে চাঁদ সম্পর্কে প্রচুর নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করা যাবে, পৃথিবীর গঠন সম্পর্কে নতুন তথ্য সংগ্রহেরও সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া কয়েকটি সত্যিকারের উপকারও হতে পারে। নিঃসন্দেহে ইলেকট্রনিক্সের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের আবিষ্কার হবে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস জ্ঞাপন ও সংযোগ রক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সূচিত হবে, আর মহাকাশ থেকে পৃথিবীর নীচের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ ও আবহাওয়ার উপর স্তরের অবস্থা ও গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ের কাজও সহজ হবে।

প্লাজ্‌মা

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষাল

প্রোটোপ্লাজম দিয়ে গঠিত হয় জীবকোষ। প্রোটোপ্লাজম ছাড়া জীবন্ত কোন কোষই তৈরী হওয়া সম্ভব নয়—জীবন তো নয়ই। আবার রক্তের প্লাজ্‌মাকে আমরা রক্তরস বলে থাকি। জলের মত যে তরল পদার্থে রক্তের শ্বেত কণিকা, লোহিত কণিকা ও অন্যান্য পদার্থ মিশে থাকে, তা হচ্ছে রক্তের প্লাজ্‌মা বা রক্তরস। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে আমরা যে প্লাজ্‌মা নিয়ে আলোচনা করবো, তার সঙ্গে একমাত্র নাম ছাড়া রক্তরস বা প্রোটোপ্লাজমের কোন সম্বন্ধ নেই। বস্তুতঃ এটি হচ্ছে গ্যাসীয় প্লাজ্‌মা।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে সার উইলিয়াম ক্রুক্‌স্‌ তাঁর পরীক্ষাগারে এক ধরণের কতকগুলি পরীক্ষা করেছিলেন, যা আজও প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। তিনি বায়ুশূন্য * কাঁচনলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণ করেছিলেন। পরীক্ষান্তে তিনি প্রকাশ করেন যে, বায়ুশূন্য নলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে ক্ষরণ হয়। ক্ষরণে সৃষ্ট কণিকাগুলি পারমাণবিক কণিকা এবং সেগুলি কঠিন, তরল ও বায়বীয় কণিকা অপেক্ষা পৃথক।

পদার্থের এই বিশেষ অবস্থাকে—যা কঠিন, তরল বা বায়বীয় নয়, ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ল্যাংমুর প্লাজ্‌মা নামে অভিহিত করেন। প্লাজ্‌মাকে পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়, কারণ প্লাজ্‌মা পদার্থের অন্য তিনটি অবস্থা থেকে পৃথক।

প্লাজমাকে আহিত (Charged) কণিকার সমাবেশ বলা যেতে পারে। কিন্তু শুধু আহিত হলেই হবে না। প্লাজ্‌মার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এর মধ্যে ধনাত্মক আহিত আয়ন ও ঋণাত্মক আহিত ইলেকট্রন একই পরিমাণে একত্রে নিস্তড়িৎ কণিকা সহ বর্তমান। তাছাড়া প্লাজ্‌মার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে (যা অনাহিত সাধারণ গ্যাসে পারে না), যদিও সমগ্র প্লাজ্‌মা বৈদ্যুতিকভাবে উদাসীন (Electrically neutral)।

বিভিন্ন শাখার বৈজ্ঞানিকদের কাছে প্লাজ্‌মার বিশেষত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা সচরাচর যে সব প্রতিপ্রভ আলো (Fluorescent lamp) এবং নিওন বাতি দেখে থাকি, তাদের এই বৈশিষ্ট্য-গুলি কিন্তু গ্যাসীয় প্লাজ্‌মার উপর নির্ভরশীল। সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র—এমন কি, আমাদের পৃথিবীর অনেক ঘটনাও গ্যাসীয় প্লাজ্‌মার সঙ্গে জড়িত। আমরা সবাই বজ্র-বিদ্যুৎ লক্ষ্য করেছি। এই বিদ্যুৎ যখন আকাশের এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যায়, তখন প্লাজ্‌মার উৎপত্তি হয়। অবশ্য এই প্লাজ্‌মা অল্প সময় বর্তমান থাকে। রকেট বা অন্য কোন অতি উচ্চগতিসম্পন্ন ভর যখন বেগে ধাবিত হয়, তখন প্লাজ্‌মার উৎপত্তি হয় এবং ঐ ভরকে ঘিরে থাকে। মহাকাশযানের বাইরের চারদিকের প্লাজ্‌মার আবরণ মহাকাশযান ও পৃথিবীর মধ্যে বেতারবার্তা প্রেরণ ও গ্রহণকে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ আয়নোস্ফিয়ারে প্লাজ্‌মার অস্তিত্বই পৃথিবীর দূরতম স্থানের মধ্যেও বেতার-সঙ্কেত প্রেরণ সম্ভব করে। এমন কি, প্লাজ্‌মা নিয়ে কতকগুলি বিশেষ ধরণের পরীক্ষা চালানো হয়েছে। তাতে এটুকু বোঝা গেছে যে, প্লাজ্‌মা ব্যবহার করে আমরা আমাদের যত প্রয়োজন বৈদ্যুতিক শক্তি পাব এবং তার খরচও পড়বে খুব কম।

* শূন্য বলতে আমরা এমন একটি স্থান বুঝি, যেখানে একমাত্র সামান্য পরিমাণ বায়ু ছাড়া আর কিছুই নেই। এই বাতাসের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে শূন্যের মাপ।

বৈজ্ঞানিকেরা প্লাজ্‌মা ও প্লাজ্‌মাসংক্রান্ত আলোচনার উপর খুবই গুরুত্ব আরোপ করেন, কারণ প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রকৃতির রাজ্যের অজানা অনেক নিয়ম জানতে সাহায্য করবে। প্লাজ্‌মা মানুষকে এমনসব সুবিধাও দিতে পারে, যা মানুষ কোন দিনই ভাবে নি।

অতীত ইতিহাস

মানবজন্মের প্রথম প্রভাতে মানুষ যখন প্রথম সূর্যের দিকে তাকায়, বলতে গেলে সে দিন থেকেই ইতিহাসের সুরু হয়েছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন বজ্র-বিদ্যুৎ থেকে আধান পাওয়া সম্ভব কিনা, তা পরীক্ষা করবার জন্যে নিজের হাতে একটি বিশেষ ঘুড়ি তৈরী করে তারের সাহায্যে আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো, বজ্র-বিদ্যুতে প্রাপ্ত ক্ষরণ ও পরীক্ষাগারে প্রস্তুত ক্ষরণে একই রকমের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বস্তুতঃ তারপর থেকেই কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ক্ষরণ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে জার্মেনীর অন্তর্গত ম্যাগডেবার্গ সহরের অটো ফন্ গেরিক প্রথম গ্যাসীয় ক্ষরণ লক্ষ্য করেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ নিউটনও প্রায় বায়ুশূন্য কাচের গোলকে অল্প চাপের উদ্দীপিত ক্ষরণ লক্ষ্য করেন। ১৮০৮-১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডেভি আর্ক ক্ষরণ উৎপাদন করেন। পদার্থের এই বিশেষ অবস্থাকে মানুষ এই প্রথম তৈরী করতে সক্ষম হয়।

হাইনরিশ্ গাইস্লার জার্মেনীর অন্তর্গত বন সহরের একজন সুদক্ষ গ্লাস-ব্লোয়ার ছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি অল্প চাপের কতকগুলি ক্ষরণ নল প্রস্তুত করেন। এই নল 'গাইস্লার টিউব' নামে পরিচিত। নিম্নচাপের একটি কাচনলকে কোন গ্যাস ভর্তি করে আহিত করলেই গাইস্লার টিউব পাওয়া যাবে। বিভিন্ন গ্যাস ভর্তি করলে বিভিন্ন রঙের গাইস্লার টিউব পাওয়া সম্ভব। এই টিউব দেখতে সুন্দর বলে প্রায়ই সাজাবার জন্যে ব্যবহার করা হতো। রাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি উৎসবেও সাজাবার জন্যে এই টিউব ব্যবহৃত হয়েছিল।

আলোর জন্যে গ্যাসীয় ক্ষরণ নল প্রথম ব্যবহার করেন লণ্ডনের অধ্যাপক জে. টি. ওয়ে (১৮৬০ খৃঃ)। এই টিউবগুলিতে পারদ গ্যাসীয় অবস্থায় ভর্তি করা হতো। কিন্তু ১৯১০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পণ্য হিসাবে এই নল বাজারে বিক্রয় হয় নি।

প্রাপ্তিস্থান

গ্যাসীয় ক্ষরণ নল—আমরা জানি যে, কোন গ্যাসে ক্ষরণ হলে প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয়। গ্যাসপূর্ণ কোন নলকে বিদ্যুতের দ্বারা ক্ষরিত করলে কি কি হয়, তাই দেখা যাক।

কয়েক সেণ্টিমিটার ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট দুটি ধাতু নির্মিত ইলেকট্রোড একটি চোঙাকৃতির কাচের নলের দুদিকে সমান্তরালভাবে রাখা হলো। নলটিকে প্রথমে বায়ুশূন্য করে সামান্য পরিমাণ গ্যাস নিম্নচাপে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া গেল। দুটি ইলেকট্রোডের মধ্যে বিভব দেওয়া হলো এবং তদনুযায়ী কারেন্টের পরিবর্তন লক্ষ্য করা হলো। বিভব ও কারেন্টের মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্তমান, তা ১নং চিত্রের দ্বারা বোঝানো হয়েছে। চিত্রের ক থেকে খ পর্যন্ত স্থানকে স্বাভাবিক উদ্দীপিত স্থান বলা যেতে পারে। গ থেকে ঘ পর্যন্ত স্থানকে বলা হয় আর্ক। স্বাভাবিক উদ্দীপিত স্থানের বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যবর্তী সব স্থানেই বিভব সমান থাকে, কারেন্টের পরিবর্তন সত্ত্বেও। কিন্তু এর পর কারেন্ট বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভবও বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থা কিছুক্ষণ চলে। এই স্থানকে বলা হয় অস্বাভাবিক উদ্দীপিত স্থান। এর পরেও কারেন্ট বাড়ালে হঠাৎ একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এবং নতুন ধরণের একটি ক্ষরণের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে বিভব পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হয়। এই স্থানকেই (গ-ঘ

চিহ্নিত স্থান) বলা হয় আর্ক। কারেন্টের পরিমাণ কত হলে যে এই হঠাৎ পরিবর্তনটি সংঘটিত হবে, তা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। আর্কের স্থানে বিভব-কারেন্টের বৈশিষ্ট্য নিম্নমুখী, অর্থাৎ এখানে কারেন্ট বাড়ালে বিভব কমে।

ক্ষরণ-নলে যে প্লাজ্‌মা সৃষ্টি হলো, তার বৈশিষ্ট্য-গুলি বিশেষভাবে নির্ভর করে গ্যাসের পার্থক্য, নলের ইলেকট্রোড দুটির ধাতু ও তাদের দূরত্ব এবং চাপ ও কারেন্টের উপর।

১নং চিত্র। প্লাজ্‌মা উৎপত্তিকারী-ক্ষরণ-নলে বিভব-কারেন্টের বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃতিতে

প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীতে আমাদের জীবন নির্ভর করে সূর্য ও সূর্যের কর্মধারার উপর। সূর্যকে যথার্থই প্লাজ্‌মীয় বলা চলে। সূর্যের যেটুকু অংশ আমরা দেখতে পাই, তাকে মোটামুটি তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। এদের নাম যথাক্রমে সূর্যের কেন্দ্র থেকে দূরত্বানুসারে—ফোটোস্ফিয়ার. ক্রোমোস্ফিয়ার এবং করোনা। এই তিনটি স্তরের প্রত্যেকটিতেই প্লাজ্‌মা আছে।

সূর্যের বিকিরণের জন্যে পৃথিবীর উপর প্রায় ১০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত একটি প্রাকৃতিক প্লাজ্‌মার আবরণ সৃষ্টি হয়েছে। একে আমরা আয়নোস্ফিয়ার বলি। ভূমণ্ডল বেষ্টনকারী যে দুটি ভ্যান এলেন বিকিরণ বলয় আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, তার জন্যেও সূর্যের বিকিরণই দায়ী এবং এরাও যে প্লাজ্‌মার দ্বারা গঠিত (অন্ততঃ আংশিক ভাবে), কৃত্রিম উপগ্রহের পরীক্ষার সাহায্যে তাও প্রমাণিত হয়েছে।

প্লাজ্‌মা যে শুধু প্রকৃতিতে এবং পরীক্ষাগারে বিদ্যুৎ ক্ষরণ করেই সৃষ্টি করা যায়, তাই নয়—প্লাজ্‌মাকে শুধু তার উপাদানগুলি একত্রিত করেও তৈরী করা সম্ভব।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

প্লাজ্‌মা যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আহিত কণিকার সমাবেশ। এখানে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কণিকাগুলি একই সঙ্গে বিচরণ করে। এই বিপরীত ধর্মী কণিকাগুলি যখন নিজেদের মধ্যে

বিচ্ছেদ ঘটাতে যায় তখন বিদ্যুৎশক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তিই উভয় শ্রেণীভুক্ত কণিকাগুলিকে একত্র থাকতে বাধ্য করে। প্লাজ্‌মা একটি বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ গ্যাস। প্লাজ্‌মার মধ্যস্থিত ইলেকট্রন, আয়ন ও গ্যাসীয় অণুগুলির তাপমাত্রা বিভিন্ন। উদ্দীপিত ক্ষরণে যেখানে প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয়, সেখানে ইলেকট্রনের তাপ আয়ন বা গ্যাস অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু আর্কের ক্ষরণে সকল উপাদান-গুলির তাপ বেশ বেশী হয় এবং নিজেদের মধ্যে তাপমাত্রার তফাৎও তেমন হয় না। ২নং চিত্রের সাহায্যে ক্ষরণের এই বৈশিষ্ট্যটি বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে ইলেকট্রনের আকৃষ্ট হয় এবং আয়নগুলিও অনুরূপ কারণেই ঋণাত্মক ইলেকট্রোডের দিকে ধাবিত হয়। গ্যাস-নল আহিত হবার পর কতকগুলি ইলেকট্রন বাড়তি শক্তির অধিকারী হয়, অর্থাৎ ইলেকট্রন-গুলি উত্তেজিত হয়। যখন কোন স্বাভাবিক ইলেক-ট্রনের একটি উত্তেজিত ইলেকট্রনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে, তখন প্রথম ইলেকট্রনটি দ্বিতীয় ইলেকট্রনের নিকট থেকে কিছু শক্তি পায় এবং উত্তেজিত হয়। ফলে এই ইলেকট্রনটি যে পরমাণুর অংশ, সেটি অধিক শক্তির অধিকারী হয়। এই বাড়তি শক্তি যদি পরমাণু থেকে না নেওয়া যায়, তবে পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এবং আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। এই
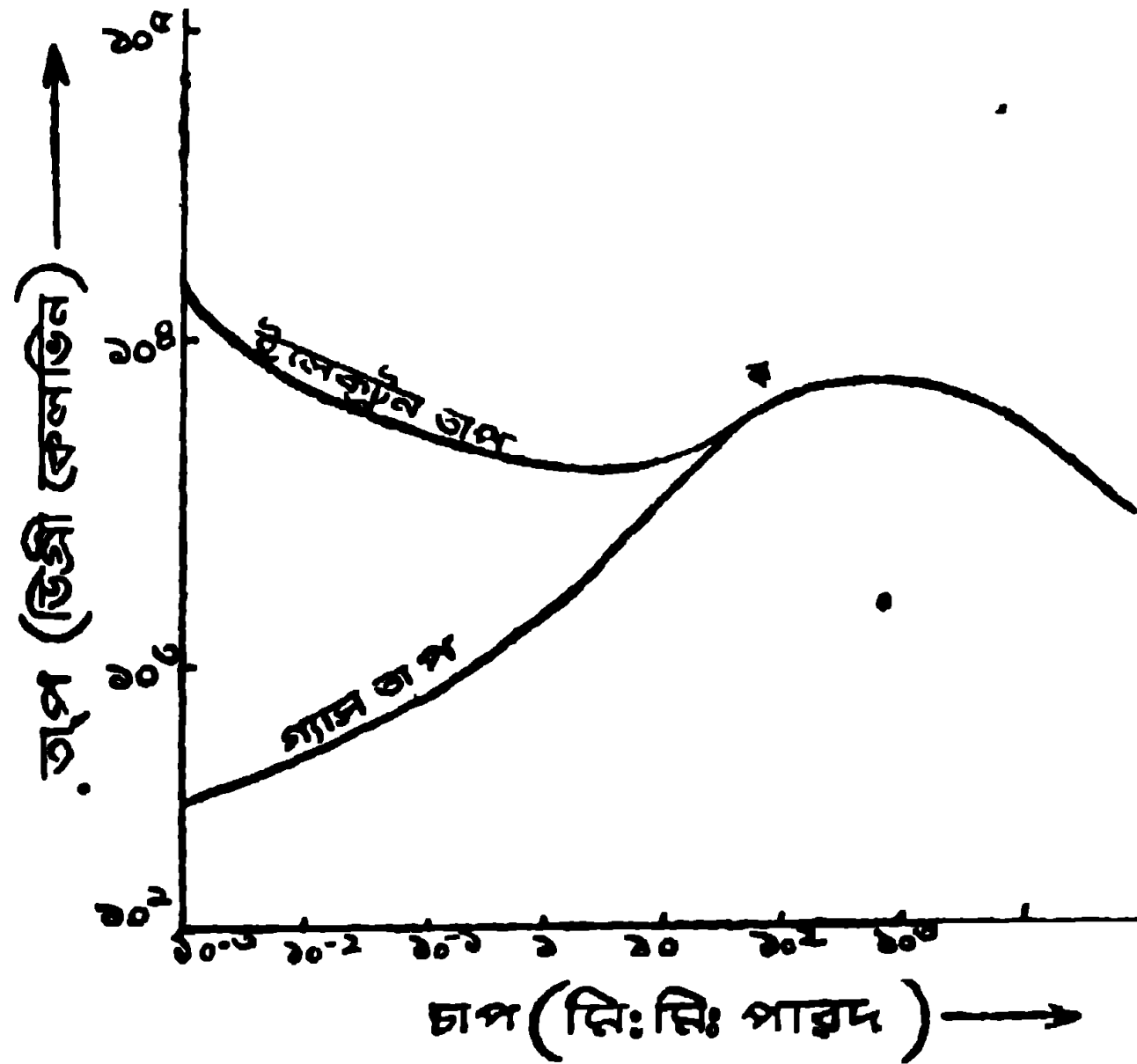
২নং চিত্র। ক্ষরণ-নলে চাপের সঙ্গে ইলেকট্রনের তাপ ও গ্যাসের তাপের সম্বন্ধ।

তাপ কমে এবং গ্যাসের তাপ বাড়ে। কোন এক চাপে ইলেকট্রনের তাপ ও গ্যাসের তাপ উভয়ই সমান সমান হয় (ক বিন্দু)। উচ্চ চাপবিশিষ্ট আর্কের ক্ষরণ এখানেই সুরু।

আমরা লক্ষ্য করেছি, প্লাজ্‌মা উৎপত্তির জন্যে কোন গ্যাসের আহিত হওয়া প্রয়োজন। গ্যাস আহিত হলে গ্যাসীয় পরমাণু, ইলেকট্রন ও আয়ন আলাদা হয়ে যায়। ঋণাত্মক আধান বর্তমান থাকায় ইলেকট্রনে ধনাত্মক ইলেকট্রোডের দিকে পরমাণুটি আবার অন্য কোন উত্তেজিত ইলেকট্রনের দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং এই প্রক্রিয়া অনবরত চলতে থাকে।

প্লাজ্‌মা-নলে ইলেকট্রনের তাপমাত্রা আয়নের অপেক্ষা অনেক বেশী। আবার ইলেকট্রন আয়নের তুলনায় অনেক হাল্কা। তাই ইলেকট্রনের গতিবেগ আয়নের চেয়ে এত বেশী যে, ইলেকট্রনের সঙ্গে তুলনায় আয়নগুলি যেন দাঁড়িয়ে আছে বলা চলে।

উল্লেখযোগ্য ব্যবহার

থার্মোনিউক্লিয়ার প্লাজ্‌মা—প্রোটন ও নিউট্রন দিয়ে গঠিত হয় নিউক্লিয়াস যা পরমাণুর অঙ্গ। এই প্রোটন ও নিউট্রন যেন একটি সূত্রে বাঁধা পড়েছে। কেউ কাউকে ছাড়তে পারে না, যদি বাইরে থেকে কোন পরিবর্তনের চেষ্টা না করা হয়। আমরা জানি যে, যদি এই পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি করে পরমাণুর গঠনকে পরিবর্তিত করা যায়, তাহলে আমরা শক্তি পাব। এই পরিবর্তন ছুটি উপায়ে করা সম্ভব। বিভাজন (Fission) ও সংযোজন (Fusion)। Fission প্রণালীতে নিউক্লিয়াসকে এমন কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, যাতে এই টুক্‌রাগুলির সমবেত ওজন Fission-এর আগের আসল নিউকিয়াসের চেয়ে কম। Fusion প্রণালী ঠিক এর বিপরীত; অর্থাৎ এখানে কতকগুলি নিউক্লিয়াস একত্রিত করে একটা নতুন নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। নতুন গঠিত নিউ-ক্লিয়াসের ওজন আগের নিউক্লিয়াসগুলির সমবেত ওজনের চেয়ে কম। ছুই প্রণালীতেই কম্‌তি ওজনটুকু শক্তিতে পরিণত হয়।

Fusion প্রণালীতে যতটা শক্তি পাওয়া যায়, Fission প্রণালীতে তার চেয়েও বেশী শক্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু প্রতি একক ভরে Fusion-এ বেশী শক্তি পাওয়া যায়।

Fusion প্রণালীর জন্যে যে সব হাল্কা আইসোটোপগুলি ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে হাইড্রোজেনের যে ছুটা আইসোটোপ আছে, তাদেরই উপযোগিতা বেশী। এরা হলো ডয়টেরিয়াম, যার মধ্যে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন রয়েছে এবং ট্রাইটিয়াম, যাতে রয়েছে একটি প্রোটন ও ছুটি নিউট্রন।

তাছাড়া ডয়টেরিয়াম প্রকৃতিতেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই Fusion-এ কাচামালের জন্যে চিন্তা করতে হয় না।

থার্মোনিউক্লিয়ার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, কি ভাবে এই Fusion-এর ফলে উদ্ভূত শক্তিকে পরিমিতভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। ছুটি নিউক্লিয়াসের মধ্যে Fusion ঘটাতে হলে তাদের অনেকক্ষণ একসঙ্গে রাখবার বন্দোবস্ত করতে হয় ও উচ্চ তাপমাত্রার সৃষ্টি করতে হয়।

এই উচ্চ তাপমাত্রায় ব্যবহৃত গ্যাস স্বভাবতঃই পুরাপুরি আয়নিত হয় অর্থাৎ প্লাজ্‌মায় পরিণত হয়। এই প্লাজ্‌মাকে একটি ক্ষুদ্র পরিসরে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় প্লাজমানিহিত আয়নের নিজস্ব চৌম্বক-শক্তির দ্বারা অথবা বাইরে থেকে চৌম্বকশক্তি প্রয়োগ করে। এই নলের আকারে রক্ষিত প্লাজ্‌মা থেকে সরাসরি বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব।

অন্যান্য কাজে ব্যবহার

রেডিও সংক্রান্ত কাজে লাগে এমন কতকগুলি টিউব আছে, যাতে প্লাজ্‌মার সৃষ্টি হয়। এগুলিকে সাধারণতঃ গ্যাস টিউব বলে। তাছাড়া রেডার ও ক্ষুদ্র বেতার-তরঙ্গ (Microwave) সম্পর্কিত অনেক কাজেই প্লাজ্‌মা বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে প্রতিপ্রভ আলো বিজলী আলোর মতই সাধারণ হয়ে উঠেছে। প্লাজ্‌মার নলে ইলেকট্রন যখন উচ্চতর শক্তি থেকে নিম্নতর শক্তিতে নেমে আসে, তখন কিছু বাড়তি শক্তি পাওয়া যায়, আলো ও তাপের মধ্য দিয়ে। এই বিকিরণ কোন প্রতিপ্রভ বস্তুকে আঘাত করলে বস্তুটি আলো দেয়। প্রতিপ্রভ নলের মধ্যে নিম্নচাপে পারদের গ্যাস রাখা হয়। আলোর রং নির্ভর করে প্রতিপ্রভ বস্তুটির উপর। বর্তমানে এই আলো নানা রঙের পাওয়া যায়। এই আলো বাড়ী, অফিস রাস্তা, খেলার মাঠ, বিজ্ঞাপন ও দোকানের শো-কেস প্রভৃতি আলোকিত করবার জন্যে ও অন্যান্য নানান কাজে ব্যবহৃত হয়। নিওন বাতির বিজ্ঞাপন আমরা বড় বড় সহরে দেখতে পাই।

এগুলি প্লাজ্‌মাপূর্ণ নল ছাড়া কিছুই নয়। তবে নিওন বাতি যে নিওন গ্যাসেরই হতে হবে, এমন কোন কথা নেই। বস্তুতঃ নলের মধ্যস্থিত গ্যাসের উপরই বাতির রং নির্ভর করে। নলে নিওন গ্যাস থাকলে আমরা লাল আলো পাই, হিলিয়াম থাকলে গোলাপী। বহু রঙের নিওন বাতি তৈরী সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন গ্যাস ব্যবহার করে। নিওন বাতি প্রধানতঃ সাজাবার জন্যে বা বিজ্ঞাপনের জন্যেই ব্যবহৃত হয়, কারণ এই বাতির আলো দেবার ক্ষমতা কম।

উপসংহার

গ্যাসীয় প্লাজ্‌মা বৈজ্ঞানিকদের বহু সমস্যার সম্মুখীন করেছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই এই বিষয়ে গভীর গবেষণা চলছে।

বর্তমানে প্লাজ্‌মা সম্বন্ধে এত উৎসাহের কারণ হচ্ছে, প্লাজমা সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের প্রকৃতির অনেক নতুন তথ্য আহরণে সাহায্য করবে, খুব কম খরচে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হবে, মহাশূন্যযানের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ রক্ষা করা সহজতর হবে, মহাশূন্যযানের জ্বালানী অল্প খরচে ও অল্প স্থানে তৈরী করা যাবে, ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ-শক্তি উৎপাদন ও পরিবর্ধন করা সম্ভব হবে।

তাছাড়া আরও নানাভাবে প্লাজ্‌মাকে কাজে লাগানো সম্ভব হবে বলে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন।

ক্ষতের নিরাময়

জয়া রায়

কোন কারণে শরীরে ক্ষত হলে তা নিরাময়ের জন্যে শরীরের মধ্যেই নানা রকমের স্বাভাবিক প্রয়াস দেখা যায়। তবে এই কাজটি ত্বরান্বিত করবার জন্যে মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই। তার মধ্যে এক্স-রে এবং অতিবেগুনী রশ্মির উপযোগিতাই সবচেয়ে বেশী। কিভাবে এই রশ্মিগুলি কাজ করে, তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না।

১৮৫৮ সালে ভারচো প্রস্তাব করেন যে, আঘাতের ফলে শরীরের কোষগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এই মতবাদ কিছুদিন বাদে ভীস্‌নার এবং ওয়েল্‌চ্‌ পুনরুত্থাপন করেন। ভীস্‌নারের মতে, আঘাতের ফলে ক্ষতস্থানে 'ক্ষত-হর্মোন' (Wound hormone) নিঃসৃত হয় এবং সুস্থ কোষগুলির বিভাজনের হার বাড়িয়ে ক্ষতস্থান পূরণের সাহায্য করে। ১৯২১ সালে ক্যারেল দেখান যে, বাইরের প্রদাহই এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী। ক্ষতস্থানগুলি সম্পূর্ণরূপে বীজাণুমুক্ত রাখলে তা সারতে অনেক দেরী হয়। কিন্তু টার্পিন তেল লাগিয়ে একটু উত্তেজিত করলে বা ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস বীজাণুর মৃদু সংক্রমণ ঘটলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ক্ষতের পূরণকার্য আরম্ভ হয়। ১৯২২-'২৪ সালে ক্ষতের হরমোন সম্পর্কে অনেক তথ্য ও প্রমাণ সংগৃহীত হয়।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক এই উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ হর্মোনের বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। শীম জাতীয় কয়েকটি গাছের জলীয় দ্রাবণ থেকে ইংলিস, বনার এবং হেগেন স্মিট এই পর্যায়ের একটি শক্তিশালী বস্তু বের করেন এবং তার নাম দেন ট্রাউমেটিক অ্যাসিড। ১৯৩০ সালে ক্যারেল আবার মত প্রকাশ করেন যে, ক্ষতস্থানেই এই হর্মোন তৈরী হয়। তবে ক্ষতস্থান থেকে তিনি এই ধরণের বস্তু পৃথক করতে সক্ষম হন নি। আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনী রশ্মি যে অনেক উদ্ভিদ ও প্রাণীকোষের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ব্রাউনিং এবং রাস ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস

জীবাণুর সাহায্যে তা ১৯১৭ সালে প্রমাণ করেন। প্রাণী-শরীরেও এই রশ্মির কোষ-বিভাজন বৃদ্ধি করবার শক্তি দেখা যায়। পরে দেখা যায় যে, রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং প্রয়োগকাল অনুসারে তার উপকার কম-বেশী হয়। ঈষ্ট-কোষের উপর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, মৃদু রশ্মির প্রয়োগে যদি কোষগুলি ধীরে ধীরে জখম হয়, তবেই তাথেকে দ্রুত নষ্ট কোষের তুলনায় ৫গুণ বেশী হর্মোন বেরিয়ে আসে। সুতরাং কোষের মৃত্যুর চেয়ে তাদের দৈহিক ক্ষতিতেই হর্মোনের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ৭ দিন বয়সের মুর্গীর বা ১৪ দিন বয়সের ইঁদুরের জ্রূণের উপর অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়ায় এই হর্মোন পাওয়া যায়। আবার ঈষ্ট-কোষের পোষক দ্রাবণকে (Culture) দ্রুত ঝাঁকুনি দিয়ে কতকটা অস্থির করলে অথবা তার ভিতর দিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস চালালে, তাপ প্রয়োগ করলে বা অ্যালকোহল দিয়ে নাড়াচাড়া করলেও এই হর্মোনগুলি বেরিয়ে আসে।

অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগের ফলে অনেক কোষ এবং তন্তুর অক্সিজেন-চাহিদা বেড়ে যায়। ইঁদুরের চর্মের কোষগুলিতে এই রকম দেখা গেছে। ঈষ্ট-কোষেও এই ব্যাপার ঘটে। রশ্মি প্রয়োগের ফলে কোষের ভিতর থেকে এই হর্মোন নিঃসৃত হয়ে অন্য সুস্থ তন্তুর কোষ-বিভাজন বাড়িয়ে দেয়। ঈষ্টের ফার্মেন্টেশন শক্তিও এই রশ্মির সাহায্যে প্রায় দ্বিগুণ বাড়ানো যায়। ঈষ্ট থেকে নিঃসৃত এই হর্মোন জল ও ৫০% অ্যালকোহলে গলে যায়, কিন্তু ঈথার বা পেট্রোলিয়ামে গলে না। ১৫ মিনিট কিছু চাপে ফোটালেও তার ক্রিয়া নষ্ট হয় না। ঈষ্ট ছাড়া অন্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের শরীর থেকেও এই ধরণের হর্মোন পাওয়া যায়।

ক্ষতের উপর রোগবীজাণুর ক্রিয়ায় যে ক্ষতি হতে পারে ও হয়ে থাকে, তা নিবারণের জন্যে সাধারণতঃ কোন না কোন জীবাণুনাশক বস্তু লাগানো হয়। এরা জীবাণু নাশ করতে পারলেও ক্ষত নিরাময়ে সব সময় সাহায্য করে না। ফিনাইল মার্কিউরিক নাইট্রেট নামক শক্তিশালী ঔষধ এই রকম ক্ষতি করে। তার বদলে রশ্মি-পীড়িত ঈষ্টের অ্যালকোহলে দ্রাবণ এই বিষয়ে কোনই ক্ষতি করে না, বরং ক্ষতপূরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। আবার ছুটি বস্তু মিশিয়ে ব্যবহার করলে উভয় রকমের সুফলই একসঙ্গে পাওয়া যায়। নানা রকম পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, জীবাণুনাশক বস্তুগুলি ক্ষতস্থানে নিঃসৃত কয়েকটি স্বাভাবিক এনজাইমের কাজ নষ্ট করে—আর এই হর্মোন ঠিক তার বিপরীত কাজ করে।

প্রাণী ও মানুষের শরীরে এই হর্মোনের উপযোগিতা প্রমাণের জন্যে অনেক পরীক্ষা হয়েছে। বার্ণস, হার্সফেল্ড ও ব্রাস কয়েকজন মানুষের আঙুলে বালির কাগজ ঘষে ক্ষত সৃষ্টি করে এই হর্মোন এবং তার সঙ্গে মিশ্রিত জীবাণুনাশক বস্তুর নিরাময়-শক্তি পরীক্ষা করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। চামড়ার স্বাভাবিক রং ধীরে ধীরে ফিরে আসে, জীবাণুর আক্রমণ বন্ধ হয় এবং নিরাময়ের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ঘা সারবার পরে গভীর বা বিশ্রী দাগও থাকে না এবং বেদনাও খুবই কম বোধ হয়। চামড়ার কোষগুলি প্রায় সর্বত্র বেশ তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। চিকিৎসার এক সপ্তাহের মধ্যেই এই সব সুফল দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন চামড়ার রং একটু গভীরতর হয় এবং কয়েক মাস পর্যন্ত থাকে। তিন বছরে ২০০ রোগীর উপর এই রকম পরীক্ষায় ওয়াল্‌স্‌ উগ্র রাসায়নিক বস্তু, আগুন বা গরম জিনিষ অথবা বৈদ্যুতিক কারেন্টেঘটিত দগ্ধক্ষতে একই রকম উপকার পান।

ঈষ্টের উপর এক্স-রে বা অতিবেগুনী রশ্মির ক্রিয়ার ফলেই এই হর্মোন নিঃসৃত হয়—একথা উল্লিখিত পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই প্রাণীদেহের ক্ষতের উপরেও এই দুই রশ্মির ক্রিয়া সুফল দিতে পারে।

প্রাণীদেহের ক্ষতের ফলে নিকটস্থ তন্তুকোষগুলিতে যে সব রাসায়নিক বস্তু নিঃসৃত হয়, তার ফলে কোষ-বিভাজনের হার বেড়ে যায়। এর ফলেই ক্ষতের নিরাময় সম্ভব হয়। এই হার স্বাভাবিকভাবে বাড়লে অন্য কোষের অসুবিধা হয় না। কিন্তু তন্তুকোষের বিভাজন অস্বাভাবিক দ্রুতহারে হওয়াই ক্যান্সার বা কর্কট রোগের বিশেষত্ব। অনেক ক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ ক্ষতের ফলে ক্ষতস্থানে এই রোগের সূচনা হতে পারে—তবে অল্পস্বল্প কাটা-ছেঁড়ার ফলে এরূপ হয় না। আগেই বলা হয়েছে যে, কোষের হঠাৎ মৃত্যুর পর কোষ থেকে হর্মোন নিঃসৃত হয় না। তবে কতকগুলি রাসায়নিকের বারবার প্রয়োগ বা উচ্চশক্তির রশ্মির ক্রিয়ায় কোষ-বিভাজন অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত হতে পারে। যখন কোষ-বিভাজন কোষের পোষক সরবরাহের সঙ্গে একতালে চলে না, তখনই এই সব উৎপাত ঘটতে পারে।

বুলক দেখিয়েছেন যে, প্রাণীদেহের বিভিন্ন কোষ-বিভাজনের হারে যথেষ্ট তারতম্য আছে। প্রধানতঃ দুই রকম উপায়ে এটা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথমতঃ, কয়েকটি হর্মোন ক্ষতস্থানে নিঃসৃত হয়ে প্রত্যক্ষভাবেই এই বিভাজন বাড়িয়ে দেয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন তন্তুতে নির্দিষ্ট প্রোটিন জাতীয় হার্মোন নির্গত হয়ে এই কাজ করে। প্রথম পর্যায়ে অ্যাড্রিন্যালিন ও নরঅ্যাড্রিন্যালিন এবং গ্লুকোকর্টিকয়ড শ্রেণীর কয়েকটি বস্তু। এরা বিভিন্ন তন্তুতে বিভিন্ন মাত্রায় বিভাজনের হার কমিয়ে দেয়। দিনের বিভিন্ন সময়ে এদের উৎপাদন বাড়ে ও কমে। অপর পক্ষে, পুরুষ এবং নারীর যৌন হর্মোন—এণ্ড্রোষ্টেরোন এবং ঈষ্ট্রোন বিভিন্ন তন্তু-কোষের বিভাজন বাড়িয়ে দেয়, (প্রধানতঃ যৌন ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশে)। তবে বিভিন্ন তন্তু-কোষ নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে নিজেরাই বিভাজনের হার বাড়াতে বা কমাতে পারে। পূর্ণবয়স্কের শরীরে কোষগুলি সাধারণ অবস্থায় নিজেদের শরীরের বিশেষ প্রোটিনগুলি সৃষ্টি করে। তবে ক্ষত বা অন্য কারণে আবশ্যক হলে কোষ-বিভাজনের জন্যে যে অপর কয়েক রকম প্রোটিনের দরকার হয়, সেগুলিও সৃষ্টি করতে পারে। বিভাজন রোধ করবার জন্যে তারা সচরাচর রোধক বস্তু নিঃসৃত করে বিভাজন বন্ধ রাখে। ক্ষতের ফলে এই রোধক বস্তুর পরিমাণ কম হয় এবং বিভাজনের হার বেড়ে যায়।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী

মূল সভাপতি ও শাখা-সভাপতিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫০তম অধিবেশন এবার দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৭ই অক্টোবর হইতে ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে চার দিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ব-বিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি অধ্যাপক ডি. এস. কোঠারী।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু ৭ই অক্টোবর সকালে অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এবারের অধিবেশন লইয়া দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন হইল। ইহার পূর্বে ১৯৪৪, ১৯৪৭ ও ১৯৫৯ সালে দিল্লীতে অধিবেশন হইয়াছিল।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের যে অধিবেশন ১৯৪৭ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে

সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু। এবারে সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন তিনি।

ডাঃ ডি. এস. কোঠারী

ডাঃ ডি. এস. কোঠারী—ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সুবর্ণ জয়ন্তী অধিবেশনের মূল সভাপতি। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পরলোকগত ডাঃ মেঘনাদ সাহার বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংল্যাণ্ডে যান এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরলোক-গত লর্ড রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণা করেন। ১৯৩৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে তাঁহাকে প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রথম বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। কোয়াণ্টাম স্ট্যাটিস্টিক্স্, প্রপার্টিজ অব ডিজেনারেট ম্যাটার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ দেশ এবং বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের সভাপতি নিযুক্ত আছেন।

অধ্যাপক সি. টি. রাজাগোপাল

অধ্যাপক সি. টি. রাজাগোপাল—গণিত শাখার সভাপতি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি উক্ত কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক কে. আনন্দ রাও-এর সংস্পর্শে আসেন এবং ইহার ফল তাঁহার পরবর্তী জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁহার পেশাগত জীবন তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত। আন্না-মালাই বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বৎসর অবস্থানের পর তিনি মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে বিশ বৎসর এবং রামানুজন গণিত প্রতিষ্ঠানে বারো বৎসর অধ্যাপনার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। মাদ্রাজ কলেজেই তিনি তাঁহার একদল ছাত্রের মাধ্যমে সংস্কৃত ও মালয়ালী ভাষায় চতুর্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর কতিপয় ভারতীয় গাণিতিক নিদর্শনের পরিচয় লাভ করেন। ১৯৫১ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁহার পুরাতন বন্ধু টি. বিজয়রাঘবনের অনুরোধে রামানুজন ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন।

ডাঃ পি. ভি. কৃষ্ণআয়ার

ডাঃ পি. ভি. কৃষ্ণআয়ার—পরিসংখ্যান শাখার সভাপতি। ১৯০৯ সালে কেরল রাজ্যের ত্রিচুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গণিতে সর্বাধিক নম্বর সহ এম. এ. পাশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থায় যোগদান করেন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৪৪ সালে ভারত সরকারের বৃত্তি লইয়া পরিসংখ্যানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যুক্তরাজ্যে গমন করেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাঃ ডি. জে. ফিনের অধীনে কাজ করিয়া ১৯৪৮ সালে গাণিতিক পরিসংখ্যানে ডি-ফিল ডিগ্রি লাভ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদে যোগ দিবার পর ১৯৫২ সালে তিনি প্রতিরক্ষা বিজ্ঞান গবেষণাগারে যোগদান করেন। পরিসংখ্যান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার ব্যাপক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান রহিয়াছে।

ডাঃ আর রামান্না

ডাঃ রাজা রামান্না—পদার্থবিদ্যা শাখার সভাপতি। ডাঃ রামান্না মহীশূরে জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হইতে স্নাতক হন এবং ১৯৪৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৯ সালে টাটা মৌলিক গবেষণা সংস্থায় যোগদান করেন এবং সেখান হইতে ১৯৫৩ সালে ট্রম্বের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার

পারমাণবিক পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান হিসাবে বদলী হন। বর্তমানে তিনি ট্রম্বের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার শাখার প্রধান এবং টাটা মৌলিক গবেষণা সংস্থার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি অপ্সরা রিয়্যাক্টরের নক্সা প্রণয়নে সহযোগিতা করেন এবং নিউক্লিয়ার রিয়্যাকশন ও নিউট্রন থার্মালাইজেশন ফেনোমেনা সম্পর্কে গবেষণা করেন। বর্তমানে তিনি ফিসন ফিজিক্স সম্পর্কে গবেষণা করিতেছেন। ১৯৫৫ এবং ১৯৫৮ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিত শান্তিপূর্ণ কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার সংক্রান্ত সম্মেলন এবং বহু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ পি. আর. জে. নাইডু

ডাঃ পি. আর. জে. নাইডু—ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজের তিরুচিরাপলীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস-সি পাশ করেন এবং ১৯৫১ সালে সুইজারল্যাণ্ডের ব্যাসেল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ১৯৪৯ সালে জার্মেনী, ১৯৫০ সালে সুইজারল্যাণ্ড, ১৯৬০ সালে কোপেনহেগেনের আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব সম্মেলন, ১৯৬০ সালে হেলসিঙ্কি ও ১৯৬২ সালে ওয়াশিংটনে খনিজ তত্ত্ব সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে তিনি রাশিয়ার বিভিন্ন অ্যাকাডেমী ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন। তিনি আন্তর্জাতিক খনিজ-তত্ত্ব পরিষদের সদস্য এবং যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ভূতত্ত্ব ও খনিজ-তত্ত্ব সমিতির ফেলো। তিনি ভারতের খনিজ-তত্ত্ব সমিতির সভাপতি।

ডাঃ এস. এম. সরকার

ডাঃ সৌরীন্দ্রমোহন সরকার—উদ্ভিদবিদ্যা শাখার সভাপতি। তিনি ১৯০৮ সালে নদীয়া জেলার পাইকপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উদ্ভিদবিদ্যায় এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পারিজা, শ্রীবাণী সেন ও ডাঃ এস. আর. বসুর অধীনে উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৩৪-'৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল কলেজ অব সায়েন্স-এ অধ্যাপক এফ. জি. গ্রেগরীর অধীনে গবেষণা করিয়া পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে উদ্ভিদবিদ্যার সহকারী লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৬-'৪৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতের জাতীয় সংস্থার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮-'৫৯ সালে ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে ব্যাপক সফর করেন এবং ধান গাছের জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। ধানগাছের জীবনতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁহার গবেষণা দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত হইয়াছে। বর্তমানে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিদ্যা বিভাগের রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক।

অধ্যাপক কে. এস. জি. দস

ডাঃ কে. এস. জি. দস—রসায়নবিদ্যা শাখার সভাপতি। প্রতিভাভাস্বর ছাত্রজীবন সমাপন করিয়া তিনি প্রথমে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি কাণপুর জাতীয় শর্করা সংস্থার পদার্থবিদ্যার রাসায়নিক এবং পরে শর্করা রসায়নের অধ্যাপক হন। ১৯৫৭ সালে ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর হিসাবে সেণ্ট্রাল কেমিক্যাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে যোগদান করেন এবং এক বৎসর পরে উহার ডিরেক্টর পদে উন্নীত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত

পদেই অধিষ্ঠিত আছেন। ফলিত ইলেক্ট্রো-কেমিষ্ট্রির বিভিন্ন বিভাগে তাঁহার বহুমুখী অবদান রহিয়াছে। তিনি গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়াল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রি, লণ্ডনের ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্স্, ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী এবং ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন।

ডাঃ বি. এস. চৌহান

ডাঃ বি এস. চৌহান—প্রাণী-বিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব শাখার সভাপতি। ১৯১৫ সালে মধ্য-প্রদেশের হোসাঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম. এস-সি পর্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯৪৪ সালে পি.-এইচ. ডি ও ১৯৫৫ সালে ডি এস-সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের কীটনাশক পরিকল্পনা এবং ইজ্জৎনগরে ভারতীয় পশু গবেষণা সংস্থার পরগাছা-তত্ত্ব বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতঃপর তিনি জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। তিনি ব্যাঙ্গালোরের ভারতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী এবং এলাহাবাদে জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর ফেলো এবং ভারতের প্রাণী-বিজ্ঞান ও কীটতত্ত্ব সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ফেলো। লণ্ডনের জুওলজিক্যাল সোসাইটিরও তিনি অনারেরী ফেলো।

ডাঃ এস. সি. শীল

ডাঃ এস. সি. শীল—চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখার সভাপতি। পাবনা জেলার (পূর্ব পাকিস্থান) শাজাদপুরে ১৯০৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৯ সালে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম বি এবং ১৯৪৯ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি (মেডিসিন) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৩৯ সালে রকফেলার বৃত্তি পাইয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডায় যান এবং বিভিন্ন লেবরেটরীতে সংক্রামণ-তত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি মার্কিন জনস্বাস্থ্য সমিতির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান সংস্থার ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৪১-'৪৩ সাল পর্যন্ত বোম্বাই হপ্‌কিন্স ইনষ্টিটিউটে প্লেগ গবেষণা অফিসাররূপে কাজ করেন। তিনি সিকিম এবং ভারতের নয়টি বিভিন্ন রাজ্যের সমাজ-উন্নয়ন প্রকল্প ব্লকের স্বাস্থ্য-সমীক্ষা কার্য পরিচালনা করেন।

ডাঃ এস. সি সেন

ডাঃ এস. সি. সেন—কৃষিবিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ১৯০৬ সালে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এস-সি এবং ডি. এস-সি উপাধি লাভ করেন। ১৯৫২ সালে কানপুরের জাতীয় শর্করা সংস্থায় অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি কৃষি রসায়ন, ভূ-বিজ্ঞান, ইক্ষু-চাষ এবং ইক্ষু-রসায়ন সম্পর্কে গবেষণা করেন এবং ১২৫টিরও অধিক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইক্ষুর পরিপকতা সম্পর্কে তাঁহার সমীক্ষাকার্য শর্করা শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হইয়াছে। ডাঃ সেন ১৯৪৭ সালে বৃটেন ও আয়ারল্যাণ্ডের রয়েল ইনষ্টিটিউট অব কেমিষ্ট্রি, ১৯৫২ সালে রাসায়নিক সংস্থা (ভারত), ১৯৫৩ সালে ভারতের শর্করা প্রযুক্তিবিদ্ সংস্থা এবং ১৯৫২ সালে বিহারের কৃষিবিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন।

ডাঃ ডি. পি. সাধু

ডাঃ ডি. পি. সাধু—জীবতত্ত্ব শাখায় সভাপতি। ১৯১৬ সালে খুলনা জেলার (পূর্ব পাকিস্থান) কপিলমুনিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৭ সালে জীবতত্ত্বে পুষ্টি সম্পর্কে গবেষণা করিয়া পি-এইচ. ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ক্যালিফোর্ণিয়া এবং

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা করেন। ১৯৪৮ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কিছুকাল কানপুরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে জীবতত্ত্ব সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অফিসাররূপে কাজ করেন। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং ১৯৫৩-১৯৬১ সাল পর্যন্ত বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি দেহের সজীব অঙ্গসমূহের মধ্যে শক্তির বিনিময়, টাইফয়েড, ভিটামিন প্রভৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করিয়াছেন।

ডাঃ পি. এইচ. প্রভু

ডাঃ পন্ধারিনাথ হরি প্রভু—মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতি। ১৯১১ সালে মহারাষ্ট্র রাজ্যের রত্নগিরি জেলায় ভেঙ্গুরলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৩০ সালে দর্শণশাস্ত্রে অনার্স সহ বি. এ. এবং ১৯৩৩ সালে এল. এল. বি. পাশ করেন এবং ১৯৩৭ সালে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৩৮-৪৩ সাল পর্যন্ত বোম্বাই খালসা কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৭ সালে সরকারী বৃত্তি পাইয়া মনোবিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৫০ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি টাটা সমাজ-বিজ্ঞান সংস্থায় রীডার এবং মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধানরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘের শিক্ষা বিজ্ঞান কৃষ্টি সংস্থার কলিকাতা কেন্দ্রে এক বৎসরকাল সিনিয়ার গবেষণা অফিসাররূপে কাজ করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬১-'৬২ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রের আরও আটটি বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

বিজ্ঞান-সংবাদ

হিমবাহের বরফ নিয়ে গবেষণা

হিমালয়ের এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহনকারী মার্কিন পর্বতারোহী দল ৪০ রকম বরফের নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এই সব বরফের মধ্যে কি পরিমাণ ট্রাইটিয়াম আছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে। সূর্যদেহে বিস্ফোরণের ফলে এই সব তেজস্ক্রিয় হাইড্রোজেন পরমাণুর কিছু অংশ পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয় কিনা, সেই সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই এই গবেষণা চালানো হবে। গবেষণা পরিচালনা করবেন ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন ও ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ উইলিয়ার্ড এফ. লিবি। ইনি একজন নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী। এভারেস্ট শৃঙ্গ থেকে বরফের নমুনা সংগ্রহের কারণ—প্রতি বছর এখানে বরফ জমা হবার পর ধূলিঝড় উৎপন্ন হয়। ফলে প্রতি বছর যে বরফের স্তর সৃষ্টি হয়, তা নির্ণয় করা যায় এবং সঠিক নমুনা সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়। সকল বারিপাতের মধ্যেই ট্রাইটিয়ামও থাকে। আবহমণ্ডলের উপরিভাগে হাইড্রোজেন অণুর উপর মহাজাগতিক রশ্মির ক্রিয়ার ফলেই ট্রাইটিয়াম উৎপন্ন হয়। অনেকে মনে করেন, সূর্যদেহে বিস্ফোরণের ফলেও ট্রাইটিয়ামের সৃষ্টি হয়। মহাশূন্যে প্রেরিত ডিস্কভারার নামক একটি উপগ্রহকে সম্প্রতি পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ঐ উপগ্রহটির দেহে প্রচুর পরিমাণ ট্রাইটিয়াম পাওয়া গেছে। এথেকেই উপরিউক্ত মতটি সমর্থিত

হয়েছে। ডাঃ লিবিকে ঐ রকমের লক্ষ লক্ষ পরমাণু থেকে ট্রাইটিয়াম মিশ্রিত একটি পরমাণু বের করতে হবে। সুতরাং তাঁর কাজের জটিলতা ও গুরুত্ব কতখানি, তা এথেকেই উপলব্ধি করা যায়।

মানুষের দেহে বিষাক্ত বস্তু

স্যানএন্টেনিয়োর টেক্সাস সাউথওয়েষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা ধূমপানকারী মানুষের দেহে বিষাক্ত পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। কিন্তু যাঁরা ধূমপান করেন না, তাঁদের দেহে ঐ পদার্থের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। ধূমপানকারীর দেহে যে বিষাক্ত পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেটি অ্যাসিটো-নাইট্রিল নামক একপ্রকার রসায়নিক পদার্থ। তামাক সেবনের ফলে এই পদার্থটি উৎপন্ন হয়।

আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণের ব্যবস্থা

কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রেরিত তথ্য ও আলোক-চিত্রাদি বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া বিভাগের ব্যবহারের উপযোগী করে সম্পাদনার জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের আবহাওয়া-দপ্তর ওয়াশিংটনের কাছা-কাছি সুট্ল্যাণ্ডে ন্যাশন্যাল ওয়েদার স্যাটেলাইট সেন্টারে নতুন একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। এখানে ৩টি বিরাটাকার কম্পিউটার এবং ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। বর্তমান বছরের শেষ নাগাদ আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে নিম্বাস পর্যায়ের প্রথম উপগ্রহটি মহাকাশে প্রেরণ করা হবে। ঐ উপগ্রহ থেকে প্রেরিত চিত্রাদি এই সব যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হবে এবং বর্তমানের তুলনায় শত গুণ দ্রুতবেগে সেই সব সম্পাদনা করা সম্ভব হবে। বর্তমানে মেঘের ছবি এবং আবহাওয়ার মানচিত্র অন্যান্য দেশে প্রেরণের জন্যে ৫ থেকে ৭ ঘণ্টা সময় লাগে, কিন্তু নতুন ব্যবস্থায় সেগুলি মাত্র দুই ঘণ্টার মধ্যেই সর্বত্র সরবরাহ করা যাবে।

রিয়্যাক্টর নির্মাণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশন জানিয়েছেন যে, কমিশনের ইডাহোস্থিত কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে অল্প খরচে বিদ্যুৎশক্তি উৎপা-দনের উদ্দেশ্যে প্রথম একপ্রকার রিয়্যাক্টর চালু করা হয়েছে। এতে যেমন ইন্ধন খরচ হয়ে থাকে, তেমনি ইন্ধন উৎপন্নও হয়ে থাকে। এজন্যে একে বলা হয় ব্রীডার রিয়্যাক্টর। মানবকল্যাণে পরমাণুশক্তি ব্যবহারের এটি এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। উল্লিখিত রিয়্যাক্টরটিতে ২৮·৭ কিলোগ্র্যাম প্লুটোনিয়াম ব্যবহৃত হয় এবং পৌণঃপুণিক পারমাণবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

খনিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তার মাত্র ০·৭ ভাগ বিভাজনযোগ্য। ঐ বিভাজন-যোগ্য ইউরেনিয়ামই পরমাণুশক্তি উৎপাদনের জন্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাকী ইউরেনিয়ামকে রিয়্যাক্টরে রেখে প্লুটোনিয়ামে পরিবর্তিত করা হয়। প্লুটোনিয়াম পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রিয়্যাক্টরে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঐ প্লুটোনিয়ামকে আরও শোধন করা হয়ে থাকে।

ইডাহো কেন্দ্রে আর একটি উন্নত ধরণের ব্রীডার রিয়্যাক্টর নির্মিত হচ্ছে। ১৯৬৩ সালে এই রিয়্যাক্টরের সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এতে প্লুটোনিয়ামই ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের এই বিবরণীতে আরও বলা হয়েছে যে, তাত্ত্বিক দিক থেকে এতে যে পরিমাণ প্লুটোনিয়াম খরচ হবে, তার তুলনায় উৎপন্ন হওয়ার কথা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী। প্রথম যে রিয়্যাক্টরটি নির্মিত হয়েছে, তাতে এর চেয়ে শতকরা ৩ অথবা ৪ ভাগ বেশী প্লুটোনিয়াম উৎপন্ন হতে পারে।

তবে ১১ বছর আগে আর এক ধরণের ব্রীডার রিয়্যাক্টর নির্মিত হয়েছিল—তাতে ব্যবহৃত হয়েছিল ইউরেনিয়াম।

ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ বিনাশের অভিনব পদ্ধতি

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটিতে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সাম্প্রতিক অধিবেশনে আমেরিকার কৃষিদপ্তরের বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন যে, তাঁরা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ নির্মূল করবার একটি অভিনব উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এই উপায়ে রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা এসব কীট-পতঙ্গের প্রজনন-শক্তি নষ্ট করে দেওয়া হয়। মশা, মাছি, ডাঁশ, ফলের পোকা প্রভৃতির উপর এটি প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া গেছে। এজন্যে বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগারে দু-হাজারেরও বেশী যৌগিক পদার্থের গুণাগুণ পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে কয়েকটি এই বিষয়ে খুবই কার্যকরী হয়ে থাকে। এখনও এই পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যেই কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া গেছে, তাতে আগামী দশ বছরের মধ্যে ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ—এমন কি, ইঁদুর প্রভৃতির উৎপাত দমনে এই সব ভেষজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে।

মৃতের রক্তে জীবিতের রোগ-নিরাময়

১৯৬২ সালের লেনিন-পুরস্কারপ্রাপ্ত দু-জন সোভিয়েট শল্যচিকিৎসক—অধ্যাপক আদিমির শামফ ও অধ্যাপক সের্গেই ইউদিন আজ সারা বিশ্বের চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: এঁরা দু-জনে এমন এক মৌলিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, যার দ্বারা আকস্মিক-ভাবে মৃত কোন লোকের দেহের রক্ত প্রয়োজনমত জীবিত রোগীর দেহে দেওয়া যেতে পারে। ডাঃ শামফ ও ডাঃ ইউদিন ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় প্রমাণিত করেছেন যে, মৃতের রক্ত বিষাক্ত (টক্সিক) বলে চিকিৎসকদের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে যে ধারণা প্রচলিত আছে, তা ভুল। যে সব রোগে রক্ত দূষিত হয়ে পড়ে—সেরূপ কোন রোগে যদি মৃত্যু না ঘটে থাকে, তাহলে মৃত ব্যক্তির দেহ থেকে মৃত্যুর এক ঘণ্টার মধ্যে নিষ্কাশিত রক্তের প্রায় সমস্ত গুণই বেশ সক্রিয় থাকে এবং সেই রক্তকে জীবিত রোগীর দেহে প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া যায়।

ডাঃ শামফ প্রথমে কুকুর নিয়ে এই পরীক্ষা চালান। একটি জীবন্ত কুকুরের দেহ থেকে তিনি ৯০ শতাংশ রক্ত বের করে নেন এবং এই কুকুরটির কিনিক্যাল মৃত্যু ঘটবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি আরেকটি সদ্যনিহত কুকুরের রক্ত প্রথম কুকুরের দেহে সঞ্চালিত করেন। ফলে প্রথম কুকুরটি বেশ সুস্থ হয়ে ওঠে। এর দু-বছরের মধ্যেই ডাঃ শামফের সহযোগী ডাঃ ইউদিন পরীক্ষামূলকভাবে আকস্মিক দুর্ঘটনায় সদ্যনিহত একজন মানুষের রক্ত আরেক জন রক্তাল্পতা রোগে মুমূর্ষু রোগীর দেহে সঞ্চালিত ক'রে বিস্ময়কর ফল পান।

ডাক্তারদের পরিভাষায় রক্ত হলো দেহের "মুক্ত তন্তু"। এতে রয়েছে ভাসমান কোষ (ফ্লোটিং সেল)। মৃত জীবদেহে এই ভাসমান কোষ বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত সক্রিয় থাকে ও তাদের সমস্ত গুণ বজায় থাকে। এই অবস্থায় যদি তাদের জীবন্ত দেহে স্থানবদল ঘটানো যায়, তাহলে তারা সেই নতুন জীবদেহের অঙ্গীভূত হয়ে যায়।

অধ্যাপক শামফ ও অধ্যাপক ইউদিন গত ৩০ বছর ধরে এক্ষেত্রে গবেষণা চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছেন—যেটা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের এক বিরাট সম্ভাবনা সূচিত করছে বলে সর্বদেশের বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। ডাঃ শামফ ও ইউদিন মৃতদেহ থেকে নিষ্কাশিত রক্ত সংরক্ষিত করে রাখবার পদ্ধতিও উদ্ভাবন করেছেন।

ভারত মহাসাগর সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

টি ভেগা নামক যুক্তরাষ্ট্রের স্কুনার শ্রেণীর ১৩৬ ফুট দীর্ঘ একখানা জাহাজ ভারত মহাসাগরে

বৈজ্ঞানিক তথ্য সন্ধানের জন্তে বর্তমান মাসে সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা করবে। টি ভেগা মোট তিনবার ভারত মহাসাগরে তথ্যসন্ধানী অভিযান চালাবে। ন্তাশন্তাল সায়েন্স ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে টি ভেগার সাহায্যে তথ্যসন্ধানী এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই হবে তার প্রথম যাত্রা।

ভারত মহাসাগরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-কার্য চালাবার পূর্বে টি ভেগা গত জুন মাসে দশ হাজার মাইল ভ্রমণ করে এসেছে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক ও ১২ জন ছাত্রকে নিয়ে সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার উদ্দেশ্তে জাহাজটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যাত্রা করে।

এই গবেষণার জন্তে নির্বাচিত ছাত্রগণ জাতীয় বিজ্ঞান ফাউণ্ডেশনের বৃত্তি পেয়েছেন। অধ্যাপকগণের নির্দেশে ছাত্রগণ সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্তে ফেদোমিটার, সোনার, বটম স্থাম্পলার কোয়ার সাবমার্জড্ কটোমিটার প্রভৃতি যন্ত্র ব্যবহার করছেন। টি ভেগা যে সব বন্দরে নোঙ্গর করেছিল, সেই সব বন্দরের কাছাকাছি উপকূলের নিকটবর্তী এলাকা ও অগভীর জলে ঐ বিদ্যার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করেছেন। আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর সমীক্ষায় পৃথিবীর ১ টি রাষ্ট্র সহযোগিতা করছে এবং ১০টিরও অধিক জাহাজ এই কাজে নিযুক্ত আছে—টি ভেগা হবে এদেরই অন্ততম।

পুস্তক পরিচয়

সায়েন্স ফর চিলড্রেন এক্সিবিশন (Science for Children Exhibition).—শ্রীশিক্ষায়তন, ১১নং লর্ড সিংহ রোর্ড, কলিকাতা-১৬।

সায়েন্স ফর চিলড্রেন এক্সিবিশন কমিটি ১১নং লর্ড সিংহ রোডের শ্রীশিক্ষায়তনে গত ১০ই থেকে ১৯শে মে (১৯৬৩) পর্যন্ত ছোটদের একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। মানুষের অগ্রগতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞান। কাজেই বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধির ফলে মানুষের দ্রুততর অগ্রগতি সাধিত হবে। আমাদের জনসাধারণ, বিশেষ করে ছোটদের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী করে তোলবার জন্তে অন্তান্ত ব্যবস্থার সঙ্গে এরূপ বিজ্ঞান প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এই কমিটি এরূপ একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে সময়োপযোগী কাজ করেছেন। এই প্রদর্শনীটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাগণ এই উপলক্ষে আলোচ্য স্মারক পুস্তিকাখানি প্রকাশ করেছেন প্রদর্শনী সমিতির বক্তব্য, মূল ও শাখা সমিতির সভাপতি, কর্মকর্তা, উপদেষ্টামণ্ডলী, দাতা, পৃষ্ঠপোষক ও যাবতীয় সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচিতি ছাড়াও এতে এন. আর. ধর, এ. সি ব্যানার্জি, দিলীপ বোস, পি. সি. সেন, জয়ন্ত বসু, কুঞ্জবিহারী পাল, ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর প্রভৃতি লেখকগণের সুলিখিত রচনাবলী প্রকাশিত হওয়ার ফলে স্মারক সংখ্যাটি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। স্মারক সংখ্যাটির মুদ্রণ পারিপাট্য প্রশংসনীয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ডিসেম্বর—১৯৬৩

১৬শ বর্ষ ঃ দ্বাদশ সংখ্যা
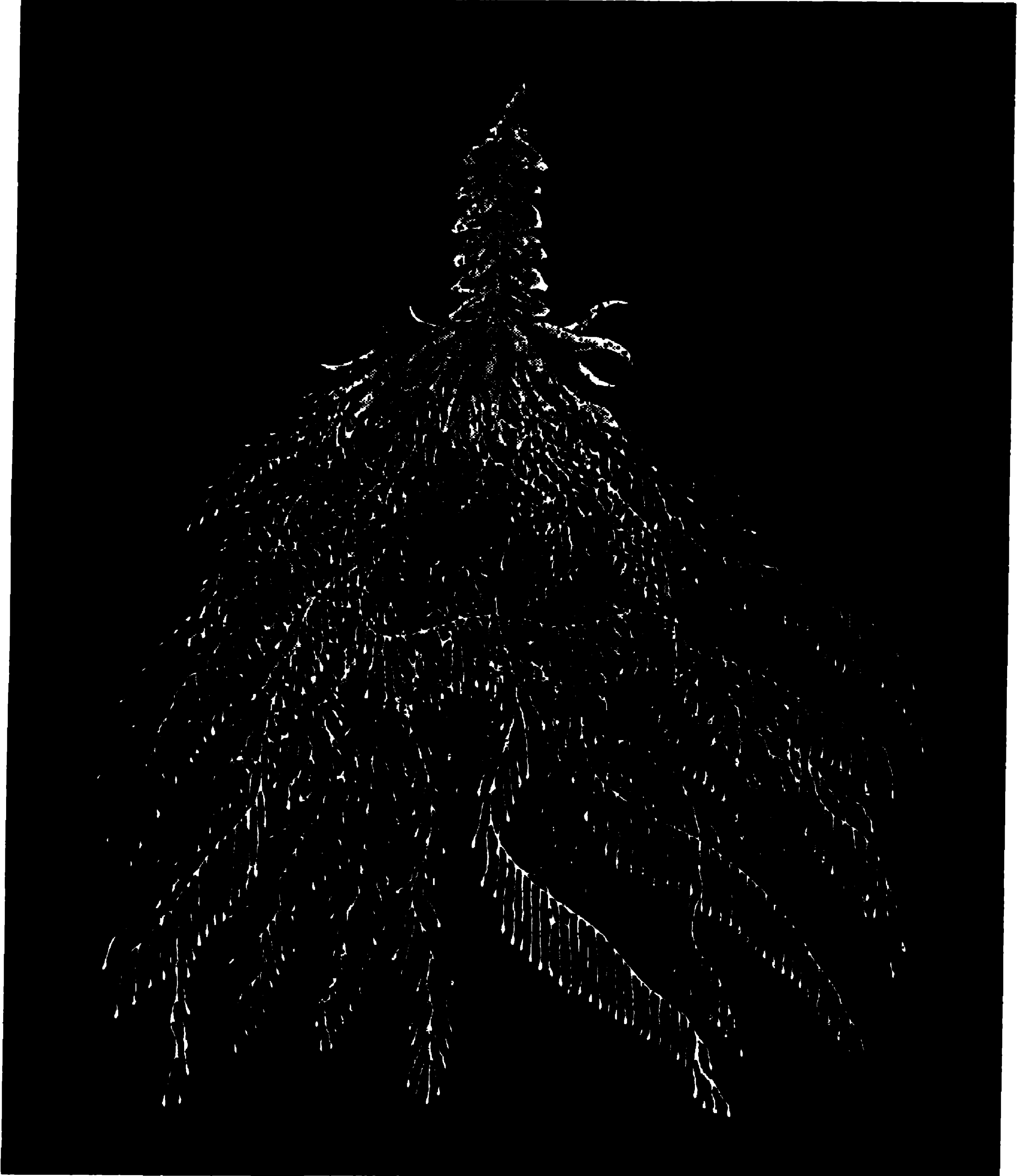
ব্লাডার বিয়ারার—একজাতীয় পলিপের উপনিবেশ। উপরের দিকের ভাসমান অংশের সাহায্যে এরা জলের মধ্যে ভেসে বেড়ায় এবং আহার সংগ্রহ করে।

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ

গত ১লা অক্টোবর তারিখ থেকে ভারতের সর্বত্র 'বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ' পালন করা হয়েছে। এই উপলক্ষে ভারতের ডাক ও তার বিভাগ ৭ই অক্টোবর তারিখে বন্য জীবজন্তু সম্পর্কে পাঁচ রকম বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন। ১ টাকা মূল্যের বিশেষ ডাকটিকিটে গীর অরণ্যের সিংহের, ৫০ নয়া পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটে বাঘের, ৩০ নয়া পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটে ভারতীয় হাতীর, ১৫ নয়া পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটে হিমালয়ের গণ্ডারের এবং ১০ নয়া পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটে বাইসনের ছবি আঁকা আছে।

এটা যে শুভ সংবাদ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'বন্য প্রাণী সপ্তাহ' পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য—বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা। কাজেই এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের প্রসঙ্গ আপনা থেকেই এসে পড়ে।

গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে ভারতে অনেক বন্য প্রাণীর সংখ্যা অতিমাত্রায় হ্রাস পেয়েছে। ফলে অনেক প্রাণীর বংশ লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনে একশৃঙ্গ গণ্ডার ও বুনো মোষ প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু বর্তমানে সুন্দরবনে ঐ প্রাণী দুটি নেই বললেই চলে। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে মালদহ জেলার বনে নীলগাই এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে ফ্লোরিকান পাখী যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশ থেকেই এরা অবলুপ্ত হতে চলেছে। কৃষ্ণসার ও পারাহরিণেরও প্রায় সেই অবস্থা।

বন্য প্রাণীর সংখ্যাল্পতার মূলে যে সব কারণ আছে, তার মধ্যে প্রধান কারণ হচ্ছে, মানুষের শিকার-প্রবৃত্তি। বুদ্ধিমান মানুষ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে যথেচ্ছ বন্য প্রাণী শিকার করে থাকে। এই শিকারের প্রধানতঃ তিন রকম উদ্দেশ্য থাকে। প্রথমতঃ, মাংস খাওয়ার উদ্দেশ্যে শিকার। এক্ষেত্রে যে সব প্রাণীর মাংস সুস্বাদু, সেই সব প্রাণীই হত্যা করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, শস্যক্ষেত্র ও গবাদি পশু রক্ষার উদ্দেশ্যে শিকার। এক্ষেত্রে যে সব প্রাণী ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে এবং মানুষ ও গবাদি পশু হত্যা করে, তাদেরই শিকার করা হয়। তৃতীয়তঃ, নিছক আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে শিকার—গেমস বা শিকার-বিলাস। তাছাড়া অনেক সময় চামড়া, লোম ও শিং প্রভৃতির লোভেও প্রাণীদের শিকার করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে যে শিকার করা হয়, তা সমর্থনযোগ্য বটে, তবে সেই সঙ্গে এই কথাও মনে রাখা দরকার যে, নির্বিচারে অবাধ প্রাণীহত্যা দেশের পক্ষে

বিপজ্জনক। বন্য প্রাণী নিশ্চিহ্ন হলে মানুষের হাতে গড়া সভ্যতাকে কঠিনতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। মনে রাখা দরকার যে, এই জগতে কোন কিছুই নিরর্থক সৃষ্টি হয় নি। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু উপযোগিতা আছে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি প্রাণীরা হিংস্র—সন্দেহ নেই, কিন্তু এরাও মানুষকে ভয় করে, মানুষ দেখলে আপনা থেকেই ভয়ে দূরে সরে যায়। কোন রকমে কোণঠাসা বা আহত না হলে মানুষকে আক্রমণ করে না। হরিণ, বুনো শূয়োর প্রভৃতি প্রাণী বাঘ ও সিংহের খাদ্য। বনে বাঘ ও সিংহের সংখ্যা কমলে হরিণ ও বুনো শূয়োরের সংখ্যা বাড়বেই। আর এদের সংখ্যা-বৃদ্ধি হলে শস্যক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি হবে। হাঙ্গেরীতে একবার চড়ুই জাতীয় পাখীর উপদ্রব বাড়ে। ঐ পাখীরা শস্যক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করছিল। সরকারী আদেশে ওদের গুলি করে প্রায় নির্মূল করা হয়। তার ফল কিন্তু ভাল হয় নি। কারণ শীঘ্রই শস্য-বিনাশী কীট-পতঙ্গের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পায় এবং তাতে কৃষির আরও বেশী ক্ষতি হয়। বলা বাহুল্য, চড়ুই জাতীয় ঐ পাখীদের অন্যতম খাদ্য ছিল শস্যবিনাশী কীট-পতঙ্গ। বনের হরিণ ও বুনো শূয়োর যদি সংখ্যায় কমে, তবে বাঘ-সিংহ প্রভৃতি প্রাণীদের খাদ্যাভাব হবে এবং তারা বন ছেড়ে লোকালয়ে যাবে গবাদি পশু শিকারের আশায়। সম্পত্তি রক্ষার জন্যে তখন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত হতে হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সকল প্রাণীই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এদের কোনটির উচ্ছেদই মানুষের পক্ষে হিতকর নয়। বন, পাহাড়, নদী, গাছপালা, ফুল, ফল—সব নিয়েই তো আমাদের দেশের সৌন্দর্য। প্রকৃতির সেই সুন্দর পরিবেশে পশুপাখী বিশেষ সম্পদ। বন্য পশুপাখীর অবর্তমানে পর্বত-অরণ্যও প্রাণহীন বলে মনে হয়। তাই দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অটুট রাখবার জন্যেও বন্য প্রাণীর সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

ভারতবাসীরা বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বহু পূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে স্থাপিত অশোক-স্তম্ভের গায়ে সম্রাট অশোকের কতকগুলি নির্দেশনামা আমরা দেখতে পাই। সেই নির্দেশনামার মধ্যে একটি হচ্ছে, যে সব চতুষ্পদ প্রাণী আহারযোগ্য নয় অথবা কোন ব্যবহারিক কাজের উপযোগী, তাদের হত্যা করা চলবে না। এই নির্দেশনামার সঙ্গে সংরক্ষণীয় পশু, পাখী, মাছ—এমন কি, কীট-পতঙ্গেরও একটি তালিকা ছিল।

বর্তমানকালে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের অন্যতম একটি উপায় হচ্ছে—অভয়ারণ্যের প্রতিষ্ঠা। প্রাকৃতিক পরিবেশে বন্য প্রাণীর জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখবার জন্যে এবং সুবিধামত লোকেরা যাতে তাদের দেখতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের এই উপায়টিও প্রাচীন ভারতের নৃপতিরা জানতেন। তার পরিচয় আমরা পাই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। কৌটিল্য লিখে গেছেন যে, সেকালের ভারতীয় নৃপতিরা তাঁদের রাজ্যের স্থানে স্থানে নিরাপদ অভয়ারণ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই সব অরণ্যের প্রাণী ধরা অথবা হত্যা করা—এমন কি, বিনা অনুমতিতে এই অরণ্যে প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ ছিল।

ইউরোপ ও আমেরিকায় বন্য প্রাণী সংরক্ষণের আন্দোলন সুরু হয় মাত্র সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে। কাজেই এদিক থেকে প্রাচীন ভারতের নৃপতিদের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে। তবে ভারতবর্ষ এই প্রাচীন আদর্শকে দীর্ঘকাল ভুলে ছিল। তারই ফলে ভারতের বন্য প্রাণীর একাংশকে ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বন্য প্রাণী সংরক্ষণের আন্দোলন জোরদার হয় এবং ইউরোপ ও আমেরিকা ছাড়িয়ে তা আন্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ভারতবর্ষেও এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম 'ন্যাশন্যাল পার্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পার্ক বন্য প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানকার গাছ কাটা ও প্রাণী হত্যা করা আইন অনুসারে নিষিদ্ধ। ধীরে ধীরে এই জাতীয় ন্যাশন্যাল পার্ক ইউরোপের অন্যান্য দেশেও প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের ভারতবর্ষেও কয়েকটি পার্ক ও 'গেম স্যাংচুয়ারি' স্থাপিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে মহীশূর রাজ্যের 'বেণু-গোপাল বন্যপ্রাণী পার্ক' ও উত্তর প্রদেশের 'করবেট ন্যাশন্যাল পার্কে'র নাম উল্লেখযোগ্য। আমাদের পশ্চিম বাংলাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এখানে আজ পর্যন্ত মোট আটটি প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলির নাম হচ্ছে—সেঞ্চল, মহানদী, গরুমারা, চাপরামারী, জলদাপাড়া, সজনাখালি, হ্যালিডে দ্বীপ ও লোথিয়ান দ্বীপ।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিকারযোগ্য বন্য প্রাণীদের সংরক্ষণের সহায়ক কতক-গুলি আইনকানুনও বলবৎ আছে। এই সব আইনের দ্বারা হাতী, গণ্ডার, বাইসন, উপকারী পাখী, গোসাপ, স্ত্রী হরিণ ও হরিণ শাবক শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে সব প্রাণী শিকারের অনুমতি দেওয়া আছে, তাদেরও আবার প্রজনন-ঋতুতে শিকার করা নিষিদ্ধ। তাছাড়া পশু যখন জলপান করে অথবা নোনা মাটি খায়, তখন তাদের হত্যা করা আইন অনুসারে দণ্ডনীয়। অবৈধ শিকার বন্ধ করবার জন্যে আইন থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত সংখ্যক রক্ষক কর্মচারীর অভাবে গুপ্ত শিকারী ধরা পড়ে না।

ভারতে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে আরও ন্যাশন্যাল পার্ক, অভয়ারণ্য ইত্যাদি গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান অভয়ারণ্যগুলির আয়তনও সম্ভব হলে বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ও কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, বনের মধ্যে নিরুদ্বেগে বসবাস করতে না পারলে, পর্যাপ্ত আহার না পেলে ও ক্রমাগত উত্ত্যক্ত ও শঙ্কিত অবস্থায় থাকলে প্রাণীদের প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায়। ফলে তাদের বংশ লোপ পাওয়া বিচিত্র নয়।

বন ও বনের প্রাণীরা দেশের এক বিরাট সম্পদ। কাজেই এদের সংরক্ষণের সঙ্গে দেশ ও দশের স্বার্থ জড়িত। এই সত্য আমরা উপলব্ধি করি না। তাই কঠোর আইন থাকা সত্বেও সৌখীন শিকারী বা ভদ্র খুনীরা নির্বিচারে প্রাণীহত্যা করে থাকে। এক্ষেত্রে আইন আর অনুশাসনই বড় কথা নয়। প্রধান কথা হলো সহযোগিতা। বন্য প্রাণীর জীবন রক্ষার ভার আমাদের। এই দায়িত্ব পালন করবার স্বপক্ষে জনমত গড়ে তোলাই আজ আমাদের প্রধান কর্তব্য। এই কাজ সফল হলে 'বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ' পালনও সার্থক হবে।

অমরনাথ রায়

বিবিধ

পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ভেষজ-বিজ্ঞানে ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার

স্টকহোলম ৫ই নভেম্বর—পদার্থবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কারে আজ তিনজন বিজ্ঞানীকে সম্মানিত করা হইয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইউজিন পি. উইগ্‌নার, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মারিয়া জিওপার্ত-মেয়ার এবং হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হান্স ডি. জেনসেনকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কারের অর্থের অর্ধাংশ পাইবেন অধ্যাপক ইউজিন পি উইগ্‌নার। অপর অর্ধাংশ পাইবেন অধ্যাপক মারিয়া জিওপার্ত-মেয়ার এবং অধ্যাপক হান্স ডি জেনসেন।

রসায়নবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কারে আজ পশ্চিম জার্মেনীর অধ্যাপক কার্ল জিয়েগ্‌লার ও ইতালীর অধ্যাপক জিউলিও নাট্টাকে সম্মানিত করা হয়।

অধ্যাপক কার্ল জিয়েগ্‌লার পশ্চিম জার্মেনীর মুলহেইমে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কার্বন রিসার্চ সংস্থার সহিত যুক্ত আছেন। অধ্যাপক নাট্টা মিলান ইনস্টিটিউট অব টেক্‌নোলজির সহিত যুক্ত আছেন।

স্টকহোলম ১৭ই অক্টোবর—চিকিৎসাবিদ্যায় ১৯৬৩ সালের নোবেল পুরস্কার আজ যুগ্মভাবে দুইজন বৃটেন ও একজন অষ্ট্রেলিয়াবাসীকে দেওয়া হয়। ক্যানবেরার সার জন ক্যারু এ্কেল্‌স্‌, কেম্ব্রিজের লয়েড হড্‌কিন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অ্যাণ্ড্রু ফিল্ডিং হাক্সলিকে এই পুরস্কারে সম্মানিত করা হইয়াছে।

শুক্রের আবহাওয়া পৃথিবীরই মত

শুক্রগ্রহের আবহাওয়ায় অক্সিজেন আছে। সুতরাং শুক্রগ্রহের আবহাওয়াও প্রায় মত। শুক্রগ্রহের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এই তথ্যটি আবিষ্কার করিয়াছেন।

মস্কো হইতে এই খবর দিয়া এ এফ. পি. আরও বলিয়াছেন—পর্যবেক্ষকদের ধারণা এবার হয়তো রাশিয়া ও আমেরিকা চন্দ্র বা মঙ্গলের মত মৃত গ্রহে মানুষ পাঠাইবার পরিকল্পনা স্থগিত রাখিবে এবং বাসযোগ্য শুক্রগ্রহ জয়ের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিবে।

বেতার-বটিকা

মার্কিন বিমান বাহিনীর বিজ্ঞান-শাখা এমন একটি রেডিও-ট্র্যান্সমিটার উদ্ভাবন করিয়াছেন, যাহা মানুষের দেহাভ্যন্তরে থাকিয়া সেখানকার সকল সংবাদ জানাইয়া দিবে।

আধখানা সিগারেট অপেক্ষা বড় নহে, এমন একটি রেডিও-ট্র্যান্সমিটার রোগীকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে। দেহাভ্যন্তরে গিয়া বেতার-যন্ত্রটি সেখানকার অবস্থা জানাইবে।

যন্ত্রটির নাম দেওয়া হইয়াছে 'বেতার-বটিকা'। বিজ্ঞান-শাখার রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বেতারের সহায়তায় মানবদেহের আভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টা এখনও প্রাথমিক পর্যায়েই রহিয়াছে। কিন্তু রোগ-নির্ণয়ের ব্যাপারে উহার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম বলিয়াই গণ্য হইবে।

জোংগা-জীপ

পার্বত্য যুদ্ধের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো জীপ। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে পাহাড়ের গা বেয়ে সরু রাস্তা খাড়া উঠে গেছে। জওয়ানদের এই রকম সঙ্কীর্ণ গিরিপথ ধরেই এগিয়ে যেতে হয় সীমান্তে প্রহরার কাজে। সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় প্রয়োজনীয় রসদ। এই পথে ট্রাক বা গাড়ী অচল। খচ্চর হয়তো চলতে পারে, কিন্তু তার বহন-ক্ষমতা সীমিত। এই সুকঠিন যাত্রাপথে জওয়ানদের পরম মিত্র হলো জোংগা জীপ। জওয়ানরা একে তাই নতুন আখ্যা দিয়েছে—যান্ত্রিক খচ্চর।

১২০ অশ্বশক্তির এই জীপ গাড়ীর পার্বত্য পথে চলবার ক্ষমতা অসাধারণ। চার শত কিলোগ্র্যাম মাল নিয়ে এই জীপ খাড়া পাহাড়ে অনায়াসে উঠে যেতে পারে। আবার অসমতল পথে চলতেও এর জুড়ি নেই। জোংগা জীপের চারদিক ঢাকা থাকে বলে জলবৃষ্টিতে মালের কোন ক্ষতি হয় না। কাজেই বন্ধুর পথে জওয়ানদের প্রকৃত বন্ধু হলো জোংগা জীপ। খচ্চরের চেয়েও এগুলি নির্ভরযোগ্য।

গত বছর জাপানের সহযোগিতায় ভারতের অস্ত্র-কারখানায় জোংগা জীপ উৎপাদন সুরু হয়েছিল। ১৯৬২-'৬৩ সালেই এক হাজারেরও বেশী জীপ নির্মাণ করা হয়েছে। চল্‌তি বছরে উৎপাদন আরও ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

এছাড়াও অস্ত্র-কারখানায় পশ্চিম জার্মেনীর সহযোগিতায় তিন টনের শক্তিশালী ট্রাক এবং জাপানের সহযোগিতায় এক টনের 'নিশান' ট্রাক নির্মাণ করা হচ্ছে। গত দুই বছরে ১৬০০টি শক্তিশালী ট্রাক ও ২০০০টি 'নিশান' ট্রাক নির্মিত হয়েছে। চলতি বছরে ১,৫০০টি শক্তিশালী ট্রাক এবং তিন হাজারটি 'নিশান' ট্রাক নির্মাণ করা হবে বলে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে।

দেশে আপৎকালীন অবস্থা সুরু হবার সময় থেকেই অস্ত্র-কারখানাগুলিতে জীপ ও ট্রাক উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তা-ছাড়া, আরও আনন্দের কথা এই যে, এসব যান-বাহন নির্মাণে ক্রমশঃই অধিক পরিমাণে দেশীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা হচ্ছে।

রক্তরোগের নতুন ওষুধ

কয়েক ধরণের রক্তরোগের চিকিৎসার জন্যে উজবেকিস্তানের চিকিৎসা-বিজ্ঞান পরিষদের রক্ত-গবেষণা ভবনের গবেষকেরা কোবাল্ট-৩০ নামে এক প্রকার নতুন ওষুধ তৈরি করেছেন। হাল্কা গোলাপী রঙের এই চূর্ণ ওষুধটি দীর্ঘকাল ধরে মস্কো, লেনিনগ্র্যাড, তাশখন্দ ও অন্যান্য শহরের হাসপাতালগুলিতে নানা ধরণের রক্তরোগ নিরাময়ে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ফার্মাকোলজিক্যাল কমিটি এই কোবাল্ট-৩০ ব্যাপক হারে উৎপাদন ও ব্যবহারের সুপারিশ করেছেন। তাশখন্দের ওষুধ উৎপাদনের কারখানায় এই ওষুধটির ব্যাপক হারে উৎপাদন সুরু হয়েছে।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদ

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন, ১৯৬৩

বিজ্ঞান কলেজ
শারীরবৃত্ত বিভাগের কক্ষ

২১শে, সেপ্টেম্বর '৬৩
শনিবার, ৩-৩০টা

কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

পরিষদের এই পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট ৩৭ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য পরিচালনা করেন। অধিবেশনের নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুসারে সভাপতি মহাশয় সভার কার্য আরম্ভ করেন এবং কর্মসচিব মহাশয়কে পরিষদের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিবার জন্য আহ্বান করেন।

কর্মসচিবের বার্ষিক-বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত বার্ষিক-বিবরণী পাঠ করিতে উঠিয়া প্রথমেই আলোচ্য বছরে পরিষদের সভ্য ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক নিখিলরঞ্জন সেন ও অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র মহাশয়দ্বয়ের পরলোক গমনে পরিষদের পক্ষ হইতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন এবং সভার উপস্থিত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত অধ্যাপকদ্বয়ের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় গৃহীত শোকপ্রস্তাব পরলোকগতদের পরিবারবর্গের নিকট পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অতঃপর সভায় উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের আদর্শ ও কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠ করেন। পরিষদের আদর্শানুযায়ী বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা ও বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় পুস্তকাবলী প্রকাশন প্রভৃতি কার্যাদির বিবরণ দান করিয়া কর্মসচিব মহাশয় পরিষদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য অন্যান্য কাজের পরিকল্পনা রূপায়ণে সভ্যগণের সাহায্য ও সহযোগিতা আহ্বান করেন। বিশেষতঃ পরিষদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য তিনি সভ্যগণের শুভেচ্ছা কামনা করেন। অতঃপর পরিষদের এই বার্ষিক বিবরণী উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

হিসাব-বিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ

পরিষদের গত বার্ষিক অধিবেশনে নির্বাচিত হিসাব-পরীক্ষক মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর অংশীদারদের শ্রী পি, কে. গুহঠাকুরতা, চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে তৎপক্ষে উক্ত হিসাব-পরীক্ষক ফার্ম কর্তৃক পরিষদের ১৯৬২-৬৩ সালের বিভিন্ন পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্‌বৃত্ত-পত্র পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভায় পেশ করেন। পরিষদের বিভিন্ন তহবিল সম্পর্কিত এই সকল হিসাব-বিবরণী ও উদ্‌বৃত্ত পত্র যথানিয়মে ইতিপূর্বেই সভ্যগণের বিবেচনার জন্য মুদ্রিতাকারে

প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে যথোচিত আলোচনার পরে সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং উপস্থিত সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে পরিষদের উক্ত পরীক্ষিত উদ্বৃত্তপত্র ও বিভিন্ন তহবিলের হিসাব-বিবরণীগুলি হিসাব-পরীক্ষকের মন্তব্যাদিসহ সভায় গৃহীত হয়।

অতঃপর পরিষদের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অনুমোদিত হইয়া ১৯৬৩-'৬৪ সালের জন্য পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের ব্যয়বরাদ্দ পত্রগুলি, যাহা সভ্যগণের বিবেচনার জন্য ইতিপূর্বেই যথানিয়মে মুদ্রিতাকারে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা কোষাধ্যক্ষ মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে সভ্যগণের অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। যথোচিত আলোচনা ও বিবেচনার পরে উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক উক্ত ব্যয়বরাদ্দ পত্রগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতি গঠন

পরিষদের গঠনতন্ত্র অনুসারে ১৯৬৩-'৬৪ সালের জন্য কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্য পদের জন্য সাধারণ সভ্যগণের প্রেরিত মনোনয়ন পত্রগুলি ও বিদায়ী কার্যকরী সমিতির এতদ্বিষয়ক সুপারিশসমূহ একত্রীত করিয়া ১৯৬৩-'৬৪ সালের কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির প্রস্তাবিত নামের তালিকা কর্মসচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করেন। এই সকল নামের তালিকা উপস্থিত সভ্যগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং পরবর্তী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে নিম্নলিখিত নামগুলি নির্বাচিত হইল বলিয়া সভায় ঘোষিত হয়।

কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু—সভাপতি
„ সতীশরঞ্জন খাস্তগীর—সহঃ সভাপতি
„ অসীমা চট্টোপাধ্যায় „
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী—সহ সভাপতি
জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় „
„ জ্যোতির্ময়চন্দ্র ঘোষ „
„ পরিমলকান্তি ঘোস—কর্মসচিব
„ কান্তিলাল চৌধুরী—সহযোগী কর্মসচিব
„ রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় „
„ সুশীলরঞ্জন মৈত্র—কোষাধ্যক্ষ

কার্যকরী সমিতির সদস্য

শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
„ অনাদিনাথ দাঁ
„ রমেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র
„ মুক্তিসাধন বসু
„ বিনয়কৃষ্ণ দত্ত
„ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
„ আশুতোষ গুহঠাকুরতা
„ শঙ্কর চক্রবর্তী
„ সুভাষচন্দ্র রায়
„ অনিল রায়চৌধুরী
„ দিলীপকুমার বসু
„ জয়ন্ত বসু
„ যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র
„ রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
„ অমূল্যধন দেব

সারস্বত সঙ্ঘ গঠন

পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘের গঠন সংক্রান্ত নিয়মতান্ত্রিক বিধিবিধানের সাপক্ষে সভায় এইরূপ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, বিভিন্ন বাস্তব অসুবিধার জন্য সারস্বত সঙ্ঘের বার্ষিক পুনর্গঠনের বিষয়টি আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া বর্তমান সারস্বত সঙ্ঘই পরবর্তী বছরের জন্য বহাল থাকিবে এবং ইহার বিভিন্ন শাখার পূর্বতন সদস্যগণই যথারীতি পুনর্নির্বাচিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

অতঃপর কর্মসচিব মহাশয় সভায় জানান যে, সারস্বত সঙ্ঘের পূর্বতন সঙ্ঘসচিব শ্রীমহাদেব দত্ত মহাশয় কর্মব্যপদেশে কলিকাতার বাহিরে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ তিনি পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘের কর্তব্যাদি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়াছেন। এই জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে কর্মসচিব মহাশয় তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সভার সর্বসম্মত অনুমোদনক্রমে তাঁহার পদত্যাগপত্র গৃহীত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর কর্মসচিব মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় অতঃপর পরিষদের সারস্বত সঙ্ঘের সঙ্ঘসচিব পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

হিসাবপরীক্ষক নির্বাচন

গত কয়েক বছর যাবৎ মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর পক্ষে শ্রীপ্রশান্তকুমার গুহঠাকুরতা, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মহাশয় পরিষদের হিসাবপত্র পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হইয়া আসিতেছিলেন। তিনি পরিষদের বিভিন্ন হিসাবপত্রের বার্ষিক বিবরণী ও উদ্বৃত্ত পত্র রচনা করিয়া এবং তৎসংক্রান্ত নানা কাজে পরিষদকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেন। পরিষদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী এই হিসাবপরীক্ষক মহাশয় গত বছর অকালে পরলোকগমন করিয়াছেন। কর্মসচিব মহাশয় তাঁহার অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানাইয়া সভায় এইরূপ প্রস্তাব করেন যে, উক্ত হিসাব-পরীক্ষক প্রতিষ্ঠান মেসার্স মুখার্জী, গুহঠাকুরতা অ্যাণ্ড কোং-এর অন্যতম অংশীদার শ্রীপ্রভাসকুমার সরকার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট মহাশয়কে এখন পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক হিসাবে নির্বাচিত করা যাইতে পারে। তিনিও পরিষদের একজন সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী এবং একজন দক্ষ হিসাব-পরীক্ষক। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে এবং সভার সর্বসম্মত অনুমোদন অনুসারে শ্রীপ্রভাসকুমার সরকার মহাশয় ১৯৬৩-'৬৪ সালের জন্য পরিষদের হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচিত হন।

অনুমোদকমণ্ডলী গঠন

পরিষদের নিয়মাবলীর বিধান অনুসারে এই বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অনুলিপি চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য বিদায়ী ও নবনির্বাচিত কার্যকরী সমিতির সদস্যগণের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ অনুমোদক হিসাবে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
শ্রীমৃণালকুমার দাশগুপ্ত
শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র
শ্রীঅনাদিনাথ দাঁ
শ্রীজয়ন্ত বসু

অধিবেশনের সভাপতি ও পরিষদে কর্মসচিবসহ উপরিউক্ত পাঁচজন অনুমোদকের দ্বারা এই অধিবেশনের কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত হইলে তাহা পরিষদ কর্তৃক যথোচিতভাবে গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

সভাপতির ভাষণ

অতঃপর পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় মাতৃভাষায় বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করিয়া দেশের জনগণকে বিজ্ঞান-সচেতন করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে পরিষদের কর্মপ্রচেষ্টাকে অধিকতর সফল করিবার জন্য সভ্যগণের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি সাধারণ সঙ্ঘ-সমিতিগুলির বিধিবিধানের নিয়ামক একটি নূতন রেজিস্ট্রেসন অ্যাক্ট প্রবর্তিত হইয়াছে। এই অ্যাক্ট অনুসারে পরিষদের পূর্ব-রেজিস্ট্রিকৃত পুরাতন নিয়মাবলীর কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইতে পারে। আইনজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে এই বিষয়ে যথা কর্তব্য স্থির করা হইবে

এবং সভ্যগণকে যথাসময়ে জানানো হইবে। তারপরে পরিষদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি সভ্যগণের নিকট তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন এবং বলেন যে, ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট হইতে পরিষদ কর্তৃক ক্রীত গোয়াবাগান অঞ্চলের জমিখণ্ডই এখন অবস্থা বিবেচনায় সুবিধাজনক ও গ্রহণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অতএব এই জমিতেই পরিষদের গৃহনির্মাণের কাজে এখন আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। এরূপ বিভিন্ন বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণদানের পরে সভাপতি মহাশয় সভ্যগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন।

বিবিধ প্রস্তাব

১। কর্মসচিব মহাশয় সভায় এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ১৮.৯.৬৩ তারিখে পরিষদের কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে পরিষদের কাজকর্মের প্রসার সাধনের জন্যে যে উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা এই সভায় অনুমোদিত হউক। অতঃপর নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দকে লইয়া উক্ত উপদেষ্টা সমিতি গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়:—

শ্রীগৌরদাস মুখার্জী, শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, শ্রীসত্যপ্রসন্ন সেন।

প্রয়োজনবোধে এই সমিতিতে পরিষদের সভ্য ও শুভানুধ্যায়ী যে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করা যাইবে এবং কর্মসচিব মহাশয় প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণের জন্য উক্ত সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিবেন।

২। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের প্রস্তাব অনুসারে এবং সভাপতি মহাশয়ের সমর্থনে এই সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এইরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে সার্থক পথিকৃৎ ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে কিছু স্মারক অনুষ্ঠান করা হইবে। অতঃপর এইরূপ স্থির হয় যে, নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া গঠিত উপসমিতি যথাসময়ে কার্যকরী সমিতির নিকট এই স্মারক অনুষ্ঠান সম্পর্কে করণীয় কর্মের সুপারিশ করিবেন:

১। পরিষদের সভাপতি
২। " কর্মসচিব
৩। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
৪। শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

এই বার্ষিক অধিবেশনের নিয়মিত কার্যাদির শেষে পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল মহাশয় সভায় উপস্থিত সভ্যগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরিষদের বিদায়ী কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সদস্যগণকে আলোচ্য বছরে পরিষদের কাজকর্মের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং নবনির্বাচিত কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলী ও কার্যকরী সমিতির সভ্যগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

সত্যেন বোস	পরিমলকান্তি ঘোষ
সভাপতি,	কর্মসচিব,
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ	বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

অনুমোদকমণ্ডলীর সভ্যগণের স্বাক্ষর:

১। সুশীলরঞ্জন মৈত্র
২। মৃণালকুমার দাশগুপ্ত
৩। অনাদিনাথ দাঁ
৪। জয়ন্ত বসু
৫। জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

আবেদন

বিজ্ঞানের প্রতি দেশের জনসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি ও বিজ্ঞান-চর্চার প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজ কথায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্যাদি পরিবেশন করবার জন্য পরিষদ 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামে মাসিক পত্রিকাখানা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করে আসছে। তাছাড়া সহজবোধ্য ভাষায় বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাদিও প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হবার ফলে পরিষদের কার্যক্রমও যথেষ্ট প্রসারিত হয়েছে। এখন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞান অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানের গ্রন্থাগার, বক্তৃতাগৃহ, সংগ্রহশালা, যন্ত্রপ্রদর্শনী প্রভৃতি স্থাপন করবার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে। অথচ ভাড়া-করা দুটি মাত্র ক্ষুদ্র কক্ষে এ-সবের ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা, দৈনন্দিন সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব বিধান ও কর্ম প্রসারের জন্যে পরিষদের একটি নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পরিষদের গৃহ-নির্মাণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের আনুকূল্যে মধ্য কলকাতার সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটে এক খণ্ড জমি ইতিমধ্যেই ক্রয় করা হয়েছে। গৃহ-নির্মাণের জন্যে এখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। দেশবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনাদের নিকট উপযুক্ত অর্থ সাহায্যের জন্যে বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আশা করি, জাতীয় কল্যাণকর এরূপ একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আপনি পরিষদের এই গৃহ-নির্মাণ তহবিলে আশানুরূপ অর্থ দান করে আমাদের উৎসাহিত করবেন।

[পরিষদকে প্রদত্ত দান আয়কর মুক্ত হবে]

২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা—৯

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ